রঙ্গশালা

দ্বিতীয় বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

কার্ত্তিক
১৩৪৪

শ্রীদুর্গা ও শ্রীদুর্গোৎসব

শ্রীযামিনী কান্ত সেন।

বর্ষার ঘন মেঘ কেটে গেছে—শরতের হাওয়ার মধুর আলিঙ্গন পাওয়া যাচ্ছে! এ সময়টা বাঙ্গালীর উৎসবের সময়। কোন উৎসব তা' তোমরা ভালই জান। যে উৎসবের জন্য সব চেয়ে দীর্ঘ ছুটি পাওয়া যায় সে উৎসব এসে পড়েছে। সারা বছর আশা করা হয় পূজোর ছুটির—তোমরা যে ছুটির আনন্দ উপভোগ কর মহাদেবী দশভূজার পূজোর জন্য। তাই আজ বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে আনন্দের ফোয়ারা! সকল দুঃখ, যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যের কশাঘাত ভুলে' বাঙ্গালী আজ আনন্দে মত্ত হয়েছে। সকল জাতিই উৎসব করতে অগ্রসর হয়েছে।

অন্যায়ের বিনাশ ও ন্যায়ের জয় এই হচ্ছে ধর্ম্মের ব্যবস্থা। দুর্গাপূজোর এই সত্যই স্পষ্ট করে দেখান হয়। অসুরেরা দেবতাদের বার বার পরাস্ত করে' জয়ী হয়—তাতে অসত্যের জয় হয়ে থাকে। দুর্গাপূজার গল্পে মহিষাসুর কি করেছিল জান? ব্রহ্মার বর পেয়ে মহিষাসুর দেবতাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। দেবতারা ব্রহ্মার নিকট যায়। ব্রহ্মা শিব ও দেবতাদের নিয়ে বিষ্ণুর কাছে যায়। বিষ্ণু উপায় দেখিয়ে দেন। সকল দেবতাদের শক্তির যোগে দুর্গার আবির্ভাব হয়। দেবতারা একে একে চক্র, শূল, বজ্র, তূণ প্রভৃতি মহাদেবীকে দান করে। এই মহাদেবীই দুরন্ত দানবকে হত্যা করে' ব্রহ্মাণ্ড শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বলতে গেলে যারা দুরন্ত তাদের নিধন না করলে সংসার চলেনা। এ জন্য মহাদেবী এদের বিনাশ করে থাকেন।

দুর্গোৎসব

শ্রীযামিনী কান্ত সেন

সকল দেশের প্রাচীন সভ্যতার দেববাদ বা Mythology আছে। গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন দেশের কল্পনা ও চিন্তা এক সময় দেবতাদের কল্পনা ও অনুষ্ঠানে প্রকাশ পেত। ভারতের তাই হয়েছে! শ্রীদুর্গা কল্পনায় প্রচুর রূপক আছে। দশ হাত মানে স্থূল হাত মাত্র নয়—দশ দিকে যার ভুজের শক্তি বিরাজ কর্‌ছে তাঁকেই দশভুজা বলা হয়। যিনি মায়ের মত চারিদিকের অমঙ্গলকে বিনাশ করে' সন্তানদের জীবন নিরাপদ করেন। মূর্ত্তি ও চিত্রে এই ভাবটী ফোটান হয়—যারা লেখাপড়া জানে না—তারাও তা'তে করে বুঝতে পারে। নানা প্রদেশের অধিবাসীর অন্তরের কথাও এমনি করে মূর্ত্তি ও চিত্রদ্বারা প্রকাশ করা হয়।



শ্রীদুর্গা—যবদ্বীপ

এ দেশে বহু ভাষা প্রচলিত—কাজেই এক দেশের লোক অন্য দেশের ভাষা বোঝে না। এরূপ অবস্থায় কলাবিদ্যার সাহায্য গ্রহণ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রয়োজন হয়। কারণ মূর্ত্তি বা চিত্রের ভিতর দিয়ে কারও কোন বিষয় বুঝ্‌তে বাধা হয় না। এ জন্য উড়িষ্যায় শ্রীদুর্গার যে মূর্ত্তি তা মহারাষ্ট্রদেশের লোকের বুঝতে কষ্ট হয়না কিম্বা যবদ্বীপের মূর্ত্তি বাঙ্গালীর কাছে সুস্পষ্ট হয়।

এই দুর্গামূর্ত্তির ভিতর দিয়া নানাদেশের ভাবের গভীরতা এবং মনের ঐশ্বর্য্যও বোঝা যায়। নানাদেশের মূর্ত্তি নানাভাবে সে দেশের অন্তরের চিত্র বহন করে। শ্রীদুর্গামূর্ত্তি রচনার এই বিচিত্রতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে যবদ্বীপের শ্রীদূর্গার আছে প্রশান্ত কারুতা ও স্বচ্ছ প্রসন্নতা। শ্রীদূর্গামূর্ত্তিকে নানা সাধক নানাভাবে অনুভব করেছে। অতি মনোহর হয়েছে যবদ্বীপের রচনা—লালিত্য ও শক্তির চমৎকার মিলন হয়েছে এই প্রতিমায়। শ্রীদূর্গা প্রতিমার মহিষাসুর বধ একটা বিশেষ ঘটনা। মহাদেবীই মহিষাসুর বধ করে' জগতকে রক্ষা করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ অবস্থায় দেবীই আবিভূ'ত হন—দেব বাহন। ভারতবর্ষে মহাদেবীই শক্তির আধার বলে কল্পিত—মহাদেব বাহন। এজন্য মাতৃরূপিণী দেবীই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। দশহাতে স্ত্রীশক্তি অস্ত্র ধারণ করে' যুদ্ধে উদ্যত—এ কাজ মহাদেবের নয়—মহাদেবীর।

দুর্গামূর্ত্তি লালিত্যে অপরাজেয়। শিল্পীরা মহাদেবীর বাহুলতাগুলিকে একটী ছন্দের মত লীলায়িত করে রচনা করে ধন্য হয়েছে। কোন কোন চিত্রে মূর্ত্তিকলায় শ্রীদুর্গা যেন একটা নাট্য প্রসঙ্গের নায়িকার মত রচিত হয়েছেন। মহিষাসুরের মুখখানি জন্তুর—দেহটি মানুষের মত। একটা প্রবল গতিশীল ভাব এই মূর্ত্তিতে সুস্পষ্ট। এই সব মূর্ত্তি মাটীর, পাথরের ও ধাতুর হয়ে থাকে।



হাতীরদাঁতের দশভুজা মূর্ত্তি—মুর্শিদাবাদ

প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি সব পাথরের তৈরী। অপরদিকে বাঙ্গলা দেশের শিল্পীরা শ্রীদুর্গামূর্ত্তি হাতীর দাঁতের হাড়ে তৈরী করে থাকে। মুর্শিদাবাদের কারিগরেরা এ বিষয়ে পাকা ওস্তাদ। অতি চমৎকার হাতীর দাঁতের তৈরী মূর্ত্তি সকলের চিত্ত হরণ করে। অবশ্য হাতীর দাঁতের মূর্ত্তির পূজো হয় না। বাঙ্গলা দেশে ইদানীং তৈরী মূর্ত্তিই পূজোর জন্য ব্যবহৃত হয়। কুমোরটুলির কারিগরেরা প্রতিবৎসর বহু মূর্ত্তি রচনা করে। কল্‌কাতার বাইরে বাঙ্গলার সব যায়গায় এখনও মূর্ত্তি তৈরীর ভাল কারিগর আছে।

বার্ষিক পূজো প্রচলিত আছে বলেই বাঙ্গলার মূর্ত্তিকলা এখনও জীবিত। না হয় এতদিনে স্মৃতিও মুছে যেত। বস্তুতঃ চিরকালই ধর্ম্মব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পকলার উন্নতি ও রচনা হয়েছে। এ যুগে চিত্র ও মূর্ত্তি রচনায় বাঙ্গলার কৃতিত্ব বজায় আছে। কারণ প্রতি বৎসরেই একটা সৃষ্টির আবহাওয়া বর্ত্তমান থাকে।



শ্রীদুর্গা—দক্ষিণ ভারত

বাঙ্গলাদেশের দূর্গা ও ইউরোপের Laocoonএ দেবীর শত্রুদলনের দৃশ্য আছে। Laocoonএ দেবীমূর্ত্তি নেই—দেবীর প্রেরিত ভুজঙ্গের দৃশ্য আছে। বাঙ্গলা দেশে শ্রীদূর্গাদেবীর মূর্ত্তির সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তিও আছে। এ সব মূর্ত্তির বাহন ও আসন অতি চমৎকার। শিল্পীরা জন্তু রচনায় নিজেদের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগও এই প্রতিমা নির্ম্মাণ উপলক্ষ্যে পেয়ে থাকে।



শ্রীদুর্গা—ময়ূরভঞ্জ

শ্রীদূর্গা বাঙ্গলাদেশের প্রিয় ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গ্রীকদের যেমন Athene ছিলেন তেমনি বাঙ্গালীরও শ্রীদূর্গা। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভাবের পরিবর্ত্তনও হচ্ছে। সেকালের নিষ্ঠা একালে নেই। সেকালের শ্রদ্ধা ও সাধনা একালে দুর্ল্ভ। তা ছাড়া ধর্ম্মেও নানা মত ও নানা তত্ত্বের স্থান আছে। কেউবা শাক্ত, কেউবা বৈষ্ণব—কেউবা জৈন? তবুও শ্রীদূর্গাপূজার একটা আন্দোলন সমগ্র বাঙ্গলা দেশকে চঞ্চল করে' তোলে। সামাজিক দিক হ'তে এটা একটা মিলনের সময়—নানাদেশ হ'তে প্রবাসী আত্মীয় ও বন্ধুরা সমবেত হ'য়ে থাকে। দেশের দুঃখ ও দারিদ্রতার ভিতরও দূর্গাপূজার মহোৎসব সকলের চিত্তরঞ্জন করে।

শ্রীদূর্গাপ্রতিমা রচনা শিল্পীর পক্ষে অতি কঠিন ব্যাপার। দেবীমূর্ত্তির দশটী হাতকে সুসঙ্গত করা ও অপ্রাকৃত অবস্থাকে চোখের তৃপ্তিকর করা অতি চতুর শিল্পীর কাজ। কালিকা-পুরাণে আছে দেবী আদি সৃষ্টিতে অষ্টাদশভুজা ছিলেন। দ্বিতীয় সৃষ্টিতে দেবী ভদ্রকালী মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে দেবীর দশভূজা মূর্ত্তিই প্রচলিত। নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও দেবীর অষ্টাদশভূজা মূর্ত্তি দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশে দেবীর দশহাতই দেখতে পাওয়া যায়। দেবী ভগবতে আছে হাজার হাত থাকলেও দেবী আঠার হাত নিয়ে অবতীর্ণ হন। ইলোরা মন্দিরেও অষ্টাদশ বাহু দেখা যায়।

যদিও দেবী মহিষাসুর নিধনে উদ্যত তবুও দেবীর দৃষ্টি প্রশান্ত। যিনি সকল শক্তির আধার তিনি বিচলিত হ'তে পারেন না। তিনি ভক্তের নিকট প্রশান্ত চোখেই দেখা দেন। বস্তুত দেবী-প্রতিমা পূজক ও পূজ্যের সহিতই সম্পর্ক স্থাপন করে—কাজেই দেবীর দৃষ্টি ভক্তের দিকে—মহিষাসুরের দিকে নয়। এজন্য মূর্ত্তি-কলায় দেবী ভয়ঙ্করী ও অসুরকে হত্যা করিতে উদ্যত হ'লেও ঈষৎ হাস্যময়ী। শ্রীদুর্গা বাঙ্গলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কারণ এত আনন্দ আর কোন পূজোতেই বাঙ্গালী উপভোগ করে না। দীর্ঘ অবকাশ শুধু শরতের এই পূজা উপলক্ষেই বাঙ্গালী উপভোগ করে।



শ্রীদুর্গা এলোরা



ভূত-চৌদশী—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোকা-সোকার শোবার ঘরে
আচিল-পাঁচিল, শিট্‌কিনি-খিল্ খুট্ খাট্ করে,
বোকা-সোকা ঘুমাতে না চায়!
উট্‌কপালী ঘুঁটে চোরের মা
থ্যাবড়া আঙ্গুল চ্যাপ্‌টা পা,
রাতের ঘোরে
আস্তে জোরে—
ছড়া কেটে যায়!

—'ঘুম্‌তা ঘুমায়
ঘুমেতে ঘুমায়
রাত-বিরেতে
চাঁদটা ঘুমায়;
নীলের ক্ষেতে
বাদ্‌লা ঘনায়!
ঘুম ঘুম্ যায়—গাঙ্গের বাতাস—স্—স্
নিশার পিতুম্—রাতের আকাশ—শ্—শ্
হুঁস্-পরীর ধীর নিঃশ্বাস

থেকে থেকে উলু ঘাস—দুলায়
পোড়ো বাড়ির ভাঙ্গা আলিসায়!
চিল-ছত্তর রাজপুত্তুর ঘুমাতে ঘুমাতে কলাই চিবায়—
চিলে-কোঠায়!

—'ও বড়াই বুড়ি!
কয়লা ঘরে কয়লা ঝুড়ি
তাতে নড়ে কি?
দেখ দেখি!'
—'নড়ে কালো বিড়ালের বাচ্ছা কটি
দেখেছি দেখেছি,
দেখে এসেছি!
—'রন্ধন ঘরে ঝন্‌ঝন্ বাসন মাজে কে?'
—'হেঁসেল বুড়ির অরন্ধন হয়ে ঢুকেছে!'
—'গোহাল ঘরে গোভুত বুঝি নাক্ ঝাড়লো?'
—'গোলপাতার ছাঁচে টিপি টিপি বৃষ্টি নাম্‌লো!

টুপ্ টাপ্ টিপ্
দেড় প্রহর রাতে ঠিক
ইন্দুরে সিন্দুক কাটে—খিট্ খাট্ খিট্!
টিকটিকি আর বাদ্‌লা পোকাতে
ছ্যালের কোনাতে,
খেলে চল্লো কিট্ কিট্—

—'কিট্ কিট্ ইট্ পাট্‌কিল্
জমা ওয়াশীল
কাজিল হাতচিট্,
চিঠিপত্র কীটদষ্ট, রুলটানা শীট্—
কিট্‌কিট্---কালো কিট্ কিট্ ;
কালো কালী, কেলে হাড়ি
ঘুঁটের কাঁড়ি,
ভূতের বাড়ী
ঝামা ইঁট্—
কালো কিট্ কিট্—তোষকের ছিট্ ;
মাথার বালিশ—তেল চিট্ চিট্
পিতুমের শিষ—কালো মুখ
আলো দেয় মিট্ মিট্
ঘড়ির কাঁটা করে—টিক্‌টিক্
টিটিক্ টুইঙ্কিল টিক্ !'

রাত দেড়টায়
শ্মশানে শিংশপায়
ঝড়ে ঝাপটায়
বিক্রম রায়
গুড়্‌গুম্ গুড়গুম্—তালে বেতালে ঝড়ে কিল্
হর্জ্জা পোহাতে ভাঙ্গা দরজার কল্ কব্‌জা শিথিল !
ঘরে ঢুকে পড়ে—উই-চিংড়া চামচিকার মিছিল
খিচির মিচির শব্দে ঘর ভরে
ঝিল্ মিল্— খড় খড়ে
নড়ে চড়ে, বলে—ঢিল্ পড়ে
না শিল্ পড়ে না কিল্ ?

বোকা সোকার
সাড়া শব্দ নেই আর
হ্রস্ব ই তে দীর্ঘ ঈ তে
দেয়ালের টিক্‌টিকিতে,
বেধে গেছে টাগোয়ার !
কুজ্‌ঝটিতে—ঘুমচটিতে
পেতি-পেরেতে, পেরেকে-শিকে—ধ্বন্ধুমার।
ঝাঁটা পিটে—ঝাঁটা বুড়ি হল আগুসার—
কলাপাতে
শালপাতে
মাছে—ভাতে একাকার !

অন্ধকারে গুবাক্ পাতার
অবাক্ টুনটুনি—
'গুরুপাক্'—গুরুপাক্'
ব্যাঙের ডাক্—
যায় শুনি !
দাঁড়কাকে ছিটকায় চুন
সেই ফাঁকে
'ছিক্' বলে থামে টুনটুনি
চোখ বোজে এক দুই গুনি !

রাত দুইটাতে
পাকা বাঁশ গাঁট মটকাতে—কটাশ
ডালকুত্তা শুঁকে দেখে বাতাস
কে যেন আসে—চটাশ্‌, চটাশ্‌ !

মশা গিয়ে বোকার পিঠে বসায় হুল্
চটাশ চাপড়ে সোকা না জেগে—বাধায় হুলুস্থুল!
—বালিশ ফেলা ফেলি
তুলো মাখামাখি,ভুত সেজে—
উভয়ে দেখছে জেগে—
চাঁদ আর নাই আকাশে লেগে!
মুচেছে তারার দাগ,
এককালে ভেগেছে রাত
হুম্‌কি দিতেছে হুঁকো বুড়ো—
"যেতে হবে না পাঠশালে!"
বাঘ যেন হাঁকরালে রেগে সক্কালে!!
তেল হলুদে মাখা আকাশ তারি তলায়
কোথায় একটা ঘানি গাছ
ডেকে বল্‌ছে কলুর বলদে—
"এঁহে—এযে, এ বি সি—এককালে।
বোকা-সোকা যান পাঠশালে।

সক্কালে—
মণ্ডল পাড়ার পাঠশালে
চলে বোকা-সোকা
ভিজে বাতাস, ভিজে মাটি—সোঁতা স্যোঁতা!
—বেয়ে উঠছে তুঁতের ডালে গুটিপোকা।
পেরিয়ে গুপ্ত-বাড়ি—গোকুলদাসের আখড়া
গাছে সেখানে ধরেছে আমড়া;
লোহার পিঁজরায় পড়া কাজ্‌লা পড়ে চলেছে,
দাঁতন করছেন গোকুলদাস
গাব ভেরেণ্ডার কাঠি গালে!

বাঁধ ঘুরে যেতে হাই-ইস্কুল,
ছাতের কোনায় বাজ ধরা শূল,
লাল খড়খড়ি সারিসারি ম্যালা—
খেলার মাঠে কাঁটা তারের বেড়া,
সবুজের পিঠে খড়ির দাগ—
জ্যামিতিকের প্রতিজ্ঞাপূরণ নির্ভুল !

ইস্কুলঘেঁসে কালীবাড়ী—
হাড়ি-কাঠে সিঁদুরের দাঁড়ি।
আরম্ভ হল মণ্ডল বাজার
গোড়াতেই দোকান খোট্টা-ময়রার।
পাকে চড়েছে বোঁদে, বো' ছেড়েছে চানা-ভাজার।
তার গায়েই ফাঁড়ি
ঢালু ছাত, লাল টালি।
আফিস ঘর টিকেদারের
মুন্সিপালী জমাদারের
বকেট্ বহা দু'চাকার গাড়ি !
তারি উত্তরে আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়,
মনিহারির দোকান একখান—বই সেলেট পেন্‌সিল্ বিক্রয় !
করগেট টিনের চৌচালা বাজার
কাঁদি-কাঁদি মর্ত্তমান, ঝাঁকা ঝাঁকা বেগুন
আতা লেবু হাঁড়ি পাতিল স্তুপাকার।
গা ঘেঁসেই তার সদানন্দ কেবিন
তাকের পরে চায়ের টিন
হিন্দু বিস্কুটের বিজ্ঞাপন
দিচ্ছে বাহার।

ভুত-চৌদশী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্যাবিনের চা খাচ্ছেন—হেডপণ্ডিত, সেকেণ্ডমাষ্টার, থার্ডমাষ্টার ;
কে একজন পড়ছেন 'আনন্দ বাজার'
খাটো পেণ্টুলেন বুট্ জুতো নিচেতেই, তার
এক পাশে দাঁড়িয়ে ছাতা—গলায় বাঁধা কম্ফরটার !
ক্যাবিন ছাড়িয়ে—
খোঁটার গায়ে পোষ্ট বক্স রয়েছে দাঁড়িয়ে।
এই খানেই মণ্ডল বাজার শেষ,
বোকা-সোকার মাথায় বই শ্লেট
জোড়ে হাঁটে পা চালিয়ে !

একধারে ঘন বাঁশের সার
আর ধারে বেড়া আস্-শ্যাওড়ার
মাঝখানে হাঁটা পথ সরু এক রত্তি
পাঁজা পোড়া ধোঁয়া গন্ধে ভর্ত্তি।
সট্‌পট্ যাবার—
সট্‌কট্ এটা পাঠশালার
রাম কুণ্ডুর ছোট মেয়েটা ঢেঁকিতে পাড়ছে পাড় !
দেখা যায় শোনা যায় বলছে ঢেঁকি—"সত্যি সত্যি !"

এক হাত নহর জলে থৈ থৈ
টপকে যেতে কাদায় পড়লো বোকার বই
সোকা শেলেট ধুয়ে, ফিরে দেখে বোকা কই ?
নহর পারে বহুকালের আম বাগান
কাঠ্‌ঠোকরা ফোঁপড়া কাঠে ঠোকর লাগান—

ঠক্ ঠকা ঠক্ তালে তালে
বোকা সোকায় মিললো সেই কালে—হাতে সেলেট বই।
দেখলে উকুন বাচ্চে একটা মর্কট একটা শুকনো ডালে
বোকা সোকা আগায় জোরে পুনরায় পাঠশালে।

বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নদীর বাঁক্ দেখা যায়
লগায় বাঁধা জাল হাত ছানি দেয় বোকায় সোকায়।
কচু পাতা সিঁদুরে সবুজে
আড়ে আড়ে চায় ঘাড় গুঁজে—
আহার খুঁজে নেউলী বুড়ি—পাতার তলায়
ভিজেমাটি আঁচড়ায়!

আম বাগানে—
পাতা ঢাকা পথ—
কীট পতঙ্গের জগৎ—
বোকা সোকা জানে,
পাঠশালার বিদ্যে—শেষ করেছে এইটুকুতে, এইখানে।
জানে ছুটিতে—
তেঁতুলের ডালে বাদুড় ঝোলে—চামথলিতে।
ভূত পালায়—রাম বলিতে;
তাও জানে।
জানে না সেবকের পিঠে শ্রী হয় দিতে।

ভূত-চৌদশী

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আম বাগান ঘুরে পাঠশালা
রাতের ঝড়ে হেলেছে চালা
 বেড়া ধ্বসেছে প্রায় মাটিতে।
বুড়ো ছাগল
চোখ দুটো তার হল্‌দে গোল
তার একটা ছোট একটা ডাগর—
করেছে টোলের পণ্ডিত বাকারী পিঠে
 বোকা সোকার পাছে সেও ঢুকলো গিয়ে পাঠশালাটিতে
'কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লিজ্জে
 কাঠা কালির পাঠ নিতে।





সুখী রাজপুত্র

(Oscar Wilde-এর 'The Happy Prince' গল্পের অনুবাদ)

শ্রীবুদ্ধদেব বসু



সহরের অনেক অনেক উঁচুতে, প্রকাণ্ড উঁচু থামের উপরে সুখী রাজপুত্রের মূর্ত্তি। সমস্ত শরীর তার পাৎলা সোনার পাতে মোড়া, চোখ তার উজ্জ্বল দুটি নীলা, আর তার তলোয়ারের হাতলে মস্ত একটা পান্না ঝলমল করছে।

সবাই তাকে খুব বাহবা দেয়। নগর পরিষদের একজন মন্ত্রী বলেন, 'বাঃ, কী সুন্দর!' তাঁর ইচ্ছে, সুন্দর জিনিসের সমঝদার হিসেবে তাঁর নাম হোক। তারপরেই তাড়াতাড়ি বলেন, 'তবে এ দিয়ে অবশ্য কোনো কাজ হয় না।' পাছে লোকে ভাবে তিনি কাজের লোক নন! মস্ত কাজের লোক তিনি।

ছোটো একটি ছেলে কেঁদে কেঁদে বলছিলো, 'আমাকে চাঁদ ধ'রে দাও, আমাকে চাঁদ পেড়ে দাও।' তার মা বিজ্ঞের মতো বলেন, 'ঐ সুখী রাজপুত্রের মতো হ'তে পারো না তুমি? সে তো কখনো কোনো জিনিসের জন্য কাঁদবার কথা মনেও আনে না।'

আশা যার ব্যর্থ হয়েছে এমন একজন লোক ঐ আশ্চর্য্য মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে মনে-মনে বলে: 'পৃথিবীতে কেউ যে একজন সুখী এ-কথা ভাবতেই ভালো।'

অনাথ-আশ্রমের ছেলেমেয়েরা বলে, 'ঠিক দেবদূতের মতো দেখতে।'

'কী ক'রে জানলে?' তাদের অঙ্কের মাষ্টারমশাই ধমকে ওঠেন, 'দেবদূত দেখেছো কখনো?'

'দেখেছি বই কি, স্বপ্নে দেখেছি।'

কথাটা শুনে অঙ্কের মাষ্টারমশাই গম্ভীর হয়ে গেলেন, ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখুক, এটা মোটেও তাঁর পছন্দ নয়।

এক রাত্রে সেই সহরের উপর দিয়ে উড়ে গেলো ছোট্ট সোয়ালো পাখি। তার বন্ধুরা দেড় মাস আগে গেছে মিশরদেশে চলে, কিন্তু সে ছিলো পিছনে পড়ে, কারণ তার ইচ্ছে অতি সুন্দর ছিপছিপে একটি বেতকে বিয়ে করে। সেদিন মস্ত একটা হলদে ফড়িঙকে তাড়া ক'রে ক'রে নদীর উপর দিয়ে সে যখন উড়ে যাচ্ছে. সেই পাৎলা ছিপছিপে বেতকে দেখে তার এত ভালো লাগলো যে সে তক্ষুণি থেমে গেলো তার সঙ্গে আলাপ করতে।

'আমাকে বিয়ে করবে?' আসল কথাটা একেবারেই পাড়লে সোয়ালোপাখি, আর শ্রীমতী বেত মাথা নিচু ক'রে নমস্কার করলে। সোয়ালো তাকে ঘিরে উড়ে উড়ে বেড়ালো, পাখার ডগা দিয়ে জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, ছলছল রূপালি ঢেউ তুলে। এমনি করে তাদের ভাব জমলো, এমনি করে কাটলো সমস্ত গ্রীষ্ম।

অন্যান্য সোয়ালোরা টিট্‌কিরি দিয়ে বললে, 'ওঃ, ভা—রি বিয়ে হচ্ছে! মেয়ের তো এক পয়সা সম্বল নেই, তার উপর আত্মীয়ের গুষ্টি!' আর সত্যি, নদীটা ভরেই বেতের ঝোপ। তারপর, শীত যখন পড়ি-পড়ি করছে তারা সব উড়ে চললো!

ওরা তো গেলো চ'লে, এদিকে আমাদের সোয়ালোর বড়ো একা-একা লাগছে। ভাবী স্ত্রীর সঙ্গেও আর সময় কাটে না। 'মোটে কথাই নেই ওর মুখে! বেশ সংসারী মেয়ে, তা ঠিক; কিন্তু আমি দেশ-বিদেশ বেড়াতে ভালোবাসি, তাই আমার স্ত্রীরও বেড়াতে ভালো না বাসলে চলবে না।'

শেষ পর্য্যন্ত সে কাছে গিয়ে বললে, 'যাবে তুমি আমার সঙ্গে? কিন্তু শ্রীমতী বেত মাথা নাড়লেন, দেশের মাটির উপর এমনিই তাঁর টান।

ব'লে উঠলো সোয়ালো, 'তা'হলে তোমার সঙ্গে হ'লো না। চললুম আমি পিরামিডের দেশে।' গেল সে উড়ে।

সমস্ত দিন উড়লো সে, সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁছলো সেই সহরে। 'রাতটা কোথায় কাটাই?' মনে-মনে সে বললে, 'এই সহর সব আয়োজন ক'রে রেখেছে আশা করি।'

তারপরে তার চোখে পড়লো উঁচু থামের উপর রাজপুত্রের মূর্ত্তি।

'ঐ তো আমার থাকবার জায়গা! সে চেঁচিয়ে উঠলো। 'জায়গাটি বড়ো সুন্দর তো—আর কী হাওয়া!'

এই না ব'লে সে নেমে পড়লো ঠিক সুখী রাজপুত্রের দু'পায়ের মাঝখানে।

'বাঃ' চারদিকে তাকিয়ে সে আস্তে বলে উঠলো, 'শোবার জন্যে সোনার ঘর পেয়েছি আমি।' ব'লে সে পাখার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমুতে যাবে, এমন সময় বেশ বড়ো এক ফোঁটা জল তার গায়ে পড়লো। 'অবাক কাণ্ড!' সে বলে উঠলো, 'আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, তারাগুলো ঝকমক করছে, তবু কিনা বৃষ্টি! এই উত্তর ইয়োরোপের ক্লাইমেট সত্যি বড়ো বিশ্রী!'

তারপর আর এক ফোঁটা পড়লো।

'বৃষ্টিই যদি আটকাতে না পারে তবে একটা মূর্ত্তি থেকে লাভটা কী? নাঃ, ভালো দেখে একটা চিমনি খুঁজে নিতে হচ্ছে।' ব'লে সে সেখান থেকে উঠতে গেলো।

কিন্তু তার পাখা খুলতে না খুলতেই আরো এক ফোঁটা পড়লো তার গায়ে, সঙ্গে-সঙ্গে উপরের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো—চুপ, চুপ! কী দেখলো?

সুখী রাজপুত্রের দু'চোখ ভরা জল, তার সোনার গাল বেয়ে দরদর করে জল ঝরছে। চাঁদের আলোয় এমন সুন্দর তার মুখখানা যে ছোট্ট সোয়ালোর হৃদয় করুণায় ভ'রে গেলো।

'কে তুমি?' সে জিজ্ঞেস্ করলে।

'আমি সুখী রাজপুত্র।'

'তবে তুমি কাঁদছো কেন? আমাকে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছো যে!'

মূর্ত্তি জবাব দিলে 'যখন বেঁচে ছিলুম, আর যখন আমার মানুষের হৃদয় ছিলো তখন কান্না কা'কে বলে আমি জানতুম না। কারণ আমি থাকতুম চিরসুখের প্রাসাদে, সেখানে দুঃখকে ঢুকতে দেয়া হত না। দিনের বেলায় আমি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলে বেড়াতুম; সন্ধে-বেলায় স্বর্ণভবনে আমি হতুম নৃত্যের নেতা। বাগান ঘিরে ছিলো মস্ত উঁচু দেয়াল—তার ওপিঠে কী আছে আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি, কারণ আমার চারদিকে সবই ছিলো অতি সুন্দর। আমার পারিষদরা আমাকে বলতো সুখী রাজপুত্র—আর ফুর্ত্তিতেই যদি সুখ হয় তবে সত্যি আমি সুখী ছিলুম। এমনি আমার জীবন কাটলো, এমনি আমার মৃত্যু হ'লো। আর এখনো মরে যাওয়ার পর, আমাকে ওরা এত উঁচুতেই বসিয়েছে যে আমি চারদিকে তাকিয়ে আমার নগরের সমস্ত কুশ্রীতা আর দারিদ্র্য দেখতে পাই; আর যদিও আমার হৃদয় এখন শিষের তৈরি, তবু না কেঁদে আমার উপায় থাকে না।'

'ও, তুমি তাহলে আগাগোড়া সাচ্চা সোনা নও!' সোয়ালো বললে। অবিশ্যি মনে মনে বললে, কেন না সে ভারি ভদ্র, কখনো কাউকে শুনিয়ে এ-রকম কোনো কথা বলে না।

এদিকে মূর্ত্তি নিচু গলায় গানের মতো গুণগুণ ক'রে বলতে লাগলো, 'অনেক দূরে এক ছোট্ট রাস্তায় আছে এক জীর্ণ বাড়ি। একটা জানলা তার খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় একটি মেয়ে টেবিলের ধারে বসে আছে। মুখ তার রোগা ফ্যাকাশে, হাত দু'খানা দগদগে লাল, ছুঁচের খোঁচা খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে গেছে। সেলাই করে তার দিন গুজরান হয়। রাণীর সখিদের মধ্যে সব চেয়ে যে সুন্দরী তার সাটিনের কাপড়ে সে বড়ো বড়ো সূর্য্যমুখী ফুল তুলছে রঙিন সুতো দিয়ে; রাজসভায় শিগ্‌গিরই যে-নাচ হবে তাতে তিনি সেটা পরবেন। ঘরের এক কোণে তার ছোট্ট ছেলে অসুখে পড়ে। ছেলেটির জ্বর হয়েছে, কম্‌লালেবু খাবার জন্যে সে বায়না ধরেছে। নদীর জল ছাড়া আর কিছু তার মা দিতে



পারছে না, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওগো সোয়ালো, ওগো লক্ষ্মী ছোট্ট পাখি, তুমি আমার তলোয়ারের হাতল থেকে পান্নাটা তুলে নিয়ে সেই মেয়েকে দিয়ে এসো। আমার পা তো এখানে আটকানো, আমার নড়বার উপায় নেই।'

সোয়ালো বললে, "মিশরদেশ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নীল নদীর উপর দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আমায় বন্ধুরা, বড়ো বড়ো পদ্মফুলের সঙ্গে গল্প করছে। শিগ্‌গিরই ওরা ঘুমোতে যাবে মৃত মহারাজার স্তম্ভে; সেখানে স্বয়ং মহারাজ তাঁর ছবি-আঁকা কফিনে শুয়ে আছেন। গায়ে তাঁর হলুদ রঙের কাপড় জড়ানো, গায়ে তাঁর সুগন্ধি মশলা মাখা। গলায় তাঁর ফিকে সবুজ পাথরের মালা, হাত দু'খানা তাঁর শুকনো পাতার মতো।'

'ওগো সোয়ালো, ওগো ছোট্ট পাখি, তুমি কি এক রাত্রি আমার কাছে থাকবে না, তুমি কি হবে না আমার দূত হয়ে? ছেলেটির বড় তেষ্টা পেয়েছে, তার মা-র কী কষ্ট!

সোয়ালো জবাব দিলে, "ছোট্ট ছেলেদের আমি বিশেষ পছন্দ করিনে। গেলোবছরের গ্রীষ্মে আমি নদীর উপরে বাসা নিয়েছিলাম। সেখানকার কলওয়ালার দুটো অসভ্য ছেলে

কেবলই আমাকে ঢিল ছুঁড়তো। অবিশ্যি তার একটাও আমার গায়ে লাগে নি, কারণ আমরা সোয়ালোরা হচ্ছি সেরা উড়িয়ে, তা' ছাড়া পাখা চালাবার ওস্তাদির জন্যে আমার বংশই নাম করা—তবু, গায়ে না লাগলেও অপমান তো বটে!'

কিন্তু সুখী রাজপুত্রকে এমন মন-মরা দেখাচ্ছিলো যে সোয়ালোর মনে কষ্ট হ'লো। তাই সে বললে, "এখানে বড় ঠাণ্ডা, কিন্তু এক রাত্রি আমি তোমার কাছে থাকবো, হব তোমার দূত।"

"ছোট্ট সোয়ালো, তুমি বড়ো ভালো," বল্‌লে রাজপুত্র।

তারপর সোয়ালো রাজপুত্রের তলোয়ারের হাতল থেকে মস্ত পান্নাটা ঠক্‌রে তুলে নিলে, সেটা ঠোঁটে ক'রে উড়ে গেলো সহরের অনেক ছাদের উপর দিয়ে।

গেলো সে উড়ে গির্জ্জার উপর দিয়ে, সেখানে শ্বেতপাথরের কত দেবদূতের মূর্ত্তি। গেলো সে প্রাসাদের ধার দিয়ে, শুনলো নাচ-গানের শব্দ। সুন্দর একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায় তার স্বামীর সঙ্গে। স্বামী বল্‌লে, "দ্যাখো, দ্যাখো কী সুন্দর তারা।"

মেয়েটি জবাব দিলে, "রাজসভায় নাচের দিনে আমার নতুন কাপড়টা তৈরি হলেই হয়। আমি ওর উপর সূর্য্যমুখী ফুল তুল্‌তে দিয়েছি, কিন্তু সেলাইওয়ালিরা কুঁড়ে!"

গেলো সে উড়ে নদীর উপর দিয়ে, দেখলো জাহাজের মাস্তুলে-মাস্তুলে আলো জ্বলছে; বন্দরের ধারে বেচা-কেনার ভিড়, দাঁড়িপাল্লায় কত টাকা-পয়সা মাপা হচ্ছে। তারপরে সেই জীর্ণ বাড়িতে পৌঁছিয়ে সে ভিতরে উঁকি দিলে। ছোট্ট ছেলেটি বিছানায় শুয়ে জ্বরের ঘোরে ছট্‌ফট্ করছে, মা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সোয়ালো ঢুকলো ঘরে, মস্ত পান্নাটা রাখলো মেয়েটির কোলের উপর, তারপর আস্তে বিছানার উপর দিয়ে উড়লো, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলো ছেলেটির কপালে। "কী ঠাণ্ডা," ছেলেটি বল্‌লে "নিশ্চয়ই আমি ভালো হয়ে উঠেছি।" ব'লে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর সোয়ালো সুখী রাজপুত্রের কাছে ফিরে গিয়ে সে যা করে' এসেছে সব বললে। "ভারি অদ্ভুত। এত তো শীত, কিন্তু এখন আমার মোটেও ঠাণ্ডা লাগছে না।"

রাজপুত্র বল্‌লে, "তুমি একটা ভালো কাজ ক'রে এসেছো কি না, তাই ও-রকম লাগছে।" কথাটা শুনে ছোট্ট সোয়ালো ভাবতে লাগলো, একটু পরেই পড়লো ঘুমিয়ে। ভাবতে আরম্ভ করলেই তার ঘুম পেয়ে যেত।

যখন ভোর হ'লো সে নদীতে গেলো স্নান করতে। সেই সময়ে পুলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পক্ষীতত্ত্বের অধ্যাপক ব'লে উঠলেন, এ তো বড় আশ্চর্য্য ঘটনা! শীতকালে সোয়ালো!" তারপর তিনি এ-বিষয়ে মস্ত লম্বা চিঠি লিখলেন খবরের কাগজে। সে চিঠি সকলেই আওড়াতে লাগলো, কেননা তাতে এমন অনেক কথা ছিলো যার মানে কেউ জানে না।

"আজ রাত্রে আমি যাবো মিশরদেশে।" কথাটা ভেবে সোয়ালোর মনে খুব ফুর্ত্তি হ'লো। সেই সহরের যত বড়ো বড়ো বাড়ি আর স্তম্ভ সব সে দেখে বেড়ালো, গির্জ্জার চূড়ায় বসে কাটালো অনেকক্ষণ। যেখানেই সে গেলো, চড়ুইপাখিরা কিচমিচ শব্দ করে' বলতে লাগলো, "দেখেছো এই বিদেশীকে! একজন কেউ-কেটা হবে!" আর সে কথা শুনে সোয়ালোর ফুর্ত্তি আরো বেড়েই গেলো।

চাঁদ যখন উঠলো, সে ফিরে গেলো সুখী রাজপুত্রের কাছে। "মিশরদেশে কোন কাজ থাকে তো বলো। আমি এখুনি রওনা হচ্ছি।"

"ওগো সোয়ালো, ওগো ছোট্ট পাখি," রাজপুত্র বল্‌লে, "তুমি কি আর এক রাত্রি আমার সঙ্গে থাকবে না?

"মিশরদেশে সবাই আমার প্রতীক্ষা করছে," সোয়ালো বললে, "কাল আমর বন্ধুরা দ্বিতীয় জলপ্রপাত পর্য্যন্ত উড়ে যাবে। সেখানে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে জলঘোড়ারা খেলা করছে, আর লাল পাথরের প্রকাণ্ড সিংহাসনে বসে আছেন দেবতা মেমন। তিনি সমস্ত রাত বসে তারাদের দেখেন, আর ভোরবেলায় শুকতারা যখন জ্বলজ্বল করে তখন একবার আনন্দধ্বনি করে' ওঠেন, তারপর চুপ। দুপুরবেলায় হলুদরঙের সিংহেরা আসে ঝরণার ধারে জল খেতে। চোখ তাদের টল্‌টলে সবুজ, আর তাদের গর্জ্জন জলপ্রপাতের শব্দের চেয়েও ভয়ানক।

রাজপুত্র বল্‌লে, "সোয়ালো, সোয়ালো, ওগো ছোট্ট পাখি, সহর পার হয়ে অনেক দূরে আমি দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট চিলকোঠার ঘরে এক যুবক ব'সে আছে টেবিলে হাত রেখে। টেবিল ভরা কাগজপত্র, আর পাশে, একটা গেলাসে শুকিয়ে যাওয়া একগুচ্ছ ফুল। চুল তার বাদামী রঙের, ঠোঁট তার ডালিমফলের মতো লাল, বড়ো বড়ো চোখ দু'টি যেন স্বপ্নে ভরা। থিয়েটারওয়ালাদের জন্য সে একটি নাটক লিখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তার এত শীত করছে যে আর লিখতে পারছে না। ঘরে তার আগুন নেই, খিদেয় সে অবসন্ন।"



সোয়ালোর মনটা আসলে বেশ ভালো, তাই সে বল্‌লে: "আচ্ছা, থাকবো তোমার সঙ্গে আর এক রাত্রি। কী করতে হবে বলো। আর একটা পান্না দিয়ে আসবো ওকে?

'হায়রে' আমার যে আর পান্না নেই, এখন আমার চোখ দুটিই সম্বল। এই যে নীলা দেখছো, ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এরা এসেছিলো, এদের মতো আর পৃথিবীতে

নেই। এর একটা উপ্‌ড়ে নিয়ে সেই যুবককে দিয়ে এসো। তা' বেচে সে কাঠ কিনতে পারবে, খাবার কিনতে পারবে, শেষ করতে পারবে তার নাটক।'

'রাজপুত্র, এ আমি কিছুতেই পারবো না', ব'লে সোয়ালো কাঁদতে আরম্ভ করলে।

'সোয়ালো, সোয়ালো, লক্ষ্মী পাখি, আমি যা বলছি তা-ই করো।'

সোয়ালো আর কি করে, রাজপুত্রের এক চোখ উপ্‌ড়ে নিয়ে উড়ে গেল সে সেই যুবকের চিলকোঠায়। ঘরের ছাতে একটা গর্ত্ত ছিলো, তাই তার পৌঁছতে কিছুই কষ্ট হল না। যুবকটি দু'হাতে মুখ ঢেকে ব'সেছিলো, তাই পাখার শব্দ সে শুনতে পেলো না। যখন সে চোখ মেললো সে দেখলো একটি অপরূপ নীলা তার শুকিয়ে-যাওয়া ফুলগুলির মধ্যে পড়ে আছে।

'তাহ'লে ওরা আমাকে বুঝতে শিখেছে', সে ব'লে উঠলো। 'এটি নিশ্চয়ই আমার লেখার কোনো ভক্ত দিয়ে গেছে। এবারে নাটকটা শেষ করা যাক্।' তার দস্তুরমত মন ভালো হ'য়ে গেলো।

সোয়ালো পরের দিন বেড়াতে গেলো বন্দরে। মস্ত একটা জাহাজের মাস্তুলের উপর ব'সে ব'সে সে দেখতে লাগলো খালাসিরা খোলের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড সব সিন্ধুক দড়ি দিয়ে টেনে টেনে তুল্‌ছে। একটা উঠে আসে, আর তারা চেঁচিয়ে ওঠে : 'হেঁইয়ো জোয়ান, হেঁইয়ো।' 'আমি যাচ্ছি মিশরদেশে', সে বল্‌লে। কিন্তু তার কথা কেউ শুনলো না, আর চাঁদ যখন উঠলো সে উড়ে ফিরে গেলো সুখী রাজপুত্রের কাছে।

'তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।'

'সোয়ালো, ওগো সোয়ালো, লক্ষ্মী পাখি, আর একটা রাত্রি কি আমার কাছে তুমি থাক্‌বে না?'

সোয়ালো বল্‌লে, 'এখন শীতকাল, শিগ্‌গিরই বরফ পড়া সুরু হবে। মিশরদেশে তাল-খেজুরের পাতায় পাতায় চমৎকার মিষ্টি রোদ, আর কুমীরগুলো কাদার মধ্যে শুয়ে অলসভাবে চারিদিকে তাকাচ্ছে। আমার বন্ধুরা বালবেকের মন্দিরে বাঁধছে বাসা, ফুটফুটে সাদা আর গোলাপি ঘুঘুরা তাদের দেখছে আর নিজেদের মধ্যে কূ-কূ করছে। শোনো রাজপুত্র, আমাকে এখন যেতেই হবে; কিন্তু তোমার কথা কখনো আমি ভুলবো না; আর সামনের বসন্তকালে, যে মণি দুটো তুমি দিয়ে দিলে, তার বদলে খুব সুন্দর পান্না আর নীলা নিয়ে আসবো তোমার জন্যে। পান্না হবে লাল গোলাপের চেয়েও লাল, আর নীলা হবে বিরাট সমুদ্রের মতো নীল।'

সুখী রাজপুত্র বল্‌লে : 'নিচের ঐ পার্কে একটি ছোটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেশলাই বেচে। তার দেশলাইগুলো সব নরদমায় প'ড়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে। এদিকে বাড়িতে

কিছু পয়সা নিয়ে যেতে না পারলে তার বাপ তাকে ধ'রে মারবে। না আছে তার জুতো, না আছে মোজা, মাথায় টুপিও নেই। তুমি আমার আর একটা চোখ উপড়ে নিয়ে তাকে দিয়ে এসো, তাহ'লেই তার বাপ আর তাকে মারবে না।

সোয়ালো বল্‌লে : 'আরো এক রাত্রি থাকবো আমি তোমার সঙ্গে, কিন্তু তোমার চোখ আমি উপড়ে তুলবো কী ক'রে? তাহ'লে তুমি একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে যে।'

সোয়ালো, ওগো সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, আমি যা বলছি তাই করো', বল্‌লে রাজপুত্র।

সোয়ালো আর কী করে, রাজপুত্রের বাকি চোখটি তুলে নিয়ে সোঁ ক'রে উড়ে গেলো। ছোট্ট দেশলাইওয়ালির পাশ দিয়ে যেতে যেতে নীলাটা ফেলে দিলে তার হাতের মুঠোর মধ্যে। মেয়েটি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো : 'বাঃ কী সুন্দর এক টুক্‌রো কাচ', তারপর হাসতে হাসতে দৌড় দিলে বাড়ীর দিকে।

সোয়ালো রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে বল্‌লে, 'তুমি তো অন্ধ হ'য়ে গেলে। এখন আমি তোমার কাছেই বরাবর থাকবো।'

'না, না, তা হ'তে পারে না', রাজপুত্র বল্‌লে, 'শোনো সোয়ালো, তুমি আজই মিশরদেশে চলে যাও।'

'আমি তোমার কাছেই বরাবর থাকবো', ব'লে সে ঘুমিয়ে পড়লো রাজপুত্রের পায়ের তলায়।

পরের দিন রাজপুত্রের কাঁধে ব'সে ব'সে সে তাকে কত অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত গল্প শোনালো। শোনালো লাল সারসপাখির কথা, নীলনদীর ধারে লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যারা ঠোঁটের ফাঁকে সোনালি মাছ র; শোনালো স্ফিঙ্কস্‌এর গল্প, যে সব জানে, যার বয়েস পৃথিবীর সমান আর মরুভূমিতে যার বাসা; শোনালো সওদাগরদের গল্প, যারা উটেদের পাশে-পাশে আস্তে হেঁটে চলে যায় অ্যাম্বরের মালা হাতে নিয়ে; আর চাঁদের পাহাড়ের রাজার গল্প, যে মেহগনির মত কালো, আর পূজো করে প্রকাণ্ড একটা স্ফটিকের; আর মস্ত সবুজ সাপের গল্প, যে ঘুমিয়ে থাকে খেজুর গাছের ছায়ায় আর মধু খায় কুড়ি জন পুরোহিতের হাত থেকে; আর ক্ষুদে মানুষের গল্প, যারা চওড়া শাপলাপাতায় চ'ড়ে বড়ো বড়ো হ্রদ পার হ'য়ে যায় আর প্রজাপতিদের সঙ্গে যাদের যুদ্ধ বেধেই আছে।

'ওগো ছোট্ট সোয়ালো', রাজপুত্র বল্‌লে, 'তুমি তো আমাকে অনেক অদ্ভুত কথা শোনালে, কিন্তু মানুষের দুঃখ অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী অদ্ভুত। দুঃখের মতো এত বড়ো

রহস্য আর নেই। ওগো সোয়ালো, তুমি আমার এই সহরের উপর দিয়ে উড়ে এসো, তারপর আমাকে বলো সেখানে কী দেখলে।

উড়ে বেড়ালো সোয়ালো মস্ত সহরের উপর দিয়ে। দেখলে বড়োলোকেরা ফুর্ত্তি করছে তাদের চমৎকার বাড়ীর মধ্যে, আর ভিখিরিরা ব'সে আছে ফটকের বাইরে। অন্ধকার গলির ভিতর দিয়ে সে উড়ে গেলো, দেখলে, খেতে না পাওয়া ছেলেমেয়েরা ফ্যাকাশে সাদা মুখে কালো কালো রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা সাঁকোর তলায় সে দেখলে দুটি ছেলে পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে, কোনোরকমে যদি শরীর গরম থাকে। 'উঃ, কী খিদে পেয়েছে!' তারা বল্‌লে। এমন সময় পাহারাওলা এসে চেঁচিয়ে উঠলো: 'হেই—ওখানে শুয়েছিস কেন? ওঠ্।' তারপর ওরা উঠে চ'লে গেলো বৃষ্টির মধ্যে।

সোয়ালো ফিরে এসে রাজপুত্রকে সব কথা বল্‌লে।

রাজপুত্র বল্‌লে, 'আমার সমস্ত শরীর পাৎলা সোনার পাতে মোড়া। তুমি প্রত্যেকটি পাতা তুলে নাও, বিলিয়ে দাও ঐ গরিবদের মধ্যে। যারা বেঁচে আছে, তাদের ধারণা যে সোনাতেই সুখ।'

পাতার পর পাতা, সোয়ালো পাৎলা সোনা খুলে ফেলতে লাগলো—শেষ পর্য্যন্ত, সুখী রাজপুত্রের চেহারা দেখালো ম্যাটমেটে ছাই রঙের। পাতার পর পাতা, সে বিলিয়ে দিলে সেই পাৎলা সোনা গরিবদের মধ্যে। ছোটদের মুখের লাল আভা এলো ফিরে, হাসতে হাসতে তারা রাস্তায় ছুটোছুটি ক'রে খেলায় মাতলো। 'আমরা খেয়েছি, আমরা খেয়েছি!' এই কথা ব'লে চ্যাচাতে লাগলো তারা।

তারপর বরফ পড়া সুরু হ'লো, সঙ্গে সঙ্গেই সব জ'মে যেতে লাগলো। রাস্তাগুলো এমন সাদা আর চকচকে যেন রূপোয় তৈরী, কাচের তলোয়ারের মত লম্বা লম্বা বরফের পাত বাড়ীগুলোর চাল থেকে ঝুলে আছে। ফারের জামা প'রে ছোটো ছেলেরা লাল টুপি প'রে বরফের উপর স্কেটিং সুরু ক'রে দিয়েছে।

বেচারা সোয়ালো! দিন দিন সে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে, আরো ঠাণ্ডা, কিন্তু রাজপুত্রকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না, তাকে সে বড্ড ভালোবাসে। রুটিওয়ালার দরজা থেকে লুকিয়ে সে রুটির গুঁড়ো কুড়িয়ে নেয়, আর পাখা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে শরীর গরম রাখবার চেষ্টা করে।

শেষটায় সে বুঝতে পারলে যে সে মরতে বসেছে। যেটুকু শক্তি তার বাকি ছিলো সব সব জড়ো ক'রে আরো একবার রাজপুত্রের কাঁধে সে চ'ড়ে বসলো। 'এবার তবে আমাকে বিদায় দাও।'

'এতদিনে মিশরদেশে যাচ্ছো তাহ'লে—খুব খুসি হলাম। তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে।'

সোয়ালো বল্‌লে : 'আমি যেখানে যাচ্ছি সে মিশরদেশ নয়। আমি যাচ্ছি মৃত্যুর দেশে। মৃত্যু তো ঘুমেরই ভাই—নয় কি ?'

এই ব'লে সে ম'রে প'ড়ে গেলো রাজপুত্রের পায়ের তলায়।

এই সময়ে মূর্ত্তিটার ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুলো, যেন কিছু ফেটে ভেঙ্গে গেলো। আর সত্যি সত্যি সেই শিষের হৃদয় ভেঙে গেলো ঠিক দু'টুক্‌রো হ'য়ে। সত্যি ভয়ানক বরফ পড়া বটে!

পরের দিন খুব ভোরে মেয়র সায়েব কাউন্সিলরদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন নিচের পার্কে। উঁচু থামটার ধার দিয়ে যেতে যেতে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন : 'আহা! আমাদের সুখী রাজপুত্রের এমন বিশ্রী চেহারা কেন ?'

'সত্যি, কী বিশ্রী!' কাউন্সিলররা একসঙ্গে ব'লে উঠলেন। মেয়র সায়েব যা বল্‌তেন, তাঁরা সবাই সব সময় তক্ষুনি সায় দিতেন তাতে। তারপর তাঁরা দেখতে গেলেন ব্যাপারখানা কী।

মেয়র সায়েব বললেন, 'তলোয়ার থেকে পান্না গেছে, চোখ থেকে নীলা গেছে—এখন আর ও মোটে সোনারই নয়। সত্যি বলতে, রাস্তার ভিখিরির প্রায় কাছাকাছি।'

'ভিখিরির কাছাকাছি!' কাউন্সিলররা ব'লে উঠলেন।

'আরে, পায়ের কাছে মরা একটা পাখিও যে! নাঃ, একটা আইন জারি কর্‌তে হবে যে কোনো পাখি এখানে মরতে পারবে না।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কেরানি কথাটা টুকে নিলে।

তারপর সুখী রাজপুত্রের মূর্ত্তিকে টেনে নামিয়ে ফেলা হ'লো। রাজপুত্র এখন আর সুন্দর নন, কাজেই তাঁকে দিয়ে আর দরকার নেই,' বল্‌লেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলার অধ্যাপক।

তারপর সেই মূর্ত্তিকে একটা হাঁপরে গলানো হ'লো। মেয়র সায়েব এক সভা ডাকলেন ঐ গলানো ধাতু নিয়ে কী করা হবে তার মীমাংসা করতে। 'আর একটা মূর্ত্তি হবে অবিশ্যি,' মেয়র বল্‌লেন, 'আর সে মূর্ত্তি হবে আমার।'

'আমার !' কাউন্সিলররা প্রত্যেকে তক্ষুনি ব'লে উঠলেন, আর সে নিয়ে ঝগড়া বাঁধলো। শেষ যখন আমি তাঁদের কথা শুনেছিলুম, তখনো তাঁরা ঐ নিয়ে ঝগড়া করছিলেন।

কারখানার ম্যানেজার আর মজুররা ব'লে উঠলো : 'এ তো আশ্চর্য্য। এই শিষের ভাঙা হৃৎপিণ্ডটা কিছুতেই গলবে না। ওটাকে ফেলে দিতে হবে।' দিলে ওরা সেটাকে ফেলে আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্যে, সেখানে মরা সোয়ালোটাও ছিল।

ঈশ্বর তাঁর এক দেবদূতকে বল্‌লেন : 'ঐ সহরের মধ্যে সব চেয়ে দামি যে দুটি জিনিস তা আমাকে এনে দাও।' আর দেবদূত তাঁকে এনে দিলে সেই শিষের হৃৎপিণ্ড আর সেই মরা পাখি।

'ঠিক দুটি জিনিস এনেছো তুমি,' বল্‌লেন ঈশ্বর। 'আমার স্বর্গের বাগানে এই ছোট্ট পাখি চিরকাল ধ'রে গান করবে, আর আমার সোনার প্রাসাদে হবে সুখী রাজপুত্রের বাসা।



গরমিল

শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

শুদ্ধ ভাষায় 'পাতা'কে সব 'পত্র' ব'লে থাকো,
'খাতা'র বেলায় কেন তবে 'খত্র' বলো নাকো?
ওদিক আবার 'ছত্র' মানে সবাই জানো 'ছাতা',
'যত্র' মানে চট্ ক'রে কি ব'লে দেবে 'যাতা'?
ব'লবে না তা? 'যত্র' বুঝি হ'য়ে থাকে 'যথা',
"তত্র' বুঝি 'তথা'?···তবে 'কত্র' কি নয় 'কথা'?

'কাণ' দুটিকে সব সময়ে ব'লছো. দুটি 'কর্ণ',
'বাণ'কে ভুলে একটিবারও বলো না তো 'বর্ণ'!
'বান'এর বেলা কেমন দ্যাখো হ'য়ে গেল 'বন্যা',
'ধান' দেখে কেউ কয় না কেন, হ'য়েছে খুব 'ধন্যা'!
'ধান' বুঝি হয় 'ধান্য' আবার 'মান' বুঝি হয় 'মান্য'?
'পান আন' তা' ব'লতে তবে, বোলো 'পান্য আন্য'!

'বাঁশ'কে ব'লে 'বংশ', তা'র 'আঁশ'কে বোলো 'অংশ',
'হাঁস'কে যদি 'হংস' বলো, 'ফাঁস'কে বোলো, 'ফংস'!
'আঁক' সে দ্যাখো 'অঙ্ক' হোলো, 'পাঁক' সে হোলো 'পঙ্ক',
'জাঁক' সে কেন 'হস্ক' দিয়ে হবে নাকো 'জঙ্ক'?
'চাঁদ'কে যদি এতটা কাল 'চন্দ্র' ব'লে মানো,
'ফাঁদ'টি তবে কি হবে তা' তোমরা ভালো জানো!

আবার দ্যাখো, 'গাত্র' মানে বুঝতে পারো 'গা'টি,
'মাত্র' কি মা?···'ছাত্র' কি ছা?···'পাত্র' কিগো 'পা'টি?
'ভাট' বামুনকে খাতির ক'রে ব'লবে সবাই 'ভট্ট',
'লাট' সাহেবকে কেউ কি কভু ব'লতে পারে 'লট্ট'?
'পাঠ' মানে কি শুধাই যদি, ব'লবে ঠিকই 'পড়া',
'কাঠ' কি তবে 'কড়া' হবে?···'মাঠ' কি হবে 'মড়া'?

গরমিল

শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

'নিম'এর বেলা 'নিম্ব' হোলো, 'ডিম'এর বেলা 'ডিম্ব',
'হিম' এর বেলা, কেনই বা না হবে বলো 'হিম্ব'?
'পাকা' ত্থাখো 'পক্ক' হবে, 'চক্র' আবার 'চাকা',
কোন্ নিয়মে চ'লবে শুনি 'টাকা এবং 'কাকা'?
'লক্ষ' মানে 'লাখ্' তো জানো? 'পক্ষি' কেন 'পাখা'?
'বক্ষ' কেন 'বুক'—না হ'য়ে 'বাখ্' অথবা 'বাখা'?

পথে ঘাটে দেখলে খোঁড়া, বলো তা'কে 'খঞ্জ',
'গোঁড়া' মানুষ দেখতে পেলে, নাম দিও তা'র 'গঞ্জ'।
বনবনিয়ে উড়লে 'মশক', ব'লবে,—ওড়ে 'মশা',
'শশক' ছুটে দৌড়ে গেলে, ব'লবে কি যায় 'শশা'?
মা'র ভাইকে 'মাতুল' ব'লে ভাগ্নেরা সব ডাকে,
বাবার যে ভাই 'বাতুল' ব'লে ডেকেই দেখো তা'কে!

একটু যদি ভাবতে পারো যখন সময় পাবে,
মিল্‌বে এমন কত শত! মজাই লেগে যাবে!
বাংলা ভাষায় এমনি ধারা, গরমিল যা' আছে,
কারণ কি তা'র, জান্‌তে পাবে গুরুজনের কাছে!





হয়তো-ইতিহাস—

শ্রীসতীকান্ত গুহ

যখন রাজারা খাঁটি রাজার হালে থাকতেন, অর্থাৎ যখনকার রাজারা যেমনটি যাত্রাগানে দেখতে পাই ঠিক তেমনটি মখমল আর জরীর ইস্কাবন আঁকা জেব্বা-জোব্বা পরে', কোমরে সাত সের ভারী তলোয়ার ঝুলিয়ে রাণীদের সঙ্গে বসে গল্প করতেন, দরবারী পোষাক পরেই যখন তাঁরা খেতেন, ঘুমোতেন, হাওয়া খেতে যেতেন,—অন্ততঃ যখনকার রাজাদের সম্বন্ধে আমাদের এই রকম একটা ধারণা, তখনকার একটা কথা বলতে যাচ্ছি। কিন্তু তা বলে হাজার বছরের কথা নয়। এখন থেকে তিনশো বছর আগে রাজাদের সঙ্গে যাদের আড়াআড়ি ছিল, যারা মাঝদরিয়ায় দেশের রাজার পশরা লুট করে খেত, সেই দেশী বোম্বেটেদের কথা। এবং আটপৌরে মানুষেরও কথা নয়। মানুষের ভিতর যারা বাঘের মতন, ঠিক বাঘেরই মতন যারা ছিল লোলুপ, নিষ্ঠুর, দুর্দ্দান্ত, সাহসী অথচ সত্যিকারের মানুষের মত প্রাণ দিয়ে যারা কথা রেখে চলত, লুট-যুদ্ধের নীতি বজায় রাখত—তাদের কথা।

তিনশ' বছর আগে বঙ্গোপসাগরে মাঝরাতে ঝড় উঠল। জাহাজ ডুবি হল, দু'ভাই, অল্প-লেখাপড়াজানা বাঙালী জোয়ান দুটি ছেলে সেই জাহাজে করে চলেছিল চাকরীর খোঁজে। জাহাজের সঙ্গে সেই দুটি ভাইও তলিয়ে গেল, কিন্তু তারপর একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে তারা ঢেউয়ের মাথায় ভেসে উঠল। একসঙ্গে তারা ভেসে চল্‌ল। একদিন, দুদিন, তিনদিন—

সাতদিন লোনা জলে লোনা হাওয়ায় ভেসে ভেসে রইল। এই সাতদিন লোনা জল খেয়ে শুধু তাদের পিপাসা মিটল না, ঢেঁকুর উঠল। না কেঁদে তারা হাসি-মস্করা করলে। একবার ছোট ভাই বললে, "দাদা, চাকরী চেয়েছিলে, ভগবান চাকরী জুটিয়ে দিলেন, সমুদ্রের পাহারাদার করে দিলেন।" বড় ভাই খানিক হেসে বল্‌ল, "হুঁ্যা"।

সাতদিন সাতরাতের শেষে শেষ-সম্বল খুঁইয়ে প্রাণ-সম্বল নিয়ে তারা লঙ্কার রাজধানীতে পৌছল। তার পরের কথা।—

ছোট ভাই বললে, "দাদা, সারাদিন না খেয়ে তোমাকে দেখতে যা লাগচে। লোক আঁতকে উঠবে। তুমি একটু বাইরেই সবুর করো। দেখি দোকানীটাকে বাগাতে পারি কিনা।"

দিব্যি বড় দোকান। খাবারের দোকান না বলে ভোজনশালা বলাই উচিত। রাত তখন বারোটা হয়ে গেছে। কয়েকটা লোক কিন্তু তখনও মস্ত ঘরের একদিককার কোণে বসে খাচ্চে। তাদের চেহারা আর আড়চোখে তাকানোর ভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকী থাকে না, তারা কারা। তাদের কাপড়-জামা খুঁজলে দু'একখানা ছুরী-ছোরা নির্ঘাৎ বের হবে। তাদের যে জিভ অনর্গল মিছে কথা কয়, সেই জিভ দিয়ে সত্যিকথা কওয়ানো সম্ভব হলে জানা যাবে কে কটা খুন-রাহাজানি করেছে।

দোকানী বললে, "খাবার"? আচ্ছা লোক দেকচি তুমি। খাবারের ভাবনা কি হে? "ভাবনা"—হুঁ হুঁ করে দোকানী হেসে উঠল—"ভাবনাটি হচ্চে পয়সার। পয়সা ফ্যালো, খাবার নাও।"

ছোট ভাই বললে, "আজ ধারে দাও। পয়সা তো আজ হবে না একটা কাজ জুটিয়ে নি। দেকচো না, বাংলা মুলুকের লোক, জাহাজ ডুবি হয়েই না পচা লঙ্কারাজ্যে এসে পড়েছি।

দোকানী বললে, "ও! তা আগে বললেই হত।" একটা ঠোঙা ভরতি খাবার এগিয়ে দেওয়ার ভান করে সে বললে, "নাও হে, হাত পাতো।"

ছোট্ট ভাই আগ্রহে একটি হাত এগিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নিয়ে হাতের পাতাটা চেপে ধরলে। নিদারুণ যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করে উঠল। থরথর করে সে কাঁপতে থাকল। কাঁপতে কাঁপতে চেঁচাতে চেঁচাতে সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে এলো।

চুল্লি খোঁচাবার গন্‌গনে শিকটা দোকানী ছোট ভাইএর হাতের তলায় চেপে ধরেছিল। সে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। ঘরের কোণে বসে যে কয়টা ষণ্ডা তখনও খাচ্ছিল, তারা একসঙ্গে সামনে তাকাল। পরিহাসটা বুঝে নিয়ে তারাও হো-হো করে হেসে দিলে।

বড় ভাইয়ের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠল। খানিকটা জামা ছিঁড়ে নিয়ে ছোট ভাইয়ের হাতটা বেঁধে দিয়ে সে ছোট ভাইয়ের কপালে হাত বুলোতে লাগল। ছোট ভাইয়ের ছলছল চোখের পানে তাকিয়ে তারও চোখে জল এলো। দাঁতে দাঁত চেপে সে কান্না চাপলে। হঠাৎ মুখ তুলে ঠাস করে ছোট ভাইয়ের গালে একটা চাপড় বসিয়ে দিয়ে সে বললে, "এই, কাঁদিস নে। হাতের চামড়া ফের গজাবে। কিন্তু মার খেয়ে কান্না চলবে না।"

"ঠিক, ঠিক বলেচ ভাই", তাদের পাশে কে বলে উঠল।

দুই ভাই চমকে তাকাল। বড় ভাই বললে, "কে বাপু তুমি?"

দোকানের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েচে বাইরে। লোকটা অন্ধকার ছেড়ে আলোয় এগিয়ে এলো। বললে আর জিজ্ঞাসা করে লজ্জা দাও কেন ভাই। ধরা-চুড়ো যা দেখচ তাতেই তো বোঝা উচিত।"

রাস্তার ওধারে একদল ভিখিরি এঁটো কুড়োচ্ছিল। এই লোকটাকে সে দলেই দেখা গেছে, সন্ধ্যা থেকেই। কিন্তু সে এঁটো কুড়ায় নি। ভোজনশালার সামনে গুণগুণ করে গান ভেঁজে, ইতস্ততঃ ঘুরচিল। মাথায় ফেটিবাঁধা। লোকটার অভিসন্ধি বোঝা ভার।

বিরক্ত হয়ে দুই ভাই তফাতে স'রে এল। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের পানে একটিবার তাকিয়ে তারপর অনেকটা আপন মনেই বললে", হুঁ! বুঝেচি। একবার ব্যাপারটা দেখে আসিতে হচ্চে।"

বড় ভাই দোকানের দিকে এগোতে গেল। বড় ভাইয়ের চোখের চাহনি যেন স্বাভাবিক নয়, তার গলাটাও অসম্ভব গম্ভীর। ছোট ভাই প্রমাদ গনল। ভাবলে, দুস্মনের আড্ডায় কী হাঙ্গামাই না বাধে।

ছোট ভাই বিস্মিতকণ্ঠে বললে, "দোকানে? দোকানে যাচ্চো?"

বড় ভাই ভয়ঙ্কর মুখে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, "দোকানী খাবার খাইয়েচে। পাওনা শুধতে হবে না?"

সেই লোকটা আবার কখন সরে এসে দুটি ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। কান পেতে কথা শুনচিল। সমজদারের মতন হেসে সে বললে, "ঠিক, ঠিক বলেচ ভাই।"

বড় ভাই আবার মুখখানা ভয়ঙ্কর করে বললে, "কে বাপু তুমি?"

সেই লোকটা খোসমেজাজে বললে, "ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো তো।" বলেচি তো, পোষাকেই পরিচয় মালুম হবে। আর সরে পড়া তো চলবে না, তা'হলে দোকানী এত খাবার খাওয়াবে যে পাওনা শুধতে দুটি ভাই আর বেঁচে নাও থাকতে পারো।"

"তার মানে," বড় ভাই চটে বললে।

"তার মানে বাপু, দল বেঁধে লোকগুলো যদি তোমাদের দুটির ছাল ছাড়িয়ে নিতে চায়, তা'হলে ?"

তা'হলে তুমি এমন কি নবাব এলে যে বিহিত করবে ?"

আবার সেই লোকটির মুখে অদ্ভুত একটা হাসি ফুটল। হঠাৎ ছেড়া পোষাকের লুকনো ভাঁজ থেকে সে একটা তরোয়াল বার করে আনলে—দোকানের জানালার আলোয় তলোয়ারটা ঝকমক করে উঠিল। সরু সুশানিত তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

দাঁত কড়মড় করে লোকটা বললে, "ভাইয়ের হাতের যেটুকু চামড়া খোঁয়া গেছে, নিয়ে এসো। নইলে ভাইকে ঘরে ফিরে যেতে বলো, আর এই নাও, এই দড়িটা সামনের গাছে টাঙ্গিয়ে ঝুলে পড়ো।"

কয়েক পাক দড়ি বার করে সে বড় ভাইয়ের সামনে ফেলে দিলে। সে কে, এতকথা বলার কী তার অধিকার এ জিজ্ঞাসা দুভাইয়ের মনে এলো না। দুজনের রক্ত দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। বড় ভাইয়ের দুটো হাত মুঠো হয়ে এলো। লোকটার হাত থেকে তলোয়ারটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাগলের মত দোকানে ছুটে গেল। ছোট ভাইকে আগলে সেই লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখে তখন আবার রহস্যের মত হাসি ফুটে উঠেচে।

"এই, খাবারের পাওনা বুঝে নাও," অস্বাভাবিক চাপা গলায় বড় ভাই বললে।

দোকানী চমকে উঠলে। তারপর সে অবাক হয়ে গেল। এর অর্থ কী ? সেই লোকটারই ভাই হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু, ভাইয়ের পাওনার পর এসে একথা বলে কেন ? মারামারি করতে এসেচে কি ? সেরকম কথা তো বলে না। লোকটা কি পাগল ?

দোকানী একটু চড়া গলায় বললে, "মাগ্‌না খেতে এলে অমন একটু আধটু খোঁচ খেতেই হয়।"

সেই দুশমনগুলোর এতক্ষণে খাওয়া শেষ হয়েচে। তারা দোকানীর এতটা নরম মেজাজ দেখে খুসী হল না, চেঁচিয়ে তারা বললে, "এই, খাবার খাইয়ে দাও না ?" দোকানীর কেন যেন সাহস হচ্ছিল না। সে একটু বিপন্নের মত দুশমনদের পানে তাকাল। তারা তখন ভেংচি কেটে চুল্লির শিকটা দেখিয়ে বললে, "খাবার খাইয়ে দাও, দাও না !"

বড় ভাই পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। দোকানীর হঠাৎ সাহস হল। সে বললে, খাবার না খাইয়ে পাওনা নেবো না। হাত পাতো।"

বড় ভাই অম্লান মুখে হাত এগিয়ে দিলে। দোকানীটা আড়চোখে তাকিয়ে উনুনের শিকটায় টান দিলে। ঘরের কোণে দুশমনগুলো মুচকি হাসতে সুরু করলে !

বড় ভাই তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দোকনীটা হঠাৎ গনগনে শিকটা তুলে নিয়ে বড় ভাইয়ের হাতের তোলোয় চাপতে গেল। তলোয়ার-ধরা স্থকনো বা হাতটা কাপড়ের ভাঁজ থেকে সাপের ছোবলের মত ছট্‌কে এসে এককোপে শিকটাকে ফেলে দিলে। তারপর, সেই তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল, ক্ষুরধার তলোয়ারটা হাতে বড় ভাই পাগলের মত দোকানীর উপর ঝাপ দিয়ে পড়ল, একেবারে কাঠের থামের সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে তাকে গেঁথে ফেললে।

দুশমনগুলোর মুখের হাসি চকিতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু শয়তানের বাচ্চা তারা। যে যার পোষাকের লুকনো ভাঁজ থেকে তলোয়ার বার করে চ্যাচাতে চ্যাচাতে এগিয়ে এলো। দোকানীর মরা শরীর থেকে এক টানে তলোয়ারটা খসিয়ে নিয়ে বড় ভাই রুখে দাঁড়াল। একজনের কাঁধে একটা কোপ বসিয়ে, একজনের নাকের ডগাটা কেটে দিয়ে, আর দুজনের কপালে দুটো ফলা এঁকে বড় ভাই ছুটে দোকানের বাইরে এলো

হাঁপাতে হাঁপাতে বড় ভাই বললে, "দোকানীটাকে একেবারেই মেরে ফেলেচি। কিন্তু আর চারজনের ছাল তুলেচি। এখন তাহলে—"

"এখন তা হলে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া দরকার" হেসে সেই লোকটা শিষ দিলে। বড় ভাই মনে মনে বললে, "বিশ্বাসঘাতক।" তলোয়ার হাতে সেই লোকটার উপর রুখে যেতেই হেসে সে তার হাত খানা ধরে ফেললে। ছোট ভাই, সেও এসে এক হাতে বড় ভাইয়ের আর একটা হাত চেপে ধরলে। দুজনে মিলে অসুরের মত বড় ভাইকে থামালে। বড় ভাই, ভাবলে কি আশ্চর্য্য ; ছোটো ভাইয়ের মাথা কি খারাপ হল নাকি? দাদাকে ধরিয়ে দিয়ে তার কী লাভ ?

সেই লোকটার শিষ শুনে হঠাৎ অন্ধকারের চারদিকে যেন কারা সাড়া দিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অগুণ্‌তি ভিখিরি এসে তাদের ঘিরে ফেল্‌লে। সেই লোকটা আকাশে হাত তুলে ইসারা করতেই ভিখিরিরা যে যার ছেঁড়া পোষাকের ভাঁজে হাত দিলে। পরমুহূর্ত্তে প্রত্যেকের হাতে এক একখানা তলোয়ার ঝকিয়ে উঠল।

সেই লোকটা বড় ভাইকে হেসে বললে, "দোকানে দুশমন চারজন আর এগোবে না। তারা আমাকে বিলক্ষণ চেনে। কিন্তু এক্ষুণি সিপাইরা এসে পড়বে। আমাদের উধাও হতে হবে।"

সেই লোকটার ইঙ্গিতে দলের একজন একটা শিঙ্গা ফুঁকে দিলে। দেখতে দেখতে অন্ধকারের একটা দিক থেকে একদল ভিখিরী ঘোড়সওয়ার এসে হাজির। তলোয়ার বার করে তারাও সেই লোকটাকে অভিবাদন করলে।

তাদের আড়ালে অন্ধকারে আরো সব ঘোড়া বাঁধা ছিল। ভিখিরিরা সকলেই একটি করে ঘোড়ায় চড়লে। তারপর ঝড়ের মত সেই রহস্যময় ভিখিরি ঘোড়সওয়ার দল ছুটে চল্‌ল দক্ষিণে। সেই লোকটার পাশে আর দুটি ঘোড়ায় চেপে দুটি ভাইও ছুটে চল্‌ল।

রাজধানী ছাড়িয়ে অনেকটা দূর এসে ঘোড়সওয়াররা একবার একটু থামল। তখন বড় ভাই সেই লোকটাকে বল্‌লে, "তোমার ভিখিরির দল না থাকলে আজ আর রক্ষা ছিল না। যাক্, রাজধানীতে আমাকে কেউ চেনে না। খুনে বলে সনাক্ত করে সহর কোটালের সাধ্য কী? এখন তাহলে আমরা দুটি ভাই বিদায় হই। এই নাও তোমার তলোয়ার।"



তার মুখোসটা খসাতেই······

সেই লোকটা হেসে হাত গুটিয়ে নিলে। বড় ভাই সবিস্ময়ে বললে, "তোমার তলোয়ার ফিরিয়ে নাও।"

সেই লোকটা বললে, "না, ও তলোয়ার এখন তোমার।"

বড় ভাই বল্‌লে, "আমার?"

"হ্যাঁ, কেননা এখন তুমি আমাদের।"

বড় ভাই বললে, "কে—তুমি কে?" সেই লোকটা টান মেরে তার ভিখিরির সাজ খসিয়ে দিলে। তারপর মুখোসটা খুলতেই, বড় ভাই আবাক হয়। তার সামনে সে তখন ঘোড়ার পিঠে দেখচে—তখনকার সবচেয়ে নামজাদা বোম্বেটে দিব্যবর্ণ।

অমরলতা
শ্রীসতীকান্ত গুহ

এমনি করে বোম্বেটেগিরিতে দুই ভাইয়ের হাতে খড়ি। শঙ্খমার্কা আর সাপমার্কা বোম্বেটেদের নামে তখন সাত সমুদ্র ভয়ে কাঁপে। শঙ্খমার্কা বোম্বেটে-দলের সর্দ্দার দিব্যবর্ণের নাম শুনলে মাঝিমাল্লারা ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। সেই দিব্যবর্ণের বোম্বেটেরা ভিখিরি সেজে লঙ্কার রাজধানীতে ঘুরে বেড়াত। কবে কোন্ জাহাজ কী পশরা নিয়ে কোথায় রওনা হবে, কোন্ জাহাজ সাগর উজিয়ে বন্দরে আসবে, ভিখিরির বেশে রাজধানীতে ঘুরঘুর করে সব সংবাদ আদায় করত এরা। সেদিন রাজধানীতে কাজ শেষ করে দিব্যবর্ণ সদলে রাজধানী ছেড়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সরাইখানার সামনে দেখতে পেলেন অসুরের মত জোয়ান দুটি সুশ্রী যুবককে। দেখে তার লোভ হল। এদের বোম্বেটেদলে টানতে পারলে ভারী চমৎকার হবে। দিব্যবর্ণ তখন সদলে সরাইখানার সামনে ঘুরঘুর করতে থাকলেন। নিয়তির লিখন। ঘটনাচক্রে অবশেষে যুবক দুটি দিব্যবর্ণের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল।

এই দুটি ভাই, কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ এদের নাম। প্রথমটা, সাধারণ বোম্বেটে হিসেবে তাদের নাম রটল। কিন্তু এক বছরের ভিতর দিব্যবর্ণ নিরুদ্দেশ হলেন। তাঁর ফেরার লক্ষণ দেখা গেল না। তখন দলের সর্দ্দার হল দুটি ভাই। লাভ লোকশানের, বিপদ ও ফুর্ত্তির প্রতিটি বিষয়ে আধাআধি বখরা হল দু'জনের। একদিন পয়সা নেই বলে গায়ের চামড়ার দাম দিতে হয়েছিল ছোট ভাইয়ের, সে কথা ছোটভাইও ভোলেনি, বড়ভাইও ভোলেনি। তাই লুঠের ব্যবসায়ে নেমে তারা ক্ষেপে গেল। টাকার নেশায় মেতে তারা ভুললে, রক্তের দাম কত। এক বছর যেতে না যেতে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের নামে সমস্ত লঙ্কারাজ্য সাড়া দিয়ে উঠল। তাদের আশ্চর্য্য নিষ্ঠুর বীরত্বের কাহিনী শুনে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও চীন সাগরের বীর নাবিকদের হৃদয়ও থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমাদের কল্পনা দিয়ে যাদের সাহস আর কৌশলের বেড় পাই না, তাদের আমরা মানুষ বলে স্বীকার করতে নারাজ। তাই, যাদের সাহস আর কৌশল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তাদের আমরা দেবতা অথবা অপদেবতা বলে মনে করি। কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের বেলায়ও এই রীতির ব্যতিক্রম হ'ল না।

সে তল্লাটের সমুদ্রে নাবিকদের চোখে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ ছিল দুটি দুরন্ত, পিশাচ-লোকের দুটি কালো ছায়া। অপদেবতার মত নিঃশব্দে এসে কখন তারা সদাগরী নৌকোয়, সোনার লঙ্কায় আগুন জ্বালিয়ে দিত, সৈন্য মাল্লারা কেউ টের পেত না। গভীর রাতে ভূমিকম্পের মত সদাগরী বহরে তাণ্ডব জাগিয়ে, মশালের আগুনে অজস্র রক্ত ঝরিয়ে, সাত

রাজার ঐশ্বর্য্য লুঠ করে তারা অন্ধকারে মহাসমুদ্রে উধাও হয়ে যেত। বিস্মিত, আহত সদাগরদের কানে দুর্দ্দান্ত দুই বোম্বেটের অনুচরদের বিকট গলার বোম্বেটি গান ঝড়ের কোলাহলের মত বেজে উঠে ঢেউয়ের কলরোলে মিলিয়ে যেত। রহস্যের মত হঠাৎ দেখা দিয়ে হঠাৎ তারা অন্তর্দ্ধান হত।

সেই সময়ে, ইতিহাসে কালোছায়া ঘনিয়ে এলো। রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁরা সকলে মিলে দুঃস্বপ্ন দেখতে সুরু করলেন। তাঁরা কল্পনায় দেখলেন, ডাঙায় আজ পর্য্যন্ত যত রাজা, সাম্রাজ্যের পত্তন তাদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছে এক বিশাল সাগর-সাম্রাজ্য। ঢেউয়ের দোলায় দুলছে সেই সাম্রাজ্য, সাত সমুদ্রের সাত দিনান্ত পেরিয়ে গেছে সেই সাম্রাজ্য! সেই সাম্রাজ্যের দুটি সম্রাট কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ। খুনের নেশায় মাতাল সেই সাম্রাজ্য পাগলের মত এসে ঢুঁ দিচ্ছে ডাঙার পৃথিবীকে আর মানুষের তৈরী সহস্র বছরের সভ্যতা যেন একখানা ঘুণে-ধরা বাড়ীর মত ধূলোয় গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।



লম্বা একটা তলোয়ার হাতে ছুটে আসছে

কিন্তু মানুষের ইতিহাস লেখেন ঈশ্বর। সাধ্য কি তাঁর নিষেধ এড়িয়ে মাথা তোলে বোম্বেটের সাম্রাজ্য। একদিন জল-পৃথিবীর ভাবী সম্রাট দুটি এসে লঙ্কা-সম্রাটের রাজ-বোম্বেটে দলে নাম লেখালে। বোম্বেটেদের জাহাজে আঁকা ছিল মাথার খুলি। সেটা মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল লঙ্কার রাজমুকুট। কী করে অসম্ভব সম্ভব হল, সে এক বিচিত্র ঘটনা।

অমাবস্যার মিশমিশে কাল রাত। কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের নৌবহর সমুদ্র শাসন করে উত্তর থেকে দক্ষিণে আসছিল। সহসা দেখা গেল, দূরে দুটি জাহাজ। অন্ধকারে মিশে

দ্রুত ঢেউ ভেঙে চলেছে। বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে সেই দুটি জাহাজের উপর গিয়ে পড়ল কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ। জাহাজের একটিতে ছিলেন লঙ্কার রাজকুমার। মাল্লারা স্বপ্নেও ভাবেনি লঙ্কার এতটা কাছে কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ রাজ-মার্কা জাহাজ চড়াও করবে। তা'ছাড়া, তাদের সংবাদ ছিল এই যে দুর্দ্দান্ত বোম্বেটে দুটি তখন আরব সাগরে কর আদায় করতে গেছে। জাহাজে সেই নিশীথে মরণ-চীৎকার উঠল। কিশোর রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল। সাহসী রাজপুত্র খাপ থেকে তলোয়ার খসিয়ে কামরার বাইরে এসে দেখলেন, চারিদিকে হুলস্থুল বেধেছে। আর দেখলেন, একটি বিরাটকায় লোক লম্বা একটা তলোয়ার হাতে ছুটে আসছে। রক্তমাখা সেই তলোয়ার রাজপুত্রের মাথার উপর লাফিয়ে উঠল। চক্ষের নিমেষে রাজপুত্র হরিণের মত সামনে নীচু হয়ে পড়ে আঘাত এড়ালেন, চক্ষের পলকে বিরাট লোকটার পায়ে তলোয়ার বিঁধে দিলেন। একটা স্থচের মত সেই তলোয়ারটা সে ঝেড়ে ফেললে বটে, কিন্তু তবু বিরাট লোকটা আশ্চর্য্য মানলে। রাজপুত্রের পিছন থেকে তাঁর মাথার উপর বোম্বেটেদের আর যে দুখানা অসি একসঙ্গে দুলে উঠেছিল, তাও বিরাট লোকটার ইঙ্গিতে সরে গেল।

এই বোম্বেটে কালীভূষণ। রাজপুত্রের যুদ্ধ কৌশলে যে বিস্ময়বোধ করেছিল, পরে মশালের আলোয় তাঁর সুন্দর মুখ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ক্ষিতিভূষণ সেখানে এসে হাজির। দূর থেকে দৃশ্যটা সে দেখেচে। গম্ভীর হাসি হেসে সে রাজপুত্রের কাঁধ চাপড়ে বললে, "সাবাস।" কালীভূষণ রাজপুত্রকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হয়তো কিশোরের কচি মুখ দেখে হঠাৎ দেশের সংসারের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সংসারে তাদের বাপ মা বেঁচে ছিলেন না। খুড়োখুড়ি ছিলেন। আর ছিল তাদের একটি সুন্দর কচি ছেলে। কালীভূষণের বড় আদরের ছিল সেই ছেলেটি। হয়তো তার লোহার মত দুটি হাত এগিয়ে দিয়ে বললে, "এসো রাজপুত্র, কোলে এসো।"

সেই রাতে মাঝ সমুদ্রে জাহাজে বসে কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণকে বললে, "একটা মজা করা যাক ক্ষিতি।" ক্ষিতিভূষণ দাদার মুখে অনেকদিন পর মজার কথা শুনে অবাক হল। কালীভূষণ বললে, "রাজপুত্রকে কোলে করে একেবারে রাজ-দরবারে যেয়ে হাজির হলে কেমন হয়?" ক্ষিতিভূষণের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, সে বললে, "সে বেশ মজার হয় দাদা।" কালীভূষণ এবার খানিকটা হেসে নিয়ে বললে, "সে এক মজার বীরত্ব, না রে?"

পরদিন গভীর রাতে বাজনা বাজিয়ে তুমুল কোলাহলে রাজধানীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে সদলে কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ যেয়ে রাজপ্রাসাদে হানা দিলে। তাদের চারিপাশে যে সৈন্যের দল ছিল, তারা তাদের পিষে মারতে পারত। কিন্তু এ রকম অদ্ভুত কাণ্ড কেউ কখনো দেখেনি,

শোনেনি। সহরের কোটাল থেকে স্মুরু করে রাজ্যের প্রত্যেক নায়কের কাছে খবর পৌছল। সকলেই বললেন, সাবধান! বোম্বেটেদের কোলে রাজপুত্র। যতক্ষণ রাজপুত্রকে জ্যান্ত হাত না করা যাবে ততক্ষণ বোম্বেটেদলকে খুসী রাখা ভালো। রাজ্যের কোটাল, মন্ত্রী আর নায়কেরা সকলেই বোম্বেটেদের আজিব মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলেন। গভীর রাতে অবশ্য রাজা আর দরবারে ছিলেন না। খবর পেয়ে হতভম্ব হয়ে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তখন মশালের আলোয় হাসি-মুখ রাজপুত্রকে দুহাতে তুলে ধরে কালীভূষণ হেসে দিলে।

তারপর, বিশ্বাসের অতীত ঘটনা ঘটল। কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের কারো মাথা খোয়া গেলনা। বোম্বেটেদের কারো হাতে হাতকড়িটি পর্য্যন্ত উঠল না। তেমনি আবার তাদের বোম্বেটেদল মিশে গেল রাজ বোম্বেটেদলে। তখনকার বড় বড় রাজা আর সম্রাটেরা গোপনে বোম্বেটে পুষতেন, বাইরে মিত্রতা বজায় রেখে লুকিয়ে এ ওর জাহাজ লুঠ করে রাজকোষ ভরাট করতেন। লঙ্কারাজের বোম্বেটেদলটি কালীভূষণের স্বাধীন বোম্বেটে দলের হাতে মার খেয়ে আধমরা হয়ে পড়েছিল। কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণের দলকে পেয়ে রাজবোম্বেটেদলটি দুর্দ্ধর্ষ হয়ে পড়ল।

তখনকার দিনে বাইরে বোম্বেটে শাসনের ভান দেখিয়ে গোপনে বোম্বেটে দল পুষতেন রাজারা। রাজাদের পক্ষে প্রকাশ্যে লুঠ-তরাজ করা সম্ভব নয়। বোম্বেটে রেখে তাঁরা অপর রাজ্যের বানিজ্য লুঠ করতেন। অভিযোগ এলে বলতেন, আমরা তো জানিনা। আচ্ছা দেখব, বোম্বাটেদের শায়েস্তা করতে পারি কি না। কিন্তু লুকিয়ে তারা বোম্বেটেদের পিঠ চাপড়ে বলতেন "সাবাস, কিন্তু আর একটু হুঁসিয়ার'।

কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ নামে অধীন হল—আসলে লঙ্কার সম্রাটের বন্ধু হল তারা। তাদের তোয়াজ করে লঙ্কার সম্রাট আর পথ পেলেন না। বোম্বেটে ভাই দুটি আগের মতন অবাধে জল-পৃথিবীর কর আদায় করে ফিরতে থাকল। কিন্তু সেই কর এসে সুগোপনে রাজশেষে জমা হতে থাকল। লঙ্কার রাজ্য তখন ওলন্দাজরা মাকড়ের মত শুষচে। লঙ্কারাজের কাছে ইংরেজদের উপদেশ অভয়বানী পৌঁছেচে, কিন্তু একটি সৈন্য-সাহায্যও পৌঁছচ্চেনা। কেননা, ভারতবর্ষে তখন চারিদিক টলমল্। ইংরেজ সেখানে ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই সময়ে দরিদ্র লঙ্কার রাজলক্ষ্মীর ভাণ্ডার কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণকে পেয়ে হেসে দিলে।

এই যে দুটি বোম্বেটে, কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ—এরা যে বাঙ্গালী তার সহজ প্রমান এদের নাম। কখন তারা বাংলাদেশের আকাশ থেকে খসে লঙ্কার আকাশে উদিত হল, তার সঠিক তারিখ উদ্ধার হয়নি। এমন কি, আশ্চর্য্যের বিষয়—যে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের করাল

ছায়া তিনটি সমুদ্রের উপর পড়েছিল, যাদের ক্ষুধিত গ্রাসের সামনে গোপনে গোপনে নানা রাজ্যের রাজারা কাঁপতে স্বুরু করেছিলেন, সেই দুটি আশ্চর্য্য পুরুষের ছায়া ইতিহাস পড়েনি ! ইতিহাসে তাদের নাম নেই। হয়তো, এতে আশ্চর্য্য বোধ করার কিছু নেই। ইতিহাস তো লেখে মাত্র একটি মানুষ। কিন্তু এই যে আমরা লক্ষ লক্ষ লোক নিজেদের হাসি-কান্নার কথা দিয়ে জীনব-ইতিহাস লিখি, তা থেকেও কি অনেক আশ্চর্য্য মানুষ বাদ পড়ে যায়না ?

হয়তো ইতিহাস এতটা উদাসীন হত না। বোম্বেটে হিসাবে একবার তাদের নামটি অন্ততঃ লেখা হত কিন্তু হঠাৎ একদিন বোম্বেটদের খাতা থেকে তারা নাম কাটিয়ে নিলে। আগুন, রক্ত তলোয়ার-ঘেরা জীবনের মাঝখানে বসে তারা কোথা থেকে কার ডাক শুনতে পেলে। সেইদিন তারা তলোয়ার হাতে জাহাজে চড়ে মহাসমুদ্রে উধাও হল। কিন্তু তাদের তলোয়ার সেদিনও আর বোম্বেটের মাতাল তলোয়ার নয়। এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে পুঁথি নিয়ে তারা বার হল পৃথিবীতে। পুঁথির বানী সফল করতে বার হল তারা।

সেই পুঁথিতে লেখা ছিল অপরূপ কাহিণী। একদিন মানুয়ের পাঁচশো বছর পরমায় হবে, সেই কাহিণী। কোথায় কোন্ সুদূরে সাত সমুদ্রের ঢেউ যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে কোন দ্বীপে ফুটে আছে অমর-লতা !

সেই লতার স্বপ্ন দেখে, জাহাজে পাল তুলে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে বার হল তারা।

সেই অভিযানের আশ্চর্য্য কাহিণী নিয়ে আমাদের আজকের উপন্যাস।



"কত অজানারে জানাইলে তুমি কত ঘরে দিলে ঠাঁই"

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী

(সত্য ঘটনা)

দেওঘর থেকে দূরে দেহাতের বাড়িটাই পছন্দ কর্‌লাম। চেঞ্জে গিয়ে, যদি সহরের ঘিঞ্জির মধ্যেই থাকা গেল তবে আর হাওয়া বদ্‌লানো কী? তোমরাই বলো!

বাড়ীটা বেশ বড়োই, বছরের পর বছর ধরে খালিই পড়ে ছিল। পোড়ো বাড়ি নাকি! —কে বল্‌ছিল। বিশ্বাস হয় না আমার। সহরের সুখ সুবিধা ছেড়ে, এতদূরে, মাঠের মধ্যিখানে, কে আর বাড়ী ভাড়া কর্‌তে আস্‌বে বলো! সেইজন্যই ভুতুড়ে বাড়ি বলে' অখ্যাতি রটেছে, তাছাড়া আর কি? অন্ততঃ, আমার তো তাই মনে হোলো।

আমার বেশ পছন্দই হয়েছে বাড়িটা! আমিও একা, বাড়িটাও একাকী। সন্ধ্যার মুখেই আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়ে গেল।

দীর্ঘকালের ধূলো আর মাকড়সার জাল ভেদ করে' ঢুক্‌লাম তো বাড়ীর মধ্যে। ভুতের আস্তানার মতই হয়ে আছে বটে! ঘরদোরের কেউ কোনদিন যত্ন নেয় নি, এ বাড়ীর যে কখনো ভাড়াটে জুটবে তা বোধহয় কারুর প্রত্যাশাও ছিল না।

টেবিল, চেয়ার, চৌকি, আয়না, দেরাজ, আল্‌মারি, খাট, তোষক, বিছানা, পাপোষ আসবাবের কোনো কিছুরই অভাব নেই, ঘুরে ঘুরে দেখ্‌লাম। নিজেকেই ঝেড়ে মুছে নিতে হবে এ সব। ভুতুড়ে বাড়ী বলে' কেউ আস্‌তে চাইল না আমার সঙ্গে। মোটা বেতনের লোভ দেখিয়েও, সারা দেওঘর খুঁজে একটা চাকর যোগাড় করা গেল না।

যাক্, নিজেই সব ঠিকঠাক্ করে' নেব। আজ তো নয়,—সেই কাল সকালে সে-সমস্ত। এখন কেবল খাটটা ঝেড়ে-ঝুড়ে, নিজের বিছানাটা পেতে, আজকের রাত্রের মতো ব্যবস্থা করে' নিতে পারলেই হয়।

আপাততঃ তাই করা গেল। কিন্তু ঘরের মেঝেতে জমে রইল বহুদিনের জড়ো-করা ধূলো। চারিধারের পুঁজি-করা ধূলোবালি-জঞ্জালের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। কিন্তু কি আর করা যাবে? এখন রাত্রের মুখে একা একা এত পরিষ্কার করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

আলো জ্বাল্‌লাম। উস্‌কে দিলাম ওর শিখাটা।

ইজিচেয়ারটায় বস্‌লাম গিয়ে।

চারিধার নির্জ্জন আর নিস্তব্ধ। আপনা থেকেই কেমন গা ছম্ ছম্ করতে থাকে। মনে হোলো আমি যেন কবরের মধ্যে; যারা মরে গেছে তাদের শান্তিভঙ্গ করতে এসেছি।

মনটাকে অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করলাম। যে সব দিন চলে গেছে তার স্মৃতি ফিরিয়ে আন্‌তে চাইলাম। কত পুরাণো দৃশ্য, আধভোলা মুখ, মধুর কণ্ঠস্বর, কত গান যা আগে লোকের খুব প্রিয় ছিল কিন্তু আজকাল কেউ গায় না আর।

ঘণ্টা দুয়েক এইভাবে কাটালাম। নিঃসঙ্গতার বোধোদয় ক্রমশই আমাকে আচ্ছন্ন করে' এল। বাতি নিবিয়ে, আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। আমার মনে হতে লাগ্‌ল যেন তাড়কা রাক্ষসী ঘুমিয়ে আছে ঘরে—জেগে উঠে এক্ষুনি তাড়া করবে আমায়। কিম্বা কুম্ভকর্ণই, কে জানে, যার ঘুম ভাঙ্‌লেই সর্ব্বনাশ! এর মধ্যে কখন্ বৃষ্টি পড়্‌তে সুরু করেছে, বাতাস সোঁ সোঁ করছে, আমি শুয়ে তাই শুন্‌তে শুন্‌তে কখন ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

হঠাৎ আমার ঘুম গেল ভেঙে; সব নীরব নিস্তব্ধ কেবল আমার আর্ত্তহৃদয় বাদে, তার গুড় গুড় আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুন্‌ছিলাম। গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, কম্বলটি আস্তে আস্তে, কথা নেই বার্ত্তা নেই, পায়ের দিকে সরে যেতে সুরু করল, কেউ সেধার থেকে টান্‌চে যেন। আমার নড়্‌বার চড়্‌বার—এমন কি প্রতিবাদ করবার পর্য্যন্ত শক্তি রইল না। যতক্ষণ না আমার কোমর এস্তক্ খালি হল কম্বল সরতেই থাক্‌লেন। কি আর করি আমি? ভদ্রতা আর চলে না দেখে, টানাটানি সুরু করে' দিলাম। অনেক ধস্তাধস্তি করে' কম্বলকে ধরে' এনে আপাদ-মস্তক ঢেকে দিলাম আবার।

আমি কাণ পেতে প্রতীক্ষায় রইলাম। কী হয় দেখি! আবার কম্বল সরতে সুরু হোলো। এবার পা-বরাবর গিয়ে পৌঁছল। আবার তাকে পা থেকে টেনে আন্‌লুম। এম্‌নি করে' অপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আমার অদৃশ্য টাগ্ অব্ ওয়ার চল্‌তে থাক্‌ল। যখন তৃতীয় বার কম্বল সরে গেল তখন টান্‌বার শক্তি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হোলো আমার। এবার কম্বলটা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে অস্ফুটধ্বনি করলাম। পায়ের কাছ থেকে

প্রতিধ্বনির মতো সেই সুরে প্রত্যুত্তর এল। আমার কপাল ঘেমে উঠ্‌ল। মনে হোলো যা বেঁচে আছি তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে মারা গেছি নিশ্চয়।

কিছু পরেই হাতীর পায়ের মতো একটা থপ্ থপ্ শব্দ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল—মানুষের পায়ের শব্দ কখনই এমন হতে পারে না, অবশ্য অতি-মানুষের কথা বল্‌তে পারিনে! থপ্ থপে আওয়াজটা দরজায় দিকে এগিয়ে গেল; শুন্‌লাম্, হুড়কো এবং দরজা না খুলেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

মানসিক উত্তেজনা শান্ত হলে, আমি স্বগতোক্তি কর্‌লাম, এ হচ্ছে স্বপ্ন,—স্বপ্নই—ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন। ভাবতে চেষ্টা কর্‌ছি যে, হয় এ বিভ্রম নয় শুধু স্বপ্ন, তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্যামেরার সামনে লোক যেমন করে' থাকে তেমনি হঠাৎ হাস্‌তেও যাচ্ছি, এমন সময়ে শুন্‌তে পেলাম, দূরে এবং নাতিদূরে, বাড়ীর আর সব ঘরের দরজা জান্‌লা জোরে জোরে খুল্‌ছে আর বন্দ হচ্ছে। এও কি মতিভ্রম? আমারই?

চট্ করে' উঠে আলোটা জ্বাল্‌লাম। জ্বেলে দেখি আমার ঘরের দরজা আগের মতই বন্দ রয়েছে, অকস্মাৎ খুল্‌বার ও বন্দ হবার কোন অভিসন্ধি নেই তার। তখম আরামের নিশ্বাস ফেলে, সিগারেট্ ধরিয়ে আমার ডেক্ চেয়ারটায় এসে বস্‌লাম।

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে আমার আপাদপিলে চম্‌কে উঠ্‌ল। চুরুট্ খসে পড়্‌লো মুখ থেকে। শ্বাসপ্রশ্বাসও ভারি সংক্ষিপ্ত হয়ে এল আমার! এ কি! ঘরের পুঞ্জীকৃত ধুলোর উপরে আমার পায়ের দাগের পাশাপাশি—! এ কার আবার? আরেক পায়ের দাগ, এত বড়ো যে তার তুলনায় আমার পায়ের দাগই শিশুর বলে সন্দেহ হয়।



আমার পায়ের দাগের পাশাপাশি—

কিছু পূর্ব্বে যে-বন্ধুটি কম্বল টানাটানি করে' গেছেন এ কি তাঁরই শ্রীচরণের চিহ্ন?

ভয়ে ভয়ে বিছানায় ফিরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও আপ্‌না থেকেই নিবে গেল। অনেকক্ষণ ধরে' অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে' পড়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হোলো, কে যেন তার বিশাল বপুটি টেনে নিয়ে আস্‌ছে, কিন্তু ঘরের যে-জানালাটা খোলা ছিল সেটা নিতান্ত খাটো বলে' কিছুতেই গল্‌তে পারছে না তা'দিয়ে। আমি ক্ষীন কণ্ঠে বল্লুম—"বন্ধু, তোমার ঐ গোদা পা নিয়ে আর এ ঘরে এসো না, বেজায় স্থানাভাব।"

কিন্তু সে যে কর্ণপাত করেছে এমন আশঙ্কা হল না।

খানিক পরে পরে, একটা ভয়ানক গোলমাল দরজার বাইরে অবধি এসে, একটু ইতস্ততঃ করে, যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। আমার বিছানার চার পাশে ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ শুনতে পেলাম, ভারী নিশ্বাসের শব্দ, অদৃশ্য পাখার ঝটাপট্ আর কি রকম একটা গুম্‌রানো ধ্বনি। মহা মুস্কিলেই পড়লাম আমি। কেননা আমার পষ্ট বোধ হোলে ঘরে কারা যেন এসেছে, আমি আর নিঃসঙ্গ নই।

ঈষৎ উজ্জ্বল কি যেন একটা বালিশে পড়্‌ল। ফুফোঁটা পড়্‌ল আমার মুখে, পড়েই গলে তরল শীতলতা হয়ে মুখময় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তারপরেই দেখ্‌তে পেলাম আবছা আবছা মুখ, সাদা সাদা হাত যেন বাতাসে ভাস্‌চে, এই ভেসে উঠ্‌চে এই মিলিয়ে যাচ্ছে! বুঝলাম আমার অবিলম্বে দরকার—হয় আলো নয় মৃত্যু ; অবশ্য মৃত্যুর চেয়ে আলোটাই বেশী বাঞ্ছনীয়! ভয়ে অবশ হয়ে গেছে সারা দেহ, আস্তে আস্তে যেমন উঠ্‌তে গেছি কার চ্যাপটা হাতের সঙ্গে আমার মুখের ঠোকাঠুকি বেধে গেল। এই অনাকাঙ্খিত মিলনের জন্য আমি একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম। ধড়াস্ করে' আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি। তার খানিক বাদে বোধ হলো একটা কাপড় চোপড়ের খস্ খস্ শব্দ ঘর থেকে যাচ্ছে বেরিয়ে।

আবার সব চুপ্ চাপ্! কত কালের রোগীর মত আমি বিছানা ছেড়ে উঠ্‌লাম। কম্পিত হাতে বাতি জ্বাল্‌লাম। আলো জ্বেলে, ধুলোর পরে যে ভয়ানক পায়ের দাগ পড়েছে তারই গবেষণা করচি; হঠাৎ বাতি যেন নিবু নিবু হয়ে এল, সেই মুহূর্ত্তে আবার হাতীর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা দরজার কাছাকাছি এসে যেন কিছু চিন্তা কর্‌বার অজুহাতেই চম্‌কে থেমে গেল হঠাৎ। বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসে হঠাৎ কেমন নীল আলো বিকীরণ করে', নিব্‌ল কিনা জানিনা, সমস্ত ঘরটা ছায়াপথের আলোতে ভরে' উঠ্‌ল।

দরজা খোলা নেই, অথচ এক ঝট্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস কোথা থেকে আমার গালে এসে লাগ্‌ল। আমার সামনে বাষ্পময় কি একটা খাড়া হয়ে রইল। দারুণ অস্বস্তি আর অসুবিধা আমি বোধ করি! কিন্তু কী যে করব—!

প্রথমে একটা হাত তারপরে দুটো পা, তারপরে সমস্ত শরীরটা, মায় এক বিষন্ন বদন ক্রমশঃ সেই বাষ্প থেকে আত্মপ্রকাশ করল। দেখলাম আমার সামনে এক প্রায়-নগ্নকায় প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা সটান্ দাঁড়িয়ে রয়েচে।


সামনে এক প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা

লোকটার বিষন্ন মুখ দেখে আমার ভয় দূর হোলো, মনে হ'ল এ কোনো ক্ষতি করবে না—ক্ষতি-জনক ভূত নয় বোধ হয়? আমার স্বাভাবিক মনের অবস্থা ফিরে এল তখন, সঙ্গে সঙ্গে আলোও আবার উজ্জল হয়ে উঠ্‌ল। আমি একলা ছিলাম, নিঃসঙ্গতার বদলে এই ভূতটাকে কাছে পাওয়া গেল—এ ভালোই! খুসীই হলাম আমি। অচেনা জায়গায় আত্মীয় পাওয়ার মতোই—আর কি!

আমি তাকে অভ্যর্থনা করে' বল্লাম—"কে হে তুমি? তুমি কি জানো আমি দু তিন ঘণ্টা যাবৎ মুমুর্ষ হয়ে রয়েছি? যাক্, তোমাকে দেখে খুসী হওয়া গেল। আমার যদি একটা চেয়ার থাক্‌তো, অবশ্য তোমাকে ধারণ করবার মতো—আহা, থামো থামো, ঐ জিনিসটির উপর বসে' পোড়ো না যেন"!

কিন্তু কাকেই বা বলা! ততক্ষণে অমন দামী চেয়ারটিতে সে বসে' পড়েছে, চেয়ারটিও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেল।

"দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি সবই ভাঙ্‌বে দেখ্‌চি—"

বলা বাহুল্য! ইজিচেয়ারটিরও সেই দশা!

"তোমার ঘটে কি বুদ্ধি বিবেচনা কিছু নেই? ঘরের সব জিনিষ-পত্তর ভেঙ্গে কি তছনছ্ করতে চাও তুমি? করো কি, করো কি, সর্ব্বনাশ—"

বলা নিষ্ফল! তাকে বাধা দেবার আগেই সে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ে। বিছানাটাও চেয়ারগুলোর সঙ্গী হোলো। কি ভয়ানক!

"এটা কি রকম বন্ধুতা হচ্ছে, শুনি?" এবার দস্তুরমতো চটেই উঠ্‌লাম আমি, "প্রথমে তো হাতীর মতো গোদা পায়ের শব্দে ভয় দেখিয়ে, প্রায় মরি আর কি, সেটা না হয় সহ্য করা গেল, কিন্তু এখন এসব হচ্চে কি? বায়স্কোপের পর্দ্দাতেই এরকম রসিকতা বরদাস্ত করা চলে কেবল! তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বোঝবার মতো বয়েস হয়েচে তোমার। নেহাৎ ছেলেমানুষটি নও তো!"

"আচ্ছা আর আমি কিছু ভাঙ্‌ব না। কিন্তু কি করব আমি, একশ বছর ধরেই আমি হাঁট্‌ছি, কেবল হাঁট্‌ছি, একদণ্ডও কোথাও বস্‌তে পাইনি য়্যাদ্দিন!" তার চোখ থেকে অশ্রুপাত হতে থাকে। ভুতের চোখে জল! এ যে রাম-নামের মতই অভাবনীয়! বেচারী ভুত! আমার দুঃখ হোলো।

আমি বল্লাম, "আমার রাগ করা উচিত হয়নি! তুমি যে একটি বাপমা-হারা, অনাথ বালক তা কি আমি জানি? তা কি করবে, এই মাটিতেই বস,—কিছুই তোমার ভার সইবে না যে! নইলে হয়ত কোলে করেই বস্‌তুম তোমায়। হাঁ, সাম্‌নে, ঐ খানটাতেই! তাহলে এই চেয়ারে বসে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি চাইতে পারবো।"

সে মাটিতেই বসে পড়্‌ল। আমার দামী লাল কম্বলটা সে ঘাড়ে ফেল্‌ল এবং বিছানাটাকে জড়িয়ে মাথায় পাগ্‌ড়ীর মতো করে' বাঁধ্‌ল। তখন তার আয়েস্ একটা দেখ্‌বার জিনিস!

"ভালো কথা, এত হাঁটাহাঁটি করচ কেন তুমি?" আমি জিজ্ঞাসা করি। "পাছে বাতে ধরে সেই ভয়ে?"

"আর কেন? খবর পেলাম কোথায় নাকি আমার ষ্ট্যাচু খাড়া করা হয়েছে? ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, এই ঠিক আমার মতোই—ঘোড়ার উপর বসানো। আমার সেই পাথুরে চেহারা দেখ্‌তেই আমি বেবিয়েছি। কিন্তু কোথায় যে হয়েছে, তাই খুঁজে পাচ্ছিনা!"

"ভাবনার কথাই তো বটে!" আমি বলি, "নিজের চেহারা নিজে না দেখ্‌তে পাওয়ার মতো দুঃখ কি আছে! তা এক কাজ করনা কেন? এত না হেঁটে, রেলে যাতায়াত কর্‌লেই তো পারো। তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায় ঘোরা হয় তাতে!"

"হেঁটেই মেরে দেব। রেল্ আবার কেন?" সে আশঙ্কা প্রকাশ করে, "রেলে ভারি কাটা পড়ে লোক, ভারি কলিশন হয়! সেই ভয়েই রেলে চাপিনা।"

"তা, চাপোনা, ভালোই করো!" ওর কথায় আমি সায় দিই। "ওতে খরচাও বাঁচে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কদ্দিন তুমি এই রকম পায়চারি করছ পৃথিবীতে?"

"পৃথিবীতে? তা প্রায় একশ বছর!" সে জবাব দেয়—"পৃথিবীতে এবং পৃথিবী ছাড়িয়েও।"

"পৃথিবী ছাড়িয়ে কি রকম?" আমি অবাক হই, "অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহেও যাতায়াত আছে নাকি তোমার?"

"আহাহা! তা কি আমি বলেছি? আর, সে সব জায়গায় যাবই বা কেন? তারা কি আমার ষ্ট্যাচু খাড়া করেচে?"

"তবে পৃথিবী-ছাড়িয়ে কি রকম?"

"যোগ-বলে। আকাশ-পথেও চলা ফেরা করতে পারি কিনা আমরা। অনেক সময়ে, মাটির থেকে, দুহাত, আড়াই হাত, পৌনে চার হাত পর্য্যন্ত ওপরে উঠি।"

"বলো কি?"

"ওই রকম।" সে ব্যক্ত করে—"যোগের ক্ষমতাই ওই। মরলে মানুষ-মাত্রই এই যোগ-বল লাভ করে, অনায়াসেই! আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌তে পারলে জীবনেও অনেক সময়ে লাভ করা যায়।"

"ওঃ, এখন বুঝ্‌ছি—" হঠাৎ আমরা টনক্ নড়ে; "তোমার পায়ের দাগের সঙ্গে মিলে যায় হুবহুব্।"

"কি—কি?" কৌতুহলী হয়ে ওঠে—সে।

"কিছুদিন আগে জায়গায় জায়গায় যে সব—বড়ো বড়ো পায়ের দাগ দেখ্‌তে পাওয়া গেছল, যা-নিয়ে খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ পড়েছিল সেই সময়ে—এখন বুঝ্‌তে পারছি সে-সব কার কীর্ত্তি!"

"কার?"

"কার আবার? তোমার।"

"তা হবে।" বিষন্ন ভাবে সে ঘাড় নাড়ে—"খবরের কাগজও দেখিনি অনেকদিন।"

"দেখাতাম তোমায়, রাখিনি ত! তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জান্‌ত কে! তা হলে রাখ্‌তাম।" আমি বলি,—"কিন্তু, বলো, আমার বাড়ীতেই পায়ের ধুলো দিলে কেন হঠাৎ?"

তোমার আস্তানার কাছ দিয়ে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম কিনা! এই বাড়ীটায় আলো জ্বলছিল। তারপর খড়ি দিয়ে সদর দরজায় তোমার নিজের নাম লিখেছ দেখ্‌লাম তার সঙ্গে আমার নামের ভারি মিল! ভাব্‌লুম আমারই আত্মীয় হয়তো কেউ, তবে তোমার কাছ থেকেই জেনে নিই না কেন আমার ষ্ট্যাচুর ঠিকানাটা! যাক্, তুমি যখন জানোই না, তখন আর বসে' থেকে কি লাভ? আমার পথে আমি বেরিয়ে পড়ি আবার।

"তোমার নামটি কি তা তো বলে' গেলে না?"

"আমার নাম? আউট্‌রাম।" সে বলে—"জাঁদ্‌রেল্ আউট্‌রাম! বেঁচে থাক্‌তে লড়াই করাই ছিল আমার কাজ। তখন জেনারেল বলে' আমায় ডাক্‌ত সবাই। এ রকম অদ্ভুত নাম শুনেচ এর আগে? অবশ্য তোমার নিজের নাম ছাড়া। আচ্ছা আসি তবে!"

আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হবার আগেই আউট্‌রাম আউট্ হয়ে গেলেন। আমার লাল কম্বলটাও সঙ্গে নিয়ে গেলেন, বিছানাটাও আর ফিরিয়ে দিলেন না।



খুকুর পুতুল

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

খুকুর একটি পুতুল ছিল
একটি পা তার ভাঙা
হঠাৎ কিসের খেয়াল হ'ল
যাবে বাবল-ডাঙা
খুকুর পুতুল।

বাবল-ডাঙা কোথায় সে যে
কোন সে নদীর পার!
কত পাহাড় পেরিয়ে সে কোন
গহন বনের ধার
কেউ জানে না।

খুকুর পুতুল, খোঁড়া পুতুল
যাবেই যাবে তবু
খেলা ঘরের বাক্সে সে না
রইবে জবু থবু
—খুকুর পুতুল।

খুকুর পুতুল খুঁড়িয়ে চলে
খুঁড়িয়ে চলে
খুঁড়িয়ে চলে
যেতে নর্দ্দামাটা পড়ল জলে
—খুকুর পুতুল।

শুধু ডাক্তারি নয়, ফলিত জ্যোতিষেও তিনি কৃত-বিদ্য ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গ্রহ উপগ্রহগুলি মানুষের জীবনে খুব বেশী পরিমাণে তাদের প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। তাঁর ধারণা ছিল বিদ্যুৎ-শক্তি এই প্রভাবের মধ্যে নিহিত। পরে কিন্তু এ-মত তাঁর বদলে যায়। তিনি জৈব চুম্বক শক্তির উপর আস্থাবান হ'য়ে পড়েন।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন যে, অসুস্থ দেহে চুম্বকের মৃদু আঘাত দিয়ে রোগ আরাম হয়। ক্রমে বিশ্বাস দৃঢ় হওয়াতে তিনি একখানা বই লিখে প্রকাশ করলেন। ১৭৬৬ সালে এই বইখানি প্রকাশিত হয়।

কিন্তু দশ বছর পরে সুইজারল্যাণ্ডে এক পাদ্রি সায়েবকে হাত দিয়ে ঐ কাজ করতে দেখে অবশেষে তাঁর ধারণা হোল চুম্বকের কোন প্রয়োজন হয় না। শেষ পর্য্যন্ত এই তাঁর বিশ্বাস দাঁড়াল যে, ব্যক্তি বিশেষের দেহেই ঐ চুম্বক-শক্তি নিহিত থাকে।

১৭৭৮ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিতে গিয়ে তিনি বিস্তৃত ভাবে পরীক্ষা এবং প্র্যাক্‌টিশ সুরু ক'রে দিলেন।

জনসাধারণ তাঁর গুণে মুগ্ধ হ'য়ে আকৃষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু ডাক্তারের দল হ'ল তার উপরে ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্ত। তাঁরা বল্লেন: লোকটা পাকা জোচ্চোর। অবশেষে রাজ-সরকার তাকে ২০,০০০ ফ্রাঙ্ক ফি দিতে চাইলেন তার গোপন-বিদ্যা জাহির করার জন্যে। মেস্‌মার কিছুতেই রাজি হ'লেন না। সাধারণের কাছ থেকেই তিনি অনেক বেশী অর্থ উপার্জ্জন করতেন।

মেস্‌মার বেশ ভাল ভাবে বুঝেছিলেন যে, রোগ মুক্তির সঙ্গে ডাক্তারের প্রতি অটুট বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। তাই তাঁর ব্যবস্থাগুলি উদ্ভট এবং বিচিত্র ছিল। যে ঘরে তিনি রুগীদের আরোগ্য ক'রতেন তার সাজ-সরঞ্জাম, বিধি-ব্যবস্থা অভিনব এবং অপরূপ ভাবে বিচিত্র ছিল। ঘরটিতে রঙ্গিন ঢিমে আলো থাক্‌ত; চতুর্দ্দিকে বড় বড় দাঁড়-করান আর্সি; এত নিস্তব্ধ যে ছুঁচ ফেল্‌লেও শোনা যায়। ঘরের মধ্যেটায় সুরভি জিনিষের সুগন্ধে ভরপুর! মাঝ-মধ্যিখানে একটা চৌবাচ্চায় ফুট্‌ছে মিঠে উত্তাপে নানা বর্ণের এবং গন্ধের রাসায়নিক তরল বস্তু। তার চারিদিকে রুগীদের আরাম ক'রে ব'সে শুয়ে থাকার চমৎকার আসন—তারা পরস্পর হাত ধরা-ধরি ক'রে ব'সত, কিম্বা একটা নরম সিল্কের কাছিতে হাত দিয়ে থাকত। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি নিয়ে আসত যে আরোগ্যতা ডাক্তারের করতল-গত!

তারপর, আস্‌তেন ডাক্তার সায়েব নিজে! কী তাঁর পোষাক; কী তাঁর রূপ! এসে, কারুকে ছুঁলেন; কারুর দিকে ফিরে হেসে চাইলেন, আবার কারুর মুখের উপর গোটা কয়েক "পাস" দিলেন। হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ মেয়েরা মূর্চ্ছা গিয়ে সেরে উঠ্‌তেন, আবার কেউ বা নিমেষে নিজেকে রোগ-মুক্ত ব'লে মনে করতেন। মোটের উপর সকলেই কিছু-না-কিছু উপকার বোধ ক'রে বাড়ী ফিরতেন।

মেস্‌মার শঠ, প্রতারক, কি জোচ্চোর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সাধুতার সঙ্গে এই ব্যবস্থাগুলিকে গভীর ভাবে বিশ্বাস ক'রতেন।

অবশেষে ফরাসী সরকার এই ব্যাপারের তদন্তের ভার দিলেন কয়েকজন বিখ্যাত ডাক্তার আর বৈজ্ঞানিকের হাতে।

তোমরা বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিনের নাম নিশ্চয়ই জান। এই দলের মধ্যে তিনিও নিযুক্ত হ'য়েছিলেন।

এই কমিশন খুব খুঁটি-নাটি ক'রে অনুসন্ধান ক'রে একটা প্রকাণ্ড রিপোর্ট পেশ ক'রলেন। তাঁহাদের স্বীকার ক'রতে হ'ল যে মেস্‌মার বহু লোকের বহু কঠিন ব্যারাম সারিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা কিন্তু মেসমারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ "জৈব চুম্বক-শক্তি" কে স্বীকার ক'রতে পারলেন না।

মেস্‌মারের অনুকরণ যারা করত তারা শুধু জোচ্চুরির জন্যে ব্যবসা ক'রত। তাই ক্রমে লোকে তাঁকেও জোচ্চোর, প্রতারক মনে ক'রতে লাগল। শেষকালে তিনি ফ্রান্স ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে মীরস্‌বার্গে, ৫ই মার্চ্চ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান।

মেসমারের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য-সেবকের দল এই বিদ্যার বৈজ্ঞানিক সত্য অনুসন্ধান ক'রে এটিকে অনেকখানি উন্নত ক'রে তুলেছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মার্কুইস পইসেগর। ইনি একজন চরিত্রবান এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক ছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র হাত দিয়েই ধীরে ধীরে একজনকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়। মেসমারের ঐ সব অদ্ভুত এবং উদ্ভট সাজ-সরঞ্জামের কোন দরকার বাস্তবিকই হয় না।

তারপর এই বিদ্যাটির যথেষ্ট আলোচনা এবং উন্নতি হ'য়েছে। এখনও প্রতিবৎসরই কিছু-না-কিছু তথ্য আবিষ্কার হ'য়ে চ'লেছে। এই বিদ্যা আর এখন ফ্রান্স কি সুইজারল্যাণ্ডে আবদ্ধ নয়। ইয়োরোপের সকল সহরেই এক-আধজন লোককে এই বিদ্যার আলোচনা এবং

প্র্যাক্‌টিশ ক'রতে দেখতে পাওয়া যায়। বহু কঠিন অসুখ ডাক্তারে জবাব দিলে তাঁরা সারিয়ে দিয়ে থাকেন। এমন লোকও এ দলে আছেন, যাঁকে দেশ-বিদেশে ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, "কল"এর পর "কল" পেয়ে।

এটি অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। এর আলোচনা, চর্চ্চা, পরীক্ষা দরকার। কেন না, দেখা যায় যে কারুর কারুর শরীরে খুব বেশী পরিমাণে বিদ্যুৎ থাকে। অন্ধকার ঘরে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোট ছোট স্পার্ক অনেকেই দেখ্‌তে পেয়ে থাক্‌বেন। এমন লোকও দেখ্‌তে পাওয়া যায় যাঁরা হাত ঘষ্‌লে বিদ্যুৎ বার হয়।

বহু দুরারোগ্য ব্যারাম কি আমরা বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে সেরে যেতে দেখ্‌ছিনে? মানুষের মধ্যে এই শক্তি নিহিত থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ—বিজ্ঞানের শক্তিমান উপায়।

এবার বোধহয় বুঝতে পেরেছ আমাদের ম্যাজিকওয়ালা, যার কথা গোড়ায় ব'লেছি, সে মেস্‌মেরিজম্ ক'রেছিল। সেই ব্যাপারটা ঠিক ক'রে বুঝতে হ'লে—মেসমেরিজমের অনুরূপ আর একটা বিদ্যার কথা তোমাদের কিছু কিছু জান্‌তে হবে। সেটা হিপ্‌নটিজম। এ বিদ্যাটাকে ইংরিজিতে বলে কৃত্রিম ঘুম। এর বিষয় পরে তোমাদের কিছু বলার ইচ্ছা রইল। এবারে আর স্থান নেই।



সর্ব্বনাশ বাক্স

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

সকল দেশের পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়—যখনই পৃথিবীর মানুষ গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি দেবতাকেও গ্রাহ্য করেনা, তখনই, সকল দেবতার বড় যিনি তিনি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। রামায়ণে দেখিতে পাই লঙ্কার রাজা রাবণ যখন ক্রমে দারুণ অত্যাচারী হইয়া উঠিল, তখনই হইল তাহার ধ্বংসের ব্যবস্থা—দেবতার অংশে রাম জন্মগ্রহণ করিয়া রাবণকে সবংশে বধ করিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত শত শত রহিয়াছে আমাদের দেশের পুরাণে। গ্রীক্-পুরাণে আছে—দেবরাজ জিয়ুস যখন দেখিলেন পৃথিবীর মানুষ উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে, দেবতাদিগকে তামাসা-বিদ্রূপ করে, তখনই তিনি তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার পুত্র ভল্‌ক্যান্‌কে (বিশ্বকর্ম্মা) ডাকিয়া বলিলেন—খুব সুন্দর একটি স্ত্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত কর, আমি ওকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে বেয়াদব মানুষকে সাজা দিব।'

কারখানা হইতে অপরূপ সুন্দরী একটি স্ত্রীমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া ভলক্যান্ যখন ওলিম্পাস্ পর্ব্বতে দেবরাজ জিয়ুসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তখন দেবতারা সকলে আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন ভল্‌ক্যানের এই অতুলনীয় কীর্ত্তির সুখ্যাতি করিবার জন্য। এরূপ অদ্ভুত সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়া দেবী মিনার্ভা এটিকে চুম্বন করিলেন—তাঁহার ওষ্ঠ স্পর্শে মূর্ত্তি সজীব বনিয়া গেল। তখন দেবতাদের প্রত্যেকে বর দিয়া ইহাকে ইহার সৌন্দর্য্যোপযোগী বসন ভূষণে সাজাইলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ, কটি-বন্ধ, নেক্‌লেস্, কঙ্কণ, আংটি সবই দিলেন, এবং ইহার নাম রাখিলেন "প্যাণ্ডোরা"। তখন দেবরাজের আদেশে দেবদূত মার্কারি (বুধগ্রহ) প্যাণ্ডোরাকে লইয়া পৃথিবীতে নামিয়া গেলেন—রাজা এপিমিথিউসের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার জন্য। দেবপুরী ছাড়িবার সময় দেবরাজ জিয়ুস্ প্যাণ্ডোরার হাতে হাতির দাঁতের তৈরি সুন্দর একটি বাক্স গুঁজিয়া দিলেন তাহার চারিপাশে একটা সোণার সাপ জড়াইয়া রহিয়াছে।

পথিক দুটি তাঁহাদের গন্তব্য পথে চলিয়াছেন। এক স্থানে পাথর হইতে পাথরে লাফাইয়া একটা ঝরণা পার হইবার সময়, প্যাণ্ডোরার হাত হইতে বাক্সটি জলে পড়িয়া গেল।

মার্কারি অন্য পারে প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছেন, তখন চেঁচাইয়া বলিলেন—"আমি হ'লে ও বাক্স জলেই ফেলে রেখে চ'লে যেতাম।" বাক্সটা সুন্দর যতই হউক না কেন, মার্কারির ভয়

ছিল—ও বাক্সে অকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আনিবে না। অমনি প্রতিধ্বনির মত শব্দ হইল—"অকল্যাণ"! ভয় পাইয়া প্যান্ডোরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ও-রকম কথা বল্‌লে?" মার্কারি বলিলেন—"ও একটা বাচাল জলদেবী, 'প্রতিধ্বনি ওর নাম, যা শোনে তার শেষ কথাটা শুধু বল্‌তে পারে। কিন্তু দেখ—ঐ প্রতিধ্বনিও বাক্সটা নিতে তোমাকে বারণ কর্‌ছে।" কিন্তু প্যান্ডোরা বাক্সের লোভ ছাড়তে পারলেন না, বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্কারিকে উহা জল হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে হইল।

রাজা এপিমিথিউসের সঙ্গে প্যান্ডোরার বিবাহ দিয়া মার্কারি দেবপুরীতে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে প্রাসাদে বসিয়া প্যান্ডোরা এবং তাঁহার স্বামী যখন অপরূপ সুন্দর বাক্সটি দেখিতেছিলেন, তখন হঠাৎ উহার সর্প বন্ধন ঢিলা হইয়া গেল। বাক্সের ভিতরটা দেখিবার জন্য প্যান্ডোরার কৌতূহল হইয়াছিল দারুণ, সুতরাং সর্প-বন্ধন শিথিল হইবামাত্র তিনি আর লোভ সাম্‌লাইতে পারিলেন না—ভয়ে ভয়ে, ধীরে ধীরে বাক্সের ডালাটি তুলিলেন। তুলিয়াই দারুণ এক চীৎকার করিয়া আবার ডালা ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার হাতে মৌমাছি হুল ফুটাইয়া দিয়াছে! একটা কুকুরও তাঁহার স্বামীকে কামড়াইয়া দিল! পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র লোকেদের মধ্যে চীৎকার-আর্ত্তনাদ আরম্ভ হইল তাহারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে, লড়াই করিতেছে! হায়রে, হায়! প্যান্ডোরা বাক্সের ডালা খুলিয়া কি দুষ্কার্য্যই না করিলেন! জগতের এই সমস্ত দুঃখ কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা, হিংসা-দ্বেষ, অসুখ ব্যাধি, ঝগড়া বিবাদ—পূর্ব্বেত এ সব ছিল না! এ সমস্তই মানুষকে সাজা দিবার জন্য দেবরাজ জিয়ুস বাক্সের মধ্যে পূরিয়া দিয়াছিলেন। এখন প্যান্ডোরার অতিরিক্ত কৌতূহলে ছাড়া পাইয়া ইহারা হুলুস্থুল ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিল—পৃথিবীর মানুষকে একেবারে ধ্বংস করিতে লাগিল। এপিমির্থিউস্ দুঃখ করিয়া বলেন—"হায়, হায়, কৌতূহলী প্যান্ডোরা! কেন তুমি বাক্সের ডালা খুলেছিলে?" প্যান্ডোরা স্বামীকে দোষ দেন—"অদূরদর্শী স্বামী আমার! তুমি কেন আমাকে বাধা দিলে না?" কিন্তু এখন আর দুঃখ করিয়া লাভ কি—অকল্যাণ পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই-সব দারুণ অকল্যাণ সত্ত্বেও বাক্সের তলা হইতে উজ্জ্বল চক্‌চকে একটি পাখী বাহির হইয়া প্যান্ডোরার চারিদিকে উড়িতে উড়িতে, মধুর শব্দে কিচ্ মিচ্ করিয়া বলিতে লাগিল—"দুঃখ করোনা, প্যান্ডোরা! আমি হচ্ছি "আশা," যেমন আমি লুকিয়ে বাক্সের মধ্যে ঢুকেছিলাম, তেমনি আমি মানুষের এই দুঃখ দুর্দ্দিনের সময় তাদের মনের মধ্যে গোপনে বাস করব—তাদের মনে সান্ত্বনা দিব।"

হালুয়াচরণ

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

প্যারীচরণের কাণ্ড শুনেছ ? . . .
হালুয়া সে ভালো করে !
—এই চাল মারে, যেখানে সেখানে,
জাঁক যেন নাহি ধরে !
পিক্‌নিকে গিয়ে কহিল সে, আমি
করিব মোহনভোগ !
কঠিন রান্না, কেউ পারিবেনা !'
মোরা কহি, 'তাই হোক্ !'

চেয়ার টানিয়া উনুনের ধারে,
বসিল সে যুৎ ক'রে.
তাপে গলা যায় শুকাইয়া, পাশে
কুঁজো রাখে জল ভ'রে ;
দুইটি গেলাস শেষ ক'রে দিয়ে,
কটাহে ঢালিল ঘৃত,
প্যারীচরণের কীর্ত্তি দেখিয়া
আমরা আতঙ্কিত !

সুজি ঢালিল সে কায়দা করিয়া
ভারতীয় কলা সম,
চিনি দিল পরে, বাহিরে বৃষ্টি
নেমে এল ঝম-ঝম ।

হালুয়াচরণ

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

মোরা চারিদিকে বসিনু ঘিরিয়া,
দেখি কটাহের পানে,
হালুয়া হয়েছে ধূসর বরণ,
কি কারণে কেবা জানে!

নামাইয়া, দিল খাইতে যখন,
বিস্বাদ মুখে লাগে,
প্যারী বলে, 'হ'ল চকোলেট্! আমি
বলিনি সে কথা আগে।'
কহি মোরা 'এ যে তিক্ত বেজায়!'
কহে সে 'ঐ ত' ভালো!
হালুয়া খাইলে খাওয়াইতে পারি,
কমিয়া আসে যে আলো!'

আচ্ছা, আমরা হ্যারিকেন জ্বেলে
সাহায্য করি তারে,
সে কহিল, 'মাথা হবে গোলমাল
কেহ যদি থাকে ধারে!'
স'রে যাই মোরা। সুজি মনে ক'রে
চিনি সে দিয়েছে আগে,
নাড়িতে নাড়িতে ভাবিতেছে, এ যে
কেমন কেমন লাগে!

চাপ বেঁধে গেছে, নামাইয়া ফের
গুঁড়ো ক'রে নেয় শিলে,
এবারে চাখিয়া, দেখে শুনে ঠিক্
সুজিই ঢালিয়া দিলে।

দানা বেঁধে গেল, হালুয়া তাহার
হ'ল মিছরির মত !
মুখে দিয়ে দেখি, কি বিষম ঝাল !
পেয়ারী 'ত' থতমত !

বলে, 'হয়েছিল এই ত' কাণ্ড,
বেটে নিয়েছিনু শিলে।'
বুঝিনু, তাহাতে লঙ্কাবাটার
রসটুকু গেছে মিলে !
সেই থেকে নাম প্যারীচরণের
পরিবর্ত্তিত ক'রে,
'হালুয়াচরণ' ব'লে তারে ডাকি,
শুনিয়া সে যায় স'রে !



নালন্দা

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু

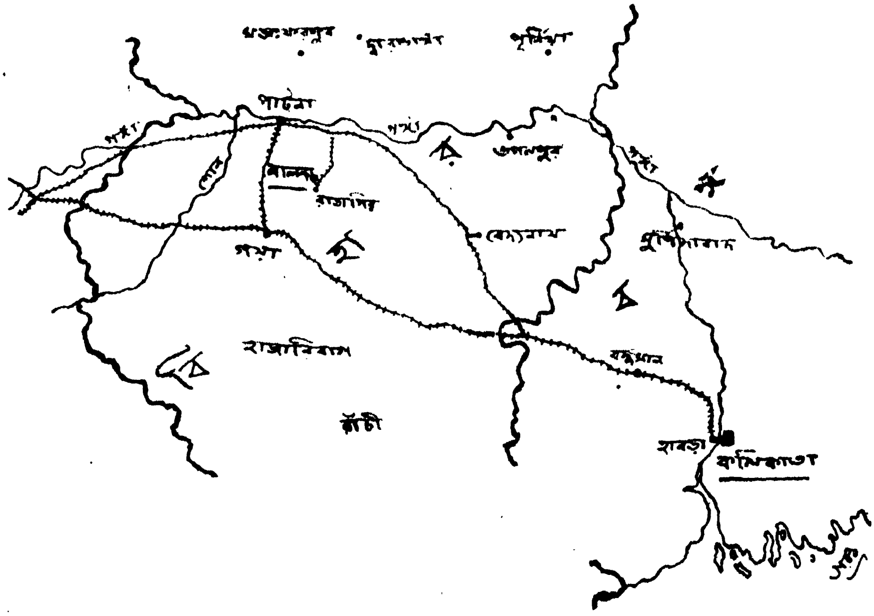
ভারতবর্ষের ইতিহাসে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তোমরা হয়ত সকলেই পড়েছ। বৌদ্ধযুগে নালন্দা ছিল বিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান। শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কোথাও ছিল না। ভারতের সকল জায়গা থেকে ত বটেই, এমন কি সুদূর চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশ থেকেও বৌদ্ধছাত্রেরা শিক্ষালাভের জন্য নালন্দায় উপস্থিত হোত। এখানে অনেক বড় বড় পণ্ডিত শিক্ষাদান করতেন। প্রায় দশ হাজার ছাত্র থাকৃত। সারি সারি প্রকাণ্ড সব বিহার ও সুন্দর সুন্দর মন্দির ছিল। ছাত্রদের খাওয়া থাকা বা লেখাপড়ার কোন খরচই দিতে হোত না। রাজকোষ থেকে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করা হোত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে নালন্দায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, তারপর আটশত বছর ধরে কত পরিবর্ত্তণের মধ্যেও এখানকার শিক্ষাদান কার্য্য চলেছিল। চীনদেশের সুবিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ সপ্তম শতাব্দীর গোড়ায় ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি ছাত্র হয়ে পাঁচ বছর নালন্দায় বাস করেন। সে সময় বাঙ্গালী ভিক্ষু মহাপণ্ডিত শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। নালন্দার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়ান হোত। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিরাজিত ছিল। মুসলমান আক্রমণে এর ধ্বংস ঘটে।

ধ্বংস পাওয়ার পর সাত শত বছর কেটে গেছে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত মাটি চাপা পড়ে গিয়েছিল! অনেকটা জায়গা জুড়ে কেবল মাটির ঢিবি ও জঙ্গল দেখা যেত। লোকে জানত না যে এরি মধ্যে প্রাচীন কালের সেই সুবিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং ইংরাজি ১৯১৫ সাল থেকে ভারত-গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন কার্য্য আরম্ভ করেছেন। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি বিহারের স্তূপের ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত খনন-কার্য্য শেষ করতে আরও সময় লাগবে। বছর ছয় আগে (১৯৩১ অক্টোবর) আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ যা দেখে এসেছিলাম, তারি কথাই এখানে সংক্ষেপে বল্‌বো।

[বিহার প্রদেশের পাটনা জেলার বড়গাঁও নামে একটী গ্রামের প্রান্তে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। অনেকে মনে করেন পূর্ব্বের বিহার গ্রাম নামই এখন বড়গাঁও নামে পরিণত হয়েছে। কলিকাতা—হাওড়া থেকে পাটনার নিকটের বক্তিয়ারপুর জংশন ৩১০ মাইল, সেখান থেকে বিহার বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু

'নালন্দা' ষ্টেসন ২৬ মাইল। আরও ৭ মাইল গেলে শেষ ষ্টেসন রাজগিরি কুণ্ড। মোট ১৫ ঘণ্টার মধ্যেই পৌছান যায়।] আমরা রাজগিরে পৌছে সনাতন ধর্ম্মশালায় উঠেছিলাম। দুদিন ধরে এখানকার দ্রষ্টব্য দেখে, তৃতীয়দিন নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাই। নালন্দা ষ্টেসন থেকে বড়গাঁও প্রান্তে খনন-স্থান আন্দাজ এক মাইল। ষ্টেসন থেকেই দূরে উঁচু স্তুপ দেখা যায়। আমরা যখন ধ্বংসাবশেষের সামনে পৌছলাম, তখন বেলা এগারটা। রাস্তার বিপরীত দিকে গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের বাংলোর ফটক দেখে, প্রথমে



সেখানেই প্রবেশ করলাম। বাংলো সংলগ্ন ক্ষুদ্র মিউজিয়মটী তখন বন্ধ ছিল। খননের ভারপ্রাপ্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আমাদের আগে খনন-স্থান দেখে আসতে বললেন, আরও জানালেন যে মিউজিয়ম বারটার সময় খোলা হবে।

খনন-স্থানের প্রবেশ দ্বারে একজন চাপরাসী ছিল, সে আমাদের নিয়ে ইটের তৈয়ারী উঁচু দেওয়ালের মাঝের প্রাচীন পথ দিয়ে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনে উপস্থিত করলে। দেখলাম, প্রাঙ্গনের পূর্ব্ব দিকে সারি সারি বিহার ভবন ও পশ্চিম দিকে স্তুপগুলি রয়েছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিরাট ধ্বংসাবশেষের দৈর্ঘ্য প্রায় দু'হাজার ফিট (১/৩ মাইলেরও বেশী) ও প্রস্থে প্রায় সাতশ ফিট স্থান জুড়ে আছে। ফটো তুলবার আশায় ক্যামেরা বার করতেই, চাপরাসী নিষেধ জানালে।* কাছেই একজন কর্ম্মচারী বসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে প্রত্যেকের জন্যে দু'আনা হিসাবে দিয়ে দর্শনার্থীর পাশ নিতে হোল। সঙ্গের চাপরাসী আমাদের সমস্ত দেখাবার ভার গ্রহণ করলে।

* এই প্রবন্ধে ছাপা ছবিগুলি সরকারী বিবরণ-পুস্তিকা থেকে নিয়েছি।—লেখক

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু

প্রথমেই আমরা, ধ্বংসস্থানের প্রধান দৃষ্টি আকর্ষক দক্ষিণ ধারের বড় স্তূপে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটি বাঁধান উঠানের মাঝখানে বিশালকায় চারকোণা স্তূপ। উঠানের চারদিকে অনেকগুলি ছোট স্তূপ ও দেখলাম। পূর্ব্বদিকে অবলোকিতেশ্বরের একটি বড় দাঁড়ান মূর্ত্তি রয়েছে, মাথার উপর কাঠের আচ্ছাদন দেওয়া। সিঁড়ি দিয়ে স্তূপের উপরে উঠতেই সমস্ত খনন-স্থানটা একসঙ্গে সুস্পষ্ট দেখা গেল। স্তূপের উপরে যে আগে একটি ছোট মন্দির ছিল, তার নীচের অংশটা মাত্র রয়েছে। দেওয়ালের গায়ের মূর্ত্তিগুলি এখনও বেশ ভাল আছে, দেখলাম। নালন্দার ধ্বংসাবশেষের বিশালতা দেখে সে সময় মনে খুব বিস্ময় ও আনন্দ জেগেছিল। আমি একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়াছিলাম। ভাবছিলাম, পৃথিবীর নানা দেশে প্রাচীন দুর্গ, রাজ-প্রাসাদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ আর কোন দেশে নেই। দেড় হাজার বছর পূর্ব্বে স্থাপিত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত এইরকম বিরাট প্রতিষ্ঠান, বর্ত্তমান যুগেও যে কোন সভ্যজাতি ও দেশের পক্ষে মহাগৌরবের জিনিষ। মনের চোখে দেখছিলাম, যেন পীত বসন পরা সুন্দরমূর্ত্তি হাজার হাজার বৌদ্ধছাত্র ও অধ্যাপকগণ বিশাল প্রাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা করছেন। বন্ধুদের ডাকে হঠাৎ চমক ভাঙ্গল, দেখলাম, তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে সুরু করেছেন।



নালন্দায় প্রাপ্ত একটী বৌদ্ধ-মূর্ত্তি

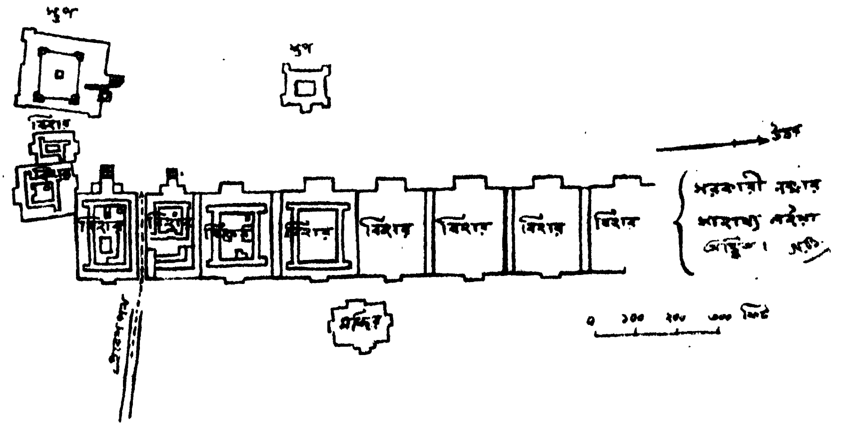
বড় স্তূপটী অন্ততঃ সাতটী ছোট স্তূপের সমষ্টিতে গড়া। তিনটী একবারে স্তূপের মধ্যে, বাকি চারটী বাইরে বেশ সুস্পষ্ট দেখা যায়। এরই একটী স্তূপের গায়ে সারি সারি সুন্দর বুদ্ধ ও বোধিসত্ব মূর্ত্তি সাজান দেখলাম। বড় স্তূপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটা ছোট মন্দিরে নাগার্জ্জুনের মূর্ত্তি রয়েছে।

স্তূপের প্রাঙ্গন থেকে বেরিয়ে, তার পূর্ব্ব পাশে দুটী ছোট বিহার ভবনের ভগ্নাবশেষ দেখে, সকলের চেয়ে বড় বিহার-ভবনে উপস্থিত হলাম। প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলাম, আগেকার যে সব

পাথরের থামের উপর ছাদ ছিল, সে গুলির নীচের সামান্য অংশ মাত্র এখন রয়েছে। বারাণ্ডা ছাড়িয়ে ভিতরে যাবার পথে, পাশের ঘর থেকে খননের সময় একটা তাম্র-ফলক পাওয়া গেছে। সেটা পাল রাজ-বংশের তৃতীয় রাজা দেবপালের সময়ের, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষের। তাতে, সুমাত্রা দ্বীপের রাজা নালন্দায় একটী বিহার-ভবন নিৰ্ম্মান করিয়েছেন, এ বিষয় লেখা আছে। ভিতরে যাবার পথে, আশেপাশে চূণ ও বালির জমাটে তৈয়ারী একবারে ভগ্ন কয়েকটী মূর্ত্তির অংশ দেখতে পেলাম।

নালন্দায় খননের ফলে একটা বিশেষ বিষয় প্রকাশ পেয়েছে যে, একই জায়গায় একাধিক বার বিহার-ভবন তৈয়ারী করা হয়েছিল। উপরকার ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের নীচে, তার আগেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের সুস্পষ্ট প্রমান রয়েছে। আমরা নীচেকার বিহারে ভিক্ষুদের বাসের উপযোগী সারি সারি ঘর দেখতে পেলাম। মাঝখানে যে পূজার জায়গা ছিল, সেখানে একটী খুব বড় আকারের বসা বুদ্ধ মূর্ত্তির কেবল দুইটী পা ও তার উপরের সামান্য অংশ মাত্র রয়েছে। বারাণ্ডায় অন্য অনেক ভাঙ্গা পাথরের মূর্ত্তিও দেখা গেল। উঠানে মাঝখানে একটা উঁচু চারকোনা চৈত্য ও এককোনে বাঁধান একটী কূপ রয়েছে দেখলাম।

উপরে তৈয়ারী বিহার ভিক্ষুদের বাসের ঘরে একটু বিশেষত্ব দেখা গেল। তাতে প্রতি ঘরে, মেঝে থেকে হাত খানেক উঁচু করে গাঁথা দুটী করে শয়ন-মঞ্চ রয়েছে। পাশে পুঁথি-পত্র রাখবার জায়গাও আছে।

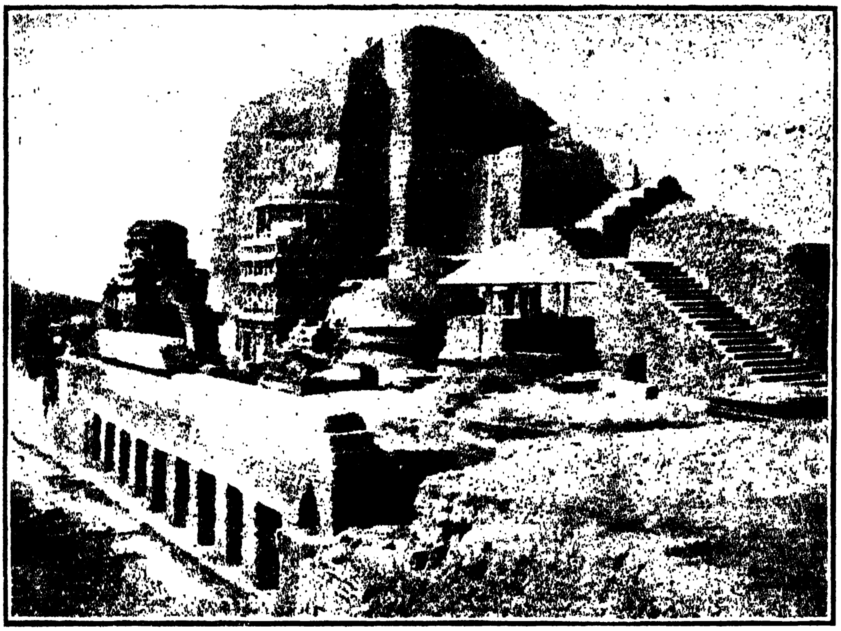


নালন্দা—খনন স্থানের নক্সা

পাশের বিহারটীর উপরের অংশে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, এর অৰ্দ্ধাংশের খুব নীচে পর্য্যন্ত খোঁড়া হয়েছে। তাতে করে, বহুপূর্ব্বের তৈরী নীচেকার বিহারটীর ধ্বংসাবশেষও দেখান হয়েছে। সেই বিহার-ভবনটী যে অগ্নিতে ধ্বংস হয়েছিল, পোড়া দেওয়াল ও চৌকাট ইত্যাদি দেখে, তার প্রমান পেলাম। উপরের বিহারের উঠানে এক কোণে একটী বাঁধান কূপ দেখলাম।

সংলগ্ন আর একটী বিহারে, একদিকের বাসঘরগুলি খুঁড়ে বার করা হয়েছে। এখানে একসারি ঘরের পেছনে, মাঝে দরজা দেওয়া আর একসারি ঘর দেখা গেল।

পরে যে বিহারটীতে গেলাম, তাতে ইট বাঁধান দুটী উঠান দেখলাম। নীচেরটী প্রথমকার বিহারের ও উপরেরটী তার ধ্বংসের পরে তৈয়ারী অপর একটী বিহারের বুঝা গেল। উপরের উঠানে ভিক্ষুদের রান্নার জন্যে ব্যবহৃত জোড়া লম্বা ধরণের চুল্লী দেখতে পেলাম। একধারে একটী বাঁধান কূপও রয়েছে। এই বিহার ও পরের বিহারটীর মাঝখানে একটী রাস্তা রয়েছে।



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

শেষে যে বিহারটীতে গেলাম, তার উঠান খুঁড়ে দেখান হয়েছে যে, এক জায়গাতে একই নক্সায় তিনবার বিহার তৈয়ারী করা হয়েছিল।

এই বিহারটীর পেছনেই, একটী পাথরের তৈয়ারী বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গেল। চারিদিকে নানারকম খোদা মূর্ত্তি রয়েছে—বিভিন্ন ভঙ্গীর মানুষ, কিন্নর-কিন্নরী, হর-পার্ব্বতী, কার্ত্তিক, বৌদ্ধজাতকের গল্পের বিষয়, সাপুড়িয়া, ধনুর্দ্ধারী আরও কত কি।

চাপরাসী জানাল যে, দ্রষ্টব্য সকল জিনিষ আমাদের দেখান হয়েছে। তাকে কিছু বকশিস্ দিয়ে বিদায় করা গেল। তারপর খোঁড়ার কায চলেছে, সেই অবস্থায় দেখবার জন্যে, খোলা প্রাঙ্গন অতিক্রম করে, অপর

দিকে দ্বিতীয় স্তূপের জায়গায় উপস্থিত হলাম। দেখলাম স্তূপটী প্রায় সম্পূর্ণ খোঁড়া হয়েছে ও একটু হেলে রয়েছে। অনেক অংশ বিকৃত হলেও, এক এক জায়গায় কারুকার্য্য যেন নতুনের মত বোধ হোল। কাছেই একটা চালার মধ্যে, মাটীর তৈয়ারী খুব বড় বৌদ্ধমূর্ত্তি ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পেলাম। পাশে পাথরের একটী ভাঙ্গা ছোট মন্দিরও রয়েছে।

সে সময় প্রায় আড়াইশ মজুর খোঁড়ার কাযে নিযুক্ত ছিল। শুনলাম আগে প্রায় সাতশ মজুর কায করতো। ছোট রেল বসিয়ে 'ট্রলি' গাড়ি করে মাটী দূরে ফেলা হচ্ছে। খুঁড়ে বার করা বিহার ও স্তূপের মেরামতের জন্যে নানা আকারের ইট ও টালি এইখানেই তৈয়ারী করা হয়। এ এক বিরাট ব্যাপার। সমস্ত খননকার্য্য শেষ হতে কতদিন যে লাগবে, সেটা স্থির করে বলা যায় না।

বিহার-স্থান থেকে বার হয়ে আমরা আবার প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বাংলোর পাশের ছোট মিউজিয়মে উপস্থিত হলাম। দুইটী নূতন সুন্দর ঘরে, নালন্দা-খননের সময় পাওয়া, নানা রকম মাটীর পাত্র, ব্রোঞ্জ ধাতুর তৈরী মূর্ত্তি ও ধুনুচি, লোহার তালা, কয়েকটী মুদ্রা, তাম্রফলক, কারুকার্য্য-করা ইট ইত্যাদি যত্ন করে রাখা আছে, দেখলাম। সব দেখা শেষ করে যখন নালন্দা ষ্টেসনে ফিরে এলাম, তখন বেলা দেড়টা।

আমাদের নালন্দা দেখে আসার পর ক' বছর কেটে গেছে, এ সময়ের মধ্যে আরও কত কি বার হয়েছে। তোমরা যদি সুবিধা করতে পার, একবার ইতিহাসে-পড়া এই বিরাট ব্যাপার স্বচক্ষে দেখে এসো। তাতে অনেক শিক্ষা ও আনন্দ দুইই লাভ হবে। তবে এক কথা, যাদের বয়স বার বছরের কম, তাদের খনন-স্থানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। আমার মনে হয়, লেখাপড়াজানা সকলেরই একবার নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখে আসা উচিত।



তুরস্কের কামাল

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সালানিকার এক ইস্কুলে একটী ছেলে ক্লাশে বসে অবিরাম গল্প করে, পড়ার চেয়ে কথা বলা আর গোলমাল করার দিকেই তার আগ্রহ বেশী।

একদিন কথায় কথায় এক সহপাঠীর সঙ্গে লেগে গেল তর্ক, তর্ক খানিকক্ষণের মধ্যেই হোল ঝগড়া, ফিস্ ফিস্ স্বর একেবারে গিয়ে উঠলো গরম গরম কথায়, শিক্ষক আর সইতে পারলেন না, ডাকলেন—মুস্তাফা !

মুস্তাফা কাছে এসে দাঁড়ালো, আগে থেকেই দুষ্ট ছেলে বলে তার খ্যাতি ছিল। শিক্ষক তার কোন কথাই শুনলেন না, বেতটা তুলে নিয়ে ঘা-কতক বেশ উত্তম মধ্যম লাগিয়ে দিলেন।

দিদিমার আদুরে ছেলে মার খেয়েই ক্ষেপে গেল; ইস্কুল থেকে বাড়ী চলে এল, বললে পড়ব না ওখানে !

দিদিমা সস্নেহে তার গায়ের বেতের কাল্‌সিরে পড়া স্থানগুলো হাত বুলিয়ে দেন, বলেন আর পড়াশুনা বেশী করেই বা কি হবে !

সেই থেকে মুস্তাফার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ।

*　　*　　*　　*　　*

সঙ্গী সাথী সবাই পড়াশুনা করে, আর সে বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকবে—এ যেন মুস্তাফার কাছে কেমন-কেমন লাগে।

একদিন এক প্রতিবেশী বন্ধু একেবারে পূরাদস্তুর সৈনিক সেজে এসে হাজির, বললে—জানিস্, আমি সৈনিকের ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি, লড়াই শিখছি, পরে সেনাপতি হ'ব !

দুষ্টু ছেলের মন, চুপ করে বসে বসে পড়াশুনার করার চেয়ে মারামারি দাঙ্গা করার দিকেই ঝোঁকে বেশী, সেদিনেই মুস্তাফা মাকে গিয়ে বললে—মা আমি সৈনিকের ইস্কুলে ভর্ত্তি হব, লড়াই শিখবো !

বিধবার একমাত্র ছেলে, লড়াই শিখে কবে কোথায় যাবে আর ফিরেবে না, শঙ্কিত হয়ে ওঠে মায়ের মন, বলেন লড়াই শিখে দরকার নেই বাবা, তার চেয়ে ইস্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হওগে।

দুষ্টু ছেলে মায়ের কথা শুনবে কেন, একদিন চুপিচুপি গিয়ে নিজেই সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয়ে এল !

ভর্ত্তি যখন হয়েছে তখন আর উপায় কি, সেখানেই শিক্ষা চলতে লাগলো।

সামরিক ইস্কুলে একজন অঙ্কের মাষ্টার ছিলেন, নতুন ছেলেটীর অঙ্কের মাথা দেখে তিনি ভারী খুসী হলেন। কিন্তু নাম নিয়েই হোল মুস্কিল, মাষ্টারের নামও মুস্তাফা, ছাত্রের নামও মুস্তাফা। অনেক ভেবে চিন্তে মাষ্টার একদিন ছাত্রকে ডাকলেন, বললেন—দেখ তোমার নাম আর আমার নাম এক হয়ে গেছে এতে আমার একটু অসুবিধা হয়েছে, তোমার নামের সঙ্গে 'কামাল' কথাটা তুমি যোগ করে নাও!

খানিকক্ষণ আলোচনার পর তাই হোল, মাষ্টার মশাই 'মুস্তাফা'ই রইলেন ছাত্র হলেন হলেন 'মুস্তাফা কামাল'।

পরে এই কামাল নামেই জগৎ তাঁকে চিনেছিল।

* * * * *

আবদুল হামিদ তখন তুরস্কের বাদ্‌শা। নিজের সুখ সুবিধে নিয়েই এমনি মেতে থাকতেন যে প্রজাদের দিকে নজর দেবার সময় তাঁর ছিল না। প্রজারা এদিকে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য উৎসুক। সুলতানের ভয় কখন তারা বিদ্রোহ করে বসে, তাই সারাদেশ তিনি গুপ্তচরে ছেয়ে ফেলেছেন, সুলতানের বিরুদ্ধে কোথায় কে-কি করছে জানার জন্যে। কারুর একটু দোষ পেলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার ....বিচার......জেল। তরুণেরা এ অত্যাচার স'বে কেন? তারা পণ করলে তুরস্ককে তারা নতুন করে গড়ে তুলবেই।

কামাল তখন ইস্কুল পেরিয়ে সবে সামরিক কলেজে এসে ঢুকেছেন. তিনি এই তরুণদের সঙ্গে মিশে মুক্তি-সঙ্ঘ নামে এক দল গড়ে তুললেন। দলের এক হাতে-লেখা কাগজ বেরুলো, যাতে সেই কাগজ পড়ে সকলে দলের কার্য্য পদ্ধতি জানতে ও বুঝতে পারে। কাগজের সম্পাদক হলেন কামাল নিজে। বেশীর ভাগ রচনাও তাঁকেই লিখতে হোত।

চরের মুখ থেকে বাদ্‌শার কাণে এ কথা উঠ্‌লো, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে সুল্‌তান আদেশ করলেন—ছাত্রদের সংযত কর!

শেষ পর্য্যন্ত কামালকে কলেজ ছাড়তে হোল। তবু তিনি দমলেন না, এক ভাড়াটে বাড়ীতে মুক্তি-সঙ্ঘের এক আফিস খুলে বসলেন। গুপ্তচরেরা তার উপর চোখ রেখেছিল। একদিন একটী অচেনা লোক এসে বললে—বড় অভাব......খেতে পাইনা......কিছু সাহায্য করুন.........আজকের রাত্রির জন্য একটু আশ্রয় দিন!

যিনি দেশের কাজে জীবন পণ করেছেন দেশের ছেলের এই আবেদন তিনি উপেক্ষা করবেন কেমন করে, বললেন—বেশ থাক এখানে—

ছেলেটী সেই রাত্রে সেখানেই রইল। কামালের দলের কারুকেই আর তার চিনতে বাকী রইল না। পরদিন সকালে একেবারে পুলিস নিয়ে এসে হাজির, একে একে সকলকে সে ধরিয়ে দিলে, বিচারে কামালের চারমাস জেল হোল, দলের কেউই বাদ গেল না।

*   *   *   *   *

যেদিন জেল থেকে খালাস পেলেনা সেইদিনই সুলতানের লোক এসে নিয়োগপত্র দিলে—সুলতান কামালকে এক চাকরী দিয়েছে, সুদূর সিরিয়ায় এক সেনানায়কের পদ।

কামালকে সালানিকা ছেড়ে সিরিয়ায় যেতে হোল,

সেখানে এসে কামাল আরেক গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করে বসলো, কিন্তু সেখানে বিপ্লবের কাজ করতে করতে তাঁর মন কেঁদে উঠলো জন্মভূমির জন্য—বেচারা অনেকদিন দেশছাড়া! সুলতানের কাছে তিনি আবেদন করলেন—আমায় ছুটি দিন, দেশে ফিরবো—

কিন্তু সুলতান তাঁকে বিপজ্জনক লোক মনে করে দেশ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, ফিরে আসার অনুমতি তিনি দিলেন না।

দুর্দ্দান্ত ছেলে কামাল প্রতিজ্ঞা করলেন, সালানিকায় তিনি ফিরে যাবেন!

একদিন সাধারণ ছদ্মবেশে সিরিয়া থেকে সমস্ত গুপ্তচরদের ফাঁকী দিয়ে কামাল পালিয়ে গেলেন, বাঁকা পথে মিনার ও গ্রীস ঘুরে সালানিকায় ফিরে এলেন।

সালানিকায় গুপ্ত সমিতির কাজকর্ম্ম দেখতে দেখতে খবর জানাজানি হয়ে গেল—কামাল সিরিয়ায় নেই কামাল সালানিকায়।

গুপ্তচরেরা হৈহৈ করে উঠলো, কামাল কিন্তু তখন আবার নিরুদ্দেশ।

*   *   *   *   *

বছর তিনেক বাদে সুলতানের অনুমতি এল—তুমি এবার সালানিকায় ফিরতে পার।

কামাল সালানিকার ফিরে এলেন, তুরস্কে যখন অনেকগুলি ছোট ছোট বিপ্লবীদল গড়ে উঠেছে, কামাল নিজের দলের সঙ্গে আনোয়ার পাশা, তালাৎপাশা প্রভৃতির দল এক করে ফেললেন। দলের নতুন নাম হোল—একতা ও উন্নতি বিধায়ক সঙ্ঘ, Society of Union and Progress.

এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল জাতির সমস্ত দুর্ব্বলতা মুছে ফেলে নতুন করে জাতিকে গড়ে তোলা। তুর্কীরা এদ্দিন আরব মিশর আফগানিস্থান ও ভারতের মুসলমানদের নিয়ে এক বিরাট ধর্ম্মসমাজ গড়ে তোলার কল্পনা করছিল এদিকে য়ুরোপের ইংরাজ, ফরাসী জার্ম্মাণী ও রুশিয়া তুরস্ককে জয় করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার এক ষড়যন্ত্র করলে। সুলতান

আবদুল হামিদ এ সব দিকে খেয়াল করেননি, নিজের সুখ সুবিধা নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। য়ুরোপীয়েরা এই সুযোগে ধীরে ধীরে বেশ অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু কামালপাশার এই তরুণ-দলকে দেখেই তারা চমকে উঠলো, সুলতানকে বোঝালে—ওদের দমন কর!

সুলতানের উদ্দেশ্য জানতে পেরেই তরুণদল বিদ্রোহ করলে। সুলতান তখনও ভাল করে তৈরী হতে পারেনি, কামাল সে সৈন্যদলকে হারিয়ে দিল। আবদুল হামিদকে সরিয়ে দিয়ে তার ভাই বেশাদকে সিংহাসনে বসানো হলো, শাসনকার্য্যের সব ভার রইল কামালের সহকর্ম্মী আনোয়ার পাশার উপর।

* * * * *

হঠাৎ একদিন য়ুরোপের বুকে আগুণ জ্বলে উঠলো—জার্ম্মান যুদ্ধ।

জার্ম্মাণরা আনোয়ার পাশাকে বোঝালেন আমাদের দলে যোগ দাও, তোমাদের লাভ হবে!

আনোয়ার বললে বেশ!

কামাল বললে—না না, ওরা হেরে যাবে, আমরাও হারবো!

আনোয়ার কিন্তু কামালের কথা শুনলেন না, যুদ্ধে যোগ দিলেন। সেনাপতি হোল কামাল। কিছুদিন আগে বুলগেরিয়ার হাত থেকে এড্রিয়ানোপ্‌ল্ দখল করে নাম করেছিলেন কামাল, তাঁর মত সেনাপতি তখন তুরস্কে ছিল না, কাজেই সৈন্য চালাবার ভার তাঁরই উপর পড়লো।

পরপর চারটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়ে গেল—দার্দ্দানেলিশে, প্যালেষ্টাইনে, গ্যালিপলিতে, কুট-অল্ আমেরাতে। চারটি যুদ্ধেই কামালের সৈন্যের সামনে ইংরাজ হটে গেল, শেষের যুদ্ধে কুট্-অল আমেরাতে ইংরাজ সেনাপতি টাউন্‌সেণ্ড সমস্ত সৈন্যশুদ্ধ কামালের হাতে বন্দী হলেন।

এদিকে জার্ম্মানরা শেষ পর্য্যন্ত লড়তে পারলো না, পরাজয় স্বীকার করলো। ইংরাজ ইতালি, ফরাসী ও আমেরিকানরা তখন যত কিছু অভিযোগ নিয়ে জার্ম্মাণী ও তুরস্ককে চেপে ধরলো। তুরস্ককে বললে—তোমাদের কাছে যত যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র আছে সব দাও আমাদের হাতে—

সেনাপতি কামাল এই আদেশ পেয়েই চমকে উঠলেন—নিজের দেশের সব অস্ত্র বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে নিরস্ত্র হয়ে বসে থাকবো, নিজেদের রক্ষা করার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত রাখবো না! আর চারিদিক থেকে সশস্ত্র বিদেশীরা এসে যা খুসী তাই করবে! বললেন—বেশ সব অস্ত্র যোগাড় করতে হবে, আমার কদিন সময় চাই।

সময় পাওয়া গেল, কামাল সমস্ত সৈন্য সামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র এক করলেন। তারপর সহসা একদিন ধূমকেতুর মত সবশুদ্ধ গিয়ে উপস্থিত হলেন আনাতোলিয়ায়। ফরাসীরা তখন সেই জায়গাটা নিজেদের অধিকারে আনার চেষ্টা করছিল। বন্দুকের ধাক্কা দিয়ে কামাল তাদের হটিয়ে দিলেন। তারপর জাতির সব নেতাদের তিনি ডাকলেন—কংগ্রেসে, ঠিক হোল,—পৃথিবীর বুক থেকে তুর্কি জাতি লুপ্ত হয়ে যায় তাও ভাল, তথাপি বিদেশীর কাছে তারা মাথা নত করবে না!

জাতির নেতাদের নিয়ে জাতীয় পরিষদ National Assembly গড়ে উঠলো, সুলতানের কাছে তারা লিখলো, প্রধান মন্ত্রী দামাদ ফরিদকে তাড়িয়ে দিন—

সুলতান ভয় পেয়ে গেছিলেন. তাতেই রাজী হলেন।

ইংরাজ, ফরাসী, ইতালী চমকে উঠলো, হুড়মুড় করে সৈন্য নিয়ে এসে তারা কনষ্টান্টি-নোপল্ দখল করে বসলো। সুলতান ভয় পেয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি ইংরাজদের সঙ্গে এক সন্ধি করে ফেললেন। কামালের দল এই সন্ধি মানলো না, 'আঙ্গোরায়' তারা ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিলে। কুড়ি দিন লড়াই করে ইংরাজেরা হটে গেল। ইতিমধ্যে গ্রীকেরা স্মার্ণা, থ্রেস, আনাতোলিয়া ও এসিয়ামাইনর দখল করে বসেছিল, কামাল একে একে তাদেরও হটিয়ে দিলে, আনন্দে তুর্কীরা তাঁকে 'গাজী' উপাধি দিয়ে দিলে, তিনি হলেন—গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা।

সুলতান ভয়ে ইংরাজের জাহাজে চেপে পালিয়ে গেলেন; সমগ্র তুরস্ক এসে পড়লো জনসাধারণের হাতে, কামালকে সভাপতি করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হোল।

এই সময় চল্লিশবছর বয়সে কামাল এক ধনীর মেয়েকে বিয়ে করেন, বিয়েতে সাড়ে উনিশ লক্ষ টাকা যৌতুক পান।

*   *   *   *   *

কামাল এবার সুরু করলেন জাতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে। সমগ্র ইস্লাম জগৎকে এক করে যে ধর্ম্মসমাজ গড়ে তোলার কল্পনা ছিল, কামাল তা ভেঙে দিলেন, বললেন—নিজেরা আগে বাঁচি, তারপর অন্য মুসলমানদের কথা ভাববো, first we are Turks then we are Mahomedans.

ধর্ম্মগুরু 'খলিফার' পদ তুলে দেওয়া হোল।

আরবী 'হদিসে'র পুরানো নিয়ম কানুন বদলে নতুন আইন তৈরী হোল, সুইজারল্যাণ্ড থেকে দেওয়ানী আইন, ইতালী থেকে ফৌজদারী, জার্ম্মান্ ও সুইস্ আইন মিলিয়ে হোল বানিজ্যনীতি।

তুরস্কের কামাল
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এতদিন তুর্কীরা আরবি অক্ষরে লিখতেন, আরবী ভাষা ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখা হয়। কামাল বললেন, এ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়, দুনিয়ার সব ভাষা বাঁদিকে থেকে ডানদিকে লেখা হয়, নব্য তুর্কীতে ও আরবী ভাষা চলবে না। তিনি রোমাণ অক্ষর a, b, c, dর আমদানী করলেন, লেখারও নিয়ম হোল বাঁ দিক থেকে।

জাতির পোষাক বদলে গেল। ছেলেদের লুঙ্গী পরা চলবে না, পরতে হবে য়ুরোপীয়ান পোষাক, ফেজের বদলে হ্যাট্ চাই। মেয়েদেরও আর পর্দ্দার আড়ালে বোর্খা পরে থাকলে চলবে না, মেমেদের মত গাউন ও টুপী পরবে, পথে বেরুবে, স্কুল কলেজে পড়বে।

খাঁ, শেখ, পাশা, প্রভৃতি আরবি পদবী তিনি তুলে দিয়েছেন, সবাইকে নতুন তুর্কী পদবী রাখতে হবে, নিজে কামাল পাশা হলেন কামাল আতাতুর্ক। তিনি বলেন—'আমরা যে প্রাচ্যের লোক একথা ভুলতে হবে। চীন, ভারত, আরব, মিশর, পারস্য বর্ত্তমান থেকে অনেক পিছিয়ে আছে, তাদের পানে তাকিয়ে থাকলে আমরাও পিছিয়ে যাব, আমাদের পতন হবে।' বর্ত্তমান যুগে আমাদের বেঁচে থাকতে হলে, য়ুরোপের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে হবে, তাদের সমকক্ষ হতে না পারলে তাদের হাতেই আমাদের মৃত্যু!

কামাল সেইজন্য আজ তুরস্ককে য়ুরোপীয় কায়দায় গড়ে তুলছেন। কিন্তু প্রাচীনেরা এসব পছন্দ করেন না, গোঁড়া মুসলমানেরা বলেন, এসব কোরান-বিরোধী। এইজন্যই একদিন আফগান-আমীর আমানুল্লাকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে দেশ থেকে পালাতে হয়েছিল। তবে তরুণেরা কামালকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে বলেই কামালের পক্ষে এত সংস্কার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কামালের প্রচণ্ড বিরোধী দলও আছে, সে হচ্ছে আনোয়ার পাশার দল। যুদ্ধে জার্ম্মানরা হেরে গেলে Society of Union and Progress-এর কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড নিয়ে আনোয়ার সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান, এখন তিনি আছেন বার্লিনে, সেখান থেকে ষড়যন্ত্র করে তিনি কামালকে হত্যা করবার চেষ্টা করছেন, অনেক বড় বড় লোক এই সব ষড়যন্ত্রে ছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

কর্ম্মী কামালের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে শুধু একটী লোকের তুলনা হতে পারে, সে মুসোলিনী।

কোয়ালা

শ্রীসুবিনয় রায় চৌধুরী

ঠিক যেন খেলার "টেডি-বেয়ার" (Teddy-bear) জ্যান্ত হ'য়ে উঠেছে! নাম "কোয়ালা" (Koala) ; ছোট্ট খাট্ট চেহারা—পূর্ণ বয়সেও ১০।১১ ইঞ্চির বড় হয় না—তুলতুলে নরম কোঁকড়ান ঘন ধূসর লোমে গা ঢাকা, মিষ্টি মুখখানা, আদুরে-গোপাল চেহারা, নিরীহ শান্ত জীবটি। সাধে কি মানুষের এত আদরের হয়েছে এরা!



এদের বাস অষ্ট্রেলিয়ায়। পৃথিবীর অন্যত্র আর কোথাও এ জীব দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে আর মানুষের কোলে চড়্‌তে এরা ভালবাসে, কাজেই মানুষও এদের পুষ্‌তে ভালবাসে। বনে-জঙ্গলে যখন বাস করে তখন এরা শুধু ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছের কচি পাতা খায় ; মানুষ যখন এদের পোষে, তখন নানা রকমের 'সুখাদ্য' (অর্থাৎ, মানুষের কাছে সুখাদ্য) খেতে দেয়। ফলে, অল্পদিনের মধ্যে এরা হজমের রোগে মারা যায়। এইভাবে শত শত কোয়ালা প্রাণ হারিয়েছে। এখন সরকার থেকে নিয়ম ক'রে কোয়ালা পোষা বন্ধ করা হয়েছে।

নিষ্ঠুর মানুষ এক সময়ে নরম লোমশ ছালের লোভে কোয়ালাদের শিকার করত। এমন নিরীহ সুন্দর জীবকে মারা যে কত বড় নিষ্ঠুর কাজ তা' সহজেই বুঝ্‌তে পার। বৎসরের পর বৎসর শিকার করার পর এদের বংশ প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। পরে, অষ্ট্রেলিয়ার

সরকারী নিয়মে কোয়ালা বধ করা দণ্ডনীয় হয়—এবং কোয়ালাদের রক্ষা করার ব্যবস্থাও হয়। নইলে হয়তো এতদিনে এরা লোপ পেয়েই যেতো। এখনও, কোয়ালাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

সিড্‌নী সহরের কাছে, একটি মস্ত বড় বাগানে কোয়ালাদের জন্য একটি আস্তানা তৈয়ারী করা হয়েছে। সেই বাগানে অনেক ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ আছে; তা'র উপরে চ'ড়ে দিন কাটায় কোয়ালারা। মানুষ দেখা করতে গেলে এরা খুবই খুসী হয় এবং অনেক সময় কোলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। শত শত লোক এই মিষ্টি, আহ্লরে নিরীহ, মিশুক জীবটিকে দেখ্‌বার জন্য "কোয়ালা-বাগান"এ (Koala-Park) যায়।



সেখানে গেলে কোয়ালাদের স্বভাব সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়। ছোট-বড়, বাচ্চা-বুড়ো-বুড়ী, সব রকমেরই কোয়ালা সেই বাগানে আছে। প্রকাণ্ড বড় ইউক্যালিপ্‌টাস্‌ গাছের উপর তা'রা দিব্য আরামে বাস করে আর মনের সাধে ইউক্যা-লিপ্‌টাসের কচি পাতার ডগাগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

তোমরা ইউক্যালিপ্‌টাসের গন্ধ শুঁকেছ তো? এই গন্ধে অনিষ্টকারী পোকারা পালায়। সে জন্য, কোয়ালার পরিষ্কার লোমশ গায়ে কোনও পোকা থাক্‌তে পারে না। তাদের কোলে নিতে কোন আপত্তি বা ঘেন্না থাক্‌তে পারে না। এরাও নিতান্ত লক্ষ্মী ছেলের মতন চুপটি ক'রে কোলে চড়ে, আঁক্‌ড়ে ঝুলে থাকে—কোন উচ্চবাচ্য নেই।

গাছের উপরে যখন থাকে, তখনও এরা—বিশেষতঃ ছোটরা অন্যের পিঠে আঁক্‌ড়ে ধরে থাকাটা পছন্দ করে। এইভাবে পাঁচ-সাত জনকেও এ ওর পিঠে আঁকড়ে ধরে থাকৃতে দেখা যায়।

কোয়ালা

শ্রীসুবিনয় রায় চেধুরী

কোয়ালাকে অষ্ট্রেলিয়ার ভাল্লুক বলা হয় বটে; কিন্তু এরা আসলে "অপোসাম্", "উমব্যাট" প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়ার জীবের জাতভাই—চেহারাটাই যা' একটু ভাল্লুকের গোছের। এদের বাচ্চারা জন্মের সময় খুব ছোট্ট থাকে; গায়েও লোম থাকে না। তখন এরা মায়ের পেটের একটি ছোট থলির মধ্যে বাস করে; মাঝে মাঝে উঁকি মেরে চেয়ে দেখে। ক্রমে



বড় হ'য়ে থলিতে আর জায়গা পায় না; গায়েও জোর হয়। ততদিনে বেশ লোমশ পা হয় আর চট্‌পটেও হয় এরা। তখন আস্তে আস্তে এরা বেরিয়ে আসে। প্রথমে খুবই সাবধানে চলাফিরা করে ক'দিন; একটু গোল শুনলে বা সন্দেহজনক কিছু ব্যাপার দেখ্‌লে তখনই মায়ের বুকে লুকায়। ক্রমে সাহস বাড়ে।

বেচারারা অতি নিরীহ। নিরামিষ খায়, নির্ব্বিবাদে থাকে, শান্ত ধীর ভাবে চলাফিরা করে; রাগারাগী নাই, ঝগড়া নাই; মুখে বেশী আওয়াজও নাই—শুধু একটু 'মিউ' গোছের শব্দ।

পাঁচ সাত জনে দল বেঁধে একত্র থাক্‌তে এরা ভালবাসে। দল বেঁধে চলাফিরা করে, জড়াজড়ি হয়ে চুপ্‌টি ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকে, আবার দল বেঁধে ঘুমও দেয়।

বুড়ো বয়সে কেউ কেউ একলাও থাকে. কোনা ঘুঁচি দেখে একা চুপটি ক'রে নির্ব্বিবাদে ঘুমও দেয়। বাচ্চারা কিন্তু দল বেঁধে থাক্‌তে ভালবাসে; মাঝবয়সীরাও তাই। তবে. দল ছেড়ে একা কোনও কোয়ালা বাস করে না।

অষ্ট্রেলিয়ার সরকার থেকে কোয়ালাদের বংশকে বাঁচাবার জন্য আইন করার পর কোনও কোনও জায়গায় "কোয়ালা-বাগান" তৈয়ারী করা হয়েছে। সেখানে তাদের রাখা হয়, বুনো কুকুরের এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করা হয়। খাবার কোনও ভাবনা নাই; ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের উপর চড়িয়ে দিলেই হ'লো।

বার্নেট নামে একটি সাহেব কোয়ালাদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সিডনীর Koala-Park তাঁরই স্থাপিত। সেখানে তিনি শত শত কোয়ালাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের চলাফিরা. খাওয়া, ঔষধ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। এই প্রবন্ধের ছবিগুলি তাঁর বাগানে তোলা হয়েছে।



এমনি দিনে কেমনে মা

শ্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ

এমনি দিনে কেমনে মা ঘুমোই বলো আমি !
ঝড়ের পাখা উড়িয়ে বাদল ধরায় এলো নামি।
ঐ দেখ মা কাজল কালো শাওন মেঘের কোলে,
ঝলক্ দেওয়া পাগলা আলোর রক্ত-শিখা দোলে
মরা গাঙে কাঁপন তুলে ওই যে জোয়ার এলো
এম্‌নি দিনে কেমনে মা ঘুমোই আমি বলো !

* * *

বেনুবনে ঝিঁঝির গানে স্বপ্ন আবেশ জাগে,
শ্যামল ঘাসের কোমল বুকে রঙীন পুলক লাগে।
সাগর-মেয়ে চপল ঢেউয়ের এলিয়ে কালো চুল
ভরিয়ে দেছে সেই অলকে শুভ্র-ফেনা ফুল।
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে সবুজ ধানের গায়
বাদ্‌লা হাওয়া নরম হাতে স্বপন বুনে যায়।
হরষ ভরা দাদুর গানে চাতক নাচে ওই
বল্ মা আমায় কেমনে আজ চুপটি করে রই।

* * *

বল্ মা আমায় কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ,
কোথায় গেলে দেখ্‌তে পাবো প্রবাল ঘেরা ঘাট ?
সোনার কদম কোথায় ফোটে গন্ধে আমোদ করে,
রাজার কুমার ছুটলো! কোথায়পক্ষীরাজে চড়ে ?
রূপ কথা এই শুন্‌বো বলে তাই তো দিবস যামি
বাদ্‌লা দিনের পথটি চেয়ে দিন গুনেছি আমি।
সেই সে সুদিন যদিই বা আজ হঠাৎ ভুলে এলো,
কেমনে মা এম্‌নি দিনে ঘুমোই তুমি বলো ?

আত্মারামবাবুর আমদানি

শ্রীবিমল দত্ত

সেদিন সেকেণ্ড্ পিরিয়াডের ঘণ্টা বাজ্তেই আমরা বলির পাঁঠার মত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্তে আরম্ভ করলুম। আত্মারাম তর্কপঞ্চাননের ক্লাশ ছিল আমাদের বিভীষিকা। তার উপর ক'দিন থেকে আত্মারাম বাবু একটা নতুন লিক্‌লিকে বেত আনছেন সঙ্গে করে। আর সেদিন ছিল ণিজন্ত প্রকরণ পড়া।

ব্যাকরণ খুলে সকলেই ণিজন্ত প্রকরণটা আর একবার দেখে নিচ্ছি—ওই ওই বুঝি আত্মারামের চটির ফটাস্ ফটাস্ শব্দ কাণে এলো!

এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে বঙ্কু এসে বল্লে—"আত্মারাম খাঁচা ছাড়া—আত্মারাম খাঁচা ছাড়া—"

"কি হয়েছে রে"—"কি হয়েছে রে"—"কি হয়েছে রে"......

সকলে বঙ্কুকে ছেঁকে ধরলে—ফাষ্ট বয় পরেশ বল্লে—"বল্‌না কি ব্যাপার?"

বঙ্কু বল্লে "ব্যাপার আর কি"—তারপর সুর করে'—

"খাঁচার পাখী উড়ে গেছে
থুয়ে দুটো লম্বা ঠ্যাং
ড্যাড্যাং ড্যাং ড্যাড্যাং ড্যাং
ছ্যাড্যাং ড্যাং ছ্যাড্যাং ড্যাং"—

বিচ্ছু বিশেটা তার ব্যাকরণ কৌমুদীখানা "ছ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা" ক'রে ঘুরন্ত ফ্যানের ব্লেডে ছুড়ে' মারলে। বইটা দু'তিন খানা হ'য়ে ক্লাশ ঘরে ছড়িয়ে পড়্‌ল।

নরা বঙ্কুকে বল্লে "সত্যি ত' রে?"

বঙ্কু বল্লে "সত্যি মিথ্যে এখনি জান্তে পারবে। হেড্‌মাষ্টার মশাই নোটিশ লিখ্‌ছেন।"

বিশে বঙ্কুকে জিজ্ঞাসা করলে "হ্যাঁ রে ভাই আত্মারাম ত' খাঁচা ছাড়া হয়েছে—লম্বা ঠ্যাং দুটো রেখে গেল বল্‌ছিস্—সে আবার কি রে—?"

"বাঃ জানিস্ না?" দন্তপাটী বিকশিত করে' বঙ্কু বলে "বেত আর ছাতা।"

নোটিশ এলো "ক্লাশ হ'বে না—আত্মারাম বাবু অনুপস্থিত।"

আত্মারাম বাবুর আত্মহত্যা

শ্রীবিমল দত্ত

ঘণ্টেশ্বর চেয়ারে গিয়ে বসে' তার চশমা কপালে তুলে দিয়ে ব্যাকরণখানা টেবিলে চীৎপাত করে' পরেশের দিকে চেয়ে বললে "হাঁরে পরা, বলি পড়া করে' এসেছিস্ আজ ?"

পণ্ডিতের ভঙ্গীর হুবহু নকল ! ছেলেরা চেঁচিয়ে মেচিয়ে অস্থির।

বঙ্কু বল্লে, "স্যার্ আমি নিজন্ত প্রকরণ বিষয়িণী বক্তৃতা করব।" বলে ডবল বেঞ্চিতে বসে' সুরু করলে "সমাগতানাং চ্যাংড়ানাং শাখামৃগানাং

"এঃ গোলমালে যে তোমরা আমাদের স্কুল ছাড়া করবে !" বলতে বলতে ক্লাশে এসে ঢুক্লেন সেকেণ্ড পণ্ডিত। বঙ্কুর "নিজন্ত প্রকরণ বিষয়িনী বক্তৃতা" চাপা পড়ে' গেল।

সেকেণ্ড পণ্ডিতের কাছে শুনলুম আত্মারাম বাবুর হঠাৎ অন্তর্দ্ধানের আসল রহস্য। তাঁর এক কিপ্‌টে কাকী মৃত্যু শয্যায়—তিনি ছুটেছেন সেখানে যদি কিছু টাকা কড়ি মেলে বা বিষয়-সম্পত্তি। আত্মারাম বাবুর কাকা মস্ত কারবারী লোক ছিলেন। বিস্তর পয়সা কড়ি বিষয়-সম্পত্তি করে' গেল বছর মারা গেছেন। ছেলেপুলে ছিল না তাই কাকীকেই সব দিয়ে গেছিলেন। এবার আত্মারাম বাবুর চান্স্। কাল রাতে তিনি ব্যারাকপুর যাত্রা করেছেন। আজই ফেরবার কথা—রাতে তিনি বোর্ডিংয়ে খাবেন বলে গেছেন। স্কুলবাড়ীতে তিনি থাকেন আর বোর্ডিংয়ে খান।

ক্লাশে এই নিয়ে বেশ ঘোঁট্ চল্‌তে লাগল। বিশে বল্‌লে, "আহা পাক্, পাক্ সম্পত্তি টম্পত্তি পেলে যদি স্কুল ছাড়ে। নয়ত হাড়্ আমাদের ভাজা ভাজা করে' ফেল্‌লে।

পরেশ বল্লে "ধ্যেৎ স্কুলমাষ্টারি কখনো ছাড়ে—বাঁধা সত্তর টাকা মাইনে—ঐ হাড়কঞ্জুস-কিপ্‌টে বুড়ো কর্‌করে সত্তর টাকার লোভ ছাড়্‌তে পারে কখনো !"

ঘণ্টেশ্বর বল্‌লে "ঠিক্ বলেছিস্ পরেশ, ওর যা টাকার লোভ আমার মনে হয় ও মরে যাবার পরও স্বর্গ থেকে পেন্‌সন্ পাবার জন্য দরখাস্ত করবে স্কুলে।"

বঙ্কু বল্‌লে, "আমার কি মনে হয় জানিস্—কাকী কিছুতেই ওকে দেবেনা, দেবার হলে কাকাই দিয়ে যেত। ওই চিম্‌ড়ে বদ্‌মেজাজী বিট্‌লে বামুনকে আবার সম্পত্তি দেবে না কলা দেবে !" বঙ্কু দু'হাতের কলা দেখিয়ে দিলে।

তারক সুর এক কোণ থেকে বলে উঠ্‌ল—'কাকীর' সঙ্গে মেলে 'ফাঁকি'—'কাকা' যখন 'ফাঁকার' সঙ্গে মিল দিয়ে গেছেন, কাকীও কি পিছিয়ে যাবেন !"

"হিয়ার্, হিয়ার্ তাড়কাসুর—হিয়ার্ হিয়ার্ তাড়কাসুর" বলে বেঞ্চি বাজিয়ে ছেলেরা হ'ল্লা করে' উঠ্‌ল।

ছুটীর পরে খেলার মাঠে ছেলেরা বল্ পিটতে পিটতে সব কথাই ভুলে গেল। তারপর বিকালে বোর্ডিংয়ে ফিরে' চেখে চক্ষু কপালে তুলে সুপার্ বসে আছেন। সাম্‌নে এক 'টেলি'। ছেলেরা ভীড় ক'রে ধরল তাঁকে। টেলিটা আসছে আত্মারাম বাবুর কাছ থেকে। তাতে লেখা :—

To

Superintendent Pal Chowdhury Institute Boarding
Calcutta.

I die this night at Barrackpore
Atmaram.

ছেলেদের চোখও কপালে উঠ্‌ল। সর্ব্বনাশ! হয়ত আত্মারামবাবু কাকার সম্পত্তি না পেয়ে ভগ্নহৃদয়ে আত্মহত্যা করবারই মতলব করেছেন। কি সাংঘাতিক!

পরে বল্‌লে, "স্যার, এখন উপায়?"

উপায় আর কি? আজ শনিবার সব মাষ্টারই দেশে পালিয়েছেন। অবশেষে ভূগোলের নতুন মাষ্টার রতনবাবুকে আত্মারামবাবুর কাকার বাসার ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রাত্তের আগে তিনি গিয়ে হয়ত আত্মারামবাবুকে বাঁচাতে পারেন।

সুপার্ বল্‌তে লাগ্‌লেন "ওঃ তাঁর মনে এই ছিল কি করে জানব!"

ছেলেরা বারান্দায় জটলা করতে লাগ্‌ল।

বিশে বল্‌লে "আহা ঝুলে পড়ুক—ঝুলে পড়ুক—ত্'দিন জুড়োই—"

পরেশ বল্‌লে "সে কিরে তা' হ'লে ব্যাকরণ পড়াবে কে?"

বিশে বল্‌লে "ঢের ঢের ব্যাকরণ পড়াবার লোক জুটবে'খন। বাবাঃ বিভিয়ে আমাদের দেহের আর কিছু রাখেনি।"

বঙ্কু বল্‌লে "কিন্তু কিপ্‌টে পণ্ডিত টেলিগ্রাম করলে?—বিশ্বাস হয় না! হয়ত' কেউ বদ্‌মায়েসি করে' অমনি করেছে।"

"হ্যাঃ তোর এককথা—তা কে করবে? আর বুড়ো ত এখন মরিয়া। মরার আগে দমকা খরচ করলে টেলিগ্রাম করে। বাটীর অতবড় সম্পত্তিটা হাত ফস্‌কে গেল। আহা আত্মহত্যা করবে না!" পরেশ বল্লে।

ঘণ্টেশ্বর বল্লে "শুনেছি পণ্ডিত নাকি চৌদ্দ বছর বয়স থেকে ঐ সম্পত্তির দিকে চোখ দিয়ে বসে আছে।"

পরেশ বল্‌লে, "যদি রতন বাবু গিয়ে দেখেন পণ্ডিত দোদুল্যমান !"

ঘণ্টেশ্বর বল্‌লে "এক কাজ করলে হয় না—চ' আমরা যাই তাঁকে যদি বাঁচাতে পারি।"

পরেশ বল্লে "মন্দ কথা নয় তা"

বিশে বল্‌লে "কিন্তু বাবা খাল কেটে কুমীর আনছ কেন ?"

বঙ্কু বল্‌লে, "আরে ও ত এই খালেরই কুমীর।"

বিশে বল্‌লে "তা তো বটে কিন্তু যে কুমীর মরতে চলেছে তাকে আবার ক্লোরোফর্ম্ম করে' বাঁচিয়ে লাভ কি ?"

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরেশ, ঘণ্টেশ্বর, বঙ্কু আর যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতকে বাঁচাবার জন্য সেই ট্রেণেই ব্যারাকপুর যাবার মতলব করলে।

ঠিক সেই সময়ে সুপার সেখানে উপস্থিত। "ছোকরারা, তোমরা কেউ ব্যারাকপুর যেতে পারবে ? রতন বাবুকে একটা ঠিকানা দেওয়া হয়নি। আত্মারামের এক বন্ধু উকিল থাকেন ব্যারাকপুরে তিনি সেখানে উঠ্‌তে পারেন। সেখানেও খোঁজা দরকার—।"

পরেশ, ঘণ্টেশ্বর বঙ্কু ও যজ্ঞেশ্বর তাদের সঙ্কল্পের কথা জানালে। সুপার খুব খুশী হ'লেন। তারপর তিনি কিছু টাকা ওদের দিয়ে একটা ট্যাক্সি করে ষ্টেষনে যেতে বল্‌লেন।

পোঁ পোঁ শব্দে ট্যাক্সি ষ্টেষনে উপস্থিত হ'ল। টিকিট্ কেটে তারা যেই ট্রেণে উঠ্‌ল অমনি ট্রেন ছেড়ে দিলে। এই ট্রেণেই রতনবাবু ছিলেন কিন্তু সে অন্য কামরায়।

ব্যারাকপুরে পৌঁছে ওরা প্রথমে রতনবাবুকে এড়িয়ে প্লাট্ফর্ম্ম পার হ'ল তারপর গেল আত্মারামের কাকীর বাড়ী। সেখানে শুন্‌লো আত্মারাম আস্‌বার অনেক আগেই কাকী মারা গেছেন। একটা উড়ে চাকর ছাড়া বাড়ীতে কেউ নেই। সে আত্মারামবাবুর অন্য কোন সংবাদ দিতে পারলে না। শুধু বল্‌লে—তিনি কাল রাতে এসেছিলেন বটে কিন্তু তারপর কোথায় গেছেন সে জানে না।

এবার ওরা ছুট্‌লো সেই উকিল বন্ধুর বাড়ী। তিনি কিছুই জানেন না। তখন আর কি করে' তারা ! এদিক ওদিক খানিক ঘোরা ঘুরি করে ষ্টেষনে ফিরে এলো। "তাইত' আত্মারামবাবুর আত্মা সত্যিই খাঁচা ছাড়া হ'বে !"

মারুক, ধরুক আর গালাগালি করুক তবুও তাঁর জন্যে তাদের মন কেমন করতে লাগ্‌ল। ট্রেণ আসবার তখনো অনেক দেরী—। তখন রাত ৯টা—সমস্ত সন্ধ্যেটা ঘোরাঘুরি করে তারা বেশ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। ঘণ্টেশ্বর বল্লে—'চ' ওই রেস্তোরাঁ থেকে কিছু খেয়ে নিই গে। যা হ'বার তা হ'বেই।"

রেস্তোরাঁয় ঢুকে তারা অবাক্। কোণের টেবিলে বুড়ো পণ্ডিত আত্মারাম তর্কপঞ্চানন বসে বসে নিবিষ্ট মনে মুরগীর ঠ্যাং চিবুচ্ছে। দেখ্‌লে মনে হয় না এই লোকটাই রাতে আত্মহত্যা করবে।

পরেশ ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লে "বোধ হয় পটাসিয়াম্ সায়েনাইড্ মাংস দিয়ে সুস্বাদু করে' খাচ্ছে!"

বঙ্কু বল্‌লে "আহা শেষ সাধ বোধ হয় পুরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বেশী খেতে দেওয়া হ'বেনা।

ঘণ্টু চুপি চুপি বেঞ্চি ও টেবিলের পাশ দিয়ে গিয়ে আত্মারামবাবুর ডান হাত খানা ধরে' ফেললে। কি জানি টের পেলে হঠাৎ যদি কিছু করে' ফেলেন্ তারপর যজ্ঞেশ্বর ধর্‌লে বাঁ হাত। পরেশ ছুরি, কাঁটা গুলো একধারে সরিয়ে ফেলে—বঙ্কুকে বল্লে "এই একটা ট্যাক্সি ডাক্—"



পরেশ ছুরি কাঁটাগুলো সরিয়ে ফেলে বল্লে "এই একটা ট্যাক্সী ডাক—"

বঙ্কু একলাফে বাইরে চ'লে গেল।

পরেশ দোকানদারকে খাবারের দাম দিয়ে আত্মারাম পণ্ডিতকে পাঁজাকোলা করে' দোকানের বাইরে নিয়ে এলো। সিদ্ধিঙ্গে পণ্ডিত খাওয়ায় বাধা পড়ায় রেগে টং হ'য়ে তাদের শাসাতে লাগ্‌লেন "হতভাগা—গর্দ্দভ, শাখামৃগ"—আর চিংড়ি মাছের মত হাত পা ছুঁড়্‌তে লাগ্‌লেন—"এ সবের অর্থ কি? তোমরা কি চালাকি পেয়েছে?

পরেশ শুধু বল্‌তে লাগ্‌লো "স্থির হোন্ স্যার, স্থির হোন্—"

আত্মারাম বাবুর আত্মহত্যা

শ্রীবিমল দত্ত

টাক্সি এসে গেলো। চার মূর্তিমান তাঁকে জোর করে ধরে' তার মধ্যে পুরে' ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড্ ধরে' গাড়ী ছুটিয়ে দিতে বল্লো।

গাড়ীর মধ্যে সমস্ত পথটা আত্মারাম বাবু ছেলেদের শাসাতে লাগ্লেন—চাব্কে লাল কর্‌ব তোদের—গায়ের চামড়া খুলে নেব হাড় গুঁড়ো কর্‌ব মাংস দিয়ে কিমা তৈরী কর্‌ব। ...... ইত্যাদি—ইত্যাদি—"

পরেশ ঘণ্টেশ্বরের কানে কানে বল্লে "বড্ড শক্ খেয়েছেন কিনা—"

গর্জে উঠ্লেন আত্মরাম পণ্ডিত "কি খেয়েছেন? বিচ্ছু শয়তান কোথাকার—তোদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো—আণ্ডামান পাঠাবো—ছ' মাসের ভাজা চাল খাওয়াব"

কোন সন্দেহই রইল না যে তাঁর সঙ্কল্পে বাধা দেওয়ায় তিনি ক্ষেপে গেছেন।

বোর্ডিংয়ের সাম্‌নে যখন ট্যাক্সিটা থাম্‌ল তখন গভীর রাত। দরজা খুল্‌তে স্বয়ং সুপার্ ও রতনবাবু ছুটে এলেন।

আত্মারাম মোটরের দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়্লেন সুপারের ঘাড়ে "—মশাই, এই ছোঁড়াগুলো আমায় দারুণ ইন্সল্ট্ করেছে এর শাস্তি চাই—" রাগে পণ্ডিত ঠক্ ঠক্ করে' কাঁপ্‌তে লাগ্লেন। তাঁর মুখ দিয়ে আর কথা সর্‌ল না।

সুপার্ পণ্ডিতকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বল্‌লেন "স্থির হোন্ একটু স্থির হোন্—ওদের আমিই পাঠিয়েছিলাম। আপনার মত একজন লোক আত্মহত্যা কর্‌বার কথা ভাব্‌তে পারেন—তা' আমাদের ধারণার অতীত ছিল।"

ঘুরে পড়্‌তে পড়্‌তে সাম্‌লে নিয়ে আত্মারাম পণ্ডিত বল্‌লেন "আত্মহত্যা? কি বল্‌ছেন আপনি?"

সুপার্ বল্‌লেন—"আজ বিকালে যখন এই মর্ম্মে আপনার 'টেলি' পেলুম যে আপনি রাতে ব্যারাকপুরে আত্মহত্যা করবেন—তখন থেকে দুর্ভাবনায় মশাই—"

আত্মারাম পণ্ডিত বাক্যহারা হ'য়ে খানিক ফ্যাল্ফ্যাল্ করে' সুপারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বল্‌লেন "কখনই হ'তে পারে না—আমি ওরকম 'টেলি' করিনি—কৈ আনুন দেখি সেটা—"

সেটা সুপারের পকেটেই ছিল। তিনি সেটা আত্মারাম বাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

সেটা খুলেই আত্মারাম চীৎকার করে' উঠ্লেন—"আমি পোষ্ট অফিসের পিয়োনদের চাব্কে লাল কর্‌ব—এই হতভাগা টেলিগ্রাম অফিসারদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো—পোষ্ট অফিসে আগুন ধরিয়ে দেব—"

তাঁর রাগ কতক কম্‌লে সুপার জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি ?"

পণ্ডিত বল্‌লেন, "আমি আজ সন্ধ্যায় ফিরব বলে' গেছিলাম কিন্তু কাকীর সমস্ত সম্পত্তি আমার হওয়ায় সে বিষয়ে কয়েকজন লোকের পরামর্শ নেবার জন্য রাতটা ব্যারাকপুরে কাটানোই ঠিক হ'ল। তাই ভাবলাম বোর্ডিংয়ে 'টেলি' করে দেই—তাই লিখ্‌লুম।" Dine this night at Barrackpore !" আর ব্যাটারা স্বচ্ছন্দে dine এর জায়গায় die বসিয়ে দিয়েছে! আমি এর ক্ষতিপূরণ দাবী করব—জেলে পাঠাবো, ওদের ফাঁসিতে ঝোলাবো !"

আমরা সেখান থেকে সড়ে পড়্‌লুম। কি জানি ! পণ্ডিতের রোখ এখন একটু বেড়েছে কাকীর সম্পত্তি পেয়েছেন।

বিশে ঘুম থেকে উঠে বল্‌লে "কিরে, পণ্ডিত সাবাড় !"

আমরা সব কথা খুলে বল্‌লুম। ও শুনে বল্‌লে "কাল আমি ট্রান্স্‌ফার নেব—বাবা ওর এবার বিষদাঁত উঠ্‌বে।"

*** *** *** ***

সকালে খবর শুনে আমরা থ। পণ্ডিত রেসিগ্‌নেশান্ পত্র দাখিল করে' স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।

কিন্তু গেল কেন ?

সুপার বল্‌লেন "কাকীর সম্পত্তি ত' ওঁরই হ'ল এবার। সে সব দেখাশোনা করবার জন্য পণ্ডিত মশায়ের কাজ বিস্তর বেড়ে গেছে। তা ছাড়া অত বিষয়-আশয় টাকাকড়ি পেয়েছেন—আর চাক্‌রি করবার দরকার কি ?"

পণ্ডিত কেন সত্তর টাকার মায়া কাটাল তার আসল কারণ আমরা কিন্তু জানি। ব্যারাক্‌পুরের সেই রেস্তোরাঁয় মুরগীর ঠ্যাং চিবুনোর কথা পাছে ফাঁস হ'য়ে পড়ে সেই ভয়ে আত্মারাম বাবু স্কুল ছেড়ে দিলেন।



আমায় দেখে যেন চিন্‌তেই পারেন নি

বছর দুই পরে।—সিটী কলেজে পড়ি তখন। একদিন ট্রামে আত্মারামবাবুর সঙ্গে দেখা। হ্যাট্ কোট্ নেকটাই পরা অপূর্ব্ব ষ্টাইলিষ্টের চেহারা। আমায় দেখে তিনি যেন চিন্‌তে পারেন নি এমন ভাব দেখিয়ে জান্‌লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘন ঘন পাইপ্ টান্‌তে লাগ্‌লেন।



শ্রীধর

সাবুর বয়স মাত্র মোটে তের বছর। দক্ষিণ ভারতের মহীশূর ষ্টেটের এক সামান্য মাহুতের ছেলে সে। তার বাবা এখন আর বেঁচে নেই। রাজ্যের নিয়ম, মাহুতের ছেলে মাহুত হয় তাই রাজ-হাতিশালেই সাবু কাজ করে—হাতীদের দেখাশোনা তার কাজ। কিন্তু বয়সে সে ছোট্ট বলে—রাজা তাকে এখনও মাহুতের পদে প্রমোশন দেন নি। ছোট হলে হবে কি, সাবু খুব বুদ্ধিমান ও চালাক ছেলে—সে হাতী নিয়ে নানা কৌশলে তাকে চালনা করে সকলকে তাক্ লাগাতে পারে! তা'ছাড়া রাজার আস্তাবলে সহিস, কোচোয়ান, মাহুত সকলের মধ্যে সে প্রিয় হয়ে উঠেছিল তার মিষ্টি ব্যবহারে। তার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা সকলকেই কাছে টানত। কিন্তু সে ছিল গরীব তার আয়ও ছিল সামান্য। তবু একদিন রাজার হাতিশালে তার বাবার মত মাহুত হবার তার বড় আকাঙ্খা ছিল।

এখন ১৯৩৬ শালে একদিন মহীশূরের রাজ-আস্তাবলে এক বিদেশীকে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে দেখা গেল। এই ক্যামেরাম্যানটির নাম বরোডেল্। কিন্তু এই মিঃ বরোডেল্ নেহাৎ বাজে লোক ছিলেন না। লণ্ডন ফিল্ম প্রডাকসনের ইনি একজন কর্ম্মচারী। ঐ ফিল্মের এক পরিচালক রবার্ট ফ্লাহার্টির একটি ছোট দলের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছিলেন। কিন্তু নিছক বেড়াতেই আসেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিখ্যাত গল্প লেখক কিপ্‌লিঙএর (নাম শুনেছ বোধ হয়) একটি ছেলেদের বই—Toomai of the Elephants (হাতীর দলের

টুমাই) বা Elephant Boy ফিল্ম করবার। হাতীর দলের অভাব ভারতবর্ষে নেই কিন্তু টুমাইর দেখা মেলে কৈ? কিপলিঙ-এর মনের মত যে ছেলেটি সে কি কেবল কল্পনাতেই ছিল, না ভারতবর্ষে কোথাও না কোথাও সে সত্যিকারের আছে? অনেক খুঁজে পেতে—নেই, এ ধারণা হোল ফ্লাহার্টের দলের। এই সময়ে মহীশূরে রাজ আস্তাবলে মিঃ বরোডেলের দেখা মিলল ছোট্ট সাবুর সঙ্গে। জহুরী জহরকে চেনে। তার কালো বড় বড় চোখগুলি, তার সুন্দর হাসিটুকু, তার ছিপছিপে দেহের গড়ন তখনই তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলল। বুঝলেন ক্যামেরায় তোলবার মতই এ ছেলের অবয়ব। যাক, এতদিনে তাঁদের খোঁজ বুঝি শেষ হোল। হাতী চালনা করতে সাবু কত ওস্তাদ বরোডেলের দেখতে দেরী হোল না। হবার কথা নয়, সে রাজ আস্তাবলের মাহুতের ছেলে। তাহলে কিপলিঙ এর বইর টুমাইকে জীবন্ত পাওয়া গেল!

এবার হবে তার অভিনয় শিক্ষার পালা। কিন্তু অভিনয় কোথায়—এতো যেন তার সত্যিকারের নিজেরই কাজ। টুমাইর সঙ্গে ভাব জমাতে তার দেরী হোল না। টুমাইর অংশ গ্রহণ করে সে আর টুমাই হয়ে গেল এক, হয়ে গেল কিপলিঙ এর Elephant Boy। সে আরো নিজের পরিচয় দিলে এই বিদেশী ফিল্ম দলটির কাছে। তারা এই ছোট্ট ছেলেটির কাণ্ড দেখে যার পর নাই আশ্চর্য্য হোল। একটা কোন দৃশ্যের কথা ফ্লাহার্টি বুঝিয়ে বলেন—সাবু হুবহু তা অভিনয় করে' নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে দেয়। কিন্তু সে কত সরল,—হয়ত কোন দৃশ্যে ঠিক বইর লেখার মত করে হাতীদের চালনা করতে হবে—সে বলে দিলে তা হবার নয়। হাতীদের সে চেনে,—এবং ঐ বিরাট প্রাণীগুলির প্রতি তার যত্ন ও ভালবাসার অন্ত নেই। কোথাও হয়ত হাতীদের সঙ্গে সত্যিকারের একটু দুর্ব্যবহার করতে হবে সাবু তাতে মোটেই রাজী নয়। কিন্তু অভিনয়ের মধ্যে যেখানে তার হাতির বিপদের কথা লেখা আছে, সাবু সেটি টপ করে বুঝে নেয়, সত্যি তার যেন টুমাইর মতই ভয় করে। বোকা হাতি নিজের দোষে না বিপদে পড়ে! হাতিকে টুমাই সাবধান করে সাবুও ঠিক তেমনি করে হাতিকে সাবধান করে দেয়। এক রাত্রে টুমাই তার হাতিকে নিয়ে চলল জঙ্গলে। বিরাট দল নিয়ে কালানাগ টুমাইর সঙ্গে যোগ দিল। রাস্তায় টুমাই তখন অভিযানের চিহ্ন ধরে তাদের নিয়ে পৌঁছল হাতীদের বিরাট আস্তানায়। এমনি করে বন্ত বন্য হাতীরা পড়ল ধরা। টুমাই মস্ত শিকারীর জয়তিলক পরল। সাবু শুধু পাকা মাহুত বলেই পরিচিত হোল না—হোল পাকা শিকারী, হোল পাকা ফিল্ম আর্টিষ্ট!

সাবুর ফিল্ম বিজয়
শ্রীধর

লণ্ডনে যখন তার বইটি প্রথম দেখান হোল—তখন চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। কিন্তু কে এই ভারতবর্ষীয় ছেলেটি? সকলেই জিজ্ঞাসা করে। সকলে তাকে অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অনেকে আবার ভাবলে এইটুকু ছেলেকে এত প্রশংসা দেওয়াটা ভাল নয়—বিগড়ে যেতে পারে। কিন্তু সাবু সে ছেলেই নয়। সকলকেই সে নিজের মিষ্ট ব্যবহারে চমৎকৃত করে দিলে। তাদের ভাবনার কিছু নেই। লণ্ডনে সাবু শীঘ্রই পরিচিত হয়ে পড়ল—হবার কথাই। এবং সে ইতিমধ্যে মস্ত এক পর্য্যটকও হয়ে গেল, নানা দেশ সে নির্ভয়ে বেড়িয়ে বেড়াল।

ছ'মাসের মধ্যেই ছোট্ট সাবু চমৎকার ইংরিজি লিখতে ও বলতে শিখে ফেললে। কিন্তু এই সময়টুকু তাকে কি পরিশ্রমই করতে হয়েছে। ছ'মাসে ইংরিজি লেখা সোজা ব্যাপার নয়। যাই হোক নিজের দেশ ছেড়ে যেতে হলেও ইংলণ্ড তার নাকি মন্দ লাগেনি। স্পাড্ তার খুব ভাল লাগে, মাটির নীচে রেলে চড়ে ভ্রমণ করতে তার ভারী পছন্দ। তারপর সেখানে সে ঘোড়ায় চড়ে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যায়, ইংলণ্ডের অলিগলিতে সাইকেল নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। ফুটবল নাকি তার খুব ভাল লাগে—বড় হয়ে সে ফুটবল খেলোয়াড় হবে তার ইচ্ছে। ইংলণ্ডের চিড়িয়াখানাগুলি ইতিমধ্যেই সে দেখে ফেলেছে। একদিন লণ্ডন চিড়িয়াখানায় একটা হাতি তাকে শুঁড় দিয়ে পিঠে তুলে একটু বেড়িয়ে নিয়ে এলো। সেদিন সাবু হেসে বলেছিল,—তোমাদের দেশে জুতো পরে সব সময় চলা ফেরা করতে হয়—দেখতো, হাতির ওপর উঠতে আমার মনে হোল যেন পিছলে যাচ্ছি। আমাদের দেশে আমরা জুতো পরি না—খালি পায়ে ওঠানামা করতে বেশ সুবিধে হয়। একটা যে কোন হাতিকে দেখবামাত্র সাবু বলতে পারে, হাতিটা দুষ্ট না শান্ত। ইংলণ্ডে ডেনহাম ষ্টুডিয়োতে একটা হাতির বাচ্চা তার খুব প্রিয়, Elephant Boy তে সে ঐ হাতির বাচ্চাটি নিয়ে অনেক খেলা দেখিয়েছে।

তোমরা অনেকেই হলিউডের ফ্রেডি বার্থের নাম শুনেছ, শুনেছ মিকি রুনি, জ্যাকি কুপারদের গল্প—তাদের ছবি দেখেছ। কিন্তু এবার দেখলে আমাদের সাবুকে—হলিউডের ফ্রেডিদের চেয়ে কিছু সে কম যায় না—যায় কি? তোমরা অনেকেই তার Elephant Boy দেখে আশ্চর্য্য হয়ে থাকবে। এই সেদিন ভেনিসে আন্তর্জ্জাতিক ফিল্ম প্রদর্শনীতে তার বইটি দেখে সকলে চমৎকৃত হয়েছে। একদিন যে ছোট্ট ছেলেটি হাতিশালে সামান্য কাজ করতো একদিন যখন তাকে হাতিশালের বাইরে কেউ চিনতো না-সে ছেলে আজ পৃথিবীর মধ্যে

পরিচিত হয়ে গৌরবের জয়টীকা পরেছে। আজ সে ছোট্ট সাবু ফিল্ম জগতের Elephant Boy. সকলের মুখে মুখে তার কথা—Elephant Boy—Elephant Boy। আমরা আজ তার কৃতিত্বে গর্ব্ব অনুভব করছি। তোমরা শুনে সুখী হবে সাবু আর একটি ফিল্মে অভিনয় করবে—না না অভিনয় করবে নয়—সে সত্যিকারের জীবন্ত ছবি দেখাবে।

এর পর সাবু একদিন দেশে ফিরবে। ফিরে এসে মস্ত অভিনন্দন পাবে। পাবে হাজার ফুলের মালা। হাজার লোক দেখতে ছুটবে। আমাদের দিশী ফিল্ম কোম্পানীরা তাকে হয়ত নিতে চাইবে। দেশে থাকতে তারা তাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু সাবু তারপর আর অভিনয় করবে কি? না নিজের দেশে ফিরে গিয়ে সে রাজার বড় মাহুতের পদ নেবে—নিয়ে হাতির দলের নেতা হয়ে তাদের মধ্যে নিজের মনের মত বাস করবে?





শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এ সংবাদ তাহলে কোন দেশ থেকে আসছে? অক্ষরগুলো ইংরাজির, কিন্তু কোন কোডে তার মানেই বা পাওয়া যায় না কেন? অক্ষরগুলো পর পর সাজালে দুটো ইংরাজি কথা প্রথমতঃ হয়ে বটে। বি, এ, এন, জি—ব্যাং, তারপরে এল, এ, আই, ডি—লেড্, কিন্তু তারপরেরটুকু দিয়ে কোন জানিত কথাই হয় না। এ, কে, সি, এচ্, আই,—অ্যাকচি; এ আবার কি ভাষা!

তাছাড়া আর একটা বিশেষ রহস্যময় ব্যাপার এই যে পৃথিবীর আর কোন বেতারের ঢেউ সেখানকার আকাশের অদৃশ্য আবরণ ভেদ করে এখানে এ পর্যান্ত পৌছোয়নি, শুধু এই সংবাদটিই কেমন করে সমস্ত বাধা জয় করে এল।

নাঃ স্টাইনকে এ খবরটা না দিলেই নয়। সমর সেই জন্যেই উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু তার দরকার হল না। সেই সময়ে ষ্টাইন ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে—কি খবর! সাড়া শব্দ কিছু পেলে?"

সমর কাণ থেকে যন্ত্র খুলে নিয়ে—উত্তেজিতভাবে যা ঘটেছে বুঝিয়ে দিতেই স্টাইন নিজে এসে ব্যস্তভাবে বেতার-যন্ত্রে বসল।

কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে সমস্ত কোড বই ঘেঁটে তাকেও হার স্বীকার করতে হল।

"আশ্চর্য্য ব্যাপার কোন মাথামুণ্ডুই ত এ সংবাদের হয় না!"

'পৃথিবীর কোন জাতের কোন গোপান 'কোড্' এটা নয় ত?'—সমর জিজ্ঞাসা করলে

ভুরু কুঁচকে স্টাইন বল্লে আমার তা মনে হয় না। যুদ্ধের সময় ছাড়া এরকম 'কোড্' কেউ বড় ব্যবহার করে না। তা ছাড়া গোপন কোড ব্যবহার করে কেউ কোথাও সংবাদ পাঠালে ওই কটা কথাই বারবার আওড়াবে কেন আরো অনেক কথা তা'হলে পাওয়া যেত!"

তারপর কয়েকদিন কেটে গেছে কিন্তু বেতার-বার্ত্তার রহস্যের কোন মীমাংসাই হয় নি। সমর ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার বেতার-যন্ত্রে সেই সাড়া পেয়েছে, আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যেকবার সেই একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কোন সংবাদ নেই, একঘেয়েভাবে সেই একই কথা ফিরে ফিরে কে কাকে কি জন্যে জানাতে চায় তা সমরের কাছে অবোধ্য।

সমর অবশ্য কিছুদিন ধরে বেতার-ঘরে বসবার বেশী সময়ও পাচ্ছে না। স্টাইন তাকে নানা কাজে এমনভাবে লাগিয়ে রাখে যে বেতার-ঘরে যাবার আর তার ফুরসৎই মেলে না। বেতার-বার্ত্তার রহস্য পাছে সমর তার আগে ভেদ করে ফেলে সেই ভয়ে স্টাইনের এই কারসাজি কিনা কে জানে!

কিন্তু বেতার-বার্ত্তার রহস্য ভেদ শেষ পর্য্যন্ত সমরের দ্বারাই হল। হ'ল অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে, বেতার-ঘরে নয় তার নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

পৃথিবী থেকে দূরে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই ঘুমের প্রয়োজন তাদের কমে এসেছে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা অন্তর একবার ঘণ্টা কয়েকের ঘুমেই কাজ হয়ে যায়।

সেদিন কিন্তু পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টার পর শুতে গিয়েও সমরের ঘুম কিছুতেই আসছিল না। শুয়ে শুয়ে নানান কথার মধ্যে বেতার-বার্ত্তার কথাও সে ভাবছিল। বেতার-বার্ত্তায় যে অক্ষর ও যে কথাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি মনের মধ্যে আওড়াতে আওড়াতে হঠাৎ সে চমকে উঠে বসল। এ কয়দিনে বিনা মাধ্যাকর্ষণে চলা-ফেরা বেশ অভ্যস্ত না হয়ে গেলে হয়ত সে কামরার ছাদে মাথা ঠুকেই মরত বেগ সামলাতে না পেরে।

তার উঠে বসার কারণ অবশ্য ছিল। এতদিন যে দুর্ভেদ্য রহস্যের বন্ধ দরজায় সে মাথা ঠুকে মরেছে তার সমাধান এমনভাবে হ'তে পারে কে জানত!

সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে সমর টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বার করে বেতারে পাওয়া অক্ষরগুলি তাতে লিখে ফেল্লে! নাঃ এবারে কোন সন্দেহ আর তার নেই। অক্ষর সবশুদ্ধ মাত্র তেরটি। তা পর পর সাজিয়ে ইংরাজির Bang ও Laid এই দুটি কথা সে তৈরী করেছিল, Akchir এবং সমস্ত কথার মানে তবু পায় নি। মানে কেমন করে পাবে! তার আসলে অক্ষর সাজানই যে ভুল হয়েছে। হঠাৎ মাথায় আপনা থেকে না খেলে গেলে এ ভুল চেষ্টা করে ভাঙতে সে কখনই পারত না। সমর এখন অক্ষরগুলি অন্য ভাবে সাজিয়ে ফেলে কাগজের ওপর, অক্ষরগুলো এখন দাঁড়ায় এই রকম—Banglai Dakchi।

কথাটার তাৎপর্য্য বোঝবার পর সমরের পক্ষে এক মুহূর্ত্ত দেরী করা অসম্ভব। তৎক্ষণাৎ সে কামরার দরজা খুলে—বেতার-ঘরের দিকে ছুটল।

যেখানেই যাক অজয়ই যে ঐ বেতার-সংবাদ পাঠাচ্ছে: আর স্টাইন যাতে ধরতে না পারে এবং একা

সমরই যাতে এ বার্ত্তার মর্ম্ম বোঝে সে জন্যে যে ইংরাজি অক্ষরে বাংলা কথা সে ব্যবহার করছে এটুকু বুঝে তখন তার উত্তেজনার আর সীমা নেই।

অজয়দের অন্তর্ধানের রহস্য এইবার সে জানতে পারবে। হয়ত তাদের উদ্ধার করবার উপায়ও হয়ে যেতে পারে।

সে নেহাৎ নির্ব্বোধ, নইলে অনেক আগেই অবশ্য তাদের পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান হতে পারত। অজয় ত কবে থেকে এ বেতার-ডাক পাঠাচ্ছে। সে শুধু মূর্খের মত তার মানে বুঝতে পারেনি বলেই এত সময় বৃথা নষ্ট হয়েছে।

বেতার-ঘরে সমরকে অবশ্য একটু সন্তর্পণেই ঢুকতে হয়। স্টাইনে ঘুনাক্ষরে একবার ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলে আর রক্ষা নেই। অজয়দের সঙ্গে যোগাযোগের সব আশা তাহলে নির্মূল হবে। স্টাইন কিছু সন্দেহ করবার আগেই তার কাজ হাসিল করা চাই।

সৌভাগ্যের বিষয় স্টাইন তখন কন্ট্রোল রুমে। সমর বিনা বাধায় বেতার যন্ত্রে গিয়ে বসে। হয়ত বহুক্ষণ তাকে সেখানে অপেক্ষা করতে হবে; বহুকাল ধরে ডাক পাঠান সত্ত্বেও কোন সাড়া না পেয়ে অজয় হতাশ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত সংবাদ পাঠান হয়ত বন্ধই করে দেবে, এ সমস্ত ভেবে গোড়ায়, সমরের একটু ভয়ই পেয়েছিল কিন্তু ভয় অমূলক।

অল্প খানিকক্ষণ বসে থাকবার পরই আবার সেই ডাক এল। সমর তখন আর ধৈর্য্য ধরতে পারছে না। অজয়ের সংবাদ পাঠান শেষ হবার আগেই সে সাড়া দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি অজয়? আমি সমর জিজ্ঞাসা করছি।

তৎক্ষণাৎ উত্তর এল—হ্যাঁ আমি অজয়, প্রায় এক হপ্তা ধরে তোমায় ডাকছি।

এবার পরস্পরের খোঁজ পাবার আনন্দে খানিকক্ষণ দুই বন্ধুর মধ্যে বেতারে যে কথাবার্ত্তা চলল তার কোন মাথামুণ্ডু হয় না।

প্রথম আনন্দের উচ্ছাস কাটিয়ে ওঠার পর সমরের হুঁস হ'ল আসল কোন কথাই এখনো জিজ্ঞাসা করা হয়নি। অথচ সময় অত্যন্ত মূল্যবান। যে কোন মুহূর্ত্তে স্টাইন এসে পড়তে পারে। তখন কোন কথাই আর জানা যাবে না। অজয়দের উদ্ধার কি করে হতে পারে সে পরামর্শ করবার সুযোগ আর নাও মিলতে পারে।

ব্যস্তভাবে সে এবার জিজ্ঞাসা করলে—"হাউই জাহাজের কোথায় তুমি আছ? তোমার সঙ্গে কি ডাঃ ক্রল আছেন?

ডাঃ ক্রল আমার সঙ্গেই আছেন। কিন্তু হাউই জাহাজে আমরা নেই।"

সমর অত্যন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তার মানে বুঝতে পারলাম না। হাউই জাহাজের কোন জায়গায় নেই ত আছ কোথায়!" কিন্তু উত্তর শোনা আর তার ভাগ্যে হল না। সামান্য একটা শব্দে সমর হঠাৎ চমকে পিছন ফিরে দেখতে পেল স্টাইন কখন অজান্তে তার ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখে ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি, চোখে নিষ্ঠুর দৃষ্টি।

"আপনার উৎসাহ দেখে খুসী হলাম মিঃ রায়, দেখছি, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে আপনি বিশ্রাম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পেছ পাও নন। কিন্তু অমন ব্যাকুল ভাবে কোথায় সংবাদ পাঠাচ্ছিলেন? পৃথিবীতে আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছিলেন না ত?"

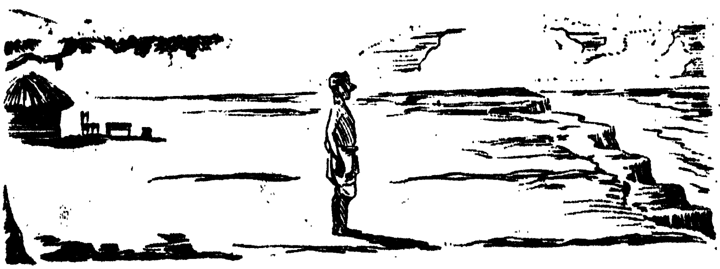
অত্যন্ত কুৎসিৎ ভাবে এবার স্টাইন হেসে উঠল। সে হাসিতে রাগে সমস্ত শরীর রী রী করে ওঠে। কিন্তু রাগের সময় তখন নয়। নিজেকে চেষ্টা করে সামলে নিয়ে সমর তার মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করলে, সত্যিই, সে কিছু জানতে পেরেছে কিনা, এবং জানলেও কতখানি জেনেছে?

স্টাইনের মুখ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা গেলনা তবু সাহসে ভর করে সমর মুখে একটু হাসি টানবার চেষ্টা করে বল্লে, "না নালিশ কার কাছে করব! এই অদ্ভুত বেতার সংবাদটা নিয়ে কদিন ধরেই ভাবছিলাম। আজ মনে হল পাল্টা কোন সাড়া আমাদের জাহাজ থেকে একবার দিয়ে দেখতে দোষ কি! তাই উঠে এসেছিলাম।

অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকিয়ে স্টাইন বল্লে—"তাই নাকি! ভালো ভালো! কিন্তু ভবিষ্যতে আমার অজান্তে এ রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবার চেষ্টা আর করবেন না,—করলে হয়ত ফল সাঙ্ঘাতিক দাঁড়াতে পারে।"

স্টাইন তেমনি ভাবে আবার হাসতে লাগল, কোন রকমে নিজের রাগ দমন করে মুখ রাঙা করে সমর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমশঃ





নিদুলী-মন্ত্র

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বরাবর দেখা যায় যতই কেন দুষ্টু ছেলে হোকনা, মায়ের হাতের মৃদু চাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে—"খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো" শুনতে শুনতে আপনি তাদের চোখ ঢুলে আসে ; তারপর দেশে বর্গী এলে যে কি দুর্ঘটনা ঘটে তা তারা জানতেও পারেনা—তার আগেই ঘুম-নদীর পাড়ে পাড়ি জমায়। এখনকার ছেলেদের ঘুম পাড়াতে বসে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে মায়েদের হাতে কড়া পড়ে যায়, বাহান্নবার "খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো". গাইতে গাইতে নিজের চোখ ঢুলে আসে—কিন্তু দস্যি ছেলের চোখে ঘুম নেই ! উল্টে "বর্গী" কাদের বলে ? খাজনা আবার কি ?"—এই সমস্ত নানারকম ছিষ্টি ছাড়া প্রশ্ন তুলে আবোল তাবোল বকিয়ে মাকে পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

সাবেক কালের ছেলে ভুলোনো ছড়া আর ঘুম পাড়ানি গান এখনকার ছেলেরা কানেও তোলে না।. দেখে শুনে দস্যি ছেলের মায়েরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছে। দুষ্ট ছেলেরা ঘুমোয়ও না পাড়াও জুড়োয় না। তাদের দাপটে পাড়ার লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। পথে ঘাটে দালানে দাওয়ায় সবারই মুখে ঐ এক কথা—"ছেলে যদি না ঘুমোয় তো পাড়া জুড়োয় কেমন করে ?"

দেশ বিদেশের যত কবি উঠে পড়ে লাগলেন ঘুমপাড়ানি ছড়া বাঁধবার জন্যে। বড় বড় মহা মহা কবি, ভারি ভারি মহা মহা সব কাব্য লিখেছেন, দেশ বিদেশ থেকে জমকালো রকমের উপাধি খেতাব পেয়েছেন, তাঁরা সব কোমর বেঁধে লাগলেন ছেলে ভুলোনো ছড়া লিখতে। কেউবা লিখলেন টানা টানা মন্দাক্রান্তা ছন্দে, কেউবা লিখলেন গুরুগম্ভীর শার্দ্দুল-বিক্রীড়িত

ছন্দে, কেউবা চতুষ্পদী, কেউ আওড়ালেন ফার্শী বয়েৎ, কেউবা ভাঁজলেন ওস্তাদি ঠুংরি! পুঁথির উপর পুঁথি জড় হলো—কিন্তু তার মধ্যে একটি ছড়া শুনেও ছেলের দল শান্ত হলো না। উল্টে দুষ্টু ছেলের পাল পুঁথি-পত্তর চশমা কলম ইত্যাদি লুকিয়ে রেখে কবির দলকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লো।

সবাই বল্লে "বাপু হে, এই তিন যুগ ধরে ক্রমাগতই শুনে আসছি—চাঁদের আলো, দখ্‌নে বাতাস, ফুলের গন্ধ আর কোকিল পক্ষীর ডাক—শুনে শুনে আমাদেরই কান ঝালাপালা হয়ে গেল। এতে কি আর ছেলে ভোলে রে বাপু!"

কবির দল মুখ চুপ করে ফিরে যায়। তাদের দুর্দ্দশার আর অন্ত নেই। রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ায়। কবিতা শোনা তো দূরের কথা কেউ আর তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কারো হাতে পায়ে ধরে বিনি পয়সায় দুটো কবিতা শোনাতে গেলে, তারা বলে "থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে! একটা চার বছরের খোকাকে ভোলাতে পারনা—আমাকে এসেছ কবিতা শুনিয়ে ধাপ্পাবাজি দিতে!"

কি আর করে! পেটের দায়ে কোন কোন কবিকে কবিতা লেখা ছেড়ে মাসিক পাঁচ টাকা মাইনেও মুদির দোকানে হিসাবের খাতা লিখতে হয়। কবি-প্রতিভার এর চেয়ে বড় দুর্দ্দশা আর কি হতে পারে। লজ্জায় অপমানে কবির দল লোক সমাজে আর মুখ দেখাতে পারে না।

ভারি মুস্কিলো পড়লো যত কবির দল। এর একটা বিহিত না করলে আর চলে না। তখুনি চাঁদা তুলে প্রকাণ্ড এক সভার আয়োজন করা হল—"কবি-দুর্গতি ঘোচনী সভা!" দেশ বিদেশের যত কবি সেখানে এসে জড় হলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন—স্বয়ং কবিগুরু!

কবিগুরু প্রকাণ্ড এক বক্তৃতা দিয়ে বল্লেন—"সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চার যুগ ধরে আমরা কাব্য শুনিয়ে লোকদের ভুলিয়ে রেখেছি। আমরা যা শুনিয়েছি সুবোধ বালকটির মত তারা তাই শুনেছে—কখনো টু শব্দটি করেনি। কিন্তু আজ একি ঘোর কলি এসে উপস্থিত হলো—আমাদের কবিতা কেউ কানেও তোলে না। কতকগুলো অর্ব্বাচীন চ্যাংড়া ছোঁড়ার দাপটে আমাদের এতদিনকার পশার প্রতিপত্তি সমস্তই বুঝি রসাতলে তলিয়ে যায়। বন্ধুগণ আজ আমাদের এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে, চিরদিনের ঝগড়া ঝাঁটি ভুলে গিয়ে, আমরা সবাই মিলে এক জোটে এর একটা বিহিত করি—নচেৎ আমাদের মান সম্ভ্রম কিছুই থাকে না।"

নিতুলী-মন্ত্র

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সভাপতির বক্তৃতা শেষ হলো। একে একে দেশ-বিদেশের নামজাদা কবিরা সব বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। ছেলে ভুলোনা ছড়ার আসল তাৎপর্য্য কি? কোথা থেকে কেমন করে এর উৎপত্তি? ছড়ার মধ্যে কি কি থাকলে দস্যি ছেলে শান্ত হয়? ছড়াগুলো কোন ছন্দে বাঁধা? ঠিক কোন সুরে কোন মাত্রায় গাইতে পারলে দুষ্টু ছেলের চোখ দুটো আপনি ঢুলে আসবে?

এই রকম নানা সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম বিষয়ে নিয়ে যখন তুমুল তর্ক বিতর্ক চলেছে, কবিদের টাক টিকে আর বাব্‌রি চুলওয়ালা মাথা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ দুলছে—ঠিক সেই সময় সুরুৎ করে একটা লোক সবার অজান্তে সভাস্থলে এসে ঢুকে পড়লো!

লোকটার চেহারা মোটেই কবিদের মত নয়। বেঁটে খাটো রোগা চেহারা। মাথার চুলগুলো কদম ছাঁটা। থ্যাবড়া নাকের দুপাশে ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো চোখের দৃষ্টি যেন খঞ্জন পাখীর মত সারা সভাটার মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে।

সবাই তখন তুমুল তর্ক নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে প্রথমটা তাকে কেউ লক্ষ্যও করেনি। হঠাৎ কবিগুরুর নজর পড়লো তার উপর। পাশের একজন কবিকে চুপি চুপি ডেকে বল্লে—"দেখ তো হে, ও লোকটাকে তো ঠিক কবি বলে বোধ হচ্ছে না। ডাকে তো ওকে ইদিকে। দেখি কি চায়?"

লোকটা যখন কবিগুরুর সামনে এসে দাঁড়ালো তখন সভা সুদ্ধু লোকের নজর গিয়ে পড়লো তার উপর। হঠাৎ এত লোকের দৃষ্টির সামনে পড়ে লোকটা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। কবিগুরুর পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা পেন্নাম করেই, চট্‌ করে একপাশে সরে পড়বার মতলব করছিল। কবিগুরু খপ্‌ করে তার একটা হাত চেপে ধরে বল্লেন—"কি হে বাপু, এখানে কি মনে করে?"

লোকটা একটা ঢোঁক গিলে, আমতা আমতা করে বল্লে—"আজ্ঞে না কিছু মনে করে নয়। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম কিনা যেতে যেতে দেখলুম বিস্তর লোক জমায়েৎ হয়েছে। ভাবলুম, বোধ করি গীতা পাঠ-টাঠ কিছু একটা হচ্ছে। তাই একবার ঢুকে দেখলুম। আমার বড়ই অপরাধ হয়ে গেছে। এখন ছাড়ান দ্যান—আমি বিদায় হই!"

কবিগুরু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"সে কি? আজকের দিনে এমন লোকও আছে নাকি যে ভীড় ঠেলে কবিদের কাছে আসে কাব্য আলোচনা শুনতে? কেন বাপু তোমার কি জানা নেই যে লোক সমাজ আমাদের আজ একঘরে করেছে?"

লোকটা একটু মুচকে হেসে বল্লে "আজ্ঞে আমিও তো একঘরে!"

কবিগুরু আরো আশ্চর্য্য বল্লেন—"সে কি? তুমি কি কবি নাকি?"

—"আজ্ঞে না, কবি নই!"

—"তবে?"

"—আজ্ঞে আমি বেচারাম—নিবাস—"

কবিগুরু বাধা দিয়ে বল্লেন—"দেখ বাপু, তোমার নাম যখন বেচারাম, তখন পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি কবি নও। তবু লোক সমাজ তোমায় একঘরে করে কোন্ বিচারে?"

বেচারাম যেন ভারি দুঃখিত এমনি ভান করে কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্লে—"আজ্ঞে আমার কপাল!"

কবিগুরু গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"তা বটে,—কপালের লিখন! সে তো আর খণ্ডন হতে পারে না। কিন্তু বাপু বিধাতা তো তোমার কপালে কাব্য রচনার দুর্ভাগ্য লেখেন নি—তবু তোমাকে একঘরে করে কোন অধিকারে?

বেচারাম দুই হাত উল্টে বল্লে—"আজ্ঞে ঐ যে বল্লুম—গ্রহের ফের!"

কবিগুরু বল্লেন—"তা বটে—গ্রহের ফের! তা বাপু গ্রহাচার্য্য যদি কুপিত হন তো একটা স্বস্ত্যেন করালেই পারো?

বেচারাম যেন একটা মস্ত হদিস্ পেলো এমনি মুখের ভাব করে কবিগুরুর পায়ের কাছে ঢিপ্ করে আর একটা পেন্নাম ঠুঁকে বল্লে—"যে আজ্ঞে! তাই করি গে—"বলেই সে সট্ করে একপাশে সরে পড়তে চায়, কবিগুরু খপ্ করে তার একটা হাত চেপে ধরে বল্লেন—"রোস বাপু তুমি লোকটি কে, কি কর?—তা তো কিছুই জানা হোল না!"

বেচারাম হাল ছেড়ে দিয়ে ঘাড় হেঁট করে বল্লে—"আজ্ঞে একটা কথা জিগ্যেস করবো—অপরাধ নেবেন না তো?

কবিগুরু বল্লেন—কি কথা?"

—"আজ্ঞে আপনাদের কি সবাই একঘরে করেছে?

—"হাঁ সবাই!"

—"ধোপা নাপিত? পাইক পেয়াদা! দারোগা-মুন্সী—সবাই!"

—"হ্যাঁ হে বাপু—সবাই!"

শুনে বেচারাম হঠাৎ খুব উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো—"তবে আর ভয় কিসের?"

কবিগুরু বল্লেন—"না না, ভয় কিসের? তবে ভারি লজ্জা, ভারি অপমান!"

বেচারাম বল্লে—"তা হোক্, স্বয়ং দারোগাই যখন আপনাদের একঘরে করেছে—তখন আর ভাবনা কি ?"

লোকটার কথা শুনে হঠাৎ কবিগুরুর কেমন সন্দেহ হোলো। ভুরু কুঁচকিয়ে বল্লেন—"দেখ বাপু, ভণিতা ছেড়ে পষ্টাপষ্টি বল্ দেখি, তুমি লোকটি কে আর কি করা হয় ?"

বেচারাম নির্লজ্জের মত এক গাল হেসে বল্লে—"আজ্ঞে যাকে বলে বড় বিদ্যে—সেই বিদ্যে ভাঙ্গিয়ে খাই !"

—"অর্থাৎ !"

—"অর্থাৎ কিছু হাত সাফায়ের কাজ শিখেছি, তারই জোরে টাকাটা সিকেটা যখন যা পাই তাতেই দিন চলে যায় !"

কবিগুরু বল্লেন—"বটে, তুমি তা হলে চোর ? চুরি কর ?

বেচারাম জোড় হাতে একপাশে মাথা হেলিয়ে বল্লে—"আজ্ঞে হাঁ—ছিচরণের আশীর্ব্বাদে !"

দেখে শুনে সভসুদ্ধু লোকের তো চক্ষু স্থির ! কী সর্ব্বনাশ ! স্বয়ং কবিগুরুও প্রথমটা আঁৎকে উঠে দুহাত পিছিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে হঠাৎ কি মনে করে এগিয়ে এসে বেচারামের পিঠ চাপড়িয়ে বল্লেন—"বেশ বেশ ! তোমার দেখা পেয়ে ভারি আনন্দিত হলুম !"

বেচারাম যেন ভারি লজ্জা পেয়েছে এমনি ভাবে হাঁটুর নীচে দুই হাত জোড় করে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। কবিগুরু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লেন—"দেখ বাপু, আমাদের একটি উপকার তোমাকে করতে হবে। আমরা বড়ই বিপদে পড়েছি—এ বিপদ থেকে এক মাত্র তুমিই আমাদের রক্ষে করতে পার !"

বেচারাম বল্লে—"কি করতে হবে বলুন ! কারো ঘরে সিঁদ দিতে হবে ?"

কবিগুরু জিব কেটে বল্লেন—"না না সিঁদ নয়। আমাদের ঐ মন্ত্রটি দান করতে হবে ?"

—"কিসের মন্তর ?"

—"ঐ চুরি করতে যাবার আগে যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করলে সমস্ত বিশ্ব ঘুমিয়ে পড়ে—সেই নিচুলী মন্ত্রটি !"

—আজ্ঞে সে মন্তর নিয়ে আপনারা কি করবেন ? চুরি করতে যাবেন নাকি ?"

—"না হে না চুরি নয়। সেই মন্ত্র ভেঙ্গে আমরা নতুন করে ঘুম পাড়ানি গান বাঁধবো—তাই শুনে ঘুমোবে যত দস্যি ছেলের দল, তবে জুড়োবে পাড়া, তবে রক্ষে হবে কবিদের মুখ।"

বেচারাম খানিক ভেবে চিন্তে বল্লে—"ঠাকুরদ্দার মুখে শুনেছিলুম বটে তারও ঠাকুর্দ্দা নাকি কী একটা মন্তর আওড়ে হাত সাফায়ের কাজে বার হতেন !"

কবিগুরু ভারি উৎসাহিত হয়ে বল্লেন—"ঠিক্ ঠিক্ ! সেই মন্ত্রটিই তো আমরা চাই !"

বেচারাম বল্লে—"আজ্ঞে সে তো বহুদিনের কথা। সমস্ত মন্তরটা আমার মনেও নেই। সেটুকু আছে—"

কবিগুরু আরো উৎসাহিত হয়ে বল্লেন—"তা হোক্, সেইটুকু—সেইটুকুতেই আমাদের কাজ চলে যাবে !"

বেচারাম বল্লে—"আজ্ঞে সভার মধ্যিখানে এত লোকের মাঝে চীৎকার করে মন্তর আওড়াব ? সমস্ত গুণ যে মাটি হয়ে যাবে !"

কবিগুরু বল্লেন—"তবে তুমি আমার কানে কানেই বল !"

বেচারাম কবিগুরুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে মন্ত্র দিয়ে সভা ছেড়ে বিদায় নিলো। কবিগুরু দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মনে মনে মন্তর জপ করতে লাগলেন। সভা সুদ্ধ লোক একদৃষ্টে কবিগুরুর দিকে তাকিয়ে রইলো—আশ্চর্য্য নিছুলি মন্ত্র ভেঙ্গে কবিগুরু নূতন করে কি ঘুম পাড়ানো গান বাঁধেন শোনবার আশায়।

অনেকক্ষণ কেটে গেল—কবিগুরু মাথা হেঁট করে কেবলই বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়ে যাচ্ছেন। সভার লোক ক্রমশঃ অধীর হয়ে উঠতে লাগলো।

অনেকক্ষণ বাদে কবিগুরু মাথা তুলে বল্লেন—"লোকটা খাঁটী চোর তো হে ?

সভার লোক নির্ব্বাক—এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো !

কবিগুরু দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বল্লেন—"মন্তরটাকে তো খাঁটি বলেই বোধ হচ্ছে— আওড়াতে আওড়াতে আমার নিজের চোখ ঢুলে আসছে !"

সভার লোক উৎসুক হয়ে সমস্বরে বলে উঠলো—"কি সে মন্তর গুরুদেব ?"

কবিগুরু একটু মুচকে হেসে স্পষ্ট গলায় বল্লেন—"কুব্রি, কুব্রি, কুব্রি !"



সবুজের আসর

জা বাগান

ীর প্রতি দেশেই কিছু না কিছু সুন্দর জিনিষ আছে। সুন্দর বলতে বলছি সে দেশের দেখবার, উপভোগ ও আনন্দ করবার জায়গাগুলি। নেচার বা প্রকৃতির সহযোগীতা যে এতে খুব বেশী আছে তা বুঝতেই পার। দেশে দেশে প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। মানুষ প্রকৃতির দানগুলি দেশে দেশে নিজের মনের মত করে গুছিয়ে নিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের দেশকে সাজিয়ে তোলার মধ্যে, আনন্দময় করার মধ্যে আছে সে দেশের জাতিদের নিজেদের বৈশিষ্টগুলি। এমনি এক দেশ জাপান। পৃথিবীর মাঝে বোধহয় সবচেয়ে কবি ও আর্টিষ্ট জাত হচ্ছে জাপানীরা। অথচ তারা অলস নয়—এ তোমাদের জানা।

জাপান ফলফুলের দেশ, উৎসব আনন্দ ও ছবির দেশ—যে যে একবার জাপান ঘুরে এসেছে সেই বলেছে। ঋতু উৎসব তাদের একটা মস্ত জিনিষ। ছেলেমেয়েদের আনন্দ মেলার অন্ত নেই। উৎসব রাত্রে সবুজে নীলে জাপানী ছেলেমেয়েরা হাজার চাঁদের বাতি জ্বালায়—আকাশের বড় চাঁদ হয় তাদের সভাপতি। প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের এত ভাব বোধ হয় আর কোন দেশে নেই, নেই এতরকম আনন্দ করার আয়োজন ও সমারোহ। জাপানের ছেলেমেয়েরা সত্যিই প্রকৃতির সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। জাপানের বাগানগুলি তাদের এই ভালবাসার মস্ত পরিচয়। কিন্তু বাগান বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি ঠিক তা নয়। বাগান ওদের নিত্য জীবনের একটা অতি অন্তরঙ্গ জিনিস। তাদের সমাজ, তাদের সম্মিলন, ধর্ম্ম সংস্কার এসব ধরে, ছুঁয়ে, ঘিরে আছে এই বাগানের আসল রূপ। নানা বিচিত্র বাগানের সে রূপ ফুটিয়ে তোলার মধ্যে আছে তাদের কবি মনের, তাদের শিল্প মনের মস্ত পরিচয়। এতে সত্যিসত্যিই জাপানের ছেলে, জাপানের মেয়ে, জাপানের ছোটরা, জাপানের বড়রা, বুড়োরা, বুড়িরা সকলে ভাবকরে যোগ দিয়েছে। তাই হয়েছে তাদের দেশ বাগানের সেরা।

জাপানী বাগানগুলির নূতনত্ব শোন। সবুজে সুনীলে পাহাড়, তুষারশুভ্র ঝর্ণা বাগানের মস্ত বিশেষত্ব। একই বাগানে ঝর্ণা'র জলধারাগুলি সাজাবার বোধহয় দশরকম কায়দা আছে। পাহাড় থেকে ঝরণা, ঝরণা থেকে সরোবর, সরোবর থেকে নদীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সরোবরের নীল জলে প্রবাল দ্বীপ আবার তাও বিভিন্ন ধরণের সেতু দিয়ে যোগ পাড়ান। কত নানা পাথরের নানান রঙের নুড়ি দিয়ে আঁকাবাঁকা পথগুলি রঙ্গিন হয়ে আছে। ঝরণা, সরোবর, পাহাড়, দ্বীপের সমন্বয় হাজার চিন্তা করে হাজার রকমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।—

কিন্তু শুধু এই নয়। ফল ও ফুলের ও নানা শোভাময় রঙীন পাতাওয়ালা গাছের আমদানি করা হয়—সমস্ত ঋতুকে রূপ দিয়ে তারা ঐশ্বর্য্যান্বিত করে। ঋতু উৎসবে এদের বাগানগুলি নন্দন কাননকে হার মানায়। যে গাছের যে রকম মাটি ও আবহাওয়ার দরকার তাকে তা দেবার চেষ্টা করা হয়। তারপর আছে—বাগানের বিচিত্র আসবাব পত্রগুলি। যেমন নানা ডিজাইনের কূপ, পাথরের হাজার রকম পাত্র ও আলো, নানাসুন্দর মূর্ত্তি, বিচিত্র প্যাগোডা, ছোট ছোট কেবিন, নানা তোরণদ্বার সবগুলি সহস্র রকমে সাজান। কোন বাগানে পাথরের শিল্প কাজ খুলেছে বেশী—সে বাগানের এক নাম, কোন বাগানে জলের নানা সমারোহ—তার এক নাম। কোথাও পাহাড় ও ঝর্ণার সমন্বয়ের অদ্ভুত সৃষ্টি, তারও অন্য নাম। আর কত বলব? প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করে, প্রতিযোগিতা করে নয়—প্রত্যেক বাগানটির এক একটি বিশেষ-বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। আর একে সহস্র রূপ দিয়াছে কে?—জাপানী মানুষের শিল্পমন শিল্পবুদ্ধি ও জাপানের বহুরূপী প্রকৃতি। এক কথায় জাপানের বাগান জাপানকে পরীর দেশ, রূপকথার দেশ করে রেখেছে।



একটি অপরূপ জাপানী উদ্যান

হাজার উৎসবের মধ্যে চা-নো-যু অর্থাৎ চায়ের উৎসবটি এদের একটা মস্ত জিনিষ। আমাদের তো এক কাপ চা খেলেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ওদের তা নয়-এই চা পান নিয়ে ঘিরে আছে তাদের অনেক আনন্দ অনেক অভিযানের মেলা। বাগানে টি-রুম বা টি-প্যাভিলিওন আছে যাদের এরা বলে চা-সে-কি। জাপানে অনেক জায়গায় এই চা-সে-কিগুলি ঘিরেই অপরূপ বাগান গড়ে উঠেছে—যে সব দেখে দেবতারাও নিশ্চয়

স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্তে নেমে আসতে চেয়েছেন। কথায় বলে মানুষের বাগানেও কখন কখনও দেবতারা এসে থাকেন। তাহলে জাপানের প্রত্যেক বাগানেই দেবতাদের আস্তানা আছে।

এবার এই অপরূপ বাগানগুলির পরিকল্পনার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি শুনে রাখ। আগেই বলেছি জাপানের বাগানগুলি ঘিরে আছে জাপানের প্রাণ, জাপানের ধর্ম্ম, সমাজ, উৎসব সংস্কার—সব কিছু। জাপানে এক সময়ে বৌদ্ধ পুরোহিতরা বাগানের নক্সা করতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের তত্ত্ব-গুলি এই উদ্যান পরিকল্পনায় ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্য গোড়ায় ছিল, এখনও আছে। নানাযুগের দার্শনিকদের নানা বানী এই উদ্যানের পরিকল্পনার মধ্যে আজও পরিস্ফুট হয়ে আছে। এ তো গেল জাপানী বাগানের ধর্ম্ম ও দার্শনিক দিকগুলি। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে-আরো সুন্দর ও সহজ, মানুষকে প্রকৃতির কোলের মধ্যে টেনে এনে তাকে দেখানো জানানো ও বোঝানো প্রকৃতি কি অসীম, কত বিচিত্র ও অফুরন্ত, কত উদার ও মহান। জাপানী বাগানের বিশেষত্ব—যেমন একদিকে প্রকৃতির এই অসীমতার রহস্য ফুটিয়ে তোলা তেমনি অপর দিকে সংসারের কোলাহল থেকে একটি পরম নিবিড় শান্তির রাজ্য সৃষ্টি করা। জাপানী উদ্যান শিল্প এই দুটি দিকে সহজভাবে ফুটে আছে।

নিত্য অনুষ্ঠান ও আয়োজনের মধ্যে জাপানীরা কেমন বিচিত্রভাবে প্রকৃতির যোগসূত্রটি মনে ধরিয়ে দেয়—একটি বিশেষ বাগানের কথা দিয়ে বলছি। বাগানের মালিক সমুদ্রের দৃশ্যপথে একটি বাগান তৈরী করেছেন। বাগানের মধ্যে ঝর্ণা আছে, সরোবর আছে, আছে সজ্জিত বৃক্ষতরুলতা শ্রেণী, আরো আছে নানা আর্টিষ্টিক আসবাব পত্র। কিন্তু সমুদ্রের দৃশ্যটি বাগানের মধ্য থেকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখা হয়েছে। চা-নো-যুর আগে যখন অতিথিরা একে একে পাথরের পাত্রে-হাতমুখ ধোবার জন্য নীচু হ'ন—হঠাৎ আশ্চর্য্য ভাবে তাঁদের চোখে পড়ে গাছের মধ্যে দিয়ে বিশাল সমুদ্রের পরম রহস্যময় রমনীয় দৃশ্যটুকু আর তাঁদের মন বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়। তখন তাদের মনে হয় পাথরের পাত্রে সামান্য জলটুকু আর ঐ অসীম অপার সাগর জল রাশির কথা, মনে হয় সমস্ত ব্যাপ্তবিশ্বের কাছে নিজেদের সামান্য ক্ষুদ্রতার কথা। প্রকৃতি কি অসীম কি মহান এই সুন্দর ভাবটি তাঁদের মনে তখন জাগল। চা পানের উৎসবের আগে অতিথিদের মধ্যে এই প্রকৃতির যোগটি করার দেখ কি সুন্দর উপায়টুকু গৃহস্বামী করেছে। জাপানীরা তাদের উদ্যানে সংযমের কল্পনা, আনন্দের কল্পনাগুলি সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছে। বাগানের নানা প্রচ্ছন্ন কোনে এক একটি বিচিত্র দৃশ্য এমন আশ্চর্য্যভাবে লুকিয়ে থাকে যে হঠাৎ নিজের তা আবিষ্কার করায় যে আনন্দ ও থ্রিল্ তার তুলনা হয় না। গোপনে একটি ভাল কাজ করায় যে আনন্দ—এ অনেকটা তাই। তাহলে দেখ, বাগান তাদের গৃহসংসারের একটি বড় অংশই নয়—তাদের কত বড় আদর্শ লক্ষ্য কর। কেবলমাত্র সুন্দর জায়গাগুলি বাগান করে সাজিয়ে তারা ক্ষান্ত হয় না। সৌন্দর্য্যের জন্য মানুষের পিপাসা মিটিয়ে নয়, প্রকৃতিকে সহজ ও সুন্দর করে নয়—বাগানের মধ্যে একটি পরম নিবিড় আশ্রম স্থল গড়ে তুলে—যাতে মানুষ পরম আনন্দ লাভ করতে পারে তার উপায় আবিষ্কার করেছে।



প্রথম

কলিকাতায় ভিনিসের একরাত্রি

জয়ন্ত ও মাণিক সেদিন 'ডিনার' খেতে গিয়েছিল,—পার্ক ষ্ট্রীটে এক হালফ্যাসানি বন্ধুর বাড়ীতে।

জয়ন্ত ও মাণিক থাকে বাগবাজারে, কিন্তু তাদের পার্কষ্ট্রীটবাসী এই বন্ধুটি ছিলেন সেই জাতীয় মনুষ্য, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হগ্-সাহেবের বাজারের উত্তরে আর আধুনিক ভদ্রলোকের বাস নেই। অতএব হগ্-সাহেবের বাজারের দক্ষিণদিকে আস্তানা গেড়ে এঁরা কোঁচানো কাপড় পরেন না, শিঙাড়া কচুরি খেতে ভালোবাসেন না, অ-আ ক-খ ব্যবহার করেন না, ঘড়ী ধ'রে দাড়ি কামান, হাঁচেন—কাশেন, স্বপ্ন দেখেন।

জয়ন্ত ও মাণিক যে এই শ্রেণীর বন্ধুর খুব অনুরাগী ছিল, তা নয়। কলেজ ছাড়বার পর এঁর সঙ্গে পথে-ঘাটে তাদের দেখা হয়েছে কালে-ভদ্রে কদাচ। সখের গোয়েন্দাগিরিতে বারংবার আশ্চর্য্যরূপে সফল হয়ে জয়ন্ত আজকাল কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ব'লে গণ্য হয়েছে এবং সেই খ্যাতির কিছু-কিছু অংশ মাণিকও পেয়েছে। তাদের মতন লোককে নিমন্ত্রন ক'রে এখন বাড়ীতে আনতে পারলেও অনেকে সৌভাগ্য ব'লে মনে করে। হয়তো সেইজন্যেই পার্কষ্ট্রীট আজ বাগবাজারকে করেছে 'ডিনার' খাবার নিমন্ত্রণ!

বাগবাজারকে চম্‌কে দেবার জন্যে পার্কষ্ট্রীট কোন আয়োজনেরই ত্রুটি করেনি। সে-সব দেখে জয়ন্ত ও মাণিক কোনরকম বিস্ময় প্রকাশ করলে না ব'লে গৃহকর্ত্তা বোধ হয় মনে মনে কিঞ্চিৎ হতাশ হলেন।

কিন্তু খানা খাবার টেবিলের উপরে 'মেনু'তে খাদ্যের ফরাসী নামগুলো তাদের কাছে বড় বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হ'ল।

জয়ন্ত বললে, "ওহে, এই ফরাসী নামগুলোর ভেতরে গরু আর শূওরের মাংস লুকিয়ে নেই তো?"

গৃহকর্ত্তা এতক্ষণে তো পেয়ে অট্টহাস্য ক'রে বললেন, "কেন হে, গরু আর শূওর সম্বন্ধে এখনো তোমাদের প্রাচীন কুসংস্কার আছে নাকি?"

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, "তোমার কথার উত্তর দিতে গেলে তর্ক করতে হয়। খানার টেবিলের সামনে ব'সে তর্ক করার অভ্যাস আমার নেই। আসল কথা, ও-দুটি খাবার আমরা পছন্দ করিনা।"

খানা শেষ হ'লে পর সকলে পাশের একটি ঘরে গিয়ে বসলেন। সে-ঘরটি একেবারে একেলে কায়দায় সাজানো। দেওয়ালে 'কিউবিষ্ট' চিত্রকরদের আঁকা ছবি, টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আসবাবও 'কিউবিষ্ট' কারিকরদের দ্বারা গড়া, এমন-কি ঘরের মেঝের 'মোজেইকে'র উপরেও 'কিউবিজ্‌মে'র প্রভাব।

গৃহকর্ত্তা বললেন, "জয়ন্ত, এ-ঘরটির 'ডেকোরেশান' তোমার কেমন লাগছে?"

"বেশ। কিন্তু ভারতবাসী যখন ঘরবাড়ী সাজায় তখন সে যদি ভারতের প্রাচীন শিল্পের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখে, তাহ'লে আমি বেশী খুসি হই।"

—"কিন্তু আমি চাই 'আপ-টু-ডেট্' হ'তে। 'কিউবিজ্‌ম্' হচ্ছে হাল-ফ্যাসানের ঢেউ।

—"না, 'কিউবিজ্‌মে'র বয়েস হ'ল ত্রিশ-পঁইত্রিশ বৎসর। এখনাকার আর্টে হালফ্যাসান্ এনেছেন "হাইপার্ রিয়ালিষ্ট্" শিল্পীরা। তাদের নাম তুমি শুনেছ?"

—"না।"

—"তাহ'লে পার্ক ষ্ট্রীটে বাস ক'রেও তুমি 'আপ্-টু-ডেট্' হ'তে পারোনি। তুমি জানো, যিনি 'কিউবিজ্‌ম্' আবিষ্কার করেছেন, তিনি এখন 'কিউবিজ্‌ম্' ছেড়ে অন্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকছেন?"

—"না।"

—"তাহ'লে হে বন্ধু, তুমি পার্ক ষ্ট্রীটের কালো কলঙ্ক!"

বন্ধু মনে মনে রেগে ঠোঁট কামড়ালেন। অধিকাংশ আধুনিক বাঙালী-সাহেবের মতন তিনিও লোক-দেখানো আধুনিক হয়েছেন, আর্টের অত খুঁটিনাটির খবর রাখবার উৎসাহ তাঁর নেই।

ডিনারের পর কফির পালা। কিন্তু কফির পেয়ালায় চুমুক্ দেওয়ার সঙ্গে' সঙ্গেই নামল যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা। হু-হু ক'রে ঝোড়ো-হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই 'কিউবিষ্ট্'দের আঁকা ছবিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। তখনি তাড়াতাড়ি দরজা-জান্‌লা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

এক, দুই, তিন ঘণ্টা গেল, তখনো ঝুপ্-ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে।

জয়ন্তের চোর-ডাকাত ধরার কাহিনী শুনে গৃহকর্ত্তার সময় কিন্তু বেশ কেটে যাচ্ছে। তাঁর গল্প শোনার উৎসাহ যেন ফুরোতেই চায় না।

কিন্তু শেষ-গল্প শেষ করবার আগেই ঘড়ীতে বাজল সাড়ে-বারোটা। জয়ন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আর অপেক্ষা করা চলে না। পার্কষ্ট্রীট থেকে বাগবাজার—মস্ত লম্বা দৌড়! ওঠ মানিক!"

গৃহকর্ত্তা বললেন, "কিন্তু এখনো বৃষ্টি পড়ছে যে!"

—"পড়ুক্। চল মানিক!"

গাড়ী-বারান্দার তলাতেই তাদের মোটর দাঁড়িয়েছিল, তারা মোটরে গিয়ে উঠল।

চৌরঙ্গী তখন একটা প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হয়েছে। সেই জলরাজ্যে জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেবল সরকারি আলোক-স্তম্ভগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে দীপ্তনেত্রে যেন সেই নির্জ্জন রাজ্য শাসন করছে, নীরবে।

চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে মোটর যখন সেন্ট্রাল আভেনিউতে প্রবেশ করল পথের জলও তখন বেড়ে উঠল। যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, সহরের বুকের ভিতরে সুদীর্ঘ এক নদীর আবির্ভাব হয়েছে!

মানিক বললে, "বর্ষায় কলকাতায় বাস করলে ভিনিসে বাস করা হয়, কারণ তখন কলকাতার রাজপথের সঙ্গে ভিনিসের জলপথের কোন তফাৎই থাকে না।"

জয়ন্ত বললে, "কেবল 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু' আর 'গণ্ডোলা' নৌকার অভাব।"

—"গণ্ডোলার অভাব কর্পোরেশনের দূর করা উচিত। বর্ষাকালের জন্যে কলকাতার মাঝে মাঝে খেয়াঘাট বসিয়ে নৌকো রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। আর 'দীর্ঘশ্বাসের সেতুর কথা বলছ?" বর্ষার সময়ে সারা কলকাতা যত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তা দিয়ে কি শত শত সেতু তৈরী করা যায় না?"

কিন্তু জয়ন্ত কোন জবাব দেবার আগেই তাদের মোটর হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ড্রাইভার বললে, "হুজুর, গাড়ী আর চলবে না!"

জয়ন্ত বললে, "গাড়ী তো আর নৌকো নয়, এতক্ষণ সে যে নৌকোর কর্ত্তব্যপালন করতে নারাজ হয়নি, এইটুকুই আশ্চর্য্য! এস মানিক, এখন জলে ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া কোন উপায়ই নেই!"

সেখানটা হ্যারিসন রোডের মোড়। বাগবাজার তখন অনেক দূরে।

দুজনে জল ভাঙতে ভাঙতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল,—পথের জলপ্রবাহ ঠিক নদীর মতই কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে এবং জলের মাঝে মাঝে ভাসছে মরা ও পচা ইঁদুর, কুকুর ও বিড়ালের দেহ!

মানিক ঘৃনায় নাক টিপে ধ'রে বললে, "বাড়ীতে গিয়ে জলে 'পার্ম্যাঙ্গেনেট্ অফ্ পটাস্' গুলে গা না ধুলে আর রক্ষা নেই! জয়, পার্কষ্ট্রীটের ডিনার বুদ্ধি আর বাগবাজারি পেটে থাকে না! থুঃ থুঃ!"

জয়ন্ত বললে, "আমি বলি, জয় কর্পোরেশনের! আধুনিক কলকাতার টেক্সো যত বাড়ছে, তার রাস্তায় জলের পরিমাণও সেই অনুপাতে দিব্য বেড়ে উঠছে! অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা করবার অজুহাতে কত লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে!"

দুজনে বিরক্ত মনে হোঁচট্ খেতে খেতে এগিয়ে চলল, তখন তাদের দুর্দ্দশা দেখবার জন্য পথে একটা জ্যান্ত কুকুর পর্য্যন্ত হাজির ছিলনা। লাল পাগ্ড়ী পর্য্যন্ত অদৃশ্য! বৃষ্টি তখনো থামেনি এবং ঝোড়ো বাতাস তখনো বন্ধ জান্লায় জান্লায় মাথা খুঁড়ে ভিতরে ঢুকতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ জয়ন্ত ব'লে উঠল, "হুঁ, এই তো চোরের শুভমুহূর্ত্ত! মানিক, তুমি কি একটা মানুষ-টিক্টিকি দেখতে চাও?"

মানিক বিস্মিত নেত্রে জয়ন্তের মুখের পানে তাকালে।

জয়ন্ত আঙুল তুলে বললে, "আমার মুখের পানে তাকিয়ে তুমি আমার মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না,—ঐ বাড়ীখানার তিনতালার দিকে তাকাও!"

পাশেই একখানা ত্রিতল বাড়ী! একটা মনুষ্য-মূর্ত্তি দেয়াল বয়ে উপরে উঠছে!

মানিক বললে, "চোর! কিন্তু কেমন ক'রে লোকটা উপরে উঠছে?"

"ট্যাঙ্কের জলের পাইপ ধ'রে।"

লোকটা হাত বাড়িয়ে বারান্দার রেলিং ধরলে, তারপর ভিতরে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জয়ন্ত বললে, "এস, দেখা যাক্ চোরটাকে ধরতে পারা যায় কিনা?"

জয়ন্ত বাড়ীর সদর দরজায় গিয়ে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ভিতর থেকে হিন্দুস্থানী গলায় কে সুধোলে, "কোন্ হায় রে?"

—"বাইরে এসে দেখ না বাবা, চ্যাঁচাও কেন? বাড়ীতে চোর ঢুকেছে!"

হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কোথায় কে তীক্ষ্ণ শীষ্ দিলে!

জয়ন্ত চারিদিকে চেয়ে কারুকেই দেখতে পেলে না। বললে, "মাণিক, এ চোর একলা আসে নি। তার দলের লোক নীচে কোথাও লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে। শীষ্ দিয়ে উপরের চোরকে সে সাবধান ক'রে দিলে!"

দরজা খুলে বেরুল গালপাট্টাওয়ালা মস্ত একখানা মুখ।

জয়ন্ত বললে, "দরোয়ানজী, রাস্তা থেকে দেখলুম একটা চোর পাইপ ধ'রে তিনতালার বারান্দায় গিয়ে উঠল! তাকে ধরতে চাও তো শীগ্‌গির আমাদের নিয়ে ওপরে চল!"

দারোয়ান তখনি কোণ থেকে নিজের লাঠিটা তুলে তিনবার মাটিতে ঠুকে যা বললে তার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই যে, এই লাঠি দিয়ে সে যদি আজ চোরের মাথাটা কাঁধের উপর থেকে উড়িয়ে দিতে না পারে, তাহ'লে মিথ্যাই তার নাম হাতী সিং!

তার সঙ্গে জয়ন্ত ও মাণিক সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল।

—একেবারে তিনতালার বারান্দায়! তিনতালায় দুটো দরজা রয়েছে, দুটোই বন্ধ।

একটা দরজার সামনে গিয়ে দরোয়ান ডাকলে, "হুজুর, হুজুর!"

কেউ সাড়া দিল না।

কিন্তু জয়ন্তের তীক্ষ্ণ কাণ শুনতে পেলে, ঘরের ভিতরে ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে!

সে দরজায় পিঠের বামদিক রেখে দাঁড়াল। তার সেই ছয়ফুট চার ইঞ্চি উঁচু দেহ আসুরিক শক্তির জন্যে বিখ্যাত, আর এ তো তুচ্ছ একটা কাঠের কবাট! তার দেহের এক ধাক্কায় ভিতরের খিল ভেঙে গেল—দরজার কবাট সশব্দে খুলে গেল!

ঘর ঘুট্‌ ঘুট্‌ করছে অন্ধকার। প্রথমেই দেখা গেল রাস্তার বারান্দার দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা মূর্ত্তি বেরিয়ে যাচ্ছে!

হাতী সিং ছুটে গিয়ে বাঘের মত তার উপরে লাফিয়ে পড়ল।

প্রথমেই একটা শব্দ হ'ল,—কার হাত থেকে কি-একটা জিনিষ যেন মাটির উপরে প'ড়ে ভেঙে গেল! তারপরেই চোখের পলক না পড়তেই বিপুলবপু হাতী সিং কুপোকাৎ!

জয়ন্তও একলাফে বারান্দায় গিয়ে পড়ল, কিন্তু চোর তখন সেখানে নেই! বারান্দার

রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে জয়ন্ত দেখলে, জলের পাইপ ধ'রে আশ্চর্য্য বেগে সে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে! তাকে আর ধরবার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে সে বললে, "হাতী সিং, তুমি উঠেছ?"

হিন্দী ভাষায় সাড়া এল, "উঠেছি বাবুজী! বড়ই জোয়ান চোর ধ'রে রাখতে পারলুম না!"

—"সেটা তোমার দোষ নয়। আলোর 'সুইচ্' কোথায়?"

হাতী সিং আলো জ্বাললে।

ঘরের একদিকে একখানা খাট। ঠিক তলাতেই মেঝের উপরে প'ড়ে একটি প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক অত্যন্ত হাঁপাচ্ছেন।

জয়ন্ত ও মাণিক তাঁর পাশে গিয়ে বসল। প্রথমেই জয়ন্তের চোখ পড়ল ভদ্রলোকের গলার উপরে—সেখানে মানুষের আঙ্গুলের রাঙা ছাপ্! চোর তাঁর গলা টিপে ধ'রেছিল।

ভদ্রলোকের বয়স হবে চল্লিশ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গৌরবর্ণ। দোহারা দেহ।

হাতী সিং জল এনে তাঁর গলায় ও মুখে ঝাপ্‌টা দিতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক কতকটা সাম্‌লে নিয়ে উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না এসে পড়লে আমি বাঁচতুম না। গেল হপ্তায় আমার সহকারী বন্ধু সুরেন বাবুকে কে খুন করেছে, আর আজ আমিও পরলোকে চ'লে যাচ্ছিলুম!"

মাণিক বললে, "আমি খবরের কাগজে পড়েছি, গেল-হপ্তায় বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অমল চন্দ্র সেনের সহকারী সুরেন্দ্র নাথ বসুকে কে হত্যা ক'রে পালিয়েছে। আপনি কি সেই সুরেনবাবুর কথা বলছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"তাহ'লে আপনিই হচ্ছেন প্রত্নতাত্ত্বিক—"

—"অমল চন্দ্র সেন।"

জয়ন্ত অবাক হয়ে অমলবাবুর মুখের দিকে তাকালে। অমলবাবুর বিখ্যাত নাম সেও শুনেছে বটে, কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের নিরীহ দেহের উপরে এমন মারাত্মক আক্রমণ কেন? পুরাণো পোকায়-কাটা পুঁথিপত্র, অচল সেকেলে মুদ্রা আর ভাঙা ইট-কাঠ-পাথর নাড়াচাড়া করা যাঁদের একমাত্র পেশা, তাঁদেরই একজনকে পাঠানো হয়েছে পরলোকে এবং আর একজনকেও—

তার চিন্তায় বাধা পড়ল। অমলবাবু হঠাৎ সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "ওকি, ঐ বুদ্ধমূর্ত্তিটা ওখানে প'ড়ে কেন? ওটা ভাঙলই বা কি-ক'রে?"

জয়ন্ত চেয়ে দেখলে, বারান্দার দিকের দরজার সামনে মাটির উপরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প'ড়ে রয়েছে, তার মুণ্ড ভেঙে আর-একদিকে গড়িয়ে গিয়েছে।

সে বললে, "এখন বোঝা যাচ্ছে, হাতী সিং যখন চোরকে আক্রমণ করে, তখন ঐ মূর্ত্তিটাই চোরের হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেয়েছিল! শব্দটা আমি তখনি শুনেছিলুম, কিন্তু কারণ বুঝতে পারি নি।"

অমলবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, "এত জিনিষ থাকতে চোর ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি নিয়ে পালাচ্ছিল? চোর ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি—নিয়ে—" বলতে বলতে তিনি হঠাৎ আবার থেমে গেলেন!

জয়ন্ত নীরবে তাঁর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল। সে বেশ বুঝলে, অমলবাবু আজকের এই বিপদের একটা হদিস্ খুঁজে পেয়েছেন।

খানিকক্ষণ পরে অমলবাবু বললেন, "আপনারা আমার প্রাণরক্ষা করলেন, কিন্তু আপনাদের পরিচয় জানা হ'ল না তো?"

জয়ন্ত বললে, "জানাবার মত পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। আমার নাম জয়ন্ত আর আমার বন্ধুর নাম মানিকলাল। আমাদের সখ হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি।"

—"আপনাদের কথা আমিও বোধহয় শুনেছি। বৈজ্ঞানিক অপরাধী ভবতোষ মজুমদারকে আপনারাই কি ধরিয়ে দিয়েছিলেন?" *

"অনেকটা তাই বটে। কিন্তু পুলিস বলবে ভবতোষকে ধরেছিলেন ইনস্পেক্টার সুন্দরবাবু।"

—"পুলিস যা বলে বলুক্, কিন্তু আসল বাহাদুরি কার লোকে তা জানে। আপনারা এখানে এলেন কেমন ক'রে?"

জয়ন্ত সব খুলে বললে। অমলবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু, ভগবান আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "অনেকটা সেই রকমই মনে হয় বটে! নইলে হঠাৎ এই দুর্য্যোগ, জলমগ্ন রাস্তা, মোটরের বিদ্রোহ, যথাসময়ে আপনার বাড়ীর সামনে আমাদের আবির্ভাব— এ-সমস্তই অর্থহীন হয়ে পড়ে!"

* "জয়ন্তের কীর্ত্তি" উপন্যাস দেখুন।

পদ্মরাগ বুদ্ধ

শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

অমলবাবু বললেন, "দেখুন, ঐ বুদ্ধমূর্ত্তিটি এতদিন আমার সহকারী সুরেনবাবুর বাড়ীতে ছিল। ঐ মূর্ত্তিটি আমরা চারমাস আগে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে পেয়েছিলুম।"

—"কাম্বোডিয়ায়? যেখানে জঙ্গলের ভিতরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দুমন্দির 'ওঙ্কারধাম' আছে?

—"হ্যাঁ। সেই পিরামিডের চেয়েও আশ্চর্য্য মন্দির থেকে আরো তফাতে, জঙ্গলের ভিতরে প্রাচীন হিন্দুদের আরো অনেক কীর্ত্তি লুকানো আছে। খোঁজে গিয়েই আমরা এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি পাই। এই মূর্ত্তি পাওয়ারও একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলব।"

জয়ন্ত বললে, "মূর্ত্তিটি এতদিন সুরেনবাবুর কাছে ছিল,—তারপর?"

অমলবাবু বললেন, "গেল হপ্তায় একদিন ঐ মূর্ত্তিটি আমার পরীক্ষা করবার দরকার হয়। আমি মূর্ত্তিটি সুরেনবাবুর কাছ থেকে আনিয়ে নি। ঠিক সেই রাত্রেই কে সুরেনবাবুকে গলা টিপে হত্যা করে। কেবল তাই নয়। সুরেনবাবুর ঘরে আরো অনেক মূর্ত্তি ছিল, হত্যাকারী যে সেগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হত্যাকারী কোন জিনিষ বা মূর্ত্তি নিয়ে যায় নি। পুলিস এই হত্যার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায় নি। জয়ন্তবাবু, হত্যাকারী কিসের খোঁজে সুরেনবাবুর ওখানে গিয়েছিল, বলতে পারেন?"

—"আপনার আর কিছু বলবার আছে?"

—"আছে। আমার কোন শত্রু নেই। আজ রাত্রে আপনাদের কড়া-নাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খাট থেকে যেই নেমেছি, অমনি কে আমার গলা টিপে ধরলে—আমি অজ্ঞানের মত হ'য়ে গেলুম। এখন দেখছি, আমার ঘরেও এক হত্যাকারী এসে আর কিছু না নিয়ে ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি নিয়েই পালাচ্ছিল, যে-মূর্ত্তি এতদিন সুরেনবাবুর ঘরে ছিল!"

মাণিক বললে, "আমার তো মনে হয়, সুরেনবাবুকে খুন ক'রে সেখানে ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি না পেয়ে হত্যাকারী আজ আপনার এখানে খুঁজতে এসেছিল।"

জয়ন্ত কিছু বললে না। দরজার কাছে গিয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির দেহ ও মাথা মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে নিলে।

মূর্ত্তিটি চূণপাথরে গড়া ধ্যানী বুদ্ধের, উচ্চতায় একহাতের বেশী হবে না।

ক্রমশঃ

অলিম্পিক

ছোট থেকে বড় হয়ে যাঁরা বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন জেকোস্লোভাকিয়ার বিগত প্রেসিডেন্ট ডাঃ মাসারিক তাঁদের অন্যতম। আজ তাঁর মৃত্যুতে জেকোস্লোভাকিয়া শোকাচ্ছন্ন। তাঁরই মহৎ চেষ্টায় জেকোস্লোভাকিয়া অন্যান্য শক্তিমান স্বাধীন জাতিদের মধ্যে নিজের বিশিষ্ট জায়গা পেয়েছে। অথচ এই বিরাট পুরুষটির জীবন কাহিনী শুনলে তোমরা আশ্চর্য্য হবে। তিনি সামান্য এক কোচম্যানের ছেলে ছিলেন। পরে তাঁকে কামারের কাজও করতে হয়েছে। কিন্তু নিজের পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে শক্তি সঞ্চয় করে দেশের তিনি বড় হয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে ডাঃ মাসারিক প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হ'ন। দেশের লোক তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে বারবার তাঁকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করেছিল। আজ তিনি আর নেই কিন্তু তিনি দেশের জন্যে যা করে গিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে দুঃস্থ রুগীদের চিকিৎসার জন্য তিনি বিশ হাজার পাউণ্ড দান করে গিয়েছেন। জেকোস্লোভাকিয়া আজ নানা দিকে নানা পথে উন্নতি করেছে। বিখ্যাত বাটা কোম্পানী এই জেকোস্লোভাকিয়া দেশের অন্তর্গত।

এবার অল্-ইণ্ডিয়া অলিম্পিয়া কলকাতাতে ফেব্রুয়ারী মাসে টালা পার্কে হবে। শীঘ্রই সেখানে 'অলিম্পিয়া ভিলেজ' তৈরী হবে। কম্পিটিটরদের সেখানে নানা শিক্ষাও দেওয়া হবে। তাছাড়া তাদের থাকবার জায়গা, পোষ্ট অফিস, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদি খোলা হবে। অর্থাৎ রীতিমত সে সময় কলকাতাতে অলিম্পিয়া উৎসব লেগে যাবে। তোমরা শুনে খুসী হবে এই প্রথমবার হাডুডু খেলার সেখানে প্রতিযোগিতা হবে। তাছাড়া কুস্তি, বক্সিং, ওজন-তোলা, সাঁতার, নানারকম দৌড় ঝাঁপ এসব তো আছেই। ছেলে মেয়েদের সকলের জন্যই নানা ইভেন্ট তৈরী করা হয়েছে।

ডুরেণ্ডে মোহনবাগান এবার আশাতীত ভাবে হেরে গেল। আই এফ এ তে মোহন-বাগানের কাছ থেকে যা আশা করা যায় ডুরেণ্ডে তার চেয়ে কিছু বেশী আশা আমাদের ছিল। বর্ডার্স মিলীটারী দল ডুরেণ্ড কাপটি এবার নিয়ে গেল। মহমেডান স্পোর্টিং এবার অত্যন্ত আশাতীত ভাবেই রোভার্স কাপে বাঙ্গালোর মুসলীম দলের কাছে হেরে গেল। শীতকালে এবার ক্রীকেট খেলার ধুম পড়বে। বিলেত থেকে লর্ড টেনিসনের দল খেলতে আসছেন এতে

অনেক বিখ্যাত ক্রীকেট খেলোয়াড়রা থাকবেন। এই বিদেশী ক্রীকেট ও ফুটবল দলগুলির খেলা দেখতে তোমরা ভুলো না। এবার দেখা যাক করিণথিয়ানদের সঙ্গে বাঙ্গালীরা কেমন খেলে। আমাদের তো মনে হয় করিণথিয়ানরা ভারতীয় দলের কাছে নিতান্ত সহজভাবে জিততে পারবে না।

কলকাতায় এই কয়েকদিন আগে যে ভয়ানক ঝড় হয়ে গেল তা তোমরা যারা কলকাতায় আছ তারা নিশ্চয় দেখেছ। এতে যেমন অনেক বিপদ গিয়েছে তেমনি অনেক মজার ঘটনা ঘটেছে। বিপদের মধ্যে অনেক জায়গায় তার ছিঁড়ে, গাছ পড়ে লোক জখম হয়েছে। নৌকো জাহাজ সেদিন কোথাও যেতে পারে নি। তা ছাড়া বাড়ী পড়ে গিয়েছে, লোকেদের জিনিষ পত্র ভেঙ্গে অনেক লোকসান হয়ে গিয়েছে। পরের দিন সকাল বেলা কলকাতার রাস্তাঘাট দেখে মনে হয়েছিল যেন কারা সব লুটপাট করে গিয়েছে। কোন জিনিষটাই ঠিক তার জায়গায় নেই। সেদিন রাস্তা দিয়ে ছাতা নিয়ে হাঁটা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল—ছাতা কেউ ধ'রে রাখতে পারছিল না; কারুর কারুর ছাতা উল্টে যাচ্ছিল—কেউ কেউ ছাতার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ইঞ্চি শূন্যে উঠেও যাচ্ছিল। (হাওয়ার গতি সেদিন ছিল ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল; জোরটা ভেবে দেখো) আর সকলেই দেখি সেদিন রাস্তায় দৌড়চ্ছে— ইচ্ছে করে নয় হাওয়ার ঠেলায়। একজনকে হঠাৎ দেখলাম তিনি বাড়ীর দরজা থেকে ছাতাটি খুলে যতই বেরোবার চেষ্টা করছেন ততই তিনি বাড়ীর ভেতর ঢুকে যাচ্ছেন শেষে মাল কোঁচা বেঁধে ছাতাটি বন্ধ করে ঝড় বৃষ্টির কাছে হার মেনে তিনি পথে নাবলেন।

কলকাতায়, শুধু কলকাতায় কেন সারা বাংলায় নানা রকম সাঁতারের ক্রীড়া কৌতুকের নানা উৎসব হয়ে গেল। বীর সাঁতারুরা অনেক নতুন নতুন রেকর্ড করলেন। তার লম্বা ফর্দ্দ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটা আজ সত্যি যে ইংলণ্ড জার্ম্মানী আমেরিকার মত আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও জলে নানারকম কসরৎ দেখিয়ে নাম কিনেছে। এনডিওরেন্স সাঁতারে আমাদের দেশ প্রথম। এবার সাগর সাঁতারে পার হওয়াই যা বাকি, সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে সেদিনেরও আর বেশী দেরী নেই। আশ্চর্য্যের বিষয় ছোটরাই এতে সাহস দেখিয়েছে—ছেলেরাও যেমন মেয়েরাও তেমনি। আর একটা কথা পৃথিবীর তো তিনভাগ জল আর মোটে এক ভাগ স্থল। কাজেই সাঁতার শেখা যে কত দরকারী তা বলা বাহুল্য। তোমরা যারা জলে নামতে ভয় পেয়ে আছ আর দেরী কোরো না, নির্ভয়ে নেমে পড়ো। এতে নিজের জীবনই যে কেবল রক্ষা করা যায় তা নয় অন্যকেও বাঁচাতে পারা যায়। তাছাড়া স্বাস্থ্য ভাল হয়—দম বাড়ে। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে খেলাধুলায় বা অন্য কাজে দেখবে দম কত দরকারী মানুষের।

রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন—

সম্প্রতি যে ঘটনাটি আমাদের,—শুধু আমাদের কেন সমস্ত দেশের মনকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করেছে তারই কথা নিশ্চয় আগে বলা দরকার। ঘটনাটা যে কি তা অবশ্য তোমাদের বলতে হবেনা। বিশ্বপূজ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অসুখের সংবাদে তোমরাও নিশ্চয় উৎকন্ঠিত হয়ে দিন কাটিয়েছ, তাঁর অসুখ সেরে যাবার জন্যে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছ। তোমাদের এবং সমস্ত দেশের সেই ব্যাকুল প্রার্থনা বিফল হয়নি। যাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে শুধু আমাদের দেশ নয় পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগ ধন্য হয়েছে তাঁকে আরো সুদীর্ঘকাল ধরে পাওয়ার সৌভাগ্য আমরা এখন আশা করতে পারি।

শুধু বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত মানুষের জাতিকে রবীন্দ্রনাথ কি যে দিয়েছেন, তার কাছে পৃথিবী যে কতখানি ঋণে আবদ্ধ তা' তোমরা বড় হলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবে। এখন এইটুকু শুধু বলছি যে তাঁর মত মানুষ জন্মাবার দরুণ পৃথিবী আরো সুন্দর হয়ে ওঠে, মানুষের জীবনে নতুন মহিমার আভা লাগে, মহত্ত্বের গভীর প্রেরণা আমরা পাই। এঁরা যা দান করেন মানুষের উজ্জ্বলতর গৌরবময় ভবিষ্যতের এই হ'ল একমাত্র পাথেয়।

মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসেও এরকম লোকের দেখা ক্বচিৎ মেলে। এঁদের যথাযোগ্য সম্মান করতে শিখেও আমরা বড় হয়ে উঠি। রবীন্দ্রনাথের নিরাময় হওয়ার খবর পেয়ে তাই সমস্ত দেশের আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তাঁর পরমায়ু অক্ষয় হোক এই আমাদের সকলের প্রার্থনা।

এবার পূজোর ছুটির কথা। না, এবারে তোমরা কোথায় যাচ্ছ আর জিজ্ঞাসা করব না। না ভেবে চিন্তে, ছুটিতে কোথায় যাব, তার গল্প বলার কথাও দিয়ে ফেলব না। আরবারে মনে হচ্ছে যেন আগে থাকতে এই রকম কথা দিয়ে একটু বিপদে পড়েছিলাম।

তা বলে, হঠাৎ তোমাদের পূজোর পর চমকে দিতে পারি না তা মনে কোরোনা। হয়ত এমন অদ্ভুত ভ্রমণ কাহিনী এসে শুনিয়ে দেব যে অবাক হয়ে যাবে। তোমরা হয়ত গেছলে দেওঘর কি দিল্লী, মধুপুর কি মথুরা, আগরপাড়া কি আগরা, আর আমি? উঁহু—আগে থাকতে কোন কথা আর ভাঙ্গছিনা।

তোমাদের

সম্পাদক মশাই



টিকিট ঘর

[পোষ্ট বক্স]

ডাক টিকিট সংগ্রহের কথা (ইংরেজীতে যাকে বলে Philately) তোমাদের কাছে নতুন না হলেও আশাকরি শুনতে মন্দ লাগবে না। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই নিশ্চয় টিকিট জমাবার সখ আছে। এই টিকিট জমাতে যে কী আনন্দ আর এর উপকারীতা যে কত তা কথায় শেষ করবার নয়।

ডাক-টিকিট সম্বন্ধে আর সব কথা বলবার আগে এর ইতিহাস একটু ব'লে রাখি। এ-কথা তোমরা সবাই শুনেছো যে মানুষের সমস্ত আবিষ্কারের পেছনে থাকে আন্তরিক প্রয়োজনের তাগিত! এই ডাক-টিকিট প্রচলনের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যখন আমাদের দেশে ডাক-বিভাগ ছিলনা তখনকার সময়ে দূরে খবর পাঠানো (যা' এখন আলো-হাওয়ার মতনই সহজ হ'য়ে এসেছে) যে কী অসুবিধের ছিল তা' এখন আমরা ভালো করে কল্পনাও করতে পারি না।

আমাদের দেশে, ভারতবর্ষে, ডাক পাঠাবার একটা অতি সাধারণ ব্যবস্থা করা হয় ১৫৪১ সালে। সে সময়ে বিখ্যাত সের সা' ছিলেন দিল্লীর বাদশা'। এর পর সম্রাট আকবর এর অনেক উন্নতি করেছিলেন তাঁর শাসনকালে; শোনা যায়, তাঁর আমলে ডাকবিভাগে কাজ করত চার হাজার ডাক-হরকরা। তারপর, অনেক বছর পরে ইংরেজদের সময়ে ক্লাইভ, বাংলাদেশের জমিদারদের সাহায্য পেয়ে আমাদের দেশে প্রথমে যে ডাকবিভাগ খোলেন তাতে সাধারণ লোকের খবর ইত্যাদি পাঠাবার সুবিধা হতো না; কারণ, সে ডাক ছিল শুধু সরকারী কাজের জন্যে। এর পরে ১৭৭৪ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সরকারী ডাকের সঙ্গে জনসাধারণেরও চিঠি-পত্র পাঠাবার সুবিধে ক'রে দেন। তখনকার চিঠি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে মাশুল দেওয়া হতোনা, আদায় করা হ'তো যার কাছে চিঠি-পত্র বিলি করা হতো! কিন্তু তখনকার প্রধান অসুবিধে ছিলো এই যে ডাকের কাজ চলতে আরম্ভ হলেও ডাক-টিকিটের ব্যবহার তখনও অজানা ছিল। পৃথিবীর মধ্যে এখনকার মতো ডাকটিকিটের প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ১৮৩৪ সালে স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি সহরে।

ডাকটিকিটের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ডাকবিভাগের কাজও খুব বাড়তে লাগলো। এই সময়ে, ১৮৩৯ সালে ইংল্যাণ্ডে বেরুলো এক পেনী দামের টিকিট। ইংল্যাণ্ডের এই টিকিট বেরুবার পর প্রথমে ব্রেজিলে, তারপর আমেরিকায়, ফ্রান্সে, অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীতে একে একে ডাকটিকিটের ব্যবহার হ'তে লাগলো। ভারতবর্ষেও ১৮৫০ সালে এই ডাকটিকিটের রীতিমতো প্রচলন হলো। ডাকটিকিট বেরুবার পর থেকেই এর আস্তে ব্যবহার বাড়তে লাগল আর সেই থেকে নানা সময়ে নানান রকমের টিকিট বেরিয়েছে।

আমাদের মধ্যে এই টিকিট জমানোর Hobby এখন খুব বেড়ে গেছে। ইউরোপ আমেরিকার Philately ওখানকার অনেক লোকের কাছে একটা খুব লাভের ব্যবসাও হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্যে শুধু যে বিস্তর দোকানই চল্‌ছে তা' নয়, এর জন্যে আছে নানান ধরণের পাক্ষিক আর মাসিক কাগজ আর রীতিমতো সভাসমিতি। এমন ঘটনাও ওখানে দেখা গেছে যে কোন পুরোণো টিকিট বিক্রী করে কেউ কেউ রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠেছে। যারা টিকিট জমাও তোমাদের ভেতরে, তারা নিশ্চয়ই জানো যে এক একখানা টিকিট সময়ে সময়ে এমন দুর্ল্লভ হয়ে পড়ে যে, তার দাম অসম্ভব রকমের বেড়ে যায়। বছর সাতেক আগে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী দামের টিকিট ছিলো British Guineaর একখানা টিকিট। এ-টিকিটখানা ছাপা হয় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে, তখন তার দাম ছিল মাত্র তিন পয়সা (এক সেণ্ট); আর প্রায় চুয়াত্তর বছর পরে এর দাম হলো প্রায় এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা! ব্যাপারটায় আশ্চর্য্যবোধ হয় না? ডাকটিকিট জমিয়ে আমেরিকার কর্ণেল গ্রীণ বলে একজন লোকের রোজগার হয় অনেক লাখ টাকা। পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জেরও জমানো টিকিটের অনেক দাম ছিলো।

তোমাদের যার Phiiatelyর নেশা নেই সে ভাবতে পারে যে সখ ক'রে টিকিট-জমানো ব্যাপারটা নিতান্তই ছেলেমানুষী। কিন্তু এর মজার দিকটা বাদ দিলেও এর গুণ যে কত তা' হয়ত সে ধারণাই করতে পারবে না। এই সব ছোট ছোট বিদেশী টিকিটের মধ্যে দিয়ে আমরা একসঙ্গে অনেক কথা জানতে পারি। জানতে পারি তাদের জন্মস্থানের ইতিহাস, সেখানকার বড়ো বড়ো কীর্ত্তি কলাপ আর বিশেষ ঘটনা, সেখানকার মহাপুরুষ আর ধর্ম্ম-ব্যবস্থার কথা আর নানারকমের আচার ব্যবহারের বিশেষত্ব। এই Philately আমাদের কত সহজে ভূগোল, ইতিহাস, কিছু কিছু বিদেশী ভাষা, আরো কত জানবার কথা শেখায়। এর আরেকটা খুব বড়ো গুণ আছে। একটা টিকিটকে কত যত্ন করে ময়লা তুলে, ছেঁড়া বাঁচিয়ে, ডাকের ছাপের হাত এড়িয়ে, পরিষ্কার করে শুকিয়ে তারপর এ্যালবামে তুলতে হয়, তা' তো তোমরা জানো। এর থেকে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবার অভ্যাস হয় না?

এক-একটি দূরদেশের টিকিটের দিকে তাকিয়ে কত কথাই না মনে হয়। তার ভ্রমণ বৃত্তান্তের কথা ভাবলে আমাদের কত কল্পনা করতে হয় বল তো; কত পাহাড় সে ডিঙ্গিয়েছে, পার হয়েছে কত অতলস্পর্শী সমুদ্র, বন্দী হ'য়ে কত অপরিচিতের হাতেই না সে ঘুরে এসে এখন যেন আমাদের সামনে নিরীহ চোখে চেয়ে আছে। আর এই সমস্ত টিকিটের বুকে সভ্য জগতের কত বড়ো বড়ো কাহিনী অমর হ'য়ে রয়েছে। কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার যাত্রা, বিখ্যাত ফরাসী জাহাজ নরমাণ্ডির প্রথম সমুদ্র যাত্রা, ব্লেরিয়টের এরোপ্লেনে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া, অষ্ট্রিয়ার শাসনকর্ত্তা ডলফাসের মৃত্যু এ সবের স্মৃতিই ডাকটিকিট বাঁচিয়ে রাখবে।

পরের মাসে ভারতবর্ষের নতুন ডাকটিকিট সম্বন্ধে বলব।



শ্রীইন্দিরা দেবী

আমার আদরের ছোট্ট বোনেরা—

এ বিভাগটি কেবলমাত্র তোমাদের জন্যই। তোমরা যাতে সব দিক দিয়ে নানা জিনিষ শেখো এ বৈঠকের তাই-ই হবে একমাত্র কাজ। তোমরা এখন কত ছোট ছোট আছ—অনেকেই হয়ত পুতুল খেলার মায়া কাটাতে পারোনি, সবার সামনে পুতুল নিয়ে খেলা না করলেও সবার অলক্ষ্যে করো—নয় কি? আমি জানি কত ভাল লাগে, আর ভাল লাগে ঘরখানা বা আলমারীটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে—নিখুঁত ক'রে ঝকঝকে, তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে কার না মন যায়।

আচ্ছা ধরো ঐ যে তোমাদের আলমারীটা—উপর তাকে কতকগুলি বই রেখেছ—যা অবসর সময় পড়ো—কোনের দিকে ঐ আলুর পুতুল জামা কাপড় পুঁথির গয়না পরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে—যেন তোমাদের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ওটা—তারপর ছোট ছোট চেয়ার, টেবিল, দমদেওয়া গাড়ী, পুতুল, হাঁস, বক ছোট্ট ছোট্ট সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়াম—খেলাঘরের ছোট্ট বাসন—এমনি ভাবে সাজিয়েছ শুধু তোমার ছোট্ট আলমারীটা নয়—সে ঘরও যেন সৌন্দর্য্যময় হয়ে উঠেছে। যে যত চমৎকার ক'রে সাজাতে পারবে তার রুচি হবে তত সুন্দর নিখুঁত ও আনন্দ উজ্জ্বল। এতে খুব আনন্দ পাওয়া যায়—নয় কি?

তোমরা যখন এই বয়সটা পেরিয়ে যাবে—আরও বড় হবে—তখন যে সংসারে তোমরা যাবে—সে সংসার ও সে গৃহকে ঠিক এমনি করে সুন্দর নিখুঁত ও উজ্জ্বল করতে হবে তোমাদের সকলকে। ছোট্ট বেলায় যে পুতুল খেলা সুরু করেছ—বড় বেলায় সে পুতুল খেলা আরো চমৎকার ভাবে সারা জীবন ধরে বয়ে চলবে। সে খেলা যাতে সুন্দর ও সার্থক হয়—সংসার তোমাদের সকলের প্রাণময় স্পর্শ পেয়ে সৌন্দর্য্যের আনন্দের ও স্বাস্থ্যের সঙ্গীত যেন প্রত্যেকের জীবনে ছড়িয়ে দিতে পারে নিখুঁত ভাবে. দেশ বা জাতি যাতে তোমাদের মত মেয়ে পেয়ে গৌরব বোধ করতে পারে—এমনি করে তোমরা সকলে সমাজ ও সংসার জীবনের ভিতর দিয়ে দেশ বা জাতিকে আরো সুস্থ, সবল, সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারো। এমন শিক্ষা এমন ভাব ও এমন ভাষার ভিতর এই সৌন্দর্য্যের স্বাস্থ্যের ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও শান্তির অনুপ্রেরণা তোমাদের সকলের ভিতর জাগিয়ে দেবার জন্যই 'ভাবী গৃহিনীর বৈঠকের' জন্ম হলো—আশাকরি সকলে একে খুব আপনার করে নেবে আদরের স্নেহের ও সম্মানের চোখে দেখবে। এই বিভাগটি সম্পূর্ণ ভাবে তোমাদের—একথা যেন সদা সর্ব্বদা তোমাদের মনে থাকে। তোমাদের সকলের নিজের নিজের অভিমত খুব আদরের সঙ্গে গ্রহণ করা হবে। তোমাদের কি শুনতে ভালো লাগে বা ইচ্ছা করে বা কি রকম হলে তোমরা যোগদান করে এ বৈঠকটি জমিয়ে তুলতে পার এমনি সব বিভিন্ন ধরণের মতামত, যুক্তি তর্ক ও অভিমত—তোমাদের জানাবার জন্য আহ্বান করছি।

আমাদের লাইব্রেরী

সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২৷৷০

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা মজার মজার গল্প ও ছবির বই। কিন্তু তোমরা ভেবোনা সাধারণ যে সব গল্প আমরা পড়ে থাকি এ বই সে রকম গল্পের মত। তা মোটেই না, এ একেবারে নতুন জিনিষ এবং যা একজন মাত্রই এরকম লিখতে পারেন। গল্পগুলি যে শুনছে তার বয়স মোটে ন'বছর আর যিনি শোনাচ্ছেন তাঁর বয়স সত্তর পার হয়ে গিয়েছে। এই মোটে ন'বছরের ছোট্ট শ্রোতাটির নাম পুপেদিদি, তাকে ঘিরেই এ সুন্দর গল্পগুলি—পুপেদিদির ও গল্পদাদুর ভারী মজার কথোপকথোনগুলি। কিন্তু সবচেয়ে মজা পুপেদিদিমণিকে নিয়েও নয়—সত্তর বছর পার হওয়া পুপেদিদির দাদামহাশয়কে নিয়েও নয়। আসল মজা 'সে' কে নিয়ে! সে কে নিয়েই সব অসম্ভব আজগুবী গল্পের অনাসৃষ্টি। কত অদ্ভুত কাণ্ড না ঘটল, কত গুজব না রটল এ সে কে নিয়ে যা পড়তে পড়তে তোমরা যেমন হেসে গড়িয়ে যাবে তেমনি আবার উঠে বসে সে'র সম্বন্ধে ভাবতে বসবে। আমরা জানি 'সে' লোক ভাল কোন্ নগরে প্রশ্ন চিহ্নের গলিতে তার বাড়ী. বাকি খবর ও তার কাণ্ডগুলি তোমরা এ বইটি থেকেই পাবে। যদি সবগুলোকে কাণ্ডই ধরো, সবশুদ্ধ এরকম ১৪টি কাণ্ড আছে বইটিতে। এই ১৪টির একটি কাণ্ড অর্থাৎ ৫ নম্বরটি রংমশালে গত বছর কার্ত্তিকে প্রকাশিত হয়েছিল। মনে নেই সেই যে শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঙ্কুনা আর গাণ্ডিসাণ্ডুং? এই অদ্ভুত গাণ্ডিসাণ্ডুং এর অদ্ভুত ছবি এঁকেছেন বইটিতে লেখক নিজে। এ ছাড়া আরো মজার মজার ছবি তিনি নিজের হাতে এঁকেছেন তোমাদের জন্য। হিজিবিজি কালিকলমের আঁচড় থেকে তিনি বার করেছেন অদ্ভুত জীব, জন্তু ও লোকেদের আকৃতি। বিশ্বকবির এই নতুন রকম বইটি পড়ে আমরা যেমন প্রচুর আনন্দ পেয়েছি তেমনি তোমরাও পাবে। কিন্তু কেবল পাতা উল্টে গেলেই চলবে না, সবকাজ ফেলে অতি মন দিয়ে পড়া চাই। বইটির বাঁধাই ও ছাপাও বেশ সুন্দর।

বাড়ী থেকে পালিয়ে—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিচিত্রিত। শ্রীসতীকান্ত গুহ সম্পাদিত। প্রাচী পাবলিসিং হাউস, ১০ ইন্দ্ররায় রোড, কলিকাতা।

শিবরাম বাবুর গল্প তোমাদের কেমন লাগে তা তোমরা আমাদের চেয়ে বোধকরি ভালই জানো। কিন্তু এ বইটি আমাদের সকলের চেয়ে পছন্দ হয়েছে। বাড়ী থেকে পালিয়ে কাঞ্চন কলকাতা গিয়ে কি সব কাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছিল তার কথা হাসি আনন্দ বেদনার রসে সুমধুর হয়েছে। কিন্তু বইটার যে জিনিষটি প্রথম আমাদের চোখে পড়েচে তা হচ্ছে বইটির চেহারা। এর আগে শিবরাম বাবুর যে সব বই আমরা দেখেছি তাদের পোষাক ছিল এক রকম আটপৌরে। কিন্তু এবার প্রাচী পাবলিশিং হাউসে তার যে টেলারিং হয়েছে তাতে শিবরামবাবুর গল্প যেন বেরিয়ে এলো নতুন মানুষ হয়ে, তার সুরুচিসম্পন্ন চেহারা ও সাজগোজের দিকে একটু না চেয়ে থাকা যায়না। ওপরে রঙীন মলাটের ছবিতে ও ভেতরে থিক্ কাগজে পরিচ্ছন্ন হরফে চোখ বুলুলে আরাম পাওয়া যায়। দেখে মনে হচ্ছে এঁরা নানা পরিকল্পনা ও বহু পরিশ্রম করে শিশুসাহিত্যে আসর জমাতে নেমেছেন। এঁদের পরের বইগুলির জন্য আমরা চেয়ে রইলাম।

এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে—শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। দাম দশ আনা।

এই দুটি লেখককেই তোমরা ভালরকম চেনো দুজনেই হাসির গল্প খুব জমাতে পারেন। এ বইটিতে ছ'টি গল্প আছে—তিনটি শ্রীশিবরামের আর তিনটি ভট্টাচার্য্য মশায়ের। হাসির সরবরাহের ভার তাঁরা দুজনে মিলে ভাগ করে নিয়েছেন। এই ছ'টি গল্প—এতে আছে নিখিলবঙ্গ জীবনী সঙ্ঘ, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ, দি হিমাচালিয়ান্ আর্ট গ্যালারী, আমার সম্পাদক শিকার, অথ আয়োডিন ঘটিত ও এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে। এঁদের লেখাগুলির বিশদ বিবরণ অনাবশ্যক—যে কোন মাসের যে কোন দিবসেই গল্পগুলি উপভোগ্য। ছাপা বাঁধাই আটপৌরে।

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা—

বিমল দত্ত এম্ এ। চারু সাহিত্য কুটীর। দাম দশ আনা।

নাম শুনেই বুঝতে পারছ হাসি টাসি নয় একেবারে এ্যাড্ভেঞ্চারের বই। অবশ্য এরকম বই তোমরা আগে অনেকে পড়েছ। একটি দুঃসাহসী ছেলের কাহিনী। এক বিদেশী সার্কাসে যোগ দিয়ে কেমন করে পরে সে এ্যাড্ভেঞ্চার বরণ করে নিলে, পরে টোটো

দি টেরিবল্ হয়ে সে কেমন করে জগতে পরিচিত হয়ে পড়ল, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বনেজঙ্গলে তার নানা অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী এর সব লোমহর্ষণ ঘটনাগুলি পড়তে তোমাদের মন্দ লাগবে না। বইটির ছাপাও ছবি ভালই।

আঁধার রাতে আর্ত্তনাদ—

ধীরেন্দ্রলাল ধর। দাম বারো আনা।

এই বইটিও ভয়—তরাসে মাবামারি খুনোখুনির গল্প—ধীরেনবাবু যাতে একরকম হাত পাকিয়েছেন। এতে বৈজ্ঞানিক আছে, দুঃসাহসী ছেলেরা আছে, পুলিস ডিটেকটিভ আছে আর আছে তান্ত্রিক সাধু ও জোচ্চোরদের দল। এর এক জটাধারী বিরাট পুরুষ লম্বায় অসাধারণ মানুষের ডবল উঁচু, চোখে তার মেসমেরিজমের শক্তি—তার সাহায্যে পাঁচ ফুট মানুষকে দশফুট উঁচু করাই হল এক শঠ বৈজ্ঞানিকের ভয়ঙ্কর গবেষণা। এ বইতে বহু চরিত্র নিয়ে অনেক রকম ঘটনা সৃষ্টি করে একটা পুরোদস্তুর নভেল করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

গল্পের মণিমালা—

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রকাশিত। কমলা বুক ডিপো। ১২০ পৃষ্ঠা দাম ১।৵০

লম্বা ছুটিতে একটা মোটা ছবি ও গল্পের বই তোমাদের হাতে থাকলে বেশ সময় কাটে, নয়? আর পূজার বার্ষিকী পড়তে কেনা ভালবাসে? এরকম একটি বই গল্পের মণিমালা, এতে নানা ধরণের বাছাই করা ১৪টি গল্প একসঙ্গে জমান হয়েছে। এ্যাডভেঞ্চারের গল্প, হাসির গল্প, রূপকথা সবই এতে আছে। আর যাঁরা হাত পাকিয়েছেন তাঁদের অনেকের লেখা এতে আছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্র কুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অখিল নিয়োগী, শিবরাম চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকের লেখা আছে। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা কেন বাদ দেওয়া হোল জানি না। বইটির নানা সুন্দর সুন্দর ছবি দেখে তোমরা খুসী হবে মনে হচ্ছে। ছাপা বাঁধাইও বেশ।

আগামী সংখ্যা হইতে কেবলমাত্র

রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকাদের জন্য

"চিঠির বাক্স"

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

এই পূজোর ছুটিতে তোমাদের ভেতর অনেকেই নিশ্চয় বাইরে যাবে বেড়াতে। বাইরে ছুটি উপভোগের উজ্জ্বল মুহূর্তগুলোকে খুব সহজেই কি করে স্থায়ী করা যেতে পারে,—নিশ্চয় তোমরা জানো। আমি ফটো তোলার কথাই বলছি।

এ বিষয়ে তোমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে আমরা একটি "আলোক চিত্র প্রতিযোগিতা" র প্রবর্তন করলুম। তিনটি পুরস্কার আমরা দেবো। ছবি পাঠাবার শেষ দিন হচ্ছে ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪৪।

এই সঙ্গে একটি করে কুপন ছাপান হল। ছবির সঙ্গে কুপন পাঠাতে ভুলোনা। ছবি কোন্ জায়গায়, কি সময়ে, কি ক্যামেরায়, কি ফিল্মে, তোলা হয়েছে তা' জানিও। হয়তো তোমাদের অনেকের কারুর খুব ভালো ক্যামেরা নেই। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। যে কোনও সাধারণ ক্যামেরায় অসাধারণ ভালো ছবি তোলা যায়—চাই শুধু শিল্পী মন আর আলো ও ছায়ার ভালো জ্ঞান।

ছবি শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যের হওয়া চাই—কারণ যে কোনও ক্যামেরায় এই বিষয়ে ভালো ছবি তোলা চলে। প্রকৃতির দৃশ্যের ছবি যাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে, এমন ভাবে তুললে ভালো হয়। মোট কথা ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে এক একদিন তোমরা বেরিয়ে পড়বে—আর যা তোমাদের নতুন ধরনের অথচ সুন্দর বলে' মনে হ'বে শুধু তারই ছবি তুলো।

"আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার কুপন"

নাম ________________

ঠিকানা ________________

____

____

তারিখ ________________



"বেশ, আমার এই খরগোসটার পিঠে চড়ে বাড়ী যাও......"

রংমশাল

দ্বিতীয় বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা

অগ্রহায়ণ
১৩৪৪

চাঁদা মামা

শ্রীসুখলতা রাও

"আয় আয় চাঁদা মামা টিপ্ দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ দিয়ে যা।"

জ্যোৎস্না ভরা চাতালের উপর মাদুর পেতে বাদলকে কোলে নিয়ে তার মা [illegible] চাঁদকে ডাকছেন "আয় আয় চাঁদা মামা—"। দুষ্টু বাদল শান্ত হয়ে, অবাক হয়ে [illegible] চেয়ে আছে। আর চেয়ে আছে একটি ছোট মেয়ে, সে মাদুরের একপাশে তার [illegible] উপর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে-ভরা মাথাটি রেখে শুয়েছে। [illegible] রাণু বলে তাকে, তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে [illegible] সে এখন বড় হয়েছে, নিজেই জামা পরতে [illegible] পারে, [illegible]। এখন যদি তার [illegible]

চাঁদা মামা

শ্রীসুখলতা রাও

রাণুর মনে এত কি ভাবনা? তার মাসী দুদিনের জন্য তাদের বাড়ী এসেছেন, তাঁর ছেলে বাদলকে টিপ্ দিয়ে যাবার জন্য চাঁদকে ডাকছেন, সেই ডাক শুনে রাণুর মনে পড়ছে, সে যখন ছেলেমানুষ ছিল তার মাও তাকে কোলে নিয়ে অমনি ক'রে চাঁদা মামাকে ডাকতেন। এখন আর তাদের বাড়ীতে কেউ চাঁদকে ডাকে না টিপ্ দিয়ে যেতে। তাদের বাড়ীতে যদি বাদলের মত একটি খোকা থাক্‌ত ত' রাণু তাকে কোলে নিয়ে চাঁদকে ডাক্‌ত; এই কথা মনে করতে করতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ সে দেখল চাঁদা মামা মিট্ মিট্ ক'রে হাসছে আর মাসীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে, বাদলের কপালে টিপ্ দিতে নেমে আসছে, শাদা মেঘটা পার হয়ে লাল তারাটার কাছে, আরও নীচে, আরও নীচে, নামতে নামতে একেবারে আমগাছের মাথার উপর নেমে এল, বাদলের কপালে টিপ্ দিতে হাত বাড়াল। বাদল যেমনি মায়ের কোলে মুখ লুকিয়েছে, চাঁদা মামা দু'হাতে রাণুকে তুলে নিয়ে হুস্ ক'রে আকাশে উঠ্‌ল, আর দেখতে দেখতে একেবারে চাঁদের দেশে চ'লে গেল। সে কী চমৎকার! রাণু এমন দেশ কখনও দেখেনি—আশ্চর্য্য পাহাড়, আশ্চর্য্য ঘর বাড়ী, সেখানে আকাশে মেঘ নেই, খালি অন্ধকারে হাজার তারা ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে; নীচে চাঁদের দেশ আলোয় আলোময়। চাঁদ তাকে বল্‌ল "ঘুরে ঘুরে দেখে এস, কিছু ভয় নেই।" রাণু কিন্তু পা বাড়িয়েই চম্‌কে গেল। মস্ত বড় কে একজন, তার শণের মত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, চরকার চাকা ঘোরাচ্ছে আর গুন্ গুন্ ক'রে গান করছে। সে একহাতে জ্যোৎস্নার মত প্যাঁজা তুলো ধরেছে আর তা থেকে সুতার মত আলোর ধারা বেরিয়ে আসছে। চাঁদ বলেছিল ভয় নেই, তাই রাণু সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল "তুমি কে?" সে বল্‌ল "আমি চাঁদের বুড়ী।" রাণু বল্‌ল "তুমি ও কি করছ?" বুড়ী বল্‌ল "আমি চাঁদের আলোর সুতা কাটছি, এই সুতার জাল আকাশে ছড়িয়ে পড়ে তাকেই তোমরা জ্যোৎস্না বল। রাত্রি বেলা সুতা কাটি, দিনের বেলা চরকার উপর মাথা রেখে আমি ঘুমাই। অমাবস্যার দিন আমার রবিবার, একেবারেই ছুটি। তুমি বাড়ী গিয়ে একবার চেয়ে দেখো আমাকে এখানে দেখতে পাবে।"

তাইত, বাড়ী ত যেতে হবে; রাণু ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। চাঁদের বুড়ী বল্‌ল "হ্যাঁ ভাই, এসো। এখানে থেকে আর কি করবে? এখানে তোমার খাবার মত কিছুই নেই, জল পর্য্যন্ত নেই, আমরা কেবল আলো খেয়ে থাকি।" তাইত, কি ক'রে বাড়ী যাওয়া যায়? চাঁদা মামাই বা কোথায় গেল? ঠিক এই সময়ে চাঁদা মামা একটা শাদা খরগোস কোলে ক'রে সেখানে হাজির হ'ল। রাণু বাড়ী যাবার কথা বলতে চাঁদ বল্‌ল "বেশ, আমার এই

খরগোসটার পিঠে চ'ড়ে বাড়ী যাও ; আমাকে এখন কেউ ডাকছে না, আমি আর এখন যাব না।" শাদা মেঘের মত খরগোসটার পিঠে রাণু উঠে বসতেই খরগোসটা মাতুর হ'য়ে গেল মাতুরটাও কেমন ক'রে জানি রাণুদের বাড়ীর চাতালের উপর বিছান হ'য়ে গেল। সেই মাতুরের উপর ব'সে রাণুর মাসী রাণুকে ঠেলতে লাগলেন "ও রাণু, ওঠ, ওঠ, দেখবি চল্।"

রাণুর মাসী তার হাত ধ'রে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে বাতি জ্বলছে, খাটের উপর—মার কাছে কি যেন আছে। মাসী তাকে আরও কাছে নিয়ে গেলেন—ওমা' কি সুন্দর এইটুকু ছোট্ট খোকা !!

সেই খোকাটি যখন চারিদিকে চেয়ে দেখতে শিখ্‌ল, হাসতে শিখ্‌ল, রাণু তাকে কোলে নিয়ে খাটের উপর বস্‌ত, জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদ তাদের দিকে চেয়ে মিট্ মিট্ ক'রে হাস্‌ত, আর রাণু হাত তুলে ডাক্‌ত—

"আয় আয় চাঁদা মামা টিপ্ দিয়ে যা,
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ দিয়ে যা।"



ডেন্‌টিষ্ট

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক

নামজাদা ডেন্‌টিষ্ট সুভীষণ দত্ত
হামেসাই এমেচার 'থিয়েটার' করত—
সর্ব্বদা নাম্‌ত সে হীরো আর ভিলেনে,
চীৎকারে ক্র্যাক্ হোত মজবুত খিলেনে !
হ'ল বটে আজ তার ছ'বছর প্র্যাক্‌টিস্ ;
শিখেছে যদিও কিছু মেডিকেল ট্যাক্‌টিক্‌স্ ;
থিয়েটারি ভাব তবু মনে দেয় ধর্ণা—
সুভীষণ এক্‌টারও, শুধু ডাক্তার না ।
এন্‌কোর শুনতে সে ভারী ভালবাসত
ক্ল্যাপ পেতো যাতে সেটা আরবার করত !
এমন কি ডেথ্-শিনে যদি ক্ল্যাপ্ পেত সে—
চকিতে বাঁচিয়া পুনঃ বারেক মরিত সে !!
একদিন দাদা তার এলো দাঁত তুলতে,
ব্যাথায় ফেলিল কাঁদি ব্যাণ্ডেজ্ খুল্‌তে ;
এতই যতনে সুভো পোকা-দাঁত তুললো—
ছাত্রেরা বাহবা ও তালি দিয়ে উঠ্‌লো ;
ক্ল্যাপ শুনে সামলাতে পারল না ডাক্তার—
বাগায়ে ধরিল পুনঃ টুথ্ এক্‌ষ্ট্রাক্‌টার,
ভালো দাঁতগুলিকেও পটাপট্ তুল্‌লো—
রোগীও বাপের নাম অচিরাৎ ভুল্‌লো !!





শাস্তি

শ্রীবিমলদত্ত এম.এ

লোহার গেট্‌ওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ীটার সামনে সুসজ্জিত বাগান। সেখানে রঙিন প্রজাপতির মতই ফুর্‌ফুর্‌ ঘুর্‌ঘুর্‌ করে' খেলা করছে দুটী ছেলেমেয়ে—বিনু আর নীলা। খুবই বড়লোকের ছেলেমেয়ে ওরা—দুঃখের বা কষ্টের এতটুকু আঁচও লাগেনা ওদের মনে। সুখী—সুখী—ভারি সুখের জীবন ওদের—হাসি, খেলা, আদর আর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা যেন ওদের জগৎটা।

সকাল বেলা—সবুজে আব্‌ছা সকাল—গেট্‌টা তখনো বন্ধ। বাহারি পশমী পুল্‌-ওভারের উপর গলা-খোলা অলেষ্টার গায়ে ভাই বোন্‌ সামনের বাগানটীতে বেড়াচ্ছে—নকল ঝরণার চারধারে ঘুরে ঘুরে তারা সাত রাজ্যের গল্প কর্‌ছে—ওঃ সে কত কথা! খুশী মনের আপনি-বেরিয়ে-আসা উচ্ছ্বাস—ভারি মিষ্টি। বিনুর হাতে একটা রঙ্‌দার লাট্টু—কথা কইতে কইতে তাতে লেত্তি জড়িয়ে জড়িয়ে মাঝে মাঝে সে লাট্টুটা ঘোরাচ্ছে—সাম্‌নের সুরকির পথের উপর রঙিন ফুলের মত লাট্টুটা ঘুরছে—বিনুর চোখে মুখে খুশীর জ্যোৎস্না...

নীলার হাতে একটা স্কিপ্‌ করবার দড়ি—একটু রাঙা মিঠে রোদ উঠ্‌লেই সে নরম ঘাসের উপর পা ফেলে লাফাবে...

দু'জনে কত কি কথাই বক্‌ছে—ভোরের ঘুমজাগা পাখীর মত—অর্থহীন আনন্দে ভরা রঙীন স্বপ্নের টুক্‌রো...

সহসা তাদের চোখ পড়্‌ল সামনের রাস্তার উপর। একটা বেঁটে রোগা কুঁজো কুচ্ছিৎ ছেলে মাথায় একটা ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে চলেছে। হাড়-কাঁপানো শীতে তার গায়ে এক ছিটেও কাপড় নেই—শুধু কোমরে জড়ানো একটা নেংটি। চোখ দুটো তার কোটরে ঢুকে গেছে—

মুখের হাড় বার হয়ে দেখতে হ'য়েছে ভয়ঙ্কর। বিনু আর নীলাকে দেখে সে গেটের কাছে দাঁড়ালো—তার রোগা সরু হাত গেটের উপর রেখে সে অবাক চোখে বিনু আর নীলাকে দেখছে। বিনু আর নীলা দেখ্‌লো তার মাথায় ঝুড়িতে যতরাজ্যের পোড়া কয়লা। নীলার চোখ দুটো ছলোছলো হ'য়ে উঠ্‌লো। বিনু লাট্টুতে লেত্তি জড়িয়ে সিমেন্টের উপর এক গচ্চা মেরে দিলে। বন্ বন্ করে' লাট্টু ঘুরছে—রঙিন রঙের রংমশাল জ্বলে উঠ্‌ল ছেলেটার চোখে—মুখ থেকে তার বেরিয়ে এলো বড়ো শুক্‌নো বড়ো করুণ একফালি হাসি—ঠিক একাদশীর আধমরা চাঁদের হাসির মত।

বিনু ধমকে উঠ্‌ল—"এই হ্যাংলা, কি চাস্?"

ছেলেটা লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে তার হাড়ের মত রোগা হাতটা বার করে' বল্‌লে "বাবু—ঐ লাটুটা—"

বিনু ভেংচে উঠ্‌ল—"ইল্লি—ভাজা মাছটা গিল্লি!" বলে' ছেলেটাকে কলা দেখালে।

নীলা মিনতির সুরে বলে "বিনু ভাইটী, ছিঃ—ওকে কেন গাল্ দিচ্ছ!—লাট্টুটা দিয়ে দাও—তোমার ত' কতই আছে।"

"থাক্‌লেই বুঝি দিতে হয়! ভারি খাতির আর কি—তোমার যদি দয়া হ'য়ে থাকে, দাও না—" বিনু আরেকধারে সরে যায়।

নীলা বলে "আমার থাক্‌লে দিয়ে দিতুম। তোর ত' কত গণ্ডা লাট্টু আছে—দেনা ওকে একটা—"

বিনু ছেলেটাকে তেড়ে যায় "ভাগ্—ভাগ্—ছোঁড়া—লাট্টু ভারি সস্তা না—কিন্‌তে দাম লাগে না?" নীলা গেটের কাছে এগিয়ে যায়—"তোমার নাম কি? কোথায় থাকো?"

ছেলেটা ছলোছলো চোখে নীলার দিকে তাকায়—"আমার নাম মাণিক—ওই মুচি-পাড়ার উদিকে কাঠগুদোম—উইখানে থাকি।"

নীলা জিজ্ঞাসা করে, "তোমার মা-বাবা কোথায়?"

ছেলেটার চোখের কূল ছাপিয়ে জল আসে—"নেই—সব মরে গেছে—এই কাঠগুদোমের বাবুর কাছে চাকরি করি—সারাদিন কাঠ বইতে হয় আর সকালবেলা পোড়া কয়লা কুড়িয়ে আন্‌তে বলে—"

"পোড়া কয়লা কোথায় পাও?"

"কেন? সব বাড়ী থেকে ছাইপাঁশ কয়লা ফেলে—তার ভিত্‌রি থাকে। এই কাঁচটা আজ কুড়িয়ে পেয়েছি—" ছেলেটা নেংটির খাঁজ থেকে একটা ঝাড় লণ্ঠনভাঙা তিন কোণা কাঁচ

বার করে' চোখের সাম্‌নে ঘুরিয়ে দেখে—রামধনুর বন্দী সাতরঙ্‌ তার মধ্য থেকে উঁকি মারে—ওঃ ওর কত আমোদ।

বিনু খেঁকিয়ে ওঠে "এই কুঁজো-মাণিক, যা যা কয়লা কুড়োতে যা—কাঠ বইতে যা—এখানে দাঁড়িয়ে গপ্প মার্‌তে হ'বে না।"

ছেলেটা ম্লান মুখে ধীরে ধীরে চলে যায়। যাবার সময় নীলার মুখের দিকে কৃতজ্ঞতার চাউনি চেয়ে তার ব্যথিত বুকের দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যায়।

নীলা বিনুকে বোঝায় "বিনু ভাইটী, তুমি বড় দুষ্টু—দীনদুঃখীকে তুমি বড় কষ্ট দাও—লোকের মনে কি ব্যথা দিতে আছে?"

"বা-রে ব্যথা আবার কবে দিলাম! আমার লাট্টু যদি আমি না দিই—ও চায় কেন?" বিনু তর্ক তোলে।

"ও-যে খেল্‌তে ছুটি পায় না মোটে—ওকে যে সারাদিন সবাই খাটায়" নীলা বলে।

বিনু বলে, "ও খাটে কেন? সারাদিন খেলে বেড়ালেই পারে।"

"বাঃ ওর মনিব তা'হ'লে খেতে দেবে কেন? ওর যে বাপ নেই—মা নেই—কেউ নেই—" ছল্‌ছল্‌ করে' ওঠে নীলার চোখ।

"ধেৎ—তাই বুঝি হয় কখনো—কেউ নেই ওর—বাবা, মা, দাদা, দিদি, মণিমা যাঃ..." বিনুর ছোট্ট মনে অতখানি না থাকার দুঃখ কল্পনা করবার ঠাঁই কৈ? তবুও নীলার কথা তাকে যেন এক মহা বিষাদের কালোছায়া-ঘেরা ভীষণ ভাঙনের মুখে এগিয়ে দেয়—তার মুখটা শুখিয়ে যায়—শীর্ণ কুঁজো কুচ্ছিৎ ছেলেটা তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে যেন।...

* * * *

ঝম্‌ঝম্‌ করে বাজনার শব্দ—ব্যাণ্ড্‌ বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা যাচ্ছে। বিনু চুপিচুপি বিছ্‌না থেকে উঠে পড়্‌লো। তারপর নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে এসে দাঁড়াল। রাস্তার ফুট্‌পাথের উপর দাঁড়িয়ে শিউপরসাদ দারোয়ান আলোর শোভাযাত্রা দেখ্‌ছে—বিনু গেট পার হ'য়ে শিউপরসাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

আলোয় আলোয় রাঙা হ'য়ে উঠেছে রাত্তির—বাজ্‌নার মধুর শব্দে বিনুর নেশা লাগে যেন। পরীর দেশের রাজকন্যার বিয়ের শোভাযাত্রা বুঝি!

হঠাৎ একটা গোলমাল সুরু হ'ল। তারপর মার্‌মার্‌ ধর্‌ধর্‌ আওয়াজ—যে যেদিকে পারল দৌড় লাগালো। বিনু ভয় পেয়ে শিউপরসাদের হাত ধরতে গেল—কিন্তু—য়্যাঁ—ভীড়ের ঠেলায় এ কোথায় এসে পড়েছে সে! কোথায় বা তাদের বাড়ী—কোথায় বা আলোর

শান্তি

শ্রীবিমল দত্ত

মিছিল ! বিশ্রী নোংরা একটা গলির মধ্যে মিট্‌মিটে একটা গ্যাসের খুঁটির তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা মোটা লোক তাকে ডাক্‌ছে—"পথ হারিয়েছ বুঝি ? ভয় কি—এসো, আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি—"

বিনু সেই মোটা লোকটাকে অনুসরণ করে' চল্‌তে লাগ্‌লো—গলির পর গলি সে হেঁটেই চলেছে—উঃ কী ভীষণ আঁধার স্যাঁতসেঁতে সব নোংরা রাস্তা—কাদা আর পাঁক প্যাচ্‌প্যাচ্‌ করছে—ময়লা পচার দুর্গন্ধ বার হচ্ছে।

একটা কথা মনে হ'তেই বিনুর বড় ভয় হ'ল—লোকটার কোন বদ্ মতলব নাই ত' ! সে পিছন থেকে সুট্ করে সরে' পড়্‌বে নাকি ? কিন্তু এ গলির জট্ ছাড়িয়ে সে যাবেই বা কোথা ? লোকটা হয়ত বিনুর মতলব বুঝ্‌তে পার্‌লে। সে পিছন ফিরে বিনুকে ডাক্‌লে, "এই জল্‌দি—জল্‌দি—"

একটা মোড় ঘুরতেই বিনু দেখ্‌লে তার সামনে একটা কাঠগুদোম। সারে সারে কাঠের গুঁড়ি সাজানো রয়েছে—বড় বড় করাত টেনে জোয়ান জোয়ান মদ্দ মোটা মোটা কাঠ চেরাই করছে—অত রাত্তিরেও কাঠগুদোমে কাজের বিরাম নেই—খটাখট্—ঠকাঠক্—খ্যাঁশাখ্যাঁশ্—দুম্‌দাম্—শব্দ লেগেই আছে।

বিনুর মনটা দম্‌কা হাওয়ার মুখে সদ্য ফাটা শিমূল তুলোর মত ছড়িয়ে গেল—এলোমেলো হ'য়ে।

সহসা সেই মোটা লোকটা একটা লিক্‌লিকে সরু বেত হাতে নিয়ে বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠ্‌ল—"ইধার আয়, উল্লুক—দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস্ ওই উঁচু থামটা থেকে এক একটা কাঠ নাবিয়ে আন—"

বিনু চেয়ে দেখ্‌লে তার সামনে থাক থাক কাঠ সাজানো রয়েছে—যেন কাঠের পাহাড়—আর বেজায় বড় বড় আর ভারি।

লোকটা সপাং সপাং করে' চাবুকের কয়েকটা শব্দ করে' বল্লে—"জল্‌দি জামা কাপড় খুলে এই নেংটিটা পর—জল্‌দি।"

বিনুর আর না বল্‌বার ক্ষমতা নেই। মুখ চূণ করে' সে জামা কাপড় খুলে নেংটিটা পরলে। শীতের কন্‌কনে হাওয়া তখন তার হাড়ে চাবুক বসাচ্ছে। হি-হি করে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে কাঠ নামাতে গেল। কিন্তু তাই কি পারে ? সেই প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ি একটু নড়্‌লও না।

লোকটা সপাং সপাং করে কয়েক ঘা চাবুক লাগাল বিনুর খোলা পিঠে। কচি মাংস দগ্‌দগ্ করে' জ্বলে উঠ্‌ল। বিনু মরিয়া হয়ে সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করে' কাঠ নামাতে গেলো

করলে। অপটু হাতের ঠেলায় হুড়্মুড়্ করে' তিন চারটে কাঠের গুঁড়ি তার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়্ল। বিনুর পায়ের খানিকটা চাম্ড়া উঠে গেল—বুড়ো আঙ্গুলটা থেৎলে গেল। বিনু যাতনায় চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্ল।

কিন্তু কে তার কথা শোনে! লোকটা আরো কয়েক ঘা চাবুক বিনুর পিঠে কসিয়ে দিয়ে হেঁকে উঠ্ল—"জল্দি কাঠ নামা"—চাবুকটা বাতাসে হিস্ হিস্ শব্দ করতে লাগ্ল—যেন একটা লিক্লিকে সাপ।

বিনু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাঠ নামাতে লাগ্ল। দারুণ পরিশ্রমে—অতি কষ্টে সে একটা একটা করে কাঠ নামাতে লাগ্ল। লোকটা তার দেরী দেখে দাঁত খিঁচিয়ে উঠ্ল—"উজ্বুক কাঁহাকা—এত দেরী করছিস্ কেন? ভাত খাস্ না? আজ রাতের মধ্যেই তিনশ' গুঁড়ি কাঠ নামাতে হ'বে, নয়ত তোর একদিন কি আমার একদিন।" বলে' লোকটা চাবুক সপাৎ সপাৎ করতে করতে চলে গেল।

একটা একটা করে' বিনু কাঠ নামাতে লাগ্ল। সে কাঠ নামিয়ে রাখে আর অন্য লোকে বয়ে নিয়ে চলে যায় যেখানে কাঠ চেরাই করা হচ্ছে সেখানে। এম্নি করে কাঠ নামিয়ে নামিয়ে বিনু ক্লান্ত হ'য়ে পড়্ল। বড়লোকের ছেলে—দৈহিক পরিশ্রম ত' কখনো করেনি—তা'ছাড়া দুঃখ কষ্টের একটু আঁচও তার গায়ে লাগেনি। সেই ছেলের কি মজুরদের মত এত পরিশ্রম সহ্য হয়? সেই দারুণ শীতে খালি গায়েও বিনুর দরদর করে' ঘাম ছুট্তে লাগ্ল—হাত পা অবশ হ'য়ে আস্তে লাগ্ল। দু'হাতে কাঠের চোঁচ ফুটে দাগ্ড়া দাগ্ড়া হ'য়ে ফুলে উঠ্ল। সে আর পারে না—আর দুটো—এই দুটো শেষ হ'লে এক থাক শেষ হয়। মরিয়া হ'য়ে বিনু একটা কাঠ ধরে' টান দিলে।

সহসা সেই কাঠের তলা থেকে বেরিয়ে পড়্ল একটা লাট্টু—ঠিক বিনুর সেই লাল নীল ডোরা কাটা লাট্টুটার মত। সেটা পেয়ে বিনুর এত ভাল লাগ্ল যে সে আপনার অজান্তেই একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে' সেটা নেড়ে চেড়ে দেখ্তে লাগ্ল। দেখ্তে দেখ্তে সেটা ঘোরাবার তার ভারি লোভ হ'ল। কিন্তু কি করে' ঘোরাবে? লেত্তি নেইত। শেষটায় সে হাতে করেই লাট্টুটা ঘোরাতে লাগ্ল। ভাল ঘোরে না কিন্তু তাতেই বিনুর কত আমোদ।

লাট্টু নিয়ে বিনু যখন মশ্গুল্ তখন সেই মোটা লোকটা চাবুক হাতে বিনুর পাশে এসে দাঁড়ালো। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্রে বার হ'চ্ছে। একটা থাবা মেরে সে বিনুর হাত থেকে লাট্টুটা কেড়ে নিলে। তারপর হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ করে' এক হিংস্র, বিকট, নির্মম

কেঠো হাসি হেসে—বিশ্রী মুখভঙ্গী করে' বিনুকে ঠাট্টা করে' উঠ্‌ল—"লাট্টু ঘোরাবি? ইল্লি, ভাজা মাছটা গিল্লি?"

শুখিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল বিনুর মুখ—ছ্যাঁৎ করে' মনে পড়্‌ল তার মাণিকের কথা—সেও ত' তাকে ঐ কথা বলে ঠাট্টা করেছে! বিনুর চোখের কূল ছাপিয়ে জল টল্‌মল্ করছে। সে লোকটার দিকে তাকালে। তার হাতে সেই লাল নীল লাট্টুটা। লাট্টুটার গায়ে হাত বুলোবার একটা প্রবল ইচ্ছা হ'ল বিনুর। বিনু সে ইচ্ছা কিছুতেই দমন কর্‌তে পার্‌লে না। ভয়ে ভয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলে—"লাট্টুটা দিন না—একটু খেল্‌ব।"

"খেল্‌বি? বটে? এই নে—" বলে' লোকটা রাগে গর্জ্জে উঠে ঠাঁই করে' লাট্টুটা ছুঁড়ে মার্‌লো বিনুর কপালে। লাট্টুর আল্‌টা লেগে বিনুর কপাল কেটে ঝরঝর্ করে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল। বিনু কপালে হাত দিয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

কিন্তু লোকটা কি পিশাচ! সে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে' পৈশাচিক অট্টহাসি হেসে উঠ্‌ল। সে হাসি যেন আর থামেই না। বিনু ভয়ে ভয়ে সেই দিকে তাকালে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার প্রকাণ্ড শরীর ছোট্ট সরু লিক্‌লিকে মানিকের মত হ'য়ে এল। বিনু আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লে কোথায় বা কাঠগুদোম কোথায় বা কি তার সামনে মানিক দাঁড়িয়ে—চোখ দুটো তেমনি ছলো-ছলো—মুখটা তেম্‌নি শুক্‌নো—পিঠে কুঁজ—হাড় জির্‌জিরে শরীর—বিনু ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌ল।

* * * *

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও গেল ভেঙে। সে অবাক হ'য়ে দেখ্‌লে যে সে তার বিছানায় শুয়ে আছে আর সবুজে ভোরের আব্‌ছা আলো জানলার সারসিতে উঁকি মারছে।

নীলার সঙ্গে জামা কাপড় পরে সে বাগানে নেমে এল। বেড়াতে বেড়াতে সে সমস্ত গল্পটা নীলাকে খুলে বল্লে—"কেন এমন স্বপ্ন দেখ্‌লুম দিদি ভাই?"

নীলা বল্লে, "তুমি গরিবের দুঃখ নিয়ে ঠাট্টা করেছ—তাই ভগবান দেখিয়ে দিলেন যে দুঃখটা কেমন।"

দূরে—গেটের ওপারে মাণিককে দেখা গেল। সে কয়লার ঝুড়ি মাথায় পথ চলেছে। বিনু পকেট থেকে লাট্টুটা বার করে' দৌড়ে গেল গেটের কাছে—"ও মাণিক, মাণিক, লাট্টু নেবে?—"

কিন্তু কানে যেন কথা কটা ঢোকেনি—এমনি ভাব দেখিয়ে মাণিক ওদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে চলে গেল। এদিকে ফিরেও তাকাল না।

বিনুর চোখ ভিজে এল। ঠাণ্ডা লোহার গেটের উপর গাল রেখে সে পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার মনের কূলে কূলে বেদনার ছল্‌ছলানি।

শিশির, কুয়াশা ও মেঘ

শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমরা ঝড় বাতাসের বিষয় কিছু কিছু জান্‌তে পেরেচ। আজ তোমাদের এই ঝড় বাতাসের সঙ্গী মেঘের বিষয় কিছু বল'ব। প্রথমেই কথা ওঠে মেঘ কি? মেঘ হয় কেন? মেঘের প্রয়োজন হয় কেন? সব মেঘেই কি বৃষ্টি হয়? ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক রকম প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথম প্রশ্নটাই ধরা যাক্‌। মেঘ কি? তোমরা শীতকালে লক্ষ্য করে থাক্‌বে যে আমাদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ও কথা বলবার সময় নাক ও মুখ দিয়ে সাদা সাদা ধোঁয়া বার হয়। বেশ সকাল বেলা শীতকালে আয়নার সাম্‌নে যদি নিঃশ্বাস ফেল তাহ'লে দেখ্‌তে পাবে যে আয়নার ওপর ছোট ছোট বাষ্প জমে গেছে। আবার গরম কালে কাঁচের গ্লাসের জলে বরফ দিলে দেখ্‌তে পাও গ্লাসের বাইরের দিক্‌টায় ঘামে ভরে গেছে। এও ঐ রকম ছোট ছোট বাষ্পকণা। এই বাষ্পকণা আসে কোথা থেকে? আসে বাতাস থেকে। বাতাস থেকেই বাষ্প কণার উৎপত্তি। বাতাসে অসংখ্য বাষ্পকণা আছে। কাঁচের গ্লাসের জলে যখন আমরা বরফ দিই তখন থেকে ঐ জলের তাপ ক্রমশঃ কম্‌তে থাকে আর কাঁচটিও ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। শেষে বাতাসের বাষ্পকণা ঐ ঠাণ্ডা কাঁচের গ্লাসের সংস্পর্শে এসে খুব ঠাণ্ডা হয়ে যখন পড়ে তখনই গ্লাসের বাইরে ছোট ছোট ঘামের মতো জলকণার সৃষ্টি হয়। ঠিক এই একই নিয়মে শীতকালে সকালে আমরা যখন নিঃশ্বাস ফেলি তখন আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে অসংখ্য বাষ্পকণাও বার করি। ঐ বাষ্পকণা ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শে জমে জলকণার সৃষ্টি করে আর তখনই আমরা ধোঁয়ার মতো নিঃশ্বাস নাক মুখ দিয়ে বার হ'তে দেখি।

চায়ের কেটলির মুখে যখন গরম বাষ্প বার হতে থাকে তখন তার কোন রং থাকে না। কেট্‌লির বাষ্পের তাপ ১০০ ডিগ্রি সেন্‌টিগ্রেড। এই গরম বাষ্প যখন বাইরের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আসে তখনই ঐ রংহীন বাষ্প সাদা জলীয় বাষ্পের আকার ধারণ করে।

আমাদের চারিপার্শ্বে যে হাওয়া বা বায়ু রয়েছে তাতে আছে অসংখ্য ধূলি ও বাষ্পকণা। তোমরা বল্‌বে হাওয়ায় বাষ্পকণা আসে কোথা থেকে! বাষ্পকণার আমদানি হয় পৃথিবীর যাবতীয় জলাশয় থেকে। আমাদের পৃথিবীতে খাল বিল, নদী সমুদ্র যত জলাশয় আছে সূর্য্যের তেজে তারা ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে আর তারা দিনরাত বাষ্পের সৃষ্টি করছে। এক কাপ জল বাইরে রেখে দাও দেখ্‌বে কিছুদিন পরে কাপে একটুও জল নেই—সব জল উড়ে গেছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ হচ্ছে তাপ, আর, তাপের কারণ হচ্ছে আমাদের সূর্য্য। কাজে কাজেই বায়ুতে থাকে অসংখ্য বাষ্প। এই জলীয় বাষ্প খুবই হাল্কা তাই বাতাসের সঙ্গে মিশে দুষ্টু ছেলের মতো ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই বাষ্পকণা বেশী দিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে পায় না। বায়ু মণ্ডলের ধূলিকণারা বাষ্পকণাদের আঁকড়ে ধরে আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে মিশে একটা বড় রকমের ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। এই সঙ্ঘই হচ্ছে মেঘ। তাহলে মেঘ হচ্ছে জলীয় বাষ্পকণার সঙ্ঘ মাত্র। মেঘ বড় হাল্কা তাই বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে মেঘের বাষ্পকণা ঘনীভূত হয়ে যায় আর বড় বড় জলকণার সৃষ্টি হয়। নিউটন একটা আপেলকে গাছ থেকে পড়তে দেখে স্থির করেছিলেন যে পৃথিবী সকল জিনিষকে নিজের কাছে টান্‌ছে। এর নাম দিয়েছিলেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। বড় বড় জল কণার সৃষ্টির পর তার ভার অথবা ওজন বেড়ে যায়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জন্য ঐ ভারাক্রান্ত জলীয় বাষ্পকণা মাটিতে যখন পড়তে থাকে তখন আমরা বলি বৃষ্টি পড়চে। এই বৃষ্টির জল আবার শুক্‌নো খাল বিল নদ নদী সমুদ্র সাগর প্রভৃতিকে জলে পূর্ণ করে। ফলে ঐ সকল জলাশয়ের আয় ও ব্যয় প্রায় সমানই দাঁড়ায়। তাহলে আমরা এই বল্‌তে পারি যে মেঘ জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছুই নয়। বাষ্পীভবনের পর জলীয় বাষ্প যখন ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন তারা ঠাণ্ডা হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। একে আমরা ঘনীভূত হওয়া কিম্বা জমাট বেঁধে যাওয়া বল্‌তে পারি।

অনেক সময় তোমরা বোধ হয় শুনে থাক্‌বে যে বাতাসের আর্দ্রতা ৫৪ কি ৯৫। বাতাসের আর্দ্রতা মানে হচ্ছে যে বাতাসে শতকরা কত ভাগ জলকণা আছে। ইংরাজিতে Relative humidity বলা হয়। বর্ষাকালে বাতাসে বাষ্পকণা থাকে প্রচুর পরিমাণে, শীত কালে বাতাসে জলীয় বাষ্প খুব অল্পই থাকে এই জন্য শীত কালে বাতাসের আর্দ্রতা খুবই কম তাই আমাদের গা তেল না মাখার জন্য ফাটে।

শীতকালে সকাল বেলা ঘাসের ওপর ছোট ছোট জলের ফোঁটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় এর নাম শিশির। আমরা কথায় বলি শিশির পড়ে কিন্তু শিশির কখন পড়ে না। ঘাসের

ওপর শিশির জন্মায়। শিশির কেমন করে হয় জান ? শীতের দিনে ঘাস, মাটি, গাছের পাতা সবই সূর্য্যের তাপে গরম হয় কিন্তু রাতে ঐ সকল ঘাস মাটি গাছের পাতা খুব শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাতাসের জলীয় বাষ্প ঐ সকল ঠাণ্ডা জমী ঘাস পাতার সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যায় আর তখনই ছোট ছোট জলবিন্দুর সৃষ্টি হয়—এর নাম শিশির। কিন্তু সব ভোরের বেলায় কি শিশির দেখ্‌তে পাওয়া যায় ? না, সকল দিন আমরা শিশির দেখ্‌তে পাই না। যে রাতে আকাশে একটুও মেঘ থাকে না সেই রাতে শিশির বেশী জন্মায়। তার কারণ হচ্ছে যে মেঘ আকাশের গায়ে ওড়নার মতো জড়িয়ে থাকে কাজে কাজেই এরা সব সহজে ঠাণ্ডা হতে পায় না। শিশির সৃষ্টি হতে চাই পরিষ্কার আকাশ আর শান্ত বাতাস। বাতাসে যে জলকণা আছে তার প্রমাণ এই শিশির।

শীতকালে সকাল বেলা আমরা প্রায় দেখি চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে গেছে, দূরের কোন জিনিষ তেমন স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে না। এই অস্পষ্টতার কারণ এক প্রকার ধোঁয়া যাকে আমরা কুয়াশা বলি। এই কুয়াশার জন্য গাড়ী ও জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়। বিলেতে ও আমেরিকায় কুয়াশার উপদ্রব বড় বেশী। লণ্ডন সহরে এক এক দিন এত গাঢ় কুয়াশা হয় যে রাস্তায় চলাফেরা করা বিপদজনক হয়ে পড়ে। লণ্ডনের কুয়াশার রং কালো কারণ ঐ সহরে অনেক কল কারখানা আছে। কয়লা ও চিমনির গ্যাসের ধোঁয়াতে এই সহরে প্রচুর ঘন কালো রং এর কুয়াশা জন্মায়। সাধারণতঃ কুয়াশার রং সাদা ধোঁয়ার মতো। কুয়াশা প্রায় পাহাড়ের গায় ও উপত্যকায় জন্মায়। শীতের রাতে আর্দ্র বাতাস যখনই জলাভূমির ওপর দিয়ে যায় তখনই বাতাসের জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে যায় আর কুয়াশার সৃষ্টি হয়। বাংলা দেশ জলাভূমি এই জন্য এখানে কুয়াশার প্রকোপ বেশী। পাহাড়ের গায়ে যখন আর্দ্র বাতাস এসে পড়ে তখনও কুয়াশা হয়। কুয়াশা সকাল বেলায় হয়ে থাকে। দিন যত বাড়তে থাকে সূর্য্যের তাপে কুয়াশা তত কম্‌তে থাকে শেষে কুয়াশা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠ্‌তে থাকে। এই কারণে কুয়াশা হলেই আকাশে মেঘ দেখা দেয়। কুয়াশা মেঘের প্রথম অবস্থা কাজে কাজেই কুয়াশা এক রকম মেঘ।

এই বার আমরা মেঘ হয় কি করে বল্‌তে পারি। গরম কালে সূর্য্যের তাপে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্পের আমদানি হয়। এই জলীয় বাষ্প খুব হাল্কা হওয়ায় আকাশের ওপরে ঐ জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যায় আর মেঘের সৃষ্টি হয়। আবার সাগরাগত বায়ু মানে সাগর-বায়ু সাগরের ওপর দিয়ে যখন ভেসে আসে তখন সঙ্গে করে আনে প্রচুর জলকণা। এই জলকণা জমাট বেঁধে মেঘের সৃষ্টি করে। এই কারণে গরমকালের পরই বর্ষাকাল আসে।

সন্ধানী

শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

সব বাদ্‌লা দিনে আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে দেখ্‌তে পাবে নানান রকমের মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সকল মেঘের আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে নাম করণ করা হয়েছে। সাধারণতঃ আমরা পাঁচ রকম আকৃতির মেঘ দেখ্‌তে পাই যেমন পালকের মতো ও সাদা মেঘ, স্তর মেঘ, স্তূপাকৃত মেঘ, কোদালে কুড়ুলে মেঘ ও কাল জমাট আকারহীন মেঘ। এই পাঁচ প্রকার মেঘের পৃথিবী থেকে দূরত্ব সমান নয়। পালকের মতো সাদা সাদা যে মেঘ আমরা দেখি তাদের দূরত্ব অনেক বেশী। তারপর আসে কোদালে কুড়ুলে মেঘ। শেষে আসে স্তূপ মেঘ, কাল জমাট মেঘ ও স্তর মেঘ। এই জন্যে মেঘকে তিন বিভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যম শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর, মেঘের দূরত্বের ওপর শ্রেণী বিভাগ।

মানুষের সংসারে যেমন ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব এই তিন শ্রেণীর লোক আছে ; মেঘ জগতে ও ঠিক তেমনি তিন শ্রেণীর মেঘ আছে। নিম্নশ্রেণীর মেঘে জলীয় বাষ্প থাকে প্রচুর পরিমাণে, মধ্যম শ্রেণীতে থাকে মাঝামাঝি কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর মেঘে জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে থাকে।

উচ্চেস্থিত মেঘের দূরত্ব হচ্ছে ৬ মাইল। নীল আকাশে সাদা সাদা পালকের মতো যে মেঘ দেখ্‌তে পাই তার নাম অলক মেঘ (cirrus) (১ নং ছবি দেখ)। এই মেঘের ওপরের ভাগ খুবই ঠাণ্ডা—এত ঠাণ্ডা যে ঐ ভাগের জলকণা জমে বরফ বা হিম হয়ে থাকে।



(১) অলক মেঘ (cirrus clouds)

সূর্য্যের কিম্বা চাঁদের কিরণ যখন ঐ হিমকণার ওপরে পড়ে তখন আমরা রামধনু রং-এর গোলাকারের বৃত্ত দেখ্‌তে পাই। ঐ রঙিন বৃত্তকে ছটা-মুকুট (corona) বলা হয়। কখন কখন ঐ বৃত্ত বড় ও সাদা রং-এর হয় তাকে সূর্য্যের কিম্বা চাঁদের শোভা (Halo) বলা হয়। অলক মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না কিন্তু এই মেঘ আগামী বারিপাতের সূচনা বহন করে। গরম কালে আর বিশেষ ক'রে বৈশাখ মাসের গোড়ার দিকে অলক মেঘ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

মধ্যম শ্রেণীর মেঘের দূরত্ব হচ্ছে ২ থেকে ৬ মাইল পর্য্যন্ত। কোদালে কুড়ুলে মেঘ এই শ্রেণীর। ২ নং ছবি দেখ, দেখ্‌তে পাবে চাষ করা জমীর মতো এর আকার। এই রকম চাষ করা আকার বলেই এই শ্রেণীর মেঘকে কোদালে কুড়ুলে মেঘ বলা হয়। কোদালে কুড়ুলে মেঘে বৃষ্টি হয় না, তাইতো ঠাকুমার মুখে শুন্‌তে পাও—



(২) কোদালে কুড়ুলে মেঘ

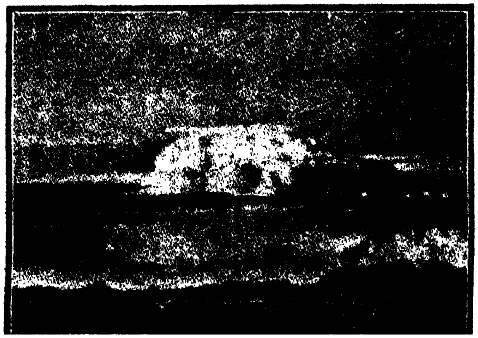
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা
বল্‌গে চাষায় বাঁধতে আল
আজ না হয় জল হবে কাল।

(খনার বচন)

মানে, মেঘের আকৃতি যদি কোদাল দিয়ে কাটা জমির মতো হয় আর সেই সঙ্গে যদি অল্প বাতাস থাকে তা হ'লে চাষা অনায়াসে জমিতে আল বাঁধতে পারে কারণ ঐ মেঘে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। কোদালে কুড়ুলে মেঘেও বর্ণচ্ছটা বা ছটামুকুট দেখা যায় তবে তারা ছোট ছোট বৃত্তের। এই মেঘে শোভার সৃষ্টি হয় না।

শেষে আমরা নিম্ন শ্রেণীর মেঘের পরিচয় পাই। এই মেঘের দূরত্ব পৃথিবী থেকে





(৩) পুঞ্জ মেঘ (cumulus clouds)

0 হ'তে ২ মাইল পর্য্যন্ত। কুয়াশা এই শ্রেণীর মেঘ তবে কুয়াশার জলকণা ঘনীভূত না থাকায় বৃষ্টি হয় না। তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে যে যেদিন ঘন কুয়াশা হয় সেদিন বাইরের

ও অন্যান্য জিনিষ ভিজে সেঁৎসেঁতে হয়ে যায়। নিম্ন শ্রেণীর মেঘ তিন প্রকার যেমন, স্তূপাকার, স্তরাকার মানে থাক থাক বসান, আর আকার-হীন।

গরম ও বর্ষাকালে দুপুর বেলা শাদা ফুলকপির মতো যে সব মেঘ দেখ্‌তে পাওয়া যায় তারই নাম স্তূপ মেঘ বা পুঞ্জ মেঘ (cumulus cloud), (৩ নং ছবি দেখ)। এদের আকার কখন কখন পাহাড়ের মতো হয় কিন্তু এই মেঘে বৃষ্টি হয় না কারণ এই মেঘের জলকণা তত ঘনীভূত থাকে না।

এই বার ৪ নং ছবি একবার লক্ষ্য কর। দেখ্‌তে পাচ্ছ যে এই মেঘের আকার পাহাড়ের মতো বিরাট, তেমনি ভয়ঙ্কর। এই মেঘের নাম পুঞ্জ-জলপ্রদ মেঘ (cumulo-nimbus cloud). এই মেঘ থেকে বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে, ঝড় আসে আর বেশ বৃষ্টি হয়। কখন কখন শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। এই মেঘের চূড়া গগনভেদী দেখ্‌লেই মনে হয় যেন একটা দৈত্য সমস্ত আকাশটা গ্রাস করতে আস্‌চে। এই মেঘ দেখে রবিবাবুর কৃষ্ণকলি কবিতাটী মনে পড়ে না কি?



(৪) পুঞ্জ জলপ্রদ মেঘ (Cumulus-nimbus Clouds.)

এম্‌নি ক'রে কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোণে।
এম্‌নি ক'রে কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে॥

আর ছুটির দিনে এই কালো পুঞ্জ জলপ্রদ মেঘ দেখে শিশু আশ্চর্য্য হয়ে মাকে বলে—

ঐ দেখ মা বর্ষা এলো
ঘনঘটায় ঘিরে
বিজুলি ধায় এঁকে বেঁকে
আকাশ চিরে চিরে।

তারপরই "মুরু—গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।"

কাল বৈশাখীর কথা তোমাদের বলেচি বোধ হয় তা ভুলে যাও নি। কালবৈশাখীর আগমন সূচনা করে এই পুঞ্জ জলপ্রদ মেঘ। হঠাৎ গরম বাতাস ওপরে যখন উঠে যায় তখনই এই বিরাট মেঘের সৃষ্টি হয়। এই হঠাৎ বায়ুর বেগ পরিবর্ত্তনের কারণ হচ্ছে সূর্য্যের তাপ। বৈশাখ মাসে বিকাল বেলার দিকেই প্রায় এই মেঘের সৃষ্টি হয় কারণ সকাল থেকে বিকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভূমি গরম হতে থাকে আর এই গরম ভূমির ওপরকার বায়ুস্তর সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে ওঠে, ওপরের দিকে দিকে ঐ গরম বায়ুস্তর হাল্কা হয়ে হঠাৎ ওপরের দিকে ঠেলে ওঠে আর তখনই ওপরকার ঠাণ্ডা বায়ুস্তরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ধাক্কার ফলে অতিকায় পুঞ্জ জলপ্রদ মেঘের সৃষ্টি হয়—সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগ খুব বেড়ে যায় আর ঝড় জল আরম্ভ হয়। যে মেঘে বৃষ্টি হয় তার নাম জলপ্রদ মেঘ (Nimbus cloud) এই মেঘের কোন বিশিষ্ট আকৃতি নেই। বর্ষাকালে এই মেঘ সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে আর অবিরাম বৃষ্টি হয়। শরৎ কালের আকাশে যে কালো মেঘ দেখি তা এই মেঘ। এ মেঘ যেখানে থাকে সেখানেই বৃষ্টি হয়। এই মেঘের রং কালো। পুঞ্জ জলপ্রদ মেঘের ঠিক নিচে এই মেঘ থাকে বলেই ঐ মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। তাই কখন কখন দেখ না কি—

ওপারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্সা গাছপালা।
এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।

মেঘের কথা এইখানেই শেষ করলাম। মেঘ না হলে বৃষ্টি হোত না, কোন শস্যও জন্মাতো না,--দেশে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো। মেঘ দেখে বৃষ্টি হবে কি না হবে কেমন করে বলা যেতে পারে তা তোমাদের পরে বল'ব। মেঘ স্থির ভাবে আকাশে থাকে না, নতুন নতুন দেশে ঘুরে বেড়ায় আর কোন কোন স্থানে জল দিয়ে শেষে নিজের দেশে যেখানে তার জন্ম সেখানে ফিরে যায়।



হিপনটিজম্‌

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জেম্‌স ব্রেড্‌ ম্যানচেষ্টারের একজন ডাক্তার (সার্জ্জেন) ছিলেন। ১৮৪১ সালে তিনি এই সম্মোহন বিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করেন।

মেস্‌মার যেমন গভীর বিশ্বাস নিয়ে কাজ সুরু করেছিলেন, ব্রেড্‌ তেমনি ঘোর অবিশ্বাস নিয়েই ব্রতী হন এই কাজে। শুধু এতে কোন সত্য আছে কিনা, তাই দেখাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য!

আলোচনা ক'রে ব্রেড্‌ এই তথ্যে এসে পৌঁছলেন যে, গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে একটা উজ্জ্বল কোন জিনিষ কপালের উপর ১০।১৫ ইঞ্চি দূরে রেখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে যদি তার দিকে কাউকে চাইয়ে রাখা যায় ত'—তার চোখের তারা দুটো ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়ে উঠে শরীরের সমস্ত স্নায়ু-মণ্ডলের উপর এমন একটা অবসাদ এনে ফেলে যে মানুষটি ক্রমে একটা কৃত্রিম নিদ্রার ঘোরে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় তার আর আত্ম-কর্ত্তৃত্ব থাকে না। যে এই নিদ্রার প্রবর্ত্তণ করে তারই চিন্তা এবং নির্দ্দেশের সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে পড়ে লোকটি।

এই অবস্থাকে ব্রেড্‌ হিপ্‌নটিক অবস্থা নাম দেন। হিপ্‌নটিজম্‌ গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে।

বছর খানেক গবেষণা করে সার্জ্জেন ব্রেড্‌ বৃটিশ এসোসিয়েশনে তাঁর নিবন্ধ পড়েন। তিনি বলেন এই কৃত্রিম নিদ্রার সাহায্যে অনেক রকম রোগ সারান যায়। পরের বছর তাঁর বই বার হয়—তাতে যেসব রোগ সারান তার রিপোর্টও বার হয়।

ব্রেডের পরে অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে পর্য্যালোচনা করে' স্থির করেন যে এ বিষয়টিকে অনায়াসে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। এখন অনেক কলেজে এই বিদ্যাটি শিখান হয় এবং ইয়োরোপের অনেক সহরে এর ব্যবহারও দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এ-কথা যে খুব সত্য তা' আমরাও ক'রে দেখেছি। একটা ফাউন্‌টেন পেনের ক্লিপের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ বুজে ফেললে—তার মুখের উপর বার কয়েক 'পাশ' দিয়ে বল্লেই

হ'ল যে এবারে তুমি ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য। কিছুক্ষণ অর্থাৎ ২।৫ মিনিট এই অবস্থায় কাটতে দিয়ে তার চোখ খুলে দিয়ে একটা কাঁচা আম্‌ড়া তার হাতে দিয়ে যদি বলা যায়, দেখছ, কি সুন্দর আমটি! দেখে কি হবে খেয়ে ফেল, দেখ, এটি মিষ্টিতে ল্যাংড়াকে হার মানায়—লোকটি আমড়াতে ল্যাংড়ার মিষ্টত্ব সম্ভোগ ক'রে মোহিত হ'তে থাকে।

তারপর তার সঙ্গে নানা রকম খেলা চ'লতে পারে। হাতখানা টেনে নিয়ে যদি বলা যায়, হায়, হায়! এটাতো কাঠের তৈরি, নাড়া যায় না, মোড়া যায় না, তো, হাতখানা সোজা হ'য়েই রইল। যদি বলা যায়, তোমার মা মারা গেছেন, অমনি সে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে থাকে। এমনি ক'রে তাকে কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, গাধার ডাক ডাকিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

একজনের মাথা ঘোরার অসুখ তিনবার হিপ্‌নটাইজ ক'রে আমি সারিয়ে দিয়েছি।

ক্লাবের ম্যাজিকওয়ালা ঐ মেয়েটিকে—এমনি ক'রেই পাথরের মত ক'রে দিয়েছিল। একটা চেয়ারে তার মাথা রেখে আর একটা চেয়ারে পা রেখে—দিব্যি মেয়েটার বুকের উপর উঠে দাঁড়াল, মেয়েটা একটু নুয়ে পর্য্যন্ত গেল না।

ঘণ্টাখানেক পরে সাজেশ্চান দিয়েই সাব্‌জেক্‌টকে জাগিয়ে দেওয়া যায়। উঠে বসিয়ে চোখে ফুঁ দিয়ে চোখ খুলে দিতে হয়—উপরন্তু দু'চারটে উল্টো 'পাস' দিয়ে বলে দিতে হয় শরীর খুব ভাল থাক্‌বে।

একবার মনে পড়ে সাব্‌জেক্‌টকে বলি—তোমাকে জাগিয়ে দেওয়ার পাঁচ মিনিট পরে—তুমি উঠানে পাঁচ চক্কর দিয়ে—ঘড়িতে দম দেবে। তারপর পাঁচ মিনিট ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে অনবরত হাস্‌বে।

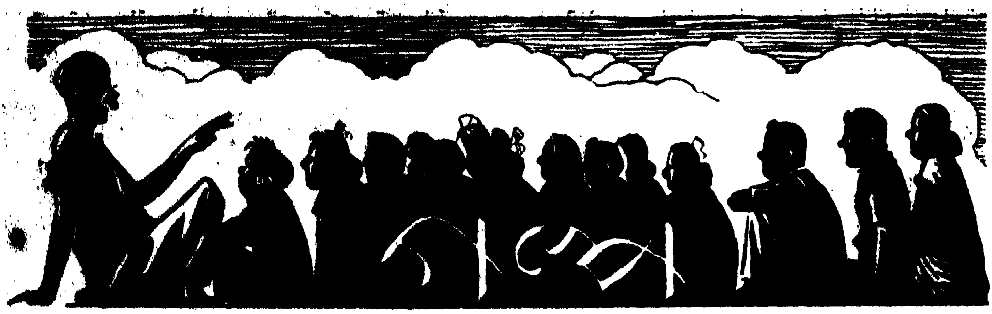
তাকে জাগিয়ে প্রথম প্রশ্ন ক'রলাম—কিছু মনে আছে?

না, ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম।

তারপর সে আমার সব হুকুম তামিল ক'রে যখন উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে অকারণে অবিশ্রান্ত হাস্‌তে লাগল—তখন যাঁরা দেখ্‌ছিলেন তাঁরাও হাস্‌তে লাগ্‌লেন। আমোদ কম হ'ল না।

তিন বছরের নীচের বয়সের ছেলেদের হিপ্‌নটাইজ না করাই ভাল। খুব বোকা কি পাগলরা কিছুতেই হিপ্‌নটাইজড্‌ হয় না।

বারান্তরে—হিপ্‌নটাইজ্‌ড্‌ ক'রতে গিয়ে কি রকম সব মুস্কিলে প'ড়েছি তা' বলার ইচ্ছা রইল।



বাড়ী বদলের করুণ কাহিনী

শ্রীরবীন্দ্র লাল রায়

যে বাড়ীটায় আমরা এতদিন ছিলাম সেটায় আমাদের আর কিছুতেই কুলোচ্ছিল না—কম করে আরও দুটো ঘর অন্ততপক্ষে দরকার। কিন্তু দরকার বল্লে কি হবে, দরকার মত বাড়ী খুজে পাওয়া যে অসম্ভব। কল্‌কাতা সহরে পয়সা দিলে বাঘের দুধ পাওয়া যায় শুনেছি কিন্তু প্রাণ দিলেও যে তোমার দরকার মত বাড়ী পাবে না, এ আমি হলফ করে বল্‌তে পারি। কলম্বস যদি আজ বেঁচে থাক্‌তেন তাহলে তাঁকেও চ্যালেঞ্জ কর্ল্লে তিনি হেরে যেতেন—বল্‌তেন হয়ত—ভাইরে, আমেরিকা আবিষ্কার করা এ বাড়ী আবিষ্কার করার চেয়ে অনেক সোজা ছিল।

যাই হোক কলম্বসের চেয়ে বড় আবিষ্কারক যে জন্মায় না জগতে তা নয়—না জন্মালে আমার ছোট ভাই মিণ্টু কি করে এমন চমৎকার একটা বাড়ীর খোঁজ এনে দিল ভবানীপুরে—টাউনসেণ্ড রোডের উপরে? আমাদের বাড়ীর সকলে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে—পাক্কা সাতটী মাস ধরে বাড়ী খুজে বেড়িয়েছি—খবরের কাগজের "বাড়ী ভাড়া" দেখে দেখে চশমার পাওয়ার বেড়ে গেছে তবুও একটীও দরকার মত বাড়ী মিলল না।—শেষকালে ঐ পুঁচকে মিণ্টেটা আমাদের সকলকে মেরে দিল। ওকে ত আমরা "বাড়ী-খোঁজা-কোম্পানী"র মেম্বারই করিনি। চমৎকার বাড়ীটা আর সব চেয়ে চমৎকার দোতলার দক্ষিণের ছোট্ট ঘরটা। সমস্ত বাড়ী থেকে একটু আলাদা। একজনের থাকার পক্ষে এমন সুন্দর ঘর বড় বেশী দেখা যায় না। একপাশে একটী ছোট খাট থাকবে আর একদিকে থাক্‌বে চেয়ার টেবিল—মাঝখানে খানিকটা জায়গা ফাঁক দিয়ে একটী কোণে ছোট একটী আলমারী...বাঃ চমৎকার হ'বে! বাবাকে বল্‌লাম, "ঐ ঘরটা আমার হ'লে বড় সুবিধা হয়—এবার বি, এস, সি ফাইনাল পরীক্ষা—বেশ নির্জ্জনে পড়াশুনার সুবিধা ......"

বাবা রাজি হলেন—কি আনন্দ যে হোলো তা বল্‌তে পারিনে। সেইদিনই নিজের মনের মত করে ঘরটা গুছিয়ে নিয়ে অধিষ্ঠান কর্ত্তে সুরু করে দিলাম। আগের বাড়ীতে যে ঘরটায় ছিলাম সেটার কাছে এ-ঘর স্বর্গ। অদৃষ্টে ছিল, জুটে গেল। মিণ্টুটার জন্যই ত হোলো —ওকে ডেকে আমার পুরানো ফাউণ্টেন পেনটাই দিয়ে দিলাম বাড়ী খুঁজে বার করার পুরস্কার স্বরূপ।

তবে একটা কথা—কোথাও নতুন বাড়ী ভাড়া নিলে বাড়ীটা ভাল হলেই চলে না প্রতিবেশী ভাল্ না হলে বড় মুস্কিল। যে বাড়ীটা ছেড়ে চলে এলাম তার পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার এত বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল—এত ভাল লোক তাঁরা। তার উপর তাঁদের বাড়ীতে ছিল দুটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে—বয়েস বোধ হয় বছর সাত আট হ'বে। কি মিষ্টি, কি সুন্দর তা'রা। তা'রা ছিল আমার খুব প্রিয়, তাদের ছেড়ে আসবার সময় আমার বুকটা ব্যথায় ভেঙ্গে যাচ্ছিল—ছোট্ট ছেলে মেয়েদের আমি যে বড্ড ভালবাসি—

এ পাড়ায় এসে নুতন বাড়ীতে ভাল ঘর পেয়ে যেমন আনন্দ হোলো—দুঃখও হোলো তেমনি ছোট ছেলে মেয়ের সঙ্গ হারিয়ে।...নিজের ঘরটায় বসে সেদিন কত কি ভাবছি এমন সময় হঠাৎ দেখি আমার ঘরের পূবদিকের জানালা থেকে হাত কয়েক দূরে পাশের বাড়ীর জানলায় ফুলের মত সুন্দর একটী বছর ছয়ের ছেলে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাক্‌ছে—"এই, এই"। আমি চোখ তুলে তাকাতেই এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লাম —ওঃ! ভগবান কি সদয় আমার উপর। শুধু সুন্দর ঘর নয় সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর ছোট্ট একটী ছেলে আমারই পাশের বাড়ীতে। চীৎকার করে উঠ্‌লাম—"মিণ্টু, মিণ্টু"

মিণ্ট ছুটে এল—বল্লে, "কি বল্‌ছ দাদা ?"—

বল্লাম—"আরে এই বাড়ীটাতে একটা সুন্দর ছোট্ট ছেলে আছেরে—আমাকে এক্ষণি ডাক্‌ছিল।"

মিণ্টু বল্লে, ছেলে আছে তা কি হয়েছে ?"

আমি উৎসাহিত হয়ে বল্লাম—"ওর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে হ'বে।"

মিণ্টু আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্লে, "আলাপ কর্ত্তে হয় তুমি করগে, আমার তা'তে কি ?'—বলে মিণ্টু যেন একটু বেশ বিরক্ত ভাবেই চলে গেল। ও চায় যে ওকেই কেবল আমি ভালবাসব, আদর কর্ব্ব, জিনিষ কিনে দেব—আর কাকেও ভালবাসা, আদর করা, কিছু দেওয়া ও সহ্য কর্ত্তে পারে না। আমি মহা আনন্দে বাড়ীর ভিতর ছুটলাম। সকলকে এ সংবাদ দিতে

লাগলাম। দেখি মেজদা তোয়ালে কাঁধে করে বাথরুমের দিকে যাচ্ছে, তাকে চেপে ধরে বল্লাম—মেজদা পাশের বাড়ীতে একটী 'লাভলি বয়'—মেজদা একটু হেসে বল্লে, "দেন এ কিংডম্ ফর ইউ, এঁ্যা, স্রেফ একটা রাজত্ব পেলি!"

ছোড়দি দেখি পান সাজছে ভাড়ার ঘরে—ছোড়দিকে বল্লাম, "ছোড়দি পুতুলের মত একটী ছেলে পাশের বাড়ীতে কি সুন্দর দেখ্‌তে, চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া, ধপ্ ধপ্ করছে রং—মুখখানা দুষ্টুমিতে মাখা—" ছোড়দি মুখটা একটু ভার করলে; ওর ছেলেটা দেখ্‌তে ভয়ানক খারাপ যে, ও কারো ছেলেকে ভাল বলা বা ভালবাসা সহ্য কর্ত্তে পারে না। কিন্তু ওর ছেলেটাকেও ত আমি যথেষ্ট আদর করি—তবে কেনরে বাপু?—

চীৎকার করে ডাকলাম—"মা, ও মা।"

মা তখন সমস্ত জিনিষপত্র গোছাচ্ছেন—নূতন বাড়ীতে এসে প্রথমটা গুছিয়ে নিয়ে বসা সত্যিই বড় হ্যাঙ্গাম। মা দেখি মহা ব্যস্ত—জিনিষপত্রের মধ্যে থেকে মাথা তুলে বল্লেন, "কি, চেঁচাচ্ছিস্ কেন?"

বল্লাম, "মা, পাশের বাড়ীতে সুন্দর ছোট্ট একটী ছেলে—"

মা একেবারে ক্ষেপে উঠলেন—বল্লেন, "এই জন্যে এত চেঁচান? তা, নিয়ে এস সেই মূর্ত্তিমানকে মাথায় করে নাচি; জ্বালাতন, ও-বাড়ীতে দুটোয় পাগল করে দিত আবার এ-বাড়ী এসেও একটা জুটেছে ঠিক?"

কেউ দেখি বিশেষ খুসী হোলো না—কেন যে হয় না বুঝি না। ছোট ছেলে মেয়েরা হয়ত একটু দুষ্টুমি করে, হয়ত একটু জিনিষপত্র নষ্ট করে; কিন্তু তা'তে কি হয়; যখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, গলা জড়িয়ে ঝোলে, কোথাও থেকে এলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে; কি আনন্দ যে হয় তখন তা এরা কেউ বোঝে না।

ঠাকুমা খালি বল্লেন, ছেলেটা ছোট ছেলেপিলে পেলে পাগল হয়ে যায়।—

সেইদিনই আলাপ কল্লাম—ছেলেটীর সঙ্গে নয় ছেলেটীর বাবার সঙ্গে। শুনলাম ছেলেটী তাঁদের বড় আদরের। চার মেয়ের পর ঐ ছেলেটী—কত মানসিক করে তবে নাকি ওকে ওঁরা পেয়েছেন—ও ওঁদের চোখের মনি, বুকের ধন।

ভদ্রলোককে বল্লাম "সুরেশবাবু আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেবেন। আমি ছোট ছেলে মেয়ে বড্ড ভালবাসি"

সুরেশ বাবু একটু হেসে বল্লেন—"বেশত' তবে ও যা দুরন্ত!" স্নেহের সুর তাঁর কণ্ঠে ভরা।

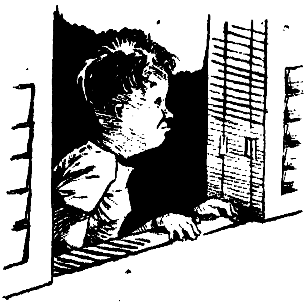
আমি বল্লাম "দুরন্তই ত ভাল ; ছেলেপিলে দুষ্টুমি কর্বে না ত কি আপনি আমি দুষ্টুমি কর্ব ? ছেলেপিলে একটু দুষ্টু না হ'লে আমার ভাল লাগে না। মনে হয় যেন প্রাণ নেই, মাটীর পুতুল !"

ভদ্রলোক খুসী হয়ে বল্লেন "তা সত্যি !—বেশ, তবে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়ারও দরকার হবে না—ও নিজেই আলাপ করে নেবে।"

হোলোও ঠিক তাই—জানালায় জানালায় আলাপ আরম্ভ হোলো। পরের দিন সকালে দেখি সেই ছেলেটী জানালায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে—"এই এই—ই—"

আমি মুখ তুলে তাকালাম, আজ আর সে পালাল না। আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে "তুই কে ?"

কি মিষ্টিই লাগল—"তুই।" ছোট ছেলে বলেই না এত আপনার মত করে ডাক্‌তে পারল। ঐ ত ওর বাবা সুরেশ বাবু আমার চেয়ে প্রায় পঁচিশ বৎসরের বড় কিন্তু তবুও ত আমাকে 'আপনি' বলে কথা বল্লেন। খালি ভদ্রতার মুখোস। ছোট ছেলেরা ওসব ভদ্রতার ধার ধারে না—ওদের সব আন্তরিক। ও যেমন নিজের খেলার সাথীদের 'তুই' 'বলে' ডাকল তেমনি।



—"বন্ধু—না 'কচু'—"

খুব ভাল লাগল—আমি বল্লাম, "আমি তোমার বন্ধু—"

ও এবার মুখ ভেংচে বল্ল—"বন্ধু না 'কচু'—"

আমার এবার আরও মজা লাগল—'কচু' বা বেশ ! বল্লাম "বেশ তোমার আমি আজ থেকে 'কচুই' হলাম—"

কলেজের বেলা হয়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি কলেজ চলে গেলাম। কলেজে কাণের মধ্যে কেবল বাজতে লাগল 'বন্ধু না কচু'

বৈকালে বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা কল্লাম জানালার ধারে—কিন্তু দেখা পেলাম না তার—ভাল লাগল না মোটেই। কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্ত্তে হবে ভেবে কষ্ট হ'ল মনে মনে। একবার ভাবলাম ডাকি—"বন্ধু"—না না 'কচু', কিন্তু ওদের বাড়ীর লোকে কি ভাববে ভেবে আর ডাকলাম না।

·········পরদিন সকালে নীচে চা খেতে গিয়েছি—খানিক পরে দেখি মিণ্টুটা চেঁচাতে চেঁচাতে এসে হাজির—"ছোড়দা তোমার ঘর কি হয়েছে দেখবে চল !"

সকলেই জানত আমি অত্যন্ত গোছালো পরিস্কার লোক। কোনও জিনিষ এদিক থেকে ওদিক হ'লে আমার খারাপ লাগে, ঘরের কোথাও একটু ময়লা পড়ে থাক্‌লে আমার মহা অস্বস্তি মনে হয়।

বাড়ী বদলের করুণ কাহিনী
শ্রীরবীন্দ্র লাল রায়

মিণ্টুর কথা শুনে আমি চমকে উঠ্‌লাম বল্লাম "কি হয়েছে রে"

মিণ্টু একটু মুচকে হেসে বল্লে "চল না দেখবে।"

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি আমার ঘরটায় নরক কাণ্ড হয়েছে। সমস্ত ঘরে পেয়ারার খোসা আর ছিব্‌ড়েতে বোঝাই—খাট বিছানা বই-এর টেবিল চেয়ার সব ভরে গেছে। দেখেই আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল—চীৎকার করে উঠলাম "কে করেছে এসব?"

হিঃ হিঃ "আমি করেছি"—তাকিয়ে দেখি ওদিকে জানালায় দাঁড়িয়ে ওদের বাড়ীর সেই খোকন—তার হাতে তখনও একটা পেয়ারা।

আমার পিছু পিছু এসেছিল অনেকে--সবাই হেসে উঠল। ছোড়দি বল্লে "কেমন লাগছে এখন?"

আমি তখন একেবারে নরম হয়ে গেছি—বল্লাম, "তাতে কি হয়েছে, ছেলেমানুষে করেছে তা কি হয়েছে?"

ছোড়দি বল্লে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই—"বেশত, কিছু হয়নি, কিন্তু অন্য কেউ পরিস্কার করে দেবে না—নিজেই পরিস্কার কোরো।"—

সত্যিই সেদিন ঘর নিজে পরিষ্কার কল্লাম—আজ পর্য্যন্ত যা করিনি। কিন্তু খারাপ লাগল না কিছুই—ছেলেমানুষ যদি একদিন করেই থাকে ঘর ময়লা—কিন্তু একদিনের উপর দিয়েই গেল না। দু'দিন পরে দেখি ঘরটী ধূলো-কাদায় ভর্ত্তি। ও-বাড়ীর খোকা ফেলেছেন বুঝলাম—কাকেও কিছু না ব'লে সেদিনও পরিষ্কার করে ফেল্‌লাম; কিন্তু আজ বেশ একটু বিরক্ত বোধ কল্লাম। এর পর আবার একদিন কলেজ থেকে এসে যা দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল। সেদিন আর পেয়ারার ছিবড়ে বা ধূলো কাদা নয়—বড় বড় ইট ঘরের চারিদিকে ছড়ান—একটা ইট টেবিলের উপরকার দোয়াটায় লেগে দোয়াতটি গেছে উল্টে—কালীতে টেবিলক্লথটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—দু'একখান বইএতে বেশ কালীর দাগ লেগেছে। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত রাগে জ্বলে উঠ্‌ল। জানালার কাছে ছেলেটা আস্‌তেই বেশ বিরক্তভাবেই জিজ্ঞাসা কল্লাম—"ঢিল ছুঁড়েছ কেন?"

সে বেশ অম্লানবদনে সব কটী দাঁত বার করে বল্লে, "বেশ করেছি, আবার করব—"

বুঝলাম এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়—ও বাড়ীর শিবরাত্রির সল্‌তে, আদুরের চরম। এ-ছেলে শুধু দুরন্ত নয়, এ-ছেলে ভীষণ।

জানালায় মোটা দেখে পর্দ্দা টাঙিয়ে দিলাম—ফলে ইট-পাটকেল, ধূলো-বালি পড়া বন্ধ হোলো কিন্তু বিপদ হোলো আর এক দিক দিয়ে। আমার কলেজ বন্ধ হোলো টেষ্টের পর। আগে সকালে ৯টায় কলেজে চলে যেতাম, ফিরতাম বৈকালে বা সন্ধ্যায়। কাজেই ও-বাড়ীর

খোকনের সাক্ষাৎ পরিচয় বিশেষ পাইনি কারণ সন্ধ্যাবেলা সে ঘুমিয়ে থাক্‌ত আর সকালবেলা কতটুকু সময়ই বা! কিন্তু এখন সমস্ত দিনের যা পরিচয় পেতে লাগলাম তা'তে বুঝলাম এইসব ছেলে বড় হ'লেই বোম্বেটে হয়।

আমার পরীক্ষা সম্মুখে—অঙ্ক অনার্স। পাগল হয়ে গেছি পরীক্ষার চিন্তায়। দিনরাত আমার তখন অঙ্ক করা দরকার নৈলে ভাল ফল হওয়া সম্ভব নয়; ফার্ষ্ট ক্লাশ অনার্স না হোলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না যে। খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে অঙ্ক কষব বলে বস্‌লাম; কিন্তু কার সাধ্যি যে একটা অঙ্ক কষে! কি চীৎকার সারাদিন—কি হৈহৈ রৈরৈ ঐ একটা ছেলেতে কর্চ্ছে! কেউ কিছু বলে না বা বল্‌তে পারে না। ওর দিদিরা কেউ কখনও যদি তা'র অত্যাচারে অস্থির হয়ে কিছু প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ওর বাবা তাড়া দিয়ে ওঠেন—বলেন, "হয়েছে কি? আহা গলে গেলেন, ঐটুকু ছেলে একটু চুল ধরে টেনেছে কি একটু গায় হাত দিয়েছে ত' মরে গেলেন—ন্যাকামি যত সব!"—মা হয়ত খেঁকিয়ে ওঠেন—"ও মেয়ের হিংসে ওর ওপর; একটু কিছু হলেই বাড়ী মাথায় করে।" বুড়ী ঠাকুমা বলেন—তা একটু সহ্য কর্ত্তে হ'বে বৈকি দিদি; তোরা হ'লি চার চারটে মেয়ে—আর ও-ত ঐ একটী সাত রাজার ধন এক মাণিক—"

কাজেই বুঝলাম ও মাণিকের দৌরাত্ম্য, শয়তানি সমানেই চল্‌বে এমনি—কি যে কর্ব্ব বসে বসে তাই ভাবছি সেদিন। বাড়ীতে কা'কেও বল্লে ত আর রক্ষে থাকবে না—ঠাট্টা করে করে আমাকে পাগল করে তুল্‌বে। বসে বসে ভাবছি এমন সময় শুনি পাশের বাড়ীর ছোট একটী মেয়ের করুণ আর্ত্তনাদ "ওঃ বাবারে, মরে গেলাম গো—ওরে বাবারে, ওরে বাবারে—"

বুঝলাম—সাত রাজার ধন মাণিক খোকনমনি তার হতভাগ্য কোন দিদির উপর বিশেষ রকম একটা কিছু অত্যাচার কর্চ্ছেন—দিদি বেচারা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ কর্চ্ছে।

দু'মিনিট আর্ত্তনাদ চল্‌ল। মেয়েটীর দুঃখে আমার চোখে জল এল—কারণ আমি নিশ্চিত জানি যতক্ষণ ঐ মাণিক নিজের ইচ্ছায় তাঁর অত্যাচার না থামাবেন ততক্ষণ মেয়েটীকে যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হ'বে; বাড়ীর কেউ এসে ওর ও অত্যাচারে বাধা দেবে না এমন কি ও নিজেও যে বাধা দেবে তা'রও উপায় নেই—একটু বাধা দিলেই ওর উপর দিয়ে শাস্তির ঝড় বয়ে যাবে।... কিন্তু ওকি হঠাৎ আর্ত্তনাদ গেল থেমে আর তার পরেই যেন মনে হোলো কার পিঠে মাথায় বেশ দু'চার ঘা পড়ল জোরে; সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার। বুঝলাম যে খোকনের দিদি আর সহ্য কর্ত্তে না পেরে আজ দিয়েছে দু'ঘা বসিয়ে। মানুষের সহ্যের ত' একটা সীমা আছে—কত অত্যাচার আর সে সহ্য কর্ব্বে! খোকনের জীবনেও বোধ হয় এই প্রথম প্রহার।

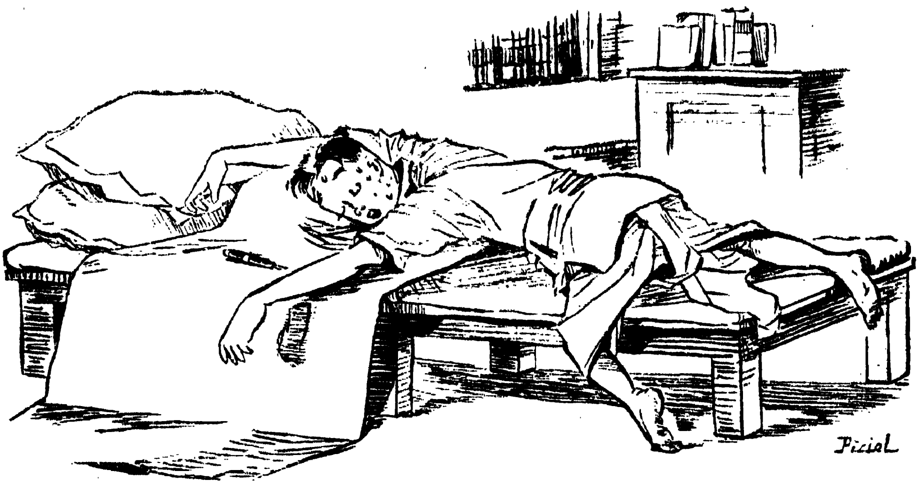
বাড়ী বদলের করুণ কাহিনী
শ্রীরবীন্দ্র লাল রায়

অন্য সময় হ'লে ঐটুকু ছেলেকে মার্লে আমি হয়ত ক্ষেপে যেতাম—উঃ ছোট ছেলেকে মারা যে আমি মোটেই সহ্য কর্তে পারি না। কত একটুতে ওদের কত লাগে—ননীর গা ওদের। ওরা কি-ই-বা জানে। কিন্তু আশ্চর্য্য, ঐ খোকনটাকে পেটানর জন্য আজ দেখলাম আমার বেশ আনন্দই হোলো—মনে হোলো আরও দু-ঘা দিল না কেন ওকে। কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্টে আজ যা ঘট্‌বে তাই ভেবে আমি আকুল হ'য়ে উঠলাম। হ'লেই বা খোকনের দিদি তবুও সেও ত ছোট মেয়ে। যা ভাবলাম তাই হোলো—খোকনের গায় হাত !! তার মা এসে মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে দিলেন ভীষণ প্রহার—বাবা এসে কাণ দুটো টেনে টেনে বোধ হয় ছিঁড়েই ফেল্‌লেন। বড়দি, মেজদি, সেজদি সকলে একবার করে তার উপর প্রহার চালালেন। সত্যিই ত, সাত রাজার ধন এক মাণিক—তার গায়ে হাত !! ঠাকুমা এসে বল্লেন, ওকে আজ খেতে দিওনা, ঘরে বন্ধ করে রাখ।...এদিকে সেই মাণিকের কান্না থামে না কিছুতেই; কত আদর, কত খাবার, কত খেলেনা—কিছুতেই কিছু না সমানে সেই কান্না—"ছোড়দি আমাকে মার্‌ল কেন ?"—সবাই বোঝাচ্ছে যে ছোড়দির তার জন্য খুব শাস্তি হয়েছে—মার হয়েছে, খেতে দেওয়া হয়নি—ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে তবুও তা'র কান্না থামেনা।...বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লাম, আমার অঙ্ক কষা মাথায় উঠে গেল। এই ব্যাপার যখন ঘটল তখন সকাল আটটা—সেই আটটা থেকে খোকনের কান্না সুরু হোলো—আর বেলা দশটাতেও থামল না। সমানে সেই এক কথা বলে কান্না বা চীৎকার—"ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?"—প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবি এবার থাম্‌বে কিন্তু পরের মুহূর্ত্তেই দেখি আবার চল্‌ল ।...ভাবলাম স্নান করে খেয়ে আসি ততক্ষণে থাম্‌বে—তখন বসব ক্যালকুলাসের অঙ্ক নিয়ে। স্নান করে খেয়ে দেয়ে উপরে গিয়ে দেখি তখনও সমানে চল্‌ছে—"ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?"—আর তার সঙ্গে বাড়ীশুদ্ধ লোকও সমানে তাকে বুঝিয়ে চলেছে। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ীর লোকেরাও ক্লান্ত হয়ে পড়ল—সবাই সাতরাজার ধন মাণিককে একা ফেলে রেখেই চলে গেল—মাণিক সমানে চীৎকার করে যেতে লাগল, "ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?" "ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?" আমি হতাশ হ'য়ে অঙ্কের বই এবং খাতা বন্ধ করে বিছানায় সটাং চোখ বুজে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার একটা খেয়াল হোলো—'আচ্ছা গুণে যাই কতবার বলে "ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?"—একটা রেকর্ড রাখলে কি রকম হয় ! শুয়ে শুয়ে গুণ্‌তে আরম্ভ করলাম—অবশ্য আগের খানিক বাদ দিয়ে। "ছোড়দি আমাকে মার্লে কেন ?"—এক, "ছোড়দি আমাকে মার্লে কেন ?"—দুই ...... তিরিশ ...... সাতাশী ...... একশ উনিশ ...... দুশ তিপান্ন ...... তিনশ ষাট ...... সাতশ নব্বই ......

মাথার মধ্যে কি রকম কর্ত্তে লাগল—চোখে যেন সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। কোন দেশে শুনেছিলাম মহাগুরুতর অপরাধ কল্লে শাস্তি দিত হাত পা বেঁধে একজায়গায় দাঁড় করিয়ে কোনও একটা শব্দ তার কাণের কাছে এক নাগাড়ে করে যেত—শেষকালে সে লোকটা পাগলের মত চীৎকার কর্ত্তে আরম্ভ কর্ত্ত—

আমাকে মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল·········আজ সে শাস্তির গুরুত্ব বেশ বুঝতে পাল্লাম। আমিও হয়ত আর খানিকক্ষণ এ ঘরে শুয়ে ঐ কান্না শুনলে পাগল হয়ে যাব। কিন্তু কি করি—এমন একটা রেকর্ডও যে থাকে না! ডাক্‌লাম মিণ্টুকে—বল্লাম, মিণ্টু গুণে যা ঐ কান্না, ভাল একটা ফাউন্টেন কিনে দেব—পুরানোটা আর তোকে ব্যবহার কর্ত্তে হবে না।

মিণ্টু ফাউন্টেনের লোভে গুন্‌তে আরম্ভ কল্ল আমার গোণার পর থেকে। সাতশ একানব্বই, সাতশ বিরানব্বই········ ······



তার সামনে একটা প্রকাণ্ড কাগজ পড়ে'—

আমি বার হয়ে গেলাম—একটু মাঠের দিকে। ঘুরে ফিরে ঘণ্টা চারেক পরে বাড়ী ফিরে দেখি········বেচারা মিণ্টু! আমার বিছানার উপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—ঘামে সমস্ত শরীর ভেসে যাচ্ছে; তার সামনে একটা প্রকাণ্ড কাগজ পড়ে তা'তে পর পর বহু সংখ্যা দু'হাজার তের পর্য্যন্ত লেখা রয়েছে—বুঝলাম ওর শুধু স্মৃতিশক্তিতে কুলায়নি তাই কাগজ

কলমের সাহায্য নিয়েছে ; তা'তেও পারে নি, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—কান্না কিন্তু তখনও চলেছে।

যাইহোক, মানুষ ত—দম ফুরোবেই এক সময়—ফুরালোও দম ; কাজেই সন্ধ্যার পর সে থামল্ কিন্তু আবার এক মুস্কিল বাধল এমন একটী জিনিষ নিয়ে যার দম তাড়াতাড়ি ফুরোয় বটে কিন্তু তাকে দম দিতেও বেশীক্ষণ লাগে না। সেটী হচ্ছে গ্রামোফোন। খোকনের কান্না থামবার জন্য তার বাবা এনে দিলেন একটী কলের গান। মৃত্যু হোলো আমার—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চল্‌ল সেই কলের গান, খোকনের আব্দার,—থামবার উপায় নেই—কখনও তার দিদিরা গান দিচ্ছে কখনও তা'র মা দিচ্ছেন কখনও বা চাকরেও দিচ্ছে। তাই কি নানা রকমের গান ? তা নয়, একটী মাত্র গান "চাঁদের আলো ছড়িয়ে গেলো সারা আকাশময়"—তার বিশেষ ভাল লেগে গেলো কেন জানি না—সেইটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চল্‌তে লাগল। সকালে উঠে শুনি "চাঁদের আলো—" দুপুরে খেয়ে এসে শুনি "চাঁদের আলো—" বৈকালে বেড়িয়ে এসে শুনি "চাঁদের আলো—।" "চাঁদের আলো" আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেপিয়ে তুলল।

পাক্‌কা তিনটী দিন "চাঁদের আলো—" শোনার পর বাধ্য হয়ে আমায় গৃহত্যাগ কর্ত্তে হ'ল। আমার একটী বন্ধুর বাড়ী আশ্রয় নিলাম—বাড়ীতে বল্লাম "দু'জনে এক সঙ্গে পড়লে পড়ার সুবিধা হবে।"—ভোরে উঠে চলে যেতাম আর রাত্রে ফির্ত্তাম, তখন ওদের খোকনমণি ঘুমিয়ে পড়তেন। এমনি ভাবে চলল কিছুদিন—হঠাৎ সেদিন সকালে উঠে পাশের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্ল্লাম না। চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিয়ে আবার তাকালাম—হ্যাঁ। ঠিক ভুল নয়।—আনন্দে নাচতে ইচ্ছা কর্ল্ল। মনে হোলো চেঁচিয়ে গান করি। কিন্তু কি গান কর্ব্ব—কোন গানই ত জানি না "চাঁদের আলো ছড়িয়ে গেলো ?" গেয়ে ফেললাম মনের আবেগে। বাড়ীর লোক পর্য্যন্ত সব অবাক হয়ে গেল। আমি শ্রীমান আদিত্য রায়—যার গলা ষাঁড়ের গলাকে হার মানায় সেই গলায়—'চাঁদের আলো' গাইতে সুরু কর্ল্লাম !! আমার উল্লাস, আমার সঙ্গীত, আমার ছুটোছুটী দেখে বাড়ীর সকলে একটু যেন চিন্তিত হয়েই পড়ল। সকলে ভাবতে লাগল ছেলেটা কি পাগল হ'য়ে গেল নাকি ! ওরা কি বুঝবে—পাগল হয়ে যেতাম কিন্তু আজকে সে সম্ভাবনা কেটে গেল।—ওঃ কি আনন্দ ! ভগবান আছেন তাহলে ! যদি কারো একচল্লিশ দিন টাইফয়েডে ভোগার পর জ্বর ছেড়ে থাকে সে বুঝতে পার্ব্বে আজ আমার কি আনন্দ ; যদি

কাকেও কখনও কচ্ছপে কামড় দিয়ে বহু কষ্টের পর সে কামড় ছেড়ে থাকে তবে সে বুঝবে আজ আমার কি আনন্দ।—ভাবলাম আজ একটা কিছু কর্ত্তে হ'বে এই আনন্দের দিনে। বায়স্কোপ যাব ? না; মোটার ভাড়া করে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসব ? না ; সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে আমোদ কর্ত্তে হবে।—ঠিক হয়েছে আজ সন্ধ্যাবেলা একটা ছোট-খাট ভোজ দেওয়া যাক। তক্ষণি বেরিয়ে পড়লাম ; বন্ধু-বান্ধব ও কয়েকজন আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে এলাম—পাড়ার দু'চারজনকেও নিমন্ত্রণ কল্লাম, এমনকি সুরেশবাবুকেও। সকলেই একটু বেশ অবাক হয়ে গেল। কৃপণ কঞ্জুস বলে আমার একটা দুর্ণাম ছিল, সেই আমি আজ হঠাৎ কোথায় কিছু নেই সকলকে খাওয়াতে গেলাম— !! দিদিমার দেওয়া টাকাগুলি পোষ্ট অফিস থেকে তুলে এনে বাজার করে আনলাম—সন্ধ্যাবেলা বিরাট আয়োজন করে ফেল্লাম।........ বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই বেশ তৃপ্ত হয়েই খেল—সুরেশ বাবু এসেছিলেন, তিনিও খেলেন। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে যখন বিদায় নেবার জন্য জড় হয়েছে তখন আমি সুরেশ বাবুকে, যেন মহা দুঃখিত আমি—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বল্লাম "আপনারা এ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কি যে খারাপ লাগছে তা কি বল্‌ব ! বেশ ছিলেন—আপনাদের অভাব বহুদিন মনে কষ্ট দেবে, বিশেষতঃ খোকনের অভাব হয়ত সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।—মনে মনে ভাবলাম, এখন বাড়ী ছেড়ে ওঁরা গেলে বাঁচি—আর খোকনের অভাব ? মা কালীকে পুজো দেব, সত্যনারায়ণের সিন্নি দেব—কিন্তু আমার ভাবনায় বাধা দিয়ে সুরেশবাবু যেন একটু অবাক হয়েই বল্লেন—"আমরা উঠে যাব আপনাকে কে বল্‌ল—কৈ আমরা ত কোথাও যাব না।"

আমার মাথাটা কি রকম গুলিয়ে গেল—মুখে চেষ্টা করে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লাম—তবে, তবে আজ সকালে দেখলাম যে আপনাদের বারান্দায় "টু লেট—বাড়ী ভাড়া" টাঙ্গান রয়েছে !!

সুরেশবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন—বল্লেন, ও ঐটে দেখে ভেবেছেন আমরা উঠে যাব ? না, না ওটা আমাদের বাড়ীর জন্য "টু-লেট" নয় ওটা আমাদের ঐ পিছনের বাড়টার জন্য। রাস্তা থেকে ও-বাড়ী ত দেখা যায় না তাই আমাদের বাড়ীতেই বাড়ীওয়ালা টাঙ্গিয়ে রেখেছে, যাতে রাস্তা থেকে দেখা যায়। কেউ খোজ কল্লে তখন আমরা দেখিয়ে দেব ঐ বাড়ীটা।...আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনাদের আদরের খোকন আপনাদের কাছেই থাকবে, নিশ্চিন্ত হ'ন—।

আর নিশ্চিন্ত হ'ন—তখন আমার সামনে পৃথিবী টল্‌ছে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কোনও রকম করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম···উঃ কি অন্যায়, ভাড়া দেবে একটা বাড়ী, আর একটা বাড়ীতে 'টু-লেট' টাঙ্গান? চীটিং চার্জ—মানুষ—ঠকানর দায়ে এদের জেলে দেওয়া উচিত······।



সেদিন দেখি "টু লেট"এর তলায়·······

সেই রাত্রে আমার জ্বর এল। এবার সকলকে আমার দুঃখের কথা খুলে বল্‌লাম। আমার এই চরম অবস্থা দেখে আর কেউ ঠাট্টা কর্ল্ল না—সে বাড়ী আমাদের ছাড়তে হোলো শেষ পর্য্যন্ত।

আমরা দু'বৎসর হরিশ মুখার্জ্জির রোডে আর একটা বাড়ীতে উঠে এসেছি, ও-বাড়ীটার মত না হ'লেও এ-বাড়ীটা মন্দ নয়, তবে একটা সৌভাগ্য যে পাশা-পাশি কোথাও খোকন নেই···

টাউনসেণ্ড রোড দিয়ে মাঝে মাঝে যাই, রোজই দেখি আমরা যে বাড়ীটা ছেড়ে এসেছি সেটাতে "টু-লেট" টাঙ্গান, সমানে দু'বৎসর ধরে খালি পড়ে আছে, ভাড়া হচ্ছে না।

সেদিন দেখি "টু-লেট"এর তলায় আর একটি লাইন যোগ করা হয়েছে "পাশের বাড়ীর সে খোকনেরা উঠিয়া গিয়াছে"—বুঝলাম এইবার ও বাড়ীটা ভাড়া হ'বে কিন্তু যে পাড়ায় খোকনেরা গেছেন সে পাড়ায় আশপাশের দু'চারটে বাড়ী আবার বেশ কিছুদিনের জন্য খালি হ'য়ে যাবে।

পথে বিপথে

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বল্ বাবা—বিশ্বনাথ!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি যখন প্রশান্তদের বাড়ী আসিলেন, তখন সে-বাড়ীর সকলে প্রশান্তকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন। প্রশান্ত মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং কহিল—আমিই আপনার সর্ব্বনাশ করেছি, চিনু মিনুকে আমি নিজ হাতে সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দিয়েছি। কেন দিয়েছি সে সব কথা আমার কিছু মনে নেই!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীরভাবে সব কথা শুনিয়া কহিলেন,—তোমাকে বাড়ীতে কে পৌঁছে দিল।

প্রশান্তের বাবা বলিলেন—আমি যদি চিনু মিনুকে না আন্তুম, তা হলে কখ্‌খনও হয়ত এমনটা ঘটত না। মিঃ চ্যাটার্জ্জি সামান্যমাত্রও বিচলিত হইলেন না, বা কোনরূপ উত্তেজনার ভাব না দেখাইয়া প্রশান্তের বাবাকে বলিলেন—দেখুন যা হয়ে গেছে, সে ইতিহাসের পেছনে দৌড়ে কোন লাভ নেই। এখন কি করে ছেলে মেয়ে দু'টোকে ফিরিয়ে পেতে পারি, তারি ব্যবস্থা করতে হবে।—আমি শুধু ভাব্‌ছি সুনন্দাকে আর বাঁচাতে পারব না। তারপর প্রশান্তের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন—তুমি কিছু দুঃখ করো না প্রশান্ত। তুমি ত' আর ইচ্ছা করে চিনু মিনুকে ছেড়ে দাওনি। তবে ভুল করলে সেখানে, সন্ন্যাসীর কথায় যদি তোমরা ব্যস্ত না হয়ে কোন লোককে আমার বাড়ী পাঠিয়ে সংবাদ নিয়ে পরে রওনা হতে, তোমার বাবাকে জানিয়ে সন্ন্যাসীকে বাড়ী নিয়ে আসতে, তা হলে।—তারপর একটু চুপ্ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—তোমাদেরই বা কি বল্‌ব বল! অতি বড় বুদ্ধিমান্ মানুষেরই মতিভ্রম হয়।—আমি আর দেরী করতে পারি না। প্রশান্ত তুমি কয়েকটা দিন বাড়ীতে থেক।—

সে সময়ে লালবাজার থানায় একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী ডিটেক্‌টিভ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুরসিক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান এবং অতি চতুর ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি বিলাতে যাইয়া গোয়েন্দাগিরি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও কিছুদিন শিক্ষানবিশী ছিলেন, সকলের উপর তাঁর ছিল অদ্ভুত রূপ সজ্জার ক্ষমতা। নিজের আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বর পরিবর্ত্তণ করিতে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সকলের উপর ছিল তাঁহার দেহের শক্তি ও মনের বল। মিঃ চ্যাটার্জ্জি ও মিঃ মুখার্জ্জি এক সঙ্গে পড়া-শুনা করিয়াছেন।

চ্যাটার্জ্জির বন্ধু প্রিয়নাথের কথা মনে পড়িতেই তিনি প্রশান্তদের বাড়ী হইতে বরাবর থানায় আসিলেন। গেটে যে দুইজন সার্জেণ্ট পাহারা দিতেছিল, তাহারা মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে দেখিয়া আর কোন বাধা দিল না। তিনি বরাবর মিঃ মুখার্জ্জির বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। কার্ড পাইয়া একটু বিস্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চ্যাটার্জ্জিকে দেখিয়া কহিলেন—কি হে তুমি এত রাতে যে? কোথাও নেমতন্ন-টেমতন্ন ছিল নাকি?

—মিঃ চ্যাটার্জ্জি কহিলেন—না!

তবে?

তবে শোন! একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া হতাশভাবে সব কথা বলিলেন। তারপর প্রিয়নাথবাবুর হাত দুটি জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন,—প্রিয়নাথ, আমার চিনু মিনুকে তুমি ছাড়া কেউ ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে না। যত টাকা লাগে, আমি দিব। তুমি আজ রাত্রেই অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করো।

মুখুয্যে মহাশয় হাসিয়া কহিলেন—এবার তোমার আসামের Tripটা কেমন হল?

মিঃ চ্যাটার্জ্জি কোনও কথা বলিলেন না।

প্রিয়নাথবাবু বলিতে লাগিলেন—আমি একবার ডিব্রুগড় বেড়াতে গিয়েছিলাম। ষ্টীমারের ঘাট বড় মনোরম। ব্রহ্মপুত্রের নির্ম্মল স্বচ্ছ জল, দুই দিকের পাহাড়-পর্ব্বত, দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়! কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় খাতা টানিয়া লইয়া আপনার মনে তিনি বইয়ের পাতাগুলি উল্টাইতেছিলেন।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি বন্ধুর এইরূপ উদাসভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিতেও সাহসী হইতেছিলেন না।

হাঁ, চ্যাটার্জ্জি ভাই শোন,—তোমার চা-বাগানটাতে ত' এবার খুব Profit পেয়েছ। বাঙ্গালীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে যায় না, তুমি একটা নূতন দিকে মন দিয়েছ। উদ্যোগী পুরুষ কিনা!

বহির একটি পৃষ্ঠা মিঃ চ্যাটার্জ্জির সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন,—তুমি এ লোকটাকে কখনও দেখেছ? মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন—আমি দেখিনি, তবে প্রশান্ত যেমন যেমন বর্ণনা দিয়েছিল—এ সন্ন্যাসীকে সেই রকমই যেন অনেকটা মনে হচ্ছে?

হুঁ!

তবে কি কোন আশা নেই!

মিঃ মুখুয্যে গম্ভীরভাবে কহিলেন—আশা বড় আছে বলে মনে নেই। তবে এ লোকটা যে নিশ্চিত, তা আমি বল্‌তে পারি। তবে তোমাকে কি বল্‌ব, তুমি একটি নিরেট গা—না, বাবা মক্কেলদের মামলা জিতিয়ে

এত টাকা লুটছো, তোমাকে তা বলা চলে না, তবে এ কথা ঠিক্ যে সাধারণ জ্ঞান, তোমার একটু কম ?

হঠাৎ মিঃ মুখুয্যে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং সাধারণ পাঞ্জাবি পরিয়া, গায়ের রেপারখানি জড়াইয়া লাঠিখানি হাতে ভদ্রবেশে সাজিয়া কহিলেন—ওহে চ্যাটার্জ্জি, সঙ্গে গাড়ী আছে ত' ?

হাঁ।

তবে চল। বাহিরে আসিয়া, তিনজন লোক বারান্দায় বসিয়াছিল, তাহাদিগকে কি ইঙ্গিত করিলেন, তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রাজপথ মুখরিত করিয়া গাড়ী টালিগঞ্জের দিকে আসিল। তখন চারিদিক একেবারে নীরব। ঘন বনজঙ্গল পর্য্যন্ত নিঃঝুম হইয়া আছে।

মিঃ মুখোপাধ্যায় অন্ধকারে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কখন যে বেশ বদ্‌লাইয়া ফেলিলেন তাহা মিঃ চ্যাটার্জ্জিও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

সহসা একটা বিরাট বটগাছের নীচে গাড়ী থামিতেই, জয় বাবা বিশ্বনাথ ! শব্দে কে একজন সন্ন্যাসী গাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল।—সঙ্গে দুইজন চেলা। মিঃ চ্যাটার্জ্জি একেবারে চমকাইয়া উঠিলেন। তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন—চুপ্—আমি। তুমি সাবধানে থাক। আমরা আস্‌ছি। তোমার গাড়োয়ান রইল—আর আমার পাহারাওয়ালা—হনুমান চৌবে রইল,—আমি ঘণ্টাখানেকের ভিতরেই ঘুরে এসে বল্‌তে পার্‌বো তোমার ছেলে মেয়ের খোঁজ মিলবে কিনা ?

ক্রমশঃ





গাধা বনাম গরু



শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু
লিখিত
শ্রীসুমুখ নাথ মিত্র
চিত্রিত

এক যে ছিল ধোপার গাধা
গাইত সে গান রোজ বেজায়।
গয়লা বলে, 'ধোপা দাদা
হাঁক ডাকে ওর প্রাণ যে যায়'!
ধোপা বলে, 'গয়লা ভায়া
ত্বগ্ধে তোমার জল বেবাক!
প্রাণটি তবু শুষ্ক কেন
বোঝ না ওর রসাল ডাক
বাড়ীর পাশে সুরের স্বর্গ!
নয়ত বরাত মন্দ ঘোর!
বুঝতে যদি এক বিসর্গ
কোন্ ধ্রুপদের ছন্দ ওর!
বয়স কত ত্থ'কুড়ি এক
শক্ত করো কানের চাম্।
হলে আশী, হলে লায়েক—
বুঝ্‌বে হে ওর গানের দাম!
জবাব শুনে গয়লা রোষে
কালিঘাটে যায় সটান,
মানত করে সেথায় বসে'
"হে মা কালী, হে ভগবান!
ধোপার গাধার গানের ঠেলায়
প্রাণটা বুঝি খাঁচা ছাড়ে,
দিলেম ওটা মানত করে
ধরে শুধু নাও মা তারে।

পাঁঠায় তোমার নাই অরুচি
রোজই কত হয় মা পথ্যি,
গাধাও তো মা সভ্য শুচি
হবে কি মা খুব আপত্তি?



গাধার ডাকে রাত্রি-ভোরে
গয়লা যখন মেল্‌লো চোখ
দ্যাখে যে তার গরু মরে
গেছে সটান স্বর্গলোক!
ত্রিশ-সেরী হায় গরু যে তার
দুধ দিত সে বারো সের
আঠারো সের জল মেশাবার
পরেও কেউ পেতনা টের!
গয়লা বলে, "হে কালী মা
বিশ্ব-জোড়া চোখ যে তোর,
গাধা ছেড়ে কর্‌লি শেষে
গরুর ওপর নেক-নজর।
গাধা গরু চিনিস্ না তুই!
তাজ্জব যে, বল্‌ব কি এর?
গালাগালে এক বটে দুই
তবু দু'য়ে তফাৎ যে ঢের!"

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

১

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সে গত শতাব্দীর কথা।—

গুর্জ্জরের কাঠিয়াওয়াড়ের কাছে ছোট এক গ্রামে সেদিন শিবরাত্রির উৎসব, মন্দিরে-মন্দিরে শিবপূজার ধুম, রাত্রি জাগরণের উৎসাহ। একটী রাত্রির জন্য সমগ্র গ্রামখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চৌদ্দ বছরের ছেলে মূলশঙ্করকেও তাঁর বাবা নিয়ে এসেছেন মন্দিরে। পিতার আদেশে বেচারাকে সারাদিন উপোস করে থাক্‌তে হ'য়েছে, এখন পিতার সঙ্গে রাত জেগে চার প্রহরে চারবার পূজা করে ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে।

পিতা-পুত্র মন্দিরের চত্বরে বসে রাত জাগছেন, প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করছেন। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে এক একটী প্রহর অতিবাহিত হচ্ছে।

প্রথম প্রহরের পর দ্বিতীয় প্রহরের পূজার শেষ হোল। উপবাসক্লিষ্ট নরনারী চোখ থেকে ঘুম আর যেন ছাড়তে চায় না। মূলশঙ্কর কিন্তু সজাগ হয়ে বসে আছে, তাকিয়ে আছে সামনের শিবলিঙ্গের পানে।

চারিদিক নীরব নিথর। সহসা কুট্‌ কুট্‌ করে একটা মৃদু শব্দ এসে লাগ্‌লো বালকের কানে। দীপের মৃদু আব্‌ছা আলোয় ধারালো চোখে তাকিয়ে বালক দেখলে একটী ছোট ইঁদুর শিবের উপর উঠে কুট্‌ কুট্‌ করে চলে যাচ্ছে, শিবলিঙ্গ অপবিত্র করছে। আজকের মত দিনে একটী নেংটি ইঁদুরের এতো সাহস। সর্ব্বশক্তিমান শিবের তেজে পূজার চাল খাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত এখুনি ও হাতে হাতে পাবে—এখুনি ও ভস্ম হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

মূলশঙ্কর প্রতি লহমায় ইঁদুরটার মৃত্যু প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু লহমার পর লহমা কেটে গেল—কই? কিছুই তো হোল না। ইঁদুরটা দিব্যি চাল খেয়ে চলে গেল। তবে কি এই শিবলিঙ্গের মধ্যে সত্যিকারের দেবতা নেই? এই সব পূজা ব্রত তাহলে সব মিথ্যা! একটা অনাচারী ইঁদুরকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা যাঁর নেই তিনি ক্ষমতাশালী মানুষের অত্যাচার অনাচার নিবারণ করে মঙ্গল বিধান করবেন কেমন করে? এমন দেবতাকে পূজা করে তো কোন লাভ নেই। অনর্থক উপবাস করে রাত জেগে শরীর খারাপ করি কেন! মূলশঙ্করের আর পূজা করা হোল না, পিতা ঢুলছে দেখে তখুনি বাড়ী চলে এল, তারপর দিব্যি খেয়ে দেয়ে এক লম্বা ঘুম দিল।

পরদিন সকালে পিতার কাছে সেজন্য তাকে বড় কম বকুনি খেতে হয়নি।

দেখতে দেখতে ছেলে বিশ বছরে এসে পৌঁছল। পয়সাওলা ঘরের ছেলে, আর কত দিন অবিবাহিত রাখা যায়? বাপ মা বিয়ের যোগাড় করলেন। মূলশঙ্কর বল্‌লে—আমি বিয়ে করবো না!

পিতা ছিলেন অত্যন্ত এক রোখা, যুক্তি তর্কের কোন ধার তিনি ধারতেন না। পয়সা আছে, ছেলেকে খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, তথাপি বিয়ে করতে ছেলের অমত কেন? বল্‌লেন—বিয়ে তোমায় করতেই হবে, আমি সব ঠিক করেছি।

ছেলে পিতাকে কোন মতেই নিরস্ত করতে পারলো না। পিতায় যখন মত বদ্‌লালো না, তখন আর কোন উপায় না দেখে, বেচারা বাধ্য হয়ে এক দিন বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই জ্ঞান বাড়ছিল ততই ধর্ম্মের প্রতি মূলশঙ্করের আকর্ষণও বেড়ে উঠেছিল। সত্যই ভগবান আছেন কি না? ধর্ম্ম কি? বেদ-বেদান্তের মধ্যে দিয়ে সত্যই ভগবানকে বোঝা যায় কি না? যোগ ও প্রাণায়াম দিয়ে সত্যই ভগবানকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় কি না?—এই সব নানান্ সমস্যা এঁর মনে তোলাপাড়া হোত তারই সমাধান করার জন্য ইনি বাড়ী ছাড়লেন, বাপ মা ছাড়লেন। তরুণ ব্রহ্মচারী জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরে বেড়ালেন কত সাধুর আশ্রমে, কত মোহান্তের মঠে, কত জ্ঞানীর পর্ণকুটীরে, কত যোগীর গাছ তলে।

পিতা ছিলেন বিত্তশালী, চারিদিক তিনি তোলপাড় করে তুললেন—ছেলে কোথায় গেল ? গুর্জ্জর ও কাঠিয়াওয়াড়ের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো মূলশঙ্করের হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ।

কত দিন পরে সহসা এক দিন খবর পাওয়া গেল—সিদ্ধপুরের মেলায় তরুণ ব্রহ্মচারীকে দেখা গেছে।

পিতা ছুটলেন। সঙ্গে চললো লোকজন, জিনিষপত্তর, টাকাকড়ি—দরকারী সব কিছু।...

সিদ্ধপুরে মেলার ভীড়। সাধু, সন্ন্যাসী, দর্শক, ভিখারী, দোকানদার—এক বিরাট জনতা পিপীলিকার মত গিস্ গিস্ করছে। তারই কোন এক ফাঁকে পিতা-পুত্রে দেখা হয়ে গেল। পিতা তো রেগেই আগুন, অনেক বকাবকি গালিগালাজ দিয়ে ছেলেকে তিনি ধরে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ী। দরজায় দিন রাত পাহারা রাখলেন, ছেলে যেন আর পালাতে না পারে। ইতিমধ্যে কতকগুলি কাজকর্ম্ম সেরে গ্রামে ফেরার জন্য তিনি তৈরী হতে লাগলেন।

একদিন গেল—

দু'দিন গেল—

তরুণ ব্রহ্মচারীর বন্দী মন চঞ্চল হয়ে উঠলো পিতার পয়সার আড়ম্বড়ের বাহিরে, রক্ষীর রুদ্র দৃষ্টির পিছনে ছুটে যাবার জন্য, শ্যামল বনানী, ধূসর প্রান্তর উদাসী হাওয়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো, বিনিদ্র রাত্রি জেগে ব্রহ্মচারী মূলশঙ্কর ছট্‌ফট্ করতে লাগলো—মুক্তি চাই! স্বস্তি চাই!! শান্তি চাই!!!

তৃতীয় রাত্রে সুযোগ মিললো। শেষ রাতে প্রহরীরা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষের শরীর তো, সারারাত আর জাগে কেমন করে, খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে নিচ্ছে। সেই অবসরে মূলশঙ্কর পালিয়ে গেল। এদিকে এখুনি সকাল হবে ততক্ষণে বেশী দূর যাওয়া যাবে না, পিতার লোকজনেরা এসে ধরে ফেলবে।—তাই তিনি এক গাছে উঠে বসে রইলেন।

সকাল হ'তেই খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল, চারিদিকে লোকজন খুঁজতে বেরুলো, অনেক খোঁজখুঁজি করা হোল কিন্তু মূলশঙ্করকে পাওয়া গেল না। লোকে পথে-ঘাটে খুঁজলো কিন্তু সে যে মাথার উপর গাছে উঠে বসে আছে তাতো কেউ জানলো না।

পিতা হতাশ হ'য়ে স্বগ্রামে ফিরে গেলেন।

দিন কতক এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে এক মারাঠি সন্ন্যাসীর সঙ্গে মূলশঙ্করের পরিচয় হোল, তাঁর নাম পূর্ণানন্দ সরস্বতী। তিনি মূলশঙ্করকে দীক্ষা দেন। দীক্ষার সময় ব্রহ্মচারীর নতুন নাম রাখাই রীতি। মূলশঙ্করেরও নব নামকরণ হোল---দয়ানন্দ সরস্বতী।

দয়ানন্দ স্বামী যে মত প্রচার করেন তা' আর্য্যসমাজী মত নামে বিখ্যাত। যা তিনি সত্য বলে বুঝেছিলেন তাই সাধারণকে জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু সেজন্য তাকে বড় কম লাঞ্ছনা আর কষ্ট সইতে হয়নি! তবু তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। সেই কথাই বলি—

এক সন্ধ্যায় মীরাটে বহু লোকজনের সামনে স্বামিজী ধর্ম্ম উপদেশ দিচ্ছেন। বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশ ধর্ম্মেচ্ছু নরনারী স্তব্ধ হয়ে শুনছে। স্বামিজী বলছেন—

—ভগবান এক।

—অসংখ্য দেবদেবীর মুর্ত্তিপুজা করার কোন অর্থ নেই।

সকলেরই ঈশ্বরকে পূজা করার অধিকার আছে।

—বেদই হচ্ছে হিন্দুর একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ—পুরাণ ভাগবৎ বৈদিক যুগের লেখা নয়।...

সনাতনীরা এসব সইবে কেমন করে? ব্রাহ্মনদের এতদিনের বংশ পরম্পরা-লব্ধ প্রতিপত্তি, সমগ্র ভারতে সমস্ত হিন্দুজাতির তাদের চরণে মাথা নত করার অধিপত্য, হিন্দুর দেবদেবী পূজা করার, স্পর্শ করার স্পর্দ্ধা, দোষগুণের বিচার না করে একগোছা উপবীত দেখিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার দম্ভ এইরকম এক একটী লোক এসে নষ্ট করে দেবে—তা হয় না! এ অসহ্য! বুদ্ধ, কবির, রামানন্দ, চৈতন্য, রামানুজ নানক বিবেকানন্দ—কাউকেই তারা সহ্য করেনি, আজও তারা সইবে না। এর একটী বিহিত তারা করবেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, জিজ্ঞাসুদের স্বামিজী ধর্ম্মতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। হঠাৎ কোথা থেকে একটী বিষাক্ত সাপ কে ছুড়ে দিলে স্বামিজীর গায়ের উপর। শ্রোতার দল চমকে উঠলো, ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, স্বামিজী কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। সাপটী গায়ের উপর থেকে মাটীতে পড়ে ফণা তুলবে এমন সময় তার মাথাটী স্বামিজী পায়ে করে চেপে ধরলেন। তারপর আবার শান্তভাবে সুরু করলেন আগের মত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করতে—

কতক্ষণ পরে ব্যাখ্যা শেষ হোল, এইবার স্বামিজী সাপটীর লেজ ধরে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

স্বামিজীর দুঃসাহস দেখে সনাতনীরা আরো রেগে গেল। নানারকমে ফন্দি ফিকির আঁটতে লাগলো।

কোন রকমেই এঁটে উঠতে না পেরে দয়ানন্দের বিরুদ্ধে সনাতনীদের একটা পাকা দল গড়ে উঠলো।

একদিন বর্ণমাসের গঙ্গাস্নান মেলায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা কৃষ্ণসিংহ রাও দয়ানন্দকে কাটতে গেলেন। আঘাত করা কিন্তু বৈষ্ণবদের ধর্ম্ম নয়, "প্রেমই" বৈষ্ণব ধর্ম্মের বড় কথা, কিন্তু সেই সম্প্রদায়ের নেতা হয়েও কৃষ্ণসিংহ স্বামিজীকে তলোয়ার নিয়ে আক্রমন করলেন। স্বামিজীর বয়েস হলেও মনের জোর ও দেহের বল ছিল যথেষ্ট, আহত হবার আগেই স্বামিজী কৃষ্ণসিংহের হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিলেন।

এবার সনাতনীরা তাঁর পিছনে গুণ্ডা লাগালো।

গুণ্ডার দল নানাস্থানে বারবার স্বামিজীকে আক্রমন করেও, কিছু করতে পারলো না, কখনো দৈবক্রমে, কখনো মনের জোরে স্বামিজী রক্ষা পেলেন।

বিরুদ্ধ দল এবার বিষ দিয়ে স্বামিজীকে হত্যা করার বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললো।

পরপর ছ'বার স্বামিজীকে কৌশলে বিষ খাওয়ানো হোল। ছ'বারই স্বামিজী বুঝতে পারলেন! বহুদিন তিনি যোগ অভ্যাস করেছিলেন। যোগের এক প্রক্রিয়া দ্বারা পাকস্থলীও অন্ত্র বাহির করে নদীর জলে ধুয়ে ফেললেন। বিষ দেহের কোন ক্ষতি করতে পারলো না।

সনাতনীরা এবার ঠিক করলো—একেবারে আর বিষ খাওয়ানো হবে না, ধীরে ধীরে সামান্য সামান্য করে প্রতিদিন বিষ দিতে হবে। তাহলে এমনভাবে আর রক্ষা পাবেন না। সেইদিনই তারা স্বামিজীর চাকরকে বশ করলো। স্বামিজী প্রতিদিন দুধ খেতেন, টাকার লোভে চাকরটা প্রতিদিন তাতে কিছুকিছু আর্সেনিক মিশিয়ে দিতে লাগলো। সেই দুধ খেয়ে স্বামিজীর দেহ দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে লাগলো। শেষে ওই বিষই তাঁর কাল হোল। পঁচিশ দিন ভুগে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন।

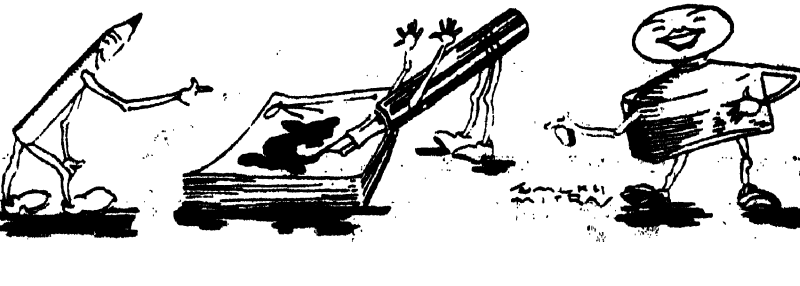
দয়ানন্দ স্বামীই আর্য্য সমাজের প্রবর্ত্তক। যে সব সনাতনী হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে স্বামিজী প্রাণ হারালেন তারা যদি তখন জানতো যে আর্য্য সমাজই হিন্দুধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখার কিরূপ সহায়তা করবে তাহলে বোধ হয় অমনভাবে স্বামিজীর পিছনে লাগতো না।

আঠারো-শো সাতাত্তর সালে রহিম খাঁ নামে লাহোরের এক ডাক্তারের বাড়ীতে স্বামিজী আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের সভ্য ছিলেন স্বামিজীর বাইশজন মাত্র শিষ্য। আজ কিন্তু আর্য্যসমাজীর সংখ্যা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে।

আর্য্য সমাজের মূল কথা হচ্ছে—
ঈশ্বর এক—
বেদই সত্য—
যা সত্য বলে জানবে, তা'ই করবে, তা'ই মানবে।
জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করে তাদের অজ্ঞাণতা দূর করতে হবে।
জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আর্য্যসমাজীরা সব কিছুই করবে।

আর্য্য সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মতের যথেষ্ঠ মিল আছে। দয়ানন্দ স্বামী যখন কলকাতায় আসেন তখন দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট নেতারা তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন এই দুই সমাজকে এক করে দেবার জন্য কিন্তু বোলেন্দ্র ঠাকুরের মৃত্যু ও জন কয়েক লোকের আপত্তির জন্য সে চেষ্টা সম্ভব হয়েনি।

আর্য্যসমাজী দল বিশেষ জোরালো হয়ে উঠে দুটী লোকের নেতৃত্বে, লালা হংসরাজ ও লালা লাজপৎ রায়। এই দুজনের একান্ত চেষ্টায় লাহোরে বিখ্যাত দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজ স্থাপিত হয়, এবং ভারতের অসংখ্য লোক আর্য্য সমাজ ভুক্ত হন। এঁরা দু'জন একসময় আর্য্য সমাজের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। পরে অবশ্য লালা লজপৎ রায় রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন।





দ্বিতীয়

সোনার চাকৃতির নক্সা

জয়ন্ত বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার ভিতর থেকে কোন-রকম বিশেষত্বই আবিষ্কার করতে পারলে না। এ-ধরণের লক্ষ লক্ষ বুদ্ধমূর্ত্তি এসিয়ার সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

মূর্ত্তির ভাঙা মাথাটি দেহের উপরে আল্‌গা ভাবে লাগিয়ে জয়ন্ত বুদ্ধদেবকে আবার টেবিলের উপরে বসিয়ে দিলে। তারপরে যেন আপন মনেই মৃদুকণ্ঠে বললে, "হত্যাকারী এই মূর্ত্তিই চুরি করতে এসেছিল? কিন্তু হিংসার সঙ্গে এই মূর্ত্তিমান অহিংসার সম্পর্ক কি?"

মাণিক বললে, "হয়তো বিশেষ কোন কারণে ঐ মূর্ত্তিকে কেউ এমন পবিত্র মনে করে যে, ওকে হস্তগত করবার জন্যে সে নরহত্যা করতেও সঙ্কুচিত নয়!"

জয়ন্ত বললে, "এর উত্তরে দুটি কথা বলা যায়। প্রথমতঃ বুদ্ধের প্রতি এতটা অতি-ভক্তি থাকা সম্ভব কেবল গোঁড়া বৌদ্ধের। কিন্তু কলকাতায় এমন ভীষণ প্রকৃতির বৌদ্ধ আছে ব'লে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কাশীধামে কাক মরলে কামরূপে কেউ হাহাকার করে না। কাম্বোডিয়ার অজানা জঙ্গলে কুড়িয়ে পাওয়া সাধারণ বুদ্ধমূর্ত্তি, তার জন্যে কলকাতার কোন বৌদ্ধের এতটা নাড়ীর টান হবে কেন? এর চেয়ে ঢের মূল্যবান আর অসাধারণ পুরাণো বুদ্ধমূর্ত্তি কত লোকের ঘরে ঘরে রয়েছে, তাদের জন্যে তো কোন বৌদ্ধের মাথাব্যথা হয় না! না মাণিক, এ ব্যাপারের মধ্যে অন্য রহস্য আছে।"

মাণিক বললে, "দেশে লক্ষ লক্ষ কালীর প্রতিমা আছে, তাদের জন্যে ভক্তরা তেমন পাগল হয় না। কিন্তু শুনতে পাই, কোন কোন কালীর মূর্ত্তি নাকি জাগ্রত, তাই তাদের জন্যে অনেক ভক্ত প্রাণ নিতে বা দিতে প্রস্তুত। কে বলতে পারে, এই বুদ্ধমূর্ত্তিরও তেমন কোন খ্যাতি আছে কিনা?

জয়ন্ত বললে, "থাকতে পারে। কিন্তু সে খ্যাতির কথা কাম্বোডিয়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতর থেকে কলকাতায় আসবে কেমন ক'রে?"

এতক্ষণ অমলবাবু চুপ ক'রে খুব মন দিয়ে জয়ন্ত ও মানিকের কথাবার্ত্তা শুনছিলেন। এখন তিনি বললেন, "জয়ন্তবাবু, আমার মনে হচ্ছে, মূর্ত্তিটি কেমন ক'রে আমরা পেয়েছিলুম, সে গল্পটাও আপনাদের কাছে বলা উচিত। হয়ত তাহ'লেই আপনাদের কোন কোন প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হবে।"

জয়ন্ত একখানা চেয়ার টেনে বসে প'ড়ে বললে, "বলুন। আমরা গল্প শুনতে ভালোবাসি।"

অমলবাবু আর কোনরকম ভূমিকা না ক'রেই বল্‌তে লাগলেন:

"বহুদিন থেকেই আমি কাম্বোডিয়ার ওঙ্কারধামের (ইংরেজীতে **Angkor Thom**) * কথা শুনে আসছি। তাই মাস কয়েক আগে আমি যখন সুরেনবাবুর কাছে প্রাচীন হিন্দুদের এই বিরাট কীর্ত্তিমন্দির দেখতে যাবার প্রস্তাব করলুম, তখন তিনিও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু আমরা তো সাধারণ ভ্রমণকারী নই, আমরা হচ্ছি প্রত্নতাত্ত্বিক। আমাদের অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল। শুনেছি, ওঙ্কারধামের চারিদিককার গভীর অরণ্যের মধ্যে এমন আরো অনেক হিন্দুকীর্ত্তি আছে, যা এখনো আবিষ্কৃত হয় নি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাদের সন্ধান নেওয়া।

যথাসময়ে যাত্রা করলুম। তারপর সাগর, নগর ও অরণ্য পার হয়ে কি ক'রে ওঙ্কারধামের আকাশ ছোঁয়া ও দৃষ্টিসীমা-ছাড়ানো ধ্বংসস্তূপের পরিত্যক্ত বিজন বিরাটতার ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম, সে সব কথা এখানে বলবার দরকার নেই।

গৌরবময় অতীতের এই মূর্ত্তিমান মৃত্যুনিসাড় দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে একদিন আমি আর সুরেন বাবু সবিস্ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম পাশের ভাঙা মন্দিরের ভিতরে কে কাতর আর্ত্তনাদ করছে!

মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, একদিকে একজন বর্ম্মী ফুঙ্গী বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শুয়ে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছট্‌ফট্ ও আর্ত্তনাদ করছেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

সুরেনবাবু চিকিৎসা-শাস্ত্র জানতেন, তাঁর সঙ্গে ঔষধের বাক্স ছিল। চিকিৎসার গুণে দুদিন পরে সন্ন্যাসীর অসুখ কিছু কমল। তাঁর মুখে শুনলুম, তিনি ওঙ্কারধামে বেড়াতে এসে এই বিপদে পড়েছেন। কেবল ওঙ্কারধাম নয়, ইতিমধ্যে এখানকার গহন বনের ভিতরে অদৃশ্য, অনেক অজানা বিস্ময়ও তিনি দেখে এসেছেন।

সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারা যাবে বুঝে আমরা প্রাণপণে তাঁর চিকিৎসা ও সেবা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, হপ্তাখানেক পরে তাঁর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়ল।

*গতবার মুদ্রাকর প্রমাদে ওঙ্কারধাম হয়েছিল "ওক্কারধাম"।

সুরেনবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন। "আর কোন আশা নেই। আজকের রাত বোধ হয় কাটবে না।"

গভীর রাত্রে সন্ন্যাসী আচ্ছন্নের মত বললেন, "সুরেনবাবু, আমার কাছে স'রে এস।"

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, "আদেশ করুন।"

সন্ন্যাসী খুব ক্ষীণ স্বরে বললেন, "সুরেনবাবু, তুমি আর তোমার বন্ধু আমার জন্যে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে আমি তোমাদের পুরস্কার দিয়ে যেতে চাই।"

সুরেনবাবু বললেন, "পুরস্কারের লোভে আমরা আপনার সেবা করি নি।"

—"সে কথা আমি জানি। সেইজন্যেই তোমাদের পুরস্কার দিতে চাই, তোমাদের সেবার ঋণ নিয়ে আমি মরব কেন? কিন্তু যে পুরস্কার তোমাদের দেব তা বড় সাধারণ পুরস্কার নয়, এর জন্যে পৃথিবীর যে কোন সম্রাটও লালায়িত হ'তে পারে। তবে এ পুরস্কার লাভ করবার আগে তোমাদের এক কাজ করতে হবে।"

সুরেনবাবু বললেন, "কি কাজ?"

—"তোমাদের সঙ্গে দেখছি ইন্ আর চ্যান্ রয়েছে। ওদের কাল্‌কেই বিদায় ক'রে দিও।"

সুরেনবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "কেন?"

—"ওরা ভালো লোক নয়। ওরা সঙ্গে থাকলে তোমরা বিপদে পড়বে।"

আমাদের দলে জন-বারো কুলি ছিল। চ্যান্ হচ্ছে তাদের সর্দ্দার। ইন্ হচ্ছে আমাদের পথ প্রদর্শক। এরা যে অকারণে কেন আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইবে, তার কোন হদিস খুঁজে পেলুম না।

সন্ন্যাসীর কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "সুরেনবাবু, আমি বুঝতে পারছি আমার শেষ মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনো। এখানে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ভাঙা হাতীর মূর্ত্তি আছে। তার ওপাশে একটা সরু পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চ'লে গিয়েছে। সেই পথ ধ'রে তোমরা অগ্রসর হবে। যেখানে পথ নেই, সেখানে জঙ্গলের ভিতরে পথ করে' নেবে—কিন্তু সাবধান, উত্তর-পশ্চিম দিক ছাড়া আর কোন দিকে যেও না। দুদিন পরে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পড়বে। তারপর—"এই পর্য্যন্ত বলবার পরেই সন্ন্যাসীর গলা থেকে ক্রমাগত হেঁচ্‌কি উঠতে লাগল।

খানিকক্ষণ পরে সেই অবস্থাতেই থেমে থেমে সন্ন্যাসী বললেন, "তারপর সেই প্রান্তরের ভিতরে দেখবে চারিদিক পাথরে বাঁধানো একটি পুষ্করিণী। তার এক কোণ থেকে পশ্চিম মুখো একটি রাস্তা আছে। সেই রাস্তার শেষে আছে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রধান মন্দিরের চারি কোণে আরো চারটি ছোট ছোট ভাঙা মন্দিরও আছে!"

সন্ন্যাসীর হাঁপ ও হেঁচ্‌কি আরো বেড়ে উঠল। কিন্তু আমাদের আগ্রহ তখন জেগে উঠেছে, বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, "তারপর—তারপর?"

কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে তিনি বললেন, "বড় মন্দিরের মাঝখানে একটি বেদী আছে। তার উপরে আছে ছোট একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। তোমরা সেই মূর্ত্তিকে তুলে নিয়ে—"সন্ন্যাসী আবার থেমে গেলেন, তাঁর দুই চোখ মুদে এল।

সুরেনবাবু তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, "তারপর আমরা কি করব?"

কিন্তু সে কথা সন্ন্যাসী শুনতে পেলেন ব'লে মনে হ'ল না। যেন নিজের মনেই অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, "পদ্মরাগ বুদ্ধ, পদ্মরাগ-বুদ্ধ"—তারপরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

এর পরের কথা আমি খুব সংক্ষেপেই সারব। আমরা সন্ন্যাসীর কথার আসল অর্থ বুঝতে পারলুম না বটে, কিন্তু তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলুম। চ্যান আর ইনের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বললুম—আমরা ওঙ্কারধাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না এখানেই হপ্তাদু'য়েক থেকে আবার দেশে ফিরব। আমাদের সঙ্গে কেবল চারজন কুলি রেখে বাকি লোক নিয়ে তারা চ'লে যেতে পারে।

আমাদের হঠাৎ মতপরিবর্ত্তনে তারা বিস্মিত হ'ল বটে, কিন্তু কোনরকম সন্দেহ করতে পেরেছে ব'লে মনে হ'ল না। সেইদিনই তারা বিদায় গ্রহণ করলে।

সেই অজ্ঞাত মন্দিরে গিয়ে কি দেখব আর কি লাভ হবে, তা আন্দাজ করতে পারলুম না, কিন্তু কি একটা রহস্যের নেশায় আমাদের কৌতূহল এমন ভাবে জেগে উঠল যে, পরদিনই উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলুম।

সেই প্রান্তর, পুষ্করিণী আর চারটি ছোট মন্দিরের মাঝখানে প্রধান একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ,—সমস্তই পাওয়া গেল। বড় মন্দিরের ভিতরে পাথরের বেদীর উপরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি বেদীর সঙ্গে গাঁথা ছিল। আমরা গাঁথনি থেকে মূর্ত্তিটাকে খুলে নিলুম। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও সেখানে উল্লেখযোগ্য আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। সম্রাটেরও পক্ষে লোভনীয় কোন পুরস্কারই সেখানে ছিল না—যদিও আমাদের মত প্রত্নতাত্ত্বিকের পক্ষে লোভনীয় অনেক পুরাতন জিনিষই সেখানে দেখতে পেলুম। বিশেষ, হাজার বছর পুরাণো যে শিলালিপি সেখানে পেয়েছি, তাইতেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সেখান থেকে ফিরে আসবার সময়ে সুরেনবাবু খুসি হ'য়ে বললেন, "সন্ন্যাসী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, কিসের লোভে আমরা এদেশে এসেছি! যে শিলালিপি আমরা পেয়েছি, তার চেয়ে অমূল্য সম্পদ আর কি থাকতে পারে?"

জয়ন্তবাবু, চোর আজ যে বুদ্ধমূর্ত্তিটি চুরি করবার চেষ্টা করেছিল, ঐটিকেই আমরা সেই বড় মন্দিরের ভিতরে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও মূর্ত্তি নিয়ে চোরের কি লাভ হ'ত, এ কথাটা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না।"

জয়ন্ত অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "অমলবাবু, আপনি বলছেন যে সন্ন্যাসীর শেষ কথা হচ্ছে 'পদ্মরাগ-বুদ্ধ'? কিন্তু 'পদ্মরাগ-বুদ্ধ' নামে কোন বুদ্ধমূর্ত্তির কথা তো আমি কখনো শুনিনি?"

অমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আমিও শুনিনি।"

মাণিক বললে, "কিন্তু পদ্মরাগ মণি ব'লে মহামূল্যবান মণি আছে!"

জয়ন্ত অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "সন্ন্যাসী এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যে কোন সম্রাট লালায়িত হ'তে পারেন। এঁরা ওখান থেকে এনেছেন চূণ-পাথরে গড়া এক বুদ্ধ মূর্ত্তি, আর

একখানা শিলালিপি,—রাজা মহারাজার কাছে যা তুচ্ছ! অথচ এই সামান্য বুদ্ধমূর্ত্তিও চোরে চুরি করতে চায়, এর জন্যে মানুষ খুন করতেও ভয় পায় না! আশ্চর্য্য রহস্য!"—সে বুদ্ধমূর্ত্তির ভাঙা মাথাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেখে দেহটা আবার তুলে নিলে। তারপর তাকে উল্টে ধ'রে খানিকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বললে, "দেখ মাণিক, এর তলার দিকটা!"

মাণিক দেখলে, মূর্ত্তির তলায় খানিকটা জায়গায় গুঁড়ো পাথরের প্রলেপ মাখানো হয়েছে! সে বললে, "এখানে একটা ছ্যাঁদা ছিল। এখন ভরাট ক'রে দেওয়া হয়েছে!"

জয়ন্ত হঠাৎ মূর্ত্তিটা উঁচুতে তুলে ধরে মাটির উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলে, সেটা সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল!

অমলবাবু হাঁ হাঁ ক'রে ব'লে উঠলেন,

"কি করলেন, কি করলেন! ওর পিছনে যে ব্রাহ্মী লিপি ছিল।"

জয়ন্ত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে ভাঙা টুক্‌রোর ভিতর থেকে একটা জিনিষ নিয়ে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলে।

জিনিষটা তামার একটা কৌটোর মত—অনেকটা বিলাতী 'সেভিং ষ্টিকে'র কৌটোর মতন দেখতে, তেমনি গোল. কিন্তু তার চেয়ে লম্বা, প্রায় এক বিঘৎ হবে!

জয়ন্ত বললে, "মূর্ত্তির ভিতরটা ক্ষদে এই কৌটোটা পুরে, তলার ছ্যাঁদা আবার বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।"

অমলবাবু খানিকক্ষণ হতভম্বের মত চুপ ক'রে থেকে বললেন, "ও কৌটোর ভিতরে কি আছে?"

—"সেইটেই এখন দেখতে হবে। কারণ, এর ভিতরে যা আছে, তার লোভেই আজ এখানে চোরের আবির্ভাব হয়েছিল!" সে কৌটোর ঢাকুনি খুলে তার ভিতর থেকে বার করলে একটি চাবি ও একটি সোনার চাক্‌তি!

অমল বাবু বললেন, "ও আবার কি?"

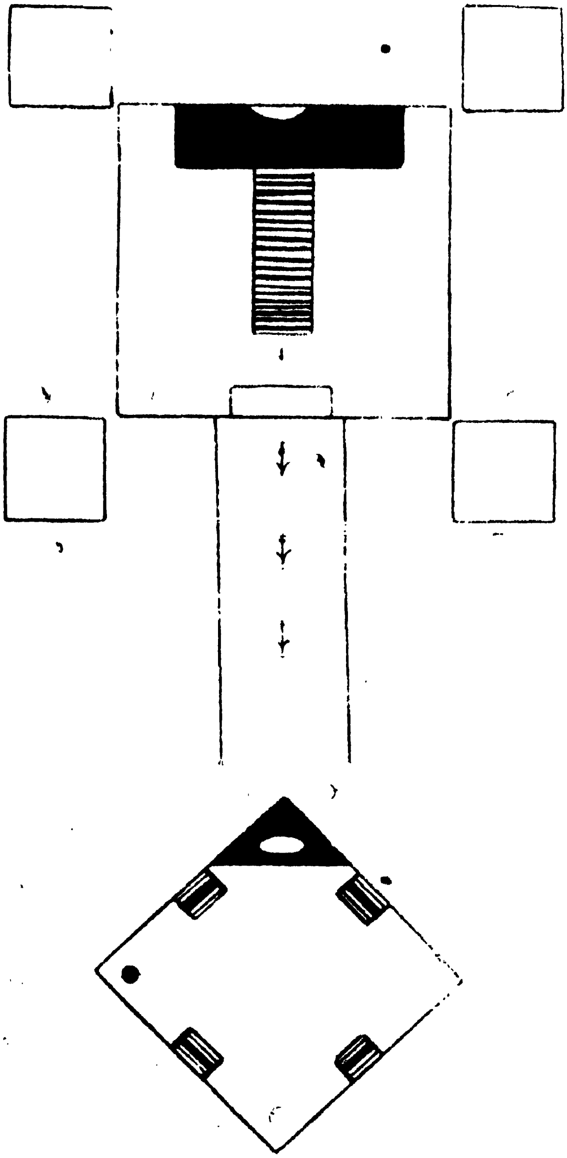
জয়ন্ত জবাব না দিয়ে চাক্‌তিটা খানিকক্ষণ পরীক্ষা ক'রে বললে, "এতে কি-একটা নক্সা ক্ষোদা রয়েছে।"

—"নক্সা?"

"হ্যাঁ" ব'লেই সে টেবিলের ধারে আলোর কাছে গিয়ে বসল। তারপর পকেট থেকে কাগজ, পেন্সিল ও 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস' বার করলে। বাঁ-হাতে চাকতির উপরে 'ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস' ও ডান হাতে কাগজের উপরে পেন্সিল ধ'রে সে তখনি তাড়াতাড়ি আর একখানা বড় নক্সা তৈরি ক'রে ফেললে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে আঁকা নক্সাখানা অমলবাবুর হাতে সমর্পণ করলে।

অমলবাবু কাগজখানার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, 'এ যে প্রান্তরের সেই মন্দিরের নক্সা! এই মন্দিরেই আমরা ঐ বুদ্ধমূর্ত্তি পেয়েছি।"

জয়ন্ত খুব খুসিমুখে পকেট থেকে রুপোর নস্যদানি বার ক'রে দুবার নস্য নিয়ে বললে, "তাহ'লে আসুন অমলবাবু! এই টেবিলের ধারে বসুন! ভালো ক'রে আপনি একবার নক্সাখানা দেখুন। আমার মনে



মন্দিরের নক্সা

হচ্ছে, সন্ন্যাসী যা ব'লে যেতে পারেন নি, আমরা এইবারে সেই গুপ্তকথাটা জানতে পারব! পদ্মরাগ-বুদ্ধ! পদ্মরাগ-বুদ্ধ। রহস্যময় নাম।"

হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার

—ধরণী সেন—

[সত্য ঘটনা]

বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে হিমালয়ের পাহাড়ী জঙ্গলে ভাল্লুক শিকার আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু এই আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা আমার ঘটে ছিল। একবার ১৯৩৫ সালে এক বিদেশী বৈজ্ঞানিক অভিযানের সঙ্গে আমি কাশ্মীর ও পুঞ্চরাজ্যগুলি বেড়াবার খুব সুযোগ পেয়েছিলাম ও সেই সঙ্গে কিছু শিকারেরও। এই দলটির নাম ছিল ইয়েল-কেমব্রিজ ইণ্ডিয়া এক্স্‌পিডিসন্—বৈজ্ঞানিক জগতে এদের আবিষ্কারের কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু শিকার করা এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না, এদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের আদিম মানুষের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল—তাদের পাথুরে অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের আস্তানা আবিষ্কার করাই এদের লক্ষ ছিল। কিন্তু সে কথা আজ বলছি না। কাজের মাঝে মাঝে কিরকম আমাদের বন্য শিকার জুটতে, তার গল্প তোমাদের বলব। তোমরা অনেকেই বিশেষ করে যারা কাশ্মীরের প্রান্তে পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলি দেখেছ হয়ত শুনেছ সেখানকার পথে বিপথে ভাল্লুকের দেখা মাঝে মাঝে মেলে। কাশ্মীর ও পুঞ্চ এ দুটি রাজ্যই ভাল্লুক প্রসিদ্ধ। কিন্তু এগুলি সাধারণ কালো ভাল্লুক পরিবারভুক্ত নয়, এদের কাশ্মীরে বাদামী ভাল্লুক বা ব্রাউন বেয়ার বলে—কারণ এদের বুকের এক জায়গায় বাদামী রং দেখতে



পাওয়া যায়। এদের গায়ের লোমশুদ্ধ চামড়া অতি সুন্দর তাই খুব দামী। এদের মারবার জন্য কাশ্মীর-রাজ স্পেশাল লাইসেন্স করেছেন। তার কারণ মৃগনাভীর মত বাদামী ভাল্লুকও ক্রমশঃ হয়ে আসছে

এই ভাল্লুকগুলি সাধারণতঃ ভালমানুষ বলেই মনে হয়। কিন্তু আক্রমণ করলে এরা বাঘের চেয়েও হিংস্র হয়ে ওঠে। দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়লে এরা সহজে একটা লম্বা মানুষকে ছাড়িয়ে যায়। অনেক পাকা শিকারীর হাত থেকে লড়াই করে এদের বন্দুক কেড়ে নিতে শোনা গিয়েছে—তারপর নৃশংসভাবে নখ দিয়ে ছিঁড়ে হত্যা করেছে। অনেক শিকারীরা বলেন—এদের চেয়ে বাঘের হাতে মৃত্যু অনেক ভাল। কাশ্মীরি ভাল্লুকেরা গুহাপ্রিয়। আর এই গুহাগুলিই প্রাকঐতিহাসিক মানুষের কঙ্কালের জন্য খনন করা আমাদের একটা কাজ ছিল। ভাল্লুকগুলোকে হয় গুলি করতে হোত, নয়ত তাড়াতে হোত। সব গুহাতেই ভাল্লুক থাকে যে তা নয়। একবার কি হোল শোনো। সে গুহাটি ছিল কাশ্মীরের লোলাব উপত্যকার অন্তর্গত। একদিনেই আমরা জেনে নিলাম সন্ধ্যার ঝোঁকে ভাল্লুক খাবার অন্বেষণে বেরিয়ে পড়ে, তারপর ভোর রাত্রে ফিরে আসে। প্রথম দুদিন তো আমরা চেঁচামেচি বাজনাবাদ্যি করে ভাল্লুকভায়াকে কিছুতেই গুহার বাইরে করতে পারলাম না। আমাদের অভিযানে টম প্যাটারসন বলে একটি স্কচ ছেলে ছিলেন—পাকা শিকারী। ভাল্লুকভায়াকে ছাড়বার পাত্র তিনি নন। আমাদের এক নিশীথ অভিযান ঠিক হোল—বন্দুকের নালাতে একটা শক্তিশালী টর্চ্চ লাগিয়ে তিনি গুহাটির ছাতে ঘুপটি মেরে ভোর রাত্রের দিকে বন্দুক বাগিয়ে বসলেন। আমি তাঁকে উৎসাহ ও সাহায্য দেবার জন্য একটা বর্শা হাতে নিয়ে তাঁর পেছনে বসলাম। যদি কিছু বিপদ ঘটে। আমার নিজের বন্দুক বা লাইসেন্স তখন ছিল না তাই একটা বর্শা করিয়েছিলাম। ভেবে বোসো না আমি মস্ত শিকারী—মোটেই নয়। তবে তাই বলে আমার সাহসের অভাব ছিল না। যাই হোক ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করবার পর টমের মুখ থেকে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখলাম সেই আবছা আলোছায়ার পথে ভাল্লুকভায়া মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছেন। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম। আরো কাছে—আরো কাছে, তারপরই হঠাৎ টর্চ্চের তীব্র আলো ভাল্লুকের গায়ে পড়াতে সে থমকে দাঁড়াতেই সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম্ গুড়ুম্। ভাল্লুকটাও সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল, আবার গুড়ুম্। ভাল্লুক পড়ল মাটিতে, আবার গুড়ুম্। তারপর সব শেষ। সবশুদ্ধ বোধ হয় তিন সেকেণ্ডের বেশী লাগল না।

৩

ভাল্লুকভায়ার বাদামী চামড়া গেল বিলাতে টমের বন্ধুর কাছে। কিন্তু টম এতে খুসী হোল না। বললেঃ আর একটা ওর পেছনে নিশ্চয় ছিল—তাকে বার করতে হবে। কিন্তু দুদিন বসে তার সাড়াশব্দ মিলল না। তখন টম একটা অসমসাহসিক কাজ করলে। বললেঃ সেন, তুমি থাকো, আমি আজ গুহার ভেতর গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত দেখবো। আমি তাকে বাধা দিতেও শুনলে না। বুঝলাম তার মাথায় শিকারীর খুন্ জেগেছে। তার পর-দিন টম তাঁবুতে চায়ের টেবিলে যে গল্প বল্‌লে তার মুখ থেকেই শোনোঃ আমি বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে টর্চ্চ জ্বেলে গুহার অন্ধকারে তো ঢুকে পড়লাম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুহার দেয়ালে দেয়ালে আলো ফেলতে লাগলাম ও ক্রমশঃ নিঃশব্দে খুব আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ছাতের সঙ্গে মাথা ঠুকে যেতে লাগল। তারপর গুহাটা ছোট হয়ে এলো-তখনও আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম। সামনে বোধহয় নিজেরই প্রকাণ্ড অদ্ভুত অদ্ভুত ছায়া দেখতে লাগলাম। একটু ভয় ভয় যে করছিল না তা নয়। হঠাৎ কাদাজলে পড়ে গেলাম—কিন্তু জল ছিল না বেশী তাই রক্ষে। মনে হতে লাগল এই বুঝি ভাল্লুকের সামনা সামনি পড়ি। ট্রিগারে আঙ্গুল দিয়ে আসন্ন বিপদের জন্য একেবারে তৈরী হয়েই এগুতে লাগলাম। কিন্তু কৈ ? কিছুই দেখতে পেলাম না। গুহার শেষ অবধি পৌঁছে সামনে ভিজে ভিজে দেয়াল পেলাম। একটু দাঁড়ালাম কিন্তু নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। বড় মন খারাপ হোলো। তারপর আস্তে আস্তে পিছু হেঁটে বেরিয়ে এলাম। ভাল্লুকটা তাহলে জন্মের মত তার এ আস্তানা ছেড়ে গিয়েছে।...ভাল্লুক মিলল না বটে কিন্তু টমের বাহাদুরীতে আমরা বাহবা দিলাম। আমাদের দলপতি একজন জার্ম্মান ছিলেন, তার নাম ডি টেরা—তিনি ছিলেন ভূতত্ত্ববিদ, শিকারের ঝোঁক তার বড় একটা ছিল না! কিন্তু তিনিও বললেনঃ তাইতো! টম, ভাল্লুকটা মারলে তুমি নিশ্চয় চামড়াটা আমার স্ত্রীকে উপহার দিতে!

এর পর আমাদের কাজের ভাগ হয়ে গেল, আর আমার ভাগ্যেই পড়ল পার্ব্বত্য নদী লীডার উপত্যকার অন্তর্গত গুহাগুলি খনন কাজের জন্য পরীক্ষা করা। টম গেল সিন্দ উপত্যকায়, ডি টেরা গুলমার্গে। আমার পথের লক্ষ্য হোল বিখ্যাত অমরনাথ গুহা। আর

এরই রাস্তায় কাজের উপযোগী গুহাগুলি দেখা। আমি একজন শিখ সর্দ্দারকে শিকারী নিযুক্ত করলাম। এর নাম ছিল গুরুদিৎ সিং—তার নিজের বন্দুক ও লাইসেন্স ছিল। এ ছাড়া ডি টেরা আমাকে একজন পাঠান বেয়ারা দিয়াছিলেন রান্না ও তাঁবুর কাজের জন্য। এ পাঠানটা গত মহাযুদ্ধের ফেরা, ফ্রান্সে লড়াইয়ে সময় তার উরুতে গুলির দাগ এখনও আছে। এর নাম ছিল মিশ্রি খান। দুজনেই বলবান সাহসী লোক, আমি খুসী ও উৎসাহিত হয়ে তাদের তখনই সঙ্গে নিলাম। এবং শীঘ্রই তারা আমার আপনার লোকের মত হয়ে গেল। কিন্তু আমার ভাগ্যে মাত্র যে দুবার ভাল্লুক শিকার জুটে ছিল সে শিকার দুবারই হাত ছাড়া হয়ে ছিল আর দুবারই টমের মত বন্ধু ও শিকারীর অভাব অনুভব করেছিলাম। যাহোক ঘটনা দুটোর একটা আগে শোনো। ছোট বড় গুহা দেখলাম অনেক কিন্তু অমরনাথের তুষার পথে এসেই ঘটনাটি ঘটল। এ জায়গাটা প্রায় ১১ হাজার ফিট উঁচু। একদিন নিজের কাজ কর্ম্ম সেরে ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে সবে ফিরেছি। কাছে দশবারো মাইল কোথাও লোকালয় নেই, কেবল বরফ আর বরফ। আর কেবল যারা ভেড়া চরায় সেই ভবঘুরে চোপানের দল। দু'একটি দলের কখন কখনও তাঁবু দেখা যায় আর দেখা যায় তাদের ভেড়ার দল। ফিরেছি মাত্র, হঠাৎ দেখি একটা চোপান এসে হাজির, সে ভাঙ্গা উর্দ্দুতে ও কাশ্মীরিতে যা বললে তাতে বুঝলাম কাল রাত্রে তার একটা বড় ভেড়া তার তাঁবুর কাছেই ভাল্লুকে মেরে গিয়েছে; সাব্ যদি মেহেরবানী করেন তো অন্য ভেড়াগুলো গরীবের রক্ষা পায় ইত্যাদি। দেখলাম এ সুযোগ আমার ছাড়া উচিৎ নয়। গুরুদিৎ ও মিশ্রি খান তখনই উৎসাহ দেখিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। জিগেস করলাম,—তাঁবু তোর কতদূর? বুঝলাম মাইল খানেক দূর হবে আমার তাঁবু থেকে। তখনই হুকুম দিলাম: তৈরী হও, তাঁবু নিয়ে চলো ঐ জায়গায়। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা, অন্ধকার পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে নেবে আসছে। খাওয়া সেদিন আমার হোল না, সাজ পোষাক রইলো গায়ে—পড়লাম বেরিয়ে। এক মাইল রাস্তাই বটে, প্রায় এক ঘণ্টার পর চোপানের শতছিদ্র তাঁবুর কাছে এসে পড়লাম, দেখলাম প্রায় দু'তিনশ ভেড়া তাঁবুর সামনে জমা হয়ে রয়েছে আর তাঁবুরই একধারে একটা প্রকাণ্ড ভেড়া মরে পড়ে রয়েছে—তার পেটটা একেবারে ফাঁক হয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। দেখলাম ভাল্লুকটার সাহস তো কম নয়, আর এরা কি তাহলে মাংসপ্রিয়! না—কিছু জোটেনা বলে ভেড়া ধরতে আরম্ভ করেছে। চোপান দূরে একটা তুষারাবৃত পাহাড়খণ্ড দেখিয়ে বললে ঐ দিক দিয়ে সে নেবে আসে—আজও সে তার হাতে মারা এই ভেড়াটা নিতে আসবেই। দেখলাম তার বিশ্বাস অখণ্ড। যাক—তাঁবু তো লাগাতে বললাম।

মিনিট দশেকএর মধ্যে তাঁবু তৈরী হোয়ে গেল। আমার তাঁবুর ঠিক পেছনে চোপানের তাঁবুতে গিয়ে দেখলাম তার স্ত্রী ও ছুটি সুন্দর ছেলে মেয়ে চুপ করে বসে আছে। ছেঁড়া জামা পরেও তাদের গায়ের রং আর স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। ছেলে মেয়ে ছুটিকে কোলে নিলাম, কথা বললাম, কিন্তু তারা কিছুই বোঝে না, বড় বড় চোখে বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো। দেখতে দেখতে নেমে এলো সন্ধ্যা, ঘনিয়ে এলো আঁধার, আমি নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলাম। চোপান বললে আমি রইলাম বসে, খবর দেবো—চোখ আমার পাহারায় রইলো—বলে, নিজের তাঁবুতে সে ফিরলো। আমার তাঁবুর সামনে বিরাট ভেড়ার দল গিজ গিজ করছে, অন্ধকারে তাদের কারুর কারুর নীল চোখগুলি জ্বলে জ্বলে উঠছে। বিশ্রী গন্ধ আর প্রায় পাশেই পড়ে আছে সেই নাড়ীভুড়ি বের করা হতভাগ্য মরা ভেড়াটা। মাঝে মাঝে এক একটা ভেড়ার ছানা করুণ ভাবে ম্যা—করে ডেকে উঠছে। আমাদের চোখ থেকে ঘুম যেন জন্মের মত ছুটে গেছে। পাশেই বসে আছে নিঃশব্দে গুরুদিৎ ও মিশ্রিখান, টোটা ভরা বন্দুক আর তীক্ষ্ণ বর্শা আসন্ন যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছে। অনেকক্ষণ বসে বসে অবসন্ন হয়ে আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার গোদা বুট জুতো জোড়া খুলে একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। হাতের কাছে ধুঁচুনিতে (ওদের দেশে কাংড়ী বলে) আগুন জ্বলছে, তাতেও শীত আমাদের কিছু মাত্র কমছে না। গায়ে পুলওভার ওভার কোট তো আছেই। নিঃশব্দে সময় কাটতে লাগল। হঠাৎ শুনতে পেলাম ভেড়াগুলোর মধ্য থেকে একটা অস্ফুট হিস্ হিস্ হিস্ আওয়াজ—আর মনে হোল তারা যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু গিজ্ গিজ্ করছে সেই ভেড়ার দল, কোথায় যে কি হচ্ছে অন্ধকারে ঠাওর করবার জো নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোপানটার মূর্ত্তি দেখা গেল, বললে—সাব্, আ গিয়া। আমি তো জুতো পরার সময় পেলাম না, ম্যস্থি পরেই বেরলাম একেবারে নিঃশব্দে ; আমার হাতে টর্চ্চ,—চোপান জ্বালাতে মানা করলে। আমরা অতি আস্তে আস্তে ভেড়ার দলের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগলাম। সব চেয়ে আগে পথ প্রদর্শক চোপান, তার পায়ে পায়ে গুরুদিৎ বন্দুক বাগিয়ে, পায়ে পায়ে আমি ও মিশ্রিখান। মিশ্রির হাতে বর্ষা। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা মাটি, কখনও নীচে নামি কখন উচুতে উঠি কখনও হোঁচোট খেতে খেতে সামলে নিই আর কখনও ডান দিকে কখনও বাঁয়ে এগুতে থাকি। বোধ হয় বিশ্ পচিশ পা যাইনি, হঠাৎ চোপান একদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে উঠল—ঐ ঐ, সঙ্গে সঙ্গে টর্চ্চের আলো ফেললাম কিন্তু কৈ কিছুতো দেখি না। টর্চ্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে লাগলাম।—একেবারে নিঃশ্বাস চেপে, হঠাৎ সামনে না পড়ি তাই ভাবতে লাগলাম। উঃ বাপস্, সে

কি সময়! ভাল্লুকটা কোথায় ঘাপটি মেরে বসে রইলো। দেখার চেয়ে না দেখা যেন অন্ধকারে আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, আমাদের চারটি প্রাণীর জীবন যেন অসহায় মনে হতে লাগল। প্রায় মিনিট কুড়ি পঁচিশ খোঁজা গেল কিন্তু কোথাও কিছু নেই। অবসন্ন হয়ে তাঁবুতে সব ফিরলাম, চোপান বল্লে—সাব, এখানেই ওটা আছে। আপনারা শুয়ে পড়ুন, আমার দায় আমি জেগে পাহারায় রইলাম। কিন্তু ঘুম কি আসে সে অবস্থায়, সমস্ত রাত সেই পাহাড়ের মধ্যে অনিদ্রায় কাটল। ভোরের আবছা আলো ফুটলে দেখলাম চোপান সপরিবারে এসেছে, সেলাম করে করুণভাবেই বললে—সাব, একটা ভেড়া আমার নিয়ে গেছে ব্যাটা, আপশোষ, আমি জানতে পারি নি তোমার কসুর নেই কো। বসে পড়ে বলে চলল—সাব, এরা আসে নিঃশব্দে, এমনভাবে অন্ধকারে বোকা ভেড়াকে ধরে যে সে টুঁ-শব্দটি পর্য্যন্ত করতে পারে না—তারপর তার জানটি মেরে যেমন নিঃশব্দে আসে তেমনি নিঃশব্দে যায় চলে। বুঝলাম তাহলে এবার ভেড়াটাকে নিয়েই সে উধাও হয়েছে। সে রাত্রি একেবারে অমাবস্যার অন্ধকার ছিল। অত্যন্ত মন খারাপ নিয়ে অনিদ্রায় এক রকম অবসন্ন হয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘাঁটিতে। তারপর দিনদুয়েক পরে কাজ শেষ করে সেখান থেকে বিদায় নিলাম। কেবল আসবার দিন একবার মৃগনাভীর খোঁজ করে ছিলাম নীচেকার জঙ্গলে। আর কতকগুলি গিধ্বড় বলে এক রকম ছোট লোমওয়ালা জন্তু মেরে মনের ও হাতের আশ তখনকার মত মেটালাম। ছোট হলেও এদের লোমও, চামড়া ভারী সুন্দর।

[পরের বারে সমাপ্য]





উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ
লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চিত্রিত

[গত মাসে উপন্যাসটির ভূমিকা দেওয়া হ'য়েছিল, এবার মূল উপন্যাসটি সুরু হ'ল—সং]

হিন্দুস্থানের ফলাও জমিতে তখন রাজ্যের আবাদ চল্‌ছে। জমিতে লাঙল দিয়েছে ওলন্দাজ, বীজ বুনেছে ফরাসী, কিন্তু আড়ালে কাস্তে হাতে সবুর করছে ফন্দিবাজ ইংরেজ ব্যাপারী। সময় বুঝে, রাত না পোহাতে, চড়াও হয়ে ফসল লুঠ করবে সে।

ম্লেচ্ছদেশের তিন রাজ্যের নায়করা মাথার কাজ চালাচ্ছেন, হিমদেশে ঘোলা আলোয় মন্ত্রণাসভা জম্‌জমাট। হিন্দুস্থানের বুদ্ধিমান যাঁরা, তাঁরাও অনেকটা বুঝে উঠেছেন যে 'রাজ্য নিয়ে ছিনিমিনি' খেলায় ও তিন রাজ্যের যেই জিতুন, আসল কোপ লাগবে দিশী লোকের গায়ে। কিন্তু দিশী রাজারা তখন ভাঙ্‌ খেয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য জেগে উঠে তেড়েমেড়ে ইনি ওনার নাক মলছেন আর উনি এনার কাণ টানছেন। যিনি কাণমলা খেয়ে নাকমলা দিতে পার্‌ছেন তিনি হাসিমুখে গোঁফ চুমরে মহাকালীর মন্দিরে পূজো দিতে যাচ্ছেন আর 'পৃথিবীপালক রাজচক্রবর্ত্তী' খেতাব নিচ্ছেন। এক পক্ষে অবশ্য রাজচক্রবর্ত্তীই বটেন। চক্রান্তের মাঝখানে যাঁরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুম যাচ্ছেন, এরা হচ্ছেন সেই চক্রবর্ত্তী—ভেড়া রাজার দল।

২

দুটি মানুষ—তারা বোকাও নয় চতুরও নয়। শিশুর মত সরল, শিশুর মতই নিশ্চিন্ত তারা। ইতিহাসে যে নূতন পালার মহলা চলছে সে সম্বন্ধে তাদের হুঁশ নেই। তারা ইতিহাস মানে না—পৃথিবী জুড়ে যুগ যুগ ধরে রাজা ও রাজ্যের যে নাটকের অভিনয় চলেছে তা থেকে কোন্ রাজা কোন্ রাজ্য সরে পড়ছে তা তারা বিন্দুবিসর্গ জানে না। তারা জানে, তারা মানে বুনো রক্তের চোখ রাঙানী, বুনো রক্তের হুকুম। যে রক্তের লোভের সঙ্গে মিশেচে পৈশাচিকতা, দুঃসাহসের সঙ্গে মিশেচে দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুরতা, সেই রক্তের হুকুমের চাকর তারা।

দিব্যবর্ণ উধাও হবার বিশ বছর পরের কথা। তখন খোদ লঙ্কা সরকারের পেয়ারের বোম্বেটে—দুটি ভাই, কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ লঙ্কা রাজ্যের সরকারী খরচে তাদের জাহাজের খোল বদল হয়েচে, আর তলোয়ারে শাণ পড়েচে আর বোম্বেটে জাহাজের মাস্তলে আনকোরা সবুজ সোণালী নিশান উড়ছে।

একদিন, থমথমে গম্ভীর রাত। ছটা জাহাজ নিয়ে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ আরব সাগরে লুট করতে চলেছে।

সেদিন রাতের আকাশ আফিং খেয়ে যেন নেশায় ঢুলচে। আর অত বড় দুরন্ত সাগর—তারও মুখে টু শব্দটি নেই। শুধু অবিশ্রাম ফুলে ওঠা টলে-যাওয়া ঢেউয়ের শব্দ—আজগুবি গল্পের অজগরের নিঃশ্বাসের মত একটা হুস্ হুস্ শব্দ।

অনেক রাতে কালো জলের দোলানো পর্দা ঠেলে চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্না লেগে ছটা জাহাজের পাল সাদা পাখীর ডানার মত আকাশে ঝিলিক দিয়ে চল্‌ল। বসে বসে ক্ষিতিভূষণ হাই তুলছিল হঠাৎ এক ঝলক চাঁদের আলো তার গায়ে এসে পড়তে সে বললে, "আরে!" তারপর এক লম্ফে কালীভূষণের জাহাজে ঠিক তার পাশটিতে এসে সে বললে, "দাদা, বড্ড মিইয়ে যাচ্ছি। একটা গান ধরো।" কালীভূষণ হো হো ক'রে হেসে নিলে। তারপর সে তার বিকট গলায় বোম্বেটি গান ধরলে। জ্যোৎস্না রাতে ফুর-ফুরে হাওয়ায় মাঝসাগরে ভাসতে ভাসতে সকলের চোখে মনে তখন নেশা ঘনিয়ে এসেছে। কালীভূষণের সঙ্গে ছটা জাহাজের তিন শো দস্যু গানের ধুয়ো ধরলে। ছটা জাহাজের ডেক থেকে ভীষণ সুরে গাওয়া গম্ভীর গলার সেই গান ধমকের মত রাত্রের আকাশে উঠে উঠে মিলিয়ে যেতে থাকল।

সহসা ক্ষিতিভূষণ বললে "হুঁসিয়ার!" সমুদ্রের একটা দিক আঙুল দিয়ে দেখালে ক্ষিতিভূষণ।

ফুট ফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ফিটফাট পরিষ্কার। যদ্দূর চোখ যায়, কিছুই আড়াল হবার জো নেই। ঢেউ উঠে যা ঢাকা পড়ে, ঢেউ গড়িয়ে গেলে তা চোখে ধরা দেয়।

অমরলতা

শ্রীসতীকান্ত গুহ

সেই জ্যোৎস্না-আলোর সমুদ্রে দিগন্তে একটা কালির বিন্দুর মত কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। বিন্দুটা ক্রমশঃ বড় হতে থাকল। প্রথমে যেটা দেখে মনে হয়েছিল জ্যোৎস্না-আলোর এক ফোঁটা কালি, কিছু পরে মনে হ'ল ঢেউয়ের তেপান্তরে সেটা যেন প্রেতশিশুদের খেলার ভাঁটা, ক্রমে ক্রমে একে একে মনে হ'ল যেন একটা কচ্ছপ, একটা শুশুক, একটা তিমি মাছ। শেষে রশারশি মাস্তুল পাল সমেত একখানা জাহাজ পরিষ্কার ফুটে উঠল আকাশের গায়ে।

গান গেয়ে গেয়ে তখন রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আরব সাগরে আর কোথাও একটা জাহাজও দেখা যাচ্ছে না। হাতের এতটা সময় কী করে কাটানো যায়। কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণকে বললে, "ভাই, রক্ত জুড়োতে দেওয়া নেই। শীকারের জন্য সবুর না করে চড়াও হয়ে তাকে আক্রমণ করি চল্।"

ক্ষিতিভূষণের বুকটা নেচে উঠল। আঃ, সে কী আরাম! চাঁদনী রাতে তাজা রক্ত ঝরিয়ে তলোয়ারের মাথায় কাটামুণ্ড বিঁধে নিয়ে মরণ খেলায় মত্ত হওয়া—আহা, সে কি সস্তা সুখ?

ধূ ধূ সাগরে ফেণা ছিটিয়ে ঢেউ উজিয়ে ছটা জাহাজের ভূতুড়ে ছায়া দূরের জাহাজখানা লক্ষ্য করে ছুটে চলল। খানিক বাদে সেই জাহাজখানা হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে উল্টোপথ ধরলে। বোম্বেটে আসচে, যাত্রী জাহাজখানা টের পেয়ে গেছে। সে তখন উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটচে, পালানোর পথ খুঁজচে। তার এলোমেলো চলায় আতঙ্ক ফুটে উঠচে।

কিন্তু বোম্বেটেদের রাজা কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ। তাহাদের জাহাজকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, সাধ্য কি সামান্য যাত্রী জাহাজের। বোম্বেটেদের জাহাজগুলিতে পালের উপর পাল উঠলো। উড়ন্ত ছটা জাহাজের দুপাশে সাগর তোলপাড় হ'ল, আকুল হ'য়ে মাথা নাড়া দিয়ে উঠে মহা সমুদ্র ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে গেল—ছটা জাহাজের পিছনে ঢেউয়ের পাহাড় ধ্বসে গিয়ে জলের পাতাল হাঁ করলে আর সামনের সমুদ্র অস্থির হয়ে থর থর করে কেঁপে কেঁপে ফুলে উঠল। শেষে বোম্বেটেরা শীকারের টুটি টিপে ধরলে। যাত্রী জাহাজখানাকে ঘিরে ফেললে বোম্বেটেদের ছটা জাহাজ, নিষ্ঠুর মৃত্যুর মত নিঃশব্দে হেসে জাহাজ ছখানা যেন পা টিপে এসে দাঁড়াল। তারপর ঠিক এক সময়ে ছটা জাহাজের মাস্তুলের দড়ি ধরে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে ঝুপ্ ঝুপ্ করে বোম্বেটের দল অসহায় যাত্রী জাহাজখানার পাটাতনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রক্ত খেয়ে রাক্ষুসে তলোয়ার গা মোড়া দিয়ে বললে, "আর নয়"—তখন কালীভূষণের হুঁস হ'ল। টাটকা রক্তে ইস্পাতের ফলায় আগুন লেগেচে। কালীভূষণ ভাবলে, থাক্, ঢের হ'য়েচে। এখন একটিবার জাহাজখানা টহল দিয়ে আসা যাক।

একটা কামরার সামনে এসে কালীভূষণ চমকে গেল।

কামরার ভিতর থেকে কবাটের ফাটল দিয়ে আলোর ক্ষীণ রশ্মি বাইরে এসে পড়েচে। কবাটে কাণ পেতে কালীভূষণ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলে। এই মৃত্যুর হাটে আলো জ্বেলে কে এখানে বসে? গভীর বিস্ময়ে কালীভূষণ কবাটে ধাক্কা দিলে। কবাটটা খুলে গেল।

কালীভূষণের চোখের সামনে যে অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠল, তা' তার বিশ্বাস হ'ল না।

(চলবে)

শারদ বন্দনা

শ্রীনীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাদল রাণী ধরার পালা সারি
চললো ফিরে হিমালয়ের পানে !
আকাশপথে দীপ্ত রবির আলো
নূতন আশা দিল সবার প্রাণে ॥
বকুল কেয়ার বিদায়-গীতি গাহি
কাশের বনে বাতাস আজি বহে ।
শিউলী ঝরি বন্দনা কার করে
দোয়েল শ্যামা শারদ সুর গাহে ॥
সোণার রথে "কিশোর শরৎ" এল
উজল আলো ছড়িয়ে ধরা পরে ।
ঘাসের ফুলে আঁকছে আলিম্পনা
দিগ্বধূরা মনের মত কোরে ॥
সবুজ লতার মোহন উত্তরীয়
বুকঢেকে ওর পিঠের পরে দোলে ।
স্থলকমলের রাঙা বরণ আজ
আগুণ সম শরের পরে জ্বলে ॥
দুলছে গলায় বিনাসূতায় গাঁথা
করবী আর পদ্মকুঁড়ির মালা ।
কপালে ওর চাঁদের তিলক আঁকা
সেই আলোতে বিশ্বভুবন আলা ॥
হাজার লহর সাগর জলে নাচে
ধুইয়ে দিতে কোমল চরণ দুটী ।
অপরাজিতা জোড় করে হাত আছে
প্রণাম দিতে পথের পরে লুটী ॥



কিশোর-এর অপমৃত্যু

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অপরাধের মধ্যে একটি মাসিক পত্রিকা বার করব ঠিক করে'ছিলুম। তাতে'ই একেবারে হুলস্থুল কাণ্ড! কাণ্ডটাই শোন ঃ

মামাবাবু মা'কে বল্‌লেন, "কি ছেলেই তৈরী কর্‌ছিস্‌, আস্ত একটি বাঁদর।"

মা একটু হেসে বল্‌লেন, "কেন? সন্তু আমার তো বিশেষ বাঁদরামি করে না বাপু। নিজের লেখাপড়া নিয়েই থাকে, না আছে তার সিনেমা দেখা বা ম্যাচ খেলা দেখার হুজুগ, না আছে আড্ডা দেবার বাতিক।"

তাঁর বিরাট গোঁফে আঙ্গুল চালিয়ে মামাবাবু বল্‌লেন, "দিন দিন তোর বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে আস্‌ছে দেখ্‌ছি। এ দিকে যে ছেলে তোর এক্‌টা মাসিক পত্রিকা বার কর্‌তে চায়।"

"কেন তা'তে ক্ষতি কি? এখন থেকে যদি সে ওদিকে ঝোঁক দেয় বড় হ'য়ে সে হয়ত ভালো করেই এক্‌টা পত্রিকা চালাতে পারবে, চাক্‌রীর জন্যে আর আফিসে আফিসে ঘুরে বেড়াতে হবে না।"

"তুইও যেমন! মিছিমিছি কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ। তা' ছাড়া লেখাপড়ারও যথেষ্ট ক্ষতি; এই বি, এ পরীক্ষাটা কেমন ও পাশ কর্‌তে পারে দেখে নিস্‌।" তাঁর ভারী পায়ের শব্দ কর্‌তে কর্‌তে তিনি চলে' গেলেন। মা'র কাছ থেকে কোনও রকম সমর্থন না পেয়ে গোঁফ জোড়াটা তাঁর সজারুর কাঁটার মত তীক্ষ্ণ আর শক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

বাড়ীর ভেতর ছোট এক্‌টা ঘর ঠিক করেছি আমাদের 'কিশোর'এর আফিসের জন্যে। বাইরে মস্ত এক্‌টা লেটার-বক্স—পত্রিকার চিঠিপত্র ইত্যাদির জন্যে।

ভূতো এসে খবর দিল, "দেখ্ সন্তু, তোদের পত্রিকাটা আমার দাদার প্রেস্ থেকে ছাপা না কেন। শ্যামবাজারে তাঁর প্রেস্—নাম, দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড্। আমি বলে রেখেছি ছ'টাকা করেই ফর্ম্মা তিনি ছাপিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। অন্য কোথাও এতো সস্তা পাবি না, তা' ছাড়া কাজ যা' একেবারে ফাষ্টো কিলাস্।"

ভূতোর ইংরিজি উচ্চারণগুলো চিরকালই একটু অদ্ভুত ধরণের। শুনে' শুনে' আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

হ্যাপা বল্ল, "দেখ্ সন্তু, পত্রিকা বার কর্‌ছিস্ বার কর, কিন্তু কয়েকটা কথা বলি মন দিয়া শোন্। প্রথমতঃ পত্রিকায় গল্প কবিতার চেয়ে বেশী দর্‌কারী বিজ্ঞাপন। সিদ্ধ মলম, দেশী বিঁড়ি, পরিমল নস্য, ফ্রেঞ্চ লণ্ড্রি (বাঙ্গালীদের), হাই ক্লাস বুক বাইণ্ডার্স, কালা জ্বরের দৈব ওষুধ, ভৈরবীর স্বপ্নপ্রাপ্ত মাদুলি. ইত্যাদির বিজ্ঞাপন জোগাড় করার জন্যে একজন এজেণ্ট রাখ্। বলিস্ তো আমার মাস্‌তুতো ভাই বিন্দেকে পাঠিয়ে দিই। টোয়েণ্টি ফাইভ্ পারসেণ্ট্ কমিশান্ আর একটা বাসের অল্-সেক্‌সান্ মান্‌থ্‌লি হলেই হবে।"

তার কথাগুলো সুযুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হল। বল্‌লুম. "আচ্ছা পাঠিয়ে দিস্।"

প্রথম সংখ্যার জন্য অন্ততঃ ভালো ভালো নামকরা লেখকদের লেখা নিতে হবে। ভাব্‌লুম সেটা আর শক্ত কি. নিজেদের লেখা ছাপাবার সুযোগ পেলে তাঁরা নিশ্চয় খুসী হয়েই লেখা দিয়ে দেবেন!

প্রথমেই গেলাম সৌমেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী। ছোটদের নাম-করা লেখক তিনি। তাঁর কাছ থেকে এক্‌টা ধারাবাহিক উপন্যাস আদায় কর্‌তে. পার্‌লেই—ব্যাস্। আমাদের পত্রিকার সেটা নিশ্চয়ই এক্‌টা এক্‌স্‌ট্রা এ্যাট্রাক্‌শান্ হবে।

তাঁর বাড়ীর কড়া নাড়তেই এক ভদ্রলোক দর্‌জা খুলে' দিলেন। বল্‌লুম, "সৌমোন্‌বাবু আছেন?"

"আমিই সৌম্যেন্‌বাবু। আসুন ভেতরে! কি চাই আপ্‌নার?"

বল্‌লুম, "ইয়ে, মানে আমরা একটা পত্রিকা বার করছি, নাম কিশোর। আপ্‌নার কাছে আসছি এক্‌টা উপন্যাস নিতে।"

একমুখ হেসে' তিনি বল্‌লেন, "বসুন। এ' তো ভালো কথা। আমি কিন্তু আড়াইশ'র কমে লিখি না। তা আপ্‌নাদের এ' প্রথম উদ্দম, প্রথম প্রচেষ্টা। আমাদেরও নিশ্চয়ই কিছু সাহায্য করা উচিত। দেবেন দু' শ;' তা' হলেই হবে।"

আমার চোখ তো কপালে ওঠার জোগাড়। দু-শো-টা-কা! কিন্তু ভদ্রলোকের সাম্‌নে এমন ভাব দেখালুম যেন তাতেই রাজি, যদিও ভালো করেই জানি এত টাকা দেবার আমার সামর্থ্য নেই। বল্‌লুম, "আচ্ছা, কাল পরশুর ভিতর নিয়ে যাবোখন। আপ্‌নার লেখা নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছে?"

"ও' আর প্রস্তুত অপ্রস্তুত কি? টাকা হাতে এলেই মাথায় প্লট্‌ ঘুর্‌বে। যাবো এক্‌টা দু'টো ডাকাতির সিনেমায় কিংবা কোনও জাঙ্গ্‌ল্‌ পিক্‌চারে; তারপরেই দেখ্‌বেন ক্যায়সা থ্রি্‌লিং এক ধারাবাহিক!"

সেখান থেকে বেরিয়ে গেলুম মহেন্দ্রকুমার রায়ের বাড়ী। ছোটদের জন্যে ভুতুড়ে গল্প লিখে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। দরজায় ধাক্কা দিতেই এখানে যে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন মোটা দিব্যি নধর তাঁর দেহ। বল্‌লেন, "কি চাই?"

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তো আর সব কথা বলা যায় না। একটু ইতস্ততঃ করে বল্‌লুম, "আমরা এক্‌টা নতুন পত্রিকা বার কর্‌ছি, আপনার সাহায্য চাই।"

ভদ্রলোক বল্‌লেন, "আসুন। তা' প্রতি গল্পে আপনারা কত করে' দেবেন?"

"দেখুন এই আমাদে প্রথম প্রচেষ্টা। আর বুঝ্‌লেনই তো, ফাণ্ডও এমন কিছু বেশী নয়, তাই ...." কাছের চেয়ারটায় বস্‌তে যাচ্ছিলুম। ভদ্রলোক "হাঁ হাঁ" করে' উঠে বল্‌লেন "ওটায় নয়, ওটায় নয়, এইটায় বসুন।" তিনি ঠিক তা'র পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন, "হুঁ, তারপর?"

প্রথমে তাঁর এই বিচিত্র ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পারি নি। কিন্তু বুঝ্‌তে বা অনুভব কর্‌তে বিশেষ দেরী হল না। —চেয়ারটায় অগুন্তি ছারপোকা!! যারা টাকা না দিয়ে গল্প চাইতে আসে এই চেয়ারটা নিশ্চয়ই তা'দের জন্যে বরাদ্দ, কোন লোকই বেশীক্ষণ বিরক্ত কর্‌তে পারে না। কি অদ্ভুত বিজ্ঞানসম্মত এই বন্দোবস্ত।

বল্‌ছিলুম, "শুন্‌লেনই তো, নতুন পত্রিকা আমাদের। তাই প্রথমে আমরা কিছু দিতে পার্‌ব না।"........উঃ (নেপথ্যে) এক্‌টু সরে' বসে', "কিন্তু পেপারটা ষ্টাণ্ড্‌ কর্‌লেই"........ওঃ (নেপথ্যে) —"আচ্ছা আজ আসি, অন্য একদিন আস্‌ব।"

ভদ্রলোক একটু মিষ্টি হেসে' বল্‌লেন "নিশ্চয়ই আস্‌বেন। আজ বোধ হয় আপ্‌নার বিশেষ কাজ আছে। ......নতুন পত্রিকা বার কর্‌ছেন, থাকাই তো স্বাভাবিক। ......আচ্ছা নমস্কার।"

"নমস্কার", রাস্তায় এসে পড়্‌লুম। উঃ, কম সে কম পোয়াটাক রক্ত ব্যাটারা চুষে' নিয়েছে। আবার ওমুখো হব? রামোঃ।

আরও কয়েকজন নাম-করা লেখকের কাছে ঘুর্‌লুম। কিন্তু সবাইকার সেই একই ভাব "ফেলো কড়ি, মাখো তেল।" বিরক্ত হয়ে ভাবলুম, "ধুত্তোর। নিজেরাই লিখব। ভালো গল্প হলেই হল, নামে কি আসে যায়?"

তা'রপর শ্যামবাজারে বাসে করে' এলুম প্রেসের খোঁজে। নতুন পত্রিকা বার কর্‌ছি, অদম্য উৎসাহ।

ঠিকানা অনুযায়ী সেই রাস্তাটা খুঁজে বার কর্‌লুম—এ' প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত বার দুই ঘোরাঘুরি কর্‌লুম, কিন্তু কোথায় সেই বিখ্যাত—দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড্? ভূতোটা একটা ভূতো চাল মারে নি তো?

মরীয়া হয়ে শেষে এক স্থানীয় ভদ্রলোককে পাক্‌ড়াও কর্‌লুম, "মশাই দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেস্ কোথায় বলতে পারেন?"

ভদ্রলোক সাম্‌নের এক্‌টা আস্তাবলের মত জায়গা নিঃশব্দে আঙ্গুল তুলে' দেখালেন। প্রথমে ভাবলুম তিনি বুঝি রসিকতা কর্‌ছেন—তারপরেই এক্‌টা সবুজ সাইনবোর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রোদে আর জলে তার ওপরকার লেখাগুলো অনেকটা আব্‌ছা হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধি খরচ করে পড়তে হল "ছাপাখানা"—কিন্তু কে এক সত্যবাদী যুবক কি বালক ছুরি দিয়ে চেঁচে তার প্রথম অক্ষরটা বেমালুম উঠিয়ে দিয়েছে!

নাকে রুমাল চেপে' বিখ্যাত দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের আফিস্ রুমে ঢুক্‌লাম। অনেক দর কষাকষির পর সাড়ে' ছ' টাকায় ফর্ম্মা রফা হল। কিন্তু প্রেসের চেহারা ও আব্‌-হাওয়ায় আমার উৎসাহের আগুণ তখন অনেকটা নিভে এসেছে।

বাড়ী ফিরেই দেখি 'কিশোর'এর লেটার বক্সে মস্ত বড় একটা বুক্ পোষ্ট। ওপরে লেখা—টু দি এডিটার, কিশোর।—উৎসাহে আমার বুকটা ফুলে' উঠ্‌ল। এ্যাড্‌ভার্টাইস্‌মেণ্টের কি রকম প্রত্যুত্তর পাচ্ছি! অধৈর্য্য হয়ে খামটা এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো করে' ছিঁড়ে ফেল্‌লুম। পরক্ষণেই সমস্ত উৎসাহটা হাওয়া বেরিয়ে-যাওয়া বেলুনের মত চুপ্‌সে গেল! আমার সাম্‌নে ফুটে' উঠ্‌ল শুভার্থী মাতুলের পদ্ম হস্তাক্ষর। ডজন আড়াই কবিতা তিনি পাঠিয়েছেন আর তা'র সঙ্গে ছোট এক্‌টা চিঠি:

কিশোর-এর অপমৃত্যু

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সন্তু,

আমার কথা না শুনে' যখন তুই নেহাৎই অবাধ্যের মত পত্রিকা বার করছিস্ তখন অনোন্যপায় হয়ে তোকে এই কবিতাগুলো পাঠালাম। উদ্দেশ্য সাধু, লেখা জোগাড়ের জন্যে তোকে যাতে টো টো করে' ঘুরে সময় নষ্ট করতে না হয় তাই এগুলো পাঠানো। দু' কপি করে ম্যাগাজিন তোর মামীমার নামে পাঠাস; আর কবিতাগুলোও তোর মামীরই লেখা, তার নামেই ছাপাস। ইতি—

তোর—মামা

পুঃ—কবিতাগুলো সব প্রথম পাতায় ছাপাবি।

এবারে আমার কান্না পেলো। জানি মামীমার যথেষ্ট সাধারণ বুদ্ধি আছে। মুড়িঘণ্ট আর আইসক্রীম আর চাট্‌নী ছাড়া তিনি অন্য বিশেষ কিছু করেন না। কিন্তু মামাবাবু ছেলে বেলা থেকেই অতি নিষ্ঠুর ভাবে বাংলা সাহিত্যকে আক্রমণ করে আস্‌ছেন—এই আড়াই ডজন কবিতা, বাংলা দেশের আড়াই ডজন ত্রৈমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে ফিরে'—আসা—কবিতা; ঐ কীর্ত্তি তাঁরই।...হায়, হুঙ্কার ছাড়্‌লে আর সজারুর কাঁটার মত খোঁচা খোঁচা গোঁপের ঝাড় থাক্‌লেই যদি ভালো কবিতা লেখা যেতো!

বিন্দেকে ওরফে বৃন্দাবনকে নগদ দশটাকা খরচা করে' ইতিমধ্যে এক্‌টা মান্‌থ্‌লি টিকেট্ কিনে দিয়েছি, কিন্তু এড্‌ভার্টাইস্‌মেণ্ট এতোদিনে এক্‌টিও এসে' জোটেনি। সে মাঝে মাঝে আমাকে এসে' অভয় দেয়, অনেক জায়গা থেকেই সে নাকি প্রমিস্ পেয়েছে। কেউ দেবে দিন কয়েকের মধ্যে, কেউ নাকি প্রথম সংখ্যাটা দেখে' তারপর দেবে। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস বিন্দে সারা সকাল শ্যামবাজার, কিংবা এন্‌ট্যালি কিংবা আলিপুরে আড্ডা দেয়, দুপুরের দিকে কোল্‌কাতার যত সিনেমা-হাউসের বাইরের ছবি দেখে বেড়ায়, বিকেলের দিকে চিনে বাদাম খেতে খেতে র‍্যাম্‌পার্টে দাঁড়িয়ে নির্ব্বিচারে ম্যাচ্‌খেলা দেখে, তারপর সন্ধ্যের দিকে ছাত-খোলা ডাব্‌ল্ ডেকারে চড়ে' একটু হাওয়া খেয়ে আসে!

যাই হোক্ এতো বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও আমি একনিষ্ঠ ভাবে চেষ্টা করে' চলেছি, কিশোর বার করতেই হ'বে,—এটা যেন আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম সংখ্যার জন্যে অখ্যাত লেখকমণ্ডলীর কাছ থেকেই কতকগুলো চলনসই লেখা জোগাড় করে'ছি।

শুধু একটা গোটা ছ'পাতার ভালো গল্প হলেই হয়। বাংলা মাসের আজ দশই। কুড়ি তারিখের মধ্যে সমস্ত লেখা প্রেসে দিয়ে দিলে মাস কাবারের দিন চারেক্ আগেই তা'রা দিয়ে দেবে বলে'ছে।

এখন এই ছ' পাতার গল্প কা'র কাছ থেকে পাওয়া যায়? তার ওপর ঐ গল্পটা বেশ একটু ভালো হওয়া চাই! কোনও বিখ্যাত লেখকের কাছে আর যাই নি, একজন তো ছারপোকা লেলিয়ে দিয়েছিলেন, এবারে যদি কুকুর লেলিয়ে দেন...নাঃ, কিশোর-এর চেয়ে পৈত্রিক প্রাণটার দাম অনেক বেশী!

হঠাৎ একটা কথা চট্ করে' মাথায় এলো, ছোটকাকা...দি আইডিয়া! স্কুল কলেজে পড়ার সময় তিনি লিখ্তেন, এবং ভালোই লিখ্তেন। ভাব্লুম, যেমন করেই হোক্ তাঁর কাছ থেকে একটা লেখা জোগাড় করতে হবে—তবে তাঁর একমাত্র দোষ অসম্ভব কুঁড়ে তিনি! নইলে লেখার দিকে যেন প্রতিভাই তাঁর ছিল, ছিল একটা প্রকাণ্ড সম্ভাবনা। কিন্তু কুঁড়েমি করেই সমস্ত তিনি মাটি কর্লেন। অভিযোগ কর্লে উত্তর দেন, "এমন জিনিষ কি আর আছে রে?"

কিন্তু, যাই হোক্, তাঁর কাছ থেকে একটা ভালো গল্প আদায় কর্তেই হবে; চেষ্টা কর্লে এখনও তিনি নিশ্চয়ই ভাল গল্প লিখ্তে পারবেন।

ইজি চেয়ারের হাতলের ওপর পা ছু'টো তুলে' দিয়ে মুখে এক ধূমায়মান পাইপ লাগিয়ে তিনি নিঃশব্দে আমার কথা শুনে গেলেন। পরে বল্লেন, "আচ্ছা চেষ্টা করে দেখি। এখন কি আর লিখ্তে টিক্তে পার্বো? যাই হোক্, পরশু সকালে তুই একবার আসিস্।"

আনন্দে আমার লাফাতে ইচ্ছে কর্ল। এক কথাতেই রাজী, ইতিহাসে এ' যে একেবারে নতুন!

নির্দ্দিষ্ট দিনে সকাল সকাল তাঁর ওখানে গেলুম। সেই ইজিচেয়ারে একই পোজে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে। কাকীমা চা-টোষ্ট এনে দিলেন। বল্লুম, "কোথায় আছে লেখাটা?"

তিনি হেসে বল্লেন, "আরে, অত ব্যস্ত কেনো। একটা ভালো প্লট্ মাথায় আসা চাই তো? এই ছু' দিন কেবলই ভেবিছি, কিচ্ছুটি মাথায় আসে নি।'

বল্লুম, বিপদ ঘটাবেন দেখ্ছি।...আচ্ছা অরিজিন্যাল প্লটের গল্প না হয় পরে দেবেন। উপস্থিত কোনও বিলিতি গল্পের অনুবাদ টনুবাদ কিছু একটা করে দিন। একটু কায়দা করে' কর্তে পার্লে অরিজিন্যাল বলেই চালিয়ে দেবো।"

তিনি উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, "দি আইডিয়া! আচ্ছা এক্‌টা ভালো বিলিতি গল্প অনুবাদ করে দেবো; এ আর এমন শক্ত ব্যাপার কি? আসিস্ দিন চারেক পরে।"

বল্লুম, "কুড়ি তারিখের মধ্যে সব লেখা প্রেসে দিতে হ'বে। চারদিন পরে হল ষোলো তারিখ, দেখ্‌বেন দেরী যেন না হয়।"

হেসে তিনি বল্লেন, "না রে পাগ্‌লা না। দেখিস্ না, খাসা একটি অনুবাদ। খুশী তো?"

ষোলো তারিখে কাকাবাবুর কাছে আবার গেলুম। তিনি বল্লেন, "বোস্ সন্তু বোস্।"

বল্লুম "বোস্‌ব তো, কিন্তু হল কদ্দূর?"

তিনি হেসে' বললেন, "বহুদূর। আর এক্‌টু বাকী।"

বল্লুম, "দেখ্‌বো। এদিকে আবার ছ' পাতার চেয়ে যেন বেড়ে না যায়। ...কৈ কোথায় আছে ম্যানুস্‌ক্রিপ্‌ট্‌টা? দেখি কি রকম হচ্ছে?"

তিনি বল্লেন, "অত ব্যস্ত কেনো? এক সঙ্গে দেখিস্। নইলে গল্পের ইন্টারেষ্ট চলে' যাবে।"

বল্লুম, "ক'বে শেষ হবে?"

"এই পরশু নাগাদ।"

"হবে তো?"

"আরে হ'তেই হ'বে, দেখে নিস্।"

"কিন্তু পরশু হ'ল গিয়ে আঠার তারিখ। হাতে মোটে দু' দিন থাক্‌বে।"

পাইপে তামাক ঠাস্‌তে ঠাস্‌তে তিনি বল্লেন, "তুই যে মাড়োয়াড়ীদের মত হলি রে। ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টা চারেক্ আগে ষ্টেশানে না এলে তারা মোটেই সুস্থ বোধ করে না।"

বল্লুম, "দেখ্‌বেন, ঠিক্ সময়ে ট্রেণ ধর্‌ব বলেই লোকে ট্রেণ ফেল করে'। কিন্তু আগে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

আঠারো তারিখ। দুরু দুরু বুক নিয়ে কাকাবাবুর বাড়ীতে হাজির সন্ধ্যের দিকে। কাকীমা বল্লেন, "কে রে, সন্তু? আয় বাবা, বোস্। তোর ছোটকাকা তো এক সপ্তাহের জন্যে শিলঙ্‌ বেড়াতে চলে গিয়েছেন।"

"এঁ্যা বলেন কি? আমার লেখাটা?"

"তিনি বলে'ছেন 'লেখাটা আর শেষ হ'ল না। সন্তু তো ভালোই লেখে' সেই যেন অনুবাদটা করে নেয়।' নাম নিয়ে বিশেষ গোলমাল হ'লে ওঁর নামটা দিতে পারিস্।"

বল্‌লুম, "যাক সে। যতটা অনুবাদ হয়েছে সেই ম্যানুসক্রিপ্‌ট্‌টা দিন আর সেই অরিজিন্যাল বইটা। বাকীটা আমাকেই শেষ করতে হবে।"

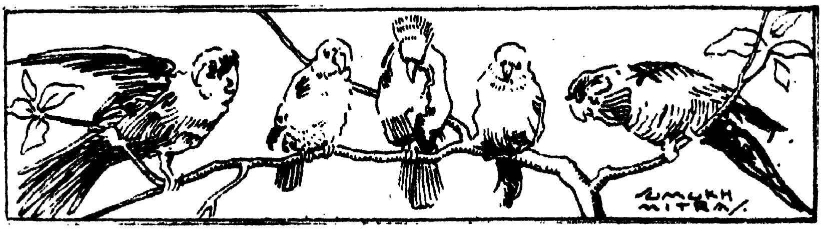
কাকীমা বল্‌লেন, "ম্যানুস্‌ক্রিপ্‌ট্ কি রকম? ঐ কদিন তো তিনি একটি আঁচড়ও কাটেননি। তবে একটা বই দিয়ে গিয়েছেন তোর নামে।" কাকীমা হ্যান্‌স্ এ্যাণ্ডারসনের ছোট গল্পের একটি বই আমাকে এনে দিলেন ভেতরে ছোট্ট একটি শ্লিপ্—"এ সব গল্প তো তোমার পড়াই আছে, ছোট আর ভালো দেখে বেছে নিয়ে অনুবাদ করে ফেলো। ঘণ্টা দুই এর বেশী লাগ্‌বে না।"

বাড়ী এসে "কিশোর" এর অফিস্ রুমে বসে চিঠি লিখ্‌তে লাগ্‌লুম ;

শ্রীচরণেষু মামাবাবু,

আপ্‌নার কবিতার জন্যে বিশেষ ধন্যবাদ। তবে আপনার উপদেশটাই বেশী মূল্যবান। সময় আর টাকা নষ্ট না করে তাই আর "কিশোর" বার করলুম না। কবিতাগুলি চমৎকার, কিশোর বেরুলে প্রথম পাতাতেই বেরুতো।

ইতি—প্রণতঃ





শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাউই জাহাজে তারা নেই! তাহলে এই মহাশূন্যে তারা আছে কোথায়? বেতারে খবরই বা পাঠাচ্ছে কোথা থেকে?

বেতার ঘর থেকে ষ্টাইনের হাসিতে অক্ষম রাগে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে পড়ে সমর সেই কথাই ভাবছিল।

নিজের ঘরে গিয়েও তার এই হ'ল একমাত্র ভাবনা। ষ্টাইনের আক্রোশও এ ভাবনার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

ষ্টাইন্‌ই অবশ্য সমস্ত ব্যাপারের মূল। গোড়া থেকেই ডাঃ ক্রুলের কেন সে শত্রুতা করেছে, কেন যে ডাঃ ক্রুল তাকে জাহাজে বন্দী করে রেখে গিয়েছিলেন অথচ বাইরে পুলিশের হাতে দেন নি এসব কথা অবশ্য জানবার উপায় নেই। কিন্তু ষ্টাইন যে মুক্ত হয়েও ডাঃ ক্রুলের ভয়ে জাহাজ থেকে পালায় নি এই জাহাজেই লুকিয়ে থেকে ঠিক সময় বুঝে সে যে ডাঃ ক্রুল ও অজয়কে ফাঁদে ফেলে বন্দী করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সে রাত্রে ঠিক কি হয়েছিল তা সে ধারণা করতে পারে না। একই ঘরে অজয় ও সে শুয়েছিল। তারই ভেতর থেকে অজয়কে কি কৌশলে ষ্টাইন সরিয়েছে তা বোঝা যায় না।

সাহায্যের জন্যে ষ্টাইনের একজনকে দরকার ছিল, সেই জন্যেই নিশ্চয় সমরকে সে রেহাই দিয়েছে। কিন্তু অজয় ও ডাঃ ক্রুলকে নিয়ে সে কি করেছে!

হাউই জাহাজের সব রহস্য অবশ্য তার জানা নয়। সমুদ্রের জাহাজে যেমন লাইফ বোট থাকে এই হাউই জাহাজের তেমন কিছু ছোট যন্ত্রযান ছিল কি! ষ্টাইন কি ডাঃ ক্রুল আর অজয়কে সেই রকম কোন কিছুতে তুলে ছেড়ে দিয়েছে?

এছাড়া অজয় ও ডাঃ ক্রুলের হাউই জাহাজ থেকে অন্তর্ধান ও এখন বেতার সংবাদ প্রেরণের কোন অর্থ ত হয় না।

কিন্তু সমুদ্রে লাইফ বোট যদি বা এই কাজে লাগে,—এই অসীম মহাশূন্যে ওরকম কোন যন্ত্রযানের কোন মূল্য ত নেই। সে যন্ত্রযানের আর কতটুকু ক্ষমতা? তাদের বিশাল হাউই জাহাজ অতি কষ্টে যে দীর্ঘ শূন্যপথ পার হতে পারে সামান্য একটা ছোট যন্ত্রযান সে পথের কতটুকু পার হতে পারে! ষ্টাইন ত তাদের জেনে শুনে একেবারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে পাঠিয়েছে। অজয় ও ডাঃ ক্রুলের সেই যন্ত্রযানে বেতারযন্ত্র আছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাও ত কোন কাজে আসবে না।

পৃথিবী থেকে বুধগ্রহের পথে কোন শূন্যে তারা এখন ভাসছে কে জানে! কোন দিন কোথাও কূল পাবার আশা তাদের নেই। হাউই জাহাজ প্রতিমুহূর্ত্তে তাদের আরো দূরে ফেলে আসছে। জাহাজের ওপর কর্ত্তৃত্ব থাকলে সে অবশ্য হাউই জাহাজ ফিরিয়ে তাদের সন্ধানে যেত। কিন্তু তা ত তার নেই। কোনরকমে ষ্টাইনকে কাবু করতে পারলেও একলা সে এ জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

ষ্টাইনকে হাতে পায়ে ধরে মিনতি করা এখন একমাত্র পথ। কিন্তু তাতে কোন রকম ফল হবে না সে জানে। দয়া মায়া মমতা বলে কোন কিছু থাকলে এমন কাজ সে করতেই পারত না।

না—অজয় আর ডাঃ ক্রুলকে বাঁচাবার কোন আশা যে নেই সমর বেশ ভাল করেই বুঝতে পারে। মহাশূন্যের মাঝে তাদের সেই ছোট যন্ত্রযানেই তাদের শেষ সমাধি হবে। দুঃখে রাগে হতাশায় সমরের যেন নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

একবার অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে সে তার দেশের বাড়িতে বাইরের কোন গাছ থেকে একটা মরণাপন্ন পাখীর কাতর গোঙানি শুনেছিল অর্দ্ধেক রাত ধরে। পাখীটা কোথায়

আহত হয়ে গোঙাচ্ছে বোঝবার উপায় নেই। তাকে উদ্ধার করে আনার কল্পনাও বাতুলতা, কিন্তু তবু সারারাত সমর ঘুমোতে পারেনি। অন্ধকারে সেই অসহায় কাতর আর্ত্তনাদ যেন তার মাথার ভেতর ছুরীর ফলার মত বিঁধেছে।

অজয়দের কথা ভেবে তার সেই পাখীটার কথাই মনে পড়ে। মহাশূন্যে হতাশভাবে যত দিন ক্ষমতায় কুলোয় তারা বেতার ডাক পাঠাতেই থাকবে। কেউ সে ডাকে সাড়া দেবার তবু নেই! কেউ নেই তাদের উদ্ধার করবার। একদিন সে ডাক তারপর আপনা থেকে থেমে যাবে। বেশীদিন এই ভাবনাই সার করলে সমর কি করে ফেলত বলা যায় না। এখন তার একমাত্র সঙ্কল্প ষ্টাইনের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। তার সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য্য তার থাকত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এরই মধ্যে এমন একটি উত্তেজনা এসে জুটল যাতে অজয়দের ভাগ্য সম্বন্ধে হতাশা ও দুঃখ কতকটা সে ভুলে থাকার সুযোগ পেলে।

অজয়দের বেতার ডাক পাবার পর তখন অনেক দিন—অবশ্য পৃথিবীর হিসেবে কেটেছে।

হঠাৎ একদিন ষ্টাইনই উত্তেজিত ভাবে জানালে শীগ্‌গীর সমরের কণ্ট্রোল রুমে যাওয়া চাই।

ষ্টাইনকে এত উত্তেজিত কোন দিন সমর দেখেনি, একটু অবাক হয়ে সে গেল কণ্ট্রোল রুমে। এ সময়ে সেখানে তাকে ডাকার কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন সত্যিই গুরুতর! ঘরে যেতেই একটা যন্ত্রের কাঁচ ঢাকা ডালার দিকে নির্দ্দেশ করে ষ্টাইন বল্লে—দেখতে পাচ্ছ কিছু!

তাইত আশ্চর্য্য! যন্ত্রটা মাধ্যাকর্ষণের মাপ নেবার। তার কাঁটা পৃথিবী ছাড়িয়ে আসার পর বহুদিন এক ভাবে ছিল, হঠাৎ তা একদিকে হেলেছে!

আনন্দে উত্তেজনায় ষ্টাইনের ওপর তার জাতক্রোধ পর্য্যন্ত ভুলে সমর বলে উঠল—একি! বুধ যে আমাদের সত্যি টানতে সুরু করেছে! আমরা এসে পড়েছি!

"তা ত পড়েছি; এখন প্রস্তুত হও। প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের অভিযানের ভাগ্য নির্ণয় হয়ে যাবে! দেখা যাক বুধ গ্রহ আমাদের কি ভাবে অভ্যর্থনা করে!

এই উত্তেজনার ভেতরও "আমাদের অভিযান"—কথাটা খোঁচার মত সমরের কানে বিঁধল। ডাঃ ক্রুল আর অজয়কে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে ষ্টাইন এখন কিনা এ ব্যাপারটাকে "আমাদের অভিযান" বলে দাবী করতে চায়!

কিন্তু সে কথা নিয়ে রাগারাগি করবার তখন সময় নয়। তার চেয়ে অনেক জরুরী কাজ সামনে।

কি ভাবে যে তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগল, কি উৎসাহ ও উত্তেজনার ভেতর দিয়ে তা বুঝি বর্ণনা করাও যায় না। আহার নেই ঘুম নেই, অন্য কোন চিন্তাও নেই!

মাধ্যাকর্ষণ-মানযন্ত্রের কাঁটা একটু একটু করে হেলে যাচ্ছে। ষ্টাইন তার নির্দ্দেশ সমরের কাছে শুনে শুনে একটু একটু করে হাউই জাহাজের বেগ কমিয়ে আনছে।

মাধ্যাকর্ষণের টান বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্ত্তনও যেন তারা এবার স্পষ্ট করে টের পাচ্ছিল। ধীরে ধীরে শরীরের ভার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। নড়া চড়া এখন আর সাবধানে করতে হয় না, হাত পা নাড়া ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসছে।

সবচেয়ে বেশী উত্তেজনা দূরবীণের ভেতর দিয়ে বুধ গ্রহের চেহারা দেখায়। প্রথমে বুধ গ্রহের চেহারা ছিল অস্পষ্ট চাঁদের মত। ধীরে ধীরে সে চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে ঘন মেঘের আবরণে বুধ গ্রহ ঢাকা, তা এখন বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এমন কি এক জায়গায় প্রবল ঝড়ের বেগে সে ঘন মেঘে যে আলোড়ন চলেছে তা পর্য্যন্ত।

হাউই জাহাজের আর নিজের বেগের কোন প্রয়োজন নেই। বুধ গ্রহ এখন তাকে সবেগে নিজের দিকে টানছে। সে প্রচণ্ড টানে যাতে বুধ গ্রহের গায়ে আছড়ে না পড়তে হয় সে জন্যে এখন একটু একটু করে বরং উল্টো দিকে ষ্টাইনকে বেগ বাড়াতে হচ্ছে।

বুধের ঘন মেঘের আবরণ ক্রমশঃ বিদ্যুৎ বেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। টেলিস্কোপ সে বেগের সঙ্গে সমান তালে ফোকাস্ করে রাখাই কঠিন। এ রকম জমাট নিবিড় মেঘ পৃথিবীর আকাশে কোন দিন সমর কল্পনাও করতে পারে না।

মেঘ বলে সেগুলি মনে হয় না, সে যেন জলীয় বাষ্পের চেয়ে আরো গাঢ়, আরো স্থূল কোন পদার্থ দিয়ে তৈরী। তার দিকে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন ঘোলাটে রঙবেরংএর কাদা জলের একটা প্রকাণ্ড ঘুর্ণি নীচে পাক খাচ্ছে। সূর্য্যের আলো তার ওপর পড়ায় কত রঙ যে ঠিকরে পড়ছে তার লেখাজোখা নেই। পৃথিবীর কোন সূর্য্যাস্তেও বুঝি এত রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

এখনো বুধ গ্রহের আসল চেহারা কি তারা জানে না। কি আছে সেখানে! এই ঘন মেঘের আড়ালে কি রূপ সে লুকিয়ে রেখেছে!

পৃথিবী ছাড়িয়ে
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

এই ত মেঘলোক এসে পড়েছে তাদের চারিধারে। হাউই জাহাজ মেঘের আবরণ ভেদ করে চলেছে। তাদের অভিযানের পরিণাম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থির হয়ে যাবে।

তারা কি নিরাপদে গিয়ে নামতে পারবে বুধের গায়ে! না আছাড় খেয়ে চুরমার হয়ে পড়বে তার ওপর। নিরাপদে হাউই জাহাজ সেখানে পৌঁছোলেও তাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে। কে জানে বুধ কি ভাবে তাদের অভ্যর্থনা করবে! সেখানে কি হাওয়া আছে পৃথিবীর মানুষের নিঃশ্বাস নেবার মত? আহার আছে মানুষের উপযোগী? সে জগৎ কি প্রাণহীন, শূন্য মরুভূমি! না, অন্য কোন কল্পনার অতীত অদ্ভুত জীব গোষ্ঠি সে গ্রহ অধিকার করে আছে? যদি তা থাকে তাহলে সে জীব গোষ্ঠি কত দূর উঠেছে বিবর্ত্তনের পথে? তারা অন্য গ্রহের দুই অতিথিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে? শত্রু হিসাবে তারা কতখানি ভয়ঙ্কর?

সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলতে আর দেরী নেই। মেঘের আবরণ পাংলা হয়ে আসছে। ষ্টাইন মাধ্যাকর্ষণের উল্টো গতিবেগ দিয়ে হাউই জাহাজের গতি একেবারে মন্থর করে এনেছে।

চলবে



রেলগাড়ী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

একঘেয়ে ইস্কুল—দুবেলা পড়া
একটুকু ফুরসৎ অবসর নাই—
দিন রাত মেজদার বকুনি-পালা
পালাবো যে কোন দিকে নেই সে উপায় !
হঠাৎ পূজোর ছুটি—অনেক দিনের—
অনেক জাগার পর ঘুমের মতো—
সহরের বাইরেতে অনেক দূরে
চলেছি আজকে উড়ে হাওয়ার মতো !

চলছে রেলের গাড়ী—মাঠের বুকে
রূপালি লাইন বেয়ে ছুটছে গাড়ী,
সবুজ মাঠের কোলে ছাগল গোরু,
এধারে ওধারে মেলা খড়ের বাড়ী।
নিকানো দেয়াল দাবা যাচ্ছে দেখা,
সাম্নে খালের জলে কলসী দোলে—
মাছরাঙা শাদা বক হাজার হাজার
তারের খুঁটিতে বসে কেবল ঝোলে !

মস্ত লোহার পুল, তলায় নদী
জেলে ডিঙি, ভড় আর জাহাজ চলে—
মাস্তুলে রকমারি পালের মেলা,
মাঝে মাঝে ভাসে বয়া অগাধ জলে !
হুস্ হুস্ চলে গাড়ী ওপর দিয়ে
আবার সবুজ মাঠ—সোণালি মাটি,
চলেছে গাঁয়ের পথে গোরুর গাড়ী
বোঝাই রয়েছে তাতে ধানের আঁটি।

রেলগাড়ী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে গামছা দিয়ে
লাইনের ঠিক নীচে চিংড়ি ধরে—
হুড়োহুড়ি করে তারা খালের জলে
দল বেঁধে হেসে হেসে লাফিয়ে পড়ে।
হঠাৎ গাড়ী না দেখে দু' হাত তুলে
চোখ বুঁজে জিভ কেটে ভঙ্গী করে—
কেউ বা গাড়ীর সাথে লাইন বয়ে
শোঁ শোঁ চোঁ চোঁ দৌড় দিয়ে পাল্লা ধরে !

একটি কাদের বউ ঘোমটা টেনে
হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দেখছে গাড়ী
পুকুরের ওপরেই কাঁঠাল তলায়
ঐ যে ওটাই বুঝি ওদের বাড়ী ?
উঠোনে ধানের গোলা তুলসী তলা,
মাচায় ঝুলছে লাউ—অনেকগুলি,
চূণ মাখা কেলে হাঁড়ি ঝুলছে দুটি—
ছেলে-মেয়ে খেলা করে দু'হাত তুলি

হঠাৎ থামলো গাড়ী—সন্ধ্যা হ'ল
এটা কোন্ ষ্টেশন—জ্বলছে বাতি
কত লোক ওঠা নামা করছে নিয়ে
রকমারি মোট-ঘাট বাক্স ছাতি !
ঐরে একটি বুড়ো নামতে গিয়ে,
হাঁটুতে কাপড় বেধে আছাড় খেলো—
বেগুনে পোষাক পরা রেলের কুলি
দল বেঁধে এক সাথে দৌড়ে এলো।

রেলগাড়ী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আবার ছুটলো গাড়ী—আঁধার চিরে
আর ত বাইরে কিছু যায় না দেখা—
কেবল ঝিঁঝিরা ডাকে জোনাক্ জ্বলে
ঝোপে ঝাড়ে টিটি পাখী কাঁদছে একা !
জ্বলছে সবুজ আলো নিশান থেকে—
গোখরো সাপের মতো লাইন জ্বলে
আকাশে ছড়িয়ে ধোঁয়া পাগল হয়ে
তারি বুক বেয়ে গাড়ী কেবল চলে !

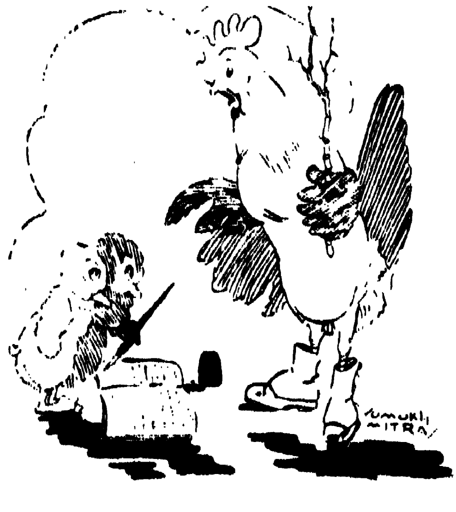
গাড়ীতে অনেক লোক পুরুষ-মেয়ে,
কেউ ঢোলে কেউ বকে কেউবা ঘুমায়,
কেউ খোস মেজাজেতে বাঙ্কে বসে,
আনমনে এলোমেলো বেহালা বাজায় !
একটি অন্ধ উঠে ভিক্ষা করে—
ছোট্ট একটি মেয়ে সঙ্গে আছে—
হকার করছে ফিরি কিসের মলম,
কেউ হাসে, কেউ বা সে নামলে বাঁচে

আমি আজ ঘুমাবো না থাকবো জেগে
আজকে আমার ছুটি পূজোর ছুটি—
একটানা রুটিনের বাঁধন কেটে,
বাইরে আমার মন পড়েছে লুটি ।
বনে জলে আকাশেতে আঁধারে ছায়ায়
ছড়িয়ে পড়েছে আজ মনটি আমার
সহরের কুনো ঘরে পড়ার চাপে
যে মন উঠতো কেঁদে রোজ দশবার ।

রেলগাড়ী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আজকে নতুন করে পেলাম খুঁজে
আমার হারানো মন জগৎ জুড়ে—
তাই ত হাওয়ার বেগে গাড়ীর সাথে
আমার স্বপন ফেরে দুনিয়া ঘুরে!
বাইরে ঝাপ্‌সা সব আঁধার ঢাকা—
কে জানে কি দেশ এটা? ঘুমের পুরী?
তেপান্তরের মাঠ হয়ত এটা—
আমি কি পক্ষীরাজে চলছি উড়ি?



ছুটির ঘণ্টা

শ্রীকামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি.এ.

ইস্‌লিঙটন্ করিন্থিয়ান্‌দের ফুটবল খেলাঃ—

কোল্‌কাতা এবার যেন শীতের জড়তাকে উপেক্ষা করতে চায়! উত্তরদিক থেকে সবে যখন ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু করেছে, এখানকার ঝিমিয়ে পড়া ফুটবল মাঠগুলো তখনই যেন চোখ রগ্‌ড়ে জেগে উঠ্‌ল! তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই এটা নোতুন খবর নয় যে এ' বছর বিলেত থেকে এক বাছাই-করা খেলোয়াড়দের নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছে এক্‌টি ফুটবল টীম—Islington Corinthians তাদের নাম। বিলেতের এ্যামেচার খেলোয়াড়দের নিয়েই এই দলটি গঠিত। ভারতবর্ষে প্রকৃত বিলিতি ফুট্‌বল খেলোয়াড়দের এই প্রথম পদার্পণ—তাই এখানকার ফুট্‌বল ইতিহাসে এটা' যে একটা স্মরণীয় ঘটনা হ'য়ে থাক্‌বে তা'তে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষে আসার পথে এরা হলাণ্ড, সুইট্‌জারল্যাণ্ড, আর ইজিপ্টে ম্যাচ খেলেছে এবং এখানে সুদীর্ঘ তালিকা অনুসারে সমস্ত খেলা শেষ হ'বার পর এরা পনের দিন হং-কংএ, মনীল্লায় উনত্রিশ দিন থেকে ইণ্ডো-চায়না এবং জাভার সঙ্গে খেলে বরমায় এক সপ্তাহ, ক্যালিফরনিয়ায় পনের দিন থাকার পর এবং ঐ সমস্ত জায়গার নানান্ টীমের সঙ্গে ম্যাচ্ খেলার পর এরা আবার ইংলণ্ডে ফিরে' যা'বে। এর আগে অবশ্য চাইনিজ অলিম্পিক ফুট্‌বল টীম এবং আফ্‌গানিস্থান থেকে আর একটি ফুট্‌বল টীম এখানে এসে'ছিল। যদিও পূর্ব্বোক্ত টীমটি এখানে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে'ছিল তবু সে সমস্ত ম্যাচ "অফিশিয়্যাল্" নয়। এই দলের (Islington Corinthians) ভেতর ছ'জন খেলোয়াড় এ্যামেচার ইণ্টারন্যাশানাল্-এ খেলেছিল এবং ফুট্‌বল এসোসিয়েশান্ অফ্ ইংলণ্ডের' মতে এই দল যথেষ্ট শক্তিশালী হ'য়েছে এবং ইংলণ্ডের এ্যামেচার টীমকে এরা সব দিক দিয়েই represent করেছে।

নীচে এই টীমের খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের নাম ও তা'দের পরিচয় ছোট্ট করে' লিখ্‌লুম।

(১) পি, বি, ক্লার্ক—ক্যাপ্‌টেন। ইনি বিখ্যাত স্কচ ক্যাপ্‌টেন। ফুল ব্যাকে খেলেন। ইনি Leyton Club-এরও ক্যাপ্‌টেন ছিলেন এবং এঁর অধিনায়কত্বে অনেক বিখ্যাত খেলা হ'য়েছে।

(২) ডাব্‌লিউ, হুইট্টাকার—খুব সুন্দর সেণ্টার হাফ্‌। বয়েস ২৬ বছর।

(৩) টেড্‌ উইঙ্গফিল্ড—অভিজ্ঞ গোলকিপার! বয়েস ২৭ বছর, ৫ ফিট্‌ ১১ ইঞ্চি লম্বা। ১৯৩৬ এ ইণ্টার-ন্যাশ্যানালের ট্রায়ালে খেলেছিলেন।

(৪) মিঃ লঙ্গম্যান্‌—ইনিও গোলকিপার। মোটে বাইশ বছর বয়েস। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এঁর সাম্‌নে।

(৫) এ, ডি, বুকানন্‌—লেফ্‌ট ব্যাক্‌ এ প্রফেশ্যান্যাল টিম্‌ chelsea খেলে'ছেন।

(৬) এ, জে, মার্টিন—রাইট হাফ্‌। বয়েস ২৮ বছর।

(৭) জে, কে, রাইট—সেফিল্ড, হ্যালাম্‌শায়ার ও সারের হ'য়ে বহুবার খেলেছেন। বয়েস ২৭ বছর।

(৮) জি, ডাব্‌লিউ, ডান্স—রাইট কিংবা সেণ্টার হাফ। ১৯৩৩ এ Wolversha-mptonএ ইণ্টারন্যাসান্যাল ট্রায়ালে খেলে'ছেন। বয়েস ১৯ বছর।

(৯) জে সি, ব্রেথ্‌ওয়েট্‌—রাইট্‌-আউট্‌। বয়েস ২৫ বছর।

(১০) এল্‌, ব্রড্‌বেরি—ফরওয়ার্ড-এ খেলেন। ১৯৩৬ এ England vrs. Irelandএর হ'য়ে খেলেছেন। বয়েস ২৩ বছর।

(১) আর, পি, ট্যারাণ্ট্‌—আইরিশ ইণ্টারন্যাশান্যাল সেণ্টার ফরওয়ার্ড। এর ক্ষিপ্রতা আর চাতুর্য্যের জন্যে খবরের কাগজে এঁকে ধ্যান চাঁদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল—যদিও খেলা দেখে মনে হয় এটা অত্যুক্তি! বয়েস ২৮ বছর।

(১২) জি, ডাব্‌লিউ, ই, পিয়ারস্‌—লেফ্‌ট আউট। বয়েস ২৫ বছর।

(১৩) এল্‌, জি, ষ্টোন্‌—বেপরোয়া ফরওয়ার্ড। বয়েস ২৫ বছর।

(১৪) জে, ডাব্‌লিউ, মিলার—লেফ্‌ট আউট। সুচতুর, ক্ষিপ্র ও অত্যন্ত সুযোগ সন্ধানী।

(১৫) এইচ্‌, সি, রেড—রাইট আউট। বয়েস ২৫ বছর।

(১৬) এ, এভেরি—অভিজ্ঞ ফরওয়ার্ড। ভালো ক্রীকেট খেলোয়াড়! বয়েস ২২ বছর

(১৭) ডাব্‌লিউ, মিলার।

(১৮) আর, শেরুড্

(১৯) আর, ম্যানিঙ্।

এঁদের সঙ্গে আছেন এইচ, লো—দলের শিক্ষক।

প্রথম ম্যাচ্

এঁরা প্রথম ম্যাচ্ খেলেন মহামেডান্ স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে। প্রায় চল্লিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। কিন্তু রেসাল্ট হ'ল, গোল হীন ড্র! ঐ দিন সকালেই (১৩-১১-৩৭) এই টীম বোম্বাই থেকে আসে এবং উপযুক্ত বিশ্রাম না নিয়েই তারা বিকেলে এম্, স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলে। অনেক গোলের সুযোগ দু' দলই নষ্ট করে'ছে এবং আগন্তুকরাই নষ্ট করেছে বেশী। তবে সেই দিনকার খেলায় এঁদের ক্ষিপ্রতা এবং শেষ পর্য্যন্ত লেগে থাকার চেষ্টা সবাইকে মুগ্ধ করে। সত্যি কথা বলতে কি এম্, স্পোর্টিং যে ড্র করেছিল সেটা তা'দের সৌভাগ্য বল্‌তে হ'বে—যদিও তাদের খেলা মোটেই খারাপ হয় নি। কিন্তু প্রথম দিনের এদের খেলা দেখে অনেকে নিরাশ হয়েছিলেন। অনেকের, এবং আমার মতেও চাইনিজ্ টীম-এর চেয়ে ভাল খেলেছিল! করিন্থিয়ান্‌স্-এর ভেতর ক্লার্ক, লঙ্‌ম্যান, মিলার ইত্যাদি ভালো খেলেছিলেন এবং এম্, স্পোর্টিংদের ভেতর সামাদ, জুম্মা খাঁ ও ওস্‌মানের খেলা বিদেশীদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিল।

দ্বিতীয় ম্যাচ

১৪ই নভেম্বার জাম্‌সেদপুরে, এ, এম্, হেম্যানের বিখ্যাত "অল্ ব্লুস্" টীমের সঙ্গে হয় এঁদের দ্বিতীয় খেলা। এঁরা ৫—২ গোলে জেতেন। ঐ দিন ট্যারেমটের খেলা হয়েছিল অপূর্ব্ব। যদিও অল ব্লুস্" প্রথমে এক গোলে জিতছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা'রা হেরে' যায়, এবং অত্যন্ত খারাপ ভাবেই হারে। খেলা শেষ হবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ তিনটে গোল হয়!

তৃতীয় ম্যাচ্ঃ

তৃতীয় ম্যাচ্ হয় জনপ্রিয় বিখ্যাত মোহনবাগান দলের সঙ্গে ১৬ই নভেম্বর। এর মধ্যেই করিন্থিয়ান্স্ দল ভারতীয় মাঠ, আব্-হাওয়া ও খেলার কায়দার সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হয়ে পড়েছে। খেলা দেখ্‌তে গেলুম। জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দু'দল এলো

মাঠে। রেফারির বাঁশী বাজ্‌ল, খেলা সুরু হল। মোহনবাগান সত্যিই সেদিন অদ্ভুত সুন্দর খেলেছিল। খালি পায়ে আমাদের দেশী টীম তাদের অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা আর চাতুর্য্যের সঙ্গে খেলে' বিদেশীদের যথেষ্ট ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য কখনও মোহনবাগানকে সামান্যও সাহায্য করে না! তাই মোহনবাগানের ফরওয়ার্ডরা যখন বল নিয়ে তাদের বিপক্ষদের গোলের সামনে জটলা করছে, গোল হয় হয়, জনতা উত্তেজিত—এমন সময় কোথা থেকে ক্লার্ক এসে' একটা লম্বা স্যুট্‌এ বলকে পাঠিয়ে দেয় প্রায় অন্য প্রান্তে। আর সুযোগ সন্ধানী ট্যারাণ্ট্‌ বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রতায় বলটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে অব্যর্থ স্যুট্‌এ গোল দেয়। ভৌতিক ব্যাপারের মত এতো চট্ করে' এটা হয়ে গেল যে সবাই ভালো করে' এটা বুঝতেই পারল না। তারপর খেলা চল্‌ল পুরোদমে। মোহনবাগান দল থাম্‌ল না, বরঞ্চ উপর্য্যপরি অক্রমণ করে' বিপক্ষকে তারা বিপর্য্যস্ত করে' তুল্‌ল। চৌধুরির চমৎকার সেণ্টারে কে, ভট্‌চার্য এক নিখুঁৎ স্যুট্ করল গোলে—লঙ্গম্যান সম্পূর্ণভাবে পরাভূত। কিন্তু ভাগ্য যেন ভেঙ্‌চি কাট্‌ল; মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে বল্‌টা পোষ্টে লেগে ফিরে এলো। আরও কয়েকবার তাদের বিপক্ষ টীমকে যেন দৈব এসে রক্ষা কর্‌ল! বেণী প্রসাদ, এস, দত্ত, কে, দত্ত চৌধুরি, ইত্যাদি খুবই ভালো খেলেছিল। সন্ধ্যের মুখে খেলা-শেষের বাঁশী বাজ্‌ল। আর চিরকালকার মত এবারেও মোহনবাগান "ভালো খেলিয়াও পরাজিত" হল! করিন্থিয়ান্‌স্‌এর ক্যাপ্‌টেন সেদিন খেলা শেষ হবার পরে বলেছিলেন, "মোহনবাগানের খেলা দেখে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছি। মহামেডান্‌দের চেয়ে এরা বেশী ক্ষিপ্র আর চতুর।" কোল্‌কাতায় বিদেশীরা এই প্রথম জিৎল।

চতুর্থ ম্যাচ্‌ঃ

১৭ই হয় I. F. A. Elevenএর সঙ্গে এদের ম্যাচ। এদিনের খেলাও খুবই চমৎকার হয়েছিল। আর্ম্মষ্টং; টেলার (ক্যাপ্‌টেন), জুম্মা খাঁ, সামাদ, বাচ্চি খাঁ, এন্, ঘোষ ইত্যাদি সেদিন খুব ভালো খেলেছিল। এই দিনের খেলা হ'ল ড্র—দু'দলই এক গোল করে' দিয়েছিল। এই দিনের খেলায় রেফারি অতি জঘন্য হ'য়েছে—ডি, এন্, দে রেফারি ছিলেন। তাঁর অনেক জাজ্‌মেণ্ট ভুল হয়েছে বলে' জনসাধারণের বিশ্বাস। এবং আর একটা মজার কথা পেনাল্টি বলে' হুইস্‌ল্ বাজাবার পর বিপক্ষ দল যখন আপত্তি জানাল তখন তাঁর মত বদ্‌লে গিয়ে তিনি করিন্থিয়ান্সদেরই স্বপক্ষে ফ্রী কিক্ দেন। এই দিন I. F. A. নিঃসন্দেহে ভালো খেলেছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত জিত্‌তও যদি প্রথম পেনাল্টি কিক্ টেলার না ফস্‌কাতেন। সামাদ

এ' দিন বল নিয়ে ক'য়েকবার এমন চমৎকার খেলা দেখিয়েছিলেন 'যা' দেখে' অতীতের সামাদকে আবার মনে পড়ে। I. F. A. এর ক্যাপ্টেন টেলার-ই একমাত্র দেখলুম বিদেশীদের সঙ্গে সমানে ধাক্কা দিয়ে এবং সমভাবে খেল্‌তে পারেন। ঐ দিন আর একটা ভারী খারাপ ব্যাপার হয়েছিল—সেটা হ'চ্ছে এই আগন্তুক টীমদের রেফারীর ওপর কথা বলা; এ'তে তাঁদের স্পোর্টস্‌ম্যান স্পিরিট্‌ যথেষ্ট ক্ষুন্ন হ'য়েছে। যাইহোক পরে তাঁরা তাঁদের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন এবং আশাকরি ভবিষ্যতেও ওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা আর ঘট্‌বে না।

শনিবার ২০-১১-৩৭ তারিখে An Indian Elevanএর সঙ্গে এঁদের আর একটা খেলা হ'বে।

মোটকথা ইস্‌লিঙ্‌টন করিন্থিয়ান্‌স্‌দের খেলা দেখে আম্‌রা যথেষ্ট পরিমাণে সন্তুষ্ট হ'তে পারি নি। এর চেয়ে অনেক ভালো খেলা আম্‌রা আশা করে'ছিলুম। তবে এঁদের ক্ষিপ্রতা এবং বলের পেছনে লেগে থাকার ক্ষমতা আমাদের মুগ্ধ করে'ছে।

লর্ড টেনিসনের ক্রীকেট্‌ দল এখানে এসেছেন এবং ক'য়েকটা খেলাও হ'য়েছে। আগামী বড় দিনের পর কোল্‌কাতায় তাঁরা খেল্‌বেন। তা' ছাড়া ভালো টেনিস্‌ খেলোয়াড়েরাও এবারে এখানে আস্‌ছেন—যেমন, কোসে, টিল্‌ডেন, ইত্যাদি। ভালো সাঁতারু, কুস্তিগিরেরাও আস্‌ছেন ও এসেছেন। পরের সংখ্যায় এঁদের বিষয়ে লিখ্‌ব।

এই সব কারণেই তো বল্‌ছিলুম যে কোল্‌কাতা এবার যেন শীতের জড়তাকে উপেক্ষা কর্‌তে চায়। এমন অদ্ভুত সমাবেশ এর আগে কখনও হয় নি, ভবিষ্যতে আবার কবে হ'বে কে জানে!—অর্দ্ধোদয় যোগের সঙ্গে এই খেলাধ্‌লো-যোগের এই বিষয়ে যেন এক্‌টা সুন্দর সামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে!—নয় কি?



চলন্তিকা

নোবেল প্রাইজের কথা তোমরা অনেকেই জান। পৃথিরীর মধ্যে এত বড় দামী প্রাইজ খুব কমই আছে। এর মোট মূল্য ৯ লক্ষ ডলার। কয়েকটি নির্ব্বাচিত বিষয়ে এ প্রাইজটি দেওয়া হয় প্রতি বৎসর। প্রতি বিষয়ে প্রাইজটির মূল্য ৮০০০ পাউণ্ড। তোমরা জানো শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথঠাকুর ও শ্রীযুক্ত সি ভি রমণ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ফ্রান্সের শক্তিশালী লেখক রোজার দু'গাদ। ফিজিক্সএ প্রাইজটি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে লণ্ডনের প্রফেসর টম্পসন ও নিউ ইয়র্ক এর ডঃ ডেভিডসনকে। কেমিষ্ট্রীতেও প্রাইজটি ভাগ করে দেওয়া হয়েচে দুজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে—তাঁদের একজনের নাম প্রঃ নর্ম্মান হাওয়ার্থ (ইংলণ্ড) ও আর একজন প্রঃ পল্ কারের্ (জুরিক)। এ্যালফ্রেড্ নোবেল যিনি ডিনামাইটের আবিষ্কারক ও এই প্রাইজের স্থাপয়িতা ষ্টকহোল্ম এ ১৮৩৩ শালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতাও একজন আবিষ্কারক ছিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যখন এ্যালফ্রেড নোবেল তাঁর ডিনামাইটের কথা পৃথিবীতে জানান তখন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক কাজে ডিনামাইটের উপকারীতা সম্বন্ধে তিনি জন সাধারণকে জানান এবং যুদ্ধে এর ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন কিন্তু সমস্ত জগত তার কোন অনুরোধ রাখেনি, গত মহাযুদ্ধে বোধ করি ডিনামাইটের দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি করা হয়েচে। কিন্তু যাই হোক খনির কাজে, পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করায়, অগ্নি নির্ব্বাপনে ও নানা কাজে ডিনামাইটের উপকারিতার তুলনা নেই। আর এ্যালফ্রেড নোবেল এই যে পুণ্য কাজে মহাদান করে গিয়েছেন এরই বা তুলনা কোথায়?

খেলাধুলার খবর তোমরা সব 'ছুটির ঘণ্টা'তে পাবে। ইস্‌লিংটন্ করীনথিয়ানসদের নিয়ে কলকাতায় এখন খুব হৈ চৈ। সকলের মুখে ঐ এক কথা—কে কিরকম খেলচে, খেলার খবর কী আর প্রত্যেক খেলোয়াড়কে নিয়ে নানা জল্পনা আলোচনা। কলকাতার খেলা শেষ

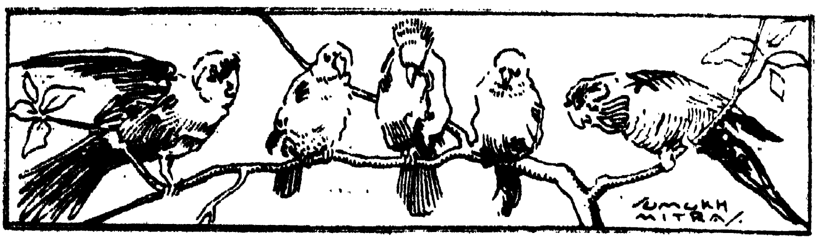
করে তারা বাংলা ও বেহারের কয়েকটি জায়গায় খেলবে। কাজেই হৈ চৈ এখন বেশ কিছুদিন থাকবে। তারপর শীঘ্রই কলকাতায় লাগবে সাঁতারের প্রদর্শনী মেলা—তারও মহলা চলচে। আমেরিকার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে সাঁতারু (diver) মিস্ ম্যানসফিল্ড কলকাতায় তাঁর অদ্ভুত সাঁতার কৌশল দেখাবেন আর তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু ডেস্‌জার্ডিনস্, এঁর পরিচয় বাহুল্য। কলকাতায় তের বছরের একটি ছেলে শ্রীমানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ওরফে মন্টু) সাঁতারে এবার খুব নাম করেচে। বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েসনে স্কুল ইভেণ্টে একশ' গজ ফ্রি ষ্টাইলে সে প্রথম হয়েচে। এ ছাড়া ন্যাশনাল সুইমিং ও কলেজ স্কোয়ার সুইমিং এসোসিয়েসনস এ ছোটদের ইভেণ্টে চ্যাম্পীয়ন হয়েচে। ছোটবড় যে কোন সুইমিং-এ সে যেখানেই না নেমেচে সেখানেই তাকে প্রথম হতে দেখা গিয়েচে। সাঁতার শেষ হতে না হতে তারপর ক্রীকেট এর ধূম পড়চে লর্ড টেনিসনের দল বড়দিনে কলকাতা আসচেন। তারপর আবার টেনিস,—নানা বিদেশী টেনিস চ্যাম্পীয়ন দলের খেলা কলকাতায় সাউথ ক্লাবে হবে সুরু। তার মানে কলকাতায় এখন ধূমধাম চলল। আমরা কেবল ভাবচি স্কুল ও কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা গুলো জানুয়ারী মাসে করলে কেমন হয় !

বীর নির্ভীক এতটুকু ছোট একটি সাপুড়ে ছেলের এক কাণ্ড শোন। ছেলেটির নাম গেজা সেগেডী—বয়স তার মোটে ৪ বছর, বুদাপেষ্টে তার বাড়ী। কিন্তু শোন তার কাণ্ড। সাপুড়েরা সাধারণতঃ বুড়ো হয় কারণ সাপ ধরা বা খেলানয় অনেক অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, অনেক রকম গাছপালা শিকড়ের সন্ধান জানা চাই কারণ সাপ ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণী, পৃথিবীতে এদের জোড়া নেই, তাই তাদের সব দিকে বশ করে রাখা চাই। কিন্তু চার বছরের গেজার সে সব কোন অস্ত্র নেই, সে সত্যি সাপুড়েই নয়।—তার কোন অভিজ্ঞতা নেই কোন গাছপালার নাম সে জানে না, বাঁশী বাজিয়ে হিপনোটাইজ করা কাকে বলে তার খবর সে রাখে না। তার সব চেয়ে বড় অস্ত্র হচ্চে তার সরল বন্ধুত্ব ও ভালবাসা। এই ভালবাসা দিয়ে সে জয় করেচে এক প্রকাণ্ড ১০৪ বছরের বুড়ো অজগর সাপকে। এই বুড়ো অজগরের ডাক নাম হচ্চে বুবু। গেজা বুবুকে নিত্য দুধ খাওয়ায় নিজের হাতে, নিজের হাঁতে তাকে নাওয়ায় আদর যত্ন করে। আর সব সময়ে তারা পরস্পর খেলা করে। গেজার বাবা নিজে শিকারী হলেও বুবু ও গেজার কাণ্ড দেখে অবাক হ'ন, ভয়ও হয়। কিন্তু গেজার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তাই তার বাবা বলেন গেজার যখন ভয় নেই তখন আমারও ভাবনা নেই। অজগর বুবু বুড়ো, তার

অন্তরঙ্গ বন্ধু—সে কখনই গেজার কোন ক্ষতি করবে না। গেজা বুবুর পাশে বসে পনের দিন অন্তর অন্তর একদিনে এক একটি করে বারোটি খরগোস খাওয়ায়, তারপর খাওয়া দাওয়ার পর বুবু তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, যারা এ সব কাণ্ড দেখেচে তাদের মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠেচে!

*　　*　　*　　*

শীত আসচে! শীত এসেচে। শীত কৈ?—এ তিন রকম খবর রোজই আমরা শুনতে পাই। ব্যাপার কী? শীতকাল তো নিশ্চয় এসেচে কিন্তু শীত তার সঙ্গে এসেচে কিনা সেটাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। দার্জ্জিলিংএ শীত এসে গিয়েচে তার সন্দেহ নেই, মুসৌরীতেও এসেচে আমরা জানি, ভারতবর্ষে অনেক দেশেই অনেকে শীতে এখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে এ খবরও আসচে। কিন্তু বাংলাদেশ—কলকাতার ব্যাপারটা কী? বাংলা দেশে শীতের কিছু ঠিক নেই, সে কি নিজের খেয়ালে আসে, খেয়ালটা কোত্থেকে পায়? মধ্যে দু'একদিন বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, তারপর কিছুদিন দুপুরে বেরোয় কার সাধ্যি—গ্রীষ্মের দুপুর বললেও চলে সরবত ও আইস ক্রীম বেশ বিক্রী হয়ে গেল। আবার আজ সকাল থেকে বেশ মেঘলা করেচে; বুড়োরা বালাপোষ গায়ে দিয়ে বেরিয়েচে। দু'এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ল তবে কি আবার বর্ষা? না, এই দু'এক ফোটা জল ও আকাশের মেঘগুলোর পেছনে শীত বুড়ী ঠক্ ঠক্ করে এগুচ্চে? আমরা যতদূর জানি আমাদের দক্ষিণে যে সমুদ্রটি আছেন ও আমাদের উত্তরে যে পাহাড় চুড়োটি রয়েচেন শীত বুড়ীকে এঁরাই মন্ত্রণা করে হটিয়ে রাখচেন। আর এই যে খাম-খেয়ালী আবহাওয়া, এতেও তাঁদের হাত আছে!





রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন—

ছুটির দিন ফুরিয়েছে, আবার পড়া আর কাজ, আর সামনের পরীক্ষার জন্যে তৈরী হওয়া। কিন্তু ছুটির দিন কি আর সত্যি ফুরোয় কাজের দিন এলে! কাজ যদি না থাকে তাহলে'ত ছুটির কোন মানেই হয় না। সত্যিকারের যে ছুটি সে থাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এমন কি কাজের ভেতরে ভেতরে। যেন ঘরের জানলায় জানলায় নীল আকাশ।

কাজে ছুটিতে যেখানে মাখামাখি নেই সেখানে কাজের কাজ কিছু হয়না এমন কথাও বলা যায়! কাজে ছুটির আনন্দই বা থাকবে না কেন। মুখস্থ বই এর পড়া যে পড়ে সে কিছুই পড়ে না, বই এর পাতায় যার মন ছুটি পায় পৃথিবীর অসীম বিশাল জ্ঞান সন্ধানের জগতে তার পড়াই সত্যকার পড়া। তার বই এর পাতা ত আর কালো হরফে ছাপা কটা কাগজ নয়, সে পাতা গিয়ে মিশেছে পৃথিবীর দিগন্তে যেখানে অরণ্যের পাতা ঝলমল করে রোদে।

তোমাদের অবশ্য বিশেষ দোষ নেই। পড়ার বই তোমাদের কাছে যে একটা শুকনো, নীরস খানিকটা ভয় সমীহ করবার জিনিষ হয়ে আছে তার জন্যে পড়া শুনার এখনকার ব্যবস্থাই দোষী। পড়ার বই আর মজার বই এর মাঝে মিছি মিছি একটা দেওয়াল তুলে আমরা তাদের আড়াআড়ির সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। কিন্তু আসলে সব পড়াই মজার পড়া হওয়া উচিত, অক্ষরের দরজা খুলে মন যাবে রহস্য লোকের এ্যাডভেঞ্চারে। ভেবে দেখো দিকি, সব পড়া শোনাই আশ্চর্য্য অভিযান নয় কি?

ইতিহাসের বই নিয়ে আমাদের মন চলেছে কালের স্রোতের উজান ঠেলে কোন সুদূর অতীতে, ভূগোলের ম্যাপ সমস্ত পৃথিবী আমাদের চোখের সামনে খুলে ধরেছে, অরণ্য পর্ব্বত আর অতল সমুদ্রের রহস্য বিস্ময় নিয়ে! ভাষা আর সাহিত্য আসছে বিপুল নদীর মত, কত ক্ষণজন্মা অসাধারণ মানুষের চিন্তা ভাবনা কল্পনার অমূল্য দান বয়ে নিয়ে। ভাবছ, অঙ্কের কথাটা সাবধানে বাদ দিয়ে চলেছি কেন! মোটেই না; গণিত, মানুষের কতবড় অপরূপ যে এ্যাডভেঞ্চার বড় হলে আরো ভালো করে বুঝবে। চোখে দেখা কানে শোনা এই সৃষ্টিকে নিয়মের বাঁধনে বেঁধে রেখেছে এই গণিত। বড় হয়ে জানবে, সৃষ্টিটা একটা মস্ত বড় জটীল অঙ্কের খেলা, সেই খেলার রহস্য আবিষ্কার করার পথেই আমরা দুইএ দুইএ চার যোগ করতে শিখি।

এইখানেই আজ থামলাম, আমাদের সব পড়া ছুটির পড়া হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা নিয়ে।—

—তোমাদের সম্পাদক মশাই



টিকিট ঘর

[পোষ্ট বয়]

Philatelyতে যারা নতুন, তা'রা এই ক'টি কথা মনে রাখতে পারো ঃ

যে কাগজ থেকে টিকিট তুলে নেবে সেই কাগজ খানা একটা ভেজা ব্লটিং কাগজের ওপর রেখে খানিক পরে টানলেই টিকিটখানা আপনি উঠে আসবে।

এ্যালবামে ছাড়া টিকিট রাখবে না আর একরকম 'হিঞ্জ' পাওয়া যায়, সেই হিঞ্জ দিয়ে টিকিট এ্যালবামে লাগিয়ে নেবে। আর একটা কথা, কখনো বাজে টিকিট জমিয়ে এ্যালবাম ভর্ত্তি করতে যেও না যেন ; এ্যালবামে কম টিকিট থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু সবগুলোই যেন তার দরকারী হয়।

ভারতবর্ষে এ বছরের শেষে যে সমস্ত নতুন অভিনব ডাকটিকিট প্রকাশিত হবে তাদের সম্বন্ধে কিছু শুনে নাও। আমাদের দেশে প্রথম ডাকবহন কেমনভাবে হোত—তারপর ক্রমশঃ উন্নতির পথে কেমন ভাবে এগিয়ে বর্ত্তমান দ্রুতগামী ডাকবাহনে পরিণত হোল তার একটি সুন্দর সচিত্র ইতিহাস এই নতুন ডাকটিকিটগুলি দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

রক্তবর্ণ তুআনার ষ্ট্যাম্পে দেখতে পাবে বাঁদিকে একটি লোক মেঠো রাস্তা দিয়ে যেন ব্যস্ত ভাবে চলেছে—তার কাঁধে ডাকের ঝোলা—ডান হাতে তার বর্শা। প্রাচীন কালে এইরূপ মেল রাণার ডাক বিলি করতো। এর ইতিহাসটা মজার—বৃটিশ ভারতবর্ষেও প্রথমে মেল রাণার পায়ে হেঁটে বরাবর এক ডাকঘর থেকে আর এক ডাকঘর যেতো। এখনও ভারতের কোন কোন সুদূর অঞ্চলে যেখানে কোন রকম যানবাহন নেই, এই মেল রাণাররাই ডাক সরবরাহ করে। ডাকবাহনের দল প্রত্যেক দিন বার-চোদ্দ মাইল যাতায়াতে টহল দিয়ে থাকে। ধরো যদি তুটো ডাকঘর পরস্পর পঞ্চাশ মাইল তফাতে থাকে—আট বা দশজন ডাকবাহী এই দূরত্ব ভাগাভাগি করে রীলে দিয়ে ডাক সরবরাহ করে।

পূর্ব্বে এদের হাতে ঘণ্টা থাকত—যাতে দূর থেকে ঘণ্টার টুং টুং শব্দ শুনে পরবর্ত্তী ডাকবাহক তখনই তৈরী হতে পারে—যাতে কোন রকমে একটুও সময় নষ্ট না হয়। আজকাল আর ঘণ্টা থাকে না—একটা মোটামুটি সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অনেকের মতে ঘণ্টা ব্যবহৃত হোত বাঘ ভাল্লুক তাড়াবার জন্য কারণ ঘন বনজঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত ডিঙ্গিয়ে অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে এদের যাতায়াত করতে হোত। কিন্তু দেখা গিয়েছে হিতে বিপরীত হয়েছে—এই ঘণ্টাই অনেক বিপদের মূলস্বরূপ ছিল। একটি ঘটনা শোন—এক জঙ্গলের রাস্তায় কোন হতভাগ্য ডাকবাহকের ঝোলা তিন ঘণ্টা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। আর কোন কারুর চিহ্নই নেই। পরে পরীক্ষার জন্য ঐ জায়গাটিতে ঘণ্টাধ্বনি করা হোল—করবামাত্র বন থেকে বেরিয়ে এলো এক প্রকাণ্ড চিতাবাঘ—তখনই তাকে গুলি করা হোল। তাহলে এই ঘণ্টা শুনেই চিতাবাঘ বেরিয়ে এসে-ঐ হতভাগ্য ডাকবাহককে আক্রমণ করেছিল।

দশপয়সার টিকিটে দেখতে পাবে—গ্রাম্যপথ দিয়ে এক ছাউনি-দেয়া ডাক-গরুর গাড়ী চলেছে। ভাবলে হাসি পায়—না? কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই ধরণের ডাকবাহনই ছিল শ্রেষ্ঠ বাহন। এই মাত্র কয়েক বছর আগেও কোন প্রদেশে ডাকবাহনের জন্য এরূপ গরুর গাড়ীর প্রচলন ছিল। এখন মাত্র কয়েকটি জায়গায় এদের ডাক বইবার জন্য রাখা হয়েছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে দিল্লী কেমনভাবে ডাক যেতো জান? কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ডাক যেতো জলপথে ষ্টীমারে। তারপর এলাহাবাদে ডাক চাপান হোত ঐ রকম গরুর গাড়ীতে—এলাহাবাদ থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীতেই দিবারাত্রি ডাক চলতো। অবশ্য একটি গরুর গাড়ীই সব রাস্তা ডাক বহন করতো না। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ডাক-গরুর গাড়ী প্রস্তুত থাকতো। রেল ট্রেন হবার পর এদের প্রচলন একরকম উঠে গিয়েছে। এই ষ্ট্যাম্পটি সুন্দর ভায়োলেট রংএ চিত্রিত করা হয়েছে।

তিন আনার ষ্ট্যাম্পগুলি ফিকে সবুজ রং করা হয়েছে—ঘন সবুজ রং করলে বোধহয় আরো সুন্দর হোত। এতে দেখবে একজুড়ী ঘোড়াওয়ালা ডাক টাঙ্গা ছুটে চলেছে। তোমরা অনেকেই হয়ত টাঙ্গাতে চড়েছ—কিন্তু জানতে কি এই টাঙ্গা এক সময়ে ডাক সরবরাহ করতো। যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত কাল্কা-শিমলা রাস্তায় এইরূপ জুড়ী টাঙ্গার প্রচলন ছিল—কি ঝড়ে কি বৃষ্টিতে এই ঘোড়াগুলি ডাক নিয়ে ছুটতো। এখনও ভারতের কয়েকটি প্রদেশে এরা ডাকের কাজ করে।

সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিটগুলি—বড় মজার। ষষ্ঠ জর্জ্জের ছবি না থাকলে মনে হোত আরব দেশের ষ্ট্যাম্প বুঝি। ছবিতে দেখছ মরুভূমির উপর দিয়ে আমাদের পরিচিত উট

চলেছে সগৌরবে লম্বা গর্দ্দান উঁচিয়ে। এই ষ্ট্যাম্পটি করা হয়েছে নীল। কিন্তু উটের গায়ের রংএর মত মেটে করলে ষ্ট্যাম্পটি আরো জীবন্ত মনে হোত। এখনও বেলুচীস্থান, সিন্ধুদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতি মরুময় প্রদেশে ডাকবাহী উটের প্রচলন দেখা যায়। তোমরা জানো এরা Ships of the Desert, অনায়াসে নির্জ্জলা মরুভূমির ওপর এরা ডাক নিয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে ডাক সরবরাহ করে। ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে নিয়মিতভাবে প্রথম উটবাহী ডাকের সূত্রপাত হয়েছিল।

চার আনার ষ্ট্যাম্পে আমরা বর্ত্তমান যন্ত্রযুগের চিহ্ন দেখতে পাই—দেখতে পাই পূর্ণ-বেগে লৌহ মেল ট্রেন ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলেছে। এর রংটি করা হয়েছে ফিকে বাদামী। তোমরা অনেকে জান ভারতবর্ষে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম মেল ট্রেনের সূচনা হয়। এই ষ্ট্যাম্পটিতে ই-আই-আর-এর ইম্পিরীয়েল মেল ট্রেনটিকে দেখান হয়েছে।

ছয় আনার ষ্ট্যাম্পটি সবুজে নীল রংএর—সমুদ্রের ওপর পি এণ্ড ও কোম্পানীর একটি আধুনিক সুবৃহৎ জাহাজ দেখান হয়েছে। সুয়েজ খাল হবার আগে ভারতবর্ষ থেকে লণ্ডনে ডাক পৌঁছতে প্রায় ছমাস লাগত। সুয়েজ খাল কাটবার পর জাহাজে আজকাল লণ্ডনে ডাক পেঁীছতে দিন পনের মাত্র লাগে।

আট আনা ষ্ট্যাম্পে তুঁতে নীল রংএর ওপর একটি মেল মটর লরী দেখান হয়েছে—লরীটির ছাতে স্তূপীকৃত ডাকের থলে দেখা যাচ্ছে। ভারতবর্ষে বহু জায়গায় ডাকবহনের জন্য লরী চলাচল করে। রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোর থেকে কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রায় দুশো মাইল লরী ডাকবহন করে। ১৯১০ সালের আগে লরীর প্রচলন ছিল না আর আজ মেল লরীর সংখ্যা কিরূপ বেড়ে গিয়েছে। পাঞ্জাবে অনেক প্রদেশে যেখানে রেল যায়নি সেখানে লরীর প্রচলন আছে। অনেক জায়গায় আবার রেলের সঙ্গে লরী ডাক নিয়ে পাল্লা দিচ্ছে।

বারো আনার ষ্ট্যাম্পগুলিতে দেখবে সব চেয়ে আধুনিক ডাকবাহনের ছবি—অর্থাৎ কিনা—এরোপ্লেনের। ঘন মেরুন রংএ চিত্রিত একটি অভিনব এরোপ্লেন নীচেকার পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে মনোরম ভঙ্গীতে উড়ে যাচ্ছে। পরের বছর কলকাতা থেকে লণ্ডন যে নূতন এরোপ্লেন ডাক নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত হয়েছে তারই একটি মডেল Armstrong-Whiteworth 'Ensign' এই ছবিতে আঁকা হয়েছে। ভারতবর্ষে ১৯২৯ সালে প্রথম ডাকবাহী এরোপ্লেনের সূচনা হয়। তোমরা জানো আজকাল তিনদিনের মধ্যে এরোপ্লেনে করাচী থেকে লণ্ডন ডাক পেঁীছে দেওয়া হয়।

তাহলে দেখতে পাবে কেমন সুন্দর পরিপাটি করে ভারতবর্ষে ডাকবহনের একটি সুন্দর ছোট ইতিহাস এই ষ্ট্যাম্পগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। এক আনা টিকিটের কথা বলতে ভুলে গিয়েছি—এ টিকিটের রংটিও লাল—মধ্যে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের ছবির তিন পাশে ঘিরে ভারতীয় কারুকার্য্যময় আঁকা একটি তোরণ আর ওপরের দু কোণে সুন্দর পদ্ম ও পদ্মপাতা চিত্রিত। এক পয়সা ও দু পয়সার টিকিটগুলির রাজার মুর্ত্তি ছাড়া আর কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়নি। রংটা বদলালে একটু নূতনত্ব হোত। এক টাকার টিকিটে রাজার মূর্ত্তি ও রং ছাড়া আর কিছু বদলান হয়নি। দুটাকা থেকে পঁচিশ টাকার ষ্ট্যাম্পগুলিও অপরিবর্ত্তিত রাখা হয়েছে—কেবল তাদের রং আরো উজ্জ্বল ও সুন্দর করা হয়েছে। আজ এই পর্য্যন্ত।*

---

* তোমরা যারা ডাকটিকিট সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাও বা যারা অদ্ভুত ডাকটিকিট জমাতে বা এক্সচেঞ্জ করতে চাও তারা এই টিকিট বিভাগে লিখবে। সম্পাদক





শ্রীইন্দিরা দেবী

আদরের ছোট্ট বোনেরা—

পূজার ছুটীতে কে কোথায় গিয়েছিলে? খুব সুন্দর ভাবে তোমাদের দিনগুলো কেটেছে এ কথা আমি জানি—বিস্তারিত আমায় জানিও। পূজার ঠিক পরেই তোমাদের সঙ্গে লেখার সাহায্যে আমার কথা বলার সুযোগ আসেনি। বিজয়া অনেক দিন চলে গেছে তবুও আমার আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা, স্নেহ-ভালবাসা তোমাদের জানাচ্ছি। ফুলের মত শুভ্র হও এবং নিজেকে বিকাশ করো এই রইল আমার আশীর্ব্বাদ তোমাদের সকলের উপর।

আজকে তোমাদের কাছে একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো—যেটা সংসার-ধর্ম্ম পালন করতে গেলে, সমাজে বাস করতে গেলে—দেশের ও দশের কাজে লাগতে গেলে আবশ্যক। আমি বলছি স্বাস্থ্যের কথা—সাধারণ সুস্থতার কথা। আমাদের শত শত অসুবিধা থাকলেও আমাদের যদি ইচ্ছা ও অনুরাগ থাকে ভালভাবে থাকবার জন্য—সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার জন্য—তা'হলে আমাদের মনে হয় সংসার ও সমাজের কোন অভাব আমাদের এই সদ্ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে না। কোন কাজ করতে গেলে শক্তির প্রয়োজন হয় তাতো তোমরা জানো। আমাদের দেহ হ'লো শক্তির আধার—প্রকৃতি আমাদের যে সব শক্তিগুলো অর্পণ করে আসছেন। দেহকে সচল রাখতে গেলে, নিরোগ রাখতে গেলে যত্ন থাকা দরকার নিজের দেহের ওপর। আমি যদি বলি, তোমরা ভালভাবে থাকতে চাইলে বাঁচতে চাইলেও তোমরা ভালভাবে থাকতে পারো না, কারণ, শরীর তোমাদের সময় অসময়ে খারাপ হয়ে পড়ে। একটা কথা তোমাদের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় 'শরীর খারাপ—শরীর খারাপ, কিছু খাবো না'! এ শরীর

খারাপ হওয়ার মূলে যদি কারুর দোষ থাকে—সে দোষ হ'ল তোমাদের আগে! কারণ নিজের শরীরের সুস্থতার দিকে তোমরা মোটেই গ্রাহ্য করো না—কেমন একটা ঔদাসিন্য—সব বিষয়ে যেন হচ্ছে-হবে এমনি ভাব। এখন তোমরা বড় হচ্ছ—ভবিষ্যতে তোমাদের দায়িত্বের কথা ভেবে দেখবার মত তোমাদের সময় আসেনি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের জীবনের দায়িত্ব কত দিক দিয়ে বৃদ্ধি পাবে তার কিছু ঠিকানা নেই। ভবিষ্যতের সে দায়িত্বের পাথেয় বর্ত্তমানে তোমাদের যোগাড় করে নিতে হবে। সে দায়িত্বটুকু বহন করবার মত দৈহিক সুস্থতা এখন থেকেই থাকা চাই—ইচ্ছা থাকা চাই।

প্রকৃতির সঙ্গে দেহের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে—প্রকৃতির নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেহের ও মনের পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে এ কথা তো জানো। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী বসবাস করলে আমাদের শরীর কিছুতেই অসুস্থ হতে পারে না এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা। আলো, বাতাস, জল আমাদের শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য—তোমরা তো জানো গাছ কেমন করে বাঁচে—বাতাস থেকে কেমন করে আহার সংগ্রহ করে নেয়—সূর্য্যের আলো থেকে শক্তি আহরণ করে—মাটীর গভীর তলদেশে আপনার শিকড় বিস্তার করে বহু বহু দূর থেকে জল আহরণ করে—তার শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে দিয়ে সজীব আনন্দে বেঁচে থাকে। আমাদেরও ঠিক এমনি করে বাঁচতে হবে।

প্রথম ধরো জলের কথা—এর ওপর আমাদের অনেকখানি নির্ভর করে থাকতে হয় জীবনধারণ করবার জন্য! আমরা জলপান করে থাকি কিন্তু জলপান করা ছাড়াও জল আমাদের রোজকার জীবনের ভিতর বহুবিধ কাজে আসে। কিন্তু দেখো—জলের সুব্যবহার আমরা করি না বলেই শরীরের নানাবিধ ক্ষতি এই দিক থেকে আসে। তোমরা সহরে বাস করো, কেউ কেউ গ্রামেও থাকো—সর্ব্বত্রই জল আমরা প্রচুর পেয়ে থাকি! জলের কষ্ট নেই আমাদের এই সুজলা বাংলা দেশে। কিন্তু এমন দেশও আমাদের এই ভারতবর্ষের ভিতর আছে যেখানে জলের এত কষ্ট ও অভাব যে তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। অথচ দেখো জলের সুব্যবহার তোমরা কেউ কেউ মোটেই কর না। সকাল সাতটায় উঠে তাড়াতাড়ি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে পড়তে বসে গেলে, নটা অবধি পড়া চল্লো—তারপর যাহোক করে স্নান সেরে (স্নান তাকে ঠিক বলা চলে না কাকের মত স্নান হ'লে) কিছু খেয়ে তৈরী হয়ে রইলে স্কুলের বাসের জন্য। এমনি করে দিন তোমাদের গড়িয়ে যায়। শরীরে নানাবিধ ব্যাধি এসে পড়ে।

স্নান আমাদের দেহকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে—বাতাসের ভিতর যে সব ধূলিকণা আছে আমাদের দেহে সেগুলো আশ্রয় নিয়ে থাকে—তাছাড়া নানা কাজকর্ম্মের ভিতর অপরিচ্ছন্নতা আমাদের দেহকে আশ্রয় করে এবং আমাদের শরীরের ওপর যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমকূপ আছে সেগুলো ময়লা পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। তোমরা হয়তো জানো আমাদের শরীরের এ লোমকূপের কাজ কি? শরীরের ভিতর ময়লা বা দূষিত জিনিস ঘামের আকারে বের হয় কিন্তু লোমকূপ বন্ধ থাকার দরুণ এটুকু হতে পারে না—ফলে শরীরের কিছু কিছু ক্ষতি ঘটে। আমরা মানুষ, আমরা আমাদের ভাল-মন্দ বুঝি, বুঝতে শিখি, জানতে পারি! কিন্তু দেখো পশু পাখীদের ভিতরও এমন আছে যারা অধিক পরিমাণে জানে কি করলে ভাল থাকবে, সুখে থাকবে, স্বচ্ছন্দে থাকবে। তোমাদের বাড়ীতে যদি পোষা কুকুর বেড়াল থাকে তাদের কাজকর্ম্মগুলো একবার লক্ষ্য করে দেখো দেখি—তা'হলে আমার কথা অন্ততঃ খানিকটা বুঝতে পারবে। তোমাদের পোষা কুকুরটার যদি শরীর খারাপ হয় সে খাবে না, স্নান করবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকে কিম্বা ঝিমোয়! কুকুর বেড়াল গা চেটে তাদের শরীর থেকে ধূলো বালি দূর করে—গরু, ঘোড়া প্রভৃতি ল্যাজের সাহায্যেও সেটুকু করে থাকে। পাখীরা ডানা ঝেড়ে ও ঠোঁটের সাহায্যে এসব করে প্রকৃতির প্রত্যেক সজীব প্রাণী নানাভাবে নানা দিক দিয়ে নিজেকে সুস্থ সবল ও সুন্দর রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে থাকে! কিন্তু আমরা? ঘড়ি ধরে পড়ে কোনও উপকার পাবে না যদি না তোমাদের দেহ ও মনকে সুস্থ ও সবল রাখতে পারো। এজন্য ডন-বৈঠক বা শারীরিক কোন কসরৎ করবার দরকার হয় না প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলাফেরা করতে হবে—একটু দৌড়-ঝাঁপ, একটু খেলা, একটু স্কিপিং প্রভৃতি করলে খুব ভাল। জলের ব্যবহার ভাল করে জানতে হবে!

সকালে উঠে বেশ ভাল করে মুখ ধোবে—চোখ ধোবে—কাণের দু'পাশ ধোবে, ভাল করে জলে ঝাপটা দিও, ঘাড়টাতে জলের একটু ছোঁয়াচ দেওয়া ভাল—তা'হলে দেখো ভাল লাগবে কেমন—শরীরে কেমন একটা স্নিগ্ধতা এসে লেখাপড়ায় একটা মনোযোগীতা এনে দেবে। তারপর স্নান করবার সময় খুব ভালভাবে গাত্র মার্জ্জনা করবে—অন্ততঃ মিনিট পাঁচেক কলের তলায় মাথাটাকে পেতে রেখো।

শরীরটা পরিষ্কার ও ভাল রাখবার চেষ্টা ক'রো—তা'হলে দেখো কত কাজ তোমরা নিঃশব্দে অবহেলায় অথচ হাসিমুখে করে যেতে পারো!

শীত বুড়ী ত এসে গেল—র‍্যাপার, পুলওভার, ফারকোট, গরমজামা প্রভৃতি গায়ে দেবার সময় এসে গেল। তোমাদের সব ঠোঁট ফাটতে সুরু করছে তো? গা হাত পা চড় চড় করতে সুরু করেছে—জল ছুঁতে ভয় করে না? বাতাসের ভিতর জলের অভাব, তার তেষ্টা পেয়েছে সে জন্য সে শুধু মানুষের দেহ থেকে নয় গাছের দেহ থেকেও জল সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছে। দেখো আমাদের যেমন শরীর খশখশ করবে, গা দিয়ে খড়ী উঠবে—গাছেরও পাতাগুলো ঝরে যাবে—এ সব দুর্গতির পিছনে আছে বাতাস, কারণ সে জল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সমস্ত প্রকৃতি থেকে। এখন বরং জলের ব্যবহারটা বেশী করে করবে। ভাল করে তেল মেখে স্নান করবে—তা'হলে অন্ততঃ খানিকটা এই বিরক্তিকর আবহাওয়া থেকে রেহাই পাবে।

তোমরা তো জানো আঙ্গুল কেটে রক্ত পড়ছে বা আঘাত লেগেছে—অনেক সময় ঠাণ্ডা জলের পটি দিলে কত উপকার হয়—জ্বরের সময় মাথায় জলপটি দেয়—জ্বর বেশী হলে মাথা ধুইয়ে দেয় জল দিয়ে—এ ভাবে রোগের ভিতরও আমরা জলের সাহায্য নানাভাবে নিই।

বর্ত্তমানে একটা চিকিৎসার প্রচলন ঘটছে সেটা হ'লো 'হাইড্রোপ্যাথী'—বাংলায় যাকে বলে 'জল-চিকিৎসা'। অর্থাৎ জলের সাহায্যে রোগের চিকিৎসা করা—এ বিষয় আরো জানবার আছে—তোমাদের ইচ্ছা হ'লে জানিও। আমি বলবো তা'হলে। আসছে বারে রান্নাবান্না সম্বন্ধে তোমাদের বলবো।





পরিচালিকা—দিদিভাই

আমার আদরের প্রিয় রংমশালের ছোট্ট ছোট্ট পাঠক, পাঠিকা, গ্রাহক, গ্রাহিকা ভাই বোনের দল —

তোমাদের সকলের জন্য এই যে বিভাগ খোলা হ'ল—তাতে তোমাদের সব ভাই বোনদের সমান অধিকার থাকবে—তা না হলে কারো রাগ কারো অভিমান কি করে সইবো বল ? এতে করে তোমাদের সকলের জন্য 'লেখনী বন্ধু' সংগ্রহ করে দেবো—তাছাড়া তোমাদের মতামত ইচ্ছাগুলো জানিয়ে তোমাদের রংমশালের আলো আরো বাড়িয়ে দাও যাতে করে সে যেন তোমাদের জীবনের রেখাপথের ওপর আলোক সম্পাত ক'রে তোমাদের জীবনকে ফলে ফুলে ভরিয়ে তুলতে পারে।

লেখার সাহায্য পেয়ে একশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একশ্রেণীর মানুষের বিভেদ দূর হয়ে গিয়ে তার পরিবর্তে জেগে উঠে বন্ধুত্ব—ভাবের আদান প্রদান করে তাদের সে বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়ে উঠে ! এ ভাবে একটা সার্বজনীন ভাব আসে মানুষের ভিতর !

'লেখনী বন্ধু' পেলে তোমাদের খুব ভাল লাগবে তো ? খুব আমোদ পাবে, না ? বোনের সঙ্গে বোনের ও ভাইএর সঙ্গে ভাইএর পরিচয় করিয়ে দেবো। যাদের দেখতে ভালো লাগে অথচ দেখতে পাও না, যাদের কথা শুনতে ভালো লাগে অথচ তাদের কথা শুনতে পাওনা, পরিচয় পাবার ও পরিচিত হবার সুযোগ তোমাদের কোনদিন ঘটে উঠে না—এই 'ডাকঘরের' সাহায্যে আবছা আলো আবছা অন্ধকারে 'লেখনীবন্ধু'র সঙ্গে তোমাদের একে অপরের সঙ্গে পরিচয়, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব খুব সুদৃঢ় হয়ে উঠে তোমাদের রংমশালকে আরো শক্তিশালী করে

তুলবে। তোমাদের সকলের হাসি হাসি মুখ দেখলে 'রংমশাল' খুব খুসী হবে জেনো। হাঁ, যা বলছিলাম—'লেখনীবন্ধু'র কথা চিঠি পত্রের ভিতর দিয়ে তোমাদের সকলের অন্তরেরও ভাবের আদান প্রদান ঘটিয়ে তোমাদের সকলকে তৃপ্ত করতে পারবে।

তোমরা যারা 'লেখনীবন্ধু' চাও—আমার কাছে তারা তাদের নাম, ঠিকানা, বয়স, কোথায় পড়ো, রংমশালের গ্রাহক-গ্রাহিকা কিনা—এ সব নিশ্চয় জানিও—তাছাড়া কি ধরনের বই পড়তে ভালো লাগে, কি কি 'হবি' (Hobby) আছে অর্থাৎ ডাক টিকিট, নানান দেশের টাকা পয়সা জমাও কিনা, লালমাছ, পাখী পোষ কিনা এও জানাতে ভুলো না—আমার খুব ভালো লাগ্‌বে আর আমি তোমাদের সকলের ভিতর পরিচয় করিয়ে দেবো কেমন?

কিন্তু আমার পুরস্কারটা?

তোমরা সবাই আমার স্নেহাশীষ ও ভালবাসা নিও। ইতি—

তোমাদের

দিদিভাই

আমাদের লাইব্রেরি

ঠাকুমার মহাভারত—শ্রীনির্ম্মলা বালা দেবী। দাম বারো আনা।

তোমাদের হঠাৎ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বসে—ভীম ও হিড়িম্বার যুদ্ধের গল্পটি বলত বাপু—অনেকেই কিন্তু বেশ মুস্কিলে পড়ে যাবে—আগে থেকে বলে রাখছি। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্যি যে আজকাল তোমাদের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প অনেকেই জানো না। আর আগে—এই কিছুদিন আগেও জিজ্ঞাসা করে ঠকায় কার সাধ্যি—প্রশ্নের শেষ না হতে হতে উত্তর এসে গেছে। এ ছাড়া বড়দের কাছে যে সব গল্প শোনা যায় আজকাল তার মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্প থাকে কই? অথচ কত সুন্দর সুন্দর গল্পই না আছে—দুঃখের, হাসির, এ্যাডভেঞ্চারের—অগুণতি। নির্ম্মলাবালা দেবী বইটি বেশ লিখেছেন যেন রোজ সন্ধ্যাবেলা ঠাকুমার কাছে বসে গল্প শুনছি আর ষোলটি সন্ধ্যায় মহাভারতখানি শেষ হয়ে যাবে। যাদের বিরাট মহাভারত দেখলে ভয় লাগে পড়বার ইচ্ছা হয় না—তাদের এ বই পড়লে ভালই লাগবে। আর গল্পগুলাও সঙ্গে সঙ্গে শেখা হয়ে যাবে। দাম বেশী নয়। ছবিগুলি ভাল হয়নি।

চীন জাপানের এ-ও-তা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কমলা বুক ডিপো, দাম বারো আনা।

বিদেশী লোক দেখলেই আমরা হা করে তাকিয়ে থাকি, বেশ নতুন নতুন লাগে। তাদের খাওয়া দাওয়া তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ কথার ভাষা ও ভঙ্গি—কত কথাই না জানতে ইচ্ছে হয়। চীনে বাজারে জুতো কিনতে গিয়ে জুতোর চেয়ে চীনেদের মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকি। আমরা যদি ওদের দেশে যাই তাহলে ওরাও নিশ্চয়ই ঐরকম করে আমাদের দিকে তাকাবে আর আমাদের খুব মজা লাগবে। কিন্তু ইচ্ছা করলেই ত আর একদৌড়ে চীন-জাপানে যাওয়া যায় না। এর আগে বিদেশীদের কথা জানতে গেলে ভাল বই ছাড়া উপায় কই? চীন-জাপানের অনেক সুন্দর সুন্দর ও দরকারী খবর শচীন্দ্রবাবু এই বইটিতে দিয়েছেন। ওদেশের ছেলেমেয়েদের কথা, তাদের খেলাধুলা নানারকম উৎসব আনন্দ আর হাজার হাজার গল্প সব এই বইটিতে আছে। সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয় জাপানীদের ভদ্রতার কথা জেনে—এত চমৎকার ব্যবহার এদের প্রতিদিনের। সে গল্পটা নিশ্চই জানো তোমরা সকলে—একজনের কুকুর আরেকজনকে গিয়ে যদি কামড়ায় সে গিয়ে গৃহস্বামীকে বলবে আপনার শ্রীযুক্ত কুকুর ম'শায় আমাকে দয়া করে কামড়েছেন। এর সঙ্গে মনে মনে একবার মিলিয়ে দেখ আমরা সাধারণত কি বলি এ অবস্থায়।

বইখানির ভাষা বেশ ভাল কিন্তু ম্যাপ দুখানা আরো স্পষ্ট ও ছোটদের উপযোগী হওয়া উচিৎ ছিল আর ছবি যা দেওয়া হয়েছে ওগুলো না দিলে কোন ক্ষতি হত না বিশেষ করে "আগ্নেয়গিরির মুখ" ছবিখানা।

মণ্টুর মাষ্টার—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। ইষ্টার্ণ ল হাউস, দাম ছয় আনা।

শিবরামবাবুর পরিচয় নূতন করে রংমশালের পাতায় দেবার কিছু নেই। ওঁর গল্পের হেডিং দেখলেই হাসি আসে, হুস্ হুস্ করে যেন সোডার বোতল খুলে দিল। এবারে "মণ্টুর মাষ্টার" দেখে মনে একটু ভয় হয়েছিল; আবার মাষ্টারমহাশয়কে কেন? হাসতে পাবো না বুঝি? কিন্তু সে ভুল ভাঙলো দু'লাইন ফুরোতে না ফুরোতে। সাতটি গল্পতেই হাসতে হবে—নিস্তার নেই। আমার কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেগেছে "গোখলে" গান্ধিজি ও গোবিন্দবাবু ও "শিশুশিক্ষার পরিনাম" এই দুটো গল্প। তোমাদের সঙ্গে যে মিলবেই এমন কোন কথা নেই। ছাপা ও ছবি ভাল, দাম বেশ কম।

পৃথিবীর গল্প।	সম্পাদক	শ্রীসতী কান্ত গুহ
পৃথিবীর উপন্যাস।	অনুবাদক	শ্রীমোহন লাল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীশোভন লাল গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্রকর—শ্রীগোপেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রাচী পাবলিশিং হাউস—দাম পাঁচসিকা ও এক টাকা।

একটু ভেবে দেখলে দেখতে পাবে যে যত গল্প উপন্যাস পড়া যায় তাদের মোটামুটী দুটো ভাগ করা চলে। এক রকম গল্প উপন্যাস আছে যাদের পড়তে মন্দ লাগে না বটে কিন্তু প্রায় পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে যাই। এরা খুব হালকা জিনিষ, মনে কোন ছাপই দেয় না। এই সেদিন বিশুর কীর্ত্তি, পড়লাম আর আজ যদি জিজ্ঞাসা কর গল্পটি কি শুনি একটু বিপদে পড়তে হবে বৈকী। টুকরো টুকরো কথা সাজিয়ে কোন রকমে হয়তো গল্পটি বলবো কিন্তু দেখতে পাবো যে বেশ অনেকখানি বেমালুম হজম হয়ে গেছে।

এছাড়া আরেক ধরণের গল্প উপন্যাস আছে যা পড়ি, পড়তে পড়তে ভাবি আর বহুদিন—অনেকদিন পর্য্যন্ত তা খুব স্পষ্ট মনে থাকে। এসব গল্প যাঁরা লেখেন তাঁরাই আসল গল্প লিখিয়ে, গল্প বলার সত্যিকারের যাদুটুকু তাঁরা জানেন। আর পড়বার সময় এই সব বই থেকে কি আনন্দই না পাই। মনে হয় যেন লেখক আমাদের মনের কথা, আমাদের গোপন অভিলাষ সব জেনে নিয়ে এ বই লিখেছেন; যেন আমাদেরই জীবনকথা, আমাদের ভবিষ্যত কাহিনী ছাড়া এ আর কিছু নয়।

অন্য অন্য দেশেও এই রকম বড় বড় লিখিয়ে গল্পের যাদুকরেরা অনেক অনেক গল্প উপন্যাস সব লিখে গেছেন—আজও লিখে চলেছেন। সেই সব বইগুলির কয়েকটি বাছা বাছা বইর সহজ ও সুন্দর অনুবাদ করবার ভার নিয়েচেন শ্রীসতীকান্ত গুহ প্রমুখ শিশুসাহিত্যের তিনজন নামজাদা লিখিয়ে। এঁদের অনুবাদ এ বই দুখানিতে এত সুন্দর হয়েছে যে পড়লেই দেখা যায় যে মূল লেখকদের গল্প বলার কায়দা ও ভাষার ভঙ্গির উপর এঁরা কি কড়া নজরই না রেখেছেন যা অন্য অনুবাদে আমরা পাইনি। আর প্রসিদ্ধ লেখকদের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ। চার্লস্ কিংসলি, হ্যান্স অ্যাণ্ডারসেন, আনাতোল ফ্রাঁস, সেকভ, চার্লস ডিকেন্স,

ভিক্টর হ্যুগো, বাল্জাক—এদের লেখা যে কি অপরূপ, কত চিত্তাকর্ষক কথায় বোঝান যায় না। এক একটি গল্প পড়তে পড়তে যেন ডুবে যেতে হয় সম্পূর্ণভাবে—অন্যদিকে কোন হুঁস থাকে না! চোখের সম্মুখে কাহিনীটুকু জীবন্ত হয়ে উঠে—ঘটনার পর ঘটনা ঘটতে থাকে—আর মন? মন চলে যায় কত দেশ বিদেশ ছাড়িয়ে দূরে অনেক দূরে যেখানে—"পাহাড় চুড়ো থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে গুড়ো বরফের ঝুরি নেমেছে, সাদা সাপের লেজের মতন। বরফের চাক ঠেকছে বরফের চাকে—শব্দ করে ফেটে যেয়ে রোদের আলোয় গলে যাচ্ছে তারা—রোদের আলো হিম জলে ভিজে যাচ্ছে—বরফের সঙ্গে ফেটে পড়ে যেন নিভে যাচ্ছে। কিন্তু পাহাড় চুড়োর নীচে গুহার চারিপাশে নেই হিমের শীতল রাজ্য। সেখানে গুহার চারিদিকে অগণতি মনোহর ফুল—রূপসী লতা।" গুহার ভিতরে কি? ছোট্ট শিশু সুন্দর জেসনের সঙ্গে সঙ্গে পা টিপে টিপে ভিতরে গিয়ে দেখি—'সেখানে সুরভিশাখার উপরে ভালুক-চামড়া পেতে শুয়ে আছেন গায়ক কাইরণ।...... মাথা থেকে কোমর পর্য্যন্ত আধখানা তাঁর মানুষের শরীর, বাকি আধখানা ঘোড়ার মতন। তাঁর মাথায় সাদা চুল বিরাট কাঁধ বেয়ে পড়েছে। তাঁর সাদা দাড়ীর গোছা বাদামী রঙের বুক ঢেকে দিয়েছে।......কাইরণ গেয়ে চলেছেন আশ্চর্য্য গান। আদিকাল কবে জন্মালেন, কবে জন্মালো আকাশ—আর আকাশের খেলাঘরে যারা নাচে, সেই গ্রহতারার দল—গান গেয়ে জানালেন তিনি।' এমন লোভ হচ্ছে সমস্ত গল্পটা বলে দিতে—কিন্তু সে ত' সম্ভব নয়। তোমরা পোড়ো, পড়লে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে।

একটা জিনিষ হয়তো তোমাদের প্রথম প্রথম খারাপ লাগবে—আমারও লেগেছিল তাই বলছি। ফ্রাইক্সস, আইওলকসে, আলেকজাঁদার—এ সব নাম যেন ভাল লাগে না আর উচ্চারণ করতে বেশ মুস্কিল লাগে; পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু ভাবলে দেখা যায় যে আমাদের বাঙলা গল্পের অনুবাদ যদি কোন ইংরাজ বা ফরাসী পড়তে বসে তাদেরও ত' এই বিপদই হবে। এতটুকু অসুবিধার জন্যে ত' আর গল্প ছাড়া যায় না, নয় কি?

বই দু'খানিতে গোপেশ বাবুর আঁকা ছবিগুলির সত্যই তারিফ করতে হয়—একেবারে নতুন ধরণের ছবি সব—বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়। ছাপা ও বাঁধাই খুব সুন্দর। ছবি ও ছাপার পরিকল্পনা সতীকান্ত বাবুর নির্দ্দেশমত হয়েছে। প্রাচী পাব্লিশিং যে ধরণের বই সব প্রকাশ করছেন—ও সবদিক থেকে ভাল করবার যে সাধু প্রচেষ্টা এঁদের—তা বাংলা দেশের শিশু-সাহিত্যে এই প্রথম—এর প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

ফটোগ্রাফিক প্রতিযোগিতার ফলাফল
পরের মাসে প্রকাশিত হবে।



নূতন ধাঁধা

নীচে ছবিগুলিতে দেখতে পাচ্ছ কতকগুলো পা আঁকা রয়েচে। বল দেখি কোনটা কিসের পা? ২২শে অগ্রহায়ণের মধ্যে এই ধাঁধা ও নীচেকার হেঁয়ালীর উত্তর পাঠান চাই।

৩



৬

হেঁয়ালী

(১) কোন্ পশু হাহাকার নয়?

(২) কোন্ পাখী শব্দ লাভ করে?

(৩) কোন্ সাপ কাৎ হ'য়ে আছে?

(৪) কোন্ সহর মুক্তাচোর?

(৫) কোন্ ফলে ইংরাজী শব্দ আর তা'র মানে আছে?

(৬) কোন্ ফলে গালা বেশী নেই?

(৭) কোন্ নদীর শেষটি বাদে ফুল হয়?

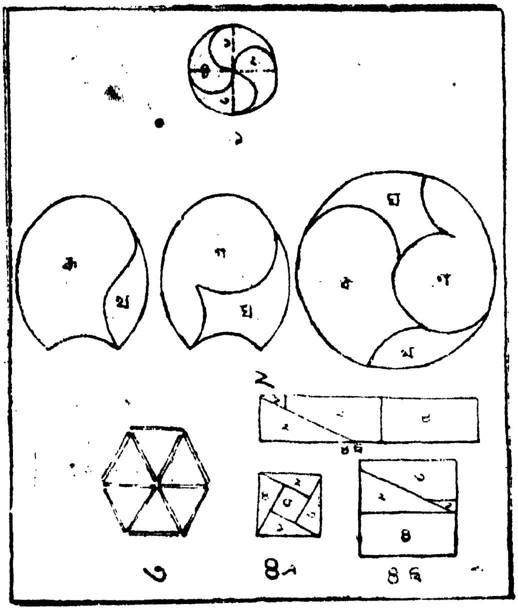
(৮) কোন্ পাহাড় উল্‌টিয়ে দেখা যায় মোটা নয়?

(৯) কোন্ ফল আসে?

(১০) কোন্ নদী চার ছটাক?

আশ্বিন মাসের

ধাঁধার উত্তর



(১) এটি ছবি দেখলেই বোঝা যাবে ১,২,৩,ও ৪ চারটি ভাগ কাঁচি দিয়ে কেটে ওপর বসালে তারা হবহু মিলে যাবে।

(২) এটি একটু শক্ত ছিল কিন্তু কাগজ নানা রকম ভাবে কেটেকুটে দেখলে এর সমাধান করা যায়। দুটি ঘোড়ার খুর থেকে ক, খ, গ ও ঘ চারিটি ভাগ কেটে তাদের গুছিয়ে জুড়ে ছবিতে দেখ একটি বৃত্ত করা হয়েচে। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে ক ও খ এবং গ ও ঘ এ দুটি জুড়লে আমাদের এক নম্বর ধাঁধার কাল ও সাদা সমান দুটি বক্রের মত হবে। (আশ্বিন মাসের ১ নম্বর ধাঁধা দেখ)।

(৩) ছবি দেখ—ছবিই এর পরিষ্কার উত্তর। আরো দু'তিন রকমে ঘরগুলি সাজান যেতে পারে।

(৪)এ—ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে পাঁচটি অংশ জুড়ে কেমন করে একটি স্কোয়ার করা হয়েচে।

(৪)বি—ওপরকার ছবিতে চারটি অংশ ১,২,৩,৪ ভাগ করা হয়েচে ও নীচে ঐ ১,২,৩,৪ অংশগুলি জুড়ে একটি স্কোয়ার করা হয়েচে।

আশ্বিন মাসের ধাঁধার

উত্তরদাতাদের নাম

আমাদের গ্রাহকগ্রাহিকাদের মধ্যে কেহই নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন নাই।

যাহাদের একটিমাত্র ভুল হইয়াছে—

নির্মল, বুলা, পোনা, নলিনী ও শ্যাম, ভবানীপুর; উমারাণী, বেলা, রবি, বেনু, ও রমা, ভবানীপুর; শিবশঙ্কর সাহা, যাদবপুর; সুধাতোষ বসু, কলিকাতা; পান্নালাল ও কেশবলাল আটা, শালিখা; বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার, সম্পাদক ও সভ্যবৃন্দ, শালিখা; মনুজেন্দু ও পূর্ণেন্দু দত্ত মজুমদার, বাজিতপুর। রুনু, টুনু ও উমা, কলিকাতা; সুনীল সরকার, ভবানীপুর; রামকৃষ্ণ বসু, কলিকাতা।



ইসলিংটন করিন্থিয়ানস ফুটবল দল

রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

পরের পাতায় ছবিতে দেখ কেমন একটি ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে বিউনী দুলিয়ে টব দেয়া ফুলগাছে জল দিচ্চে। এই ছবিটি তোমাদের খুব সুন্দর করে রঙ করা চাই। রঙমশালের মতে রঙ দেয়া সবচেয়ে যার ভাল হবে তাকে একটি পুরস্কার দেয়া হবে। এ বিষয়ে রংমশালের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। ছবিটিতে রঙ দিয়ে আমাদের অফিসে ২২শে অগ্রহায়ণের মধ্যে পাঠাতে হবে। যার যতগুলি খুসী ছবিতে রঙ দিয়ে পাঠাতে পারো। রংমশাল প্রেসে ও রংমশাল আফিসে এই ছবির বাড়তি বা এক্সট্রা কপি পাওয়া যাবে—/০ দাম দিয়ে যে কেউ কুপন শুদ্ধ এক্সট্রা ছবি কিনতে পারে। রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকা ও পাঠকপাঠিকা সকলের জন্যেই এই প্রতিযোগিতা দেওয়া হোল। কুপনে নাম, গ্রাহক নম্বর (যদি গ্রাহকগ্রাহিকা হও) ও ঠিকানা লিখতে হবে। যারা গ্রাহকগ্রাহিকা নয় তাদের নাম; বয়স, ও ঠিকানা লিখতে হবে, কিন্তু তাদের ১৬ বছরের মধ্যে বয়স হওয়া চাই। বয়সে সবচেয়ে ছোট এমন যদি কোন গ্রাহকগ্রাহিকা বা পাঠক পাঠিকার রং দেয়া ভাল হয় তাকে একটা বিশেষ পুরস্কার হবে। সে-জন্য ১০ বছরের নীচে গ্রাহকগ্রাহিকারা তোমাদের বয়স লিখো।

যারা পরের মুখে ঝাল খেতে চায় না সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী ছেলে মেয়েরা আমাদের বই পড়ে খুশি হবে

পৃথিবীর রূপকথা

এদেশের সবচেয়ে বড় রূপকথাকার
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
সম্পাদিত

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো রূপকথা, রকমারী রঙ্গ
ছবি। বড় সাইজের বই। ঝলমলে মলাট।
দাম দেড় টাকা।
ডাকমাশুল আলাদা।

পৃথিবীর গল্প
পৃথিবীর উপন্যাস

সতীকান্ত গুহ, মোহনলাল ও
শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদিত

একখানা বই-য়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো গ
আর একখানায় সবচেয়ে ভালো চারখানা উপন্যাস
রংমশালের মতে এ দুখানা বইয়ের মত এত চমৎক
লেখা, ছবি ও ছাপা আর দেখা যায়নি।
দাম একটাকা চার আনা আর এক টাকা।
ডাকমাশুল আলাদা।

বাড়ী থেকে পালিয়ে

শিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখিত

শিবরাম বাবু বাড়ী থেকে পালিয়েছিলেন। ত
এত চমৎকার বই লিখতে পেরেছেন। সকলে
মতে পূজোয় এ রকম বই আর বার হয়নি।
দাম এক টাকা।
ডাকমাশুল আলাদা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত

রাজকাহিনী

প্রথম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ
দাম বারো আনা।

রাজকাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ
দাম একটাকা।

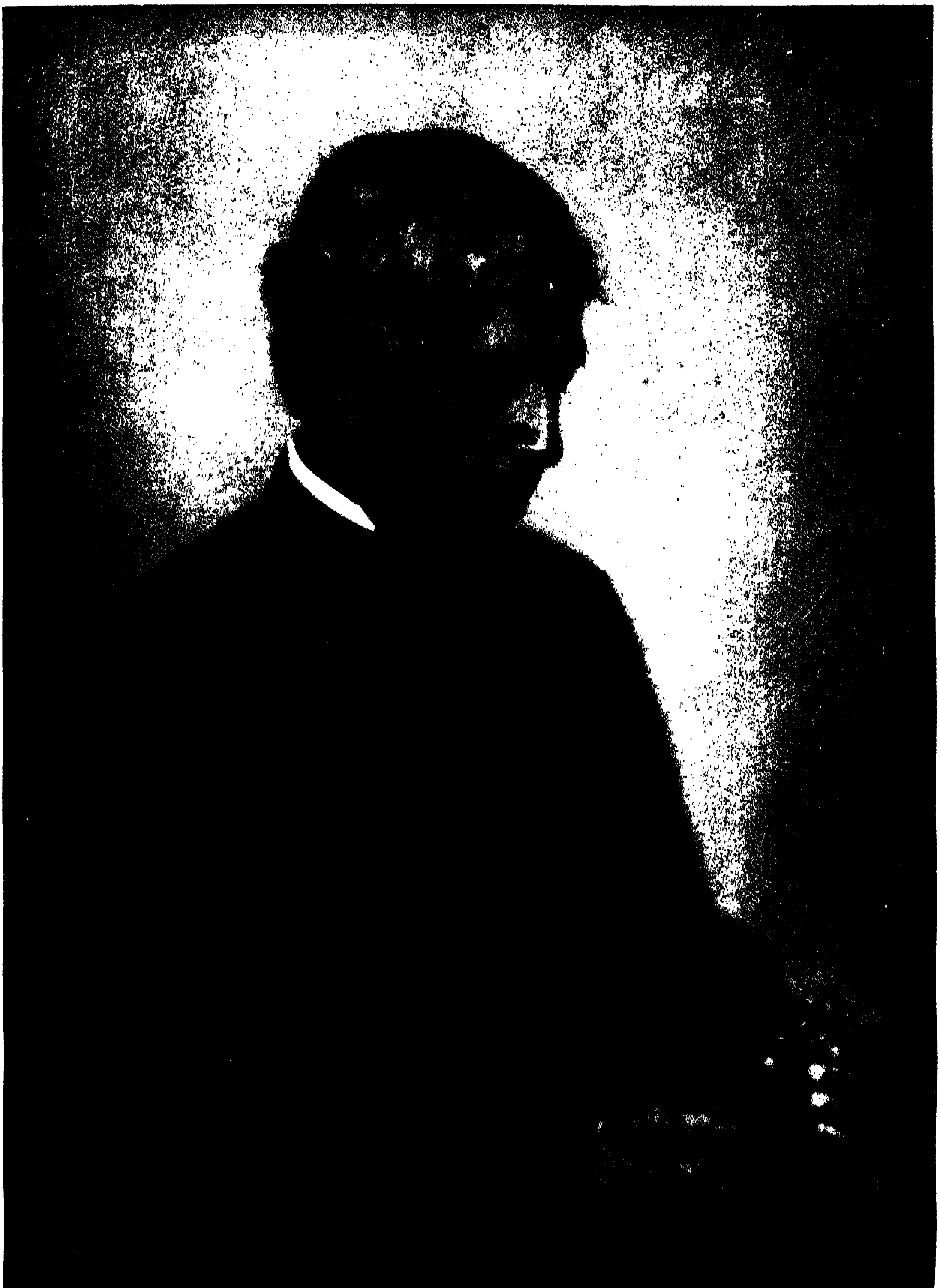
ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথিবীতে অবনীন্দ্রনাথের মত লেখক নেই, রাজকহিনীর মত বই নেই। এবার অনেক খরচ করে মলাটের নতুন ছবি ছাপা হল। ভিতরে অনেক হাফ্‌টোন ছ দেওয়া হল।

তিনখানা আশ্চর্য্য বই বার হচ্ছে ঃ জানুয়ারীতে 'সবুজলেখা', ফেব্রুয়ারীতে 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'গল্পের দেশে'। তারিখ ভুলোনা।

প্রাচী পাবলিশিং হাউস

১০ ইন্দ্ররায় রোড,
ভবানীপুর কলিকাতা।

সূচীপত্র



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

রংমশাল
দ্বিতীয় বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
পৌষ
১৩৪৪

লালকমল নীলকমল সঙ্গে যাবি কে?

শ্রীসতীকান্ত গুহ

লালকমল নীলকমল সঙ্গে যাবি কে ?
ও ভাই কমল ! সঙ্গী হব যাওনা যেদিকে ।
এলেম আমি দত্যিমারণ মন্ত্রটি শিখে ।
রাতদুপুরে তালপুকুরে হাসচে যেন কেউ,
হল্‌দিবনে বাঘের পিছে শেয়াল ধরে ফেউ ।
এইতো আমি এলাম চলে,
বাঁদরা বনে জোনাই জ্বলে,
আধখানা চাঁদ পড়ল ঢলে
হিম-আকাশের গায়,
দুভাই কমল চমকে গিয়ে
অবাক চোখে চায় ।

লালকমল নীলকমল সঙ্গে যাবি কে ?

শ্রীসতীকান্ত গুহ

এক ফোঁটা চাঁদ মুছলো হাতে ডাইনী বুড়ী কে ?
হঠাৎ হাওয়ায় ফোঁস্ করে কে বনের বাঁদিকে ?
কোন্ অজগর লুকোয় মাথার ঝিলিক-মাণিকে ?

অন্ধকারে বনের পথে হাঁটছে দুটি ভাই,
তাদের সাথে এলেম আমি, একটুতো ভয় নাই।
এলেম আমি একলা রাতে,
লাল তলোয়ার জ্বলছে হাতে,
আর একহাতে ঢালের পাতে
নামটি লেখা তায়,
দুভাই কমল নামটি পড়ে'
অবাক চোখে চায়।

লালকমল নীলকমল ! চলবে ও দিকে ?
বেশ চলো না চলব আমি বলবে যে দিকে।
মাঠের শেষে দেখবো বুঝি কঙ্কাবতীকে ?

কঙ্কাবতী ! কঙ্কাবতীর পুর যে অনেক দূর,
মাঠের শেষে উল্কি নদীর বুকটি দুরু দুর্।
পাটনি মাঝি বললে কেসে'
"খেয়ার কড়ি কে দেবে সে ?"
"দেবে কমল" বলেই শেষে
দিলেম কড়ি তায়,
উল্কিনদীর পাটনি বুড়ো
অবাক চোখে চায়।

ছোট্ট নদী ফুরিয়ে গেল একটুখানিকে।
তেপান্তরে পান্থ চলে একটি দুটি কে ?
শুধোও গাছের সব্ জানিয়ে বিহঙ্গমীকে।

"রাক্ষসিনীর" বললে পাখী "দুইটি অনুচর,
"পথ ভুলিয়ে ফেলবে নিয়ে পাশাবতীর ঘর।"

লালকমল নীলকমল সঙ্গে যাবি কে ?
শ্রীসতীকান্ত গুহ

বলনু হেঁকে "কেরে তোরা?
"পাশাবতীর পাশাজোড়া"
খিলখিলিয়ে হাসল ওরা
চোখের লহমায়
মিলিয়ে গেল। দুভাই কমল
অবাক চোখে চায়।

লালকমল নীলকমল ! কে যায় এদিকে ?
দেখনু চেয়ে রূপকাহিনীর রূপকুমারীকে।
ঘোমটা টেনে দিলে হাতে পত্রটি লিখে।
"রূপের হাটে জোয়ার ভাঙে, চাঁদের বুকে ঘর,
"রাজার মেয়ে এলেম আমি, কমল আমার বর।"
বলনু হেসে, "লাল কি নীল ?"
নীল বলে, "লাল," লাল বলে "নীল।"
হঠাৎ দেখি চার চোখে মিল
আমার সনে হায়,
দুভাই কমল একটু হেসে
অবাক চোখে চায়।

দুভাই কমল সঙ্গে নিল রূপকুমারীকে,
পায়ের তলে মিলিয়ে গেল পাহাড় নিমিখে।
হঠাৎ দেখি পূবের আকাশ একটু যে ফিঁকে।
হঠাৎ বাঁশী বেজে ওঠে, ডঙ্কা কড়াকড়,
দুভাই কমল পৌঁছে গেছে রূপতরাসের ঘর।
রাণী এলেন নীচমহলে,
বলেন "কমল আয়রে কোলে।"
তখন আমি এলেম চলে
ঘরেই ফিরে হায়
চুপি চুপি মায়ের কোলে
ছোট্ট বিছানায়।

দিদি

—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

[একাঙ্ক নাটক]

অরুণ — মাধবী ও তার তিন সঙ্গিনী

পথিক — দুটি রাখাল ছেলে

বাউল

[সকাল বেলা। সোনালী আলো সমস্ত পূব আকাশ আলো করে' ছড়িয়ে পড়েছে দূরে দূরে গাছের মাথায় মাথায়।

ছোট্ট মাঠের ধারে, সরু আঁকা বাঁকা পথের পাশে শিউলি ফুলের গাছ। যত না ফুল ফুটে রয়েছে গাছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ঝরে' পড়েছে নীচের সবুজ ঘাসে।

একদল মেয়ে গুণগুণ করে' গান গাইছিল আর সেই ঝরে'-পড়া ফুলের রাশ কুড়িয়ে তাদের ছোট্ট আঁচলগুলো ভরে' তুলছিল।]

গান

ভোরের আলো আকাশ পারে
ডাক দিয়ে যায় বারে বারে
বলে—জাগো, আঁখি মেলো,
ঘুমের রেখা মুছে ফেলো;
আনন্দ ওই এল দ্বারে।

প্রথম মেয়ে— অন্যদিনকার চেয়ে আজকার ফুলগুলোকে যেন বেশী ভাল লাগছে, না ভাই?

দ্বিতীয়া— আজ ফুল ঝরেছেও অন্যদিনকার চেয়ে অনেক বেশী!

তৃতীয়া—সত্যি ভাই, সবুজ মাঠটাকে করে দিয়েছে যেন দুধের মত সাদা।

চতুর্থা — একরাশ সাদা বরফের টুক্‌রো কেউ যেন ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিককার ঘাসের উপর। বেশ দেখতে লাগছে, না ভাই?

গান

ভোরের বাতাস এল ব'য়ে
কানে কানে কি যায় ক'য়ে।
বনের পাখী গানের সুরে
ডাক দিয়ে যায় দূরে দূরে
সুর ভেসে যায় আলোর ধারে।

প্রথমা —আজ ফুল কুড়োতে খুব আনন্দ লাগছে, না ভাই?

দ্বিতীয়া—আজ এক কাজ করলে হয় না?

তৃতীয়া—কি কাজ ভাই?

দ্বিতীয়া—মালা ত রোজই গাঁথি, আজ গাঁথবো ফুলের গয়না।

চতুর্থা — সেই ভালো। আমি বানাবো মাথার মুকুট।

প্রথমা — আমি গাঁথবো গলার সাতনরী হার।

দ্বিতীয়া—কানের দুল আর হাতের বাজুবন্ধ বানাবো আমি।

তৃতীয়া—আর আমি—আমি করবো পায়ে পরবার ফুলের তোড়া।

চতুর্থা —আর, সেই ফুলের গয়নায় সেজে নাচ্‌বো আমরা আমাদের খেলাঘরের বরকনের বাসরে, কেমন?

তৃতীয়া—খুব মজা হবে কিন্তু ভাই!

[এমন সময় অরুণ ছুটতে ছুটতে এসে তৃতীয় মেয়ের পিঠের ওপর ঝুলে পড়া বিনুনীতে দিলে টান।]

তৃতীয়া—কে—?

[সব মেয়েরা চমকে উঠে তাকালে অরুণের দিকে। অরুণ খুব লজ্জিত হয়ে পড়লো।]

প্রথমা — কে ভাই তুমি?

অরুণ — [তৃতীয়ার প্রতি] তুমি ত আমার দিদি নও।

তৃতীয়া—না, আমি মাধবী।

দ্বিতীয়া—তুমি কে ভাই ? তোমায় ত কখনও দেখিনি !

অরুণ — আমাদের বাড়ী তো এখানে নয় ; অনেক দূরে—আর এক গাঁয়ে।

চতুর্থা — তোমার নাম কি ভাই ?

অরুণ — আমার নাম অরুণ।

তৃতীয়া — বা, বেশ নামটি ত তোমার !

চতুর্থা — তুমি বুঝি তোমার দিদিকে খুঁজতে এসেছ ?

প্রথমা — তোমার দিদির কি নাম ভাই ?

অরুণ — তার নাম অরুণা—মা ডাকে অরু বলে। খুব সুন্দর দেখতে সে। [তৃতীয়ার প্রতি] ঠিক তোমার মতন।

তৃতীয়া—তোমার দিদি বুঝি তোমায় লুকিয়ে একা একাই ফুল তুলতে এসেছে ? তোমার সাথে ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?

অরুণ — দিদি ত আমার সাথে ঝগড়া করে না—সে আমাকে খুব ভালবাসে।

প্রথমা — তবে, তোমায় সাথে নেয়নি কেন ?

অরুণ — দিদি ত এখন আর আমাদের বাড়ীতে থাকে না। অনেকদিন আগে দিদির খুব অসুখ করেছিল। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন—কত ওষুধ দিয়েছিলেন ! তারপর—সেদিন অনেক লোক এসে দিদিকে কোথায় নিয়ে গেল। আমি সাথে যেতে চাইলাম—তারা যেতে দিল না। আমি অনেক কেঁদেছিলাম। মা বল্‌লে—দিদি অসুখ ভাল হ'তে গেছে, আবার আসবে !

তৃতীয়া—দিদির জন্যে তোমার খুব মন কেমন করছে বুঝি ?

অরুণ — হাঁ !

দ্বিতীয়া—তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন ?

অরুণ — মাকে জিজ্ঞাসা করলেই মা কাঁদে, আর বলে, দিদি অসুখ ভাল হ'লেই ফিরে আসবে। আমার একলাটি আর ভাল লাগছে না ; তাই, দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

চতুর্থা — তোমার দিদি কিন্তু সত্যি ভারি দুষ্টু—তোমার মতন সুন্দর ভাইটিকে ভুলে রয়েছে !

অরুণ — রোজ সকালে উঠে দিদিকে খুঁজতে আসবো ভাবি।' কিন্তু, মা আমাকে কিছুতেই আসতে দেয় না। আজ মা ঘুমিয়ে আছে দেখে চুপি চুপি পালিয়ে চলে এসেছি।

তৃতীয়া— এত দূরে কেন এলে ভাই ? অনেক বেলা হয়েছে বাড়ীতে ফিরতে যে তোমার খুব কষ্ট হবে।

অরুণ — আমি ত এখন বাড়ী ফিরবো না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দিদির খোঁজ করে' তবেই বাড়ী ফিরবো।

চতুর্থা — ক্ষিধে পাবে না তোমার ?

অরুণ — আমার কিছু কষ্ট হ'বে না।

তৃতীয়া --- তুমি কেন চলনা আমাদের বাড়ীতে !

অরুণ — আমি যাব না ভাই ! আমার যে দিদিকে খুঁজতে হ'বে। সবাইকে জিজ্ঞাসা করবো—কেউ না কেউ নিশ্চয় বলে দেবে দিদি কোথায় আছে।

তৃতীয়া — তোমার দিদিকে পেলে তাকে সাথে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ীতে আসবে ভাই ? এই পথ দিয়ে গিয়ে খানিকটা দূরে দেখ্‌বে একটা লাল রঙের বাড়ী, সেইটে। কেমন, আসবে ত ?

অরুণ — আস্‌বো।

প্রথমা — সত্যি আসবে কিন্তু ভাই ! তোমার দিদির সাথে তখন খুব ভাব করে নেবো, কেমন ?

দ্বিতীয়া—চল্ ভাই, বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে। কখনই বা মালা গাঁথব, আর, কখনই বা খেলা করব।—

প্রথমা — আমরা চললাম ভাই। আমাদের কথা মনে রাখবে তো ? দিদিকে সাথে নিয়ে একদিন আসতে যেন ভুলো না !

[মেয়েরা গান গাইতে গাইতে চলে গেল বাড়ীর পথে। অরুণ দাঁড়িয়ে রইল তাদের দিকে চেয়ে। এমন সময়, জনৈক পথিক এল পথে।]

পথিক—তুমি কে ভাই, একলাটি এখানে দাঁড়িয়ে ?

অরুণ—আমি অরুণ আমার দিদির জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

পথিক—কোথায় গেছে তোমার দিদি ?

অরুণ—তাতো জানি না। ক'দিন আগে লোকেরা তাকে কোথায় নিয়ে গেলো। আমি যেতে চাইলাম—কিছুতেই যেতে দিলে না।

পথিক—তোমার দিদি ত ভারী দুষ্টু, তোমায় সাথে নিলে না।

অরুণ—দিদির তো কিচ্ছু দোষ নেই—তার তখন খুব অসুখ করেছিল যে !

পথিক—খুব অসুখ করেছিল বুঝি ?

অরুণ — হাঁ। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, কত ওষুধ দিয়েছিলেন। পূব ধারের ঘরের ছোট্ট জানলাটার কাছে দিদি দিন রাত শুয়ে থাকতো। আমাকে মা তার কাছে যেতে দিত না। বলতো, দিদির অসুখ করেছে, ওর কাছে যেতে নেই। দিদিকে না দেখতে পেয়ে আমার ভারী কান্না পেতো। একদিন দুপুর বেলা মাকে লুকিয়ে দিদির ঘরে গেলাম।

পথিক — তোমায় দেখে তোমার দিদি কিছু বললে না?

অরুণ — সে তখন চোখ বুজে চুপটি ক'রে শুয়েছিল। সমস্ত গায়ে একটা সাদা চাদর ঢাকা দেওয়া শুধু মুখখানাই বাইরে ছিল।

পথিক — তারপর?

অরুণ — আমি আস্তে আস্তে ডাকলাম—'দিদি!' সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইল। আমি বললাম 'আমি এতদিন আসিনি বলে রাগ করিসনি তো ভাই? ওরা আমায় আসতে দেয় না।' তার দুই চোখে জল ভ'রে এল। সে বললে—আমার কাছে আর এসো না ভাই—আমার যে অসুখ করেছে। আমার কাছে তোমার আসতে নেই! 'আমার ভারী কান্না পেয়ে গেলো'—আমি ফিরে চলে এলাম। তারপর একদিন সবাই মিলে দিদিকে কোথায় নিয়ে গেলো। আমি কাঁদলাম—আমাকে সাথে নিলে না তারা।

পথিক — আহা!

অরুণ — অনেক দিন মা'কে জিজ্ঞাসা করেছি দিদির কথা। মা শুধু কাঁদে আর বলে,—অসুখ ভাল হ'লেই ফিরে আসবে।

পথিক — মা যখন বলেছেন তখন তোমার দিদি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে আবার।

অরুণ — অসুখ ভাল হ'তে আর কত দিন লাগবে, বলতে পার? আমার ও অসুখ করেছিল—আমি ত দুদিনেই ভাল হয়ে গেছি। দিদির এত দেরী হচ্চে কেন?

পথিক — তোমার দিদির যে অসুখ খুব বেশী হয়েছে কিনা, তাই, সারতে দেরী হচ্ছে। অনেক বেলা হয়েছে, তুমি বাড়ীতে যাবে না?

অরুণ — আমাদের বাড়ী ত এ গাঁয়ে নয়। মাঠের শেষে ঐ যে গাছগুলো দেখ্‌ছো না?—ঐ দূরে—ঐখানে আমাদের বাড়ী।

পথিক — তুমি একলাটি এত দূর কেন এসেছ বল ত?

অরুণ — দিদি নেই—আমার আর বাড়ীতে ভাল লাগে না।

দিদি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

পথিক — তোমার মা তোমায় না দেখে খুব ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌বেন !

অরুণ — দিদিকে খুঁজতে এসেছি জেনে মা কিছু বলবে না আমাকে। মাও দিদিকে খুব ভালবাসে কি না। আচ্ছা, তুমি ত অনেক দূর থেকে আসছো। তুমি আমার দিদিকে কোথাও দেখ নি ?

পথিক — আমি ত তোমার দিদিকে চিনি নে ভাই !

অরুণ — খুব সুন্দর দেখতে সে। অরুণা নাম—মা ডাকে অরু বলে।

পথিক— এমন কাউকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না !

অরুণ — হয় তো তুমি দেখেছ, কিন্তু মনে নেই।

পথিক — তাও হ'তে পারে বৈকি ! কত জায়গায় ঘুরছি, কত লোক দেখ্‌ছি—সবাইকে কি আর মনে করে রাখা সম্ভব ?

অরুণ — আমার দিদিকে দেখলে কিন্তু ভুলতে পারতে না ! আমি ত ভুলি নি তাকে—ভুলবোও না কোনও দিন।

পথিক — খুব সম্ভব, আমি তোমার দিদিকে দেখি নি। বেলা অনেক হয়েছে—আচ্ছা ভাই, এবারে আমি যাই। আমাকে আবার অনেক দূরের পথ যেতে হ'বে কি না !

[অরুণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। পথিক ধীরে ধীরে চলে গেল নিজের পথে। ক্লান্ত অরুণ অবসন্ন হয়ে বসে পড়লো একটি ঝোপের আড়ালে।]

অরুণ — দিদিটা সত্যি ভারী দুষ্টু ! আমার জন্যে তার একটুও কষ্ট হয় না। আমায় দিদি একটুও ভালবাসে না, বোধ হয়। এবার ফিরে এলে, এমনি আড়ি করে দেবো তার সাথে হাজার সাধলেও আর কথাটি কইব না ! হাজার আদর করলেও আর খেলব না, তার সাথে। তখন বুঝবে মজা !

বড্ড খিধে পেয়েছে। মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। আর বসে থাকতেও পারছি নে।

[সে ঝোপের পাশে শুয়ে পড়ল।]

কাউকে এ পথে আসতেও তো দেখছি নে। বেলা অনেক হ'য়েছে—মা ভাবছে আমার জন্যে। দিদিকে যদি সাথে করে নিয়ে যেতে পারি, মা'র—ভারী আনন্দ হ'বে আমাকে আরও ভালবাসবে [ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো]

[ইতিমধ্যে বেলা অপরাহ্ন হয়ে এলো। দুপুরের প্রখর সূর্য্য এখন নিস্তেজ হ'য়ে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লো। এমনি সময় দুইজন রাখাল ছেলে সেই পথে আসছিল।]

প্রথম — কে একজন শুয়ে রয়েছে না ভাই ?

দ্বিতীয় — ছোট্ট একটা ছেলে। খুব সুন্দর দেখতে—না রে ?

প্রথম — ও এখানে শুয়ে রয়েছে কেন ভাই ?

দ্বিতীয় — বোধ হয় পথ হারিয়ে ঘুরে' ঘুরে' ক্লান্ত হ'য়ে এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে। দাঁড়া, ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছি, ওগো—শুনছো—

অরুণ — [ঘুমের ঘোরে] দিদি, এতদিন কোথায় ছিলি ভাই ? আমি তোর জন্যে কত কেঁদেছি—কত খুঁজেছি তোকে—

প্রথম — ও সব কি বলছে ভাই ?

দ্বিতীয় — ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওর দিদিকে স্বপ্ন দেখছে। শুনছো ও ভাই—

অরুণ — এঁ্যা ! দিদি---দিদি---[উঠিয়া বসিল।] তুমি—তুমি ত দিদি নও।

দ্বিতীয় — তোমার দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছ বুঝি ? কোথায় গেছে তোমার দিদি ?

অরুণ — তাতো জানি না। তার খুব অসুখ করেছিল---তার বিছানাতে একলাটি দিনরাত শুয়ে থাক্‌তো। একদিন সব লোকেরা মিলে তাকে কোথায় নিয়ে গেলো। তারপর থেকে সে আর ফিরে আসেনি বাড়ীতে।

প্রথম --- তাই বুঝি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছ ?

অরুণ — হঁা।

দ্বিতীয় — বাড়ীতে কাউকেও জিজ্ঞাসা করনি কেন ?

অরুণ --- মাকে অনেক জিজ্ঞাসা করেছি। মা শুধু কাঁদে আর বলে যে—অসুখ ভাল হ'লেই ফিরে আসবে !

প্রথম — আর কিছু বলেন নি তোমার মা ?

অরুণ — আর কিছু ? কই---না।

দ্বিতীয় --- আমি বুঝতে পেরেছি তোমার দিদি কোথায় গেছে। আচ্ছা, তোমার দিদি কেমন দেখতে বলত !

অরুণ — খুব সুন্দর দেখতে সে—-

প্রথম — গোলাপের পাপড়ির মতন গায়ের রং ?

দ্বিতীয় — মাথার চুলগুলো খুব কালো আর গোছা গোছা ?

প্রথম — চোখ দুটো খুব টানা টানা আর বেশ বড়, না ?

অরুণ — হাঁ, ঠিক বলেছ।

দ্বিতীয়—ডান দিকের গালে একটা কালো তিল আছে না ?

অরুণ — হাঁ, আছে।

প্রথম — সাঁথির ওপর একটা টকটকে লাল সিঁদুরের টিপ পরেছে তোমার দিদি ?

অরুণ — সিঁদূরের টিপ ? কই, না—

প্রথম — এখন পরে আছে—

দ্বিতীয়— কি নামটা বলেছিল—রু—রু—

অরুণ — অরু—অরুণা— ?

দ্বিতীয়—না, না—অরুণা নয়, তার নাম বলেছিল করুণা।

অরুণ — করুণা ?

দ্বিতীয়— হাঁ, করুণা।

অরুণ — শুনতে ভুল হয়নি তো তোমাদের ?

দ্বিতীয়—না, শুনতে একটুও ভুল হয়নি।

প্রথম — আমরা যে দুই তিন বার করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ভাই !

অরুণ — তবে, সে আমার দিদি নয়।

দ্বিতীয়— তাই বটে।

প্রথম — তবে আর কি হবে বলো। ওরে, চলরে চল—সন্ধ্যে হয়ে এলো। ফিরতে বড্ড দেরী হয়ে যাবে—

দ্বিতীয়—তুমি বাড়ী যাবে না ভাই ?

অরুণ — বাড়ী ? যাব বই কি—তবে, এখন নয়। একটু অপেক্ষা করে দেখি আর কারও যদি দেখা পাই।

প্রথম — ভয় করবে না তোমার ?

অরুণ — এখনও তো অন্ধকার হয়নি—এখন ভয় করবে না।

দ্বিতীয়—আমরা তাহ'লে চল্‌লাম্ ভাই।

[রাখাল ছেলে দুটি চলে গেলো। অরুণ একলাটি সেখানে বসে রইলো অন্য পথিকের সাক্ষাতের আশায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ইতিমধ্যে বেশ গাঢ় হয়ে উঠলো।]

অরুণ — কই, আর কেউই তো এ পথে আসছে না! সন্ধ্যে হয়ে এসেছে—বাড়ী যেতে হ'বে। মা আমার জন্যে ভাবছে? হয়ত সারাদিন খাওয়া হয়নি—আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে রয়েছে। দিদির খোঁজ তো পেলাম না। কেউই তো বলতে পারলে না দিদির কথা! দিদি কি আর ফিরে আসবে না? সে কি আমাদের কথা ভুলে গেছে? মা তাকে অত ভালবাসে. মাকে সে ভুলে রইলো কি করে?

[আস্তে আস্তে পথের দিকে অগ্রসর হোল। এমন সময় বাউলের গান শোনা গেল। চুপ করে দাঁড়ালো তার আসার অপেক্ষায়।]

কে একজন গান গাইতে গাইতে এই পথেই আসছে। ভালই হোল...ওকে পেয়ে যাব পথের সাথী। দিদির কথাও ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌বো, যদি বলতে পারে।

[গান গাইতে গাইতে বাউলের প্রবেশ।]

গান

আমার এই পথ চলাতেই
আনন্দ!
কেটে যায় পথে পথে
বর্ষা, শরৎ, বসন্ত।

বাউল — [অরুণকে দেখিয়া] কে ভাই তুমি?

অরুণ — আমি অরুণ। তুমি কত দূরে যাবে?

বাউল — আমি? আমার যাবার কি কিছু ঠিকানা আছে ভাই? আমি পথিক—পথ চলাই যে আমার কাজ!

গান

এ পথের নাই ঠিকানা,
এ পথের নাই যে মানা;
চলে যাই আপন মনে
পথ বেয়ে এই অনন্ত।

আমার এ পথের তো শেষ নেই! তবে, আপাততঃ যাব চণ্ডীতলার মন্দিরে—ভাবছি, রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দেবো।

দিদি

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ—আমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে? সন্ধ্যে হয়ে গেছে; একলা যেতে আমার ভয় করবে।

বাউল—তোমার বাড়ী চণ্ডীতলাতে বুঝি! এত দূরে একলাটি কেন এসেছিলে তুমি?

অরুণ—আমার দিদিকে খুঁজতে এসেছিলাম।

বাউল—দিদির দেখা পেলে না বুঝি?

অরুণ—সবাইকেই জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউই তো বলতে পারলে না দিদির কথা।

বাউল—কোথায় গেছে তোমার দিদি?

অরুণ—খুব অসুখ করেছিল তার। ডাক্তার বাবু এসেছিলেন—অনেক ওষুধ দিয়েছিলেন! দিদি সারাটা দিন চুপ চাপ করে নিজের বিছানাতে শুয়ে থাকতো। মা আমাকে তার কাছে যেতে দিত না—বলত, দিদির অসুখ করেছে, ওর কাছে এখন যেতে নেই। কদিন পরে এক দল লোক এসে দিদিকে কোথায় নিয়ে গেলো—

বাউল—তারপর থেকে তোমার দিদি আর ফিরে আসে নি বুঝি?

অরুণ—না।

বাউল—তোমার দিদি আর ফিরে আসবে না ভাই।

অরুণ—ফিরে আসবে না? কেন? তুমি কি করে জানলে যে দিদি ফিরে আসবে না?

বাউল—তোমার দিদি যেখানে গেছে, সেখান থেকে কেউ যে আর কখনও ফিরে আসে না। আমার একটি ছোট্ট ভাই ছিল—তোমার মতন দেখতে! সেও ওখানে চলে গেছে কি না, তাই আমি জানি। আমি, তুমি—সবাই—একদিন সেই দেশে চলে যাব; আর ফিরে আসবো না।

অরুণ—তুমি কোন দেশের কথা বলছ ভাই? সে দেশ কোথায়? তার নাম কি?

বাউল—সে দেশের নাম স্বর্গ—ওই শূন্যে।

অরুণ—ওখানে কি আমাদের মতন ছেলেরা আছে? দিদির মতন মেয়েরা আছে? তারা সারাদিন কি করে?

বাউল—সারাটা দিন তারা গান গেয়ে গেয়ে নেচে বেড়ায় ওখানকার পথে পথে। ওদের মনে একটুও দুঃখ নেই, নিরানন্দ নেই—সব সময়েই তারা খুসী, আনন্দময়।

অরুণ—ওখানে গেলে বুঝি আর এদেশের কথা কারও মনে থাকে না? ওখানকার লোকের আমাদের কথা একবারও ভাবে না বুঝি?

বাউল—আমাদের কথা তারা ভাবে বৈ কি। আমরা যখন ঘুরে বেড়াই, তখন তারা ওপর থেকে তাকিয়ে আমাদের দেখে। রাতের বেলা আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন তারা আমাদের কাছে নেমে আসে।

অরুণ—আমরা তো কৈ ওদের দেখতে পাই না।

বাউল—দেখতে পাই বৈ কি। আকাশে ওই যে সব তারা দেখ্‌ছো, ওরা কারা জানো? ওরাই সেই দেশের লোক। ওরা আমাদের ভুলতে পারে না; তাই, সন্ধ্যে হ'তে না হ'তেই ওরা ফুটে ওঠে নীল আকাশের কোলে একটি একটি করে, আর, সারা রাত ধ'রে ধ'রে ঝিক্‌মিক্, ঝিক্‌মিক!

অরুণ—আমার দিদিও আছে তা হ'লে ওদের মাঝে? তোমার ছোট্ট ভাইটি! ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের? আচ্ছা, কোন তারাটা আমার দিদি? কোন তারাটা তোমার ছোট্ট ভাইটি?

বাউল—তা কি ঠিক ক'রে বলা যায়? তবে, ওদের মাঝে আছে নিশ্চয়ই। জানো ওরা আমাদের খুব ভালবাসে,—তাই, নিশুতি রাতে নেমে আসে আমাদের কাছে স্বপ্ন হয়ে আমাদের ঘুমের মাঝে।

অরুণ—সত্যি? তা'হলে দিদি রোজ রাতে আসে আমার কাছে? আজও আসবে? আমি আজ কী করবো জানো? আজ চুপ চাপ শুয়ে থাকবো ঘুমের ভানে; আর, যেই দিদির পায়ের শব্দ পাবো, অমনি একটি লাফে তাকে ধরে ফেলবো শক্ত করে। দিদি তা'হলে আর পালিয়ে যেতে পারবে না। কেমন মজা হ'বে বল তো! এস ভাই, শীগগীর করে এসো মাকে বলতে হবে দিদি আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। আবার তাকে ধ'রে রাখবো আমাদের বাড়ীতে।

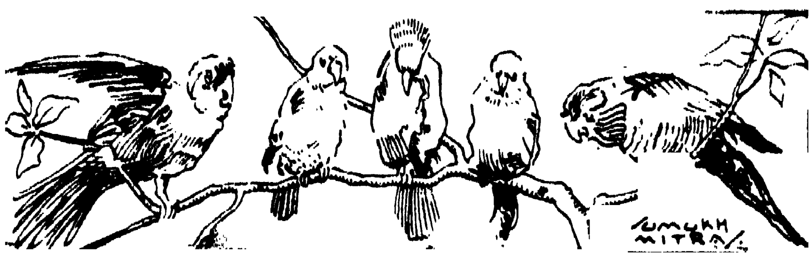
[ব্যস্ত অরুণ অপেক্ষা না করে ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে। বাউল শুধু হাসলো তার ব্যাকুলতা দেখে।]

বাউলের গান

জীবনের প্রহর গুলি
এমনি করে হ'লো যে ভোর
জানি না কোথায় পাবো
না-পাওয়া বন্ধুরে মোর।
রাখালের মেঠো বাঁশী,
সারাদিন আসে ভাসি,
ফুটে রয় সন্ধ্যা তারা
বাতাস বহে সুমন্দ।

[গান গাইতে গাইতে বাউল চলে গেল সেই অন্ধকার পথ বেয়ে। তার গানের সুর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে ক্রমে ক্রমে একেবারে মিলিয়ে গেল চারিদিককার নিস্তব্ধতার মাঝে। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে আরও গাঢ়তর হ'য়ে উঠ্‌লো—সাথে সাথে দূর আকাশের বুকে অগণ্য তারা যেন হ'য়ে উঠলো আরও উজ্জ্বল আরোও সুন্দর।]

যবনিকা



✵ ঘুমছায়া-ছায়াঘুম ✵

— পূর্ণেন্দু সেন —

ওঃ, লোকটা কি অসম্ভব বুড়ো!

কতদিনের, কতকালের ছাপ মাখানো আমাদের এই আদ্যিকালের থুত্থুরে বৃদ্ধটী।—আর দাড়ী ত নয়, যেন একগোছা সবুজে শ্যাওলা। শ্যাওলাই ত; সমস্তটা জটপাকান, আর মোচড়ান, আর দোমড়ান।

পাশেই পড়ে আছে একটা কুঁকড়ে-যাওয়া লাঠি। দেহের চামড়ার স্থান পূর্ণ করেছে খানিকটা লতা, আর খানিকটা গুল্ম। যেমনি তার ছাঁদ, তেমনি তার ছিরি।

উঁচু একটা ঢিপির উপর বসে আছে সে একটা ঝোপের ফাঁকে। কেন জানি না সুরু করলাম কথা, সুরু করলাম প্রশ্ন। কিন্তু নড়ল না সে একটুও, সেই এক ঠায় রইল বসে—যেন প্রাচীন একটা দেয়াল।

শেষে সে বললে—"মাথাটা একটু কাৎ কর"—অনেক কষ্টে। আচ্ছা মুস্কিল! কাৎ করব কি করে? আমি যে এখনও রইছি জেগে রীতিমত। বরঞ্চ সাধারণ যা দেখি তার হাজার গুন ভাল দেখছি এখন। বেশ ত আমি দেখতে পাচ্ছি ওই লক্ষ লক্ষ শিশিরকনার ভেতর জ্বলছে অগুনতি চোখ ওড়না-ওড়ানো নরম পরীদের। একটা বেশ মোটাসোটা মৌমাছি—বেশ পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আমি—ফুলেদের কাছে পত্র বিলি করে বেড়াচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে গজর গজর—তার মুখে খই ফুটছে ত ফুটছে অনবরত। কর্ত্তব্য না হাতি! যত সব ইয়ে।

"হুঁ, এর বেশী আর নেই বুঝি আজ"—মৌমাছিটা বল্লে সুর করে—"হ্যাঁ, হ্যাঁ রেণুর কথাই বলছি, কি হল?"

তারপর একটা খরগোস পা' গুটিয়ে নিজের লেজের ওপর উঠল বসে; আঙুল দিয়ে চুমরে নিলে তার গোঁফজোড়াটা দু'পাশে। তারপর তুলল হাই! হাই আর হাই; খালি হাই। একবার নয়, দু'বার নয়—বারেবার তিনবার।

কোলাব্যাঙটারও পেট উঠল ফুলে। তার গর্জ্জন আবার কি রকম! আর এমনই নাকের ডাক যে ঘাসের ফাঁকের মাক'শার জাল কেঁপে উঠছে বারবার থরথরিয়ে।

—"মাথাটা একটু কাৎ করে দাও লক্ষীটি"—

ঘুমছায়া-ছায়াঘুম

পূর্ণেন্দু সেন

নাঃ, বুড়োটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বলি কোথায় আমার ঘুম যে মাথাটা আমি কাৎ করব? দেখ্‌ছ নাকো, আমি দেখছি ঃ চাঁদামামাকে বুড়ি রেখে তারারা খেলছে লুকোচুরি আর কইছে কথা ফিসফিস করে আকাশে আকাশে। আর জোনাকিরা জ্বালিয়েছে হলদে শিখার পিদীম মিশ্‌মিশে অন্ধকারে। বললাম তাই—

—বুড়োমশাই ঘুম যে আমার আসচে না।

এরপর সে অনেক কষ্টে তার নীল চোখদুটো খুলতে পারলো। আমার দিকে চেয়ে বল্লে একটু মুচকে হেসে—

"ঢুলুনি, ঘুমকাতুরে, আর ঘুমপাড়ানি গান"।

না এবার সত্যি ক্ষেপতে হল। বললাম—তুমি কোথাকার একটা ধেড়ে বোকারাম পোকায়-খাওয়া, প্যান্‌পেনে আর অকম্মার ধাড়ি। বলছি না—ঘুম আমার আসছে না—আসছে না, আসছে না। হ'ল? কথাটা গেল কানে?

আবার সেই জড়ানে সুরে—নেশায় পেল বুঝি, মাথাটা কাৎ কর, আর কেবল ঝিমোও।—

এ যেন খোকার কাছে ঠাকু'মার ঘুমপাড়ানি গান। যেমনি বিশ্রী তেমনি ঢিমে তেতালা; পাগল করবে শেষে?

ক্লান্ত পৃথিবী চারপাশে পড়ছে ঘুমিয়ে। মৌমাছিটাও গা ঢাকা দিয়েছে অনেকক্ষন। খরগোসটা ত বুনো গোলাপটায় হেলান দিয়ে পাকা ধানের স্বপ্ন দেখছে চোখভরে। এ সবই আমি দেখতে পাচ্ছি সেই দৃষ্টি দিয়ে যে দৃষ্টিতে নেই মায়া, নেই মমতা কোন। এইমাত্র একটা দুষ্টু পরীকে—দেখতে পেলাম—পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল অন্ধকার কূয়োর নীচে। সে ঘুমুবে সেখানে শুঁয়োপোকাদের সঙ্গে। আর জালের ভেতর মাক'শারও চোখ ভারী হয়ে এল ক্রমশঃ।
—অসহ্য—একেবারে কুঁকড়ে-উঠা অসহ্য। "আমি যে কিছুতে ঘুমুতে পারছি না"—শেষ পর্য্যন্ত পারলাম না না বলে!

এবার সে উঠল—সেই বুড়োটা। আলিস্যি ভেঙ্গে, গা মোঁড়া দিয়ে হাসল সে একটু মুচকে। তারপর এগিয়ে এল সে সেই—সেই ঝোপের মাঝের ফাঁকটার দিকে। বিচিত্র তার অঙ্গভঙ্গী—যেন কোমরভাঙ্গা ভাল্লুক।—

আস্তে সে ডাকল আমায়।—

তারপরই বাতাসে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এল দূরাগত এক ঘণ্টার ধ্বনি। একটা কেন, বোধ হয় দুটো। উঁহু দুটোও নয়। শত শত আওয়াজ কাঁপছে যে—

ডিং লিং—টিং লিং—ডিং লিং * * *

বাতাসের পরতে উঠল থরথরিয়ে ঘণ্টার রুপোলি আওয়াজ।

বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি—এবার ছায়ারা আসছে এগিয়ে। হ্যাঁ নিশ্চয়, ছায়ারাই ত—ঘুমের দেশের ছায়ারা। আর ঐ যে ঐ বুড়ো লোকটা—ওর কাজই ত হ'ল ছায়াদের তাড়িয়ে বেড়ান, পরদার মত কাঁপিয়ে বেড়ান। আর সেইগুলোকে গোনা—এক-দুই-তিন করে পরপর গোনা। প্রথম ছায়াটা পিছলে এগিয়ে এল। বললাম,—এই যে, এক নম্বর স্যাঙাৎ যে।

ছায়াটা গম্ভীরভাবে দোলাল মাথা সামনে। বলল—গল্পটা যদিও সাধারণ, তবুও কিন্তু বেশ করুণ, শুনবে না কি ?

পালাও, পালাও—চেঁচিয়ে উঠলাম আমি—সরে পড় শীগ্গীর, কোথাকার পাজী পেজোমি করতে এল।

"আমি ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতাম"—সে ভয় না পেয়ে বলে চল্‌ল—"শকুন্তলার পেছন পেছন। এই যে চুল দেখতে পাচ্ছ আমার—এই চুল একদিন অরণ্যের মত কালো ছিল, কালো ছিল আমাবশ্যের মত। হ্যাঁ, ভালকথা—আমাবশ্যে কি তা তো জানো ? যখন গোধূলি আসত ঘনিয়ে, যখন দেবশিশুদের জন্য শেফালি আর শিউলি গাছের নরম কোলে শাদা বিছানা পাতা হত, আর যখন জটেবুড়ি তার কালো বেড়ালের উপর বসে ছিড়ত রাজহাঁসের পাখনা থেকে একটা করে পালক, তখন আমি পড়তাম গলে গলে। সুন্দর মেয়ে ছিল আমাদের এই শকুন্তলা। যখন সে তার হরিণছানার সাথে সাথে দৌড়ে যেত আমি যেতাম তার পেছন পেছন। আশ্রমের পাঠ সাঙ্গ হলে সে খেত মিহিদানা, সন্দেশ, শোনপাঁপড়ি—

উঁহু, শোনপাঁপড়ি নয়, জলপদ্মের পাঁপড়ি—আমি ভুল শুধরে দিলাম ছায়ার।

"আহা! শোনই না, খেত সে শোনপাঁপড়ি। আচ্ছা যাক, তুমি কি বিরক্ত হ'লে ? আমি তাহলে উঠি এবার। হ্যাঁ, আরেকটা কথা—তুমি কি ছোটদের ভালবাসো, না—ভালবাস গদ্য কবিতা ? আমার ত বোম্বাই আমই ভাল লাগে। নাঃ তোমার এবার সত্যিই ঘুম আসছে"—ছায়াটা জড়ান স্বরে বললে—"এবার আমি যাই।"

—হুঁ, হুঁ, এখুনি বেরোও তুমি—রেগে গিয়ে বল্‌লাম আমি—কে তোমায় থাকতে বলেছে ?

"আর সত্যি কথা কি জান"—সে আবার সুরু করলে তার কাহিনী—"আমি ছিলাম একটু দলছাড়া গোছের। যে-ই আমায় দেখতো সেই হেসে হ'ত অস্থির, লুটোপুটি খেত

হাসবার বেলায়। বাঁকাচোরা, মোটকা-বেঁটে—সে যে কত রকম মূর্ত্তি ধরতাম তখন দেখতে যদি একবার।"

কি রকম কি রকম, কি করে রূপ বদলাতে তুমি ?—জিগেস করলাম তাকে।

"আহা অত বেশী অস্থির হলে কি চলে ? আর সত্যি, বলিই বা তোমায় কি করে। ব্যবসার গুপ্ত মন্ত্র কাউকে কি জানানো যায় ? তবে একটা কথা শোন বলি—সেই শাদা দাড়ীওলা মুনি ঠাকুরটী ....."

—ওঃ তাহলে—আমি ব্যঙ্গ করেই বলি—একজন সন্ন্যাসী ঠাকুরও ছিলেন, বল !

"আহা, সে কী অত্যাচার। উঃ, সে অত্যাচার তো নয়, যেন ভীমরুলের ঝাঁক।

এই বলছ অত্যাচার, এই বলছ সন্ন্যাসী, বলি তোমার মাথায় গুবরে পোকা না ঝিঁঝিঁ পোকার বাসা—

আমি রাগ সামলাতে না পেরে মারি ছুড়ে এক ঢিল ছায়াটার দিকে।—বিটকেল বাট-কুলে ছায়া কোথাকার। ভাগো এখান থেকে, ভাগো। কি দাঁড়িয়ে রইলে যে ? আহ্লাদ তো ধরে না—দাও পাঠিয়ে দাও তোমার চেলাগুলোকে। কি একঘেয়ে গল্পই না করতে পার তোমার, উঃ।

"আমরা সবাই একই দলের"—বললে ছায়া—"মেয়েটা নিতান্তই বোকা ছিল, যেমন সব মেয়েই হয়ে থাকে। একবার দীপালির রাত্রে আমায় না দেখতে পেয়ে সে কী কান্না তার ! অথচ আমি ঠিক তার পেছনেই ছিলাম। হ্যাঁ, দেখ একটা বিস্কুট খাবে কি ? কিংবা হ্যাপি বয় ?"

দেখ—বললাম আমি—সহ্য করেছি আমি ঢের, আর কিছুতেই নয়। তোমার প্রলাপ শুনতে ত আমি আসিনি, এসেছি আমি ঘুমুতে। বিস্কুট ত নয়ই তবে হ্যাপি বয়ের কথা আলাদা। আচ্ছা অনেক তো বাজে বকলে, এবার বল তো কি করে মিষ্টি একটা লম্বা ঘুম দেওয়া যায় ?—

"ঘুমছায়া-ছায়াঘুম"—বললে ছায়া বিড়বিড় করে—"ভাবতে থাক একটা শূন্য, গুন কর তাকে তিনবার ; যে সংখ্যাটা হল, তার প্রথমটা বাদ দিয়ে শূন্য দিয়ে ভাগ কর আধা-আধি। এবার বল ত বাকী থাকে কি ?"

বাকী যা থাকে তা তোমার মাথা আর মুণ্ডু—ক্ষেপে গিয়ে বললাম আমি।

"কিন্তু শকুন্তলা ত ক্ষেপেন নি কখনো, তোমায় ত আমি বলেছিই আগে"

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলেছই তো, একশোবার বলেছ, হাজারবার বলেছ, কান যে আমার পচে গেল শুনে শুনে।—আমি আর কিছুতেই সহ্য করব না।

অস্থির হয়ে ছায়া জবাব দিলে এবার—"লক্ষ বার আমি এই গল্পটাই লক্ষ লোককে শুনিয়েছি; আর দেখেছি ভালই লাগে তাদের শুনতে। আর শুনতে শুনতে তারা চোখ বোজে ঘুমের কোলে। কত লোকেই ত পারে না ঘুমুতে; কিন্তু সব ঠাণ্ডা—সব ঠাণ্ডা শুধু আমার কাছে। ঐ এক গল্পতেই সব কুপোকাৎ।—জানো?"

হতাশ হয়ে আমি চীৎকার করে উঠলাম এবার—কশাই কোথাকার, পাশণ্ড।

সে শুধু এবার একটু হাসল, হাসল আর একচোখ টিপে বলল: "সকাল বেলায় গরম চা আর হালুয়া"—এই কথাটা বল্‌তে বল্‌তে হাজার লোককে আমি ঘুমুতে দেখেছি,—দেখেছি তাদের নরম বিছানায় ঝিমিয়ে পড়তে।

তুমিই কি একটীমাত্র ছায়া, আর কি কেউই নেই?—শুধোলাম আমি তাকে।

উত্তর এল: দ্বিতীয় ছায়া হচ্ছে বুড়ো বটের মোটকা ছায়া। অনেক দিনের প্রাচীন হলেও সে কত রঙ্গই না জানে।

"আচ্ছা"—আমি জিজ্ঞেস করি—"তুমি গেলেই ত অন্য ছায়ারা আসবে, তুমি যাচ্ছ না কেন তবে?"

'আর তিন নম্বর হচ্ছে'—সে এবার জুৎ করে বসে বললে—'চাঁদের চোখের আয়নায় ধ্রুবতারার নীলচে ছায়া'

—আমার ত মনে হয় ধ্রুবতারা নয়কো, সপ্তর্ষির সাতটা খয়েরি ছায়া বোধ হয় ওটা—আমি বললাম। আমার গলার স্বরটা যেন অনেক—অনেক মাইল দূরের মনে হল।—আমি কি ঘুমিয়ে পড়ছি নাকি?

"ছায়াটা প্রথমে থাকে ঝাপসা, আর রাতের প্রহর যতই যায় গড়িয়ে ভোরের গুহার দিকে ততই তার রঙটা থাকে খুলতে। সাতটা রঙের ভারী অদ্ভুত এই রূপ বদলানোটা। কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালী মেজাজ এই রকমই—অসম্ভবও হয় সম্ভব।"

বুঝতে পারলাম মাথাটা আমার কাৎ হচ্ছে, চোখ দুটো আসছে বুজে। মনে হচ্ছে ছায়াটা যেন অনেক অনেক দূরে—অস্পষ্ট। তবুও আমি বলতে চেষ্টা করলাম:

আরে কখনও তাই কি হয়, তাই কি হয়—হয়!

তারপর, ছায়ায় গাল দুটো হঠাৎ উঠল ফুলে, ফুলে উঠে তক্ষুণি আবার তুবড়ে গেল ফলের খোসার মত।

ঘুমছায়া-ছায়াঘুম

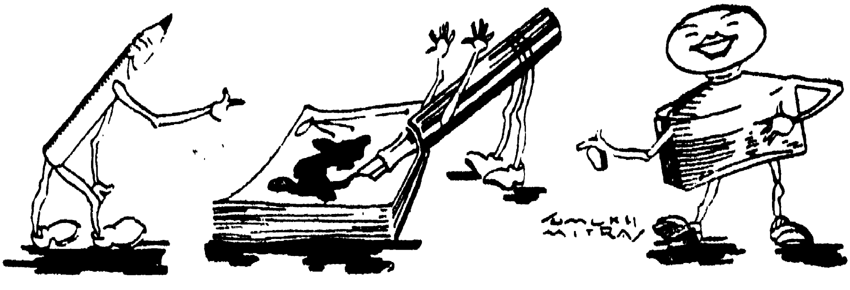
পূর্ণেন্দু সেন

মাথাটা আমার আরেকটু হ'ল কাৎ।

বললাম—ফুঃ, কি করে মনে রাখব যা—যা বললে তুমি, তুমি। কি করে·········?

চারিধারের মাঠে তারপরেই এক ঝলক মিষ্টি গরম বাতাস গেল বয়ে। আর কি নরম, কি আরাম সেটার ভেতর। আর আমি দেখতে পেলাম ছায়াটা যাচ্ছে মিলিয়ে আস্তে আস্তে। আর লোকটা—সেই বুড়োটা—কি যেন কি বললে আমায়। আর তারপর—তারপরেই লক্ষ লক্ষ ছায়া আসতে লাগল পিছলে, আর মিলিয়ে যেতে লাগল ক্রমেই। একের পিছন আরেকজন লাগল যেতে পায়ে পায়ে—দুই, পাঁচ, সাত এগারো·········নাঃ, আর পারছি না, পড়ছে না আর কিছু মনে। কাল-পেঁচা আর রাতবাদুড়ের ডানার পালক বেয়ে অন্ধকার পড়ছে চুঁইয়ে, অন্ধকার পড়ছে ভিজে আমার চোখের পাতায়, আমার চারিপাশে, আমার নাকে মুখে চুলে। বুঝতে পারছি, আমি পড়ছি ঘুমিয়ে। আর দেরী নেই। এই নামল বলে। এইবার নিশ্চয় এইবার। আমি পড়ছি ঘুমিয়ে। আর একটুখানি। আমি সত্যি পড়লাম ঘুমিয়ে—ঘুমিয়ে * * * *

(কোন বিদেশী গল্পের সামান্য অংশ অবলম্বনে



ঠাট্টা

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি. এ.

সকাল সবে আট্‌টা ঃ
উঃ ! এ' কে বেজায় জোরে মার্‌লে আমায় গাঁট্টা ?
চমকে উঠে' চেয়ে দেখি,
সেজ-কাকা দাঁড়িয়ে একি !
আমায় দেখে' হেসে' বলেন,—"ও কিছু নয়; ঠাট্টা !"
মাথার মাঝে আলু ফলে, এম্‌নি মজার গাঁট্টা !!

দুপুর যখন গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হ'য়ে আসে ঃ
ঠাণ্ডা জল কানে ঢেলে' সেজ-কাকা হাসে !
যতই বক্ কাঁদো যতই ;
সেজ-কাকা আগের মতই,
মুচ্‌কি হেসে দাঁত দেখিয়ে আহ্লাদেতে ভাসে ঃ
দুপুর যখন গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হ'য়ে আসে।

রাত্রে যখন এক্‌লা বসে' জিয়োমেট্রি পড়্‌ছি,
মাথার ঘাম ঝর্‌ছে পায়ে—এক্‌স্ট্রাগুলো কর্‌ছি।
কামড় লাগায় মশাগুলো,
খাতার পাতা এলোমেলো,
সেজ-কাকার গানের জ্বালায়, এক্কেবারে মর্‌ছি ;
জিয়োমেট্রি পড়্‌ছি আর এক্‌স্ট্রা যখন কর্‌ছি।

* * * *

হঠাৎ সেদিন—ভুল্‌ব না ভাই, অমন মজার রাতটা।
বেজায় কাদায় ভরা ছিল, খেলা শেষের মাঠ্‌টা।
আম্‌রা সবাই হলুম অবাক্,
সেজ-কাকা পড়্‌ল বেবাক্,
নির্ব্বিবাদী চীনের গায়ে ঃ—সন্ধ্যে তখন আট্‌টা,
চীনের দিকে হেসে' বলি, "ও কিছু নয়, ঠাট্টা।"



দুয়ে দুয়ে শূন্য

সুকুমার দে সরকার

পাল তোলা মেঘ নীল সাগর থেকে উঠে নীল আকাশে ভেসে পড়েছে, আমরা পাল্লা দিচ্ছি তার সঙ্গে। কাশ বনে ঢেউ তুলে হাওয়া তাড়া করেছে আমাদের পিছনে, দু'পাশে সোণালী সবুজ ধানের ক্ষেত। অনেক দূরে খেলাঘরের রেলগাড়ীর মত একটা ট্রেণ পাগলা মোষের মত ঝাঁকুনী খেতে খেতে ছুটে চলে গেল, ডোবার ওপর একটা শরের ডগার বসে একটা দোয়েল টুপ টুপ করে লেজ দোলাচ্ছে। আমরা ফিণ ফিণ করে ছুটে চলেছি। আমাদের পেছনে পড়ে রইল কত আঁকা বাঁকা খাল, কত লতা ঢাকা একশো বছরের বটের ছায়া আমরা পেছনে ফেলে এলাম, কত—হাজার বছরের—বাঁশের গরুর গাড়ী ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে কাঁচা রাস্তায় সবেগ মন্থর গতিতে চলতে চলতে অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমাদের দিকে কত রাখাল ছেলের মেঠো গান ধূলোয় ঢাকা দিয়ে আমরা এগিয়ে এলাম—হাজার হাজার বছরের আমাদের শান্ত গ্রাম—আমাদের গতির ঢেউ লাগল না তাদের মনে। হ্যাঁ লেগেছিল—একটা গরুর হঠাৎ কি খেয়াল হোল আমাদের দেখে, লেজটা শূন্যে তুলে দিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মারল ছুট পশ্চিমের পানে। পশ্চিম আকাশে তখন কালচে লালের রেখা পড়েছে, তারও নীচে ধূসর।

আমরা সাইক্ল-টুরে বেরিয়েছি! পূজোর ছুটি।

পটু বলল—পা'দুটো ঠিক সীসের মত ভারী হয়ে গেছে, কাছাকাছি গাঁ আর কতদূর?

—কাছেই হবে, গরু চরছে দেখতে পাচ্ছিস না? বলল রমি।

রমির দিকে চেয়ে পটু বলল—গরু ত আমার পাশে পাশেই চলছে অনেকক্ষণ থেকে।

পটুর পাশাপাশি যাচ্ছিল রমি।

—চলছে ত বলিনি, চরছে

—ওই চরতে গেলেই চলতে হয়। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চরতে পারিস ?

ওপাশ থেকে লালমণি বলল—কিন্তু গাঁয়ে পৌঁছলেই বা কি হবে ?

—কেন ?

—আমি সীটের সঙ্গে আটকে গেছি

—সে কিরে ?

—হঁ্যা! তোরা আমাকে নামিয়ে নিয়ে সাইকেল শুদ্ধ শুইয়ে দিস।

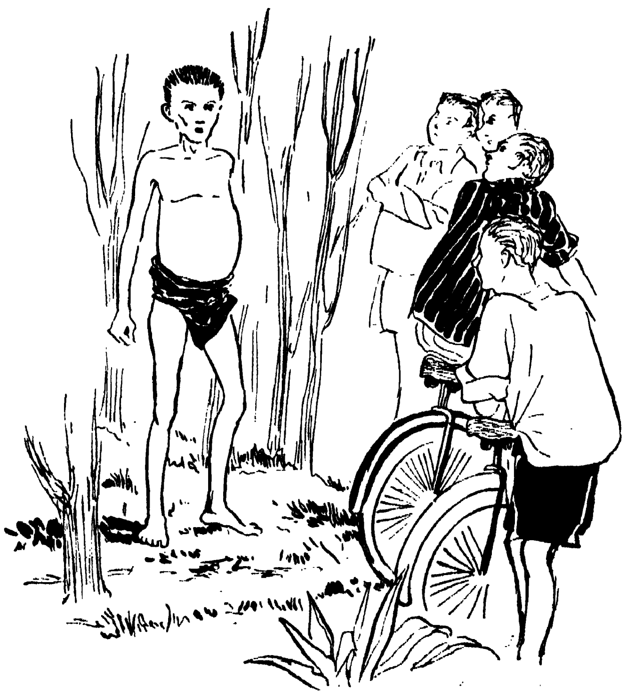
পটু আমার দিকে চেয়ে বলল ওই দোল গোবিন্দ তোর সীটের নীচে একটা চাট মারলেই, সীট থেকে ছেড়ে ছিটকে পড়বি, দেখতে হবে না।

আমার নাম গোবিন্দ, ছেলে বেলায় মা কোন দিন ভুলিয়েছিল কিনা জানি না, এরা নামের আগে বিশেষণ যোগ করার সময় কেউ সে খোঁজ নিয়েছিল কিনা তা'তেও আমার সন্দেহ আছে কিন্তু সকলের এক-মতে, উপায়ের অভাবে নির্ব্বিবাদে হয়ে গেছি দোল গোবিন্দ। ভবি-তব্যকে স্বীকার করাই ভাল।

সামনের মাঠে খানিকটা দূরে একটাছেলে একপাল গরু নিয়ে ফি রছিল আমি তাকে ডাকলাম—হুই!

গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই মেঠো ডাকটা আমরা আয়ত্ত করে নিয়ে-ছিলাম।

ছেলেটা এল মাঠ পার হয়ে পথের ওপর। আমাদেরই বয়সী হবে কিন্তু চেহারাটা দেখবার মতন লিকলিকে সরু সরু হাত পা, পরণে একটা নেংটী আর উদরের পরিধিটা বিশাল



তবু একবার চাঁদ বদনে বল—

—কি কও কর্ত্তা ?

—সামনের গাঁয়ের নাম কি রে ?

—নাম ? জাননা ?

—জানলে কি মস্করা করছি ?

—সোনারং কয়

—কয় ?

—উঁ

—এখান থেকে কতদূর আর ?

—দূর ? জাননা ?

—খুব জানি, তবু একবার চাঁদবদনে বল।

—এই এক পোয়া পথ

—এক পোয়া !

—উঁ

পটু বলল—পথ কি দুধ ?

রমি বলল—পথ কি তেল ?

—পথ কি গুড় ? বলল লালমণি

—আধ সের নয়ত ? আমি জিগেস করলাম

পটু বলল—ওরে ওর ভুঁড়িটা দেখেছিস ? রোজ একপোয়া পথ খেয়ে খেয়ে করেছে।

ছেলেটা হঠাৎ মাঠের দিকে টেনে ছুট মারল আর যেতে যেতে আমাদের উদ্দেশে যে কথাটা বলে গেল সেটা এখানে না বলাই ভাল।

সোনারঙে আমরা যখন ঢুকলাম তখন সূয্যি ডুবে গেছে, পথে অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে আসছে আর আকাশের ছায়াপথে অজস্র তারার বাতি জ্বলে উঠছে। একটা বাড়ীর দরজায় এসে আমরা কড়া নাড়লাম। দূরে একটা ঝোপে অজস্র জোনাকী চিক চিক করছে। ভিতর থেকে সাড়া এল—কে ও ?

—আজ্ঞে আমরা

—আমরা ?

—হ্যাঁ আমরা

"—তবে ত ধন্য হয়ে গেলুম" বলতে বলতে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়াল। আমাদের সাইকেলের বাতি না থাকলে অন্ধকারে তাকে দেখতেই পেতাম না কারণ বুড়ো অন্ধকারের চেয়েও কালো।

—কি চাই বাপু?

—আজ্ঞে আজকের রাতটা আমরা আপনার এখানে থেকে যেতে চাই।

—ওঃ এই সামান্য কথা? আর কি চাই? কিছু খাবে দাবে না?

—নিশ্চই নিশ্চই, আমরা সমস্বরে গেয়ে উঠলাম।

—লুচী, পাঠা, পুকুরে জাল দিলে দুটো পঁচিশ-সেরী কাৎলাও উঠতে পারে

পটু বলল—আর গাঁয়ে নিশ্চয় দই পাওয়া যায়—

—খুব খুব

"—আর পান্তুয়া কিছু" লালমণি বলল "বেশী নয় ছ'টা করে তা আর বেশী কি?"

—কিচ্ছু না কিচ্ছু না

রমি আমার কাণে কাণে বলল, বুড়ো খুব মাই ডিয়ার আছে না রে?

আর বুড়ো গর্জ্জে উঠল—তোমরা কে হে বাপু? হঠাৎ যেন ট্রেণ চলতে চলতে হল কলিশন।

আমি জবাব দিলাম—আজ্ঞে আমরা টুরিষ্ট

—কি?

—টুরিষ্ট



ভাগো ভাগো সব স্বদেশী ডাকাত—

—ডেঁপো ছোকরা আবার ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে?

—কই আমি ত······

—আমিও টুরিষ্ট, বুঝেছ ছোকরা, দুটো রিষ্ট আমারও আছে আর আমার রিষ্ট দুটো

তোমাদের থেকে অনেক চওড়া। আর আমার ছুটো রিষ্ট ছাড়া আরও ছুটো জিনিস আছে। ছুটো কুকুর, বুঝেছ? ভাগো ভাগো সব স্বদেশী ডাকাত!

বুড়ো সশব্দে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল। বাংলার লোক না কি অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণ। কিন্তু সোনারঙে আমারা দেখেছিলাম উল্টো কিন্তু তা বলে আমরা অন্যান্য গ্রাম সম্বন্ধে হতাশ হইনি। একটা নিয়মের ব্যতিক্রম নিয়মের নিয়মত্বই প্রমাণ করে। সোনারং ছিল একটা ব্যতিক্রম। প্রায় গ্রামের ঘরে ঘরেই সেই একই ব্যাপার—কেউ থাকতে দিতে রাজী নয় এবং শেষ পর্য্যন্ত খোঁজ নিয়ে জানা গেল গাঁয়ের জমিদার বাড়ীটা অনেক দিনের পোড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেখানে ইচ্ছে করলে আমরা গিয়ে থাকতে পারি। বাড়ীটা সম্বন্ধে যদিও অনেক অপবাদ আছে তবে স্বদেশী ডাকাতদের আবার প্রাণের মায়া কি?

সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ ভেঙ্গে পড়ছিল, আমরা নিরুপায় হয়ে ঠিক করলাম ওই ভূতের বাড়ীতেই থাকা যাবে, নেহাৎ একা ত নয় আমরা, চারজন একসঙ্গে আছি, তার পরে যা থাকে কপালে! মানুষের আতিথেয়তা ত দেখা গেল, এবার দেখা যাক ভূতের।

অন্ধকার ঠেলে জমিদার বাড়ী এসে যখন আমরা উঠলাম তখন রাত গাঢ় হয়েছে। দূরে কোথায় একদল শেয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ীর ভাঙ্গা সিংদরজা দিয়ে ভেতরে পা দিয়েই গাটা ছম ছম করে উঠল। ঠাণ্ডা একটা শ্যাওলার গন্ধ।

রমি বলল—ও ভাই!

—কি রে?

—ভয় করছে

—দূর ভয় কি? বলতে বলতে আমরা চারজনে আরও গা ঘেঁসাঘেসি করে এলাম। সঙ্গে সম্বল চারটে সাইকেলের বাতি।

নীচেটা এত ঠাণ্ডা আর এত অন্ধকার প্রতি পদেই যেন মনে হয় ঘরের কোণগুলোতে কারা সব লুকিয়ে আছে অদৃশ্য সব জীব। আমরা সোজা ওপরে উঠে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, ঘরগুলো সেকেলে নীচু নীচু, তার চারপাশ ঘিরে গাঢ় অন্ধকার নিঃশব্দে গোলমাল সুরু করেছে। আমাদের বাতির আলোর রেখাগুলোকে দেখে সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার যেন অট্টহাসি হেসে উঠল। ক্লান্ত শরীরে সামনে যে ঘরটা পেলাম সেটাতেই ঢুকে পড়লাম—ধূলোয় ভরা নিরাভরণ ঘর। কোনো রকমে মেঝের খানিকটা ধূলো ঝেড়ে আমরা সেখানেই শুয়ে পড়লাম—ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুম এসে আমাদের সব অভিযোগ দূর করে দিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না. হঠাৎ পটুর চেঁচামেচীতে ঘুম ভেঙ্গে গেল—কে আমায় লাথি মারল, ওরে বাবা

সঙ্গে সঙ্গে লালমণিও চেঁচিয়ে উঠল—আমাকেও আমাকেও !

রমিও চেঁচাতে সুরু করল—আমাকেও মেরেছে ও বাবারে !

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। সাইকেলের বাতিগুলো নিভে এসেছে। সেই স্তিমিত অন্ধকারে দেখি পটু চোখ বুঝিয়ে চেঁচাচ্ছে আর দুম দাম করে হাত পা ছুঁড়ছে। কখনও লাথি পড়ছে রমির গায়ে কখনও লালমণির গায়ে। আমি বললাম—এই পটু কি হচ্ছে কি ?

সোঁ সোঁ করে একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকল, হুড়মুড় করে ঘরের একটা জানলা ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেল। সঙ্গীরা তখন উঠে বসেছে। হঠাৎ নীচে থেকে একটা শব্দ হল—হুম্! উঁ!

আমাদের মুখে আর কথা নেই, কাছাকাছি ঘেঁসে বসেছি।

রমি বলল—ও কি ?

আবার শব্দ হল—হুম্ হুঁ উঁ! আর মনে হল শব্দটা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। সিড়িতে কার পায়ের আওয়াজ বেজে উঠল দুম দুম করে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—কে ?

কোন সাড়া নেই।

আর সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

এক একটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা নিস্তরঙ্গ যুগ, আমরা কাঁপছি। ঘরের দরজায় আবির্ভাব হল এক সাদা মূর্ত্তির। অন্ধকারে মূর্ত্তিটার সাদা রেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

—হুম্

আমার গলা দিয়ে কোন মতে বার হল—কে ?

—ভূত

—কি করছ তুমি এখানে ?

—ভয় দেখাচ্ছি

—কেন আমরা কি করেছি ?

—কিছু না

—তবে ?

—ভূত ভয় দেখাবে না ? হুম ! হি হি হি হি !
মূর্ত্তিটা ঘরের মধ্যে এক পা বাড়াল ।
—আর এগিও না ।” আমি বললাম



দাঁতে দাঁতে তখন ঠোকাঠুকি হচ্ছে····

—কেন ?
—কামড়ে দেব
ওদিকে আমার দাঁতে দাঁতে তখন ঠোকাঠুকি হচ্ছে ।

—কামড়ে দেবে ?

—হুঁ

—তোমার দাঁতে ধার আছে ?

—ভীষণ

—তবে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে কেন ?

—ও কিছু নয়, ক্ষিধে পেয়েছে বলে

—ক্ষিধে পেয়েছে ? এতক্ষণ বলনি কেন ?

মূর্ত্তিটা হঠাৎ যেন উবে গেল। বাইরে ঘন অন্ধকার।

আর পাঁচ মিনিট পরে ঢুম করে একটা পুঁটলি পড়ল। খুলে দেখি পুঁটলিতে একরাশ মুড়ি আর নারকেল। খাবার দেখে ক্ষিধেয় আমাদের পেট আবার জ্বলে উঠল কিন্তু বুক তখনও দুর দুর করে কাঁপছে। খাব কি না ভাবছি হঠাৎ দরজার পাশ থেকে গলা শোনা গেল—খেয়ে নাও বলছি! কড়া গলা।

আমরা চটপট খেতে লেগে গেলাম—কি জানি ভূতকে সন্তুষ্ট করাই ভাল।

মুড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি চুপি চুপি সঙ্গীদের বললাম—বেশ ভাল ভূত না রে ?

পটু বলল—চলে গেল নাকি ?

আমাদের তখন একটু সাহস ফিরে এসেছে। যে ভূত খেতে দেয় সে নিশ্চয় কোন অনিষ্ট করবে না। আমি সাড়া দিলাম—ইয়ে! ও ইয়ে………

সাদা মূর্ত্তিটার একটুখানি দেখা গেল দরজায়।

—ইয়ে কি ? চালাকী হচ্ছে আমার সঙ্গে ? নাম ধরে ডাকতে পার না ?

—নাম কি ?

—কি আবার ? ভুত !

—ও! তা ভাই ভুত তুমি কি করছ ?

—ছুরী শান দিচ্ছি

বুকের মধ্যে রক্ত চমকে উঠল।

—ছুরী কেন ?

—তোমাদের কাটতে হবে না ? খাইয়ে দাইয়ে পাঁঠা মোটা করলাম এবার বলি দিতে হবে।

কি বলা যায় ভাবছি কারণ ওর সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলতে পারি ততক্ষণই আমাদের জীবনের আশা। কোন রকমে পূব আকাশ একবার ফর্সা হলেই জানি ভূত আর থাকতে পারবে না। কিন্তু এখন ও ছুরী শানাচ্ছে।

পটু হঠাৎ বলে উঠল—ছুরী কেন? ঘাড় মটকাতে ভুলে গেছ বুঝি?

মূর্ত্তিটা বোধ হয় এক মুহূর্ত্ত কি ভাবল তারপরে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে এল—ঘাড় মটকান বড় গোলমেলে, তার চেয়ে ছোরা দিয়ে গলার নীচে—কুচ! চমৎকার!

রমি বলল—কেন আমরা কি করেছি?

জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। আমি পূবের দিকে তাকালাম, ভোর হতে আর দেরী নেই।

মূর্ত্তিটা বলল—কিচ্ছু করনি

—শুধু শুধু তুমি আমাদের মারবে?

আমি বললাম—ভেবে দেখ আমাদের মারলে আমাদের মা কাঁদবে, বাবা কাঁদবে, দাদা কাঁদবে, বৌদি কাঁদবে, বৌদির দিদি কাঁদবে আর শাশুড়ী কাঁদবে, তার ছেলে কাঁদবে তার শালা কাঁদবে·· ·····

পটু সুরু করল—আর ঝণ্টু আমার সাইকেলটা নিয়ে নেবে কাঁদতে কাঁদতে,

—ঝণ্টু কে?

—আমার ছোট ভাই

—আর মণ্টু আমার ফউণ্টেন পেনটা নিয়ে নেবে আর আর...আমি আবার চালালাম—আর আমার কুকুরটা কাঁদবে তার ছানাগুলো কাঁদবে, আমাদের ফুটবল ক্লাব কাঁদবে, ফুটবলটা কাদবে, মাঠ কাঁদবে, কলেজ কাঁদবে·········

হঠাৎ মূর্ত্তিটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ওরে আমার সোনাতন রে—এ—এ

—কি হল কি হল? সোনাতন বুঝি তোমার ছেলে? মরে গেছে বুঝি?

—না সোনাতন আমার ছাগল, তাকে খেয়ে ফেলেছি।

—ঘাড় মটকে?

—না কেটে! ওরে আমার সোনাতন রে—এ—এ

—দেখ তা হলে আমাদেরও কেটে তুমি শুদ্ধ কাঁদবে

—হুঁ তাইত দেখছি

—তাহলে ভাই ভূত তুমি আমাদের ছেড়ে দেবে ত?

—না

—ছাড়বে না ?

—না

—কিছুতেই না ?

—"উঁ" ভুতটা একটু ভেবে বলল "ছাড়তে পারি যদি তোমরা একটা প্রশ্ন বলতে পার।"

প্রাণে একটু আশা এল। পূবেও দেখি একটু বুঝি আলোর ছোঁয়া লেগেছে।

—কি প্রশ্ন ?

—দুয়ে দুয়ে কত ?

ওঃ এই, ভেবেছিলাম না জানি কি ভুতুড়ে প্রশ্নই না হবে! বেঁচে গেলাম এবার।

বললাম —দুয়ে দুয়ে চার

ভুতটা মাথা নাড়ল—হল না।

আমরা চারজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম —হল না মানে ?

দুয়ে দুয়ে চার ত সবাই জানে।

—না

—তবে কত ?

—শূন্য

—দুয়ে দুয়ে যোগ করলে শূন্য হয় ?

—যোগ করতে বলেছে কে ?

—তবে কি করতে বলেছ ?

—বিয়োগ! নাও তৈরী হও আমার ছোরা শানান হয়ে গেছে।

আমরা এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠলাম—কে আছ বাঁচাও মেরে ফেল্লে..........

কোথায় দূরে একটা মুরগী তারস্বরে চীৎকার করে উঠল, পূব আকাশে ধূসর আলোর ছোঁয়াচ লেগেছে।

আমি বলে উঠলাম—চুপ চুপ

—সবাই জিগেস করল—কেন ? কেন ?

—ভুতটা আর আমাদের মারতে পারবে না

মুন্টিটা তাড়াতাড়ি জিগেস করল—কেন ?

—ভোর হয়ে গেছে, সকাল হলে কি ভুতে কিছু করতে পারে ?

—ভোর হয়ে গেছে ? ভুত জিগেস করল।

—হ্যাঁ ওই দেখ না আলো আর ওই শোন রগী ডাকছে।

—তবে বড় বেঁচে গেছ।

ভুতটা তখনও অন্ধকারই ঘরের মধ্যে থেকে হুম হুম করতে করতে নীচে নেমে গেল। আর আমরা প্রায় তার পেছনে মরি কি বাঁচি না ভেবে প্রাণপণে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি সামনে সেই সাদা মূর্ত্তি এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরে অনেক লোক জড় হয়েছে, বোধ হয় আমাদের চীৎকারে।

আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম ভূত! ভুত!

একদল লোক জিজ্ঞাস করল—কই ?

—ওই যে সামনে।

—ও ত পাগলা হরিদাস!

—অ্যাঁ পাগল ?

—একদম।

দেখি আপাদমস্তক গায়ে কাপড় জড়িয়ে পাগলা হরিদাস গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে "হরি বল মন রসনা...... ।"

সকাল হয়ে গেছে। ধানের ক্ষেতে সোনালী রোদ উঠেছে, আমরা পেছনে ফেলে এসেছি সোনারং। আকাশের মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে একটা পাখী ডাকছে—কুক্ কুক্! শঙ্খচীল উড়ছে আকাশে। জলার ধারে ধার্ম্মিক বক নিথর পাথরের মত বসে আছে। চিক চিক করছে সবুজ ঘাসের মধ্যে একটুখানি রুপালী জল। আমরা সব পেছনে ফেলে চলেছি। সামনে আমাদের ডাকছে, সামনের রহস্যময় আবছা মায়া!



হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার

—ধরণী সেন—

[সত্য ঘটনা]

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(৫)

শিকারের মোহ যখন মানুষকে পেয়ে বসে তখন তার আর রক্ষে নেই। আগেই বলেছি আমি মোটেই শিকারী নই কিন্তু শিকারের মোহ যেন আমাকে পেয়ে বসল। কি ব্যাপার তার কথা বলচি।

অমরনাথ থেকে নেমে পাহালগামে আবার এলাম। অমরনাথ যেতে হোলে এই পাহালগাম জায়গাটি হয়েই পশ্চিমে যেতে হয়—আবার শ্রীনগর বা অন্যত্র যেতে হোলে পাহালগামেই অমরনাথ থেকে নেমে আসতে হয়। যাহোক, এবার ঠিক করলাম যাবো পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ কোলাহাই তুষার পাহাড়ের উদ্দেশে। কোলাহাই পাহালগাম থেকে প্রায় মাইল কুড়ি রাস্তা হবে। চেষ্টা করলে ঘোড়ার পিঠে একদিনেই পৌছন যায় কিন্তু আমি মাঝে লিডারওয়াট বলে একটি জায়গায় রাত্রে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন বেলা থাকতে কোলাহাই পৌছলাম এবং কোলাহাই তুষার পাহাড়ের সামনেই অপরিসর উপত্যকার মাঝে একখণ্ড তৃণ ভূমিতে তাঁবু লাগালাম। ঘাস এসব জায়গায় দুর্ল্লভ। অনেক খুঁজে পেতে ও তুষার পাহাড়ের প্রায় একেবারে সামনে গিয়ে পড়ে এই সামান্য ঘাসের সোনার জায়গাটুকু আবিষ্কার করেছিলাম। দুধারে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে। কেবল একপাশ দিয়ে লীডার নদী তুষার পাহাড়ের নীচেকার একটা গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে একটানা একঘেয়ে একটা শব্দ করে চলেচে। কোথাও গ্রাম, লোকালয়, এমন কি একটা মানুষের মাথাও দেখা যাচ্ছে না। এদিকের রাস্তা এই তুষার পাহাড় অবধি এসে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েচে। সূর্য্যি বোধকরি এখানে দেখা দেয় না—আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় সূর্য্যি কোনকালে এদেশে উঠে না। চারিদিকে ঠাণ্ডার একটা প্রলেপ ও কেমন একটা থমথমে ভাব। ভাল্লুকের চলাফেরা করবার উপযুক্ত জায়গা বটে।

একঘণ্টার মধ্যে যেন হঠাৎ সন্ধ্যে হয়ে গেল। কেবল পাহাড়ের চুড়োর দিকে চেয়ে মনে হতে লাগল অন্য দেশে দিন যেন এখন অনেক বাকি। এই রকম স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়ার মধ্যে আমার ছোট্ট ছোউলদারী তাঁবুটিতে আমি ও আর একটিতে, গুরুদিং সিং, মিস্ত্রিখান ও দুজন কুলী এই পাঁচটি প্রাণী জেগে আছি। আর চারিদিকে সব যেন আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়চে। এ জায়গাটাতে যে ভাল্লুকভায়াদের বেশ গতাগম্য আছে আমার শিকারী ও কুলিরা ভালরকম জানে—তারা এর আগেও এদেশে এসেচে।

সেদিন খুব ভোরে আমরা লীচার নদীর ধারে এমন একটা জায়গা ঠিক করলাম যে ভাল্লুকের ওপরে পাহাড়ে ওঠবার পথে বা নেমে সেখানে জল খেতে আসবার সম্ভাবনা খুব বেশী—শোনা গিয়েচে তারা নিত্য আসেও।

তখনও বেশ রাত্রি ; আমরা তিনটি প্রাণী একটা প্রকাণ্ড পাথরের পেছনে গা ঢাকা দিলাম। এক রকম অগুনতি গোলাকার পাথরখণ্ড সেখানে পড়ে আছে। আমাদের পেছনে একটা খাড়াই পাহাড়ের গা। আমাদের পাশেই ঠিক আর একটা প্রকাণ্ড পাথরের খণ্ড—তার পাশ দিয়ে জানলার মত করে নদীর ধারটাও ভাল্লুকের চলার রাস্তা বেশ চোখে পড়ে। গুরুদিং গুছিয়ে বন্দুকের নালাটা ঐ দিকে ফিরিয়ে তাক্ করে রাখল। পূব আকাশের অতি সামান্য একটু আলোর ভাবে নদীর ধারটা আবছা থেকে, বসে বসে দেখলাম, যেন একটু সামান্য স্পষ্ট হোল। আমরা অধীরভাবে অপেক্ষা করচি--কথাবার্ত্তা নেই ; যা কথা কওয়ার ছিল তাঁবুতে সব সেরে এসেচি। আমার হাত ঘড়িটা-টিক টিক্ করে আওয়াজ করচে—দেখতে পাচ্চি না ঠিক ক'টা বেজেচে। তাঁবু থেকে বেরুবার সময় হয়েছিল জানি সাড়ে তিনটে। চুপচাপ এমন সময়—প্রায় তিনশ গজ দূরে, দুটো ছায়া আস্তে আস্তে যেন একদিকে সরে যাচ্চে—হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। সেদিকে আঙুল দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে গুরুদিংকে দেখালাম। গুরুদিং মাথা নাড়লে—অর্থাৎ চলবে না। এখন দেখা গেল আমাদের রাস্তার দিকে না এসে ভাল্লুক জোড় যেন ভিন্ন পথ নিচ্চে। তাহলে শীকার তো হাতছাড়া হবার যোগাড়। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম. গুরুদিং অস্ফুট স্বরে আমাকে বললে : আব্ বয়ঠিয়ে, ম্যয় উসকো পিছু যাউঙ্গা।—বলে চতুর শিকারীর মত নিঃশব্দে সে উঠে ওদিকে চলে গেল—কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট প্রস্তরখণ্ডগুলি তার গন্তব্য পথ আড়াল করল। ভাল্লুকগুলোকেও আর দেখা গেল না।

(৬)

আবার কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। এবার একটু একটু যেন আলো পাহাড় থেকে নীচে নামচে। হঠাৎ দেখি একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক একবারে জলের ধারে মুখ নীচু করে আছে। কি ভয়ঙ্কর!—গুরুদিং নেই কাছে ; বড় আপশোষ হতে লাগল। কিন্তু কোথায় সে? সে কি অন্য কোথা থেকে ভাল্লুকটাকে তাক্ করচে? ......কিন্তু বেশ কয়েক সেকেণ্ড কটে গেল। ভাল্লুক সেই মুখ নীচু করে আছে তো আছেই—কিন্তু এটা করচে কি—জল খাচ্চে নাকি? ঠিক বোঝা যাচ্চে না। অথচ পঞ্চাশ ষাট গজের মধ্যেই। আমার ইতিমধ্যে রক্ত হয়ে উঠল গরম—কিসের একটা টানে উসখুস করে উঠলাম। ভাবলাম আমার হাতের বর্শাটা ছুড়ে তার পিঠে গেঁথে দিই। তাক্ করে গায়ের সমস্ত জোরে বর্শাটা টিপ করে ছুড়লাম। কিন্তু আমি আফ্রিকার হটেনটট্ নই—ও চলবে কেন! ভাল্লুকটার প্রায় ফুট খানেক পাশে একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে বর্শাটা অন্য একটা দিকে ভীষন জোরে ছিটকে পড়লো। মুহূর্ত্তে কি হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম, গুড়ুম করে দুটো আওয়াজ। ভাল্লুকটা তীক্ষ্ণ বেগে একদিকে বেরিয়ে গেল। এবং সে সঙ্গে সঙ্গেই নিকটেই গুড়ুম গুড়ুম করে দ্বিতীয়বার আওয়াজ। প্রায় ৬।৭ মিনিট আমরা অস্থিরভাবে চুপচাপ—বাইরে বেরিয়ে আসতেও পারচি না। নিজের উপর ভয়ানক রাগও হচ্চে। কিন্তু হতভাগা গুরুদিং কোন্ দিকে গেল? বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে—রাত্রি

আর নেই। এবার দূরে মনে হচ্চে যেন একটা সমস্ত রাত্রি পরে গুরুদিংকে দেখতে পেলাম আর দেখতে পেলাম একটা ভাল্লুকের বাচ্চাকে ঝোলাতে ঝোলাতে সে নিয়ে আসচে। অবশ্য সেটা মরে গেছে। শেষে, ভাল্লুকের বাচ্চা!—ওটার অতটুকু চামড়া কি হবে? গুরুদিং এসেই বল্লে: জী, আব লোক কৈ আওয়াজ কিয়া?-আমি তখন আমার বর্শা ছোড়ার অতি লোভের ইতিহাসটা লজ্জায় বললাম। তখন গুরুদিং বল্লে, যে সে একটা বড় ভাল্লুক নির্ঘাত নিতো—কিন্তু ঐ আওয়াজে সে চমকে সরে যাওয়াতে তার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। ভাল্লুকটার পেছনে এই ছোট বাচ্চাটা ছিল—ওরা দুটোই ছুটছিল—সেও পিছু নিলে—এবং বাচ্চাটা একটু পিছিয়ে পড়াতে ঐটাকেই সে গুলি লাগিয়েচে। আমি ক্লান্ত হয়ে বললাম—যাক আজকে অনেক হয়েচে আর কাজ নেই,—ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলুম। গুরুদিং খুসীই হোল। আমরা সেদিনকার অভিযানের কিছু কাজ শেষ করে তাঁবুতে ফিরলাম। তার পরের রাত্রের আগেই আমরা সেখান থেকে বিদায় নিলাম—হয়ত বড় ভাল্লুকটা বাচ্চা হারিয়ে হিংস্র হয়ে আমাদের তাঁবুটা আক্রমন করে বসত। ভাল্লুক হিংস্র হয়ে উঠলে তারা সমস্ত বন্য পশুদের চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন পরে গুলমার্গে আমরা চলে এলাম। এবং সেখানে টম ও ডি টেরার সঙ্গে দেখা হোল। শুনলাম, আমি ও টম পুঞ্চ রাজ্যে যাবো ঠিক হয়েচে। অনেকদিন বাদে টমকে আবার পেয়ে আমার ভারী মনটা খুব হাল্কা ও খুসী হয়ে উঠল।

(৭)

গুলমার্গ থেকে খাড়াইতে উঠে পীর পঞ্জল পাহাড় টপকে পুঞ্চরাজ্যে নামবার এ্যাডভেঞ্চারের মস্ত প্ল্যান তৈরী হোল। যে পার্ব্বত্য গলি (pass) দিয়ে আমারা যাবো সেটার নাম চোর পঞ্জল পাস। সাধারণতঃ নেহাৎ এ্যাডভাঞ্চার-দুরন্ত বা জেল পালান খুনী আসামী লোক ছাড়া বোধ হয় এ রাস্তা কেউ নেয় না। রাস্তা মানে দুফুট পায়ে চলার অপ্রশস্ত বিপদসঙ্কুল পিচ্ছল পথ। যাহোক, সুরু হোল আমাদের যাত্রা। এই যাত্রাটা আমাদের এতো ঘটনাবহুল ছিল যে তার সমস্ত বর্ণনা দিয়ে লিখতে গেলে রংমশালের সব পাতা কটাই সম্পাদকের আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তাই কেবল শিকারের কথাই বলবো। আমরা সমস্ত দিন হাঁটতাম ও যেখানেই সন্ধ্যে যেতে সেখানে তাঁবু ফেলতাম—আর বাইরে আকাশের তলায় সর্ব্বপ্রথমে আমাদের ডিনার তৈরী হোত। সমস্ত দিন চলে ক্লান্ত হবার দরুণ ৭টার সময়ই ভবঘুরে বেদুইনদের মত খাওয়া দাওয়া করে আমরা যে যার তাঁবুতে ঢুকতুম। বাইরে আমাদের লোকজনের কেউ কেউ পালা করে পাহারায় থাকতো। বন্য পশু ও ছিঁচকে ডাকাতের জন্য এ সাবধানতা। টমের দুটো বন্দুকের একটা আমার কাছে থাকতো—এবং দুটো টোটাভরা অবস্থায় আমাদের বিছানার এক পাশে পড়ে থাকতো। পীর পঞ্জল পাহাড় পার হবার আগে এক জায়গায় (পাঞ্জান পাথরি) আমাদের তাঁবুর পেছনের জঙ্গলে ভাল্লুক এসেছিল শুনেছিলাম।

পীর পঞ্জল পাহাড়টা উচ্চতায় চোদ্দ হাজার ফুটের বেশী। যে দিন সেই চোর পঞ্জল গলিতে চোদ্দ-হাজারফিটের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম সে দিন এক অপূর্ব্ব অনুভূতি আমাদের হয়েছিল। চারাদকে শূন্য, কুয়াশাচ্ছন্ন, পায়ের তলায় কালো বরফ—কতবার আমরা যে পিছলে পড়ছিলাম তার ঠিক ছিল না। সে দিন

মনে হয়েছিল যেন হিমালয় জয় করেচি। কাছাকাছি এক জায়গা থেকে আমরা সুউচ্চ নঙ্গ পর্ব্বতের ধবল চূড়া দেখলাম—সে এক স্বগায় দৃশ্য! পীর পঞ্জল পার হয়ে আমরা পুঞ্চরাজ্যে নামলাম।

পুঞ্চরাজ্যে সাপুর বলে একটা পাহাড়ী গ্রামে আমাদের ভাল্লুক শিকারের একটা প্রকাণ্ড ঘটনা ঘটল। এই সাপুরে শুনেচি এমন একটা গুহাও নেই যেখানে ভাল্লুকের বসতি নেই। এজন্য আমরা মনস্থ করেছিলাম আমাদের অভিযানের প্রত্যেক সভ্যের জন্য একটা করে ভাল্লুক মারা হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাদের অত বড় উচ্চাকাঙ্খা ভাল্লুকের দল ব্যর্থ করেছিল। তবে আমাদের চেষ্টা একেবারে নিস্ফল হয়নি।

সাপুরে সমতল ভূমি বলে কিছু ছিল না। যাহোক, গিয়েই আমরা শুনলাম ভূট্টাচোর ভাল্লুকের জ্বালায় গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে আছে। আমাদের শিকারের দল ভেবে তারা উৎসাহিত হয়ে অভ্যর্থনা কর্‌লে। বিনামূল্যে আমরা মুরগী, ডিম, দুধ, কাঠ—সব পেয়ে গেলাম। তারা বল্লে, তাদের গ্রামের দু'চারজন শিকারী যোগ দেবে—কিন্তু তাদের লাইসেন্স নেই তাই তারা মারতে পারবে না—তারপর একদল-বাজনা, বিগ্‌ল্‌, ঢোল এসব বাজিয়ে তারা তুমুল কোলাহল করে ভাল্লুকগুলোকে কোনঠেসা করবে বা তাদের তাড়িয়ে একদিকে বার করবে অর্থাৎ রীতিমত রাজ শিকারের বন্দোবস্ত হোল। রাজারা যেমন লোকজন বাজনা-বাদ্যি নিয়ে শিকার করেন— আমাদের সেই অবস্থা হোল।

ভোর প্রায় চারটে নাগাদ আমাদের দল শিকারে বেরলো। মাঝে মাঝে এখান থেকে সেখান থেকে দুএকজন করে আমাদের দলে যোগ দিতে লাগল। তামাসা দেখবার জন্য ছেলে ছোকরার দল অনেকে পেছনে পেছনে চললো। সেই প্রচণ্ড ভয়াবহ খাড়াই পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে যেতে বেশ রোমাঞ্চ হচ্ছিল।

(৮)

দুচারটে ভাল্লুকের গুহা এড়িয়ে (কারণ সেখানে পৌছোন শিবের অসাধ্য সোজা খাড়াইর দরুণ) আমরা শেষে একটা অপেক্ষাকৃত কম খাড়াইতে একটা বিরাট গুহার আস্তানা দেখলাম। মুহূর্ত্তে পাকা শিকারীর মত আমরা চুপ করে গেলাম ও দুতিনটে ছোট দলে ভাগ হয়ে গেলাম। ক্রমশঃ এগিয়ে আমাদের ছোট দলটি একেবারে প্রায় গুহার সামনে এসে পড়ল। ভাল্লুকের যে এটা একটা আস্তানা তাতে সন্দেহ নেই। ওখানকার স্থানীয় এক শিকারী বললে: ভাল্লুক গুহার ভেতরেই আছে—আপনারা গুলির আওয়াজ করুন—বেরুবে। —এটা ভুল হোল। গুহার ভেতরের অন্ধকার লক্ষ্য করে টম্ গুলি চালালে—সমস্ত নিস্তব্ধ পাহাড় কাঁপিয়ে তার ভয়াবহ গুরুগম্ভীর প্রতিধ্বনি হোল—আমরা সম্মুখ সমরের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। গুহাটার দুতিনটে ফাটল দিয়ে আমরা সতর্কে উঁকি ঝুঁকি মেরেও কোন ছায়া বা কোন কায়া আবিষ্কার করতে পারলাম না। সেই ফাটলগুলো দিয়ে দুচারটে গুলি ছাড়াও হোল—গুলির ভীষণ শব্দে মনে হোল—ভাল্লুকের বাবাও বেরিয়ে এলো বুঝি! বেশ খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর—আর সময় নষ্ট করার আমার ও টমের ইচ্ছে হোল না—কাছেই অন্য গুহা ও জঙ্গলের খোঁজে আমরা এগুতে লাগলাম। বলা বাহুল্য এখানকার শিকারীরাই আমাদের পথ প্রদর্শক ছিল। প্রায় আধঘন্টা পর এবার আমরা একটা খড্‌এর ধারে

এসে পড়লুম—নীচেটা জঙ্গলে ভর্ত্তি ও পাহাড়ের গায়ে গায়ে দু'চারটে গুহাও চোখে পড়ল। এবার আমরা কাজটা রীতিমত গুছিয়ে করলাম। ঢোলবাজনার দলকে নীচে পাঠান হোল—লোক প্রায় পঞ্চাশজন হবে—তাদের পাঁচ ছটা ভাগ করে সে জঙ্গলটা গোল করে ঘিরে ফেলতে বলা হোল। গোলমাল চেঁচামেচি হৈ চৈ করে ক্রমশঃ এই দলটি ভাল্লুকগুলোকে তাড়িয়ে একটা বিশেষ দিকে নিয়ে আসবে ও সেই বিশেষ দিকে যেখানে ভাল্লুক ভাববে তার একমাত্র পালবার পথ সেখানে বন্দুক বাগিয়ে লুকিয়ে আমরা বসলুম। আমাদের একটু দূরে গুরদিং সিং তৈরী হয়ে রইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হোল, আক্রমণ করবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হয়ে নিলে। তারপর দলের মধ্য থেকে কে একজন বাঁশী বাজিয়ে দিলে—যেন ফুটবল ম্যাচ আরম্ভ হচ্চে। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল কাঁশর বিগ্‌ল ও গগনফাটা কান ঝালাপালা তুমুল চীৎকার—সে এক বিরাট কাণ্ড; কখনো নিজের চোখে দেখিনি কখনও নিজের কানে শুনিনি এ স।—দেখে শুনে আমার সমস্ত শরীর একটা ভয়ানক উত্তেজনায় রোমাঞ্চে কি রকম হতে লাগল। এরকম অদ্ভুত অভিজ্ঞতা পূর্ব্বে আমার জীবনে ঘটেনি। মনে হতে লাগল—ভাল্লুকের দল ক্ষেপে গিয়ে একেবারে হত্যাকাণ্ড না সুরু করে। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজেকে সামনে নিলাম ও বাইরে আমার অভূতপূর্ব্ব উত্তেজনার কিছুমাত্র প্রকাশ করলাম না।

(৯)

টম পাশেই বন্দুক বাগিরে নিশ্চল স্থির দৃষ্টিতে একটা বিশেস দিক লক্ষ্য করে বসে আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেও যেন উত্তেজিত হয়ে কি এক একটা অস্ফুট শপথ করে। মিনিট কয়েক সে বিকট বাজনা কোলাহল চললো—ও তারপরই সে হৈ চৈর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ভাল্লুক প্রায় ৫০গজ দূরে আমাদের সামনে দৃষ্টিগোচর হোল। আমার সমস্ত শরীর যেন হিপ্‌নোটাইস্‌ড্‌ হয়ে গেল এবং মুহূর্ত্তেই টমের বন্দুক ভীষন শব্দে গজরে উঠলো গুড়ুম, গুড়ুম! দুবার,—তিনবার—গুড়ুম। মনে হোল দেখলাম যেন, ভাল্লুকটা আছড়ে মাটিতে পড়ে সটাং হয়ে পড়লো, পড়বার পর সামনের জঙ্গলের জন্য তাকে আর দেখা গেল না। এদিকে আমরা উঠতেও পারচি না। আবার হয়ত আসবে তার সঙ্গী বা প্রতিবেশী দুচারটে। গুলির আওয়াজের সঙ্গে বাজনা কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। একটা সর্দ্দারকে আমরা জানালাম—"এক মারা হায়" লেকেন, তারপর ইঙ্গিতে বাজনা বাজাতে সুরু করতে বলা হোল। আবার সেই তুমুল গগনভেদী চীৎকার উঠল এবং এক মিনিট পরেই দেখা গেল—একদিকের লোকের দল উর্দ্ধশ্বাসে পালাচ্চে আর চেঁচাচ্চে—যাক্ বোধহয় দুএকটা ভাল্লুক দুএকজনকে জখম করে নিজের রাস্তা করে নিচ্চে। শীঘ্রই আমাদের কাছে সে দলের একটা লোক এসে পড়ল, দেখলাম পা দিয়ে রক্ত পড়চে, তবে এমন কিছু নয়। বুঝলাম পালাবার সময় কোন পাথরের খণ্ডে তার পা ঠুকে গিয়েচে। লোকটাকে কিছু বলবার তখন সময় নেই, আমরা সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির করে রইলাম বসে। আবার বাজনা হঠাৎ থেমে গেল —আর ছুটো তিনটে লোক নীচে থেকে চেঁচিয়ে উঠল :—"ভাগা—ভাগা—।" আরে কিধার ভাগা—কোন্ সে গিয়া—তার জবাব নেই হঠাৎ সব একেবারে চুপচাপ। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই কতকগুলো লোক হুড়মুড় করে এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো। টম বসেই তাক্ করে ছিল; ওদের কাণ্ড দেখে—উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়াল তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেচে। আমিও ঐ লোকগুলোর বোকামি বুঝলাম। চেঁচামেচি বন্ধ

করাটা তাদের অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গিয়েচে—চেঁচামেচি করতে থাকলে ভাল্লুক কিছুতেই তাদের ব্যূহ ভেদ করে যেতে পারত না। আমাদের সামনের পালাবার একমাত্র রাস্তাতেই তাদের আসতে হোত। এর পরে আরো অনেক কাণ্ড ঘটল কোন দল এদিকে নামে—কোন দল ওদিকে ওঠে, তারপর আমরা ভাল্লুকের পেছনে কি ভাল্লুক আমাদের পেছনে—তুমুল ছত্রভঙ্গের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে আবার আমরা পূর্ব্বেকার জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। টম বললে: সেন—দেখলে এদের বোকামি! আমি হেসে বললাম: এদের ব্যাপারই ঐ রকম টম, গরিলা যুদ্ধ, এরা নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজে নামতে জানে না। মধ্যেখান থেকে আমাদেরও নাকাল করে মারলে। আর আমরাও যে শিকারী নয় তাও বোধ হয় ওরা ধরতে পেরেচে! যাকে যেটাকে গুলি করা হয়েচে কিছুক্ষণ আগে—দেখা গেল এগিয়ে ঢালুতে একটু নেমে সেটা সত্যিই মরেচে। প্রকাণ্ড জানোয়ারটা—তার চারটে মোটা পুরু থাবার তীক্ষ্ণ নোখগুলো তখন বেরিয়ে বেঁকে শক্ত হয়ে আছে গায়ের লোম বোধ হয় ৬ ইঞ্চি ঘন হবে—সুন্দর কালো কালো নরম লোম। গুলিটা বুকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে আর একটা কাঁধ দিয়ে। সেখানটা রক্তাক্ত হয়ে আছে। টম বললে: সেন, আমাদের অনেক তপস্যার ফল এবং আমরা নিশ্চয় খুসী হয়েচি, কিন্তু বেটাদের বোকামি না থাকলে আরো অন্ততঃ একটা আমাদের হাতে মরতো। নেহাৎ ভাল্লুকগুলোর আয়ুর জোর ছিল।

(১০)

আমাদের কাজ তারপর প্রায় সমস্ত দিন ঘুরে ছিলাম কিন্তু শীকার আর মেলেনি। এটা একটু আশ্চর্য লাগল—কারণ শোনা গিয়েছিল সাপুর ভাল্লুকে ভর্ত্তি। তবে কি তারা আমাদের আসার গন্ধ পেয়ে রাত্রি থাকতেই সব দূরে দূরে সরে পড়েচে! যাইহোক সন্ধ্যার সময় ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে আমরা তাঁবুতে পৌছলাম। দুজনেই ক্ষিধেতে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। মিস্ত্রিখান জানতো—সে আমাদের জন্য খাসা ডিনার তৈরী রেখেছিল।

পরের দিন ভোর বেলা পুঞ্চের উদ্দেশ্যে লটবহর নিয়ে আবার আমরা যাত্রা করলুম। সেদিন ছিল ২০শে অগাষ্ট। তারপর কাজের মধ্য দিয়ে, পাহাড় পর্ব্বত, নদী, জঙ্গল অতিক্রম করতে করতে পুঞ্চ হয়ে নিত্য নতুন জায়গায় তাঁবু ফেলতে ফেলতে আমরা ১৫ই সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিণ্ডি পৌছলাম। রাওয়ালপিণ্ডি এসে (যখন আমরা বিদ্যুতিক আলো দেয়া পিচ ঢালা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম) মনে হোতে লাগল আমাদের--যেন একযুগ পরে সুদূর আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ান জঙ্গল থেকে আমরা এইমাত্র সভ্য জগতে এসে পৌছেচি। সব-কিছু বাড়ী ঘর লোক জন আমাদের চোখে আশ্চর্য্য অস্বাভাবিক গোছের লাগতে লাগল। টম বললে: সেন, দেশে গিয়ে স্কটল্যাণ্ডের কোন মাসিক কাগজে আমাদের পুঞ্চ ভ্রমণ কাহিণী আমি নিশ্চয় লিখবো। আমি বললাম আমিও; টম, বাংলা দেশে কোন মাসিক পত্রিকাতে আমিও একদিন সব লিখবো। টমকে হোটেলে পৌছে দিয়ে আমি আমার প্রবাসী বাঙ্গালী বন্ধু শ্রীকরুণা মিত্রের বাড়ীতে এসে বড় কড়া জোরে সজোরে নাড়লাম। আমার সমস্ত মন শরীর তখন একটা লম্বা বিশ্রাম ও শান্তির জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল; আমি জানি আমার সহৃদয় বন্ধু তার সুমধুর আতিথ্যে আমাকে দুদিনেই চাঙ্গা করে তুলবেন—।



উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ
লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চিত্রিত

৩

আধ-ফোটা আলো কামরায়। একটা, পোষা পাখী দাঁড়ে বসে ঝিমচ্ছে। পিছনে পাৎলা রেশমের নীল পর্দ্দা একটু কাঁপচে, আবছা আলোয় খানিক ঝিলমিল করছে। আর পর্দ্দার আড়াল থেকে মিহি গলার মিঠে সুর ভেসে আসচে।

পর্দ্দার ওধারে আলো একটু উজ্জ্বল। চরকা আলোর দু একটা ফলা পর্দ্দার এক ফাঁক দিয়ে এ পাশের আবছা আলোয় কেটে কেটে বসচে। আর সেখানে ফুলন্ত আলোয় মিষ্টি গান। কালীভূষণের মনে একটু রঙ ধরল। পর্দ্দার ওধারে, রাত যেন ভোর হয়েচে, পাখী যেন ডাকচে। সেখানে যেন ভয় নেই, সেখানে যেন উৎসব। কালীভূষণ ভাবলে, কী তাজ্জব! একি অর্দ্ধেক রাতের স্বপ্ন? না, মাঝদরিয়ার প্রহেলিকা?

পোষা কাকাতুয়াটা হঠাৎ জেগে বললে, 'কে?' চমক ভেঙে তলোয়ারের একটা খোঁচা দিয়ে কালীভূষণ বললে, "আমি।" পাখীটা ডানা ঝটপটিয়ে দাঁড়ের এক ধারে সরে বসল। কিন্তু পর্দ্দার আড়ালে গান থামল না।

বোম্বেটের চোখে নেশা ধরে, কিন্তু দুরন্ত রক্ত ঠাণ্ডা হ'তে জানে না। কালীভূষণ ফিস্ ফিস্ করে ভয়ঙ্কর সুরে বললে, "রোসো, গানের সখ মেটাচ্ছি।"

তলোয়ারের ফলাটা রেশম পর্দ্দার উপর রেখা কেটে টেনে নিলে কালীভূষণ। আলগোছে একরাশ মাকড়সা-জালের মত পর্দ্দাটা ঝলমলিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

ঝন্ করে একটা শব্দ হ'ল। কোত্থেকে একটা পিতলের ফুলদান মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে গান থেমে গেল।

একটা রাক্ষুসে দেয়াল আরসি। তার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে খোপা বাঁধচে। ইস্পাহানের ফুলবাগিচার পরী যেন সে। পিছন থেকে আরসিতে কালীভূষণ তাকে দেখলে। রূপসীর আলোর-মত-হাল্কা ওড়ণার ভিতর দিয়ে কালীভূষণের প্রতিবিম্ব আরসিতে ফুটে উঠল।

মেয়েটি আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরালে।

কালীভূষণ বললে, "আমি কালীভূষণ।"

মেয়েটি একটু যেন হতাশ সুরে বললে, "যা ভেবেছিলাম!"

খানিকটা সময় চুপ। তারপর মেয়েটি কালীভূষণের হাতের রক্তমাখা তলোয়ারটা দেখে যেন শিউরে উঠল। বললে, "ওই ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে তুমি আমায় মারতে পাবে না।" ওড়ণার আড়ালে কোমর থেকে একটা কিরিচ খসিয়ে এনে সে বললে, "এই নাও। আর দেখো, খবর্দ্দার গলা কেটো না যেন। কিরিচের ফলাটা আলগোছে বুকে বিঁধে দিও। তা' হ'লেই, ব্যস্, ল্যাঠা চুকবে।"

কালীভূষণের মুখে কথা সরল না। সে শুধু অবাক হচ্ছিল। খানিকবাদে ভারী গলায় সে বললে, "আমরা ছাঁপোষা বোম্বেটে নই। মেয়েলোকের গায়ে তলোয়ার তুলি না।"

মেয়েটি ভুরু উঁচিয়ে বললে, "ও! তা' হ'লে?"

"তা'দের আমরা ধরে নিয়ে যাই।"

"বটে?"

"তারপর মোটা টাকা পেলে তাদের ফিরে' দিই।"

মেয়েটি হেসে বললে, "সে তো বেশ মজা!"

কালীভূষণ বল্লে, "মজাটা বুঝবে।"

মেয়েটি ফিক্ করে একটু হাসল। সেই হাসি দেখে কালীভূষণ মুগ্ধ হ'ল।

হঠাৎ মেয়েটি চেঁচিয়ে বল্লে "ছাখো!"

পাটাতনের এক পাশে কামরাটা। খোলা জানালা দিয়ে রাতের সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে কালীভূষণ দেখলে জ্যোৎস্না রাতের দুধ-সাগর। সেই ফাঁকে রূপসী একখানা হাত চোখের পলকে তুললে, একটা রেশমী রুমাল কালীভূষণের

নাকে চেপে ধরলে। কালীভূষণের তলোয়ার উঠতে গিয়ে হাতের মুঠো থেকে খসে পড়ল।

কী একটা কথা বল্‌তে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে গেল। টলতে টলতে সে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

৪

কালীভূষণের পিছু পিছু নিঃসাড়ে বারোটি মূর্ত্তি কামরায় ঢুকেছিল। রাতের অন্ধকারের মত কালো তাদের পোষাক। বরফচুরের মত ফর্সা ধব ধবে তাদের মুখের রঙ। পা থেকে মাথা সাঁজোয়া পরা তারা। হাতে একটি করে খোলা তলোয়ার। মেয়েটির মুখের দিকে এক দৃষ্টে তারা তাকিয়ে ছিল।

কালীভূষণ মেঝেয় বেঁহুস হ'য়ে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি হাত তুলে ইসারা করলে। সেই সাঁজোয়া-পরা বারোজন এসে কালীভূষণকে ঘিরে দাঁড়াল। তাদের একজন, তার লোহার মুকুটে ছোট্ট একটা লাল ত্রিশূল আঁকা। মাথা নুইয়ে সে বললে, "সব তৈরী।"

মেয়েটি বললে, "নৌকোয় একে তুলে নাও।"

খোলা জানালার তলায় একটা নৌকো বাঁধা ছিল। চারজন ধরাধরি করে কালীভূষণের অজ্ঞান শরীরটা জানালা দিয়ে গলিয়ে নৌকোয় নামিয়ে দিলে।

সেই চারজন ফিরে এলো। তারপর সেই-বারোজন মেয়েটির দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল। কিছু আগে খুনী বোম্বেটের সঙ্গে খোস্ মেজাজে যে মেয়েটি মস্করা করছিল, সে তখন বদ্‌লে গেছে। তার মুখ গোধূলি ঝড়ের মত রঙীন নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেচে। চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়চে। আর দুটি ঘন কালো ভুরু, কালো কুটে মেঘের মত জেগে আছে।

লালত্রিশূল আঁকা মুকুট যার, তার পানে সাঁজোয়া-পরা আর এগারজন তাকাল। ফিস্ ফিস্ করে তারা বললে, "সময় নেই।" তখন ভয়ে ভয়ে সে বললে, "আর সময় নেই।"

মেয়েটি অন্যমনস্ক ভাবে বললে, "বাক্সটা নিয়ে এসো।"

সেই বারোজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ত্রিশূল-মুকুট মানুষটি বললে, "মা, বাক্স যে আমাদের ছুঁতে নেই।"

"ওঃ!" বলে মেয়েটি হঠাৎ যেন জেগে উঠল। ধীরে ধীরে সে কামরার এক কোণ থেকে একটা বাক্স নিয়ে এলো। তারপর সে বললে "এসো।"

সাঁজোয়া-পরা বারোজন তার পিছনে হেঁটে সেই খোলা জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কালীভূষণের পাশে নৌকোয় রাখতে গেল সেই বাক্সটা, রাখতে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলে। তার দু চোখ জলে ভরে এলো। তারপর, আস্তে আস্তে সে মুঠ আল্‌গা করে দিলে। বাক্সটা ঠক করে নৌকোয় পড়ল।

নৌকোটা জাহাজের জানালার তলায় একটা আঙটায় মোটা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। মেয়েটি ইসারা করলে। তখন সাঁজোয়া-পরা একজন তীক্ষ্ণ তলোয়ার ছুঁইয়ে দিলে রশিতে। ছাড়া পেয়ে নৌকোটা টলমল করে উঠল, একটা মস্ত ঢেউয়ের মাথায় চেপে প্রায় আকাশে উঠল। তারপর মহাসাগরের এক পাল বুনো ঢেউ নৌকোটা নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে এক দিকে ছুটে চলল।

৫

সাঁজোয়া-পরা বারোজন খোলা তলোয়ার উঁচুতে তুলে ধরলে। আর সেই মেয়েটি একটি হাত তুলে অস্ফুট স্বরে বললে, "জয় হোক অমরলতার।" সাঁজোয়া-পরা বারোজন গম্ভীর গলায় বললে, "জয় হোক।"

তাদের দিকে এবার ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি বললে, "বাইরের খবর কী?"

"বোম্বেটেরা জাহাজ সাফ করে এনেছে। দুশো সন্ধানী মরেছে।"

"ধন্য সন্ধানীরা!" কপালে হাত ঠেকিয়ে মেয়েটি বললে। তারপর সাঁজোয়া-পরাদের বললে, "দুঃখ কোরোনা। পুণ্য কাজে প্রাণ দিয়েছে সন্ধানীরা।"

মাথা হেট করে তারা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর তাদের একজন বললে, "এখন কী হুকুম তোমার?"

"আমাদের কাজ ফুরিয়েছে। বোম্বেটেকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। এখন সরে পড়া ভালো।"

"তা হ'লে চলো। চোরাই কবাটের পাশে নৌকো বাঁধা আছে।"

মেয়েটি ম্লান মুখে বললে, "আমার যাওয়ার উপায় নেই। তোমাদের ছুটি এখন। ফিরে যাও তোমরা।"

"আর তুমি? তুমি বোম্বেটের হাতে মরতে থাকবে?" সাঁজোয়া-পরা আর একজন বললে।

"বেঁচে থেকে কী লাভ! ঋষির হুকুম তামিল করেছি। বুক ভেঙে যাচ্ছিল, তবু অমরলতার পুঁথি বোম্বেটের হাতে তুলে দিয়েছি। এখন, এখন মরতে চাই আমি।"

"আমরা বাধা দেবো।" সাঁজোয়া-পরা বারোজন একসঙ্গে বলে উঠল। "তুমি আমাদের সব। তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু নই।"

বড় দুঃখের হাসি ফুটলো সেই মেয়েটির মুখে। সে হেসে বললে, "আমি তোমাদের সব! আমার কথা শোনো তবে। দেশে যাও। দেরী কোরো না। বোম্বেটে এসে পড়বে।"

সেই বারোজনের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। তারপর তাদের চাহনী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। "না, তা হ'তে পারে না। তোমাকে দস্যুর হাতে ফেলে যাবোনা আমরা। তোমায় ঘিরে, এক সঙ্গে মরব।"

সেই সময় কামরার বাইরে দুপদাপ শব্দ হ'ল, অনেক লোকের ছুটে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। সাঁজোয়া-পরা বারোজনের হাতের তলোয়ার থর থর কাঁপল। কবাট ঠেলে একপাল বোম্বেটের সঙ্গে কামরায় ঢুকল ক্ষিতিভূষণ।

৬

একবার চোখ রগড়ে নিলে ক্ষিতিভূষণ। তার মনে হচ্ছিল, ভেল্কি না কি? পরে একটু হেসে সে বললে, "বাঃ, এ যে অবাক কাণ্ড দেখছি!"

ক্ষিতিভূষণের দলের একজন বললে, "ভানুমতীর খেল।"

ক্ষিতিভূষণ কট্‌মট্‌ করে সেই বোম্বেটের দিকে তাকাল। তারপর সে ইসারা করলে। বোম্বেটের দল যেমন পিল্ পিল্ করে কামরায় ঢুকেচিল তেমনি বেরিয়ে গেল।

তখন ক্ষিতিভূষণ বললে, "ব্যাপার কী?"

কামরার সকলে চুপ। সেই মেয়েটি, মেঘের মত গম্ভীর। মেঝেয় তাকিয়ে আছে সে। আর সেই সাঁজোয়া-পরা বারোজন, ক্ষিতিভূষণের দিকে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে।

ক্ষিতিভূষণ ঠাট্টার সুরে বললে, "এক এক করে, না সবাই মিলে এক সঙ্গে?"

ত্রিশূল-আঁকা মুকুট যার, সে তাচ্ছল্যের সঙ্গে বললে, "এক এক করে।"

ক্ষিতিভূষণ হেসে বললে, "সাবাস! তবে এসো। একদান খোঁচাখুঁচি হ'য়ে যাক।"

সাঁজোয়া-পরা মানুষটি এগিয়ে এলো।

ক্ষিতিভূষণ দেয়ালের এক পাশে সরে এলো, একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তলোয়ারটা সামনে ধরে একবার দেখলে। মেয়েটিকে একবার আড় চোখে দেখলে। মেয়েটিকে তলোয়ারের বাট দিয়ে ছুঁয়ে বললে, "একটু সরে দাঁড়াও। নইলে খোঁচা খেয়ে একশেষ হ'বে।"

সাঁজোয়া-পরা সেই বারোজন একসঙ্গে বললে, "মা, সরে দাঁড়াও।" মেয়েটির ভ্রূক্ষেপ নেই। তখন ক্ষিতিভূষণ মেয়েটির গায়ে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বললে. "এই, সরো না?"

মেয়েটি এবার মুখ তুলে ক্ষিতিভূষণকে দেখলে। তারপর—ক্ষিতিভূষণ "বাপ্‌রে" বলে নিজের গাল চেপে ধরলে। একবার তলোয়ারটা তুলতে গিয়ে সে থেমে গেল।

সেই সাঁজোয়া-পরা বারোজনের মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। তারা এক লাফে এসে মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়াল। পরে, মেয়েটির হুকুমে তারা হটে দাঁড়াল।

মেয়েলী হাতের চড় আর নরম নয়। ক্ষিতিভূষণ বুঝলে। তা ছাড়া, তার বড় লজ্জা হ'ল। কিন্তু উপায় নেই। ক্ষিতিভূষণ হচ্ছে রাজ-বোম্বেটে। মেয়েলোকের গায়ে তলোয়ার দিয়ে কোপ বসানোর অভ্যেস নেই। চড় খেয়ে মেয়েলোকের গায়ে চড় কষা, তাও তাদের শাস্ত্রে নেই।

বত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ ক্ষিতিভূষণ! বয়স পেকেছে, বুদ্ধি পাকে নি। একটুবাদে সে বললে, "তার মানে?"

সেই মেয়েটি হেসে দিলে। বললে, "তার মানে তুমি জংলি। ভদ্রতা জানো না। মেয়েলোকের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে এসেচিলে কেন?"

"তা, তা—হুঁ, মেয়েলোক! লঙ্কার রাজ-সভায় কত মেয়ে দেখে এলাম।"

এবার খিল্ খিল্ করে হেসে মেয়েটি বললে, "তাদের সঙ্গে গা ঠেলে কথা বলতে গেলে তারাও এমনি থাপ্পর কষে দিত।"

উঃ! কষলেই হ'ল আর কি। তা হ'লে রক্তারক্তি হ'য়ে যেত না?"

"তা, করোনা রক্তারক্তি। কে ঠেকাচ্ছে তোমায়!" ঠোঁট চেপে হেসে মেয়েটি বললে।

"মেয়েলোক না হ'লে"—

"তা হ'লে আর রক্তারক্তির কথা তুলছ কেন?"

ক্ষিতিভূষণের মুখে তখন আর কথা জোয়ালো না। সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। তার যেন কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না। তারপর, একবার সে মাথা চুলকল, একবার তলোয়ারের বাটে হাত দিলে, পরে আবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন

এক সমস্যায় পড়ে গেল। তার ভাবভঙ্গি দেখে সেই সাঁজোয়া-পরা বারোজন হাসতে সুরু করলে।

কিন্তু হাসিতামাসার সময় সে নয়। দেখতে দেখতে ক্ষিতিভূষণ, সেই মেয়েটি ও সাঁজোয়া-পরা বারোজনের মুখ গম্ভীর হ'য়ে এলো। কামরাটা থম্ থম্ করতে থাকল।

সেই মেয়েটি বললে, "আমি তোমার বন্দী।"

ক্ষিতিভূষণ সাঁজোয়া-পরা বারোজনকে দেখিয়ে বললে, "আর এরা?"

"এরা আমার অনুচর। আমি এদের ছুটি দিয়েছি।"

ক্ষিতিভূষণ একবার মেয়েটির দিকে তাকাল। তলোয়ারের সামনে এতগুলো কাচা মাথা পেয়ে ছেড়ে দেওয়া বোম্বেটি আইন নয়। তবু যেন ক্ষিতিভূষণ সে রাতে একটু নরম হ'ল। খানিক ভেবে সে বললে, "আচ্ছা।"

সাঁজোয়া-পরা সেই বারোজন কী বলতে যাচ্ছিল। মেয়েটি ওষ্ঠে আঙ্গুল রেখে ইসারায় চুপ হ'তে বললে। ভাঙা গলায় সে বললে, "ফিরে যাও তোমরা।"

সাঁজোয়া-পরা বারোজন এক মুহূর্ত্ত মাথা হেঁট করলে। তাদের চোখ জলে ভরে এলো। লাল-ত্রিশূল আঁকা মুকুট যার, সে তলোয়ার খুলে ইঙ্গিত করলে। সাঁজোয়া-পরা বারোজন এসে মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়াল, তার মাথার উপর একসঙ্গে ঝক্‌ঝকে বারোখানা তলোয়ার তুলে ধরলে। তারপর খাপে তলোয়ার ভরে' একজনের পর একজন তারা চোরাই-কবাট খুলে অদৃশ্য হ'ল।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "এরা কারা?"

মেয়েটি সে কথার জবাব দিলেনা, বললে "চলো।"

ক্ষিতিভূষণ বললে, "কোথায়?"

মেয়েটি বললে, "তোমার জাহাজে।"

সরু সাঁকো বেয়ে মেয়েটি ক্ষিতিভূষণের জাহাজে উঠল। ক্ষিতিভূষণ একবার দুচোখ ভরে মেয়েটিকে দেখলে। আনমনে হেসে কী একটা কথা ভাবলে। তারপর হঠাৎ সে বললে, "হুঁ। দাদা কোথায়?"

কালীভূষণকে এতক্ষণ দেখা যায় নি। তাই তো! হঠাৎ ক্ষিতিভূষণের কথায় সবার যেন হুঁস হ'ল। বোম্বেটেরা সবাই এবার একটু অস্থির হ'ল। কালীভূষণ মারা গেছে কিম্বা তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে—অসম্ভব।

বোম্বেটেরা চারদিকে ছুটল, জাহাজ তচ্‌নচ্‌ হল, কিন্তু কালীভূষণের পাত্তা মিলল না। তখন ক্ষিতিভভূষণের মনে কী একটা সন্দেহ হল। সাঁকোর ধার ধারলে না সে। এক লাফে গিয়ে পড়ল নিজের জাহাজে। তারপর, একবার এদিক ওদিক সে দেখলে। কোথায় সে? হ্যাঁ, ঐ যে, রেলিঙয়ে ভর দিয়ে আকাশের একটা দিকে চেয়ে আছে। ক্ষিতিভূষণ ছুটলো সেদিকে।

কঠিন চাপ দিয়ে হাতটা ধরে ঝাকুনী দিয়ে ক্ষিতিভূষণ বললে, "বলো, আমার দাদা কোথায়?"

"উঃ! ছাড়ো ছাড়ো" মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিলে।

ক্ষিতিভূষণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বলো, নইলে তোমার আর রক্ষা নেই।"

মেয়েটি বললে, "কে তোমার দাদা?"

মেয়েটির এ কথায় ক্ষিতিভূষণ হতাশ হল। তা হলে এ নিশ্চয়ই জানে না। মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে সে রেলিঙয়ে নুয়ে পড়ল।

এই ফাঁকে মেয়েটি চট করে কী ভেবে নিলে। আড়চোখে তাকিয়ে সে বললে, "তোমার দাদা দেখতে তোমার মত—না কি হ্যাঁ?"

ক্ষিতিভূষণ লাফিয়ে উঠে পাগলের মত বললে, "হ্যাঁ, আমার মত।"

মেয়েটি বললে, "তাহলে জানি কোথায় সে।" বলেই সে গুন্‌ গুন্‌ গান ভাঁজতে সুরু করলে।

ক্ষিতিভূষণ মেয়েটির মুখ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "থামো। বলো দাদা কোথায়।"

মেয়েটি গুন্‌ গুন্‌ করে ভাঁজলে,

"দাদা হলেন বার,
হিম সায়রের পার।"

ক্ষিতিভূষণ উত্তেজনায় যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে হাঁ করে মেয়েটিকে দেখতে থাকল। বোম্বেটে ক্ষিতিভূষণ ভাবল, মেয়েটা এত নিষ্ঠুর কেন? জানে যদি তো বলে না কেন?

দুরন্ত বোম্বেটের দশা দেখে মেয়েটি লুকিয়ে হাসল। সে হাসি যেন শুধু নিষ্ঠুর নয়, তার যেন অনেক অর্থ। কোন্‌ অর্থ কে জানে! সে রাতে কোন্‌ রহস্য নিয়ে সে খেলচে, তাও বা কে জানে! কে জানে সে কে? সে রাতের এক একটা অদ্ভুত ঘটনা, কে জানে কী তাদের মানে!

মেয়েটি বললে, "তোমার দাদা একখানা নৌকো করে বার হয়েচেন।"

মহাসমুদ্রে কালীভূষণ নৌকো চেপে বার হয়েছে? ক্ষিতিভূষণের বিশ্বাস হল না। সে বললে, "নৌকো চেপে বার হয়েছে দাদা! সঙ্গে কে ছিল?"

"একটা বাক্স।"

বাক্স! কিসের বাক্স! কালীভূষণ কি কোনো গুপ্তধন পেয়েছে? কিন্তু সেটা নিয়ে মাঝ সমুদ্রে সে নেমে পড়বে কেন? জাহাজে লুকোবার ঢের জায়গা আছে। তা ছাড়া, তাকে ফাঁকি দিয়ে কালীভূষণ কখনো কোনো কাজে তো হাত দেয় না।

কালীভূষণের অন্তর্দ্ধান হবার রহস্য জল হোলো না। ক্ষিতিভূষণের কাছে ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত ঠেকল। খানিকক্ষণ সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে মেয়েটিকে বললে, "নৌকো কোন্ দিকে গেছে, বলতে পারো?"

"ক্ষিতিভূষণের সুন্দর মুখ তখন বড় কাতর দেখাচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে তাকে। দেখে মেয়েটির দয়া হল। যাহোক এবার আর সে ঠাট্টা করলে না। বুঝি একবার উচ্ছৃঙ্খল মহাসমুদ্রের চারিদিক দেখে সে বললে, দিক ঠিক নেই।"

ক্ষিতিভূষণ আর পারলে না। রেলিং ধরে কাঁপতে কাঁপতে সে জাহাজের পাটাতনে বসে পড়ল।

মহাসমুদ্রে রক্ত দিয়ে এতকাল হোরী খেলেচে ক্ষিতিভূষণ। ধূ ধূ সমুদ্রের হু হু গান বড় ভালো লেগেচে। আর আজ তার মনে হল ধূ ধূ সমুদ্র ভালো নয়, আপনজন হারিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আর সমুদ্রের হু হু গান, তাও যেন ভালো নয়। সেই গানে যেন থেকে থেকে মরণ কান্না শুনতে পাওয়া যায়। তবু, ইঁদুরের প্রাণ নয় ক্ষিতিভূষণের। সে উঠে দাঁড়াল, হাঁক দিয়ে সে ডাকলে বোম্বেটেদের, শিঙা ফুঁকে দিলে ক্ষিতিভূষণ। তখন তার হুকুমে ছটা জাহাজ মহাসমুদ্রের ছয় দিকে ছুটে চল্ল।



ছুটির ঘণ্টা

ফুটবল—কোরিন্থিয়ান্স—

শচীন্দ্রলাল ঘোষ

কল্‌কাতায় বিলিতি ফুটবল টীম কোরিন্থিয়ানদের আসার কথা তোমরা গত সংখ্যায়ই পড়েছ, আর তাদের প্রথম চারিটী খেলার বিবরণও পড়েছ। আমি এ-ও ধরে' নিচ্ছি যে তোমরা তাদের পরবর্ত্তী খেলাগুলোর ফলাফল দৈনিক খবরের কাগজে দেখেছ। আমি কলকাতার বাইরে তাদের কোন খেলা দেখিনি, তবে কল্‌কাতায় যতগুলি খেলা হয়েছিল সবগুলি দেখেছিলাম। এই কটী খেলা থেকে আমি তাদের ফুটবল খেলার ধরণ-ধারণের যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তাই তোমাদের বল্‌ব।

কল্‌কাতায় কোরিন্থিয়ানদের শেষ খেলার কথা প্রথমে বলে' নিই। খেলাটা হ'ল আই-এফ-এর নির্ব্বাচিত সর্ব্বভারতীয় দলের সঙ্গে—অর্থাৎ কিনা সমস্ত ভারতবর্ষ যে বাছাই করে' আমদানী করা সেই সব খেলোয়াড়, আই-এফ-এ যাঁদের জোগাড় করতে পেরেছিলেন। অবশ্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের সকলেই কল্‌কাতার কোন না কোন টীমের পক্ষে গ্রীষ্মকালে খেলেছেন, তোমাদের অনেকেই সেটা চট্‌পট বলে'ও দিতে পারবে। যাহোক, আমি তাঁদের অনেকটা পরিচয় নীচে দিচ্ছি তোমাদের সকলের সুবিধার জন্য।

গোল—ওস্‌মান—দিল্লী (মহমেডান স্পোর্টিং)

ব্যাক—জুম্মা খাঁ—পেশোয়ার (ঐ)

সন্মথ দত্ত—বঙ্গদেশ (মোহনবাগান)

হাফ্‌ ব্যাক—বিমল মুখার্জ্জি বঙ্গদেশ (ঐ)

নুর মহম্মদ—যুক্তপ্রদেশ (মহমেডান স্পোর্টিং)

বাচ্চি খাঁ—পেশোয়ার (ঐ)

ফরওয়ার্ড—নির্ম্মল ঘোষ—বঙ্গদেশ (মোহনবাগান)
রহিম—যুক্তপ্রদেশ (মহমেডান স্পোর্টিং)
মুর্গেশ—মহীশূর (ইষ্ট-বেঙ্গল)
রহমৎ— ঐ (মহমেডান স্পোর্টিং)
সামাদ—বিহার (ই, বি, রেলওয়ে) (ক্যাপ্টেন)

এর মধ্যে সামাদ আজ ১৫ বচ্ছর ধ'রে বাঙ্গলাদেশেই খেলছেন কাজেই তাঁকে বাঙ্গালী বলেই ধরে' নেওয়া যেতে পারে। এই বাছাই করা টীমটার মধ্যে দুটী লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। প্রথম হচ্চে এই যে বাঙ্গলাদেশের আই, এফ্,এ-তে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেরই নাম করা খেলোয়াড় খেলেন এবং ফলে বাঙ্গলাদেশের ফুটবল খেলায় উপরের দিকে বাঙ্গালীর স্থান কমে' গেছে—এগার জনের বাছাই টীমে বাঙ্গালী আছেন তিনজন, সামাদকে ধরলে চারজন। আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হ'চ্ছে এই যে, এই টীম সমস্ত ভারতবর্ষে থেকে বাছাই করা টীম, এর সঙ্গে কোরিন্থিয়ানদের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের ফুটবল খেলা কোন শ্রেণীর, তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

কোরিন্থিয়ান দল সম্বন্ধে একটা কথা বলে' রাখা দরকার। ইংলণ্ডে আমাদের দেশের মত সব ফুটবল খেলোয়াড়ই সখের খেলোয়াড় নন। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়, তাঁরা পেশাদারদের টীমে হাজার হাজার টাকা মাইনে পেয়ে থাকেন। প্রসিদ্ধ বিলাতী টীম আর্সেন্যাল, সাণ্ডারল্যাণ্ড, কুইন্সপার্ক-রেঞ্জার্স, উলভার-হ্যামটন, বোল্‌টন, এস্‌টন ভিলা এগুলো পেশাদারদের টীম। তার মধ্যেও দুই ভাগ—ইংলিশ লীগ ও স্কটিশ লীগ। এই দুই লীগে আবার চার চারটী করে শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় (১) ও তৃতীয় (২)। এই রকমের ১৭৬টী টীমের বাছাই খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়ে তবে আস্‌তে হয় সখের খেলায়। কাজেই, তাঁরা যে বিলাতের হিসাবে একেবারেই উঁচুদরের খেলোয়াড় নন, সে কথা বুঝতেই পারছ। অবশ্য সখের দলের মধ্যে কোরিন্থিয়ান দল বেশ ভাল দল, এবং যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্য সখের দলের খেলোয়াড় এবং সৌখিনদের ইন্টারন্যাশনলের খেলোয়াড়ও আছেন। কাজেই এঁরা যে বিলাতের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর দল, একথা ধরে' নেওয়া যেতে পারে।

সেদিনকার খেলা দেখে' আমার স্পষ্ট ধারণা হ'য়েছে যে ভারতীয় দলের চেয়ে কোরিন্থিয়ান দলের খেলা অনেক উঁচুদরের। ভারতীয় দল ২-০ গোলে হেরে' গেলেন,

কিন্তু সেটা অপ্রত্যাশিত হয় নি। আমাদের দলের খেলোয়াড়দের ক্ষমতার পরিচয় খুবই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় নি। ফুটবল খেলার মূল কথা হ'চ্ছে খেলার নিয়ম না ভেঙে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে গোল দিয়ে তা'কে হারানো এবং নিজেদের ঘাড়ে যাতে গোল না হয় তার ব্যবস্থা করা। যে-কৌশল অবলম্বন করলে সেটা সম্ভব হয়, সেইটাই হচ্ছে আসল কৌশল এবং সেইটাকে আয়ত্ত করাই হ'চ্ছে প্রথম ও প্রধান জিনিষ। যদি গোল দেওয়ার সুবিধা না হয় তবে পায়ে পায়ে 'বল্' ঘুরিয়ে পাঁচজন প্রতিপক্ষকে হয়রাণ করা বা মাঠের এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত প্রচণ্ড 'কিক' করা অরণ্যে রোদনের মতই নিরর্থক। আমাদের খেলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চমক দেবার মত কায়দা দেখানর চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু খেলার সত্যিকারের উদ্দেশ্যের খোঁজ পাওয়া যায় না। ফরওয়াড লাইনে সবাই খেললেন ভাল, বিপক্ষদল বার বার হয়রাণ হ'ল, কিন্তু যাতে গোল হয় তেমন কৌশল আমাদের খেলোয়াড়রা দেখাতে পারলেন না।

কোরিন্থিয়ান দলের সব চেয়ে প্রশংসার কথা হ'চ্ছে এই যে, তাঁরা একমাত্র গোল দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই খেল্‌তে নেবেছিলেন। খেলা এত দ্রুত হ'য়েছিল যে আমাদের খেলোয়াড়রা জমাট বেঁধে উঠতে পারেন নি, কিন্তু ওঁরা বরাবর মিলিত খেলার কৌশল বজায় রেখেছিলেন। সমস্ত খেলোয়াড় একই উদ্দেশ্যে একতালে পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধা বুঝে' খেল্‌ছেন—এ দৃশ্য আমাদের দেশের পক্ষ নতুন। ভাল করে' ফুটবল খেলতে হ'লে তোমাদের প্রথম থেকেই মনে রাখতে হবে যে বড় বড় খেলায় নিজের কসরৎ দেখালেই গোল হয় না—সকলে 'মিলে' খেল্‌তে হয়। বল্ নিয়ে নিজের পায়ে বেশীক্ষণ রাখতে নেই, তাতে সময় নষ্ট হয়—আর সময় একটু নষ্ট হ'লেই প্রতিপক্ষ সতর্ক হ'য়ে যায়, তখন গোল দেওয়া কষ্টকর হ'য়ে পড়ে। আমাদের খেলোয়াড়দের দৌড়ের ওপরে বল্ মারার অভ্যাস নেই, তাঁরা বল্ পায়ে এলে না থামিয়ে মারতে পারেন না। কোরিন্থিয়ান্ দল বল্ নিয়ে নিরর্থক দেরী কখনো করেন নি—বল্ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করেছেন। এমন কি, যেখানে তাঁরা দেখেছেন সামনে 'পাস্' করা অসুবিধা, সেখানে পেছনের লোকের কাছেও 'পাস্' করে দিয়েছেন।

এ ছাড়া তাঁদের আর একটা জিনিষ আমাদের অনুকরণীয়—সেটা হ'চ্ছে তাঁদের সকলেরই শারীরিক পটুতা। প্রত্যেকেরই সুন্দর সবল সুগঠিত শরীর, পরিশ্রমের অসীম ক্ষমতা এবং মনে জিতবার আগ্রহ। শরীর চর্চ্চা না করলে যে ভাল খেলা যায় না একথা

আমাদের খেলোয়াড়দের দেখলেই বোঝা যায়। আমাদের দেশে শরীর ভাল করবার চেষ্টা নেই বলে' আমাদের ফুটবল খেলা হ'য়েছে অনেকটা শুচিবাইগ্রস্ত—সবাই প্রতিপক্ষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে খেলতে চান্। ওঁরা কিন্তু ধাক্কায় অটল, পায়ের ওপর থেকে বল্ কেড়ে নিতে ভয় পান্ না—কারণ শরীরে শক্তি আছে, কুপোকাৎ হ'য়ে হাত পা ভাঙ্গার ভাবনা নেই। গায়ের জোর চাই—মনের জোর চাই, খেলার বিজ্ঞান আয়ত্ত করা চাই, নিজে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছা দমন করা চাই—এ হ'লে ভারতবর্ষের ফুটবল খেলা পৃথিবীর দর্শনীয় বস্তু হ'বে। কোরিন্থিয়ান দলের বিচক্ষণ ম্যানেজার স্মিথ সাহেবের মতে ভারতে'র খেলার খুব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সেটা সার্থক হ'চ্ছে না। আশা করি তোমাদের যারা খেলোয়াড় এ কথাগুলি সব সময়ে মনে রেখে খেলা অভ্যাস করবে।

কিন্তু বাহাদুর বটে ঢাকার খেলোয়াড়রা। ১-০ গোলে কোরিন্থিয়াণদের হারিয়ে দিয়ে তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষের মুখ রেখেছেন। অবশ্য কোরিন্থিয়ান দল ভেবেছিলেন যে যখন ভারতবর্ষের টীমকে হারিয়ে দেওয়া গিয়েছে, তখন ঢাকা আর কি পারবে? কিন্তু এই বড়াই হোল তাঁদের কাল, ঢাকার ছেলেরা সম্মিলিত খেলা খেলে তাঁদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে তাঁদের কৌশলেই তাঁদের হারিয়ে দেওয়া যায়। ঢাকার গৌরবে আমরা সকলেই গৌরব বোধ করছি।

ক্রিকেট—

গত সপ্তাহে এখানে রেঞ্জার্স মাঠে বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে বিহারে ক্রিকেট খেলা হ'য়ে গিয়েছে। বাঙ্গলা দেশ এক ইনিংস্ ও ১৬৬ রাণে জয়ী হয়েছে। প্রথম দিন বাঙ্গলা দেশ ব্যাটিং করে, ৭ উইকেটে ৩৭২ রাণ করে। কার্ত্তিক বসু ২৪, কমল ভট্টাচার্য্য ৬১, লংফিল্ড ৪১, হোসী ৫১ এবং ভ্যাণ্ডারগাষ্ট ৬৯ রাণ করেন। বিহার দল দ্বিতীয় দিন প্রথমে ৯৯ রাণ এবং পরে ১০৭ রাণ মাত্র করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে বিহার দলের বিজয় সেন ৪৬ রাণ করেন। বাঙ্গলা দলের বোলারদের মধ্যে লংফিল্ড, কমল ভট্টাচার্য্য এবং জিতেন বাঁড়ুর্য্যে খুব ভাল বল্ করেছিলেন।

লর্ড টেনিসনের দল লাহোরে সর্ব্বভারতীয় দলকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় দল ১২১ ও ১৯৯ রাণ করেছিলেন কিন্তু ইংরাজ দল ২০৭ রাণ ও ১ উইকেটে ১১৪ রাণ করে জয়লাভ করেন। ফুটবলেও যেমন, ক্রিকেটেও তেমনি—আমরা হারলাম খেলোয়াড়ের অভাবের জন্য নয়, মিলিত খেলার অভ্যাসের অভাবে। এখানেও দেখা গেল আমাদের খেলবার কায়দা জানা আছে, প্রত্যেকেরই খেলা উচুদরের, কিন্তু জানা নেই কোন

কৌশলে প্রতিপক্ষকে হারাতে হয়। শুটে বাঁড়ুয্যে অসুস্থ হওয়ায় খেলতে পারেন নি। আমাদের টীমের নির্ব্বাচন খুব ভাল হয় নি। এক অমরনাথ ব্যতীত ভাল 'শ্লো বোলার' কেউ খেলেন নি। ভারতবর্ষে সোলো বোলারের খুব অভাব। আমাদের কমল ভট্টাচার্য্য 'শ্লো বোলার' হিসাবে বেশ ভাল, ব্যাটিংয়েও তাঁর হাত মন্দ নয়। তাঁকে এবং কার্ত্তিক বসুকে ভারতীয় দলে নিলে বোধ হয় অনুচিত হয় না। ৩১শে ডিসেম্বর কল্‌কাতায় যে খেলাটি হ'বে, তাতে বোধ হয় তাঁদের দেখা যাবে। সে খেলাটি তোমরা দেখতে ভুলো না।

এই সপ্তাহেই বোম্বাইয়ে আর একটা 'টেষ্ট' খেলা হচ্ছে, তাতে মেজর নাইডু খেলছেন। এবারের টীমটা লাহোরের টীমের চেয়ে ভাল হয়েছে, দেখা যাক্ কি ফল হয়। এটার আর কলকাতার 'টেষ্ট' খেলার ফলাফল আগামী সংখ্যায় তোমাদের জানাবো। তোমাদের যারা কল্‌কাতার খেলা দেখতে পাবে এবং যারা দেখতে পাবে না, তারা সব সময়ে মনে রাখবে যে আমি তোমাদের চোখ দিয়ে খেলা দেখছি তোমাদের জন্য।

কিন্তু লর্ড টেনিসেনের দলকেও ঘাল হ'তে হয়েছে—ইতিমধ্যে দুইবার। প্রথমে রাজপুতানার কাছে, পরে জামনগরের কাছে। ফলাফল নীচে দিলাম

রাজপুতানা—২৩৭ এবং ৮ উইকেটে ৮৯।

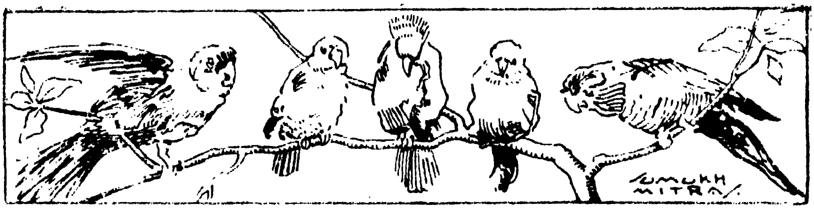
টেনিসনের দল—২১২ এবং ১১২।

—রাজপুতানার ৮ উইকেটে জয় লাভ।

জামনগর—২০৬ এবং ২২৩।

টেনিসনের দল—১২৬ এবং ২৬৯।

জামনগরের ৩৪ রাণে জয় লাভ।



সাল তামামী

শ্রীলোকেশ ঘটক।

কুট্‌র কুট্‌র বছরগুলো যাচ্ছে কেটে উই পোকায়—
পিছিয়ে পড়ে থম্‌কে চেয়ে খোঁজ রাখে তার কোন বোকায়!
পাগলা পিসির দাঁতের মিশি কেই বা তা আর খাচ্ছে রে,
বন-বাদাড়ে আঁধার ঠেলে দিল্লী কেবা যাচ্ছে রে।

আর তাছাড়া নিঝুম্ পাড়ায় কেই বা চাটে আলুর দম,
শুক্‌নো পাতি লঙ্কা টিপে হাঁকছে কে আর 'আমার কম'।
এ সব দেখে উঠ্‌ছে রুখে কোন্ ঘোষেদের কোন্ কেলো—
কোন্ বাগানের কোন্ পাখিরা করছে 'নালিশ চোখ্ গেলো।'

শ্মশান ঘাটে চায়ের সাথে খাচ্ছে কে আর ইলিশ মাছ?
এক পা তুলে চোখ্ টাটিয়ে দেখ্‌ছে কাদের অশথ্ গাছ?
কাদের পায়ে ফোড়ার উপর লাগাচ্ছে কে আইস্ ক্রীম?
হাসের সাথে ঝগড়া করে খাচ্ছে কারা ঘোড়ার ডিম?

কাদের বাড়ির হোঁৎকা খোকা বোঁচ্‌কা কাঁধে কাঁদ্‌ছে রে,
আরশোলারা কাঠি হাতে বল্‌ছে দেবে চীন ছেড়ে।
এ সব ভেবে রাঁচী টাঁচী যাস্‌নে রে তুই বাস চড়ে
চোখটা বুজে ঘুমিয়ে নে তুই একটা বছর পেটভরে।





গল্পবলা

শ্রীমতী অপর্ণা সেন

পূজার ছুটি সবাই খুব হৈ হৈ করে কাটায়, তবুও যারা স্কুলে পড়ে তাদের পরীক্ষার ভয়ে মাঝে মাঝে বই নিয়ে বসতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে যে বিরাট শিশু-বাহিনীটি মিহিজাম এসেছিল বেড়াতে, তাদের মধ্যে কেউই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নয়, কাজেই পরীক্ষার ভয় দেখিয়ে তাদের শাসন করবার উপায় ছিল না। সারাদিন এই ছোট দলটির কোন পাত্তা পাওয়া যেত না কিন্তু সন্ধ্যে যেই হ'ত, এরাও কোত্থেকে ভুঁইফুঁড়ে হাজির হ'ত—গল্প বলার বায়না নিয়ে। কদিন সন্তু গল্প বলার ভার নিয়েছিল; তার এসব বেশ ভালই লাগে। কিন্তু সে পরশু দিন চলে গেছে, এবার আমার পালা। যথারীতি দলটি 'প্রেজেন্ট প্লীজ' বলে হাজির। গম্ভীর মুখে বললাম তোমাদের আজ ব্রেইনের 'কম্পোজিসন' বোঝাব! খানিকক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখি খোকা ছাড়া আর সবাই আনন্দে চোখ বুঝে বোধ করি তাল রাখবার জন্যেই বা মাথা নাড়াচ্ছেন। যাক্, ঠাকুরের জিম্মায় করে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দ্বিতীয় দিন বললাম আজ অঙ্ক অঙ্ক খেলা যাক! বলা বাহুল্য, সভা ভাঙতে বেশী দেরী হয়নি। তৃতীয় দিন ধানের ক্ষেতে আলের রাস্তায় ওদের দলে মিশে হ'ল প্রকাণ্ড এ্যাড্‌ভেঞ্চার, কাজেই সেদিন গাম্ভীর্য্যের আবরণ টেঁকলো না। টেবিল চেয়ার ছেড়ে প্রমোশন নিতে হ'ল ওদের চৌকিতে। "শোন তবে"—দেখি ছ'জোড়া চোখ কৌতূহলে জ্বলজ্বল করছে।

সেবার কলকাতায় ভারী বর্ষা পড়েছিল; আমরা তখন কলেজে পড়ি। একদিন দুপুর থেকে এমনি বিষ্টি সুরু হ'ল যে সারা সহর ভেসে গেল। প্রিন্সিপ্যাল খবর পাঠালেন জল না কমলে কলেজের গাড়ী বেরোবে না। অতএব! অতএব আমরা কয়েক জন দলবল নিয়ে

হোষ্টেলের একটি মেয়ের ঘরে আড্ডা গাড়লুম। তারপর বুঝতেই পারছো কিসের গল্প জমে বর্ষার অন্ধকারে!

বুলু 'ভূতের' বলে জানলার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মীরার কাছে গিয়ে বসলো আর বুন্তা আমার কোল ঘেঁষে এলো।

•

হ্যাঁ, যেদিন সন্ধ্যেবেলায় সবাই আরম্ভ করলো ভূতের গল্প—কার মাসীর ঘরে কবে একটা বেরাল—কুকুর হয়ে গিয়েছিল, কার ঠাকুমা খড়ম পায়ে এক ব্রহ্মদৈত্য কবে দেখেছিল—এই রকম নানা কথা।—টুটুল এতক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে বসেছিল, হঠাৎ বলে উঠলো—তোমরা সবাই শোনা কথা বলছ, আমি কিন্তু নিজের দেখা একটা ঘটনা বলতে পারি। রুণা বললে—ও বাবা, এযে ভূতের মুখে রাম নাম—টুটুলা তুই ত ভূতই বিশ্বাস করিস না। বীণা মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিল—ওসব চাল্ রেখে দাও। অমন সন্ধ্যেটা মাটি হয়ে যায় দেখে তখন আমি বল্লাম—বীণা, তোর ঝঙ্কার থামা, টুটুল তুই আরম্ভ কর রে।

টুটুল মুখ না ফিরিয়েই বলতে আরম্ভ করলে—'আমি তখন মফঃস্বলে একটা স্কুলে পড়ি, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ হ'ল ভীষণ অসুখ। আমাকে 'সিক রুমে' নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরটা ভারী বিশ্রী—দেয়ালগুলো চুণ বালি ওঠা ওঠা। অসুখের জ্বরের ঘোরে কি একলা থাকার দরুণই কেন জানিনা আমার প্রায়ই মনে হত—ওই চুণ বালি খসার মধ্য থেকে একটা অস্পষ্ট মুখ দেখা যাচ্ছে, আর—ক্রমশই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার নাক চোখ ও ভুরু। যেদিন পথ্য করলাম সেদিন সেই দেয়ালে আঁকা মুখটা চুণ খসে খসে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, একটু টেপা নাক আর অদ্ভুত বাঁকা ঠোঁট খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যাক, সিক্ রুমের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে ত আমি বাঁচলুম। তার পরেই আরম্ভ হল পরীক্ষা, কাজেই গোলমালে সেই দেয়ালের মুখের কথা একদম মনেই রইলো না।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, তার পরদিন মাসীমার কী দয়া হ'ল, বল্লেন—চলো আজ সব নদীর ধারে বেড়িয়ে আসা যাক—মেয়েরা ত পা বাড়িয়েই আছে, কারুরই আপত্তি হল না। দূর থেকে বেড়াতে বেড়াতে দেখি অত ভোরেও একটা লোক নদীতে মাছ ধরছে। কাছে যেতে লোকটাকে ভয়ানক চেনা মনে হ'তে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় ওকে দেখেছি। লোকটা আমাকে দেখে মুখটা একটু বিকৃত করলো; বুঝলাম মাছ ধরায় বাধা পড়াতে সে বিরক্ত হয়েছে। চলে এলাম কিন্তু সারাদিন ধরে সেই মুখটা কি জানি কেন মনে পড়তে লাগলো, রাত্তিরে ভাল ঘুম হল না। ভোরে বাগানে ঘুরছি, মাসীমা সিক্ রুমে

কি করছিলেন, ডাক্‌লেন—"এই সেদিন অসুখ থেকে উঠেছো হিমে বাগানে বেড়াচ্ছে—"উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু দেয়ালের দিকে চোখ হঠাৎ পড়াতে থেমেই গেলাম, আশ্চর্য্য ! দেয়ালের মুখটা আর কালকের লোকের মুখটা অবিকল এক ! এর পরই বড়দিনের ছুটি হয়ে গেল।

বাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখি, মহা ব্যাপার, চূণকাম করা হচ্ছে সমস্ত স্কুলটা। শুনলাম নাকি ইন্‌স্‌পেক্ট্রেস্‌ এসে স্কুলের অবস্থা দেখে খুব রাগ করেছেন, তাই এ অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থা। বোর্ডিয়ের শোবার ঘরগুলো রং হয়ে গেছে 'সিক্ রুমটা' চূণকাম করা হচ্ছে। সেই বিচ্ছিরি মুখটা উঠে যাবে ভেবে আশ্বস্ত হলাম।

'তার পরের পর দিন সকাল বেলায় কাগজ পড়ছি দেখি কার এক ছবি বেরিয়েছে, তলায় লেখা, "এই লোকটিকে নদীর তীরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সর্প দংশনে ইহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মৃত ব্যক্তির ফটো দেওয়া হইল, আত্মীয় স্বজনগণ লাস সনাক্ত করিতে পারেন।" ফটোটা হচ্ছে সেই নদীর ধারের লোকটার। যেদিন সিক্ রুম রং করা হয়েছে, সেই দিনই লোকটী মারা গেছে !!!

বাসের হর্ণ অনেক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, টুটুল যাবার জন্য পা বাড়াল। বীণা মেয়েটী একটু ভুতপ্রবণ,--বলে উঠ্‌লো অদ্ভুত্‌ ! "বানাতে পারলে অনেক জিনিষই অদ্ভুত্‌ করা যায়" --বলে টুটুল খোপা ঠিক করতে করতে বেরিয়ে গেল।

গল্প শেষ হ'ল—আমার মিহিজামের দলটি এবার স্ব-স্ব মত প্রকাশ সুরু করলো।

ফুলু বল্‌লে আমি আগেই ভেবেছিলাম গল্পটা আজগুবি হবে। মনো খুব খুসী হ'য়ে বললে পুটুন পিসী, তোমরা কেমন জব্দ হ'য়েছিলে কিন্তু বন্ধুর কাছে !

বল্‌লাম, তাই নাকি ? আমার কিন্তু টুটুল বা রুণা বলে কোন বন্ধুই ছিল না, আর জল জমলে বেশী দেরী হ'লে আমাদের ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হ'ত। আমিও গল্পটা তোমাদের বানিয়ে বলেছি !

(একটি ইংরাজি গল্পের ভাব অবলম্বনে)



যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

দেবাশীষ সেনগুপ্ত

মানুষ বেঁচে যতদিন থাকে আমরা তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন মনে করি না; তাঁর কীর্ত্তি তাঁর যশ পৃথিবীর দিকে দিকে বিঘোষিত হলেও আমাদের কাছে তা যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করে না। আমরা শুধু জানি মরণের পর মুগ্ধ ছন্দে কাব্য সৃষ্টি করতে—আত্মার মন্দিরে অঞ্জলি দিতে স্মৃতি-তর্পনে দুফোঁটা অশ্রুপাত করতে।

জগদীশচন্দ্রের কীর্ত্তি গাথা জ্ঞাত নয় বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে—আর তাই-ই বা কেন, সমগ্র পৃথিবীতে এমন লোক বিরল। জ্ঞানের অতি ক্ষীণ আলোকরশ্মি সম্পাতে যার অন্তর পুলকিত সেই জানে এই জগতজোড়া নাম! তাই আজ বিশ্বজনের মুখে মুখে ফেরে: জগদীশ! আচার্য্য জগদীশ!!

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক!............

এই বিপুল বৈচিত্রময় ধরণীর কোলে নিত্য রূপ ও রসের অগণিত লীলাখেলা বিরাজমান··· জড়ে ও জীবের মধ্যে যে অপরূপ পার্থক্যরহস্য তার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র!

গত ২৩শে নভেম্বর ৮-১৫ মিঃ প্রভাতে এ মরজগতের মায়া তুচ্ছ করে প্রস্থান করলেন কোন অজ্ঞাত রহস্যলোকে!···বুঝি নব নব সমস্যা সমাধান কল্পে!···

ঋষি জগদীশ! সাধক জগদীশ!! সত্যদ্রষ্টা জগদীশ!!!

এই বৈজ্ঞানিক মনিষীর কর্ম্মবহুল বিপুল জীবনীর যথাযথ বিবরণ রংমশালের কটী পাতায় আবদ্ধ করা বাতুলের কল্পনা মাত্র।

অতি সংক্ষেপে আজ তাঁর জীবনী আলোচনা করেই আমরা ক্ষান্ত হবো। বারান্তরে তাঁর আবিষ্কার, পাশ্চাত্য মহলে তাঁর সিদ্ধান্ত-প্রভাব ও তাঁর দিগ্বিজয় ইত্যাদি সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলবার ইচ্ছা রইলো।

হ্যাঁ! সত্যিই তিনি দিগ্বিজয় করেছিলেন—অস্ত্র নিয়ে নয়, সৈন্য নিয়ে নয় শুধু তীক্ষ্ণ প্রতিভার অপরূপ দ্যুতিতে! জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি তর্কে পরাস্ত করে আপন মতামত সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

দেবাশীষ সেনগুপ্ত

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জগদীশচন্দ্র ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমায় রাড়িখাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

তার পিতা ভগবানচন্দ্র দাস তৎকালে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং পিতার কর্ম্মস্থল ফরিদপুরে জগদীশচন্দ্রের বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়।

শৈশবে কোমল ভাবপ্রবণ অন্তকরণে যে পিপাসার বীজ উপ্ত হলো পরবর্ত্তী কালে তা শাখাপ্রশাখায় কাণ্ড বিস্তারিত করে বিরাট মূর্ত্তিতে আবিষ্কারক মনে রূপ রস গন্ধ বিকীরণ করে!

জগদীশচন্দ্রের বাল্য জীবন সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায় তিনি নাকি ডাকাত সর্দ্দারের হাতে মানুষ হয়েছিলেন। জগদীশ চন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র এক দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলকে বিচারে কয়েক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। দণ্ড অন্তে দস্যুসর্দ্দার ভগবানচন্দ্রের নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করে। ভালো কাজ পেলে সে পাপ পথ পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়। ভগবানচন্দ্র তখন শিশু জগদীশের সমস্ত ভার তার হাতে অর্পণ করেন। পার্ব্বত্য অঞ্চলের বনে জঙ্গলে এই দস্যুর কাঁধে কাঁধেই জগদীশচন্দ্রের বাল্য জীবনের অধিকাংশ দিন অতিবাহিত হয়।

সমস্ত কিছুই শিশু জগদীশ নবরূপে দেখতে পেতেন। চিন্তা করবার অনুভব করবার একটী স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিলো তাঁর। কর্ম্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সুখ উপভোগ করা তাঁর পিতার ভাগ্যে ছিলো না—শিশুর অবিরত প্রশ্ন বর্ষণে তিনি হয়ে উঠতেন বিপর্য্যস্ত। কিন্তু যা হোক একটী সম্ভবপর সন্তোষজনক উত্তর তাকে দিতেই হতো।

এমনি ভাবে দিন যায়! শৈশব যায়.........কৈশোর আসে! আস্তে আস্তে কিশোর মন বাল্যের লীলাচাপল্য কাটিয়ে হয়ে ওঠে বাস্তবতাময় কঠোর!......জেগে ওঠে বৈজ্ঞানিকের স্বতস্ফূর্ত্ত কৌতূহলরাশি! অসাধারণ কিছু দেখবার প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সুন্দর চক্ষু দুটী কিসের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে বেড়ায়।

পৃথিবীর ভাবী শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকের যাত্রাপথ সাতরঙ্গা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে!.........

ভগবানচন্দ্র তখন বর্দ্ধমানে এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার। পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তার অত্যন্ত খর দৃষ্টি ছিলো। বর্দ্ধমানের পিতলের কারখানার মায়া ত্যাগ করে তাই জগদীশচন্দ্রকে কলকাতায় আসতে হয়। হেয়ার স্কুলে প্রথমে তাকে ভর্ত্তি করে দেওয়া হলো। কিন্তু কিছুদিন পর হেয়ার স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ভগবানচন্দ্রের মনপূঃত না হওয়ায় জগদীশচন্দ্র ভর্ত্তি হলেন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে।

যথাকালে স্কুলের সমস্ত শিক্ষা সসম্মানে শেষ করে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবেশ করেন।

চার বৎসর পর অন্তরে অন্তরে তৃষ্ণার্ত্ত জগদীশ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন!

জ্ঞানতৃষা তার মেটে নি। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি লণ্ডন যাত্রা করলেন। জুলজি, বটানী ও এ্যানাটমী নিয়ে তিনি পড়া সুরু করে দিলেন।......কিন্তু বিধির বিধান ছিলো অন্যরূপ!

স্বদেশে থাকতে তাঁর প্রায়ই জ্বর হতো ; এই সময়েই লণ্ডনে ঘন ঘন জ্বরের প্রকোপে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন।

চিকিৎসক ও শিক্ষকেরা পরামর্শ দিলেন চিকিৎসাশাস্ত্র ত্যাগ করতে। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে এখানে কিছু আশা করা বৃথা !

অগত্যা ! নবীন বদন হতাশার ম্লান হয়ে পড়ে ! চোখে দুঃসহ ঘন ব্যথা দেখা দেয় !! কিন্তু পুরুষ সিংহ তিনি !—মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নবীন জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থী লণ্ডন পরিত্যাগ করতে মনস্থ করলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জগদীশচন্দ্র কেম্বিজ ক্রাইষ্ট কলেজে পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। এই কলেজ থেকেই তিনি 'ন্যাচারাল সায়েন্স'-এর বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

শিক্ষকমণ্ডলী তার অসাধারণ প্রতিভায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে তাকে বহুবার অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন। এই সময়ে তার মৌলিক গবেষণা শক্তি স্ফুরিত না হ'লেও তার কর্ম্মকুশলতা-ভাব, প্রকাশ প্রণালী, পর্য্যবেক্ষণনৈপুণ্যে সকলকে চমৎকৃত করে। তাই, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের ট্রাইপিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উপাধি লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের বি, এস সি উপাধিটী তাঁকে দান করা হয়। এর জন্যে তাঁকে পুনরায় স্বতন্ত্র পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে হয় নি।

বিলাতী উপাধী ভূষিত হয়ে জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করলেন। এখানে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রফেসর ফসেটের মধ্যস্থতায় তদানীন্তন বড় লাট লর্ড রিপণের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। লর্ড রিপণ উদ্যোগী হয়ে তার জন্যে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে একটি চাকুরী সংগ্রহ করেন কিন্তু তা'তে জগদীশচন্দ্রের অসম্মতি থাকায় তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপকরূপে এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করতে অনুরোধ করেন—পাব্লিক ইনষ্ট্রাকসনের ডিরেক্টর সার আলফ্রেড ক্রফটকে। তিন বৎসর একাগ্র কর্ম্মনৈপুণ্যে কর্তৃপক্ষকে মুগ্ধ করে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তবহ্নিতে চতুর্দ্দিক আলোকিত করে জগদীশচন্দ্র স্থায়ী পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

জীবনের চলার পথে যে রহস্যালোকের আবছা আভাষ মনে রেখাপাত করেছিল তা ক্রমে সুস্পষ্ট, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে! ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর পঞ্চত্রিংশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে সর্ব্বসমক্ষে জগদীশচন্দ্র ঘোষণা করলেন : অতঃপর তার জীবণের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানারোহণ। "জ্ঞানানিমজ্জুৎসায়" এ জীবন আমি আজ উৎসর্গ করলাম।"

এলো এই শুভদিন! ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র তড়িৎ উর্ম্মি ধরবার নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। কলকাতা টাউন-হলে বিপুল জনতার মধ্যে তিনি সে যন্ত্রের শক্তি প্রদর্শন করলেন! একটী ছোট বাক্সের মধ্য থেকে তড়িততরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে আর একটী ছোট বাক্সে রক্ষিত লোহার তারের উপর পড়ামাত্র সেই তারে তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হচ্ছে। প্রবাহবলে কম্পাসের কাঁটা নাড়া থেকে পিস্তলের আওয়াজ পর্য্যন্ত করা চলছে।

এই বৎসরই আচার্য্য জগদীশ তার প্রথম মৌলিক গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ পাঠ করলেন—এসিয়াটিক সোসাইটী গৃহে। বিষয় ছিলো Refraction of Electric rays অর্থাৎ বিদ্যুৎ- তরঙ্গোৎপাদক ঈথর-তরঙ্গ-কম্পনের দিক পরিবর্ত্তণ।

ক্রমে ক্রমে অতি স্বল্পকালের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোক বিকীরণ বা electric radiation সম্পর্কে বহু দুরূহ সমস্যা মীমাংসিত হলো আচার্য্য জগদীশের নব আবিষ্কার আলোয়।

বৎসর কালের মধ্যে বিলাতের রয়েল সোসাইটী এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপটুতার পরিচয় পেয়ে নানা দিক দিয়ে তাঁকে অজস্র সম্মানে সম্মানিত করে তুললেন। তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধগুলি রয়েল সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হলো;—খুব কম লোকেরই এ সম্মান লাভ করবার সৌভাগ্য ঘটে! এ ছাড়া রয়েল সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে একটী নিয়মিত বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন।

লণ্ডন য়ুনিভ্যার্সিটী তাঁকে সানন্দে ও স্বেচ্ছায় তার প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর করলেন ডি, এস্, সি (Doctor of Science) উপাধি প্রদানে।

পাশ্চাত্য দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী লর্ড কেলভিন, মঁসিয়ে কোর্ণ প্রভৃতি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন।

ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সুখ, সুবিধা, স্বচ্ছন্দতা যাতে অক্ষুন্ন থাকে তার জন্য বাৎসরিক ২,৫০০ টাকার একটী বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বসু গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযানে ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশনের লিভারপুল অধিবেশনে উৎসুক জনতা তাঁকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা জানায়। প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর আবিষ্কার-তত্ত্বসমূহ ব্যক্ত করে অতি সুক্ষ্ম যন্ত্রে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম পরীক্ষাগুলি অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করে আচার্য্য বসু মহাশয় ওদেশের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। শুদ্ধ বিস্ময়ে তারা ওঁকে অভিনন্দন জানায়।

কিন্তু এ জয়যাত্রার শেষ কোথায়?.................. ..

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এক শুক্রবার জগদীশচন্দ্রের জীবনে একটী স্মরণীয় দিন। আরও কতকগুলি জটিল দুরূহ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সুসম্পন্ন করে সরল ভাষায় যথাযথপ্রণালী ব্যক্ত করে আচার্য্যদেব বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন আলোক সম্পাত করে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন।

অবশেষে বৈজ্ঞানিক মহলের চেতনা হরণ করে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরলেন। কপালে তাঁর জয়ের রাজটীকা।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বসু প্যারিস্ একজিবিশনের "ইণ্টার ন্যাশানাল কংগ্রেস অব ফিজিকস্" এ নিমন্ত্রিত হয়ে তাতে যোগদান করবার জন্য সরকারের ব্যয়ে বাংলা ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে আবার সাগরপাড়ি দিলেন।

এই বিদ্বজ্জন মহাসম্মিলনীতে বসু মহাশয় যে সব মৌলিক গবেষণালব্ধ বিবরণী পাঠ করেন "জীব ও জড় দেহে সাড়া" (Response of inorganic and living matter) তার মধ্যে অন্যতম।

তারপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১০ই মে এক শুক্রবার বিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রয়েল ইন্‌ষ্টিটউশনে ধাতু ও সাধারণ উদ্ভিদে বৈদ্যুতিক সাড়া (Electric response of metals and of ordinary plants) এই আবিষ্কার তত্ত্বমূলক সুন্দর প্রবন্ধটী সর্ব্বসমক্ষে বিবৃত করলেন।

অতঃপর এই রয়েল ইনষ্টিটিউসন ল্যাবোরেটরীতেই বহুদিন তিনি জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের প্রত্যাগত হয়ে স্বদেশবাসীর নিকট থেকে অজস্র শ্রদ্ধাঞ্জলির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য বসু মহাশয় সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সময়েই জগদীশচন্দ্রের গবেষণার গতি ভিন্ন পথ অবলম্বন করলো। এতদিন পদার্থবিদ্যা বা Physicsই ছিলো তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। এখন তিনি জড়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

কলকাতার পথে বর্দ্ধিষ্ণু একটী উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রণালী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এ থেকেই তাঁর নব গবেষণার সূত্রপাত হয়। জড় ও জীবের মধ্যে আপাতদৃষ্টির ব্যবধানটুকু দূরীভূত করাই তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি বলে গেছেন : জীবদেহের উপাদানে যত প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন স্পন্দন দৃষ্ট হয় উদ্ভিদ দেহেও তার প্রত্যেকটী বর্ত্তমান। স্বরচিত দুখানি গ্রন্থ The Plant Response ও Comparative Electrophysiologyতে আচার্য্যদেব যথাযথ বিবরণ প্রমাণ ও পরীক্ষাফল সহ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই উদ্ভিদ সম্পর্কিত আবিষ্কারপরম্পরা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে বিশ্বচক্ষে এক নূতন আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। ইতিপূর্ব্বে আর কোন বৈজ্ঞানিকই উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে এরূপ ভাবে আলোচনা করতে সক্ষম হন নি ; একমাত্র জগদীশচন্দ্রের দ্বারাই এ সম্ভব !

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নূতন আবিষ্কার-তথ্যগুলিকে সাথী করে আচার্য্য বসু আবার সাগরপাড়ি দিলেন। এবারের বিজ্ঞান-অভিযানে তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকার সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে জড় ও জীবের ব্যবধান রহস্য প্রচার করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেও জগদীশচন্দ্র গবেষণার বিরত হন নি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উদ্ভিদ সম্বন্ধে তার সমুদয় গবেষণার নিশ্চিত ফলাফলগুলি রয়েল সোসাইটী কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয় এবং তারা তাদের Philosophical Transaction নামক পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন।

কিছুদিন পরেই তাঁর Researches on Irritability of lPants নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার বার আমন্ত্রণ আসায় জগদীশচন্দ্র গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সেখানে প্রেরিত হলেন।

য়ুরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যগুলি অজস্র প্রশংসা অর্জ্জন করলো।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

যারা আমাদের স্মরণীয়

দেবাশীষ সেনগুপ্ত

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তার জীবনের একটী উল্লেখযোগ্য দিন—এই দিনে প্রতিষ্ঠিত হলো বসু বিজ্ঞান-মন্দির। আচার্য্যদেবের মতে বোস ইনষ্টিটিউট বা বসু বিজ্ঞান মন্দির বিদেশী ল্যাবোরেটরী নয়, ভারতীয় সাধকদের পুণ্য আশ্রম। পুরাকালে আমাদের দেশের তক্ষশিলা, নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ছাত্র এসে বিদ্যাশিক্ষা করতো···আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরও ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে এনে নিতি নব ছাত্র আকর্ষণ করবে—এই ছিলো তাঁর অভিলাষ।

ইতিমধ্যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তাঁকে সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'স্যার' উপাধিতে সম্মানিত হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সুরু হলো জগদীশচন্দ্রের পঞ্চম বিজ্ঞান-অভিযান। জগতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকবর্গ সমীপে উদ্ভিদ দেহের স্পন্দন ধরবার জন্যে আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র প্রদর্শনই ছিলো তার মুখ্য উদ্দেশ্য; গৌণ উদ্দেশ্য বসু বিজ্ঞান মন্দিরে প্রচলিত বিচিত্র গবেষণা প্রণালীর সুবিধা প্রচার!

অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের সমক্ষে স্বীয় অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে জগদীশচন্দ্র সাফল্যের জয় মাল্য দুলিয়ে ফিরলেন স্বদেশে।

আবার্দ্দিন্ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানজনক এল এল ডি উপাধি প্রদানে আপ্যায়িত করেন।

কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান তখনও তার জন্যে অপেক্ষা করেছিলো! ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি রয়েল সোসাইটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হলেন। এ সম্মানে শুধু আচার্য্য জগদীশই নন—প্রত্যেক বঙ্গবাসী, প্রত্যেক ভারতবাসী আজ ধন্য···শুধু এই মনে করে···আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আর কেউ নন—তাদের স্বদেশবাসী—তাদেরই বাংলার কৃতী সন্তান।

১৯২৬ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বসু মহাশয় "লিগ অব ন্যাশানাল কমিটী ফর ইনটলেকচুয়াল কো-অপারেশন"-এ আহুত হয়ে আবার বিদেশ যাত্রা করলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে এ সময়ে যে যোগ স্থাপিত হয় তা সত্যি অনবদ্য!

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র শেষ বার য়ুরোপ পরিদর্শন করলেন। বিজ্ঞানেতিহাসে সে সময়ের কথা বহু দিন পর্য্যন্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সর্ব্বত্রই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপ আদৃত হন। সর্ব্বত্রই উচ্চনিনাদে ধ্বনিত হয় তার জয়গান!

জগদীশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ বন্ধুদ্বয় নাট্যকার বার্ণাড শ' ঔপন্যাসিক রোঁমা রোঁলা তাঁকে যে স্ব স্ব রচিত উপহার প্রদান করেন তার উৎসর্গ পত্রে যথাক্রমে লেখা আছে:—From the least to the greatest Scientist ও···To the Revealer of a new world.

এ ছাড়া গলস্‌ওয়ার্দ্দী প্রমুখ বহু সাহিত্যিক তাঁকে তাঁর এই অপরূপ সাফল্যে অভিনন্দিত করেন।

কিন্তু দিন তার পূর্ণ হয়ে এসেছিলো। এ বয়সে বিশ্রাম গ্রহণ করাই উচিত; অথচ কোথায়ও তিনি বিশ্রাম স্বস্তি পাননি। কর্ম্মী পুরুষসিংহ তিনি···তার চাই কাজ।

কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত একরকম অবসরজীবন যাপন করতেই তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

দেবাশীষ সেনগুপ্ত

গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিংয়ে ৭০০০ ফিট উচ্চে সহরের কোলাহল থেকে দূরে—বহু দূরে—'মায়াপুরী'। সামনেই কাঞ্চনজঙ্ঘার অপূর্ব্ব শোভা! গবেষণার জন্যে প্রকাণ্ড উদ্যানটী নানা প্রকার দুষ্প্রাপ্য ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। এইখানে বহু দিন তিনি একনিষ্ঠ সাধনায় রত ছিলেন। ফলতার বাড়ীটীতেও একটী ছোট্ট বাগান আছে। সেখানে ছাত্রদের গবেষণার উপযুক্ত স্থানও আছে।

গত ৩০শে নভেম্বর তাঁর অশীতিতম জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হবার কথা ছিলো। কিন্তু হায় কে জানতো তার অতি স্বল্পকালের মধ্যে তিনি এমনিভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন!

বহুদিন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন পীড়িত ছিলো। গত ২রা নভেম্বর তিনি গিরিডিতে গিয়েছিলেন বায়ুপরিবর্ত্তন করতে। ২৮শে তাঁর কথা ছিলো ফিরবার। ভাগ্যবিধাতা তখন বোধ হয় শুধুই হেসেছিলেন।

গত ২৩শে নভেম্বর আচার্য্য জগদীশ—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মহাপ্রস্থান করেছেন কোন অজ্ঞাত রহস্যালোকে। ঋষি জগদীশ!! সাধক জগদীশ!! সত্যদ্রষ্টা স্রষ্টা জগদীশ!!! তোমাকে প্রণাম করি।!



পথে বিপথে

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঠাকুর বেটা--ডাকু।

—সেই যে অশান্ত শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সেই ঘুম যখন ভাঙ্গল, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেহে এই বিশ্রামের অবসর ও সুযোগ পাইয়া সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এখানে সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছিল।

সাঁওতালেরা অতিথিসংকার করিতে ভালবাসে। অশান্ত ঘুম ভাঙ্গিলে আরও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমের জড়তার হাত হইতে মুক্ত হইল না। কেমন যেন একটা নেশার মত ভাবে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।—সে হাত মুখ ধুইয়া বেশ একটু সুস্থ হইল, মনে হইল যেন সে তাহার পূর্ব্বের সেই সাহস ও শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে।

সে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গ্রামখানি ছোট একটি ডুংরি বা পাহাড়ের উপর। এই পাহাড়ের গায়ের ঢালু জমিতে সাঁওতালেরা চাষ-বাস করে। দূরে মাঠের পর মাঠ। মাঝ দিয়া লাল মাটির পথ। সে পথে লোকজন চলা ফেরা করে। দু' একটা ঘোড়ার গাড়ী কিন্তু বেশীর ভাগই গরুর গাড়ী ও মহিষের গাড়ী চলে।

শীতের বেলা। সূর্য্য নামিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ সাঁওতালের নাম মঙ্গরু।

মঙ্গরু—দূর গাঁয়ে একটা হাট করিতে গিয়াছিল। সে অশান্তকে কহিল—তুইত আর আমাদের খাবার খেতে পারবি না, তাই হাটে গিয়েছিলাম।—এখন উঠ্, ডাল ভাত রেঁধে নে—তোদের বাবুদের খাবার তৈরী আমরা ত আর করতে পারবো না।—

অশান্ত রান্না-বান্নার ধার বড় একটা ধারিত না। তার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে বলে যে তোদের রান্নাই খাব।—কিন্তু এইখানে তাহার স্বভাবজাত সংস্কার পাইয়া বসিল। সে কহিল সব ঠিক করে দাও।—

—মঙ্গরুর মেয়ে সব ব্যবস্থা করিয়া দিল। অশান্ত যেমন পারিল রান্না করিল।—সে খাওয়া দাওয়ায় পর সুস্থ হইলে পর—ছোট আর একটি ঘরে তাহার জন্য বিছানা দেওয়া হইল।—তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সাঁওতালেরা মাদল বাজাইয়া গান ধরিয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ মঙ্গরু—অশান্তের কাছে আসিয়া কহিল—হাঁরে বাবু, —তুই এখানে কেমন করে এলি!—অশান্ত চুপ্ করিয়া রহিল। সে জীবনে এই প্রথম সাঁওতালদের দেখিল, এই কৃষ্ণকায় বলিষ্ঠ জাতির হৃদয়ে যেমন সরলতা ও সরসতা আছে, সত্যে নিষ্ঠা আছে, তাহা সে জানিবেই বা কেমন করিয়া। তাই সে ভাবিতেছিল, ইহাদের বলিতে গিয়া সে কি আবার কোন বিপদে জড়াইয়া পড়িবে নাকি ?

—বৃদ্ধ মঙ্গরু মাঝি,সহরে যাইত, বাঙ্গালীদের চিনিত, আর সে ছিল এ গাঁয়ের সর্দ্দার, তাহাকে সকলেই মানিয়া চলিত।

—হাসিয়া কহিল—তুই ভয় করিস্ নে। বল্ কি হ'য়েছিল।

—অশান্ত তখন তাহার জীবনের সব কাহিণী এবং লিনু টিনুর অপহরণের কাহিণী—সন্ন্যাসীর কথা : সেখানে হইতে পলাইয়াই যে সে এখানে আসিয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

—বৃদ্ধ মঙ্গরু গম্ভীরভাবে সব কথা শুনিয়া কহিল—এই !—

তুই কিছু ভাবিস্ নি ! আমি সব খবর নিচ্ছি। সে ডাকিল—গুলাঞ্চ !

অমনি একটি যুবক পাশের বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিল।

অশান্ত তাহার বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। যুবকের মাথায় লম্বা কালো চুল। দু'হাতে বালা। পরণে ছোট একটি কাপড়।—হাতে একটি তীর ও ধনু !

মঙ্গরু কহিল কোথা থেকে এলিরে গুলাঞ্চ।

শিকারে করতে গিয়েছিলেম।

কি মারলি বলত ?

গুলঞ্চ হাসিয়া কহিল একটা তারুগ মারতে গিয়েছিলেম।

মঙ্গরু গুলাঞ্চের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল সাবাস ! শোন গুলাঞ্চ—তোকে একটা কাজ করতে হবে। কাল তুই নীল কণ্ঠেশ্বরীর মন্দিরে যাবি।

কেন বলত সর্দ্দার।

তখন মঙ্গরু মাঝি, সাঁওতালি ভাষায় গুলাঞ্চের কাছে সব কথা কহিল।

গুলাঞ্চ কহিল—সর্দ্দার আমি আজ দুপুর বেলা ঘোড়ার গাড়ীতে করে একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে নিয়ে দেখেছি। বাহার (ফুল) মত দেখতে। তারা বোধ হয় গাড়ী করে চলে গেল।—ই'টেশনের দিকে যেতে দেখ্‌লাম। ছেলেটা বড় কাঁদছিল সর্দ্দার।

তখন মঙ্গরু মাঝি অশান্তের সহিত গুলাঞ্চের পরিচয় করাইয়া দিল। গুলাঞ্চ কহিল, আমি কাল তোকে খুঁজে এনে দেব, ছেলেমেয়েদের কোথায় নিয়ে গেল। আর সন্ন্যাসীই বা কোথায় ? তুই নিশ্চিন্দি থাক।

সব সাঁওতাল তোর জন্যে প্রাণ দিবে। সর্দ্দারের হুকুম, মঙ্গরু মাঝির হুকুম, দশ গাঁয়ের সাঁওতালেরা মেনে নিবে।

অশান্ত কহিল, আমি যে ভাই তোদের ভাষায় কথা বল্‌তে পারি না।

গুলাঞ্জ কহিল, তুই বাঙ্গালা বলবি আমরা বুঝতে পারবো। সহর ত বেশী দূরে নয়।—রোজই বেসাতি করি।—

অশান্ত কহিল, কাছাকাছি ডাকঘর আছে? গুলাঞ্জ ও মঙ্গরু মাঝি এক সঙ্গে কহিল,—হাঁ ইটেসানের কাছে আছে। তুই কি চিঠি দিবি?

হাঁ!

বেশ, ডাকে দিয়ে আসব।—তোকে যেতে দোবনা, যতদিন না ঐ ছেলে-মেয়ে দু'টোর খোঁজ করে আন্‌তে পারি।—তুই আজ ঘুমো।

—পরের দিন সন্ধ্যার সময় গুলাঞ্জ আসিয়া কহিল—ওখানটায় কোন লোক নেই, ঠাকুর বেটা নেই। ওটা ত ডাকু! পালিয়েছে।

পরদিন অশান্ত বালিগঞ্জে ও প্রশান্তদের বাড়ীতে চিঠি দিল।

ষোড়শ অধ্যায়

এই বুঝি লিনু—টিনু

পরদিন সকাল বেলা ষাট সত্তরজন সাঁওতাল রণবেশে সজ্জিত হইল। তাহাদের কালো কুচকুচে শরীর। সকলেরই বলিষ্ঠ দেহ হাড়ে মাসে জড়িত। মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

সাঁওতালেরা তীর ধনু ও বল্লম হাতে করিয়া দলবদ্ধ ভাবে আসিয়া মঙ্গরু মাঝির বাড়ীর অঙ্গনে উপস্থিত হইল।

গুলাঞ্জ ডাকিল—মাঝি!

মঙ্গরু বাহিরে আসিল। তাহার হাতেও তীর ধনু, সেও রণবেশে সাজিয়াছে।—

মঙ্গরু অশান্তকে কহিল—চল ঠাকুর বেটার বাড়ী খুঁজে আসি।

অশান্তের দিকে চাহিয়া মঙ্গরু পুনরায় কহিল,তুই কিছু ভয় পাস্‌নে। মঙ্গরু সর্দ্দার তীর ছুড়লে এখনও একটা বাঘকে ঘাওয়াল করতে পারে। ঠাকুর ডাকুটা—সাঁওতালদের গাঁয়ের কাছে থাকবে আর বাচ্চাদের মারবে সে হবে না। চল্—চল্—সব।

দলে দলে সাঁওতালেরা সেই লাল মাটির পথ ধরিয়া চলিল। তাহাদের দ্রুত গমনের দরুণ পথের লাল ধুলি উড়িয়া চারিদিকটা লাল করিয়া ফেলিল।—অশান্তকে তাহারা মাঝখানে করিয়া এই অভিযান করিতেছিল।—অশান্তের কিন্তু কেমন যেন একটা শঙ্কা বোধ হইয়াছিল। যদি আবার কোন বিপদ ঘটে!

ক্রমে নদী পার হইয়া ঘনবনশ্রেণীর মধ্যদিয়া আবার সেই মন্দিরের কাছে তাহারা আসিল। নূতন দিনের নূতন আলোর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকটা উজ্জল ও দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। আলোর কাছে ভয় ভীতি

কিছুই থাকে না। তারপর আজ অশান্ত যাহাদের সঙ্গীরূপে পাইয়াছিল, তাহারা ভয় কাহাকে বলে জানে না। বনে বনে যাহাদের বাস, শিকার করিয়া যাহাদের খাদ্য যোগাইতে হয়, তাহারা বন-বাদাড়, সাপ বাঘকে ভয় পাইবে কেন? মন্দিরের দরজা তেমনি খোলাভাবে পড়িয়া আছে। মহিষমর্দ্দিণীর রক্ত নেত্র তেমনি জ্বলিতেছে। কিন্তু জনপ্রাণীরও সাড়া পাওয়া গেল না। পাখীরা অশ্রান্ত ডাকিয়া যাইতেছে, কাঠ-বিড়ালীরা এ শাখায় ও শাখায় লাফালাফি করিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু সেই গভীর বনের মধ্যে যে কেহ আছে, এইরূপ মনে হইল না।

তাহারা কেহ কেহ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেখানে কতকগুলি পোড়া কাঠ, ভস্ম মাত্র পড়িয়া আছে—ভয়ানক দুর্গন্ধ, কাহার সাধ্য প্রবেশ করে!

মন্দিরের পেছনে আসিতেই অশান্ত দেখিল, ঘন শালবনশ্রেণী এবং অন্যান্য নানা জাতীয় গাছ রহিয়াছে। সেই তরুশ্রেণীর ও লতা গুল্মের ও শিলারাশির মধ্য দিয়া একটা এক পেয়ে পথ চলিয়াছে। মঙ্গরু ও তাহার দলের লোকেরা সেই পথে চলিতে লাগিল। আধ মাইল মাত্র পথ অতিক্রম করিবার পরই তাহারা দেখিতে পাইল, একটি জলাশয়।জল াশয়টির দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় পোয়া মাইল। চারি ধারে ভয়ানক জঙ্গল। জল কিন্তু বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেক পারেই বাঁধান ঘাট ছিল বলিয়া মনে হয়, এখন মাত্র তাহার চিহ্ন আছে। তাহারা যেখানে আসিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল—দুইটি তিনটি ছোট ডুংরি (ছোট পাহাড়) খাড়া হইয়া আছে। তাহার মধ্যে যেটি সকলের বড়, সেখানে মস্ত বড় একটা গুহা। গুহার মুখে কয়েকটি পাথর ঢাকা দেওয়া। এই পাহাড় তিনটি তিনদিক দিয়া এমন ভাবে খাড়া হইয়া আছে,এবং পাহাড় তিনটির সম্মুখে ও পশ্চাতে এমন গভীর জঙ্গল, শিলা প্রস্তর স্তূপীকৃত যে কাহার সাধ্য এমন একটি স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে?

তিনটি পাহাড় ঘেরাও করা স্থানটি বেশ সমতল। বালু ও কাঁকড়ে ভরা। কতকগুলি সেফালি গাছ বনের মত ঝোঁপের সৃষ্টি করিয়াছে। তলায় অজস্র ফুল পড়িয়া আছে, গাছে ও ফুলের অভাব নাই। মঙ্গরু কহিল—পাথর সরা, জোয়ানেরা।

কয়েকজন সাঁওতাল যুবক সর্দ্দারের আদেশে পাথর সরাইয়া ফেলিল। অশান্ত কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, পাথর সরান মাত্র সে দেখিতে পাইল গুহার ভিতর দিয় একটা পথ যেন অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়াছে। —কি ভীষণ অন্ধকার!

গুলাঞ্চ কহিল, সর্দ্দার, এ ত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! মঙ্গরু মাঝি কহিল, একদল বাইরে থাক্। আর আমরা ত্রিশজন ভিতরে ঢুকি। তোরা বাইরের থেকে, শিকার পেলে করিস্ কিন্তু।—হাঁরে বাবু! তুই হরিণের মাংস খাস্ ত?

অশান্ত হাসিয়া কহিল—হাঁ, সর্দ্দার!

গুহার মুখটা প্রায় চার হাত চওড়া বইবে। খাড়াও তিন হাতের কম হইবে না। মঙ্গরু সকলের আগে গুহায় প্রবেশ করিল। অশান্ত গুহার মুখে প্রবেশ করিতেই হঠাৎ হুঁচোট খাইল। সে কিসে এমন

হুঁচোট খাইল, তাহা মাটি হইতে তুলিয়া দেখিল একটা মাথার খুলি। তাহারা সারি বাঁধিয়া গুহার পানে চলিল। সাম্নের সাঁওতাল যুবকটিকে বলিতেই সে হাসিয়া কহিল—ফেলে দাও!

—তাহারা এই গুহা পথটিকে যেমন ভীষণ মনে করিয়াছিল, পথটি কিন্তু তেমন খারাপ নয়। বেশ পরিষ্কার। দেয়াল মসৃণ। মাঝে মাঝে দুই একটা পাথরের ফাঁটল দিয়া সূর্য্যের আলো আসিয়া অন্ধকারের বিভীষিকাও অনেকটা দূর করিয়াছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা এই পথ অতিক্রম করিয়া আসিল।—হঠাৎ মঙ্গরু সর্দ্দার সকলকে তাড়াতাড়ি আসিবার জন্য ইসারা করিল।

—অশান্ত গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিল—এক অদ্ভুত দৃশ্য।—মস্ত বড় প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারি দিকে দেয়ালের মত খাড়া পাহাড়! সে পাহাড়ে গাছপালার চিহ্নমাত্রও নাই। কালো—অমসৃণ বড় বড় পাথরে পর্ব্বতটি আবৃত।

প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ। গৃহের মধ্যে—বাহিরের মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির অনুরূপ একটি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি এ বেদীর উপর স্থাপিত। দেবীর চরণ তলে রাশি রাশি বিল্বপত্র পড়িয়া আছে।—তা ছাড়া পাঁচটি ঘর। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাসোপযোগী। কতকগুলি মাটির হাঁড়ী বাসনকোসন, মনে হয় যেন এখানে লোকের বাস আছে।

—এমন সময় অশান্ত শুনিতে পাইল—কোথা হইতে যেন শিশুর কান্না, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে শুনা যাইতেছে।—মঙ্গরুও শুনিতে পাইয়াছিল। তাহারা দেখিল সব ঘরের দরজাই খোলা, কেবল একটি ঘরের দরজা বন্ধ। সেই ঘরের ভিতর হইতেই কান্নার শব্দ আসিতেছে!—দরজাটির ভিতর হইতে বন্ধ। এ ত বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নহে।—সকলে কবাট ভাঙ্গিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—একটি শিশু সেখানে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছে!—

মঙ্গরু তাহাকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিল! সুন্দর সুকুমার শিশুটি বাহিরের আলোতে চোখ মেলিতে পারিতেছিল না!—

মঙ্গরু সর্দ্দারের চোখে জল আসিল।—অশান্ত উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া কহিল—সর্দ্দার! সর্দ্দার আমার কাছে দাও! এই বুঝি লিনু!—যাও নিশ্চয়ই টিনুও এখানে আছে। সর্দ্দার, সর্দ্দার—যাও!

মঙ্গরু আবার সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে অশান্ত বাহিরে চীৎকার করিতে লাগিল—লিনু! লিনু! টিনু! টিনু!

—বাহিরের পাহাড়ের গায়ে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—লিনু—টিনু—লিনু—টিনু! শিশুটি মৃতের মত অশান্তের বুকে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিল।

পুবের আলো

বিদেশে বড়দিন

বড়দিন মানে কি সত্যি বড় দিন? আমরা জানি, যিশুখৃষ্টের জন্ম উপলক্ষে যে উৎসব সেই উৎসবের ঋতুটির নাম বড়দিন। কিন্তু যিশুখৃষ্ট কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সে ঠিক কোন্ দিন? অনেক পূর্ব্বে—বছরের বহুরকম দিন স্থির করে যিশুর সম্মানার্থ ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা হতো। প্রথম প্রথম, পঞ্চাশ শতাব্দীর আগে তো কেউ কেউ উড়িয়ে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা—অর্থাৎ, কোন বিশেষ দিনই কেউ যিশুর জন্মদিন বলে মানতে চাচ্ছিলেন না। কেউ বলতেন ওটা গল্প, কেউ নিছক বাজে বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সত্যি সত্যি, পঞ্চম শতাব্দীর আগে ৫ই জানুয়ারী, ২৫শে মার্চ্চ, ২৫শে ডিসেম্বর ইত্যাদি অনেক রকম তারিখ যিশুর জন্মদিন বলে ক্যালেণ্ডারে লেখা থাকতো—ফলে খৃষ্টমাস্ (a mass for christ) উৎসব সব দিনগুলোতেই হোত। বাস্তবিক যিশুর জন্মের ও শৈশবের ভালো রকম ইতিহাস আজও পাওয়া যায়নি। আর এ নিয়ে কত গল্প কত কাহিনী না তৈরী হয়েচে!

বহুদিন ধরে গবেষণার পর হিপ্পোলিটাস্—"ডানিয়েল" থেকে কয়েক লাইন বার করে তার অর্থ করে বুঝিয়ে বললেন যে যিশু বেথলেম্-এ ২৫শে ডিসেম্বর জন্মেছিলেন—এই ঠিক দিন। এর পরে কয়েকটি প্রাচীন ক্যালেণ্ডারে, ও ২৫শে ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন বলে পাওয়া গেল। কিন্তু এতো গেল তাঁর শারীরিক জন্মকথা—তাঁর আধ্যাত্মিক জন্মের কথা, এর আগেও তিনি যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার সম্বন্ধে, জোর্ডানে তারকালোক দেখার দিনপঞ্জী ইত্যাদি বিষয়ে আজও অনেক গল্প, অনেক তর্ক বিতর্ক আছে।

একটা মজার কথা এই—ক্রীশ্চান ধর্ম্মের বহু আগেও ইংলণ্ডে ২৫শে ডিসেম্বর একটা উৎসবের দিন ছিল। ২৫শে ডিসেম্বরে তখন নতুন বছর সুরু হোত। কিন্তু ঐ বিশেষ দিনটিতেই কেন নতুন বর্ষ সুরু হোল? টিউটন দেশগুলি ছাড়া আর কোথাও বড়দিনের উৎসব বা উপহার বলে কোন আসল ব্যাপার নেই।

যা হোক আমরা জেনেচি ২৫শে ডিসেম্বর যিশুর শুভ জন্মদিন আর তা থেকেই হয়েচে বড়দিনের মহোৎসবের উৎপত্তি। আর, যে দেশেই তিনি জন্মাতেন না কেন, যে সময়েই তিনি জন্মাতেন না কেন—তিনি মহাপুরুষ হোতেন। পরের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের মহৎ প্রাণ উৎস্বর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবিত কালে অল্প লোকেই তাঁকে চিনেছিল—তাঁর মৃত্যুও এক বড় মর্ম্মস্পর্শী করুণ কাহিনী। তখন যদি লোকেরা জানতো তিনি কত বড়!

কিন্তু সে অনেকদিন হয়ে গিয়েচে। আজ সর্ব্বদেশে তাঁর জন্মদিনে তাঁর সম্মানার্থ প্রার্থনা, সভাসমিতি ও উৎসব হয়। এই বড়দিনের সময় সমস্ত ইউরোপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ উৎসব আনন্দে জেগে ওঠে। আমাদের যেমন পূজার ছুটির আনন্দ ওদেশে তেমনি বড়দিনের আনন্দ। ছোট ছেলেমেয়ে, কিশোর কিশোরীদের এ সময় ভারী স্ফুর্ত্তি। সমস্ত পড়া থেকে তাদের ছুটি—স্কুলের ছুটি, পরীক্ষা নেই, কেউ তাদের পড়তে বলেন না। আনন্দে হৈ চৈ করে আসর মসগুল করে নিজেরা মেতে যায়।

ছেলেমেয়েরা সব এসময় ভারী মজার মজার উপহার পায়। তোমরা দেখেচো শুনেছো Christmas Tree, Christmas Cakes, Christmas Box, Christmas Crackers এ সবের কথা। সমস্ত দোকানপাট বড়দিনের উপহারের জিনিষ দিয়ে দোকানীরা সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে—আর সে সব ছেলেমেয়েদের খেলনা, পুতুলেই ভর্ত্তি থাকে। সে যে কতরকম কত অদ্ভুত বিচিত্র জিনিষ তার ঠিক নেই। আর তোমরা জানো তাদের ছেলেমেয়েদের উপহার দেওয়ার ইতিহাসটাও কত সুন্দর। তোমাদের যদি কেউ নাম না জানিয়ে চুপি চুপি খুব সুন্দর সুন্দর জিনিষ দিয়ে যান—তোমরা কত খুসী, কত আশ্চর্য্য হও—নয় কি? উৎসবের পর পরমসুখে যখন ছোট ছেলেমেয়েরা বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে—সকালে উঠে দেখে তাদের বিছানার পাশে কে সব মজার মজার উপহার দিয়ে গিয়েচে। সে সময় তাদের মধ্যে যা হুলস্থুল পড়ে—! কে দিয়েচে? স্যাণ্টা ক্লস্ এর গল্প জানো তো? না, না, তিনি সত্যিকারেরই এক ভারী মজার লোক ছিলেন। ছোট ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে গরীব ছেলেমেয়েদের তিনি খুব ভালবাসতেন। বড়দিনের আগের রাত্রে উপহারগুলি নিয়ে এসে তিনি ঘুমন্ত শিশুর পাশে রেখে যেতেন। স্যাণ্টা ক্লস এক দয়ালু ডাচ্ বিশপ বা পাদ্রী ছিলেন। অথচ যিশুকে ভালবাসতেন বলে এক সময়ে তাঁকে জেলে যেতেও হয়েছিল। তিনি এমন চুপি চুপি আসতেন যে তাদের মা বাবাও জানতে পারতেন না। সেই থেকেই বড়দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুপি চুপি উপহার দেওয়ার পালা চলে আসচে। যিনি দেন—তিনি মা বাবা, বন্ধু বা আত্মীয়ই হউন—তিনি হয়ে যান Father Christmas. যিশু ছেলেমেয়েদের বড় ভালবাসতেন। তাই বড়দিন

যেন ছোট ছেলেমেয়েদেরই কেবল উৎসবের দিন। মোজার ভেতর করে উপহার দেওয়ার গল্পও তোমরা জানো। দোকানপাটে দেখেচো অনেক রকম ছোট ছোট জিনিষ পোরা এই মোজাগুলি টাঙ্গানো থাকে। এগুলি Father Christmas এর কাছ থেকে পেয়ে ছেলে-মেয়েদের খুব আনন্দ হয়। এই মোজাগুলির প্রথম ব্যবহার ডাচ্‌রা করেছিলেন।

বড়দিনের উৎসবে তোমরা দেখেচো—রঙীন ছোট বড় গাছ করে তার পাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকানো থাকে কত রকমের উপহার ঝোলান। রাত্রে এর মধ্যে নীল লাল আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করে এই মজার মজার উপহারগুলি গাছ থেকে পাড়তে থাকে। জার্ম্মানরা প্রথম এই গাছের সুন্দর কল্পনাটা করেছিলেন।

মিস্‌ল্‌টো বলে একরকম সাদা ফলওয়ালা সবুজ গাছ দক্ষিণ ইংলণ্ডে জন্মায়। আমেরিকাতেও একরকম মিস্‌ল্‌টো জন্মায়। বড়দিনের সময় "মিস্‌ল্‌টো" করা নিয়ে অনেক হৈচৈ মজা করা হয়। ঘরে ঘরে মিস্‌ল্‌টো টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। আগেকার দিনে মিস্‌ল্‌টো গাছ কোথাও কোথাও পূজো করা হোত।

আগে আগে বারো দিন ধরে ক্রমান্বয়ে বড়দিনের উৎসব চলতো—অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ৫ই জানুয়ারী লম্বা ছুটি। তখন ছোট ছেলেমেয়েরা গান (carol) গেয়ে গেয়ে বাড়ী যেতো আর প্রত্যেক বাড়ী থেকে তারা কেক উপহার পেতো। বড়দিনের সময় ছেলেমেয়েদের গাইবার জন্য কবিরা সুন্দর সুন্দর carols সৃষ্টি করেচেন। যিশু সম্বন্ধে যেমন এই এক ধরণের গান ছিল—

God rest you, merry gentlemen
Let nothing, you dismay,
For Jesus Christ our Savior
Was born on Christmas Day.

তখন সকলের ধারণা ছিল, (এখনও কোথাও কোথাও আছে) যে বড়দিনের সময় পশু পাখীরাও গান করতে, কথা বলতে পারে। যিশু তাদের কথা বলবার শক্তি দেন। এ সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প ও রূপকথা আছে। যাদের পোষা পশু পাখী থাকতো, তারা ভয়ে ভয়ে তাদের খুব আদর যত্ন করতো কোন ত্রুটি থাকলে যদি তারা যিশুকে বলে দেয়! সর্ব্বনাশ! তাহলে তাদের ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। বড়দিনের সময় সারা রাত চারিদিকে আলো জ্বেলে রাখা হয়। যিশু যেদিন জন্মেছিলেন সে রাত্রে যে অন্ধকার থাকতে পারে না। তাদের বিশ্বাস সে রাত্রে ভূত-পেত্নী কারো এসে উপদ্রব করবার উপায় নেই—শিশু যিশু সেদিন

জন্মেচেন যে—। ছেলে মেয়েরা তাই মনের আনন্দে রাত্রে খুসীমত আনন্দ করে বেড়ায়। অন্য রাত্রের মত তাড়াতাড়ি মায়ের কোলে ভয়ে ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়ে না। আজও অনেক দেশে ২৫শে ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিনে সমস্ত ঘরে ঘরে, জানলায় জানলায় মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখা হয়—ছোট্ট শিশু যিশুকে আলো দেখাবার জন্য। আর লম্বা টেবিলে অনেক কেক সাজিয়ে রাখা থাকে যিশুর সঙ্গে যে পরীরা এসেচে তারা যদি সে পথ দিয়ে আসে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য। যিশু যেন ছোট্টদেরই—তারাই যেন তাঁকে সব চেয়ে ভালো করে চেনে। বড়দিনের উৎসব ও-দেশের ছোট ছেলে মেয়েদের তাই সব চেয়ে বড় উৎসব; তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন। আমাদের দেশে অনেকে, বিদেশেও অনেকে শিশু যিশুকে ও বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েচেন।

এই রকমভাবে বহু শতাব্দী ধরে দেশে দেশে শিশু যিশুকে উৎসব আনন্দে আহ্বান করা হয়। আর সে বহুপ্রাচীন কাল থেকে—ইংলণ্ড, ইউরোপ আমেরিকাতে বড়দিনের সুন্দর উৎসবটি চলে এসেচে। শিশু যিশু যেন প্রতিবার এই বড়দিনে জন্ম গ্রহণ করেন ও ছেলেমেয়েরা যিশুর সঙ্গে উৎসব আনন্দে আত্মহারা হয়। ওদেশে বড়দিন তাই কেবল বড়দের জন্য নয় বড়দিন ছোটদের মস্ত দিন—মহোৎসবের সময়। এর জন্য তারা দিন গুণতে থাকে—কবে তাদের স্কুলের ছুটি হবে বড়দিনের!





অমলবাবু নক্সার কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর বললেন, "দেখুন জয়ন্ত বাবু, এখানা যে সেই মন্দিরের নক্সা, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। সেই চার-ঘাটওয়ালা পুকুর, তার কোণাকুনি রাস্তা, চারদিকে চারটি ছোট আর মাঝখানে প্রধান মন্দির, এমন কি কালো পাথরের লম্বাটে বেদীটি পর্য্যন্ত মিলে যাচ্ছে কিন্তু কোন কোন জায়গায় অমিলও রয়েছে।"

জয়ন্ত নক্সার উপরে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, "কি কি মিলছে না, আমাকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলুন।"

—"মন্দিরের ভিতরে, বেদীর সামনে সিঁড়ির মতন ওটা কি আঁকা রয়েছে? আমার বেশ মনে আছে, মন্দিরের ভিতরে ও-রকম কিছুই আমাদের চোখে পড়ে নি।"

—"তারপর?"

—"পুকুরের পশ্চিম কোণে তিন কোণা ঐ কালো অংশটাই বা কি? মন্দিরের বেদীর মাঝখানে একটি সাদা জায়গা আছে—ঐখানেই আমরা বুদ্ধ মূর্ত্তি দেখেছিলুম। কিন্তু পুকুরের কোণেও কালোর মাঝখানে সাদা চিহ্ন আছে, তারও অর্থ বুঝতে পারছি না। পুকুরের ওখানে আমরা জল ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।"

—"আর কোন অমিল দেখতে পাচ্ছেন?"

—"না। তবে মন্দির থেকে পুকুরে আসবার পথের উপরে তিনটে তীর চিহ্ন রয়েছে কেন?"

জয়ন্ত নক্সার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ ভেবে বললে, "আমার মাথায় কতকগুলো সন্দেহের উদয় হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো এখন প্রকাশ ক'রে লাভ নেই, কারণ সে-সব সন্দেহ অমূলক হ'তেও পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে অমিলের কথা বলছেন, তারই মধ্যে পদ্মরাগ-বুদ্ধের সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে।"

অমলবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু, আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে। ওঙ্কারধামে যাবার আগে আমরা শ্যামদেশেও বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা জনপ্রবাদ শুনেছি। ও-অঞ্চলে কোথায় নাকি এক মহা মূল্যবান বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, তা নাকি তুলর্ভ মণিমাণিক্য কেটে এক সঙ্গে জুড়ে জুড়ে গড়া! কিন্তু সে মূর্ত্তির ঠিকানা কেউ জানে না! অবশ্য এটা আমরা জনপ্রবাদ ব'লেই উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ জনপ্রবাদ অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়!"

মাণিক বললে, "ভেবে দেখ জয়ন্ত, পদ্মরাগও হচ্ছে মহা মূল্যবান মণি! এই মণি দিয়ে যদি বুদ্ধমূর্ত্তি গড়া হয়, তবে তার পদ্মরাগ-বুদ্ধ নাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক!"

জয়ন্ত বললে, "সন্ন্যাসীও এমন পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন, যার জন্যে পৃথিবীর যে কোন সম্রাট লালায়িত হ'তে প্যারেন!"

—"পদ্মরাগ-বুদ্ধ! আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়, তবে সে মূর্ত্তি সম্রাটের পক্ষেও লোভনীয় বটে!"

—"পদ্মরাগ-বুদ্ধ! সে মূর্ত্তি কত বড়? কতগুলো পদ্মরাগ-মণি দিয়ে সে মূর্ত্তি গড়া হয়েছে? মাণিক, এই অসম্ভব সম্পদের কথা ভাবতেও আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে!"

অমলবাবু মাথা নেড়ে হেসে বললেন, "কিন্তু সেই মণিময় বুদ্ধ কোথায় লুকিয়ে আছেন, কেউ তা জানে না!"

জয়ন্ত বললে, "অমলবাবু, লোভের মহিমা দেখুন! মণিময় বুদ্ধের নাম শুনেই আমি পরম ভক্ত বৌদ্ধ হয়ে পড়েছি!"

—"কিন্তু জয়ন্তবাবু, এটাও ভুলে যাবেন না যে, সারা মন্দির তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও আমরা চূণপাথরে গড়া বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাই নি!

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "আপনিও ভুলে যাবেন না যে, এই চূণপাথরে গড়া মূর্ত্তির মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি চাবি আর নক্সা-আঁকা চাক্তি! বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে এমন ছুটো জিনিষ লুকিয়ে রাখবার কথা কে কবে শুনেছে? এত লুকোচুরির কারণ কি অত্যন্ত অসামান্য নয়? সেই কারণটাই কি বুঝিয়ে দিচ্ছে না যে আমরা কল্পনাতীত কোন সুদুর্লভ বস্তু লাভ করতে পারি? এই জন্যেই এমন একটি সাধারণ মূর্ত্তির লোভে কেউ নরহত্যা

করেছে, হয়তো আজ আপনাকেও খুন করত! কিসের এই চাবি? চাবিটা যে-রকম বড়, তাতে মনে হচ্ছে, এর দ্বারা খুব বড় কুলুপই খোলা যায়! সে কুলুপ কোথায় লাগানো আছে? আপনার মতে, এই চাক্তির উপরে সেই ভাঙা মন্দিরের নক্সা আছে। কিন্তু নক্সার ঐ সিঁড়ির রহস্যটাই বা কি? ওরকম কোন সিঁড়ি আপনি দেখতে পান নি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই ও-সিঁড়ি কাল্পনিক নয়—নক্সার সবটাই যখন মিলছে তখন ও-সিঁড়ি কাল্পনিক হ'তে পারে না, ওর অস্তিত্ব আছেই।"

অমলবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন, "না, ওর অস্তিত্ব নেই!"

জয়ন্তও দৃঢ় স্বরে বললে, "কিন্তু আমি যদি ওর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি?"

—"কেমন ক'রে?"

—"ওঙ্কারধামে গিয়ে।"

—"ওঙ্কারধামে গিয়ে? সে যে হবে মরীচিকার পিছনে ছোটার মত! ঐ অদৃশ্য সিঁড়ি, আর পুকুরের কোণে আর এক অদৃশ্য রহস্য, এরা কোন্ যাদু-মন্ত্রে আবার দৃশ্যমান হবে?"

—"বুদ্ধির যাদু-মন্ত্রে অমলবাবু, বুদ্ধির যাদুমন্ত্রে!"

অমলবাবু আহত কণ্ঠে বললেন, "অদৃশ্য সিঁড়ি দেখতে পাইনি ব'লে আপনি কি আমাকে এক নম্বরের গাধা ব'লে মনে করেন?"

জয়ন্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, "না, না অমলবাবু, আপনকে বোকা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়! আমার বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকরাও সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না। ধরুন, প্রত্নতত্ত্বের কথা। ও বিভাগে আপনার তুলনায় আমার বুদ্ধি একেবারেই অকেজো। আবার, আমার বিভাগে আপনার মাথাও বেশী সুবিধা ক'রে উঠতে পারবে ব'লে মনে হচ্ছে না। এই চাবি আর সোণার চাক্তির ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন না! বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আপনাদের কাছে এতদিন ধ'রে রয়েছে, তবু এমন ছুটো অদ্ভুত জিনিষ আপনারা আবিষ্কার করতে পারেন নি! আর একটা প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি এখানে এসেই আমি যখন বারান্দায় গিয়েছিলুম, তখন কতকগুলো কাদা মাখা পায়ের দাগ চোখে প'ড়েছিল! এতক্ষণ সেগুলো পরীক্ষা করবার সময় পাই নি, এইবারে তাদের কাছে যাওয়া যাক্। আসুন অমলবাবু, এস মাণিক!"

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। লম্বা বারান্দায় সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে তার অনেকগুলোই বেশ স্পষ্ট।

জয়ন্ত বললে, "এগুলো নিশ্চয়ই চোরের পায়ের দাগ! আচ্ছা অমলবাবু, এই দাগগুলো দেখে আপনার কি মনে হয়?"

অমলবাবু সেগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "কী আবার মনে হ'বে? ওগুলো হচ্ছে চোরের পায়ের দাগ!"

জয়ন্ত হেঁট্ হয়ে প'ড়ে দাগগুলো তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষা করতে করতে বললে, "আর কিছু মনে হয় না?"

অমলবাবু বললেন, "আমার মনে হয় দাগগুলো অতিরিক্ত বড়!...কিন্তু জয়ন্তবাবু, পায়ের দাগ নিয়ে অত বেশী মাথা ঘামাবার কি আছে? আসামী যখন পলাতক, তখন ঐ দাগগুলোর ভিতর থেকে তাকে তো আর গ্রেপ্তার করা যাবে না!"

কিন্তু সে কথা বোধ হয় জয়ন্তের কাণে ঢুকল না। পকেট থেকে নস্যদানী বার ক'রে সে ঘন ঘন নস্য নিতে লাগল, নীরবে!

তারপর সে বললে, "পৃথিবীতে যেদিন থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে, সেইদিন থেকেই যে-সব প্রমাণের জোরে অপরাধী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে পায়ের দাগই হচ্ছে প্রধান!"—একটু থেমে, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার বললে, "অমলবাবু, আমি একটি লোকের চেহারার কথা বলব, তাকে আপনি চেনেন কি? মাথায় সে খুব ঢ্যাঙা. মাপ্‌লে সাতফুটও হ'তে পারে। তার দেহও রীতিমত হৃষ্টপুষ্ট। তার গায়ে অসুরের মতন জোর। সে ডানপাশে একটু বেশী হেলে প'ড়ে হাঁটে। আর—আর তার ডানপায়ের ক'ড়ে আঙুল নেই!"

প্রথমে অমলবাবু হতভম্বের মতন ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর মুখে-চোখে গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "জয়ন্তবাবু, আপনি চ্যান্‌কে চিন্‌লেন কেমন ক'রে?"

জয়ন্ত দুই ভুরু কুঁচ্‌কে জিজ্ঞাসার স্বরে বললে, "চ্যান্?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চ্যান্—ওঙ্কারধামে সে আমাদের কুলির সর্দ্দার ছিল। সন্ন্যাসীর কথায় তাকে আর তার বন্ধু ইন্‌কে আমরা বিদায় ক'রে দিয়েছিলুম। আপনার মুখে এখনি অবিকল চ্যানেরই বর্ণনা শুনলুম, আর তাকে আপনি চেনেন না!"

জয়ন্ত আর এক টিপ্ নস্য নিয়ে খুসিমুখে বললে, "না, চ্যান্‌কে আমি চিনি না! তাহ'লে চ্যানের দেহ হচ্ছে বেজায় ঢ্যাঙা, জোয়ান আর মোটা সোটা?"

—"হ্যাঁ! আর তার ডান পায়ের ক'ড়ে আঙুল নেই।"

—"উত্তম! মাণিক, কাল ভোরে উঠেই আগে আমাদের বন্ধু ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবুকে ফোন্ ক'রে সব কথা জানিও। চ্যানের নামে কালকেই যেন ওয়ারেণ্ট বার করা হয়। কারণ

খুব সম্ভব সুরেনবাবুকে সেইই খুন করেছে। আর আজকে চ্যান্ই যে অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল, তার প্রমাণ ঐ পদচিহ্ন!"

অমলবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, "জয়ন্তবাবু, কী বলছেন! চ্যান্ কি কলকাতায় আছে?"

—"পদচিহ্ন তো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে!"

—"পদচিহ্ন! অসম্ভব, পায়ের দাগে কি চেহারার বর্ণনা লেখা থাকে?"

—"থাকে। এ বর্ণনা পড়তে পারে কেবল বিশেষ বুদ্ধি! পায়ের দাগগুলো আর একবার ভালো ক'রে দেখুন, বর্ণনা পড়তে বেশী সময় লাগবে না। আপনিও তো দেখেছেন, পায়ের ছাপগুলো অতিরিক্ত বড়! সাধারণতঃ ছোট চেহারার পায়ের দাগ এত বড় হয় না। তারপর প্রত্যেক পদচিহ্নের মাঝখানকার ব্যবধান লক্ষ্য ক'রে দেখুন। এই ব্যবধানের মাপ দেখেও আকৃতির দীর্ঘতা আন্দাজ করা যায়। বেঁটে লোকের চেয়ে ঢ্যাঙা লোকেরা বেশী তফাতে পা ফেলে হাঁটে। দাগগুলো কি-রকম স্পষ্ট দেখেছেন? হাল্কা দেহ বহন করে যে-সব পা, তাদের ছাপ্ আরো কম স্পষ্ট হ'ত। ডান পায়ের প্রত্যেক ছাপের ডানপাশটা বেশী চেপে মাটির উপরে পড়েছে; কারণ এগুলো যার পায়ের দাগ, সে ডানপাশে বেশী হেলে হাঁটে। তার ডান পায়ের ক'ড়ে আঙুল যে নেই, এ সত্য তো ছাপ্ দেখে বালকরাও ধরতে পারবে! আর তার গায়ের জোর তো আমরা সকলেই দেখেছি! সে আজ চোখের পলকে আপনার অত-বড় পালোয়ান দরোয়ানকে কুপোকাৎ ক'রে স'রে পড়েছে!.. ...দেখছেন তো অমলবাবু, আমাকে বেশী বুদ্ধি খরচ করতে হয়নি, আমি কেবল বুদ্ধির যথা-ব্যবহার করেছি, সাধারণ লোকে যা করতে পারে না!"

অমলবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, "কিন্তু চ্যান্ এসেছিল আমাকে খুন করতে! কোথায় কাম্বোডিয়া, আর কোথায় কলকাতা! কি আশ্চর্য্য!"

—"এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই! ওঙ্কারধামের সন্ন্যাসী তো চ্যান্ আর ইন্ সম্বন্ধে আপনাদের আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন! নিশ্চয়ই তিনি জানতেন যে, চ্যান্ আর ইন্ পদ্মরাগ-বুদ্ধের সন্ধানে আছে! পদ্মরাগ-বুদ্ধকে লাভ করতে হ'লে যে চূণপাথরে গড়া বুদ্ধ-মূর্ত্তিটিকে দরকার, চ্যান্ কোনগতিকে সেটাও টের পেয়েছে। ঐ মূর্ত্তি এখন আপনার দখলে তাই শত্রুর দৃষ্টি আপনার উপরেই পড়েছে! এতক্ষণে সব রহস্য তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল!"

অমলবাবু সভয়ে বললেন, "আমি তো পদ্মরাগ-বুদ্ধ চাই না, তবে আমার প্রাণ নিয়ে এত টানাটানি কেন?"

জয়ন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললে, "কে বলে আপনি পদ্মরাগ-বুদ্ধ চান না ? এক হপ্তার ভিতরেই আপনার সঙ্গে আমরাও যে পদ্মরাগ-বুদ্ধকে আনবার জন্যে ওঙ্কারধামে যাত্রা করব !"

—"বলেন কি মশাই ? একটা জনপ্রবাদের পিছনে দৌড়ে অপঘাতে মারা পড়ব ? পদ্মরাগ-বুদ্ধের মূল্য যদি লক্ষ-কোটি টাকাও হয়, তাহ'লেও ওর মধ্যে আমি নেই ! আপাতত কেবল চ্যানের সাংঘাতিক অনুগ্রহ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, প্রতিদানে ঐ চাবি আর চাক্তি আপনাদের হাতে আমি সমর্পণ করলুম। পদ্মরাগ-বুদ্ধ পেলে সে মূর্ত্তি নিয়ে আপনারা যা-খুসি-তাই করতে পারেন, তার উপরে আমার আর একটুও লোভ নেই।"

মাণিক বললে, "আচ্ছা, ও-সব কথা পরে হবে অখন। কিন্তু আপাততঃ এইটেই আমি বুঝতে পারছি না যে, বিদেশী লোক হয়েও চ্যান্ কি ক'রে অমলবাবুর বাড়ীর অন্ধিসন্ধির সব খবর রেখেছে ? সে কেমন ক'রে জানলে, অমলবাবুর ঘরের কোথায় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, আর গৃহকর্ত্তা নিদ্রিত ? বুঝে দেখ জয়, চ্যান্ অন্ধকারেই ঘরে ঢুকে মূর্ত্তিটিকে অনায়াসে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল !"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি মাণিকের পিঠ চাপড়ে খুসি কণ্ঠে বললে, "সাবাস মাণিক, সাবাস ! তুমি খুব বড় প্রশ্ন তুলেছ, এ-কথা তো আমার মাথাতেও ঢোকে নি ? চ্যান্ এত হাঁড়ীর খবর রাখলে কি ক'রে ?

অমলবাবু বললেন, "আপনাদের কথা শুনে আর একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে। আজ কিছুদিন ধ'রে লক্ষ্য করছি, এই পাড়ায় চার পাঁচজন বর্ম্মী লোক প্রায় আনাগোনা করে। দেখলে মনে হয় যেন তারা এই পাড়ারই বাসিন্দা !"

জয়ন্ত বললে, "তাই নাকি ? তাহ'লে তারা নিশ্চয়ই এই বাড়ীর উপরে পাহারা দেয় ! কিন্তু তারা ঘরের ভিতবকার খোঁজ রাখলে কেমন করে ?......আচ্ছা অমলবাবু, পথের ওপাশে ঐ মস্ত বাড়ীখানায় কে থাকে বলতে পারেন ?"

—"ওটা মেস-বাড়ীর মত। ওখানে দেশ বিদেশের লোক থাকে, কিন্তু তারা কেউ বাঙালী নয়।"

—"তাহ'লে ও বাড়ীর তিনতলার ঘর থেকে আপনার এই ঘরের ভিতরে নজর রাখা খুবই সহজ দেখছি ! কে বলতে পারে এই মুহূর্ত্তেই ওখানে ব'সে কেউ আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে কিনা ?"

অমলবাবু চম্‌কে উঠলেন, ম্লান মুখে বললেন, "বলেন কি ? আমি কি তবে শিয়রে শমন নিয়ে বাস করছি ?"

জয়ন্ত বললে, "আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করা যাক্। আমরা দুজনে আপনাকে নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আপনিও প্রতি-নমস্কার ক'রে ঘরের আলো নিবিয়ে দিন। যদি কোথাও শত্রু জেগে থাকে, সে মনে করবে আমরা বিদায় হয়েছি, আর আপনি আবার শুয়ে পড়েছেন। এই পরীক্ষার ফল কি হয়, দেখা যাক্।"

কথা-মত কাজ হ'ল। জয়ন্ত ও মাণিক ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, ঘরের আলো নিবে গেল এবং তার পরেই রাস্তার দিক থেকে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজ!

জয়ন্ত বললে, "যা ভেবেছি তাই! আমাদের উপরে কড়া পাহারা বসেছে! কেউ বোধ করি বাঁশীর সঙ্কেতে কাদের জানিয়ে দিলে যে, 'সবাই হুঁসিয়ার হও, শত্রুরা এখনি রাস্তায় বেরুবে!' ওরা কি আমাদেরও পথে আক্রমণ করতে চায়? ওরা কি ও-বাড়ী থেকে দেখেছে যে, চাবি আর চাকৃতি আমার পকেটে ঢুকেছে? আচ্ছা, এস! আর একবার অন্ধকারে অমলবাবুর ঘরে ঢোকা যাক্!"

জয়ন্ত আস্তে আস্তে বারান্দার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তখন বৃষ্টির প্রবল ঝোঁকটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু জল তখনো ঝির-ঝির্ ক'রে ঝরছিল, রাস্তা দিয়ে তখনো হাঁটু-ভোর জলের ধারা কল্-কল্ ক'রে ছুটছিল এবং শেষ-রাতের আকাশের বুকে পুরু মেঘের কালো পর্দ্দা ছিঁড়ে তখনো থেকে থেকে বিদ্যুতের অগ্নি-অক্ষরগুলো ঝক্‌মক্ ক'রে জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছিল। সেই মুহূর্ত্তেই আবার বিদ্যুৎ ফুটল এবং জয়ন্ত স্পষ্ট দেখলে, ওপাশের বাড়ীর তিন-তালার বারান্দা থেকে একটা মূর্ত্তি রেলিংয়ের উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে নীচের পথের দিকে তাকিয়ে আছে!

ক্ষণিক আলোতে তাকে ভালো ক'রে দেখা গেল না—কিন্তু কে সে? চ্যান্, না আর কেউ?

ক্রমশঃ



চলন্তিকা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কথা কাগজ পত্রে অনেক কিছুই লেখা হোল, রংমশালে আমাদের স্মরণীয় বিভাগে এঁর জীবনী তোমরা পাবে। কিন্তু এতো বলে লিখেও—আচার্য্য জগদীশ সম্বন্ধে আমরা যেন সব জানতে বা জানাতে পারচি না। তাঁর আবিষ্কারের কথা এত বিশদ, তাঁর বৈজ্ঞানিক অভিযানের বিষয়গুলি এত আশ্চর্য্য যে সমস্ত তাঁর গুণাবলী লেখা এক অসম্ভব ব্যাপার। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন—তাঁর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীতে এক মস্ত দান। সত্যপ্রয়াসী দরদী মন ছিল তাঁর। মূক গাছ-পালার পরিচর্য্যার ভার তিনি নিয়েছিলেন, তাদের তিনি দিয়েচেন নতুন জীবন। ছোট ফুল, ছোট ছোট লতাপাতা—এদের যে সত্যিকারের বোধশক্তি আছে তা তিনি দেখিয়েছেন এবং এই সত্যানুসন্ধানে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেচেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে বলেচেন যে তিনি যাতে নিছক কল্পনা খেয়াল দিয়েছেন, জগদীশ তাতে দিয়েচেন সত্য। তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না—তিনি ভারতের বৈশিষ্টে প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন। তোমাদের সঙ্গে আমরা তাঁকে প্রণতি জানাই।

সাদা বাঘের কথা আমরা রংমশালে কয়েকমাস আগে বলেছিলাম। গিধাউর এর মহারাজা গিধাউ'র জঙ্গলে এক সাদা বাঘ মেরে কলকাতার মিউজিয়মে উপহার দিয়েচেন। তোমরা এ সাদা বাঘটি মিউজিয়মে গিয়ে কেউ কেউ দেখে এসে থাকবে। সাদা বাঘ ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষে কেন—সমস্ত পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত, যা শোনা যায়, কেবল উড়িষ্যা, বিলাসপুর, সোহাগপুর ও মধ্যপ্রদেশ—এই দেশগুলির জঙ্গলে সাদা বাঘ দেখা গিয়েচে। আমরা বলেছিলাম-এই "এ্যালবিনো" বা সাদা বাঘ-এর রং তার নিজের জাতের রং নয়। সাধারণতঃ বাঘের গায়ের লাল্‌চে বা হলদে ভাগ কম হলে বা একেবারে না জন্মালে তার রং সাদা বা মাখন রং-এর হয়ে যায়। কলকাতা মিউজিয়মে যে সাদা বাঘটাকে দেখেচো এরও হয়েছিল তাই—আর এই সাদা হওয়ার দরুণ তার গায়ের বাদামী লম্বা লম্বা দাগগুলো এরূপ স্পষ্ট ফুটে উঠেচে। এই রং-এর পরিবর্ত্তনে বাঘের একটা ঘোর রংও হয়ে থাকে—কালো বাঘও দেখা গিয়েচে কোন কোন জঙ্গলে।

আমরা কয়েকমাস আগে থেকে শুনে আসচি যে হিমালয়ে বরফের ওপর এক রকম অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া গিয়েচে এবং সে যে কার পায়ের দাগ সে নাকি এক রহস্যজনক ব্যাপার। তিব্বত ও হিমালয়ের লোকদের একটা আশ্চর্য্য বিশ্বাস আছে যে হিমালয়ে প্রকাণ্ড মানুষ-রাক্ষসেরা বাস করে—তিব্বতীরা তাদের বলে—"মির্কা" বা "মি-গো" যার ইংরিজী মানে "Abominable Snowmen"। মিঃ স্মাইথ তদন্ত করে এ বিষয় সমাধান করে দিয়েচেন। মিঃ স্মাইথ এক বিখ্যাত এক্সপ্লোরার, হিমালয় অভিযানে তিনি তাঁর দল নিয়ে বহু উচ্চে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি বলেচেন এই পায়ের ছাপ আসলে বার তের ইঞ্চি লম্বাও ইঞ্চি ছয়েক চওড়া, কিন্তু সূর্য্যের তাপে বরফ গলাতে এই পায়ের ছাপগুলো বড় দেখায়। এত বড় দেখায় যে মনে হয় এ দাগগুলো বুঝি কোন হাতির বাচ্চার হবে। মিঃ স্মাইথ এই পায়ের ছাপগুলোর অনেক রকম মাপ জোপ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের দেখান। তাঁরা বহু পরীক্ষা করে বলেন—এ পায়ের ছাপ হচ্চে একরকম ভাল্লুকের—এই বিশেষ ভাল্লুকগুলি পশ্চিম ও পূর্ব্বহিমালয়ে বাস করে ও সেখানকার অতি প্রাচীন অধিবাসী।

হিমালয়ে আবার একটা বড় রকম অভিযানের তোড় জোড় হচ্চে এবং আবার মিঃ স্মাইথ বা মিঃ সিপটন্—একজন হবেন অভিযানটির নেতা। সকল রকম আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে নেওয়া হবে কিন্তু লোকসংখ্যা কম করে ফেলা হবে, তার কারণ, ছোটদল সহজে ও সুবিধেমত চলাফেরা করতে পারে। এ দলটি পরের বছর গোড়াতেই ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করবে এবং বর্ষা সুরু হবার আগেই হিমালয় চড়াই করবে। দেখা যাক এবার এ অভিযানের ফলাফল কি হয়।

আজকাল দুর্ঘটনার পালা যেন ক্রমশঃ পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্চে এবং শুধু ডেঙ্গায় নয়, জলেও, আকাশেও। ইম্পিরীয়েল এয়ারওয়েসদের ফ্লাইং বোট Cygnus গত ২রা ডিসেম্বর করাচী ছেড়ে পরে বৃন্দিসি পৌঁছে—বৃন্দিসিতে জল থেকে ঠিক ওড়বার আগেই এক ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়ে যায়—এটা এতো আকস্মিক হয় যে Cygnus তার balance হারিয়ে ফেলে, ফলে ঘুরে পড়ে জলেতেই ভীষণ জোরে আছড়ে পড়ে এবং তার সামনের ও পেছনের দিকটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। অনেক যাত্রী এই ভীষণ সংঘর্ষণে তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে—কারুর কারুর এতো আঘাত লেগেচে যে তাদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। একজন ভারতীয় পাইলট মিঃ শর্ম্মা এই বোটে ছিলেন, তাঁর অবস্থাও আশাজনক নয়। এই বোটে ৩০শে নমেম্বরের কলকাতার ডাক ছিল।

জাপানীরা নাকি শীঘ্রই কলকাতা আক্রমণ করতে আসচে ! তারা চুপি চুপি এরোপ্লেনে এসে ওপর থেকে কলকাতার ওপর নাকি বোমা ফেলবে। ব্যাপার বড় সুবিধে মনে হচ্চে না। যে রকম যুদ্ধের সুচনা হচ্চে ও-সব দেশে তাতে কিছু আশ্চর্য্য হবার নেই। ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরার দিকে চেয়ে সবার লোভ। তাহলে ইংলণ্ডকে এবার যুদ্ধে নামতে হোল। তার মানে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। কিন্তু আপাততঃ জাপানী প্লেন বোমা ছাড়তে সুরু করলে কলকাতায় আমাদের মতো ভালোমানুষদের কি দশা হবে ! ও-দেশে তো বড় বড় সহরে মাটির নিচে ঘর দোর তৈরী হয়েচে। কলকাতায় সে রকম তো কিছু দেখচি না, তবে আমরা যাই কোথা ? আমরা কি ছাতে উঠে তখন বাজি দেখবো ? করাচীতে শোনা যাচ্চে গ্যাস-প্রুফ ঘর ও ছাত তৈরী হচ্চে। তারপর বিপদ টের পেলে মিলিটারীরা বিগল্ ও সাইরেন বাজিয়ে খবর চারিদিকে রাষ্ট্র করে দেবে যাতে তখনই লোকেরা গ্যাস ও বোম্ব-প্রুফ ঘরে পালাতে পারবে। শীঘ্রই ভারতবর্ষে নাকি গ্যাস-মুখোস বিক্রী হবে—তার দামও নাকি ঠিক হয়েচে তের টাকা করে—যারা গরীব তারা কি করবে ? আট আনা, চার আনা করে গ্যাস মুখোস বিক্রী না করলে কি হবে। আর এক মজার ব্যাপার শোনা যাচ্চে যে এই গ্যাস মুখোস পরলে নাকি হাঁপানি সেরে যায় বিলেতের গ্যাস-মুখোস ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে বেশ দুপয়সা লাভ করবে।

বড়দিনের ছুটিতে কলকাতার আকর্ষণ খুব বেশী ও সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্চে খেলাধূলো। বেশ শীত পড়েচে কাজেই রোদ্দুরে বসে খেলা দেখতে বা খেলাধূলো করতে খুব মজা লাগে। ক্রীকেটের ধূম তো পড়েই আছে। তারপর বড়দিনের মধ্যেই লর্ড টেনিসনের দল এসে আশা করা যাচ্চে ক্রীকেটের আসর জমাবেন। যাদের টেনিস খেলা ভাল লাগে তাদের মস্ত খোরাকের বন্দোবস্ত হয়েচে। বিখ্যাত টিলডেনের দল ভারতবর্ষে এসেছেন এবং ডিসেম্বরের শেষে তাঁরাও কলকাতার সাউথ ক্লাবে খেলা আরম্ভ করবেন। তাছাড়া ভারতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা তো সুরু হয়েচেই। আর হবে পোলো খেলা ময়দানে এবং কয়েকজন নামকরা পোলো খেলোয়াড়কে দেখা যাবে। এসব তো আছেই আর আছে ঘোড়দৌড়, কুকুর-দৌড় (Greyhound Racing) এসব খেলার মেলাও বসে যাবে। কুকুর-দৌড় কলকাতায় এই প্রথম। সাঁতারের প্রদর্শনীর কথা আমরা বলেচি—মিস ম্যান্সফিল্ড ও ডেসজডিনস হেদুয়ার জলে তাদের কলা কৌশল দেখাচ্চেন। তারপর, সার্কাস সিনেমা নাচ গান এ সবেরও মস্ত আয়োজন হবে। কিন্তু আমাদের তো মনে হয় দলবেঁধে মিষ্টি রোদ্দুরে বসে কলকাতার মাঠে পার্কে খেলাধূলো করা বা দেখাই বড়দিনের সবচেয়ে বড় আনন্দ।



শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সমর নিজের বুকের কাঁপুনি যেন শুনতে আছে। ছেলেবেলা প্রথম বায়স্কোপ দেখতে গিয়ে যেমন হয়েছিল এ যেন অনেকটা তাই। সমস্ত দেহ মন অধীর উৎসুক হয়ে আছে। সামনে সেদিন রহস্যময় সাদা পর্দ্দা টাঙ্গান ছিল। কি তাতে দেখা দেবে, কি অপরূপ বিস্ময়—কিছুই জানা নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেদিনকার মত আজও সমর অপেক্ষা করে রইল।

মেঘের শেষ পর্দ্দা সরে গেল। হাউই জাহাজ ধীরে ধীরে নামছে—কোথায়!

এখনো ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওই বিশাল অসীম যে কালো রঙের ছোপ দেখা যাচ্ছে—ওই কি বুধের সমুদ্র! আর ওই মেটে সবুজ—ওকি বুধের অরণ্যের রঙ!

তাহলে বুধেও অরণ্য আছে! নিস্প্রাণ মরুভূমি বুধ নয়!

কিন্তু অরণ্যের একি রূপ! হাউই জাহাজ নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমরের বিস্ময় বাড়ছে। পৃথিবীর কোন জঙ্গলের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। একি সত্যিই জঙ্গল না আর কিছু?

সমর দূরবীণটা আরো ভালো করে ফোকাস্ করতে যাচ্ছে এমন সময় স্টাইন ডাকলে—সমর শীগ্গীর শোন।

সমর দূরবীণ ছেড়ে কাছে যেতেই ষ্টাইন উত্তেজিত ভাবে বল্লে এই লিভারটা চেপে ধরে থাক। ব্রেকে একটু গলদ আছে মনে হচ্ছে। জাহাজ এবার খুব সাবধানে চালিয়ে নামাতে হবে। কোন রকমে সমুদ্রে পড়লেই সর্ব্বনাশ!

ষ্টাইন এবার নিজে দূরবীণের ভেতর দিয়ে বুধের চেহারা দেখতে দেখতে জাহাজ চালাতে লাগল।

কিছুই সমর আর দেখতে পাচ্ছে না বলে উদ্বেগ তার আরো বেশী। জাহাজের ব্রেকে গলদ আছে বলছে স্টাইন। এতদূর এসেও কি তারা সত্যিই আছড়ে পড়বে বুধের গায়ে!—ডুবে যাবে বুধের কালীর মত কালো সমুদ্রে? বুধের রহস্যভেদ কি আর মানুষের দ্বারা সম্ভব হবে না!

কিছুই বলা যায় না। ব্রেকের লিভার সমর প্রাণপণে চেপে আছে। লিভার ঠেলে রাখতে যে জোর লাগছে তাতে বোঝা যাচ্ছে জাহাজের পতন থামাবার জন্যে হাউই বারুদের যে নলগুলি আছে সেগুলি ঠিক কাজ করছে না। কোথায় তারা পৌঁছেছে, চোখে দেখতে পেলে সমর যেন আর একটু সান্ত্বনা পেত! হাউই জাহাজ যদি ধ্বংসই হয় তবু বুধের চেহারা আর একটু ভাল করে দেখে মরতে পারত।

কিন্তু উপায় কি? ব্রেকের দোষে হাউই-নল থেকে বারুদের বিস্ফোরণ এক এক সময়ে থেমে যাচ্ছে। পরের মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত জোরে নল থেকে আগুন বেরোচ্ছে। সমস্ত জাহাজ তাইতে কেঁপে ওটার সঙ্গে সঙ্গে সমরের মনে হচ্ছে এখুনি বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে। এই বদ্ধ জাহাজের খোলে ইঁদুরের মত বদ্ধ হয়ে মরতে হবে তাদের।

হটাৎ ষ্টাইন চীৎকার করে উঠল। ব্রেকের লিভারটা সমরকে সবলে ছিটকে ফেলে তখন সোজা হয়ে গেছে।

হাউই জাহাজ বিদ্যুৎ বেগে পড়ছে সমর টের পাচ্ছে। বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত অনুভূতি, বুকটা একেবারে খালি হয়ে যাচ্ছে যেন। গভীর কয়লার খনিতে লোহার খাঁচা দিয়ে সবেগে নামবার সময় যে রকম মনে হয় এ অনুভূতি তার চেয়েও নিদারুণ।

সমর সব বুঝতে পারছে তবু লিভারটা আবার ঠেলে ধরবার তার সামর্থ্য নেই। স্টাইন দূরবীন ছেড়ে ছুটে আসছে সমর টের পাচ্ছে। তবু একটি হাত তুলতেও যেন সে ভুলে গেছে।

স্টাইন লিভারটা ধরবার পর তার হুঁস হল যেন। প্রাণপণে দুজনে এবার লিভারটা চাপাবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু আর সময় আছে কি? জাহাজ একেবারে মাটির ওপর এসে পড়েছে। ব্রেক এখন কাজ করলেও তার বেগ আর রোখা যাবেনা।

এই তারা আছড়ে পড়ল বলে।

কিন্তু একি! জাহাজ চুরমার হওয়ার জন্যেই তারা অপেক্ষা করছিল, তার বদলে প্রথমে শুধু একটা ঝাঁকুনি টের পাওয়া গেল, তাও এমন কিছু প্রবল নয়। তারপর অত্যন্ত নরম মখমলের কোন গদির ওপর জাহাজটা ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে মনে হল।

তারা কি তাহলে সমুদ্রের ওপরেই পড়েছে, ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে বুধের কালো জলে?

না, তাহলে জলের সঙ্গে প্রথম ধাক্কাটা অমন আস্তে হত না। তাছাড়া এই ত হাউই জাহাজ থেমে গেছে।

স্টাইন চীৎকার করে উঠল আনন্দে—আমরা নেমেছি, বুধের ওপর নেমেছি!

সমর দৌড়ে যাচ্ছিল পেছনের পাকা জানলার প্লেট সরিয়ে বুধের চেহারা দেখবার জন্যে। স্টাইন তাকে বাধা দিয়ে বল্লে—দাঁড়াও, ব্যস্ত হোয়ো না। এখন আমাদের অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। বুধ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই।

এ সময়ে স্টাইনের এতটা সাবধানতা যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল সমরের। তার কি তখন তর সয়! কন্ট্রোল বোর্ডের পাশের একটা বাক্স খুলে, স্টাইন যে দুটি পোষাক বার করলে তা দেখে ত সমর অবাক! অনেকটা ডুবুরির পোষাকের মত সেগুলি দেখতে শুধু মাথার ঢাকনাটা আর একটু ছোট। দুটি পিস্তলের মত অস্ত্রও স্টাইন সেই সঙ্গে বার করে স্টাইন বল্লে—আগে এই পোষাক পরে নাও!

—কেন? সমর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

কেন! যাতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে না মরতে হয় সেই জন্যে। কে জানে বুধ গ্রহের বাতাস কেমন? পৃথিবীর হাওয়ার সঙ্গে তার কিছু গরমিল থাকলেই ত আমাদের মৃত্যু। এই পোষাকগুলি যুদ্ধের সময়কার গ্যাস মুখোসের মত করে তৈরী। বাইরের বাতাস যেমনই হোক না, এর ভেতর আমাদের নিশ্বাস নেবার উপযুক্ত ২৪ ঘণ্টার হাওয়া জোগাবার ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু আমরা ত এখনি বাইরে বেরোচ্ছি না। কাচের জানলা দিয়ে শুধু একটু দেখবো।

তবু বিপদ আছে! আমাদের জাহাজ তেমন কোন ধাক্কা খায়নি বটে তবু যেটুকু ঝাঁকানি তার লেগেছে তাতে কোথাও কোন ফুটো হওয়া আশ্চর্য্য নয়, সে ফুটো দিয়ে বাইরের বাতাস এসে ভেতরের হাওয়া বিষাক্ত করে দিতে পারে। সুতরাং কি হয়েছে না হয়েছে জানবার আগে থাকতেই সাবধান হওয়া উচিত। বেশী বকবার সময় নেই। তুমি আগে পরে ত নাও।

অগত্যা কৌতূহল দমন করে সেই বিদ্‌ঘুটে পোষাকই সমরকে আগে পরতে হল। নিজের চেহারা দেখবার মত আয়না অবশ্য সেখানে ছিল না, কিন্তু সে পোষাকে ষ্টাইনের মূর্ত্তি দেখেই সে বুঝতে পারলে কি অদ্ভুত কিমাকার রূপ তাদের হয়েছে! বুধগ্রহে কি প্রাণী আছে বলা যায় না, কিন্তু চেহারার ভীষণতায় তারা বোধহয় তাদের হারাতে পারবে না।

বিদ্‌ঘুটে পোষাকের কল কৌশল বড় কম নয়। রবারের সঙ্গে আর কিসের খাদ মিশিয়ে সেগুলি এমন ভাবে তৈরী যে বাইরের হাওয়া দূরের কথা কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের পক্ষেও তা ভেদ করা শক্ত। এত মজবুত হওয়া সত্ত্বেও পোষাকগুলি তেমন কিছু ভারী নয়। তার ভেতরে হাওয়া তৈরীর ক্ষুদে যন্ত্র ত আছেই তাছাড়া পরস্পরের কথা যাতে পোষাকের আবরণের ভেতর দিয়েও শোনা যায় সেজন্যে দু'কোণের কাছে দুটি করে জোরালো শব্দধর যন্ত্র বসান। মাথার মুখোসে দেখবার জন্যে যে কাচের দুটি ঢাকনি আছে তারও বিশেষত্ব ষ্টাইন সমরকে বুঝিয়ে দিলে। ইচ্ছে করলে তার একটি প্যাঁচ বাইরে থেকে ঘুরিয়ে সেটিকে দূরবীণের কাজে লাগান যায়!

পৃথিবী ছাড়িয়ে

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

সেই পোষাক পরে ও পিস্তল ছুটি নিয়ে দুই কিম্ভুত কিমাকার এবার পাশ জানালার দিকে অগ্রসর হল।

জানালার প্লেট সরানর সময় ষ্টাইনের হাতও বুঝি কাঁপছিল কি তাদের চোখে পড়বে এবার কে জানে।

জানলার প্লেট সরে গেল। সামনে বুধগ্রহের দৃশ্য, তাদের এতদিনের স্বপ্ন, মানুষের কত যুগের সাধ এবার পূর্ণ।

খানিক কারুর মুখেই কথা নেই—। কি কথা তারা বলবে! বুধগ্রহ একেবারে অদ্ভুত আজগুবি কোন দৃশ্য তাদের সামনে মেলে ধরেনি সত্যি, তবু কেমন করে সে দৃশ্য যেন তাদের বন্দনাকে হার মানিয়েছে।

তাদের জাহাজ কেন যে চূরমার হয়ে যায়নি আছাড় খেয়ে তা সমর এবার বুঝতে পারলে। ছোট পাহাড়ের মত উঁচু টিবির ওপর বিরাট কোন অদ্ভুত জাতের ঘন ঘেঁস ঘেঁস গাছের জঙ্গল থেৎলে তাদের জাহাজ পড়েছে। সেই গাছগুলি গদির কাজ করাতেই তাহাদের জাহাজ চোট্ খায় নি।

টিপির উপরে থাকার দরুণ জাহাজের জানলা থেকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। যে দিকে দৃষ্টি যায় অসমতল বালির ওপর সেই বিশাল বিরাট অদ্ভুত সব গাছের অরণ্য। বুধের এখন দিন, কিন্তু ওপরের ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করে যে সামান্য আলো চুইয়ে এসেছে তাতে চারিদিকে সন্ধ্যার মত কেমন একটা আধ অন্ধকার থম থমে ভাব। অদ্ভুত অরণ্য তাতে আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে! যতদূর বোঝা যায় বুধে এর বেশী আলো বড় একটা কোন সময়েই হয় না। মেঘের আবরণ তার ওপর থেকে নড়ে না বল্লেই হয়।

এই আবছা আলোর গ্রহে, অজানা রহস্যময় অরণ্যে কোন জীবের বাস আছে কি? থাকাই স্বাভাবিক অবশ্য! কিন্তু কি তাদের রূপ!

সমর সাগ্রহে তখনই জাহাজ ছেড়ে বেরুতে চায়।

ষ্টাইন তাকে থামিয়ে বল্লে—"দাঁড়াও জাহাজটা কোথাও জখম হয়েচে কিনা আগে ভালো করে খোঁজ নিয়ে তবে বেরুব। বেরুবার সময় ত আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না, এখন কত মাস—এমন কি কত বৎসর এই গ্রহে আমাদের থাকতে হবে কে জানে!"

ক্রমশঃ





রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন,

যাক্ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে—কেমন? তোমরা নিশ্চয় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছ। কিম্বা এরই মধ্যে ক্লাস প্রোমোশনের কথা ভেবে নতুন বইএর স্বপ্ন দেখতে স্বুরু করেছ। নতুন বইএর স্বপ্ন সত্যি ভারী মধুর নয়। ঝকঝকে বইগুলো যখন প্রথম কেনা হয়—তখন তার পাতাগুলো ওল্টাতে কি মজাই লাগে। বইগুলোর আদরই তখন কত,—মলাট দিয়ে যত্ন করে বাঁধান, ময়লা যাতে না হয়, ছিড়ে না যায় তেমনি সাবধান হয়ে নাড়াচাড়া!—তারপর দুদিন বাদে বইগুলো কেমন করে যে পুরোণ হয়ে যায় কে জানে! স্কুলের পড়ার একঘেয়েমির ভেতর দিয়ে তাদের অর্দ্ধেক রহস্য যায় হারিয়ে তাদের সরসতা যায় শুখিয়ে! কেন এমন হয়!

শুধু কি নতুন বইএর খেলা—অনেক কিছুর বেলাই আমাদের এমনি হয়। দোষ বোধ হয় নতুন বই বা নতুন জিনিষের নয়, দোষ আমাদের মনের, আমাদের মনের সজীবতা যায় বলেই বাইরে আমরা সজীবতা খুঁজে পাই না। নতুন বই নতুনই থাকে, আমাদের মন যায় পুরোণ হয়ে।

তোমাদের ছেলেবেলার মন হচ্ছে তাজা সরস মন, সে মন এই পৃথিবীর নূতনত্বে সাড়া-দেয়, আনন্দ পায়, বড় হওয়ার সঙ্গে অনেকে এই নতুন মনটি হারিয়ে ফেলে—হারিয়ে ফেলে অনেক কারণে।

সে সব কারণগুলো নাই এখন আলোচনা করলাম, হারাবার দুঃখটার কথাই বলি।

আমাদের জীবন এক একটা চির নতুন বই—পাতার পর পাতায় তার নতুন ছবি নতুন গল্প। সে গল্পের, সে ছবির ঠিকমত মর্ম্ম বোঝবার জন্যে, তা উপভোগ করবার জন্যে চাই নতুন সরস মন। মনে যদি মরচে ধরে তা হলে জীবনের বইএর কি রস আর থাকে? সেটা মস্ত বড় দুঃখ নয় কি!

যেমন করে এবছরের নতুন বইএর পাতা দুদিন বাদে তোমরা ওল্টাবে তেমনি করে জীবনের বইএর পাতা ওল্টাবার ক্ষমতা যেন তোমাদের থাকে। নতুন বই তাহলে আর কখন পুরোণ হবে না, ময়লা হবে না অনাদরে—

—তোমাদের সম্পাদক মশাই



শ্রীইন্দিরা দেবী

আমার প্রিয় আদরের ছোট্ট বোনেরা !

গতবারে আমি তোমাদের সকলকে যা বলেছিলাম আশা করি তা পড়েছ ? এবং সেটুকু কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করেছ, যদি না করে থাকো—তাহলে আমি কিন্তু ভয়ানক রাগ করবো আর দুঃখিতও হবো মনে মনে ! আমি যা বলবো তা তোমরা নির্ব্বিচারে করবে এমন আদেশ আমি জোর করে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেবো না—তবে একটা কথা আমার অনুরোধ বলে গ্রহণ করো যে আমি যা বলছি—সব তোমাদের দিকে তাকিয়ে তোমাদের সকলের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে তাকিয়ে তোমাদের সকলের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে চেয়ে আমি তোমাদের কাছে এই সব কথা বলি।

তোমাদের সকলের সঙ্গে পরিচয় আমার লেখার ভিতর দিয়ে,—রংমশালের আলোয় তোমাদের সকলের মুখ আনন্দে, গর্ব্বে, সাফল্যে রাঙা হয়ে উঠবে এই আমি সদা সর্ব্বদা কামনা করি, রংমশাল তোমাদের সকলের জীবনে আলো দিয়ে তোমাদের সকলকেই সুখী করতে পারে, আনন্দিত করতে পারে—এই হচ্ছে রংমশালের উদ্দেশ্য। তোমাদের সকলের সর্ব্বাঙ্গীন সুখ আনন্দ ও তৃপ্তির উপর 'ভাবী গৃহিনীর বৈঠক' নির্ভরে করে আছে। আশা করি তোমরা সকলে একথা বোঝবার চেষ্টা করেছ এবং উপলব্ধিও করতে পেরেছ।

আর একটা কথা, তোমাদের কি শুনতে ভাল লাগে, কি জানতে ইচ্ছা হয় তোমাদের সমস্ত ইচ্ছা গুলো সামান্য হলেও নিঃসঙ্কোচে জানিও, লক্ষ্মী বোনেরা! এবিষয়ে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি—কেমন?

এবার এসো একটু 'রান্নাঘরের' দিকে যাই। আমরা দুটো জিনিস ভয়ানক ভুল করে যাই এবং এটা আমাদের জীবনে চলে আসছে বরাবর। তবে আজ আমাদের সকলের এদিকে একটু সামান্য দৃষ্টি পড়েছে। 'রান্নাঘর'-এর উপর আমাদের সাধারণ সুস্থতা অনেক খানি নির্ভর করে একথা সকলেই জানে, অথচ মজা দেখো বাড়ীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরটাই হয় এর জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করছে, আলো বাতাস নেই, সূর্য্যের প্রবেশাধিকার নেই, আরসূলা ইদুরের রাজত্ব, মাকড়সার জাল ঝুলে পড়ে কড়িকাটগুলো কালো—এমনি ধরণের রান্নাঘরে আমাদের প্রাণযাত্রার রসদ তৈরী হচ্ছে আর আমরা নির্ব্বিচারে মনের আনন্দে তা মেনে নিয়েছি, সেখানে বসেই হয়তো খাচ্ছি, কিছুই ভ্রূক্ষেপ করি না।

এমনি বাড়ী আমি অনেক দেখেছি—অনেক ধনী লোকদের বাড়ীতেও এই ব্যাপার চলছে। তোমরা নিজের মনে মনে বিচার করলে দেখতে পাবে আমার কথাগুলো মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। রান্নাঘর সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ার অন্যতম অর্থ হচ্ছে সংসারের সকলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবজ্ঞা দেখান। রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘরের মাল মসলার উপর দিয়ে আরসূলা, টিকটিকির ইঁদুরের, মাকড়সার অভিযান চলে—খোলা বা আলগা পরে থাকলে এরা এদের খাবার অন্বেষব করতে গিয়ে আহার করতে বসে। কখনও কখনও তরীতরকারীর সঙ্গে এগুলো সম্পূর্ণ ভাবে মিশে গিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতে উদরে স্থান লাভ করে আমাদের দেহের সুস্থতাব কতখানি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা বলবার নয়।

সেজন্য প্রথম কাজ হচ্ছে যেখানে রান্না হচ্ছে বা হবে সে স্থান ভাল ভাবে পরিষ্কার করা—অপরিষ্কার যতদূরে রাখতে পারো স্বাস্থ্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। ভিটামিনযুক্ত দ্রব্যাদি আহার করলেই শরীর সুস্থ থাকবে না, শারীরিক সুস্থতার জন্য রান্নাঘরের ভিতর ও বাইরের এবং পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার ওপর দৃষ্টি দিতে হবে। তাছাড়া আরো একটা কথা—মা কাকিমা জ্যাঠাইমা, দিদি—তোমাদের গুরুজন যাঁদের ওপর রান্নাঘরের সমস্তই কিছু নির্ভর ক'রে আছে রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতার ওপর তাঁদের ইচ্ছা থাকলে ও কাজের খাতিরে বা সময় অভাবে সেটুকু রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না এজন্য তোমাদের সাহায্যের দরকার—সহানুভূতির প্রয়োজন। যেমন ধরো ছোট ছোট কাজ, রৌদ্রে কাপড়গুলো

ঝুলে যাচ্ছে তোলার অভাবে রয়ে গেছে—মা'দের সময় হয়নি ; যাদের এসব কাজের জন্য চাকর আছে—তাদের চাকর হয়তো কাজ করতে করতে ফুরসৎ পায়নি অথচ তোমরা ঘরে খেলছ বই পড়ছ এমনি—খেলা বা পড়ার একটা একটা সময় করে নেবে—এই সব ছোট ছোট কাজ, কাপড়-চোপড়গুলো তুলে পরিপাটী করে আনলায় গুছিয়ে রাখা, যাতে একটা জামা আনতে গেলে হুড়মুড় করে সব না ঘাড়ে পড়ে যায়।—বাবা, দাদা, কাকা প্রভৃতি সব খেতে বসবেন, আসন করে গেলাসে জল ঢাকা দিয়ে দিলে।—আচ্ছা গেলাস আর নুন কোন দিকে দিতে হয় বল তো ? হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, ডানদিকেই। আমি যখন তোমাদের মত ছোট্ট ছিলাম ঠিক উল্টো দিকেই বার বার করে গেছি—আর বাবার পাঞ্জাবীর বোতামও ঠিক উল্টো করে পরিয়ে রাখতাম। তোমরা কর না তে ?

সব কাজই যদি ছোট বেলা থেকে বেশ পরিপাটী করে করবার চেষ্টা করো—দেখো নিজেরই কত ভালো হবে। আমি একটী মেয়েকে জানতুম—ছোটবেলা থেকে সব কাজ কর্ম্মই তার বেশ ঝরঝরে ছিল—তার আলনা গোছান এত চমৎকার ছিল যে যে ঘরের আলনায় তার হাতের গোছান কাপড় চোপড় থাকতো সে ঘরে যদি কেউ ঢুকতো তা হলে তার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। অথচ এমন কিছু ভাল কাপড়—বেনারসী, জর্জ্জেট কি সব আরও যে বলে, নটরাজ, মেঘদূত, আনারকলি প্রভৃতি—এমন সব ভাল কাপড়ও নয় সাধারণ বাড়ীতে পরবার শাড়ী, ধুতি, জামা, সায়া—তার ভিতর ২।১টা যে ছেঁড়া নেই তাও নয়—কিন্তু তবু ও কী চমৎকার ভাবে গোছাতো—সত্যিই দেখতে ভালো লাগতো। আরও একটা মজার কথা : হঠাৎ একদিন শুনলাম যে তার দিদিকে বিয়ের জন্য কোথা হতে দেখতে এসেছিলেন, এসে সেই বাড়ীর মেয়েদের এই আলনা গোছানর উপর দৃষ্টি পড়ে এবং তার কাজের পরিচ্ছন্নতা ও রুচি বোধ দেখে একেও পছন্দ করে গেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সেইখানে তার বিয়েও হয়ে গেলো !

ছোট বেলা থেকে মা, কাকিমা, দিদিদের কাছে থেকে রান্নাবান্না কাজ শিখে নেওয়া খুব ভাল এখন থেকে ছোট ছোট কাজ যদি নিজেরা কর তাহলে দেখো কত আনন্দ পাবে আর শরীর তোমাদের কত ভাল থাকবে।

বলছিলাম রান্নাঘরের কথা—রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে তোমাদের প্রয়োজন অনেকখানি। তাছাড়া সংসারের পরিচ্ছন্নতায় তোমাদের রুচির পরিচয় দেবে। হয়তো কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পার আলো হাওয়া যুক্ত ঘরে যাদের বাস করবার সৌভাগ্য না ঘটে তারা কি করে রান্নাঘরে শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবে ?

আমি জানি আমাদের এই দেশের অধিবাসীদের সাধারণ আর্থিক অবস্থা ভাল নয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত গৃহে বসবাস করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু তবু আমরা ভাল থাকতে পারি, সুস্থ থাকতে পারি যদি আমাদের ভাল ও সুস্থ থাকবার মত মন থাকে, ইচ্ছা থাকে। পরিচ্ছন্নতাই সুস্থতা ও ভাল থাকবার প্রথম উপায়। তাছাড়া তোমরা তো নিজেরাই বুঝতে পারো একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে, একটু সাফ কাপড় জামা পরলে সহজ নির্ম্মল আনন্দে মন প্রাণ আমাদের ভরে যায়—কী রকম আনন্দ লাগে তা তো জানো!...

রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করো—তারপর রান্নাবান্নার কথা বলবো—কেমন? রান্নাবান্নার গোড়ার কথা হলো 'রান্নাঘর'—নয় কি?



পরিচালিকা—**দিদিভাই**

পরম স্নেহের ও আদরের আমার রংমশালের ভাই বোনের দল !

তোমাদের কাছে থেকে আমি যে সব চিঠি পত্র পেয়েছি তার উত্তর দিচ্ছি। তোমাদের দিদিভাইকে যে তোমরা ভালবেসেছ বা ভালো লেগেছে সেটা তোমাদের নিজগুণে। আমি সত্যি তোমাদের খুব স্নেহ করি, ভালবাসি। তোমাদের যদি কিছু জানবার বা শোনবার থাকে প্রশ্ন করো—কিম্বা কিছু শুনতে চাও কোন বিষয়ে,—জানিও। তোমাদের 'দিদিভাই'এর এ বিভাগ তোমাদের মনের সর্ব্ববিধ পরিচয় জ্ঞান তৃষ্ণা মেটাবার জন্য খোলা রইল জেনো।

এবার তোমাদের চিঠির জবাব দিই ঃ—

শ্রীঅরুণ কুমার বসু পাটনা থেকে লিখেছে—

"দিদিভাইমণি ! আমাদের প্রিয় রংমশালের কাছে থেকে তোমার পরিচয় পেয়ে যে কী আনন্দ হলো তোমায় কী করে জানাবো। আমাদের যে একটী আদরের দিদিভাই আছে এ ভেবে খুব ভাল লাগছে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি শুধু আমারই দিদিভাই…… …… তোমার 'তুমি' বলছি বলে রাগ করবে ? কেনই বা করবে—আমি যে তোমার ভাই, ভাইয়ের উপর কি কখনও রাগ করতে পারো ? সবার দিদি আছে আমার নেই। বোনেরা সব কত আদর করে হাসিমুখে তাদের ভাইদের কপালে 'ভাইফোঁটা' দেয়। আমি শুধু দূর থেকে সবার আনন্দভরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি..............কিন্তু কাউকে আমি হিংসা করি না ভগবানের কাছে অভিযোগ জানাই না......আজ মনে হচ্ছে আনন্দমাখা ভাইফোঁটা'র দিনগুলি চোখের জলে ভেসে যাবে না..............আমায় তুমি অনেক 'লেখনীবন্ধু' করে দিও......আমি আমার লেখনী বন্ধুদের অনেক চিঠি লিখব—তাদের সঙ্গে ফটো প্রভৃতি নানান

জিনিষ বিনিময় করবো। আমার ভাই বোনদের খুব ভালবাসবো। জান ভাই দিদি আমার অনেক রকম 'হবি আছে......আমি ডাক টিকিট Nestle's chocolate এর Star's of the Silver Screen আর Wonders of the World' প্রভৃতির ছবি, নানান দেশের নানারকম পয়সা জমাই। খবরের কাগজ থেকে অনেক রকম 'কাটিংস' রাখি, ফটো তুলি, অটোগ্রাফ রাখি আর এস্রাজ বাজাতে শিখি। আমি একটা টিয়াপাখী পুষেছিলাম, তাকে খুব ভালবাসতাম আর যত্ন করতাম—একদিন কি করে খাঁচা খোলা পেয়ে সে পালিয়ে গেল আর সে ফিরে এলো না... সেদিন দুঃখে আমার চোখে জল এসেছিল। পাখী পোষার মোহ আমার কেটে গেছে। দিদিভাই, আমাদের ভাইবোনের মধ্যে তুমি যে পরিচয় করিয়ে দেবে তার জন্য পুরস্কার চেয়েছ ? কিন্তু তোমায় আমরা কি পুরস্কার দিতে পারি—তুমি যে এতগুলি ভাই পেয়েছ—এই কী তোমার সব চেয়ে বড় পুরস্কার নয় ?...রংমশাল আমার এত ভাল লাগে...আমাদের প্রত্যেকের নামে একটা একটা বই আসে কিন্তু সব মাসিক পত্রের মধ্যে আমার রংমশালই সব চেয়ে ভাল লাগে, তাই রংমশাল এলেই আমি সবার আগে পড়তে বসি। মাসের পয়লা থেকে পিয়নের আশায় বসে থাকি—এ বই এর উপর সব চেয়ে আমার দাবী বেশী। আমার নিজের সব চেয়ে প্রিয় কবিতা বিশেষ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। তারপরে ভাল লাগে ডিটেকটিভ ও য়্যাডভেঞ্চারের গল্প। করুণ গল্প পড়তে ভাল লাগে কিন্তু ওসব পড়লে বড় কষ্ট হয়......পরশুরামের গল্প পুস্তকও আমার খুব প্রিয়। ......আমার চিঠি খুব বড় হয়ে গেল......রাগ করবে না ? ......আজ মনে হচ্ছে আমার জীবন সার্থক এতগুলি দিদি ও বোন পেয়ে......তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা গ্রহণ করো।"

কুমারী অলকা ঘোষ—(কট্রাসগড়)

"অগ্রহায়ণ মাসের রংমশাল পেয়ে আমি খুব খুসী হয়েছি। বাস্তবিক বইখানি সুন্দর হয়ে উঠেছে। দিদিভাই এর পরিচালনায় যে 'চিঠির বাক্স' খোলা হয়েছে তাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের ভারী সুবিধে হলো। দিদিভাই যদি অনুগ্রহ করে আমার বিদেশী বাঙ্গালী বন্ধুদের কারুর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে বুঝবো যথার্থই তিনি আমাদের 'দিদিভাই'। আমার পরিচয়টা এবার দিদিভাইকে জানাই—আমার নাম কুমারী অলকা ঘোষ, আমার বয়স তেরো বছর। আমি ফোর্থক্লাসে পড়ি। আমার 'হবি' কি জানেন ?—মাছ পোষা, ফিল্মষ্টারসদের ছবি জমান, ফটো তোলা। আমরা দুই বোনও এক ভাই। আমার বাবা কট্রাস কলিয়ারীর এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার। খাদ (coal mine) সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু জানতে চান, তাহলে তাকে অনেক কিছু জানাতে পারি।

যদি কেউ ডিটেকটিভ গল্প শুনতে ভালবাসে, তাহলে আমার সঙ্গে তাঁর মিলবে ভাল, কারণ আমি ডিটেকটিভ গল্প শুনতে বড় ভালবাসি......সম্পাদক মশাই ও দিদিভাইকে আমার নমস্কার জানাছি।"

অরুণ ভাই!

তোমাদের মত ভাই-বোনগুলি পেয়ে ভারি খুসী হয়েছি। রংমশালের জন্য তুমি তো কত ভাই বোন পাবে—পেয়েছ—অতএব মনে আর দুঃখ রেখো না—এখন তো আর বোন নেই বলে মনে দুঃখ হবে না? 'ভাই ফোঁটা'র দিন নিশ্চয় হাসবে এবার থেকে, কি বল? সত্যিই তো হিংসা করতে নেই—আর তুমি হিংসা করনি বলেই তো ভগবান তোমার কত ভাই-বোন মিলিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয় 'লেখনী বন্ধু' করে দেবো। তুমি ঠিক বলেছ অরুণ ভাই, পুরস্কার আমার-তোমাদের মত ভাই-বোনগুলি—আর এতে আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যন্বিতা মনে করছি। না, তুমি মোটেই অভিমান করতে পাবে না—তোমার 'তুমি' সম্বোধন ও সুন্দর মিষ্টি চিঠি আমার খুব ভাল লেগেছে। রংমশাল তোমাদের খুব ভাল লাগে জেনে আমরাও খুব ভাল লেগেছে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ তোমরা গ্রহণ করো।

অলকা বোনটী!

যদিও তুমি তোমার দিদিভাইকে চিঠি লেখোনি কিন্তু তবুও সেটা তোমাদের সম্পাদক মশাই 'দিদিভাই'এর দপ্তরে পাঠিয়েছেন। আর আমাকেই উত্তর দিতে হচ্ছে—রাগ করছো না তো? 'লেখনী বন্ধু' নিশ্চয়ই পাবে। তোমাদের অভাব অভিযোগ মেটাবার জন্যই এই 'চিঠির বাক্স' হয়েছে—সুতরাং জেনো নিশ্চয়ই পাবে। তুমি খাদ সম্বন্ধে ছোট করে লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিও

তোমরা যারা চিঠি লিখবে—ঠিকানা, বয়স, স্কুলে পড় কিনা, জন্ম তারিখ, কোন ক্লাসে পড়, গ্রাহকগ্রাহিকা কিনা সমস্ত ভাল করে লিখে পাঠাবে। আমার স্নেহভালবাসা সব ভাই বোনের উপর রইল।

ইতি—

তোমাদের—

দিদিভাই

গত মাসের

ধাঁধার উত্তর

কিসের পা—

১। উট পাখী ২। ঘোড়া ৩। গরু ৪। চিল ৫। সিংহ ৬। কুকুর ৭। হাতী
৮। ভাল্লুক ৯। হরিণ ১০। বানর

হেঁয়ালী—

১। হায়না ২। পায়রা ৩। হেলে ৪। মতিহারী ৫। নোনা ৬। কমলা
৭। পদ্মা ৮। গারো ৯। আতা ১০। পো

উত্তরদাতাদের নাম

আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে কেহই নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন নাই। যাঁদের উত্তরের অধিকাংশ ঠিক হইয়াছে তাঁদের নাম দেওয়া হইল—

মামনি, তরুণ ও তুষার, ভবানীপুর; জগদিন্দ্র নাথ রায়, ভবানীপুর; দেবেন্দ্র বর্ম্মন, হাওড়া; অচিন্ত্য কুমার রক্ষিত, কলিকাতা; ভাদুড়ী ভ্রাতৃ বৃন্দ, হাওড়া; শেফালিকা মুখার্জ্জি, পেশোয়ার; সুনীল কুমার সিদ্ধান্ত, রাজসাহী; সমীরণ ও সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, পেশোয়ার; রেবা গাঙ্গুলী, লাক্সার; মনীন্দ্র, রথীন্দ্র, প্রাণ গোবিন্দ, গোপাল, সতী, দুর্গা, যমুনা, করুনা, আন্নাবুন্নু ও মরফাই, রাজসাহী; বেবী, লক্ষ্মী, খুকু, মনীন্দ্র, রথী, সাবী, রেবু, লোচন, মঙ্গলা, সুরেশ দা ও সতী রাজসাহী; মীরা, দেবী, বালীগঞ্জ; মিস কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য, নাগপুর; শ্রী, দিলীপ, প্রভাত, মানস ও দীরা, গয়া; সরমা ও কনক সরকার, খিদিরপুর; প্রতাপ চন্দ্র রায়, ধানবাদ; সমরেন্দ্র কুমার চৌধুরী, গৌরারং; নগেন্দ্র নাথ দাস, দাড়িয়া পাড়া; প্রশান্ত ও অনন্ত কুমার সিংহ, শ্যামবাজার; সথানাথ মুখার্জ্জি, জলপাইগুড়ি; উমা, সোমা, পচু ও বিশু, কুচবিহার; অমিয়, অসীম, অরুণ, অশনি, অজিত, রনেশ, রথীশ ও শেফালি মন্দিরের সভ্যবৃন্দ, কুচবিহার; উৎপল গুপ্ত, বালীগঞ্জ; চিত্রা, উমা, তারেকট, ছোটেলাল, গাবলু, সুবেদার ও সুনীল, বাঁকিপুর; সাধনা, গোপাল ও রাখাল, গৌহাটি, বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ ও সম্পাদক, হাওড়া; কেশবলাল, পান্নালাল, ধনগোপাল ও মাষ্টার মহাশয়, হাওড়া; উমা, বেলা ও রবি, ভবানীপুর; কুমারী অলকা ঘোষ, মানভূম; কমলা মৈত্র, অরুণা, রমেন ও রবীন সান্ন্যাল, কলিকাতা; যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য, ভবানীপুর; নন্দিত ব্যানার্জ্জি, বৈদ্যবাটী; কল্যাণ কুমার রায়, রাঁচি; দেবাশীষ মজুমদার, কলিকাতা।

[গত আশ্বিন মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নামের মধ্যে যাঁদের একটিমাত্র ভুল হয়েচে তার মধ্যে বিভা চক্রবর্ত্তী, দিল্লী, এই নামটি ভুল বশতঃ লেখা হয় নি]

রং দেওয়ার প্রতিযোগিতা

আমাদের রং দেওয়ার প্রতিযোগিতা সকলের খুব পছন্দ হয়েচে এবং আমরা একশ'র ওপর ও এত রকম রং দেওয়া ছবি পেয়েচি যে কোন্‌টি সব চেয়ে ভাল তা নির্ব্বাচন করা রীতিমত কঠিন হবে। রংমশালের আর্টিষ্টরা, সম্পাদক ও আরো কয়েকজন মিলে এই নির্ব্বাচন করবেন। তাই আমরা একটু সময় নিতে চাই। মাঘের রংমশালে আমরা যথাযত ফলাফল প্রকাশ করবো। এই সুযোগে যারা দূর দেশে থাকার দরুণ রংমশাল দেরীতে পেয়েছিলে ও যারা সময় মত পাঠাতে পারোনি তাদের জন্য বিশে পৌষ পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতাটি খোলা রইল। আশা করি এতে তোমাদের সকলের মত আছে।

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল

আমাদের আলোচিত্র প্রতিযোগিতায় আমরা এত রকমের ছবি পেয়েছিলাম যে তা থেকে সব চেয়ে ভাল ছবি পছন্দ করা আমাদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়েছিল। নির্ব্বাচনের পর দেখা গেল,—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিগুলির মধ্যে খুব বড় রকম তফাৎ নেই। আমরা একটি কমিটি গঠন ক'রে তার ওপর ছবিগুলির নির্ব্বাচন ভার দিয়েছিলাম। নীচে প্রতিযোগিতার ফলাফল দেওয়া গেল :—



ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গা



বাঁশী

১ম—শ্রীতরুণ কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় (গ্রাহক নং ৮৩৭) কলিকাতা, ছবির বিষয় ডায়মণ্ড হারবার ;
২য়—কুমারী সাধনা সেন (গ্রাহক নং ৪৩৩) ছবির বিষয় বাঁশী ;
৩য়—শ্রীনরেন্দ্র সিংহ নাহার, কলিকাতা, ছবির বিষয়—ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ ;

নিম্নলিখিত প্রতিযোগিদের ছবিগুলিও প্রশংসাজনক হ'য়েছে।—

কুমারী ইরা রায়, কলিকাতা,—গির্জ্জার সামনে ; শ্রীঅভয় সিংহ নাহার, কলিকাতা,—গাছের ফাঁকে ; অশোক মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা (গ্রাহক নং ৭১৭),—গঙ্গার বুকে সূর্য্যাস্ত ; সুজাতা সিংহ, দানাপুর (গ্রাঃ নং ৯১৩)—হুড্রুজলপ্রপাত ; চিন্মু ও বিনয় ভট্টাচার্য্য, কুমিল্লা (গ্রাঃ নং ৬৩১),—কাশ্মীর ; শ্রীচিন্ময় কুমার বসু, কলিকাতা (গ্রাঃ নং ৯৭৩)—পুরীর সমুদ্র ; শ্রীঅলক ঘোষ, কলিকাতা (গ্রাঃ নং ৯৭৬) কাঞ্চনজংঘা।

মন্তব্য—এবারে স্থানাভাবে কেবল পুরস্কার প্রাপ্ত ১ম ও ২য় ছবিটি আমরা ছাপাতে পারলাম। পরের মাসের রংমশালে তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি ও প্রশংসাজনক ছবির মধ্যে কয়েকটি নির্ব্বাচিত ছবি ছাপিয়ে তোমাদের দেখাবার ইচ্ছা রাখলাম। আমরা শীঘ্রই পুরস্কারগুলি পাঠাবার বন্দোবস্ত করচি।

গল্প প্রতিযোগিতা

এবার গল্প লেখার নতুন ধরণের একটি প্রতিযোগিতা তোমাদের জন্য দেওয়া হোল। রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প থেকে যে কোন একটি সুন্দর ঘটনা তোমাদের বাছতে হবে যেটি তোমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে। তার ওপর বা সেই বিষয়টি নিয়ে তোমাদের নিজের ভাবে ও ভাষায় সাজিয়ে একটি গল্প রচনা করতে হবে। ফুলস্ক্যাপ কাগজের তিনপাতার বেশী কিন্তু গল্পটি হবে না। এই প্রতিযোগিতায় আমরা দুটি পুরস্কার দেবো। একটি দেওয়া হবে গ্রাহকগ্রাহিকা পাঠকপাঠিকাদের যাদের বয়স বারো বছরের নীচে হবে, আর একটি দেওয়া হবে যাদের বয়স বারোর উপর। যারা গ্রাহকগ্রাহিকা তারা নম্বর দেবে। নীচের কুপনটি কেটে নিয়ে গল্পটির সঙ্গে পাঠাতে হবে, পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে পৌষ ১৩৪৪।

নূতন ধাঁধা

১। আজকাল পৃথিবীতে কত অদ্ভুত জিনিষ তৈরী হচ্ছে নয়? এক বৈজ্ঞানিক এমন একটি বাড়ী তৈরী করার মতলব করেছেন যে তার চারদিকের সব জানালাকটাই দক্ষিণমুখো। কেমন ভাবে বা কোথায় এরকম অদ্ভুত বাড়ী করা সম্ভব ভাবতে পারো? তোমরা একটু ভূগোল জানলেই পারবে।

২। চারটে পয়সা নিয়ে তোমরা এমন সাজাতে পারো যাতে তাদের দূরত্ব পরস্পরের কাছে থেকে সমান; যেমন তিনটে পয়সা নিয়ে তেকোণা ত্রিভুজ আকারে ছুঁয়ে সাজাবে ও বাকি পয়সাটি তাদের মধ্যিখানে রাখবে। কিন্তু যদি পাঁচটা পয়সা নিয়ে বলা হয় যে এমন ভাবে সাজাও যে পাঁচটা পয়সাই পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকবে ও তাদের দূরত্ব হবে এক—কি করবে?

৩। একটি আলমারিতে পাশাপাশি রাখা একইরকম তিনটি বই উইপোকা প্রথম বইর গোড়ার পাতা ফুটো করে শেষ বইর শেষ পাতা পর্য্যন্ত টানেলের মত করে কেটেচে। প্রতি বইর পাতাগুলি একসঙ্গে করলে তিন ইঞ্চি চওড়া হয় আর মলাট এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ চওড়া। বলতো ঐ পরিশ্রমী উইমজুরটি সবশুদ্ধ কতটা লম্বা টানেল কেটেচে?

কুপন।

নাম…………………………………… গ্রাহক নং………………

ঠিকানা……………………………………………………

বয়স……………………………………

পিতা বা অভিভাবকের নামের স্বাক্ষর……………………



কাজল-জল]

বাঁশী রাখালের···বাজে বটপাকুড়ের তলে

রংমশাল

দ্বিতীয় বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ
১৩৪৪



কাজল জল

রূপকথা

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

এক

সে, এক রাখাল।

রাখালী করে মাঠে। গাই চরায়, আর, বাঁশী বাজায়।

কাকের চোখ নদীর জলের কালো সোঁত থম্‌কে' যায়, লাখে লাখে ঢেউয়ের ফণা তুলে' সেই বাঁশী শোনে কাজল জল নদী আর দুলে' দুলে,' আ—স্তে বয়।

দু'পারে—কল্ কল্, ছল্ ছল্।

নদীর পাড়ে বটপাকুড়ের ছায়া বাঁশীর সুরের মৌচাক হয়ে থাকে। পাখীরা চুপ্। মাঠের ঘাস চুপ্। নদীতে পাল তোলা নৌকো চুপ্। ময়ূরপঙ্খী চুপ্। সওদাগরের ভরা চুপ্।

কখন্ ঘাট ছাড়িয়ে ঢেউয়ের মাতন—নিয়ে যায় কোথায়, যারা থাকে কাজল জলে, তারা কেউ জানে না!

বাঁশী রাখালের...বাজে বটপাকুড়ের তলে।

দুই

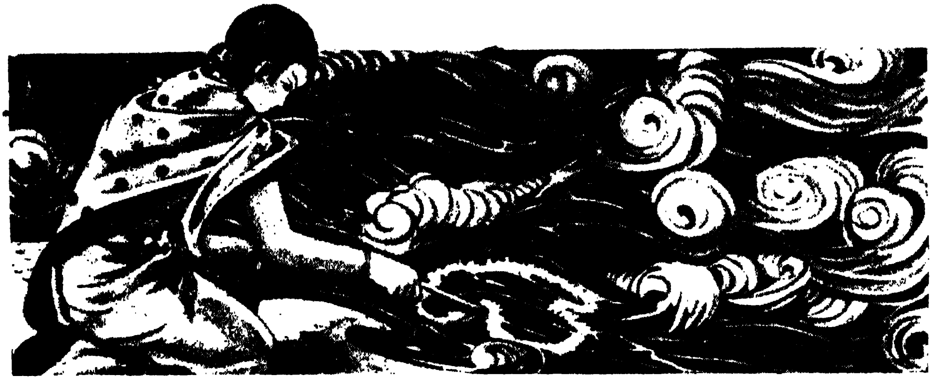
বাজে বাঁশী।

শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়।

বাজ্‌তে, আজ, বাজ্‌ছে না: গন্ধে কেন ভরে উঠে বাঁশীর সুর আর বাঁশীর বুক? না তো, গন্ধ ঘাট ছায় মাঠ ছায়, বট অশথের পাতা ছায়, নদীর বাতাস ছেয়ে যায়। রাখালের বাঁশীর ফুঁ চমকে' যায় নেমে—

কিসের গন্ধ?

হঠাৎ থামিয়ে বাঁশী, চেয়ে রাখাল দেখে, এক যে আস্‌ছে আর ভাস্‌ছে ফুলের মালা, নদীর ঢেউয়ে, তেমন ফুল কখনোই কেউ দেখে নি!



বাঁশীর আগায় তুলে নিলে......

কোথায় ঘাসের ফুল, কোথায় গাছের ফুল, কোথায় খাল, বিল, নহর নদী, সাত সরোবরের ফুল, কোনই ফুল তার কাছে লাগে না।

বাঁশী নামিয়ে ধরে,' রাখালে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

খৈ-ফোটা ঢেউ সোনায় সোনায় সোনালী হয়ে গেছে সেই ফুলের পাঁপ্‌ড়িতে ঢেউয়ের দোলা নাচিয়ে, রোদের ঝলক্ হাসিয়ে মালা এসে ঠেক্‌ল বালির চড়ায়, যেন বালির দেশে কোন্ গন্ধ পাখীর সোনার ঝাঁক এসে বস্‌ল!

দেখ্‌লে কতক্ষণ রাখাল, গন্ধে 'ম' হয়ে, দেখ্‌লে 'থ' হয়ে। তা'পরে, কিনারে এসে নুয়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে বাঁশীর আগায় করে' তুলে নিলে মালাগাছা।

নদীর গন্ধ জল, বাতাস গন্ধে উছল! আর গন্ধে উতল রাখাল নাচন্ পায়ে পাড়ে উঠে, বটের এক কচি ডালে মালাটি দোল্ দোল্ ছুলিয়ে রেখে, বস্‌ল।

বসে,' আবার দিলে বাঁশীতে ফুঁ!

রাখালের গাই চরে গন্ধ ছম্ চম্ মাঠে। রাখাল বাঁশী বাজায়।

তিন

পরদিন ভোর আকাশের রাঙা বৌ যখনো ঘোম্‌টা খোলেনি, সেই পোহাব-পোহাব রাতে, চম্‌কে' মা বল্‌লে রাখালকে জাগিয়ে দিয়ে, "মানিক! কি মালা তুই আন্‌লি, গন্ধে চোখে নেই ঘুম, সারা রাত গোহালে গাইয়ের সাড়া পাই, কপিলা, নীলা, ধবলী, আর তিলকী কাজলী ঘুমোয়নি তো কেউ!"

ঘুম্ ভাঙা চোখ ঝুলনো মালায় রেখে, রাখাল বল্‌লে, "কেন মা?"

দেখে, সোনালী মালা শুকিয়ে, পাপড়ি পাতা লুকিয়ে, কোঁচনো গুছনো ঝুল্‌ছে, নেই গন্ধ, নেই বাস।

বল্‌লে রাখাল, অবাক্ হয়ে, "কৈ মা!...

...গন্ধ কি হল!"

মা এগিয়ে থতমত। রাখাল, কপালে-ওঠা ভুরু!

বিলের জলে মালা ভাসিয়ে এসে, রাখাল, মোছে চোখ মুখ।

গোহালের দোর খুলে দেয়।

একরত্তি গামছাটুকু। তাতেই মাথায় পাগ বেঁধে, বগলে বাঁশী, গাইয়ের সার সাথে রাখাল চলে মাঠের পথে।

চার

নীলা, কপিলা, ধবলী, তিন গাই। আগে নীলা, ধবলী মাঝে, পিছে কপিলা। দু' গাইয়ের বাছুর তিলকী আর কাজলী। কপিলা চলে একা।

মাঠের ঘাসেরা মাথা তোলে, রাখালের বাঁশীর সুর কাঁপে, গাইয়েরা চলে এক পা, আর পা, এক পা, ও পা।

পথের দু ধারে যার ঘরে যত আছে শিশু মানিক মণি, আর মাটীতে, বনে, যত আছে কীট পতঙ্গ পীঁপ্ড়ে, সবার জন্যে কপিলার দুধের বাঁটে ঝরণা নামে; দুধের চারটি ধারে পথ ভেজে, দুধ বরণ মাটী হাসে...রোদে ধব্ধব্, ছায়ায় চল্ খল্।

তিলকী ধূলো উড়োয়, চলে মার সাথে, কাজলীর খুর মাটীতে কাটে দাগ, মার সাথে যায়, আর, কপিলা চলে হাঁসের পায়ে। চলে কি, চলে না।

"কেন রে?"

বাঁশীর সুর ভেঙে, কাছে এসে এগিয়ে রাখাল দেখে, পথের মাটীতে দুধের ধার লাল—যেন সিঁদুর-গোলা পোঁচ্। কাঁপা বুকে রাখাল উবু হয়ে দেখে, কপিলার বাঁটে কিসের চিরুণ দাঁতে দাগ।

"———রক্ত !!"

বাঁশী গুটিয়ে রাখাল দাঁড়াল। কোন্ নাজানি নাগে, কপিলার বাঁট কেটেছে, দুধের ধারা শুষে' নিচ্ছে।

গামছার সরু পাগ রাখাল ফেল্লে খুলে'। ছিঁড়ে, বিলের জলে ভিজিয়ে, কপিলার বাঁট বেঁধে দিলে। তা'পর, আবার বাঁশী মুখে তুলে, দিলে সুর।

পাঁচ

আর রাখাল, মাঠে গেল না। মা বৌয়েরা ফির্তি সুরের চাঁপন্ বাঁশী আবার শুন্‌ল বিলের পাড়ে। রোদের পহর আধখানা করে রেখে গাইয়ের সা'র ফির্‌ল। ফিরে এসে, রাখাল, কাদা ধূলো পায়, আঙনে বেঁধে গাছের ছায়, গাই বাছুরকে খোল বিচালী দিলে।

দিয়ে, না গেল ঘরে গোহালে, না ডাক্‌ল মাকে, না গায়ে তেলের ছোঁয়াচটুকু, না কলার পাত্ কাট্‌ল, না চান্, শুন্‌লে—পাতার আড়ালে ঘু ঘু ডাকছে কাক শালিক জট্‌লা করছে, চিল ফিঙে হাওয়া কাট্‌ছে, মাকে বল্‌লে—

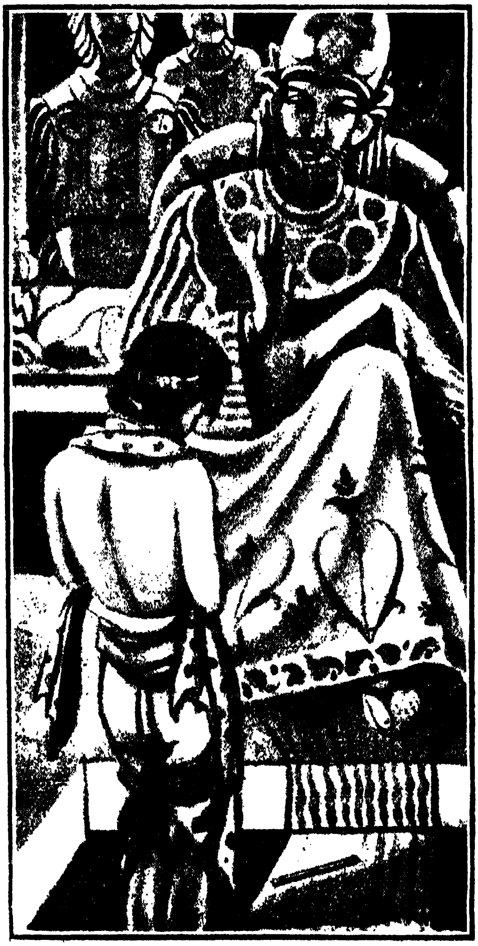
"মা! আমি আসচি......।"

কাজল জল

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

ছয়

ছু' সারে, বর্শা, শূল, ঢাল, খড়্গ ঝগ্ ঝগ্ কর্ছে। নড়েনা চুল টুকু। রাজা, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, রাজসভাতে অবাক হয়ে আছেন। হাতে খোলা তরোয়াল, আর-হাতে তেউন-পরা রাখালকে ধরে' কোটাল আছে দাঁড়িয়ে, রক্ত-ফাটা চোখ। রণ সিপাইরা ঘিরে আছে, এতটুক্ এক রাখাল, সেই কি না তিন দেউড়ীর ছাপ্পান্ন সিপাইকে চড় মেরে, অন্দর ডিঙিয়ে গেল রাণীর মহলে।



"মহারাজ, পাই অভয় তো, বলি"

রাজা মুকুট খুলে, নামিয়ে রেখে বললেন „রাখাল, এক নয় ছুই নয়—তুমি তিন তিন দেউড়ী পার হয়ে গিয়েছ, যে-ই তুমি হও, তোমার মত বীর আর আমার রাজ্যে নেই। কি তোমার চাই, বল।"

হীরে জ্বল্ জ্বল্ মেঝের উপরে বাঁশী খানি শুইয়ে রেখে, মাথা নুমিয়ে বল্লে রাখাল, "মহারাজ, পাই অভয় তো, বলি।"

"বল, নির্ভয়।"

বল্লে রাখাল, "মহারাজ, আপ্নার কাছে তো চাইনে কিছু আমি, চাই যা, তা রাণীমার কাছে।"

পাত্র মিত্র যন্ত্রীমন্ত্রী বল্লেন—"তো বেশ, বল আগে কি চাও।"

রাখাল বল্লে, "মহারাজ, আপ্নার রাজত্বে বাঁশী আমি বাজাই, সেই বাঁশী আমার থাম্ল।......থামুক। এই নিন্, রইল বাঁশী আপ্নার। কিন্তু—রাজ্যের কীট পতঙ্গ, কাঁচা কচি সব্বার মুখের ছুধের সাগর যে শুকিয়ে যায়—রক্ত কেন ছুধের বদলে, কপিলার বাঁট কেন কাটে নাগে? পাটরাণী হলেন মা-রাণী, আমি তাঁকে এ কথা শুধোব।"

রাজসভা থম্‌কে' যায়। পাট সিংহাসন কেঁপে উঠে। পুরী কেঁপে উঠে। কপিলা গাই, তার বাঁট সাপে কাটে।

সভা, রাজা ভেঙে দিলেন। বাঁশী রাখালের হাতে তুলে দিয়ে রাজা বল্‌লেন "রাখাল, তোমার বাঁশী বুকে তোমার অক্ষয় থাকুক, কোথায় থাক তুমি, চল, কপিলা আমি দেখ্‌ব।"

লোক লস্কর, মন্ত্রী নিয়ে রাজা চল্‌লেন রাখালের সাথে।

যন্ত্রী তন্ত্রী, শাস্ত্রী সিপাইরা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। কোটালের রক্ত চোখ শক্ত হয়ে থাক্‌ল কপালে গিয়ে।

কেবল, হাতের তার তরোয়ালখানা, ঝণাং করে পড়ে গেল।

সাত

পাত পেতে, মা আছে বসে'। ফেরে না রাখাল। মাথার রোদ নাম্‌ল পাথারে। প'খ্‌পাখালীর চোখ আঁধার।

সাঁজের পিদিম মা. জ্বাল্‌ল।

না।

রাখাল আসে না।

পেঁচা ডাক থামিয়ে পালায়। শেয়াল ডাকে। পথের মাটীতে ঝঁকি লাগে,—কিসের শব্দ?—

চেয়ে মা দেখে, বেটা তার আগে আগে. পিছে তু'সারে মশাল, ঝিক্ ঝিক্ ঝিলিক্ মিলিক্।

—কা'রা?

মা ঠাহর করতে পারে না। পাড়া পড়শীরা দোর খোলে তো, হুড়্ দাড়্ খিল আঁটে।

"মা! মা!" বলে' রাখাল পা আঙনে দিতেই,——দেখেই তো, মা, দাঁড়িয়ে মূর্চ্ছা খায়।

অভয় দিয়ে আস্তে, রাজা, তা'পর গোহালে যান।

তিন গাই তু' বাছুর গোহালে।

রাজার চমক্ লাগে। শঙ্খ চোক পদ্ম গা, সোনার খুর শিং রূপা, সত্যই তো, এক কপিলা!

মাকে বুঝিয়ে এসে রাখাল খুলে দেয় কপিলার বাঁধন, রাজা দেখেন, মাটী ছোঁয় ছোঁয় বাঁট, কপিলার সেই বাঁটের দুধ উবে' গেছে—রক্ত ঝল্ ছল্ বাঁট !

চার খুরে কপিলার, মুকুট ছুঁইয়ে মাথায় তুলে,' রাজা হুকুম দিলেন, "কাণাৎ ফেল।"

আট

খবর গেল। থানায় থানায় রাজকটক, পহর রাত না যেতে হাঁ! হাঁঃ! শব্দে জম্‌ল এসে।

মাঠ জুড়ে' কাণাৎ পড়ে।

মশাল আর মশাল, পাহারা বসে গোহালে। মশার একটি ছানাও বস্‌তে পায় না কপিলার গায়।

সূঁচ্ ফোটা আঁধার কাঁপে। রাখাল জাগে মশালের সাথে।

দুপুর রাত কেটে' নিশুতি পড়্‌ল। পড়্‌তেই, হীল হীল্ হীল্ করে' এসে, সোনালী ডোরা এক কী যে সাপ, ঝলকে ঝমকে সব পাহারা এড়িয়ে গিয়ে হিস্ হিল্ শব্দে গোহালে কপিলার চার পা জড়িয়ে, ছাঁদন দিয়ে.. ...দুধ খায় !

যত পাহারার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, এলোমেলো মশাল ঝাটা হেন হট্‌ল, রাখালের দু' চোখ ভাঁটা ঘুর্‌ল, শাস্ত্রী সিপাই লোক লস্কর সারা কটক জমা হল ; কিন্তু, কে ছোঁবে এ সাপ ?

টাঙ্গী লাঠি, শূল তরোয়াল নীচুমুখ হয়ে রইল। রাজার হাতের মণিমুখ খড়্‌গ ঝুলে পড়্‌ল, কপিলার চার পা জড়িয়ে নিয়ে দুধ খায় সাপ, কি করে' মারবেন ?

হাতের অস্ত্র হাতে, সিপাই-ই কি, রাজাই কি, দাঁড়িয়ে। আর, ছিল যারা সাপুড়ে,' চুল খাড়া তাদের, তন্ত্র মন্ত্র পড়বে কি, দুধ খায় সাপ আর পলকে পলকে বাড়ছে! দণ্ড না যেতে সাপের গা গোহালে ধরে না, আগুনে ধরে না, লেজ গিয়ে ঠেক্‌ল রাজার কাণাতের কোণে !

দু'দিক থেকে তীর আস্‌ছে, তরোয়াল হান্‌ছে, লাঠি কুড়ুল শূল বল্লম যত অস্ত্র পড়্‌ছে, ঠিক্‌রে যায় সব ! পিছ্‌লে যায় সাপের গায় !

সবাই হাঁপিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে।

কাজল জল

নীরঞ্জন মিত্র মজুমদার

মশালচীরা, মশাল চেপে ধর্‌ল। না কিচ্ছু, না ফোস্কাটুকুও! সাপ, শুধ্‌ দিলে একটুকু মোড়ামোড়ি।

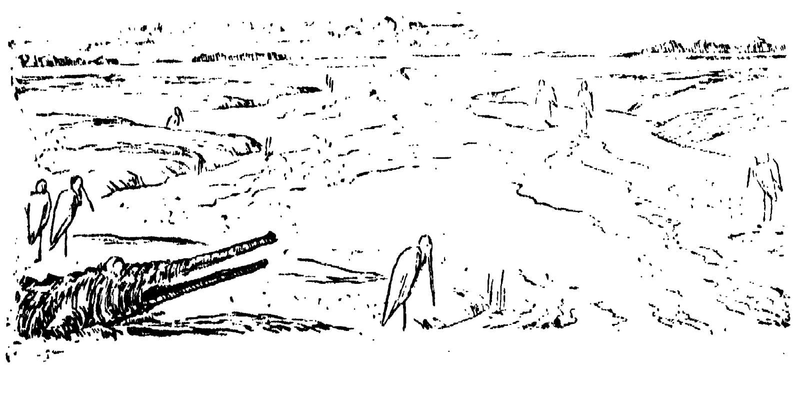
কপিলার দুধ ফুরিয়ে যখন বাঁটে ঝর্‌লে রক্ত, সাপ তখন বাঁট ছেড়ে দিয়ে, জিভ্‌ বাড়িয়ে, যে পড়্‌ল সাম্‌নে তাকেই জিভে টেনে পূরে, লোক লস্কর সৈন্য সিপাই—রাজকটক টপ্‌ গপ্‌ গিলে গিলে চল্‌ল!

মুকুট এঁটে, সাম্‌নে উঁচনো খড়্‌গ রাজা দাঁড়াতেই হেঁকে, শেষ সিপাই গিলে ফেলে ল্‌ল্‌ল্‌লিক্‌ করে' রাজাকে জিভে তুলে নিশুতির আঁধার শিউরিয়ে, সাপ, মাঠ জাঙ্গাল বিল সায়র পেরিয়ে, নদীর জল চীরে ভেসে চল্‌ল মণি মাথায়, যেন কোন্‌ সোনার চৌদ্দ ডিঙা কাল্‌ বৈশাখীর ঝড়ো পালের টানে ছুটেছে সোঁ! সোঁ! সোঁ!

ঘরের বাতি ঘরে নেবানো—পাড়া পড়শী গাঁয়ের জন, কাঁপে থর্‌, থর্‌, থর্‌——কে জানে আর, রাখালের মা আছেই কি নেই?

আঁধার কাটিয়ে কোথায় যে সে সাপের শিস্‌ গর্জ্জে—যেন সমুদ্দুরের ডাক!

—(পরের বারে সমাপ্য)।



বিভীষণের বিভীষিকা

(নাট্য-কণিকা)

শ্রীঅসিত কুমার হালদার

প্রথম দৃশ্য

[বিভীষণ পাতালপুরীতে তার রাজদরবারে বসে আছেন, পাশে অহি-রাবণ মহী-রাবণ দুটি নাতি এবং পিছনে পর্দার আড়ালে রাণী সরমা সমাহিতা। সকলেই পাঠকের নিকট রামায়ণ শুনচেন।]

—বিভীষণ—

থাক, আজ কি জানি রাম নামে অরুচি
হ'ল কেন বলত ?
শুনে শুনে রোজ রোজ লাগচেনা ভাল আর
যাই কোথা বলত ?

—সরমা—

কেন ? ও গো হ'ল কি ? লাগ্‌চেনা ভাল কি
রামায়ণ সনাতন ?
যুগে যুগে শুনে এ'লে আজ তুমি তাই ব'লে
হও কেন জ্বালাতন ?

অহিরাবণ (বিনয় সহকারে)

শুনেছিনু মহারাজ রাম নাম জোরেতে
জপে সদা যদি কেউ উঠে রোজ ভোরেতে
মরবে না কখনো সীতারাম বরেতে
কাল তার কাটবে পাতালের ঘরেতে ?

—বিভীষণ—

তাই ভেবে এত কাল এত যুগ কাটান্থ
নাতিপুতি—লাখ লাখ যমালয়ে পাঠান্থ
সুখ তায় আছে কি পাতালেতে না মরে ?
জানি আমি কাটে কাল রোজ হেথা যা' করে !

—মহিরাবণ—

দাদাভাই ! ঠিক্ তাই ; বেঁচে গেছে হনুমান
সাপে বর হয়ে গেছে হয়ে শেষে তিরোধান
রাম বড় শিব ছোট ব'লে সেই পাপেতে
ভীমরতি মরে তাই মহাদেব শাপেতে। *
অহি-মহি কর চুপ্ মহাবীর হনুমান
এত শিখে তবু তোরা রাখলি না তাঁর মান ?
(বিভীষণের প্রতি)
অপেয়ে সে রামভড় কথা তার শুনো না
রাম ছেড়ে মরণের জাল তুমি বুনো না !

—বিভীষণ—

পাতালের রাজা সাজা আর বল কি সাজে ?
মরা ভাল, রাম নাম জপে যাই কি বাজে !
বিংশ শতাব্দীতে বসে মোরা পাতালে
'এডিসন' 'মার্কনী' জগৎ যে মাতালে !

—মহিরাবণ—(অভিমান ভরে)

কি বলেন মহারাজ—আমরা কি পারি না
কোন কাজ করিতে ?—কারো ধার ধারি না !

* লেখকের লেখা "হনুমানের পাঁচালী" দ্রষ্টব্য।

বিভীষণের-বিভীষিকা

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

—অহিরাবণ—

ঠিক্ তাই, বালুসাই বানালে যা ধরাতে
পারি তাহা করিতে এই জোর বরাতে।



মহারাজ! এই নিন—সাজা এঁরে দেব কি?

—বিভীষণ—

আরে ছাই বালুসাই নয় যাহা দুনিয়া
করেচে যা বিজ্ঞানে মগজটি ধুনিয়া।—
বেতারের বার্ত্তায় ভরে গেল দেশটা!
আকাশেতে উড়্‌চে রে মানুষরা শেষটা!

[ঠিক এমন সময় একজন নাগ প্রহরী হন্তদন্ত হয়ে একজন হ্যাট্-কোট-টাই ধারী হাল ফ্যাসানের যুবককে ধরে এনে হাজির করলে]

—প্রহরী—

মহারাজ! এই নিন—সাজা এঁরে দেব কি?
পাতালেতে এসেচেন নাম এঁর 'দেবকী'।

—বিভীষণ—

এ যে দেখি আধুনিক মানুষ যে তাই ত!
ভাব্‌ছিনু এদেরে কোথা বল পাই ত?
যাই হোক্ এসে যবে গেছে এই এখানে
নিয়ে যাও পাতালের যেতে চায় যেখানে।

—দেবকী—

টিটানিক জাহাজে মহারাজ! ডুবে তাই
পাতালেতে ঢুকে আজ দরশন তব পাই!
'এনজিনিয়ার আমি পারি সব করিতে
যমালয়ে গিয়ে তাই চাই নাক' মরিতে।

—অহিরাবণ—

—মহারাজ—!
অনুমতি হয় যদি পারি তবে বলিতে
পারে কিনা জানিনাক' ঘোর এই কলিতে
কাজ যা' আছে বাকি করেছিল রাবণে
শেষ মোটে হয়নিক ধরেছিল শ্রাবণে।

—বিভীষণ—

কি কাজ-বলি আছে তাই মোরে বল না?
জানি না তো আমি তা' কর কেন ছলনা?

—মহিরাবণ—

আমি বলি রাবণের চিতাটিরে নিভোলে
শেষ হয় সব কাজ পাতালেতে তা' হ'লে।

—অহিরাবণ—

নাহে না,—আর এক কাজ আছে জরুরী—
পারবে না কেহ তাহা পোষাবে না মজুরী।

—দেবকী—

ভিজে এই কাপড়ে হাড় গেল কালিয়ে
যেতে দিন মহারাজ ধরণীতে পালিয়ে!
ভিজে স্যুট ছাড়লে পারি সব করিতে—
জ্বরজ্বাড়া হ'য়ে হেথা চাইনাক' মরিতে।

—সরমা—

(পর্দ্দার আড়াল থেকে)
আমি যাই, কাজ আছে রান্নার ঘরেতে
সেরে ফেলি কাজ সব রাম নাম বরেতে।
(রাণী সরমার প্রস্থান)

—বিভীষণ—

নিয়ে যাও প্রহরী দেবকীরে আদরে
ভ'রে দাও সজ্জায় উড়ুনী ও চাদরে।

—প্রহরী—

যে হুকুম মহারাজ! নিয়ে যাই এখুনি
যা' দেখার দেব সব, পোষাকের ঠিকুনি!
(প্রহরী ও দেবকীর প্রস্থান)

—অহিরাবণ—

দেখে যেন মনে হয় এ লোকটি পারবে
রাবণের সিঁড়িটায় এই দেখ সারবে।

ষণ—

ঠিক্ ঠিক্ তাই তো! স্বর্গের সিঁড়িটি
শেষ এই করবে; (খুসী হয়ে হাস্য করে) দেব খেতে বিঁড়িটি

—মহিরাবণ—

বিঁড়ি ও খায় না সিগারেট পাইপে
'স্মোক্' সে করে থাকে আধুনিক টাইপে।

—অহিরাবণ—

তা হোক্ এখানে স্বদেশীর দিনেতে
সস্তায় সব হয়, কাজ কি এ ঋণেতে?
'বারসাই' চায় না ত কাজ সারে হুক্কায়
পাতালেতে বিঁড়ি টেনে কাজ হেথা চলে যায়।

(প্রথম দৃশ্য শেষ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মহারাজ বিভীষণ, অহি ও মহি পাতালের এক অন্ধকার গুহার মধ্যে আব্ছা দেখা যাচ্চে দেবকীকে চোখ বেঁধে তাঁরা সেখানে এনেচেন।]

—দেবকী—

(হাতড়াতে হাতড়াতে চোখ বাঁধা অবস্থায়)
কৈ—? হেথা মহারাজ দেখচি না কিছু যে
আঁধারের হাতখানা গলা টেপে পিছুতে।
চোখ বেঁধে এনে হেথা সাজা মোরে দিলে কি?
কোন দেশী রসিকতা কোন্ দেশী 'দিলেগি'?

—অহিরাবণ—

নাহে না, শোনো তবে বলি এক কাহিনী—
রাবণের সিঁড়িটিরে ক'রে এক বাহিনী—
মোরা যাব স্বর্গে, তুমি যাবে মর্ত্তে,
শেষ তুমি কর্‌বে খালি এই সর্ত্তে।

—বিভীষণ—

মহি ! ওর খোল চোখ, বিজ্ঞান কলেজে—
পড়েছিল, পারবে—কি ভাল বলে যে—
এন্‌জিনীয়ারী, টেক্‌নিক্যালিটি—
আছে ওর মগজে ওরিজিনালিটি ।

(অহি দেবকীর চোখ খুলে দেওয়ার পর সামনে একটি অসমাপ্ত সিঁড়ি দেখে)

—দেবকী—

এ যে দেখি ঘূর্ণি স্তম্ভের ফোয়ারা
সিঁড়ি তায় উঠে গেছে আকাশেতে দোহারা
শেষ কি এ হয়নি ?—মনে ত হয় না ?
চড়ে দেখি ভার বোঝা সয় বা কি সয় না !

(ক্রমশঃ সিঁড়ি বেয়ে দেবকী উপরে উঠ্‌তে লাগলেন)

—মহিরাবণ—

(গলা উঁচু করে সিঁড়ির দিকে দেবকীকে লক্ষ্য করে)

আরে য্যাঃ গেল যে সাগরের ওপারে
সিঁড়ি বেয়ে যায় কোথা পাতালের ওধারে ?

—দেবকী—

(উঁচু থেকে রুমাল নেড়ে)

দেখছি এ সিঁড়িটা চলে যদি চল্‌বে
সেই মত কাজ ক'রে তবে ফল ফলবে
রুমালের ইসারায় দেব তাহা বুঝিয়ে
ভাঙা-চোরা মেরামৎ ক'রে দেব বুঁজিয়ে ।

—অহিরাবণ—

(পুনরায় মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে ভাল করে দেখে)

নাঃ আর দেখা ওরে যায়না ত কিছুতে—
আমাদের ফেলে ব্যাটা রেখে গেল পিছুতে ।

—সরমা—

(রাণী সরমা কাঁদতে কাঁদতে এসে)

গেল কোথা হতভাগা মানুষের ছানাটা—
চুরি করে খেয়ে গেছে বুদ্ধির পানাটা
করেছিনু তৈরী—অহি-মহি তরেতে
কত পূজা পার্ব্বণ—রাম নাম বরেতে।

—বিভীষণ—

হায়! হায়!—গেল যাঃ কোথা ওটা পালিয়ে (রেগে)
সিঁড়িটারে ভেঙে দাও সাগরেতে চালিয়ে।

[দুম দাম সিঁড়ি ভাঙা শব্দ হতে লাগল, আর নেপথ্যে জাহাজের ভোঁ বেজে উঠ্‌ল।]

(নেপথ্যে) প্রথম কণ্ঠ

দেখ, দেখ, অদূরে রুমালের ইসারায়
ডাকচে যে ওটাকে দেখ দেখি কি যে চায়?

(নেপথ্যে) দ্বিতীয় কণ্ঠ

আরে এ কি? দেবকী টিটানিক ডোবাতে
ডুবেছিলে; কোথা হ'তে এলে বাবা ভোগাতে?

[যবনিকা পতন]

(পাঠকের পাঠ)

বিভীষণের বিভীষিকা কথা সুমধুর
শুনিলে সকল ব্যথা হয়ে যায় দূর।
কলিকালে অঘটন ঘটিল যে তাঁর
যেতে গিয়ে ঠেকিলেন স্বর্গের দ্বার।
মানুষে ঘটাল যাহা অঘটন তাই
উপ পুরাণের মাঝে সেই কথা পাই।
জ্ঞান-বিজ্ঞান জোরে যায় অবহেলে
পাতালপুরীর সবে পাতালেতে ফেলে।
মগজের জোরে দেখ মর্ত্তের লোকে
অবহেলে সাগরের ভিতরেতে ঢোকে।
তাল ঠুকে উঠে যায় বুদ্ধির জোরে
স্বরগের সিঁড়িটায় উঠে যায় ধরে।
অস্পষ্ট সকল কথা শোনে যেই জনে
কনে হলে পায় বর, বর হলে কনে।

মাটির স্বর্গ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পল্লীমা গো—পল্লীমা গো !
সদাই তুমি চিত্তে জাগো।
শ্যামল তোমার স্নিগ্ধ রূপে মুগ্ধ আমায় করে।
তোমারি বিল, তোমারি মাঠ,
তোমারি পথ, তোমারি ঘাট,
তোমারি কানন, তোমারি কুঞ্জ,
তোমারি সরোবরে
লুব্ধ মন ঘুরিয়া ফেরে কতই তৃপ্তিভরে।
সুনীল তোমার উদার আকাশ,
শীতল তোমার গায়ের বাতাস,
তোমার সোনার আঁচল পাতা
ধানের ক্ষেতের 'পরে।
তুমিই আমার মাটির গড়া মাটির স্বর্গ রে।

*　　　*　　　*

কুঞ্জবনে, বাঁশের ঝাড়ে,
আমবাগানে, নদীর পাড়ে,
কী মাধুর্য্য বেড়ায় ভেসে, কী যে প্রীতি ঝরে !
পাখীর সভা গাছে গাছে,
প্রজাপতি হাওয়ায় নাচে,
লাল-শালুক আর পদ্ম ফোটে
দীঘির জলের 'পরে।
পল্লী আমার ! পল্লী আমার !
স্বপ্ন দিয়ে সৃষ্টি তোমার।

এইখানেতেই মা-টি আমার
থাকেন মাটির ঘরে।
এই ত আমার মাটির গড়া মাটির স্বর্গ রে!

* * *

পূবে যখন সূর্য্য ওঠে,
বিলের জলে মাণিক ফোটে,
দোয়েল শ্যামা উল্লাসেতে গায় রে 'টহল্'-গান।
'বউ কথা কও'—হলদে পাখী,
কণ্ঠ ভাঙ্গে ডাকি' ডাকি';
'কেষ্ট গোকুল' কোথায় ডাকে—
পাইনাক সন্ধান।
দ্বিপ্রহরে দূরের মাঠে,
রাখাল ছেলের দিনটি কাটে;
অশথ বটের ছা'য়ায় বসে
ছড়ায় বেণুর তান।
দিনের শেষে অস্ত-রবি,
ফুটিয়ে তুলে রঙীন ছবি,
সেই রঙেরই ঢেউয়ের তলে
বিদায় নিয়ে যান।
পল্লীমাতা—পল্লীমাতা!
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা।
তুমিই আমার জন্মভূমি—
পুণ্য তীর্থধাম!
স্বর্গাদপি গরিয়সী তুমিই আমার প্রাণ!

* * *

সন্ধ্যা-তারা ওঠার সাথে,
সন্ধ্যা-প্রদীপ বধূর হাতে;

মাটির স্বর্গ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

আঁচল গলায়, তুলসী তলায়
কতই মানৎ করে।
পল্লী জুড়ে শাঁখের ধ্বনি
অমনি ঘরে ঘরে।
ঠাকুরমা'রা শিশুর দলে
কতই রকম 'শোলোক' বলে।
জোনাই জ্বালে লক্ষ বাতি
আঁধার বৃক্ষ 'পরে।
ঝিঁঝিঁরা সব একজোটেতে
ঐকতানটি ধরে।
পল্লীমা গো—পল্লীমা গো!
চিত্তে তুমি নিত্য জাগো।
তোমার বক্ষ সকল দুঃখ সকল দৈন্য হরে।
যেথায় থাকি, যেথায় যাই,
তোমার পায়ে ভিক্ষা চাই—
শেষ বেলাতে ঠাঁই দিও গো
তোমার সোনার ঘরে
ওরে আমার জন্মভূমি মাটির স্বর্গ রে!



সারনাথ

ভ্রমণ কাহিনী

অমিয় মাধব মিত্র

সারনাথ একটি ইতিহাসবিখ্যাত স্থান। বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম এই সারনাথেই তাঁর অহিংসা বাণী প্রচার করেন—সারনাথ বৌদ্ধ হিন্দুদের তাই একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সারনাথের সহিত বহুদিনের ইতিহাস জড়িত—এর সমস্ত বিবরণ এস্থানে দেওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি সারনাথের একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে—তার নাম রাখা হয়েছে 'মূলগন্ধকুটি' বিহার। মিসেস্ মেরী ফষ্টার নামে আমেরিকান মহিলা এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য লক্ষ টাকা দান করে ভারতবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন। প্রায় তিন বছর হ'ল সারনাথে নিখিল ভারত বৌদ্ধ অধিবেশন হয়েছিল—তাতে আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান ও পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত থেকে বৌদ্ধভক্তরা যোগদান করেছিলেন। সারনাথে কতকগুলি দেখবার জিনিষ আছে—তাদের মধ্যে 'মূলগন্ধকুটি' বিহার, জৈন-মন্দির, মিউজিয়াম, ধামেক স্তূপ, চৌখণ্ডী স্তূপ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। সারনাথ কাশীর প্রায় আট মাইল উত্তরে। বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট থেকে বি, এন্. ডবলিউ, আরের গাড়িতে সারনাথে যাওয়া যায়। এ ছাড়া কাশী থেকে বরাবর একটি সারনাথে যাবার পাকা রাস্তাও আছে—সুতরাং মোটর, একা, কিংবা সাইকেলেও বেশ যাওয়া যায়।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সেবার এক বন্ধুর সঙ্গে বেনারসে তার মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলুম্। কাশীতে তখন ভীষণ বেরিবেরি। সকলেই ষ্টেশনে আমাদের ভালয় ভালয় কলিকাতায় ফিরে আসতে বল্লেন। আমরা কিন্তু কারুর কথা না শুনে একেবারে উঠলুম গিয়ে বন্ধুর মামার বাড়ি—বেণারসে ইংলিশিয়া রোডে। ওখানটা একটু ফাঁকা বলে বেরিবেরি বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করতে সাহস পায় নি।

বন্ধুর মামা থাকেন ছোট্ট একটি সুন্দর বাংলোতে—তাঁর পরিবারটিও অল্প। ভদ্রলোক আমাদের খুব আদর যত্ন করলেন এবং বাড়ির সকলেই যেন এক ঘণ্টার মধ্যে কত দিনকার চেনা হয়ে উঠলেন। এইজন্যই সঞ্জীববাবু তাঁর 'পালামৌ' এ বলেছেন, "প্রবাসে বঙ্গবাসী মাত্রেই সজ্জন।"—এর বাস্তব প্রমাণ সেবার কাশী গিয়ে পেয়েছিলুম। সারনাথের কথা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছিলুম কিন্তু কখনো দেখবার সৌভাগ্য ঘটে ওঠেনি—সুতরাং সেই রাত্রেই ঠিক হ'য়ে গেল যে, পরের দিন ভোর বেলা আমরা সাইকেলে সারনাথ বেড়াতে যাব। কাজেই রাতারাতির মধ্যেই চারটে সাইকেল যোগাড় করে ঘড়িতে রাত সাড়ে চারটের alarm দিয়ে রাখা হ'ল।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি আগেই বন্ধুর মামতো ভায়েরা উঠে বাথরুমে হাতমুখ ধুতে গেছে। কিন্তু আমার বন্ধুটি তখনও কুম্ভকর্ণের নাক ডাকাচ্ছে। ভারী রাগ হ'ল ওর ওপর, দিলুম জোরসে ঝাঁকুনি। ও শুধু "উঃ" বলে একবার পাশ ফিরলে মাত্র—ওঠবার কোন গতিকই দেখালে না। এদিকে ঘড়িতে ঢং ঢং

করে পাঁচটা বেজে গেল। কোথাও কিছু না পেয়ে হাতে নস্যির ডিবে থেকে দিলুম এক টিপ নস্যি ওর নাকে—দেই না দেওয়া অমনি "হ্যাঁছ্যো, হ্যাঁছ্যো" করতে করতে হুড়মুড়িয়ে ও পড়ল উঠে; চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘড়িটার দিকে চেয়েই বিছানা থেকে এক লাফ মেরে ঢুকল গিয়ে বাথরুমে।

চব্য চোষ্য পেটপুজো করে' আমরা চারজনে সাইকেল নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়লুম—তখন ঠিক ৬টা। ইংলিশিয়া রোড ধরে পূর্ব্ব দিকে খানিকক্ষণ যাবার পর রেললাইন পার হয়ে অন্য একটা রাস্তায় এসে পড়লুম, রাস্তার নামটা মনে নেই—এই রাস্তাটাই বরাবর উত্তরে সারনাথের দিকে গেছে। রাস্তার দু'ধারে আমের গাছ। যেতে যেতে বেনারসের কুইন্স্ কলেজ দেখতে পেলুম—এখানে নাকি ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল সংস্কৃত পড়ানো হয়।

অনেকক্ষণ এইভাবে যাবার পর আমরা একটা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লুম—উঃ, সে কি ভীষণ ধুলো, যেন ধুলোর সাহারা! কলকাতার আসে পাশে অনেক কাঁচা, ধুলোভরা রাস্তা দেখেছি কিন্তু এ রকম মারাত্মক ধুলো আর কোথাও দেখিনি। তখন মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীর সব রাস্তাকে এটা ধুলোয় টেক্কা দিতে পারে। সাইকেলের চাকা আর চলে না। ঠিক এক হাঁটু আন্দাজ ধুলো জমেছে রাস্তায়। আমাদের অবস্থা তখন একেবারে কাহিল। কোনগতিকে ত সাইকেলগুলো কাঁধে চাপানো গেল। মনে মনে ভাবলুম কি কুক্ষণেই না বাড়ীর থেকে বেরিয়েছিলুম। একবার ভাবলুম আর সারনাথ দেখে কাজ নেই এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু এমন জায়গায় আমরা গিয়ে হাজির যে ফিরে আসাও সোজা নয়। কোন কিছুর অপরাধ না দেখতে পেয়েও বেচারা ভাগ্যের ওপর চাপালাম যত দোষ।

পরমুহূর্ত্তেই আবার ভাবলুম—'দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?' না, কখন না। সুতরাং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলুম—সাইকেল বাবু দিব্যি ঘাড়ে চেপে যাচ্ছেন। সাইকেল সামলাতে যাই ত কাপড় হাবুডুবু খায় ধুলো সমুদ্রে, আর কাপড় সামলাতে যাই ত উনি কাঁধে থাকেন না—মহা মুস্কিল। এই অবস্থায় প্রায় আধঘণ্টা ধুলোর সঙ্গে লড়াই করবার পর আমরা আবার ভাল রাস্তায় এসে পৌছলুম। কিছুদূর যাবার পর আমরা একটা তেমাথায় এসে পৌছলুম। এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সোরখ্পুর আর এর বাঁদিকে চলে গেছে সারনাথ, কাজেই আমরা বাঁদিকে সাইকেল ফেরালুম। রাস্তাটি বড় বড় গাছ দিয়ে ঢাকা বনবীথির মত! একটু পরেই ডানদিকে সারনাথের ছোট ষ্টেশন দেখতে পেলুম।

আরও খানিকটা যাবার পর বাঁদিকে একটা বড় স্তূপ চোখে পড়ল—এর নাম চৌখণ্ডী স্তূপ। বুদ্ধদেব উরুবিল্ব থেকে সারনাথে আসার পথে এইখানেই প্রথম তাঁর পাঁচজন শিষ্যের দেখা পান। স্তূপটার চূড়োয় একটা আটকোণা ইটের স্তম্ভ আছে। সবশুদ্ধ প্রায় নব্বই ফিট উঁচু হবে স্তূপটি। সাইকেলগুলোকে মাটীতে শুইয়ে রেখে আমরা স্তূপের ওপর উঠতে আরম্ভ করলুম। এখান থেকে সারনাথের মন্দিরটি বড় সুন্দর দেখায়। কাশীরও দৃশ্য পাওয়া যায়। কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজা দু'টি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ ওপরে বসে আমরা নেমে এসে আবার সাইকেল চাপলুম। এবার সোজা পশ্চিমদিকে। খানিক যাবার পর আর একটা তেমাথায় আমরা এসে হাজির হলুম। ডানদিকে বেঁকে কিছুদূর গিয়েই সারনাথের নতুন মন্দির

মূলগন্ধকুটি বিহার দেখতে পেলুম। কি সুন্দর এই মন্দির! চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। কি সুন্দর এর কারু-কার্য্য! সারনাথ জায়গাটি ভারী নির্জ্জন—মনে হচ্ছিল কোন্ এক অজানা লোকে চলে গেছি। সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সারনাথের স্তূপের ধ্যান গম্ভীর দৃশ্য দেখে আমার মনে যে অপার্থিব অনুভূতি হয়েছিল তা' আমার জীবনের চিরকালের হয়ে থাকবে। ঠিক এই জায়গাটিতেই ভগবান বুদ্ধ একদিন তাঁর 'অহিংসা পরমোধর্ম্ম' বাণী প্রচার করেছিলেন। ধন্য এই স্থান।

রাস্তার ওপরেই একটি ফটক। মাঝখান সুন্দর লাল সুরকির রাস্তা। গেটের গায়ে সাইন বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে—Cars not allowed.—আমাদের ছিল সাইকেল, আমরা সাইকেল শুদ্ধই ভেতরে ঢুকলুম। ওগুলোকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে রেখে মন্দিরের সিঁড়ির সামনেই লেখা রয়েছে Shoes off please—নগ্নপদে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলুম।



সারনাথ মূলগন্ধকুটি বিহার

ভেতরে সে কি চমৎকার দৃশ্য! মন্দিরের চারধারের দেওয়ালে বুদ্ধদেবের জন্ম থেকে মৃত্যুকালের পরিচায়ক অনেক ছবি। ছবি আঁকবার জন্যে সুদূর জাপান থেকে নসু ও কাওয়াই নামে দুজন আর্টিষ্ট এসেছিলেন। মন্দিরের দেওয়ালের ছবি দেখতে দেখতে আমরা ক্রমশঃ এগিয়ে চললুম। তার পরেই সামনে বুদ্ধদেবের পিতলের একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখতে পেলুম।

একটা ব্যাপার দেখে আমরা সবচেয়ে অবাক হয়ে গেলুম—একজন বৌদ্ধ ভক্ত হাত যোড় করে কেবলই সেই মূর্ত্তির চারিদিকে ঘুরছেন—ও মাঝে মাঝে মূর্ত্তিটিকে নমস্কার করছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে আমাদের সাহস হ'ল না।

সারনাথ

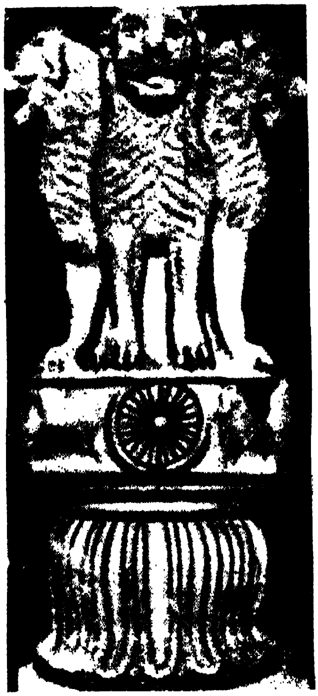
অমিয় মাধব মিত্র

মন্দির থেকে বাইরে এসে আমরা একবার মন্দিরটার চারিধারে ঘুরে দক্ষিণ দিকে চল্লুম। কিছুদূরে আর একটা স্তুপ দেখতে পেলুম—এটি ধামেক স্তূপ। এই স্তূপটি চৌখণ্ডী স্তূপের চেয়ে বড় বলে মনে হ'ল। সবশুদ্ধ ১২০ ফিট উঁচু উপরে ওঠবার কোন রাস্তা নেই। এখান থেকে সারনাথের নতুন মন্দিরটির দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল—পকেট থেকে ক্যামেরাটা বার করে একটা ছবি নিলুম। তারপর ধামেক স্তূপেরও একটা ছবি তুললুম। সাইকেলগুলোকে এখানে একজন লোকের জিম্মায় রেখে আমরা এবার দক্ষিণদিকে কাছেই Excavations দেখতে গেলুম। Excavations, মানে—লোকজন লাগিয়ে মাটি খুঁড়ে তার তলা থেকে বহুকালের প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কার করা। অনেকদিন হ'ল সারনাথে excavations চলে আস্‌ছে যেমন নালান্দায় চলছে এবং এর ফলে পুরাকালের যেমন শ্রীঅশোকের সময়ের অনেক জিনিষ আবিষ্কার করা হয়েছে। অয়েরটেল নামে এক সাহেব প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই স্থান খুঁড়ে সারনাথের আসল মন্দির, অশোক স্তম্ভ ও তার চূড়া এবং আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। মার্শ্যাল ও হারগ্রীবস্ নামে আরও দু'জন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে সাহায্য করেছেন। ১৯২৪ সালে দয়ারাম সাহানী প্রায় পাঁচ বছর excavations চালিয়ে যে সমস্ত আবিষ্কার তাঁর পূর্ব্বে হয়েছিল এবং যা তিনি নিজে করেছিলেন সেগুলি সংরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করেন। সেই সমস্ত কীর্ত্তি সারনাথ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। অশোকের সময়ের ঘর-বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে। যদি তোমরা কখন সারনাথ যাও তো এ সমস্ত দেখতে ভুলো না যেন—তাহলে তোমাদের ইতিহাসে বুদ্ধদেব ও অশোক পড়া এবং সারনাথ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। Excavations দেখবার জন্য আমরা একজন গাইড নিয়েছিলুম—সে আমাদের প্রত্যেকটি জিনিষ দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিচ্ছিল; সত্যি কথা বলতে কি আমাদের ভারী কৌতূহল হচ্ছিল। Excavations দেখতে যাবার পথে ক্রমশই আমরা নীচে নামছিলুম—সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল যেন পাতালে প্রবেশ করছি। সমস্তটা ঘুরতে আমাদের প্রায় আধঘণ্টা সময় লাগলো।



ধামেক স্তূপ

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমরা পূর্ব্বদিকে চল্লুম জৈনমন্দির দেখতে। সারনাথের একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে যে 'মূলগন্ধকুটি' বিহারের প্রায় হাত পঞ্চাশ দূরে পূর্ব্বদিকে এই প্রকাণ্ড জৈন মন্দির। মন্দিরটি দেখে মনে হ'ল বেশীদিনের তৈরী নয় কারণ সেটি আধুনিক ভাবে তৈরী। এ মন্দিরটির জন্য সারনাথ জৈনদের একটি তীর্থস্থান। মন্দিরে গিয়ে দেখলুম সামনের বড় গেটটা খোলাই রয়েছে কিন্তু ভেতরে দরজা বন্ধ— কেউ কোথাও নেই। সুতরাং ঐ পর্য্যন্তই দেখেই আশা মেটাতে হল।

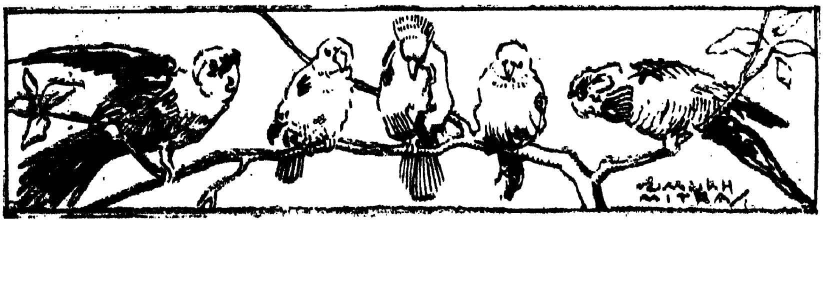

বিখ্যাত সিংহচূড়া

জৈনমন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা বৌদ্ধ পুরোহিতদের গৃহে জল খেতে গেলুম। আমরা সেখানে দেখলুম জাপানী বৌদ্ধই অধিকাংশ। একজনের সঙ্গে ইংরাজিতে আলাপ করে জল খাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলুম। হাসিমুখে তিনি বাড়ীর উঠানে পাত্‌কো দেখিয়ে দিলেন।

এবার আমাদের মাত্র মিউজিয়ম দেখতে বাকী। সাইকেল নিয়ে আমরা আসবার মুখে তেমাথার মোড়ে সারনাথের বিখ্যাত মিউজিয়াম দেখতে গেলুম। সামনে সুন্দর বাগান—মাঝখান দিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন রাস্তা। মিউজিয়মের বড় দরজার সামনেই দেখলুম বিখ্যাত সিংহচূড়া রয়েছে! কিন্তু—মিউজিয়ম তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে!—মনটা বড়ই দমে গেল, শেষকালে কি না একটার জন্যে খুঁৎ রয়ে গেল, কিন্তু তখন আর কোন উপায় নেই—সুতরাং মিউজিয়ম আর সেবার দেখা হল না।

মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে আমরা কাশীর দিকে ফিরলুম। আবার সেই মরুভূমি পার হতে হবে ভেবে শরীর ভয়ে রি-রি করে উঠলো—যাহোক সারনাথ দেখার সৌভাগ্যে সমস্ত কষ্ট ও ভয় দূরে ঠেলে ফেলে দিলুম।

যখন বাংলোয় ফিরলুম তখন সন্ধ্যা ৬টা।



প্ল্যান্‌চেট

শ্রীশামুক

বাড়ী ফেরবার সময় মিনু বললো—"সমুদা সব ঠিক রইলো তাহ'লে, তুমি, আমি আর দাদা—শনিবার সন্ধ্যা সাতটায় ; বাবা মা কেউ বাড়ী থাকবে না, সব নেমতন্ন আছে। আমি মাকে বলে রেখেছি, সেদিন রাত্রে তুমি আমাদের বাড়ী খেও।"

মিনুর দাদা বিভু জিজ্ঞাসা করলো—"মাকে সব বলেছিস বুঝি? মা শুনে কি বললো রে?" মিনু উত্তর দিল—"মা বললো বেশ ত' একরকম মজার খেলা হবে তোমাদের, আমি ওসব ভুত-টুতে মোটেই বিশ্বাস করি না।" সমু বাধা দিয়ে বললো—"এদের ভুত কিন্তু বলা চলে না মিনু।" "সে ত' জানি, তুমি ত' এস, সব ঠিক করে রাখবো"—মিনু উত্তর দিল। সমু বললো—ভুলো না, একটা টেবিল কালো টেবিল ক্লথ দিয়ে ঢাকা, সবুজ শেড্ দেওয়া টেবিল-ল্যাম্প, কাগজ, পেন্সিল"—একটু ভেবে নিয়ে আবার বললো—"না আর কিছু নয় ; প্ল্যান্‌চেট, আমিই নিয়ে যাবো।"

শনিবার সন্ধ্যা। মিনুদের বাড়ী সমু এসে দেখে দোতলার পড়বার ঘরটিতে একেবারে তৈরী হয়ে বিভু ও মিনু বসে আছে, সঙ্গে আরেকটি কে ছেলে। সমু ঘরে ঢুকতেই মিনু বললো—"ঠিক সময়ে এসেছো, আমাদের দলে আরেকজন হয়েছে ; এই যে জিতুদা, কাকীমার ছোট ভাই। তুমি জিতুদাকে একটু বলে দিও প্রথমে।"

টেবিলের চারপাশে চারখানা চেয়ারে সকলে বসলো! সবুজ শেড্ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে পাশের বস্তীর চাল ও তিনটে তালগাছের মাথা চোখে পড়ে। আকাশ বেশ পরিষ্কার, একটু মেঘ নেই—তারাগুলো জল্ জল করছে। মিনুর কোঁকড়ানো চুলের ছায়া দেওয়ালে গিয়ে পড়েছে, তার অস্থির চোখদুটো নেচে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে একজনের পর আরেকজনের মুখের উপর। মিনুর ঠিক সামনেই সমু বসে, চওড়া কপালে তাকে বয়সের চেয়ে একটু বেশী আর গম্ভীর দেখায়। মিনুর দাদা ও বিভু একই ক্লাসে পড়ে আর সমস্ত কাজে ও এই দলের পাণ্ডা। মিনুর ডানদিকে বসে বিভু আর বাঁদিকে জিতু ; জিতু বেচারী আজ এই দলে প্রথম। কোথায় একটু গল্প গুজব হবে বা খেলাধুলা—না এই গম্ভীর হয়ে টেবিলের চারদিকে বসে এই সব! কি করে, মিনুর পাল্লায় পড়ে আজ থাকতে বাধ্য হয়েছে। ওর পাতলা ঠোঁট আর টানা টানা চোখদুটি দেখলেই মনে হয় যেন কোন কাজেই ও জোর করতে পারে না—কেউ একটু জোর গলায় চেঁচিয়ে কথা বললেই যেন ওর চোখ ছলছল করে উঠবে আর কাঁপতে সুরু করবে ঠোঁট দুখানি।

সমু গম্ভীর গলায় আরম্ভ করলো জিতুর দিকে চেয়ে "আমি কেশবাবুর কাছ থেকে যা শিখেছি তাই বলি। মানুষের মরবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়। আত্মার মৃত্যু হয় না। এই আত্মারা আমাদের চারিদিকে খুসিমত ঘুরে বেড়ান এবং আমরা যদি ডাকি ত আসতে পারেন।"

জিতু একটু ভয় ভয় পেলো। সমুর চোখের উপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মিন্থর দিকে চাইলো। মিন্থ একটু মিষ্টি হাসি হেসে যেন অভয় দিল—ভয় ত' নেই কিছু। কিন্তু সে একটু দুষ্টুমির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো—"আচ্ছা খারাপ আত্মারা এসে আমাদের মেরে ফেলতে পারে?" জিতু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো "সমুদা, তাদের অনিষ্ট না করলে আমাদের কিছু হতে পারে না?"

"তাই তো মিন্থ ভয় পেয়েছ বুঝি?" সমু জিজ্ঞাসা করলো। বিভু বাধা দিয়ে বললো—"না সমু তুমি জানো না, ওসব মিন্থটার দুষ্টুমী। ডানপিটে মেয়ে, ওর আবার ভয়" সমু বললো—"এবার আমরা কি করবো তাই বলি। আলো নিবিয়ে দিয়ে কাগজের উপর প্ল্যান্‌চেটে হাত রেখে চুপ করে বসে ভাববো। খানিকবাদে প্ল্যান্‌চেট যখন বেশ কাঁপতে থাকবে তখন জানতে পারবো কোন না কোন আত্মা এসে গেছেন। তখন আলো জেলে দেখতে পাবো যে প্ল্যান্‌চেটের মধ্যের পেনসিলটি কাগজের উপর লেখা সুরু করেছে। আমাদের ইচ্ছামত প্রশ্ন করতে পারি; তার উত্তর বেশ স্পষ্ট লেখায় তক্ষুণি পাওয়া যাবে। তবে কেশববাবু বলেন যে কারুর কোন রকম অন্যায় প্রশ্ন বা হাসাহাসি করা উচিৎ নয়। তাহলে আত্মারা বড় কষ্ট পান মনে।" এই কথা বলে সমু মিন্থর দিকে চাইলো।



সকলে প্ল্যান্‌চেটের ওপর পশাপাশি হাত রেখে বসেছে

মিন্থর মুখ দেখে মনে হয় মিন্থ বেশ জোর করে গম্ভীর হয়ে আছে, একটা কিছু খুব মজা হবার আশায় আনন্দ ও হাসি মুখ ফুটে বেরুতে চাচ্ছে। জিতুর কিন্তু কিছু ভয় ভয় লাগছে, বিশেষতঃ আলো নিবিয়ে দেবার কথা শুনে। একবার মনে হ'ল আজকে না এলেই সে ভালো করতো, কিন্তু এসে যখন পড়েছে তখন না থাকা ছাড়া উপায় কি? সে একবার সমুর মুখের দিকে তাকিয়ে, আলোর সবুজ শেডটার দিকে চেয়ে বসে রইলো। সমু বললো—"বিভু এবার আমরা আরম্ভ করি কেমন?" মিন্থ বললো—"দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে ত?" স বললো—"দিলে ভালই হয় কেউ এসে ডিস্‌টার্‌ব্‌ করতে পারে।" মিন্থ বললে

—"বা তোমায় ত' বলেছি বাড়ীতে আজ কেউ নেই চাকরেরা ছাড়া ; তবু বন্ধ করে দি। রামাটা যা চেঁচায় মাঝে মাঝে।" সমু সাদা কাগজের উপর ঠিক মাঝখানে প্ল্যান্‌চেটটি বসিয়ে তার গর্ত্তে একটি পেনসিল লাগিয়ে দিল। সকলে প্ল্যান্‌চেটের ওপর পাশাপাশি হাত রেখে বসেছে, টেবিল ল্যাম্পটি একধারে রাখা—সুইচ ঘুরিয়ে আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'ল।

মিন্টু একবার চোখ বুজেই আবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো সকলের মুখ দেখা যাচ্ছে কিনা। কালো কালো অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। মিন্টুর বাঁ হাতের আঙ্গুলের সঙ্গে ছুঁয়ে ছিল জিতুর ডান হাত—মিন্টুর মনে হ'ল জিতুর আঙ্গুল কাঁপছে—সে কড়ে আঙ্গুল দিয়ে একটু চাপ দিতেই কাঁপুনি বেশ থেমে গেল।

জিতুর সামনেই খোলা জানলা। ঘর অন্ধকার হতেই সামনের বস্তীর চাল ও তার ঠিক পাশের তালগাছের মাথাগুলো বড় ভীষণ দেখালো—যেন তিনটে প্রকাণ্ড দৈত্য হাঁটুগেড়ে বসে আছে পাশাপাশি। আকাশের দিকে চেয়ে জ্বলজ্বলে তারাগুলোকে বড় ভাল লাগলো—ঐ তাদের মিটমিটে আলোর দিকে চেয়ে ঘরের অন্ধকারের কথা ভুলতে চেষ্টা করলো।

সব চুপচাপ। ঘরের মধ্যে নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না—বড় রাস্তা থেকে গাড়ীর আওয়াজ অস্পষ্ট ভেসে আসছে—একটি ছোট ছেলে কোন বাড়ী থেকে হঠাৎ কেঁদে উঠলো আর তার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ধমকানি—চুপ চুপ বলছি। একটা গলা শোনা গেল ঘরের ভিতরেই—"কাঁপছে না ?"

এ বিভুর গলা নিশ্চয়ই, কিন্তু কি ভয়ানক গম্ভীর আর ভারী শোনালো। সমু উত্তর দিল "আমারও মনে হচ্ছে কাঁপছে প্ল্যান্‌চেট—মিন্টু টের পাচ্ছ ?"

মিন্টু বললো—"পাচ্ছি।" এবারে মিন্টুর গলার আওয়াজে বেশী উৎসাহ খুঁজে পাওয়া গেল না—বোধ হয় ভয় পেয়েছে সে—জিতুর হাতটি আস্তে আস্তে এসে মিন্টুর হাতের উপর ভর করে চাপ দিয়ে রইলো—মিন্টুর মনে হ'ল জিতুর হাতের কাঁপুনিতেই যেন প্ল্যান্‌চেটটা কাঁপছে। এবার মনে হ'ল সমুদাকে বলে এ কথা, কিন্তু কিছু বললো না।

সমু ফট করে আলোটা জেলে দিতেই বেশ বড় দু'চারটে নিঃশ্বাসের শব্দ হ'ল, সকলেই যেন নিশ্চিন্ত হ'ল এতক্ষণে। সমু বললো "এইবার আমরা প্রশ্ন করবো ; যে আত্মা এসেছেন তিনি তাঁর উত্তর কাগজের উপর লিখে দেবেন। মিন্টুর ও জিতুর নিরিবিলি ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে চোখাচোখি হয়ে গেল। দুজনই বেশ লজ্জায় পড়লো, কারণ ওরা ভেবেছিল ঘরের চারিপাশে একবার দেখে নেওয়া ভাল—যদি আত্মাটাত্মা হঠাৎ যদি পিছন থেকে এসে—!

বিভু বললো—"সমু আরম্ভ কর।"

সমু জিজ্ঞাসা করলো—"আপনি কে ? কি করে মারা গেছলেন ?" কাগজের উপর পেনসিলশুদ্ধ প্লান্‌চেট সরে সরে গেল এক লাইনে। সমু প্যান্‌চেট সরিয়ে নিয়ে পড়লো—"আমার নাম শ্রীবসন্ত বিশ্বাস—আমার মৃত্যু হয় গরুর গাড়ী চাপা পড়ে।"

কথা শেষ হতে না হতেই মিনু খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো আর তার দেখাদেখি জিতুও। তবে জিতুর মুখ দেখে মনে হয় ওর হাসিতে আনন্দের ভাগটা কিছু কম।

সমু ধমকে বলে উঠলো—"ছিঃ মিনু, জানো হাসাহাসি করলে এঁরা খারাপ করতে পারেন আমাদের।" বিভু বললো—"মিনু, কি হচ্ছে? সাধে কি—" কথাটা আর শেষ করলো না। মিনু ভাবলো গরুর গাড়ীর চাপা পড়েছে শুনলে হাসি পায় না বুঝি? ঠোঁটটা কামড়ে একবার বিভুর দিকে চাইলো! জিতু চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলো। খারাপ করতে পারেন—কথাটা তার ভাল লাগেনি। খারাপই যদি হবার সম্ভাবনা আছে তবে কাজ কি এসব করে? মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেলো।

সমু আবার বললো—"আপনার সম্বন্ধে কিছু বলুন—কি করে মৃত্যু হ'ল, এই সব আমাদের বড় জানতে ইচ্ছে করছে।"

এরপর বেশ খানিকক্ষণ কাগজের উপর ঘস্‌ঘস্ আওয়াজ। এক এক লাইন শেষ হয় আর প্ল্যানচেট আবার ফিরে এসে কাগজের বাঁধার থেকে নতুন লাইনের উপর চলতে সুরু করে। ঘরের ভিতর আর কোন শব্দ শোনা যায় না। এত চুপ যে খারাপ লাগে, একটু ভয়ও করে। দূরে একটা পেঁচাও ডেকে উঠলো বিশ্রী ভাবে; মনে হ'ল যেন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডেকে উঠল। সকলেই চমকে জানলার দিকে দেখলো। তালগাছের মাথাগুলো একটু একটু নড়ছে, কালো বস্তীর চালটা একটা প্রকাণ্ড কুমীরের মত নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে আছে—দূরে একটা বাড়ী থেকে সবুজ আলো দেখা যায়।

প্ল্যান্‌চেট থামল। সমু কাগজটা তুলে ধরে পড়লো,—টাউন স্কুলের সেকেণ্ড-মাষ্টার ছিলাম আমি। স্কুল থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার বাড়ী। আমার মা, স্ত্রী ও ছোট্ট একটি মেয়ে—এই নিয়েই ছিল আমার সংসার। মেয়েটি আমার বড় চঞ্চল আর দুষ্টু ছিল, অনেকটা মিনুর মতনই, আর দিন রাতে আবদারের তার শেষ থাকতো না, নাম তার কমলা।"—এই পর্য্যন্ত পড়ে সমু মিনুর দিকে চেয়ে একটু হাসলো বিভু জিতুও মিনুর দিকে তাকালো। মিনুর বড্ড রাগ হ'ল—সে ঠোঁট উলটে চোখ বুজে বুড়ো মানুষের মত মুখ করে বসে রইলো,। ভাবটা এই যে, দুষ্টু না হাতী, ভারী ত'!

সমু আবার পড়ে গেল—"সেদিন স্কুলের পর বাড়ী ফিরছি, সারাদিনের বিষ্টিতে পথঘাট কাদা, সাবধানে পা না ফেললেই—ব্যাস। একটা সরু গলির মোড় ফিরেছি, দেখি সামনে থেকে একটা গরুর গাড়ী ছুটে আসছে। দেখেছ ত,' মাঝে মাঝে কলকাতার রাস্তায় গরুর গাড়ীগুলো কি রকম জোরে ছুটে চ'লে। এক পাশে সরে যাবো ভাবছি এমন সময় তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তার ওপার থেকে একেবারে ছুটে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। তাদের ত' আর ঠেলে ফেলে যেতে পারি না, তাই, কি করবো ভাববার আগেই গরুর ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গেলাম আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। তারপর এই শূন্য রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজকে তোমরা ডাকতে দৌড়ে এলাম। কমলার জন্যে বড় মন কেমন করে। এখন বেশ বড় হয়েছে—যখন বই খাতা নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করতে স্কুলে যায় তখন মনে হয় একবার ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরি।"

প্ল্যান্‌চেট

শ্রীশামুক

সমুর পড়া শেষ হোল ; সকলেই চুপ, ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। মিনুর চোখে জল টল্‌টল্ করছে। সে আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে চোখের জল মুছবার আগেই জিতুর চোখেও হঠাৎ জল এসে গেছে একেবারে দুকূল ছাপিয়ে—ঠিক বোঝা গেল না, আলোর শেডের ছায়া ওর মুখে গিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে সমু প্ল্যান্‌চেট যথাস্থানে রেখে আবার প্রশ্ন করলো—"আপনারা যখন খুসী যেখানে সেখানে যেতে পারেন ?" খস্‌খস্ লেখার পরে কাগজ তুলে সমু আবার পড়লো—"আমরা ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারি বটে যতদূরই হোক না কেন। সত্যিই, এই ধরো না কেন দিল্লী গিয়ে দেখে আসতে পারি মিনুর বড়মামীমা কি করছেন। কিন্তু তা'তে লাভ কি ?—তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি করে নিজেরা ত' আর দেখতে পাবে না ?"

মিনু চোখ বড় বড় করে কথাগুলো যেন গিল্‌লো, কি অসম্ভব কথা। দিল্লীতে তার বড়মামীমা থাকেন—জানল কেমন করে! সত্যিই তো এই ন'শো মাইল গিয়ে এখনই দেখে আসতে পারেন বড়মামীমা কি করছেন—তা'লে এঁদের অসাধ্য কি ? এঁরা পারেন না এমন কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে ? ইচ্ছা করলে ত' এক নিমেষে সব ক'জনাকে সাবাড় করেও দিতে পারেন !— মিনুর সত্যিই এবার ভয় হল। জিতুর দিকে তাকিয়ে দেখে জিতু চুপটি করে বসে আছে, ওর শরীর একটুও নড়ছে না, চোখ যেন চেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সমুর মুখে কিন্তু ভয়ের লেশমাত্র নেই। এ যেন ওর জীবনের নিত্যকার ঘটনা, নতুন কিছু নয়। এই জন্যেই ত' সমুদার উপর মিনুর এত ভরসা।

সমুর গলার আওয়াজে মিনু চমকে উঠলো,—সমু বলছে—"আপনি যদি ভবিষ্যৎ জানতে পারেন ত' আমাদের চারজনের সম্বন্ধে কিছু বলুন না, জানবার বড় ইচ্ছা।" একটু বাদে কাগজে উত্তর এল—"আজ আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে ; আরেকদিন সময়মত সব বলবো। তোমাদের আগ্রহ দেখে ভারী খুসী হয়েছি তোমরা ভালো ছেলে মেয়ে। একটা কথা যাবার আগে বলে যাই তোমাদের মধ্যে একজনের আজকে বড় বিপদ আছে, সকলেই একটু সাবধানে থেকো। আজ আসি।"

মুখ শুকিয়ে গেল সকলেরই—বিপদ! বিপদ আবার কি আসবে—এ আত্মার ভয়-দেখানো নয়তো ? কিন্তু যে-ভাবে বলছেন তাতে মনে হয় যেন সত্যি। বাড়ীর মধ্যে বিপদ কি হতে পারে ? আর যার বিপদ সে যদি রক্ষা না পায়, তাহ'লে ? সকলে মুখ চাওয়াচাই করলো। জিতুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বিপদ যে তারই এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। মিনু ঠোঁট কামড়ে চেয়ারের হাতল দুটো ধরে ফেলেছে, মনে হল যেন ও কাঁপছে। সমু কিন্তু প্রকাশ করতে চায় না, ও ভয় পেয়েছে, শরীর একটা নাড়া দিয়ে একটু ধরা ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলো—"যাবার আগে একটা কথা শুধু বলে যান, কার বিপদ আর সে রক্ষা পাবে কিনা ?"

প্ল্যান্‌চেট শেষবারের মত এক লাইনে সরে সরে চললো আর সেই খস্‌খস্ শব্দ।

সমু পড়লো—"কা'র বিপদ বলবার ইচ্ছা ছিল না, আগে থেকে ভয় পাবে এই ত'—না ? তবে যখন পীড়াপীড়ি করছো বলতেই হবে। তোমাদের মধ্যে একজন তাকে রক্ষা করবার বিশেষ চেষ্টা করবে, তবে

সে সফল হবে কিনা বলতে পারছি না। ভয় পেয়ো না। বিপদ যখন আসবেই আগে থাকতে ভেবে ভেবে তাকে আটকাতে পারে কেউ? মিন্টুকে একটু সাবধানে রেখো—চললাম।"

মিন্টু—মিন্টুর বিপদ আজ? চারজনেরই গলা টিপে ধরে কে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিল। মিন্টু ছাড়া সকলের যেন একসঙ্গে কান্না পেয়ে গেল—মিন্টুর বিপদ আজ; কি হবে? মিন্টু নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত বসে। প্রথম শুনে ভয়ে হিম হয়ে গেল সমস্ত শরীর, বুকের থেকে ধক্ ধক্ আওয়াজ ও নিজেই শুনতে পেয়েছে। তারপর ভাবতে লাগলো ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে—সমুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, সমুদা ছাড়া আর কে? ওর চক্চকে প্রশস্ত কপালখানা চোখে পড়লে যেন সাহস আপনি এসে পড়ে; কিন্তু জিতুদাই বা নয় কেন? জিতুর দিকে চেয়ে দেখে চোখে ওর একটা অসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মন কিন্তু ঘরের বাইরে অনেকদূরে চলে গেছে। জিতুদা বাঁচাতে পারবে? হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ দুম্ দুম্ দুম্—সকলেই হাউ-মাউ করে লাফিয়ে উঠলো চেয়ার থেকে। আবার সেই আওয়াজ দুম্ দুম্ দুম্—দরজার উপর কে ঘা মারছে আর সঙ্গে সঙ্গে রামা চাকরের গলার চীৎকার—"খাবার তৈরী যে—আটটাও ত' বেজেছে, সকলে খেতে আসুন।"

বিভু সকলের মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলো কিন্তু মুখে হাসি ফুটলো না। সমুর ইচ্ছা হ'ল রামাটাকে এখুনি খুব পিটিয়ে দেয় কিন্তু কেউ কিছু বললো না, কোনরকমে তালগোল পাকিয়ে খিল খুলে সকলে এলোমেলো ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আলো জ্বলতেই থাকলো, নিবোবার কথা কারুর মনে পড়ল না।

খাওয়ার পর সমু ও বিভু এসে ঘরে ঢুকলো। বিভু বললো—"আমার মনে হয় তুমিই আজ মিন্টুকে রক্ষা করবে। জিতুকে সাহস দেবার জন্য মিন্টু কি বললো শুনলে ত'? বললো, আজ জিতুদাই আমাকে বাঁচাবে। মিন্টুটা যেন কি রকম, একটু আগে কত ভয়ই না পেয়েছিল আর এখন দেখে মনে হয় বিপদ হবে জেনে ও খুব খুসী হয়েছে। সমু চুপ করে শুনলো, মুখে ওর বড় ভাবনা ফুটে উঠেছে—আজকের সবটুকু দায়িত্ব যেন ও মাথা পেতে নিয়েছে।

দূর থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠলো—আগুন আগুন—আর সঙ্গে সঙ্গে লোকের গোলমাল, মেয়েদের ভয়ের প্রবল চীৎকার, ছোটদের কান্না—সব সুরু হয়ে গেল। এক মুহূর্ত্তে আকাশ বাতাস ছেয়ে সে এক প্রলয় কাণ্ড। সমু বিভুর দিকে চাইলো—ওর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, ঠোঁট অল্প একটু কেঁপে একটা অস্পষ্ট কথা বেরিয়ে এল—'মিন্টু'—তারপর দুজনাই ব্যস্ত ভাবে ছুটে চললো ভিতরের দিকে।

বিভুদের বাড়ীর সামনেটা লোকে লোকারণ্য। পাশের বস্তীতে আগুন লেগেছে। আগুনের শিখা আকাশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে লাফিয়ে উঠছে আর ধোঁয়ার ধোঁয়া—দম বন্ধ হয়ে আসে। সকলে ছুটোছুটী করছে আর চীৎকার করছে—জল জল। সমুরা বাড়ীর গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে সব দেখলো—এসব যেন সত্যি নয়, স্বপ্ন দেখছে।

প্ল্যানচেট
শ্রীশামুক

সমু বললো—"আমাদের এ রকম করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিৎ নয়। মিনু তুমি এখানে থাকো, কোথাও এক পা' যেতে পাবে না তুমি ; জিতু থাক তোমার কাছে। আমি, বিভু ওদের সাহায্য করিগে, জল বইবার লোকের দরকার হবে। মিনু কিন্তু কোথাও যেও না ভাই লক্ষীটি।" সমু ও বিভু চলে গেল যেখানে লাইন বন্দী লোক দাঁড়িয়ে জল চালান করছে বালতী বালতী। আর একদল লোক, এক একবার দৌড়ে বস্তীর ভিতর ঢুকে যাচ্ছে আর কিছু না কিছু জিনিষ পত্তর বা ছোট ছেলেমেয়েদের আঁকড়ে ধরে ছুটে বেরিয়ে আসছে।

আগুন বেশ দাউ দাউ করে জ্বলছে—গায়ে আগুনের হল্‌কা এসে লাগে, চোখ জ্বালা করে ধোঁয়ায়।—সবচেয়ে ছোট তালগাছের মাথায় আগুন গিয়ে উঠলো। তালগাছটা একটা ফুলঝুরির মত জ্বলছে। পোড়া কাঠ ফাটার ফট্ ফট্ শব্দ, জল চালার আওয়াজ, মানুষের কান্না ও চীৎকার—সব মিশে এক অদ্ভুত কোলাহলের সৃষ্টি করছে।

মিনুর পাশে দাঁড়িয়ে জিতু দেখছিল কিছু দূরেই সমু ও বিভু লোকদের লাইনে দাঁড়িয়ে হাতে হাতে জলের বালতী চালান করছে। ওরা মাঝে মাঝে এদিকে দেখছে মিনু ঠিক আছে কিনা। জিতুর মনে হ'ল এরকম দাঁড়িয়ে দেখা তার শোভা পায় না—তারও কিছু করা উচিৎ। মিনুকে বললো—"মিনু তুমি এখানে থাকো, কোথাও যেও না, সমুদা তা'লে বড় রাগ করবে—আমি ওদের কাছে যাচ্ছি।"

মিনু আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নির্জ্জীবের মত দাঁড়িয়ে ছিল ; ওর কোঁকড়ানো চুলের উপর আগুনের আলো ছায়ার খেলা চলেছে। জিতুর কথাগুলো তার কাণে গেছে বলে মনে হয় না। জিতু কোন উত্তর না পেয়ে ওর চোখের পানে চেয়ে রইলো তারপর আস্তে আস্তে চলে গেল বিভু সমুদের দিকে।

মিনুর হুঁস ফিরে এল লখিয়ার মাকে কাঁদতে শুনে। তার সামনেই মাটীতে বসে বুক চাপড়ে কাঁদছে সে। লখিয়া, লখিয়ার মা, আর তার ছোট্ট বোন—এই বস্তীর একটি ঘরে আজ অনেকদিন থেকে আছে। লখিয়া মিনুর বয়সী হবে। তার ছোট্ট বোনটি ভারী সুন্দর দেখতে। মিনু কতদিন লখিয়ার কোল থেকে নিয়ে আদর করেছে, কত খেলা করেছে তার সঙ্গে। মিনু দেখলো লখিয়া মায়ের পাশে থরথর করে কাঁপছে আর তার মার সে কি আকাশ ফাটানো কান্না। মিনু কান পেতে শুনলো—বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো—ছোট্ট বোনটি কই ? ঐ আগুনের ভিতর ? লখিয়ার মাকে ধাক্কা মেরে জিজ্ঞাসা করলো—"কোথায়, কোথায় সে ?"—কিন্তু উত্তর দেবে কে ? মিনু টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে, তারপর ছুটলো সে, যেন আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। কোন্ ঘরে লখিয়ারা থাকতো তার জানা, সোজা সেদিকে ছুটলো।—ধোঁয়া—সেই জমাট কালো ধোঁয়া প্রকাণ্ড এক হাঁ করে মিনুকে গ্রাস করে নিল।

সমু, বিভু, জিতু তিনজনেই দেখলো মিনুর সেই ধ্বংসকারী আগুনের ভেতর মৃত্যুর মুখে ছুটে যাওয়া। হাত পা অবশ হয়ে গেল ওদের। সমু চেঁচিয়ে ডাকতে গেল কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

জিতুর মনে হ'ল কি করবে সে—করবারই বা আছে কি ? এতক্ষণে হয়তো সব শেষ হয়ে গেছে। চোখের সামনে মিনুর মুখ ভেসে উঠলো—সেই দুষ্টু চাহনী, পাতলা ঠোঁটের সেই মিষ্টি হাসি আর কোঁকড়ানো কালো চুলের ঢেউ। আগুনে পুড়ছে মিনু। চুলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আগুনের লক্‌লক্ শিখা নাচছে—মিলিয়ে

গেল মুখটা হাওয়াতে। কি করবে সে? হঠাৎ মনে পড়লো মিন্টুর কথা; খেতে খেতে বলেছিল সে—"আজ আমাকে জিতুদাই বাঁচাবে।" কে যেন শপাং করে চাবুক লাগালো জিতুর পিঠে; লাফিয়ে উঠলো সে। পিছনের লোকটি এক বালতী জল হাতের কাছে এনে দিল, এবার তাকে তার সামনের লোকের হাতে পৌঁছে দিতে হবে, কিন্তু আর দাঁড়াতে পারলো না সে। এক লাফে বেরিয়ে এল লাইন থেকে, তারপর ছুট আর ছুট, যেন কে পিছন থেকে ভীষণ তাড়া করেছে ওকে। পাশের লোকেরা হা হা করে উঠলো, একজন এগিয়ে ধরতেও গেল—কিন্তু সে তখন নাগালের বাইরে...

মিন্টুর জ্ঞান হতে চেয়ে দেখে, মার কোলে শুয়ে আছে, আর বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সমু, বিভু, জিতু সামনে সব চুপ করে দাঁড়িয়ে, জিতুর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মিন্টুকে চোখ চাইতে দেখে মা বললেন—"তোমার বিশেষ কিছু হয়নি মিন্টু—আজ জিতুর জন্যেই বাঁচলে তুমি। বেচারী জিতুর হাত বেশ খানিকটা পুড়ে গেছে। আর লখিয়ার ছোট মেয়েটিও ভাল আছে। তুমি ভিতরে যাবার আগেই অন্য লোক তা'কে বার করে এনেছিল। তোমার কিন্তু এটা বড় দুঃসাহসের কাজ হয়েছিল মা।"

মিন্টু একটু হেসে বললো—"সব শুনেছ মা প্ল্যানচেটের কথা?" মা ঘাড় নেড়ে জানালেন যে সবই তার শোনা হয়েছে। তারপর জিতুর দিকে চেয়ে মিন্টু বললো—"দেখলে জিতুদা আমার কথা ঠিক হ'ল কিনা—তুমিই তো আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলে।"

জিতুর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল, সে মাটীর দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, কোন উত্তর খুঁজে পেল না।



চা-এর কথা

বিমল বসু

তোমাদের বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত, বন্ধু বান্ধব কিম্বা আত্মীয় স্বজন এলে সাধারণতঃ আমরা যে জিনিষটি তাঁদের সামনে এগিয়ে দি সেটা হলো "চা"। সভাসমিতি ও বৈঠকেও এই 'চা'কে কেন্দ্র করে কত কত নিরস আলোচনা সরস হয়ে উঠে। অথচ এই 'চা' সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই।

প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে চীন দেশে সর্ব্বপ্রথম চায়ের প্রচলন দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং এই Tea কথাটি এসেছে চীন দেশ থেকেই। উত্তেজক পানীয় হিসাবে ওরা ব্যবহার করতো। শুধু চীনদেশের জনসাধারণই সাদরে 'চা'কে আপন করে নেয় নি বৈদিক সাধু সন্ন্যাসীরাও তাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য 'চা' পান করেন। চীন দেশ থেকেই সর্ব্বপ্রথম 'চা' আমদানী হয় ইউরোপে। এটা হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। কয়েকজন মিশনরী ভগবানের আশীষের মত যেন 'চা'কে ইউরোপে নিয়ে এলেন।—তারপর এদেশে 'চা' এলো কি করে সে কথাই তোমাদের বলি এবার :—

বহু চেষ্টার পর ইংরেজেরা 'চা'য়ের চাষ ভারতে প্রচলন করতে পেরেছিলেন। এ সম্বন্ধে দুটো মজার গল্প আছে : ইংলণ্ডে রাণী এলিজাবেথের সময় চীনা দূত রাণীকে এক প্যাকেট 'চা' উপহার দিয়েছিলেন। রাণী ঐ 'চা' সিদ্ধ করে জলটা ফেলে দিয়ে রুটী আর চিনি দিয়ে পাতা-গুলো খেয়েছিলেন! তাছাড়া আমাদের এই কোলকাতা সহরের কথা ধরো—জনসাধারণকে 'চা' পান করবার জন্য কত উপহার উদ্ভাবন করা হয়েছিল তার ঠিক ঠিকানা নেই। শোনা যায় তখনকার কোলকাতার রাজপথের ওপর 'চা' এর দোকান করে পথচারীদের সাদরে ডেকে বিনামূল্যে 'চা' পান করান হতো এবং কী ভাবে এই 'চা' তৈরী করতে হয় তার নিয়ম কানুনগুলো যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিয়ে এক প্যাকেট 'চা' উপহার দেওয়া হোত--এভাবে কতদিন ধরে কত

ভাবে আন্দোলন করার ফলে আজ 'চা' সার্ব্বজনীন হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে প্রথম প্রথম 'চা'কে ঘৃণার ও অবজ্ঞার চোখে দেখা হোত—'চা' খাওয়াটা তখন ছিল যেন একটা অসামাজিক কাজ করার মতো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপে প্রচুর পরিমানে 'চা'এর ব্যবহার হতে লাগ্‌লো এবং ক্রমশঃ ইংলণ্ডের সঙ্গে চীনদেশের এই 'চা' নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠ্‌লো। ১৭৮০ সালে চীনদেশ থেকে কতকগুলো 'চা' গাছ এনে কোলকাতায় লাগান হয়। শোনা যায় ৫০।৬০ বছর আগেও লালদীঘির ধারে নিছক্ সৌন্দর্য্যের জন্য কতকগুলো 'চা' গাছ ছিল। তখন ভারতবর্ষে 'চা' চাষ করবার পরিকল্পনা চল্‌ছিল! ঠিক এমনি সময়ে মিঃ আর ব্রুস্ নামে এক ইংরাজ আসামের জঙ্গলে শীকার করতে গিয়ে বুনো 'চা' গাছ দেখতে পান। কেউ কেউ বলেন মনিরাম দেওয়ান বলে একজন আসামীয়া বুনো 'চা' গাছের প্রথম আবিস্কারক। যাহোক—তখন থেকে জল্পনা কল্পনা চল্‌তে লাগ্‌ল ভারতে 'চা'এর চাষ হতে পারে কিনা এবং আসাম জঙ্গলে যে বুনো 'চা'গাছ দেখতে পাওয়া গেছে তাকে কোন রকমে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে কিনা। তারপর একটা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে চীনদেশ থেকে বীজ এনে হিমালয়ের কুমায়ুন অঞ্চলে পরীক্ষা স্বরূপ চায়ের চাষ আরম্ভ করা হোল। এদিকে পরীক্ষা করে দেখা গেল আসামের বুনো গাছের 'চা' ব্যবহার করার মত নয়। তখন চীনদেশ থেকে বীজ আনিয়ে আসামে সদিয়ায় সর্ব্বপ্রথম 'চা' বাগান করা হোল—এর পর থেকে আসামের দু'একটা জায়গায় 'চা' চাষ চলতে লাগল।

'চা' গাছের ফুল হয় সাদা আর বড়ো চমৎকার দেখ্‌তে—সুগন্ধ তা হ'তে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ 'চা' গাছকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি (১) যে সব 'চা' গাছের পাতা-গুলো দু'ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না এবং বুনো অবস্থায় গাছগুলো ১০।১২ ফুটের বেশী উঁচু হয় না। এগুলো সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব চীনদেশে। (২) আর এক রকম 'চা' গাছ আছে সেগুলো দেখা যায় চীন দেশের য়ুনান ব'লে জায়গাতে। এর পাতাগুলো হয় লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি ও গাছগুলো হয় ১৬ থেকে ১৮ ফুট উঁচু। (৩) তৃতীয় ধরণের 'চা' গাছ আসাম ও উত্তর ব্রহ্মদেশের সান্ প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায় এবং বুনো অবস্থায় ২৫।৩০ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। (৪) চতুর্থ ধরণের গাছগুলো মণিপুর কাছাড় ও পার্ব্বত্য লুসাই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় গাছগুলো বুনো অবস্থায় ৪০ থেকে ৬০ ফুট উঁচু হতে পারে এবং এর পাতাগুলো ১২।১৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। তবে 'চা'এর বাগানে এই গাছ-গুলোকে ৩।৪ ফুটের বেশী বড়ো হতে দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে ছাঁটা হয় এবং তাতে করে

'চা' তোলার (Pick) করার সুবিধা হয়। বীজ থেকে গাছ হয় এবং কঠিন মাটীতে এরা সজল আবহাওয়ার ভিতর বেশ বাড়তে পারে। বীজ বপন করার তিনবছর পরে 'চা' গাছ থেকে 'চা' Pick up করা হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ, সিংহল, জাভা ও চীনদেশে প্রধানতঃ এই চারটে দেশেই অধিক পরিমানে 'চা' জন্মে থাকে। তাছাড়া জাপান ফরমোজা আফ্রিকার কোন কোন স্থান এবং রাশিয়ার জর্জ্জিয়া অঞ্চলে কতক পরিমানে 'চা' চাষ হয়ে থাকে এবং ভারতবর্ষ সিংহল ও জাভা থেকেই প্রচুর পরিমাণে বিদেশে 'চা' রপ্তানী হওয়ার দরুণ চীনদেশ থেকে 'চা' রপ্তানী অনেক পরিমাণে কমে গেছে।

সিংহল ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বড়ো বড়ো 'চা' বাগানে ঘোড়ায় চড়ে চা-করেরা বাগানের দেখা শোনা করে। আগাছা মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়। বাগানে কাজ করার জন্য ও 'চা' তোলার জন্য ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়োগ করা হয় এবং ভবিষ্যতে তারাই বড়ো রকমের ও উঁচুদরের Picks হয়ে উঠে। 'চা' তোলা বড় সহজ কথা নয় কারণ এরজন্য ক্ষিপ্রতা, সতর্কতা ও কার্য্যদক্ষতা প্রয়োজন। অতি সাবধানে যাতে গাছের ও পাতার কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে খুব আলতো ভাবে আঙ্গুলের সাহায্যে 'চা' তোলা হয়। তুটো জিনিষ তোমাদের বলি : 'চা' গাছ থেকে 'চা' তোলার সময়ে পাতায় কোন গন্ধ থাকে না—আসল 'চা' বিভিন্ন উপায়ে তৈরী করার সময়ে এর সুগন্ধ আসে, আবার একই 'চা' গাছ থেকে একই পাতা থেকে বিভিন্ন 'চা' তৈরী করা হয়।

সিংহলের একটী 'চা'এর কারখানার কথা তোমাদের বলি :—'চা' বাগান থেকে যারা 'চা' তুল্‌ছে তাদের পিঠে বাঁধা থাকে একটা করে টুকরী বা ঝুড়ি—ওরা 'চা' তুলে তার ভিতর রাখে। তারপর বস্তা বা টুক্‌রীটা ভাল ভাবে বন্ধ করে 'চা'-কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এদিকে আবার Ropeway র ব্যবস্থা আছে। মানে, দড়ির ওপর টুক্‌রীগুলা ঝুলিয়ে সোজাসুজি একেবারে কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখানে এগুলো নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে শুকান ও গুঁড়ো করা হয়। এগুলোকে নানা ভাবে বড়ো বড়ো পাত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয় শুকোবার জন্যে। তারপর ট্রে করে Rollerএর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এসবের পর ভবিষ্যতে যাতে 'চা'য়ের রঙ্‌ না বদ্‌লে যায় সেজনা এগুলোকে আরো তু'তিন ঘণ্টা ধরে গরম করা হোল। 'চা' বাছ্‌বার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হ'য়েছে সিংহলের 'চা'-কারখানায়।

এসব হয়ে গেলে পর 'চা' বাক্সবন্দী করে কখনও বাঁকে করে কখনও বা গরুর গাড়ী করে রেল ষ্টেসন অথবা নদীতীরে জাহাজে করে স্বদেশে অথবা বিদেশে রপ্তানী করা হোল।

এভাবে প্রথমে 'চা' বাগান থেকে কারখানায় এবং কারখানাতে নানা বিধি ব্যবস্থার পর গরুর গাড়ী অথবা অন্য উপায়ে জাহাজে ও রেলে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

তা হলে দেখ্‌তে পাচ্ছ কি বিরাট ব্যাপার সামান্য 'চা'কে কেন্দ্র করে চল্‌ছে। আরো একটী সুন্দর ব্যাপার এই 'চা'র পিছনে আত্মগোপন করে আছে। আমেরিকা যে আজ স্বাধীন হয়েছে এই স্বাধীন হওয়ার পিছনে 'চা'এর দান যে কতখানি তা শুনলে অশ্চর্য্য হয়ে যাবে। ইংরাজেরা 'চা'র ওপর কর বসাবার দরুণ আমেরিকাতে যে এর বিরুদ্ধে দারুণ আন্দোলন হয় সে আন্দোলন ক্রমশঃ স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এখন এই 'চা' খাওয়াটা ভালো না মন্দ? সাধারণতঃ লোকের ধারণা 'চা' খাওয়া মোটে ভালো নয়— এ ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। তোমদের আগে বলেছি, উত্তেজক পানীয় হিসাবে আগে এর নাম ছিল। ছেলে মেয়েদের 'চা' খাওয়াটা মোটে ভাল নয়, বিশেষ করে কড়া 'চা'—কারণ খুব কড়া করে 'চা' করলে অথবা অধিকক্ষণ গরম জলে 'চা' ভিজিয়ে রাখলে ট্যানিন বলে এক রকম এ্যাসিড তৈরী হয় আপনা থেকেই—সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, কারণ, অনেক সময় পরিপাক শক্তি নষ্ট করে দেয়। তিন মিনিটের বেশী গরম জলে 'চা' কখনও ভিজিয়ে রাখবে না, কারণ, এর চেয়ে বেশীক্ষণ রাখ্‌লেই ট্যানিন এ্যাসিড তৈরী হবে আপনাথেকেই। তার-পর 'চা' খালি পেটে কিছুতেই খাওয়া উচিৎ নয়, বেশী খাবে না আর অসময়ে খাবে না। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে রাশিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমান করেছেন যে 'চা'র ভিতর নাকি বি, ও, সি জাতীয় ভিটামিন আছে। তবে অধিক পরিমানে 'চা' কিছুতেই পান করা উচিৎ নয়। এ কথা তোমরা মনে রেখো। 'চা'এর ব্যবসা এখন আমাদের দেশেরও ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহু ভারতবাসী এতে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করছে। চীন জাপান প্রতিযোগিতা করেও ভারতকে এ বিষয়ে পিছনে ফেলে যেতে পারেনি। বিদেশীর হাত থেকে 'চা' বাগান ক্রমে ভারতবাসীদের হাতে আস্‌ছে।





নালিশে বালিশ

শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

সেদিনটা ছিল কিসের ছুটি।

কেল্লা থেকে গুড়ুম্ ক'রে তোপের আওয়াজ হ'ল। বেলা ঠিক একটা। কাকাবাবু তখন একখানা ইংরিজি নভেল প'ড়ছিলেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ; অর্থাৎ, একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'রছিলেন।



মণি, মায়া, সোণা কানু নালিশ জানালে।—

হঠাৎ এমনি সময়ে মনি, মায়া, সোনা আর কানু সবাই একসাথে ঘরে এসে ঢুকে নালিশ জানালো,—পানু ভাঁড়ার থেকে চুরি ক'রে কুলের আর আমের আচার এই মাত্তর খেয়ে পালালো, তা'র শাস্তি হোক্!.......

নিজেরা যে ভাগ পায়নি সেটা অবশ্য কেউই আর ব'ললো না। ওই পানুটা ছিল বেজায় ডান্‌পিটে। শুধু সে-ই ব'লে অত উঁচু থেকেও কায়দা ক'রে আ'চার সরাতে পেরেছে! তা'রপর, সব চেয়ে তা'র বড় অপরাধ হ'য়েছিলো, ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়াটা। সেটা ওরা কি ক'রে বরদাস্ত করে, বলো! কাজেই তারা চ'লে এলো কাকাবাবুর কাছে নালিশ ক'রতে।

বইটা বন্ধ ক'রে কাকাবাবু নালিশ শুনলেন। শুনে ব'ললেন—ছাখো, ব'ললেই অমনি একজনকে শাস্তি দেওয়া যায় না। এসব ব্যাপারে ন্যায্য বিচার হওয়া চাই। তা'র জন্যে সাক্ষী চাই প্রমাণ চাই, তা'রপর দু'পক্ষেরই কথা শুনতে হবে, তবে না বিচার, তবে না শাস্তি!............

তা'রা ব'ললো,—তা'কে তবে ডাকা হোক্!.........

কাকাবাবু ব'ললেন,—বেশ কথা ডাকো তা'কে।

তক্ষুনি সোনা গিয়ে কাকাবাবুর নাম ক'রে পান্নুকে ডেকে নিয়ে এলো। না এসে পান্নুর উপায় ছিল না। তা'র কারণ এই যে, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কাকাবাবুকে যেমনি বাস্তো ভালো, তেমনি ক'রতো ভয়।

পান্নু এলে কাকাবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন,—কিরে ভাঁড়ার থেকে চুরি ক'রে আচার খেয়েছিস্ তুই?......কিসের কিসের আচার, মণি?.........

মণি পরম উৎসাহে তৎক্ষণাৎ ব'লে দিল,—আমের কাকাবাবু, আর কুলের.......

কাকাবাবু ব'ললেন,—হাঁা হাঁা, আমের আর কুলের! খেয়েছিস?......তিনি পান্নুর দিকে চোখ ফেরালেন আবার।

পান্নু তো এর জন্যে আগে থেকেই তৈরী হ'য়ে আছে। দিব্বি পরিষ্কার গলায় জবাব দিল,—না কাকাবাবু, কক্ষনো না!......ওরা সব মিথ্যে ক'রে আমার নামে লাগাতে এসেছে নিজেরা পান্‌নি কিনা......ব'লে তা'দের দিকে কট্‌মট্ ক'রে একবার তাকালো।

তা'র কথা শুনে আর ভাবখানা দেখে, কাকাবাবুর তো ব্যাপার বুঝতে আর একটুও বাকী থাক্‌লো না।

তবু বাইরে সেটা কিছু প্রকাশ না ক'রে তিনি ব'ল্‌লেন, আমি তোমাদের কথা সব ঠিক বুঝতে পারছিনে......বড্ড গোলমেলে ব'লে মনে হ'চ্ছে!......তা'র চেয়ে তোমরা এক কাজ করো।

মণিরা জিজ্ঞেস ক'রলো,—কি কাজ?

কাকাবাবু ব'ললেন,—দু'দলই একজন ক'রে উকিল ঠিক করো। নিজেরা ব'ললে তো হবে না!......সেই উকিলরা তোমাদের কাছ থেকে সব শুনে আমায় গুছিয়ে ব'লবে। তা'রাও যেন তোমাদের বয়সীই হয়!......

মণি ব'ললো,—রবি হ'লে হবে?

রবি বাড়ীরই আর একটি ছেলে। এ ব্যাপারের কিছুই জানতো না, ঘরে ব'সে সাউথ্ আফ্রিকার একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প প'ড়ছিলো।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন,—সে তখন ছিল না তো ?

মণি ব'ললো,—না।

কাকাবাবু ব'ললেন,—তা'হলে হবে। আর সেই সাথে যা'র সাক্ষী প্রমাণ আছে, তা'ও এনে হাজির ক'রতে হবে। এখন সবাই যাও, আমি একটু ঘুমিয়ে নি'। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় বিচার হবে।

এই ব'লে তিনি পাশ ফিরে চোখ বুজলেন।

মণির দল সেখান থেকে সোজা গেলো রবির কাছে। তা'কে সব জানিয়ে ব'ললো,—পানুটাকে শাস্তি দিতেই হবে! উঃ······কী ভয়ানক হ্যাংলা, সবগুলো আচার একাই গিললো, আবার কাকাবাবুর কাছে গিয়ে কেমন জলের মতো মিথ্যে কথাগুলো ব'লে আসা হ'লো!······

রবিরও অনেকদিন আগের রাগ ছিল পানুর উপর, সে ওর ফাউণ্টেনপেনটা না ব'লে নিয়ে কোথায় হারিয়ে এলো, সে কথা ব'লতে গেলে আবার চটে উঠে চটাং চটাং কথা শুনিয়ে দেয়!······আচ্ছা······

রবি রাজী হ'য়ে গেলো। সাউথ আফ্রিকা রেখে, সে পরামর্শ ক'রতে ব'সে গেলো, মণিদের সাথে।

পানু প'ড়ে গেলো একা। সে ভাবতে লাগলো উকিল এখন কা'কে পাওয়া যায়। রবিকে তো ওরা দখল ক'রে নিলো। আর, রবিকে দিয়ে ওর দরকারও নেই, হয়তো উল্‌টোই ব'লে দেবে।······

কাকাবাবুর কথা, না মেনে উপায় নেই! না-হ'লে, নিজের কথাও তো নিজেই অনায়াসে ব'লতে পরতো! তা' নয়·········যত সব······কাকাবাবুর উপর ওর রাগ হ'তে লাগলো।······কিন্তু কি-ই বা করা যায়!······

আচ্ছা, বীরু কেমন!······নাঃ, বড্ড বোকা, কথাই ব'লতে পারবে না হয় তো!...কেষ্ট!...হ'তো, কিন্তু বাড়ী অনেক দূর, যেতে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে!

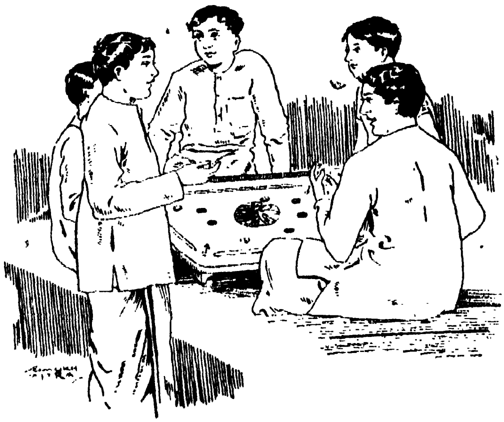
নবু! হ্যাঁ, হ'য়েছে, নবুই ঠিক হবে, তুখোড় ছেলে, ব'লতে-কইতেও পারবে। ...ঠিক!...

তক্ষুণি ছুট্‌লো পানু গলি পেরিয়ে নবুদের বাড়ীর দিকে!...

সেখানে গিয়ে দেখে, দলের আরো অনেকেই হাজির, ক্যারম্ চ'ল্‌ছে।...রিবাউণ্ড ক'রবার জন্য নবু ষ্ট্রাইকারটাকে জায়গা মতো বসাচ্ছে।

—কিরে...খেল্‌বি?.. নবু মাথা তুলে ওকে জিজ্ঞেস ক'রলো।

পানু মুখটা কালো ক'রে ব'ললো,—না ভাই, এখন খেলতে পারবো না, জরুরী কাজ। তোমায় ভাই, আমার উকিল হ'তে হবে।



কিরে...খেলবি?

উকিল!...সবাই পানুর মুখের দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকালো। উকিল মানে?...

পানু তখন আগাগোড়া ঘটনাটা ব'লে গেলো, সত্যি করেই।

নবু দেখলো, এ এক মজা মন্দ নয়। বেশ তো, একটু উকিলগিরিই করা যা'ক্ না?... লাফিয়ে উঠে ব'ল্‌লো,—আমি খুব রাজী, কি ক'রতে হ'বে বলো!...

খেলাটা খানিক সময় বন্ধ থাকলো।

পানু খুব খুসী হ'য়ে নবুকে শেখাতে পড়াতে লেগে গেলো। আর, নবুটাও তো কম নয়! সে-ও চট্‌পট্ বুঝে নিলো, কি ক'রতে হবে-না-হবে, কি ব'লতে হবে, বা না-হবে!..

খানিক পরে সে পানুর সাথে তা'দের বাড়ীর দিকে চ'ললো।

সাড়ে তিনটের সময় দু'টো দলই আবার এসে কাকাবাবুর ঘরে হাজির হ'লো।

কাকাবাবু ব'ললেন,—দু' দল দু' ধারে আলাদা হ'য়ে ব'সে পড়ো।...

তা'রা তাঁর কথা মতো, একটু তফাৎ হ'য়ে মুখোমুখি ব'সলো।

কাকাবাবু মুখখানা যথাসম্ভব ভারী ক'রে গম্ভীর গলায় ব'ললেন,—এবার এক-এক ক'রে আমি দু'পক্ষের কথা শুনবো। আগে, যা'রা ফোরেদী, অর্থাৎ যা'রা নালিশ ক'রেছে। কৈ, মনি, তোমাদের উকিল কে?...

মনি ব'ললো—রবি; এই যে!...আর, এই আমরা কতগুলো প্রমাণ এনেছি।...

ব'লে একটা কাগজের মোড়ক খুলে কাকাবাবুর সামনে রাখলো। বেরুলো কয়েকটা কুলের আঁটি!...বিস্তর খুঁজে খুঁজে ওরা ওই ক'টা জোগাড় ক'রেছে।

কাকাবাবু অনেক কষ্টে হাসি চেপে বল্‌লেন,—বেশ বেশ। এখন রবি, তোমার কি ব'লবার আছে দাঁড়িয়ে বলো। আর, তোমরা কেউ গোলমাল ক'রো না!...

রবি উঠে দাঁড়ালো। তারপর, পানুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লো,—ওই পানু আজ দুপুর বেলা ভাঁড়ার থেকে আমের আর কুলের আচার চুরি ক'রে খেয়েছে। এই তা'র প্রমাণ!.. ব'লে কুলের আঁটিগুলো দেখিয়ে দিলো। রবি ব'লে যেতে লাগলো,—এই মোটে ক'টা পাওয়া গেছে। আরও খেয়েছে। আমের আচার সব সুদ্ধু খেয়েছে, কিচ্ছু ফেলে নি'!

কাকাবাবু তেমনি গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস ক'রলেন,—খেতে কে কে দেখেছে, সাক্ষী আছে?

উকিলবাবু কিছু ব'ল্‌বার আগেই মণি উৎসাহিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লো---আমরা সবাই দেখেছি!...আমি দেখেছি. মায়া দেখেছে, কানু সোণা সব্বাই দেখেছে!...কেমন, দেখিস্‌ নি' তোরা? বল্‌ না!...

তা'রা এক সাথে হৈ-চৈ ক'রে উঠ্‌লো,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সব্বাই ওকে আচার খেতে দেখেছি, আমাদের এক ফোঁটাও...

কাকাবাবু বাধা দিয়ে ব'ল্‌লেন,---বুঝেছি বুঝেছি। রবি, তোমার যদি আর কিছু ব'লবার না থাকে তো এবার ব'স্‌তে পারো।

রবি ব'ললো,—না, আর কিছু ব'লবার নেই, তবে ওর কঠিন শাস্তি হোক্‌!...ব'লে ব'সে পড়লো।

কাকাবাবু পানুর দিকে তাকিয়ে ব'ললেন,—এবার আসামী, অর্থাৎ যা'র নামে নালিশ করা হ'য়েছে। পানু, তোমার উকিল বুঝি নবু?...পানু মুখ ফুলিয়ে ব'ললো,—হুঁ। কাকাবাবু নবুকে যা' ব'লবার আছে দাঁড়িয়ে ব'ল্‌তে ব'ললেন।

নবু দু' একবার কেশে নিয়ে ব'ল্‌তে সুরু ক'রলো,—পানু চুরিও করে নি...আচারও খায় নি। ও সবই ওদের মিছে কথা...আগাগোড়া তৈরী!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন,—খামোকা মিছিমিছি নালিশ ক'রতে আসবে কেন?... ওদের এতে লাভ কি?

নবু তড়্ বড়্ ক'রে ব'লে দিলো,—এতো সোজা কথা ! পানুর সাথে ওদের ঝগড়া আছে, তাই !...

কাকাবাবু মাথা নেড়ে ব'ল্লেন—উহুঁ, শুধু ও ব'ল্লে চ'ল্বে না। ওরা প্রমাণ সুদ্ধ হাজির ক'রেছে, সাক্ষীও রয়েছে !

এবার নবু কি জবাব দেয় শোন্বার জন্যে মণির দল উৎসুক হ'য়ে কাণ খাড়া ক'রে রইলো।

নবু চোখ পাকিয়ে, হাত নেড়ে চ্যাচাতে লাগল, —সাক্ষী তো সব ওদের দলের ! আর প্রমাণও তো ভারী !...এর আবার প্রমাণ কি ! খায়নি, ব্যাস্ ! হ্যাঁ, যদি খেয়েই থাকবে, তা হ'লে কি ওদের জানিয়ে খেতে যাবে ?...কোত্থেকে কতগুলো শুক্নো আঁটি কুড়িয়ে এনেছে !...

মণি হাঁ হাঁ কার উঠ্লো,—কে ব'ল্লে শুক্নো ? এখনও একটু একটু ভিজে রয়েছে...ত্যাখোনা হাত দিয়ে !...

কাকাবাবু আর একবার হাসি চাপলেন। নবু হাত নেড়ে বল্লো,—থাক, দেখতে চাইনে।...আর ভিজে থাকলেই পানু যে খেয়েছে, তার কি মানে ? তোমরা নিজেরাও তো খেতে পারো !...পানু যদি সত্যিই খেতো, তবে কি ধরা পড়বার জন্যে আঁটিগুলো রেখে দিত ? সবসুদ্ধুই তো অনায়াসে খেয়ে ফেল্তে পারতো।...

একটু দম্ নিয়ে, বাঁ হাতের উপর ডান হাতে জোরে একটা কিল মেরে আবার বল্লো,—এতেই প্রমাণ হচ্চে, পানু আচার খায়নি !...আর, যদি না-ই খাবে, তবে চুরি করতে যাবে কেন ?...কাজেই, ও চুরিও করেনি !...এই ব'লে একটা মাতব্বরি ভাব দেখিয়ে ধুপ্ করে বসে পড়লো।

মণি মরিয়া হয়ে বলে উঠলো,—আল্বৎ করেছে !...

পানু অমনি ভেংচে উঠলো,—বেশ্ করেছি !...

কাকাবাবু ধমকে তাঁদের থামিয়ে ব'ললেন,—সাক্ষীপ্রমাণ সব হ'ল। রায়, অর্থাৎ বিচারের ফলাফল জানাবো !...

সবাই চুপ...কি না জানি হয় !...

কিছুক্ষণ পরে কাকাবাবু ধীরে ধীরে স্পষ্ট গলায় রায় দিলেন,—আজকের বিচারে পানু দোষী।

পান্নুর মুখ শুকিয়ে উঠলো।

কাকাবাবু ব'লতে লাগলেন,—তার সাজা চার-ঘা বেত।...তিন-ঘা চুরি করবার জন্যে, আর এক-ঘা মিথ্যে কথা ব'লবার জন্যে।...কাল সকাল বেলা আটটার সময় এই-খানেই শাস্তি দেওয়া হবে।

নবু শেষ চেষ্টা করলো,—এইবারটি ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক্, আর এমন কাজ কক্ষণো ক'রবে না।

কাকাবাবু কিছুতেই তা শুন্‌লেন না। নবু ধরলো,—অগত্যা শাস্তিটা কিছু কমানো হোক্!...

কাকাবাবু একটু ভেবে ব'ললেন,—আচ্ছা, তিন-ঘা।...এখন সবাই যাও, আর কোনও কথা নয়!

সব তখন উঠে পড়ল; কাকাবাবুও হাতমুখ ধোয়ার জন্যে চ'ল্‌লেন।

মণির দল বাইরে এসে হৈ হৈ করে উঠ্‌লো,—ঠিক হ'য়েছে, আর চুরি করে খাবে কিছু কখনো দেখিয়ে দেখিয়ে?

পান্নু তো রেগে একেবারে টং!...

এদিকে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে, একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে, কাকাবাবুর মনে হ'ল, বিকেলের ঘটনাটা। তিনি ভাবলেন, পান্নু দোষ করেছে বটে, কিন্তু একটু হলেই অমনি নালিশ করাটাও তো ভালো নয়। পান্নু তার অপরাধের জন্যে লজ্জা পেয়েছে, ওর যা'হোক কিছু শিক্ষা তো হলো!...কিন্তু...

আচ্ছাঃ...তিনি একটা মৎলব ঠাউরে রাখলেন।

পরদিন আটটায় সবাই এলো কাকাবাবুর ঘরে। পান্নুর শাস্তিটা বেশ মজা করে দেখতে হবে।

পান্নুর সাথে নবুও এলো। হ'লে কি হয় পান্নুর উকিল, তারও ইচ্ছে পান্নুর মার খাওয়াটা একটু দেখে!

কাকাবাবু তাদের ডেকে বল্লেন,—পান্নুর শাস্তি যারা দেখতে চায়, তাদের টিকেট লাগবে। নইলে দেখতে দেওয়া হবে না।

তারা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো,—টিকিট্?...

কাকাবাবু বল্লেন হ্যাঁ টিকিট।—এক-ঘা করে বেত।

নবু বল্‌লো,—আমি উকিল, আমার টিকিট কেন?...কাকাবাবু ব'ললেন, টিকিট সকলেরই লাগবে, উকিলদেরও। তবে তোমাদের একটু সুবিধে ক'রে দিতে পারি। সবাই খাবে ডান হাতে তোমরা খাবে বাঁ হাতে। কেমন?...

অর্থাৎ, খেতেই হবে। রবি, নবু কেউ-ই আর সুবিধে নিতে আগ্রহ দেখালো না। অথচ শাস্তিটা না দেখলেও তো চলেনা!...

পানুকে ঘরের মধ্যে একখানা চেয়ারে বসিয়ে রুমাল দিয়ে তার হাতখানা একসাথে বাঁধা হ'ল। তারপর সকলকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজার কাছে কাকাবাবু বেত হাতে করে দাঁড়িয়ে বললেন—কে কে এবার ভেতরে আসবে, শীগ্‌গির এসো! দেরী হলে দরজা আট্‌কে দেবো, আর কিন্তু ঢুক্‌তে পাবেনা!

তখন এক-একজন করে গুটিসুটি এগুতে লাগলো আর চোখমুখ সঁট্‌কে হাতে এক-ঘা করে বেত খেয়ে, ঘরে ঢুকে ব'স্‌তে লাগলো।

পানুর তখন রাগে, দুঃখে যা' অবস্থা...

সব এলে কাকাবাবু দরজা এঁটে' বেত নিয়ে পানুর পাশে এসে দাঁড়ালেন। সবাই উৎসুক, কখন শাস্তি সুরু হয়!...বেত খেয়ে পানু মুখটা না-জানি কি রকমই ক'রবে!...

কাকাবাবু বেত উঁচিয়ে বলতে লাগলেন,—তোমরা আমার কথা এখন খুব মন দিয়ে শোনো!... বিচারের রায় একটু বদ্‌লে গেছে।

সবাই একেবারে নিস্তব্ধ!...পানুর শাস্তিটা বোধহয় তো আরও বেড়ে গেলো!...

কাকাবাবু ব'ললেন,—আমি আবার সব ভালো করে ভেবে দেখলাম যে, পানুর এটা প্রথম অপরাধ হিসেবে মার্জ্জনা করা যেতে পারে। তবে, মিথ্যে কথা ব'লবার জন্যে ওকে কানমলা খেতে হবে!...

এই বলে, ডান হাত বাড়িয়ে, পানুর বাঁ কানটি জোরসে দিলেন এক টান।

তারপর ব'ললেন,—কিন্তু সামান্য কারণে নালিশ করাটাও ভারী খারাপ। আবার, কারো শাস্তি দেখতে আসাটা তা'র চাইতেও খারাপ। তা'ই আজ ওর বদলে তোমাদের শাস্তিটাই হ'লো বেশী!...এখন সবাই যেতে পারো।

ব'লতে ব'লতে তিনি পানুর হাতের বাঁধন দিলেন খুলে।...

আর কি।...সবাই হতভম্ব হয়ে মুখ চূণ ক'রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

পান্নু তো আহ্লাদে আটখানা ছেড়ে ছাপ্পান্ন খানা! ফূর্ত্তির চোটে সে কানমলার কথা একদম্ ভুলেই গেলো। বাইরে গিয়ে ব'লে বেড়াতে লাগলো,—কেমন নালিশ করে বালিশ পেলে সব!—যাও, এখন হাতে তেল মালিশ করোগে!—আর টিকিট্ নিয়ে মার খাওয়া দেখতে যাবে?—

মণির দল বোকা ব'নে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রলো আর কোনও দিন কা'রও নামে নালিশও ক'রবে না, কা'রও শাস্তিও দেখতে যাবে না কখনো!..



বাবার জন্মদিনে

শ্রীপ্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বকিস্ নে মা বাবাকে মোর
আজ্‌কে তাঁর-ই জন্মদিনে,
বল্‌না মাগো খেল্‌না কী কী
আজি তাঁরে দেই গো কিনে,
মনের কথা জানাই তোরে—
কয়টী টাকা দে না মোরে,
বাবার মন কি হ'বে খুশি
লবনচুষ্ আর পুতুল বিনে ?
রঙীন ফানুস্, কলের বাঁশী,
কল্কা পেড়ে ধুতি-জোড়া,
রাঙা জামা আন্‌বো কিনে—
চকোলেট্ তবক-মোড়া ?
আন্‌বো আরো মিষ্টি খাবার,—
দেখে তাক্ লাগ্‌বে বাবার !
হ'বেন খুশি আরও দেখে
চাকাওলা কাঠের ঘোড়া।
আমার জন্মদিনে বাবা
দেন ত বাঁশী পুতুল কিনে,
আমি কেন চুপ্‌টি করে'
রইবো তাঁর-ই জন্মদিনে ?
আজ্‌কে মাগো ভোরের আলো
লাগ্‌লো আমার ভারী ভালো !
ফুল-বনে ওই হাওয়ার দোলায়
বেজে উঠ্‌লো খুশির বীণে !

বাবার জন্মদিনে

শ্রীপ্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে হয় মা ধানের শীষে,
ঘাসের বুকে শিশির-কণায়,
দীঘির জলে আলোর ঝিলিক
বাবারে আজ আশিষ্ জানায়,
গাঙের বুকে ঢেউ উঠেছে,
মেঘের তরী খুব ছুটেছে,
পাখীর গানে মনটী আমার
উঠ্‌লো ভরি' কাণায় কাণায়।
আজ্‌কে মোদের খুশির সাথে
মেতে উঠ্‌লো ধরাখানা;
বাবার জন্মদিন যে আজি
ওদের কি মা ছিল জানা?
মনের কানে শুন্‌চি যেন
বল্‌ছে ওরা—"দিনটী হেন
শতবার আসুক ফিরে
ল'য়ে আশিষ সাগরপানা।"
আজ্‌কে মাগো সবাই খুশি,—
জগৎ জুড়ে' হাসির মেলা,
তরুলতা ফুলের বনে
পাখীরাও কর্‌ছে খেলা।
এমন দিনে তুমি মাগো,
বাবাকে আজ বকো' নাকো,
চুমু দিয়ো আদর করো
বাবার আফিস যাবার বেলা।

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

জটিয়া বাবা বিজয়কৃষ্ণ

শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর

শান্তিপুরের কয়েকটি ছেলে একদিন ঠিক করলে—ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে!

কিন্তু ঘোড়া পায় কোথায়?

কাছেই ছিল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো. সহিসের অলক্ষিতে একটা ঘোড়া চুরি করা হোল। তারপর মাঠের মধ্যে চললো ঘোড় দৌড়, আর ছেলেদের হল্লা।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মশাই কেমন করে জানতে পারলেন, কে জানে। খানিক পরে তিনি মাঠে এসে উপস্থিত হলেন। হরিণের দলে বাঘ পড়লো। ছেলেদের উল্লাস এক নিমেষে স'ব ঠাণ্ডা। ঘোড়া ফেলে যে যেদিকে পারলো ছুটলো।

একজন কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তাকে ডেকে জিগেস করলেন তোমরা আমার ঘোড়া চুরি করে এনেছ কেন?

ছেলেটী নির্ভীক। সত্যি কথা গড়গড় করে বলে গেল—আজ্ঞে ঘোড়ায় চড়তে বড় ইচ্ছা করছিল, অথচ এই অঞ্চলে আর কোথাও ঘোড়া নেই, তাই আপনার ঘোড়াটীই নিয়ে এসেছিলুম।

ম্যাজিষ্ট্রেট লোক ভাল ছিলেন, ছোট ছেলের সত্যি কথা শুনে তিনি খুসী হলেন, আর কিছুই বললেন না।

এই নির্ভীক সত্যভাষী ছেলেটির নামই বিজয়কৃষ্ণ।

ছেলেবেলায় যে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস, এই সামান্য একটা ঘোড়াচুরির ব্যাপারে দেখা যায় বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণগুলি আরো উৎকর্ষতা লাভ করে।

বিজয়কৃষ্ণ তখন কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পড়তেন।

পরীক্ষা দেবার কিছু দিন আগে কর্তৃপক্ষের কি একটা অন্যায় দেখে ইনি তার প্রতিবাদ করলেন। এই প্রতিবাদে কলেজের কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হলেন, বিজয়কৃষ্ণকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—তোমায় এজন্য ক্ষমা চাইতে হবে!

বিজয়কৃষ্ণ জানালেন অন্যায়ের তিনি প্রতিবাদ করেছেন। সেজন্য তাঁর ক্ষমা চাওয়ার কথাই ওঠে না।

এজন্য শেষ পর্য্যন্ত তাকে পড়াশুনা ছাড়তে হোল, পরীক্ষা দেওয়া হোল না, তবু তিনি মিথ্যার কাছে মাথা নত করলেন না।

পরীক্ষায় পাশ না করলেও ডাক্তারী ইনি করতেন,—পয়সা নিয়ে নয়, বিনা পয়সায়।

এমন দিন গেছে ঘরে একটী পয়সার সংস্থান নেই। কোন দিন আধ পেটা খেয়ে কখন বা অনাহারে তাঁর দিন কাটে, তবু তিনি চিকিৎসার জন্য কখনও কোন দিন একটী পয়সাও নেন নি। রোগী সারলেই তাঁর আনন্দ।

শুধু তাই নয়, অনেক সময় রোগীর জন্য তিনি যা করতেন, তখনকার দিনে টাকা পেলেও কোন ডাক্তার তা করতো না।

একটী কাহিনী বলি—

সেদিন ভয়ানক জল ঝড়। লোকে বাড়ীর বাইরে যেতে পারছে না এম্‌নি দুর্য্যোগ। এমন সময় একজন এসে বললে—রোগী বোধ হয় আর বাঁচবে না, অবস্থা বড়ই খারাপ আপনাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে—

দুটো ফিয়ের ডাক্তারকে দশ টাকা দিলেও সে সময় পথে বেরুতো কি না সন্দেহ, বিনা পয়সার ডাক্তার কিন্তু তখুনি বেরিয়ে পড়লেন।

পথে বেরিয়ে শুধু জল ঝড় ভেঙে খানিকটা পথ চললেই হবে না, সেই দুর্য্যোগের মধ্যে গঙ্গা পার হয়ে যেতে হবে ওপারে কাল্‌নায়!

বিজয়কৃষ্ণ যখন গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়ালেন, তখন ভীষণ তুফাণ। কোন মাঝিই সেই ঝড় তুফাণের মধ্যে নৌকা ছাড়তে চাইলো না। বিজয়কৃষ্ণ একবার গঙ্গার উদ্দাম জল স্রোতের পানে তাকিয়ে দেখলেন—এই ঝড় তুফাণের ভয়ে ওপারে যাওয়া হবে না, রোগী মারা পড়বে? অসম্ভব! বিজয়কৃষ্ণ সেই গঙ্গার বুকে ঝাপিয়ে পড়লেন।

ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টির ঝাপ্‌টা ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের আঘাত, স্রোতের টান—কোন বাধাই সেই মনের জোরের কাছে দাঁড়াতে পারলো না। উদ্দাম বাতাস, উত্তাল তরঙ্গ সেই দুর্জ্জয় মনঃশক্তির কাছে পরাজিত হোল। বিজয়কৃষ্ণ ওপারে গিয়ে উঠলেন।

রোগী দেখলেন।

সে-রোগী শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই হাতে বাঁচলো।

এমন সর্ববত্যাগী নিঃস্বার্থপর মানুষকেও শান্তিপুরের কোন কোন লোক উৎপীড়ন করতে ছাড়ে নি। তাঁকে প্রহার করারও আয়োজন হয়েছিল ; অপমান যে তাঁকে কত সইতে হয়েছিল সে কথা না বলাই ভাল। এমন কি শেষে বিজয়কৃষ্ণকে দেশ ছাড়া হতে হয়েছিল !

এই সব উৎপীড়নের মূলে ছিল একটী মাত্র অসন্তোষ, সেটী হচ্ছে বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন সমগ্র ভারত তোলপাড় করে তুলেছেন। তাঁর মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা যিনি শুনেছেন তিনি মুগ্ধ হয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করেছেন। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম হলেন। তাঁর পক্ষে ব্রাহ্ম হওয়া বড় সহজ কথা নয়, শান্তিপুরের গোঁসাই বংশের ছেলে,...সাত শো ঘর যজমান।

কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন অন্য ধরণের লোক, অর্থ ও আধিপত্য তাঁর মনকে সত্য থেকে টলাতে পারে নি।

একবার বক্তৃতা করতে করতে তিনি বললেন—আমি জাতিভেদ মানি না, পরমেশ্বরের চরণে সবাই সমান !...

কৌতূহলী একটী ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনছিল, বাধা দিয়ে বললে—জাতিভেদ মানেন না, তো গলায় পৈতে রেখেছেন কেন ?

গোস্বামী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পৈতা খুলে ফেলে দিলেন।

শেষকালে, সাত শো ঘর যজমান যাঁর, তিনি সব ছেড়ে কলকাতার পথে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। নিঃস্ব, সম্বলহীন ; পকেটে একটী পয়সা নেই, কলের জল খেয়ে দিন কেটে গেছে তবু যা সত্য বলে তিনি গ্রহন করেছেন তা ছাড়েন নি। এমনই ছিল তাঁর দৃঢ়তা।

একবার কি একটা কারণে মনের দুঃখে আত্মহত্যা করবেন বলে ঠিক করলেন। তখন তিনি লাহোরে। মাঝ রাতে কাপড়ে একটা ভারী পাথর বেঁধে রাচী নদীর জলে ডুবে মরার জন্য তৈরী হয়েছেন। এক জঙ্গলের ধারে নির্জ্জন নদীতটে তিনি জলে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছেন, এমন সময় অত রাতেও কোথা থেকে এক সাধু এসে তাঁকে নিরস্ত করলেন, বললেন—ডুবে মরবে কেন, তোমার জীবনে যে এখনও অনেক কাজ বাকী !

শেষ পর্য্যন্ত বিজয়কৃষ্ণের ডুবে মরা হোল না।

এর পরে সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে বিজয়কৃষ্ণের পরিবর্ত্তণ। যিনি নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। যাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা দেখে ব্রাহ্মরা 'আচার্য্যের' সম্মানে ভূষিত করেন, সেই লোক রাধাকৃষ্ণের ভজনা সুরু করে দিলেন।

গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে এক নানক-পন্থী সাধু তাঁকে দীক্ষা দেন; তারই ফলে আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণের এই পরিবর্ত্তন।

ব্রাহ্মরা এই ব্যাপারে প্রথমে বিজকৃষ্ণের মন ফেরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি যা গ্রহণ করেন—সত্য বলে যা মনে করেন তা থেকে তাঁর মন ফেরাণো বড় শক্ত। শেষে তাঁরা তার এই দেব-দেবী ভক্তি দেখে বিরক্ত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে আসতে হোল।

কিন্তু সাধনা করে বিজয়কৃষ্ণ বিশেষ শক্তি লাভ করেছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে যাঁরা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই তার ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করেন। অনেক জ্ঞানী ও গুণী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন।

একবার তাঁর কোন এক শিষ্যকে বিছা কামড়ায়। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি বিজয়কৃষ্ণের কাছে আসেন। তার যে আঙুলে বিছা কামড়েছিল, সেই আঙুলটা বিজয়কৃষ্ণ একবার স্পর্শ করেছিলেন মাত্র, তৎক্ষণাৎ সব যাতনার উপশম হয়ে গেল।

এই ধরণের অসংখ্য ছোট-খাটো অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে।

তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান ভেদ ছিল না। মুসলমান ফকিরদের সঙ্গে আহার উপাসনা করতে কোন দিন তাঁর অন্তরে এতটুকু দুর্ব্বলতা দেখা দেয় নি।

গোস্বামী মহাশয়ের এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি এক মহাপুরুষের পরম প্রিয় হয়েছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংশ দেব।

শেষ জীবনে বিজয়কৃষ্ণ কিছু দিন পুরীতে ছিলেন। আচার্য্য বিজকৃষ্ণকে সেখানে কেউ চিনতো না, জটাজুটধারী গৈরিক বসন সন্ন্যাসীকে সেখানকার অধিবাসীরা নাম দিয়েছিল জটিয়া বাবা। পুরীর দরিদ্র ও নিঃস্বদের অন্ন সংস্থানের কেন্দ্র ছিল এই জটিয়া বাবার আশ্রম। যখনই যত টাকার প্রয়োজন হয়েছে অযাচিত ভাবে তাই এসে পৌচেছে জটিয়া বাবার শিষ্যদের কাছ থেকে। কোন দিন আশ্রম চালাবার অর্থের অভাব হয় নি।

মাত্র আটান্ন বছর বয়সে পুরীতে জটিয়া বাবা দেহ রক্ষা করেন। সেখানে নগেন্দ্র সরোবরের তীরে জটিয়া বাবার সমাধি নামে তাঁর এক স্মৃতি-সৌধ আছে। তোমরা যখন পুরী যাবে সেই সমাধি মন্দিরটি দেখে এসো।



গভীর জলের কাহিনী

অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল

গভীর জলের নীচে থাকত অতিকায় রাঘব বোয়াল। মাছের রাজা সে। দৈত্যের মত বিরাট দেহ নিয়ে সে জলের মধ্যে নিজের চালে ঘুরে বেড়াত। ভারী সুন্দর দেখতে ছিল কিন্তু সে,—বড় বড় চক্‌চকে চোখ আর ভেলভেটের মত নরম গা। জেলেরা কোন দিন তাকে ধরবার চেষ্টা করে নি; কাজেই তার সাহসের আর সীমা ছিল না। প্রায়ই দেখা যেত, সে হ্রদের স্বচ্ছ জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে, আর তার সুদৃঢ় পাখ্‌না ও ল্যাজের ঝাপটায় জলের মধ্যে আবর্ত্তের সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্য্যের আলো জলের নীচে পৌঁছলে তার ঈষৎ চঞ্চল ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যেত। তার দুধের মত সাদা পেট আর গাঢ় সবুজ পিঠ দেখে জেলেদের ধারণা হয়েছিল, সে শাপভ্রষ্ট দেবতা!

কিন্তু বড় লোভী ছিল সে। খাবার সামনে পেলেই সে তার ভীষণ হাঁ নিয়ে তেড়ে যেত। ছোট ছোট মাছেদের ঝাঁক সে এক নিমিষে পেটে পুরে দিত। কত দিন ধরে সে সেই জলের মধ্যে অবাধে রাজত্ব করছে, তা কেউ ঠিক বলতে পারত না। রুই, কাতলা প্রভৃতি বড় বড় মাছেরাই তাকে যমের মত ভয় করত! শুধু তাই নয়,—মাছ-খেকো পাখীরা তার ভয়ে সে হ্রদের দিকেই ঘেঁসত না। জেলেদের মুখে শোনা গেছে যে হাঁস, বক, মাছরাঙা প্রভৃতি তার নাকি নিত্য আহার্য্য ছিল!

সে হ্রদে ছিল রাঘব বোয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষুসে শোল মাছ। ভীষণ হিংসুটে ছিল সে। বোয়ালের সঙ্গে জোরে না পেরে সে সব সময় তার অনিষ্ট করবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াত। হয়ত বোয়ালটা এক ঝাঁক মাছ দেখে আসচে তেড়ে, হঠাৎ কোথা থেকে শোল এসে দিলে

তাদের তাড়িয়ে। বোয়াল তার শত্রুকে তেড়ে গেল বটে, কিন্তু সে যে কোথায় লুকাল, তার আর পাত্তা পাওয়া গেল না।

মাছের রাজ্যে দিন এইভাবে কাটছিল।

সেদিন দুপুরে গোটা একটা হাঁস খেয়ে বোয়াল আয়েসে নিশ্চলভাবে জলের মধ্যে পড়ে আছে। আর একদিকে শ্যাওলার মধ্যে শুয়ে শোল মাছ ফন্দি আঁটচে কি করে বোয়ালটা তাড়িয়ে সে নিজে গভীর জলের রাজা হবে।—বয়স বেশী হওয়াতে সে একটু মোটা ও কুঁজো হয়ে গেলেও তার বুদ্ধিশুদ্ধি একটুও কমে নি। জীবনে তার অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। কতবার যে সে মরতে মরতে বেঁচে গেছে তার আর ঠিক নেই।—হঠাৎ সে কি ভেবে তার শ্যাওলার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল। এক ঝাঁক চক্‌চকে পুঁটি মাছ তাকে দেখে প্রাণভয়ে একদিকে ছুটে পালাল। শোল মাছ এসব গ্রাহ্য করল না। সে তখন বোয়ালকে কি ভাবে জব্দ করবে বোধ হয় তাই ভাবছিল।

ঘুরতে ঘুরতে শোল মাছ কখন বোয়ালের মাথার উপর এসে পড়েছে। বোয়াল ভাবল শত্রুনিপাতের এই সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সে হঠাৎ আক্রমণ করে বসল না, কারণ তার জানা ছিল, শোল একটু বেশী রকম সাবধান। কাজেই সে ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন শোল একটু অন্যমনস্ক হবে।—সে তখনি বিদ্যুৎ বেগে শোলের উপর গিয়ে পড়বে। শোলের এক পাশ দাঁত দিয়ে কেটে দিলেই,—বাস্, সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর সে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

এইরকম মতলব ভেঁজে বোয়াল চুপটি করে জলের মধ্যে পড়ে থাকল। সেই সময় কিছু দূরে ঝকঝকে এক ঝাঁক মাছের উপর তার নজর পড়ল। পেটুক বোয়াল শোলের কথা ভুলে গিয়ে একটা মুখরোচক আহারের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। তার পিঠের পাখনা আস্তে আস্তে খাড়া হয়ে উঠল ; আর তার সমস্ত শরীরটা শক্ত করে গুটিয়ে গেল। কিন্তু এর মধ্যে হতভাগা শোলটা কোথা থেকে এসে নিমেষে মাছগুলো তাড়িয়ে দিয়ে তীর বেগে কোথায় আবার উধাও হয়ে গেল। লজ্জায় বোয়ালের পাখ্‌না একেবারে পিঠের সঙ্গে মিশে গেল আর সবুজ পিঠটা ভেতরের ফুলে ওঠা রক্তে তার লালচে হ'য়ে উঠল।

বোয়ালকে জব্দ করেছে, শোল খুসী মনে নিঃশব্দে জল কেটে হ্রদের একধারে সাঁতরে এসে অসাড় হয়ে পড়ে থাকল।—তার চেহারাটা বোকার মত হলেও চালাকীতে তার মত প্রাণী মাছের রাজ্যে আর একটিও ছিল না।—হঠাৎ হ্রদের সোনালি জল কাঁপতে লাগল। মনে হল আকাশের সূর্য্য যেন শতধা বিভক্ত হয়ে হ্রদের জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শোলের ভারী

কৌতূহল হল। সে এই রহস্যভেদের জন্য খুব সন্তর্পণে সাঁতরে এগিয়ে দেখতে পেল, জলের মধ্যে একটা সুন্দর ছোট নীল রং এর মাছ আস্তে আস্তে চলাফেরা করচে। তার ভয়ানক সন্দেহ হল। মাছটা চক্রাকারে সাঁতার কাটছিল, আর সেই জায়গাটুকুর মধ্যে দুটো ছায়া-মূর্ত্তি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল।

শোল মাছ আরও কাছে সরে গেল। মাছটা তাকে দেখে ভয়ানক জোরে ঘুরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়াদুটিও কাঁপতে লাগল। মাছটার খুব কাছে গিয়ে শোল কি যেন দেখেই তাড়াতাড়ি ডুব মারল। ব্যাপারটা বুঝতে তাকে একটুও ভাবতে হয় নি। কারণ মাছটার গায়ে লাগান বঁড়শীর কারসাজিটা তার ভাল রকম জানা। শোলের মনে পড়ল অনেকদিন আগে সে যখন ছোট্টটি ছিল, তখন সে একবার বঁড়শীতে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে ছোট ছিল বলে তাকে বুঝি আবার জলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

শোল আবার রাঘব বোয়ালের আড্ডার দিকে জল কেটে চলল। ঘন সবুজ শ্যাওলার মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে যেতে যেতে সে দেখতে পেল বোয়ালটা একদিকে চুপ করে পড়ে আছে। তাই দেখে সে বোয়ালের উপরে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল,—ভাবটা এই, যেন সে তার শত্রুকে দেখতেই পাইনি। বোয়াল কিন্তু তাকে লক্ষ্য করেছিল। তার পাখ্না আবার আস্তে আস্তে সোজা হয়ে উঠল; তার ল্যাজের মৃদু ঝাপটে আশেপাশের শ্যাওলাগুলো যেন আসন্ন হত্যার আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল। আর তার সাদা চোখ দুটো রাগে জ্বলতে লাগল। কিন্তু শোলের বুদ্ধির চালটা সে তখন যদি বুঝতো শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত করে শোলকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হতে না হতেই শোলটা বিদ্যুতের ঝলকানির মত কোথায় মিলিয়ে গেল।

বোয়াল ত অপ্রস্তুতের একশেষ! খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে সে তার ল্যাজ ঘুরিয়ে দ্রুতবেগে তার খোঁজে জল কেটে চলল। খানিকটা যেতেই কোথা থেকে শোলটা আবার বেরিয়ে তার গা ঘেঁসে হাউই এর মত উপরে উঠে গেল। রাঘব বোয়াল ত অবাক! খুব তো তাকে বোকা বানাচ্ছে। শোল যে তাকে তার নিজের আড্ডায় আক্রমণ করতে সাহস করবে সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। সে মহারাগে জল তোলপাড় করে শোলকে ভীষণ বেগে তাড়া করে গেল।

মাছেদের মধ্যে খবর পৌঁছল, রাঘব বোয়াল ক্ষেপে গেছে। তার সাড়া পেয়ে তারা দলছাড়া হয়ে চারদিকে ছিটিয়ে পড়ল। আর এদিকে ফন্দীবাজ শোলটা বঁড়শী লাগান নীল মাছটার দিকে বেগে সাঁতার কেটে চলল। ক্রোধান্ধ বোয়াল শোলের প্রায় কাছাকাছি

এসে পড়েছিল। দুই অতিকায় রাক্ষসকে তার দিকে ছুটতে দেখে নীল মাছটা ভয়ে পাগলের মত ভয়ানক জোরে ঘুরতে লাগল। শোল ছুটল তার পিছনে। কিছুক্ষণের জন্য জলের মধ্যে যেন তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। হঠাৎ শোল নীল মাছটার সামনে গিয়ে কায়দা করে এক ডুব মেরে একেবারে জলের অনেক নীচে চলে গেল। – সে ভয়ানক হাঁপিয়ে গিয়েছিল। দ্রুত নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় কাণকোর ভিতর দিয়ে তার লাল ঝিল্লী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

বোয়াল আবার বোকা বনে গেল। শত্রু হাতের মুঠো থেকে ফস্কে গেল দেখে রাগে তার সারা শরীর ভীষণ কাঁপতে লাগল। আর তার সমস্ত রাগ পড়ল ওই নিরীহ নীল মাছটার উপর। সে তার বিরাট হাঁ-এর মধ্যে মাছটাকে পুরে অতল জলের মধ্যে নেমে গেল।



রাঘব বোয়াল ক্ষেপে গেছে……

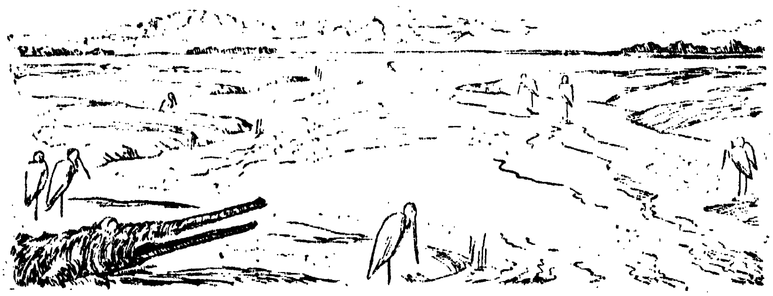
এতক্ষণে সেই রহস্যময় ছায়ামূর্ত্তিদুটি যেন বাস্তবে পরিণত হল। –এদিকে বোয়াল হাঁ বন্ধ করেই হঠাৎ থেমে গেল। একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার মুখের ভিতরটা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল। হ্রদের উপরটা হুইল্ থেকে সুতো ছাড়ার শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নীচে বোয়ালটা জল তোলপাড় করে অস্থির হয়ে কেতরে ঘুরতে লাগল; কিন্তু বঁড়শীটা তার মুখের ভিতরকার মাংসে আরও শক্ত করে গেঁথে গেল।

এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে সাহস ও বীরত্ব দেখাতে কসুর করল না। মরবার আগে সে জানিয়ে যাবে সে কাপুরুষ নয়। জলের মধ্যে সে অসম্ভব রকম দ্রুতগতিতে চলতে লাগল।

একবার একটু ভেসে ওঠাতে সুতোর টান আর বোধ হল না। তার মনে হল সে মুক্তি পেয়েছে। উৎসাহের সঙ্গে নীচের দিকে ডুব দিতেই সেটা যন্ত্রণা আবার অসহ্য হয়ে উঠল। তার চারদিকে জল রক্তে লাল হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না তার নিজের রক্তেই জল এরকম হয়েছে।

আস্তে আস্তে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। যখন তাকে টেনে উপরে তোলা হচ্ছিল সে একবার শেষ ব্যর্থ চেষ্টা করল পালিয়ে যাওয়ার। তারপরেই দেখা গেল তার অতিকায় শরীরের শাদা ফ্যাকাশে দিকটা জলের উপর আস্তে ভেসে উঠেছে। তাকে তীরে তুলেই একটা প্রকাণ্ড বর্ষা দিয়ে বিঁধে ফেলা হল। রাঘব বোয়াল নিজের রাজ্য ছেড়ে বিদেশী রাজ্যে বিদেশী আবহাওয়ায় মরে পড়ে থাকল।

সূর্য্য তখন আকাশের ঠিক মাঝখানে। চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। হ্রদের জলে শেষ চিহ্নটুকু মুছে গেছে। শুধু রাক্ষুসে শোল গভীর শ্যাওলার মধ্যে নিঃশব্দে শুয়ে তখন বিজয় গৌরব অনুভব করছিল।



পথে বিপথে

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

সপ্তদশ অধ্যায়

আশা নাই

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইয়া আসিল! অন্ধকার যেন চারিদিক একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিল। আকাশে মেঘ করিয়াছিল। দুই চারি ফোঁটা বৃষ্টিও মাঝে মাঝে পড়িতেছিল।—মিঃ চ্যাটার্জ্জি অরণ্যের সেই গভীর বিজনতার মধ্যে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। হনুমান চোবে—বুদ্ধিমান মানুষ সে কোচ বাক্সের উপরটাতেই মাথাটা এলাইয়া বেশ ঘুমের আয়োজন করিতেছিল।—কিন্তু সে মুখস্যে সাহেবকে ভয়ানক ভাবে ভয় পাইত, নতুবা সে এতক্ষণে গাড়ীর ভিতরে আসিয়া আশ্রয় লইতেও ইতস্ততঃ করিত না।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি ক্রমে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, দিয়াশালাই জ্বালাইয়া ঘড়ি দেখিলেন—রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে। তাঁহার মনে নানা দুশ্চিন্তা আসিল!—তাই একবার হনুমান চোবেকে কাছে ডাকিলেন। সে 'জী' বলিয়া কোচ বাক্স হইতে লাফাইয়া তাঁহার কাছে আসিল।

চ্যাটার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের সাহেব যে—

চ্যাটার্জ্জির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া হনুমান কহিল—সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন? কিছু ভয় করবেন না হুজুর! হঠাৎ হনুমান তাহাকে ঈশারা করিয়া চুপ করিতে বলিল।

মিঃ চ্যাটার্জ্জির ভয়ানক ভয় হইল, তবে আবার কি কোন নূতন বিপদ ঘটিবে না কি? সেই নিশীথ রাত্রে মশার গুঞ্জরণ সমান ভাবে চলিতেছিল, তাহারা দংশন করিতেও কোনরূপ কার্পণ্য করে নাই। তারপর দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় তাহার মনকে ভীষণ ভাবে পীড়ন করিতেছিল।

তাহাদের গাড়ীটা পথের পাশে, ঝোপের আড়ে কয়েকটা বড় বড় গাছের আড়ালে লুকানো ছিল;—আর তাহার অল্প একটু দূরেই ছিল বিরাট বট গাছটি। হনুমান চোবে এবং মিঃ চ্যাটার্জ্জি

শুনিতে পাইলেন—কতকটা দূরে যেন কয়েকজন লোক বড় গোল করিতেছে! ক্রমশঃ লোকগুলি কাছে আসিয়া পড়িল।—যখন ঝোপের অপর দিকে পথের কাছে আসিয়া তাহারা পৌছিল, তখন তাহাদের কথা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। মনে হইল যে ঐ দলে দশ জনের কম লোক হইবে না।

একজন কহিল,—আমি ঠিক্ বলছি যে পেছনে লোক লেগেছে।

আর একজন ভয়ানক ভাবে হা-হা করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল—লোক লাগবে কেন? তুই ভয় পেয়েছিস নাকি।

তা কেন ভয় পাব। তবে—

তবে বোসেদের বাড়ীর ছেলেটাকে এনেছিস্ ত?

সে আর বল্‌তে?

কোথায় রেখেছিস?—

সাধুবাবার জিম্মেয়!—উঃ ছেলেটা বড় কাঁদছিল রে!

আর লোকটি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

কাঁদবে না রে? কেবল শিশু।

অপর কহিল—চল, মন্দিরে যাই। কাল সকালেই কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে।

গাড়োয়াণটাকে কি করলি?

যেমন বরাবর করি। তেমনি!—বাছাধন মাটিতে পড়ে কাৎরাচ্ছেন।

লোকগুলি চলিয়া গেল।

খানিক পরে হনুমান চোবে কহিল—সাহেব! এ দলটা ছেলে মেয়েদের চুরি করে বেড়ায়, তাই সহরে এত ছেলে চুরি হচ্ছে।

কি করে বুঝলে?

আমি যে পথের পাশের ঝোঁপটাতে গিয়ে লুকিয়েছিলাম।

বটে!

কেন চুরি করে! জানো!

জানি সাহেব!—ওরা কোন ছেলেকে মেরে ফেলে; কোন ছেলেকে বিক্রী করে, এমন সব কত কি করে! মস্ত বড় এদের দল। যারা ভারতবর্ষই জুড়ে আছে। কত ঘরে ঘরে যে ছেলে হারিয়ে বাপ মায়েরা কাঁদছেন তার সীমা সংখ্যা নেই।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এমন সময় 'জয় শিবশঙ্কর! হর হর বোম্ বোম্' শব্দে একজন সন্ন্যাসী অতি দ্রুত বেগে দুইজন চেলা লইয়া আসিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিল। গাড়ী ভীষণ বেগে—নিস্তব্ধ বন পথ মুখরিত করিয়া বালিগঞ্জের দিকে ছুটিয়া চলিল—গাড়ীতে সন্ন্যাসী সুধু একবার মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে বলিলেন—আশা নাই।

পথে বিপথে

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রশান্ত যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। যে দিন রাত আমোদ ছাড়া কিছুই জানিত না, যে প্রশান্ত ছিল সকলের প্রিয়, সেই প্রশান্তের মুখ হইতে হাসি লোপ পাইয়াছিল, সে আর হাসিত না, তেমন করিয়া কাহারও সহিত মিশিত না বা কথা বলিত না।

এক দিন সকাল বেলা প্রশান্ত মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা! বাবা! প্রশান্তের এইরূপ চীৎকারে তাহার বাবা পাশের ঘর হইতে অতি দ্রুত বাহির হইয়া আসিলেন এবং প্রশান্তের কক্ষে আসিয়া কহিলেন—কি বাবা। তুমি আমায় ডাকছিলে? প্রশান্ত কহিল,—হাঁ বাবা! এই দেখ, এই চিঠিখানা, পড়ে দেখ, এই মাত্র ডাক হরকরা দিয়ে গেল। একি অশান্তের চিঠির নয়?

প্রশান্তের বাবা অতি সন্তর্পণের সহিত জামার ভিতর হইতে চশমা বাহির করিয়া পড়িলেন, —অশান্তের লেখা চিঠিই বটে। অশান্ত লিখিয়াছে:—

ভাই প্রশান্ত,

আমি তোমাকে ভুলি নাই। তবে কি করিব, আমার ত কোন ক্ষমতা ছিল না। জ্ঞান হইলে পর বুঝিলাম—আমি একদল দস্যুর হাতে পড়িয়াছি। স্থানটি কোন্ জেলার কোথায় বলিতে পারি না। তবে যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি, দেশটা সাঁওতালদের, তাই ভূগোলের সামান্য জ্ঞান হইতে মনে হয় সে ছোটনাগপুরের বোধ হয় কোন জেলা হইবে।—আমি পলাইয়া এক সাঁওতালদের গ্রামে আসিয়াছি। এক বুড়ো সাঁওতালের বাড়ী আশ্রয় পাইয়াছি।—চিনু মিনু জীবিত আছে। তাহাদিগকে সেই সন্ন্যাসী দুইজন লোকের কাছে অনেক টাকায় বিক্রয় করিয়াছে।—কিন্তু কোন্ দেশ তা আমি বলিতে পারিব না।—বোধ হয় পশ্চিমের কোন স্থানে হইবে। আমি সাঁওতালদের সাহায্যে এই চিঠি পাঠাইলাম। জানি না তোমাদের হাতে পৌঁছিবে কি না। আমি বড় দুঃখী, তাই যেখানে যাই সেখানেই বিপদ ঘটে। তোমার দয়ায় এক দয়ালু পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। আবার সেই আশ্রয়চ্যুত হইলাম।—আমি পণ করিয়াছি যেরূপেই পারি চিনু মিনুকে উদ্ধার করিব। সে পথেই হউক বা বিপথেই হউক।—বালিগঞ্জেও পত্র দিলাম।

তোমার বন্ধু

অশান্ত।

প্রশান্তের বাবা বেয়ারাকে গাড়ী যুতিতে বলিলেন। তারপর দুইজনে বালিগঞ্জে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া শুনিলেন—সুনন্দা দেবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শরীর দিন দিনই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—খাওয়া দাওয়া একরূপ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাহারও সহিত কোন কথা বলেন না।

—বেয়ারা উপরে সংবাদ দিতেই মিঃ চ্যাটার্জি নীচে নামিয়া আসিলেন। প্রশান্তের বাবা তাঁহার হাতে অশান্তের চিঠিখানা দিলেন। তিনি চিঠিখানা পড়িয়া বলিলেন—আপনারা একটু বসুন, আমার একজন বন্ধু এখানে আছেন, তাঁকেও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেবো।

একটু পরেই মিঃ চ্যাটার্জি ও তাঁহার বন্ধু মুখুয্যে মহাশয় নীচে নামিয়া আসিলেন। সকলে এক সঙ্গে ড্রইং রুমে যাইয়া বসিলেন। প্রশান্তের কাছে অশান্ত যে চিঠিখানা লিখিয়াছে, সেখানি মুখার্জ্জি

সাহেব বেশ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। ঠিক অমনি সময়ে বেয়ারা একখানা ট্রেতে করিয়া—দুই তিনখানি খবরের কাগজ ও অনেকগুলি চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল।—একখান চিঠি ছিল—সুনন্দা দেবীর নামে।—মিঃ চ্যাটার্জ্জি তাঁহার চিঠিখানি বেয়ারার হাতে দিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেন। কে লিখিয়াছে, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার কোনও সংবাদ লইলেন না।

—মিঃ মুখার্জ্জি চিঠিখানি পড়িয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। উৎসাহের সহিত প্রশান্তের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—মুষড়ে গিয়েছ কেন বাবাজী, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার সাহায্যেই আবার বিপদ কেটে যাবে।

—এমন সময়ে সেখানে একেবারে পাগলিণীর মতে আলুথালু বেশে সুনন্দা দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার হাতেও একখানা চিঠি। তিনি ধপ্‌ করিয়া একখানা কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—এই দেখুন আপনারা, আমার চিনু ও মিনু বেঁচে আছে এইবার তাদের এনে দিন।

অশান্তের চিঠিখানা এবং প্রশান্তের চিঠিখানা মিলাইয়া দেখিলেন—একই তারিখে, একই সময়ে চিঠি দু'খানি ডাকে দেওয়া হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক ক্লেশে অস্পষ্ট ডাকের মোহরটি পড়িয়া যে স্থান হইতে চিঠিটি ডাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম উদ্ধার করিলেন।—স্থানটির নাম,—বুর্গি।

মুখোপাধ্যায় মহশয় হাসিয়া বলিলেন—মিসেস চ্যাটার্জ্জি, জানেন ত—মেঘ কেটে গেলেই পূর্ণিমা রাত্রে চাঁদের আলো ঝলকে পড়ে, এ ত জান্‌চেন, মেঘ কেটে গেছে।—আমি সত্যি করে বল্‌ছি এই ছেলে চুরি ব্যাপারটা আজ তিন চার বছর থেকে ভীষণ ভাবে চল্‌ছে, কিন্তু দুঃখের কথা এই যে আমরা আজ পর্য্যন্তও এর কোন একটা মীমাংসা করে উঠতে পারি নি।—কাল অনেক চেষ্টা করে যা জান্‌তে পেরেছিলুম—আজ এই চিঠি দু'খানিতে তা পরিষ্কার হয়ে গেল।—ঠগীদের অত্যাচারের চেয়ে এই সন্ন্যাসী দলের অত্যাচার বড় কম নয়।—এদের কাজ হচ্চে, ছেলে চুরি করে বিক্রয় করা, যদি তা না হয় তবে—সে অনুমান করে নেবেন।—আমি আপনাদের এমন কথা বল্‌তে পারি না যে দুচার দিনের মধ্যেই আপনাদের ছেলে মেয়ের উদ্ধার করতে পারবো, তবে এইটুকু জানবেন যে আমার বিশ্বাস আছে হয়ত বা আবার আমি তাদের আপনার কোলে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবো।

আমাকে নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে!

মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—বেশ ত যাবেন, তবে আজ নয়।—আপনি আর কান্না-কাটি করবেন না। জানেন ত মায়ের কান্নায় সন্তানের অকল্যাণ হয়।

সুনন্দা দেবী চুপ করিয়া রহিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন—যে ছেলেটি আপনাদের সংবাদ জানিয়েছে, সে বড় সহজ নয়। অমন দস্যুসন্ন্যাসীদের হাত থেকে যে পালাতে পেরে বেঁচে গেছে—ঠিক জানবেন সে অনেক কিছু কাজ করতে পারবে।

পথে বিপথে

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

মুখোপাধ্যায় মহাশয়—মিঃ চ্যাটার্জ্জির ওখানে আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—এক সপ্তাহের মধ্যে আর তুমি আমার ওখানে যেও না, আর খোঁজ করো না। তুমি জেন এই দলটি বড় সহজ নয়। সারা ভারতবর্ষে এরা ছড়িয়ে পড়ে আছে। এই দলে ভারতবর্ষের সব দেশের লোকই আছে। আমাদের মত তাদেরও লোক আছে, যারা নানা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়।—মিসেস চ্যাটার্জ্জি—একটা কথা, ভিখারী দেখলেই দয়া দেখাবেন না, তাড়াতে বলি না, তবে বেশী দয়াও দেখাবেন না—সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই হাত দেখাতে ব্যস্ত হবেন না, যেমন সব মেয়েদেরই এই দুর্ব্বলতাটা থাকে।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি মাথা নাড়িলেন।—অনেকদিন পরে এই পরিবারের লোকের মুখে যেন হাসির ঈষৎ বিদ্যুৎরেখা দেখা দিল।



ছুটির ঘণ্টা

ক্রীকেট--

গত বছরের শেষ দিনে কোলকাতায় ভারতীয় দলের সঙ্গে লর্ড টেনিসনের দলের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ্ সুরু হয়। এর আগে বোম্বাই ও লাহোরে এই দলেরই সঙ্গে যে দুটি টেষ্ট ম্যাচ্ হয়েছিল তাতে ভারতীয় দল হেরে যায় এবং সে পরাজয়কে যথেষ্ট শোচনীয় পরাজয়ই বলা যেতে পারে। (বোম্বাইতে ৬ উইকেটে এবং লাহোরে ৯ উইকেটে ভারতীয় দল পরাজিত হয়)। খেলার আগে কেউই নিঃসন্দেহে বলতে পারেনি এর ফলাফল কি হবে; কারণ ভারতীয় দল যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও ইডেন গার্ডেনে প্রতিবারেই সবাইকে নিরাশ করেছে এবং এইবারের খেলায় হয়ত সেই পুরণো ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হবে। এই ধরণের একটা ভয় সবাই করেছিল তার ওপর আগেকার দু'টো খেলাতেই ওই ফল।

সেদিন সমস্ত সকালটা কেটে ছিল বেশ উত্তেজনার মধ্যেই;—শুধু সে দিনই বা কেন, খেলার শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দর্শককেই কি হয় কি হয়, ভাব অতিরিক্ত চঞ্চল করে ছিল। যাক্, শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দল আমাদের নিরাশ তো করেই নি, পরন্তু এই কোলকাতার মাঠেই ভারতবর্ষের প্রথম বিজয়ে সবাইকে—এবং বিশেষ করে বাঙালীকে গৌরবান্বিত করেছে! খেলা আরম্ভ হবার মিনিট দশেক আগে ইডেন্ গার্ডেনে গিয়ে হাজির হলুম। ভাগ্যিস্ টিকেট কাটা ছিল! নইলে্ হয়তো সে সময়ে টিকেটই পেতুম না; কিংবা বহু কষ্টে টিকেট পেলেও ভালো জায়গায় বসে আরাম করে খেলাটা দেখার সৌভাগ্য হত না। এই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই ক্রিকেট খেলাটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, বোধ হয়! আকাশ ঢাকা গ্যালারীর এক কোনে চুপ্ করে বসে থাকা; সাম্‌নে সুন্দর সবুজ মাঠ, কোথাও তিলার্দ্ধ জায়গা নেই; প্রতিটি বল্ ভালো করে লক্ষ করা, ব্যাট চালানোর প্রতিটি কায়দা উপভোগ করা; —ওঃ, ভাবলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তে হয়!

ভারতীয় দলের কাপ্‌টেন মার্চেণ্ট টসে জিতে মুস্তাক আলি ও হিণ্ডলেকারকে ব্যাট্‌ করতে পাঠালেন। প্যাভিলিয়নের ভেতর থেকে তারা বেরুতেই বিপুল জনতা হর্ষধ্বনি করে তাদের সম্বর্দ্ধিত করল। তার পর এলো টেনিসন দলের এগারো জন খেলোয়াড়। আগন্তুক দলের গোভার ও ওয়েলার্ড বোলিং স্থরু করল। মুস্তাককে খুব সাবধানে দেখা গেল খেলতে; প্রথম প্রথম তার ব্যাট চল্‌তে লাগ্‌ল খুব সংযত ভাবে। রাণ সংখ্যা ধীরে ধীরে চল্‌ল বেড়ে। স্কোর বোর্ডে সবে তখন ২৪রাণ উঠেছে এমন সময় গোভারের বলে হিণ্ডলেকার একটা সহজ ক্যাচ্‌ তুল্‌ল, আকাশের বলটাকে এড্‌রিচ্‌ লুফে নিতে একটুও ভুল কর্‌ল না; আমরা তো বেশ দমে গেলুম; বেচারী হিণ্ডলেকার মাত্র তখন ১০রান্‌ করেছে।

এর পর প্যাভিলিয়ান থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো সতেরো বছরের বাচ্চা খেলোয়াড় মাঁকড় (Mankad; এই উচ্চারণ এক ভদ্রলোকের কাছে শুন্‌লুম)। অদ্ভুত সুন্দর এ বছরে এ খেল্‌ছে এবং এর খেলা দেখার জন্যে প্রত্যেকেরই অদম্য কৌতূহল ছিল। খুব হাততালি পড়ল চারিদিক থেকে। সত্যিই এ ভারী সুন্দর খেলে। মুস্তাক আলি খুব ভেবে চিন্তে এ সময় খেল্‌ছিল কিন্তু মাঁকড় খেল্‌তে লাগ্‌ল খুব সহজ ভাবে। বিদ্যুতের মত চলে এর ব্যাট; লাল বলটা সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে কতবার পেরিয়ে গেল বাউণ্ডারি লাইন! স্কোর বোর্ডে তড়তড় করে রান সংখ্যা বেড়ে চল্‌ল। এবং মুস্তাকের চেয়ে অনেক পরে এসে মুস্তাকের চেয়ে আগেই মাঁকড়ই প্রথম পঞ্চাশের ওপর রাণ করে ফেল্‌ল—আগন্তুকদের বিরুদ্ধে এই ওর পঞ্চমবার ৫০এর ওপর রাণ করা। কিন্তু যখন তার ৫৫রাণ তখন গোভারের এক্‌টা বাম্প্‌ বল মারতে গিয়ে ওয়েলার্ডের হাতে ও খুব সহজ ভাবেই আউট হয়ে গেল। (১৩৩।২।৫৫)।

এর পর এলো অমরনাথ। কোল্‌কাতায় অমরনাথ খুব কমই ভালো খেলেছে; এবারেও সে আমাদের নিরাশ করবে কিনা কে জানে! যাই হোক, অমরনাথ তো খেলা সুরু কর্‌ল; প্রথম থেকেই ও পিটিয়ে খেল্‌তে লাগ্‌ল। যখন ওর সবে ২০ রান্‌ তখন ওয়েলার্ডের বলে এক্‌টা খুব শক্ত ক্যাচ্‌ কর্‌তে ল্যাঙ্‌রিজ পারল না; তবে সেটাকে "লাইফ্‌" দেওয়া বোধ হয় বলা যায় না। এদিকে মুস্তাকও খুবই সাবধানে চল্‌ল তা'র রান্‌ সংখ্যা বাড়িয়ে। ১৯৬ মিনিটে মাত্র ২ উইকেটে ভারতীয় দল ২০০ কর্‌ল। মুস্তাকের যখন ৯৯ রান্‌, টেনিসান্‌ তখন নতুন বল নিলেন এবং তাঁ'র দলের ফাষ্ট বোলার গোভারকে দিলেন বল কর্‌তে। ওঃ, সে এক সাঙ্ঘাতিক উত্তেজনায় ভরা মুহূর্ত্ত; ১রানের জন্যে বুঝি মুস্তাকের

সেঞ্চুরিটা ফস্কায়! কিন্তু নাঃ, প্রথম বলেই ও একটা রান নিয়ে নিজের সেঞ্চুরি পুরো কর্‌ল। আগন্তুদের বিরুদ্ধে এই তিন্‌টে টেষ্টের ভেতর এই-ই প্রথম সেঞ্চুরি! উঃ, কী চীৎকার, কী হাততালি!—কিন্তু অথচ কে জান্‌ত আরও একটা আরও সুন্দর সেঞ্চুরি ঐদিনই আমরা দেখতে পাবো! তা'র সেঞ্চুরির পরেই মুস্তাক খুব অসাবধানে খেল্‌তে লাগল এবং ১০১রাণে গোভারের বলে এড্‌রিচের হাতে ও কট্‌-আউট হল। মুস্তাকের সেঞ্চুরির ভেতর তিন্‌টে 'লাইফ্' ও পেয়েছিল। (গত ১৯৩৬ সালে বিলেতে মুস্তাক এই কটা সেঞ্চুরি করেছিল: ১৪১সারের বিরুদ্ধে, ১৪০ লেভেসন্‌-গোভার্স একাদশের বিরুদ্ধে, ১৩৫ মাইনর কাউন্টিসের বিরুদ্ধে এবং ১১২ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে)। (২১০।৩।১০১)।

এরপর কুমারুদ্দিন এলো, কিন্তু গোভারের বলে মাত্র ৪রান করে এল্, বি, ডাবলিউ আউট এয়ে গেল। (২৩১।৪।৪)। এর পর এলেন মার্চেণ্ট—ভারতীয় দলের কাপ্‌টেন। এই সময়ের মধ্যে অমরনাথের ভেতরকার সমস্ত টলমলে ভাবটা চলে গিয়েছে। এখন সে ব্যাট কর্‌ছে সহজ দৃঢ়তার সঙ্গে। প্রতিটি বলই মার খেয়ে হয়ে উঠছে ব্যতিব্যস্ত। একবার মনে পড়ে গোভারের বলে উপর্য্যুপরি ও তিন দিকে তিনটে বাউণ্ডারি করল—কোন দিক দিয়ে যে অমরনাথের বল আসবে তা কেউ অনুমান কর্‌তে পারছিল না!

চা-য়ের খানিক পরে ওয়র্দ্দিংটনের বলে অমরনাথ ৩রাণ করে ৯৯এ এসে থামে। সবাইকার ভেতরটা তখন যে বেশ তোলপাড় হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। কোলকাতার মাঠে একদিন ভারতীয় দলের শেষ পর্য্যন্ত দু' দুটো সেঞ্চুরী হবে? এমন সময় আবার ওয়র্দ্দিংটনের বলেই ১৯রাণে মার্চেণ্ট হ'লেন এল্, বি ডব্‌লিউ! (৩০৯।৫।১৯)! আব্বাস খাঁ এলো অমরনাথের সঙ্গে খেল্‌তে। কিন্তু পোপের এর পরের বলেই অমরনাথ খুবই সহজে ১রাণ নিয়ে নিজের সেঞ্চুরি সম্পূর্ণ কর্‌ল। ১৫০মিনিট লেগেছিল এই সেঞ্চুরি কর্‌তে। এর ভেতর ১১টা বাউণ্ডারি ছিল। যাক্ প্রথম দিনের খেলায় ৫উইকেটে ৩১৩রাণ হবার পর খেলা শেষ হল। অমরনাথ ১০২ নট্ আউট্ ও আব্বাস খাঁ ১রাণ নট্ আউট্ রয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিনে কিন্তু ভারতীয় দলের কেউই দাঁড়াতে পার্‌ল না। টেনিসন দলের বোলার 'পোপ্' বল নিয়ে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড কর্‌ল; ফলে সব কটা উইকেট মিলিয়ে ভারতীয় দল ৩১৩ থেকে মাত্র ৩৫০রাণ করেই হল আউট্। (অমরনাথ ১২৩; অমরসিং নট্ আউট্ ৯)।

তারপর এলো এ্যাড্‌রিচ্ ও ম্যাক্‌করকেল, টেনিসন দলের' বাট করতে। ভারতীয় দলের বিখ্যাত বোলার অমরসিং ও নিসার বোলিং সুরু কর্‌ল। এ্যাড্‌রিচ্ সুন্দর খেলে, তবে অমর সিংয়ের একটা বল মার্‌তে গিয়ে শ্লিপে নিসারের হাতে ও কট আউট হয়, মাত্র

২৯রাণে। কিন্তু যে বলটা নিসার ধরেছিল তা যে লোফা সম্ভব কেউই তা ভাবে নি। আমরা দেখলুম অমরসিং বল দিল, এড্রিচ্ ব্যাট তুল্‌ল এবং পরমুহূর্ত্তেই লাল বলটা নিতান্ত সহজ ভাবে লোফালুফি করতে করতে এগিয়ে এলো নিসার। এরপর এলো হার্ডস্‌টাফ্। খেলা এগিয়ে চল্‌ল আর ক্রমানয়ই আগন্তুকদের রাণ সংখ্যা চল্‌ল বেড়ে। চমৎকার খেলা দেখলুম হার্ডস্‌টাফের। চমৎকার ষ্টাইলে চলে এর ব্যাট, খুব সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে। কিন্তু নিসার সেদিন বিপক্ষদের কাছে হয়ে উঠ্‌ল দারুণ বিভীষিকা। সে দিন ও সবশুদ্ধ পাঁচটা উইকেট নেয় আর আমির ইলাহি নেয় দু'টো। একদিক থেকে বোলিং করছে নিসার, এতো দ্রুত বল আসছে যে ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না, আর একদিক থেকে আমির ইলাহি করছে শ্লো-স্পীন বল। নিসারের সামনে সেদিন কেউ দাঁড়াতে পারল না। ওদের ভেতর সবচেয়ে বেশী রাণ তুল্‌ল হার্ডস্‌টাফ—৫৯রাণ। তারপর নিসারের বলে আমির ইলাহির হাতে হল কট্ আউট্। ইয়ার্ডলিও করেছিল ৩৮রাণ, তারপর নিসারের বল মারতে গিয়ে বলটা সামান্য উঁচু হয়ে যায়, ফলে হিণ্ডলেকার কৃতীত্বের সঙ্গে ধ'রে নেয় সেই বলটা। চমৎকার খেলা দেখলুম উইকেট কীপার হিণ্ডলেকারের। সেদিন ও দু'টো ক্যাচ্ ধরে এবং যে রকম ক্ষিপ্রতা ও সতর্কতার সঙ্গে উইকেট কীপ করে তা না দেখলে বোঝা যায় না। যাক, সেদিন খেলা শেষ হল, বিদেশীদের রাণ হ'ল ২০০র নীচে। লর্ড টেনিসন ও ওদের বোলার পোপ নট আউট থেকে গেলেন। আমরা সবাই-ই আশা করলুম ২০০র ভেতরেই ওদের ইনিংস শেষ হবে এবং তা হলে 'ফালো অন' হতে বাধ্য হবে।

কিন্তু তৃতীয় দিনে ওদের ইনিংস শেষ হ'ল ২৫৭ রাণে পোপ্ ৪১ করে নট আউট থেকে গেল। নিজদের দলের এই দারুণ দুঃসময়ে ও'র এই নির্ভীক ভাবে দাঁড়ানো সত্যিই প্রশংসনীয় এবং টেনিসন দলকে, 'ফলো অনে'র হাত থেকে বাঁচালো ও নিজেই।

এর পর আরম্ভ হল ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস। আগের বারের মতই মুস্তাক ও হিণ্ডলেকার এলো ব্যাট করতে। আজ মুস্তাক ও হিণ্ডলেকার দু'জনকেই দেখা গেল আক্রমণ করে খেলতে। তা'দের ভেতর জড়তা ও আড়ষ্টতা আজ গোড়া থেকেই নেই। রাণ সংখ্যা খুব চমৎকার গতিতে বেড়ে চল্‌ল—লাঞ্চের সময়ে ভারতীয় দলের ৭৩ রাণ, এবং কেউই আউট হয় নি। লাঞ্চের পরেই কিন্তু লাঙ্‌রিজের একটা স্পিন বল তা'কে ঠকিয়ে দিল এবং ৫৫ রাণে ম্যাক্‌কর্‌কেলের হাতে মুস্তাক কট আউট হল। এর পর এলো মাঁকড়। খুব দ্রুত রাণ বাড়াবার জন্য ভারতীয় দলের ক্যাপ্‌টেন আদেশ পাঠালেন মেরে খেল্‌তে। তাঁ'র এই আদেশ নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন ঠিক এই রকম

আদেশ না দিলেও চা-খাবার সময়ের মধ্যেই ভারতীয় দল শ'দুই রাণ করতে পারত এবং অনেকগুলো উইকেটই হাতে থাকত। ফলে ভারতীয় দলের জিত হতে পারত আরো ভালো ভাবে। কিন্তু যাই হোক, সব বল পিটীয় খেলতে গিয়ে কেউই আর দাঁড়াতে পারল না, চা'য়ের সময়েতেই ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ১৯২ রাণে। (হিণ্ডলেকার ৬০, অমরনাথ ০, আমির ইলাহি নট্ আউট ১৫)। ভারতীয় দল তখন ২৮৫ রাণে টেনিসনের দলের চেয়ে এগিয়ে আছে। আর সময়ও বেশী নেই। ভয় হতে লাগল টেনিসন্ দল ২৮৫র বেশী না করতে পারলেও—যদিও ঐ সময়ের মধ্যে টেনিসন দলের ২৮৫ রাণ করা কিছুই অসম্ভব ছিল না—পুরো সময়টা ব্যাট্ দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে ভারতীয়দের কাছে পরাজয়টা এড়িয়ে যাবে। এবং এতো'র পরেও সত্যিই যদি তাই হত তা' হলে আক্ষেপের সীমা থাকত না।

কিন্তু, নাঃ—রয়েছে আমাদের অমর সিং রয়েছে নিসার, মাকড়। হ'লও তাই। চায়ের সময়ের পর এ্যাড্রিচ ও ম্যাক্করকেল এলো ব্যাট করতে। কিন্তু অমর সিং যেন ক্ষেপে' রয়েছে। আগুণের মত সাঙ্ঘাতিক বল তা'র কাছে থেকে আস্তে লাগ্ল। বিরুদ্ধ দল গন্ল প্রমাদ। মাত্র তিন রানে অমর সিংএর বলে নিসারের হাতে বিখ্যাত খেলোয়াড় এড্রিচ হ'ল কট আউট এবং ঐ তিন রানেই ম্যাক্করকেল অমর সিংএর হাতে হ'ল একেবারে বোল্ড আউট। সেদিনের খেলা শেষ হ'ল দু' উইকেটে টেনিসন দলের মাত্র ৪২ রানে—হাউস্টাফ ও ইয়ার্ডলি তখন ২৩ ও ১১ করে নট আউট।

শেষ দিনের খেলা সুরু হ'ল, টেনিসন দলের তখন জিততে হ'লে ২৪৪ রান করতে হয়। অমর সিংএর প্রথম ওভারেই ইয়ার্ডলি ১৫ রানে মুস্তাকের হাতে হ'ল কট আউট। (৪৬।৩।১৫)। এলো ল্যাঙ্রিজ ব্যাট করতে, এ' বাঁ হাতে ব্যাট ধরে। ৬৬ রানের মাথায় নিসারের বদলে মাকড় বল দিতে লাগ্ল। এর খানিক পরেই অমর সিং ছাড়ল একটা অফ্ ব্রেক্ বল এবং হাউস্টাফের অফ ষ্টাম্পটা নিয়ে সাঁ করে বলটা বেরিয়ে গেল। আমরা তখন অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুমঃ ভারতীয় দল যে জিতলেও জিততে পারে। ঐ মাকড়এর বল যে কি রকম বিপদজনক তা' প্রমাণিত হ'ল শীগ্গিরই। প্রথমেই গেল ওয়ার্দ্দিঙ্টন এরই বলে, আমির ইলাহির হাতে ক্যাচ্ আউট হ'য়ে। (১১২। ৫।১১) এর পর এলো পোপ। মাকড় এর পরেই পেল ল্যাঙ্রিজের উইকেট—নিজেই ও ক্যাচ ধরেছিল। (১২৫।৬।৩০)। তা'রপরেই গেল পোপ্, মাকড়এর বলেই। (১২৮।৭।২। মাত্র ৩৩ রানে ও তখন ৩টে উইকেট পায়। তারপর গেলেন টেনিসন মাত্র ৮ রানে, মাকড়এর বলে এবং ইলাহির হাতে কট আউট হয়ে। ১৩৯।৮।৪৮)। এর পরেই এই খেলায় প্রথম একটা

ওভার বাউণ্ডারি হাঁকড়ালে ওয়েলার্ড, অমর সিংএর বলে! কিন্তু তা'রপরেই ওই রকমই একটা ওভার বাউণ্ডারি মারতে গিয়ে ব্যানার্জ্জির হাতে বাউণ্ডারি লাইনে ও কট আউট হল। (১৫৭।৯। ৫)। এর পর এলো শেষ খেলোয়ার গোভার। অমর সিং এর প্রথম দিকের বলেই ও একটা সুন্দর ক্যাচ তুলল। কিন্তু অমর সিং ধরতে গিয়েই সেটা লুফ্‌তে পারল না। কিন্তু দর্শকদের মন তখন ভারতীয় দলের এই রকম আশাতীত সুন্দর খেলায় এতোই খুসী যে কোন দিক থেকেই অসন্তোষের গর্জ্জন শোনা গেল না।

এর পরে লাঞ্চের সময়। লাঞ্চের খানিক পরেই মাকড়এর বলে গোভার ১৩ রানে কট আউট হ'ল নিসারের হাতে। টেনিসনের দল দ্বিতীয় ইনিংসে করল ১৯২ রান; কাজে কাজেই ভারতীয় দলের এই-ই প্রথম ৯৩ রানে, কোল্‌কাতার মাঠে হ'ল জয়।

এই খেলায় ভারতীয় দলের ভেতর যে একতা ও দৃঢ়তা দেখলুম তা' যদি ভবিষ্যৎ মাঠেও থাকে তা হ'লে নিঃসন্দেহেই তা'রা টেনিসনের দলের কাছে জিতবে এবং শুধু টেনিসনের দল কেন, যে কোনও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দলের পক্ষেই ভারতীয় দলকে হারানো বিশেষ সহজ হবে না।

টেনিস—

ক্রীকেটের মত হৈ চৈ না হ'লেও টেনিসেও এবার কয়েকটি সুন্দর খেলা কল্‌কাতায় দেখা গিয়েছিল। আমরা টিলডেনের দলের খেলাগুলির কথা বল্‌ছি। এখনও টিলডেনকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বলা যেতে পারে। এক কালে টিলডেনই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর শুক্রবার উড্‌বার্ণ পার্কে কল্‌কাতায় টেনিসের যেন উৎসব বসেছিল—তাকে টেনিসের প্রদর্শনীও বলা যেতে পারে। এদিন টিলডেন বার্ককে ৬-৩, ৬-২ তে হারিয়ে দিলেন—বার্কএর কাছে টিলডেন যেন সর্ব্বজয়ী ছিলেন। দেখবার বিষয় ছিল—তাঁর 'বেস্ লাইন খেলা'—অত ডিপ্ ড্রাইভ কলকাতায় আমরা খুব কম দেখেছি। কিন্তু সে আগেকার টিলডেন এর ক্যানন বল্ সার্ভিস আমরা আর দেখলাম না। কসে-র‍্যামিলিয়োঁ খেলাটিও উপভোগ্য হয়েছিল; ভারতবর্ষের মাঠে কসের বেশী চেনা আর সত্যিই ভাল খেলে তিনি (৬-২,৬-৩) জিতেছিলেন। ডাবল্‌স ম্যাচ এ টিলডেন—র‍্যামিলিয়োঁ ও কসে-বার্ক এর যা খেলা হয়েছিল তা চিরদিন মনে রাখবার মত। আমাদের বাঙ্গালী ও ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেদিন নোটবই ও পেন্সিল নিয়ে খেলা দেখা উচিৎ ছিল—দেখে শেখার বিষয় এত ছিল।

দ্বিতীয় দিনের কসের খেলা সকলের চেয়ে দেখবার জিনিষ ছিল; তাঁর খেলার ষ্টাইল ও গতি অতি সুন্দর। সেদিনকার ফলাফল—কসে বার্ককে ৬-২,৬-৩ তে ও টিলডেন র‍্যামিলিয়োঁকে ৬-৩,৬-৩ এ হারিয়েছিলেন; ডাবল্‌স্ কসে ও র‍্যামিলিয়ো—টিলডেন ও বার্ককে ৬-৩,৬-১,৪-৬ তে হারিয়েছিলেন। চতুর্থদিনের খেলাও হয়েছিল যেমন সুন্দর তেমনি অভূতপূর্ব্ব। সত্য কথা বলতে কি কলকাতায় এত ভাল খেলা কখনও হয়েচে কি না সন্দেহ। খেলা দেখার শুধু আনন্দ ছিল না—দেখার পর শরীর মন অতক্ষণ বসে থাকতে হলেও যেন সতেজ ও সজীব হয়ে উঠছিল। এরকম খেলা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দেখলেও কোন কষ্ট বা ক্লান্তি আসে না। এই খেলাতে কসে টিলডেনক হারিয়েছিলেন ৬-২,৪-৬,৯-২তে। অদ্ভুত খেলা হয়েছিল—ফলাফল দেখেই বুঝতে পাচ্ছ খেলায় কি রকম উত্তেজনা ও জোর ছিল। টিলডেন দলের সব খেলাগুলির এই খেলাটাই সবচেয়ে সুন্দর হয়েছিল। আর একটি সিংগল্‌স্ খেলায় র‍্যামিলিয়োঁ বার্ককে ৬-০,৬-৩ তে হারিয়েছিলেন। ডাবল্‌স্‌এ র‍্যামিলিয়োঁ-বার্ক ও টিলডেন-কসের খেলা সন্ধ্যা হওয়ার দরুণ অসমাপ্ত থাকে।

ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে টিলডেনের অভিমত—ঘাউস মহাম্মদ বড় ষ্টাইলিশ প্লেয়ার কিন্তু সাহানি ভলিতে আরো সুন্দর। তাঁদের মতে ইউরোপ আমেরিকার প্রফেসানাল মাপকাটিতে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের পৌঁছতে হলে সে দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের এখানে কোচ্ হিসেবে রাখা উচিৎ। আপাততঃ Estrabean সাউথ ক্লাবে উঁচুদরের খেলা শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছেন। এর মধ্যে একটি ছোট্ট কিন্তু পাকা খেলোয়াড়ও শিখচেন—তিনি হলেন খসু সেন পাটনা)—এর কথা আমরা তোমাদের একবার বলেছিলাম। এই ছোট ছেলেটি বড়দের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপএ নেবেছিল। একটু বড় হলে খসু ভাল খেলোয়াড় হবে সকলেই আশা করে। নসু সেনকে এবার দেখতে পেলাম না কেন? যাই হোক এবারকার টেনিস খেলা আমরা খুব উপভোগ করেছি ও সত্যিকারের ও উঁচুদরের টেনিস কী জিনিষ তা দেখেচি ও দেখে খুব আনন্দ পেয়েচি। টিলডেন এর দল এখন ভারতের অন্যান্য জায়গায় খেলচেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি মাত্র ঢিল ও দুইটি পক্ষী

অমলবাবু সভয়ে ব'লে উ'লেন, "কি ভয়ানক! দেখুন জয়ন্তবাবু, দেখুন! সত্যিই তো, ও বাড়ীর বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই শেষ রাতে, এমন দুর্য্যোগে রাস্তার দিকে অত আগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে ও-লোকটা কি দেখছে?"

জয়ন্ত বললে, "এতক্ষণ ও লোকটা নিজের অন্ধকার ঘরে ব'সে আমাদের ঘরের সমস্ত দৃশ্য লক্ষ্য করছিল। এখন ও বেরিয়ে এসে দেখছে যে, চাবি আর চাকতি নিয়ে আমরা পথে বেরিয়েছি কিনা! আমরা পথে বেরুলেই বোধ হয় আমাদের উপরে আক্রমণ হ'বে!"

—"সর্ব্বনাশ! তাহ'লে আপনারা কি করবেন?"

জয়ন্ত হেসে বললে, "অমলবাবু, আমার চেহারা দেখছেন তো? আমরা শত্রুদের গায়ে কত জোর আছে জানি না, তবে আমি যে একবার একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়কে ধ'রে মাটির উপরে কাৎ করেছিলুম, মানিক সে সাক্ষ্য দিতে পারে! কুস্তি-বক্সিং আমরা দুজনেই জানি। সুতরাং পথে বেরুতে আমাদের কোন ভয় নেই। কিন্তু অকারণে অশান্তি সৃষ্টি ক'রেও কোন লাভ নেই। ওদের সঙ্গে হাতাহাতি হ'লে খুব সম্ভব আমরা জিতে যাব; কিন্তু সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষকেও সাবধান ক'রে দেওয়া হবে। অতএব কোন হাঙ্গামা না ক'রে আজ আমরা এইখানেই রাতটা কাটাতে চাই। এতে আপনার আপত্তি নেই তো?"

অমলবাবু বললেন, "আপত্তি? বিলক্ষণ! আপনারা কাছে থাকলে আমি তো ধড়ে প্রাণ পাই! যদি চ্যান্ আবার আসে?"

জয়ন্ত বললে, "না, আজ আর সে এখানে বেড়াতে আসবে না। বরং কাল সকালে আমরাই ঐ সামনের বাড়ীটায় বেড়াতে যাব।"

—"বলেন কি, ঐ বাঘের বাসায় ?"

—"কেন, আপনি তো বললেন ওটা হচ্ছে মেস্ বাড়ী !" তা যদি হয়, তাহ'লে ওখানে আরো অনেক লোক নিশ্চয়ই বাস করে ? আমরা ওখানে ঘর ভাড়া করতে বা কোন চেনা লোককে খুঁজতে যাব। দিনের বেলায় পাঁচজনের বাসায় নিশ্চয়ই কেউ আমাদের গলায় ছুরি বসাতে সাহস করবে না !"

মানিক বললে, "কিন্তু ওখানে গিয়েই বা আমাদের কি লাভ হবে ?"

—"প্রথম লাভ হ'বে এই যে চ্যান্ ওখানে আছে কিনা সেটা জানতে পারব। অমলবাবু তার চেহারার যে-বর্ণনা দিয়েছেন, চ্যান্‌কে চিনে নিতে আমাদের একটুও বিলম্ব হবে না। দ্বিতীয় লাভ হবে, চ্যান্ ওখানে থাকলে কাল সকালেই তার হাতে হাতকড়ি দেবার ব্যবস্থা করব।"

—"কি অপরাধে, আর কি প্রমাণে ?"

—"চ্যান্‌ই যে সুরেনবাবুকে খুন করেছে, আমাদের হাতে আপাতত তার কোন প্রমাণ নেই বটে। কিন্তু চ্যান্ যে এই বাড়ীতে দেওয়াল বেয়ে উঠে চুরি করতে এসেছিল আর অমলবাবুকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বারান্দার ঐ পদচিহ্নগুলো। ঐ প্রমাণের জোরেই তাকে এখন অনেককালের জন্যে জেল খাটানো যেতে পারে। প্রধান শত্রুকে সরাতে পারলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে বনবাসী হ'তে পারব।"

অমলবাবু বললেন, "কিন্তু জয়ন্তবাবু, আপনি ইনের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ? সন্ন্যাসীর কথা মান্‌লে বলতে হয়, ইন্‌ও আমাদের মস্ত শত্রু। সে কোথায় আছে ?"

জয়ন্ত বললে, "তারও চেহারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার তো ! অমলবাবু, অতঃপর আপনি ইনের রূপবর্ণনা করুন !"

অমলবাবু বললেন, "চ্যান্ যেমন অসাধারণ ঢ্যাঙা, ইন্ তেমনি অসাধারণ বেঁটে, মাথায় সে চারফুটের বেশী তো হবেই না, বরং কম হওয়াই সম্ভব। কিন্তু নিজের দীর্ঘতার অভাব সে মিটিয়ে নিয়েছে অসাধারণ মোটা হয়ে ! দূর থেকে তাকে দেখলে মনে হয়, যেন একটি গোলাকার পদার্থ যাদুকরের মন্ত্রে হঠাৎ জ্যান্তো হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে ! কিন্তু এত মোটা ও বেঁটে হ'লেও ইন্ অত্যন্ত চট্‌পটে আর চুল্‌বুলে। সে ছোটে ক্রিকেট-বলের মত আর মাটি থেকে লাফ মারে টেনিস-বলের মত। চ্যানের লম্বা চওড়া চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু ইন্‌কে দেখলে একেবারেই অবাক হয়ে যেতে হয় ! আবার চ্যান্ ও ইন্‌কে এক সঙ্গে দেখলেই মনে হয়, ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কথা !"

জয়ন্ত বললে, "চমৎকার ! মানিক, এমন উজ্জ্বল বর্ণনা শোনবার পর আর কি ইন্‌কে চিনে নিতে আমাদের কষ্ট হবে ?"

মানিক বললে, "নিশ্চয়ই নয় ! অমলবাবু একখানা কথার ফোটোগ্রাফ তুলে আমাদের দান করলেন !"

—"ফোটোগ্রাফ নয় মানিক, এ হচ্ছে 'এক্সপ্রেসানিষ্ট' চিত্রকরের আঁকা ছবি ;—এ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এঁকে একে কিছু দেখালে না, কিন্তু আসল মূল ভাবটি হুবহু প্রকাশ করলে। তুমি যদি ইনের সত্যিকার

…খানা ফোটোগ্রাফও হাতে পেতে, তাহ'লেও তার স্বরূপ এত সহজে ধরতে পারতে না!…………কিন্তু …ক সে কথা! ভোরের পাখী ডাকবার আগে আপাতত একটুখানি স্বপ্নলোকটা দেখবার চেষ্টা করার দরকার!"

পরদিন বেলা সাতটার সময়ে আকাশের বিরাট কুম্ভ শূন্য হয়ে গেল—এখন আর এক-ফোঁটাও বৃষ্টি নেই। এবং সূর্য্যের তাপে মেঘগুলোও মোমের মতন গ'লে মিলিয়ে গেল। রাস্তার ময়লা জল কমেছে বটে, কিন্তু এখনো জুতো না ভিজিয়ে পথ চলবার উপায় নেই।

অন্যদিনে এ-সময়ে বিচিত্র জনতার অনৈক্যতানে রাজপথের তন্দ্রা ছুটে যায়, কিন্তু আজ এখনো তার ঘুম-ঘুম ভাব দূর হয় নি। যার নিতান্ত দায়, সেইই পথে পা বাড়িয়েছে। অনেক দোকান এখনো বন্ধ, ফিরিওয়ালাদের আর্ত্তনাদ প্রায় স্তব্ধ, মোটররা এখনো মানুষ-মৃগয়ার লোভে উৎসাহিত হয় নি।

জয়ন্ত ও কুমার যখন রাস্তার ও-পাশের মস্ত মস্ত বাড়ীখানার সুমুখে গিয়ে দাঁড়াল, তখনও তার ভিতর থেকে জীবনের কোন কচকচিই জাগে নি।

একটা বুড়ো হিন্দুস্থানী দ্বারবান সদর দরজার চৌকাঠে ব'সে দাঁতন-কাঠি চর্ব্বণ করছিল, জয়ন্ত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "দরোয়ানজী, এ বাড়ীতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়?"

দ্বারবান একটু বিস্মিত ভাবে জানালে যে, এখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু 'বাংগালী বাবু'দের থাকবার সুবিধা হবে না।

জয়ন্ত বললে, "সে কথা আমিও বুঝি দারোয়ানজী! কিন্তু আমি তো এখানে পরিবার নিয়ে থাকব না, খান দুই-তিন ঘর ভাড়া নিয়ে আমি এখানে আপিস করব, মাড়োয়ারি আর পশ্চিমা লোক নিয়েই আমার কারবার কিনা!"

দ্বারবান জানালে, তিনতালায় চারখানা ঘর খালি আছে, বাবুরা উপরে গিয়ে দেখতে পারেন।

—"তিন-তলায়? সেখানে আর ক-ঘর ভাড়াটে আছে?"

শোনা গেল, তিন-তালায় রাস্তার দিকে দুখানা ঘর নিয়ে পাঁচ-ছজন বর্ম্মী লোক আছে। ভিতর দিকে আছে একঘর মাদ্রাজী। বর্ম্মীদের ঘরের পাশেই দুখানা ঘর খালি আছে।

জয়ন্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে দ্বারবানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মানিকের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করল।

সিঁড়ি দিয়ে তারা উপরে উঠতে লাগল। কলকাতার অধিকাংশ মেসবাড়ীর—বিশেষত যেখানে অবাঙালীর বাস—সিঁড়ি হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণাকর স্থান। তার ধাপে ধাপে চোখে পড়ে কুকুরের বিষ্ঠা, মানুষের

মূত্র ও যত রাজ্যের দুর্গন্ধ জঞ্জাল এবং তার দেওয়াল হয় থুতু, পানের পিক্ ও অন্যান্য নানা নক্কারজনক মলিনতার দ্বারা চিত্রবিচিত্র। শ্বাস ও চক্ষু বন্ধ ক'রে এবং যতটা-সম্ভব জড়োসড়ো হয়ে সেখান দিয়ে ওঠা-নামা করতে হয়।

জয়ন্ত ও মাণিক এই ভাবেই দোতালায় গিয়ে উঠল। দোতালায় চারিদিকে বারান্দা ও তারপর সারি সারি ঘর। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়ালে 'ডাষ্ট্ বিনে'র চেয়েও নোংরা এক-তলার উঠান দেখা যায়। অধিকাংশ ঘরের দরজা-জান্লাই সারারাত্রব্যাপী বৃষ্টির জন্যে এখনো বন্ধ এবং তাদের ভিতর থেকে একাধিক নাসিকার তর্জ্জন-গর্জ্জন বাইরে বেগে ছুটে আসছে।

তারা তিনতালায় উঠতে উঠতে শুনতে পেলে, তিন-চারজন লোকের দ্রুত পদধ্বনি! কিন্তু তিন-তালায় উঠে জনপ্রাণীকে দেখতে পেলে না এবং সেখানেও বারান্দার ধারের প্রত্যেক ঘরের দরজা জান্লা বন্ধ রয়েছে।

তারা চারিদিকের বারান্দা ঘুরে এল —তবু কারুর দেখা বা সাড়া নেই, এমন-কি এখানে কারুর নাক পর্য্যন্ত ডাকছে না!

মাণিক মৃদুস্বরে বললে, "কিন্তু উপরে এমনি যাদের পায়ের শব্দ পেলুম তারা কে, আর গেলই বা কোথায়?"

জয়ন্ত বললো, "হয়তো তারাই হচ্ছে চ্যান্ ও ইন্ কোম্পাণীর লোক, আমাদের সাড়া পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে! মাণিক এখানে একটু সাবধানে চলা-ফেরা করতে হবে!"

একটা ঘরের দরজায় বাহির থেকে তালা লাগানো রয়েছে। দ্বারবানের দেওয়া চাবি সেই কুলুপে লাগল। দুজনে ঘরের ভিতরে ঢুকল। ঘরের মধ্যে একটা দরজা দিয়ে আর একখানা ঘরে যাওয়া যায়। তারপর রাস্তার ধারের বারান্দা।

সেখানে গিয়ে সুমুখের দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "দেখ মাণিক, এখান থেকে অমলবাবু ঘরের ভিতরটা পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!

বারান্দার যেখান থেকে কাল রাত্রের সেই মূর্ত্তিটা পথের উপরে পাহারা দিচ্ছিল, জয়ন্ত সেইদিকে পায়ে পায়ে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময়ে আস্তে আস্তে একটা জান্লা বন্ধ করার আওয়াজ হ'ল।

মাণিক চুপি চুপি বললে, "বারান্দার ধারের একটা ঘরের জান্লা খোলা ছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ বন্ধ ক'রে দিলে!"

জয়ন্ত বললে, "হুঁ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এরা আমাদের সন্দেহ করেছে। হয়তো আমাদের মৎলোব ধ'রে ফেলেছে!

যেখান থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেইখানে গিয়ে তারা দেখলে, একটা জান্লা ও একটা দরজা রয়েছে। দুইই বন্ধ।

দরজার কড়া ধ'রে জয়ন্ত বারকয়েক নাড়া দিলে। কোন সাড়া নেই।

পদ্মরাগ বুদ্ধ
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জয়ন্ত বললে, "এরা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। চল, নীচে নেমে অন্য উপায় চিন্তা করি গে।"

দুজনে আবার ভিতর-বারান্দায় ফিরে এল। আর-একবার এদিকে-ওদিকে উঁকিঝুঁকি মেরে তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল—আগে মাণিক, তারপর জয়ন্ত।

হঠাৎ হুড়মুড় ক'রে বিষম একটা শব্দ হ'ল—মাণিক চমকে পিছনে তাকাতে-না তাকাতে জয়ন্তের বিপুল দেহ একেবারে তার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং পর মুহূর্ত্তেই ভয়ানক ধাক্কা খেয়ে মাণিক সিঁড়ির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল।

দৈবগতিকে মাণিক হাত বাড়িয়ে রেলিং ধ'রে ফেললে তাই আর নীচের দিকে নেমে গেল না, কিন্তু যন্ত্রণায় সে যেন অন্ধ হয়ে গেল এবং সেই অবস্থাতেই সে শুনতে পেলে যে, জয়ন্তের দেহ গড়াতে গড়াতে দুম-দুম শব্দে নীচে নেমে যাচ্ছে! তারপরেই চারিদিকে ব্যস্ত পদধ্বনি, চ্যাঁচামেচি, হুড়োহুড়ি! সে বুঝলে, জয়ন্ত হঠাৎ পা হড়্‌কে সিঁড়ির উপরে প'ড়ে গেছে!

প্রায় দুই মিনিটকাল সেইখানে আচ্ছন্নের মত ব'সে থেকে মাণিক অতিকষ্টে উঠে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

দোতালায় নেমে সে দেখলে, সেখানে মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী ও মাড়োয়ারির ভিড়! জয়ন্ত বারান্দার রেলিংয়ে ঠেসান্ দিয়ে পা ছড়িয়ে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মতন ব'সে আছে, তার মুখ বুকের উপরে ঝুলে পড়েছে এবং কেউ তার মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিচ্ছে ও কেউ পাখা নেড়ে বাতাস করছে!

মাণিক তার কাছে গিয়ে ডাকলে, "জয়, জয়, তোমার কি বড্ড বেশী লেগেছে?"

অভিভূতের মত জয়ন্ত খালি বললে, "হুঁ।"

মিনিট পাঁচেক পরে জয়ন্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল, তার চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবার ফিরে এল। সে মুখ তুলে ভিড়ের ভিতরে যেন কা'কে খুঁজতে লাগল। মাণিক বুঝলে, জয়ন্ত এ অবস্থাতেও চ্যান্ বা ইন্‌কে ভোলে নি! কিন্তু ভিড়ের ভিতরে মগের মুল্লুকের কোন নমুনাই দেখা গেল না।

মাণিক বললে, "জয়, আমি একখানা ট্যাক্সি ডেকে আন্‌ব কি?"

জয়ন্ত কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "না, আমি হেঁটে যেতেই পারব। আগে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।

সকলকে সাহায্য করার জন্যে ধন্যবাদ দিয়ে জয়ন্ত ও মাণিক ধীরে ধীরে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

রাস্তায় এসে জয়ন্ত নিজের জামার ভিতরকার পকেটে হাত দিয়েই থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুষ্ক স্বরে বললে, "মাণিক, ভিড়ের ভিতরে তুমি কোন বর্ম্মী লোককে দেখ নি?"

—"না। তবে তোমার কাছে যেতে আমার মিনিট দুয়েক দেরী হয়েছিল। তার মধ্যে কেউ এসেছিল কিনা জানি না।"

—"নিশ্চয় এসেছিল!"

—"কি ক'রে জানলে?"

জয়ন্ত গম্ভীর স্বরে বললে, "মাণিক, আমি পা পিছলে প'ড়ে যাই নি!"

—"তবে?"

—"আমাদের সুচতুর বন্ধু এক ঢিলে দুই পক্ষী বধ করেছে!"

—"জয়ন্ত, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না!"

জয়ন্ত খুব-শুকনো হাসি হেসে বললে, "মাণিক, তোমার পরে আমি নামছিলুম। হঠাৎ পিছন থেকে কেউ এমন ভাবে আমাকে একটা প্রবল ধাক্কা মারলে যে, তোমাকে নিয়ে আমিও হুড়মুড়িয়ে প'ড়ে গেলুম।"

মাণিক সচকিত কণ্ঠে বললে, "বল কি জয়! কে ধাক্কা মারলে? তাকে দেখেছ?"

—"না, দেখবার সময় পাই নি। তবে তার গায়ে যে ভীষণ জোর আছে, ধাক্কা খেয়ে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি।......তারপর আমি যখন দোতালার বারান্দায় প'ড়ে প্রায়-অজ্ঞানের মতন হয়ে আছি সেই সময়ে আমাকে সাহায্য করবার অছিলায় অজানা বন্ধু আমার পকেট থেকে সেই বড় চাবিটা আর নক্সা-আঁকা সোনার চাকতিটা নিয়ে দিব্যি স'রে পড়েছে!"

—"সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?"

জয়ন্ত বললে, 'অমলবাবুর বাড়ীতে 'ফোন্' আছে। তুমি এখনি গিয়ে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবুকে একদল কনষ্টেবল নিয়ে এখানে আসতে বল। এই বাড়ী খানাতল্লাস করা ছাড়া অন্য উপায় দেখছি না। তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দি।"

ক্রমশঃ



নদী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমার ইচ্ছে করে, ওপারে যেতে,
আবছায়া ঝাউ বনে সর্ষে ক্ষেতে।
ছোট্ট ডিঙায় চড়ে
নিজে হাতে হাল ধরে
ঝির ঝিরে সন্ধ্যার হাওয়ায় মেতে।

এ পারে গাঁয়ের ঘরে পিদিম জ্বালা,
মন্দিরে সন্ধ্যার আরতির পালা।
মেঠো সুরে গান করে
রাখাল ফিরবে ঘরে
আকাশে উঠবে ফুটে তারার মালা।

অথৈ নদীর জল অগাধ কালো,
তার বুকে সন্ধ্যার সোনালি আলো।
সারসেরা পাক দিয়ে
উড়ে যায় বাঁক দিয়ে
ছায়া ছায়া ও-পারের ছবিটি ভালো।

এপারে রয়েছে ঘর, রয়েছে বাড়ী,
সব কিছু একেবারে পালাবো ছাড়ি।
মাঝখানে রবে নদী,
ফিরে নাই আসি যদি
মা তুমি আমায় ভেবে কাঁদবে ভারী?

নদী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

ওপার আমায় মাগো নিত্য ডাকে—
কতদিন ছেড়ে আর থাকবো তাকে ?
চুপ চাপ নিরালায়
একা তার দিন যায়
কুয়াসায় মুখখানি লুকিয়ে রাখে।

ওপারে মানুষ নেই, নেইক বাড়ী,
আছে শুধু আশে পাশে গাছের সারি।
মাঝে মাঝে আছে মাঠ
ধান যব গম পাট—
ডাকে তারা আয় আয় কেশর নাড়ি।

ওপারে নেইক মাগো দুঃখ কিছু,
ছোটে না মানুষ কেউ কাজের পিছু।
হাসি নিয়ে দিন চলে
স্বপ্নে ফসল ফলে
আকাশ ওপারে যেন অনেক নীচু।





উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ
লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চিত্রিত

৭

রহস্যেভরা চাঁদনীরাত উধাও হল, ভোরের আবছা আলো একটু ফুটে উঠন্ত-আলোয় নিভে গেল, ক্ষিতিভূষণের জাহাজখানা তখন টলমল করে দিনের সোনালী আলোয় পাগল ঢেউয়ের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ল। হালের মাঝি লছীন্দর হাঁক দিলে "সামাল!"

পাটাতনের উপর মাস্তুলে হেলান দিয়ে বসে ছিল ক্ষিতিভূষণ। সে তখন তন্দ্রাতে ঢুলচে। এক একবার আধখানা স্বপ্নে দেখচে কালীভূষণকে। কালীভূষণের নৌকা যেন ডুবু ডুবু। একটা রসি ছুড়ে দিয়ে ক্ষিতিভূষণ যেন ডেকে বলচে, "দাদা, রসি ধরো, উঠে এসো।" বারে বারে সেই আধখানা স্বপ্ন ভেঙ্গে যাচ্ছে আর ক্ষিতিভূষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলচে। কে জানে, কোন্ দুরন্ত সমুদ্রে খড়কুটির মত ভেসে চলেছে কালীভূষণের নৌকো!

জাহাজ হঠাৎ টল্‌তে ক্ষিতিভূষণ চোখ মেললে। সামনের ধূ ধূ সমুদ্রে আশা নেই, ভরসা নেই। কোথায় কোন্ আশায় চলেছে সে? এই মেয়েটা—এর কথার দাম কতটুকু? কালীভূষণের খবর সে জানলে কী করে? কী করে দেখলে সে? একি হঠাৎ দেখা? না মেয়েটা আরো কিছু জানে? মেয়েটা কে? কালীভূষণ উধাও হবার ব্যাপারে কোনো হাত আছে কি তার? একি কোনো চক্রান্ত! কিন্তু অতটুকু মেয়ে—অতবড় বোম্বেটে কালীভূষণকে নিয়ে চক্রান্ত করে সাধ্য কি? আর কেনই বা এই চক্রান্ত? কালী-ভূষণকে মাঝ সমুদ্রে জাহাজ থেকে নিয়ে গিয়ে কার কী লাভ? হঠাৎ ক্ষিতিভূষণের মনে হল—মেয়েটা পাগল নয় তো! কাল রাতে সে তাকে কখনো হাসতে, কখনো গম্ভীর হয়ে যেতে দেখেচে। মনে হয় মাথায় ছিট আছে। হয়তো তাই ঠিক। নইলে কী করে কালীভূষণের খবর জান্‌বে সে। হয়তো চূড়ান্ত ক্ষ্যাপামী, শয়তানি করছে মেয়েটা। মিছিমিছি হায়রাণ করে মারছে। তাই যদি বা হয়, ক্ষতি কি? ক্ষিতিভূষণ

হাসল। দাদা না থাকলে তার ঘর আর তার কাছে তো ঘর নয়, আপনজনও তখন পর। তাহলে খুসিমত আটপ্রহর শুধু ভেসে ভেসে চলা তো মন্দ নয়। এমনি করে জাহাজে ভেসে আধখানা স্বপ্নে বার বার সে দাদাকে ফিরে পাবে।

কালীভূষণের পোষা কুকুরটা জাহাজেও কালীভূষণের সঙ্গী। লুটের সময় মনিবের পিছু পিছু ফিরতো সে। কিন্তু কাল রাতে লুটের সময় কালীভূষণ তাকে সঙ্গে নেয় নি, জাহাজে বেঁধে রেখে গিয়েছিল। কুকুরটাকে ভোরবেলা ছেড়ে দেওয়া হয়েচে। তখন থেকে পাটাতনময় শুঁকে ফিরচে কুকুরটা। হয়তো মনিবকে খুঁজে ফিরচে। কিন্তু, মহাসমুদ্রে কোথায় কতদূরে কালীভূষণ আর কোথায় পাটাতনে জানোয়ারটা মনিবের খোঁজে ফিরচে। ক্ষিতিভূষণ আর একবার হাসল। ভাবলে, মন্দ কি! কুকুরটা বোঝে না, তাই তো ও সুখী। হয়তো ও ভাবচে জাহাজে কোথায় লুকিয়ে আছে ওর মনিব। ও এখনও আশা রাখচে।

হঠাৎ কুকুরটা থমকে দাঁড়াল। একখানা পাথরে খোদাই কুকুরের মত না কেঁপে দাঁড়াল। অনেকদূরে রেলিংয়ের একটা ধারে কী যেন ঠাহর করে দেখচে। চোপগুটোয় একটু কাঁপন নেই। আলোয় টুটুকরো কাচের মত, অন্ধকার আকাশের তারকার মত, চোখের মণি জ্বল জ্বল করচে। হালের মাঝি লছীন্দর ক্ষিতিভূষণের পানে একবার তাকাল। একবার শিষ দিয়ে পরে সে কুকুরটাকে নাম ধরে ডাকলে, "রঙ্গিলা।" কুকুরটা একটিবার ঘাড় ফিরিয়েও দেখলে না। একটিবার লেজ নেড়েও সাড়া দিলে না।

লছীন্দর বললে, "কর্ত্তা ব্যাপার কী!"

তবে কি সেদিকে মহাসমুদ্রে দেখা যাচ্ছে কালীভূষণের নৌকা? তাই কি একদৃষ্টে দেখচে কুকুরটা? ক্ষিতিভূষণ উঠে দাঁড়াল। সেদিকে মহাসমুদ্রে তাকিয়ে ক্ষিতিভূষণ দেখলে অফুরন্ত রূপোলী জলে লাখো ঢেউয়ের ভাঙন আর দিগন্তে একখানা ঝকঝকে আলগা মেঘ।

হঠাৎ কুকুরটা একখানা তীরের মত ছুটল। রেলিংয়ের ধারে পাটাতনের উপর থেকে কী একটা জিনিষ মুখে তুলে সোজা ছুটে এলো ক্ষিতিভূষণের কাছে। ক্ষিতিভূষণের সামনে পাটাতনে জিনিষটা ফেলে রেখে কুকুরটা লেজ নাড়তে লাগল। ক্ষিতিভূষণের চোখে বিস্ময় ঘনালো। সে দেখলে সোনায় মোড়া একটুকরো মণি। কোন্ অজগরের মাথার মণি, কোন্ পাতাল কোঠার লুকনো মণি—সকালের নরম রোদে একমুঠো আগুনের মত জ্বলছে মণিটা, সাতরঙা রোদে সাতশো ফিনিক ফিরিয়ে দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে পাটাতন থেকে মণিটা কুড়িয়ে নিলে ক্ষিতিভূষণ। কুটি কুটি অক্ষরে কী একটা কথা চুলের মত সরু হরপে খুঁদে লেখা। ক্ষিতিভূষণ গভীর বিস্ময়ে লেখাটা পড়লে "অমরলতা।" হালের মাঝি লছীন্দর তফাৎ থেকে হাঁ করে সেই জিনিষটা দেখলে। হালটা অন্য এক বোম্বেটের জিম্মায় রেখে সে ক্ষিতিভূষণের পাশে এসে দাঁড়াল। ক্ষিতিভূষণকে সে বললে "কর্ত্তা, আর দেরী নয়। বিষয়টা এখনই একটু তলিয়ে দেখতে হচ্ছে।"

ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে তর সইল না। ক্ষিতিভূষণের জাহাজ কোঠায় গুপ্ত বৈঠক বসল। লছীন্দরের সঙ্গে আর দুজন এলো। পঞ্চাশ বছরের মাঝি দুভাই, বুলন্দ পুলন্দ নাম। ফন্দি ফিকিরে দুরন্ত তারা। যোগফলের

মত রহস্যের কল বলে দেয় তারা। বুদ্ধিতে তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। লঙ্কার মন্ত্রণাসভা তাদের কাছে হার মেনে যায়।

জিনিষটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সুলন্দ পুলন্দ দুভাই ক্ষিতিভূষণকে বললে, "কর্ত্তা, এবার রহস্য জল হচ্ছে দেখচি।"

"জিনিষটা দেখে তো গয়না বলে মনে হয় না। মনে হয়, কোনো একটা গুপ্তদলের গোপন চিহ্ন।" সুলন্দ বললে।

"মনে হয় বলচ কেন সুলন্দ? বলো, নিশ্চয়ই।" পুলন্দ বললে। "এটা গয়না যখন নয়, তখন ছেলেপুলেদের খেলার জিনিষও নয়। জানি না, চীনবাদশার খোকনরা হীরেমুক্তো নিয়ে ষোল ঘুটি বাঘ বন্দী খেলেন কিনা। জিনিষটাকে দেখে আবার নেহাৎ একটা চিহ্ন বলে মনে হয় না। ভেবে দেখলে বলতে হয় এটা একটা পাঞ্জা টাঞ্জা হবে।"

"পাঞ্জা? পাঞ্জা কাকে বলে!" লছীন্দর শুধোলে।

"বিস্তি খেলার পাঞ্জা নয়, এ আর এক পাঞ্জা! চীন বাদশার আমোল থেকে পাঞ্জার রেয়াজ চলে আসচে। রাজ্যের গুপ্ত ব্যাপারে পাঞ্জার চল। সব সময় রাজা তো আর মুখোমুখি হুকুম দিতে পারেন না। গুপ্ত ব্যাপারে চিঠিও পাঠানো চলে না। চিঠি শত্রুর হাতে পড়তে পারে! তখন রাজার হুকুম জানিয়ে বিশ্বাসী লোককে পাঞ্জা দিয়ে পাঠানো হয়। পাঞ্জা যার হাতে, তাকে ঠিক রাজার মতন মানতে হবে! তার হুকুম রাজার হুকুম। তার কথা ঠেললে সর্ব্বনাশ।" সুলন্দ বললে।

ক্ষিতিভূষণ বললে, "আমাদের জাহাজে একটি মেয়েকে বন্দী করে আনা হয়েচে। সে কথা তোমরা জানো। আমার মনে হয় মেয়েটি কোনো দেশের রাজকন্যা হবে। পাঞ্জাটা নিশ্চয়ই তার হাত থেকে খসে পড়েচে। এটা তা হ'লে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাক।"

সুলন্দ পুলন্দ দু ভাই হাঁ করে ক্ষিতিভূষণের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর পুলন্দ বললে, "এটা কিছুতেই ফিরিয়ে দেওয়া চলে না। জানানোও চলে না। এটার সঙ্গে বড় কর্ত্তার উধাও হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। অবাক হচ্ছ কর্ত্তা! তবে শোনো। এই পাঞ্জা নিয়ে কেউ একজন বড় কর্ত্তাকে চুরি করতে বার হয়েছিলেন। তার হাত থেকে অজান্তে পাঞ্জাটি খসে পড়েচে। টের পাননি! তবে জাহাজে যখন পাঞ্জা পাওয়া গেছে তখন তিনি এখানেই আছেন!"

ক্ষিতিভূষণ সবিস্ময়ে বললে, "তোমাদের কথার অর্থ? এখানে আমরা ছাড়া আর কে আছে বলতে চাও! তোমরা মেয়েটিকে সন্দেহ করচ? অর্থাৎ কোনো দেশের রাজকন্যা দাদাকে চুরী করেছে? কিন্তু দাদার তো বিয়ে হয়ে গেছে!"

সুলন্দ পুলন্দ দুভাই প্রাণ খুলে হাসল। সুলন্দ বললে, "কর্ত্তা, জানি না তোমার বন্দীটি রাজকন্যা বটেন কিনা আর তিনি বড়কর্ত্তার গলায় ফুলের মালা দিতে রাজী কিনা। কিন্তু

একটা কথা ঠিক জেনো, এই পান্নার সঙ্গে বড়কর্ত্তা উধাও হওয়ার সম্পর্ক আছে, আর পান্নাটি নিয়ে যিনি ফিরচেন তিনিও এই জাহাজেই আছেন। এবং তিনি এই মেয়েটিই।"

ক্ষিতিভূষণ বল্লে, "বিষয়টা ঘোলাটে বোধ হচ্ছে! খুলে বলো।"

পুলন্দ বললে, "তোমার বুদ্ধি এখনও বড় কাঁচা আছে দেখচি ছোটকর্ত্তা! সুলন্দ, বড়কর্ত্তা উধাও হবার গল্পটা ছোটকর্ত্তাকে শুনিয়ে দাও দিকি—আমি ততক্ষণ এক ছিলিম—"বলেই একটা হুঁকোয় মুখ দিয়ে পুলন্দ একটা বুড়ো শেয়ালের মত ঝিমোতে থাকল।

সুলন্দ একটু কেশে নিয়ে বললে, "তবে শোনো গল্পটা : কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ দুই বোম্বেটে একদিন জাহাজে চেপে রওনা হলেন। ইচ্ছে, আরব সাগরটা লুঠ করবেন। ফুটফুটে চাঁদনী রাত। দূরে একখানা জাহাজ দেখে মরীয়া হয়ে ছুটে তারা গিয়ে জাহাজটা চেপে ধরলেন। তারপরেই কালীভূষণ উধাও!"
ক্ষিতিভূষণ বললে, "তা জানি, কিন্তু কেন উধাও, কোথায় উধাও, ভণিতা রেখে বলো!"

সুলন্দ বললে, "গল্পে শুনতে পাবে সবটা। হুঁ, তারপর যে জাহাজ চড়াও হলেন দুটি বোম্বেটে, সেটি কিন্তু আসলে যাত্রী জাহাজ নয়। সাঁজোয়াপরা দুশো তিনশো লোক ছিল জাহাজে। তাদের হাতে ঢাল ছিল, তলোয়ার ছিল। কোনো একটা ফন্দী তাদের মনে ছিল না কে বলবে? তাদের মাঝ থেকে কালীভূষণ উধাও হলেন।"

ক্ষিতিভূষণ রাগে গর গর করে' বললে, "এ আমাদের জানা কথা। আসল কথা বলো।"

"জাহাজে একটি মেয়েকে দেখা গেল, সকলের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছিলেন তিনি। তাকে সাঁজোয়া পরা লোকগুলো 'মা' বলে ডাকচিল। রাজ্যের রাজকন্যারা শেষ পর্য্যন্ত না লড়ে বোম্বেটের হাতে ধরা দেন না। প্রাণের চেয়ে লজ্জা বড়। বোম্বেটের হাতে ধরা দেওয়ার লজ্জা থেকে তাঁরা বাঁচতে চান। কেউ ডুবে মরেন, কেউ বিষ খান, আগুণে ঝাঁপ দেন, বুকে তলোয়ার বিঁধে কেউ বা খুন হন। কিন্তু ইনি শেষ পর্য্যন্ত লড়লেন না। সাঙ্গপাঙ্গ ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়ে যেচে ধরা দিলেন বোম্বেটের হাতে। কেন? তিনি ভীরু নন, বোকা নন। জাহাজে তাকে কাল রাতে যে দেখেচে সেই এ কথা বলবে। তবু তিনি কেন ধরা দিলেন? একটা ফন্দি আছে মানতেই হবে। বড়কর্ত্তাকে সরিয়েই তাঁর কাজ ফুরোয় নি।"

একটু থেমে সুলন্দ বললে, "গল্পটা এখানে একটু জটিল হবে। মন দিয়ে শুনো ছোটো কর্ত্তা। সেই মেয়েটি শুধু যে ধরা দিলেন তা নয়, একসময় বললেন, বড়কর্ত্তাকে তিনি একখানা নৌকো চেপে বার হতে দেখেচেন। বড়কর্ত্তা কি তাহলে চাঁদনীরাতে মাঝদরিয়ায় হাওয়া খেতে বার হলেন? বড়কর্ত্তা পাগল নন। কিন্তু বড়কর্ত্তা তাহলে গেলেন কোথায়? স্বীকার করতেই হবে বড়কর্ত্তাকে বন্দী করা হয়েছে। বড়কর্ত্তাকে কাল রাতে কে আর বন্দী করবে—জাহাজে সাঁজোয়া পরা লোকেরা নিশ্চয়ই। কিন্তু কার হুকুমে? নিশ্চয়ই এই মেয়ে-সর্দ্দারটির হুকুমে। যিনি সর্দ্দার তার হুকুম ছাড়া এতবড় একটা ব্যাপার হবে—অসম্ভব। তাছাড়া, ইনি যখন বড়কর্ত্তার খবর দিচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই এর হুকুমে এর সামনেই বড়কর্ত্তাকে বন্দী করা হয়েচে।"

"পাগল !" ক্ষিতিভূষণ একটু হেসে মাথা নেড়ে বললে, "তাহলে নিজের মুখে সে কথা খুলে আমাকে বলবে কেন ? চেপে গেলেই পারতো !"

হুঁকো থেকে মুখ তুলে কাশতে কাশতে পুলন্দ বললে, "নিজের মুখে কেন বড়কর্ত্তার খবর দিলে ? তবে শোনো ছোটো কর্ত্তা। পাঞ্জা জিনিসটা যেখানে দেখবে সেখানে বুঝবে কোনো চক্রান্ত চলেছে, কোনো অদ্ভুত মতলবে এক দল লোক ফিরচে। গোপন আর জটিল ব্যাপার ছাড়া পাঞ্জার দরকার নেই। যে জটিল কাজ হাঁসিল করতে মেয়েটি বার হয়েছে, এমন হতে পারে তাতে তার ঠিক সায় নেই ! হয়তো আগে কথা দিয়েছিল বলেই তাকে কাজটা করতে হয়েচে ! তাই কাজটা শেষ করেই ব্যাপার ফাঁস করে দিতে তার আপত্তি নেই।"

"কিন্তু সে তো সব কথা খুলে বলছে না। কারা দাদাকে নিয়ে কোথায় উধাও হ'ল, কেন উধাও হ'ল—সে কথা তো সে বলচে না !" ক্ষিতিভূষণ বললে।

"হয়তো সবটা খুলে বলতে সে চায়ও না। তাতে সব কাজ পণ্ড হ'তে পারে। তা ছাড়া দলকে সে ঠিক ফাঁসাতে চায় না। কিন্তু তবু, তার হয় তো মনে হচ্ছে কাজটা উচিত হচ্ছে না। হয়তো তোমাকে দেখে তার একটু দুঃখ হচ্ছে। তাই, দুটো একটা কথা বলচে। মেয়েটির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারো তো দেখবে এমনি করে দুটি একটি কথা আরো আদায় করতে পারবে। মেয়েরা চালাক হতে পারে, বুদ্ধিমতী হতে পারে। কিন্তু মন তাদের নরম। দয়ায় তাদের বুদ্ধি ঢাকা পড়ে !" সুলন্দ বললে। ক্ষিতিভূষণের কাছে ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা উপন্যাস বলে ঠেকল। কিন্তু তার মনে হ'ল এই উপন্যাসের প্রতিটি অক্ষর হয়তো সত্যি। সুলন্দের গল্পটা বিশ্বাস করতে পারলে কালীভূষণের উধাও হবার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। নইলে বোম্বেটে কালীভূষণ মাঝ দরিয়ায় চাঁদনী রাতে কি স্বপ্নের মত গেল মিলিয়ে ? কিন্তু, কালীভূষণকে ধরে নিয়ে যাওয়ার মানেটা কী ? পৃথিবীতে কালীভূষণকে দিয়ে কার কী দরকার ?

হয়তো ক্ষিতিভূষণের মনের কথাটা টের পেয়েই পুলন্দ বললে, "কর্ত্তা, একটা ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার। এই মানুষ চুরী ব্যাপারটা কোনো একটা গুপ্ত দলের কাজ। বড় কর্ত্তাকে দিয়ে তাদের জরুরী দরকার। আমার মনে হয় সবুর করার সময় নেই বলেই তারা মাঝ দরিয়ায় হানা দিয়ে বড় কর্ত্তাকে চুরী করে নিয়ে গেছে ! আমরা ভাবছিলাম যাত্রী জাহাজ লুট করলাম আমরা, কিন্তু সেই ফাঁকে আমাদের সেরা মাল লুঠ হয়ে গেল।"

ক্ষিতিভূষণ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সুলন্দ বললে, "কোথায় যাও কর্ত্তা।" ক্ষিতিভূষণ ভীষণ স্বরে বললে, "কথা আদায় করতে হবে।"

"গায়ের জোরে কথা আদায় হবে না কর্ত্তা। ও মেয়ে সহজ পাত্তর নয়। দেখো, মরবে তবু কথা বলবে না। কৌশলে কাজ হাঁসিল করতে হবে !" পুলন্দ বললে।

"কৌশলটা কী, খুলে বলো।" ক্ষিতিভূষণ বললে।

"এই পাঞ্জা দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে হবে।" পুলন্দ বললে।

"বুঝেচি, পাঞ্জার বদলে দাদার খবর জেনে নিতে হবে।" ক্ষিতিভূষণ বললে।

"আঃ, তা নয়। অনেক রাজ্যে অনেক দলে পাঞ্জা হারানোর শাস্তিটা কঠোর বটে। পাঞ্জা ফিরিয়ে দিতে না পারলে প্রাণ পর্য্যন্ত চলে যায়। কিন্তু এ সহজ মেয়ে নয়, মরতে ভয় পাবে না।" স্থলন্দ বললে।

"তা হলে পাঞ্জাটা দিয়ে করা যাবে কী?" ক্ষিতিভূষণ বললে।

"আসল কাজ হাসিল করা যাবে। মেয়েটির কাছে যদি কোনো কাগজপত্তর থাকে, হাত করতে হবে। তাতে দলের খোঁজ পাওয়া যাবে। মেয়েটির সম্বন্ধেও কিছু খবর জেনে নিতে হবে। পরে কাউকে এই মেয়েটির ছদ্মবেশ ধরে সেই দলে হানা দিতে হবে। পাঞ্জা হাতে থাকলে বড় কর্ত্তাকে খুঁজে পেতে তা হলে আর কোন মুস্কিল হবে না।" স্থলন্দ বললে।

ক্ষিতিভূষণ কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, "তোমার গাঁজাখুরী ফন্দি তোলা থাক। মেয়েটির কাগজ পত্তর নয় চুরী করা যাবে। কিন্তু মেয়ে সাজবে কে? গোঁপ দাড়ি কামিয়ে পুরুষের কি আর মেয়ে সাজা চলে!" "পুরুষ মেয়ে সাজতে পারে না বলচ? পৃথিবীর কী আর তুমি জানলে তবে? আচ্ছা একটু সবুর করো।" স্থলন্দ বললে। "আচ্ছা আমি একটু আসি।" বলে স্থলন্দ বার হয়ে গেল। পুলন্দ ফিক্ ফিক্ হাসতে লাগল। খানিক বাদে জাহাজকোঠার কবাটে আস্তে টোকা দিয়ে মিষ্টি মেয়েলী গলায় কে বললে "আসতে পারি?"

ক্ষিতিভূষণ, লছীন্দর এ ওর দিকে চেয়ে রইল। এ যে সেই বন্দী মেয়েটির গলা। কবাটে কান পেতে সব কথা শুনে ফেলেনি তো! তাহলে তো সর্ব্বনাশ! মণির পাঞ্জাটা লুকিয়ে নিয়ে ক্ষিতিভূষণ তবু বললে, "এসো।" সেই মেয়েটি ভিতরে এলো। দিনের আলোয় তাকে দেখে ক্ষিতিভূষণের চোখে পলক পড়ল না। মেয়েটি একটু ক্লান্ত স্বরে বললে, "আমি আর পারি না ক্ষিতিভূষণ। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও। তার বদলে তোমার দাদার খোঁজ দিচ্ছি।"

লাফ দিয়ে উঠে ক্ষিতিভূষণ মেয়েটির হাত ধরে বললে, "দাদার খোঁজ দাও। তুমি যা চাও তাই হবে।"

"তার চেয়ে নয় আমাকে তোমাদের দলের সর্দ্দারণী করো। তাহলেই খোঁজটা দিতে পারি।"

"তা দাদা ফিরে এলে আমি তাকে ঠিক রাজী করাবো। তুমি এখন খোঁজটা দাও।" ক্ষিতিভূষণ বললে।

"তাহলে দাদা ফিরে এসে মতটা দিলেই খোঁজ দিতে পারি," বলে মেয়েটি পুলন্দের পাশে বসে পড়ে বললে, "ভাইরে, হুঁকোটা দে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যায় যে।"

ক্ষিতিভূষণ লছীন্দর অবাক হয়ে বললে, "স্থলন্দ!"

স্থলন্দ বললে, "চোপ্, স্থলন্দ নয়, রাজকন্যা। এখন বিশ্বাস হল কর্ত্তা? সাধে কি আর গোঁপ দাড়ী কামিয়ে মাকুন্দ সেজে থাকি। ছেলেবেলায় পালাগানে সুভদ্রা সেজে হাতে খড়ি।"

পুলন্দ বললে, "তাহলে স্থলন্দের বুদ্ধিটাই বহাল রইল। মেয়েটির কাছ থেকে চুরী করে তার দলের ঠিকানা জেনে নিতে হবে। দলের আদব কায়দা জানতে হবে। মেয়েটির চালচলন পরিচয়ও জানতে হবে।

নইলে দলে গিয়ে বোকা সেজে ধরা পড়তে না হয়। পাঞ্জা যার হাতে থাকে তার কাছ থেকে কোনো খবর লুকনো নয়। বড়কর্ত্তার খবরটাও আর লুকনো থাকবে না।"

ক্ষিতিভূষণ বললে, "তা হলে একটু ঝট্‌পট্‌ কাজে নামা দরকার।" সুলন্দ বললে "আজ রাত্তেই একবার কবাটে আড়ি পাতবো। অনেক সময় মানুষ ঘুমে কথা কয়, একা একা আপনমনে কথা কয়। মেয়েটির যদি সে অভ্যাস থাকে তবেই রক্ষে। নইলে কাগজ পত্তর ঘেঁটে কতটা আর জানা যাবে! তা ছাড়া কাগজ পত্তর কিছু আছে কিনা কে জানে।" সকলে একটু চিন্তিত হল, সুলন্দ খানিকক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে থেকে বললে, "যাহোক, ভেবো না, কাজ হাসিল করবই। তবে দেখো, এই পাঞ্জাটা লুকিয়ে রেখো। মেয়েটি যখনই টের পাবে জিনিষটা খোয়া গেছে তখনই কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে খুঁজে ফিরবে। খবর্দ্দার, ঘুণাক্ষরে যেন না রটে পাঞ্জার কথা। আমাদের হাতে এটা এসেচে খবর পেলে মেয়েটা যে করে হোক দলে খবর পাঠাবে যে পাঞ্জা শত্রুর হাতে পড়েছে। পাঞ্জার অর্থ তখন দাঁড়াবে উল্টো।" তক্তপোষ ছেড়ে উঠে তর্জ্জনী উঁচিয়ে সুলন্দ বললে, "খুব সাবধান কিন্তু। ভেবোনা মাঝ দরিয়ায় বসে মেয়েটি দলের কাছে পাঞ্জার খবর পাঠাবে কী করে? বুদ্ধিতে সব হয়। তা যাহোক, আমি এখন চললুম। তোমরা খেয়ে দেয়ে ঘুমোও। আর ছাখো, জাহাজটাকে আর কেন সামনে ছুটিয়ে মেরে হায়রাণ করছ? মেয়েটিকে দেখে তো লঙ্কার খাস বাসিন্দা বলেই বোধ হচ্ছে। তাহলে এদের দলটারও আড্ডা লঙ্কাতে কিম্বা আশেপাশে কোথাও হবে। জাহাজটার মুখ লঙ্কার দিকে ফিরিয়ে নেওয়া ভালো। কী বলো পুলন্দ?"

পুলন্দ শেয়ালের মত হেসে বললে, "ঠিক, ঠিক।"

(ক্রমশঃ)

ভনিতিকা

উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্র রবিবার ১৬ই জানুয়ারী বেলা দশটায় পরলোকে গেছেন। যাঁদের লেখা শুধু দেশের অনেকের কাছে নয়, দেশ বিদেশের অনেকের কাছে নাম কিনেছে—উপন্যাস সম্রাট শরৎচন্দ্র তাঁদের ক'জনের একজন। একদিন চুপি চুপি কলম হাতে বসেছিলেন তিনি উপন্যাস লিখতে, নিজেই হয়তো বোঝেননি কী আশ্চর্য্য লেখা লিখতে যাচ্ছেন তিনি! কিন্তু তারপর এলো উন্যাসের পর উপন্যাস। মন ভোলানো মনগড়া কাহিনী নয়, সত্যিকারের মানুষের সুখ দুঃখের অপরূপ ইতিহাস।

আমরা এবং আমাদের আগে যাঁরা পড়ুয়ার দলে ভিড়েছিলেন, কেউ ভাবেননি এত সব নিখুঁত সত্যি কথা কারো লেখা হতে পারে। যখন লুকিয়ে লুকিয়ে শ্রীকান্ত পড়েছি, তখন মাঝে মাঝে বইয়ের পাতা মুড়ে রেখে চোখের সামনে স্বপ্ন দেখেছি, অন্ধকার রাতের স্বপ্ন, বেপরোয়া দস্যু ছেলে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বর্ষার ধারালো জল ঠেলে মাছ চুরী করতে যাওয়ার স্বপ্ন। যতটা সত্যি কথা তিনি লিখে গেছেন, ঠিক ততটা গভীর কথাও তিনি সত্যি কথার সঙ্গে জড়িয়ে বলে গেছেন। সেইজন্যে তিনি আর আড়ালে রইলেন না। তাঁকে দেশ চিনলো। বিদেশও চিনলো। দেশে যখন তাঁকে উপন্যাস সম্রাট বলা হ'ল, বিদেশের মনীষিরা তখন তাঁর লেখার অনুবাদ পড়ে তাঁকে নিজেদের দলে টেনে নিলেন।

যে বাতি আলো দেয়, একদিন তা নিভবেই। শরৎচন্দ্রও নিভে গেলেন। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে থেকে নিভে গিয়ে অনন্তকালের আকাশে তিনি একটি তারার মত ফুটে উঠলেন। সেখানে থেকে যুগে যুগে তিনি তাঁর আপন-নমস্কারটি ফিরে পাবেন।

আগামী মাসে রংমশালের পাতায় শরৎচন্দ্রের জীবন কাহিনী ছাপা হ'বে।

কলকাতায়, শুধু কলকাতায় কেন—এটা একটা সমগ্র ভারতের জিনিষ। আমরা ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনের কথাই বলচি। এবারকার অধিবেশনের বিশেষত্ব হচ্চে এই যে ব্রিটিস সায়েন্স এসোসিয়েসন ও ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস একত্রে মিলিত হয়ে

বিজ্ঞানের নানা নূতন ও পুরানো দিক আলোচনা করেচেন। এই সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেন থেকে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এসে যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া, আমেরিকা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি থেকেও কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এসে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এঁদের সকলকে দেখার ও তাঁদের বাণী শোনার সৌভাগ্য আমাদের প্রথম ও চিরদিন মনে করবার মত। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার জেম্‌স্ জীনস্ এই মিলিত ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান সভার মূল সভাপতি হয়েছিলেন।

স্যার জেমস্ জীনস এর নাম অবশ্য তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। জ্যোর্তিবিজ্ঞানে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিকা সম্বন্ধে তিনি যা আবিষ্কার করেছেন ও লিখেছেন তা বিস্ময়কর ; তিনি দার্শনিকও বটে ; তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের নক্ষত্র খচিত নীল আকাশ তাঁর খুব ভাল লেগেচে, শুধু তাই নয় ভারতের মাটি, বনজঙ্গল পাহাড়, তার লোক-জনদের তিনি ভালবেসেচেন। তিনি বলেচেন, তাঁর দেশের (ইংলণ্ড) আকাশ এমন সুনীল নয় ; এত অগুনতি তারা, নক্ষত্র আর কোথায় এমন দেখতে পাওয়া যায় না ! আরো যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—প্রঃ ডারউইন, ডঃ এসটন, প্রঃ বার্কার, প্রঃ বসওয়েল, প্রঃ ক্রুউ, প্রঃ ব্যারণ আইকষ্টেট, প্রঃ ফিসার, প্রঃ ফ্লিউর, প্রঃ রাগল্‌স্ গেট, স্যার আরথার হীল, প্রঃ ইউং, প্রঃ পীক, ডঃ ডাড্‌লে ষ্ট্যাম্প, প্রঃ টমাস, প্রঃ মরিস, স্যার হবডে ও আরো প্রায় পঞ্চাশজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। এর মধ্যে অনেকেই F. R. S. বা নোবেল প্রাইজ পেয়েচেন। এঁরা সকলেই অগাধ পাণ্ডিত্যে, ব্যবহারে, মিষ্ট কথাবার্ত্তায় আমাদের মুগ্ধ করেচেন। ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ এঁদের কাছ থেকে অনেক শেখবার জিনিষ পেয়েচেন। এই অধিবেশনের সবচেয়ে বড় ফল হয়েচে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সুন্দর মিলন। এখানে কোন জাতিভেদ নেই, রাজনৈতিক মতভেদ নেই, সকলেই বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধানে একত্র হয়েছেন।

বিদেশের মত আমাদের দেশেও আজকাল ছেলেমেয়েদের সভাসমিতি, মিলন মজলিস সুন্দর ভাবে দেখা দিয়েচে। একত্রে খেলাধূলা, গানবাজনা, নাচ, সভাসমিতি করা ছেলে-মেয়েদের খুব ভাল লাগবারই কথা, এতে অনেক শিক্ষাও হয়। দিল্লী, বম্বে, লাহোর থেকে ছেলেমেয়েদের নানা উৎসবের কথা আমরা শুনতে পাই। কলকাতাতেও মাঝে মাঝে ছেলে-মেয়েদের নানা জায়গায় মিলন-উৎসব হয়ে থাকে। কিন্তু আরো ভালভাবে, আরো বেশী বেশী হওয়া দরকার। রাশিয়া সুইডেন ও জার্ম্মানীতে ছোট ছেলেদের নানারকম মিলনের বন্দোবস্ত

আছে। সেখানকার ছেলেমেয়েরা শুধু স্কুলঘরে লেখাপড়ার জন্যই মেলে না, তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিম্‌নাসিয়াম আছে, ছেলেমেয়েদের থিয়েটার আছে, তাদের নিজেদের চালান কাগজ-পত্র আছে, এমন কি নানা বিষয়ে নিয়মিত বই আলোচনা করার উপযুক্ত তাদের নানা সভাসমিতি, ঘরবাড়ী আছে। তাদের সবচেয়ে মজার জিনিষ হচ্চে কিন্তু দল বেঁধে সহরের বা গ্রামের বাইরে বেড়াতে যাওয়া যা ওদের দেশে hiking বলে। আমাদের দেশে কোন কোন স্কুল কলেজে এ রকম বন্দোবস্ত আছে—কিন্তু আরো হওয়া দরকার ; আর শুধু স্কুল, কলেজ কেন ? বাইরেও নানা সমিতি গঠন করা উচিৎ যাতে ছেলেমেয়েরা পাঁচ জায়গায় ঘুরে শিক্ষা ও আনন্দ একসঙ্গে পেতে পারে। এ দেশের ছেলেমেয়েরাও এবিষয় খুব তৎপর হবে, বড়দের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবে, এ আশা আমরা করচি।

চীন জাপান যুদ্ধের কথা তোমরা শুনেচ, কাগজপত্রে পড়চও। আর এতো শুধু চীন-জাপানের যুদ্ধই নয়—এতে ইউরোপীয় দেশগুলিরও অনেক স্বার্থ আছে আর সেজন্যই চীনজাপান যুদ্ধ এরূপ ভাবে বেড়ে চলেচে কিনা কে জানে! যদি যুদ্ধ হবেই, হচ্চেও—চীন জাপানে একটা নিস্পত্তি হয়ে যাওয়াই ভাল ও সেটা নিজেদের মধ্যেই। যুদ্ধ জিনিষটা ভাল কিন্তু মন্দ তা আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু এটা আমরা জানি গৌতম বুদ্ধের দেশ চীন-জাপান তার আদর্শকে ক্ষুন্ন করেচে—তাঁর অহিংসা বাণীর অবমাননা করেচে। প্রাচ্যে বোধহয় একমাত্র আমাদের দেশই আজও মহাবুদ্ধের বাণী ও সত্যাগ্রহের আদর্শ এত বিপদেও রক্ষা করে চলেচে। চীন জাপানের এই যুদ্ধ ভারতের পক্ষেও দুর্দ্দিন, কেননা, ভারত, চীন, জাপান একই মহাপুরুষের কাছে দীক্ষা পেয়েচে। আজ পশ্চিমাকাশও ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। কথাবার্ত্তায় ও আলোচনা ব্যবহারে 'যুদ্ধং দেহি' এই ভাবটা যেন প্রকাশ পেয়ে আছে। হয়ত কোন মহাসমরের সূচনা হচ্চে। এই মহাসমরে আমরা থাকব মূক নিস্তব্ধ দ্রষ্টার মত। যুদ্ধ বিষয়ে আমরা কোন শিক্ষা পাইনি। পীড়িত শান্তিপ্রিয় জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত বর্ব্বরতা বোধহয় নেই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করা বোধকরি ভাল। অন্ততঃ নিজেদের মান ও প্রাণ বাঁচাবার জন্য যতটুকু দরকার। কিন্তু হিংসা আমাদের লক্ষ্য নয় ; আমাদের চিরদিনের বড় আদর্শ বুদ্ধদেব ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ বাণী। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালের যুদ্ধের আদর্শ বুদ্ধদেব ও গান্ধীর বাণীর ওপর গড়ে ওঠেনি।

হরিদ্বারে এবার বিরাট কুম্ভ মেলা বসচে। কুম্ভ মেলা হয় মাঝে মাঝে বটে কিন্তু পূর্ণ কুম্ভ বারো বছরে একবার আসে। বারো বছর বড় কম সময় নয় তো! এ বছর যাঁরা এ বিষয় একটুও উৎসাহ বোধ করচেন তাঁদের কৌতূহল নিষ্পত্তি করে ফেলাই ভাল। ভারতবর্ষের নানা মেলা আছে কিন্তু কুম্ভমেলার সঙ্গে আর কোন মেলার তুলনা চলে না। অনেক দূর থেকে, বন জঙ্গল গুহা গহ্বর থেকে একটি বারের জন্য উদাসী সন্ন্যাসীর দল নেমে আসেন মানুষের মাঝে। সেই সঙ্গে পুণ্য লোভীর দল সেখানে যেয়ে ভীড় জমান। মেলাটি দেখতে হয় আশ্চর্য্য—নানা দেশের নানা লোক নানান রঙে এ মেলাটিকে মনোহর করে তোলে। আর শুধু উদাসী সন্ন্যাসী বা পুণ্যকামী লোকেদেরই এখানে দেখা যায় না—যারা নিছক ভ্রমণবিলাসী—নানা দেশের নানা অদ্ভুত মানুষ, তাদের আচার ব্যবহার দেখতে ভালবাসেন তারাও দলবলে এই সুযোগে মেলাটিতে যোগ দিতে পারেন। তোমরা হয়ত শুনে থাকবে ই, আই, আর এই সম্পর্কে হরিদ্বার পর্য্যন্ত সব শ্রেণীর যাতায়াতের ভাড়া বিশেষ কমিয়ে দিয়েচেন।





টিকিট ঘর

[পোষ্টবক্স]

আজ বিভিন্ন দেশের নানা রকমের ডাক-টিকিট সম্বন্ধে কিছু বল্‌বো।

তোমরা বোধহয় অনেকেই জানো যে সারা পৃথিবীর মধ্যে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ আর ইটালী থেকে প্রতি মাসে সব চেয়ে বেশী আর অনেক রকমের সুন্দর সুন্দর টিকিট বেরোয়।

এবারে ইটালীর ডাক-টিকিট সম্বন্ধে দু'এক কথা শোনো।—বছর কয়েক আগে পর্য্যন্ত ওখানকার টিকিটে থাকতো শুধু রাজার ছবি। অবশ্য অন্য কোন বিষয়ের ছবি যে একেবারেই থাক্‌তো না তা নয়; কিন্তু সে-সব ষ্ট্যাম্প-ছবি জাতীয় ভাব বিকশিত করতে বিশেষ সাহায্য করতো না। ১৯১০ সালে শুধু গ্যারিবল্ডির নামে কতকগুলো ষ্ট্যাম্প বেরিয়েছিলো (গ্যারিবল্ডির নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো; তিনি ছিলেন ইটালীর একজন স্বনামধন্য দেশনায়ক)। কিন্তু রাজা তাতে হুকুম দিয়েছিলেন যে ষ্ট্যাম্পগুলো বাইরে বেরুতে পারবে না, শুধু দেশের ভিতরেই যেন তাদের ব্যবহার করা হয়।

মুসোলিনী ঠিক করলেন দেশের সমস্ত লোক যাতে দেশের কথা জান্‌তে পারে, ভাবতে পারে, সেই রকমের সব ষ্ট্যাম্প বার করতে হবে। এই ভেবে তিনি সতেরোখানা ডাক-টিকিট বার করলেন। সেই ষ্ট্যাম্পগুলোতে এমন ভাবে পরের পর ইটালীর নানা সময়কার প্রসিদ্ধ দেশ-নায়কের ছবি, ঐতিহাসিক স্থানের বিশেষত্বের ছবি, বিশেষ বিশেষ ঘটনার ছবি, বেরিয়েছে যে সেই সব টিকিটগুলোর সাহায্যে লোকের ইটালীর মোটামুটি ইতিহাস জানতে কোন অসুবিধে হয় না। তা' ছাড়া এই সব টিকিটের দৃশ্যগত ও আকারগত বৈশিষ্ট্যও আছে। এগুলো নানান রঙের আর সাধারণতঃ যে-মাপের টিকিট তোমরা দেখ্‌তে পাও, লম্বায় এরা তাদের চেয়ে বড়ো! আশাকরি তোমাদের অনেকেই ইটালীর এই চমৎকার টিকিটগুলো এ্যাল্‌বামে ভর্ত্তি করেছো। এই সব টিকিটের আরো একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য আছে; প্রত্যেকটি ষ্ট্যাম্প-এর তলায় মুসোলিনীর ভালো ভালো বক্তৃতা থেকে নেওয়া এক একটি সুন্দর সুন্দর কথা আছে।

কিছুদিন আগে গোটাকতক নতুন ধরনের টিকিট দু'একটি দেশে বেরিয়েছে। এই ষ্ট্যাম্পগুলোতে আছে বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা নামকরা ক'খানা ছবির প্রতিলিপি। এর মধ্যে একখানা হচ্ছে বিখ্যাত স্প্যানীস্ চিত্রকর Gisbert এর আঁকা কলম্বসের আমেরিকা আবিস্কার যাত্রার ছবি। এ ছবিখানি চমৎকার। এতে আছে—কলম্বসের জাহাজ যাত্রা সুরু ক'রেছে (তিনি বেরিয়েছিলেন ১৪৯২ সালের ২রা আগষ্ট্ তারিখে), তীরে দাঁড়িয়ে যাত্রার শুভ-কামনায় পাদ্রী প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করছেন আর কলম্বস জাহাজের উপরে মাথা হেঁট ক'রে আশীর্ব্বাদ গ্রহন করার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।

আর একখানা ছবি হচ্ছে প্রসিদ্ধ বেলজিয়ান শিল্পী Dyekmans এর আঁকা অন্ধ ভিক্ষুকের ছবি। এই ছবিখানি যে কত সুন্দর তা যারা এ ছবি না দেখেছো তারা ভাবতেই পারবে না। বৃদ্ধ অন্ধ ভিক্ষুকের মুখভাবে যে গভীর বেদনার প্রচ্ছন্ন আভাস রয়েছে আমি লিখে তা' কেমন ক'রে প্রকাশ করবো। তোমাদের মধ্যে যাদের সংগ্রহে এই টিকিট-খানি নেই, তারা এখানি জোগাড় করবার চেষ্টা ক'রো। এই ষ্ট্যাম্পটির নাম হচ্ছে Stamp of Charity অর্থাৎ এই ষ্ট্যাম্প্ বিক্রীর সমস্ত টাকা গরীবদের দান করা হয়। আজকাল এই ধরণের দানের টিকিট ইউরোপের আরো অনেক দেশে বেরুচ্ছে।

আর একখানি ডাকটিকিটের ছবির নাম হচ্ছে Mother's Stamp। এখানি হচ্ছে আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিল্পী Whistler এর আঁকা তাঁরই মায়ের ছবি। আমেরিকা এই ছবি বের করেছে দেশের সমস্ত মায়েদের প্রতি সম্মান প্রকাশ করবার জন্যে। (তোমরা জানো, আমেরিকায় প্রতি বছর Mother's Day নামে একটি উৎসব হয়।)

প্রায় মাসতিনেক আগে ডাকটিকিটের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে 'ডানজিগ'এ। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে 'ডানজিগ' থেকে দু'টি ষ্ট্যাম্প্ বেরিয়েছে। এই দু'খানি ষ্ট্যাম্প্ই পঞ্চাশ ফেনিগ দামের। এর মধ্যে একখানি হচ্ছে সাধারন ষ্ট্যাম্প্, আর একখানি এয়ারমেল ষ্ট্যাম্প্।

কয়েকমাস আগে রুমানিয়া থেকে চারখানি ষ্ট্যাম্প্ বেরিয়েছে ওখানকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জোয়ান ক্রিয়েঙ্গার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। (ক্রিয়েঙ্গারের জন্ম হয় ১৮৩৭ খৃঃ আর মৃত্যু হয় ১৮৯৯ খৃঃ)। এই চারখানি ষ্ট্যাম্পের মধ্যে দুখানিতে আছে তাঁর জন্মস্থানের ছবি আর দু'খানিতে আছে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি। প্রথম দু'খানির দাম হচ্ছে ২ ও ৩ 'লি' আর শেষের দু'খানির দাম হচ্ছে ৪ ও ৬ 'লি'।

পরের বারে আরো গোটাকতক খুচরো খবর দেবার ইচ্ছে রইলো।



পরিচালিকা—**দিদিভাই**

আমার প্রিয় মিষ্টি ভাই বোনেরা!

এবার তোমাদের কাছে থেকে আমি অনেক চিঠি-পত্র পেয়েছি। আমার কিন্তু তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ হচ্ছে। কেন জানো? এতগুলি ভাই বোন পেয়েছি বলে।

তোমরা কেউ জন্ম তারিখ দাওনি। এবার দেবে কেমন? বয়স, ছবি, কোন ক্লাসে পড়, গ্রাহক-গ্রাহিকা কিনা সব জানিও।

এবার তোমাদের চিঠির দপ্তর খুলি—

কল্পনা ও অঞ্জলী আচার্য্য, নাগপুর।

"প্রিয় দিদিভাই! তোমার লেখার ভিতর কি যাদু আছে বলতে পারো?...পৌষের রংমশালে তোমার পরিচয় পেলাম সে পরিচয় বাইরের নয় অন্তরের।...তুমি আমাদের পরস্পরের পরিচয় আদান প্রদানের সুবিধা দিয়েছ—এইটারই ছিলো একান্ত অভাব। আমরা সকলেই কে কোথায় ছড়িয়ে আছি, হয়তো কোন দূর দেশে সঙ্গীহারা হয়ে আমাদেরই ভাই বোন পড়ে আছে। সকলকে এক সূত্রে বেঁধে, পরস্পরকে আপনার করে নিয়ে মনকে উন্নত ও বৃহত্তর করবার ভার তুমি নিয়েছ!.........তোমার বাইরের পরিচয় কি আমাদের দেবে না?.....তুমি আমাদের সার্ব্বজনীন দিদিভাই।......বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে থাকলে সত্যিই মন বড় খারাপ লাগে, আমাদেরও লাগতো, কিন্তু এখন আর লাগবে না। বাঙ্গালী ভাই বোনের সঙ্গে আলাপ তো কর্ত্তে পারবো।.....তোমার কাছে যা জানতে চেয়েছি তা না জানতে পারলে আমাদের পরিচয় তোমাকে ভাল করে জানতে দেবোনা......সশ্রদ্ধ ভালবাসা নিও।"

শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশ (তলিনীপাড়া)

"দিদিভাই আমার, রংমশাল থেকে তোমার পরিচয় পেয়ে যে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল—সে কথা কী বলবো।......তোমায় তুমি বলছি বলে রাগ করবে না তো ?... মা, দিদিমারা বলেন যে আমার নাকি একটী দিদি ছিল। কিন্তু দিদিকে আমি এক দিনের জন্য চোখে দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন—সে আকাশের একটী ছোট্ট তারা হ'য়ে আছে। তাই আমি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা বেলা সেই তারাটীকে দেখি মিট মিট করে জ্বলে, মনে হয় হাতছানি দিয়ে ডাকে—এই কি আমার দিদি ? দিদিভাই ! তুমি আমার দিদির আসন নিও।

আমি কোন কোন খেলা খেলতে ভালবাসি জানো ? ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিটন, পিং পং ক্যারাম বোর্ড, এইগুলো আমার খুব ভাল লাগে—তারপর স্পোর্টসের মধ্যে সব জিনিসই ভাল লাগে। স্কুল থেকে ফিরে এসে বন্ধুদের সাথে রোজ খেলতে যাই। এখন আমরা 'হকি' খেলি। আসছে মার্চ্চে ১৯৩৮ ম্যাট্রিক দেবো। আমি রংমশালের নিয়মিত পাঠক, রংমশালকে আমরা খুব ভালবাসি। তুমি আমায় 'লেখনী বন্ধু' করে দিও। আমার হবি ডাকটিকিট জমান, য়্যাডভেঞ্চার ও ডিটেকটিভ বই পড়া, কোন কিছু অদ্ভুত জিনিস পেলে যত্ন করে রাখা, খবরের কাগজের অদ্ভুত, আশ্চর্য্যজনক দরকারী বিষয়ের কাটিংস রাখা, ফ্রি ক্যাটালগ আনান।......তুমি তোমার ভাই বোনদের কাছে পুরস্কার চেয়েছে—কিন্তু এর উত্তর পাটনার অরুণ ভাইটী দিয়েছে। আমি যদি এর উত্তর দি তবে ভাইটীর কথার প্রতিধ্বনি করা হবে মাত্র......প্রণাম নিও।"

শ্রীশিবপ্রসাদ সেন (নিউদিল্লী)

"দিদিভাই ! গত মাসের রংমশাল পেয়ে খুব সুখী হয়েছিলাম.....তখন মনে মনে একটা চিঠিও লিখে রেখেছিলাম ভেবেছিলাম সবার আগে আমার চিঠি যাবে কিন্তু সে সময় আমার পরীক্ষা......পরীক্ষা শেষ হয়েছে—ছুটী, পড়া-শোনা নেই, এখন ঘুরে বেড়ান ছাড়া আর কাজ কি ? এখানে এ সময়টা ভারী চমৎকার। শীতের দিন প্রায়ই মেঘলা থাকে। বাড়ীতে বসে থাকা যায় না—পাহাড়ে পাহাড়ে দল বেঁধে বেড়াই......আমাদের স্কুল পাহাড়েরই উপরে—নাম রাইসিনা বেঙ্গলী হাই স্কুল, আমি পড়ি ক্লাস VII এ—আমার বয়স ১৩ বছর। আমি সব চেয়ে পড়তে ভালবাসি য়্যাডভেঞ্চার ভ্রমণ কাহিণী, আবিষ্কারের কথা আর করুণ গল্প। দেশ বিদেশের Stamp জমাই, খবরের কাগজের কাটিংস রাখি, দেশলাই এর লেবল জমাই আর পাহাড় থেকে পাখীর বাসা বা পালক খুঁজে আনি, তবে আমার পাখী মারতে ভাল লাগে না ফুটবল, ক্রীকেট, হকি ৫।৬ বছরের সব বড় বড় খেলার ইতিহাস আমার কাছে আছে। হিমালয় অভিযান এবং অন্যান্য অভিযানের ছবি ও গল্প কাগজ থেকে রেখেছি।......রংমশাল নিয়ে দাদা তর্ক করতো—এবার প্রমাণ হয়ে গেল রংমশাল সব চেয়ে ভাল......অলকা বনের কাছে থেকে কয়লার খাদ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা হয়।"

শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ (এলাহাবাদ)

"দিদিভাই। আমি 'লেখনী বন্ধু' চাই। আমি ডাকটিকিট সংগ্রহ করি, এইটি আমার সব চেয়ে প্রিয় হবি—এ ছাড়া নানান দেশের টাকা পয়সা (coin) ক্যাডবেরিজ ও নেসলস চকোলেটের কুপন সংগ্রহ করি। আমার বয়স ১৪ বছর।"

শ্রীঅবনীকুমার বসু (আলিপুর, কলিকাতা)

প্রিয় দিদিভাই! আপনি কি আপনার ছোট ভাইটীকে ভুলে গেলেন?......আমার অনেক রকম হবি আছে, আমিও নেসলেস চকোলেটের ছবি, ডাকটিকিট, নানা দেশের কয়েন জমাই, খবরের কাগজের কাটিংস রাখি, সাইকেল চালাই আর ড্রাইভারের পাশে বসে গাড়ী চালান শেখার হাতেখড়ী দি। আমারও অনেক টিয়া, চন্দনা, বুলবুলি, শালিখ, লালমোহন প্রভৃতি অনেক পাখী ছিল এখন একটাও নেই........ ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলি।......আমায় 'লেখনী বন্ধু' করিয়ে দেবেন......প্রণাম জানবেন।"

শ্রীহৃষীকেশ দে (শ্রীহট্ট)

"প্রিয় দিদিভাই! নতুন লোকেদের সাথে প্রথম পরিচয় করাটা বোধ হয় সকলেরই একটু বাধে, অন্ততঃ আমার ত এই মনে হয়—কিন্তু ভেবে দেখলাম 'দিদিভাই' এর কাছে কিছু লিখতে বা আবদার জানাতে ছোট ভাই এর খুব বড় অধিকার......বাঙ্গালী ভাইদের সঙ্গে পরিচয় করতে ইচ্ছা হয়।......এবার ১২ বছর চলছে আমার, ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষা এখনও হয়নি আমার। একটা আজগুবি হবি আছে,......লেখকদের বই এর মলাটের ছবি-গুলো ব্লক করে যে বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয় ঐ গুলো পেলেই আমি কেটে রাখি।...প্রণাম নিও।"

শ্রীগৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা)

"দিদিভাই!......আমি নিশ্চিত জানি যে বন্ধু পাবই, কেননা তুমিই আমার হ'য়ে তার বন্দোবস্ত করে দেবে।......মা বলেন দিদিভাইকে চিঠি লিখি না কেন, কিন্তু তার একমাত্র কারণ বার্ষিক পরীক্ষা। যাহোক ভগবানের কৃপায় ও তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমি প্রথম হয়েছি......আমার বয়স তেরো আমি আগামী বৎসর (১৯৩৮) ক্লাস VIIIএর ছাত্র হবো। আমি রংমশালের প্রিয় গ্রাহক। আমার Hobby হচ্ছে ডাক টিকিট জমান, দেশলাই এর ছবি সংগ্রহ, ছবিযুক্ত পোষ্টকার্ড সংগ্রহ, বাগান করা, বই বাঁধান, সিগারেটের কুপন সংগ্রহ করা, ক্রস ওয়ার্ড পাজ্‌ল করাটা আমার খুব ভাল লাগে, আমার ফুটবল খেলতে খুব ভাল লাগে......পাঠ্য বিষয়ে সব চেয়ে ভাল লাগে বিজ্ঞান পড়তে, আর জীবনী পড়তেও খুব ভালবাসি......প্রণাম নিও।"

শ্রীঅরুণকুমার বসু (পাটনা)

"দিদিমণি ভাই!...তুমি যে আমার ডাকে রাগ করনি তা দেখে এত সুখী হলাম বলতে পারিনা.. ছোট ভাই এর রাগ অভিমান সব সইতে হবে।...অলকা বোনটী যদি খাদের বিষয়

কিছু জানায় তো খুব খুসী হবো। আমি কখনও খাদ দেখিনি।...সব ভাই বোনদের ভালবাসা জানাচ্ছি।"

অমল চক্রবর্ত্তী (Meerut)

"দিদিভাই আমার একটীও দিদি নেই—সবগুলি ভাই বোন আমার চেয়ে ছোট... আমি আপনির চেয়ে তুমি বলাটা ভালবাসি।...যদিও আমার নাম অমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তবে আমি সকলের কাছে 'করু' বলেই পরিচিত, পড়ি নবম শ্রেণীতে। বয়স ১৫—আমি ডাক-টিকিট ও চকোলেটের ছবি জমাতে খুব ভালবাসি।...আমায় লেখার খুব সখ...কি করে ভাল লেখা যায় বলতে পারো দিদি ভাই ?...প্রণাম নিও।"

আরতি চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)

আমি গ্রাহিকা নই...রংমশালের পাঠিকা বন্ধু. আমি ক্লাস IX এ পড়ি, রংমশাল আমার বন্ধু। ভাই বোনদের প্রীতি সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য বোনেরা !

তোমাদের চিঠি পেয়ে সত্যি খুসী হয়েছি। বাঙ্গালা দেশ ছেড়ে আছ বলে দুঃখ করেছ—কিন্তু তোমাদের আদরের রংমশাল সে অভাব রাখবে না। ভাই তোমাদের কথায় আমি রাগ করিনি ; তোমরা আমার কত আদরের ভাই বোন—তোমাদের উপর কি রাগ করতে পারি—কিন্তু কি পরিচয় দেবো ভাই ? আমি আমার এতগুলি ভাই বোনের দিদি-ভাই—এ ছাড়া তো আমার পরিচয় নেই। আমার ছবি রংমশালে ছাপাতে বলেছ কিন্তু আমার ফটো মোটে ওঠে না ভাই—হয় একেবারে সাদা নয় একেবারে কালো—সেইজন্য তোমাদের কথা আমি রাখতে পারলাম না—লক্ষ্মী দিদু রাগ করো না। তোমাদের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছি। আমার সব পরিচয় তো পেয়েছ—এবার আশা করি তোমরা নিজের সব কথা লিখবে।

পরের বারে আমার অন্য ভাইবোন যারা লিখেচে তাদের উত্তর দেবো। স্থানাভাবে এবার হয়ে উঠল না।

আমার সব ভাইবোনকে আমার আদর স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইতি—

শুভার্থিনি

তোমাদের

দিদিভাই

নান্দীমুখ

রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাই বোন,

জানলার বাইরে দিয়ে চাইতেই আজ মনে হ'ল শীত চলে' যাচ্ছে! পথের তু' ধারে শীর্ণ পাতাঝরা গাছগুলোয় যেন অনাগত পত্র-মঞ্জরীর শিহরণ! শীতের সেই রুক্ষ কাঠিন্য আজ যেন নরম হ'য়ে এসেছে এক অদেহী শিল্পীর মায়াপরশ পেয়ে।

ভারী অদ্ভুত লাগে এই সময়টা, নয় কি? যখন ছোট ছিলুম তোমাদেরই মত শীত-শেষের এই রকমই একটি দিনে হঠাৎ যেন কেমন সুন্দর লাগত সব কিছু, হঠাৎ-খুসীতে ভরে উঠত মন। তখন যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে সব জিনিষ বিচার করতুম না। তাই তখন এই হঠাৎ ভালোলাগার এই হঠাৎ খুসীতে টলোমলো মনের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করতুম না—কিংবা করলেও কৃতকার্য্য হতুম না। তার পর অনেক দিন, অনেক রাত্রির পর কেমন করে জানি না আজ আবিষ্কার করছি হঠাৎ যেন বড় হয়ে গিয়েছি! তাই শুধু বড় হওয়ার অধিকারেই ভাবতে বসলুম কেন বড় হলুম কে জানে! কোন উত্তর পাই না। তাই মনে হয় এ বিষয়ে বুঝি ভাবতে না বসাই ভালো; তা হলে এই হঠাৎ খুসীর ঝল্‌মলানি যাবে শুকিয়ে!

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের কোথায় যেন একটা সুন্দর যোগসূত্র আছে। তাই বুঝি প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বেজে ওঠে আমাদের শিশু মন! বর্ষা-সন্ধ্যায় তাই যেন মনটা কি রকম রূপকথার রাজ্যে পাখা মেল্‌তে চায়, শরৎ-কালের প্রথম থেকেই যেন মনে বেজে ওঠে কার বাঁশী!

সব চেয়ে অদ্ভুত লাগে এই সময়টা—শীত যখন চলে যাচ্ছে। আর, ফাল্গুন যখন আসেনি। প্রকৃতির ভেতর যে একটা বিপুল পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়ে যায় এই সময়ে তা' এতো স্পষ্টভাবে আমরা আর কখনও দেখতে পাই না। বনে বনে আজ সমস্ত গাছ-পালাগুলো অঞ্জলি ভরে তাদের শুকনো পাতার রাশি যেন কাকে মনে করে ঝরিয়ে দিচ্ছে; হরিণ শিশুর পায়ের তলায় বোধ হয় খড় খড় করে উঠছে সেই পাতাগুলো। পলাশ বনে আজ বিপুল আয়োজন, আর আমবাগানের একটা তু'টো গাছে এরই মধ্যে এসেছে তু'য়েকটি সুগন্ধী মুকুল!

আর শুধুই বা বনে কেন? আমাদের সহরে গাঁয়েও যেন সে খবর এসে পৌঁচেছে! বিদেশী গাছগুলোর অনাগত মঞ্জরীর শিহরণ; আর কৃষ্ণচূড়াতেও আসচে রক্তিম ফুলের বন্যা!

সময়ের ফাঁকে হয়তো অনাগত সুন্দরের কথা মনে আসাতেই খুসীতে আর গানে চঞ্চল হয়ে ওঠে আমাদের মন; আর তাই সে, প্রকৃতির এই বিপুল আয়োজনের মধ্যে, নিজেকেও বুঝি মিশিয়ে দিয়ে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে চায়।

—**তোমাদের সম্পাদক মশাই**

রং দেওয়া প্রতিযোগিতার ফলাফল

বড়দের মধ্যে প্রথম ঃ গীতা রায়, (বয়স ১৩), কলিকাতা

ছোটদের মধ্যে প্রথম ঃ ইলা সেন (বয়স ৮) অমৃতসহর (গ্রাহক নং ৯৩৩)

এঁদের রং-দেওয়া বিশেষ প্রশংসাজনক হয়েছেঃ—অজয় শঙ্কর ভাদুড়ী, হাওড়া; কল্যাণ কুমার মজুমদার, কাটিহার; কুমারী বেলা দাসগুপ্ত, ভবানীপুর; সমীর কুমার পাল, বালীগঞ্জ; মাষ্টার রথীন্দ্র মোহন মৈত্র, রাজসাহী; সুবোধ চন্দ্র ব্যানার্জ্জী, ভবানীপুর; মৃনাল কান্তি সেনগুপ্ত, ভবানীপুর; কুমারী শ্যামলী রক্ষিত, কলিকাতা; সুশীল কুমার রায়, কলিকাতা; জীমূত বাহন রায়, কলিকাতা; অনিল কুমার সেনগুপ্ত, ভবানীপুর; সর্ব্বানী চ্যাটার্জ্জী, কলিকাতা; সুধীন্দ্র নাথ গুহ, কালীঘাট; সাধনা সেনগুপ্ত, আমেদাবাদ; কুমারী পূর্ণিমা গুহ, ভবানীপুর; কুমারী নির্ম্মলা দেবী, ডোমজুড়; অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর; অজয় কুমার ঘোষ, এলাহাবাদ; অরুণ কুমার রায়, ভবানীপুর; বুদ্ধদেব সেনগুপ্ত, কলিকাতা; সত্য নারায়ণ গুপ্ত, কলিকাতা; সরমা সরকার, খিদিরপুর; কুমারী ইন্দিরা ঘোষ, ঢাকা; অরুণ কুমার সরকার, বিকানীর।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। উত্তর মেরু। ২। চারটি পয়সা চারকোনা ভাবে সাজিয়ে—তাদের ওপর ঠিক মধ্যিখানে বাকি পয়সা বসালে এ ধাঁধার একটা উত্তর হয় বটে। কিন্তু সঠিক এইটি—প্রথম লম্বালম্বি দুটী পয়সা রাখো তারপর মাঝামাঝি একটা, সবার ওপরে মাঝামাঝি বাকি দুপয়সা মাথা ঠেকিয়ে দাঁড় করাও।

৩। ৩½ ইঞ্চি।

উত্তরদাতাদের নাম

যাদের নির্ভুল উত্তর হয়েছে—

শ্রীঅচিন্ত্য কুমার রক্ষিত ও কুমারী শ্যামলী রক্ষিত (কলিকাতা); ধীরেন, নবু ও বাবু (ভবানীপুর); শ্রীদীপঙ্কর চৌধুরী (কলিকাতা); বীনা, টুনু ও অনিল (ভবানীপুর); শ্রীমনোতোষ দে (কলিকাতা)।

যাদের একটিমাত্র ভুল হয়েছে—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীনিশীথ কুমার রায় (এলাহাবাদ); শ্রীপাচু গোপাল দাস (কলিকাতা); শ্রীহর্ষ দে (কলিকাতা) পানু, ধনু, মনু মল্লিক (ভবানীপুর); শ্রীমাণিক বসু ও কুমারী শকুন্তলা (ভবানীপুর)।

নূতন ধাঁধা

১। লুডো খেলার সাদা চৌকো অঙ্ক বা diceএ ১-৬ নম্বরগুলি কত রকম ভাবে লেখা যেতে পারে? কিন্তু এটা মনে রাখবে ১ ও ৬, ২ ও ৫ আর ৩ ও ৪ এ নম্বরগুলি বরাবর উল্টোউল্টি থাকবে।

২। কলকাতার রেস কোর্সে ঘোড়দৌড় হচ্চে; যখন গোল হয়ে ঘোড়াগুলো ঘুরচে তখন একজন দর্শক আর একজনকে বলচে—ঐ দেখ সাদা ঘোড়ায় মিঃ স্মিথ! দ্বিতীয় দর্শক বললে—হাঁ, দেখতে পাচ্চি বটে কিন্তু কটা ঘোড়া দৌড়াচ্চে বলতো? প্রথম দর্শক জবাবটা একটু ঘুরিয়ে বললে। সে বললে—মিঃ স্মিথের আগের ঘোড়াগুলির তিন ভাগের এক ভাগ ও মিঃ স্মিথের পেছনের ঘোড়াগুলির চারভাগের তিনভাগ ঘোড়াগুলি যোগ করলেই তুমি উত্তর পাবে। তোমরা বলতে পারো কটা ঘোড়া দৌড়োচ্ছিল?

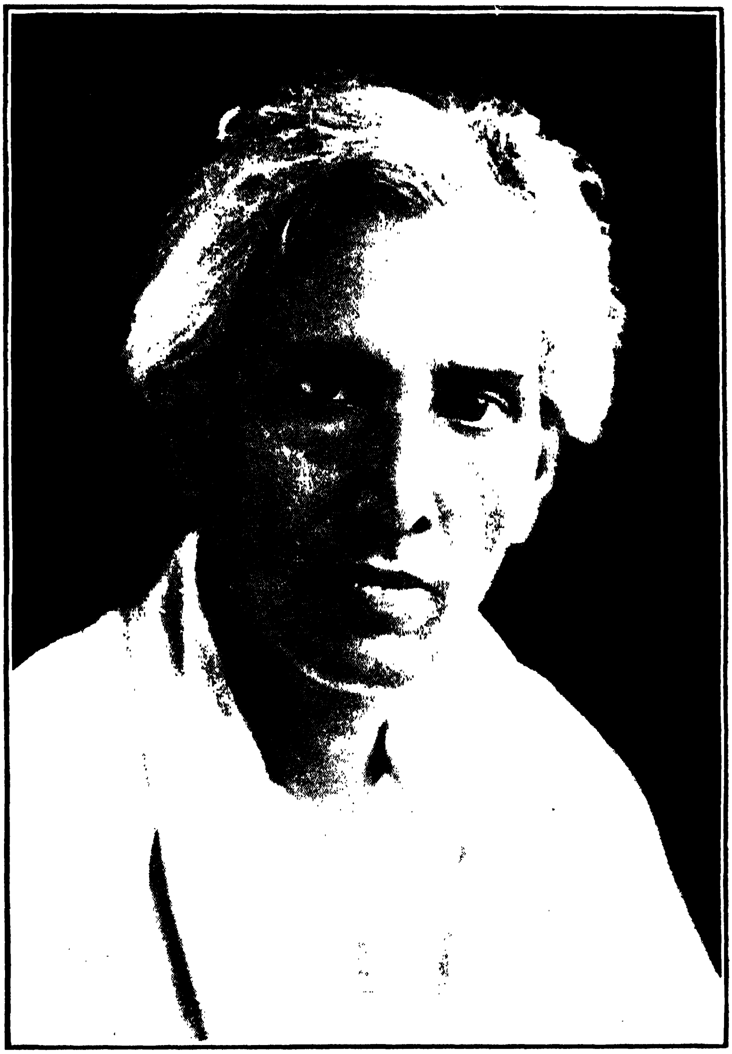
৩। ছবিতে একটি ঘরে ৮ সংখ্যাটি দেওয়া আছে; এখন অন্য ঘরগুলিতে ১-৯ এর মধ্যে এমন সংখ্যাগুলি সাজাও যাতে ওপরনীচে বা কোনাকুনি যোগফল প্রতিবার ১৫ হয়। এক সংখ্যা দুবার বসান চলবে না।

৪	৩	
৯	৫	১
২	৭	৬

৪। মন্টু শুনতে পেলে তার মা—বাবাকে হাসতে হাসতে বলচেন, জানো তোমার বয়স আমার বয়সের ঠিক উল্টো; আর আমাদের দুজনার বয়সের তফাৎ হচ্চে আমাদের বয়স যোগ করলে যা হয় তার এগার ভাগের এক ভাগ। মন্টু তক্ষুনি খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে বাবা ও মার বয়স বার করে ফেলে বাবা মাকে যে আশ্চর্য্য করে দিলে! তোমরা বার করতে পার মন্টুর বাবার ও মার বয়স কত?

নতুন প্রতিযোগিতা

রংমশাল পত্রিকায় তোমরা যা গল্প, উপন্যাস, রূপকথা, কবিতা, জীবনকাহিনী ও অন্যান্য রচনা পড়েচ বা পড়চ তোমাদের মতে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা আমরা জানতে চাই। (১) উপন্যাসের মধ্যে কোনটি তোমরা প্রথম স্থান দেবে, (২) গল্পের মধ্যে কোনটি প্রথম করবে, (৩) রূপকথাতেও কাকে প্রথম ধরবে, তেমনি, (৪) কবিতাতে, (৫) নাটকে, (৬) জীবনীতে, (৭) ভ্রমণ কাহিনী ও (৮) প্রবন্ধ রচনার মধ্যে—কোনটী তোমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেচে তা আমাদের জানাবে। তোমাদের মধ্যে যার লিষ্ট ভোটের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হ'বে তাদের দুটী প্রাইজ দেবো। আর সব মিলিয়ে কোন জিনিষ তোমাদের সবচেয়ে ভাল লাগে এবং কেন লাগে তাও আমরা জানতে ইচ্ছে করি। "কেন লাগে" যে সুন্দর করে এক পাতার মধ্যে গুছিয়ে বলতে পারবে তাদের মধ্যে দুজনার এই কেন ভাল লাগে বা লেগেছে এটি রংমশালে ছাপাবো। ২৮শে মাঘের মধ্যে সব এই প্রতিযোগিতার উত্তর রংমশাল অফিসে পৌছান চাই। কেবলমাত্র গ্রাহকগ্রাহিকা এতে যোগ দিতে পারবেন। পাঠক পাঠিকা যাঁরা এজেন্টের নাম দিতে পারবেন তাঁরাও ইচ্ছে করলে যোগ দিতে পারেন।



আমাদের শরৎচন্দ্র

জন্ম : ১২৮৩ সাল, ৩১শে ভাদ্র] [মৃত্যু : ১৩৪৪ সাল, ২রা মাঘ

রংমশাল

দ্বিতীয় বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা

ফাল্গুন
১৩৪৪



কাজলজল

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

নয়

খবর রাজপুরীতে। যেতে আর না যেতে রাজ্যের চারদিকে হাহাকার। রাজা নেই, রাজার রাজ্যে হল অরাজক। রাণী যে সায়র জলে ডুব দিলেন, উঠ্‌লেন না আর। প্রজাজন আপন বুকে শূল গেঁথে, রাজার শোকে দলে দলে মর্‌ল। পাত্র মিত্র সায় সামন্ত সাধু সরিক কেটে, মণিভাণ্ডার লুটে' কোটাল হল রাজা।

তন্ত্রী যন্ত্রী নিয়ে লোহার মুকুট মাথায় কোটাল রাজত্ব করে।

রাজত্ব না রাজত্ব, ঘাট নেই হাট নেই, পথ চল্‌বার বাট নেই, খাঁড়া তরোয়ালের সবুর সয় না, কোটালের রাজ্‌গির্‌ জনমনুষ্যের মাথা হাতে কাটে।

রাজ্যে খা খা।

না ক্ষেতে ধান, না পাখীর গান, রাত না পোহাতে শকুনী গৃধিনী উড়ে।

ধূলায় অন্ধকার।

কেবল, রাজার যে একা-রাজকন্যা, ধবল পাহাড়ে তাঁর পুরী, রাজকন্যা ব্রত করেন, নিয়ম করেন, রাজ রাজ্যের খবর যায় না তাঁর কাছে।

ধবল পাহাড়ের নীচে ধবল সমুদ্দুর। ধবল সমুদ্দুরে রাজকন্যার শ্বেতপঙ্খী ভাসে, ভোর উষায় রাজকন্যা শ্বেতকমল তোলেন আর শ্বেত পাথরের মন্দিরে জোড় শঙ্খ বাজে।

রাণী নেই, রাজা নেই, রাজকন্যার কাছে কে দেয় খোঁজ, রাজা আছে, না আছে?

ভোর পাহাড় রাঙিয়ে সূর্য্য দেয় উঁকি, শ্বেত পঙ্খীর শাদা পালে পড়ে রঙের ছায়া, পাগল্ হাওয়ায় পাল ফুলিয়ে শ্বেতপঙ্খী ফিরে পদ্মের বন দিয়ে।

যখন বাতাস থাকে ঝির্ ঝির্ তার কত আগেই রাজকন্যার ফুলতোলা হয়ে যায়।

চার পারের কত দেশের রাজ-পুত্রেরা শ্বেত হাতীতে চড়ে' আসেন সেই ঘাটে নাইতে, নেয়ে, আস্তে মন্দিরে প্রণাম করে, মন্দিরের ঘণ্টায় সুর দিয়ে যান।

কোন্‌দিন কেউ রাজকন্যার পায়ের জলের দাগ দেখ্‌তে পান, কিন্তু রাজকন্যাকে কেউ দেখ্‌তে পান না।

রাজপুত্রদের সোনার শিঙার সুর সমুদ্দুরের ওপর দিয়ে ভেসে যায়।

দশ

সেই সুর ধরে' ধরে', এক রাক্ষসী, নীল তার গা, শাদা চোক, পা, ধবল সমুদ্দুরে ঘুরে' বেড়ায়, কা'কে পাব, কা'কে খাব! ঝাক্‌ড়া চুলে, আগুনের নায়ে রাতরাক্ষসী সারা সমুদ্দুর থৈ থৈ করে।

পায় না জন মানুষ। লাল লক্‌লক্ জিভ্ বের করে' খোঁজে রাজকন্যার পায়ের দাগ। তা' রাজকন্যার পায়ে তো ধূলো নেই, পায়ের জলের দাগ, রোদ পড়্‌তেই শ্বেত পাথরে শুকিয়ে যায়; রাতে কোথায় পাবে? ছুতো পায় না রাক্ষসী কি করেই খায় যে রাজকন্যাকে!

ধোঁয়ার বৈঠায় আগুনের না' বায়, সমুদ্দুর চষে' বেড়ায় আর হাঙর তিমি গিলে খায়।

ভোরের আগে, শ্বেতপঙ্খীতে নিশান না উড়্তেই, আপন না' ডুবিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায় ধবল সমুদ্দরের জলে।

নয় তো, পড়ে যদি রাজকন্যার চোখে, চাই-তো কি, ফুল হয়ে যাবেই ফুটে'!

ওমা !! রাক্কসী কি তা পারে? না পড়্তেই ভোর পাখীর ডাক, দাঁত করে কড়্মড়্, গা করে গস্গস্, ধোঁয়া এলিয়ে আগুনের না' নিয়ে ভু-উ-স্ করে' ডুবে যায়।

কোথায় গিয়ে যে আবার উঠ্বে, কেউ তা জানে না!

এগারো

রাখাল?

কপিলার পিছনে, ছিল, দুধের বাটের পাহারা। ভোরে, যখন চমক্ ভাঙ্ল, উঠে দাঁড়াল রাখাল।

গিয়ে দেখে, মার নাই চেতন। মেঝেয় গড়ানো বালিশ আ-স্তে মার শিয়রে এনে দেয়। জলের হাত দিয়ে, বাতাস দিয়ে মুখে চোখে, বসে।

তা'পর এসে গরুবাছুর বের করে, গোহাল মুক্ত করে।

পাড়া পড়শীরা জাগ্ল, মা জাগ্ল দুপুর গড়ালে।

নাওয়া কি, খাওয়া কি আর, দিন যায়, রাতও যায়।

কোনো সাড়া নেই।

পরদিনে নিজে খেয়ে, মাকে খাইয়ে' বাঁশী হাতে বাঁশবনের ছায়ায় বস্ল।

বাজায় না।

দিন যেতে, একদিন মাকে বলে, "মা, আসি তো একটু।"

বুকে টেনে নিয়ে মা বলে, "মা !! কোথায় যাবি মানিক!"

রাখাল বল্লে—"ডর নেই মা, এখনি আস্ব।"

দূর পড়শীরা শোনে, বিলের সে-পারে রাখালের বাঁশী বাজে, বাজ্‌তে বাজ্‌তে থামে। এ গাঁ থেকে সে গাঁ, সে গাঁ থেকে আর গাঁয়ে রাখাল পথ চল্‌তে আটক। পথ ঘাট কি আর আছে? কোটালের সিপাই জন বন ঘুচিয়ে জল, জল বুজিয়ে মাঠ করেছে, রাজপুরীতে যাওয়ার পথ নেই।

কোন্‌ দিকে ডান, কোন্‌ দিকে বাঁ, কেউ বলে না কোটাল রাজার ডরে।

গালে বাঁশী ঠেকিয়ে, রাখাল চেয়ে থাকে। তা'পর কাজল নদীর পাড় ধরে' চলে, যেদিকে উজান।

কাজল নদীর বাঁকে বাঁকে বাঁশীর সুর থামে।

বারো

এক সে চিল। উড়্‌ছে। গাছ আছে পাতা নেই। উড়্‌তে উড়্‌তে উড়্‌তে হায়রাণ, হয়ে, কি করবে, বস্‌ল এসে এক বটগাছের শুক্‌নো ডালে।

সেই গাছের নীচে, বাঁশী বুকে রাখাল ঘুমোয়।

কত দেশ কত বন, পাহাড় পর্ব্বত ছাড়িয়ে এল যে রাখাল, কাজল নদীর উজান ধরে' তবু রাজপুরীতে মেলে না!

সেদিন গেল যে পথে, সেই পথ পায়ে হল ভুল!

রাখাল যায়, নদীর বাঁকে বাঁকে দাঁড়ায়, দেখে চেয়ে, অচিন ন-চিন এ কোন্‌ দেশ, গাছে নেই পাতার পোম্‌ মাঠে নেই ঘাসের ছোপ্‌, না চরে গাই, না সরে নৌকো, জন মনিষ্যি কেউ কালা, কেউ বোবা, কেউ খোঁড়া, কেউ কাণা। রাখাল সুধোয় তো, শোনে না; শোনে তো বলে না, বলে তো চলে না, আর চলে তো দেখে না চক্ষে।

রাখাল সুধোলে, বলে

"কার খাই, কা'র লাগি,
কার ঘরে নিশি জাগি,
কি জানি—
কে রাজা, কে রাণী?"

রাখাল ভাবে, রাজা নেই, বুঝি রাণীও নেই! রাজার যে রাজকন্যা, রাজকন্যাও কি নেই?

কোন্ দেশে যে সে রাজকন্যা, কি জানে রাখাল? রাখাল শুক্‌নো বটের তলে বাঁশী নামায়।

রোদ্দুর!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাখাল, মাটীতে, ঘুমিয়ে পড়ে।

চিলের ডাকে রাখাল জেগে দেখে, রোদ পড়ে' আসে। রাখাল উঠে' বসে।

চিল উড়ে' যায়।

কোথায় যাবে রাখাল? যে পথে যায় চিল, চোখ মুছে' বাঁশী তুলে নিয়ে চলে সেই পথে।

তেরো

যায়।

রাত ঘনিয়ে আসে। থম্ থম্ করে চারদিক। কোথায় যে চিল কোথায় যে কি, এক তেপান্তর।

রাত যায়, দিন যায়।

রাখাল বাঁশী তুলে নেয় মুখে। বাঁশী বাজায়, চলে; বাঁশী বাজায় তেপান্তর পার হয়ে যায়।

পার হয়ে গহন বন। গহন বনে বাঘ ভাল্লুক। বাঁশী বাজায় রাখাল। যায়। লতায় পাতায় পথ নেই। তবু যায়। অফুর বাঁশী বাজায়। আবার যায়। আবার রাত ঘনিয়ে আসে তবু চলে রাখাল, বাঁশী বাজায়।

মাস, দিন, বছর চলে' রাখাল দেখে, সেই কাজল জল নদী! ধবল হয়ে, ঝর্ণা ধারায় ঝর্‌ছে নদী, ঝির্ ঝির্ ঝির্, গহন বন দিয়ে, সরু থেকে সুতো-সরু!

সাত দিন সাত রাত ধরে' চলে' চলে' পাহাড়।

জ্যোচ্ছনা!!

জ্যোচ্‌নায় আর জ্যোচ্‌নায় আর পাহাড়ে ময়! আর থৈ থৈ থৈ জল!

জ্যোছ্নায় পাহাড় হেসে উঠে, জলের ঢেউ নেচে উঠে, ঝিরি ঝিরি ঝর্ণা ঝিক্ মিকিয়ে খেলা করে।

ভুলে', রাখাল, দাঁড়িয়ে রইল।

থাকে। তা'পর এক পাথরে বসে', বুক ভরে' দেয় বাঁশীতে সুর।

চ'দ্দো

নাঃ! নীল রাক্ষসী লাল হয়, লাল রাক্ষসী কালো হয়, তবু আর পারে না! ধোঁয়ার রবৈঠা আগুনের না' নিবু-নিবু, রাক্ষসী না পারে টান্‌তে, না পারে কাঁদ্‌তে!

কিসের সুর!
এমন সুর তো রাক্ষসী তার শোনে নি!

দেখে, উদল গা উদল মাথা এক ক্ষুদে' মানুষ, ফটিক্ জ্যোছ্না নাচিয়ে দিয়ে বাঁশী বাজায়! কাজল ঝর্ণার জল ধবল হয়ে ঝর্‌ছে যেখানে ধবল পাহাড়ে ঝর্ ঝরো ঝর্, সেইখানে বসে' বাজায় বাঁশী, দুধের বরণ জলে পা ডুবিয়ে, ধবল পাহাড় হাসিয়ে আর সমুদ্দুর ধাঁধিয়ে দিয়ে!

রাক্ষসীর গা মুড়ে' আসে, রাগে উঠে ফুলে', জিভের লাল্ টস্ টস্ করে' গড়ায়, হাতে বৈঠা খুঁইয়ে যায়, উল্টো জিভে ঠোঁট চেটে কথা দাঁতে কেটে কেটে রাক্ষসী বলে......

"তুই কে রে?"

ক্ষুদে' মানুষ কি জানে না শোনে? বাঁশী বাজায়।

চুলে হাওয়া জড়িয়ে, দাঁতে জিভ্ জড়িয়ে রাক্ষসী আবার বলে,—

"কে রে তুই?"—

শোনে না কিচ্ছু ক্ষুদে' মানুষ। বাঁশী বাজে।

জ্যোছ্না উছলে, সমুদ্দুর উথলে, ঝর্ণা ঝন্‌কে', শ্বেতপাহাড় মধু মেখে বাঁশী বাজে।

চুল উড়িয়ে করাতে' দাঁত নিয়ে রাক্ষসী গর্জ্জে' আসে—"কে তুই?—

—দাঁড়া!"

সমুদ্দুরের জলে ডাক উঠে, শব্দে বাঁশী ছেড়ে, ফিরেই দেখে মানুষ—জল তোলপাড় করে' পাহাড় ভেঙে আসে—**সাপ !**

বাঁশী বাজ্‌তে বাজ্‌তে ভোর হয়ে গেছে, রাজকন্যার ফুলতোলা ভুল হয়ে গেছে, শ্বেত-পঙ্খীতে দাঁড়িয়ে রাজকন্যা, দেখ্‌তেই চেয়ে, সোনালী ডোরায় ডোরায় সাপ লাখো কমল হয়ে ফুটে রইল পাহাড় তলে ধবল সমুদ্দুরের দুধজলে !

সহস্রদল কমলের মত চেয়ে রাজকন্যা, বললেন—

"কে তুমি ?"

"আমি রাখাল।"

বাঁশী ছুঁয়ে আস্তে, শ্বেতপাথরের উপরে দাঁড়িয়ে রইল রাখাল।

রাজকন্যা বল্‌লেন,
"রাখাল তুমি ?
বাঁশী
আবার বাজাবে ?"

রাখাল আসে।

সমুদ্দুর শিউরে' উঠে, পাহাড় শিউরে' থাকে, শ্বেতপঙ্খীর গলুইয়ে বসে' বাঁশী বাজায় রাখাল।

পনেরো

ধবল পাহাড়ের মন্দিরে, গন্ধে দিক ছায়।
মন্দিরে ঘণ্টা বাজে।

রাখাল বলে "রাজকন্যা, এ ফুলের মালা পেলাম আমি, কাজল নদীর জলে !"

রাজকন্যা বলেন, এই ফুল তো জগতে নেই, মন্দিরে আসে, সোনালী হয়, তোমার আমার দেশে......আমার বাবার রাজ্যে এই কাজল জল নদী, বছরের একদিন এই মালা আমি তারি জলে দি, সেই মালা, রাখাল, তুমি পেলে !"

ডাগর চোখে রাখাল বলে,
"কেন গন্ধ উবে' যায়, রাজকন্যা ?"
"নিঃশ্বাসে"
"কিসের ?".



—'কেন গন্ধ উবে যায় রাজকন্যা ?'
—'নিঃশ্বাসে'

"নয় তো কোটালের, নয় তো, সাপের।"

"গন্ধ উবে, দুধ শুকায়, রাজার রাজ্য উজাড় যায় ?"

মুক্তাজলের নহর গলে ; দু'-চোখ ফুলের মালায় রেখে, রাজ-কন্যা বলেন—

"সব যায়।"

ঝর্‌ঝর্ চোখ রাখাল, আপন বাঁশী কুড়িয়ে নেয়, "রাজকন্যা যে রাজকন্যা, আগে-না-জানি ! মাপ চাই, রাজকন্যার রাজ্য জন কেন রাজকন্যা, ছার্‌খার্ যায় ?"

শুনে' রাজকন্যার চোখের জল ফুলের মালায় শ্বেত চন্দন হয়ে ঝরতে থাকে। বাঁশী হাতে রাখাল, কাজল ঝর্ণার কিনারে গিয়ে বসে' বাঁশীতে সুর দেয়।

ষোল

যত দেশের রাজপুত্র সমুদ্দুর নাইতে এসে সারাদিন সেই সুর শোনেন।
শোনেন, ব্রতপাট নিয়ে রাজকন্যা আপন রাজ্যে যাবেন।
শোনেন, দোল চৌদোলে যাবেন না, জন জৌলুষ নেবেন না, রাজকন্যা পায়ে হেঁটে যাবেন।—

শোনেন, ঢাক নক্‌ড়া বাজ্‌বে না, খাঁড়া তরোয়াল সাজ্‌বে না, শুধু, মন্দিরে বাজ্‌বে শাঁখ আর পথে বাজ্‌বে বাঁশী।

শুনে' রাজপুত্রেরা পথের দু'ধারে সা'র দিলেন।

না হাতী সাথে, না ছত্রমুকুট মাথে, কাঁকন কুণ্ডল খুলে', হাতের বনফুলে রাজপুত্রেরা চোখে পলক ধরেন।

মন্দিরে শাঁখ বাজে, পাহাড় সমুদ্দুর সুরে ভাসে, রাজকন্যার পা পাথর ছেড়ে এসে পড়ে মাটীতে।

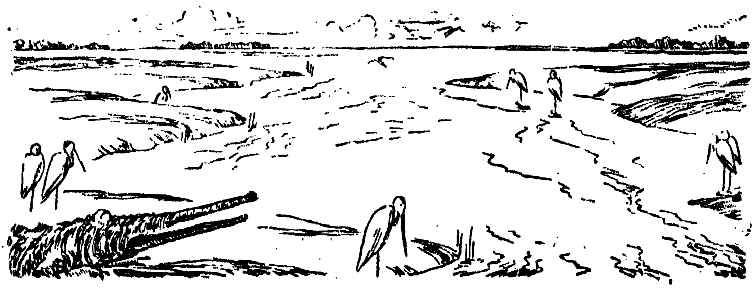
বেজে উঠে রাখালের বাঁশী।

পথে পথে গাছের ফুলে, রাজপুত্রদের হাতের ফুলে রাজকন্যার হাঁটন পথ ছেয়ে যায়। আপ্‌নি খোলে পথ, আপ্‌নি জাগে ঘাট—বসত, বন, মালঞ্চ, নগর, মাঠ!

আর, লোকজনের কলরব!

আলোর সোনায় মাটী হাসে, কন্যা আসেন, বাতাস ছেয়ে যায় রাখালের মোহন বাঁশীতে আর ঢেউয়ে নেচে কাজল-জল নদীর তর্‌তর্ তর্‌তর্ কালো কাজল জল, বেয়ে চলে ছুটে'—যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে নীলা কপিলা ধবলী গাই, কখন্ রাখালের বাঁশী শুন্‌বে বলে'।

সমাপ্ত।



চাঁদনী রাতের গান

শ্রীসতীকান্ত গুহ

১

উড়ন্ত মেঘ ঘুমন্ত হল ঢুলন্ত সন্ধ্যায়
হাসচে আবেশে রূপসী আকাশ ফুটফুটে জ্যোছ্‌নায়।
কারা গান গেয়ে যায়?
তাদের গানের রেশ ভেসে আসে ঝিমন্ত হিমবায়।
ওরে তোরা আয় আয়,
কাণ পেতে শোন্‌, চোখ মেলে দ্যাখ্‌ কারা গেয়ে চলে যায়।
ওরে তোরা আয়, কারা গান গায়, জানি কারা গান গায়—
যাদের গানের কথা ভেসে ভেসে, ঘুমনো শিশুকে কয় চুপি এসে,
"গানের খেলায় দোলাবো তোমায় চাঁদিমার দোলনায়।"

হিম আকাশের পরীরা নামছে? নিবে দাও লণ্ঠন।
আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী জ্বলবে সারাক্ষণ।

২

নিভন্ত রাত জ্বলন্ত হল ফুলন্ত হল বন,
হিমেল রাতের বসন্ত এলো। ডাক্‌ছে চাতকী কোন্!
কারা গান গেয়ে যায়?
হিমেল রাতের পরীরা নেমেছে ফুলফোটা জ্যোছ্‌নায়।
ওরে তোরা আয় আয়—
তাদের ছোট্ট রুপোলী চরণ জ্যোছ্‌না আলোয় ভায়।
ওরে তোরা আয়, কারা গান গায়, জানি কেন গান গায়—
গান গেয়ে গেয়ে ঘুমনো শিশুকে, তুলে দেবে তারা স্বপনের বুকে,
চাঁদের টিপটি পরাবে খোকনে আকাশের আঙিনায়।

চাঁদনী রাতের গান
শ্রীসতীকান্ত গুহ

হিম আকাশের পরীরা আসচে ? নিবে দাও লণ্ঠন।
আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী জ্বলবে সারাক্ষণ।

৩

'কুলুকুলু' নদী উলুউলু বয় ঢুলুঢুলু সারাখণ,
পরীদের সনে যাবে কি খোকন কাজল-লতার বন ?
কারা গান গেয়ে যায় ?
হিম আকাশের পরীরা নেমেছে স্বপনের ইসারায়।
ওরে তোরা আয় আয়,
স্বপনদেশের বিজন কাননে ফুল ফুটে হেসে চায়।
ওরে তোরা আয়, ফুল ফুটে যায়, ফুটে হেসে ঝরে যায়।
আজকে স্বপনে সকলের সনে, খেলবে পরীরা চাঁদ্‌নী লগনে,
সোণালী ঠোঁটের চুমু ঝরে যাবে বিজন বনের ছায়।

হিম আকাশের পরীরা খেলচে ? নিবে দাও লণ্ঠন।
আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী জ্বলবে সারাক্ষণ।

৪

পড়ন্ত রাত উঠন্ত হল, তুলন্ত হল ফুল,
তুড়ন্তে বয় সপ্তসায়র, ঢেউয়ে ঢেকেচে কূল।
কারা গান গেয়ে যায় ?
ভাসাবে পরীরা স্বপনতরণী সায়রেতে জ্যোছ্‌নায় ?
ওরে তোরা আয় আয়,
'কুলু' নদীশেষে সাতটি সায়র পার হবি যদি আয়।
ওরে তোরা আয়, খেয়া ছেড়ে যায়, পাল তুলে তুলে যায়,
আজকে স্বপনে বিজন সায়র, পার হবি কেটে ঢেউয়ের লহর,
সাত সায়রের শেষের মাঠেতে বাঁশরী বেজেছে হায়।

স্বপন পরীরা বাইছে তরণী ? নিবে দাও লণ্ঠন।
আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী জ্বলবে সারাক্ষণ।

৫

সপ্তসায়র পার হয়ে শেষে ধূ ধূ ধূ তেপান্তর,
সেখানে বেঁধেচে পাতাল শিশুরা আকাশ দেখার ঘর।
কারা গান গেয়ে যায়?
তারা চলে এলো তেপান্তরের বিজন বটের ছায়।
ওরে তোরা আয় আয়,
স্বপন-পুরের ঘোড়া বাঁধা আছে বিটপীর আঙিনায়।
ওরে তোরা আয়, রাত বয়ে যায়, ঘোড়ারা চমকে চায়,
আজকে আলোয় পাখা মেলে ভেসে, নিয়ে যাবে তারা আকাশের দেশে
রূপোলী গাছের সোণার ফলটি জ্যোছ্‌নায় ঝলসায়।

আকাশ পরীরা পেড়ে দেবে ফল ? নিবে দাও লণ্ঠন।
আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী জ্বলবে সারাক্ষণ।

৬

ও ফল খেওনা খেওনা খোকন, ওরে বোকা চঞ্চল,
আকাশ পরীর যাদু ছুঁয়ে আছে রূপোলী গাছের ফল।
কারা গান গেয়ে যায় ?
সোণার ফলটি তুলে দিল হাতে, খোকন হাসিয়া চায়।
ওরে তোরা আয় আয়,
সোণার খোকন সোণার ফলটি অধরে ধরেছে হায়।
ওরে তোরা আয়, খোকা ভুলে' যায়, সব ভুলে ফল খায়—
সে ফল যে খাবে পরীদের সাথে, অফুর বছর জ্যোছনা নিশাতে
খেলতে যে হবে ঘুম-আকাশের মেঘ-ছাওয়া আঙিনায়।

পরীরা মানেনা যদি বলো "না, না।" নিবে দাও লণ্ঠন।
আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী জ্বলবে সারাক্ষণ।

৭

জ্বলন্ত রাত কেঁদে হল খুন, জ্যোছ্‌না গলিয়ে যায়,
আয় রে ধরার উদাসী রাখাল বাঁশী নিয়ে ছুটে আয়।
কারা দূরে গান গায় ?
তাদের গানের কথা ঢেকে দেবে বাঁশরীর বাজনায়।
ওরে তোরা আয় আয়,
রাখাল ছেলের বাঁশী শুনে খোকা পিছন ফিরিয়া চায়।
ওরে তোরা আয় খোকা ফিরে চায়, পরীরা চমকে চায়,
সোণার ফলটি পড়ে যায় মেঘে, হঠাৎ বাতাস যেন ওঠে জেগে,
ঘুমন্ত মেঘ উড়ন্ত হল, জ্যোছ্‌না ঝিমিয়ে যায়।

থেমে যায় গান, পরীদের গান। নিবে দাও লণ্ঠন।
জ্বলছে আকাশে দিনের দেয়ালী, রঙন্ত হল বন।





আশ্চর্য্য উপহার

বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু

নাম তার উৎপল, কিন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে মূর্ত্তিমান উৎপাত।

বাবা সখ ক'রে নিলেমে একটি চেয়ার কিনে এনেছেন, আধ ঘণ্টা পর ঘুরে এসে দেখেন তার একটি হাতল বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঝেতে গড়াচ্ছে। পিণ্টু---যা ব'লে উৎপলকে সবাই ডাকে—বুঝি একটা করাত জোগাড় করেছিল কোথা থেকে, সেটা চালাবার মতো আর কোনো বস্তু হাতের কাছে না পেয়ে চেয়ারের হাতলটাকেই দ্বিখণ্ডিত করেছে। আর তারপরে ভোঁ দৌড়।

সেদিন পাশের বাড়ির লিলিকে ধ'রে এমন মার মারলে যে তার পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেল। বেচারার দোষের মধ্যে পিণ্টু যখন মাথার উপর দাঁড়িয়ে সার্কাস করছিল, সে সেদিকে তাকিয়ে বাহবা না দিয়ে গিয়েছিল বুঝি মিনুর সঙ্গে পুতুল খেলতে। পরের বাড়ির মেয়েকে এমন করে মারলে বাপ মার কী লজ্জা ভাবো তো!

কিছুতেই ওকে সামলানো যায় না।

কি বাড়িতে কি ইস্কুলে পিট্টি খেতে খেতে বেড়ালের হাড় হয়ে গেল—তবু কিছু শিক্ষা হওয়া দূরে থাক, দিন দিন ও যেন আরো খারাপ হয়েই চলেছে। কখন যে ওর মাথায় কী নতুন দুষ্টুমির ঢেউ খেলে খণ্ডপ্রলয় ঘটায়, বাড়ির চাকর-বাকর থেকে সুরু করে মা-বাবা পর্য্যন্ত সকলেই সন্ত্রস্ত। মেজদার আশিটাকা দামের ঘড়িটাকে "পরিষ্কার" করবে বলে এক ঘণ্টা বালতির জলে ডুবিয়ে রেখে এমন অবস্থা করলে যে ঘড়ি ব'লে তাকে আর চেনাই যায় না। রবিবার সারা দুপুর ছাদের কোণে ব'সে ব'সে হয়তো কয়লা গুঁড়ো করলে—পরের দিন বাড়ির সকলের জামার পকেটে, বালিসের ওয়াড়ে, টেবিলের দেরাজে যেখানে যে হাত দেয়, কয়লার গুঁড়ো ছাড়া কিছু নেই!

ভাবতে পারো !

ভাইবোনগুলোকে, খেলার সঙ্গীদের ছ্যাখ্-না-ছ্যাখ মারছে পটাপট, ফড়িংগুলোকে ধ'রে ধ'রে আলপিনে ফুঁড়িয়ে রাখছে, টিকটিকির লেজ কেটে দিচ্ছে, ব্যাঙের বাচ্চা ধ'রে ঠ্যাঙগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে হো—হো ক'রে হাসছে। একফোঁটা দয়ামায়া নেই।

ওর কাণ্ড দেখে মা এক এক সময় ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলতেন। বড়ো হয়ে "মানুষ" হওয়া দূরে যাক্ কোনোদিন কাউকে খুন জখম ক'রে জেলে না যায়।

এই পিণ্টুকেই একদিন তার মামা এক অতি আশ্চর্য্য উপহার দিয়ে ফেললেন—আর কিছু নয়, একেবারে ফুটফুটে ছোট্ট নরম আস্ত একটি কুকুর ছানা।

মা কপাল চাপড়ে বললেন, ওরে পরেশ, এ কী করলি ! কুকুরটাকে দু'দিনেই ও মেরে ফেলবে যে ! হয় উনুনে পোড়াবে, নয় গরম তেলে ভাজবে, নয়—

পিণ্টু ব'লে উঠলো—হ্যাঁঃ, মারবোই তো ! আমার কুকুর ছানার গায়ে যে হাত দেবে তাকে মেরে গুঁড়ো ক'রে দেব।

মামা বললেন—বেশ তো, তবে তুমিই ওকে যত্ন কোরো। ওকে খাওয়াবে, স্নান করাবে, বেড়াতে নিয়ে যাবে—

পরম উৎসাহে মাথা কেড়ে পিণ্টু বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব করবো। কত রকম কসরৎ শেখাব, দেখো। আয়, আয়, বুলু।

বুলু তার ছোট্ট লেজ নেড়ে মেঝে শুঁকতে শুঁকতে এগিয়ে গেল।

পিণ্টুকে আর পায় কে ! কুকুর পেয়ে সে যেন ছোটখাটো রাজা হয়ে গেল। দিনরাত্তির আছে ওরই পিছনে, রান্নাঘর থেকে কেবলি দুধ নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছে, কোলে নিয়ে সারাবাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাত্রিতে নিজের বিছানারই এক পাশে ওকে শোয়াচ্ছে। কুকুরের পরিচর্যা করতে করতে সে ইস্কুলে যেতেই ভুলে যায় আর কি।

একমাসের মধ্যেই কুকুরটা বেশ একটু বড়ো হ'লো। পিণ্টুর সঙ্গে কাঠের বল্ নিয়ে খেলা করে, মেঝেতে মাছি বসলে ঘেঁাং ক'রে তেড়ে যায়—পিণ্টুর ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় হ'লে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে. আর সে এলেই কী দুর্দান্ত লাফালাফি ! বই-খাতা ছুঁড়ে ফেলে পিণ্টু ওকে নিয়ে চ'লে যায় ছাতে—পকেট থেকে চীনেবাদাম বার ক'রে ওকে খেতে

দেয়, বুলু যখন সেটা খায় না এমন এক লাথি মারে পেটে যে যন্ত্রনায় ও পাঁচ মিনিট সমানে কেঁউ-কেঁউ করে।

মা কেবলই বলেন—ঠিক একদিন কুকুরটাকে মেরে ফেলবে। পরেশের যত কাণ্ড!

এদিকে মিনু কেবলই পিণ্টুর হাতে মার খাচ্ছে, এই বুঝি সে বুলুকে একটু ছুঁয়েছে—নাকি তার পাতের একটা মাছের কাঁটা খেতে দিয়েছিল, এই জন্যে ওর ঢেঁকুর উঠছে। এদিকে পিণ্টু যখন বুলুকে কসরৎ শেখায় তখন যদি মিনু উপস্থিত থেকে বাহবা না দেয় তাহ'লেও রক্ষে নেই।

মিনু চ'টে গিয়ে বলেছে—দাঁড়াও না, আমি একটা ভালুক পুষবো, তোমার কুকুরকে গিলে খাবে।

—ইস আন্ তো ভালুক। দেবো গুলি ক'রে খুলি উড়িয়ে।

একদিন পিণ্টু কসরৎ শেখাতে গিয়েই বিভ্রাট ঘটলো। বুলু দু'পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করতে কিছুতেই শিখছে না। পর পর বারো বার ধৈর্য্য ধ'রে শেখাবার চেষ্টা করেও যখন কিছু হলো না, তখন পিণ্টু চ'টে গিয়ে পিংপং এর র‍্যাকেট দিয়ে এমন এক বাড়ি লাগালে যে বুলুর নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো।

মা এসে চীৎকার ক'রে পড়লেন—কেমন, হ'লো তো এবার! যা ভেবেছি তা না হ'য়ে পারে! যা, যা, ভাগ্ তুই, বেরো এখান থেকে।

সব সময়ই একটা অঘটন ঘটিয়ে পিণ্টু ভোঁ দৌড় দেয়, কিন্তু এবারে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল, নিজের মার খাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও। মা ওর দিকে আর তাকালেনও না, জল ন্যাকড়া নিয়ে ব'সে বুলুকে জলপটি দিতে লাগলেন, রক্ত যেন থামতেই চায় না।

—ইস্, মানুষ পারে এ-রকম মারতে! এখন ম'রে গেলেই আপদ চুকে যায়।

—ওঃ ভারি তো মেরেছি, পিণ্টু বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো। আবার মারবো, আরো মারবো, চার পা বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখবো, গলায় ইঁট বেঁধে জলে ছেড়ে দেব। এতদিনেও হ্যাণ্ড্শেকটা শিখতে পারলো না—ইডিয়ট কোথাকার! ইস্—একটুখানি মেরেছি তো রক্ত ছুটে গেছে! ন্যাকামি! এই তো—কী হচ্ছে আমার! পিণ্টু পিংপং র‍্যাকেটা দিয়ে নিজের মাথায় বাড়ি মারতে লাগলো, কিন্তু সত্যি বলতে, বুলুকে যত জোরে মেরেছিল, নিজের গায়ে তার আদ্ধেকের আদ্ধেক জোরেও মারতে পারলে না।

সে-যাত্রায় বুলু যা হোক্ বেঁচে উঠলো, এবং তাকে তেমনি পিণ্টুরই অনুগত দেখা গেল। কাছাকাছি আর যখন কেউ নেই, পিণ্টু তাকে চুপি-চুপি বললে—এই, শোন্, সেদিন

তোকে মেরেছিলুম, খুব লেগেছিলো? একটুও লাগেনি, সব বাজে কথা। অমন তো কতই রক্ত বেরোয়—এই তো সেদিন ফুটবল খেলতে আবার যা রক্ত বেরিয়েছিল, তুই দেখলে বোধ হয় ফিট হয়ে যেতিস। তুই একটা গাধা—এখনও হ্যাণ্ডশেকটা শিখতে পারলি না! টুপি মাথায় দিয়ে টেবিলে ব'সে চা খেতে শিখবি কবে।

পিণ্টুর বাসনা, বুলুকে ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কুকুর করবে, তারপর নিয়ে যাবে প্যারিসের একজিবিশনে। একদিন মামার কাছে সে সগর্বে তার এই প্ল্যান উদ্ঘাটিত করলে। কথা হলো, কুকুর দেখিয়ে যত টাকা হবে তার আদ্ধেক নেবেন মামা, আর আদ্ধেক পিণ্টু।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কুকুরটা হারিয়ে গেলো।

গেলো তো গেলো বেমালুম ভোঁ হয়ে গেলো যেন। আগেরদিন রাত্তিরেও দেখা গিয়েছিল ওকে বারান্দার কোনে গোল হয়ে শুয়ে, ভোরবেলা উঠেই নিখোঁজ। খোঁজ খোঁজ, দৌড় দৌড়, হুড়োহুড়ি ঘোরাঘুরি বালিগঞ্জ ষ্টেশন থেকে রসা রোডের মোড় পর্য্যন্ত পিণ্টু চারবার টহল দিয়ে এলো, দাদারা বেরুলেন খুঁজতে, চাকররা বেরুলো, এমন কি বাবাও একবার বেরুলেন—কিন্তু সে ফুটফুটে ব্রাউনরঙের ছোট্ট মূর্ত্তিটি কোনোখানেই দেখা গেলো না। থানায় খবর দেয়া হ'লো, খবরের কাগজে তিনদিন বিজ্ঞাপন দেয়া হ'লো—কিন্তু একদিন তু'দিন করে পনেরো দিন কেটে গেলো, বুলুর কোনো সন্ধানই মিললো না।

পিণ্টু কাঁদলো-কাটলো, না খেয়ে শুয়ে থাকলো, তারপর মিণ্টু যখন সান্ত্বনা দিতে এলো এক চড়ে তার গাল লাল ক'রে দিলে। বললে—বেরো, বেরো তোরা সব। তোদের শাপেই তো গেলো ও। আর ও-ই বা কী অসভ্য পাজি, একা-একা বাড়ি থেকে বেরোতে গেছল কেন। আবার পেয়ে নিই ওকে, ছুরি দিয়ে কাণ কাটবো তবে ছাড়বো।

কিন্তু তারপরেই তার মনে হ'লো বুলু আর ফিরবে না, আবার তার নতুন ক'রে কান্না পেলো।

কী হ'লো বুলুর? বোধ হয় পথ হারিয়ে অনেকদূর চ'লে গেছে, আর ফিরতে পারে নি। হয়তো গাড়ি চাপা হয়েছে, হয়তো চুরি হয়েছে—কলকাতায় আবার কুকুর চোর কম নেই। কে জানে।

যাক্, গেছে আপদ গেছে, পিণ্টু কেয়ার করে না। অমন হতভাগা বোকা পাজি কুকুর, যে বাহিরে একা একা বেরোয়, আবার বেরুলে ফিরতে পারে না, তার হারানোই

উচিত। বেশ হয়েছে, খুব খুসি হয়েছি, পিন্টু দাঁত কিড়মিড় ক'রে বলে। ও মরুক্।

মামা এসে সব কথা শুনে বললেন, পিন্টু, মন খারাপ কোরো না, তোমাকে আর একটা কুকুর দেব আমি।

মা ব'লে উঠলেন, আরে সর্বনাশ! একটা গেছে তো ভালোই হয়েছে—ওকে তো পিন্টু বেশি দিন আস্ত রাখতো না।

মামা বললেন, পিন্টু কী বলে?

—পিন্টু আবার বলবে কী? দ্যাখ্ পরেশ, আদর দিয়ে দিয়ে ছোকরাটার মাথা খাসনে তুই। আমার বাড়িতে জীব হত্যা যেন না হয়।

মামা বললেন, কী রে, চাই নাকি আর একটা কুকুর?

পিন্টু মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো। ক'দিন থেকে ও যেন ঘোরতর বিগড়ে গেছে। কেউ একটা কথা বললেই খেঁকিয়ে ওঠে—আর খেলবার সময় একটা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে একা একা ছাতে ঘুরে বেড়ায় আর দুমদাম লাফায়।

আশ্চর্য্য এই, এর কয়েক দিন পরে মামা সত্যি সত্যি এক কুকুর ছানা নিয়ে এসে হাজির। এটা স্প্যানিয়েল জাতের, অপরূপ সুন্দর, চিকচিকে কালো সিল্কের মতো চামড়া। দেখে পিন্টুর চোখ আর ফেরে না।

হ'লে হবে কী, কুকুরটাকে সে যেন বেশি ধরে ছোঁয় না। ভালো ক'রে তাকায়ও না ওর দিকে। এদিকে মিনু কি অন্য কেউ ধরতে এলে খেঁকিয়ে ওঠে ঠিক।

কুকুরটা নিজের মনেই যখন অনেকটা বেড়ে উঠলো তখন কিন্তু পিন্টু একটু একটু মন না দিয়ে পারলে না। দেখতে ভারি সুন্দর, কিন্তু একটু বোকা বোকা। তেমন চটপটে খেলোয়াড় গোছের নয়—ঠাণ্ডা গোছের। বোকা বলে পিন্টু ওর নাম রাখলে বুকু।

ওর সঙ্গে পিন্টু খুব মৃদু ব্যবহারই করতে লাগলো। মারধোর দূরে থাক এক ধমক পর্য্যন্ত নয়। স্নান করায়, খাওয়ায়, পাউডার ঘষে, গায়ের কাছে নিয়ে পড়তে বসে। আস্তে আস্তে ওর স্বভাবের দুর্দান্ত ভাবটাও যেন কেটে এলো। বাড়ির লোক অবাক হয়ে দেখলে যে প্রায় পনেরো দিন এক সঙ্গে পিন্টু কোনো নতুন কীর্ত্তি করেনি, কাউকে একবার মারেনি পর্য্যন্ত। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে মিনুকে ও বুকুর সঙ্গে খেলতে দিচ্ছে—এমনকি পাড়ার দু' চারটি বাছা বাছা ছেলে-মেয়েকেও।

প্রথম প্রথম পিণ্টুর কেবলই মনে হতো বুকু একেবারেই বুলুর মতো নয়—থেকে-থেকেই বুলুর কথা মনে হ'তো আর বুকুর কিছুই যেন পছন্দ হ'তো না। কিন্তু ক্রমে বুকুকেই ভারি ভালো লেগে গেলো ওর। ও যে ভারি চুপচাপ, ঠাণ্ডা, ঘেউ-ঘেউ ঘোৎ ঘোঁৎ হুড়দাড় লাফালাফি নেই সেটাই যেন ওর মস্ত গুণ হয়ে উঠলো। বুকুকে ছেলেবেলা থেকেই চেন বাঁধবার নিয়ম হ'লো, গলায় সুন্দর ঘণ্টা-বাঁধা নাম-খোদানো বকলয ; বিকেলে পিণ্টু যখন চেন ধ'রে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, গর্বে ওর মুখের ভাবই বদলে যায়।

কিন্তু এই বুকুও একদিন হারিয়ে গেলো।

কখন, কী ক'রে কেউ জানে না। দেখা গেলো, চেন প'ড়ে আছে, বুকু নেই। পিণ্টু প্রথমেই ব'লে উঠলো ঃ হারালো!

বুকু যে হারিয়েছে, বুকু যে আর ফিরে আসবে না তা যেন ও নিশ্চিত জানে। ও বেশি খুঁজলোও না, না দিলে থানায় খবর কি কাগজে বিজ্ঞাপন, কাঁদলেও না সেবারের মতো, অসম্ভব মন মরা হ'য়ে গেলো শুধু। ক'দিন তার খাওয়াতে রুচি নেই, খেলাতে মন নেই,—মুখে নেই কথা—এমন প্রচণ্ড দুর্দান্ত ছেলে হঠাৎ যেন এক দমকে মিইয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।

মামা এসে বললেন, সে কী! এটাও হারালো।

পিণ্টু কিছু বললে না।

—চাস তো আর একটা—

পিণ্টু বললে, না, না, আর আমি কুকুর পুষবো না। এমনভাবে বললে যে মনে হ'লো তার যেন অনেকটা বয়েস বেড়ে গেছে

এর পর থেকে ও যেন একেবারে বদলেই গেলো। চুপচাপ থাকে, রবিবার সকালে চিৎ হয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ে—হঠাৎ এই বই পড়াটা যেন একটা রোগের মতো আক্রমণ করলে ওকে। কত সময় দেখা যায়, মিণ্টু আর ও একসঙ্গে একটা বই পড়তে পড়তে হেসে কুটিপাটি হচ্ছে।

৪

কিছুদিন পরে পিণ্টুর জন্মদিন এলো।

পিণ্টুর ধারণা এখন সে আর তার অত ছেলেমানুষ নয় যে ঘটা ক'রে জন্মদিন হ'তে পারে। তার উপর, সবাই যখন তার জন্যে উপহার আনতে লাগলো, ভারি লজ্জা করতে

লাগলো তার। চকোলেটের বাক্স, রঙিন জামা—এ-সমস্ত কী? মিনুকে চুপি-চুপি বললে—এগুলো সব তোর। শুধু বইগুলো আলাদা ক'রে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো।

সব চেয়ে দেরি ক'রে এলেন মামা। এলেন খালি হাতেই। পিণ্টুর মা মুচকি হেসে বললেন—কী রে পরেশ, তুই কিছু উপহার আনিসনি?

পিণ্টু তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ ক'রে উঠলো—ছি-ছি, কী যে বলো, মা!

মামা বললেন—এনেছি বই কি। আমি এনেছি সব চেয়ে আশ্চর্য্য উপহার। আয়, আয়—বলামাত্র লাফিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো দু' জনে—একজন প্রকাণ্ড বড়ো, ব্রাউন রঙের শরীর, ছোট্ট লেজ আর লোমশ মুখ, আর একজন চিকচিকে মসৃণ কালো, ছোট্ট শরীরে লম্বা কান দুটো মেঝে ছোঁয়-ছোঁয়।


আয় আয় বলা মাত্র ঘরে এসে ঢুকলো দুজনে

পিণ্টু এক বিরাট লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—বুলু! বুকু! বা-বাঃ কী সুন্দর হয়েছে—বুলুটা কত বড়ো, বুকু কী সুন্দর—কোথায় ছিলি রে তোরা, কোথায় পেলে তুমি ওদের?—বাঃ, বাঃ, বুলু—হ্যাণ্ডশেক করতেও শিখেছিস যে—

আনন্দে পিণ্টু যেন পাগল হয়ে গেলো।

মামা বললেন—পিণ্টু, তোমার দুটি কুকুরই চুরি গেছল, এবং চোর হচ্ছে—আর কেউ নয়, আমি।

—তুমি!

—কী রকম হাত সাফাই দেখছ তো—বাড়ির একটি লোকও টের পায়নি। এইবার নাও তোমার বুলু আর বুকু—দেখো, এবার আর ওরা হারাবে না।

—বাঃ, দুটো কুকুর আমার! দুটোকে দু' হাতে নিয়ে বেড়াবো যখন—এই মিনু, তুই নিবি একটা! নে না—বুকুকে তুই নে, বুলু কিন্তু আমার। কেমন?

এখন যদি মিনুকে জিজ্ঞেস করো সে নিশ্চয়ই বলবে তার ছোড়দা অর্থাৎ পিণ্টুর মতো মানুষ জগতে আর হয় না।



[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে ষ্টাইন নিশ্চিন্ত হয়ে জানালে যে হাউই জাহাজ জখম হয় নি। অন্ততঃ জাহাজের ভেতরে তারা নিরাপদ।

কিন্তু জাহাজের বাইরে?

হাউই জাহাজের দরজা খুলে বেরুবার সময় সমরের বুকটা নিজের অনিচ্ছাতেও একবার শিউরে উঠল। হাতের অস্ত্রটা সে তখন বেশ জোরেই চেপে ধরেছে।

বুধগ্রহের ওপর প্রথম পা দেওয়া! উল্লাসে সমরের একবার চীৎকার করে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু চীৎকার করবার কথা তার তখন মনেই নেই। বিস্ময়ে ভয়ে উত্তেজনায় সে তখন স্তব্ধ হয়ে আছে।

তা ছাড়া নামতে গিয়েই নোংরা প্যাচপেচে কাদায় পা ডুবে গেলে চীৎকার করবার কথা মনে থাকে না।

সত্যিই বুধের গ্রহের প্রথম স্পর্শ তারা পেল পাৎলা গভীর কাদায়। কাদা হওয়া অবশ্য আশ্চর্য্য নয়। কারণ বৃষ্টি সেখানে লেগেই আছে। তাও যেমন তেমন বৃষ্টি নয়—

পৃথিবীর মুষলধারে বৃষ্টি তার তুলনায় নগণ্য। এই বৃষ্টির পরিচয় পেতে তাদের দেরী হ'ল না।

কিন্তু তার আগেই বুধগ্রহের একটা রহস্যের কিছু পরিচয় তারা পেয়ে গেল।

তাদের হাউই জাহাজ বুধের জঙ্গল থেঁৎলে নীচে পড়েছিল একথা আগেই বলা হয়েছে।

জঙ্গলের অদ্ভুত গাছ কিরকম তা একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েই সমর প্রথম চমকে উঠল। ষ্টাইনকে ডাকবার জন্যে মুখ ফেরাতে গিয়ে দেখলে ষ্টাইন নীচু হয়ে মাটির ওপর সেই ব্যাপারটা পরীক্ষা করছে।

এ কি রকম গাছ, ষ্টাইন। থেঁৎলে যাওয়া গাছ কি জানোয়ারের মত যন্ত্রণায় কাৎরায়! তাছাড়া তাদের পাতা কই!

ষ্টাইন তার কথায় কোন উত্তর দিলে না। থেঁৎলান গাছের খানিকটা তুলে নিয়ে সে তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে তা পরীক্ষা করছে।

মোটা মোটা সুতোলি কয়েকটা টুকরো সমরও হাতে করে তুলে ধরেছিল সবুজ জোঁকের মত সেগুলো তার হাতের ওপরই কিল বিল করে নড়ে উঠতে ঘেন্নায় ভয়ে শিউরে সে হঠাৎ সেগুলো ফেলে দিল।

সত্যি এ কি রকম গাছ! গাছের মত মাটি থেকে এগুলো পরস্পরের গায়ে জড়িয়ে উঠেছে। গাছের মতই তাদের রঙ সবুজ, কিন্তু পাতার বদলে আছে তাদের অসংখ্য সুতোলি ক্যাঁকড়া আর তার মাঝে মাঝে কুঁড়ির আকারের এক রকম জিনিষ। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা গাছের গা থেকে ছিঁড়ে যাবার পর সুতোলি অংশগুলি ঠিক জীবন্ত প্রাণীর মত নিজে থেকে নড়া চড়া করতে পারে!

এ কি রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার হের ষ্টাইন!

এবার ষ্টাইন উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লে,—আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখবার জন্যেই ত বুধে আসা। তুমি কি ভেবেছিলে বুধে গিয়ে লণ্ডনের সহর দেখবে?

ষ্টাইনের কথার ধরণে চটলেও নিজের কৌতূহল দমন করতে না পেরে সমর আবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝলেন!

এক মুহূর্ত্তেই কি বোঝা যায়?—ষ্টাইনের কথায় ধরণটাই রুক্ষ—তবে যা অনুমান করছি তা সত্যি হ'লে ভারী অদ্ভুত।

সমরই এবার বিরক্ত স্বরে বল্লে—কি অনুমান করছেন সেইটেই ত জানতে চাচ্ছি।

—বল্লে তুমি বুঝবে! ফিলামেণ্টল্ য়্যালজি জান!

তা একটু আধটু জানি—সমর একটু অহঙ্কারের সঙ্গেই বল্লে। জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে পড়াশুনা সে করেছে। অহঙ্কার করতে পারে।

ষ্টাইন তাতে অবশ্য ভ্রূক্ষেপ না করে বল্লে,—পৃথিবীতে সেগুলি অনুবীক্ষণের রাজ্যের জিনিষ, না গাছ না প্রাণী, তারা নড়া চড়াও করতে পারে আবার গাছের মত তাদের গায়ে সবুজ ক্লোরোফিলও আছে। বুধের এই গাছগুলি তাদেরই অনুরূপ কোনো কিছু বলে আমার মনে হচ্ছে। এখানে তাদের আকার অবশ্য অনেক বড়। পৃথিবীতে এটা কল্পনাও করা যায় না।

ষ্টাইন তারপর ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হতে বল্লে,—খুব সাবধানে সঙ্গে এস। প্রথম চোটেই বুধ যে রকম বিস্ময়ের নমুনা দেখিয়েছে তাতে এখানে কোন্ মুহূর্ত্তে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই তেমন ঘটল না। কাদার মধ্যে পা ডুবিয়ে ঘন জঙ্গল কোথাও হাতদিয়ে সরিয়ে চলতে যা একটু কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেই এক ধরণের জীবন্ত গাছ ছাড়া আর কোথাও কিছু চোখে পড়ে না।

বুধে কি এই গাছ ছাড়া আর কোন রকম প্রাণী নেই! কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব।

দেখতে দেখতে যে উঁচু ঢিবিটার ওপর তাদের জাহাজ পড়েছিল তার কিনারে তারা এসে পড়ল।

এখন এগুতে গেলে নীচে নামতে হয়। নামবে কিনা বিবেচনা করছে, এমন সময় এল বৃষ্টি!

বুধের বৃষ্টি যে কি প্রচণ্ড হতে পারে তারা কল্পনাতেও এতক্ষণ বুঝতে পারে নি। আকাশ ভেঙে পড়া কথাটা বুঝি এই খানেই খাটে। তাও আবার হঠাৎ। বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে আচমকা আকাশের বিশাল একটা গামলাকে যেন উবুড় করে ঢেলে দিলে।

গায়ে দুর্ভেদ্য মুখোসওলা পোষাক কিন্তু তবু জলের তোড়েই তাদের মাটির ওপর যেন আছড়ে ফেলে দিতে চায়। কোথাও যে আশ্রয় নেবে এমন জায়গাও নেই। বুধের গাছ আশ্রয় দেবার মত নয়।

বিপদের ওপর বিপদ। হাউই জাহাজের দিকে ফেরার উপায়ও বুঝি নেই। একে বুধের আকাশে আলো নেই বল্লেই হয়, তারপর বৃষ্টিতে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। তাদের মুখোসেই কাঁচে জল লেগে এমন অবস্থা হয়েছে যে তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টিই চলে না। দুজনে কাছাকাছি থাকাই একটা সমস্যা। একজন একটু এগুলে কাঁচের জল মুছেও আর দেখা যায় না। বৃষ্টির দারুণ শব্দের মধ্যে ডেকে সাড়া পাবার ও উপায় নেই।

মিনিট দশেকের মধ্যেও বৃষ্টি না থামাতে সমর রীতিমত ভয় পেয়ে উঠল। দু'তিনবার বৃষ্টির মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরে ইতিমধ্যে তার একেবারে দিক ভুল হয়ে গেছে। হাউই জাহাজ যে কোন দিকে হতে পারে কোন ধারণাই তার নেই। পৃথিবীর জঙ্গলেই পথ হারিয়ে কত জনের মৃত্যুর গল্প সে শুনেছে, শেষে বুধে সেই অবস্থা তার হবে নাকি!

ষ্টাইন এরি ভেতর কোন রকমে একদিকে এগুবার চেষ্টা করছিল। সমর চেষ্টা করছিল যথাসম্ভব তার কাছাকাছি থাকবার! এখন ষ্টাইনের সঙ্গও তার একান্ত কাম্য। যত বড় শত্রুই হোক এসময়ে পৃথিবীর একজনকে কাছে পাওয়া তার কাছে পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু বৃষ্টি কি সত্যিই থামবেনা! কাদা জল এর মধ্যেই তাদের হাঁটু ছাড়িয়ে উঠেছে। টিবির ওপরে যখন এই অবস্থা, তখন নীচে নামলে কি দুরবস্থা না তাদের হ'ত।



যে জীবটী বৃষ্টির ভেতর দিয়ে

এই কাদা জল ঠেলে তারা কতক্ষণে জাহাজে পৌছোবে,—পৌছোতে পারবে কি!

সমরের কাণ মুখোসের মধ্যেই হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠল। এ আবার কিসের শব্দ! জলের ত নয়। ঝাপসা কাঁচ মুছে বৃষ্টির ভেতর চারিদিকে সে দেখবার চেষ্টা করলে—কিছুই দেখতে পেলনা। শব্দটা কিন্তু ক্রমশই কাছে আসছে,—ইউরোপের নানা জায়গায় যে হাওয়া জাঁতা আছে শব্দটা যেন অনেকটা তার মত!

কোন রকম জানোয়ার কি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে! বুধের জানোয়ার কি অদৃশ্য!

না অদৃশ্য মোটেই নয়। হঠাৎ আকাশে চোখ তুলতেই সমর ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। ছোটখাট দুটি সামিয়ানার মত ডানা নেড়ে লম্বা বীভৎস দাঁতাল মুখ সামনে বাড়িয়ে যে জীবটি বৃষ্টির ভেতর দিয়ে উড়ে আসছে তাদের দিকে, অতি বড় দুঃস্বপ্নেও তেমন জীব সে কল্পনা করে নি।

নিজেকে বাঁচাতে সমর কাদা-জলের ওপরেই সভয়ে বসে পড়ল হাতের অস্ত্রটি সজোরে চেপে ধরে। কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার তাকে করতে হ'ল না। গরুড়ের মাসতুত ভাইটি তাকে নিশ্চয় দেখতে পায়নি, তার মাথায় ওপর দিয়ে উড়ে বৃষ্টি ভেতর সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাঁফ ছেড়ে উঠে সমর ষ্টাইনের দিকে ফিরে তাকাল।

কোথায় ষ্টাইন ?

সমর ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল আর একটু। কই তবুও ষ্টাইনের দেখা নেই। এরি মধ্যে কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল !

পোষকের ভেতর সমর তখন রীতিমত ঘেমে উঠেছে ভয়ে।

(ক্রমশঃ)

বাসন্তিকা

শ্রীভবদেব চন্দ্র কর

এলো বাসন্তিকা !
ভালেতে তাহার আঁকা বিজয় টীকা।
চোখেতে কোমল দিঠি, মুখেতে হাসি,
কবরী ভরিয়া দোলে কামিনী রাশি ;
আঁচলে বকুল বেলা, পলাশ রাঙা—
চাঁপার কয়টী কুঁড়ি আধেক ভাঙা !
তুহিন্ শীতের শেষে দিয়াছে দেখা,
প্রিয় বাসন্তিকা ॥
মৌমাছি তাই নাচে ফুলের বুকে,
কৃষ্ণচূড়ার তাই হাসি যে মুখে।
হাস্নুহানা আঁখি মেলিল সুখে,
নাচিছে ছোট্ট টুনি তাদেরে দেখে !

প্রজাপতি হোথা আজি ফুলের বনে,
সুখেতে খেলিছে খেলা ভোমরা সনে।
চঞ্চল কিশলয় ! মলয়-কাণে
সহকার মঞ্জরী আকুল প্রাণে,
কহিল গানে ;
"পেয়েছি তাহার প্রিয় আজিকে দেখা,
মোর বাসন্তিকা !"

——:০:——

ভোরের আলো

এস্কিমোদের দেশে

—দেবাশীষ সেনগুপ্ত—

"তারপর ?"

"তারপর আর কি !—কুকুরের গাড়ী চড়ে কিস্তু আবার গাঁয়ে ফিরে এলো।"

তবু রীণুর তৃপ্তি হয় না। এ গল্প শেষ না হলেই যেন ছিলো ভাল। এমন সুন্দর উপকথাটী এমন চমৎকার ছেলেটী......সব শেষ হয়ে গেলো।

বাবা মা ঘুমিয়ে পড়লেন আস্তে আস্তে। ঘুমন্ত ভাই বোনদের দিকে চেয়ে চেয়ে রীণু ভাবে ছোট এস্কিমোটীর কথা......সাহসী ছেলে কীশুর কথা। ভাবে তাদের কথা—যাদের দেশে বছরে ছ মাস নেই সূর্য্যের আলো যেখানে নেই আইন কানুন.. নেই যুদ্ধ কলহ, আছে শুধু শান্তি—পুর্ণশান্তি...আর আছে মানুষের গুণাবলী—দয়া মায়া স্নেহ শ্রদ্ধা ভক্তি !

কী অপরূপ ! ছোট্ট একখানি গুহার মত ঘর—তা'তে বাস করছে কত লোক—কত পরিবার ! কিন্তু এ প্রশ্ন কারও মনে জাগছে না—ও কেন বেশী জায়গা দখল করলো—আমার তৈরী ঘরে ও কেন এলো !

এলো ঘুম—ঘুম এলো ! অলস আবেশমাখান হাতছুটী দিয়ে রীণু লেপ খানা চেপে ধরলো গায়ের উপরে। ওঃ কি শীত !

কে ?

মাঝরাত্রে রীণুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। কে যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে ;—পীতাভ তামাটে রং তার, একখানা পুরু ঘন লোমশ পশুচর্ম্ম তার পরিধেয়। নীচে আরও উঁকি মারছে চামড়ার কি কি পোযাক সব !

চিনতে রীণুর আর কষ্ট হয় না। এ যে কীশু ! এস্কিমো কীশু !!

দূরের আলো
দেবাশীষ সেনগুপ্ত

"কি চাও গো?"—আনন্দে জিজ্ঞাসা করে ও।

কিন্তু সে কি বুঝতে পারে ওর ভাষা! হাবে ভাবে সে জানায় ওকে নিমন্ত্রণ—ওদের দেশে—এস্কিমোদের দেশে।

চির আকাঙ্খিত মুহূর্ত্ত ওর সামনে। রীণু আর দেরী করতে চায় না। কিন্তু সেখানে যে বড্ড শীত! তাইতো শোনা যায়। এ পোষাকে তো—

কীশু যেন বুঝতে পারে ওর মনের কথা। নীরবে সে তুলে দেয় ওর হাতে একপ্রস্থ পোষাক।—হাঁসের চামড়ার জামা, দুটো পায়জামা—একটা শীলমাছের চামড়ার—লোমশ দিকটা ভিতরে; আর একটা ওদেশীয় হরিণের চামড়ার—লোমশ দিকটা বাইরে এর। একটা লম্বা জামা—ভাল্লুকের চামড়ার।

সর্ব্বশেষে এই পোষাকটী পরলে রীণু। ছেঁড়া ফুটবলের ব্লাডারের মত জামার সঙ্গে টুপির মত একটা পোষাক—মাথাটাও ঢেকে ফেললে। নাঃ! রীণুকে আর চেনাই যায় না!

ওমা! জুতো আর দস্তানার মত ও কি দুটো—ওগুলোও যে পরতে হবে।

ব্যাস!.........চল!............

একি! একি যাদু? ভেল্কী?...এই তো ওরা এসে পড়েছে। ওই তো দেখা যায় এস্কিমোদের ছোট্ট গাঁ খানা। চারিদিকে আবছা আবছা অন্ধকার! সূর্য্য নেই আলোর তেজ নেই। ধূসর ম্লান আলোয় যেন পথ চেনা দুষ্কর।

কিন্তু কীশুর তৎপরতা সত্যিই দেখবার মত। দ্বিধাহীন পদে ও এগিয়ে চলেছে কতকগুলো গোল গোল মাটীর ঢিবির দিকে।......হঠাৎ একটা ঢিপির সামনে এসে ওদের যাত্রাপথ শেষ হয়। একটা অন্ধকার বাতাসহীন সুড়ঙ্গের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার জন্যে কীশু ইঙ্গিত করে রীণুকে।

ওরা এসে উপস্থিত হয় কীশুর বাড়ী বা 'ঈগলু' তে। রীণু লক্ষ্য করে দেখলে—একখানা গুহার মত ঘর—বেশ বড় আর গোল অর্দ্ধেকটা মাটীর নীচে অর্দ্ধেকটা মাটীর উপরে। দেওয়ালগুলো পাথরের মাটী ঘাস শ্যাওলা ইত্যাদি দিয়ে ভর্ত্তি করা করা।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য হ'ল রীণু ঘরের আলোটা দেখে। একরকম নরম পাথর থেকে কাটা বড় বাটীর মতো একটা পাত্র তিমি আর শীলের চর্ব্বিতে ভরা তার ভিতরে একটা লম্বা সল্‌তে, মুখটা জ্বলছে ঠিক আমাদের দেশের প্রদীপের মতো। আরও অবাক কাণ্ড! বাতিটা উনুনেরও কাজ করছে!—কীশুর মা ওর উপরে মাংস আর কি কি সব যেন সিদ্ধ করছেন। ......হঠাৎ একখানা ভল্লুকের মাংসের টুকরো আর একটা বরফ জমা মাছ কাঁচা খেতে খেতে

কীশু প্রমাণ করে দিলে যে সেদ্ধ না করেও ওগুলো খাওয়া চলে—আর সকলে খায়ও !

রীণু চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

ঘরের এককোণে বসে কীশুর বোন কতকগুলো হাঁসের চামড়া জুড়ে জুড়ে একটা জামা সেলাই করছে। ওর সুঁচটা কোনও পাখীর পাতলা হাড়ের আর সুতো—পশুর শুকনো নাড়ীভুঁড়ি।

মেজের উপর একটা প্রকাণ্ড শীল মাছ পড়ে—খানিকটা ছাল ছাড়ানো...একটু আগে কীশুর মা কয়েক খণ্ড কেটে নিয়ে গেছেন।

অন্যপাশে কীশুর বাবা তিমির মেরুদণ্ডের ধনুকাকৃতি প্রকাণ্ড হাড় এবং শেয়ালের চামড়া পাকান নাড়ী দিয়ে একখানা ধনুক তৈরী করছেন আর মাঝে মাঝে পাশের মাটীর পাত্র থেকে শিলের মাংসটুকরো তুলে নিয়ে মুখে ফেলছেন। আঁটসাঁট পোষাক পরা বেঁটে চেহারায় তাকে দেখাচ্ছে—যেন ঠিক একটী ভাল্লুক !

অন্য একদিকে শুধু জলচারী ও স্থলচারী পশুপক্ষীদের হাড় দিয়ে তৈরী করা একখানা উঁচু পালঙ্ক। কীশু সেইদিকে চেয়ে কি ইঙ্গিত করলে রীণুকে। কৌতুহলী হয়ে রীণু কাছে গিয়ে দেখে—পাখীর পালক বোনা ছোট বড় কতকগুলো থলি পড়ে আছে পালঙ্কখানার উপর। বা-রে ! হঠাৎ একটা থলি নড়ে উঠলো। বিস্মিত রীণু দেখে থলির বাইরে একটী ছোট মাথা আকুলি বিকুলি করছে। বেশ মজা তো ! তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে রীণু আরও দেখলে প্রত্যেক থলির মুখেই একটা করে ছোট মাথা।—মাথাটা বাইরে রেখে শিশুদের পাখীর পালকের থলিতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

এদিকে শিশুটী কেঁদে জেগে উঠতেই কীশু আর তার বোন ছুটে এলো। তাড়াতাড়ি ওকে থলিশুদ্ধ তুলে নিয়ে ওরা দুজনে কাড়াকাড়ি করে বাচ্চার নাকে নাক ঘষতে সুরু করে দিলে।

এ আবার কি আদর রে বাবা।...রীণু অবাক ! ছোট ছেলেকে আদর করতে হলে আমরা তো তার চোখে মুখে গালে চুমোর রাশি ছড়িয়ে দি। কই—নাকে নাক তো ঘসি না—কেউ ঘষে এমনও তো কই শোনা যায় নি।

কীশু ওকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়—এই ওদের রীতি।

শিশুর খাবার সময় হয়েছে। কীশুর মা একবাটী টুকরো টুকরো বরফ জমা তিমির চর্ব্বি নিয়ে এলো। শিশুকে খাইয়ে অবশিষ্ট যা থাকলো তা সাবাড় করলো কীশু আর

তার বোন। রীণুকে ওরা দুজনেই বার বার অনুরোধ করলে ওদের এই ভোজে অংশ নিতে কিন্তু রীণু প্রাণপণে মাথা নাড়তে নাড়তে দূরে সরে গেলো। মা গো! মানুষে—বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি করে ওটা খায়—রীণুর ভারী আশ্চর্য্য লাগে! কীশুও আশ্চর্য্য হয় এমন সুন্দর উপাদেয় খাবারটা রীণুর ভাল লাগলো না। ওদের এই মাংস কেউ অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কী করে—কীশু তা ভেবে পায় না।

মা এসে ছেলেটাকে থলি থেকে বের করে নিলো; ওর পোষাকের পিছনে একটা লোমশ পকেটের মধ্যে রেখে দিয়ে সে কাজ করতে লাগলো। রীণু বিস্মিত হয়ে দেখলে—মা হাড়ের লম্বা লম্বা র‍্যাকে পোষাক শুকুতে দিচ্ছে আর শিশুটী নির্ব্বিকারভাবে সেই পকেটের মধ্যে বসে আছে মাঝে মাঝে আবার খিল্‌খিল্ করে আপন মনে হাসছে। অবশ্য আমাদের দেশেও এ দৃশ্য বিরল নয়। দার্জ্জিলিং সিমলা নেপাল কাশ্মীর ইত্যাদি পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসিনীরা বিশেষতঃ যারা শ্রমজীবিনী তারা তাদের শিশুসন্তানদের এমনি পিঠে বেঁধে নিয়ে চলাফেরা করে—নিত্যকার কাজকর্ম্ম করে।

কীশুর বাবার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ধনুকটি বারকতক পরীক্ষা করে সেটা একটা হাড়ের হুকে টাঙ্গিয়ে রেখে দিলো তারপর আস্তে আস্তে সেই হাড়ের তৈরী পালঙ্কের উপর শুয়ে পড়লো।

একটি জিনিষ রীণু লক্ষ্য করে দেখলে—ওদের দেশে কাঠ আর লোহার স্থান অধিকার করে আছে জীবজন্তুর হাড়! সবই ওখানে হাড়ের তৈরী।

আরে! মজা মন্দ নয় তো!! কীশুর মা কীশুর বাবাকে খাইয়ে দিচ্ছে আর সে বেশ আরামের সঙ্গে চক্ষু বুজে মাংস ও চর্ব্বিগুলো গলাধঃকরণ করে চলেছে!

রীণুর আক্ষেপের সীমা রইলো না। এমন চমৎকার দৃশ্যটি তার মা একবার দেখতে পেলেন না!

ওদিকে কীশু বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত। হাতছানি দিয়ে সে ডাকলে রীণুকে। কুকুরগুলো বিকটরবে ঘেউ ঘেউ শব্দ করছে। নেকড়ে বাঘের মত ছ'টা কুকুর একসঙ্গে চামড়া দিয়ে বাঁধা—ছ'টার গলা থেকে ছ'টা বল্গা এসে মিশেছে এক জায়গায়।

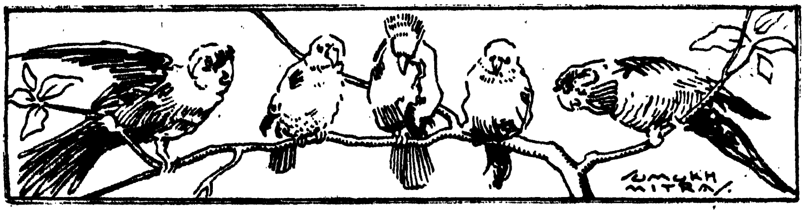
কুকুরগুলো বোনের হাতে দিয়ে বাইরে বরফের স্তূপ খুঁড়ে কীশু বের করলো একখানা হাল্কা গাড়ী—সবটাই হাড়ের তৈরী তার।

গাড়ীখানা কুকুরে জুততে বেশী দেরী লাগে না। কুকুরগুলোর জন্যে কিছু মাংস সঙ্গে নিয়ে একবার বোনের নাকে নাক ঘেসে সে উঠে পড়ে, রীণুকেও ইঙ্গিত করে তার পাশে উঠে বসতে।

উঃ! কী জোর চলেছে গাড়ীখানা। চাঁদের আলোয় ধু ধু করছে সাদা বরফের বিস্তীর্ণ প্রান্তর; কোথাও ঢালু কোথাও উঁচু;—চড়াই উৎরাই সমস্ত অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে চলেছে ওরা দু'জনে। রীণুর ভারী ইচ্ছে হয় কীশুর সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু ও যে এস্কিমোদের ভাষাই জানে না। অবশ্য ভাষা জানলেও সরলভাবে ওরা ভাবের আদান প্রদান করতে পারতো না, কারণ অনেক কথার পরিভাষা—যে সব কথা ওরা ব্যবহার করে না তার প্রতিশব্দ—ওদের ভাষায় নেই! বই খাতা পেন্সিল কলম ট্রাম ষ্টিমার ট্রেন—এসব ওরা জন্মেও জানে না—তাই ও সব কথা ওদের ভাষায় ব্যক্ত করবারও উপায় নেই!

কীশুরও হয়তো ইচ্ছে হয় রীণুর সঙ্গে কথা বলবার। হয়তো ভাষা না জানার জন্যে ওরও মনে দুঃখের সঞ্চার হয়। উপায় থাকলে হয়তো সেও বলতো কত কথা!—বলতো গ্রীষ্মকালে তাদের অভিযান কাহিনী। সূর্য্যের আলো পেয়ে তখন তারা কী ভাবে ঐ 'ঈগলু' ছেড়ে চামড়ায় তৈরী তাবু বা 'তাপিকে' উঠে এসে বসবাস করে। আর বলতো কোথায় কোন্ পাখী কোন্ মাছ চুপিচুপি লুকিয়ে থাকে, গলান বরফের মধ্যে দিয়ে বা তার ছোট্ট 'কয়াক' (নৌকো) এ করে কেমন করে সে কত বিপদ আপদের সম্মুখীন হয়ে তাদের বর্শাবিদ্ধ (হাড়ের তৈরী হারপুণ) করেছে—সেই উত্তেজনাময় শিকার কাহিনী। হঠাৎ গাড়ীটা সশব্দে থেমে গেল। আর সে শব্দে......।

ওমা একি! বিছানায় শুয়ে রীণু এই শীতেও বুঝি ঘেমে উঠেছে।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোপীনাথের মহাপ্রস্থান

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে ইন্‌স্পেক্টার সুন্দরবাবু যখন মাণিকের সঙ্গে এসে হাজির হলেন, জয়ন্ত তখন অস্থির পদে ফুটপাথের উপরে পায়চারি করছে।

অধীর কণ্ঠে সে বললে, "এত দেরি হ'ল কেন সুন্দরবাবু ?"

সুন্দরবাবু তাঁর মাথা-জোড়া ঘর্ম্মাক্ত টাকের উপরে রুমাল চালনা করতে করতে বললেন "হুম্! দেরি হবে না ? শুনলুম বাড়ী খানাতল্লাস করতে হবে, উপরওয়ালার কাছ থেকে হুকুমনামা আনতে হ'ল যে !…… কিন্তু ব্যাপার কি জয়ন্ত ? সত্যিই কি তুমি সুরেনবাবুর হত্যাকারীর খোঁজ পেয়েছ ?"

—"আমার তো তাই বিশ্বাস। অন্তত, যাকে আমরা ধরতে চাই, সে আজ প্রত্নতাত্ত্বিক অমলবাবুকে খুন করতে উদ্যত হয়েছিল।"

—"হুম্। মাণিকের মুখে সব আমি শুনেছি। শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আবার এক নতুন রহস্য-সাগর আবিষ্কার করেছ ! পদ্মরাগ বুদ্ধ, নক্সা-আঁকা সোনার চাক্‌তি, একটা চাবি ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

জয়ন্ত বললে, "এখন ও-সব বোঝাবুঝির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন। চলুন, ঐ বাড়ীর ভেতরে যাই।"

—"কিন্তু অপরাধী কি এখনো ওখানে আছে ?"

—"বর্ম্মীদের উপরেই আমার সন্দেহ ! কিন্তু এবাড়ীর ভেতর থেকে এখনো কোন বর্ম্মী লোক বাইরে বেরোয় নি। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, এখান থেকে বেরুতে গেলে এই সদর দরজা দিয়েই বেরুতে হবে।"

—"বেশ, তবে চল।"

এত পাহারাওয়ালা দেখে দ্বারবানের দুই চক্ষু বিস্ময়ে ছানাবড়ার মতন হ'য়ে উঠল!

সুন্দরবাবু পুলিসসুলভ কর্কশ কণ্ঠে বললেন, "এই পাঁড়ে!"

দ্বারবান মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, "আমি পাঁড়ে নই হুজুর, আমি হনুমান চোবে!"

—"তুমি হনুমান চোবেই হও, আর জাম্বুমান পাঁড়েই হও, সে কথা আমি জানতে চাই না! আমাদের তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে চল!—"তারপর পাহারাওয়ালাদের দিকে ফিরে সুন্দরবাবু হুকুম দিলেন, "এই সেপাই! আমার সঙ্গে জন-ছয়েক লোক এস, বাকি সবাই এইখানে পাহারা দাও,—কেউ যেন এই বাড়ীর বাইরে যেতে না পারে!"

জয়ন্ত ও মাণিক সবাইকে নিয়ে একেবারে তেতালায় গিয়ে উঠল। বর্ম্মীদের ঘরের দরজা তখনো বন্ধ ছিল। সুন্দরবাবুর পাল্লার উপরে এক লাথি মারতেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিলে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, চারজন বর্ম্মী বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দরবাবু রুক্ষ স্বরে বললেন, "এই মগের বাচ্চারা! দেশ ছেড়ে তোরা কলকাতায় কি করতে এসেছিস্?"

একটা লোক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললে, "আমরা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি।"

—"হুম্। মানুষ মারবার ব্যবসা? ওহে জয়ন্ত, এ বেটাদের কোন্‌টাকে তুমি চাও?"

বর্ম্মীদের কাছে এগিয়ে এসে জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকের অপাদমস্তক লক্ষ্য ক'রে বললে, "তোমরা ক-জন এখানে থাকো?"

তারা জবাব দেবার আগেই দ্বারবান হনুমান চোবে বললে, "হুজুর, এখানে দুটো ঘর নিয়ে ছ-জন বর্ম্মী থাকে।"

জয়ন্ত বললে, "এরা তো মোটে চারজন দেখছি। আর দুজন কোথায়?"

একজন বর্ম্মী বললে, "আধঘণ্টা আগে তারা বাইরে বেরিয়ে গেছে।"

জয়ন্ত চুপিচুপি সুন্দরবাবুকে বললে, "এ লোকটা মিছে কথা কইলে। আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি, আজ সকাল থেকে কোন বর্ম্মী লোক বাড়ীর বাইরে পা বাড়ায় নি।"

—"হুম্, মিছেকথা, না? তাহ'লে বেটাদের মনে নিশ্চয়ই পাপ আছে! চল, ভেতরের ঘরটা খুঁজে দেখি!"

কিন্তু অন্য ঘরে ঢুকেও বাকি দুজনের দেখা পাওয়া গেল না।

সুন্দরবাবু ফিরে বললেন, "এই জাম্বুমান পাঁড়ে!"

দ্বারবান হাত জোড় ক'রে বললে, "হুজুর' আমার নাম হনুমান চোবে!"

—"ও একই কথা। সকাল থেকে তুমি দেউড়ীতে আছ?"

—"হাঁ হুজুর!"

—"দুজন বর্ম্মীকে তুমি বাইরে যেতে দেখেছ?"

—"না হুজুর!"

—"তাহ'লে তারা কি হুস্ ক'রে আকাশে উড়ে গেল?"

—"বড়ই তাজ্জবের কথা হুজুর! আরো দুজন লোক এ ঘরে থাকে—একজন ভয়ানক ঢ্যাঙা, আর একজন ভয়ানক বেঁটে!

মাণিক জয়ন্তের কাণে কাণে বললে, "চ্যান্ আর ইন্-এর চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে!"

জয়ন্ত কেবল বললে, "হুঁ।"

সুন্দরবাবু বললেন, "জয়ন্ত, এখন আমাদের কি করা উচিত?"

জয়ন্ত বললে, "সেই চাকৃতি আর চাবি খোঁজ। যদিও ও-দুটো জিনিষ খুব-সম্ভব সেই অদৃশ্য লোক-দুটোর সঙ্গেই আছে, তবু একবার এই ঘরদুটো খুঁজে দেখা যাক্।"

খানাতল্লাস সুরু হ'ল। দুটো ঘরের সমস্ত ওলট্-পালট ক'রে, এমন-কি বিছানার বালিস পর্য্যন্ত ছিঁড়ে খুঁজে দেখা হ'ল, কিন্তু চাবি আর চাকৃতি পাওয়া গেল না।

ঘর থেকে বাইরে এসে সুন্দরবাবু বললেন, "সে মগদুটো তাহ'লে বাড়ীর অন্য-কোথাও লুকিয়ে আছে। এই জাম্বুমান—"

—"হুজুর, হনুমান—"

—"না, আমি তোমাকে জাম্বুমান ব'লেই ডাকব! বারান্দার ওপাশের ঐ ঘরে কে থাকে?"

—"একজন মাদ্রাজী সদাগর।"

—"আচ্ছা, আগে ঐ ঘরখানাই দেখা যাক্। এস জয়ন্ত! এই সেপাই, হুঁসিয়ার! মগের বাচ্ছাগুলো যেন স'রে না পড়ে!"

বারান্দার ওপাশের ঘরের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, সুন্দরবাবুর ধাক্কাধাক্কিতেও কেউ খুলে দিলে না।

জয়ন্ত সুধোলে, "হনুমান চোবে, এ ঘরে যে মাদ্রাজী থাকে তার নাম জানো?"

—"জানি হুজুর! গোপীনাথ নায়ড়ু।"

সুন্দরবাবু হাঁক্লেন, "গোপীনাথ! গোপীনাথ!"

কোন সাড়া নেই।

দ্বারবান একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "গোপীনাথবাবু তো খুব ভোরে ওঠেন, তবে এখনো দরজা বন্ধ কেন?"

সুন্দরবাবু আবার পদযুগল ব্যবহার করলেন, চার-পাঁচবার লাথি মারবার পরেই খিল ভেঙে দড়াম্ ক'রে দরজার পাল্লাদুটো খুলে গেল!

হুড়মুড়্ ক'রে ঘরের ভিতরে ঢুকেই সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে 'হুম্' ব'লে চীৎকার ক'রে বেগে আবার পিছিয়ে এলেন।

মাণিক বললে, "কি হ'ল সুন্দরবাবু, কি হ'ল ?"

সুন্দরবাবু আবার বললেন, "হুম্ !"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলে, তা ভয়াবহ !

দরজার ঠিক সামনেই মেঝের উপরে চিং হয়ে চারিদিকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটা লম্বা-চওড়া মাদ্রাজী,—তার বুকের উপরে আমূলবিদ্ধ একখানা মস্ত ছোরা ! এবং ক্ষত দিয়ে তখনও রক্তস্রোত বেরিয়ে আসছে !

দ্বারবান বিহ্বল স্বরে ডাকলে, "গোপীনাথবাবু, গোপীনাথবাবু !"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "গোপীনাথবাবু এ-জীবনে আর কথা কইবে না !"

সুন্দরবাবু বললেন, "গোপীনাথকে এখনি কেউ খুন করেছে ! সাবধান, খুনী ঘরের ভিতরেই আছে, কারণ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল !"

জয়ন্ত ঘরের চতুর্দ্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "জান্‌লার দিকে চেয়ে দেখুন। খুনী পালিয়েছে !"

একটা খোলা জান্‌লার দুটো লোহার গরাদে দুমড়ে ফাঁক্ হয়ে রয়েছে !

জান্‌লায় কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরবাবু বললেন, "বাপ্ ! গায়ে কত জোর থাকলে এমন লোহার গরাদে তারের মতন দুমড়ে ফাঁক ক'রে পালানো যায় ?"

মাণিক বললে, "এ চ্যান্ ছাড়া আর কেউ নয় ! কিন্তু চ্যান্ এই গোপীনাথ-বেচারাকে খুন করলে কেন ?"

সুন্দরবাবু এদিকে-ওদিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ ক'রে বললেন, "দেখ মাণিক, ঘরের সমস্ত জিনিষ লণ্ডভণ্ড ! যেন কেউ এখানে মালপত্তর উল্টেপাল্টে কিছু খুঁজেছিল !"

ঘরের সর্ব্বত্রই রাশি রাশি চটিজুতো, কাঠের পুতুল, 'ল্যাকারে'র কৌটো প্রভৃতি ছড়ানো রয়েছে !

মাণিক বললে, "দেখছি, সমস্ত জিনিষই বর্ম্মায় তৈরি ! গোপীনাথ কি বর্ম্মা থেকেই এগুলো আনিয়ে ব্যবসা করত ?"

দ্বারবান বললে, "হাঁ বাবুজী !"

সুন্দরবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "আবার দেখছি একটা নতুন মামলা ঘাড়ে চাপল। যাই উপর-অলাদের কাছে খবর পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আসি গে !"

সুন্দরবাবু বাইরে গেলেন। মাণিক বললে, "জয়, তুমি বোবা হয়ে কি ভাবছ বল দেখি ?"

জয়ন্ত দুই হাতের ভিতরে মাথা রেখে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সেছিল। সে মুখ তুলে বললে, "মাণিক, আমি মনে মনে আঁক কষ্‌ছিলুম। দুই আর দুই যোগ দিয়ে দেখলুম, চার হয়।"

—"অর্থাৎ ?"

—"মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমার কথা সত্য হওয়া উচিত। নইলে গোপীনাথের মৃত্যুর কোন অর্থই হয় না। এই যে গোপীনাথবাবু, যিনি এইমাত্র স্বর্গারোহণ করেছেন, এঁর ব্যবসা ছিল ব্রহ্মদেশ

থেকে মাল আমদানি করা। অতএব ধ'রে নেওয়া যাক্, গোপীনাথ নিজেও অনেকবার বর্ম্মায় গিয়েছে, আর বর্ম্মী ভাষাও তার অজানা নয়। গোপীনাথ হঠাৎ একদিন এই ঘরে ব'সে দেখলে যে, একদল বর্ম্মা লোক সাম্‌নের ঐ ঘর দুখানা ভাড়া নিলে। কলকাতার এই পাড়ায় এটা খুব স্বাভাবিক নয়। তারপর সে দেখলে বর্ম্মীদের হাবভাব রহস্যময়। তারা কোন কাজ করে না, কেবল রাস্তার ওপাশে অমলবাবুর বাড়ীর দিকে নজর রাখে, আর বর্ম্মী ভাষায় কি পরামর্শ করে! গোপীনাথও তখন কৌতূহলী হয়ে তাদের উপরে আড়ি পাতলে, তাদের গুপ্তকথা জেনে ফেললে! তখন সেও তাদের উপরে—আর অমলবাবুর বাড়ীর উপরে পাহারা দিতে লাগল। কাল রাত্রের সমস্ত ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখেছিল। আমার পকেটে যে চাকৃতি আর চাবি আছে, গোপীনাথ তা জানত। চ্যান্ আর ইন্ কোম্পানী আজ সকালে ভয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারে নি বটে, কিন্তু গোপীনাথ তাদেরও চেয়ে সাহসী, এমন সুযোগ সে ছাড়লে না। সে মারলে আমাকে ধাক্কা, আমি প'ড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেলুম, সেই ফাঁকে গোপীনাথ আমার চাকৃতি আর চাবির অধিকারী হ'ল। কিন্তু তার দুর্ভাগ্যক্রমে উপরের বারান্দা থেকে চ্যান্ আর ইন্ কোম্পানীর কেউ সেই দৃশ্যটা দেখে ফেললে। তারই ফলে গোপীনাথকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে! মাণিক, আমি কি অঙ্ক কষতে ভুল করেছি বলে মনে কর?"

ইতিমধ্যে কখন্ সুন্দরবাবু আবার ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন এবং জয়ন্তের কথা কিছু-কিছু শুনেছেন! তিনি বললেন, "না জয়ন্ত! তুমি তো অঙ্ক কষ্‌ছ না, তুমি কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ তৈরি করছ! হুম, ঐ তো হচ্ছে সখের গোয়েন্দাদের বদ্-স্বভাব! তারা যখন কবিত্ব করে, আসল অপরাধী তখন কেল্লা ফতে ক'রে সরে পড়ে!"

সে কথায় কাণ না দিয়ে মাণিক বললে, "তাহ'লে তোমার মত হচ্ছে, গোপীনাথকে খুন ক'রে চ্যান্ আর ইন্ এই ঘর খানাতল্লাস ক'রে চাবি আর চাকৃতি নিয়ে ঐ জান্‌লা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে?"

জয়ন্ত কিছু বললে না, সাম্‌নের দেয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তার দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে মাণিক দেখলে, সাম্‌নের দেয়ালের গায়ে একখানা বড় 'ব্রমাইড এন্‌লার্জমেন্ট' ছবি টাঙানো রয়েছে। ছবিখানা মৃত গোপীনাথের কিন্তু উল্টো ক'রে টাঙানো রয়েছে!

মাণিক বললে, "চ্যান্ আর ইন্ দেখছি ছবিখানা নিয়েও টানাটানি করেছিল, তারপর তাড়াতাড়ি উল্টো টাঙিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "না। তারা যদি ঐ ছবিখানা নামাত তা'হলে আবার ওখানা টাঙিয়ে রেখে যাবার মাথাব্যথা তাদের হ'ত না বোধহয়। দেখ না, ঘরের যে সব জিনিষ তারা ঘেঁটেছে, কোনটাই গুছিয়ে রেখে যায় নি।"

—"তবে?"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার মাথা আর মুণ্ডু! এখন উল্টো আর সোজা ছবি নিয়ে গোলমাল করবার সময় নয়, আমাকে কাজ করতে দাও!

জয়ন্ত বললে, "এ হচ্ছে সম্ভবত গোপীনাথেরই কাজ! সে ছবিখানা নামিয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি টাঙিয়ে রেখেছিল, সোজা হ'ল কি উল্টো হ'ল সেটা দেখবার সময় আর পায় নি।"

—"কিন্তু তার এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কি?"

—"ছবিখানা আর একবার নামালেই হয়তো কারণ বোঝা যাবে!"—এই ব'লে জয়ন্ত উঠে গিয়ে ছবিখানা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর সেখানা উল্টে দেখলে, ছবির পিছনে পিচ্‌বোর্ডের এক জায়গা উঁচু হয়ে আছে এবং দুটো কাঁটা-পেরেকও তুলে ফেলা হয়েছে!

জয়ন্ত পিচ্‌বোর্ড ফাঁক্ ক'রে ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করলে, একটা চাবি ও একখানা সোনার চাক্‌তি!

মাণিক ও সুন্দরবাবুর দৃষ্টি একেবারে চমৎকৃত!

জয়ন্ত খুসি কণ্ঠে বললে, "চাবি আর চাক্‌তি চুরি ক'রে গোপীনাথ ঘরে এসে ঢুকল। তাড়াতাড়ি জিনিষ দুটো ছবির পিছনে ঢুকিয়ে রেখে দিলে। এমন সময়ে চ্যান্ আর ইনের প্রবেশ। গোপীনাথ বধ। খুনীরা খানাতল্লাসিতে প্রবৃত্ত। সদলবলে আমাদের পুনরাগমন। জান্‌লা-পথে চ্যান্ আর ইনের পলায়ন। সুন্দরবাবু, দেখছেন, কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ সব সময়ে ব্যর্থ হয় না? আলেকজান্দার একেবারেই পৃথিবী জয় করেন নি, প্রথমে তিনি কল্পনাতেই পৃথিবী-জয়ের উপায় স্থির করেছিলেন! যার কল্পনাশক্তি নেই দুনিয়ায় তার পরাজয় পদে পদে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "দৈবগতিকে যখন জিতে গেছ, তখন দু'কথা শুনিয়ে দাও ভায়া, শুনিয়ে দাও! এই জাম্বুমান পাঁড়ে—"

—"হুজুর, হনুমান চোবে—"

—"ও একই কথা! নীচে গোলমাল শুনছি! বোধহয় বড় সায়েব এলেন! তোমরা এখন এখান থেকে চ'লে যাও!"

জয়ন্ত বললে, "আমাদের হারানিধি আবার ফিরে পেয়েছি, আমাদেরও এখানে থাকবার আর দরকার নেই। কিন্তু সুন্দরবাবু, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা ব'লে যাই। এই মামলাটা আপনি অন্য ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মাস-খানেক ছুটি নিন।"

—"কেন?"

—"আর আমরা কলকাতায় থাকছি না! এই নাটকের পরের দৃশ্য সুরু হবে একেবারে কাম্বোডিয়ার জঙ্গলে, ওঙ্কারধামের ধ্বংসস্তূপে! আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্।"

ক্রমশঃ



একটি ঘোড়ার মৃত্যু

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি. এ.

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল সকালবেলায় খবরের কাগজ সহযোগে চা পান করছিলেন; অর্থাৎ খবরের কাগজ পড়ছিলেন ও চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন। পাশের জান্‌লা দিয়ে তাঁর পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মত সকাল বেলার মিষ্টি রোদটুকু লুটিয়ে পড়েছে। এমন সময় তাঁর পুরোণো চাকর মুখ কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়ালো এবং গলার স্বরকে যতদূর সম্ভব করুণ করে আর্ত্তস্বরে বলল, "কর্ত্তাবাবু, সর্ব্বোনাশ হয়েছে!"

কর্ত্তাবাবু খবরের কাগজটা থেকে মুখ তুলে তা'র দিকে চাইলেন, চশমাটাকে ঠেলে তুল্‌লেন কপালের ওপর এবং পরিশেষে কট্‌মট্‌ করে তা'র দিকে চাইলেন! অর্থাৎ কি হয়েছে ভুমিকা ছেড়ে বল্।

খানিক ইতস্ততঃ করে চাকর বল্‌ল, "হুজুর! এই মাত্তোর থানা থেকে খবর আন্‌লুম—বোপদেব মারা গেছে।"

"কি?" ভূমিকম্পের পাহাড়ের মত শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল কাঁপ্‌তে লাগলেন সম্মিলিত ক্রোধ এবং উত্তেজনার বশে! "কি বল্‌লি?—বোপু মরে গেছে?" আর তারপরে যা হল তা বর্ণনা করা যথেষ্ট শক্ত। তিনি চায়ের পেয়ালাটা ছুঁড়লেন চাকরের উদ্দেশে, অর্থাৎ বোপদেবের মৃত্যুর কারণ সে যেন নিজে। কিন্তু বুদ্ধিমান চাকর একটা অঘটনের ভয়ে বহু আগেই সরে পড়েছিল! ·········তারপর চেয়ার উল্টুলো, টেবল ভাঙ্গল, খবরের কাগজ ছিঁড়ল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই সমস্ত পাড়াটা জান্‌তে পারল এই বোপদেবের মৃত্যুর হৃদয় বিদারক খবর।

একটি ঘোড়ার মৃত্যু
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বোপদেব কর্ত্তাবাবুর আদরের ঘোড়া।

এই অঘটনের যথার্থ কারণ জানতে হলে আমাদের অনেকটা পেছিয়ে যেতে হবে ;

গ্রামটির নাম চন্দনপুর। এখানে অবস্থাপন্ন বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল এবং নিত্যধন লাহিড়ী। কেউই কারুর আঁচ সহ্য করতে পারেন না এবং দু'জনেই পরস্পরের নিন্দে করতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন! প্রত্যেকে সুযোগ পেলেই তা'র বিপক্ষকে নিজের চেয়ে ছোট বলে প্রমাণ করেন।

ঠিক মাস সাতেক আগে চন্দনপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে নন্দনপুরে একটা প্রকাণ্ড মেলা বসে। আশেপাশের গ্রাম এই মেলার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘনশ্যাম ও নিত্যধন শুনলেন সেই মেলার কথা আর এমনই দুর্ভাগ্য দু'জনে ঠিক একই দিনে মেলা দেখতে বেরুলেন।

দুপুর তখন বারোটা। ঘনশ্যাম স্নান করে ভাত খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে নিজের অতি আদরের ঘোড়া বোপদেবের পিঠে চেপে বসলেন ও মাথার ওপর একটি ছাতি খুলে যাত্রা সুরু করলেন। প্রায় মাঝ পথে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে নিত্যধনের দেখা, তিনিও চলেছেন মেলায়, তবে পায়ে হেঁটে—কারণ বোপদেবের মত ঘোড়া তাঁর নেই ; তবে তাঁর দুটো গরু ও একটা বলদ আছে এবং বলদটিকে তিনি মাণিক বলে ডাকেন। ঘনশ্যামের এই ঘোড়ার জন্যে যথেষ্ট গর্ব্ব এবং ঘোটকহীন নিত্যধনের চেয়ে তিনি যে ধনে এবং মানে বড় প্রায়ই সে কথা তিনি ঘোষণা করে থাকেন। আজ এই রকম অবস্থায় নিত্যধনকে দেখে তিনি একটু মুচকি হাসলেন ও খোঁচা দিয়ে বললেন, "কি হে ভায়া! বলি তোমার মাণিকের কি হল? তা'র পিঠে চড়লেই তো পারতে!

এই খোঁচায় নিত্যধনের সর্ব্বাঙ্গ রী রী করে জ্বলে উঠল এবং সেটাকে সম্পূর্ণ হজম করতে না পারায় তিনি মুখটাকে কুঁচকে এবং আধ হাত পরিমাণ জিব ব'ার করে তা'র মৌন প্রত্যুত্তর জানালেন। ঘোড়ার পিঠে বসে ছাতাটাকে বন্ধ করে ঘনশ্যাম দু'হাতের সংযোগে একটি নিখুঁত বক দেখালেন!

নিত্যধনের আজ এই মেলায় আসার একটা গুপ্ত কারণ ছিল। সত্যি বটে তাঁর ঘনশ্যামের মত ঘোড়া নেই কিন্তু একটা প্ল্যান তাঁর মাথায় এসেছে যাতে অতি সহজেই তিনি ঘনশ্যামকে পরাস্ত করতে পারবেন।—প্ল্যানটা আর কিছু নয়; সেবার কোলকাতায় এসে তিনি কোনও দোকান থেকে তাঁর মাপের একটি সুট কিনে আনেন এবং একটি সোলার হ্যাটও বাদ দেন নি সেই সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিছানার ভেতর করে সোলার টুপিটা আনায়

তেব্ড়ে গিয়ে টুপির টুপিত্ব আর ছিল না। আজ তিনি তাই মেলায় চলেছেন, যদি সেখানে সোলার টুপি পাওয়া যায়। এই টুপি হলেই তিনি নিখুঁত সাহেব হয়ে চন্দনপুরকে তোলপাড় করে ছাড়বেন এবং পরাজিত ঘনশ্যামের মুখ যে আরও গোলাকার হয়ে উঠ্‌বে তা'তে সন্দেহ নেই!

নিত্যধন যখন মেলায় এসে পৌঁছলেন তখন প্রায় বিকেল। অনেক লোক এসেছে আর চারিদিক গমগম্ করে উঠেছে সেই ভীড়ে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তিনি পুলকিত হয়ে উঠ্‌লেন—সাম্‌নেই একটা টুপির দোকান! ভালো দেখে একটা টুপি পছন্দ করে তিনি জিগ্‌গেস্ কর্‌লেন, "দাম কত হে?"

"আজ্ঞে আড়াই টাকা।"

"অ্যাঁ, আড়াই টাকা? বল কি? একটাকায় হবে?" দোকানদার ভালো করে নিত্যধনকে দেখল তারপর পাশের কুমোরের দোকানটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌ল, যান্ বাবু ওই দোকানে। দু'পোয়সায় একটা হাঁড়ি মিলবে—মাথায় দেওয়াও যা'বে, চিড়ে ভি ভিজবে!

নিত্যধন এই অপমানে রেগে টং হ'য়ে উঠলেন এবং অন্য টুপির দোকানের খোঁজে সশব্দে সে জায়গা ত্যাগ করলেন।

ঘনশ্যাম মণ্ডল অনেক আগেই সেই মেলায় এসে পৌঁছেছিলেন। ঘোড়াটাকে কাছের একটা গাছে বেঁধে রেখে তিনিও মেলার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

এদিকে হয়েছে কি হারু বাগদি ঠিক সেই দিনই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। পকেট-কাটার অভিযোগে এই নিয়ে সে পঞ্চমবার জেল খেটেছে! হাতে তার পয়সা কড়ি কিছুই নেই। তাই সে-ও আজ এই মেলায় এসেছে যদি 'সৎ' উপায়ে সে কিছু রোজকার কর্‌তে প্যারে। কিন্তু লোকগুলো যেন বেজায় চালাক হয়ে গিয়েছে! কিছুতেই সে সুবিধে করতে না পেরে একটা গাছের তলায় এসে বসল। এই গাছটাতে ঘনশ্যাম বোপদেবকে বেঁধে মেলা দেখতে গিয়েছেন। খানিক এদিক ওদিক চেয়ে হারু বাগদি হঠাৎ লাফিয়ে উঠল এবং চীৎকার করে বলে চল্‌ল "খুব শোস্তায় ঘোড়া যাচ্ছে বাবু। ছো-টাকা—ছো-টাকা···।" মেলায় অনেক রকম জীব-জন্তু বিক্রী হচ্ছিল তাই এই ঘোড়া বিক্রীর ব্যাপারটা মোটেই বে-মানান হল না!

নিত্যধন আর টুপির দোকানের খোঁজ না পেয়ে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার এই সুলভ মূল্য শুনে লাফিয়ে উঠলেন ও হারুর কাছে এসে ঘোড়াটাকে কেন্‌বার ইচ্ছে প্রকাশ কর্‌লেন।

হারু বল্‌ল, "কি রে ?·········হাওয়ার মত উড়্‌বি ? বাবু, এ পোক্ষীরাজের বাচ্চা।... ছো-টাকা, ছো-টাকা।"

ঘোড়াটা চিঁ হি হি করে হারুর কথার যেন সমর্থন করল এবং নিত্যধন আর বাক্যব্যয় না করে ছ'টাকায় ঘোড়াটাকে কিনে ফেললেন।

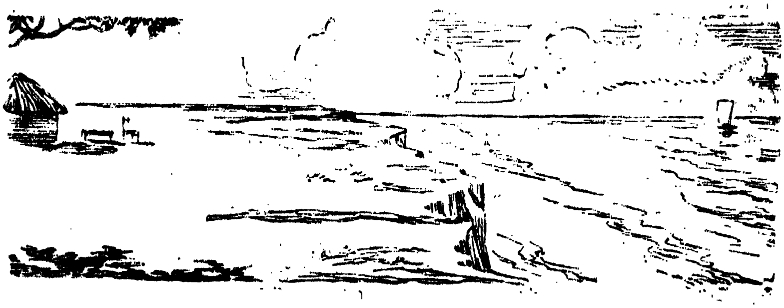
টাকাগুলো হারু বেশ করে গুণে নিল। তারপর একটা সবিনয় নমস্কার জানালো, এবং দু'বার নাগোর দোলায় চেপে পরিশেষে নির্ব্বিঘ্নে মেলা পরিত্যাগ কর্‌ল।

এদিকে হয়েছে কি ঘনশ্যাম নিজের ঘোড়া নিতে এসে দেখেন সেটা নেই, এবং কিছু দূরেই দেখলেন নিত্যধন তাঁ'রই ঘোড়ায় চেপে তাঁকে বক দেখাচ্ছেন!

তারপর যা হল তা আর নাই লিখলুম! ঘটনাস্থলে পুলিশ এলো, ঘোড়াটাকে তারাই নিয়ে গেল এবং এই সাতমাস ধরে নিত্যধন আর ঘনশ্যাম পরস্পরের বিরুদ্ধে মাম্‌লা করে দিন কাটাচ্ছিলেন।

আর সেই অত দুঃখের ঘোড়াটাই কিনা আজ মারা গেল! ঘনশ্যামের কান্না পেল!

কিন্তু তখনও তাঁর দুর্ভাগ্য শেষ হয় নি! খানিক পরেই চিঠি এলো যে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল মাম্‌লায় গতকাল জিতেছেন; প্রমাণ হয়েছে ঘোড়াটা তাঁরই। এবং আরও খানিক বাদে পুলিশ অফিস্‌ থেকে তাঁর কাছে আর একটা চিঠি এলো—এই সাতমাস ধরে ঘোড়াটাকে খাওয়াতে মাসে দশ টাকা হিসেবে, সত্তর টাকা পড়েছে। সেটাকা যেন চট্‌পট্‌ পাঠানো হয়!



যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

শ্রীশরৎচন্দ্র

শ্রীমতী অপর্ণা সেন

ফুল ফুটলেই ঝরবে তার জন্যে দুঃখ করবার থাকে না কিন্তু তবু মানুষ সেই সাথী ফুলটির জন্যে দুঃখ না করে পারেও না। যখন মধু নিঃশেষিত হবার আগেই ফুল ঝরে যায় তখন তার ঝরার ও না পাওয়ার ব্যথা মিশে মানুষের দুঃখকে আরো নিবিড় করে তোলে। তাই শরৎচন্দ্রের জন্যে চোখের জল আমরা ফেলছি শুধু হারানোর দুঃখেই নয় না-পাওয়ার ও অভিমানে। বয়সের হিসাবে তাঁর মৃত্যুকে হয়তো আমরা অকাল মৃত্যু বলতে পারি না কিন্তু বাংলা সাহিত্য তার এই কৃতী সন্তানের কাছে আরো অনেক আশা করেছিল, সে আশা তার পূর্ণ হয়নি। সেই অপূর্ণ আশা সম্পূর্ণ না করেই তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন।

শরৎচন্দ্র নিতান্তই আমাদের সবার আপনার লোক। হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর শিক্ষা সুরু হয়। এই পাঠশালার জীবনের ছবি তাঁর কোন কোন গল্পতে আমরা দেখতে পাই। এর পর তিনি ভাগলপুরে চলে আসেন ও হাইস্কুলে ভর্ত্তি হ'ন এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। এই পরিবারের সাহিত্য প্রীতি বাংলা দেশের পাঠকগণের অজানা নয়। এদের মধ্যে ৺গিরীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি আছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্ভবতই তাঁর মামার বাড়ীর সংস্পর্শেই প্রথম মুকুলিত হয়। কিন্তু সাহিত্যানুরাগ উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি তাঁর পিতার নিকটেই পেয়েছিলেন। তাঁর চঞ্চল ভবঘুরে স্বভাবটিও স্বোপার্জ্জিত নহে!

শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন ভাগলপুরেই কাটে। ভাগলপুরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার বিশাল গঙ্গা, তার গাছপালা বন বাগান তাঁর জীবনে গভীর ভাবে ছায়াপাত করেছে। কিশোর

বয়সে তিনি প্রায়ই নৌকো করে বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যেতেন। বাড়ীর লোকেরা প্রথম প্রথম খুব হট্টগোল করতেন। শেষকালে তাঁর যাযাবরবৃত্তির পরিচয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে আর বেশী মাথা ঘামাতেন না। ভগবানকে ধন্যবাদ তাঁদের অভিভাবক সুলভ মাথাঘামান বেশীদিন স্থায়ী হয়নি; যদি হত তাহলে কি আমরা ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের নৌকো যাত্রার সেই পরিপূর্ণ সুন্দর ছবিটি পেতাম?

শরৎচন্দ্রের প্রথম লেখা যে কোন্‌টি তা ঠিক জানা যায় না। আমাদের মধ্যে একটু লিখতে যাঁরা পারেন ছাপার অক্ষরে নিজেদের নাম দেখার জন্যে তাঁরা কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেন। শরৎবাবু কিন্তু এ নিয়মের মস্ত ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি নিজের লেখা ছাপাতে দিতে বরাবরই কুণ্ঠা বোধ করতেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত 'মন্দির' ও তাঁর নিজের নামে ছাপা হয়নি। আর একটা মজা এই যে প্রায় প্রত্যেক দেশের লেখকের ভাগ্যেই প্রথম প্রথম জোটে সম্পাদকের সবিনীত প্রত্যাখ্যান; শরৎচন্দ্রকে কিন্তু এই বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়নি, উপরন্তু সম্পাদক মহলেই তাঁর লেখা নেবার জন্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। 'ভারতী'তে যখন তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয় তখন তাতে লেখকের নাম ছিল না এবং অনেকেই এটা রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে সন্দেহ করেছিলেন। শেষকালে এই সন্দেহ দূর করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভারতীর সম্পাদক শ্রীসৌরীন মুখোপাধ্যায়কে লেখকের নাম দিতে অনুরোধ করেন। এই হ'ল বাংলার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ইতিহাস। তাঁর রচনার সাবলীল ভঙ্গী, কথার অপরূপ মাধুর্য্য বাংলা পাঠকের মনে তার নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল এবং তাদের অন্তরলোকে পাতা তাঁর আসনখানি এখনো তেমনি অটুট রইল।

শিশু বা কিশোর সাহিত্য বলে শরৎচন্দ্র কিছু সৃষ্টি করেননি বটে কিন্তু তিনি ছোট গল্পে বা উপন্যাসে যে কয়েকটি শিশুচরিত্র এঁকেছেন তা অনবদ্য; তাদের আনন্দ বেদনা কল্পনা তাঁর নিপুণ তুলিকায় সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর শিশুচরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে শিশুকে তিনি শিশু বলে অবহেলা করেননি। তাঁকে তিনি বিশ্বমানবের প্রতীক স্বরূপ দেখেছিলেন এবং তার ভবিষ্যতের স্বপ্নকে দিয়েছিলেন রূপ!

শরৎবাবুর শুধু সাহিত্য প্রতিভা ছিল না প্রকৃত বন্ধুর হৃদয়ও ছিল তাঁর। তিনি শুধু মরমী লেখকই ছিলেন না, দরদী বন্ধুও ছিলেন। কত দুঃখীকে যে তিনি গোপনে সাহায্য করেছেন তার ঠিক নাই। চেহারার মধ্যে যেমন তাঁর কোন অসাধারণত্ব ছিল না তেমনি কথাবার্ত্তায়ও ছিলেন তিনি অতি সাধারণ আর নিজে গম্ভীর থেকে হাসাতে ভালবাসতেন তাঁর শ্রোতাদের। কথাবার্ত্তা আলাপ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রচার করার ব্যগ্রতা তাঁর

ছিল না। এই জন্যেই সাধারণ লোক তাঁর কাছে যেতে কুণ্ঠা করতো না। মেয়েদের তিনি বড় ভালবাসতেন। আমাদের একটি ছাত্রী সঙ্ঘ ছিল। তার একটি অধিবেশনে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কতটুকুই বা আমাদের সঙ্ঘ আর কতই বা ছিল তার সভ্যসংখ্যা কিন্তু তিনি আসতে একটুও অরাজী হন নি। অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি আমাদের আবোল তাবোল বক্তৃতা আর কত না গল্প তিনি করলেন। বল্‌লেন, অতদূরে বসেছ কেন আমায় ঘিরে গোল করে বোস। আমরা কয়েকটি ব্রাহ্ম গার্লসের মেয়ে ছিলাম। জিগেস করলেন, তোমরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম গার্লসে পড়তে! আমরা হেসে মাথা নেড়ে সায় দিতে তিনি মহাখুসী হয়ে বলে উঠলেন তোমাদের মাথানাড়া কথা বলার ভঙ্গী দেখেই বলে দিতে পারি তোমরা কে কোন্ স্কুলে পড়ো। তিনি জানতেন কি করে কার সঙ্গে গল্প করতে হয়। ঘরে ঢুকেই প্রথমে তিনি বলেছিলেন তোমরা আমার কাছে কি শুনতে চাও জানি না আমি কিন্তু বক্তৃতা দিতে আসিনি তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। শরৎবাবুকে সেই প্রথম আমি দেখি! কতদিন কেটে গেছে তার পর, কিন্তু কি ভালই না লাগে সেই দিনটির কথা ভাবতে।

যে লেখক ইন্দ্রনাথ এবং শ্রীকান্তর মত ডানপিটে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি যে নিজেও নির্ভীক হবেন তা বলাই বাহুল্য। রেঙ্গুণে থাকতে অফিসের সাহেবের সঙ্গে তাঁর একবার কি বচসা হয়। সাহেব তাঁকে অপমান সূচক কি কথা বলেন। শরৎবাবু সেই অপমান নীরবে সহ্য কবার পাত্র ছিলেননা, ও সাহেবের নাকে একটি ঘুঁসি বসিয়ে দিতে একটু ও দ্বিধা করেননি।

দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দারিদ্র্য তাঁর মনকে শুধু আলোড়ন করেই ক্ষান্ত হয়নি তাঁকে কর্ম্মেরও মধ্যেও টেনে এনেছিল। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাঁরই অনুপ্রেরনায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে একটা গভীর দেশপ্রীতি দেখা যায়।

এই কয়েকদিন আগে বিশেষ কোন কলেজের পক্ষ থেকে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে সংবর্দ্ধনা করা হয়েছিল। সভাপতি মহাশয় উঠে দাড়িয়ে বলেছিলেন যে আমরা কামনা করি যেন এই ৩১শে ভাদ্র দিনটি তাঁর জীবনে বার বার ফিরে আসে। সেই ৩১শে ভাদ্রের অশ্রু সজল স্নিগ্ধ দিনটি বার বার ফিরে আসবে কিন্তু তাকে মধুর করে তুলতে থাকবে না সেই অতি সাধারণ এলো মেলো লোকটি যাঁর জন্যে এই দিনটি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইল।

ছেলেদের গল্পে শরৎচন্দ্র

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

রাত দুপুর। সুদূর বর্ম্মায় একখানি ছোট ঘরের মধ্যে অত রাতেও আলোর সামনে বসে এক বাঙালী লেখক তাঁর ভাব-ধারা লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন, লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে লেখকের উদাস দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাহিরে ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে, কাগজের উপর!

গায়ের রং কালো, কাঁধের উপর থেকে নেমে আসা শাদা পৈতে সব দেখে মনে হয় তিনি সাধারণের একজন। প্রবাসে সঙ্কীর্ণ গৃহকোনে বসে, বাংলার রোগ শোকে জীর্ণ, দুঃখ কষ্টে ক্ষীণ, আনন্দ ও বাৎসল্য মেশানো বিচিত্ররূপ তিনি দেখেছিলেন। বাংলাদেশের সে জীবন ধারা তাঁর কাছে ধীরে স্বপ্নে ধরা দিয়েছিল। শত সহস্র দরিদ্র পীড়িত বাঙ্গালীদের জীবনকথাই তিনি লিখছেন। রাত ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। সারাদিন আফিসের খাটুনীর পর শরীরকে যে বিশ্রাম দেওয়া দরকার, সে প্রয়োজনটুকু তিনি ভুলে গেছেন। বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার ছেলেমেয়ে তাঁর মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। বাংলার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ভুলে গেছেন তাঁর পরিশ্রান্তি, চোখের পক্ষ্ম থেকে তন্দ্রার রেশটুকুও হারিয়ে গেছে। বাংলার জন্য তিনি আত্মভোলা সন্ন্যাসী। বাংলার দুঃখ তাকে ব্যথা দিচ্ছে, বাংলার গৌরব তাঁকে আনন্দিত করছে, তিনি লিখছেন। সুখের দিনের কথা তিনি লিখছেন না, লিখছেন বাংলার দুঃখের কথা, বাঙালীর শতকরা নিরানব্বুই জনের সকরুণ জীবন ইতিহাস।

ছোট পাঁচ ছ' বছরের ফুলের মত ছেলেটী বিসূচিকায় মারা গেছে, অভাবের জন্য তাকে দাহ করা হয়নি; নদীর কিনারায় শিয়ালে টানাটানি কচ্ছে তার মৃতদেহ; ইন্দ্রনাথ রাত-দুপুরের সেই শ্মশানের কোল থেকে ছেলেটীকে বুকে তুলে নিলে, কোনজাতের ছেলে তার বিচার নেই, মরার যে জাত হয় না। অকালে ঝরে যাওয়া ফুলের মত শিশুটি যেন ইন্দ্রনাথের কাণে কাণে বললে—'ভাইয়া!' ইন্দ্রনাথের কাছে সবাই যে তার ভাই, সমাজ নেই, ধর্ম্ম নেই, জাত নেই, সে নতুন বাংলার বিদ্রোহী দুলাল! মনুষ্যত্বের টানে রাত্রির দুর্য্যোগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, বাধা নিষেধের গণ্ডী তাকে ধরে রাখতে পারে না।

ছেলেদের গল্পে শরৎচন্দ্র

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

রাত্রির অন্ধকারের পানে তাকিয়ে বাংলা মায়ের প্রবাসী ছেলে বাংলার দুঃখ ও দুর্দ্দশার কথা ভাবতে ভাব্তে ইন্দ্রনাথের মত দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহী কিশোরদের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, সে আহ্বান ব্যর্থ হোলনা, বাংলা মা তাঁর প্রবাসী ছেলেকে খ্যাতি ও যশের আশীর্ব্বাদ করলেন, এক শুভ সন্ধ্যায় লেখক বাংলা মায়ের কোলে ফিরে এলেন।

ইনিই আমাদের শরৎচন্দ্র। তখন আমার বয়স বছর পনেরো, বাংলা সিলেক্‌সনে একদিন একটী অদ্ভুত গল্প পড়লাম। অদ্ভুত বললাম এই জন্যে যে এদ্দিন যে সব গল্প পড়েছি, এটী ঠিক তেমন নয়, কেন যে তেমন নয় তা তখন বিচার করতে পারিনি। কিন্তু রাম ছেলেটীকে ভারী মনে লেগেছিল, বৌদির বেশী আদরে সে একটু বেশী দুরন্ত। কিন্তু কুইনিনের সঙ্গে ময়দার গুঁড়া মেশানো বন্ধ করতে তার মত ডানপিটে ছেলে নাহলে—সে যাত্রা ডাক্তারের হাতে তার বৌদির জ্বর ছাড়তো কি না কে জানে। বৌদির আদর ও স্নেহে তার দিনগুলি কাটছিল ভাল, কিন্তু বৌদির মা এসেই যত হাঙ্গামা বাধালেন। কার্ত্তিক গনেশের একটি মরলো, বৌদির মা'কে পেয়ারা ছুড়ে মারতে গিয়ে বৌদিরই লাগলো, বৌদি বিছানা নিলেন। বেচারা রামকে আলাদা করে দেওয়া হোল; মনের দুঃখে রাম বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যায় সেই সময় বৌদির স্নেহের জয় হোল, রামের আর যাওয়া হোল না। পড়তে পড়তে বাংলার ছেলেমেয়েদের মনের কথা ধরা পড়ে, সামান্য একটা বোঝার ভুলে তাদের কত নির্য্যাতন সইতে হয়। অথচ সামান্য স্নেহ অনায়াসে সেই দুর্দ্দান্ত মনকে জয় করে।

তারপর পড়লুম বিন্দুর ছেলে। অমূল্যর দুই মা, অন্নপূর্ণা ও কাকিমা বিন্দু; কিন্তু মার চেয়ে অমূল্য কাকিমাকেই বেশী চিনতো' কাকিমার কোলের কাছে না শুলে তার ঘুম হোত না। বেশ দিন কাটছিল, মাঝে নরেন এসে হাজির, নরেন থিয়েটার করে' গান গায়, নাচতেও জানে। তার সঙ্গে মিশে ভাল ছেলে অমূল্য পাছে খারাপ হয়ে যায়, বিন্দুর বড় দুর্ভাবনা। কিন্তু শেষে যখন একদিন যে অমূল্য মাথার চুল কদম-ছাঁটে ছাঁটতো, তারই পকেট থেকে সিগারেটের টুক্‌রো বেরুলো তখনই হোল সমস্যার সুরু, ছেলের হাতে পয়সা দেন বলে অন্নপূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর ঝগড়া হয়ে গেল, দুজনে দুবাড়ীতে পৃথক হয়ে গেলেন। অমূল্য মায়ের কাছেই থাকে, বিন্দু অমূল্যকে কাছে না পেয়ে নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে শেষে মরণাপন্ন হয়ে পড়লেন, রোগশয্যার অন্নপূর্ণা অমূল্যকে নিয়ে বিন্দুর কাছে এলেন, দুজনে আবার মিলন হোল।

সবার শেষে শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব্বে ইন্দ্রনাথের য়্যাড্‌ভেঞ্চার বাংলার ছেলেদের মনকে আচ্ছন্ন করে। ভূতের পিছনে কি নররাক্ষসের পিছনে কাল্পনিক

য়্যাড্‌ভেঞ্চার নয় বাংলা দেশের একান্ত পরিচিত নদীতে শ্মশানে মশানে আশ্চর্য্য অভিযান। পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হবে, মন কোথায় হারিয়ে যাবে। বাংলায় আজ কি ধরণের ছেলের প্রয়োজন এক ইন্দ্রনাথের মধ্যে নিয়ে শরৎচন্দ্র বুঝি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের অনেকগুলি বই কিশোর-পাঠ্য নয় তার আলোচনাও এখানে করবো না, তবে একটা কথা এই যে ইদানীং তিনি শিশু সাহিত্যেও হাত দিয়েছিলেন, মাত্র দুতিনটী গল্প লেখার পরেই আমরা তাঁকে হারিয়েছি। 'লালু' গল্পটীর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "এর আগে তোমাদের জন্যে গল্প কখনো লিখিনি। যাঁরা তোমাদের প্রিয় লেখক, তাঁদের মুখে শুনি তোমাদের খুসী করা বড় শক্ত।" যাঁর একটী লেখা পড়ার জন্য বাংলার পাঠকেরা উৎসুক, তখনও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন, ছেলেদের তিনি খুসী করতে পারবেন কি না! অথচ তিনি জানতেন না, এর আগেই কিশোরদের উপযোগী অনেক লেখা তিনি লিখে ফেলেছেন। রামের সুমতি ও মহেশ পড়লে কোন্ ছেলে না খুসী হয়? লালুর কথাই বলি। 'লালু' এমন একটী ছেলে, যে প্রয়োজন হলে পাঁঠা বলিও দেয়, আবার সেই বলি বন্ধ করার জন্য উন্মুক্ত খাঁড়া নিয়ে উদ্যোক্তাকেও তাড়া করে। কোন ভয় তাকে আছন্ন করতে পারে না। একা শ্মশানে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে তার ভয় নেই। কিন্তু এই লালু বেচারাই শেষে দুটী কুলীকে ইঞ্জিনের মুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মারা পড়লো। লালুকে দেখলেই ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। এঁরা হচ্ছেন শরৎচন্দ্রের মানসপুত্র। বর্ত্তমান যুগে বাংলার সব মলিনতাকে ধুয়ে যারা নতুনবাংলা গড়ে তুলবে, লালু ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাদের এঁকেছেন।

শরৎচন্দ্র আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মানুষ চিরদিন থাকে না, কিন্তু যাঁদের চিন্তাধারা জাতিকে সমৃদ্ধ করে তাঁদের মৃত্যু দেশের জনগণকে বিহ্বল করে দেয়। জগদীশ-চন্দ্রের পর শরৎচন্দ্রের মৃত্যু বাংলাকে আজ যেন নিঃস্ব করে দিয়েছে।

শরৎচন্দ্রকে বাংলাদেশ শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের সম্মান দিয়েছিল, কেননা শরৎচন্দ্রের লেখা সকলের মনকে স্পর্শ করতো। শরৎচন্দ্র লিখতে জানতেন। তাঁর লেখা সম্বন্ধে তাঁর কথাই বলি "যারা ছবি আঁকিতে জানে না তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে যা চোখের সামনে দেখি, সবই আঁকিয়া ফেলি, কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই শেষে টের পায়, না তা নয়, অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরন করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করতে হয় তবেই সত্যিকারের বলা বা আঁকা হয়।" শরৎচন্দ্র যা লিখতেন এই জন্যই তা বেশী মধুর হয়ে আমাদের মনকে স্পর্শ করেছে।

এমনি দিনে

—পূর্ণেন্দু সেন

দিদি আমার আর লাগে না ভালো
চলো এবার কোথাও চলে যাই,
সহরের এই ধূলো আর ধোঁয়া কালো
সহরের এই কোলাহল যেথা নাই।

আকাশ যেথায় মুক্ত বাতাস খোলা,
ঝিঙের শিষ আর নদীর জলে গান,
ছুপুর বেলার ঘুঘুর সুরে ভোলা ;
রাখাল ছেলের শিউরে কচি প্রাণ।

খড়ে-ছাওয়া একটী ছুটী কুঁড়ে,
কাঁপছে দীঘির নিটোল কালো জল,
জলের বুকে মাছরাঙারা উড়ে,
দোলায় মাথা কলমীলতার দল।

ফুলের আবির লাগবে গিয়ে সারা আকাশটাই
সেই আকাশের তলে দিদি আয় না চলে যাই।

এই সহরে যায় না আকাশ দেখা,
বকের সারির নেই কোন উদ্দেশ ;
ঠোঁটের কোণে নেইক হাসির রেখা,
ইঁটের পরে ইঁটের খাঁচা বেশ !

ট্রামগাড়ীর ঐ ঘড়ঘড়ানি আর
হঠাৎ ছ্যাকরাগাড়ীর কেঁদে ওঠা,
আমরা যেন পিপ্‌ড়ে পোকার সার—
নিঃশ্বাস না নিয়ে কেবল ছোটা।

মন-মরা সব রইছে বসে চুপ,
সব জিনিষই নিক্তি ওজন করা ;
বাধার ওপর বাধার খালি স্তুপ
চোখ-রাঙানি আর শাসনে ভরা।
একটু আদর মিষ্টি কথার নেই কো কোথায় রেশ
নিজের দেশও হয়ে যেন এ এক পরদেশ।

যে গ্রামটী ছোট্ট ছায়ায় ঘেরা—
পথের পাশে ঘেটুফুলের পাড় ;
পোড়ো ভিটেয় রইছে শুয়ে কা'রা
গয়লা আসে ঝুলিয়ে দুধের ভাঁড়।

সন্ধেবেলায় ক্লান্ত ঝিঁঝি ডাকে—
কুঁড়ের চালে খণ্ড ধোঁয়ার ভিড়,
জোনাক জ্বলে ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে,
মুখরিত সকল পাখীর নীড়।

পথের পাশে শেয়াল মারে উঁকি
একটা কুকুর দাওয়ায় এসে শুলো ;
বসছে ঠাকুরদাদার মুখোমুখি
গল্পলোভী পাড়ার ছেলেগুলো।
শুনছে বসে, ঢুলছে বা কেউ সব যেন নিঃসাড়,
শেষ নৌকো পাঠিয়ে দিল খেয়াঘাটের পাড়।

আকাশের রঙ যেথায় ঘোলা নয়—
নীলের উপর নীলের ছড়াছড়ি ;
সবই ঠাণ্ডা শুধুই শান্তিময়
থমকে চলে জীবনের এই ঘড়ি।

এমনি দিনে

পূর্ণেন্দু সেন

নেইকো হিংসে দ্বেষ আর জ্বালাতন—
সবাই আছে মনের আরামেতে ;
একটুও না নষ্ট করে আর ক্ষণ
ইচ্ছে করে সেই দেশেতে যেতে।

এমনি দিনে সহর ছেড়ে দূরে—
দোলন চাঁপার গন্ধ ভরা গ্রামে,
মন যেতে চায় পাখীর পাখে উড়ে
আকাশ সীমা যেথায় গিয়ে নামে।

ইচ্ছে করে এই বেলাতে চল্‌তি ডিঙায় চড়ি'
দাঁড়ের ঘায়ে জল ছিটে' সেই গাঁয়ের নাগাল ধরি।





উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চিত্রিত

৮

ক্ষিতিভূষণের কোঠা থেকে সুলন্দ সোজা এলো নিজের কামরায়। সেখানে নেলো হুঁকোয় টান দিয়ে পাথুরে গেলাসে ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে নিয়ে লম্বা চুমুক দিলে। আঃ বলে সুলন্দ হাই তুলে দুচোখ বুজলে। তারপর পালঙ্কে হাতপা টেনে শুয়ে পড়ে শরীর দোলাতে দোলাতে গুন্ গুন্ করে ছড়া-গান ধরলে ঃ

"সুলন্দ আয় পুলন্দ আয়,
সুলন্দ মামাবাড়ীতে যায়।"

ছেলেবেলায় শোনা এই ছড়া সুলন্দের বড় ভালো লাগে। এ যেন তার বুদ্ধি-কোঠার জীয়ন কাঠি ছড়া ধরতে ধোঁয়ার মত নেশা আসে ঘনিয়ে, মৌতাতী মনে মৌরসের মত বুদ্ধি ওঠে গাঁজিয়ে।

গান গাইতে গাইতে পালঙ্কের উপর সুলন্দের শরীর আসে ঝিমিয়ে। জাহাজে ঠিক দুপুরবেলা তোফা ঘুম। ঘুমোতে ঘুমোতে সুলন্দ শেষে একেবারে স্বপনকোঠায় পৌছে যায়। কিন্তু কোঠা যেন বন্ধ। ভিতরে খিল দিয়ে বসে আছে যেন জাহাজের সেই মেয়েটি। সুলন্দ যেন বলে, "হঠাৎ কর্ত্তা উধাও, হঠাৎ আসে সাজোয়া-পরাদের জাহাজ, হঠাৎ আসেন উদাসী কন্যা, হঠাৎ আসে মণির পাঞ্জা—বুঝতে কিছু বাকী নেই বাহাদুরণী, এবার খিল খোলো।" মেয়েটি যেন ঘরের ভিতর থেকে খিল্‌খিল করে হেসে বলে "বুঝেচ কচু।"

হঠাৎ ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙতে সুলন্দ বলে, "কচু বুঝিনি ঠিক বুঝেচি—হঠাৎ জাহাজ, হঠাৎ মেয়ে, হঠাৎ পাঞ্জা—হঠাৎ-য়ে হঠাৎ-য়ে কোলাকুলি। এখন তাহলে"—কথা বলতে সুলন্দ হঠাৎ থেমে যায়। বেলা যে শেষ! রোদ ডুবু-ডুবু। জানলা দিয়ে খানিকটা তামাটে আলো এসে আধখানা পালঙ্কে হিল্‌মিল্ করছে।

অমরলতা
শ্রীসতীকান্ত গুহ

আর সময় নেই। এখনই সন্ধ্যা হবো হবো। সন্ধ্যা হলে, তখন সুলন্দের আর সময় নেই। কে জানে তখন সুলন্দ মেয়ে না ছেলে, বুড়ো না গুঁড়ো, উজীর না ফকির!

বোম্বেটে জাহাজের ঢকছাঁদও যাত্রীজাহাজের মতনই। পাটাতনের উপর গোটা কয়েক কামরা, বাকী সব কামরা পাটাতনের তলে জাহাজ-খোলে। জাহাজ-খোলে তিনটি তলা, প্রত্যেক তলায় দুধারে দুসার কামরা। দুসারের মাঝে চলার পথ। খোলের অন্ধকারে সেখানে দুপুর বেলায় মশাল জ্বলে, চুনের ভাটিও জ্বলে। কামরায় কামরায় সারাক্ষণ তেলের আলো।

ঠিক সন্ধ্যাবেলা পাটাতন থেকে সিঁড়ি বেয়ে সুলন্দ জাহাজ-খোলে নেমে এলো। সেখানে তখন সারাদিনের অন্ধকার সন্ধ্যায় আর একটু জমাট বেঁধেচে। কামরার ফাকে ফাকে পথে পথে কাঠের ছাত থেকে আলো ঝুলচে। তেলের আলো থেকে ধোঁয়া উড়চে, আলোয় সেই ধোঁয়া কেঁপে কেঁপে পাৎলা মেঘের মত, কুয়াসার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। সেখানে যেন ফিস্ ফিস্ আর আলোয় মিশে যাওয়া ছায়ামানুষদের ওষ্ঠে আঙ্গুল দিয়ে বলা ইস্‌স্‌স্। কারা যেন আলগোছে হাঁটে আর পাটাতনের উপর থেকে চুরী করে আসা গল্‌তি হাওয়ায় আলগোছে কথা কয়। যারা সত্যিকারের মানুষ তাদের পানে তাকিয়ে যেন ছায়ারাজ্যের ছায়ামানুষেরা একটু মুচকি হেসে পায়ে পা মিলিয়ে অজান্তে সঙ্গে সঙ্গে চলে। তারপর কানে কানে হাওয়ার হিস্ হিস্ আওয়াজে একটা ভয়ের কথা বলে হঠাৎ আলোর আলো, বাতাসে বাতাস হয়ে বাঁকা হাসি হেসে মিলিয়ে যায়। বছরের পর বছর যারা জাহাজ বায়, জাহাজ খোলে দিন দুপুরে আলো মেশানো অন্ধকারে যারা দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়ায় সেই বোম্বেটেদেরও থেকে থেকে মনে হয় এইখানে আর কারা যেন আছে, তাদের চোখে দেখা যায় না। তাদের পায়ে চলার শব্দ কানে ধরা পড়ে না।

সুলন্দের মনে হল কারা যেন তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। চোখটিপে তাদের একজন যেন বলছে, "হুঁ হুঁ, চলেছ কোথায় সুলন্দ বাবাজী?" সুলন্দ মনে মনে জবাব দেয়, "রহস্যের মীমাংসা করতে।" তাদের আর একজন যেন বলে, "বেশ! বেশ!" সুলন্দ মনে মনে তেড়েমেড়ে জবাব দেয়, "বেশ না তো কি! দেখে নিও।" তারপর পোষাকের লুকনো ভাঁজ থেকে তলোয়ার বার করে একবার বাতাসের গায়ে কয়েকটা কোপ বসিয়ে বলে, "ভাগ্! ভাগ সব!" খানিকক্ষণের জন্য তখন একবার আলো ছায়ার ছম্‌ছমে্ ভাবটা যেন কেটে যায়, ছায়া-মানুষদের কথা যেন আর মনে থাকে না। কাজের মানুষ তখন কেতা-দুরস্ত হয়ে চোখকাণ খুলে পথ চলে।

৯

ভূতের রাজ্য থেকে সে যেন পরীরাজ্যে এসে পড়েছে। এখানে কালীভূষণের জাহাজী বৈঠকখানা। আজ কালীভূষণ নেই, জায়গাটা ফাকা পড়ে আছে। জাহাজখোলে এখানটা একটু সাজানো গোছানো। কাঠের দেয়ালে নক্সা তোলা, আর কাঠের ছাতে প্যাখম-মেলা ময়ূর খোদাই। কম-তেলের টিম্‌টিমে আলো নয়, ছাত থেকে একটা জমকালো ঝাড় ঝুলচে। কড়া তেলের চরকা আলোর ষোলটা বাতী ঝাড়ে, তাতে যেন ঝাড়টা একটা হীরের মুকুটের মত ঝিল্‌ঝিল্ করচে।

সুলন্দ একটু থমকে দাঁড়াল। পাশেই বোম্বেটেদের নাচঘর। ওড়ণা জড়িয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে এই নাচঘরে নেচে অভ্যেস। আজ ও সে ওড়ণা গায়ে মেয়ে সেজেই এসেছে। কিন্তু পায়ে তার নাচওয়ালীর ঘুঙুর নেই। তার বদলে পরেছে মিহি-সুরের সোণার মল। মতিগড়ের জাহাজ লুঠের সময় এই মলজোড়া সুলন্দ ঘুমন্ত রাজকন্যার পা থেকে আলগোছে খুলে নিয়েছিল। আজ রূপসী সাজতে গিয়ে মলজোড়া প্যাটরা খুলে বার করেছে। ভুরুতে সুর্ম্মা টেনে চোখের কিনারায় আলগোছে কাজল দিয়েছে সুলন্দ। পান চিবিয়ে ঠোঁট লাল করে নিয়েছে। মুখে আধফোটা গোলাপের রং মেখেছে। কিন্তু আঙরাখার লুকনো ভাঁজে নিয়েছে তলোয়ার।

কালীভূষণের বৈঠকখানা থেকে কিছু তফাতে একটা কামরায় মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েচে। আর পঞ্চাশ হাত এগোলেই সেই কামরা। সুলন্দ ভাবলে, "সোজা গিয়ে কবাটের পাশে দাঁড়াবো। তারপর এক ফাঁকে ঢুকে পড়ব।" সকালবেলার আড়ি পাতার ফন্দিটা আর তার নেই। রূপসী মেয়ে সেজে মেয়েটির সঙ্গে সোজাসুজি মোলাকাৎ করবে সে। তারপর? তারপর চলবে কৌশলের পর কৌশল। কোন্ কৌশল টিকবে কে জানে! কিন্তু ষড়যন্ত্রটা ভেস্তে না যায় যেন!

কিন্তু একটু যেন ইতস্তত: করছে সুলন্দ। ভাবছে, সোজা চলে যাই, না লুকিয়ে লুকিয়ে এগোই। কার ভয়ে লুকিয়ে চলবে সুলন্দ? কেন, যদি মেয়েটি একা জাহাজে না এসে থাকে? তার সঙ্গী যদি কেউ থাকে এই জাহাজে? নাঃ, তাও কি সম্ভব? হঠাৎ সুলন্দ বিড়বিড় করে বললে, "দূর কর ছাই ভাবনা! সোজা যাই এগিয়ে। কাকে ফাঁকি দিতে বা লুকিয়ে চলব! আসল কাজ তো মেয়েটিকে নিয়ে। তাকে ফাঁদে ফেলতে পারলেই হয়।" তারপর সুলন্দ ভাবলে, "তা ছাড়া, সঙ্গে কেউ থাকলেই বা। আমাকে কে আর চিনতে যাচ্ছে। আমি তো এখন আর সুলন্দ নই। এখন আমি বন্দিনী রাজকন্যাটি যে।" কালীভূষণের জাহাজী বৈঠকখানার কবাট আরসীমোড়া। যেতে যেতে তাতে সুলন্দ নিজের প্রতিবিম্ব দেখলে। একটু হেসে সুলন্দ মনে মনে বললে,।" রাজকন্যা সাজায় খুঁত নেই। এখন বুদ্ধি ঠিক থাকলে হয়।"

হঠাৎ মহাসাগর যেন গা মোড়া দিলে। জাহাজটা টলমল করে উঠল! পাটাতনের উপর বোম্বেটি গলার "সামাল সামাল" ডাকহাঁক পড়ে গেল। আর ভয়ানক একটা দোলা খেয়ে ঝাড়টা ছাতে ঠেকে বে-তাল হয়ে চর্কি খেতে লাগল। ছায়া আর আলোয় জড়াজড়ি হয়ে ছাতে, দেয়ালে আর মেঝেয় আলো-ছায়ার নাচ সুরু হয়ে গেল। পাশে একটা কামরার কবাটে হাত দিয়ে টাল সামলে নিলে সুলন্দ। তারপর একেবারে সেই মেয়েটির কামরার সামনে এসে দাঁড়াল সে। কবাটের ফাটলে চোখ রাখলে সুলন্দ।

একাঘরে পালঙ্কে বসে আছে মেয়েটি। ঘরে নিবু নিবু বাতী জ্বলছে। আধোআঁধারে একখানা সুন্দর স্বপ্নের মত ফুটে আছে সে। সে যেন ঘুমন্তপুরীর হঠাৎ জেগে ওঠা রাজকন্যা। সে বসে আছে, মুখে কথা নেই তার। অন্ধকারে সে কী দেখচে, কোন্ কথা সে ভাবচে কে জানে! সুলন্দ ভাবলে "ঢুকে পড়ি। সত্যিকারের বন্দিনীর সঙ্গে নকল বন্দিনী রাজকন্যার মোলাকাৎটা হয়ে যাক।"

হঠাৎ মেয়েটি গুন্ গুন্ গান ধরলে। কবাটের ফাটল দিয়ে সে গান বাইরে ভেসে এলো :

"সারা জনম ভরি ও রূপ ধেঁয়ায়নু
হৃদয়ে রাখনু কথা,
সারা নিশি ভরি কাঁপল থরথরি
স্বপনে অমরলতা।"

এককলি গান সে বারবার গাইলে। এক একবার সে চুপ হয়ে যায় আর গানের রেশ বাতাসে মৌমাছির গুঞ্জনের মত উদাসী হয়ে ফেরে। শেষে, সে আর একবার গানের কলিটা ধরে ছেড়ে দিলে—"স্বপনে অমরলতা।" তার গলা কেঁপে কেঁপে যেন ভেঙে গেল আর স্বরটা একটা ডানা-ভাঙা পাখীর মত যেন করুণ একটা শব্দ করে চুপ হয়ে গেল। পালঙ্কের উপর উবুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে—"স্বপনে অমরলতা।"

অমরলতা? কোন্ রহস্য এই অমরলতা? মনি পান্নার বুকে নিখুত হরফে লেখা অমরলতা। আর একাধরে মেয়েটির গানের বুকেও সেই অমরলতা। তাহলে, তাহলে আসল রহস্য কি এই অমরলতা? তাকে নিয়েই কি জাহাজে একটার পর একটা যত আশ্চর্য্য ঘটনা? কে জানে অমরলতা কী! কিন্তু জানা গেল নামটা। সুনন্দ ভাবলে, হয়তো রহস্যের সঙ্কেত এই নামটা। নামটা জানা তবে কম লাভ নয়।

সুনন্দের চোখ জ্বলে উঠলো। মগজে বুদ্ধি পাক দিলে। কবাটের ফাটলে মুখ রেখে সে মিহি গলায় উতোর গাইলে :

"তুঁহার কারণ ছোড়নু ঘর,
দুনিয়ামে সব করনু পর,
হামারা মনমে রহল ব্যথা,
দরশ না মিলল অমরলতা।"

মেঘ থেকে বিদ্যুৎ যেমন ছিটে আসে, তেমনি পালঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। ধরা গলায় সে বললে,—"কে?"

কবাট ঠেলে কামরায় ঢুকে পড়ে' সুনন্দ বললে, "আমি—বন্দিনী রাজকন্যা।"

মেয়েটি উত্তেজনায় কাঁপচে। কেঁপে যাওয়া হাতে কামরার নিবু-নিবু বাতীটা উস্কে দিয়ে সে দুপা এগিয়ে এলো। তার চোখে মুখে সন্দেহ, বিস্ময়। সে যেন জেগে জেগে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখচে।

নকল বন্দিনী রাজকন্যা সুনন্দ খানিক এগিয়ে এলো। তার মুখে ম্লান হাসি। নকল উদাস স্বরে সে বললে, "তোমাতে আমাতে তফাৎ নেই। জানিনা, তুমি কোন্ দেশের রাজকন্যা। কিন্তু আমার মত বন্দিনী তুমিও। তোমার গান আমার গান এক হয়ে মিলবে, তাতে আশ্চর্য্য কী?"

মেয়েটি এতকথা যেন শুনলে না। বাতাসের ফিস্ ফাসের মত সে শুধোলে, "ওনাম তুমি কোথা থেকে শুনলে?"

সুলন্দ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, "যেখান থেকে তুমি শুনেচ, সেখান থেকে শুনেচি।"

মেয়েটি বললে,—"তুমি, তুমি তাহলে অমরলতার দলের ?"

সুলন্দ বললে,—"তোমার আন্দাজ মিছে নয়।" তারপর সে মনে মনে বললে, "কাজটা বেশ সোজা ঠেকচে দেখচি। কথা সুরু না হতেই জানা গেল অমরলতার দল বলে একটি দল আছে। দেখা যাক্ মোলাকাৎ কদ্দূর গড়ায়।"

মেয়েটি আকাশপাতাল কী যেন ভাবলে। তারপর সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে সুলন্দের দিকে চেয়ে বললে, "মাঝ সাগরে হঠাৎ জাহাজে কোত্থেকে এলে তুমি ?"

সুলন্দ ঝট্ করে বলে ফেলে, "আগেই সে কথা বলেছি। আমি বোম্বেটের হাতে বন্দিনী।"

মেয়েটি কপালে হাত দিলে। তারপর সে এসে পালঙ্কে বসল। একখানা হাতের পাতায় চিবুক রেখে সে যেন ভাবনায় তলিয়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে সে বলতে লাগল "অসম্ভব! অসম্ভব!"

সুলন্দ সাহসে ভর করে বললে, "অসম্ভব। কী অসম্ভব ?"

মেয়েটি জবাব দিলে, "অসম্ভব তোমার হঠাৎ জাহাজে আসা।"

সুলন্দ একটু হক্ চকিয়ে গিয়ে বললে, "কেন ? বোম্বেটে জাহাজে তুমি ছাড়া আর কেউ বন্দিনী হওয়া কি এতই আশ্চর্য্য !"

মেয়েটি পালঙ্কে সোজা হয়ে বসল। তার চোখ দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বার হয়ে এলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে কঠোর স্বরে সে বললে, "থামো মিথ্যেবাদী! বোম্বেটের হাতে তোমার বন্দিনী হওয়ার কথা আগাগোড়া মিছে। তুমি আমার পিছু নিয়েছ—আমারই জাহাজে ছদ্মবেশে এসেছিলে তুমি। তারপর স্বেচ্ছায় বোম্বেটের হাতে ধরা দিয়েছ।"

সুলন্দ মনে মনে হাসল। সে ভাবলে মেয়েটি তখন চটেছে। বুদ্ধি ঠিক নেই। ঝোঁকের মাথায় অনেক রহস্য ফাঁস করবে। মুখের একটা কাতর ভঙ্গী করে কপাল চাপড়ে সুলন্দ বললে, "আমার অদৃষ্ট! জানি তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে না।"

মেয়েটি বললে, "মিছে কথা বিশ্বাস করবে রঙিলা এমন কাচা মেয়ে নয়। তুমি ঋষির গুপ্তচর।"

তাহলে একজন ঋষিও ব্যাপারটায় আছেন দেখচি, সুলন্দ মনে মনে বললে। মেয়েটির কথার জবাবে সে বললে, "ঋষির গুপ্তচর!"

"হ্যাঁ, ঋষির গুপ্তচর। ঋষি টের পেয়েছিলেন তাঁর হুকুমে আমার সায় নেই। তাই তোমাকে তিনি আমার পিছন পিছন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে তিনি বাধা দিতে পারেন নি।"

সুলন্দ বললে, "তার মানে ?"

"তার মানে জলের মত পরিষ্কার।"

"অর্থাৎ"—

"তার অর্থটা এবার স্বচক্ষে ছ্যাখো।" মেয়েটি আঙরাখার তলা থেকে একটা শানিত কিরিচ বার করে এনে স্থলন্দের ললাট নিশানা করে বললে, "ঋষির অভিশাপে আমায় নরকে যেতে হতে পারে। কিন্তু পরের কাজ যারা চুরি করে দেখে তারা পোকার সামিল।"

সুলন্দের তখন মনে ভয়। মুখে সাহস ফুটিয়ে সে বললে, "কিরিচটা নামাও। পোকা মেরে লাভ কী?"

মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে কী ভেবে কিরিচটা এনে আঙরাখার ভাঁজে গুঁজে রাখলে। তখন সুলন্দের পালা এলো। সে দেখলে, আসল কথাটা যেন চাপা পড়ে যাচ্ছে। মেয়েটিকে ক্ষেপিয়ে তুলতে না পারলে গোটারহস্য জানা যাচ্ছে না। এখন সাঙ্ঘাতিক কিছু করা দরকার। তখন তোফা অভিনয় করলে সুলন্দ। হঠাৎ ওড়ণার আড়াল থেকে তলোয়ার বার করে এনে সে বললে, "ঋষি দূরে বসে অভিশাপ দিন তোমায়। মহাপুরুষ তিনি।কিন্তু ঋষির গুপ্তচর আর মহাপুরুষ নয়। তার হাতে তলোয়ারে শাস্তি পেতে হবে তোমায়।"

মেয়েটির মুখ রাগে দুঃখে কালো হয়ে এলো। সে ভাঙা গলায় বললে, "রঙিলার মরণে ভয় নেই। ঋষিকে বোলো তাঁর তপস্যা ব্যর্থ করেছি আমি। আমাকে মেরে আমার কাজ উল্টে দেবেন, সে ক্ষমতা আর ঋষিরও নেই। হয়তো ঈশ্বরেরও নেই।"

মেয়েটির চোখে হঠাৎ আগুন জলে উঠলো। দাঁতে দাঁতে চেপে সে বললে, "অমরলতার পবিত্র পুঁথি পাবে বোম্বেটে, অমরলতার তপস্যা হবে তার ···—অসম্ভব! প্রাণ ধরে অমরলতার পুঁথি বোম্বেটের হাতে তুলে দেবে——অমরলতার দলে এমন পাষাণ কে আছে? তবু ঋষির হুকুম! হায় ঋষি, এ কোন সর্ব্বনাশা ইচ্ছা তোমার!"

তার চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা জল ঝরল। কিন্তু তখনও তার চোখে মেঘলা আকাশের বিদ্যুতের মত কী একটা কঠিন রাগ দুঃখের সঙ্গে মিশে জলে জলে উঠল। অভিমানভরা গলায় সে বললে, "ঋষিকে বোলো, রঙিলা বোকা মেয়ে নয়। এক ঢিলে দুপাখী মেরেচে সে। ঋষির হুকুম তামিল করেছে সে, তবু তাঁর ইচ্ছাকে ব্যর্থ করেছে। বোম্বেটের হাতে পুঁথি তুলে দিয়েচে কিন্তু বোম্বেটেকে অজ্ঞান করে একখানা ছোট ডিঙি করে মহাসাগরে ভাসিয়ে দিয়েচে। চোখ মেলে পুঁথি পড়ার আগে ঢেউয়ের তলায় সমাধি হবে তার।"

"এ্যাঁ" বলে স্থলন্দ অস্ফুট একটা চীৎকার করে উঠলো। তলোয়ার দিয়ে মেয়েটিকে সে বিঁধে দিতে গেল। স্থলন্দ চমকে উঠলো। কোথায় কোন্ দেশে অমরলতার দল, পুঁথিতে কোন আশ্চর্য্য কথা লেখা, কোন্ বিচিত্র তপস্যা অমরলতার——সব প্রশ্ন তার মন থেকে মুছে গেলো। মেয়েটির মুখের ভয়ঙ্কর কথা শোনার পর আর কোনো জিজ্ঞাসা তার নেই। কালীভূষণ তো এখন আর কোনো দলের হাতে নয়। যে দল তাকে পুঁথি দিয়ে পাঠিয়েছিল,—কেন পাঠিয়েছিল কে বলবে—তাদের নাগালের বাইরে কোথায় কোন ঢেউয়ের তলায় তার শেষ হয়ে গেছে কে জানে! এই ক্ষ্যাপা মেয়েটার খেয়ালে পৃথিবীর সেরা বোম্বেটে কালীভূষণ কতদূরে কোথায় ঢেউয়ের হাতে খেলনা হয়ে আছে, হায় তা কে জানে!

সুলন্দের তলোয়ারের আগায় রঙিলা নামের মেয়েটি শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তখন পৃথিবীর একটা অপরূপ ঘটনা ঘটল। কবাট ঠেলে কামরায় ঢুকল কালীভূষণ। কবাটের ফাটল দিয়ে কালীভূষণ হয়তো ভিতরের দৃশ্যটা দেখছিল। ঈষৎ হেসে কালীভূষণ বললে, "ঋষির গুপ্তচর তলোয়ার খাপে ঢাকুন। দোষীকে শাস্তিটা আমায় নিজের হাতে দিতে দাও।"

সুলন্দ ভাবলে, একি স্বপ্ন? সে তার নকল মেয়েলীগলা ভুলে চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, "কর্ত্তা!" কিন্তু কালীভূষণ একচোখ টিপে অদ্ভুত একটা ইসারা করলে। সুলন্দ কিছুই বুঝতে না পেরে আগে যেমন, তেমন দাঁড়িয়ে রইল।

কালীভূষণ হেসে মেয়েটিকে বললে, "ঋষির ইচ্ছা ব্যর্থ হবার নয়। মহাসাগর আমায় নিলে না। শেষটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।"

রঙিলা চোখের সামনে দেখচে রহস্য। যে কালীভূষণকে সে নিজের হাতে মাতাল ঢেউয়ের মুখে সঁপে দিয়েছে সে আজ হাসিমুখে তার সামনে কামরায় দাঁড়িয়ে। মনে হয়, সে যেন বিছানা থেকে উঠে এসেচে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সে মেঝেয় বসে পড়ল। দুহাত দিয়ে মুখ আড়াল করে কেঁদে সে বললে, "ঋষি ক্ষমা করো আমায়। ভুল বুঝে তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে গিয়েছিলাম। তোমার ইচ্ছে ব্যর্থ হবার নয়।"

কালীভূষণ ইতিমধ্যে কী একটা কথা যেন ভেবে নিলে। হঠাৎ সে বললে, "ঋষি তোমায় ক্ষমা করুন! কিন্তু বোম্বেটের হাতে ক্ষমা নেই। বোম্বেটেদের সামনে বৈঠকখানায় তোমার বিচার হবে। এখনই বিষয়টা সেরে ফেলতে হচ্ছে।"

১০

জাহাজে হৈ চৈ পড়ে গেল। কালীভূষণ ফিরে এসেচে—বোম্বেটের দল আনন্দে যেন ক্ষেপে গেল। জাহাজ-ভাঁড়ার আগলে রাখা দায় হল। ভাঁড়ার লুঠ করে মদের জালা বার করে এনে বোম্বেটেরা ফুর্ত্তির হাট বসিয়ে দিলে। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নিয়ে ইয়া লম্বা গোঁফওয়ালা বোম্বেটেরা ধুমে ধামে নাচগান জুড়ে দিলে। শুধু মহাসমুদ্রে জাহাজখানা কোনরকমে ভাসিয়ে রাখতে যে কটি বোম্বেটে পাটাতনের উপর ছিল, তারা জাহাজ-খোলের হল্লা শুনে রাগে গজর গজর করতে করতে বললে, "আঃ, ফুর্ত্তির রকম ত্যাখো!"

যাহোক; খানিকবাদে বোম্বেটেদের কাছে কালীভূষণের হুকুম এলো—ফুর্ত্তিটা আপাততঃ মুলতুবী রেখে বিচারঘরে সবাইকে আসতে হচ্ছে। তখন মদের নেশা চেপে ঢেকে বোম্বেটেরা সুর সুর করে বিচার ঘরে এসে ঢুকল।

কালীভূষণের পাশে বসেচে ক্ষিতিভূষণ। তাকে ওড়ণা-ওয়ালী সুলন্দ বললে, "নাঃ ছোটকর্ত্তা। ব্যাপারট, যেন কেমন ঠেকচে। মেয়েটার কথা মিছে বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু তাহলে—হঠাৎ কর্ত্তার ফিরে আসা ব্যাপারটা যেন"—

ক্ষিতিভূষণ বললে, "আঃ! তোমার কিছুই বিশ্বাস নয়।" তবু ক্ষিতিভূষণের মনেও যেন একটু আধটু খটকা বাধছে। একএকবার সে কালীভূষণকে ঠাহর করে দেখচে আর ভাবচে, সত্যিই কি এই তার দাদা?

সকলেই চুপ। কালীভূষণ কী বলে—সেই অপেক্ষায় সকলে তার মুখপানে তাকিয়ে।

কালীভূষণ খানিকটা হেসে নিয়ে কাজ সুরু করলে।

"সভাস্থ বোম্বেটে সবাই, সসাগরা পৃথিবীতে বোম্বেটে কালীভূষণের জুড়ী কে আছে?" বোম্বেটেরা কোলাহল করে বলে উঠল, "না, কেউ নেই।"

"এহেন কালীভূষণকে যে মারতে চায়, বোম্বেটেদের হাতে তার কোন্ শাস্তি পাওয়া উচিত?"

"মৃত্যু।" বোম্বেটেরা চেঁচিয়ে একগলায় বললে।

"উহুঁ! তোমরা ভুল করচ। সকলের পক্ষে মৃত্যু চরম শাস্তি নয়। মৃত্যুর চেয়ে বড় শাস্তি আছে। ভেবে দ্যাখো, দোষী ব্যক্তিটি সামান্য লোক নয়। কোনো দেশের রাজকন্যা, নিদেন পক্ষে বড় ঘরের মেয়ে বটে।" কালীভূষণ বললে।

"লাঞ্ছনা, অপমান" বোম্বেটেরা চেঁচিয়ে উঠল। কেউ বললে, "লাথি মেরে সমুদ্রে ফেলে দাও।" কেউ বললে, "মাথা মুড়িয়ে সকলের দাসী করে রাখা হোক।"

কালীভূষণ গম্ভীর গলায় বললে, "আঃ, মিছে গোল কোরোনা। মেয়ে লোককে লাঞ্ছিত করায় বাহাদুরী নেই।"

তবে? সকলে কালীভূষণের দিকে তাকালে।

কালীভূষণ বললে, "শোনো সকলে। আমি মনে মনে একটা শাস্তি ঠিক করে রেখেছি। আমি টের পেয়েছি এই মেয়েটি কোনো গুপ্তদলের চর। আমাকে দিয়ে সেই গুপ্তদলের কোনো গোপন প্রয়োজন আছে। এই মেয়েটি আমাকে চুরি করতে রওণা হয়েছিল।" একটু থেমে কালীভূষণ বললে, "সেই গুপ্তদলের অভিসন্ধী গোপন রাখা এর কর্ত্তব্য। সেই অভিসন্ধী যাতে ফাঁস না হয়, সে রকম একটা কোন শপথ হয়তো একে করতে হয়েচে। প্রাণ থাকতে সেই শপথ কেউ ভাঙতে রাজী হয় না। প্রাণের চেয়ে শপথ বড়। সেই শপথ আজ ভাঙতে হবে তোমাদের সামনের রঙিলা নামের মেয়েটির। তার নিজমুখে আমরা তার দলের ইতিহাস শুনতে চাই। কেন আমাকে চুরী করে নিয়ে যেতে মহাসমুদ্রে এসেছিল সে, কে সে, কোথায় তার ঘর, সকল কথা অকপটে তাকে বলতে হবে। না হলে, না হলে জাহাজের খোলে তাকে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে। মরে সে মুক্তি পাবে। তার আগে নয়।"

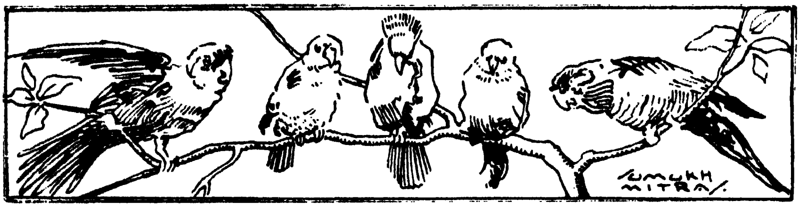
কামরায় কারো মুখে টু শব্দটি নেই। নিঃশ্বাস নিতে সকলের যেন ভুল হচ্ছিল। কালীভূষণের কথা শেষ হতে সকলের রোখ গিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর।

মেয়েটির ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। না সুখের না দুঃখের হাসি। সে বললে, "কালীভূষণ, ঋষির হুকুম অমান্য করে' শপথ ভাঙার পথ সোজা করে দিয়েছি আমি। যদি ঋষির কথা মেনে চলতাম, তা হলে এখনও আমি থাকতাম অমরলতার দলের একজন। কিছুতেই শপথ ভেঙে অমরলতার কাহিনী বলা

চলতনা। বিশ্বাসঘাতকতা হতো। কিন্তু ঋষির কথা যখন ঠেলেচি, তখন থেকেই দল থেকে আমার নাম কাটা গেছে। এখন অমরলতার ইতিহাস খুলে বলতে আমার আপত্তি কি?" মেয়েটি একটু থামল। তার গলা যেন ধরে এসেচে। একটুক্ষণ নীচেয় তাকিয়ে থেকে সে বললে, "তা ছাড়া, অমরলতার ইতিহাস এমনিই আমাকে খুলে বলতে হবে। অমরলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার জীবনের করুণ ইতিহাস। সেটা বলতে গেলে অমরলতার ইতিহাস না বলে উপায় নেই। আর আমার জীবনের ইতিহাস, তা আমি লুকিয়ে রাখতে চাই না। ঋষির হুকুম যে আমি নিজেই অমান্য করিনি, একটা বড় রকমের কারণ যে আছে, অমরলতার পবিত্র পুঁথি কিছুতেই বোম্বটের হাতে তুলে দিতে পারি না যে আমি—আমার জীবনের ইতিহাস না শুনলে পৃথিবী তা বুঝবে কি করে?"

কালীভূষণ ভারী গলায় বললে, "তা হলে তোমার কাহিনী স্থরু হোক।"

ক্রমশঃ



আলোচনা

সনাতন ধর্ম্ম ও আর্য্য সমাজ

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌,এ

অগ্রহায়ণের রংমশালে "স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর মহাশয় এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহা সত্য নহে, যাহা পাঠ করিলে তরুণ পাঠক-পাঠিকাগণ সনাতনীদের বিরুদ্ধে অযথা বিদ্বেষভাবাপন্ন হইবেন। এজন্য এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

সনাতনী কাহাকে বলে ধীরেন্দ্রবাবু তাহার কোনও সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মের এক নাম 'সনাতন' ধর্ম্ম—সনাতন শব্দের অর্থ—অনাদি, চিরস্থায়ী, পরিবর্ত্তনহীন; এবং 'সনাতনী' কথাটি 'সনাতন' শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে 'সনাতন ধর্ম্ম' কথাটিই ব্যবহার করা হইয়াছে, হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া কোন কথা নাই—হিন্দু ধর্ম্ম এই নামটি মুসলমানগণ দিয়াছেন।

'শাস্ত্র' বলিতে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থকে বুঝায়। সনাতনীরা সকল শাস্ত্রই বিশ্বাস করেন এবং স্বামী দয়ানন্দ কেবল মাত্র 'বেদ'এই আস্থাবান—তাঁহার সহিত সনাতনীদিগের ইহাই মতভেদের কারণ।

ধীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন সনাতনীগণ রামানুজ ও শ্রীচৈতন্যকে সহ্য করেন নাই। ইহা সত্য নহে। কারণ তাঁহাদের জীবনী ও গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে তাঁহারা বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র গ্রন্থেই বিশ্বাস করিতেন। বেদে তাঁহাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি যদি বেদ বিরোধী হইত তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত গ্রন্থগুলিকে বেদানুযায়ী বলিয়া সমর্থন করিতেন না। সুতরাং তাঁহারা সনাতনীই ছিলেন। এবং যেহেতু স্বামী দয়ানন্দ পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিতেন না, সেহেতু তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্য রামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের মতের বিরোধী বলা যাইতে পারে।

ধীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন স্বামী দয়ানন্দকে হত্যা করিবার জন্য সনাতনীগণ বারম্বার চেষ্টা করিয়াছিল এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি এমন একটি গল্প বলিয়াছেন যাহার কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই।

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই দুষ্ট লোক আছে। কিন্তু তাহা হইতে, সেই সম্প্রদায়ের সকলেই যে মন্দ ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা অন্যায়। পৃথিবীতে বহু ধর্ম্ম আছে এবং নানা বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতভেদও আছে। আমরা যদি পরমত-সহিষ্ণু হই তাহা হইলে জগতে শান্তি বিরাজ করিবে। আমাদের সেইরূপ চেষ্টা করাই উচিত। আমাদের এরূপ সকল মন্তব্য প্রকাশ করা কখনই উচিত নহে যাহাতে বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে।

ধীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন স্বামী দয়ানন্দ বাল্যকালে একবার দেখিয়াছিলেন যে একটি ইন্দুর শিবলিঙ্গের উপর চড়িয়া নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতেছে, এবং তথাপিও মহাদেবের রোষে সে ভস্মীভূত হইতেছেনা। ইহা হইতে তাঁহার নাকি মনে হইয়াছিল যে, যে দেবতা সামান্য ইন্দুরকে ভস্মীভূত করিতে পারেন না তাঁহাকে পূজা করা অর্থহীন। এই সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিতে চাই। কোনও পিতা যদি দেখেন যে তাঁহার জ্ঞানহীন শিশুপুত্র তাঁহার ভোজন পাত্র হইতে অন্ন ভক্ষণ করিতেছে তাহাতে কি সেই পিতার মনে হয় যে শিশুপুত্র তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হউক অথবা তাহাকে মারিয়া ফেলি?

নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা করা, ধ্যান করা কঠিন। এ জন্য হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মান করিয়া পুজা করিবার বন্দোবস্ত আছে; এবং শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ প্রতিমাপূজা সমর্থন করিতেন তাঁহারা নিজেও প্রতিমাপূজা করিয়াছিলেন। অতএব ধীরেন্দ্রবাবু যাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে।

স্বামী দয়ানন্দের মত এই যে ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না। কিন্তু ব্যাস, বাল্মীকি মুনিগণ ধ্যানে জানিতে পারিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, প্রভৃতি রূপ ধরিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে ঈশ্বরের অবতার হয়। সুতরাং স্বামী দয়ানন্দের মত গ্রহণ করিলে এতগুলি মহাপুরুষকে ভ্রান্ত বলিতে হয়।

স্বামী দয়ানন্দের মতে ঈশ্বর এক; সনাতনীরাও এই কথাই বলেন। কিন্তু ঈশ্বর এক হইলেও বিভিন্ন ব্যক্তির স্বভাব বিভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের কল্পনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরকে কেহ প্রভু বলিতে ভালোবাসেন, কেহ ভালোবাসেন বন্ধু বলিয়া ডাকিতে। এই জন্যেই ঈশ্বরের কৃষ্ণ, মহাদেব, বিষ্ণু, দুর্গা, ইত্যাদি রূপের কল্পনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরের এতগুলি রূপের পরিকল্পনা সত্ত্বেও তিনি এক।



মশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন—

শীত শেষ হয়ে এল বসন্ত। সরস্বতী পূজোর উৎসবে তোমরা কদিন খুব মেতেছ নিশ্চয়। বসন্তকালের ঠিক সুরুতে সরস্বতী পূজোর উৎসব হওয়ার একটা গভীর মানে আছে মনে হয় না কি? সরস্বতী হলেন বাণী—জীবনের বাণী, শীতের শুকনো শীর্ণ আড়ষ্ট পৃথিবীতে সে বাণী ফুটে উঠল গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতায় রঙবেরংএর ফুলের উৎসবে। বোবা পৃথিবী কথা কয়ে উঠল আনন্দে। সরস্বতীকে সেই ভাবেই আমরা ভাবতে চাই।

প্রাণের সাড়া আনেন তিনি অচেতন জড়ের মধ্যে, ঘুমন্তকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। পুঁথির পাতার শুকনো নীরস জ্ঞানের দেবতা তিনি ত নন, তিনি আনন্দময় উদ্দীপনা। শুভ্র তাঁর বর্ণ, অন্ধকার যে আলোর বন্যায় ধুয়ে যায়, সেই আলোর মত শুভ্র।

সরস্বতী পূজোর সমস্ত আনন্দ উৎসব কিন্তু এবারে একটি নিদারুণ শোকের ছায়ায় ম্লান হয়ে গেছে। সরস্বতীর বর পুত্র রূপে বাংলা দেশের হৃদয় যিনি জয় করেছিলেন সেই শরৎচন্দ্র আমাদের ছেড়ে গেছেন।

চিরদিন পৃথিবীতে কেউই থাকে না। সকলের যাঁরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র তাঁদেরও একদিন বিদায় নিতে হয় এসব কথা জেনেও মন কি সান্ত্বনা মানতে চায় এই দুঃখের দিনে! শরৎচন্দ্রের মত অসামান্য প্রতিভা নিয়ে যে সব অসাধারণ মানুষ জন্মান তাঁরা একটি পরিবারের আপনার জন্য হয়ে ত থাকেন না, সমস্ত দেশের তাঁরা পরমাত্মীয় হয়ে ওঠেন। তাঁকে হারানর দুঃখ তাই পরমাত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথার মত সান্ত্বনাহীন।

শরৎচন্দ্র কত বড় লেখক ছিলেন, বাংলা দেশের সাহিত্যকে কত গৌরব তিনি দিয়ে গেছেন সে সব কথা এখানে আলোচনা করব না, বড় না হলে তোমরা সব বুঝতেও বোধ হয় পারবে না। তবু তোমাদের জন্যে যে কটি লেখা তিনি লিখেছিলেন তা পড়ে তোমরা নিশ্চয় বুঝেছ তাঁর কলমে কি যাদু ছিল। তোমাদের জগতে এমন কটি সঙ্গী তিনি এনে দিয়েছেন যাদের তুলনা মেলেনা;—কোন দিন তাদের কেউ ভুলতে পারবে না। মনে করো দেখি ইন্দ্রনাথের কথা! অমন বন্ধুর সঙ্গ পেলেও জীবন ধন্য হয় না কি?

—তোমাদের সম্পাদক মশাই

চলন্তিকা

প্রিন্সিপাল হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র শুধু অধ্যাপনায় বড় ছিলেন না, তাঁর সব চেয়ে বড় গুণ ছিল—সত্যের প্রতি তাঁর অসামান্য নির্বিচল অনুরাগ ছিল। অপ্রিয় সত্য বলতেও তিনি কখনও কুণ্ঠিত থাকতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহু গল্প ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অধ্যাপনা তাঁর প্রিয় ছিল, ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, ছাত্রদের তিনি ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যুতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রমহলে অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। হেরম্ব মৈত্র ও জগদীশ বোস এঁদের মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজও তার দুটী অধিনায়ক হারিয়েছেন। গত মাঘোৎসবে এঁদের অনুপস্থিতি সকলেই অনুভব করেছিলেন। হেরম্ব মৈত্রের শ্রাদ্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন ঃ

জীবন ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়,
সংসার যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
নির্বিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার,
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়-মাল্য তার।

* * *

বাংলার জয়! ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল ক্রীকেটে বাংলা মধ্য ভারতকে ২৮ রাণে হারিয়েচে। ক্রীকেটে বাংলা দেশ বড় নাম করতে পারেনি কিন্তু এবার মধ্যভারতকে হারিয়ে সে নিজের ওপর বিশ্বাস এনে আরো ভালো করবার আশা করেচে। বাংলার এই জয়লাভ আরও আনন্দের ও আশার এই জন্যে যে তার তিন জন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—কার্ত্তিক বোস, হোসি ও লঙ্‌ফিল্ড এঁরা কেউ সে দিন খেলেন নি। নীচে ফলাফল দেওয়া গেল ঃ

বাংলা—	১ম	ইনিংস	...১১০
	২য়	,,	...২১৭
			৩২৭
মধ্যভারত—	১ম	,,	...১৫৪
	২য়	,,	...১৪৫
			২৯৯

এরপর বাংলা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারত ফাইন্যালে বম্বেতে নওয়ানগরের সঙ্গে খেলবে।

* * *

মাদ্রাজে চতুর্থ ক্রীকেট টেষ্ট ম্যাচে লর্ড টেনিসনের টীম এর কাছে আবার ভারতীয় টীম জয়ী হয়েচে—এক ইনিংস ও ছ' রাণে। ইনিংসে হার লর্ড টেনিসন দলের ভারতবর্ষে এই প্রথম। বম্বেতে ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়মে এবার পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ খেলায় রাবার (Rubber) নির্দ্ধারিত হবে।

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচের ফলাফল ঃ

ভারতবর্ষ—প্রথম ইনিংস		...২৬৩
		২৬৩
লর্ড টেনিসন দল—প্রথম	,,	...৯৪
লর্ড টেনিসন দল—দ্বিতীয়	,,	...১৬৩
		২৫৭

*　　　*　　　*

গ্রীস দেশের এক বীর ছেলে ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ২২ মাইল ক্রমাগত দৌড়ে এথেন্সে গ্রীকদের জয়লাভ বার্ত্তা এনেছিলেন। এথেন্স নগর প্রান্তে পৌঁছে "Rejoice, we conquer," —এই কথাটী বলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই গ্রীক যুবাটীর নাম ফিডিপাইডীস। তিনি চিরদিনের মত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ রাণার হয়ে রইলেন। গ্রীসে পৃথিবীর প্রথম অলিম্পিয়াতে ও তারপর থেকে সর্ব্বদেশের অলিম্পিয়াতে এ ঘটনাটি চিরস্মরণীয় রাখবার জন্য ম্যারাথন রেস অনুষ্ঠিত হয়। গত ফেব্রুয়ারী কলিকাতার টালা পার্কে অলিম্পিয়া উৎসবে ভারতবর্ষে প্রথম ম্যারাথন রেস অনুষ্ঠিত হল। পাতিয়ালার অমর সিং এই ম্যারাথন রেসে ২৬ মাইল দৌড়ে প্রথম হয়ে প্রাচীন ম্যারাথন-গৌরব অর্জ্জন করে সত্যিই অমর হলেন।

*　　　*　　　*

গত ৬ ই ফেব্রুয়ারী রবিবার টালা পার্কে মহাসমারোহে ভারতীয় অলিম্পিক খেলাগুলি শেষ হল।। অলিম্পিক উন্মোচনের পর প্রথম দিন 'মার্চ্চ পাষ্ট' (March past) অনুষ্ঠিত হয়—তারপর নানা প্রদেশের প্রতিযোগিরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েচে—পাঞ্জাব ও 'টাটা ট্রফি' পেয়েচে। তার মোট ৫৮ পয়েন্টস, বাংলা ও পাতিয়ালা জোড়ে দ্বিতীয় হয়েচে—তাদের প্রত্যেকের ৩৬ পয়েন্টস। তারপর ইউ পি ২০ পয়েন্টস। বাংলা এ প্রতিযোগিতায় বেশ ভালই করেচে। 'Pentathlon' ইভেন্টগুলিতে বেশী পয়েন্ট নিয়ে এল্ সুকিয়া বাংলাকে জয়ী করেচে। কুস্তীতে, কবাটীতে, ও বাস্কেট বলে বাংলাই জয়ী হয়েচে। ৪০০ মিটার দৌড়ে ভারতীয় রেকর্ড স্থাপনা করে এফ্ গ্যাণ্টজার বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেচেন। এ ছাড়া ১০০ মিটার রেসে খান (বাংলা) প্রথম হয়েচেন;

মেয়েদের ১০০ মিটার রেসে প্রথম হয়েচেন মিস বারবারা এড্‌ওয়ার্ডস (বাংলা) ; মেয়েদের 'ডিসকাস থ্রো' তে প্রথম হয়েচেন মিস ম্যাকিনটায়ার (বাংলা)। কিন্তু মোট পয়েন্টে পাঞ্জাব হয়েচে প্রথম।

'ম্যারাথন' রেসে ২৬ মাইল দৌড়ে পাতিয়ালার নাম রেখেচেন অমর সিং—তাঁর সময় হয়েছিল—২ ঘঃ ৫৯ মিঃ .৭ সেঃ ; বাংলার পি চন্দ্র ও আর হোর এঁরা ২য় ও ৩য় হয়েচেন। পাঞ্জাব নিয়েচে—১১০ মিটার হাডল, ৮০ মিটার হাডল (মেয়েদের) ; জেভলিন থ্রোতে ও ভলিতে ও পাঞ্জাব প্রথম। সাইক্ল রেসে বম্বে, ডিসকাসএ মাইসোর, হফ্‌-ষ্টেপ্‌-জাম্পএ মান্দ্রাজ ও প্রথম হয়েচে। পাতিয়ালা প্রথম হয়েছে ম্যারাথন রেসে, ৫০০০ মিটার রেসে, ১৫০০ মিটার রেসে ও পোল ভল্টে।

কবাটি (হা-ডু-ডু) প্রতিযোগিতাও এবারকার ভারতীয় অলিম্পিকের একেবারে নূতন জিনিষ। ফাইন্যালে সি-পি কে ১৬-১৪ পয়েন্টে হারিয়ে কবাটিতে বাংলা ভারত জয়ী হয়েচে। দিশি খেলাতেও বাংলা দেশ গৌরব রেখেছে।

কলকাতায় এই প্রথম মেয়েদের ইন্টার স্কুল স্পোর্টস দেখে আমরা খুব আনন্দিত হলাম। শুক্রবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলকাতার মাঠে এই স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়। সেন্ট টমাস স্কুল এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পীয়ন হলেও বাঙ্গালী মেয়েরা বেশ ভালই করেচে ! নীচে আমরা কয়েকটি ফলাফল দিলাম।

জেভ্‌লীন্‌ থ্রো
—মিস বি সেন (লরেটো)-প্রথম।

অবষ্টাকল্‌ রেস ঃ
—মিস রেণু ঘোষ (ডাফ)-প্রথম।

১০০ গজ রেস (বড়দের) ;
—মিস রুবি (জিউ গার্লস)-প্রথম।

৭৫ গজ রেস (ইন্টার) ঃ
—মিস্‌ গ্রীনউড (লা মার্টিনেয়ার) প্রথম।

৫০ গজ রেস (ছোটদের) ঃ
—মিস্‌ জেকবস্‌ (সেঃ টমাস)-প্রথম।

৫৫ গজ হাড্‌ল্‌ (বড়দের)
—মিস পোর্ট (সেঃ টমাস)-প্রথম।

স্কিপিং (ছোটদের) ঃ
—মিস ব্রাউনলো (সেঃ টমাস)-প্রথম।

ব্যালেন্স (বড়দের) ঃ
—মিস রমোলা মজুমদার (লেক স্কুল) প্রথম।

স্যাক রেস ঃ
—মিস নিয়তি দে (ভিক্টোরিয়া)-প্রথম।

রাণিং ব্রড জাম্প (ইন্টার) ঃ
—মিস প্রতিমা দত্ত (বেথুন)-প্রথম।

জার্ম্মান কুস্তিগীর ফন্ ক্রেমারকে হারিয়ে ভারতীয় চ্যাম্পীয়ন কুস্তিগীর ইমাম বক্স পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর বলে পরিচিত হয়েচেন। কুস্তি জগতে এটা মস্ত খবর। গুঙ্গাকে হারিয়ে ক্রেমার হয়েছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী আর একমাত্র এই গুঙ্গাকে ভয় করে চলতেন ইমাম বক্স। শীঘ্রই ক্রেমার ও ইমাম বক্সকে আহ্বান করা হোল। ইমাম বক্স পৃথিবীতে অপরাজেয় হয়ে ভারতের যে সম্মান গুঙ্গা মুহূর্ত্তের ভুলে হারিয়ে ছিলেন তিনি সে সম্মান ফিরিয়ে এনে কুস্তীতে ভারতকে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বম্বেতে ফন ক্রেমার ও ইমাম বক্সের আশ্চর্য্য লড়াই চিরস্মরণীয় হয়ে রইল। বিদেশে ক্রেমার এর মত কুস্তীগীর আর নেই-ইমাম বক্স এর সঙ্গে তিনি যা খেলা দেখিয়েছেন তা অতি সুন্দর।

*　　　*　　　*　　　*

পায়রা রেসের কথা শুনেচ? অনেকে হয়ত শোনোনি। বাংলাদেশে আমরা অনেকে তো পায়রা পুষি তাদের ওড়াই কিন্তু রেস কৈ খুব বেশী শোনা যায় না। এলাহাবাদে এবার শোনবার মত পায়রার রেস হয়েচে। এলাহাবাদ থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত ৫১৩ মাইল বড় কম নয়। ২৮শে জানুয়ারী শনিবার সকাল ৭-২২এ ৪৮টা পায়রা এলাহাবাদ থেকে ছাড়া হয়—কলকাতায় তাদের মধ্যে দুটিকে দেখা গেল ঐ দিনই বিকেল ৬টার সময়। আশ্চর্য্য নয়! কত তাড়াতাড়ি এসেচে বলতো? যে পায়রাটি প্রথম হয়েচে তার নাম 'রেবা,' এটি মিঃ এস্ সি ব্যানার্জ্জির পায়রা। আর দ্বিতীয় হয়েচে মিঃ এস্ এন্ চৌধুরীর—"ট্রাই এগেন্"। অনান্য পায়রাগুলি সবাই পরদিন সকালে এসে পৌঁচেছিল।

এই রেসিং পায়রাকে আগে নানা কাজে লাগান হোত। এরা দুর দেশবিদেশের ডাক পিওনের কাজ করতো। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের আগে পায়রা ডাকই ছিল সবার প্রিয়। বেলজিয়ামে এখনও মহা উৎসবে পায়রা ওড়ানর স্পোর্ট করা হয়। গত মহা যুদ্ধে পায়রা অনেক গোপন দরকারী কাগজ পত্র নিয়ে শত্রু পক্ষের ওপর দিয়ে ওড়ে আসা যাওয়া করেচে। অনেক জায়গায় নীচে উড়তে গিয়ে বেচারা গুলিতে প্রাণ হারিয়েচে। যুদ্ধে জার্ম্মানরা শত্রুপক্ষের পায়রা দমন করবার জন্য শিক্ষিত বাজ পাখী নিযুক্ত করতো। প্রাচীনকালে চীনেরা বড় পাখী তাড়াবার জন্য পায়রাদের গলায় ঘণ্টা লাগিয়ে দিত। পায়রা অনেকদিন ধরে অনেক দূর দূর ক্রমাগত উড়ে ঠিক নিজের জায়গাটিতে পৌঁছতে পারে-কোন ভুল হয় না তাদের।

*　　　*　　　*　　　*

অরোরা পোলারিস (Aurora polaris) কি জান? আকাশের উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মেরুদণ্ডে এদের কখনও কদাচিৎ দেখা যায়। উত্তর আকাশে যে অরোরা দেখা যায় তার পুরো নাম অরোরা বোরিয়ালিস্ (Aurora Borealis) আর দক্ষিণে যে অরোরা দেখা যায় তাকে বলা হয় অরোরা অষ্ট্রালিস। কেবল মাত্র অরোরা বোরিয়ালিস কয়েকবার দেখা গিয়েচে। নানা বিচিত্র রং এ আকাশে আলোকচ্ছটা বা উল্কার মত এদের দেখায়। সাধারণতঃ বক্র আকারে (arc) বা রশ্মিরূপে, কখনও আবার গোল বা ঢেউ এর মত, কখনও আলোক পর্দ্দার মত এরা দেখা দেয়। যখন এরা ক্ষীণ হয় এরা দেখতে হয় সাদা, আর একটু উজ্জ্বল হলে হলদে দেখতে হয়, বেশী উজ্জ্বল হলে সবুজ নীল লাল ও নানা বিচিত্র রং এ এরা দেখা দেয়। আকাশ ও পৃথিবীর বৈদ্যুতিক ও চুম্বক শক্তির অবস্থা বিপর্য্যয়ে এরা প্রকাশ পায়। কখনও কখনও এদের আবির্ভাবের পর ঝড়ের সূচনা হয়। সম্প্রতি [গত ২৬শে জানুয়ারী] লণ্ডনে এক উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট অরোরা বোরিয়ালিস দেখা গিয়েচে। এরকম আশ্চর্য্য অরোরা নাকি ইউরোপে বহু শতাব্দী দেখা যায় নি। সন্ধ্যার দিকে আকাশের কোণে প্রথমে সামান্য একটু লাল আলোর আভা দেখা যায়, পরে ক্রমশঃ সেটা রং এ উজ্জ্বল হতে হতে ঘন নীল হয়ে ওঠে। অনেকে আগুন লেগেচে ভেবে ভয়ে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিয়েছিল! কেউ কেউ ভেবেছিল লণ্ডনের রাজপ্রাসাদে [Windsor castle] বুঝি আগুন লেগেচে! লণ্ডন সহরে এই আশ্চর্য্য খবরটা জনসাধারণকে জানাবার জন্য অরোরার নীচে বড় বড় এরোপ্লেন চালান হয় রেডিয়ো ও নানা আওয়াজে চীৎকারে অরোরা দেখা দিয়েচে বলা হয়। এত চীৎকার আর কোলাহল হয় যে সমস্ত লণ্ডন সহর ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল! অনেক ভেবেছিল যুদ্ধের বুঝি আয়োজন হচ্চে! অরোরার এই আকস্মিক আবির্ভাবে অনেক অদ্ভুত জল্পনা কল্পনাও চলছে—এর ফল কি হবে!





ইন্দিরা দেবী

আমার আদরের ছোট্ট বোনেরা—

কি খবর তোমাদের ? সাড়া শব্দ নেই চুপ চাপ বসে বসে কথাগুলি আমার শুনে যাচ্ছ বা পড়ে যাচ্ছ কিন্তু অভিমত কিছু জানতে পারছি না। রান্নাঘর শুনতে কী ভারী বিরক্ত লাগছে না রাগ হচ্ছে ? ভাবছো গল্প নেই মজার কথা নেই খালি ভারিক্কী চালের কথা— আচ্ছা আজ কি শুনবে তোমরা বলতো ? মাঝে মাঝে যদি তোমাদের মতামত আমায় জানাও তা হলে খুব খুসী হই।

আজকে তোমাদের একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বলবো। সেলাই সম্বন্ধে তোমরা সবাই অল্প বিস্তর কিছু কিছু জানো ঃ ছোট ছোট জামা ফ্রক ইজের, জাঙ্গিয়া প্রভৃতি তৈরী করাটা খুব কষ্ট সাধ্য ব্যাপার নয়। কষ্ট সাধ্য হচ্ছে মনকে এরকম কাজে নিযুক্ত করার প্রচেষ্টাকে। তোমাদের হয়তো অনেকের এখন পুতুল খেলার নেশাটা আছে—আমারও মনে পড়ে আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম খবরের কাগজ কেটে কেটে পুতুলের জামা কাপড় তৈরী করতাম। আর একটা কি ছিল জান ? দিদি বা আত্মীয়দের যার ভাল শাড়ী দেখতাম বলতাম এটা ছিঁড়ে গেলেই আমায় দিও। তোমাদের সময় এখন তো কত সুন্দর সুন্দর পুতুল খেলনা ও তাদের জামা কাপড় তৈজস পত্র বেরিয়েছে আমাদের সময়ে কিছু ছিল না। মাটীর আর কাঁচের পুতুল—তাও কাঁচের গুলো কত দাম—শোয়ালে চোখও বুজতো না, হাত পায়ে গহনা পরানো কি জামা পরানও যেতো না! তোমাদের ঐ সুন্দর সুন্দর আলুর পুতুল ওদের তো জামা কাপড় পরাতে হয় ইচ্ছাও করে। ওর সায়া, ব্লাউজ, প্লেন ব্লাউজ, ফ্রিল দেওয়া ব্লাউজ, হাতে কাটা কাটা জাফরি মত এসব কি করে করবে বল তো ? আচ্ছা খবরের কাগজ নাও—কিন্তু নেবার আগে দেখো সেটা

পুরানো কিনা অর্থাৎ কিনা যদি সেদিনের হয় নিওনা'—আচ্ছা তারপর সেটা ভাঁজ করে আগে তোমার নিজের গায়ের একটা জামা ফেলে কেটে নাও—দেখে দেখে করো। তাহলে ধারণা হবে কেমন ভাবে করবে, তারপর ঐ জিনিষটা ছোট ভাবে কেটে নাও—যাতে তোমার ঐ পুতুলের গায়ে মাপে হয়—যে রকম তোমার ইচ্ছা তেমন ভাবে করো। ২।১টা তৈরী করলেই দেখো কেমন ভাল লাগবে—এই করতে করতে তারপর নিজের জামা সায়া প্রভৃতি তৈরী করতে পারবে. তোমরা এরকম পুতুল খেলার ভিতর দিয়ে ছোট ছোট ফ্রক ব্লাউজ ইজের জাঙ্গিয়া প্রভৃতি কাটবার চেষ্টা করো। এতে করে তোমাদের পুতুল খেলার ভিতর দিয়ে খানিকটা আনন্দ আসবে। তোমাদের এ বিষয় আমি পরে বলবো। ছোট ছোট অপ্রয়োজনীয় জিনিষ নিয়ে কেমন সুন্দর খেলার জিনিষ করা যায়—তা তোমাদের জানাব।

আজ একটা মজার গল্প শোনোঃ—**বেড়াল আর কাকাতুয়া**

মেনি বেড়াল, বুকখানা তার সাদা, নাক মেটেরংএর আর ঘন নীল চোখ দেখতে মন্দ নয়,এমনি এই বেড়াল—এটা হলো আমার পোষা—আদর করে তার নাম রেখেছি 'পুষু'। তার সঙ্গে আমার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ নয়—আমার পুষু বিছানায় আমার পায়ের কাছে রাতে ঘুমোয়—যখন লেখা পড়া করি তখন চেয়ারটীর হাতলে বসে ও কেমন ঝিমোয়। বাগানে বেড়াবার সময় ও আমার পিছনে পিছনে থাকে—খাবার সময় আমার সহকারীর কাজ করে। এমনি আমার আদরের পোষা বেড়াল—নাম তার 'পুষু'।

একদিন হয়েছে কি আমার এক বন্ধু বিদেশ যাবার সময় তার একটা পোষা কাকাতুয়া আমার জিম্মায় রেখে গেলেন—যাতে সে একটু ভাল ভাবে থাকতে পায়—নিয়মিত খেতে পায়। কাকাতুয়া নিজের পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে আমাদের বাড়ী এসে রইল, তার ভাব গতিক দেখে মনে হলো—সে যেন জলে এসে পড়েছে। ঠোঁট দিয়ে তার দাঁড়টিকে কামড়ে ধরে আস্তে আস্তে সে তার ওপরে গিয়ে বস্‌লো। 'পুষু' কখনও কাকাতুয়া দেখেনি—তাই একে তার নুতন জীব মনে হলো; নিঃশব্দে সে এই পাখীটির দিকে চেয়ে রইল এবং এর সম্বন্ধে অসম্ভব যত ধারণা তার মনে জেগেছিল—সে সব ভাবতে লাগলো। বাগান আর উঠোনটীর উপর বসে বসে এ কথাই বহুবার ভেবেছে। তার যদি বাকশক্তি থাকতো সে তার মনের ভাব অসঙ্কোচে প্রকাশ করে বলতো—"এটী নিশ্চয় সাদা রঙের মুরগী।" এই রকম কিছু ভেবেই বোধ হয় পুষু টেবিল থেকে নেমে পড়ে ঘরের কোনে ঘাপটি মেরে বসলো—সামনের পা দুটো ঈষৎ উঁচু করে মাথাটী নীচু করে দক্ষ শিকারীর মত ওৎ পেতে

রইল। কাকাতুয়া উৎকণ্ঠায় তাকে দেখতে লাগলো—পাখা দুটো তার অকারণে ঝাড়তে লাগলো—পদশৃঙ্খল দিয়ে বার দুই শব্দ করলো, দাঁড়টীর উপর ঠোঁটটী ঘসে তীক্ষ্ণ করতে লাগলো। পুষু যে দুষ্টুমী করবার ফন্দী ফিকির খুঁজছিল তা সে সহজেই বুঝতে পেরেছিল—মোহিত হয়ে পড়েছে এমনি দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে পুষু কাকাতুয়াটীর দিকে তাকিয়ে রইল। সাদা হলে কি হবে মুরগীটা খেতে মন্দ হবে না—এ ছিল পুষুর চোখের ভাষা!

আমি বেশ কৌতুক করে এদের যুদ্ধের আয়োজন দেখছিলাম। প্রয়োজন হলে যে এদের আয়োজন নিরর্থক করে দেবো—সে কথা আমার মনে মনে ছিল। পুষু কাকাতুয়ার কাছে ধীর পদে এগিয়ে গেল—তার মেটে রঙের নাকটা ফুলে উঠলো—সে তার চোখ দুটো অৰ্দ্ধেক বন্ধ করে আবার পুর্ণ ভাবে চেয়ে রইল—থাবাটা গুটিয়ে নিল! একটা উন্মাদনা তার সারা শরীরে বয়ে গেল। আহারের আশায় উৎফুল্ল হয়ে তার ক্ষুধা হঠাৎ চনচনিয়ে উঠলো। মুহূর্ত্ত মধ্যে পুষুর পিঠটা জ্যা মুক্ত তীরের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়ের উপর সে এসে পড়লো।

কাকাতুয়া নিজের আগত প্রায় বিপদে—নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে স্থির গম্ভীর অথচ দৃঢ়স্বরে হঠাৎ বল্লোঃ মহাশয়ের ব্রেক্‌ফাষ্ট হয়েছে কী?

কাকাতুয়ার কথা শুনে তো পুষু ভয়ানক চমকে উঠলো—ভয়ও পেলো, ভয়ে সে পিছিয়েও গেলো! যুদ্ধের দামামা, হঠাৎ কতকগুলো প্লেট ঝনঝন করে ভেঙ্গে পড়ার শব্দ—কানের কাছে পিস্তলের শব্দে—সারা শরীরে মনে কিসের ঝড় বয়ে গেল! কিম্বা এই সব ঘটলেও এত ভয় হয় পেতো না, যত ভয় সে পেলো মানুষের মত কাকাতুয়ার এই কথায়।

'এটা পাখী নয়—এ নিশ্চয় একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক।'—মনে মনে এ কথাই হয়তো সে বল্লো। এদিকে কাকাতুয়া আনন্দে চীৎকার করে গান আরম্ভ করলো। পুষু আমার দিকে একটা জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর দিন থেকে পুষুকে কাকাতুয়ার দিকে আর যেতে দেখা যায়নি। তাহলে কাকাতুয়াটা একেবারে ভদ্রলোক বনে গেল?

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গতমাসের প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ আমরা ২৫ শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত রাখিলাম। রংমশালের আগামী সংখ্যায় পৌষ ও মাঘ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল আমরা প্রকাশ করিব। ফাল্গুন ও চৈত্রের প্রতিযোগিতার ফলাফল বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। পুরস্কার বিতরণ করা হইবে নববর্ষে ১লা বৈশাখ।



মিষ্টি ভাই বোনেরা!

তোমাদের চিঠির সবারই গতবার উত্তর যায়নি বলে রাগ অভিমানের পালা সুরু হয়েছে, কিন্তু এ দোষ তোমাদের দিদিভাইএর নয়, স্থানাভাব ঘটেছিল, সেইজন্য উত্তর দিতে পারিনি। একটা কথা—দেখো, গ্রাহকগ্রাহিকা ভিন্ন চিঠির উত্তর দেওয়া নিয়ম নেই কিন্তু তবুও আমি দিচ্ছি এবারে, পরে আর সম্ভব হবে না ভাই। কাজেই, যারা গ্রাহক নও, শীঘ্র শীঘ্র গ্রাহক হয়ে পড়ো। আরও বলে রাখি। এই বিভাগের নিয়ম, ছেলের সঙ্গে ছেলে মেয়ের সঙ্গে মেয়ে'র লেখনী বন্ধু হবে। লেখনী বন্ধুদের নাম ঠিকানা আমি তোমাদের স্বতন্ত্রভাবে পাঠিয়ে দেবো।

এবারে গতমাসের বাকি চিঠির দপ্তরের উত্তর দিই তোমাদের।

জগদীশ ভাই! তোমার চিঠি পেয়ে ভারী আনন্দ হলো, সব চেয়ে বেশী খুসী হয়েছি 'তুমি' বলেছ বলে। তোমার হারান দিদিকে খুজে পাবে ভাই তোমার রংমশালের ভাই বোনের ভিতর। মনে দুঃখ রেখোনা। 'লেখনী বন্ধু' নিশ্চয় করে দেবো।

শিবপ্রসাদ ভাই! রংমশালকে তুমি ভালবাস জেনে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই—আর তো তোমার কোনও অভাব রইলো না ভাই—দাদার মত তুমিও 'লেখনী বন্ধু' পাবে। আর বড় হয়ে তুমিও দাদার মত সুন্দর ইংরাজী লিখতে পারবে। তোমার যা জানতে ইচ্ছা হবে জানাবে, বুঝেছ?

অজয় ভাই! তোমার চিঠি পেয়ে মনে হচ্ছিল-যদি অল্প কথায় সব জানিয়ে চিঠি লেখার প্রতিযোগিতা হয়, তার প্রথম পুরস্কার তুমি পাবে। এটা খুব শক্তির দরকার। লেখনী বন্ধু করে দেবো।

অবনী ভাই! তোমার দুটী চিঠি এসেছে—প্রথম চিঠি খানা দেরীতে এসেছিল বলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি—তোমরা বাংলা ১৭।.৮ তারিখের মধ্যে যা জানাবার লেখবার জানালে তবে সুবিধে হয় ও উত্তর যায়। তোমাদের উপর আমি রাগ করতে পারি কি? তোমরা আমার কত স্নেহের ও কত আদরের। লেখনী বন্ধু সবাইকেই দেবো। তুমি টাটার লোহার কল কারখানার ছবি পাঠিও, মনোনীত হলে সম্পাদক মশাই ছাপিয়ে দেবেন। হাতের লেখাটা তোমার ভালো তাহলেও আরও পরিস্কার করবে।

হৃষীকেশ ভাই! তোমার আজগুবি সখ দেখে ভাল লেগেছে। নিশ্চয় দিদিভাইএর কাছে আব্দার জানাবে। প্রবাসী ভাইদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলেই তো এসেছি তোমাদের কাছে। তুমি যা যা লিখতে বলেছ, আমি সম্পাদক মশাইকে জিজ্ঞাসা করে জানাবো।

গৌরাঙ্গ ভাই! তোমার চিঠি ভাল করে পড়েছি। লেখনী বন্ধু পাবে। হাতের লেখা তোমার ভাল হলেও বড় ছোট—অক্ষর গুলি বেশ স্পষ্ট করলে ভবিষ্যতে লেখা খুব ভাল হবে। রাগ করছে? দিদিভাইকে যে সব দেখতে হয়, তাই বলছি।

অরুণ ভাই! ভাবছিলাম চুপচাপ কেন? চিঠি পেয়ে আমার মনের মেঘ কেটে গেছে। তোমাদের জন্ম তারিখ জানাবে—বড়দিদি হলে আশীর্ব্বাদ করতে হয়, জন্মদিনে জানোতে? রাগ অভিমান করতে নেই।

অমল ভাই! দিদি নেই বলে দুঃখ আর করোনা—তোমাদের আদরের রংমশাল সে অভাব রাখবে না। আমিও 'তুমি' ভালবাসি—অমল নামটি ভাল-কিন্তু 'করু' বেশ মিষ্টি—ঠিক তোমার নামেরই উপযোগী। গল্প খুব লেখো—কিন্তু প্রকাশ হোক-প্রথমেই এমন ভাব যেন মনে না আসে—লিখে যাও কেবল—পরে দেখবে কেমন সুন্দর লিখতে শিখেছ। যেটা তুমি পাঠিয়েছ, এখনও পড়িনি, পরে জানাবো।

আরতি চক্রবর্ত্তী বোন। আমি রাগ করেছি—সম্পাদক মশাইকে চিঠি লিখেছ—আমায় তো লেখনি—আমি যেচে তোমায় লিখছি। রংমশাল তোমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

এবারের চিঠির দপ্তর—

সুরমা ও সমরেশ বসু—কলিকাতা (গ্রাহক নং ৯২১)। প্রিয় দিদিভাই! আমরা অনেকদিন পরে চিঠি লিখছি—দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—গত আশ্বিনে আমার দিদিটী মারা গেছেন সেইজন্যই লিখবো ইচ্ছা হলেও—কাজে হয়ে ওঠেনি... .. কিন্তু আমরা অনেকদিন আপনাকে দিদিভাই করে নিয়েছি...মা বলেছেন আমার দুটী মেয়ে ও দুটী ছেলে ছিল—তা

একটী মেয়ে হারিয়েও আর একটী মেয়ে পেলাম। আমরা ভারী সঙ্গী ভালবাসি—আমাদের 'লেখনীবন্ধু' করে দেবেন। আমার বয়স (সুরমা) পনের বৎসর আর আমার বয়স (সমরেশ) নয় বৎসর। আমার হবি বইকেনা ও পড়া, ছবি জমান ও ভালো ভালো লোকের জীবনীপড়া আর আমার (সমরেশ) ডাকটিকিট ও ক্যালেণ্ডার। আমরা দু'জনেই মাঘমাসে জন্মেছি...... প্রণাম নেবেন।

শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়—পাটনা (গ্রাহক নং ৯৪১)। দিদিভাই! যেদিন থেকে তুমি আমাদের সকলের দিদিভাই হয়ে রংমশালের পাতায় দেখা দিলে—সেদিন থেকেই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল, আমার মস্তদোষ নিজে এগিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারি না—তবু ও আজ সাহস করে তোমাকে চিঠি লিখছি—কারণ মনে হচ্ছে—যত বাজে আব্দারই করিনা কেন—সত্যিকারের দিদির মত হাসিমুখে সহ্য করবে। কল্পনা আর অঞ্জলি—এরা তোমায় স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছি দিদি—কিন্তু ওরা ভুল করেছে—তোমাকে আমরা কল্পনায় ভেবে রেখেছি......তোমার পরিচয় আমরা পাচ্ছি তোমার স্নেহে ভালবাসায়—তাই তো যথেষ্ট দিদি......তার চেয়ে তুমি চিরকালই নিজেকে আমাদের কল্পনার আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখো দিদিভাই। আমি এইবৎসর পাটনা মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি—আমার বয়স আঠার বৎসর—হয়তো রংমশালের গ্রাহক হবার পক্ষে আমার বয়স বেশী—কিন্তু আমি রংমশালকে ভালবাসি।...আমার জীবনের লক্ষ্য কি জান দিদিভাই—আমি চাই খুব বড় একজন Surgeon হ'তে—এত বড় যে সারা পৃথিবীতে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে।...আমার দু'একটা হবি আছে—অদ্ভুত তা আমি স্বীকার করি। একটা হচ্ছে যতরকম পোকা মাকড় জন্তু জানোয়ার পাই—তা স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখি। আর একটা (হেসোনা ভাই) যেখানে আমি যাই প্রত্যেক নতুন জায়গার খানিকটা জল আর মাটি শিশিতে ভরে লেবেল করে—কবে সে জায়গায় যাই নাম ইত্যাদি লিখে রেখে দিই। খুব অদ্ভুত না?......আমায় লেখনীবন্ধু করে দিও।...

শিবরাম বন্দোপাধ্যায়—ভবাণীপুর (গ্রাহক নং ৮৭৬)। দিদিভাই, এ চিঠি বোধহয় পছন্দ হবে না কারণ সবাই বলে আমি চিঠি লিখতে জানি না।......আপনি আমায় ডাক নামে সম্বোধন করবেন......আমার ডাক নাম 'এস'।......আমি সমস্ত দেশের টাকা জমাতে ফটো তুলতে ও কুকুর পুষতে ভালবাসি...কিন্তু আমাদের বাড়ী কুকুর পুষতে দেয় না। ডিটেকটিভ ও য়্যাডভেঞ্চারের গল্প বই পড়তে আমার ভাল লাগে......আমায় লেখনী বন্ধু করে দেবেন।

সুজাতা—Gethia (গ্রাহক নং ৮৩০)। দিদিভাই মণি! যখন থেকে তুমি চিঠির

বাক্স খুলেছ তখন থেকেই আমার 'লেখনী বন্ধু' পেতে ও তোমায় চিঠি লিখতে ইচ্ছা করতো... এখন মনে হচ্ছে তুমি আমার অপরিচিত নও।...আমি একজন যক্ষ্মারোগী, হিল ক্রেষ্ট স্যানিটেরিয়মে আমি আজ দু'বছর আছি...আমার বয়স ১৮ বৎসর, ক্লাস নাইনে উঠে পড়া ছেড়েছি। আগে আমি গান গাইতে, এস্রাজ ও সেতার বাজাতে, ছবি তুলতে, সেলাই করতে ও বুনতে পারতাম—কিন্তু এখন সেলাই ও বোনা ছাড়া সবই বারণ।...আমার পাখী পোষা ও বাগান করার সখ খুব কিন্তু শরীরে কুলোয় না...আমায় লেখনি বন্ধু করে দিও...আমায় বোধহয় কেউ বন্ধু করতে চাইবে না কোনও গুণ নেই তো...কোন ভাইবোন T. B. সম্বন্ধে যদি কোন প্রশ্ন করে জানতে চায় তাহলে যথাসাধ্য জানাবো।...

সুরমা সমরেশ! তোমাদের চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। মাকে নমস্কার দিও—সত্যিই তিনি মেয়ে পেয়েছেন বলো তাঁকে। তোমরা আমায় এখানে চিঠি দিলেই আমি পাবো—আমি তোমাদের সব্বাইকেই খুব ভালবাসি।

শুভেন্দু! তোমার চিঠি সর্ব্বোপরি তোমার ছবি আমায় খুব আনন্দ দিয়েছে ভাই। তোমার বয়সের কথা বলেছ—আমরা ৬ থেকে ১৮ পর্য্যন্ত রংমশালের এই বিভাগে প্রথম যোগদেবার বয়স ঠিক করেছি—বয়স নিয়ে সব সময় বিচার করা চলেনা ভাই, মন নিয়ে বিচার করতে হয়—এই বিভাগে আমার একটী ৬০ বছরের বোন আছেন—জানো? আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার যা লক্ষ্য তুমি যেন তাই হতে পারো ভাই।

শিবরাম ওরফে এস! সত্যি তুমি এস এই বৈঠকে। চিঠি লিখতে খুব ভাল পারো কিন্তু লেখাটা একটু পরিস্কার করতে চেষ্টা করবে বুঝেছ? লেখনী বন্ধু পাবে। কোন্ স্কুলে পড় লিখো।

সুজাতা বোনটী! চিঠি পেয়ে খুসী হয়েছি—সব্বাই তোমার সঙ্গে আলাপ করবে। তোমার পদবী দাওনি কেন? তুমি T. B. সম্বন্ধে জানিও—তোমার কি থেকে ওরকম অসুখ হলো? সব জানিও ভাই।

অরুণ ভাইটী, সুপর্ণা বোনটী! তোমাদের জোর তাগাদা ছিল কিন্তু স্থানাভাবে অনেকের চিঠির উত্তর গেলোনা, রাগ করোনা লক্ষ্মী ভাইবোন। শিবাণী, রবীন্দ্র, দিলীপ, বাঁশরী, যুগল, সুনীল, মুকুল, বিকাশ, জীমূতবাহন, অরুণ, প্রভৃতি তোমাদের চিঠি পেয়েছি—কেউ অভিমান করোনা—আমার ভালবাসা, স্নেহাদর সকলে নিও।

ইতি—শুভার্থিণী তোমাদের—

দিদিভাই



রংমশাল-বৈঠক

বুলুবাবুর একটি বেলা

রাধারাণী দেবী

মঞ্জুরাণী ! একটুখানি, চার বছরের মেয়ে।
ফুট্‌ফুটে ঠিক তারার মত, বেড়ায় নেচে গেয়ে।
যেমন কালো চোখের তারা, তেমনি কালো চুল,
রংটী ! যেন গায়ে মাখা, গোলাপ চাঁপা ফুল।
মেয়ে—কিন্তু নয় সে মেয়ে, একেবারে ছেলে,
চুল ছাঁটে সে ছেলের মতই, ফ্রক দিয়েছে ফেলে
ক্রেপ ডি সিন, সিল্ক্‌ পপ্‌লিন, আর
ছাপার রকমারী।
কিন্তু, হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ আর হাফ্‌সার্টেতেই মানায়
তাকে ভারী।
মঞ্জুরাণী ! নামটী মোটেই মনমত নয়।
"বুলুবাবু" ডাকলে তারে মনটা খুসী রয়।
আছে তাহার বছর দশের একটি মাত্র ভাই।
রোজ সকালে দাদায় তাহার জাগিয়ে
দেওয়াই চাই।
দুই জনেতে, একই সাথে মুখ ধোওয়া আর পড়া
দাদার পড়া সিক্সথ্‌ ক্লাশের, আর বুলু
কাটেন ছড়া।

খান্‌ তিনচার প্রথম ভাগের আছে ছবির বই,
কিন্তু তা'তে মন ওঠে না, আরও বেশী চাই।
[দাদার যেমন,] তেমনি তারো, কি
আর ও করে ?
চেম্বার্স, আরও খান চারপাঁচ, মেলিয়ে
বসে ধরে।
[দাদার] বাংলা, গ্রামার, ইংরিজী ওর
সবই চেনা আছে।
কিন্তু, সবার চেয়ে লাগে ভালো
রংমশাল ওর কাছে।
লিখতে যেমন পড়তে তেমন, সবই যেন জল,
এক মিনিটেই ভরাণ পাতা, ভরাণ ঘরের তল
দাদার আদেশ করতে পালন, উৎসাহটা ভারী
কখন ছোটেন বই আন্‌তে, কখনও বা ছুরী।
মনের মাঝে ভাবটা, ও নয়কো যে সে ছেলে,
একেবারে পড়বে সে যে জিলার স্কুলে।
পড়ার শেষে, মায়ের কাজও এগিয়ে দেওয়া চাই
কখনও ঝাড়েন, ঝাড়ন হাতে, কখন লাগান ঠাঁই

মনটা থাকে উদাসপারা, দাদার স্কুলে যাবার পর,
চুপি চুপি শুধায় মাকে, "মা গো, কবে রবিবার ?"
একটী মিনিট নাইক ছুটী, এটা ওটার কাজে
থাকেন ব্যস্ত, যতক্ষণ না বেলা একটা বাজে।
অতঃপর, একটী কথা চুপি চুপি বলি,
মেনুমুখে মঞ্জুরাণী পড়েন ঘুমে ঢলি॥

ছুটীর একটা রাত

রংমশালের ভাই বোনেরা,

তোমাদের অনেকের অনেক রকম লেখা ও চিঠি পড়ি—আমার কিন্তু লিখবার ইচ্ছা যথেষ্ট থাকলেও লেখা আর হয়ে ওঠে না। তার প্রধান কারণ সম্পাদক মশাই আমায় স্থান দেবেন কি না জানি না।

যাই হোক, এবার পুজোর ছুটীতে একটা রাতে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তার ভাগ তোমাদের না দিয়ে পারলাম না। পরীক্ষা শেষ কোরে পর দিনই তল্পীতল্পা গুটীয়ে মাসখানেকের মত পড়ার ভাবনা ভুলে, বইগুলো 'ন্যাপথেলিন' দিয়ে বাক্স বন্দী কোরে সাত হাজার ফিট উঁচু দার্জ্জিলিং এর দিকে রওনা দিলাম। কোলকাতার দারুণ গরম থেকে এসে, পাহাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া প্রথম প্রথম বড়ই জ্বালাতন সুরু কোরল।

সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। অমন পরিষ্কার দিন দেখে ঠিক হোল "টাইগার হিল" এ সূর্য্যোদয় দেখতে যাওয়া হবে। দার্জ্জিলিং এ "টাইগার হিল্" থেকে সূর্য্যোদয়টা শুনেছিলাম সে নাকি এক আশ্চর্য্য দৃশ্য—দেখলে আর জীবনে ভোলা যায়না। বিশ্বাস তখন কোরিনি--ভাবলাম ওরা সব কবি মানুষ ওদের কথাই আলাদা। কিন্তু ভাই যদিও আমি কবিত্বের ধার ধারিনে, তবু সেদিন যে সূর্য্যকে উঠতে দেখেছিলাম, সেই সূর্য্যকে আর যে কোনদিন দেখতে পাব তেমন দুরাশা রাখিনা। কে বোলবে যে ঐ একই সূর্য্য, প্রতিদিন ভোরে আমাদের কোলকাতার বাড়ীর তেতলার রঙ-চটা ট্যাঙ্কএর ওপর আর ঐ পাশের গলির স্তূপীকৃত তরকারীর খোসার ওপর তার প্রথম আলোটুকু ফেলে।

তাড়াতাড়ি কোরে বিছানায় আশ্রয় নিলাম, কেননা মাঝরাত্রে উঠতে হবে, যতটা ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। গরম কাপড়ের স্তূপ মাথার কাছে রাখলাম। শুনেছিলাম সেখানে যত গরমই পরে যাও না কেন, শীতে নাকি জমে বরফ হতে হয়। আমার নাকি একটু ঠাণ্ডা লাগলেই অসুখ করে, মায়ের মতে অবশ্য।

অক্টোবর মাসের শেষ বেজায় শীত ও লেপ মুড়ি দিয়ে কি আরামেই ঘুমচ্ছিলাম—এমন সময় মায়ের ঘন ঘন ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম যাবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। মা বল্লেন—"ওঠ, ওঠ, দুটা বেজে গেছে। যাবি তো তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে।" আমার অত

উৎসাহ দপ কোমে নিভে গেল যেই মনে হোল এই মাঝ রাত্রে দারুণ শীতে চোখদুটো যখন ঘুমে জড়িয়ে আসছে, তখন এমন আরামের গরম বিছানা ফেলে, কোথায় কোন রাজ্যে সূর্য্যোদয় দেখতে যেতে হবে। বোল্লাম, "থাক গে যাব না"। ভাবলাম, "থাক আমার সূর্য্যোদয় দেখা, সকাল বিকাল ম্যাল্ বেড়ান আমার বেঁচে থাক্।"

মা দেখলাম বেশ খুসীই হোলেন। ক্রমশঃ ঘুমটা ভাল কোরে কেটে আসতে যাওয়াই ঠিক কোরলাম। কুঁড়েমিকে দাবিয়ে রেখে গরম কাপড় পরতে সুরু কোরলাম। বাবাঃ, মার একি কাণ্ড। এ যে শেষ আর হয় না। আমি করুণ ভাবে একবার কাপড়ের স্তূপের দিকে তাকাই, আর একটার পর একটা ঢোকাই। অথচ একটা যে কম পরব তারও উপায় নেই, তাহলেই যাওয়া বন্ধ। সব শেষ ওভার কোট পরতে গিয়ে দেখি, ও মা! ওভারকোট তো ঢোকে না। নিজের চেহারা দেখে নিজেই হেসে ফেল্লাম। মা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে বোল্লেন, "ওভার কোটটা জড়িয়ে নে গায়। "মরিয়া হয়ে বোল্লাম, "হাটব কি কোরে এই বোঝা-বয়ে?" মা গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "তাহলে আর কাজ নেই তোর গিয়ে।

যথা সময় দুট বাস বোঝাই কোরে আমাদের যাত্রা সুরু হোল। অত রাত্রের দার্জ্জিলিং এর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না আজ নিশুতি রাত্রে রাস্তা গুলোকে বড় মনে হোতে লাগল। কোথাও শব্দ নেই গভীর নিস্তব্ধতা, মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যু পুরীর মধ্য দিয়ে চলেছি। আকাশে সে রাত লক্ষ্মী-পুর্ণিমার চাঁদ। কাঞ্চন-জঙ্ঘার ওপর তারই আলো পড়ে রূপোর পাতের মত ঝলমল করছে। মনে হোল আমাদের সামনে পাষাণ পুরীর গুপ্ত অন্তঃপুরের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। এ পারে জীবনের চঞ্চল নৃত্য ওপারে চির-স্তব্ধতার চিরন্তন রাজ্য। আমরা কয়টী মুগ্ধ পথিক মোহের ঘোরে এগিয়ে চলেছি! পাহাড়ের বাঁক ঘুরে আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে।

'ঘুম্' পেরোতেই গাড়ী থামল, মনে হোল যেন একটা স্বপ্নের ঘোর কাট্‌ল। এইবার আমাদের পায়ে হেঁটে যাত্রা সুরু। পথে আলো নেই। দু'পাশে বেশ ঘন বন, মাঝে পায়-চলা সরু রাস্তা। চাঁদের আলোর কি মোহিনী শক্তি! মনের ভাবকে ভাষা দিতে অক্ষম, না হলে সে রাতের চাঁদের আলোর ওপর কম কোরেও পাঁচ পৃষ্ঠা রচনা নিশ্চয়ই লিখতাম।

টাইগার হিলএর তলা থেকে মাথা অবধি যে রাস্তাটা গেছে সেটা বেজায় খাড়া। কয়েকটী মেয়েকে টেনে তুলতে হোল দেখে দুঃখও হোল আবার হাসিও পেল। খানিক বাদে দেখি আমাদের দোতলার মাসীমা দুই ছেলের কাঁধে দিব্যি আরামে উঠ্‌ছেন। টাইগার হিল-এর ওপরে যে ঘরটা আছে তার ছাতে সব উঠলাম। ভোর হয়ে আসছিল। একটু পরেই বুঝলাম

শীত বলে কাকে। মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস মার উপদেশ মত কাজ করেছিলাম। দেখি একটী মেম ব্রীচেস পরে ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপছে আর মিহি গলায়—"So cold—So cold—" ডাক ছাড়ছে।

আমরা পৌঁছবার মিনিট দশেকের মধ্যেই পুর্ব্ব দিগন্তে একটী ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল। ক্রমশঃ রেখাটি বিস্তৃত হোল ও রঙ বদলাতে আরম্ভ কোরল। ফিকে গোলাপীর আভা ঘোর গোলাপীতে পরিণত হোল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে রঙ রক্তিম হয়ে উঠল। তারপর প্রত্যেক মিনিটে একের পর এক রঙ বদ্‌লাতে লাগল। সে কী রঙের খেলা—আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি এ কী অপরূপ রঙের মেলা। সমস্ত আকাশ বাতাস যেন রঙ্গীনের নেশায় ভোর। এ কি অনিন্দ্য সুন্দর রঙীনের রাজত্ব।

পশ্চিমে ঐ আলোর প্রতিচ্ছায়া। এভারেষ্ট এর তিনটে চূড়োর ওপর পড়ে চিক্ চিক্ কোরতে লাগল। মনে হোল, দিগন্ত ছোঁয়া, অসীমের পানে বিস্তৃত এক অলৌকিক তীরে এসে পৌঁছেছি।

ধীরে একটী কোন আগুনের শিখার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সূর্য্যদেব তাঁর নিদ্রা জড়িত অরক্তিম চক্ষু জগতের ওপর প্রসারিত কোরলেন। সমস্ত প্রকৃতি পূজার অর্ঘ্য উজাড় কোরে সূর্য্যদেব তাঁর অসংখ্য ভক্তের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হোলেন। মনে হোল এতো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব। দেবতাই বটে, ঐ গম্ভীর মহা-সৌন্দর্য্যের সামনে মাথা যে আপনি নত হয়ে আসে। বেশ বুঝলাম, কেন সুদূর অতীতে মুনি-ঋষিরা-সূর্য্য-দেবকে অর্ঘ্য দিয়ে জলগ্রহণ কোরতেন।

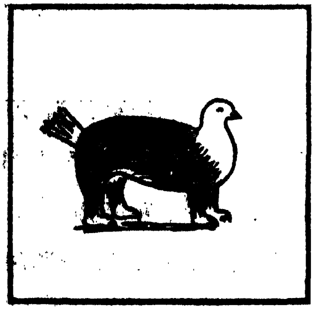
খানিক পরেই রঙের খেলা মিলিয়ে এল—সামনে চির পরিচিত আমাদের "সূর্য্যি মামা।" মনে হল এতক্ষণ যা দেখলাম সবই কি কল্পনা।

কিন্তু অদৃশ্য শিল্পীর শিল্প-প্রহেলিকার স্মৃতি মন থেকে মুছে যাবার নয়। তোমরা যদি কেউ দার্জ্জিলিং অথবা কাছাকাছি কোথাও যাও টাইগার হিলএর কথাটা কখনও যেন ভুলো না।

———

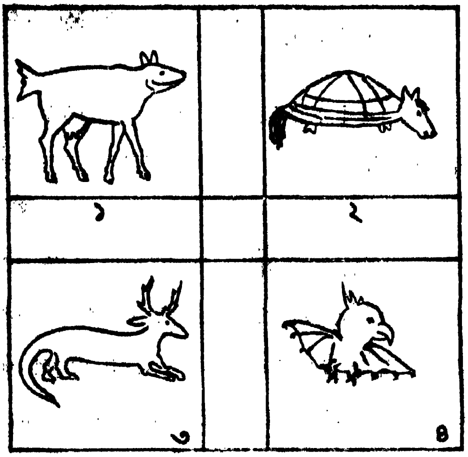
নূতন পুরস্কার প্রতিযোগিতা

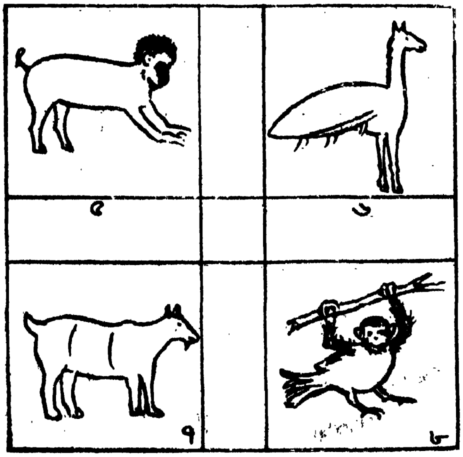
জোড়া জীব



এই যে ছবিটি দেখ্‌ছ, দুটি জন্তুর শরীরের অংশ মিলিয়ে এবং নাম মিলিয়ে এটি তৈয়ারী করা হয়েছে। দুটি নামের মধ্যে প্রথমটির শেষ অংশটুকু দ্বিতীয়টির প্রথমাংশ; যেমন "ভাল্লুকবুতর" (ভাল্লুক+ কবুতর)।

এই রকমের আরও কয়েকটি জোড়া জীবের ছবি দিলাম। এদের নাম বল্‌তে পার কি?





নূতন ধাঁধা

'কার' এই কথাটির আগে এবং পরে অন্য অক্ষর যোগ করে অনেক কথা বানান যায়—যেমন, "সাকার।" এই কথাটির মানে (বা ভাবার্থ) দিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে "আকার যুক্ত-কার" কি? উত্তর হবে "সাকার"। এই রকমের আরও কয়েকটি কথার মানে (বা ভাবার্থ) নীচে দেওয়া হয়েছে। সবগুলিরই প্রথমে বা শেষে "কার" আছে। বল্‌তে পার কি, কোন্‌টা কি কথা? (কোনও কোনটাতে যুক্তাক্ষর থাক্‌তে পারে—যেমন তিরস্কার)।

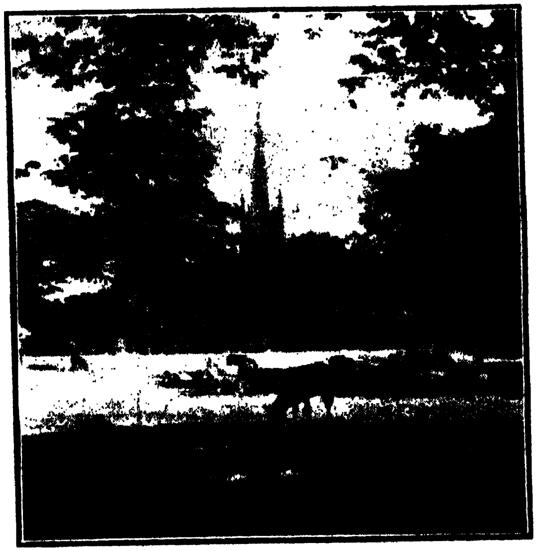
(১) খারাপ হওয়া—কার
(২) যা'র জন্য হয়—কার
(৩) আকৃতি—কার
(৪) করে যে—কার
(৫) মধুর শব্দ—কার
(৬) জিনিষ তৈয়ারীর—কার
(৭) ব্যবসা—কার
(৮) আটক রাখে—কার
(৯) শোভা বাড়ায়—কার
(১০) মেনে নেওয়া—কার
(১১) রকম—কার

কাৰ্ত্তিক মাসের আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল আমরা পুনবিচার করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম

১ম পুরস্কার—শ্রীতরুণ কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা, (গ্রাঃ নং ৮৩৭)—ডায়মণ্ড হারবার, গঙ্গা।

২য় পুরস্কার—শ্রীনরেন্দ্র সিংহ নাহার, কলিকাতা, (গ্রাঃ নং ৮৩১)—ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ।

৩য় পুরস্কার—কুমারী ইরা রায়, কলিকাতা, (গ্রাঃ নং ৫৫৩)—গির্জ্জার সামনে।



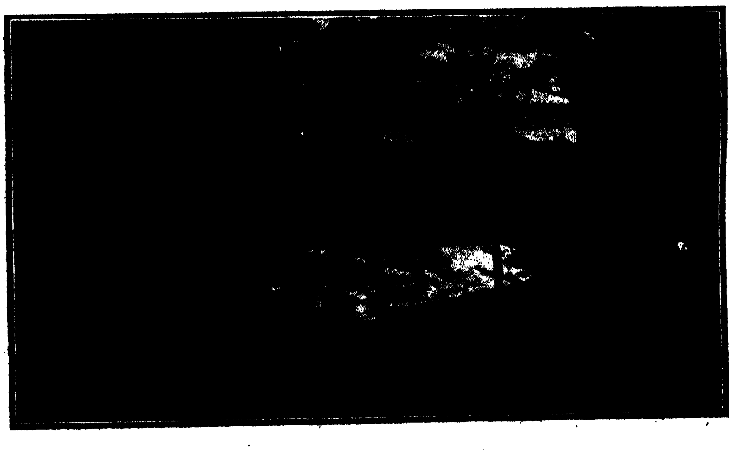
গির্জ্জার সামনে (তৃতীয় পুরস্কার)

কুমারী ইরা রায়—গ্রাঃ নং ৫৫৩



ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ (দ্বিতীয় পুরস্কার)

শ্রীনরেন্দ্র সিংহ নাহার—গ্রাঃ নং ৮৩১



গাছের ফাঁকে—(উচ্চ-প্রশংসিত)

শ্রীঅভয় সিংহ নাহার

গত মাসের

ধাঁধার উত্তর

১। ৪৮। রকমে লেখা যেতে পারে।

২। ৭৩টী ঘোড়া দৌড়োচ্ছিল।

৩। অথবা, এই ভাবে আরও কয়েক প্রকারে সাজাইতে পারা যায়।

৬	১	৮
৭	৫	৩
২	৯	৪

৪। মন্থর— { বাবার বয়স ৫৪
মায়ের বয়স ৪৫

উত্তরদাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম—

পরেশ চন্দ্র মাইতি, (ভবানীপুর); অরুণ কুমার বসু ও শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, (পাটনা); উৎপল গুপ্ত, (বালীগঞ্জ); উমা, বেলা ও রবি, (কলিকাতা); অশোক মুখোপাধ্যায়; (কলিকাতা); নৃপেন সেন, (বহুবাজার); জগদিন্দ্র নাথ রায়, (ভবানীপুর); প্রফুল্ল কুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর)।

যাদের একটি মাত্র ভুল হইয়াছে—

অমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর); সিরাজুল ঝর্ণা, খোকন, অমলা, হামেদা ও নুরুল, (ধান াদ); বুল সেন, (ভবানীপুর); কনকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, (পাটনা); জীমূত বাহন রায় ও কল্যাণী দেবী, (কলিকাতা); মনুজেন্দ্র রায়, (রংপু); কল্পনা বসু, (ঝরিয়া); শিবানী সরকার, (কলিকাতা); সুরমা ও সমরেশ বসু, (কলিকাতা); বিনয় ভূষণ চন্দ্র, (কটক)। যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভবানীপুর); রাম প্রসাদ সিং, (বেহালা); রবীন্দ্র নাথ রায়, নিশীথ কুমার রায়, (এলাহাবাদ); লতিকা সেন, (কালিঘাট)।

যাদের দুটী ভুল হইয়াছে—

পাঁচু গোপাল দাস, (কলিকাতা); অচিন্ত্য কুমার ও শ্যামলী রক্ষিত, (কলিকাতা); সুশীল দাস, (ভবানীপুর); প্রতিভা রেণু ও নীলা, (জামসেদপুর); রবি, ভোলা, সরলা, বড়খুকি, ছোটখুকি, গণেশ ও মূষিক, (অমৃতসর); ভাদুড়ী ভ্রাতৃবৃন্দ, (হাওড়া); সুনন্দা দে, (কলিকাতা); রমেশ রায়, (বনাইগড়) পবিত্র ও প্রসূন গুপ্ত, (পাটনা); সুশান্ত, গৌর, নিতাই অমূল্য ও সুরেশ (খিদিরপুর); শ্যামল, অমল, শচীন, চুনী ও ফটিক, (কুড়িগ্রাম); ক্ষিতীন্দ্র নাথ রায়, (কুড়িগ্রাম); ষষ্ঠীধন সেন গুপ্ত, (হাওড়া); গীতশ্রী, জ্যোতির্ময়, সুধা, উষা ও কমলা, (বাঁকিপুর)।



স্বপ্নের দেশে

রঙ্গশালা

দ্বিতীয় বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র
১৩৪৪

বাসন্তিকা

শ্রীঅখিল নিয়োগী

একাঙ্ক শিশু-নাটিকা

[রাণী জয়ন্তীর বাগান। ফুলের গাছ শীতের-কুয়াসায় মরে গেছে। তাই আজ হ'বে বসন্তরাণী বাসন্তিকার আবাহন। উদ্যানে তারি শুভ পদার্পণ হ'লে—পাখী গাইবে, ফুল ফুটবে—ধরার বুকে আবার বসন্ত ফিরে আসবে। সকাল বেলা থেকেই উৎসবের আয়োজন চলছে]

জয়ন্তী — [সহচরীকে উদ্দেশ্য করিয়া] সখি, তুমি উদ্যান-পালিকাকে ডেকে বলে দাও...আজ যেন এখানে কোনো চপলতা প্রকাশ না পায়। এক বছর বাদে বসন্তরাণী বাসন্তিকা এখানে ফিরে আসবেন—। তিনি আসবেন তবে এ মরা বাগানে ফুল ফুটবে। সেই উৎসবের আয়োজন কর—

[প্রস্থান]

সহচরী — ওলো খর্ব্বনাশা, এদিকে এসে শুনে যা—

[খর্ব্বনাশা সত্যিই থ্যাদা নাকী। সহচরীর ডাক শুনে হেল্‌তে দুল্‌তে তার কালো মোটা দেহ দুলিয়ে এসে উপস্থিত হল]

খর্ব্বনাশা — কে ডাকছ আমায় ? [সহচরীকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া] ও! আমাদের রাণীর সখি তুমি! তা তুমি আমায় কেন ডাক্‌ছ গা ?

সহচরী — ডাক্‌ছি কথা আছে। কথা নয়—আছে তোমাদের রাণীর আদেশ।

খর্ব্বনাশা — [ভয় পাইয়া] রাণীর আদেশ ? আমার গর্দ্দানা যাবে নাকি গো ? ওগো সত্যি করে বল নাগো...

সহচরী — ঠিক গর্দ্দানা এখনও যাবেনা...তবে তোমাকে একটি কাজের ভার দেয়া হবে... সে কাজটি ঠিক মত করতে না পারলেই—

খর্ব্বনাশা — গর্দ্দানা যাবে! ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি...আমার গর্দ্দানা নিও না—

সহচরী — [হাসিয়া] আমি গর্দ্দানা নেবার কে! কিন্তু রাণীর আদেশ কি তা'তো জিজ্ঞেস্ কচ্ছ না!

খর্ব্বনাশা — কচ্ছি...কচ্ছি...আগে আমায় একটু হাঁফ্ ছাড়তে দাও...

সহচরী — হ্যাঁ জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ো, তারপর আরো জোরে একটা নিঃশ্বাস নাও। এইবার মন দিয়ে শোনো—

খর্ব্বনাশা — বল গো বাছা, বল—; কিন্তু শোন্‌বার আগেই যে আমি হাঁপিয়ে উঠছি—

সহচরী — শুন্‌লে আরো হাঁপাবে। শোনো—! আজ এক বছর পর এখানে বসন্ত-রাণী বাসন্তিকা আস্‌ছেন। তিনি এলে এই মরা বাগানে ফুল ফুটবে!

খর্ব্বনাশা — কি সর্ব্বনাশ ফুল ফুটবে! এই কটা মাস বেশ ছিলুম—শীতে কাঁথা গায়ে দিয়ে! ফুল ফুটলে আবার আমার খাট্‌নি বাড়বে! ফুল তোলো, মালা গাঁথো...গাছে জল দাও,...বাগান পরিস্কার রাখো...আরো কত কি! না বাপু, বসন্তরাণীর এসে কাজ নেই!

সহচরী — রাণীর আদেশ না মান্‌লে কি হ'বে মনে আছে ?

খর্ব্বনাশা — হ্যাঁ, হ্যাঁ, গর্দ্দানা যাবে! না, না, তুমি বলো, কি আদেশ—

সহচরী — রাণী জয়ন্তী আদেশ দিয়েছেন, আজ যেন এখানে কোন চপলতা প্রকাশ না পায় —আর তিনি উৎসবের আয়োজন করতে বলেছেন।

খর্ব্বনাশা — সে না হয় করলুম, কিন্তু 'চপলতা' মানে কি ?

সহচরী — চপলতা মানে চঞ্চলতা...মানে ছেলেমানুষী!

খর্ব্বনাশা — ও ! বুঝ্‌তে পেরেছি...বুঝ্‌তে পেরেছি। আচ্ছা তুমি যাও...আমি সব ব্যবস্থা করে রাখ্‌বো'খন।

[সহচরীর প্রস্থান]

সহচরী — [দূর থেকে] মনে থাকে যেন—আদেশ পালন না করলে—

খর্ব্বনাশা — মনে পড়েছে! গর্দ্দানা! ওরে বাবারে! আর ভুলি! [আপন মনে] আচ্ছা খানিকটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলে কেমন হয়? এরপর ফুল ফুটলে ত' সে উপায় থাকবে না।

[কাঁথা আনিয়া মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। খানিক বাদে তাহার নাকের ডাক শোনা যাইতে লাগিল। ইতি মধ্যে একদল ফুট্‌ফুটে মেয়ে তাদের কোঁকড়া চুল দুলিয়ে সেই বাগানে এসে হুটোপাটি সুরু করে দিল]

কণিকা — ওরে শুনেছিস ভাই?

ক্ষণিকা — কি রে কি?

কণিকা — আজ নাকি বসন্তরাণী এই বাগানে আসবে?

দীপিকা — শুধু আসবে নয়, এসে এই বাগানে ফুল ফোটাবে!

কণিকা — কেন, বসন্তরাণী না এলে কি বাগানে ফুল ফোটে না?

দীপিকা — কি বোকা মেয়ে তুই!

কণিকা — কেন বল দেখি?

দীপিকা — কে না জানে—শীতের কুয়াসা দূর করে দিয়ে আসে বসন্ত; আর সেই সঙ্গে আসেন বসন্তরাণী—

ক্ষণিকা — বসন্তরাণী এলেই বুঝি ফুল ফোটে?

দীপিকা — শুধু ফুল ফোটে? মলয় হাওয়া আকুল হয়ে ছুটে আসে না? বসন্তের কোকিল তার মিষ্টি গানে চারদিক আকুল করে তোলে না?

কণিকা — তবে আয় ভাই, আমরাও আজ গানে-গানে চারদিকে আনন্দের জোয়ার ডাকি—নেচে গেয়ে বসন্তরাণীকে আহ্বান করি। তিনি এসে আমাদের দেখে খুসী হবেন।

দীপিকা — সেই জন্যেই ত' তোদের আজ এখানে ডেকে এনেছি—আয় আমার সঙ্গে সবাই যোগ দে—

[সকলের নৃত্য-গীত]

আসবে মোদের বাসন্তিকা ফুল ফোটানর তানে···
তাইত পরাণ জানায় নাতি ঘুম ভাঙানোর গানে!
মলয় পবন দোল দিয়ে যায়
বনের বিহগ সুর সাধে তায়—
কোথায় এত পুলক ছিল কেউ নাহি তা জানে!
ঘুম কাতুরের ঘুম টুটেছে আজ্‌কে জাগার পালা
অরুণ কিরণ হিরণ-বরণ হাজার মাণিক জ্বালা!
কে ঘুমিয়ে রয় প্রভাতে
ডাক দেবো তায় সবার সাথে—
দ্বার খুলে দেখ কে এসেছে সকল প্রাণে প্রাণে!

[হঠাৎ গানের মাঝখানে খর্ব্বনাশার ঘুম ভেঙে গেল; সে চোখ কচ্‌লে উঠে বস্‌ল তারপর হুঙ্কার দিয়ে ছুটে এলো সেই মেয়েদের মাঝখানে]

খর্ব্বনাশা — বটে! দ্বার খুলে দেখ্‌বো! দরজা খুলে রেখেছি বলেই না তোরা আমার এমন কাঁচা ঘুমটা নষ্ট করে দিলি! আবার বলা হচ্ছে কি না 'কে ঘুমিয়ে রয় প্রভাতে!' কেন, সকালে একটু কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছি—তাতে তোদের কি রে?

কণিকা — ওরে বাবা—এ আবার কে!

দীপিকা — ওরে চিনেছি রে চিনেছি—ওর নাম খর্ব্বনাশা।

ক্ষণিকা — ওর খর্ব্বনাশা নাম কেন হ'ল বল দেখি?

দীপিকা — তা জানিস্‌ নে বুঝি? নাক খ্যাঁদা কি না—তাই রাণী জয়ন্তী ওর নাম রেখেছে খর্ব্বনাশা—

খর্ব্বনাশা — বটে! আমার নাক খ্যাঁদা, আর তোদের নাক বড় টিকলো, কেমন? দাঁড়া নাক কেটে সবাইকে আজ আমি খর্ব্বনাশা করে ছাড়বো—! কৈ—আমার দা খানা কোথায় গেল—

কণিকা — ওরে পালা রে পালা, খর্ব্বনাশা আজ বিষম চটেছে—

[সকলের কোলাহল করে প্রস্থান]

বাসন্তিকা
শ্রীঅখিল নিয়োগী

[রাণী জয়ন্তী আর সহচরীর প্রবেশ]

জয়ন্তী — এত গোলমাল কিসের ?

খর্ব্বনাশা — [নমস্কার করে] আজ্ঞে—এই আমি—

জয়ন্তী — হ্যাঁ তুমি যে খর্ব্বনাশা—তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেস্ কচ্ছি এত গোলমাল হচ্ছিল কিসের ?

খর্ব্বনাশা — আজ্ঞে রাণীমা, বাগানের দরজা খোলা পেয়ে ছোট ছোট মেয়ের দল এসে গোলমাল আর হুটোপুটি সুরু করেছিল।

জয়ন্তী — বাগানের দরজা খোলা কেন ? সখি, তুমি ওকে আমার আদেশ জানিয়ে দাওনি—?

সহচরী — দিয়েছি বই কি সখি ! আমি আড়াল থেকে দেখেছি.. তোমার আদেশের কথা শুনে ও দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগ্‌ল—আর সেই সুযোগে মেয়েরা—

জয়ন্তী — খর্ব্বনাশা—

খর্ব্বনাশা — দোহাই রাণীমা, গর্দ্দানা নেবেন না। আমি এখন থেকে ঠায় বসে থাক্‌বো—

জয়ন্তী — শুধু বসে থাকলে চলবে না। আজকে শেষ রাত্তিরের মধ্যে কেউ যেন না এই বাগানে ঢোকে ! বসন্তরাণী কখন এসে বিরক্ত হয়ে চলে যাবেন !

খর্ব্বনাশা — কাউকে ঢুকতে দেবোনা ?

জয়ন্তী — না—না, কাউকে নয়, আমি যদি আসতে চাই আমিও আসবো শেষ রাত্তিরের পরে...ফুল ফুটে গেলে তারপর। বুঝলে ?

খর্ব্বনাশা — আজ্ঞে বুঝেছি রাণীমা ! আমায় এবারকার মতো ক্ষমা কর তুমি—। এখন থেকে মশা-মাছিটিকে আর এ বাগানে ঢুকতে দিচ্ছিনে ! আগে ভালো করে বাগানের ফটকটা বন্ধ করে দিয়েনি। [তথাকরণ]

[রাণী ও সহচরীর প্রস্থান]

[গান গাইতে গাইতে ফটকের সামনে একটি কালো মেয়ে এসে দাঁড়াল]

—গান—

কুহু—কুহু—কুহু—
আনন্দের ঝর্ণা সম ডাকছি মুহুর্মূহু
ডাকছি আমি বিনা কাজেই
ডাকছি নীরব পথের মাঝেই—
ডাকছি আমি সকাল সাঁঝেই
কুহু—কুহু—কুহু—
ডাকছি মুহুর্মূহু !



খর্ব্বনাশা ও কোকিল

রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশী শুনে আমার ডাক—
আমার আগমনের সাথে বধূ বাজায় শাঁখ!
নীরব দুপুর অশথ্‌ তলায়—
কি সুর ঝরে আমার গলায়—
আধেক গানে আধেক বলায়
কুহু—কুহু—কুহু
ডাক্‌ছি মুহুর্মুহু!

খর্ব্বনাশা — কে রে কালো মেয়েটা এখানে এসে গান জুড়ে দিয়েছিস?

কোকিল — আমায় চেনোনা মাসী? আমি বসন্তরাণীর অগ্রদূত। আজ বাসন্তিকার এখানে এসে ফুল ফোটাবার কথা কিনা—তাই আগে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে—তুমি দ্বার খোলো—

খর্ব্বনাশা — [হাসিয়া] ও সব ছেঁদো কথায় আর আমি ভুলছিনে ভাল মানুষের মেয়ে—! যেখান থেকে এসেছ সেইখানে সরে পড়। নইলে আজ আমার হাতে তোমার অনেক দুর্গতি লেখা আছে!

কোকিল — সে কি কথা মাসি?

খর্ব্বনাশা — ও মাসীই ডাকো, আর পিসিই ডাকো—আর ভবি ভুলছে না—

কোকিল — তবে কি আমি ফিরে যাবো? বাসন্তিকার ফুল ফোটানো কি তবে হ'বে না?

খর্ব্বনাশা — ফুল তার নিজের গরজেই ফুট্‌বে—কিন্তু তুমি বাছা সরে পড়—হ্যাঁ! নইলে দেখেছ ত' আমার শতমুখী...

কোকিল — আচ্ছা, তবে আমি চল্লুম—

[কুহু কুহু ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান]

খর্ব্বনাশা — ফুল না ফুট্‌তেই এই...ফুল ফুট্‌লে যে আমার কি দুর্গতি হবে—সেই কথাই আজ শুধু ভাব্‌ছি!

[একটি ফুট্‌ফুটে ফর্সা মেয়ে এসে ফটকের সামনে দাঁড়াল। তার নীল উত্তরীয় ফুর ফুর করে উড়ছে]

খর্ব্বনাশা — তুমি আবার কেগো? সেজেছ মন্দ নয়, কিন্তু মতলব শুনি?

[ফুট্‌ফুটে ফর্সা মেয়ের গান]

গান

মলয় অনিল আমি ফুর্ ফুর ফুর
শীতের কুয়াশা সব করে দেবো দূর
হাল্কা মেঘের মতো মেলিয়া পাখা—
নীল আকাশের গায় চলি বলাকা...
ঘুম কাতুরের চোখে আমি সুড় সুড়।

খর্ব্বনাশা — ও সুড়সুড়ই দাও আর ফুরফুরই কর—আমি বাছা দরজা খুল্‌ছিনে—

মলয়ানিল— সে কি কথা মালঞ্চ-মালিনী! আমি যদি না ঢুক্‌তে পাই তবে বসন্তরাণী এখানে আসবেন কি করে?

খর্ব্বনাশা — খুব শক্ত শক্ত কথা বলে আমাকে ভয় দেখাচ্ছ বুঝি? 'মালঞ্চ মালিনী'! পালাও বল্‌ছি...নইলে—[তাড়া করে এলো]

মলয়ানীল— তাড়িয়ে দিচ্ছ? তা হ'লে চলি—

[গান গাইতে গাইতে প্রস্থান]

খর্ব্বনাশা — না, এদের জ্বালায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ল। চোখের পাতাও ঘুমে ঢুলে আসছে। এখন ত' সবে সন্ধ্যে। রাণী জয়ন্তী আসবে সেই কাল ভোর বেলায়। এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক্...

[খর্ব্বনাশা ঘুমিয়ে পড়ল...ধীরে ধীরে সমস্ত মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর আবার ভোরের আলোতে সমস্ত পরিস্কার হয়ে উঠ্‌লে দেখা গেল খর্ব্বনাশা তেমনি সেখানে ঘুমুচ্ছে। তার নাকের ডাকটা আরো বেড়েছে। *ঠিক সেই সময় সহচরীকে নিয়ে রাণী জয়ন্তীর প্রবেশ*]



বাসন্তিকা

জয়ন্তী — এ কি সখি! উৎসবের কোন আয়োজনই নেই! সূর্য্যোদয় হয়ে গেছে...তবু খর্ব্বনাশা ঘুমুচ্ছে! তাই বুঝি আমার বাগানে কোনো ফুল ফোটেনি!

সখি — নিশ্চয় বাসন্তিকা এসে ফিরে গেছেন!

সহচরী — ওলো খর্ব্বনাশা—শিগ্‌গীর ওঠ—

[খর্ব্বনাশার নাকের ডাক আরো বেড়ে গেল]

জয়ন্তী — খর্ব্বনাশা!

[লাফিয়ে উঠে বসল]

খর্ব্বনাশা— সর্ব্বনাশ!

জয়ন্তী — হ্যাঁ সর্ব্বনাশ! কোথায় উৎসব! কোথায় আমার বসন্তের ফুল? [খর্ব্বনাশা কি বল্‌তে চাইল] কোনো কথা শুন্‌তে চাইনে। ফুল যখন ফুটল না...তোমার রক্তে আজ আমি ফুল ফোটাবো।

[সহসা বসন্তরাণী বাসন্তিকার প্রবেশ]

বাসন্তিকা— আরো কি রক্তপাতের প্রয়োজন আছে?

[সকলে অবাক হয়ে দেখলে বাসন্তিকার কপালে রক্তের দাগ]

জয়ন্তী — দেবী! আপনার এ অবস্থার জন্যে দায়ী কে? নিশ্চয়ই এই খর্ব্বনাশা!

বাসন্তিকা— না দায়ী তুমি!

জয়ন্তী — দায়ী আমি?

বাসন্তিকা— হ্যাঁ, দায়ী তুমি! তোমার আদেশে তোমার পরিচারিকা উদ্যানের পথ বন্ধ করে রেখেছিল। আর তারই ফলে‥‥ 'বসন্তের কোকিল এসে এখানে গান গাইতে পারেনি, মলয় অনিল এসে স্নিগ্ধ কর স্পর্শে ফুলদের জাগাতে পারেনি, তার ওপর—

জয়ন্তী — তার ওপর?

বাসন্তিকা— তার ওপর শিশুদের তোমরা দূর করে দিয়েছ এই উদ্যানের বাইরে। কি করে ফুল ফুটবে! যত আঘাত তুমি করেছ—ওদের—সব এসে যে আমারই গায়ে লেগেছে!

জয়ন্তী — দেবী! আমি বুঝতে পারি নি। তাই ওদের দূর করতে আদেশ দিয়ে— আপনাকেই দূরে ঠেলে দিয়েছি—আমায় শাস্তি দিন—

বাসন্তিকা— ওদের সবাইকে ডাকো, বাগানের পথ খুলে দাও তবেই আমার ক্ষত শুকুবে— তোমার বাগানে ফুল ফুটবে।

[দ্বার খুলিতে কোকিল, মলয় আর বালিকার দল গাইতে গাইতে এসে ঢুকল]

সকলের গান

এলো এলো ঐ এলো রে বাসন্তিকা!
মন কাননে ফুটল কুসুম অগ্নি শিখা!
জুঁই বেল সব দলে দলে···
ঘোমটা খোলে কৌতূহলে
গহন বনে কে পাঠাল রঙের লিখা!
ফুলের সাথে কোকিল কি গো শোনায় গীতি!
[কোকিল — তোমরা জান বসন্তেরি এই ত রীতি]
মলয় অনিল ফুর ফরে বায়
[মলয় — কোন কথা আর কইব সবায়]
ডাকব ফুলে‥‥‥লাল কালো নীল সবুজ ফিকা!
বাসন্তিকা।

[গানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাগান ফুলে ফুলে ভরে গেল]

=ধীরে যবনিকা=





একটা চলে যাওয়া দিনের গুরুতর কাহিনী

সুকুমার দে সরকার

নিজের নাম নিয়ে শেষে এমন মুস্কিলে পড়ব কে জানত? শেক্সপিয়র বলে গেছেন নামেতে কি আসে যায়? আমার মামা আমার বেলায় মহাপুরুষের সেই মহাবাক্য প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ যে কোন বিশেষ্য বা বিশেষণ যা তাঁর বেশ লাগ সই মনে হয় তা তিনি আমার ওপর লাগিয়ে বসেন। তাই তাঁর কাছে কখন আমি পেঁচা কখন গরু কখন ভাল্লুক আবার কখন দোল-গোবিন্দ বলেও আখ্যাত হই। আমার মেশোমশায়ের কিন্তু অন্য মত—তিনি আমার মস্ত মনস্তত্ত্ববিদ! তিনি বলেন নামের ওপরেই এক এক জনের মনস্তত্ত্ব ফুটে ওঠে—নামই সব। বাপ মা যা নাম দেয় সে সব ভুল, তার ভেতর থেকে চরিত্রের কোন আভাস পাওয়া যায়না, তাই যে সব লোকের সংস্পর্শে তিনি আসেন, তাদের সকলকে তিনি নিজে এক একটা নাম দেন। আমার কপালে জুটেছিল—হরির লুঠ!

তারপরে আমার পিসেমশাই। তিনি অত যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না। তাঁর পরিচয় তোমরা শিগ্‌গিরই পাবে তবু আগে থাকতে এটুকু জেনে রাখ যে তিনি রসোগোল্লা খেতে অত্যন্ত ভালবাসেন আর রসোগোল্লা কথাটা সব সময়ে তাঁর মুখে লেগে আছে। আমার পিসেমশাই পয়সাওয়ালা লোক, কিন্তু তেজারতী ব্যবসা করে তাঁর প্রকৃতিটা বেশ কৃপণ হয়ে উঠেছিল। সদানন্দ রোডে প্রকাণ্ড এক পাঁচতলা বাড়ীর দোতলার ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন। মোটের ওপর সবই চলছিল ভাল কিন্তু গোলমাল বাধালে একছড়া প্রকাণ্ড মোটা সেকেলে সোনার বিছে হার।

সেদিন সকালে তখন সবে বিছানায় উঠে বসেছি হঠাৎ মামা হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই বললে,—এই দেখ ঠিক যা ভেবেছি পেঁচাটা ঘুমোচ্ছে

—কৈ মামা ঘুমোচ্ছি কোথায় এই ত উঠে বসে আছি

—তবে ত খুব কাজ করছ! নে নে চল

—কোথায় ?

—শুনিসনি তোর পিসেমশায়ের বাড়ী যে ভীষণ চুরী হয়ে গেছে

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ রে ভাল্লুক চল শিগ্‌গির চল।

একবার মামার দোকানের একটা মুক্তোর মালা চুরীর চোর ধরার সাহায্য করেছিলাম বলে মামার কাছে আজও আমার খুব খাতির। আমার মামা জুয়েলার আর পিসেমশাই তেজারতী করেন তাই ওঁদের দুজনের মধ্যেও খুব খাতির।

মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম—পথে যেতে যেতে মামা আমাকে চুরীর সমস্ত ব্যাপার খুলে বলল।



বাবুজী আমি নূতন কলকাতায় এসে—

পিসেমশায়ের বাড়ীর ওপরের ফ্ল্যাটে তেতলায় সম্প্রতি এক বেহারী ভদ্রলোক ভাড়াটে এসেছেন। কালরাত্রে সেই ভদ্রলোক পিসেমশায়ের কাছে এসে বলে—বাবুজী আমি নূতন কলকাতায় এসে টাকার অভাবে বড় বিপদে পড়ে গেছি, শুনলাম আপনি টাকা ধার দেন তা আমার এই হারটা বাঁধা রেখে যদি আপনি পাঁচশো টাকা ধার দেন ত বড় উপকার হয়।

অবশ্য কথাগুলো সব হিন্দীতেই হয়েছিল।

পিসেমশাই হারটা পরীক্ষা করে দেখলেন একেবারে পাকা সোনার দামী হার তবু বললেন—আপনি কাল আমার দোকানে আসবেন দিয়ে দেব।

তখন সে ভদ্রলোক বলেন—বাবুজী আমার হাতে একটাও পয়সা নেই আজই যদি আপনি দেন ত বিশেষ উপকার হয়। এখন, সেদিন কি কারণে পিসেমশায়ের হাতে টাকা ছিল, তিনি হারটা নিয়ে টাকাটা দিয়ে দেন তারপরে হারটা তাঁর সেকেলে লোহার সিন্ধুকে তুলে রেখে যথারীতি কাজটাজ সেরে তিনি শুয়ে পড়েন। লোহার সিন্ধুকটা থাকত পিসীমার ঘরে, পিসীমা কিছুদিন আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। পিসেমশায়ের শোবার ঘর তার পাশে। সকাল বেলা তিনি উঠে দেখেন পিসীমার ঘরের বারান্দার দিকের দরজা খোলা। তাঁর কি রকম সন্দেহ হয়। উঠে এসে দেখেন সেকেলে লোহার সিন্ধুকের ডালা ভাঙ্গা পড়ে আছে ভেতরে কিছু নেই। আর বারান্দা থেকে বাঁধা একটা লম্বা দড়ী নীচে মাটিতে ঝুলছে। সিন্ধুকে আর কিছু বিশেষ ছিল না, কিছু টাকা আর সেই হারটা। সব উধাও। পিসেমশাই

প্রথমে টেলিফোন করে মামাকে আনান তারপরে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে সব লিখে টিখে নিয়ে বলে যে এই রকম সিন্ধুক ভাঙ্গা চুরী কয়েকদিন ধরে অনেকগুলো হয়েছে কিন্তু চোরকে তারা কিছুতেই ধরতে পারছে না।

এই ত গেল সংক্ষেপে ব্যাপার, তারপরে মামা আমার কাছে আসে। পিসেমশায়ের ওখানে যখন পৌছলাম তখন বেলা প্রায় ন'টা হবে বাড়ীতে ঢোকবার প্যাসেজের সামনেই রামসিং দরোয়ানের ঘর। ফ্ল্যাট হিসেবে ভাড়া দেওয়া কিনা তাই রামসিং বাড়ীর তাঁবেদারী করে, আমাদের দেখে রামসিং বেরিয়ে এল। ইয়া তাড়া লম্বা চেহারা বুক পেট সব সমান গোল আর মুখে বিশাল এক ঝাড়ুদারি গোঁফ। মামাকে দেখে রামসিং বলল—কি বাবুজী ডাকু পাকড়াবার জন্যে কি এই খোঁখাবাবুকে নিয়ে এলেন নাকি?

মামা বলল—হ্যাঁ।


রামসিং বেরিয়ে এল

রামসিং হো হো করে হেসে উঠল। তারপরে আমার কাঁধের ওপর তার বিশাল হাতটা রেখে বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে ঝাঁকুনি দেয় তেমনি একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—খোঁখা বাবু পালোয়ান, ডাকু পাকড়কে লিয়ে আসবে।

রামসিং আবার হো হো করে হেসে উঠল। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল তবু রামসিংএর চোখে একটা অদ্ভুত লোভী আলো দেখে চুপ করে গেলাম। এরকম ব্যাপারে যত চুপ করে দেখা যায় ততই ভাল।

ওপরে গিয়ে দেখি পিসেমশাই একটা ইজি চেয়ারে উদাস হয়ে পড়ে আছেন আমাকে দেখেই হাঁউমাউ করে উঠলেন—এই দেখ রসোগোল্লাটা এই সময় জ্বালাতে এসেছে, আমি মরছি আর এখন হোল ওর মজা দেখবার সময়! ওরে উঃ আমার বুক কেমন করছে!

মামা বলল—ওরকম করছ কেন? চুপ কর

—চুপ করব? আমার মান সম্মান সব গেল দেওনারায়ণের কাছে মুখ দেখাব কি করে?

দেওনারায়ণ সেই বেহারী ভদ্রলোকের নাম।

মামা বলল—কি আর হয়েছে না হয় টাকাটা তুমি দিয়ে দেবে—"অ্যাঁ! ওরে বাবা হা—জা—র টাকা!" পিসেমশাই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন ওরে আমার বুক কেমন করছে, বুকের ব্যাথাটা আবার ধেড়ে উঠেছে। ওরে রসোগোল্লা ডাক্তার ডাক।

একটা চলে যাওয়া দিনের গুরুতর কাহিনী
সুকুমার দে সরকার

আমি মামার মুখের দিকে তাকালাম। মামা বললেন—যারে শুকৃটি মাছ তোর মেশোমশাইকে একবার খবর দে।

মেশোমশাই আত্মীয়দের সকলেরই ফ্যামিলি ফিজিশিয়ন—ভিজিটটা বেঁচে যায় কি না!

একটু পরে দুম দাম করে এসে মেশোমশাই ঘরে ঢুকলেন কাঁধে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ী। আমরাত অবাক! জিগেস করলাম

—ওতে কি মেশোমশাই

—কমলা লেবু

—কমলা লেবু কি হবে?

—উঃ উঃ কি বোকা রে! কমলা লেবু কি হয়? নে নে একটা খেয়ে দেখ কি হয়।

—তা ত জানি কিন্তু নিজে কাঁধে করে নিয়ে এলেন এর মানে কি

—ওগুলো পিসেমশায়ের জন্য বুঝি?

—অ্যাঁ? না, না, বুকের ব্যামো ও লেবু খাবে কি? আর নীচে গাড়ীতে রেখে আসারকি জো আছে? ড্রাইভারটা যদি খেয়ে নেয়?

ভেবে দেখ তোমরা প্রকাণ্ড মাষ্টার বুইকে যিনি ঘুরে বেড়ান তাঁর ভয় একটা লেবু যদি ড্রাইভার খেয়ে নেয়। আবার জিগেস করলাম—তা লেবু খেলেত শুনেছি হার্ট শক্ত হয়, পিসেমশায়ের বেলা কি সে নিয়ম খাটে না?

—অ্যাঁ? আচ্ছা দে আধখানা

তারপরে পিসেমশায়ের দিকে ফিরে বললেন—এইবার বলত টেঁশুরাম কেমন আছ?

পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন—টেঁশুরাম কাকে বলছ?

—কেন তোমাকে! আমি ভেবে দেখলাম ওই নামটাই তোমার মনস্তত্বের সঙ্গে চমৎকার মানায়। একেবারে যেন খাপে খাপে বসে যায়, কি বলিস রে হরির লুঠ"? আমার দিকে ফিরে মেশোমশাই বললেন।

আমাকে আর উত্তর দিতে হোল না। পিসেমশাই তখন উঠে বসেছেন, তাঁর বুকের ব্যথা কখন ভাল হয়ে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন—আমি টেঁশুরাম? তা হলে তুমি—তুমি একটা (পিসেমশাই কথা খুঁজতে লাগলেন)......তুমি একটা রসোগোল্লা!

—খামোখা কেন রাগ করছ? মেশোমশাই বললেন। তারপরে মামার দিকে ফিরে জিগেস করলেন—আচ্ছা তুমিই বল গদাধর?

—গদাধর কাকে বলছ? বাজখাঁই গলায় উত্তর এল

—কেন তোমাকে। ওটা তোমার নাদা পেটের সঙ্গে যা মানায় চমৎকার!

—কি? কি বললে আমার নাদা পেট?

তারপরে যা কাণ্ড সুরু হোল ঘরের ভেতর সে আর বলবার নয়। কাকে রেখে কাকে সামলাই? ঘরের ভেতর বেশ কথার কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। আমি শেষে চটে মটে বললাম—তোমরা তা হলে এই করতে থাক আমি চললাম।

রাগ করে পথে নেমে এলাম। তিনজন বয়স্ক লোক তাদের একি কাণ্ড? সকাল বেলাটাই আমার নষ্ট হোল দেখছি—। আর হঠাৎ পেছন থেকে পিসেমশায়ের চীৎকার শুনলাম—এই রসোগোল্লা!

সঙ্গে সঙ্গেই মেশোমশায়ের ডাক—হরির লুঠ! দেখি সামেনের বারান্দায় পিসেমশাই আর মেশোমশাই দুজনেই বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকছেন

—রসোগোল্লা!

—হরির লুঠ!

—রসোগোল্লা!

—হরির লুঠ!

কি আর করি ফিরলাম। কিন্তু একি বিপদ আমার পেছু পেছু এত লোক আসে কেন? দেখতে দেখতে পথটা লোকে ভরে গেল আর সবাই পিসেমশায়ের বাড়ীর সামনে এসে জড় হোল। একজন হেঁকে বলল—কই মশাই রসোগোল্লা হরির লুঠ কোথায়?

পিসেমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন—না সে আপনাদের নয় মশাই ওই ওকে!

—কেন আমরা বুঝি খেতে জানিনা? হরির লুঠ দেবেন তার আবার একে ওকে কি:

মেশোমশাই আমাকে ডাকলেন—এই হরির লুঠ

—কই মশাই কই? শুধু শুধু লোককে মিথ্যে কথা বলেন কেন?

—আপনাদের বলছি না মশাই

—বলছেন না কি রকম, হরির লুঠ বলে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছেন আর আসলে শূন্যি?

কতক্ষণ এরকম চলত বলা যায় না কিন্তু সব থেকে বাঁচাল মামা, আমার ওপর মামার জীব জগতের জ্ঞান প্রয়োগ এত দিনে দেখলাম সার্থক হোল। মামা হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে এসে আমাকে হেঁকে বললেন—এই ডালকুত্তা তেড়ে যা না হাঁ করে দেখছিস কি?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল—অ্যাঁ ডালকুত্তা? তারপরেই সব হাওয়া।

ওপরে এসে বললাম—তোমরা কি সারাদিন আজ এই করবে না চুরীর ব্যপার কিছু বলবে?

মামা বলল—ব্যপার আর কি বলবার আছে? একটা চোর দড়ী বেয়ে এই বারান্দায় উঠেছে, কোন যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে তারপরে সিন্দুক ভেঙ্গে লোপাট।

পিসেমশাই শুধু একবার হাঁউ-মাউ করে উঠল।

আমি বললাম যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে কি করে জানলে?

—প্রথম, যে চোর সিন্দুক ভাঙ্গতে পারে সে দরজাও ভাঙ্গতে পারে; দ্বিতীয়, দরজায় একটা নূতন বড় করে ছেঁছা করা হয়েছে।

—আচ্ছা পিসেমশাই আপনার সেই ভদ্রলোক সেই হারটার কথা বা টাকার কথা ওই রামসিং দারোয়ানকে বলেছিল কিনা জানেন?

—না তাতো জানি না তবে ডেকে জিগেস করতে পারি।

—হ্যাঁ করুণ না একবার

দেওনারায়ণ বাবুকে ডেকে আনা হোল।

মামা বলল—এই প্যাঁচা কি জিগেস করবি তুই কর

আমি জিগেস করলাম—আচ্ছা আপনি আপনার হারটা কি রামসিংকে দেখিয়েছিলেন না বন্ধকের কথা বলেছিলেন ?

ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পিসেমশাই বললেন —ও উনি আবার ভালো বোঝেন না আচ্ছা সব আমি জিগেস করছি।

অনেকক্ষণ ইকড়ি মিকড়ি করার পর জানা গেল হারটার কথা দেওনারায়ণ বাবু রামসিংকে বলেওছিলেন দেখিয়েও ছিলেন এবং বন্ধক দিয়ে যে টাকা নিয়েছিলেন সে কথাও বলেছিলেন। এক দেশের আর এক ভাষার লোকের কাছে অত লুকোচুরী করবার দরকার মনে করেন নি।

দেওনারায়ণ বাবু চলে গেলে মামা বলল—কেন রামসিং এর কথা জিগেস করছিস কেন ?

আমি বললাম---হারটার কথা দুজন লোকের মোটে জানবার কথা এক দেওনারায়ণ দুই পিসেমশাই তৃতীয় যদি কেউ জানে তাহলে সন্দেহটা তার ওপর পড়ে। এখন এটা সাধারণ চোরের কাজ নয় কারণ ঠিক হারটা যেদিন রাখা হোল চুরীও সেদিনই হোল। এর মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়েছে। এ কোন জানা চোরের কাজ।

পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন----ঠিক হয়েছে নিশ্চয় ওই ব্যাটা রামসিং নিয়েছে। আমার এখানে যে আর কিছু থাকে না, সব দোকানে থাকে ও জানে। কাল শুনেছে হারটা ওখানে রেখেছি, ব্যাটা দড়ী বেঁধে ওপরে উঠেছে তারপর দরজা কেটে সিন্দুক ভেঙ্গে চুরী। দাঁড়াও দেখাচ্ছি ব্যাটাকে।

----দাঁড়ান দাঁড়ান পিসেমশাই এখনই নয়

----কেন ?

----আগে ভাল করে দেখা যাক চলুন ত বারান্দাটা একবার দেখা যাক।

বারান্দায় এসে আমি বললাম----দড়ীটা কোথায় গেল ?

----পুলিশ নিয়ে গেছে

----দড়ীটা কোথায় বাঁধা ছিল ?

মামা আর পিসেমশাই দেখিয়ে দিলেন, মেশোমশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেবু খেতে লাগলেন।

বাড়ীটা প্রকাণ্ড লম্বা সামনে দুসার ছোট ছোট ব্যালকনি ওপরে উঠে গিয়েছে, আমাদের মাথার ওপর আমাদের মতই ব্যালকণি আরও চারটে ওপরে উঠে গেছে। ব্যালকণি গুলো ঢালাই করা তার ওপর বালী কাজ। দেখলাম সেখানে দড়ীটা বাঁধাছিল বলে ওঁরা দেখিয়ে দিলেন সেখানে কোন দাগ নেই চুণ বালীর ওপর কোন রকম দাগ পড়েনি। একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

সেদিন আর কিছু হোল না চলে এলাম। মনটা চিন্তিত হয়ে রইল। পথে যেতে যেতে ভাবলাম একটা লোক দড়ী বেয়ে নীচে নেমে গেল অথচ রেলিং এর চুণ বালীতে কোন দাগ পড়ল না? লোকটা কি পাখীর মত হালকা নাকি? লোকটা দড়ী বেঁধে ত উঠেও এসেছে তাতে চুণের ওপর অনেক ঘসা লাগবার কথা। হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটা কথা মনে চমকে গেল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম চোর দড়ী বেঁধে ওপরে উঠে চুরী করেছে। বারান্দায় দড়ীটা বাঁধা ছিল। কিন্তু চোর নীচ থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ী বাঁধল কি করে? চোরের ত আর পাখা থাকতে পারে না আর থাকলে সে দড়ী ব্যবহার করবে কেন? হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কি অদ্ভুত ব্যপার?

সন্ধ্যেবেলা আবার পিসেমশায়ের ওখানে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়ী অন্ধকারে কুপ কুপ করছে। সিঁড়ির মুখে রামসিংকে ডেকে জিগেস করলাম—এত অন্ধকারে ডাকু পকড়েনেকা সুবিস্তা হোগা আপকা খোঁখা বাবু।" রামসিং হো হো করে হেসে উঠল তারপরে বলল—নেই খোখা বাবু বিজলী লাইন ফিউজ হো গিয়া মিস্ত্রী আতা হ্যায়।

আর কিছু না বলে ওপরে উঠতে লাগলাম আর হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে লাগল ঠক্কর—কার সঙ্গে আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল—কি মশাই দেখতে পান না? অন্ধ নাকি?

একটা কড়া জবাব দিতে যাব হঠাৎ লোকটা প্রায় ছুটে নেমে গেল। আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কে লোকটা অমন করে পালাল কেন? তাড়াতাড়ি পিসেমশায়ের ঘরে ঢুকতেই পিসেমশাই বলে উঠলেন—কি রে রসোগোল্লা কি মনে করে?

'দাঁড়ান'—বলে ছুটে বারান্দায় গিয়ে দেখি বাড়ী থেকে দেওনারায়ণ বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা একবার সন্দিগ্ধ ভাবে ওপরে তাকাল তারপরে হন হন করে পা চালিয়ে দিল।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ওর সঙ্গেই যে আমার ধাক্কা লেগে ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিলনা কিন্তু ও নাকি বাংলা জানে না? এ লুকোচুরীর মানে কি? প্রথমতঃ ও মিথ্যে কথা বলেছে বাংলা জানেনা বলে, দ্বিতীয়তঃ বাংলা বলে ফেলে ও ওরকম লুকিয়ে পালাতে যাচ্ছে—এর মানে কি? আর হঠাৎ সত্যিটা মনে চমক দিয়ে গেল।

হারটার কথা তিনজন জানত। পিসেমশাই, দেওনারায়ণ আর রামসিং। এখন রামসিং নীচে থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ী বাঁধতে পারে না। পিসেমশাইকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। তা হলে থাকে দেওনারায়ণ। সে তার বারান্দা থেকে দড়ী বেঁধে নেমে এসে হারটা চুরী করেছে তারপরে ওঠবার সময় দড়ীর নীচের দিকটা পিসেমশায়ের বারান্দায় বেঁধে, আবার ওপরে উঠে গেছে। তারপরে নিজের বারান্দা থেকে দড়ীটা খুলে একেবারে নীচে ফেলে দিয়েছে। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারেনি। তার দু'রকম লাভ টাকাটাও হারটাও। আর তাই আমরা নীচের বারান্দায় কোনরকম দড়ীর দাগ দেখতে পাইনি। আমি ছুটে ভেতরে এলাম—পিসেমশাই তোমার থানার ইনস্পেক্টরের সঙ্গে ভাব আছে?

—কোন ইনস্পেক্টর ?
—যে এই চুরীর খোঁজ নেবার ভার নিয়েছে
—না তবে তোর মামার সঙ্গে তার ভাব আছে
—তবে ডাকুন মামাকে
আধঘণ্টা পরে মামা এসে বলল---কি রে গরু আবার কি খেয়াল ?
—মামা ইনস্পেক্টরকে একটা খবর দিতে হবে। খবরটা ঠিক কি না জানি না, তবে মনে হয় আমার সন্দেহ ঠিক।
—খবরটা কি ?
পিসেমশাই বললেন---রসোগোল্লা
—অ্যাঁ রসগোল্লা ? সে আবার কি ?
আঃ তোমরা আবার সুরু কোরনা "আমি বললাম" দাঁড়াও সব বলছি।

সেই রাতেই ইনস্পেক্টর বিজয়লালবাবু এসে দেওনারায়ণকে বললেন, বাবুজী আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে একবার আসতে পারি ?

—'জরুর' দেওনারায়ণ জবাব দেয়

আমরা বিজয়লালবাবুর পেছনে ভেতরে যাই এবং কোন কথা না বলে একেবারে বারান্দায় গিয়ে হাজির হই। বেশী খুঁজতে হয় না, বারান্দার চুণবালীর রেলিংএর হাতলের গোল করে কাটা কাটা দাগ। বিজয়লালবাবু হেসে ওঠেন তারপরে আমাকে বলেন----সাবাস ভায়া! ওই দড়ীর দাগ, ওইখান দিয়ে ও নীচে নেমেছিল।

পিসেমশায় লাফিয়ে ওঠেন—উঃ উঃ সাহস দেখেছ হতভাগাকে জেলে দেব, হতভাগা একটা...একটা...রসোগোল্লা! আমরা ভেতরে আসি আর আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি—দেওনারায়ণ কোথায় ?

—অ্যাঁ ? পিসেমশাই বলেন

—পালিয়েছে বললে মামা

বিজয়লালবাবু হাসেন—এইটাই হোল বোঝার ওপর শাকের আঁটি। লোকটা চালাক হয়েও বোকা, ভেবেছে পালিয়ে রেহাই পাবে। ওর এই পালানটাই ওর ওপর শেষ প্রমাণ। তবে বাছাধনকে যেতে হবে না বেশীদূর। নীচে আমার লোক এমনি সাধারণ পোষাকে খাড়া আছে, যতক্ষণ আমি ওপরে থাকব ততক্ষণ কেউ পালাতে পারবে না।

তারপরে ? আরও শুনতে চাও ? দেওনারায়ণ ধরা পড়ল, বামাল পাওয়া গেল তার কাছে। শুধু মামারটা নয় আরও অনেকের। লোকটা বেহারী মোটেই নয় একটা পাকা বাঙালী চোর। নানা জায়গায় নানারকম সেজে চুরী করেছে। সিন্ধুক ভাঙ্গায় লোকটা একেবারে পাকা। তারপরে তার দুঃখের কাহিনী আর নাই বা শুনলে।

এ সবের পর অনেকদিন কেটে গেছে। সে সব দিনগুলো আজকাল একএকবার স্বপ্নের মত মনে ভেসে আসে আবার স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যায়। স্মৃতির ওপর কিন্তু তাদের দাগ থেকে যায় তাই স্মৃতির পাতা থেকে একএকটা কাহিনী তোমাদের উপহার দিই। কি অদ্ভুত আমাদের ওই চলে যাওয়া দিনগুলো!

—:o:—

বেলশাজারের ভোজসভা

শ্রীমনুজেন্দ্র চৌধুরী

(১)

নৃপতি আসীন সিংহাসনে
ঘেরি সভাসদ দল,
শত প্রদীপের উজল কিরণে
ভোজ সভা উজ্জ্বল।
স্বর্ণ পিয়ালা হাজারে হাজার,
'জুডা'দের শূত যাহা,
'জেহবার' সেই পুণ্য আধার—
কলুষিত করে তাহা।

(২)

সেই ঘটিকায়, সেই সভাতেই,
হাত এক দিল দেখা,
দেয়াল ফুঁড়িয়া—সভার মাঝেই,
কি যেন লিখিল লেখা।

(৩)

সভয়ে নৃপতি উঠিল কাঁপিয়া,
মুখে নাহি কথা ফোটে,
দৃষ্টিশূন্য চাহনি হানিয়া,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে;
বলিল, "ধরায় যত জ্ঞানী আছে,
বিদ্বান আছে যাঁরা
ত্বরায় আনাও আজি মোর কাছে
করুক অর্থ তারা।

(৪)

'ক্যালডিয়া' দেশে বাস করে যারা
জ্ঞানী তারা নিশ্চয়,
আজব লেখাটি দেখে দেখে তারা,
মুর্খের মত রয়।
'ব্যাবল্' দেশের অধিবাসী যাঁরা
বিদ্বান তারা বটে,
অজানা লেখার অর্থ তাঁহারা
করিতে পারেনা মোটে।

(৫)

এক বন্দী যে তথাকার
নবাগত যুবা সে
খবর শুনিল আজব লেখার
অর্থ সে জানে যে!
প্রদীপ যেগুলি চারিধারে ছিল,
উজল হইয়া উঠে,
গভীর নিশিতে যাহা সে পড়িল,
সত্য হইয়া ফুটে।

(৬)

কবর তাহার রচিত হয়েছে,
দেশ হবে হাত ছাড়া
ওজন করিয়া তারে দেখা গেছে,
নহে সে মাটির বাড়া।
কবরের চীর হল তার বেশ,
পাথর চাঁদোয়া বেশে।
দলে দলে 'মিডি' ঘিরে ফেলে দ্বার,
পারসীরা আসে দেশে।

Byron রচিত "Belshazzar's Feast"এর অনুবাদ।

কিশোর বালক শেলী

ধরণী সেন

১



শেলী

প্রায় দেড়শ' বছর আগেকার কথা।

ইটন স্কুলে সেদিন ভারী হুজুগ। কী? ঘুষোঘুষি লড়াইতে নাকি একটি ছেলে অপর একটি ছেলেকে একেবারেই শেষ করে দিয়েচে! কিন্তু তার জন্য কেউ একবার একটু দুঃখ করচেনা। মুখ গম্ভীর করে হেডমাষ্টার যা বল্লেন শুনে অবাক হতে হয়। বল্লেন: হুঁ, দুঃখের বিষয় বটে কিন্তু কি আর করা যায়! ও আত্মরক্ষা করতে কেন শেখেনি! আমি চাই ইটনের প্রত্যেক ছেলে মার খেয়ে মার দিতে যেন প্রস্তুত থাকে!

ইটনের হেডমাষ্টার ডঃ কীট দেখতে ছোটখাট মানুষটি হলেও বড় ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর ধারণা ছেলেদের পেটালেই বুঝি সহজে তারা মানুষ হয়। অথচ ধনী সম্ভ্রান্ত লোকেরা এই হেডমাষ্টারের হাতে তাঁদের ছেলেদের ছেড়েদি য়ে কেমন একরকম নিশ্চিন্তই থাকতেন।

আশ্চর্য্য নয়, কেন তখনকার দিনে মাষ্টার মশাইদের এই ধরণের অনুশাসন সকলে বেশ পছন্দ করে চলতেন। তাঁদের অগাধ বিশ্বাস ইংলণ্ডের মন্ত্রী, সেনাপতি, পাদ্রী সকলেই যখন তাঁর হাতে মানুষ হয়েচেন তখন আর তাঁদের ছেলেরাই বা হবে না কেন?

ছেলেদের ধরণ ধারণও কেমন নিষ্ঠুর অসভ্য রকমের ছিল। ছোটরা বড় ছেলেদের চাকরের মত থাকত। বড়দের বিছানা করা থেকে জল আনা, জুতো ঝাড়া সব হুকুম তাদের তামিল করে চলতে হত। না পারলে তাদের হাতেই প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের সুব্যবস্থা ছিল।

আঁদ্রে মারোয়া রচিত "এরিয়েল" দ্রষ্টব্য।

অথচ স্কুলের অধিকাংশ ছেলেরাই এরকম জীবন বেশ পছন্দ করত।

কেবল একটি কিশোর এই স্কুলের নিষ্ঠুর আবহাওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করে উঠতে পারছিল না। সাসেক্সএর মস্ত এক ধনী জমীদারের ছেলে সে। তাকে দেখে ভারী ভাবপ্রবণ মনে হত। বড় সুন্দর তার নীল চোখ, কোঁকড়ান ঘন চুল আর ফুটফুটে গায়ের রং। তার ক্লাশের গোঁয়ার গোবিন্দ দলের মধ্যে তার চেহারা মোটেই খাপ খেত না।

এই সুন্দর কিশোর বালকটির নাম শেলী।

শেলী যখন প্রথম ইটন স্কুলে ভর্ত্তি হল, স্কুলের বড়রা অর্থাৎ যাঁরা কাপ্তেন, মেয়ের মত ছিপছিপে ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখে ভাবল---একে বশে আনা বা এর উপর প্রভুত্ব চালাতে তাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু কাপ্তেন দলের শীঘ্রই বেগ পেতে হল।

তারা দেখলে সামান্যতেই ছেলেটি বেপরওয়া হয়ে তাদের বাধা দেয়। শান্তিতে যার সুনীল চোখদুটি স্বপ্নে ভাসে, যুদ্ধহুজুগে তার ঐ চোখজোড়া দিয়ে আগুণ ঠিকরে পড়ে। এমনি তার গলার স্বর ভারী মিষ্টি, ভারী মৃদু কিন্তু বিরক্ত হলে তার গলা হয়ে উঠে উদ্ধত ও তীক্ষ্ণ। কাপ্তেন দল কলার ওলটানো মেয়েলী গলা বারকরা এই বেপরওয়া শিশু কবিকে দেখলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত।

শীঘ্রই শেলীকে আউট ল' বা অসহযোগী বলে ঘোষণা করা হল।

বড় ছোকরাদের বাঁদরামীগিরি তাদের পোষমানা কিছুতেই সহ্য করবে না, তাদের সামনাসামনিই অগ্রাহ্য করবে—শেলী প্রথম দিন থেকেই ঠিক করে। তার রকম সকম দেখে সকলে তাকে 'পাগলা শেলী' বলে ডাকতে সুরু করলে। কিন্তু তার সঙ্গে একা একা লড়তে কেউই রাজী নয়, কি জানি, একগুঁয়ে ছেলেটা যদি আঁচড়ে কামড়েই দেয়! তখন তারা করলে কি শেলীকে নানা ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল ও এই নিয়ে রীতিমত তারা আমোদ কৌতুক সুরু করে দিলে। কোন দিন শেলী নদীর ধারটিতে নির্জ্জনে বসে একমনে কবিতার বই পড়চে অমনি কয়েকজন কোত্থেকে হঠাৎ উড়ে এসে জুটে তাকে বিশ্রীভাবে 'হ্যালো' করতে সুরু করলে। দল ভারী দেখে কিশোর শেলী মাঠ দিয়ে দৌড় দিলে, তার লম্বা কোঁকড়ান চুলগুলি হাওয়ায় দুলে দুলে উঠল। কিন্তু পাজি ছেলেগুলো ধাওয়া করে মৃগয়ার হরিণ শিশুর মত

তাকে চারিধার ঘিরে তার গায়ে কাদার বল ছুড়ে মেরে মজা করতে থাকে। যেমন একজন একদিক থেকে 'শেলী' বলে চেঁচিয়ে উঠে, আর একজন অমনি অন্য দিক থেকে 'শেলী' বলে বিকট চীৎকার ছাড়ে, ক্রমশঃ দিকবিদিক থেকে 'শেলী', 'শেলী' ডাক প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। শেষে শেলী রাগে পাগলের মত হয়ে উঠত, তার চোখ দিয়ে আগুণ ঠিকরে পড়ত, চীৎকার করে সমস্ত শরীর তার থরথর করে কাপতে থাকত।

এই দৃশ্য দেখবার জন্যই যেন ছেলের দল প্রতীক্ষা করত!

তারপর বীর কাপ্তেন দলেরা যে যার সরে পড়ত।

ঠাণ্ডা হয়ে শেলী তার কর্দ্দমাক্ত প্রিয় বইগুলি সযত্নে তুলে নিত, তারপর ধীরে আবার টেম্‌স্‌এর ধারে রৌদ্রতপ্ত সবুজ ঘাসটিতে বসে নীল জলের দিকে একমনা চেয়ে থাকত। তার চোখে ও নদীর জলে কি যেন একটি মিল ছিল।

স্রোতস্বতী নদীটির দিকে চেয়ে সে আবার ভুলতে চেষ্টা করত। জলের মধ্যে বিরাট উইলো গাছের কম্পমান ছায়াগুলি দেখতে তার কী ভালোই লাগত।

তার হাতের বইগুলি তাকে বড় সান্ত্বনা দিত। কেন এ সুন্দর বইগুলি তারা পড়েনা? তাহলে তো সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি চুকে যেত, পৃথিবীর সব অন্যায়গুলো মুছে যেত। বই মুড়ে শেলী আবার ভাবতে বসত।

ভাবত মানুষের সুখদুঃখ নৈরাশ্যের কথা। দূরে দুষ্ট ছেলেদের হট্টগোল শোনা যেত আর শেলীর গাল বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ত। হাত জোড় করে সে বলত—আমি ন্যায়পথে চলব এই প্রতিজ্ঞা করচি। প্রতিজ্ঞা করচি কখনই আমি কারুর হাতের পুতুল হব না, কখনও স্বার্থপর দলে ধরা দেবনা। প্রতিজ্ঞা করচি আমার সমস্ত জীবন চিরসুন্দরের পায়ে উৎসর্গ করব —!

ইটন স্কুলের হেডমাষ্টার ডঃ কীট যদি ছেলেটির এই আকুল প্রার্থনা শুনতে পেতেন— তাহলে তিনি নিশ্চয় শেলীর প্রতি কোন অন্যায় করতে পারতেন না—নিশ্চয় তিনি ভালভাবেই তার দিকটা বিচার করে দেখতেন।

স্কুলে যে ছেলেটি অসুখী যার এই করুণ দুর্দ্দশা, ছুটির সময় বাড়ীতে সে যেন সুখী রাজপুত্র! শেলীর বাবা টিমোথি শেলী সাসেক্‌স্‌এ সুন্দর বাগানবাড়ী করেছিলেন। সেখানে শেলীর চার বোন আর তার তিন বছরের এক ছোট্ট ভাই থাকত। শেলীর দিদি এলিজাবেথ

ও শেলীর সম্পর্কীয় বোন হেরিয়েট এরা দুজনেই ছিল শেলীর মস্ত ভক্ত ও বন্ধু। সংসারে বড় ছিলেন শেলীর ঠাকুর্দ্দা স্যর বিসি শেলী, ইনি এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত স্নেহধারা নিজের ছেলেমেয়েদের মায়া ছাড়িয়ে ছোট্ট শেলীর ওপর গিয়ে পড়েছিল; তাঁর বিরাট সম্পত্তির এক বড় অংশও শেলীকে দেবার ইচ্ছা মনে মনে রেখেছিলেন। শেলীর বাবা একটু কড়া লোক ছিলেন; স্যর বিসির সঙ্গে তাঁর মোটে মিলতনা। শেলীর মাও চাইতেন না যে তাঁর ছেলে বনে বনে বই বগলে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর ভারী ইচ্ছে শেলী মস্ত লোক হয়।

কিন্তু ছোট ভাইবোনেদের চক্ষে শেলী ছিল দেবতা বিশেষ। ছুটিতে যে মুহূর্ত্তে তারা সব একসঙ্গে মিলত ভাই বোনেরা আনন্দে উঠত মেতে! তার বোনদের কাছে শেলী ছিল একাধারে হিরো, বন্ধু, ভাই ও শিক্ষক। তাদের শেলী ভারী মজার মজার গল্প শোনাত আর তারা চোখ বড় করে নিস্তব্ধ হয়ে শুনত। শেলীদের বাগানবাড়ীটা ছিল প্রাচীন দুর্গের মত; তার নানা অন্ধকার অলিগলি ঘরদোরের নানান রহস্য শেলী তাদের বলত। একটা তালা-বন্ধ ঘরে নাকি এক বুড়ো ডাক্তার থাকত, তার মস্ত দাড়ী — শেলী গল্প করে বলে। ঘরে কোন শব্দ শোনা গেলেই শেলী বলত আর ওরা ভাবত, ঐ! ঐ বুড়ো ডাক্তার বুঝি টেবল ল্যাম্প উল্টে দিলে! গরমের ছুটিতে তাদের বাগানে শেলী বোনেদের নিয়ে ঐ বুড়ো ডাক্তার বেচারার জন্য মাটির ঘর তৈরী করত।

আর শুধু এই মানুষ-বুড়োই ছিলনা; ছিল বাগানের পুকুরে আদ্যিকালের মস্ত বুড়ো এক কচ্ছপ আর থাকত প্রকাণ্ড এক সাপ। এই সাপটাকে একদিন নাকি তাদের বাগানের মালি কুড়ুল দিয়ে মেরে ফেলেছিল। শেলী বলে চলত—জানিস্, এই মালিটার মানুষের চেহারা বটে আমাদের মত, কিন্তু আসলে, সে হচ্চে 'কালরূপী'—রূপ কথার সমস্ত দৈত্য দানবকে সে সাবড়ে দেয়!

মাঝে মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করে বসত শেলী। একবার ইটন স্কুলে সে একটা বাটিতে পেট্রোল জ্বালিয়ে তার নীল ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে চেয়ে সে অদ্ভুত ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করলে, 'হে বাতাস, হে অগ্নির দানবগণ... !'

—এমন সময় মাষ্টারের গলা শোনা গেল, তখন শেলীর উত্তর এল, প্লীজ্, স্যর—আমি দানবদের আহ্বান করচি—"

স্কুলের পড়া এমনি করে শেলীর শেষ হয়।

৪

কলেজে ও হোষ্টেলে শেলীর খুব ভাল লাগল। বেশ নিজের একটা ছোট্ট ঘর; নিজের বেশ খুসীমত ক্লাশে যাওয়া—নিজের পছন্দমত পড়া ও বেড়ান। এমনি মধুর ভাবে চিরকাল যদি কাটান যায়!—শেলী ভাবত আর স্বপ্ন রচনা করত। কলেজে একটি ছেলেকে তার ভারী পছন্দ হয়ে গেল—তার নাম হগ। ভাব জমাবার জন্য শেলী প্রথম সুরু করলে: আজকালকার সবচেয়ে উঁচু সাহিত্য হচ্চে জার্ম্মান সাহিত্য; হগ হেসে বলে: উঁহু, জার্ম্মাণদের প্রকৃতি বলে কোন পদার্থ আছে নাকি?—তার চেয়ে আমার বাপু পছন্দ ইতালীয়ান। তখন শেলী বলে: তবে এস আমার ঘরে সেখানে নিরিবিলিতে আলোচনা করা যাবে।

এমনি করে তাদের ভাব হয়।

সকালে উঠে তারা দুটিতে মিলে অনেকদূর বেড়ায়। শেলী তখন ছোট্ট ছেলের মত মহানন্দে লাফালাফি করতে থাকে। জলের ধারে এসে কাগজের নৌকো ভাসায়, ছোট ছোট জঙ্গ্‌লা ফুল তুলে নদীর ঢেউএ দুলিয়ে দেয়। শেলীর কাণ্ড দেখে হগ ভারী অবাক হয়।

কলেজের সুন্দর আবেষ্টনে শেলী বই লিখতে সুরু করে—লিখে তার মনের কথাগুলি যে সে বলতে পারবে। কিন্তু শীঘ্রই বাধল গোলযোগ; তার লেখা সকলে পছন্দ করলেন না। লেখার মধ্যে নাকি অনেক অন্যায় কথা আছে।

শেলীর মা বাবা তাঁদের ছেলের রকম দেখে অসুখী হলেন। শেলীর গভীর দুঃখ হল। সে নিজে যা ভেবেচে তাই ত লিখেচে এতে অন্যায় কী?—শেলী ভাবে। বাড়ীতে সকলে এমন কি তার প্রিয় বন্ধু হেরিয়েটও যখন তাকে ত্যাগ করলে নিজের দুঃখ রাখবার সে আর জায়গা পেলেনা। কেবল মাত্র তার দিদি এলিজাবেথের স্নেহ শেলীর প্রতি শতগুণ বেড়ে উঠল। গভীর বেদনায় লিখতে লিখতে শেলী যেন ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অন্য নামে এক বই বার করে ভগবানের অস্তিত্ব নেই সে প্রচার করলে। কলেজের এক কর্ত্তার চোখে সে বইটি পড়ে। তিনি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। ইউনিভার্সিটিতে খবর দিলে তাদের দোকানই উঠে যাবে এই ভয়ে দোকানদার বইগুলি সরিয়ে নিলে।

শেলী এ খবর পেয়ে খুসী হলনা, কিন্তু সে সগর্ব্বে দোকানদারকে জানালে: আমার বইর এক একখানা কপি সব কলেজের মাষ্টারদের কাছে, এমন কি চ্যান্সেলারের কাছেও পাঠিয়েছি। সর্ব্বনাশ, এ ছেলে করেছে কী!—দোকানদার ভাবে।

শেলীকে কলেজ ছাড়তে হল! তখনই শীলমোহর করা এক লম্বা মানপত্র তার হাতে দিয়ে তার নাম কাটান পাকা হয়ে গেল!

শেলী দৌড়ল।—দৌড়ে তার বন্ধু হগের কাছে গিয়ে পাগলের মত বলতে লাগল: **Expelled! Expelled!**

তার মানে কলেজের যে সুন্দর জীবন স্বপ্ন সে মধুর ভাবে রচনা করেছিল—তার সব শেষ! শেষ তার সুমধুর ছাত্রজীবন! কোন কলেজেই তার আর স্থান নেই।

হগ সমস্ত শুনে ভয়ানক চটে গেল। বন্ধুর প্রতি এই দারুণ অবিচারে তার সমস্ত মন সমব্যথায় ভরে উঠল। তখনই সে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদের এক চিঠি লিখে জানাল, শেলীর মত ছেলের প্রতি তাঁদের এমন ব্যবহারে সে অত্যন্ত দুঃখিত। সে আশা করে তাঁদের বিচার নিশ্চয়ই চরম নয়।

হগের হাতে শীলমোহর করা মানপত্র এলো! সেও কলেজ থেকে চিরদিনের মত বিতাড়িত হল!

পরদিন সকালে কলেজের গেটে ছোটবড় সকল ছেলেদের চোখে পড়ল এক মস্ত নোটিস। তাতে লেখা—টি জে হগ্ ও পি বি শেলী এ দুটি ছেলেরই কলেজ থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েচে।

কলেজের রুটিন থেকে শেলীর নামটা কাটা গেল বটে, কিন্তু যাঁরা স্বপ্নে কল্পনায় এক একটা মধুর জগত সৃষ্টি করেন জীবনের অনেক সুন্দর লুকোন রহস্য ছন্দে গানে যাঁরা ধরেন পৃথিবীর সেই মহৎ চারণ কবিদল একদিন শেলীকে শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক বলে চিনে তাঁদের দলে টেনে নিয়েছিলেন!

পথে বিপথে

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

ঊনবিংশ অধ্যায়

কু-উ-উ

বৃদ্ধ মঙ্গরু মাঝি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে ভাবিতে পারে নাই তাহাদের বাড়ীর এত কাছে পাহাড়ের গায়ে এমন একটী মন্দির থাকিতে পারে। অশান্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছেলেটীকে কোলে করিয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়াছিল, তাহার মুখ ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল।

বৃদ্ধ মঙ্গরু তাহার কাছে আসিয়া কহিল,—হ্যাঁরে বাবু তুই অমন মুষড়ে গেলি কেন? ছেলেটাকে ত বাঁচাতে হবে! এই কথা বলিয়া সে একেবারে ছেলেটির মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, যদি বাঁচাতে চাস্ তাহলে এক্ষুনি ওকে দুধ খাওয়াতে হবে। মঙ্গরু অমনি দুইটী সাওতাল যুবককে দুধের সন্ধানে যাইতে আদেশ করিল, তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকটা দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিল, মঙ্গরু ও অশান্ত অতি সন্তর্পনে শিশুকে একটু একটু করিয়া দুধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিল।

এদিকে যে ঘরে শিশুটীকে পাওয়া গিয়াছিল সেই ঘরের মেঝটার এক পাশে গুলাঞ্জ লক্ষ্য করিল যেন একটী ছোট পাথর আলগাভাবে বসান রহিয়াছে। সে আস্তে আস্তে সেই পাথরটা সরাইয়া ফেলিতেই দেখা গেল—একটি ছোট সিঁড়ি নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে। গুলাঞ্জ বাহিরে যাইয়া মঙ্গরু সর্দ্দারকে বলিবামাত্র মঙ্গরু কহিল,—একা যাস্‌নে, তিন চারজন এক সঙ্গে আস্তে আস্তে নেমে যা! এক পা এগুবি, আর বল্‌বি—কি দেখ্‌ছিস্—আমি একটু পরে আস্‌ছি! ভয় পাস্‌নে যেন!

গুলাঞ্জ মাথা নাড়িয়া কহিল—ভয়?

মঙ্গরু সর্দ্দার হাসিল।

অশান্ত অপলকে সেই শিশুটীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। ফুলের মত সুন্দর সুকোমল শিশুটী আস্তে আস্তে চোখ মেলিতেছিল, আবার ফুলের পাপ্‌ড়ির মত চোখের পাতা বুজিতেছিল।

মঙ্গরু বলিল—তুই বাবু এখানে ছেলেটাকে নিয়ে থাক্ আমি দেখে আসি গুলাঞ্জ কোথায় গেল। যাইবার সময় মঙ্গরু তুইটী সাওতাল যুবককে অশান্তের পাশে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিল। মঙ্গরুর ন্যায় একজন সাহসী সাওতাল সর্দ্দারের কাছেও কেন যেন একটা বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল তাহারও মনে হইয়াছিল এই স্থানটী একেবারে নিরাপদ নহে, নিশ্চয়ই আশে পাশে লোক আছে। হঠাৎ কোন সুযোগে তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কাও যে তাহার মনে না হইতেছিল তাহা নহে।

গুলাঞ্জ একটী বর্ষা হাতে করিয়া সেই ক্ষুদ্র অপরিসর গর্ত্তের ভিতরে অতি কষ্টে প্রবেশ করিল। প্রথমেই সে পায়ের তলায় একটী সিঁড়ি দেখিতে পাইল এই ভাবে এক পা তুই পা করিয়া তুই তিনটী সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সে বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া অপর সঙ্গীগণকে একে একে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। একজন তুইজন করিয়া প্রায় পাঁচজন বলিষ্ঠ সাঁওতাল যুবক ওই অপরিসর গর্ত্তের মধ্য দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহারা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। বৃদ্ধ মঙ্গরু সর্দ্দার উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল গুলাঞ্জ, ভিতর হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর আসিল সর্দ্দার——খাণিক পরে মঙ্গরুর আহ্বানেও নীচ হইতে আর কোন শব্দ আসিলনা।

এদিকে অশান্ত অপলকে ছেলেটীর দিকে লক্ষ্য করিতেছিল ক্রমে দিনের আলোর সঙ্গে ছেলেটীর যেন পরিচয়টা বেশ ভাল ভাবেই হইয়া আসিতেছিল সে এখন একটু একটু করিয়া চোখ মেলিতেছিল আর অশান্তের মুখের দিকে চাহিয়া একটু একটু হাসিতেছিল। অশান্ত দেখিল ছেলেটীর গলায় সোণার একটী ছোট হার, হারের সঙ্গে একটী পদক, পদকের মাঝখানে একটী নীলা পাথর ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছে, ছেলেটীর মুখের হাসি দেখিয়া তাহাকে চোখ মেলিয়া চাহিতে দেখিয়া অশান্তের মুখে ও আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, —এইবার সে ছেলেটির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। সে যে পিন্টু ও টিন্টুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট তাহা বুঝিতে পারিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হায়! তবে তাহারা কোথায়? —এই ক্ষুদ্র সুকুমার শিশুটিকে মায়ের বুক হইতে যাহারা চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে, কত বড় নির্ম্মম তাহাদের হৃদয়।

অনেকটা দুধ খাইয়া ছেলেটি বেশ সবল হইয়া উঠিয়াছিল,—সে মধুর স্বরে কহিল কা-কা।

অশান্ত শিশুটির ঠোঁটে চুমু খাইয়া আদর করিয়া কহিল—হাঁ, কাকা!

ছেলেটি কহিল, মা-মা—বা বা!

অশান্ত কহিল—মা কোথায়? বাবাই বা কোথায়?

—ছেলে কহিল—কু-কু-কু। একটা পাখী, তাদেরই সাম্‌নের একটা ঝোঁপে বসিয়া ডাকিতেছিল—কু-উ-উ,—তাই খোকা তাহারই অনুকরণ করিয়া কুকু করিতেছিল! হাত পা ছুঁড়িতেছিল। হাতে দু'গাছি সোনার বালা। গলায় হারের কাছে ছোট পদকের গায়ে দু'টি ছোট কথা লেখা রহিয়াছে! অশান্ত হাতে লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। একটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়াছে, অপরটি বেশ স্পষ্ট রহিয়াছে—রা! তবে কি রাজু, রাখাল, রাম কতইত হইতে পারে।

তাহার দুপাশের সাঁওতাল যুবক দুইটিও নির্ব্বাক্ ভাবে এই ফুলের মত সুন্দর সুকোমল শিশুটির দিকে অপলকে চাহিয়াছিল।

ক্রমে সূর্য্য নামিয়া পড়িতেছিল। পাহাড়ের কালো ছায়া দীর্ঘ হইয়া বেলা শেষের আভাষ জাগাইয়া দিয়াছিল!

—এমন সময় মঙ্গরু তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল,—তাইতরে বাবু, এবড় বিষম ঠাঁইরে। তারপর সে গুলঞ্জ যে সিঁড়ি বাহিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে সেকথা বলিল। কোন পাড়া পাওয়া গেলনা!

অশান্তও চমকিত হইল

বিংশ অধ্যায়

খুব-খুব-খুব সাজা দাও

সেদিনের কথা বলিতেছি। যেদিন পিনু ও টিনুকে সন্ন্যাসী প্রশান্তের নিকট হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল, সেদিন দুটি ভাই বোন্ বিশালকায় সন্ন্যাসীর বুকে কাতর কপোত শাবকের মত কাঁপিতেছিল, ভয়ে তাহাদের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইতেছিলনা। তারপর একটি নীরব পথ বাহিয়া মন্দিরের মধ্যে আসিয়া সন্ন্যাসী তাহাদের দুইজনকে একটি ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল।

—পিনু কহিল—টিনু—

টিন্নু কাঁপিতেছিল। দাদার কথায় সে কহিল—দাদা!

বিপদে পড়িলে ছোটদের মনেও সাহস আসে। পিন্নু কহিল—আয় আমরা ভগবানকে ডাকি।

টিন্নু কহিল—না, বাবা বোধ হয় এক্ষুণি আমাদের নেবার জন্য ছুটে আস্‌বেন!

পিন্নু কহিল,—তাঁরাত জানেন না যে আমাদের ডাকাতি কার নিয়ে এসেছে?

টিন্নু কহিল—হুঁ পায়নি! নিশ্চয় পেয়েছেন!

এই দেখনা, এলেন বলে। অই শুন্‌ছো!

কি ভাই?

ঐ যে গাড়ীর শব্দ হচ্চে!—বাঃ কি মজাই হবে, বাবা যখন খুব এদের সাজা দিবেন!

পিন্নু মলিন মুখে কহিল—কোথায় শব্দ! কোথায় তোর গাড়ী?

বেচারী টিন্নু কাঁদিতে লাগিল।

পিন্নু কহিল, জানিস্ কাঁদ্‌লে দেবতা রাগ করেন, যে কাঁদে তাঁকে তিনি ভালবাসেন না! তার চেয়ে আয়, আমরা তাঁকে ডাকি!

জানিস্ মা বলেছেন, ঈশ্বর দয়াময় তিনি বিপদে পড়লে সবাইকে রক্ষা করেন। আয় তবে তাঁকেই ডাকি।

দুই ভাই বোন্, সেই ছোট ঘরখানিতে বসিয়া বলিতে লাগিল—দয়াময়, ঠাকুর আমরা ছোট শিশু, আমাদের বাড়ী পৌঁছে দাও, যারা আমাদের ধরে এনেছে তাহাদের খুব-খুব, খুবই সাজা দাও।

তারপর তাহারা দুইজনে সেই কদর্য্য বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িল।—তারপর—কি হইল, তাহা আগেই বলিয়াছি।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু গুলাঞ্জ ও তাহার পাঁচজন সঙ্গী সেই পাতালপুরী হইতে ফিরিয়া আসিলনা।

বৃদ্ধ মঙ্গরু মাঝিও যখন চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন অশান্ত কহিল,—শোন মাঝি, তুমি কোন ভয় করোনা। আজ রাত্রিতে আমরা এখানেই থাক্‌বো। একজনকে গাঁয়ে পাঠিয়ে দাও খবর জানাতে, তারা যেন আমাদের জন্য কোন চিন্তা না করে। আমরা এদিকে খুঁজে দেখি কি করা যায়।—মঙ্গরু অশান্তের কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল,—বেশ কথারে বাবু! আমি কি করে ওদের ছেড়ে যাই!

অশান্ত ছেলেটিকে লইয়া, সেই মন্দিরের একটি ঘরে আসিল। একজন যুবক বাহিরে যেসব সাঁওতালেরা পাহারা দিতেছিল—তাহাদেব ডাকিয়া আনিলে মঙ্গরু এবং অশান্ত তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া বলিল।

সাঁওতালেরা তখন সেই সুড়ঙ্গ কাটার মুখে বড় বড় কয়েকটা পাথর চাপা দিয়া আসিবার পথটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিকের পাহাড় হইতে শুক্‌নো কাঠ ও শাখা প্রশাখা জড় করিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। তাহারা আজ যেন একটা নুতন খেলা পাইল, কাহারও মুখে কোনরূপ অপ্রসন্নতার ভাব দেখা গেলনা।

গুলাঞ্জ ও তাহার সঙ্গিগণ যতই নামিতে লাগিল, ততই যেন সিঁড়ি প্রশস্ততর হইতে লাগিল অন্ধকার গভীরতর হইতে লাগিল। সিঁড়ি আট দশটি মাত্র। সেই সিঁড়ি পার হইলে পর তাহারা একটি বেশ বড় ঘরের মধ্যে যাইয়া পৌঁছিল। ঘরের এক পাশে আগুন জ্বলিতেছে। সেই অগ্নিশিখার আলোকে তাহারা দেখিতে পাইল, ঘরটির দেয়ালের গায়ে সারি সারি ছোট বড় কুলুঙ্গি, কুলুঙ্গিতে নানা প্রকারের খাদ্য দ্রব্যাদি সাজানো রহিয়াছে। কোথাও খুব বড় একটি জালা। গুলাঞ্জ জ্বলন্ত কাষ্ঠ হাতে লইয়া দেখিতে পাইল, জালার মধ্যে অনেক ফল সঞ্চিত রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য ঘরের কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। কে কখন আগুণ জ্বালাইয়া গিয়াছে, লোকজন কোথায় ? কিছুই বুঝা গেলনা !



ঘরের একপাশে আগুন জ্বলিতেছে

গুলাঞ্জ ও তাহার সঙ্গিগণ প্রফুল্ল মনে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপরে ফিরিয়া আসিল। এবং উপরে উঠিয়া সেই পাথরখানার উপর খুব গুরুতর ভারী কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড আনিয়া এমন ভাবে ঢাকিয়া দিল যে নীচ হইতে কাহারও উপরে উঠিয়া আসা বড় সহজ হইয়া উঠিবেনা।

গুলাঞ্জ ও তাহার সঙ্গিগণকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া বৃদ্ধ মঙ্গরু সর্দ্দার ও তাহার সঙ্গিগণের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তখন কেহ কাঠ জোগাড় করিল, কেহ রান্নার জোগাড় করিল, কেহবা গান ধরিল, তাহারা সারাদিনের শ্রমের পর মহা আনন্দে মত্ত হইল।

অশান্ত, মঙ্গরু মাঝিতে ও গুলঞ্জের মধ্যে কথা হইতেছিল।

অশান্ত কহিল—গুলাঞ্জ কি কি দেখ্‌লে ?

গুলাঞ্জ কহিল, নীচু থেকে বুঝতে পারিনি যে এতটা রাত হয়ে গেছে। তারপর সে কহিল মস্ত বড় খবর রে বাবু, সবতো আর ভাল করে দেখ্‌তে পেলামনা।

মঙ্গরু মাঝি গম্ভীর ভাবে কহিল—কি কি দেখ্‌লি রে ? তখন গুলাঞ্জ মেজের নীচে ঘরের মধ্যে যাহা যাহা দেখিয়াছিল, সেই কথা কহিল। সে বলিল, কি বল্‌ব সর্দ্দার ওই ঘরের ভিতরে ডাকুদের খাবার সব জিনিষপত্র আছে।

মঙ্গরু কহিল—বুঝলিরে বাবু, এ হচ্ছে ডাকুদের আড্ডা আমাদের এত কাছাকাছি থাক্‌তেও কিছুই জান্‌তে পারিনি।

দেখ বাবু, আমার মনে হয় কাল সকাল হলে আমরা একটা হেস্তনেস্ত করে ফেল্‌ব। আমার মনে হচ্ছে সাধু বেটারা এখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে !

অশান্ত কথাটা একেবারে অসম্ভব মনে করিলনা। সে চুপি চুপি মঙ্গরু ও গুলাঞ্জকে কহিল—রাতটা আমাদের খুব সাবধানে থাক্‌তে হবে। কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে। সে ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া লইয়া একটি চুমো খাইয়া কহিল—কিছু ভয় নেইরে খোকা তোকে আর কেউ আমার কাছ থেকে চুরি করে নিতে পারবেনা।

ক্রমশঃ



ছুটির ঘণ্টা

গুজরাতী ছেলেমেয়েদের খেলা

শ্রীশামুক

"আড়্কো দাড়কো দহি দাড়্কো
পিল্লু পাকে শাবন আজ্‌
উড়মুড় দাতাড়িয়ে খজুর শাকর, মেরভি সিন্দুর।"

পড়ে মনে হচ্ছে, এ আবার কি—এর মানে হয় নাকি কিছু? কিন্তু ভেবে দেখো আমাদের "ইকীড়-মিকীড়"-এরই বা মানে কতটুকু! শুধু মজার মজার কথা সাজিয়ে তৈরী। আমাদের "ইকীড়-মিকীড়" থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমরা কি করি!—আমরা গোল হয়ে বসি দুহাত মাটিতে পেতে আর একজন সকলের আঙুল থেকে আঙুলে চাপ দিয়ে দিয়ে সুর করে বলে যায়—

"ইকীড়-মিকীড়
চাম-চিকীড়
চামে কাটা মজুমদার"—
—ইত্যাদি

যার আঙুলের ওপর গিয়ে ছড়া শেষ হবে তার সে আঙুল বুজোনো হ'ল, তার পরের থেকে আবার সুরু! মজা সেখানেই যে কার হাত দুটো আগে মুঠো হয়ে যায়—তারই জিত। গুজরাটে এই একই খেলাটির নাম, "আড়কো-দাড়কো" আমরা যাকে বলি "ইকীড়-মিকীড়" ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ঠিক বাংলা দেশের মতই এ খেলাতে মাতে বেশী, তাদের চোখগুলো বড় বড় হয়ে ছড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঙুল থেকে আঙুলে লাফিয়ে চলতে থাকে—কখন্ সবকটা আঙুল বন্ধ হয়ে মুঠো হবে। তফাৎ কিছু নেই কেবল আমরা বলি 'ইকীড়-মিকীড় চাম-চিকীড়', ছড়াটি কাটি আর খেলি আর গুজরাটি ছেলেমেয়েরা বলে "আড়কো দাড়কো দহি দাড়্কো" ইত্যাদি আর ছড়া কেটে ঐ একই খেলাটি খেলে।

বম্বে প্রেসিডেন্সীর উত্তর দিকটা গুজরাট। এর একদিকে রাজপুতানা—বিশাল মরুভূমি বুকে করে পড়ে আছে তার অন্যদিকে নর্ম্মদা নদী, তা পেরিয়ে মারাঠীদের পাহাড়ী দেশ। পশ্চিমে ধূ ধূ সমুদ্দুর—আরবসাগর। বাংলা দেশ কোনদিকে? চোখ বুজে ভারতবর্ষের ম্যাপটা মনে করলে মনে হবে সে কতদূর প্রায় সেই পূর্ব্ব সীমানায় ধার ঘেঁসে। গুজরাটের বাসিন্দাদের গুজরাটী ত বলবেই আর এদের দেশেও যে ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তাদের খেলাধুলা আছে—সে বিষয়ে ভুল হতে পারেনা।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য কতগুলো খেলা ত হুবহু মিলে যায় বাংলার ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার সঙ্গে, নিয়ম-কানুন সব সমেত! কেবল নামে যা তফাৎ। 'আড়কো দাড়কো' খেলাব বেলা তো দেখলেই। আর অন্য কোন কোন খেলায় কিছু কিছু অদল-বদল হয়েছে মাত্র।



"আঁধড়ী খিস্‌কোলী"

ধরো—"কাণামাছি।" এদের ঠিক ঐ রকম খেলারই নাম "আঁধড়ী খিস্‌কোলী" বা অন্ধ কাঠবেরালি। আমাদের 'কাণামাছি'র চেয়ে এনাম বেশী যুৎসই। খেলাব সময় দুটি চোখই যখন বাঁধা হয় তখন তাকে অন্ধ বলাই কি উচিৎ নয়? খেলার নিয়ম সমানই। গোনবার ফলে একজন 'কাণা-মাছি' হ'ল—তার চোখ কাপড় দিয়ে কসে বেঁধে তাকে এক জায়গায় বসানো হ'ল। অমনি একজন করে এসে মাথায় একটি করে টোকা মারবে আর অন্যজন জিজ্ঞাসা করবে—'কোন ছে? অর্থাৎ কে বল দেখি? কাণামাছিকে নাম বলতে হবে—মিলে গেলে তবে নিস্তার। নিয়ম হচ্ছে মাথায় টোকা মারতে হবে খুব আস্তে কিন্তু দুষ্টু ছেলেমেয়ের অভাব আছে কোন দেশে? কেউ হয়তো মারলো এক গাঁট্টা খুব জোরসে ব্যস—"আঁধড়ী খিস্‌কোলী" না তার চোখের বাঁধন দুহাতে টেনে খুলে ফেলে—লাগালো যুদ্ধ যাকে সামনে পেল তাকেই সন্দেহ করে।

প্রত্যেকেই যখন এক একবার করে টোকা মারলো আর 'কাণামাছি' বলতে পারলো না কে সে তখন তাকে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে দৌড়ে ধরতে হবে; আর তার কাণ ঝালাপালা অন্যদের

চীৎকারে—"আঁধড়ী খিস্‌কোলী—আঁধড়ী খিস্‌কোলী।" আমরাও ত' বলি—"কাণামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পারি তাকে ছোঁ।"

তারপর লুকোচুরী। এ খেলা এরা নিয়মের একটু আধটু অদল বদল করে এরা অনেকভাবে খেলে—আর তার নামও আছে অনেক রকম। যেটা একেবারে আমাদের সঙ্গে মিলে যায় শুধু সেটার কথাই বলি। এ খেলাকে এরা বলে "দহিনো ঘোড়ো"—মানে হচ্ছে, "বুড়ীর ঘোড়া"। আমরা লুকোচুরী খেলার সময় একজনকে বুড়ী করি—যাকে এসে ছুঁলে আর চোর হতে হয় না। এ সেই বুড়ী আর তার ঘোড়া হ'ল যে চোর হয়েছে সে। চোর এসে বুড়ীর কোলে মাথা গুঁজে চোখ বন্ধ করে বসে রইলো, অন্যরা সেই ফাঁকে যে যার নিশ্চিন্ত জায়গাটিতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে লুকিয়ে চুপিচুপি হাসছে। বুড়ী এবার সুর করে চেঁচিয়ে বলবে—

"দহিনো ঘোড়ো
পানী পিতো,
রমতো ঝমতো ছুট্‌মুট্;
হাতমা লকড়ী
কাম্মার কাকড়ী,
জেনো ঝিলী লেবু হোয় ত' ঝিলী লেজো।"

বুড়ী বলছে—"বুড়ীর ঘোড়া (চোর) শীগ্‌গীর জল খেয়ে ছুট্ লাগাও—হাতে তোমার লাঠী—কোমরও বেঁধেছ, যাকে পাবে তাকে ধরে নিয়ে এস।" যাকে ছোঁবে সেই চোর হবে পরের দানে, আর বুড়ী আবার বলবে তার মজার ছড়া।

এরপর "চাকবিল্লু" বা "খো"। এ শুধু দৌড়ের খেলা—কে কত দৌড়োতে পারে—ছড়া কিছু নেই। যতজন খেলবে সকলে এক লাইনে একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়ালো—দু'জন ছাড়া। বাকী দু'জনের, একজন লাইনের সামনে, অন্যজন ঠিক পিছনে। দলের সর্দ্দার বলবে—এবার আরম্ভ। তখন পিছনের ছেলেটি দু'একবার ধোঁকা দেবে সামনের ছেলেটিকে—যেন ডাইনে কি বাঁয়ে দৌড়াবে ঠিক করতে পারছে না, তারপর হঠাৎ একটানা ছুট্। লাইনের পাশ দিয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দৌড়াতে হবে, ধরতে হবে সামনের ছেলেকে। যদি ধরতে পারলো, তাদের স্থান পরিবর্ত্তন হবে আর যে পিছনে আসবে সেই এবার ধরবে। কিন্তু যদি পিছনের ছেলেটি দৌড়ে আর পারলো না, ক্লান্ত হয়ে পড়লো, তখন সে লাইনে দাঁড়ানো যে কোন একটি ছেলের পিঠে মারবে এক চাপড়। এই ছেলেটির এবার দৌড়বার

পালা আগের মতনই আর ক্লান্ত ছেলেটি তার জায়গা দখল করে জিরোতে লাগলো। আসলে খেলার সময় শেষ পর্য্যন্ত কেউ বড় একটা দৌড়ায় না অন্যের পিঠে চাপড় মেরে মেরে অপরকে দান দিতে থাকে। এতে খেলা ভয়ানক জমে যায় আর উৎসাহের অন্ত থাকে না। এই রকম করে অনেকক্ষণ খেলা চলে যতক্ষণ না সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লো। এ খেলা শুধু ছেলেরাই খেলে, মেয়েরা এত বেশী দৌড়াতে পারে না।

এবার একটা বাদ্‌লা দিনের খেলা বলি। ধর ঠিক বিকাল বেলাটি দেখেই যেন বর্ষা নাম্‌লো। কি রকম মন খারাপ হয়ে যায় বল দেখি! কিন্তু ছোটরা চট্ করে বরুণ দেবতার কাছে হার মানতে রাজী নয়। খেলবেই তারা যেমন করে হোক—তারা খেলবে ঘরের ভিতরেই—অথচ ছুটোছুটী খেলা। এ খেলার নাম "চালাক্ চালাড়ু।" মাত্র পাঁচজন একসঙ্গে খেলতে পারে, কারণ ঘরের কোণ চারটির বেশী থাকে না। তবে যদি এমন কোন ঘর হয় যে তার চারের বেশী কোণ, ততজন ও আরো একজন এই নিয়ে খেলা আরম্ভ হবে। সাধারণত ঘরের চারকোণে চারজন আর মাঝখানে একজন দাঁড়াবে। মাঝের ছেলে বা মেয়ে একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রত্যেকের কাছে যাবে আর বলবে—"চালাক্ চালাড়ু" ?

উত্তর আসবে—"ওলানে ঘের ভাড়ু"—ওর ঘরে যাওগে। এই বলে পাশের কোণ্ দেখিয়ে দেওয়া হবে। এই করে কোণ থেকে কোণে একপায়ে লেংচে লেংচে চললো। শেষের ছেলে বা মেয়ের কাছে গিয়ে যেই বলা—"চালাক্ চামড়ু ?" সে তখন উত্তরে বলবে—"মিনি মিনি দুধ পি।"—মিনি তুমি দুধ খাও। মিনির যেমন মাটীর দিকে নীচু হয়ে দুধ খাবার ভাণ করা—অন্যরা সেই অবসরে এক দৌড়ে পরস্পরের স্থান বদল করে নেবে।

এই গোলমালে মিনিরও একটা ঘর বা কোণ্ দখল করে নেওয়া চাই—তখন একজন বাকী থাকতে বাধ্য। যে কোণ্ পেল না তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে নিজের জায়গাটুকু হারালো তাকে এসে মাঝখানে দাঁড়াতে হবে—আবার খেলা চলবে। আমাদের "খোন্তাখুনী দে, ওস্কা বাড়ী যা"—এই রকম খেলা নয় কি ?

এসব খেলা ছাড়া আমাদের মতনই "হা ডু ডু ডু" আছে—এরা বলে, "হু তু তু তু" ; "গিল্লীডাণ্ডা" (ডাণ্ডাগুলি) আছে, একটা গিলে বা অমনি কিছু নিয়ে "পালাথিয়া" বা "ল্যাঙ্গ্‌ড়ী" (এক্কা-দোক্কা) খেলাও সব আছে। নিয়মকানুন—একই, কেবল নামের যা তফাৎ।

এবারে মেয়েদের দুটো খেলা বলে শেষ করবো। এ-দুটো খেলা মেয়েরাই বেশী খেলে তবে ছেলেরা যে একেবারে খেলে না তা বলা যায় না। মিলেমিশেও কখন কখন খেলতে দেখা যায়।

প্রথমটি হ'ল "কাঁগ্‌ড়া কাঁগ্‌ড়া"—আমাদের ভাষায়, "কাগ কাগ।" বাংলা দেশেও এ-খেলার চলন আছে, কেউ কেউ বলে "গরমমুড়ী।" চার পাঁচজনে খুব কাছাকাছি বসে গোল হয়ে, দু'হাত একসঙ্গে মুঠোর মত করে। আরেকজন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলো—ইনিই হ'লেন কাঁগ্‌ড়া বা কাগ। দলের ভিতর একজন একটা ঢিল বা কোন ছোট ইট্‌ পাট্‌কেল নিয়ে, প্রত্যেকের মুঠোর মধ্যে রাখার ভান করতে করতে একজনের মুঠোর মধ্যে হঠাৎ রেখে দেবে লুকিয়ে—নিজের মুঠোর ভিতরও রাখতে পারে। 'কাগ' ততক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দূর থেকে দেখছে ঢিলটি গেল কোথায়। এরপর দলের সেই মেয়েটি চেঁচিয়ে বলবে—

"কাঁগড়া কাঁগড়া কড়ি পিবা আওজে।"

কাগ, ও কাগ কড়ি খাবে এস। কড়ি এদেশের একরকম খাবার জিনিষ, দই এর সঙ্গে নিম-পাতা আর মগমা দিয়ে রান্না হয়। এদের ভয়ানক প্রিয়। কাগ এসে প্রত্যেকের হাতের কাছে ঝুঁকে ঝুঁকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করবে আর যার কাছে আসবে সে বারবার বলবে হাসতে হাসতে—"মনে কাঁকরো ঘুচেছে,"—আমার হাতে ঢিলটা বড় লাগছে। ঠিক যদি বলতে পারে ত' যার হাতে ঢিল সেই হবে কাগ্‌ড়া। না হ'লে যার হাতে ঢিল সে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে মুঠো খুলে দেখাবে যে ঢিল কোথায়—কাঁগ্‌ড়ার বুদ্ধি কিচ্ছু নেই আর অন্যেরা হেসে লুটোপুটী খাবে। তখন আবার সুরু গোড়া থেকে। সবচেয়ে মজা লাগে দেখতে যখন সুর টেনে টেনে এরা বলে—"মনে কাঁকরো ঘুচেছে"—যেন কতই না লাগছে।

এরপর—"ইতে ইতে পানী।" মেয়েরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়ায়, একজন মাঝখানে থাকে। মাঝের মেয়েটি প্রতি দুজনার ধরাধরি হাতের কাছে গিয়ে হাত নেড়ে বলে—"ইতে ইতে পানী।"—এত জল, এত জল। যেন একেবারে জলের মাঝখানে, কূপের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে মিলে একসুরে এর উত্তর দেবে—"যো গে রাণী।" আবার সে বলে—"আ দরবাজা খোলুঙ্গা।"—এই দরজাটা খুলবো। সকলের কাছ থেকে একসুরে উত্তর আসবে—"ছড়ো নইলে মারুঙ্গা।"—ছড়ি দিয়ে মারবো।

পরের জায়গাটিতে গিয়ে আবার সে হাত মুখ নেড়ে বলবে—"ইতে ইতে পানী", আর উত্তর আসবে আগের মতনই। এমনি বলতে বলতে যখন সেই মাঝের মেয়েটি সুবিধা বুঝবে—একদিকের হাত জোর করে হঠাৎ ছাড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে পালাবে আর সবাই ছুটবে ধরবার

জন্য। যে ধরতে পারবে সে এসে মাঝের জায়গা দখল করবে পরের দানে। এ-খেলার মত আমাদের কোন খেলা? রাজার পুকুর পুকুর?—এই মাছটি কাটবো রাজা এলে বলে দেবো—নয় কি? এছাড়া এদের আরো অনেকরকম মজার খেলাধূলা আছে! কিন্তু ছুটির ঘণ্টা ফুরোলো।

—:o:—

সাত বার

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

সোমবার

অফুরন্ত দম তার
শিক্ষকের ন্যায় আসে ফাষ্ট ঘড়ি ধরি তার
রবির খুনের দায়ে দাও ত্বরা ফাঁসি তার

মঙ্গল

যেন গ্রিপ্ ডম্বল
শক্ত, ব্যাজারে, যেন বদ্‌হজমী অম্বল
ঝাঁটা মেরে দূর কর অশুভ অমঙ্গল

বুধবার

সবই যেন সুদ তার
আসলে নজর নাই সুদে শুধু কারবার
কাবলীর অধম সে যে পায়ে ধরে দেয় ধার

বৃহস্পতি

অমানুষ, মেষ অতি
বিশাল বপুর ভারে অতিকায় মন্দগতি
রবিরে করায় দেরী শনির করায় ক্ষতি

শুক্রবার

পরাকাষ্ঠা উগ্রতার
আপন মেজাজে চলে নাহি মানে কারো অ
চব্বিশ ঘণ্টার আগে তাড়াইতে সাধ্য কার

শনিবার

একদিন গণি আর
স্বস্তির প্রিয়েম্বল্ শান্তির মেসিঞ্জার
শনি যেন পাকা দেখা বিয়ে যেন রবিবার

রবিবার

মধুরতা কবিতার
স্নেহাশীষ ধরিত্রীর উজ্জ্বলতা সবিতার
প্রেমিকতা প্রেমিকের আশীর্ব্বাদ দেবতার

—:o:—



শ্রীসৌমিত্র শঙ্কর দাসগুপ্ত।

দেশ দেখবার সুযোগ হ'লে, হাজার বাধা যদি মাথা তোলে তবু আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কিছুতে ছাড়িনে।

কিছুদিন আগে যদিও ক' জায়গায় ঘুরে এসেছি তবু বন্ধুরা যখন জানালে টাটানগর যাবার কথা—তখন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়িনি।

টাটানগরে যাবার কথা শুনেই মন আমার নেচে উঠেছিল। এমনিত দেশভ্রমণ করলেই আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা হয় কিন্তু বুঝেছিলাম টাটানগরে গেলে শিক্ষা ও আনন্দ দুই পাব।

আমাদের দেশ কলকারখানার ক্ষেত্রে আজও খুব পিছিয়ে আছে তবুও এসিয়ার মধ্যে সব চাইতে বড় কারখানা এই টাটানগরের—জাপানে পর্য্যন্ত টাটার মত কারখানা নেই! পৃথিবীর ছ'টা বড় কারখানার মধ্যে আমাদের টাটার কারখানা স্থান পায়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাত্রে আমরা এক দল বন্ধু মিলে টাটানগরের উদ্দেশ্যে নিজেদের ছেড়ে দিলাম। মনে আমাদের নেমেছিল খুসীর জোয়ার, তাই সারা রাত গাড়ীতে হৈ হৈ ক'রে কাটিয়ে দিলাম। শনিবার ভোরে পৌঁছেই আমাদের কারখানা দেখতে হ'বে—কারণ হাতে বেশী সময় ছিল না—তবু সারারাত আমরা জেগে হৈ হৈ করলাম। ত্রিশজন বন্ধু মিলে চলেছি, মন আনন্দে ভরপুর হ'বে না?

টাটানগরে ভোরে পৌঁছে, চা খেতে না খেতেই যে ভদ্রলোক আমাদের কারখানার ভেতর সব বুঝিয়ে দেখবার ভার নিয়েছিলেন, তিনি এসে গেলেন। আমরাও তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে তাঁর সঙ্গ নিলাম।

প্রায় তিন মাইল ব্যাপী বিরাট কারখানা আমরা সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম। কারখানায় ঢুকতেই পথের দু-দিক দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুকুর মত—আর সেই জলাশয় ছাড়িয়ে একদিকে বিরাট ইস্পাতের কারখানা অন্যদিকে সেই প্রকাণ্ড লোহার কারখানা।

টাটানগরে কারখানার চারদিকে নীল আকাশ দেখবার ভাগ্য কারো হ'বেনা। নানা চিমনি থেকে নানা রঙের ধোঁয়া বেরিয়ে আকাশের স্বাভাবিক রূপকে বদলে দিয়েছে।

ধোঁয়ায় ভরা আকাশই যেন এখন টাটানগরের স্বাভাবিক আকাশ। কোন চিমনি থেকে সাদা ধোঁয়া, কোনটা থেকে কালো ধোঁয়া, কোনটা থেকে হলদে সব বেরিয়ে আকাশের গায়ে জমাট বাঁধে।

সব চেয়ে বড় চিমনি হচ্ছে লোহা তৈরী হয় যেখানে—তারপর হচ্ছে ইস্পাত তৈরীর চিমনি।


লৌহ কারখানার এক পার্শ্ব

লোহা তৈরী করতে দরকার হয় তিনটে জিনিষ—প্রথম Irone ore, তারপর Lime stone আর উত্তাপের জন্যে Coke ; — Iron ore দেখতে বাদামী রঙের—বাদামী রঙের পাথরের—আসে টাটানগর থেকে ৬০।৭০ মাইল দূরের বড় বড় পাহাড় থেকে। সেই বাদামী রঙের পাথর আগুনে গলালে তার অর্দ্ধেকের বেশী ভাগই লোহা হয়ে যায়—যে ore থেকে যত বেশী ভাগ লোহা পাওয়া যায় সেই ore ই তত বেশী কাজের। Lime stone-কে অল্প কথায় বলা যায় চুনের পাথর—এর প্রয়োজন লোহাকে শুদ্ধ করতে। Coke হচ্ছে কয়লার একেবারে পাথরের মত শক্ত সারটুকু,—অল্প কথায় একে বলা যায় পাথুরে কয়লা। নানা রকম উপায় অবলম্বন ক'রে কয়লাকে Coke এ রূপান্তরিত করা হয়, টাটানগর কারখানাতেই।

রাত্রিদিন এই লোহা তৈরীর কাজ চলছে টাটানগর কারখানাতে। হাজার হাজার টন পাথুরে কয়লা তার চূণের পাথর আর লোহার পাথর মিলে গিয়ে পড়ছে সেই অনুপাতের

পর্ব্বত সমান এক চুল্লীতে,—চিমনি দিয়ে বেরোচ্ছে সেই চুল্লীর ধোঁয়া—আর মাঝে মাঝে চুল্লীর মুখ খুলে দেওয়া হচ্ছে—মুখ খোলা হ'লেই সেই মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে আগুণের বন্যা, যেন আগুণের নদী বয়ে যায়। সেই নদীর ধারা গিয়ে পড়ছে হাত পনের উঁচু আর হাত দশেক চওড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব পাত্রে আর কিছুক্ষণ বাদে আগুণের নদীর ধারা, জমে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে লোহা।

এই যে লোহা তৈরীর বিরাট চুল্লী এটার নাম "ব্লাষ্ট ফারনেস্"। সারাদিন রাত্রি এই ফারনেসে কাজ চলছে, কারণ কিছুক্ষণ কাজ এখানে বন্ধ থাকলে নাকি লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে। এখানে একদল কাজ করছে সকাল ছ'টা থেকে বেলা দু'টো আর একদল বেলা দু'টো থেকে রাত্রি দশটা আর একদল রাত্রি দশটা থেকে ভোর ছ'টা।

লোহা গলে' গিয়ে যখন আগুণের নদীর মত বেরোতে থাকে তখন তার ধারের উত্তাপ প্রায় ১৬০০।১৭০০ ডিগ্রী—আর সেইখানে দাঁড়িয়েই সবাই কাজ ক'রে চলেছে! যাঁরা এই প্রচণ্ড উত্তাপে কাজ ক'রে চলেছে তাদের শুধু প্রশংসা করলেই যথেষ্ট হয় না—যাদের এই ভীষণ পরিশ্রমে এত প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী হচ্ছে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমাদের। ছুঁচ থেকে আরম্ভ ক'রে যত সব খুঁটিনাটি জিনিষের বেলায় লোহার যেমন প্রয়োজন, তেমনি বড় বড় যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা তৈরী ক'রে জাতকে বাণিজ্যের পথে এগিয়ে নেবার জন্যে এই লোহার প্রয়োজন। জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে যে লোহার প্রয়োজন তা' একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আধুনিক যুগে লোহাকে ধরা হয় জাতির শক্তি হিসেবে।

এতবড় লোহার কারখানা থেকেও, আজ আমরা যন্ত্রপাতি, কল-কব্জা প্রভৃতির জন্যে বিদেশের দরজায় ছুটে যাই—এদিক দিয়ে যদি আমরা স্বাবলম্বী হ'তে পারি তবেইনা দেশ শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাবে।

লোহা তৈরীর চুল্লীর পরেই আর এক বিরাট চুল্লী ইস্পাতের। তৈরী লোহা থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোহার ভেতরকার গলদ নষ্ট ক'রে ইস্পাত তৈরী হয়। এখানে চুল্লী দিয়ে যেন আগুণের ধোঁয়া বেরোয়। এখানে চুল্লী থেকে পনের হাত দূরে দাঁড়িয়েও মনে হচ্ছিল আগুণের তাপে যেন গা পুড়ে যাচ্ছে অথচ এর সামনে দাঁড়িয়ে সবাই বেশ দিব্যি কাজ ক'রে চলেছে! অবশ্যি সব কিছু সম্ভব হয়েছে অভ্যেসের দ্বারাই। জাতিকে উন্নত করতে হ'লে লেখা-পড়া ছাড়া আরো নানারকম কঠিন কাজের প্রয়োজন আছে বৈকি! কাজকে ভয় করলে কি মানুষ কোনদিন উন্নতি করতে পারে।

টাটানগর কারখানায় বেশীভাগ কাজই বড় বড় machine-এর সাহায্যে হচ্ছে—তবুও এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক কাজ করছে। চারিদিকে আগুণ জ্বলছে নানারকম যন্ত্রপাতির যাওয়া আসা, কেউ মাথার ওপরে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজিয়ে কল চালাচ্ছে, গলা-ইস্পাতের স্তূপ কলকব্জার সাহায্যে এসে আর একটা কলের উপর বসে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল, একটা যন্ত্রের চাপ খেয়ে লম্বা হ'তে সুরু করল—আর তার মাঝে অনভিজ্ঞ আমরা,—বেশ ভয়ই করছিল, মনে হচ্ছিল এই বুঝি একটা কিছু মাথায় ভেঙে পড়ে, দেবে আমাদের সব শেষ ক'রে।

লোহা-ইস্পাত তৈরী হ'বার পর আরো সব নানা জায়গায় নানান উপায়ে সেগুলো থেকে কড়ি, বড়গা, টিন ইত্যাদি নানা রকম জিনিষ তৈরী হচ্ছে। আগুনে তাতানো ইস্পাত যখন নানা রকম কলকব্জার চাপ খেয়ে কলকব্জার ওপর ছুটতে সুরু করে তখন তাকে জীবন্তই মনে হয়।



Water Works-এর এক পার্শ্ব—দূরে দলসা পাহাড়

এ কারখানায় কত রকমের কত বড়, ছোট যন্ত্র কত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে এত বড় রকমের সব কাজ করা হচ্ছে যে আশ্চর্য্য হ'তে হয়—অবাক হয়ে ভাবতে হয় মানুষের দ্বারাও এত বড় বড় ব্যাপারের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে! মানুষেরও যে কত শক্তি কত বুদ্ধি আছে তা এ কারখানা দেখে বুঝতে পারা যায়। কারখানা চোখে না দেখলে এ যে কত বিরাট তা' ধারণায় আনাও শক্ত!

রাত্রে টাটানগরে আকাশের আর এক রূপ দেখলাম। তখন আকাশের চেহারা একেবারে বদলে যায়। মনে হয় কোথাও ভীষণ আগুন লেগেছে আর তার শিখায় ভ'রে আছে সমস্ত আকাশ। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আকাশের গায়েই দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্বলছে। রাস্তায় যদিও ইলেকট্রিক লাইট্ জ্বলে, তবু মনে হয়, এ আলোর যেন কোন প্রয়োজনই ছিলনা ঐ আকাশের আগুণের আলোতেই ত রাস্তা আলোয় ভরে যেত। রাত্রে এই আগুণের মত ধোঁয়া বেরোয় 'ডুপ্লে ফার্নেসের' চিমনি থেকে।

টাটানগরে ক'দিন
শ্রীসৌমিত্র দাসগুপ্ত

রবিবার সকালে আমরা সহর দেখতে বেরোই। প্রথমে গেছিলাম জলসববরাহের কারখানা দেখতে—নদী থেকে জল এনে সেটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুদ্ধ ক'রে সমস্ত সহরে এবং টাটানগরের লোহার কারখানায় জলসরবরাহ করা হয়। জলসরবাহের কারখানার ছবি এখানে দিলাম। টাটানগর নানা কারখানা থাকা সত্বেও সহরের আবহাওয়া ভারি সুন্দর। সহরটি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভব হয়েছে কারখানার মালিকদের চেষ্টায়।

শহরে সব বড় বড় রাস্তা—রাস্তা কোন জায়গায় নীচু থেকে উচুতে উঠেছে—পাহাড় জায়গা বলেই এরকম হয়েছে।

বলেছি টাটানগর জায়গাটি সুন্দর। সহরের চারিদিকে সারি সারি সবুজ পাহাড় দেখে মন যেন আনন্দে পাগল হয়ে উঠতে চায়। একদিকে বিজ্ঞানের কত বড় সার্থক বিকাশ টাটানগর কারখানাই, অন্যদিকে প্রকৃতির চির সুন্দর রূপ প্রকাশ। সমস্ত কিছুতে—একদিকে মানুষের বড় সাধনা, অন্যদিকে ভগবানের সৃষ্ট বড় সৌন্দর্য্যে টাটানগর একটা সত্যিই দেখবার মত স্থান হয়ে থাকবে। সহরের পরিকল্পনাটাও খুব সুন্দর। ফাঁকা ফাঁকা সুন্দর সুন্দর বাড়ী—প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে বাগান, ঝকঝকে রাস্তা সহরের রূপ একেবারে খুলে দিয়েছে। এমন কি গরীব সাঁওতালী দের ছোট ছোট মাটির কুঁড়ে ঘরগুলো এমন সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—যেন ঠিক একেবারে ছবির মত সব দাঁড়িয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে শালবনের ভেতর দিয়ে আমরা পাহাড়ী নদী সুবর্ণরেখা দেখতে গিয়েছিলাম! আমাদের স্রোত-ভরা নদীর যেমন তার একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, তেমনি পাহাড়ী নদীরও একটা শান্ত রূপশ্রী আছে। এ নদী প্রায় সব বালুতে ভর্ত্তি—মাঝে মাঝে হাঁটু সমান জল বয়ে চলেছে—সে জল এত স্বচ্ছ যে রোদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে, আর সব বালুকণা রোদের আলোয় ঝিক্ মিকিয়ে ওঠেছে। মাঝে মাঝে জলের ভেতর বড় বড় পাথর মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথরের দানা নদীর সৌন্দর্য্যকে যেন অনেকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

নদীটা এত সুন্দর যে তার সৌন্দর্য্য আমাদের সবকে টেনে নামিয়েছিল তার বুকে—আমরা তার বুকের উপর আনন্দে ছুটোছুটি করছিলাম। আমরা বালু খুঁড়ে জল বের করছিলাম, কেউ অল্প জলে লাফালাফি করছিলাম, কেউ চীৎকার করছিলাম, কেউ গান করছিলাম। সুন্দর জিনিষ এমনি ক'রেই আমাদের মনকে আনন্দ দেয়!

হাতে ছুটি ছিল না—তাই সোমবারেই ফিরে আসতে হ'ল। তবু বারবার শুধু মনে হচ্ছিল আর কিছুদিন যদি থাকতে পারতাম এখানে, তা হলে কি আনন্দই না হত!



কঙ্কণ ও চন্দনা

শ্রীমতী অনিমা বসু

তার নাম চন্দনা। সাঁওতালের মেয়ে সে, কিন্তু রূপ কথার অচীন রাজকুমারীও বোধ হয় হার মেনে যায় তার রূপে। শুভ্র জ্যোৎস্নার অপরূপ কান্তি ও স্নিগ্ধ শ্বেত চন্দনের বর্ণে তার চন্দনা নাম সার্থক করেছে। চোখে মুখে তার বুদ্ধির দীপ্তি ফুটে উঠেছে।



কাঁসাইয়ের তীরে বিরাট বটগাছটার নীচে বাঁশী বাজায় কঙ্কণ।···

বন জঙ্গল পাহাড় ঝরণা সবার সঙ্গেই চন্দনার পরিচয়, মানুষ সে এদের কোলেই। বনের সব পাখীগুলোকে সে চেনে, তাদের সঙ্গে কথা কয়, গান গায়—তারা চন্দনার মাথায় কাঁধে এসে বসে। হরিণ শিশু চন্দনাকে দেখতে পেলেই ছুটে আসে, তার গায়ে পিঠে মাথা ঘসে আদর জানায়। চন্দনাও কচি কচি ঘাস পাতা আনে, ত্বহাতে গলা জড়িয়ে তার কালো চোখে চুমু দেয়। চন্দনার পিতা নান্‌কু সর্দ্দারের শাসন যা পারে না, চন্দনার এক কথায় তাই হয়। সে যেন সাঁওতাল পল্লীর রাণী।

পল্লীর পাশে কাঁসাই নদী। কাঁসাইয়ের তীরে বিরাট বটগাছটার নীচে বাঁশী বাজায় কঙ্কণ।······কি সুন্দর সে বাজায়! কালো পাহাড়ের কোল বেয়ে ঝরণা যেন তার বাঁশীর সুরে

সুর মিলিয়ে অঝোর ধারে ঝরে পড়ছে। জংলী গাছগুলো তার বাঁশীর সুরে মাথা নামিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। সে কিন্তু আপন মনে বাজিয়ে চলে।

কিশোরকঙ্কণ—সুন্দর স্বাস্থ্য তার। ঘন কালো কোঁকড়ান চুলগুলো তার কাঁধ পর্য্যন্ত ছড়ান। শান্ত কিশোর সে জানে এ জগতে নিজের বলতে তার কেউ নেই। পল্লীর সবচেয়ে শেষ ঘরটিতে সে থাকে। তার প্রতিপালক ভূল্লু সর্দ্দার ছিল অদ্ভুত তীরন্দাজ—কিন্তু কঙ্কন ভূল্লু সর্দ্দারের কোন গুণ পায়নি। কোন উৎসবেই সে একটীও হরিণ কিংবা বরাহ শিকার করে আনতে পারেনি। বেচারা কঙ্কণ তাই সমস্ত পল্লীর ঘৃণার পাত্র।

কঙ্কনের একমাত্র বন্ধু কেবল চন্দনা।...চন্দনা কঙ্কণকে এনে দেয় কত ভাল ভাল ফল, মাংসর পীঠে, আমলকীর আচার আরও কত কি!

সেবার মোল্লু সাঁওতালের ছেলে মনুয়া হরিণ শিকার করতে গিয়ে আর একটু হ'লেই কঙ্কণকে শিকার করে ফেলতো,—ভাগ্যিস তীরটা এসে লাগে কঙ্কণের হাতে। কঙ্কণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করেছে কিন্তু কেউ তার কাছে আসেনি। শুধু চন্দনা—চন্দনা জংলীগাছের শেকড় বেটে অতি যত্নে তার হাতে বেঁধে দিয়েছে, সেবা করেছে। চন্দনা বলেছে,—"জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে থেকে থেকে ওরা জন্তুদের মতোই বুদ্ধি পেয়েছে। সেরে উঠে ঐ মনুয়ার হাত দুটো এমন করে দেবে যাতে ও জীবনে তীর ধরতে না পারে।" কঙ্কণ শুধু হেসেছে।

সাঁওতাল পল্লিতে সারাদিন ধরে উৎসব, যে বেশী বরাহ ও বাঘ শিকার করতে পারবে সে হবে শ্রেষ্ঠ শিকারী। গত দুই উৎসবেই মনুয়া শ্রেষ্ঠ শিকারীর সম্মান পেয়েছে। আর সারাদিন সাঁওতাল কুমারীরা বনফুল সংগ্রহ করে মালা গাঁথবে, যার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মালা হবে, সে হবে উৎসবের রাণী।—চন্দনাই হয় উৎসবের রাণী।

রাত্রিতে সাঁওতাল ছেলেরা বাজাবে মাদল বাঁশী, সাঁওতাল মেয়েরা নাচবে ও গাইবে। গভীর রাত্রে শিকারের মাংস খাওয়ার পর, উৎসবের রাণী ও শ্রেষ্ঠ শিকারীকে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসব ভঙ্গ হবে।

কঙ্কণের হাত ভাল হয়ে গেছে, তবুও আজ উৎসবে সে যোগ দেয়নি। সকাল বেলায় সে বাঁশের বাঁশীটি নিয়ে চলে এসেছে কাঁসাইয়ের তীরে। কিন্তু আজ তার বাঁশী বাজাত ভাল লাগছে না—তার চির প্রফুল্ল মনে যেন কিসের ব্যথা বেজেছে। কঙ্কণ বাজাচ্ছে বিষাদের সুর! তার চোখ বেয়ে জল উপছে পড়ছে তার খেয়াল নেই, সে বাজিয়েই চলেছে।

চন্দনা পেছন থেকে ডাক্‌লো—"কঙ্কণ" ! কঙ্কণ শুনতে পায় নি। চন্দনা ফের ডাকলো, "—কঙ্কণ, কঙ্কণ।" চন্দনা এবার রাগ করে কঙ্কণের গা নাড়া দিয়ে ডাক্‌লো। কঙ্কণ তাকিয়ে দেখে, চন্দনা।

চন্দনা বললো—একি তুমি কাঁদছো কঙ্কণ ?

কঙ্কণ একটু হেসে বললো,—"না চন্দনা। তুমি যে উৎসবে যাওনি চন্দনা ?"

চন্দনা,—"না যাইনি, দেখলুম সবাই উৎসবে যোগ দিয়েছে, কিন্তু তোমাকে দেখতে পেলুম না। তীর-ধনু নিয়ে এসেছি, তুমি তোমার উৎসবের পোষাক নিয়ে এস কঙ্কণ! আমি বলছি আজ নিশ্চয় তুমি শ্রেষ্ঠ শিকারী হতে পারবে।·······যাও কঙ্কণ, আমি ততক্ষণ ফুল তুলে নিই।"

কঙ্কণ একটু হেসে বললো,—"আমি যাবনা ভাই, তোমাদের শিকার উৎসব আমার একটুও ভাল লাগে না। শিকারে ওরা আনন্দ পায়, আমার ভারী কষ্ট হয়। তুমি ফুল নিয়ে যাও চন্দনা, আজও তুমি উৎসবের রাণী হবে।"

চন্দনা রাগ করে বললো,—"বেশ তবে তুমি যেয়োনা, কিন্তু মনে রেখ উৎসবের নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠিন শাস্তি পেতে হয়।"

কঙ্কণ প্রফুল্ল মনে উত্তর দিল—"সে আমি জানি চন্দনা, কিন্তু তুমি যেন আমার পর রাগ করো না"—কঙ্কণ জোরে হেসে উঠলো।

চন্দনা আপন মনে ফুল তুলতে লাগলো! কঙ্কণ বুঝলে চন্দনা ভয়ানক রেগেছে তাই কৌতুক কণ্ঠে বললো—"আমার ওপর রাগ করে তুমি যে গাছগুলোকেই কষ্ট দিচ্ছ চন্দনা, ফুল না তুলে তুমি ওদেরই তুলে ফেলছো।"

চন্দনার ফুল তুলতে ভাল লাগছিল না—কিছুক্ষণ নিজের রাগ প্রকাশ করবার জন্যে কয়েকটা গাছ উপড়ে পাতা ছিঁড়ে বিরক্তির শব্দ করতে লাগলো। কঙ্কণ হেসে ফেললো, তারপর বললো—"গেলে না যে চন্দনা শিগ্‌গীর যাও, তুমি না গেলে যে উৎসব মাটী হবে!"

চন্দনা জোরে ঘাড় নেড়ে বললে—"না ভাই, আমি যাবনা, আমি তোমার কাছে বসে বাঁশী বাজান শিখবো······তুমি আমায় যেতে বলোনা, কঙ্কণ।

সূর্য্যদেব পাটে বসতে চলেছেন। নীল আকাশের বুকে রঙের ছোপ পড়েছে, লাল আভা পড়েছে গাছগুলোর মাথায়। একরাশ সোনালী কিরণ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

কঙ্কণ ও চন্দনা

শ্রীমতী অনিমা বসু

কঙ্কণ এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল সূর্য্যদেবের বিদায় দৃশ্য।

চন্দনা বললে—"কঙ্কণ, বাড়ী যাবে না? ঐ শোন, উৎসবের বাজনা বেজে উঠেছে, আর তো দেরী করা চলেনা ভাই।

পল্লীতে মাদল বাঁশী মহা উল্লাসে বেজে চলেছে। সাঁওতালি মেয়েদের নূপুরের রুণ্‌ঝুণ্‌ বেশ শোনা যাচ্ছে।

কঙ্কণ হেসে উত্তর দিলে—"কি সুন্দর চন্দনা, এই আলোর খেলা! এর চেয়ে কি ঐ উৎসব ভাল। তুমি যাও চন্দনা। আমি বাঁশী বাজাই।

চন্দনা বললে—"সত্যি, আমার তো না গিয়ে চলবে না কঙ্কণ, এখনি সবাই খুঁজবে। আমি যাই ভাই।" চন্দনা চলে গেল।

সেদিন ভজুয়ার বোন লখিয়ার মালাটী সবচেয়ে ভাল হয়েছিল সে। কিন্তু শিকার বিজয়ী মনুয়া ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে চন্দনার এটা ইচ্ছাকৃত। একটু ক্ষুন্নও হয়েছিল সে। উৎসবমগ্ন কোন পল্লীবাসীই বুঝতে পারেনি কঙ্কণের অনুপস্থিতি, কেবল সর্দ্দার লক্ষ্য করেছিলেন।

উৎসব শেষে সর্দ্দার প্রস্তাব করলেন, আগামী উৎসবে মনুয়ার সঙ্গে চন্দনার বিয়ে হবে এবং ভবিষ্যৎ সর্দ্দারের পদ মনুয়া পাবে। সকলেই সর্দ্দারের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করলো ও সম্মতি দিল। রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে সর্দ্দার চন্দনাকে বললে—"তুমি আজ সমস্তদিন উৎসবে আসনি। জান, এ অপরাধের ক্ষমা নেই? শুধু আমার মেয়ে বলে আজ রক্ষা পেয়েছ। যাক্‌, তুমি আজ উৎসব শেষে আমার কথা শুনেছ। আগামী উৎসবে মনুয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। তোমার কি অভিমত আমাকে পাঁচ দিনের মধ্যে জানাবে।—আর কঙ্কণ, আজ তোমাকে কঙ্কণের সব কথা জানাব।



বাড়ী ফিরে এসে সর্দ্দার চন্দনাকে বললে—

—কঙ্কণ বিলাস নগরের রাজার ছেলে। বিলাস নগরের রাজার সঙ্গে আমাদের বিগত সর্দ্দারের শত্রুতা ছিল। রাজার লোকেরা সর্দ্দারের ছেলেকে খুন করে কাঁসাইয়ের জলে ভাসিয়ে

দিয়েছিল। সর্দ্দার তাই প্রতিশোধ নেবার জন্যে দুবৎসরের রাজপুত্র কঙ্কণকে চুরি করে নিয়ে আসে। কিন্তু ঐটুকু শিশুকে মেরে ফেলতে তার বেজেছিল। সর্দ্দার নিজের ছেলের মতই কঙ্কণকে মানুষ করে। সর্দ্দারের কি ইচ্ছে ছিল জানি না, তবে আমরা স্থির করেছি সমস্ত কথা প্রকাশ করে কঙ্কণকে বৃদ্ধ রাজার কাছে পাঠিয়ে দেব।

চন্দনা পিতার সমস্ত কথা শুনলে,—এক ফোঁটা অশ্রু তার গাল বেয়ে ঝরে পড়লো। তখনও দূর থেকে বাঁশীর একটা ক্ষীণ সুর ভেসে আসছিল হাওয়ার বুকে।

বিলাস নগরের রাজমন্ত্রী এসেছেন কঙ্কণকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কঙ্কণ শুনেছে তার ইতিহাস, শুনেছে তাকে ফিরে যেতে হবে তার পিতার রাজধানীতে। দলে দলে সাঁওতালি ছেলেমেয়েরা তাকে জানাতে এসেছে অভিনন্দন। কিন্তু কঙ্কণের একটুও আনন্দ নেই; সে বুঝি তার প্রকৃত পরিচয় না জানলেই সুখী হতো। এই সাঁওতাল পল্লী, এই পাহাড়পর্ব্বত বনজঙ্গল এযে তার কৈশরের স্বপ্ন। রা ?প্রাসাদ সে তো চায় না! কিন্তু তাকে যেতেই হবে। সে বিদায় নিলে সমস্ত পল্লীবাসীদের কাছে, বিদায় নিলে সেই বনজঙ্গল ও তার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটির কাছে। সর্ব্বশেষে চন্দনার কাছে।

চন্দনা বললে—"রাজধানিতে গিয়ে আমাদের ভূলে যাবে না তো কঙ্কণ ভাই?" কঙ্কণ বললে—"তাও কি সম্ভব চন্দনা? এই পল্লীই যে আমার কৈশরের মায়াপুরী ভাই—তোমরা যে আমার কৈশরের সাথী, তোমাদের কি করে ভুলে যাব?" একটু থেমে চন্দনা বললে—"তোমার বাঁশীটি আমায় দিয়ে যাবে ভাই, ঐ বনবীথি যেখানে বসে তুমি বাঁশী বাজাতে, সেখানে বসে আমিও বাজাবো।" কঙ্কণ বললে—"দেব ভাই, তোমার বিয়ের দিন নিজে এসে আমার বাঁশীটি তোমাকে দিয়ে যাব।"



প্রবাসী

বিষাক্ত গ্যাস ভয়

শ্রীবিধুনারায়ণ সেন

কিছুদিন যাবত যুদ্ধের ভয় আমাদের ভারতবর্ষেও বেশ প্রচার লাভ করিতেছে। আজকাল ঘরে ঘরে আগামী যুদ্ধ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা শুনিতে পাওয়া যায়। এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বেশী, কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপও যে সমান ভয়াবহ তাহা এখানকার লোকেরা পরিচিত নয়। অন্যান্য স্বাধীন দেশ কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতেছে, কয়েকটি সংবাদ হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ফরাসী গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের হিতের জন্য গ্যাসপ্রতিরোধী মুখোস ব্যবহারের এক সহজ উপায় স্থির করিয়াছেন। অর্থাৎ কেহ যদি গ্যাস-মুখোস ক্রয় করেন তবে পাঁচ বৎসরের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিলেই হইবে। নিত্য নূতন আবিস্কারের দেশ জার্ম্মাণী ইতিমধ্যেই একপ্রকার নূতন-রকম মুখোস বাহির করিয়াছে—জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য—এবং লক্ষ লক্ষ তৈরী করিতেছে। গ্রেট বৃটেন ইতিমধ্যে এককোটীরও বেশী মুখোস তৈরী করিয়াছে এবং দৈনিক গড়পরতা একলক্ষ মুখোস তৈরী হইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে আগামী যুদ্ধে বিষাক্ত-গ্যাস যে খুব বেশীরকম ব্যবহৃত হইবে সেই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তখনকার অবস্থা যে কিরূপ ভয়াবহ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এক একটি বড়বড় সহর যাহার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস হয়তো মুহূর্ত্তের মধ্যে নীরব হইয়া যাইবে।

লেঃ কর্ণেল এ, প্রেন্টিস্ একখানা পুস্তকে লিখিয়াছেন যে বাস্তবিক পক্ষে আগামী যুদ্ধে বিষাক্ত-গ্যাস সম্বন্ধে এরূপ ভয়াবহ চিত্র অঙ্কণের কোনই কারণ নাই।

আমরা প্রায় শুনিতে পাই যে একপ্রকার "অতিগ্যাসের" কয়েক শত পাউণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহা কলিকাতার ন্যায় একটি সহরের সমস্ত জনসংখ্যাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে! কোন কোন দেশ নাকি এই গ্যাসটি আবিষ্কার করিয়াছে ও আগামী যুদ্ধের জন্য অতি

সংগোপনে রক্ষা করিতেছে। সমর-বিশারদ রাসায়ণিকগণ এরূপ একটি গ্যাসের কথা জানিতে পারিলে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা উত্তেজিত মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত ছাড়া আর কি? মহাযুদ্ধের ব্যবহৃত গ্যাস অপেক্ষা আরো বিষাক্ত গ্যাস আছে কিনা আমাদের জানা নাই, এমন কি গণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণও এরূপ বিষাক্ত "অতিগ্যাসের" অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। অদূর ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াও আশা করেননা। কারণ রাসায়ণিকগণ নূতন যুদ্ধগ্যাস আবিস্কারের জন্য প্রায় তিন হাজার রাসায়ণিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া মাত্র ৩৮টি গ্যাস আবিস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ৩৮টির মধ্যে মাত্র কয়েকটি কার্য্যকরি হইয়াছে দেখা গেল। মারাত্মক যুদ্ধগ্যাসের অভাব এত বেশী কেন সে সম্বন্ধে একটি সহজ যুক্তি আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃত ফল পাইতে হইলে একটি গ্যাসের আরও বিষাক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি যে হাইড্রোসায়াণিক এসিড গ্যাস একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিষ। ইহা একবার ঘ্রাণেই মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বায়ু অপেক্ষা লঘুতর হওয়াতে—ইহা যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্যোপযোগী হওয়ার জন্য গ্যাসসমূহ বায়ু অপেক্ষা ভারী হওয়া দরকার; ইহা যাহাতে সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং প্রস্তুত করিবার জন্য কাঁচামাল সহজ প্রাপ্য এবং এরূপ হওয়া দরকার যে সঞ্চয় করিয়া রাখিলে নষ্ট হইবে না, এবং গ্যাসটি যদি যথার্থই গ্যাস হয় তবে পরিমিত চাপে তরল করিয়া ইহাকে সহজেই বোমা এবং গোলাতে ভর্ত্তি করান যাইবে। উহা পরে সাধারণ তাপে বাস্পান্তরিত হইবে।

রাসায়ণিকগণ অতি গ্যাস আবিস্কারে অসন্তুষ্ট হইলেও যন্ত্রবিদগণ এমন সব উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন যে, যেকয়টি জানা বিষাক্ত গ্যাস আছে তাহাই ভয়াবহরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে এরোপ্লেন হইতে গ্যাস নিক্ষেপ একটি প্রধান আতঙ্কের কারণ হইয়াছে। পূর্ব্বে গ্যাস নিক্ষেপের জন্য কোন যুদ্ধে এরোপ্লেন ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু আজকাল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এরোপ্লেন দুই রকম ভাবেই ব্যবহৃত হয়। বোমা নিক্ষেপ উপযুক্ত ফলপ্রদ নয় কারণ ইহা মাত্র অল্প স্থান ব্যাপিয়া কার্য্য করে। কিন্তু এরূপ বোমা নিক্ষেপকারী এরোপ্লেনের পাখার নীচে আজকাল ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি তরল বিষাক্ত গ্যাস থাকে; এবং এরোপ্লেনটী ধীরে ধীরে উড়িতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে ফোয়ারার ন্যায় এই তরল গ্যাসটি নিক্ষিপ্ত হয়। পরে এই তরল পদার্থই গ্যাসে পরিণত হইয়া কুয়াসার আকারে মাটীতে অবতরণ করিয়া ধ্বংসের পথ সৃষ্টি করে। বিগত আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইতালীয়গণ উভয় প্রকার উপায়ই অবলম্বন করিয়া-

ছিল। এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তরল গ্যাসও ফোয়ারার ন্যায় ছড়াইয়া দেওয়া হইত এবং ইহা কিরূপ মারাত্মক সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন।

কিন্তু গ্যাস নিক্ষেপ একটি প্রথম শ্রেণীর সৈন্যদলের উপর কতটা ফলপ্রদ হইবে তাহাই বিচার্য্য। কারণ তাহারা গ্যাসমুখোস পরিধান করিয়া এরূপ বিষাক্ত প্রক্রিয়াকে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবে।

অন্যদিকে এরূপ গ্যাস নিক্ষেপ যদি কলিকাতা, লণ্ডন অথবা নিউইয়র্কের লক্ষ লক্ষ জন-সাধারণের উপর প্রয়োগ করা যায় তবে তাহার ফল যে কি হইবে তাহা অনুমানের বিষয়। বস্তুতঃ কোন কোন দেশ প্রকৃত যুদ্ধ না করিয়াই নিরীহ নগরবাসীদের উপর এরোপ্লেন হইতে গ্যাস নিক্ষেপের ফলাফল আতঙ্কপূর্ণ অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া ভয় দেখাইয়াই কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। বড় বড় সহরের উপর গ্যাস কেন নিক্ষেপ করা হয়না—সে সম্বন্ধে চমৎকার সামরিক যুক্তি আছে। ইহা কেবলমাত্র নিরীহ নগরবাসীদের উপর দয়া নহে। তরল গ্যাস নিক্ষেপের জন্য এরোপ্লেনের তিনশত ফুটের মধ্যে বিচরণ করা আবশ্যক, কারণ তাহার উপরে উঠিলে তরল গ্যাস নিক্ষেপের উদ্দেশ্য অনেকটা বিফল হয়। কাজেই তিনশত ফুটের মধ্যে অবস্থান বড় বড় সহরের উচ্চ বাসগৃহের মধ্যে নিরাপদ নহে। অবশ্য উপর হইতে গ্যাস-বোমা নিক্ষেপ করা যাইতে পারে কিন্তু অর্দ্ধেকেরও উপর তাহা ছাদের উপর পড়িয়া বিশেষ ক্ষতি করেনা। অনেকে জানেন না বিষাক্ত গ্যাসের মারাত্মকতা বাতাসে গ্যাসের পরি-মাণের উপর নির্ভর করে সুতরাং একই গ্যাস বিভিন্ন অবস্থায় বিপজ্জনক এবং নির্দ্দোষ দুইই হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কার্ব্বন মনক্সাইড বিষাক্ত হয় কেবল বদ্ধ হাওয়ায়, উন্মুক্ত স্থানে নহে। এইপ্রকার অনেক গ্যাসই জানা আছে।

সরিষা গন্ধযুক্ত গ্যাস অথবা নূতনতর জিরানিয়াম গন্ধযুক্ত লিউইসাইট্ বোমারূপে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, সেজন্য যুদ্ধ ব্যাপারে ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর। সাধারণতঃ এই গ্যাসটী তাদৃশ মারাত্মক নহে। রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হইলে জনসাধারণ—রাস্তা হইতে দুই অথবা তিনতলা উচ্চ অট্টালিকায় গবাক্ষ বন্ধ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। আক্রান্ত হওয়া মাত্রই মুখোস পরিচ্ছদে সজ্জিত সৈন্যদল গ্যাসপূর্ণ স্থানটী অবরুদ্ধ করিয়া জন-সাধারণের চলাচল বন্ধ করিয়া দেয় এবং উক্ত গ্যাসটী ময়লা জলের পাইপের ভিতর চালাইয়া দিয়া কিংবা ক্লোরাইড অফ লাইম ছড়াইয়া বিষাক্ত প্রক্রিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

এরোপ্লেন হইতে গ্যাস নিক্ষেপের সম্ভাবনাই জনসাধারণকে সহজেই ভীতিগ্রস্ত করিয়া তোলে। এই অভিপ্রায়ে সমরবিদগণ অল্প ক্ষতিকর হাঁচি ও কান্না গ্যাস ব্যবহার করিবেন কারণ তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণেই কার্যোদ্ধার করে!

অন্যান্যদেশে রণসজ্জা নগরবাসীদের মন হইতে এই আক্রমণভয়কে বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে। ফাঁকা গ্যাস আক্রমণ, গ্যাস-রোধক বাসগৃহ নির্ম্মাণ মুখোস বিতরণ ইত্যাদি সাধারণ নগরবাসীদের অনুপ্রাণিত করিতেছে। এমন কি গ্রেট বৃটেনে "গ্যাস স্কুল" খোলা হইয়াছে এবং প্রদর্শনীতে সবরকম সাবধানতা অবলম্বনের উপায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে। গ্যাস-আক্রমণের সময় সমস্ত পরিবারের আশ্রয়ের জন্য একটী গ্যাস প্রতিরোধের ঘর থাকা আবশ্যক এবং যদি সেই ঘরটী বোমানিক্ষেপে অথবা অন্যকারণে গ্যাস-প্রতিরোধক না থাকে তবে তো গ্যাস-মুখোস আছেই।

ফলকথা, ঘরে বাস করিয়া এরোপ্লেন হইতে গ্যাস নিক্ষেপের ভয় করার কোনও প্রয়োজন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার।

শত্রুসৈন্যদের উপর সর্ব্বপ্রকার সুপরিচিত গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া বোমারুগণ সামরিক কূটনীতি ইত্যাদি সুচারুরূপে জানিতে পারেন। আর শত্রুসৈন্যেরাও ট্রেণে না গিয়া মোটর-যোগে সম্মুখে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে। একই স্থানে থাকা নিরাপদ নহে কারণ কোন একটি বিশেষ বিশেষ স্থানেই বোমারুগণ বোমা নিক্ষেপ করে। কখনও কখনও এরূপও ঘটে যে বোমারুগণ মোটর ইত্যাদির উপরেও ফোয়ারার ন্যায় গ্যাস নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং তাহাতে জনসাধারণ এতদূর বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে যে তাহারা পলায়ন করিবে অথবা মোটরেই আশ্রয় গ্রহণ করিবে কিনা তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেনা।

অন্যান্য নূতন নূতন গ্যাসেও শত্রুসৈন্যদের বিধ্বস্ত করা হয়। বোমারুগণ রাসায়ণিক land mineএর উপর বোমা নিক্ষেপ করে, ফলে ট্যাঙ্ক হইতে তরল বিষ ছড়াইয়া পড়ে ও অগ্রসর হইবার বাধা সৃষ্টি করে। নবতম আবিস্কার "কমপ্রেস্‌ড গ্যাস সিলিণ্ডার"—গুলিদ্বারা বায়ুবাহী বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া হয়। এবং তাহার পনর কুড়ি সেকেণ্ড আগে ইহা এরূপ প্রচণ্ড আওয়াজ করিতে থাকে যে ইহার শব্দেই সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হয়।

ইহাই অনেকের মতে গ্যাস নিক্ষেপ করিবার আধুনিকতম উপায়। কিন্তু ইহা কি ভীতিজনক? প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীন অথবা ছররা বোমাদ্বারা মানুষকে বিধ্বস্ত অথবা নিহত করার মধ্যে দয়াজনক যে কিছুই নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে রাসায়নিকদের মতে গ্যাসদ্বারা মৃত্যু নাকি অনেক শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর কারণ ইহা মানুষকে ছিন্ন ভিন্ন করেনা।

অনেকের মতে গ্যাস স্থায়ী ক্ষতি করেনা। অনেকের মতে আবার, গ্যাসের ধোঁয়ায় মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন গ্যাস-আক্রান্ত লোকের মধ্যে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা অতি সামান্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়াছে যে শতকরা মাত্র দুইজন গ্যাস নিক্ষেপ দ্বারা নিহত হইয়াছে এবং সেই স্থলে শতকরা পঁচিশ জনের অন্যভাবে মৃত্যু হইয়াছে। এককথায় গ্যাস আক্রান্ত লোকের জীবনের আশা অন্যভাবে আহত লোকের জীবনের আশা অপেক্ষা বারগুণ বেশী।

গ্যাসনিক্ষেপ যতই বিপজ্জনক হউক না কেন লেখকগণ ইহার ভয়াবহতা সম্বন্ধে অনেক বাড়াইয়া বলেন অর্থাৎ তাঁহারা তিলকে তাল করিয়া ফেলেন, অপর পক্ষে সমরনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার ভয়াবহতা সম্বন্ধে সমধিক নিশ্চিন্ত আছেন

এখন বলা যাইতে পারে যে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি গ্যাস আক্রমণ খুবই বাড়িয়া যায় তবে ইহার ভীতিও বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

মাতৃ-হৃদয়

শ্রীবিনয় ব্যানার্জ্জি এম, এ

(১)

দখিন বাতাসে সবেগে আজিকে
দুলিছে কাঁটার বন,
গাঢ় সবুজের রঙ লেগে তার
মুগ্ধ নয়ন মন
মায়ের হৃদয় সদাই হ'তেছে
অস্থির সচেতন,
ছেলে ক'টী তাঁর ভাল হ'বে না কি—
সেই ধ্যানে নি.গন

(২)

তুষার-শীতল ঝরণার জল
ঝর ঝর ব'য়ে যায়,
'সিঙ্গন্' সহর ঘিরে ঘিরে ওঠে
কল্লোল-ধ্বনি তায়;
ছেলে ক'টী তাঁর মানুষ হ'বে কি ?
ভাবনা এই সারাখন,
দখিন বাতাস করিছে উতলা
আজিকে ঝাউএর বন।

(৩)

রাঙা-পালকেতে দেহ ঢাকি কত
সুন্দর পাখী গায়,
মধুর কণ্ঠে নিয়ে যায় স্মৃতি
অতীতে ও অজানায়,
কী আনন্দে আজ গানে দোলে হেলে'
ঘন বেতসের বন !
কীর্ত্তি-কিরীটে এল' কি রে সেজে'
মায়ের হৃদয়-ধন !

(৪)

'কিয়াঙের' তীরে সূর্য্য উদয়
সারা দেশ আলোময়,
পথে চলে যত নরনারী সব
গাহে 'বুদ্ধের জয়'
জননী তা'দের আজিকে পূজায়
চাহে নাকো ধনজন,
ছেলেদের যশে পূরাবে সে শুধু
রিক্ত জীবন-মন ॥

George Borrow কর্ত্তৃক চৈনিক-কবিতার ভাবানুবাদ



উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ
লিখিত

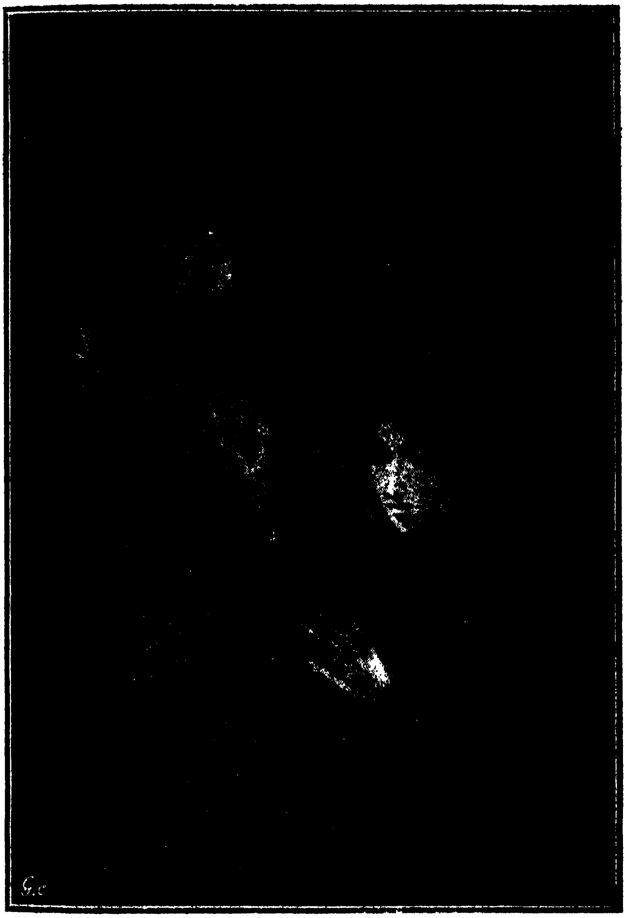
শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চিত্রিত

১১

রঙিলা তার কাহিনী স্নুরু করলে ঃ "কালীভূষণ, ক্ষিতিভূষণ, বোম্বেটেরা, শোনো তোমরা দুঃখিনী রঙিলার কাহিনী। রঙিলা আমার বাপমার দেওয়া নাম নয়, হিন্দুস্থানও আমার দেশ নয়। নাজিরা আমার নাম আর দেশ আমার—দেশ আমার কোথায়! যেখানে সূর্য্যের চেয়ে বড় দেবতা কেউ নেই ; যেখানে মরা রাজারা পিরামিডের পাথরকোঠায় বাদ্‌শাহী ঠাটে সোনার পালঙ্কে শুয়ে থাকেন ; যেখানে সকালে সন্ধ্যায় পড়ন্ত রোদে পিরামিডের ছায়ায় ছায়ায় সারবেঁধে চলে উটের দল ; যেখানে যেদিকে চাও দিক হতে দিগন্তে থই থই বালুর ঢেউ ; যেখানে মরুভূমিতে, চাঁদের বুকে কলঙ্কের মত, খর্জ্জুর বন আর শীতল দীঘি ; যেখানে ক্লান্ত পথিকের চোখে আগুন-রোদে ফুটে ওঠে মায়া মরীচিকা ; যেখানে তপ্ত বালুর গা'টি ঘেঁষে' নীল আকাশ আর পাখীর ছায়া বুকে ধরে, কলকল বয়ে যায় নীল নদীটি ; যেখানে মরুভূমিতে ফুঁসে ওঠে বালুঝড় আর বর্ষায় অজগরের ফণা তুলে ক্ষেপে যায় নীল নদী ; যেখানে আমার জন্ম, যেখানে আমার স্বর্গ—সেই মিশর আমার দেশ।

একদিন বাপমা ঘরবাড়ী হারিয়ে পাঁচবছরের ছোট ভাইটির হাত ধরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছি। শীতের রাত। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া সূচের মত আমার আঙরাখা ফুঁড়ে গায়ে বিঁধছে। কাঁদছি, ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি আমি। রাজপথে ব্যস্ত পথিকের দল এদিকে

সেদিকে ছুটে চলেছে। দশবছরের অনাথাকে একটিবার থেমে দুটো কথা শুধোয় সে সময় কারো নেই। তখন কাঁদতে কাঁদতে ভাইটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে পথের ধুলোয় শুয়ে পড়েছি আমি, চোখে নেমেছে ঘুম। স্বপ্নে শুনলাম কে যেন অনেকদূর থেকে আমায় ডেকে বলছে, 'নাজিরা, এসো'। তোমাকে দিয়ে বড় দরকার আমার।' তখনই আমার ঘুম ভেঙে গেল। এদিকে তাকাই, সে দিকে তাকাই, কে ডাকে আমায়! আমি উঠতে যাচ্ছি, তখন আমার ছোট ভাইটি ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠে আমার ওড়ণার আঁচল মুঠো করে চেপে ধরে বললে, 'দিদি, যাস্ কোথায়? ওরা আমায় নিয়ে যায় যে'! আমি বলে উঠলাম, 'ষাট্! কে তোকে নিয়ে যায় খোকন!' বলতেই কাদের যেন সাড়া পেলাম, কাদের ছায়া যেন পিছন থেকে আমার সামনে এসে রাজপথের আলো অন্ধকার করে দিলে।



রঙিলা তার কাহিনী সুরু করলে

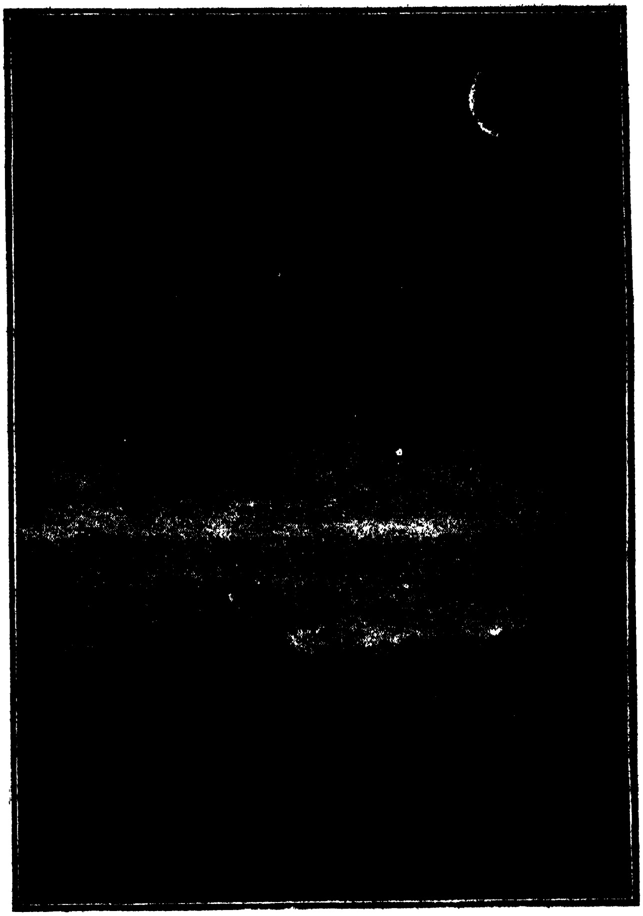
নিশুতি রাতের তিনটে কালো স্বপ্নের মত তিনটে মূর্ত্তি, যেন ছায়া, আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ভাইটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে কেঁপে বললাম, 'কে তোমরা?' আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে একজন শুধোলে, 'তোমার নাম,—নাজিরা কি তোমার নাম?' আমি মাথা নেড়ে বললাম 'হ্যাঁ।' সেই তিনটি ছায়ামূর্ত্তি একবার এ ওর পানে তাকাল। তারপর গম্ভীর স্বরে তিনজন বললে, 'মহর্ষি পিঙ্গলের জয় হোক। আমাদের এতদূর আসা সার্থক হয়েছে।' মালী যেমন ফুল তোলে তেমনি আলগোছে আমাকে পথের ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে

তারা পথের একটা আলোর কাছে গেল। তখন একজন আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আমার কপালে কী যেন রহস্য খুঁজে ফিরতে থাকল। দেখতে দেখতে তার চোখে বিস্ময় আনন্দ জ্বলে উঠল। আকুল কণ্ঠে ফিস্‌ফাস্ করে' সে বললে, 'ঢ্যাখো, এই সেই অমর-লতার চিহ্ন। চলো, একে নিয়ে ফিরে যাই মহর্ষির কাছে। এতদিনে বুঝি আমাদের ছুটি হল।' একজন আমার কোল থেকে আমার পাঁচবছরের অবুঝ ভাইটিকে কেড়ে নিলে। ভয়ে 'দিদি' বলে ভাইটি আমার কেঁদে দিলে। আমি পাগলের মত হয়ে বললাম, 'তোমরা ওকে কেন কেড়ে নিচ্ছ?' 'ভয় কি' বলে একটু হেসে সে একটা রেশমী রুমাল ভাইটির মুখের উপর বিছিয়ে দিলে। ভাইটি আমার চোখের পলকে যেন ঘুমিয়ে পড়ল, আর দিদি বলে কাঁদলনা! আমাকে অবাক হতে দেখে তারা হেসে দিলে—তারপর আর একখানা রেশমী রুমাল আমার মুখের উপর দুলে উঠল।

আমার মুখে কথা সরল না। একখানা নরম মিষ্টি মেঘের মত সেই রুমাল চারিদিক গন্ধে ভরে আমার চোখের সামনে সব মুছে দিয়ে যেন একখানা সবুজ ছায়া মেলে ধরলে। তারপর, আমি যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সে কী ঘুম! স্বপ্নেভরা, রহস্যভরা ঘুম। সে যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জেগে থাকা, ঘুমঘোরে পৃথিবীর সকল ঘটনা স্বপ্নের পর্দ্দায় ছবির মত দেখা। আমার চোখের পাতা খুললনা। শরীরে সাড়া এলোনা, পুতুলের মত আমি গভীর চুপ—তবুও কিছুই যেন আমার দেখতে শুনতে বাকী থাকলনা। দেখলাম, উটের সমান উঁচু তিনটে সাদা ঘোড়ায় চেপে বসল তারা। তাদের একজনের কোলে আমি যেন শুয়ে আছি। 'মহর্ষির জয় হোক' বলে তিনজন হাসিমুখে ঘোড়া ছেড়ে দিলে। ঘোড়া ছুটে চলল। তাদের খুরে বুঝি বালুকণা বিঁধলোনা—মরুভূমির থইথই বালুতে ঝড় তুলে তুরন্ত-তুফানের মত তারা ছুটে চলল। মাথার উপর আঁধার রাতের কালো আকাশে চাঁদনী রাতের হাসি ফুটল, আঁধার রাতের তারাভরা ঝলমলে আকাশ জোছ্‌না রাতের তারা নেবানো আলোয় ছেয়ে গেল; এলো ঊষা, এলো গোধূলি আর তাদের মাঝে বসে দুপুরের জ্বলন্ত আকাশ ছড়িয়ে দিলে আগুন ধূলি; সকালের রঙীন মেঘ দুপুররোদে লুকিয়ে পথ চলে' গোধূলির আকাশে খেলতে এলো, খেলাশেষে সন্ধ্যার কালো নদীতে ঝাঁপ দিলে; দূরে দূরে উটের ছায়া ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, মরু-পথিকদের একটানা মিছিল বারবার দেখা দিয়ে বারবার আড়াল হল; হাওয়া দিলে, ঝড় এলো, তুফান বইল, কতদূরে কান্না হায়হায় করে চুপ হল—তবু তারা ছুটে চলল। তারা মানুষ নয়, তারা যেন পৃথিবীর নয়, তারা যেন রহস্যদেশের গুহা থেকে উঠে আসা প্রাণী। কে জানে,

হয়তো তারা প্রাণীও নয়, শুধুই তিনটে আশ্চর্য্য ছায়া। তাদের মুখে কথা নেই, ভয় নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, অবসাদ নেই—কতদিন কতরাত তারা ঘোড়ার পিঠে একঠায় বসে চলেছে। শুধু আলোয় অন্ধকারে তাদের তিনজোড়া চোখ তিনজোড়া কালো আর্সির মত—ঝক্‌ঝক্ করেছে। আলো যেমন দেশহতে দেশে দিকহতে দিগন্তে নিঃশব্দে ছুটে চলে, তেমনি তারা আকাশের তলা দিয়ে এক মরুভূমি থেকে আর এক মরুভূমিতে দিগন্তের কবাট খুলে খুলে যেন চলেছে। আশ্চর্য্য অদ্ভুত অপরূপ তাদের ছুটে চলা, পৃথিবীর আর সব চলা যেন বারবার পিছনে পড়ে যায়। সকাল সন্ধ্যা যেন কাছে এসে ধরা দেয়না তাদের। আলো আঁধারকে পিছনে ফেলে তারাই যেন সকাল সন্ধ্যাকে বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। শেষে, একদিন পিরামিডের ছায়া মিলালো ; নীল নদী অনেকদূরে সাপের মত খানিকটা দেখা গিয়ে মিলালো ; মিলালো গরম হাওয়া, ধূলোর ঝড় ; ফুরোলো পায়ের তলার অফুরন্ত মরুভূমি, এলো ঘাসে ছাওয়া মাঠ, এলো সমুদ্র। তারপর, সেই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জেগে থাকা ঘুমে আমি দেখলাম—মহাসমুদ্র ফুলে উঠেছে, জাহাজ পাল তুলেছে ; দেখলাম—মহানদীর খরস্রোত তলোয়ারের মত হানচে, ময়ুরপঙ্খীর সাতরঙা পালে তুফান লেগেছে ; দেখলাম—ধূধূ মাঠ, গহন বন, মাঠ পেরিয়ে বনচিরে ছুটেছে ঘোড়া ; দেখলাম মাঠের শেষে বনের শেষে কালো পাহাড়, তার মাথায় আষাঢ় মেঘের নীল ঝুটি। সেই নীল-ঝুটি পাহাড়ে যেন উঠলাম।



আকাশের তলা দিয়ে এক মরুভূমি থেকে আর এক মরুভূমিতে ছুটে চলেছে তারা

তারপর—তারপর আমি যেন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি যেন শুনলাম—মিশরদেশে রাজপথে অনেকদিন আগে স্বপ্নে যে ডাক শুনেছিলাম তা' যেন আবার শুনলাম, আরও স্পষ্ট আরও মধুর, শুনলাম, 'নাজিরা এসো। তোমাকে দিয়ে আমার বড় দরকার।' স্বপ্নঘোরে শুধোলাম, 'কে? কে তুমি?' ঘুমভাঙতে চারিদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে শুধোলাম, 'আমি কোথায়? আমার ভাই কোথায়?'

হঠাৎ আমার চোখের সামনে যেন খানিকটা রূপোলী আলো জ্বলে' জ্বলে' গলে গেল। চোখ মুছে তাকাতে গিয়ে—আমার যেন কিছুই বিশ্বাস হলনা।

দেখলাম, বিশাল ঘর। আকাশের মত উঁচু খিলান-ছাত। ঘরের একদিক থেকে আর একদিক ঠাহর হয়না। ঘরের একটা দিক রাতের মত অন্ধকার। আর একটা দিকে কোথা থেকে সকালের সোনালী রোদ এসে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে সেই সোনালী রোদকে ম্লান করে এক আশ্চর্য্য পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন দেখলাম। এরকম মনোহর রূপ জীবনে আমি আর দেখিনি।

আমি ক্ষীণস্বরে বললাম, 'কে তুমি?'

রাতের শেষে অন্ধকারে যেমন উষার কনক রেখা ফুটে ওঠে, তেমনি সেই আশ্চর্য্য পুরুষের গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাসি ফুটল। একখানা হাত আমার মাথায় রেখে তিনি বললেন, 'আমি মহর্ষি পিঙ্গল। অনেক দূরে মিসরে আমিই তোমায় স্বপ্নে ডেকেছিলাম। তুমি এখন হিন্দুস্থানে।' আমাকে অবাক হতে দেখে মহর্ষি বললেন, 'জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। তোমার জীবনেও এটা একটা আশ্চর্য্য ঘটনা—রাতের স্বপ্ন কিম্বা চোখের ভুল নয়। ভাখো—ঐযে দূরে আকাশ দেখচ, মিশরের আকাশ নয়। আর ঐ যে মহাসমুদ্র দেখা যাচ্ছে, তাও মিশরদেশের সমুদ্র নয়। তুমি এখন হিন্দুস্থানে, ভারতবর্ষে।'

আমি দেখলাম, অনেক দূরে নীল আকাশ, মিসরদেশের আকাশের থেকে আলাদা নীল ছোপ যেন আকাশের গায়ে, আর দূরে হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠা নীলাম্বরীর মত যে সমুদ্র সে যেন মিশরের সমুদ্র নয়।

মহর্ষি বললেন, 'তুমি পৃথিবীতে বড় কাজে এসেছ। হিন্দুস্থানে বসে' একথা জানতে আমার বাকী নেই। তাই তোমাকে সমুদ্র মরুভূমির ওপার থেকে মিশরদেশের বুক থেকে নিয়ে এসেছি আমি। আমার তিনটি শিষ্য—তোমাকে খুঁজে নিয়ে আসার ভার ছিল তাদের। তোমাকে চিনতে তাদের ভুল হয়নি। যারা দেখতে জানে, সাধারণ মানুষের মত যারা অন্ধ

নয়, তাদের কী করে ফাঁকি দেবে তুমি? তোমার কপালে অদৃশ্য অক্ষরে স্পষ্ট লেখা আছে একটা কথা।'

মহর্ষির চোখ হঠাৎ ধ্বক করে জ্বলে উঠল। সেদিকে মুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল কতদূরে যেন চলে গেল সেই দুটি চক্ষু, যেন লক্ষ যোজন দূরে সেই চক্ষু দুটি দুটি রঙীন সূর্য্যের মত ফুটে উঠল। সেই লক্ষ যোজন দূর থেকে মহার্ষির কথা গম্ভীর একটা গানের মত আমার কাণে ভেসে এলো। আমি শুনলাম, 'একটা কথা লেখা আছে তোমার কপালে— যেকথা শুনে পৃথিবী মাথা নোয়াবে, আকাশের দেবতারা নমস্কার জানাবেন, সেই কথা! জানো তুমি সেই কথা? শোনো তবে, সে কথা **'অমরলতা'**।

সেই ধূধূ পাথরঘরে মহর্ষি হাত জোড় করে' আমার সামনে বসে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁর মূর্ত্তি পাথরের মত হল, তাঁর দুটি চোখ শুধু ঘুমন্ত আগুনের মত স্থির হয়ে জ্বলতে থাকল। সেই সময়, সেই পাথরঘরের কোথা থেকে কারা গেয়ে উঠল 'অমরলতা'— সপ্তপাতালের রহস্যসঙ্গীতের মত সেই গানের গম্ভীর সুর পাথরঘরের বুকে কেঁপে কেঁপে বেজে উঠল। গান যেন ঘর থেকে বাহিরে, বাহির থেকে যেন দূরে দূরে আরো বাহিরে, মাটি থেকে আকাশে, আকাশ থেকে আর এক আকাশে ভেসে ভেসে গেল। যেন কারা, পৃথিবীর লক্ষপ্রাণী, পৃথিবীর বাহিরে আকাশের গ্রহনক্ষত্রের আরো কোটি কোটি লক্ষ প্রাণী, সেই গানে যোগ দিলে।

গান শেষ হল। মহর্ষি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ হতে তুমি আর কারো নও, হিন্দুস্থানের নও, মিশরের নও, পৃথিবীর কোনো দেশের নও, কারো নও, আজ হতে তুমি শুধু অমরলতার!'

আমার মুখে একটি কথা ফুটলো। আমি বললাম, 'অমরলতা! অমরলতা কে?'

মহর্ষি আমার কপালে একটা আঙুল ছুঁয়ে বললেন, 'ছাখো, অমরলতা কে?'

[ক্রমশঃ]



টিকিট ঘর

ডাক-টিকিট ও সাধারণ জ্ঞান

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

লোকে ডাকটিকিট জমায় সখ ক'রে। কেউ কেউ লাভের জন্যও জমায়—সখের ফলেও লাভ হয় কা'রো কা'রো।

যে যে ভাবের থেকেই টিকিট সংগ্রহ করুক না কেন, এ বিষয়ে সফল হ'তে গেলে নানা রকমের খবর জানা দরকার। এই ধরনা কেন, নানা দেশের অক্ষর বা ভাষা সংগ্রহকারকের জানা না থাকারই কথা। কিন্তু, সব টিকিটই যদি তার "ক্যাটালগ" (Stamp Catalogue) বা "এল্‌বাম" দেখে চিনে নিতে হয়, তবে তো বড় মুস্কিল। টিকিটটা দেখে এবং লেখার ধাঁচ দেখে অনেক সময় চিনে নিতে পারা চাই সেটি কোন্ দেশের টিকিট। গ্রীস, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের টিকিটের অক্ষর চেনা মুস্কিল; স্পেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ভাষা বোঝা মুস্কিল;—কিন্তু, অভিজ্ঞ এবং পুরানো সংগ্রাহকেরা অধিকাংশ টিকিট দেখেই চিনে নেয় সেটি কোন্ দেশের। কিছু কিছু ভাষা-জ্ঞানও বাড়ে এর ফলে। এ ছাড়া, নানা দেশের চলিত মুদ্রা সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞানলাভ হয়। কোন্ দেশে কোন্ কোন্ মুদ্রার চল, সে মুদ্রার দামই বা কত, এসব খবর ডাকটিকিট সংগ্রাহকেরা একটু-আধটু জানে। এ ছাড়া, সংগ্রাহকের যত্ন আর চেষ্টার ফলে তা'র সাধারণ জ্ঞানও নানা রকমে বেড়ে যায়।

নানা দেশের ডাকটিকিট যে দেখেছে, সে-ই জানে ডাকটিকিটে কত রকমের ছবি থাকে : রাজা, রাণী, প্রেসিডেন্ট, প্রিন্স, ধর্ম্মগুরু, মন্ত্রী ডিক্‌টেটর, সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি, দেশভক্ত জননায়ক, বড় বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, পণ্ডিত—এসব তো থাকেই; তা' ছাড়া বাড়ী-ঘর কীর্ত্তিস্তম্ভ, সাঁকো বাঁধ, স্মৃতি-মন্দির, মানমন্দির, ধ্বংশাবশেষ, পাহাড়-পর্ব্বত, আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত, নানা জাতের পশুপাখী, লুপ্ত জীব, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জাহাজ, রেল, এয়ার-শিপ, এরোপ্লেন ইত্যাদি কত কিছু থাকে! এই সব টিকিট নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে, নানা রকমে তাদের জ্ঞান বেড়ে যায়।

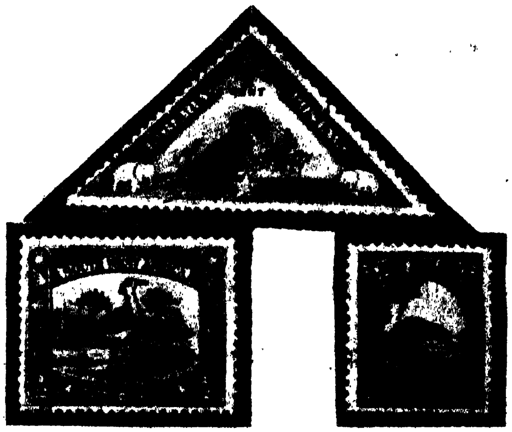
এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখ্‌তে গেলে মস্ত বড় বই হ'য়ে যাবে; তাই মোটামুটি অতি সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ের কথা বলব। এ থেকেই বুঝবে, ডাকটিকিটের খবর ভাল ক'রে

যা'রা নিয়ে থাকে, তাদের সাধারণ জ্ঞান যে অন্যান্য দশজনের চেয়ে বেশী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

(১) ডাকটিকিটে পশুপাখীঃ কত পশুপাখীর ছবি যে ডাকটিকিটের উপর ছাপা হয়, তা'র খবর রাখ কি? চিড়িয়াখানায়ও অত রকমের পশু-পাখী একত্র দেখা যায় কিনা সন্দেহ। কোনও জীব আর বড় বাদ পড়েনা। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতী, হিপ্পো, উট, টেপির, কুমীর, বাঁদর, ভোঁদড়, বনমানুষ, গরিলা, হাড়গিলা, বেড়াল, কুকুর, কাকাতুয়া, টিয়া, উটপাখী, ভাল্লুক, জেব্রা, জিরাফ, পিপীলি কাভুক, আর্ম্মাডিলো, হরিণ, সীল, ধনঞ্জয়-পাখী, টিকটিকি এরা কেউ বাদ যায়নি। নানাজাতের মাছও ডাক-টিকিটে দেখা যায়। মোটের উপর,


পশু

ডাকটিকিটের উপর চিড়িয়াখানার জন্তুরা সব জড়ো হয়েছে বলা যেতে পারে। যাদের ছবি আজও বের হয়নি, তাদেরও অনেকে শীগ্‌গিরই দেখা দেবে—যেমন, 'কোয়ালা'; —এরা অষ্ট্রেলিয়ার টিকিটে দেখা দেবে। লুপ্ত পশুপাখীরাও কেউ কেউ ডাকটিকিটে দেখা দিয়েছে—যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট লুপ্ত 'শ্লথ', লুপ্ত পাখী ডোডো'। যে সব দেশের টিকিটে পশুপাখীর


পাখী

ছবি ছাপা হয়েছে, তা'র মধ্যে বোর্ণিও, নায়াসা, লাবুয়ান, কঙ্গো, পিরাক আর গোয়াটিমালা উল্লেখযোগ্য।

(২) **নানাজাতের লোক** ঃ নানা দেশের রাজা-রাণী, মন্ত্রী, প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতির ছবি তো ডাকটিকিটে থাকেই, তা' ছাড়া কোনও দেশের টিকিটে তো দেশের অধিবাসীরও ছবি থাকে—যেমন অষ্ট্রেলিয়ার মাওরি, বোর্ণিওর অসভ্যজাতি 'ডায়াক', আফ্রিকার নিগ্রো প্রভৃতি। মোটের উপর, পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকেরই ছবি ডাকটিকিটে আছে।



বিভিন্ন জাতি

(৩) **উদ্ভিদ-জগৎ** ঃ ডাকটিকিটে আবার উদ্ভিদ আছে নাকি? আছে বৈকি। চীনদেশের টিকিটে ধানের ক্ষেত, কিউবার টিকিটে পাম্ (Palm) গাছ, পেরুর টিকিটে 'বাল্-সম' গাছ, ইজিপ্টের টিকিটে তুলার চাষ, ক্যামেরুণের টিকিটে রবরের গাছ; তা' ছাড়া, আঙ্গুর, কোকো, কাঁটা মনসা, পেঁপে প্রভৃতির ছবিও ডাকটিকিটে আছে। এ থেকেও অনেক খবর জানা যায়!

(৪) **এঞ্জিনিয়ারিং** :—বড় বড় সাঁকো, কলে চাষবাস, লোহার কারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানা এবং এই ধরণের আরও নানা রকমের এঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারের ছবি আয়ার্ল্যাণ্ড, ক্যানাডা, রুশিয়া প্রভৃতি দেশের টিকিটে ছাপা হয়েছে।

(৫) **আবিষ্কার** : ডাকটিকিটে নানা আবিষ্কারের ব্যাপারও বাদ যায় নি। কোনও কোনও আবিষ্কারের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে—যেমন, বৈদ্যুতিক শক্তির কল। তা'ছাড়া, ছাপার কল, চাষের কল এবং অন্যান্য নানা রকমের আবিষ্কারের ছবিও নানা দেশের ডাকটিকিটে ছাপা হয়েছে।

টিকিট ঘর

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

(৬) **যান বাহন**: ডাকটিকিট নাড়াচাড়া করলেই দেখ্‌বে কত রকমের যান-বাহনের ছবি আছে। ভারতবর্ষের নূতন টিকিটে উট, রেলগাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতির ছবি আছে; আমেরিকার যুক্তরাজ্যের টিকিটে সাধারণ জাহাজ আর যুদ্ধজাহাজের ছবি আছে; তা'ছাড়া পালের জাহাজ, এরোপ্লেন, এয়ার-শিপ, মোটর, প্রভৃতি আরও নানা রকমের যান আর গরু, ঘোড়া প্রভৃতি বাহনের ছবি ডাকটিকিটে আছে।

(৭) **আকাশপথে চলা**: ডাকটিকিটে আকাশপথে চলার ইতিহাসও পাওয়া যায়। প্রথম বেলুন থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ এয়ারশিপ, এরোপ্লেন প্রভৃতির ছবি তো আছেই; তা'ছাড়া, লিলিয়েন্থালের কলহীন 'গ্লাইডার', প্রথম এরোপ্লেনের ছবি, আরোহী-বাহী

(১)

(২)

(৩)



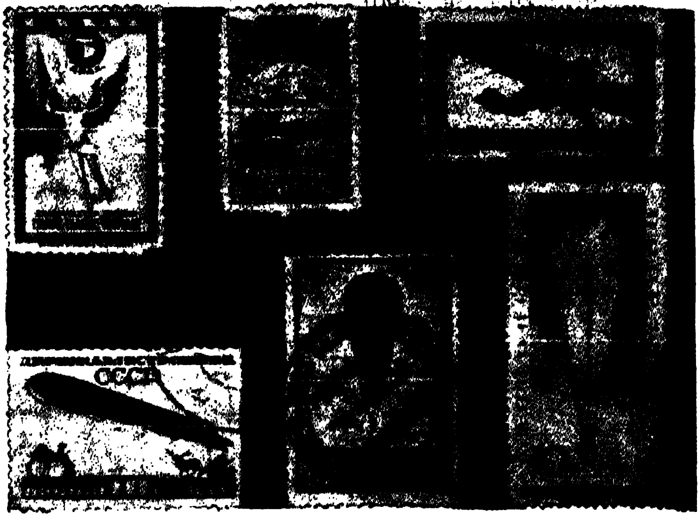
(১) ইঞ্জিনিয়ারিং (২) উদ্ভিদবিদ্যা (৩) আবিষ্কার

এরোপ্লেন, "গ্রাফ-জেপেলীন" প্রভৃতি বহু রকমের আকাশ-যানের ছবি ডাকটিকিটে আছে। আকাশে চলাফেরার ক্রমবিকাশ এই সব টিকিট থেকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নানা দেশের "এয়ার-মেল" টিকিট থেকেও আকাশযাত্রার অনেক খবর পাওয়া যায়।

(৮) **ইতিহাস**: অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি ডাকটিকিটে ছাপা হয়েছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ডাকটিকিটে কলম্বাসের জীবনের নানা ঘটনার ছবি ছাপা হয়েছে; তা' ছাড়া নানা যুগের বড় বড় লোকের ছবিও নানাদেশের ডাকটিকিটে ছাপা হয়েছে। সে সবের

মধ্যে রাজা-রাজড়া তো আছেনই ;—মন্ত্রী, সভাপতি, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম্ম-প্রচারক প্রভৃতিও আছেন। এসব টিকিট দেখে নানা দেশের বিখ্যাত লোক সম্বন্ধে অনেক ভাল লাভ হয়।

(৯) নানাদেশের ঘর বাড়ী রীতি-নীতি চাল-চলন : ডাকটিকিটে নানা দেশের ঘরবাড়ী (বিশেষতঃ, আদিম জাতিদের) রীতিনীতি চালচলন প্রভৃতির ছবিও দেখা যায়। আফ্রিকায় ফরাসীদের যে সব দেশ আছে তা'র টিকিটে এই ধরণের অনেক ছবি আছে। তা' ছাড়া নানা দেশের প্রসিদ্ধ জায়গা, বাড়ী, কেল্লা, গির্জ্জা, পাহাড়পর্ব্বত, দৃশ্য প্রভৃতির ছবিও অনেক আছে। জাপানের টিকিটে ফুজি পর্ব্বত, আমেরিকার টিকিটে নায়াগাবা প্রপাত, রুশিয়ার টিকিটে ক্রেমলীন ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাড়ী, ইজিপ্টের পিরামিড প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত।



আকাশ যাত্রার ইতিহাস

(১০) ডাকটিকিটে লোকশিক্ষা : সাধারণের জান্‌বার জন্য নানা কথা ডাকটিকিটের ছবির মধ্যে দিয়ে বলা হয়। রুশিয়া থেকে কয়েকটি টিকিট প্রকাশ করা হয়েছে যা'র ছবিতে যুদ্ধের বিষময় ফল (দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অঙ্গনাশ প্রভৃতি) দেখান হয়েছে। তা' ছাড়া, আহতের সেবা, হাঁসপাতালে দান প্রভৃতির বিষয়ও ডাকটিকিটের ছবিতে দেখান হয়েছে। এই ধরণের ছবি দিয়ে নানা দেশে দানের আবশ্যকতা প্রচার করা হচ্ছে।

ডাকটিকিটের সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ হয় তা'র কথা মোটামুটি বল্‌লাম ; এ ছাড়া আরও নানা রকমে সংগ্রাহকের জ্ঞান বাড়ে। যেমন, ডাকটিকিট ছাপার নানারকম প্রণালী সম্বন্ধে জানা যায়, ডাকটিকিট প্রচলিত মুদ্রার বদলে কোন কোন দেশে ব্যবহৃত হয়েছে জানা যায়, ডাকটিকিটের পিছনে কত রকমের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে জানা যায়, ডাকটিকিটের ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়, নানাদেশের নামের উৎপত্তি আর নামের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর জান্‌তে পারা যায়।



(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

যেমন আচমকা বৃষ্টি এসেছিল তেমনি আচমকাই থেমে গেল।

কিন্তু চারিধারের চেহারা তখন আশ্চর্য্যরকম বদলে গেছে। এ্যালজি জাতের গাছগুলি যেন বৃষ্টির জল পেয়ে আরো ঘন হয়ে উঠেছে লতায় পাতায়, চারিধারে একটা ধোঁয়াটে বাষ্প মাটি থেকে উঠে সব আরো ঝাপসা করে দিচ্ছে। নীচের কাদা এত বেশী যে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবে যায়।

এর মধ্যে কোনদিকে ষ্টাইনকে খুঁজবে! ষ্টাইনকে খুঁজে না পাক, কোন রকমে হাউই জাহাজে পৌঁছলেও তার চলে,—কিন্তু জাহাজ যে কোন্ দিকে সে ধারণাও ত তার নেই।

এইটুকু মাত্র সে জানে যে নীচেরদিকে নয় ওপর দিকেই তাকে উঠতে হবে। কারণ যে ঢিবির ওপর তাদের জাহাজ পড়েছিল তা থেকে তারা প্রথমে নীচের দিকে নেমে এসেছিল তার মনে আছে।

কাদার ভেতর ঘন জঙ্গল ঠেলে সমর ওপরের দিকে উঠতে লাগল। জলে ভেজা ভারী পোষাক বয়ে আর হাঁটু সমান কাদা আর ঘন জঙ্গল ঠেলে শরীর তার এর মধ্যে ক্লান্ত হয়ে এসেছে। তার ওপর অনিশ্চিত একটা নিদারুণ ভয়। সে ভয় সমর জোর করে চেপে

রাখতেই চায়। কারণ সে মনে মনে বুঝেছে এই অজানা অদ্ভুত গ্রহে বিপদের মাঝে সে ভয়কে প্রশ্রয় দিলে আর তার রক্ষা নেই।

এসময়ে ভয়ে বিচার বুদ্ধি যদি লোপ পায় তাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য্য। বাঁচার জন্যেই ভয়কে জয় করে তার মাথা ঠিক রাখতে হবে।

কিন্তু তবু ভয়ঙ্কর ভাবনাগুলো কিরূপে রাখা যায়! ভেতর থেকে তারা জোর করে ঠেলে ওঠে। যদি সত্যিই সে হাউই জাহাজে আর পৌঁছোতে না পারে! এই ঘন জঙ্গলে দুহাতের ভেতর থেকে ষ্টাইন যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে তাতে হাউই জাহাজ আর ফিরে পাবার সম্ভাবনা তার কতটুকু!

মেঘের ঘন আবরণে এখন বুধের কত বেলা বোঝবার উপায় নেই। বুধের দিন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় বলেও সে জানে। তবু এক সময়ে অন্ধকার নেমে আসবেই।

তার আগে হাউই জাহাজ বা ষ্টাইনকে খুঁজে বার করতে না পারলে তার কোন আশা আর নেই।

অবশ্য বুধ গ্রহের প্রাণীজগতের একটি যে নমুনা সে দেখেছে তাতে দিনের আলোতেও খুব ভরসা আছে বলে সে মনে করেনা। তবে দিনের আলোয় তার হাতের অস্ত্র সে ব্যবহার করতে পারে। রাত্রে তারও উপায় নেই।

হাতের অস্ত্র ব্যবহার করবার এপর্য্যন্ত কোন দরকার হয়নি। বিকট কোন প্রাণী এখনো হানা দেয়নি। তার ফলে হানা দিয়েছে বুধের বৃষ্টি। হিংস্র প্রাণীর চেয়ে তার আক্রমণ কম ভয়ঙ্কর নয়।

কতবার যে এর মধ্যে দুরন্ত বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে এল আর থেমে গেল সমরের কোন হিসেবই নেই। সে চলেছে ত চলেইছে। কিন্তু শরীর যেন আর বয়না। কাদার ভেতর থেকে প্রত্যেকটা পা টেনে তোলা এখন ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রত্যেকবারই মনে হচ্ছে পরের পাটা যেন আর উঠবেনা।

তবু হাউই-জাহাজের কোন পাত্তাইত মিললনা। দিক ভুল যে হয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ তার নেই। কে জানে হয়ত একই জায়গায় সে ঘুরে ঘুরে মরছে বারবার, হয়ত হাউই জাহাজের অত্যন্ত কাছ দিয়ে গিয়েও সে চিনতে পারছেনা। খানিকক্ষণ আগে পর্য্যন্ত মুখোসের ভেতর সে বারবার ষ্টাইনের নাম ধরে ডেকেছে। যদি ষ্টাইন শুনতে পায়! কিন্তু আর তার সে দম নেই। গলা কাঠ হয়ে এসেছে ক্লান্তিতে।

এদিকে বেলাও ত প্রায় ফুরিয়ে এল। বুধের আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। পৃথিবীর আকাশের অমাবস্যার রাতও তার কাছে কিছু নয় সে জানে। কারণ পৃথিবীতে তবু পরিষ্কার রাত্রে তারাও আলো থাকে। এখানে সমস্তই মেঘে ঢাকা।

সে অন্ধকারে সে কি করবে! সে দীর্ঘ রাত ত তার কাট্‌বেনা! সমর হতাশ হয়ে এ্যালজিলতায় ঢাকা উঁচুমত ঢিবি পেয়ে তার ওপর উঠে বসে পড়ল এবার। আর হাউই-জাহাজে খোঁজবার চেষ্টা যে বৃথা তা সে বুঝেছে। এখন একটু বিশ্রাম করতে পারলেই সে বেঁচে যায়। কাদা জল থেকে পা তুলে এরকম একটা উঁচু শুকনো ঢিবির ওপর বসতে পাওয়া তার কাছে সৌভাগ্য এরকম একটা ঢিবির আশ্রয় সে এতক্ষণ পায়নি। এইবার আসে আসুক রাত। কিন্তু রাত্রি আসবার আগেই যে বিপদ এল তার কথা সমর ভুলেইছিল এতক্ষণ।

অনেকক্ষণ ধরেই নিশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। সেটা ক্লান্তির লক্ষণ বলে আর কিন্তু ভুল করবার যো রইলনা। ক্লান্তি নয়, মুখোসের ভেতর হাওয়ার সম্ভাবনা তার ফুরিয়ে এসেছে হঠাৎ বুঝতে পেরে তার বুকের ভেতরটা একেবারে হিম হয়ে গেল। এ সম্ভাবনার কথা যে তার একবারও মনে হয়নি। অন্য সব রকম বিপদের ভয় সে করেছে, কিন্তু নিশ্বাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে—এ তার কল্পনাতেও ছিলনা।

এখন উপায়? হাউই জাহাজ ছাড়া আর কোথাও হাওয়া পাবার সম্ভাবনা নেই—অথচ হাজার চেষ্টা করলেও এখন হাউই জাহাজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। চারিধার বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্ধকার না হলেও বাতাসের অভাবে যেরকম সে হাঁফাতে সুরু করেছে তাতে তার বেশীদূর যাওয়া সম্ভব নয়।

পোষাকের ভেতর হাওয়া তৈরীর যন্ত্রটির মিটারে সে হাত বুলিয়ে দেখলে। তাতে বোঝা গেল যে হাওয়া আর নেই। আর মিনিট পোনেরো কোন রকমে টেনেটুনে চলতে পারে। তারপরই সব শেষ। তখনই তার ফুসফুসে রীতিমত যন্ত্রণা সুরু হয়েছে, কাণে মানে হচ্ছে যেন তালা লেগে গেছে।

তবু একবার শেষ চেষ্টা না করে দেখে সে মরবেনা। এখনো আবছা অন্ধকারে হাউই-জাহাজের ধাতুতে তৈরী উজ্জ্বল গা হয়ত দূর থেকে দেখা যেতে পারে। শুধু একটু উঁচু জায়গা থেকে চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে দেখবার চেষ্টা সে করবে!

উঁচু জায়গা বলতে ত এই ঢিবিই রয়েছে। সমরের মন-উৎসাহে নেমে উঠেই ঝিমিয়ে পড়ল। এইরকম একটা ঢিবি সময় থাকতে চোখে পড়লে কত সুবিধেই না হত। কেন যে

এরকম একটা উঁচু জায়গা তার চোখে পড়েনি, এইটেই আশ্চর্য্য ! এখন হয়ত হাউই জাহাজ দেখতে পেলেও আর তার সেখানে পৌছোবার সামর্থ্য থাকবেনা ! তার চেয়ে আর আফ্-শোষের ব্যাপার কি হতে পারে। ভাগ্য কি তাকে এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপই শেষে করতে চায় !

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ চেষ্টায় সমর তবু ঢিবিটার ওপরে উঠতে লাগল। হাওয়া ফুরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের মেয়াদও শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যুর সঙ্গে এ যেন দৌড়ের পাল্লা। সে এসে গলার টুঁটি চেপে ধরবার আগেই হাউই জাহাজে যদি পৌছান না যায় তাহলে নিস্তার নেই।

ঢিবিটার ওপর ওঠা খুব সহজ নয়। এ্যালজি জাতের লতায় তার সারা গা পেছল হয়ে আছে। সব সময়েই হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

তবু সমর কোন রকমে ঢিবিটার ওপরে গিয়ে পৌছোল। নিশ্বাস নেওয়া এখন বেশ কষ্টকর, মৃত্যুর শক্ত মুঠির চাপ সে যেন গলার ওপর স্পষ্ট বুঝতে পারছে।

কিন্তু কই ! হাউই জাহাজের কোন চিহ্নই ত কোন দিকে নেই।

যে ঢিবিটার ওপর সে উঠেছে সেটা বেশ উঁচু, অন্ধকার হয়ে এলেও বহুদূর পর্য্যন্ত এখনো সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু চারিধারে সবই ত সমতল ঘন জঙ্গল; হাউই জাহাজের মত একটা বিশাল জিনিষ ত তার ভেতর লুকিয়ে থাকতে পারেনা যে উঁচু মালভূমিটি চারিধারে দেখা যাচ্ছে—এরই ওপর তাদের জাহাজ যে পড়েছিল এ বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নেই। অথচ এখন কোন দিকে তার চিহ্নও দেখা যাচ্ছেনা।

হাউই জাহাজ তাহলে গেল কোথায় ? ষ্টাইন কি শেষ পর্য্যন্ত তাকে ফেলে রেখে একাই হাউই-জাহাজ নিয়ে অন্য কোথাও সরে গেছে ? ষ্টাইনের মত লোকের পক্ষে অবশ্য তা অসম্ভব নয় কিন্তু তবু তা বিশ্বাস হলনা এইজন্যে হাউই জাহাজের আওয়াজ সমর তাহলে নিশ্চয় শুনতে পেত।

এ রহস্য সম্বন্ধে আর কিছু ভাববার অবসর কিন্তু সময় পেলনা। অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে, তারই ভেতর চারিধারে চাইতে চাইতে হঠাৎ সে চমকে উঠে একেবারে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে গেল।

বহুদূরে মালভূমি যেখানে নেমে গিয়ে সমতল সমুদ্রের ধারে গিয়ে মিশেছে, সেখানে যেন একটা ক্ষীণ অঙ্গিত আলো দেখা যাচ্ছে !

বুধগ্রহে আলো ? বুধগ্রহে আলো দেখার অর্থ যে কতখানি, কি বিপুল যে তার ইঙ্গিত তা না বোঝবার মত নির্দ্দোষ বা মূর্খ সমর নয়।

আলো মানেই আগুন, এবং আগুন মানে এমন কোন জীব যারা সাধারণ পশুর চেয়ে অনেক উঁচু স্তরে উঠছে! আগুন যে জ্বালতে পারে তার সঙ্গে বুদ্ধিমান সভ্য মানুষের বিশেষ কোন একতাই নেই।

পৃথিবীতে মানুষ যেদিন আগুনের ব্যবহার শিখেছে সেদিন থেকেই ত তার সভ্যতার সূত্রপাত সাধারণ জানোয়ারের থেকে সেদিনই মানুষ অনেক উঁচু ধাপে উঠে গেছে।

বুধগ্রহে তাহলে সত্যিই কি সেরকম বুদ্ধিমান জীব আছে! কি রকম প্রাণী তারা, কি তাদের রূপ ?

হায়, তার সময় ফুরিয়ে এসেছে ও এসব প্রশ্নের কোন মীমাংসা না করেই তাকে মারা-পড়তে হবে এইটেই এখন তার সব চেয়ে বড় দুঃখ।

কিন্তু এতখানি উত্তেজিত হবারও কোন কারণ হয়ত নেই। হঠাৎ সমরের মনে হ'ল পৃথিবীতে যেমন জলা জায়গায় আপনা থেকে আলেয়ার আলো জন্মায়, এও ত সেইরকম হতে পারে।

কিন্তু না, আলেয়ার আলো এনয়, আলেয়ার আলোর স্বভাব নড়ে বেড়ান,—সে আলো কখন একজায়গায় এমন স্থির থাকেন। তা ছাড়া……তাছাড়া চোখের কাঁচটির বেতাল ঘুরিয়ে সেটি দূরবীণের কাচ লাগিয়ে সমর তখন আরো কিছু দেখতে পেয়েছে।

অন্ধকার বেশ ঘোরালো, দূরবীণটিও তেমন জোরালো নয়, তবু অস্পষ্টভাবে আগুনের পাশে যে জিনিযটি নড়তে-চড়তে দেখা যাচ্ছে, সেটি যে কোন প্রকার প্রাণী এ বিষয়ে কোন সন্দেহই তার নেই। আগুনের সামনে প্রাণীটিকে কালো ছায়ার মত যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে তার আকার ঠিক বোঝা যায় না, পৃথিবীর কোন প্রাণীর সঙ্গে তার মিল আছে কিনা তাও বলা শক্ত, তবু আগুন যে সেই জ্বালিয়েছে এ বিষয়েও কোন ভুল আর নেই।

বুধগ্রহ সম্বন্ধে এত বড় একটা আবিষ্কার কিন্তু কেউ জানতে পারবে না, তার সঙ্গেই এ আবিষ্কার হারিয়ে যাবে। নিশ্বাসের দারুণ কষ্টের ভেতরেও সমরের সে কথাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু খানিক বাদে আর কোন কিছু ভাববার ক্ষমতা তার রইল না।

নিশ্বাসের কষ্ট এখন সত্যি অসহ্য হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন জাঁতাকলে নির্ম্মমভাবে কে তার বুক ক্রমশঃই চেপে ধরছে, ফুস ফুস যেন ফেটে যেতে চায়। সমস্ত মাথা ঝিম ঝিম করছে, চারিধারে অদ্ভুত সব আওয়াজ!

না আর সে পারেনা। এর চেয়ে আকস্মিক মৃত্যু অনেক ভালো ছিল।

সমর ঢিবিটার ওপর এবার কাতর হয়ে বসে পড়ল। তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে যন্ত্রণায়। হাতগুলো আপনা থেকে মুঠো হয়ে যাচ্ছে। জলে ডোবা লোকের মত সে যেন কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায়।

এমনিভাবে ঢিবির ওপরকার 'অ্যালজি'গুলো আঁকড়ে ধরতে গিয়েই সে ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম শেষ বিদ্রূপের পরিচয় পেয়ে গেল।

জোঁকের মত সুতুলি 'অ্যালজি'গুলির সঙ্গে যে জিনিষটি তার হাতে ঠেকল সেটি একটি আংটা। জ্ঞান তার তখন প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে, তবু তারই ভেতর সে বুঝতে পারলে যে বুধগ্রহের একটি ঢিবিতে শক্ত কোন আংটা থাকা স্বাভাবিক নয়। যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে সে আরো খানিকটা অ্যালজি ঢাকা জায়গা পরিষ্কার করে ফেললে দু'হাতে আঁচড়ে।

একি এযে শক্ত ধাতুর প্লেট! এযে তাদেরই হাউই জাহাজের গা!

হাউই জাহাজের ওপরে বসেই সে হাউই জাহাজ খুঁজে মরেছে এতক্ষণ! কিন্তু এখন যে খোঁজ পেয়েও আর লাভ নেই। এখান থেকে নেমে হাউই জাহাজে ঢোকবার ক্ষমতা আর তার নেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য কে জানত! এখানকার 'অ্যালজি' জাতীয় গাছগুলির বাড় এমন অদ্ভুত! ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তারা রক্তবীজের ঝাড়ের মত একটা বিশাল জাহাজকে ঢেকে ফেলে তার চেহারা বদলে দিতে পারে!

'অ্যালজি'তে ঢাকা পড়বার জন্যই সে জাহাজকে ঢিবি বলে ভুল করেছে। কে জানে ষ্টাইনও হয়ত সেই রকম ভুল করে আর কোথাও মরতে বসেছে। মানুষের বুধগ্রহ অভিযান এমনি করেই তাদের সঙ্গে গেল।

না আর আশা যখন নেই, তখন এ মুখোসের আর কি দরকার। ভেতরের বিষাক্ত হাওয়া আর বাইরে বুধের বিষাক্ত বাতাস সবই এখন তার কাছে সমান। মিছিমিছি এই পোষাকের গারদে বন্ধ হয়ে মরে লাভ কি।

জ্ঞান লোপ পাবার আগে সমর প্রাণপণ চেষ্টায় মুখোসটা খুলে দূরে ফেলে দিলে।

তারপর অসাড় দেহ লুটিয়ে পড়ল হাউই জাহাজের পিঠে।

ক্রমশঃ

মিষ্টিমুখ

রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন—

তোমাদের এবার কি চিঠি লিখব বসে বসে ভাবছি, এমন সময় জানলাটা ঝণাৎ করে খুলে গেল দমকা হাওয়ার এক ঝাপটায়। মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম জানলাটা দক্ষিণের এবং তারপর কলমটা নামিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

মনে হ'ল কি চিঠি আর তোমাদের লিখব, দক্ষিণের জানলা দিয়ে যে সুদূর ডাকের চিঠি এল তেমন চিঠি যদি লিখতে পারতাম।—অমনি হাল্কা, ফুর ফুরে মিষ্টি ঝর ঝরে চিঠি! মনের আর যে চিঠির কথাগুলো আলগোছে বয়ে যাবে ছুঁই কি না ছুঁই করে, অথচ রং ধরবে সব জায়গায়।

দক্ষিণের জানলা দিয়ে চিঠি এল দক্ষিণ সমুদ্রের দুরন্ত গড়ানো ঢেউ আর শাদা ফেনা, জলের রূপোলি ছাট আর সাগর পাখীর ছড়ানো ডানার, সে চিঠি এল বনে বনে মাঠে ঘাটে লোকালয়ে, সহরের এই দেয়াল তোলা পাহারা এড়িয়ে ও সে চিঠি এল জানলা গড়িয়ে আর অমনি রং ধরল শুকনো গাছের ডালে, মানুষের ঘুমনো মনে। এত রং যে কোথায় লুকিয়েছিল কে জানে! মাটির ভেতর থেকে গাছের ডালে মরা বাকল থেকে চুইয়ে যেন রঙের বাণ ডাকল।

না, অমন চিঠির ভাষা কোথায় পাব! তবু তোমাদের মনে রং ধরানো কত সোজা ছিল তোমরা ত আর শীতের মরা ডাল নয়। তোমাদের মন তাজা জীবন্ত, রং সেখানে জমেই আছে ফুটিয়ে তোলার অপেক্ষায়।

আমার চিঠি না পৌছোক দক্ষিণ সমুদ্রের চিঠি আজ তোমাদের কাছে পৌছবেই এই যা আনন্দ। এ চিঠির ডাক মাশুল লাগেনা, বেয়ারিং হলেও বিলি করতে ভুল হয় না কখনও। আমার চিঠির বদলে সে চিঠিই এবার তোমরা পড়ো।

—তোমাদের সম্পাদক মশাই—

ভণিতিকা

শিল্পাচার্য্য গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকে গিয়েছেন। শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ, গগনেন্দ্র নাথ ও নন্দলাল, এই তিনজন রঙে রেখায় যে অপরূপ স্বর্গ ফুটিয়েছেন, তার আর তুলনা নেই। এঁরা তিনজন আমাদের দেশের শিল্পসভার ত্রিরত্ন—গগনেন্দ্র নাথের মৃত্যুতে একটি রত্ন লুপ্ত হল।

ছন্দ ও মিল থাকলেই যেমন কবিতা হয় না, তেমনি রঙ ও রেখা মিল্‌লেই ছবি হয় না। চাই কল্পনা, অন্তরালের রহস্যকে চোখে দেখার ক্ষমতা। গগনেন্দ্রনাথের ছিল সেই কল্পনা! দেখেছিলেন তিনি চোখের আড়ালের রহস্যকে। তাঁর আঁকা গাছপালা, পশু পাখী, মানুষ ও প্রকৃতিতে আমরা নতুন অর্থ খুঁজে পেতাম। এই অর্থটা ছিল অদ্ভুত।

অবনীন্দ্র নাথ তুলি হাতে জীবনের এক একটা সত্য খুঁজে ফিরেছেন। চোখে দেখার জিনিষ হুবহু না এঁকে তিনি তার অন্তরের রূপ ফোটাতে চেয়েছেন। গগনেন্দ্র নাথ কিন্তু এই সত্য নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি আপন মনে চোখে দেখার জিনিষ নিয়ে স্বপ্ন তৈরী করেছেন, স্বপ্নে তাদের যে রূপটি দেখেছেন সেই রূপটিই অন্ধকার মেশানো রঙে এঁকেছেন। তাই তাঁর ছবিতে একটা নিবিড় রহস্যের ভাব—মানুষ যেন মানুষ নয়, অদ্ভুত কোনো প্রাণী, আর লতাপাতা, ঘর বাড়ী, পশু পাখী তারাও সবই যেন অদেখা পৃথিবীর আশ্চর্য্য জীব। ছবি আঁকার এই অদ্ভুত স্বপ্নময় ধোঁয়াটে ঢং তিনিই প্রথম এদেশে এনেছেন।

বাংলার গৌরব রাষ্ট্রপতি সুভাষ চন্দ্র এবার নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে বাংলা তথা ভারতের গৌরব অর্জ্জন করেছেন। ভারতের মুক্তি সাধনায় সুভাষচন্দ্রের দান অপরিমেয়। তিনি আজ মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে জাতীয় গৌরবের শিখরে অধিরূঢ় হয়েছেন। তিনি ইউরোপএ বহুস্থান পরিভ্রমণ করে নানা মনীষিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করে সুভাষ চন্দ্র যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন আমরা আশা করি ভারতের মূল

সমস্যার সমাধানে তাঁর সে অভিজ্ঞতাগুলি তিনি কার্যাকরী করে তুলবেন। বাংলা মা তাঁর আদরের সন্তানকে অভ্যর্থনা করলেন। আমরা সুভাষ চন্দ্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

পৃথিবীকে অমূল্য সম্পদ দিয়ে ঐশ্বর্য্যময় করে যাঁরা মহর্ষি হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁদের অন্যতম। তিনি ভগবানের স্বরূপ ছিলেন। আর পৃথিবীতে তাঁর বাণী প্রচারের ভার নিয়েছিলেন তাঁর ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ। মনুষ্যত্বের যে মস্ত বিকাশ সেবাধর্ম্ম তা হচ্ছে এ বাণীর সারগর্ভ। পৃথিবীর যাবৎ ধর্ম্ম যে মূলতঃ এক তাদের কোন ভেদাভেদ নেই এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল তত্ত্বকথা। পৃথিবীর নানা দেশবিদেশ শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করেছে—বিশেষ করে সুদূর আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ে গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি দু'জন আমেরিকান মহিলা বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ স্মৃতি-মন্দির স্থাপনা করচে বহু অর্থ দান করেছেন। সে মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে এবং আমেরিকান মহিলা দুটি ভারতবাসীর কাছে চিরদিনের জন্য শ্রদ্ধাভাজণীয়া হয়েছেন। মন্দির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুন্দর মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপনা করা হয়েচে। আজ বেলুড় মঠ, এই স্মৃতিমন্দির ও মূর্ত্তি শুধু ভারতের নয়—এ সমস্ত পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মিলন ক্ষেত্র।

বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার মত এত দুঃসাহসিক আজকাল এক জার্ম্মাণী ব্যতীত বোধহয় আর কেউ নেই। শুধু নানা আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেই রাশিয়ানরা ক্ষান্ত হয় না তাদের আবিষ্কারগুলি তারা কার্য্যকরী করে তুলতে জানে। সম্প্রতি উত্তর মেরুপ্রদেশে তাদের কয়েকটি অভিযান হয়। প্রফেসর স্মিথ ছিলেন তার নেতা, নানা বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এরোপ্লেন চালিয়ে তাঁরা নানা বিষয় তো পর্য্যবেক্ষণ করেছেনই তাছাড়া নীচে নেমে ঝড় শীত তুচ্ছ করে তাঁবু লাগিয়ে উত্তর মেরুপ্রদেশ বাস উপযোগী করবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে টেলিগ্রাফ তার পর্য্যন্ত গিয়েছে, বৈদ্যুতিক আলোও নাকি যাবে। ক্রমশঃ লোকের বসতি বসবে। এরপর আর আশ্চর্য্য কি আছে! এতদিন উত্তরমেরু অজানা নিরতিশয় অগম্য প্রদেশ ছিল আজ রাশিয়ার কল্যাণে সেখানে এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠছে।

সেদিন কলকাতার 'ব্ল্যাক-আউট্ এক্স্‌পেরিমেন্ট্' ব্যস্তবাগীশ কলকাতার লোকেদের পক্ষে বেশ এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পনের মিনিট চুপচাপ, সমস্ত কলকাতা অন্ধকার কি ভয়ানক ব্যাপার। পনের মিনিট গাঢ় অন্ধকার কলকাতা সহর আত্মগোপন করেছিল বটে

কিন্তু ভয়ানক কিছুই ঘটল না। কলকাতার ব্যস্তবাগীশরা তাই বড় বিফল মনোরথ হয়েছেন। কেউ কেউ অন্ততঃ ময়দার বস্তা আশা করে ছাতের ওপর বা ময়দানে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিলেন কিন্তু দু'একটি শান্তিপ্রিয় সবুজ-লাল আলো দেয়া এরোপ্লেন ছাড়া আর কিছু দেখা যায়নি। কয়েকজন সাহসী বিচক্ষণ লোক যদি বা এরোপ্লেন চালকরা ময়দার বস্তা ভুল করে বোমার বস্তা ফেলে সেই ভয়ে এরোপ্লেন দেখা মাত্র তাঁরা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। সত্যি কথা, ইংলণ্ড জার্ম্মাণী বা ফ্রান্সে যে সব 'ব্লাক-আউট্ এক্স্পেরিমেণ্ট্' হয়েছিল তা শুধু দেখবার মত নয়, যথেষ্ট শিক্ষণীয় ছিল। কিন্তু কলকাতার নিরীহ লোকদের ওপর কেবল একটা তামাসা হল। ছোট্ট ছেলেপিলেরা সেদিন বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সত্যি বুঝি জাপানীরা এই ফাঁকে এরোপ্লেনে এসে কলকাতার ওপর মস্ত মস্ত বোমা ফেলবে!

কোন একটা ছুটি হলেই আমাদের মন ছুটতে চায়, অর্থাৎ আমাদের বেড়াবার কথা মনে হয়। ছুটির অনেক আগেই আমরা ভাবতে বসি দল বেঁধে কোথায় ঘুরে আসা যায়। এবার আসছে ইষ্টারের ছুটি। ইংরাজদের ধন্যবাদ, তাদের দৌলতে এ ছুটিটি আমাদের মিলেছে। ছুটি কে না বেশী চায়? ইউরোপে এই উপলক্ষে বেশ কয়েকদিন মেলার উৎসব বসে। এ দেশে এই ছুটি একটু ছোট হলেও কয়েকদিনের জন্য বেশ একটা টহল দিয়ে আসা যায়। রেল কোম্পাণীরা, যেমন ই-আই-আর ও ই-বি-আর—এরা বেরিয়ে পড়বার জন্য বেশ লোভ দেখান ভাড়া কমিয়ে দিয়ে। সত্যি সত্যি ভাড়া কমানর দরুণ আমরা তবু আজকাল কিছু কিছু ঘোরা ফেরা করতে পারি। আমাদের মনে হয় বিশেষভাবে ভাড়া কমিয়ে দিলে সুবিধেটা ছাড়া উচিৎ নয়। আমরা বিজ্ঞাপনে দেখছি—এবার ইষ্টারের দরুণ ভাড়ার সুবিধে কতকগুলি মন্দ নেই। দেশ ভ্রমণে শুধু দেশ দেখাই হয় না আরো অনেক শিক্ষা হয়।

খেলাধুলায় ছোট ছেলেমেয়েরা আমাদের দেশে আজকাল খুব ভাল করচে এ কথা আমরা প্রায় বলি। যদিও আজও বিদেশের তুলনায় স্পোর্টসে আমরা অনেকটা পেছিয়ে আছি। কলকাতায় গত অলিম্পিকে বাংলা খুব নাম করেচে।

এবার টেনিসে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ও রংমশালের গ্রাহক নম্টু ও খম্টু সেন জুনিয়ার টেনিস চ্যাম্পিয়ন সিপে ডাবলস্ ও সিংগল্স্ দুই-ই পেয়েচে। খম্টু সেন দাদাকে হারিয়ে সিংগল্স্ নিয়েচে আর দুভাই মিলে ডাবল্স্ এ জয়ী হয়েচে। বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন শিপে এবার দ্বাদশ বর্ষীয় একটি ছেলে হোসেন খুব কৃতিত্ব দেখিয়েচে। তোমাদের মধ্যে যদি যে কোন খেলাধুলোয় লুকিয়ে কেউ চ্যাম্পিয়ন হয়ে থাক চট করে আমাদের জানাতে ভুলো না।

আমরা চাই বাংলার ছেলেমেয়েরা যে সমস্ত রকম খেলাধূলায় অগ্রণী হচ্চে এ কথা সকলে জানুক।

আমাদের একজন গ্রাহক জানিয়েচেন যে পৃথিবীতে ঘুমোয় সব চেয়ে কোন্ প্রাণী? সরিসৃপদের মধ্যে কয়েক জাতীয় প্রাণী আছে তারা ঘুমোয়, কি জেগে থাকে বা মরে গিয়েচে বোঝা যায় না। কুমীর, সাপ, কচ্ছপ এদের কথা ছেড়েই দাও। এরা ক্রমান্বয়ে না খেয়ে মাসের পর মাস ঠিক এক জায়গায় একভাবে পড়ে থাকতে পারে। এমন কি বাড়ীর চেনা কোন কোন মাকড়শা তোমরা লক্ষ্য করে দেখে থাকবে, কয়েক দিন ধরে দেয়ালের একই জায়গায় তারা থেবড়ে পড়ে আছে। শ্রীমান অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে উত্তর আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে এক জাতীয় কাঠ বিড়ালী দেখা যায় যারা বছরে কম করে ছ'মাস নিদ্রিত থাকে। জুন জুলাই মাসে যখন সেখানে গরম ও অনাবৃষ্টি তখন তারা ঘুম দেয়—তারপর বাকি বছরটা আধমরা হয়ে তারা বোধ হয় বেশ সুখেই নিদ্রিত থাকে। ঘুম ভাঙ্গে তাদের ফেব্রুয়ারী মাসে। কুম্ভকর্ণের বংশধর আর কি!

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগ এবার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রদের জন্য "শিক্ষা ভ্রমণের" একটি সুবন্দোবস্ত করেছেন। সম্প্রতি কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের ভার প্রাপ্ত অফিসার শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় প্রাইমারী স্কুলের একদল ছাত্রদের নিয়ে কামাখ্যা, রাজসাহী, গৌড় ইত্যাদি দেশ ভ্রমণে যাত্রা করেছেন। এতে ছেলেরা দলবলে শুধু দেশ ভ্রমণের নিছক আনন্দই পাবে না, এতে নানা বিষয় তারা শিক্ষা লাভও করবে, তা ছাড়া তাদের স্বাস্থ্য ও মন প্রফুল্ল হবে। সদল বলে এই দেশভ্রমণ অভিযানের মূল্য অনেক; আমরা আশা করি কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিবছর এই দেশভ্রমণের একটি পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে কর্পোরেশন স্কুলগুলির ছেলেদের হৃদয় জয় করবেন।



আমাদের লাইব্রেরী

রাজকাহিনী—১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচী পাবলিশিং হাউস
১ম খণ্ড বারো আনা, ২য় খণ্ড এক টাকা।

রাজকাহিনী সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে যাওয়া বোধকরি ধৃষ্টতা। কারণ রাজকাহিনী বইটি ছেলেমেয়েদের এত ভাল লেগেচে যে পরপর কয়েকটি সংস্করণ বার করতে হয়েচে। ভাল বই লুকিয়ে থাকেনা, সে আত্মপ্রকাশ করেই। রাজকাহিনীর তো কথাই নেই, রাজকাহিনী যখন প্রথম বেরুল ছেলেমেয়ে মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। কেন? কেননা এ লেখা কথাশিল্পী ও চিত্রশিল্পী আচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখা। তাঁর হাতের মোহন যাদুস্পর্শে ছেলেমেয়েদের লেখা অপরূপ শোভন হয়ে ওঠে। আর কেন? আর শিল্পাচার্য্য নন্দলালঠাকুর মহাশয়ের নিজের পাকা তুলিতে ছবিগুলি এতে আঁকা আছে বলে। আরও কেন? বইটি সমুজ্জ্বল করে তোমাদের ঘরের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়ে তুলতে পণ করে যাঁরা নেবেচেন সেই প্রাচী পাবলিশিং হাউস তোমাদের মনের মতই বইখানি ছাপিয়েছেন ও বাঁধিয়েছেন। তাই যেখানে পাকা হাতে, পাকা তুলিতে, পাকা কারিগরের অপরূপ সমন্বয়ে যে বই তৈরী হয়েচে তার কথা বলতে হবে কি? তোমরাই দেখো, যারা কিনেচে ও পড়েচে তোমাদের মধ্যে তাদের জিগ্‌গেস কোরো। আমাদের কাছেই বা সবটা শুনবে কেন? গল্পগুলি সম্বন্ধে আর বলব কী? আমাদের দেশের ঐতিহাসিক গল্প এর আগে এত সুন্দর, এত জীবন্ত করে আর কেউ লিখেচেন কিনা আমরা তো জানিনা।

উৎপল ও রবি—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। সাহিত্যাশ্রম, কলিকাতা। আট আনা।

রূপকথাকার শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের নাম তোমাদের মধ্যে কেনা জানে! রংমশালে তাঁর রূপকথা—কাজল জল, বনের হাওয়া পড়ে তোমরা মুগ্ধ হয়েচ শুনেচি। কারণ রূপকথা লিখিয়ের মধ্যে তিনি একজন সেরা শিল্পী। কিন্তু এবার তিনি ছেলেদের উপন্যাস

লিখে দেখিয়েছেন এতেও তাঁর হাত পাকা। উৎপল ও রবি ছেলেদের একটি ছোট উপন্যাস। উৎপল ও রবি দুই বন্ধু—এদের বন্ধুত্ব নিয়ে তিনি একটি স্নিগ্ধ মনোরম উপন্যাস লিখেছেন। তোমাদের মধ্যে উৎপল আছে রবিও আছে। বইটি পড়ে দেখ তাদের খুঁজে পাবে। কেমন সহজ সরল নিরভিমানী বন্ধুত্ব এদের। বইটির ছবিগুলিও সুন্দর। ছাপা বাঁধাইয়ের পরিকল্পনাটিও ভাল।

পৃথিবীর রূপকথা—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত।

রূপকথা ছেলেমেয়েদের একেবারে আপনার জিনিষ। এ শুনতে—আর কারুর বুঝি দখল নেই। প্রতি দেশেই সে দেশের রূপ নিয়ে রূপকথার জন্ম নিয়েচে। রূপকথা আজকের নয়—সে বহুদিন আগে শিশুমানবের মনে কখন জন্ম হয়েচে কেউ জানে না। শিশুমনের আজগুবি আনন্দ রহস্যে এগুলি ফুটে আছে। সব দেশে কিন্তু শিশুমন এক, তাদের মোহন জগৎ একই মধুর স্বপ্নে গড়া।

কিন্তু মনে হয় অন্য দেশের রূপকথা সে কেমন? জানতে ইচ্ছে হয় নাকি? ঠিক আমাদের মতই ছোট ছেলেমেয়েরা কি সে রূপকথা শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঢুলে পড়ে রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে চলে যায়? তাদেরও কী সেই সোনার কাটি, রূপার কাটি, রাজকন্যে, রাজপুত্তুর, ফুলপরী, ডাইনীবুড়ি—এরা সব আছে? 'পৃথিবীর রূপকথা' এ নতুন বইটি তার জবাব দিয়েচেন। নানা পরিশ্রম করে পৃথিবীর নানান দেশের শ্রেষ্ঠ রূপকথাগুলি একত্র করে সহজ সরল সুন্দর অনুবাদে বইটি তোমাদের উপহার দেওয়া হয়েচে।

আমাদের দেশের কয়েকটি বাছাইকরা রূপকথা তো আছেই—তাছাড়া চীন, জাপান, ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মণী, আমেরিকা প্রভৃতি নানাদেশের রূপকথার রূপ পরিবেশন করা হয়েচে এ বইটিতে। ভারী সুন্দর নির্ব্বাচন হয়েচে। নববর্ষে এ বইটি তোমাদের হাতে নেওয়া চাই-ই। বইর ছবিগুলিও হয়েচে জীবন্ত। ছাপাই বাঁধাই অনিন্দ্যসুন্দর।

এককথায় প্রাইজ বই।

——:o:——



পরিচালিকা—দিদিভাই

আমার মিষ্টি ভাইবোনেরা !

ফাগুণ শেষ হয়ে এলো—বাতাস এখন অল্প মধুর। চৈত্র এসে গেল। বনপথ মুকুলের ও লেবু ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছে—সে সুরভি আমি কলিকাতায় ইঁট কাট ঘেরা নিতান্ত বাস্তবতার ভিতর পাচ্ছি—আমাদের তরুণ হৃদয়ের ভালবাসা ভরা মিষ্টি চিঠিগুলোর ভিতর। তোমাদের চিঠির দপ্তর খুলে বসে আজকের দিনটাকে বেশ ভাল লাগছে—আর ভাল লাগছে তোমাদের। মন আমার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমাদের চিঠির গহণ অরণ্যে। কি করেছ তোমরা? আমায় ডুবিয়ে দেবার যোগাড় করেছ যে ভাই?

তোমাদের সবাইকে দলে বাঁধবার চেষ্টা চলছে জানো? তার নিয়মাবলী অন্যত্র প্রকাশ করা হলো। এবার তোমাদের চিঠির দপ্তর খুলি। এগুলি গতবারের—

শিবাণী সরকার (কলিকাতা)

দিদিভাই! রংমশালের অন্যান্য গ্রাহক গ্রাহিকার তুলনায় আমি বোধ হয় কিছু বড় হয়ে গেছি, তাই চিঠি লেখবার খুব ইচ্ছা হলেও লজ্জা এসে প্রতিবার বাধা দিচ্ছে·········আমার লেখনী বন্ধু চাই······আমার বয়স ১৫ বছর; এই মার্চ্চ মাসে মাট্রিকুলেশন দেবো। কবিতা লিখতে ও পড়তে আমি খুব ভালবাসি········· রবীন্দ্রনাথের কেবল কবিতাই নয় তাঁর ছোট গল্প ও নাটিকা আমার খুব ভাল লাগে। Autograph hunter ও বটে!····· ফোটোগ্রাফ শেখবার ইচ্ছাও আমার খুব·········।

বিকাশেন্দু সরকার (ভাগলপুর)

দিদিভাই!········আমায় কিন্তু লেখণী বন্ধু যোগাড় করে দিতে হবে।······আমার বয়স তেরো, আমি রংমশালের গ্রাহক, আমি ক্লাস IX এ পড়ি। আমার হবি দেশ বিদেশের Stamp জমান, ফটো তোলা, চকোলেটের ছবি জমান ও কুপন দিয়ে জিনিস আনানো।·········ভাই বোনদের ভালবাসা জানাচ্ছি।

সুর্পণা দেবী (কলিকাতা)

দিদিভাই·········ভারী ভয় হচ্ছে তুমি আমায় আর সবার মত আদর করে ডেকে নেবে·········আমি নিজে গ্রাহিকা নই, যে গ্রাহিকা আমি তার দিদিভাই আর তা ছাড়া আমি একজন রংমশালের মুগ্ধ পাঠিকা ······এই দাবীর জোরেই তোমাকে একেবারে দিদিভাই করে নিলাম······জানো দিদিভাই, আমি অনেকের দিদিভাই কিন্তু আমার কোনও দিদিভাই কি মেজদি ছোড়দি নেই। এত মিষ্টি আদর ভরা ডাকগুলো আমি মোটেই ডাকতে পাই না······ভাবছি তুমি যদি আমার থেকে ছোট হও? তুমি তো তোমার কথা কিছুই বলবে না তাই আমিই বলি—আমার বয়স সতেরো বছর, আমি ফেব্রুয়ারীতে I. A. দেবো। তুমি ভাই রংমশালের ভিতর দিয়ে জানিও তুমি আমার চেয়ে বড় কিনা। নাহ'লে কেমন করে 'দিদিভাই' বলবো?······ আমার অজস্র স্নেহ ভালবাসা সকলের জন্য পরিবেশন করে দিও রংমশালের পাতায়······ভাইবোনের নিবিড় সম্বন্ধটি রংমশালের পাতায় পাতায় প্রতিদিন পূর্ণতর হয়ে উঠুক······আমার অনেক ভালোবাসা তুমিও নিও॥

দিলীপ সিংহ (কলিকাতা)

প্রিয় দিদাই, আমি তোমায় অন্য নামে সম্বোধন করলাম বলে কিছু মনে করোনা। আমার একজন দিদিভাই আছে।·········এই ৩রা এপ্রিল আমার ১২ বছর পূর্ণ হবে। আমি স্কটিশ চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুলের 3rd ক্লাসে উঠলাম। আমি রংমশালের গ্রাহক—আমার হবি ডাক টিকিট জমান, ক্রিকেট খেলোয়াড় দের ছবি জমান আর নেকলেশ এর ছবি জমান। আমি আমাদের স্কুলের স্কাউট ও একজন Bendileagues আমার সব চেয়ে প্রিয় খেলা হচ্ছে হকি ও ক্রিকেট। আমি ১৯৩৭ সালে All India Janbooreeতে গিয়েছিলাম। সেখানে সিংহলএ একজন লেখনী বন্ধু পেয়েছি। যদি কোনও গ্রাহক গ্রাহিকা বিলাত বা আমেরিকার লেখনী বন্ধু পেতে ইচ্ছা করে তাহ'লে যেন আমায় জানায়—আমি লেখণী বন্ধু পেতে হলে কি করতে হবে তা জানাবো।·········প্রণাম নিও।

বাঁশরী চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)

দিদিভাই, আমি রংমশালের পাঠিকা······আমি এবার মাট্রিক দেবো, বাড়ীতেই পড়ি, বয়স পনেরো··· কল্পনা ও অঞ্জলির সঙ্গে ভাব করবার জন্য আমি উৎসুক······আরও লেখণী বন্ধু করে দিও।·········

অরুণ চন্দ্র মিত্র (কলিকাতা)

দিদিভাই······আমার সম্বন্ধে প্রথমেই বলে রাখি আমি রংমশালের গ্রাহক নই বাড়ীতে বই আসার অসুবিধা বলে খুচরো কিনে পড়ি······বয়স ১৪ বছর, ক্লাশ XIII এ পড়ি। ষ্টেটস্‌ম্যান বেঙ্গলীগের আমি একজন মেম্বর।······হবি বিশেষ কিছু নেই—ধাঁধার সমাধান করতে ভালবাসি, ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে আগ্রহ বেশী। প্রত্যেক ভাল খেলা দেখে থাকি এবং ঐ সম্বন্ধে কাগজের কাটিংস রাখি······

মাষ্টার সুশীল দাস (ভবানীপুর) গ্রাহক ৭৮৪

দিদিভাই,……আমাদের বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের মাসিক বই প্রায় সব রকমই রাখা হয়, কিন্তু আমি সব থেকে এই রংমশাল কাগজকেই ভালবাসি……আমার মোটে একটি বোন আছে, কিন্তু তারও বিয়ে হয়ে গেছে—যাহোক এবার রংমশালের কল্যাণে কতকগুলি ভাই বোন পেলাম্…… আমার আরতি বোন এবং আরও দু'একজন ভাই বোন যে লিখিছেন তাঁরা গ্রাহক নয় কিন্তু রংমশাল ভালবাসে, তাদের আমি রংমশালের গ্রাহক হতে অনুরোধ করি……এতে আমাদের রংমশালেরই ভাল হবে।……আমি চকোলেটের ছবি জমাই আমার হবি গান করা। আমি বালীগঞ্জ গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ক্লাস IX এ পড়ি।

মুকুল চন্দ্র সেন (বেহালা) গ্রাহক ৯৬২

দিদিভাই……আমি নিশ্চিত জানি বন্ধু পাবই……আমি ক্লাশ VIII এর ছাত্র, হবি ডাক টিকিট সংগ্রহ করা ও ডিটেকটিভ গল্প পড়া ও পাখী পোষা……আমি আপনির চেয়ে তুমি বলতে ভালবাসি…।

রবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (অমৃতসর, পাঞ্জাব) গ্রাহক ১০৩২

দিদিভাই……এই বন্ধু বিহীন বিদেশে রংমশাল আমায় অনেক আনন্দ দিয়েছে…এবার আমি বাংলা দেশের ভাইবোনদের সাথে আলাপ করতে পারবো…আমার পরিচয় দিই…আমার বাবা অমৃতসরের উইভিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। আমার বয়স ১৮ বৎসর, কলিকাতা থেকে মাট্রিক পাশ করে এখানকার হিন্দু সভা কলেজে পড়ছি।…বাংলাদেশের ভাই বোনদের সাথে আলাপ করিয়ে দেন তবেই জানবো প্রকৃত দিদিভাই……।

জীমূত বাহন রায় (কলিকাতা) গ্রাহক নং ৬৩২

দিদিভাই আমার বয়স বারো বছর, আমার জন্ম তারিখ ১লা আষাঢ়, ১৩৩২ সাল, আমি কলিকাতা স্কটীশ চার্চ্চ স্কুলের ক্লাশ VII A তে পড়ি…আমার ছোট তিনটি বোন আছে, আর ভাই নেই,… …সুখের বিষয় এই যে রংমশালের জন্য আরও ভাই বোন পেলাম……আমার হবি হলো ডাক টিকিট নেসেল্স্‌সের ছবি আর ক্যাডবেরিজ চকোলেটের ছবি জমান…আমি উপন্যাস, অ্যাডভেঞ্চার ও জীবনি পড়তে ভালবাসি…… আমার বাবা একজন চিত্রকর……আমায় লেখণী বন্ধু করে দিও…॥

অজয় ঘোষ (এলাহাবাদ) গ্রাহক ৪৫৭

দিদিভাই…… আপনি জন্ম লিখতে বলেছেন, আমার জন্ম ৩রা নভেম্বর ১৯২৩ সালে। আমি এংলো বেঙ্গলী ইণ্টার মিডিয়েট কলেজের VIII ক্লাসের ছাত্র।……

অজয়ের ঠাকুরমা (এলাহাবাদ)

প্রিয় দিদিভাই, আমি রংমশালের একজন নিয়মিত পাঠিকা, আমার বয়স ৬৩ বৎসর, আমার জন্ম ১৮৭৩ সালে হ'য়েছে…রংমশাল পড়িতে আমার খুব ভাললাগে। আমি গল্প পড়িতে খুব ভালবাসি, আর

ঃ ছোট ছেলে মেয়ের সঙ্গে গল্প করিতে আমার খুব ভাল লাগে, তারা আমার বন্ধুর মতন। আমার হবি ়র বোনরে প্যাটার্ণ সংগ্রহ করা, যদি কোন পাঠিকা নূতন নূতন প্যাটার্ণ জানেন তবে রংমশালে ছাপালে, নকার খুব উপকার হবে, আমি ও খুব খুসী হবো।…আমি নিশ্চয় তোমার চেয়ে খুব বড় হবো, অতএব লিখছি বলে, আশাকরি সেজন্য কিছু মনে করিবে না…আমার শুভাশীষ জানিবে।

না বিশ্বাস (মীরাট) গ্রাহিকা ১০২৪

দিদিভাই, সামাজিক জীবনে সামাজিক বন্ধু আমাকে করতে হয় সেজন্য আমার সঙ্গীর অভাব নেই… ং লেখণী বন্ধুর লোভ সামলাতে পারলাম না, তাই লিখছি।…আসছে মার্চে (1938) আমি Matricula-ı দেব। আমার বাবা মীরাট কলেজের অধ্যাপক…আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইনি সেইজন্য আমার ণ পরিচয় দিলামনা…ভাইবোনদের দিদিভাই এই পরিচয় যদি আপনার হয় তাহলে দিদিভাই এর ভাই ং আমাদের এই পরিচয় কি যথেষ্ট নয় ?—

এই পর্য্যন্ত তোমাদের সব গতবারের চিঠি। এবারে যে সব চিঠি পেয়েছি সেও একটাও গেলো না ভাবের জন্য। তোমরা আমার উপর সবাই অভিমান করবে জানি ভাই কিন্তু আমার উপায় কী বলো ? মরা অনেকে লিখেছ নিজেরা গ্রাহক নও—কেউ খুচরো কিনে পড় কেউ এমনি পড়—আরও লিখেছ জন পূর্ব্বে গ্রাহক ছিলে এখন ছোট ভাই এর নামে করেছ—তাহলে কি চিঠি লিখতে পারবে না ? ক্ষেত্রে আমি বলি গ্রাহক নম্বরটা দুজনের নামে করিয়ে নিলেই ভাল হয়। আমি তোমাদের প্রত্যেককে ভাবে ভালবাসি কিন্তু সম্পাদক মশাইদের হুকুম গ্রাহক না হলে উত্তর দেওয়া হবে না আমার উপায় মরাই যদি না কর তাহলে কি করে হবে। আমার উপর সব অভিমান করে চোখে জল আনলে আমি করি বলতো ভাই ? গতবার আমি বলেছিলাম যে এবারটা শুধু যারা গ্রাহক গ্রাহিকা নয় তাদের উত্তর চ্ছি—কিন্তু স্থানাভাবে হয়নি বলে এবার সব উত্তর দিলাম।

শিবাণী বোনটী ! তোমার লজ্জা কাটিয়ে ফেলেছ দেখে খু-উ-ব খুসী হয়েছি। এখন তো তোমার পরীক্ষা কট, খুব ব্যস্ত আছ নয় ? আচ্ছা খুব ভাল করে পরীক্ষা দাও—এবং আমায় জানিও কেমন দিলে। মার পরীক্ষার পর 'লেখণী বন্ধু' করে দেবো ভাই।

বিকাশেন্দু ! স্থানাভাবের জন্য তোমাদের চিঠির উত্তর গতবার দিতে পারিনি, রাগ করবে না ভাই কেউ কারণ তোমরা সবাই আমার সমান। আশীষ নিও।

সুপর্ণা দিদু ! তোমাকে সত্যি আদর করে ডেকে নিয়েছি কিন্তু আমার উপর যে কি আদেশ আছে তা জান ভাই। রংমশাল তোমাদের জন্যই সুতরাং সে যাতে তোমাদের আনন্দ দিতে পারে তার ব্যবস্থা রা করবো। আমি তোমার চেয়ে বড় কিনা জিজ্ঞাসা করেছ ? কিন্তু তুমি অনেকের দিদিভাই হলে কী —দিদিভাই এরও দিদিভাই থাকে জান তো ?

দিলীপ ভাই ! তোমার দিলাই ডাকটী মিষ্টি কিন্তু আমার 'দিদিভাই' ছাড়া যে কিছু হবার উপায় নেই। মাদের সবারই লেখণী বন্ধু করে দেব। গ্রাহক নম্বর, জন্ম তারিখ দিও।

বাঁশরী বোনটী ! নামটী তোমার বেশ, হাতের লেখাটীও—যা চেয়েছ সবই পাবে কিন্তু রংমশাল দল এ যে আসতে হবে দিদি, না হলে আমার তো উপায় নেই।

অরুণ ! তোমার সম্বন্ধে ঐ বাঁশরীদের মত কথাই বলি—তোমাদের রংমশালকে ভালবাস তোমরা সুতরাং তোমাদের ইচ্ছামত কাজ করবে ভাই—'দিদিভাই' তোমাদের সকলের জন্য।

সুনীল ভাই ! দেখছ তো মাণিক তোমায় কত ভাই বোন করে দিলাম—কিন্তু তুমি আমায় কিছু দেবেনা বুঝি ? বেশ ভাল করে লেখা পড়া করো, জানো ?

মুকুল ! তোমার দু'টী চিঠিই পেয়েছি—আগেই বলেছি কেন উত্তর দেওয়া হয়নি ভাই। তোমরা সবাই আমায় 'তুমি' বলে, সেটাই আমার লাগবে খুব।

রবীন্ ! অমৃতসর ও বাড়ী থেকে তোমার দুটো চিঠি পেয়েছি। শেষ চিঠিতে তুমি আমায় এক ভীষণ অপবাদ দিয়েছ যে যারা নাকি লিখতে ভাল পারে আমি তাদের ভালবাসি। একথাটা কিন্তু মস্ত ভুল একথা কি তোমার রংমশালের সব ভাই বোনদের অভিমত ? লক্ষীভাই এধারণা তোমার কেমন করে হলো ? কি লিখতে চাও লিখে পাঠিও সম্পাদক মশাইকে দেবো। রাগ করোনা, বুঝেছ ?

জীমূত বাহন ! তোমার নামটা বড্ড বড় হয়ে গেছে ভাই, ঐ সঙ্গে ডাক নামটী ও যোগ করো। লেখণী বন্ধু দেব।

অজয় ভাই ! তোমার চিঠি পড়ে আমার আনন্দ হয় কেন জানো ? ছোট্ট চিঠির ভিতর সব লেখো সত্যই তুমি পুরস্কার যোগ্য। তা ছাড়া আমার দিক থেকেও সুবিধা হয়।

ঠাকুরমা ! (অজয়ের ঠাকুর মা) আপনাকে আমি সাদরে ডেকে নিচ্ছি। আপনার রংমশাল যে কত প্রিয় তার প্রমাণ আপনার চিঠি। বোনার প্যাটার্ণ সম্বন্ধে এখানে বোধ হয় সুবিধা হবে না ওগুলো 'ভাবী গৃহিণীর বৈঠকের' পরিচালিকাকে জানাবো, আপনিও জানাবেন। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় কি ছোট তাতো জানি না কারণ আমি যে 'দিদিভাই' এটা সকলেরই থাকে। আপনার শুভাশীষ গ্রহণ করেছি আপনি আমার নমস্কার নেবেন।

লীলা বোনটী ! তোমার চিঠি পড়ে খুব হেসেছি—দিদিভাই এর ভাইবোন এ পরিচয় তোমাদের যথেষ্ট কিন্তু লেখণী বন্ধু পেতে গেলে সেটা তো সব নয় দিদি—সেই জন্যই এই ব্যবস্থা—আমার কথা লিখেছ—আমার সব চেয়ে বড় পরিচয় যে রংমশালের দলের দিদিভাই এ ছাড়া কিছু নেই।

তোমাদের চিঠির উত্তর দিলাম—এবার অরুণ বসু ও যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য কে দু একটী কথা জানাচ্ছি। যুগল ! তুমি যে চিঠি সম্পাদক মশাইকে দিয়েছ সেটা দেখেছি—তুমি তো দিদিভাইকে চিঠি দাওনি ভাই। লেখণী বন্ধু পেতে হলে ও 'রংমশালের দল' এর ভিতর আসতে হলে দিদিভাইকে চিঠি দিতে হয় আমি আশাকরি এবার তুমি লিখবে কেমন ?

অরুণ ভাইটী ! তোমার দুটী চিঠি এসেছে। আমার উপর অভিমান করে অত দুঃখ করে কেন লিখেছ দাদামণি ? তোমাদের সকলকে ভালবাসি আমি সমান ভাবে কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম করে সম্পাদক

াই এর উপর তো কথা চলবে না ভাই। আমি কি করবো? এ ব্যবস্থা আমার তো নয় তোমার। এর াংসা তোমার উপর আমি দিলাম। স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও।

সুজাতা রক্ষিত! তোমার চিঠি পেয়েছি। অনেকে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়—ঠিক সময়ে ার লেখণী বন্ধু করে দেবো। আশাকরি তুমি ভাল আছ।

শ্যামল ভট্টাচার্য্য, জগদীশ দাস, লক্ষ্মী ঘোষ, মাণিক বসু, উর্ম্মিলা সেন, কামাখ্যা চন্দ্র বল, তরুণ শঙ্কর ড়ী, গৌরাঙ্গ চৌধুরী, সাধনা সরকার, ক্ষিতিন্দ্র নাথ রায়, শচীন্দ্র নাথ রায়, শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, বপ্রসাদ সেন, বিনয় চন্দ্র, উমা রাণী রায়, রমা সেনগুপ্তা, কল্পনা অঞ্জলি আচার্য্য, প্রতিভা রায়, পরিমল চন্দ্র কার, নিশানাথ দাসগুপ্ত, বকুল সেন, অনন্ত কুমার সিংহ, বিশ্বনাথ লাহিড়ী, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, রতন ার রায়, অনিল ভূষণ দত্ত, নন্দিনী, হৃষিকেশ, সুরমা ও সমর, কমলা দাস, তৈয়েবর রহমান,—তোমাদের লের চিঠির উত্তর পরের বার যাবে। তোমরা সকলে আমার স্নেহ ভালবাসা নিও। ইতি—

প্রীতিপ্রয়াসী—

তোমাদের—

দিদিভাই

— বিশেষ দ্রষ্টব্য —

যে সব গ্রাহক গ্রাহিকাদের চাঁদা চৈত্র মাস অবধি দেওয়া আছে, পরের রংমশালের জন্য তাঁদের আমরা অবিলম্বে চাঁদা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করছি। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠান সুবিধা। ৩০শে চৈত্রর মধ্যে যাঁদের চাঁদা আমরা পাবো না—তাঁদের নিকট বৈশাখের রংমশাল 'ভি পি' তে যাবে। যাঁরা বৈশাখ থেকে রংমশালের গ্রাহক থাকতে চান না, তাঁরা যেন অবিলম্বে সে কথা আমাদের জানান। ভি পি যেন কেউ না ফেরৎ দেন, তাতে আমাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়।



সাহিত্য সাধক শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে

সাহিত্য সাম্রাজ্যের উপন্যাস সম্রাট শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজ আর ইহলোকে নাই ! কিন্তু তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজি বাঙ্গলার এমন কি সমগ্র ভারতের নরনারীর চিত্ত জয় করিয়া রহিল। তাঁহার প্রস্থানে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে শোকের চিহ্ন কেন ? কারণ তিনি মানব জাতিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "টাকায় কিছু হয় না, নামেও কিছু হয় না, যশেও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়।"

শরৎচন্দ্রের বাল্য জীবন দারিদ্র্য ও নানাবিধ বিঘ্নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তাঁহার তিন ভ্রাতার মধ্যে ইনিই জ্যেষ্ঠ। মধ্যম ভ্রাতা স্বর্গীয় স্বামী বেদানন্দ প্রথম জীবনেই সন্ন্যাসী হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের শেষ কাজ সমাধা করেন শরৎচন্দ্র মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন ; কিন্তু পরীক্ষা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ এখানেই শেষ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় রেঙ্গুন চলিয়া যান ও অনেক চেষ্টার পর সেখানে কাজ পান। কিন্তু স্বাধীন চেতার মন কি কাহারও অধীনে কাজ করিতে চায় ? তিনি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ১৩৩৯ সনের ৩১ ভাদ্র শরৎচন্দ্রের সপ্ত পঞ্চাশৎ জন্ম দিবসে তাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য তাঁহার গুণ মুগ্ধ দেশবাসী "শরৎ-বন্দনার" আয়োজন করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশনের তিনি সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "জগোত্তারিণী সুবর্ণ পদক" দ্বারা সম্মানিত করেন, রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই এই সম্মানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। গত বৎসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "Doctor of literature" উপাধি দেন।

শরৎচন্দ্র জীবনে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন দরিদ্রের সেবায় তিনি দান করিতেন। ৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাস এখনও পড়ি নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত "বিন্দুর লে" নামক পুস্তকের "রামের সুমতি' গল্পটী পড়িয়াছিলাম। উহাতে সহজ সরল ভাষায় একটী মের দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রামটীর সমস্ত ঘটনাগুলি ফিল্মের মত আমাদের সম্মুখে সিতেছে। শরৎচন্দ্র মাছ ধরিতে এবং বাঁশী বাজাইতে খুব ভালবাসিতেন। শরৎচন্দ্র যে কেবল নুষের দুঃখ কষ্টে ব্যথিত হইতেন তাহা নহে, সমস্ত জীব জন্তুর উপরেও তাঁহার টান ছিল। হার "ভেলু" নামে একটী দেশী কুকুর ছিল। শরৎচন্দ্র উহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সুখ করিয়া 'ভেলু' যখন মারা গেল তখন তিনি কাঁদিতে থাকেন।

মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে শরৎচন্দ্র "কাশীনাথ" ও "বাল ও শিশু" লেখেন। ১৯১১ সালে নি "রামের সুমতি" "চন্দ্রনাথ ও "বিন্দুর ছেলে" রচনা করেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও নেক বড় বই লিখিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি শিশু সাহিত্যের উপযোগী কয়েকটি ছোট গল্প খিয়াছিলেন তাহা শীঘ্রই পুস্তকাগারে বাহির হইবে। শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য াণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গমাতা তাঁহার সুসন্তানকে হারাইলেন, দরিদ্রগণ ়কে হারাইলেন, আর আমরা হারাইলাম আমাদের কোমল প্রকৃতি, নিরভিমান জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে।

শ্রীবিমল বিলাস পাল।

—:0:—

বড় ও ছোট

কুঁড়িকে ডাকিয়া কহে এক ফোটা ফুল,
"রূপে গুণে আমি তোর চেয়ে ঢের বড়ো;
রূপহীণ তুই তাতে নাহি কোন ভুল,
চারিধারে তোর হয় নাকো অলি জড়ো।"

কুঁড়ি বলে. "ভাই, জেনো তবে এর সাথে
ছোট আছি বটে যাইনিকো আমি ভুলে,
ফুটে কুঁড়ি থেকে উঠেছ যে তুমি সাথে—
অর্থটি এর লেখা আছে তব মূলে॥"

শ্রীষষ্ঠীধন সেন গুপ্ত
গ্রাঃ নং ৯৭৯

কেন ভাল লাগে?

(মাঘ মাসের পুরস্কার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে)

রূপকথা—

খুব ছোট বেলায় যখন একটু একটু বুঝতাম তখন থেকেই আমার গল্পের একটা নেশা ছিল। নিজে তখন অ আ শিখিনি তাই আব্দার ধরতাম নিষ্কর্মা ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমা চোর-ডাকাত, ভূতের বা হাসির গল্প বলতেন না। গল্প আরম্ভ করতে বললেই, তিনি আরম্ভ করতেন, 'এক যে রাজা.........' তারপর গাছের গোড়ার মত একই জায়গা থেকে আরম্ভ করে যে কত গল্প বলতেন তার ঠিক নেই! এগুলো স্বপ্নের মত আমার চোখের সামনে ভাসে। যখন অনেক ছোট ছিলাম মনে আছে—কাঠের ঘোড়ায় চেপে একটা গাছের ডাল নিয়ে আমার রাজপুত্র হবার ইচ্ছে হত! ভাবি, কে এই সরস সুন্দর রূপকথা আবিস্কার করেছে? আমার মনে হয়, রূপকথা বোধহয় স্বর্গ থেকে ঠাকুমাদের কাছে নেমে এসেছে। এসব কোন মানুষের তৈরী নয়। মানুষেব তৈরী কি কখনও অত সুন্দর হয়?

শ্রীঅরুণকুমার রায় (গ্রাঃ নং ৯৮১)

সবচেয়ে ভাল লাগে আমার রূপকথা। তার প্রথম কারণ, দিনের সাথে সাথে পা মিলিয়ে চলতে চলতে শিশু হয় যুবক, যুবক হয় প্রৌঢ়, প্রৌঢ় হয় বৃদ্ধ, শিশুমন কিন্তু হারায় না, আর এই চিরশিশুমন অমর বলেই রূপকথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই ভাললাগে। রূপকথায় যেন বিশ্বের সকল আনন্দ, শিশুমনের সকল সৌন্দর্য্য লুকিয়ে রয়েছে। তেপান্তরের মাঠ, বন্দিনী রাজকন্যা, জীবন মারণ কাঠি, রাজপুত্র—অন্য কোন অরূপ কথায় এদের একত্র জমায়েৎ হবার অধিকার বা আদেশ নেই যেন। রূপকথা ফুরোয় না, তার সুর মনের কোণ থেকে কখনও হারায় না।

শ্রীশচীধন সেন গুপ্ত (গ্রাঃ নং ৯৭৯)

উপন্যাস—

যখন থেকে গল্প পড়তে শিখেছি, উপন্যাস বিশেষ করে এ্যাডভেঞ্চার আমার এক অদ্ভুত নেশায় মাতিয়ে তুলেছে। কয়েকঘণ্টার জন্য আমি যেন এক নূতন কল্পনা রাজ্যে ঘুরে বেড়াই, মনের মধ্যে নূতন নূতন কল্পনা জেগে ওঠে। মনে হয় আমি যখন বড় হব, কত না রহস্যজনক ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটন করব, কত অসমসাহসিক কাজ করে জগতে নাম রেখে যাবো, কত নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার করে জগতে নূতন আলোর শিখা জ্বালিয়ে দেবো। জগতের লোকেরা হয়ত আমার নিজের জীবনের এ্যাডভেঞ্চার নিয়েই পড়তে বসে যাবে।

শ্রীঅলক ঘোষ (গ্রাঃ নং ৯৭৬)

অসাধারণত্বের নেশা বোধহয় সকল মানুষের মধ্যেই আছে। আদিম যুগ থেকেই ৎতি দেবী তাঁর প্রিয় সন্তানদের মধ্যে একটা তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে চায় কেবল নতুন একটা কিছু যা সাধারণের বাস্তবতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বহু বহু উর্দ্ধে উঠেছে। অপরিমিত প্রবল কল্পনার আগ্রহের ফলেই বর্ত্তমান সভ্যতা আর বিজ্ঞানের এই দ্রুতগতি। উপন্যাসে একটা বৈজ্ঞানিক কল্পনা, যার মধ্যে কল্পনা বিলাসী চিরন্তন পিপাসী মন রয়েছে, ত সুদক্ষ শিল্পীর যাদুস্পর্শে মানুষের কল্পনা বিলাসী মন রাশ ছেঁড়া ঘোড়ার মত ছুটে যায় উপন্যাস আমার খুব ভাললাগে।

শ্রীকামাক্ষা চন্দ্র বসু (গ্রাঃ নং ৮০৩)

বন্ধ—

কোন জিনিষ কেন ভাললাগে, এই প্রশ্নের উত্তর কোন মানুষ আজ পর্য্যন্ত সঠিক দিতে রে নি। আমার সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমার এই ভাল লাগার মূলে য়েছে—আমার সবকিছু জানার কৌতুহলী মন আর বর্ত্তমান জগৎ। পৃথিবীতে মানুষ অনেক ছু জানবার জন্য প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করছে। এই সব জানতে প্রবন্ধই আমাদের সবচেয়ে হায্য দেয়। তাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে প্রবন্ধ পড়তে, বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ সহজ সরল ভাষায় লেখা সেই সব প্রবন্ধ।

শ্রীদেবেনাথন্দ্র মণ্ডল বর্ম্মণ (গ্রাঃ নং ৪৯২)

ীবনী—

আমার সবচেয়ে ভাল লাগে জীবন চরিত পড়তে। যাঁরা এই মর্ত্ত্য লোক থেকে চলে য়েও অমর হয়ে রয়েছেন, তাঁদের মত হয়ে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখতে হলে, সে সব স্বীদের জীবন কাহিনীর সাথে পরিচিত হতে হয়। জীবন চরিত যেমন অশেষ আনন্দ দান রে তেমনি উপকারও করে অনেক। আমরা জানতে পারি কেমন করে মহৎ লোকেরা বন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁরা কত বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে কেমন করে গ্রসর হয়েছিলেন। জীবন চরিতকে একজন নির্ব্বাক শিক্ষকের সাথে তুলনা করা যেতে রে। জীবন চরিত পাঠ করতে করতে আমাদেরও মহৎ হবার একটা অদম্য স্পৃহা গে ওঠে।

শ্রীঅধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী (গ্রাঃ নং ৩৩১)

‘রংমশাল দল’

দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মানুষের স্বভাব—মানুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই এ লা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে ফেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলী হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্য ভাবতে শিখি, একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তৃত হয়।

এতখানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে আছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করেছি—**রংমশাল দল।**

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জন্যে যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা সবাই এক দলের। দলের বীজ সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল **আনন্দ** আর **আলো।** রংমশাল দলেরও আদর্শ পরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ে দরকার হয় সেই জন্যে রংমশাল দলের ব্যাজ হবে ‘**মশাল**’। সুন্দর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাজটি তৈরী হয়েছে তোমাদের জন্য; ব্রুচের মত ব্যবহার করবে তোমাদের পোষাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায়

নিয়মাবলী



রংমশাল দলের "ব্যাজ"

(১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জন্যে কোন আলাদা চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাজ পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে।

(২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।

(৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।

(৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ব মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।

(৫) সমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার। সেজন্য কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।

(৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, 'দিদিভাই' C/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।

(৭) সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অন্য কোনও ব্যাপার—'দিদিভাই' এর ইচ্ছাধীন।

(৮) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।

(৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর সবার উপর সমান দৃষ্টি থাকবে।

(১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

রংমশাল দল
কুপন

নাম...গ্রাঃ নং..................

জন্ম তারিখ.....................স্কুল বা কলেজ, শ্রেণী..

পিতা বা অভিভাবকের নাম (তাঁর স্বাক্ষর)..

ঠিকানা..

....

লেখনী বন্ধু চাই কিনা..

হবি (Hc bby)..

পৌষ মাসের প্রতিযোগিতার
ফলাফল

ছোটদের মধ্যে প্রথম—

শিপ্রা সরকার, বয়স ৬ বছর ৮ মাস। গ্রাঃ নং ৭৯৪, কলিকাতা।

গল্পের নাম—কর্ণ ও কুন্তীর কথা।

বড়দের মধ্যে প্রথম—

পবিত্র গুপ্ত, বয়স ১৪ বছর। গ্রাঃ নং ৯১১, পাটনা।

গল্পের নাম—'শবরীর প্রতীক্ষা'।

পুরস্কার প্রাপ্ত এই গল্প ছুটি ভবিষ্যতে রংমশালের কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। পুরস্কার দেওয়া হবে বৈশাখ মাসে।

মাঘ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রতিযোগিতায় নীচের লিষ্টের সঙ্গে যাদের সবচেয়ে মিল হয়েছে তাদের মধ্যে হয়েছেন—

প্রথম— { শ্রীঅমিতাভ বন্দোপাধ্যায় (গ্রাঃ নং ৬৩৫)
শ্রীপবিত্র গুপ্ত (গ্রাঃ নং ৯১১) }

দ্বিতীয়— { শ্রীবাসুদেব বসু (গ্রাঃ নং ৫৯৯)
শ্রীঅধীর চন্দ্র রায়চৌধুরী (গ্রাঃ নং ৩৩১) }

পুরস্কারগুলি ভাগ করে দেওয়া হবে

যে সব গ্রাহক গ্রাহিকা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের ভোটে এই গুলি শ্রেষ্ঠ :—

উপন্যাস— পৃথিবী ছাড়িয়ে

রূপকথা— { ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা
কাজল জল }

গল্প— { খেয়ার মাঝি লক্ষীনাথ
হলধর ও ইন্দ্র সেন }

নাটক— { ভিটামিন
দিদি }

প্রবন্ধ— জেপেলীন

জীবনী— কামাল পাশা

ভ্রমণ কাহিনী— রামটেক ও খিণ্ডসী

কবিতা সম্বন্ধে নানা মত ভেদ হয়েছে। এইগুলি সাধারণতঃ গ্রাহকগ্রাহিকাদের পছন্দ হয়েছে :—

বাড়া তৈরী ; রেলগাড়ী ; মাটির স্বর্গ ; কেলেঙ্কারী ; নাচের কবিতা ; খুকুর পুতুল ; কিচ্ছু না ; কাজের ভাগ ; ভোলার কাণ্ড ; গরমিল ; বদ্রীচৌবে।

এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে—'কেন ভাল লাগে' কয়েকটি রচনা আমরা রংমশাল বৈঠকে প্রকাশ করলাম।

নূতন ধাঁধা

("উল্টা বুঝ্‌লি" ছবি)



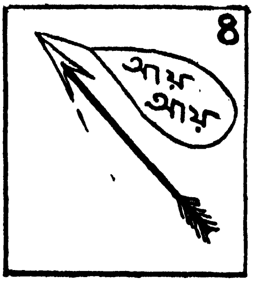
কি হচ্ছে? নীচে কয়েকটি হেঁয়ালি ছবি দেওয়া হয়েছে। কোন্‌টিতে কি বোঝাচ্ছে বলতো? উত্তরগুলি 'চলিত কথায়' দিতে হবে।

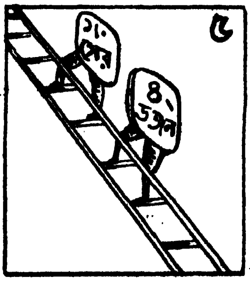
উদাহরণ স্বরূপ, পাশের ছবিটিতে দেখান হয়েছে "কানে তালা লেগেছে"। কিছু শুনতে না পেলে আমরা এরূপ চলিত কথা ব্যবহার করি।













—গত মাসের ধাঁধার উত্তর—

১। অপকার; বিকার ২। কারণ ৩। আকার ৪। কারক ৫। ঝঙ্কার
৬। কারখানা ৭। কারবার ৮। কারা; কারাগার; প্রাকার ৯। অলঙ্কার

গত মাসের উত্তর দাতাদের নাম

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম :—

কুমারী স্মৃতি রায়, (শিলচর); প্রফুল্ল কুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর); জগদিন্দ্র নাথ রায়, (ভবানীপুর); বীরেন্দ্র কিশোর দাসগুপ্ত, মনুজেন্দু ও পূর্ণেন্দু দত্ত মজুমদার, (বাজিত পুর); অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, (পাবনা); ষষ্টিধন সেনগুপ্ত, (শালকিয়া); অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, (ভবানীপুর); প্রশান্ত ও অনন্ত কুমার সিংহ; (শ্যামবাজার); অরুণ কুমার বসু ও শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, (পাটনা); রবীন্দ্র নাথ শেঠ (কলিকাতা); পিন্টু, মিন্টু ও বাবলা, (কলিকাতা); হৃষিকেশ, মাধব, মন্টু ও নিবারণ, (শ্রীহট্ট); কানাই চন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ); অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা); উমা, বেলা ও বেবী, (ভবানীপুর); শ্যামানাথ মুখার্জ্জি, (জলপাইগুড়ি); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল, (শালখিয়া); পরেশ চন্দ্র মাইতি (ভবানীপুর); উৎপল গুপ্ত, (বালিগঞ্জ); সাধনা, অর্চ্চনা, গোপাল, রাখাল, (গৌহাটি); অমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর)।

যাদের একটি মাত্র ভুল হইয়াছে :—

কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জি, (শ্যামবাজার); সুজাতা রক্ষিত, (নাইনিতাল); যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভবানীপুর); শচীন্দ্র নাথ রায়, (হাওড়া); কুমারী প্রীতিশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়, ও জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, (বাঁকিপুর); কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য, (নাগপুর); কনকেন্দু ভট্টাচার্য্য, (পাটনা); অমলা চাটার্জ্জি, (ভবানীপুর); সুবিমল বসু ও রেণুকণা বসু, (বাগেরহাট); শ্যামল, অমল, চুণী, কটিক ও শচীন, (কুড়িগ্রাম); সাবি, দুর্গা লক্ষ্মী, রেণু, করুণা গীতি, কল্পনা, গোপাল, বেবী, সতী ও রথীন্দ্র মৈত্র, (রাজসাহী); রমেশ চন্দ্র রায়, (বনাইগড়); নৃপেন্দ্র নাথ ও ইলা সেন, (বহুবাজার); অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, (কলিকাতা); অরুণ কুমার রায়, (ভবানীপুর); প্রশান্ত কুমার ঘোষ, (ধুবড়ী); শিব প্রসাদ সেন, (নিউ দিল্লী); ক্ষিতীন্দ্র নাথ রায়, (কুড়িগ্রাম); ধীরেন্দ্র কুমার সরকার, (ঢাকা)।

এ মাসের রংমশালে গোড়ায় এবার যে রঙীন ছবিটি "স্বপ্নের দেশে"—তোমরা দেখছ, এই ছবিটির বিষয় নিয়ে একটি সুন্দর ছোট্ট কবিতা রচনা করা যায়! এবারের প্রতিযোগিতা দেওয়া হল তাই—এ ছবিটির বিষয় নিয়ে তোমাদের একটি সুন্দর কবিতা রচনা করতে হবে। কবিতাটি রংমশালের একপাতা বা দু'পাতার বেশী বড় যেন না হয়। গ্রাহক-গ্রাহিকা ও যে সমস্ত পাঠক পাঠকরা এজেণ্টের নাম দিতে পারবেন, তাঁরা সকলেই এ প্রতি-যোগিতায় যোগ দিতে পারবেন। এই কবিতা প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার আছে। একটি বার বছরের নীচে যাদের বয়স তাদের জন্য আর একটি যাদের বয়স বারো বছরের ওপর। নীচে আমরা একটি কুপন দিলাম, কুপনটি ভর্ত্তি করে কবিতার সঙ্গে রংমশাল কার্য্যালয়ে পাঠাতে হবে। পাঠাবার শেষ দিন ২৬ শে চৈত্র, ১৩৪৪।

কুপন

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

নাম.. গ্রাহক নং ....

এজেন্টের নাম

বয়স........

পিতা বা অভিভাবকের নামের স্বাক্ষর..............................

রং মশাল—



শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

রংমশাল

দ্বিতীয় বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা

বৈশাখ
১৩৪৫

‘হাসির কথা নয়’

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বালিশ নেই সে ঘুমোতে যায়
মাথার নিচে ইঁট দিয়ে।
কাঁথা নেই, সে পড়ে থাকে
রোদের দিকে পিঠ দিয়ে!
শ্বশুর বাড়ি নেমন্তন্ন,
তাড়াতাড়ি তারি জন্য
ছেঁড়া গামছা পরেছে সে
তিনটে চারটে গিঁঠ দিয়ে।

ভাঙা ছাতার বাঁটখানাতে
ছড়ি করে চায় বানাতে,
রোদে মাথা সুস্থ করে
ঠাণ্ডা জলের ছিট দিয়ে।
হাসির কথা নয় এ মোটে,
খেঁক শেয়ালিই হেসে ওঠে
যখন রাতে পথ করে সে
হতভাগার ভিট দিয়ে॥

——০——



বাদশাহী গল্প

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাদোশাবাবু বল্লেন—"দাদামশা, ভূতপত্রীর দেশ দেখা শেষ করে কোথায় গেলে ?"

—"গেলেম একটা জায়গায় !"

—"কিসে গেলে ? পাল্কিতে ?"

—"না !"

—"রেল গাড়ীতে ?"

—"না !"

—"পায়ে হেঁটে ?"

—"না !"

—"ইষ্টিমারে ? মটোরে ? উড়োজাহাজে ?"

—না ?"

—"তবে ?"

—"শোন বলি—

'জলপথ, স্থলপথ, আকাশপথ—এইতো তিনটা

জলেতে চলি সাঁতার কাটি

থলেতে চলি ধরে লাঠি

আকাশ পথে স্বপ্নে হাঁটি

তবু ছাড়েনা বিপদ আপদ সঙ্গে লেগে আছেই

—কোথাও একটা যাবার চিন্তা!'

কোথায় যাই, কিসে যাই—এই ভাবছি সারা দিনটা!"

—"একটা কাঠের ঘোড়া কিনে বেরিয়ে পড়লে না কেন দাদামশা? কিম্বা মশার পিঠে চড়ে?"

—"গিয়েছিলেম মশার পিঠে চাপতে; সেটা বল্লে—

'তোমার ঐ গজগিরি দেহ গুরুভার
সাধ্য নাই বহা ক্ষুদ্র মশার
কিম্বা যুদ্ধ ঘোড়ার
জল-পী-পী কাঠের ঘোড়া তো কোন্ ছার!'

গেলেম আলিপুরের চিড়িয়াখানায়। সেখানে উটপাখীকে বল্লেম,—

—'আমাকে একবার ঘুরিয়ে আনতে পারো?'

সে বল্লে—'রোজ তিন মোণ করে লোহার পিরেক যদি খাওয়াতে পারো তো রাজি আছি!'

সোনার সঙ্গে সমান দরে বিকোচ্ছে বাজারে লোহা জেনে উটপাখীর আশা ছাড়লেম। উট বল্লে—'যদি আলু-কাবুলি আর আলুবোখারা খাওয়াতে পারো সাড়ে বত্রিশ সের করে দুবেলা, তো এসো নয় তো যাও' বলে ডাঙার জাহাজ—সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। বন মানুষটা নীচের ঠোঁট উল্টিয়ে আমাকে ভেংচে দিলে। হাতি গজদাঁত বার করে হেলে দুলে হাসতে থাকলো—নীরব হাসি!

জানোয়ারদের খোসামোদ করতে ঘেন্না ধরলো। তখন মনের দুঃখে ঘরে এসে নিজের চৌকিতে একটু জিরোতে বসলেম,—ছারপোকার ভয়ে পুরোনো আসনখানা পেতে।"

—"এইবার বুঝেছি, দাদামশা ছারপোকার পিঠে চড়ে চল্লে!"

—"ঠিক ধরেছ, বাদশাবাবু, এতক্ষণে ঠিক ধরেছ! বার হলেম ছারপোকার পিঠে—'আসুন বসুন' লেখা আসন পেতে।"

—"তখন কি হল?"

—"এই মনে হচ্ছে ভাসছি জলে
এই বোধ হচ্ছে যাচ্ছি থলে
—গ্রাম হতে গ্রামান্তরে;
পরেই মনে হচ্ছে—গরু গাধা ছাগল ভেড়া হাঁস মুর্গি

তাদের সঙ্গে চড়ছি, আবার উড়ছি একস্তরে।
বন হতে বনান্তরে—দিক হতে দিগন্তরে।

পথের পন্থি এমনি বোধ করছি যেন—
মাছরাঙা হয়ে মাছ গিলছি—হঠাৎ কাঁটা বেধেছে গলে !
অমনি "অবাক" বলে, আসন ফেলে দিয়েছি এক লাফ—চৌকি ছেড়ে !"
—"এরে দাদামশায়কে ছাৎপোকা কামড়িয়েছে !"
—"আরে না ভাই না, হাসি না—শোননা বলি—
জেগে দেখি অন্ধকারে ভুনেশ্বরের মাঠে চকাচোঁও লেগে দাঁড়িয়ে গেছি ! চেয়ে দেখছি—

'আঁধার পরে চাঁদের কলা
কতক কালো কতক ধলা।
উত্তরে উঁচা দক্ষিণে কাৎ
মেঘ একখানা বিরাট

—কোন দেশ হতে আসছে, কোথায় যাচ্ছে কিছু যায়না বলা।

গুম্তিঘর একটা তারি তলায়
তেলকালি পড়া বেজায়
সেটার চূড়ায় পেটা লোহার ভুষুণ্ডি কাক
—এক পা তুলে বুড়োমানুষকে দেখাচ্ছে কলা।"

—"গুম্তিঘর কারে বলে দাদামশায় ?"
—"কে জানে ভাই দেখে মনে হলো সেটা গুম্তিঘর।

'কে জানে ভুৎখানা কি গুম্তিঘর
ধাঁচাখানা
খাঁচাপানা
কোন লুপ্ত যুগের গুপ্ত কৃষ্টির দিচ্ছে খবর
বারন্দা দিচ্ছে গান্ধার শিল্পের গন্ধ
মৌর্য্য শিল্পের শৌর্য্য বোঝাচ্ছে
সারি সারি জানালা দরজা আঁটসাঁট বন্ধ।
অলিন্দে বারেন্দ্র শিল্পের সারি সারি কবন্ধ

মাথার জন্যে অপেক্ষা করছে একটানা।

সদর দোরে পাল রাজাদের পাল্কি আছে পড়ে একখানা।'

—কোথায় এলেম কিছু ঠিক নাই

মনে ভাবছি আগাই না পিছাই।

এমন সময় নাক কাটা দুই মূর্ত্তি এসে হাজির। খোনা খোনা নাকি সুরে বলে—'এই অবু কবু, নমস্কার। কেমন আছেন?' "

বলেই দুজনে গীত ধরলেন—

'ভালো আছেন তো? ভালো আছেন তো?

দেখছি কাহিল নিতান্ত;

মন প্রাণ তো—আছে শান্ত?

চিন্তে পারছেন তো?

উপদেব উপাধ্যায়, প্রভূত সামন্ত

ভূতখানার কিউরেটার ও তাঁ আসিষ্টান্ত!'

দেখি একটা কিছু জবাব না দিলে অশিষ্টতা হয়, বল্লেম—'ভালো আর কি? যেতে তে রয়ে গেছি। প্রায় হয়েছে প্রাণান্ত; কই মশায়দের স্মরণ হয়না তো!' "

—'কি আশ্চর্য্য! কত কালের ফ্রেনশিপ্

একদম মেমারি স্লিপ্?

আমরা কিন্তু ধরেছি ঠিক। আপনি অবনীবাবু না হয়ে যাননা! শিল্প-প্রাণ শিল্পিপ্রেদান ল্পাচার্য্য আমরা আপনার—'বলেই দুই প্রভূতে আমার দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্লো।

আমি ভাবছি যাচ্ছি কি যাচ্ছিনা। তারা বলছে—'চলেন চলেন, চলেন, দেখবেন লন—আমাদের ভুৎখানার অদ্ভুত কলেকসন্টা!'

প্রভূত বল্লেন—

'ভুৎ খানাটি ভুনেশ্বরের পরগণার

ভভারতের অধুনালুপ্ত কৃষ্টির রত্ন সমষ্টির

বল্লেও চলে একটি বিশেষ রত্নভাণ্ডার।'

উপদেব বল্লেন—

'এখান থেকে দেখেন ধাঁচাখানা বাড়িটার

সত্যি বলেন, কেমন লাগছে আপনার ?'

আমি আর কি বলি ! মুখে এলো—'ভূতগত ব্যাপার' সামলে বল্লেম '—চমৎকার !

চৌকোস যেন লখিন্দরের মাঞ্জামটা লোহার

গম্বুজটি যেন মাহেঞ্জোদাঁড়োর তিজেল হাঁড়ি

তোরণ মকরটি যেন পোড়া মৎস্যটি নলরাজার !'

—'বলেন তো পরিকল্পনাটি কার

সারা বাড়ীখানার ?

দেখি ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন কতদূর এগিয়েছে আপনার ?'

আমি তখন ভূয়োদর্শন করব কি, চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

একবার মনে হলো বলে ফেলি —'ধীমান বিট্‌পালং এর।' কিন্তু কি জানি করে কপাল ঠুকে বল্লেম—'শ্যাম মিস্তিরীর কাম্বোডিয়ার !'

উপদেব একটুখানি হেসে বল্লেন, নিজের বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে—'আমার !'

প্রভূত বল্লেন—'চলেন, ভিতরটা দেখেন একবার !'

খট্‌ করে একটা তালা খোলার শব্দ হলো। কালচিটে নিবিড়ান্ধকার ভেদ করে, ভিতরে ঢুকে দেখে, ফিকে ফিকে তিমির সঞ্চার ! ডাইনে বাঁয়ে ভূৎখানার দুই মহাপ্রভূতে লিষ্টি ধরে দেখিয়ে চল্লেন। আমিও দেখে চল্লেম।

—'শেষু নাগবংশীদের সিল্—ভারলাগ্ ওষ্টাইরিন হতে সংগ্রহ করা !'

—'কালিদাসের ঘোঁটন কালির একটুকরো !'

আমি বল্লেম—'বর্ণচ্ছটায় কোক্‌কে হারায়। কোথায় পেলেন এটি ?'

—'নিউ কাস্‌ল্—পাঁচ নম্বর জেটি,

কয়লার দরে পাওয়া গেছে—এ রত্নটি !'

—'দেখেন, সগরাশ্বমেধের ঘোড়ার আক্কেল দাঁত

সিলোনে পাওয়া মাটির তলায়—পাঁচহাত !'

আমি বল্লেম—'এটা কি ? যেন গুলে পোড়া শীতল পাটি !'

—'আজ্ঞে না, নটী বেহুলার মেথুলা সাটি !'

—'ওটা কি, শাঁখ ভাঙা নাকি ?'

বাদশাহী গল্প
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—'লখিন্দরের মালাই চাকি !'
—'কি একটা গজালের মতন ?'
—'লৌহদন্ত মুনির দাঁতন !'
—'এটা বুঝি কাগের পালক ?'
—'আজ্ঞে না, আলেকজাণ্ডারের বিউকিফেলার ঘোড়ার চক্ষের পালক !'
—'কটি কাঁচ পোকার ডানা না ?'
—'আহা দেখে পায় কান্না—লক্ষ্মণসেনের পেলেট্ ভাঙা।'
—'এটা যে দেখি ভাঙা বোতল !'
—'আজ্ঞে না মশায়, সম্রাট অশোকের গড়গড়ার মুখনল !'
—'ও যে পড়লো একটা কাগজের চিরকুট !'
—'আহা, উপগুপ্তের প্রেমপত্রের কোন্ একটুক্
করকোষ্ঠি ভাষায় লেখা—শুঁকে দেখেন,
লোধ রেনুর গন্ধ পাবেন—অত্যল্প খুব।'
—'দেখেন, অজন্টা গুহার দোরের ছিট্‌কিন্ !'
—'যেন আজকালের একটি চেপ্টিপিন্ !'
—'পাহাড়পুরের কাঁচা ইঁট এক খান !'
—'মহেঞ্জোদাঁড়োর ব্যাঞ্জোর কান।'
—এটা বুঝি নারদ মুনির পিয়োনোর তার ?'
—'অদ্ভুত শিল্পদৃষ্টি আপনার !
—লম্বা আঙ্গুল দেখেই বুঝেছি।'
—'বাইরে পড়ে ওটা কি ?'
—'মৈপাল রাজার সুখপাল পালকি !'
—'তা হলে আমি ওটাতেই উঠি, আর কি ?—নমস্কার !'
—'বড়ই চল্লেন তাড়াতাড়ি
দেখান হলোনা চাঁদ সদাগরের হেঁতাল বাড়ি
নেতা ধোপানীর পাট
বড়ু চণ্ডীদাসের দোয়াত
বাংলার কৃষ্টি সবই গেল বাদ

—দেখলে হতো কাজ ভার !'

আমি বল্লাম—'পরে আসবো যদি সময় করতে পারি !'

—'যে রূপ দিন কাল পড়েছে মশায়, দেখেন বল্লালসেনের ব্রাহ্মণ-ভোজনের খুরি গেলাস মেটে হাঁড়ি !

—'তা হলে যাই এখন সুখপালে হই কাৎ !'

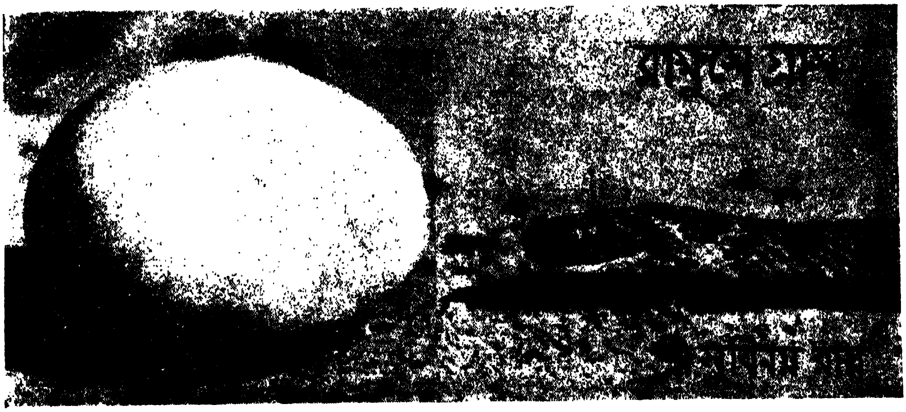
—'তা হলে যাই এখন সুখপালে হই কাৎ !'

—'প্রণিপাৎ দণ্ডবাৎ—একটা দিয়ে যান অটোগ্রাফ !'

পকেট খুঁজতে গিয়ে দেখি, পকেটও নেই, সোয়ান কলমও নেই, কামিজটাও লোপাট্ !

জেগে দেখি হঠাৎ হয়ে গেছি ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।"





তোমার-আমার মতন তো নয়, যে, রোজ চারবেলা নানা রকমের খাবার তৈয়ারী
ছে ;—খেয়ে নিলেই হ'লো। সাপ বেচারার আর সেটি হবার জো নাই। বেচারার
ার জোটে কালে-ভদ্রে ; কাজেই একবারে ভাল-রকম ভোজ না হ'লে আর উপায় নেই।
য়ে বা কামড়িয়ে খাবারও সুবিধা নাই ;—গিলে খেতে হবে। নিরামিষ নয় যে, বড়
ছের একটা ফল টপ্ ক'রে গিলে ফেল্‌বে। আমিষ হওয়া চাই।

কিন্তু, প্রকৃতির ব্যবস্থা বড় সুন্দর। যা'র যেমন অবস্থা বা আবশ্যক, তা'র জন্য
স্থাও সে রকমেরই। সাপ বেচারার খাবার চাই অনেকখানি একসঙ্গে,—আবার গিলেও
ওয়া চাই ; কাজেই, তা'র মুখটি সে কাজের উপযুক্ত ক'রে তৈয়ারী করা
ছে।

অজগর নামটি হয়েছে ছাগল (অজ) গিল্‌তে পারার ক্ষমতা থেকে। রাক্ষুসে হাঁ ক'রে
গর সাপ ছাগলকে গিল্‌তে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে গিল্‌বার কাজটি শেষ ক'রে সে
কবারে পেটটি ঢাক ক'রে মড়ার মত নিশ্চল হ'য়ে পড়ে থাকে। এই অবস্থায় কতদিন
কেটে যায় কে জানে ? কয়েক সপ্তাহের ভোজ তো হ'য়ে গেছে ; কাজেই আর ভাবনা
ই। ক্রমে পেটের অবস্থা স্বাভাবিক হ'য়ে গেলে সে ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়া'তে পারে। তখনও
'র ক্ষিধে হয় না। সবে তো খাবার হজম হয়েছে। কিছুকাল এইভাবে থেকে একটু
া-ফিরা ক'রে, তা'র ক্ষিধে হ'তে আরম্ভ হয়। তখন আবার একটি জীবকে গিল্‌বার
ষ্টায় থাকে।

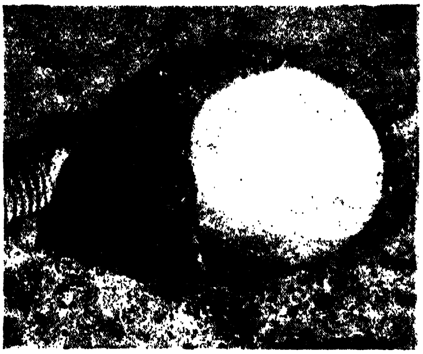
শীতকালটি অজগর (এবং অন্যান্য সাপেরাও) ঘুমিয়ে কাটায়। তা'র আগে বেশ এক-পেট খেয়ে নেয়। শীতের পর আবার খাবার খোঁজে! কাজেই বুঝতে পারছ, অজগর ক'বার খায় ;—বড় জোর বারচারেক।

অজগরের মত অন্য সাপেরাও রাক্ষুসে গ্রাসে খায়। তা'দেরও তো অবস্থা একই। কিন্তু, সব সাপেরই মুখের গড়ন এমনই সুন্দর, যে, প্রকাণ্ড বড় গ্রাস মুখে নিয়েও বেকায়দায় পড়েনা।



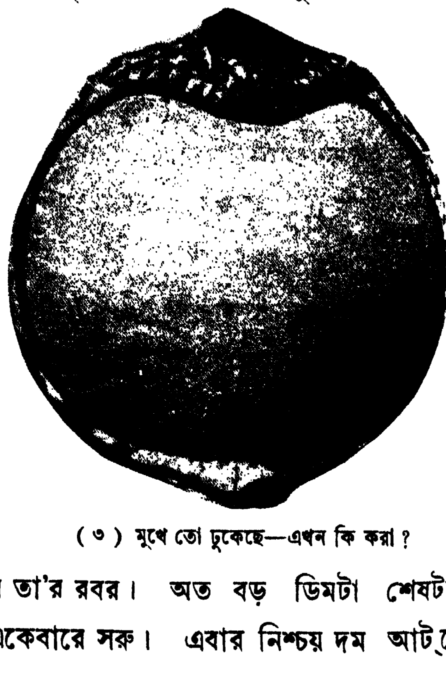
(১) রাক্ষুসে হাঁ ক'রে মুখে ঢুকাবার চেষ্টা

সাপের ডিম খাওয়ার এই যে ক'টি ছবি দিলাম, তা'থেকেই বুঝ্‌বে ব্যাপারখানা। সাপের মুখের সঙ্গে ডিমের তুলনা ক'রে দেখ



(২) রাক্ষুসে হাঁ ক'রে মুখে ঢুকাবার চেষ্টা

একবার ;—মনে হবে, এত বড় ডিম গেলা ঐ ক্ষুদে সাপের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বিরাট একটি হাঁ ক'রে আস্তে আস্তে ডিমটিকে তো সে মুখে দিল ; কায়দা ক'রে ঢুকিয়েও দিল। তা'র পরে তা'র যে অবস্থা হ'লো সেটি ভাল ক'রে দেখবার জন্য সাম্নে থেকে একটা ফটো তোলা হয়েছে ;—এই বুঝি ঠোঁটের কোণা চিরে যায়! বেচারার অবস্থা একেবারে কাহিল ব'লে মনে হচ্ছে।

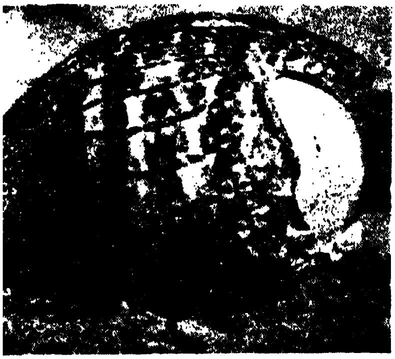


(৩) মুখে তো ঢুকেছে—এখন কি করা ?

কিন্তু, সেও ছাড়্‌বার পাত্র নয়। গলা যেন তা'র রবর। অত বড় ডিমটা শেষটায় মুখে তো ঢুক্‌ল ; কিন্তু, এখন উপায় ? গলা যে একেবারে সরু। এবার নিশ্চয় দম আট্‌কে

রাক্ষুসে গ্রাস
শ্রীসুবিনয় রায়

ওকি! এ আবার কি হ'লো? ডিমের খোলা যে মুড়্‌মুড়িয়ে ভেঙ্গে গেল। সাপের র মাংস পেশির জোর তো কম নয়! এবার তো মজা; ডিমের ভিতরের তরল অংশটি ং' ক'রে গিলে খেয়ে ফেলে, একটি 'ওয়াক্' তুলে খোলাটি ফেলে দিয়ে সাপভায়ার নিশ্চিন্ত ্যসিদ্ধি হয়ে গেল।





(৪) (৫) এবার মুখের ভিতরে গেছে—দম বুঝি আটকায়



(৬) মাংস পেশির জোরে খোলা ভেঙে সারটি খেয়ে নিল;
তারপর "ওয়াক" তুলে খোলা ফেলে দিল

জন্তু জানোয়ার বা পাখী গিল্‌বার সময় অবিশ্যি 'ওয়াক্' তুলে তা'র ছাল-হাড্ডি ইু ফেল্‌বার উপায় নাই; সব শুদ্ধই গিলে হজম কর্‌তে হবে। তবে, তা'র জন্য সময়ও ওয়া যায়। ডিমটিকে তো আর গলায় রেখে দেওয়া যায়না;—কিছুক্ষণ থাক্‌লেই াভায়ার দম আট্‌কে দফা শেষ হবে; কাজেই, ঐ ভাবে খোলা ভেঙ্গে সারাংশ গিলে য় ফেলা ছাড়া উপায় নাই।



ঠিকেভুল

শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী বি. এ.

এ একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা।.....

ঘটনাটা বুলছড়ি বলে নিতান্ত ছোট একটী জনবিরল দ্বীপের মধ্যে। বঙ্গোপসাগরের মোহানায় সাগরদ্বীপ ছাড়িয়ে আরও পঁচিশ ত্রিশ মাইল পূর্ব্বদিকে গেলে মাৎসানদীর মুখে এই দ্বীপটির দেখা পাবে। সমুদ্রের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী বলে দ্বীপের কোলে প্রায় সারাবছরই নোনা ধরে থাকে ; সেখানে শাকশব্জী জন্মায়না, শুধু দুচারটে নারকেল গাছ ছাড়া সুবিস্তির্ণ ধূ ধূ বালুচরে দ্বীপটার চারিদিক ঘেরা। দ্বীপের মধ্যে অবিশ্যি কিছু কিছু গাছ-গাছড়া জন্মায়,—দুই এক স্থানে ধান, যব, ভুট্টার আবাদও করা হয়। দ্বীপের বাসিন্দাও খুব বেশী নয়—তারা চাষ আবাদ করে বা সমুদ্রে মাছ ধরে কায়াক্লেশে জীবনধারণ করে। ওইরকম ভাবে আজও চলে আসছে তাদের।

কিন্তু যে ঘটনাটার কথা বল্‌ছি সেটা আজকের নয় ; প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্ব্বে বুলছড়ি দ্বীপের বাসিন্দারা ঐ ঘটনাটায় দস্তুর মত স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। যাদের নিয়ে এ কাহিনী তারা আজ নেই,—যারা ছিল এ ঘটনার সাক্ষী তাদেরও অনেকেই আজ মরে জরে মহাকালের কোলে হারিয়ে গিয়েছে। তবু তাদের মধ্যে যে ক'জন আজও কোনরকমে টিঁকে আছে তারা বোধ হয় এখনো সেকথা ভুলতে পারেনি ; বুলছড়ি দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে ঘটনাটা প্রথম এতই দুঃসাহসিক, এতই অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

যে সময়ের কথা বল্‌ছি তখন বুলছড়ি দ্বীপের জেলে এবং চাষী সম্প্রদায়ের সর্দ্দার ছিল রঘু জোলা। সে সময়ে রঘুর মত শক্তিধর ও দোর্দ্দণ্ড প্রকৃতির লোক আর কেউই ছিলনা সেখানে, তাই দ্বীপবাসীরা রঘুকে তাদের সর্দ্দার করে, তার ঘাড়ে সমস্ত দায় দায়িত্ব চাপিয়ে

পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে দিত। শুধু তাই নয়, আকাশের দিকে চেয়ে রঘু বলে দিতে পারত বৃষ্টি হবে কিনা, শুধু মাত্র সমুদ্রের দিকে একবারটী তাকিয়েই তার বুঝতে কষ্ট হতোনা যে সেদিন মাছ উঠবে কিনা, এবং ঝড় ঝটকা, বা তুফানের গন্ধ' সে যেন আগে থাকতে টের পেয়ে সকলকে সাবধান করে আত্মরক্ষা করবার যথেষ্ট সুবিধে করে দিত।

কোথাও কোনো গোল ছিলনা, বেশ নিশ্চিন্তেই দিন কেটে আসছিল। কিন্তু এতদিন পরে রঘুসর্দ্দারের শেষ বয়সে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল সেই সাগরকোলের বালুময় দ্বীপের মধ্যে।—গোলমালটার সুত্রপাত করে কানাই; সেও জেলে। এই এতখানি চওড়া বুকের পাটা কানাইএর—নৌকোর দাঁড় টানবার সময়ে তার পেশী বহুল কালো কুচকুচে বাহু দুটোয় শক্তি যেন নেচে নেচে উঠত। দুর্দ্দান্ত সাহসী ছিল কানাই, পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার ভয় ছিলনা--আর শরীরের অপরিমিত শক্তির সাহায্যে সব ব্যাপারেই কানাই বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যেত। কিন্তু তার একটা মস্ত দোষ ছিল এক-গুঁয়েমী, এবং ঐ একগুঁয়েমীর জন্য শেষ পর্য্যন্ত কানাইকে পস্তাতে হয়েছিল।

* * * *

সেবার পর পর দুবছর তাদের তল্লাটে খুব নোনা ওঠায় চাষবাস বা মাছের কারবার কিছুই দাঁড়াতে পারলোনা ভাল করে—ফলে দ্বীপময় ভয়ঙ্কর অন্নকষ্ট দেখা দিল। প্রথম প্রথম যে যার ঘরের জমানো ধান চাল ভুট্টা খেতে লাগল, আর জালে যা দুইএকটা মাছ পড়ে তাই ভাগাভাগি করে নিত। ক্রমে কিন্তু এসবও যখন আর সকলে জোটাতে পারলনা তখন দ্বীপময় চুরি চামারী সুরু হ'ল—কেউই আর তার শেষ সম্বল দুমুঠো ধান বা ভুট্টা চুরি যাবার ভয়ে রাত্রে চক্ষের দুপাতা এক করতে ভরসা পেতনা!

এই সময়ে কানাই একদিন বেপরোয়া হয়ে ঠিক করে ফেললে যে সাধুগিরিতে আর দিন চলবেনা, তাকেও যাহোক করে কিছু পয়সা কড়ি পেতেই হবে নইলে বৌ-বেটা তার আর কদিন পারবে উপোষ দিয়ে থাকতে!

হ্যাঁ চুরিই করবে সে! কিন্তু কারুর ঘটিটা বটিটা বা একপালি ধানে হাতদিয়ে সে কোন মতেই ধর্ম্ম খোয়াতে পারবেনা! চুরিই যদি করতে তাকে হয় ত' সে এমন কাজ করবে যাতে তার কিছুদিন অন্তত নিশ্চিন্তে চলে। এমন ভাবে ত' আর দিন কাটান যায় না!

কানাই স্থির করলো যে, সে একবার খুঁজে পেতে দেখবে তাদের সর্দ্দারের বাড়ীটা। এতদিন সর্দ্দারি করে সে আর কোন্না দুঁপাচ কুড়ি টাকা জমিয়ে রেখেচে তার ঘরে? তার

ওপর সেই যে সেবার তুফানের মধ্যে একটা ভাঙা জাহাজের খোল সর্দ্দার দ্বীপের কোলে আবিস্কার করেছিল কে জানে কি ছিল তার মধ্যে ? নিশ্চয়ই কিছু ধনসম্পত্তি সর্দ্দার রাতারাতি পগার পার করে তবে সকলকে খবর দিয়েছিল। তাই তারা গিয়ে শুধু ভাঙা রকগুলো তক্তা আর খালি ক্যানাস্তারা নিয়ে হৈ হৈ করে বাড়ী ফিরেছিল। আর হ্যাঁ মাঝে মাঝে যে সর্দ্দার কুমিরের ছাল বা শঙ্কর মাছের চাবুক বেচতে সহরে যায় তাই বা কেন ? সে সব ত' কত বাবুরা ইষ্টিমারে করে এসে তাদের দ্বীপথেকেই খরিদ করে নিয়ে যায় ? ওকি তবে সব ফাঁকি ? সহরে যাওয়া টাওয়া কিছু নয়, সর্দ্দার তার ধনদৌলত সব কোথাও লুকিয়ে রেখে আসে ? আর শহরে যেতে আসতে বরাবর সর্দ্দার যে সেই ফুলকাটা টিনের বাক্সটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেরে তাই বা কেন ? কি আছে ওর মধ্যে ?

কী যে আছে কানাই তা একদিন রাত্রিবেলায় জানতে পেরেছিল ; চাঁদের আলোয় সেই ফুলকাটা টিনের বাক্সর ডালাটা টেনে খুলতেই ওর চক্ষু ঠিক্‌রে গিয়েছিল একরাশ ঝক্‌ঝকে চূণী আর পান্নার উজ্জ্বল চ্ছটায় !...

থাক ওকথা, গোড়া থেকেই শোনো ঘটনাটা।

রঘু সর্দ্দার সেদিন সন্ধ্যার পর সবেমাত্র ডিঙিতে জাল তুলে সাগরে ভেসে পড়েছে মাছের সন্ধানে। পাড়ার আর আর সমস্ত জেলেরাই তখন সাগরে গিয়েছে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। কানাই কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না বেরুতে—সে সেদিন 'শরীর খারাপ' এই অজুহাতে বাড়ীতেই রয়ে গেল সকলের হাত এড়িয়ে। তাই দেখে কানাইয়ের বৌ তখন বল্লে—"কীগো, সক্কলে যে চলে গ্যালো : তুমি আর কখুন যাবে ?"

"যাবো যাবো একটু রাতে বেরুবো আজ।" তাচ্ছল্যভ'রে কানাই বল্লে।

সন্ধ্যায় জাল না টাঙালে যে মাছ ওঠবেনা একটা জেলের মেয়ে হয়ে কানাইয়ের বৌয়ের আর জানতে বাকি নেই। সে তাই ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো !

তখন গিয়ে জল ধরেই এনো জালে, মাছ কাঁদ্‌বেখ'ন তোমার জালে পড়তে, এদিকে তিনদিন ঘরে চাল নেই এক মুঠো ভুলোনি য্যানো।"

"থাম থাম, বেশী বকতে হবেনি তোর—মাছ পড়ে কিনা পড়ে সে আমি জানি।" বলে ধমক দিয়ে কানাই তার বৌকে নিরস্ত করে...

কানাই এক কলকে তামাক সেজে হুঁকো নিয়ে দাওয়ায় গিয়ে বসল। খাওয়া-দাওয়ার পাট নেই আজ তিনদিন, ওর বৌ তাই তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ল ছেলেটাকে কোলের কাছে নিয়ে।

ঠিকে ভুল
শ্রীসত্য চক্রবর্ত্তী

রাত্রি ক্রমেই গড়িয়ে চললো— কানাই কিন্তু নড়লোনা, চড়লোনা, সমানে হুঁকো টানতে-নতে কি যেন আকাশপাতাল ভেবে চললো অনেকক্ষণ ধরে।...

ক্রমে রাত্রি যখন দুপহর পার হয়ে গেল কানাই তখন হুঁকো নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো বং একমুহূর্ত্ত মাত্র কি যেন ভেবে হঠাৎ অতি সন্তর্পণে চারিদিক তাকাতে তাকাতে তার ড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়লো পথের ওপর।

চতুর্দ্দশীর ঝকমকে চাঁদের উজ্জ্বল সোনার বরণ আলোয় রাত্রিটা যেন থমথমে,—রহস্য-য়। বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলোর ঝিলিমিলি ঘনঘোর অন্ধকার রাত্রির চেয়েও ান ভয়াবহ বলে মনে হতে লাগল কানাইয়ের।

ভালমনে দেখলে দৃশ্যটা অবিশ্যি খুবই মনে হবার উপযুক্ত বটে: চাঁদের আলোয় দিগন্ত স্তৃত সাদা চরের বালিগুলো যেন ঠিক রূপোর মতই শুভ্র উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। এর মধ্যে কোথাও দুচারটে খোড়ো বাড়ী গাছের ফাঁক থেকে যেন উঁকি মেরে চাঁদের শোভা উপভোগ করছে াথাও বা তালনারিকেলের ঘনবিথিকা দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে গম্ভীরভাবে যেন সমস্ত ক্ষ্য করছে। কোথাও বা আবার কলাবাগানের চারিদিকে বালিরূপোর ঝকমকিও কচি কলা-াতায় ঠিকরে পড়া চাঁদের টুকরো টুকরো সোনালী আলো......সত্যি সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ন্তু কানাইর ওসব দেখবার অবস্থা ছিলনা তখন। নিশাচর এক ভয়ঙ্কর শ্বাপদের মত ক্ষিপ্র ায়ে কানাই সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলল সেই থমথমে রাত্রির বুক চিরে।

রঘুসর্দ্দারের খামার বাড়ীর পোয়াটাক পশ্চিমে নিকটস্থ সাগরের খাড়ির মুখে তখন াধহয় সবেমাত্র দুচারজন জেলে মাছ ধরে ফিরে এসেছে। অতিমাত্রায় টিমটিমে একটা াট্ট মশালের আলোর সাহায্যে জেলেরা তখন যা দুচারটে মাছ জালে পড়েছে তাই নামাতে ্যস্ত। মশালের সেই স্বল্প আলোয় কালো কুচকুচে জাতভাইদের দেখেই কানাইয়ের সর্ব্বাঙ্গ ঘন হিম হয়ে গেল ভয়ে, ওর মনে হলো সেগুলো যেন হুবহু যমদূত কানাইয়ের দুরভিসন্ধি টর পেয়ে তাকে ধরতে আসছে!

কানাই তাড়াতাড়ি সে পথ ছেড়ে ঘুরপথে সর্দ্দারের বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করলো। াতঙ্কগ্রস্ত ধুকধুকে মনে কানাই যখন রঘুসর্দ্দারের বাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছলো রাত তখন তন পহর পার হয়ে গিয়েছে।

চারিদিকে তাকিয়ে কানাই তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর পেছনে গিয়ে ঘরের ঝাঁপ াটিতে হাতের ছুরিটা চালিয়ে দিলে বেড়ার মধ্যে। ঘ্যাচ্ করে বেড়া কাটার বিশ্রি একটা ব্দ হতে কানাই যেন চম্‌কে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অদূরে কোন গাছ থেকে নিশাচর কোন একটা

পাখী কর্কশ কণ্ঠে অস্বাভাবিক একটা শব্দ করতেই কানাই যেন থাড়িমাড়ি খেয়ে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু একটুখানি স্থির থেকে কানাই আবার সুরু করলে বেড়া কাটতে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রঘুর ঘরের একটা সম্পুর্ণ বেড়া সরিয়ে দিয়ে কানাই সচ্ছন্দে ঢুকে পড়লো সেই ঘরের মধ্যে।

অনেকক্ষণ ধরে আঁতি পাঁতি করে খুঁজেও ঘরের মধ্যে কোথাও কিছু না পেয়ে কানাইয়ের প্রাণটা হতাশায় যেন ভেঙে পড়লো। একি? এত বড় সর্দ্দার রঘু? অন্ততঃ দুহাজার চেলা চামুণ্ডা তার চতুর্দ্দিকে? তার ঘরে এসব কী? দুটো ভাঙা জাপানী আলুর পুতুল, একটী টিনের গাড়ী! কি এসব আর কেনই বা? তার না আছে একটা ছেলে না একটী মেয়ে! তবে এসব নিয়ে বুড়োর কী দরকার? শেষে তাদের সর্দ্দারের ভীমরতি ধরলনাতো বুড়ো বয়সে?

নানান রকম চিন্তায় কানাইয়ের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। হটাৎ এই সময়ে ঘরের মটকায় ঝোলানো একটা পুঁটুলি দেখে কানাই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সেটা নীচে নামায়।

তারপর প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চাঁদের আলোয় ভরা দাওয়ায় গিয়ে সেটা খুলতে ব'সে যায় কানাই......বুক তখন তার আশা আকাঙ্ক্ষার উৎকণ্ঠায় ঢিপঢিপ করছে।......

নিশ্চয়, নিশ্চয়ই এতে বুড়োর যা কিছু সমস্ত সম্পত্তি লুকোনো আছে, কানাইয়ের মনে হলো; না হলে এত যত্ন কিসের এর ওপর?

পাটের পর পাট কাপড় ও কাগজ খুলতে খুলতে শেষে বেরিয়ে পড়লো একটা টিনের পুরোনো বাক্স!......'এইত', 'এইত, উৎসাহে অধীর হয়ে কানাই সেটার ডালাটা খুলে ফ্যালে এক টানে!

তারপর? তারপর আর কী? বাক্সের খোলে দুশ পাঁচশ' বড়বড় জলজলে চুণী আর পান্না দেখে কানাইয়ের যেন মাথা ঘুরে গেল! কানাই তাড়াতাড়ি বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে কেউ তাকে দেখছে কিনা? নাঃ, ও সময়ে কেইবা কোথায় থাকবে: কানাই একটু স্থির হ'ল। তারপর সেই বাক্সটা কাঁধে তুলে কানাই সাঁ করে সর্দ্দারের ঘর ছেড়ে ঝোপঝাড়ের এ আড়াল সে আড়ালে এলোমেলো পায়ে তীব্রগতিতে পালাতে সুরু করলো।......

ছুট,-ছুট,-ছুট,...সেই আলো আঁধারী রাত্রে ওই অবস্থায় কেউ যদি কানাইকে দেখতে পেত, তার নিশ্চয়ই মনে হত' কোন ভীষণ দৈত্য যেন রাজপ্রাসাদের মণিভাণ্ডার লুণ্ঠন করে

নিয়ে প্রাণপণে পালাচ্ছে--পিছনে তার রাজপুত্রের শাণিত তরবার উদ্যত। কানাইয়ের াটাও অনেকটা সেই রকম তখন—ধরা পড়বার ভয়ে সে সামনে পিছনে, এপাশে ওপাশে করছে একএকবার, আর আতঙ্ক উৎকণ্ঠায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ভয়ঙ্কর বেগে ছুটছে ক্ষণ! উদ্বেগে পরিশ্রমে কানাইয়ের যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, তার চক্ষু যেন ার থেকে ঠেলে বেরিয়ে বাইরে ঝুলে পড়ল তবু পথ আর ফুরোয় না!......

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু রাজপুত্রের খরশান তরবারী হটাৎ এক সময়ে এসে দৈত্যের ঘাড়ে দেহটা থেকে মুকুট তার পৃথক করে দিল। হটাৎ কানাইয়ের মনে হলো বালির থেকে কে যেন তার পাদুটো সবলে টেনে ধরল'—পায়ের সেই বজ্রবাঁধন ছড়িয়ে পালা- সামর্থ হলোনা কানাইয়ের—উল্টে খানিক বৃথা চেষ্টা করবার পর কানাই দেখলে যে কেমন করে যেন তার হাঁটু পর্য্যন্ত পাদুটো বালির তলায় ডুবে গিয়েছে। এবং যতই াণভয়ে উদ্ধার পাবার জন্যে আঁকপাঁক করলো ততই সে ডুবতে লাগল বালির তলায়। ার বুঝে কানাইয়ের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। শত শত চোরা বালুময় দ্বীপের মধ্যে করে চোরাবালুর কেরামতি সম্বন্ধে কানাইয়ের জানতে কিছু বাকি নেই। কতলোক যে ভাবে প্রতি বছর জীবন্ত সমাধি লাভ করে তার ঠিকানা নেই। প্রাণভয়ে কানাই হটাৎ ় আর্ত্তনাদ করে উঠল—কে আছ রক্ষে কর রক্ষে কর চোরাবালিতে আমায় ধরেছে গো, াছ।”......কিন্তু কোথায় কে তখন? জনশূন্য চরের দিকে দিকে কানাইয়ের কাতর ় বিদ্রূপধ্বনি জেগে উঠে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

মিনিট পনের এই ভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বাক্সশুদ্ধ কানাই তখন বালির তলায় ডুবে ছে বল্লেই হয়। কোনমতে নাকটা তখনো বাইরে তুলে রেখে সে তখন হাঁসফাঁস ় মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। কানাইয়ের কাতর কণ্ঠের চাপা আওয়াজ বালিভেদ করে তখনো ় গুমরে গুমরে উঠতে লাগল স্থানটার আশেপাশে।...

ওদিকে রঘুসর্দ্দার সেইমাত্র মাছধরা সাঙ্গ করে বাড়ী ফিরছিল। মানুষের কণ্ঠের কাতর গোঙানি শুনে সেই শব্দ ধরে ছুটে এসে বুড়ো সর্দ্দার কানাইয়ের কাছে উপস্থিত। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে যুদ্ধ চলল মানুষে আর চোরা বালিতে! উঃ সে বীভৎস দৃশ্য!

শেষে কানাইকে বালির মধ্যে থেকে টেনে তুলে রঘু মহা বিরক্তিতে বলে উঠল— ত ইদিকে এ্যাইছিলি ক্যানো রে? তোদের কি জ্ঞানগম্যি এ্যাদ্দিনেও কিছু হলোনা! সিধেপথে চলতে তোদের হয় কি রে হতভাগা?”

কীযে হয় তা আর কী বলবে কানাই ! সে কি করে বলবে যে সর্দ্দারের ধনসম্পত্তি চুরি করে পালাবার সময়ে উৎকণ্ঠায় ভুলপথে গিয়ে পড়ে তার এই দশা হয়েছিল !...

মিনিট পনের কুড়ি ধরে ঝিমোতে ঝিমোতে কানাই বসে বসে ভাবলে, করবে কী এখন ? শেষে আর পারলেনা সামলাতে নিজেকে—হু হু করে কেঁদে ফেলে সে, আছড়ে পড়লো সর্দ্দারের পাদুটোর ওপর।

কানাইয়ের ব্যবহারে রঘু যৎপরনাস্তি আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠল—"এ কিরে ? কাঁদিস ক্যানো ? আহা পা ছাড়না বাপু ?"

কানাই কিন্তু পাও ছাড়েনা, কান্নাও থামায় না। বরং রঘুর কাছ থেকে সহানুভূতি মাখানো দুটো কথা শুনে কান্না ওর বেড়ে গেল একশো গুন ; সে আরো জোরে বুড়ো সর্দ্দারের পা দুটোর ওপর মুখখানা চেপে ধরে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল দুর্দ্দমনীয় কান্নার বেগে।

রঘু আবার বল্লে—"আরে দূর ! জোয়ান মরদ কাঁদতেছে দেখনা মেয়ে মানুষের মত ? কী হয়েছে তাই বল্‌না আগে ?"

কানাই তখন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে অতি কষ্টে কান্নাজড়িত কণ্ঠে মুখ তুলে শুধু বল্লে—"সর্দ্দার তুই মাপ কর আমারে।"

"ক্যানো করেছিস কী তুই যে মাপ করতে হবে, ও কানাই ?" বলে রঘুসর্দ্দার কানাইয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কানাই আর কান্না থামাতে পারেনা। যার ও সর্ব্বনাশ করেছে সেই ফের ওর জীবনরক্ষা করলো এইভেবে কৃতজ্ঞতায়, অনুশোচনায় কানাইয়ের মন তখন পুড়ে যাচ্ছিল।

কানাই এখন স্থির করলো নে যা থাকে কপালে ওসব কথা খুলে বলবে সর্দ্দারের কাছে—তাতে সর্দ্দার ওকে যে শাস্তিই দিক তা সে মাথা পেতে নেবে। এবং একটু পরেই কানাই আগাগোড়া ঘটনাটা সর্দ্দারের কাছে বলে কাঁদতে কাঁদতে বার বার তার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল।

কানাইয়ের কথা শুনে রঘু প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত শুনে হো হো করে হেসে উঠে বল্লে—"কৈ কোথায় সে বাক্সটা দেখি ?"

কানাইয়ের ভয় তখনো যায়নি ; ভাঙা গলায় চোরা বালির দিকে দেখিয়ে সে ধীরে ধীরে বল্লে "ঐ ওর মধ্যে।"

আবার দশ পনের মিনিট বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে বাক্সটা টেনে তুলল রঘু। তারপর ‍র ডালাটা খুলে ফেলে কানাইকে ডেকে বল্লে—"কী বল দিকি এগুলো?"

কী আবার! ঝক্‌মকে চূণীপান্নাগুলোর দিকে আড়ষ্টভাবে একবার তাকিয়ে কানাই না বলে ফ্যালফ্যালে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে ও শুধু তাকিয়ে রইল সর্দ্দারের মুখের পানে।

বাক্স থেকে রঘু তখন হাতে করে একটা তুলে নিয়ে কানাইকে বল্লে—"হাঁ করদিকি, ানাই; দেখ দিকি মুখে দিয়ে একটা।"

কানাইয়েরও যেন সমস্ত ঘুলিয়ে আসতে লাগল মাথার মধ্যে। অর্দ্ধচেতন অবস্থায় সে করতে সর্দ্দার তার হাতের গুলিটা ফেলেদিলে কানাইয়ের মুখের মধ্যে। আর সঙ্গে মুখের মধ্যেটা একটা মিষ্টি রসে ভরে উঠতেই কানাই হটাৎ চমকে উঠে থু থু করে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—"বিষ, বিষ!"

"নারে বিষ নয়, ওগুলোকে বলে 'লেবনচুষ'। লক্ষ্মীপূজোর দিন চরের ছেলেমেয়েদের ার জন্যে সহর থেকে ওগুলো গতবারে এনেছিলুম। তা এই নে ধর দুমুঠো, তোর ছেলে- ক না হয় দুদিন আগেই দিগে যা খেতে।" বলে কানাইয়ের কাপড়ের কোঁচড়ে দুমুঠো ন্স ফেলে দিয়ে বাক্সটা কাঁধে নিয়ে দেখতে দেখতে রঘুবুড়ো গাছের আড়ালে নয়ে গেল।

ভূতে পাওয়া রুগীর মত আচ্ছন্ন অবস্থায় কানাই যখন তার ঘরে ফিরল তখন আর ত্রি নেই—পূব গগনের কোলে সূর্য্যদেব সবেমাত্র তখন উঁকি দিচ্ছেন।......

কোনও ইংরেজী গল্পের সামান্য ছায়ায় রচিত।

নীল পরী

শ্রীসৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত

নীল পরী!
দাওনা তুমি হাত ছানি
তোমায় মোরা বেশ জানি, বেশ জানি।
আকাশ পারে বেড়াও তুমি ভেসে—
তোমার সোনার দেশে।
আকাশ পারের নীল পরী!
একটু খানি আলগা হ'লে ফেলবে মোদের ধরি!

ফাঁকি দিয়ে নিয়ে তোমার দেশে,
বলবে তুমি মিষ্টি হেসে হেসে—
'ফেলেছি যে তোদের ভালবেসে।'
কিন্তু মা যে কাঁদবে মোদের তরে।
কেমন ক'রে ফিরব তখন ঘরে ?

নীল পরী !
দেশটা নাকি তোমার ভারি সুন্দর,
আনন্দেতে ভরায় নাকি অন্তর !
কিন্তু তুমি নাকি জান ভীষণ মন্তর !
এক নিমিষেই করবে মোদের পাখী !
তোমার দেশে কেমন ক'রে থাকি ?

নীল পরী !
যেতে পারি তোমার দেশে একটা কথা মোদের যদি রাখ—
তোমার দেশে নইলে যাব নাকো।
দেখা হ'লে দেশটি তোমার আনবে ফিরিয়ে।
তোমার দেশের কথা তখন বলব মাকে গিয়ে।
গল্প শুনে মা যে মোদের দেবে অনেক চুমো—
বলবে হেসে—'সোনার খোকার দল, এবার তোরা ঘুমো।'
কিন্তু, যদি তুমি রাখ মোদের ধ'রে—
মা যে তখন কাঁদবে মোদের তরে।
কান্নাতে যে আকাশ যাবে ভ'রে।
কেমন ক'রে ফিরব তখন ঘরে ?



ভারতের চিত্রশিল্প

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সুন্দরকে ভাল না বাসে এমন লোক পৃথিবীতে নেই। তোমরাও সুন্দরের চর্চ্চা করে ক নিশ্চয়ই। নিজের বেশভূষা ও চেহারাকে কে না ভাল করতে চায়? এজন্য সকল দেশে নুষ সুন্দর জিনিষ তৈরী করে। ছবি আঁকা, মূর্ত্তি তৈরী করা, গানগাওয়া, গৃহনির্ম্মাণ করা— সব চিরকাল মানুষের সভ্যতার প্রমাণরূপে দেখা যায়।

প্রাচীনকালে যেমন, তেমনি আজও মানুষ সুন্দরকে ভালবেসে সুখী হয়। ইউরোপে :র ঘরে ছবি আঁকা, গান গাওয়া প্রভৃতি প্রচলিত—ভারতেও সেই ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সব না হ'লে মানুষের আনন্দ হয় না। মানুষ এজন্য দেবতার ছবি বা মূর্ত্তিও রচনা করে। াচীনযুগে অজান্তা গুহায় অনেক ছবি আঁকা হয়েছিল। মোগল আমলে মোগলাই ছবি াকা হ'ত এবং যে সব হিন্দু ছবি আঁকা হ'ত তাদের নাম হচ্ছে রাজপুতচিত্র।

ভারতের সব জায়গায় শিক্ষার একটা নূতন আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রম্য াল্পের চর্চ্চাও বেড়ে গেছে। শিল্প রচনার জন্যও নানা স্কুল হয়েছে।

আমাদের গান যেমন বিলিতী গানের মত নয়—সুরের কায়দা ভিন্ন—তেমনি আমাদের রাণ ছবির কায়দাও ভিন্ন। আবার কোন কোন ছবি দেখ্‌তে একেবারে স্বাভাবিক।

তোমাদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই অনেক ছবি আছে। দেবদেবীর ছবি ঠিক মানুষের মত । হলেও দেখ্‌তে বেশ ভাল। শ্রীদুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী এসব দেবীর ছবি এদেশে এখনও মৎকারভাবে আঁকা হয়। এসব মূর্ত্তি পাথরে, ধাতুতে, কাঠে বা মাটি দিয়ে তৈরী হয়। ানেক ওস্তাদ কারিগর এসব মূর্ত্তি তৈরী করে। কুমোরটুলীর কারিগরেরা মাটি দিয়ে দেবীমূর্ত্তি তরী করে। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে শিল্প-শাস্ত্র মতে পাথরের মূর্ত্তি তৈরী হয়। জয়পুরের শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি বিখ্যাত। এখনও এসব অঞ্চল হ'তে বহু মূর্ত্তি আসে।

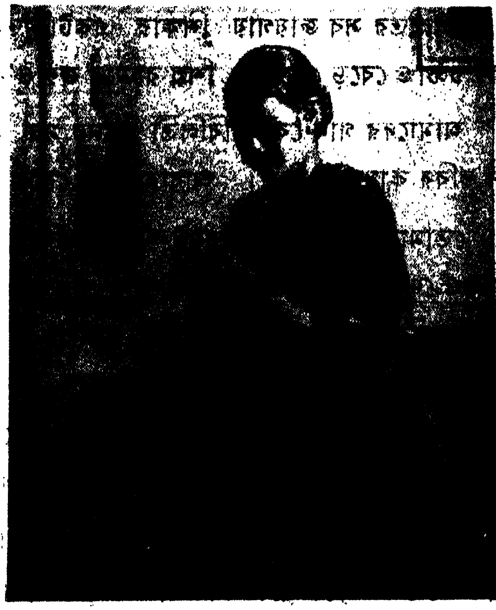
নব্যশিক্ষিত যুবকেরাও সম্প্রতি ছবি আঁকবার কায়দা শিখেছে এবং মূর্ত্তি তৈরী করে' াখ্যাত হচ্ছে। গৃহে গৃহে এসব ছবি ও মূর্ত্তি রাখা হয়।

কয়েকখানি ছবি দেখ। ছবিতে পুরাতন আদর্শ আছে নূতন আদর্শও আছে। পুরাতন আদর্শ কাল্পনিক সৌন্দর্য্য পছন্দ করে। শিল্পী অবনীন্দ্র ঠাকুর এই প্রথামত ছবি আঁকতে সুরু করেন। সম্প্রতি ভারতের নানা জায়গায় এই নিয়মে ছবি আঁকা চল্‌ছে। প্রমোদ চাটুয্যের "শ্রীগৌরাঙ্গ" এই রকমের ছবি। শিল্পীর আঁকবার ভঙ্গী চমৎকার অথচ এসব ছবি হুবহু কোন প্রাকৃতিক ব্যাপারের নকল নয়। সিংহাসনে শ্রীগৌরাঙ্গ বসে আছেন। দেবতার মত তাঁর চরিত্রটি কি সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চারিধারে ভক্তবৃন্দের দল, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা বসে—তাদের চোখের ভাব কি সুন্দর ফুটে উঠেছে। এরকম রচনাকে এদেশে 'Oriental' বলে। এটা জোলো রঙে (Water Colour) তৈরী।



শ্রীগৌরাঙ্গ

এম, এন স্বামীর "আমার চুড়ি" নামক একখানি ছবি দেখ। খুব স্বাভাবিক ঠিক যেন জীবন্ত একটি মেয়ে নিজের হাতের চুড়ি দেখ্‌ছে খুসী হয়ে। এটাকে 'Oriental' বা প্রাচ্য রীতি বলা হয় না। এ ছবিখানি তেলের রঙে (Oil Colour) আঁকা। জোলো রঙ ও তেলের রঙে সাধারণত ছবি আঁকা হয়। রঙ ছাড়াও শুধু রেখা দিয়ে ও ছবি আঁকা হয়। কালীঘাটের ও তিব্বতীয় পঠ এইভাবে আঁকা। এযুগেও রেখার সাহায্যে বহু



আমার চুড়ি

স্কুলে ড্রইং করে তোমাদের যে শিক্ষা হয়েছে তা'তে আর একটু চেষ্টা করলেই ভাল [ছবি] আঁকবার ক্ষমতা হবে। হেরম্ব গাঙ্গুলীর 'দোলযাত্রায়' অনেক বাড়ী ঘর দোর, গাছপালা, [লো]কজন, রাস্তা সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঁকা হয়েছে। এরকম আঁকায় বাহাদুরী আছে। [মা]ঠ বা প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকে তাকে Landscape বা ভূচিত্র বলা হয়। বর্ত্তমান ভারতে [মে]য়েরাও ছবি আঁকছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'প্রার্থনা'য় একটি ভুটিয়া স্ত্রীলোকের [সু]ন্দর ছবি আছে মন্দিরের বারান্দায়। * বল্‌তে গেলে জগতের যা ইচ্ছা সব কিছুই এঁকে [তো]মাদের ঘরে রাখতে পার যদি ছবি আঁকতে জান। এটা কম আনন্দের কথা নয়।



দোল যাত্রা

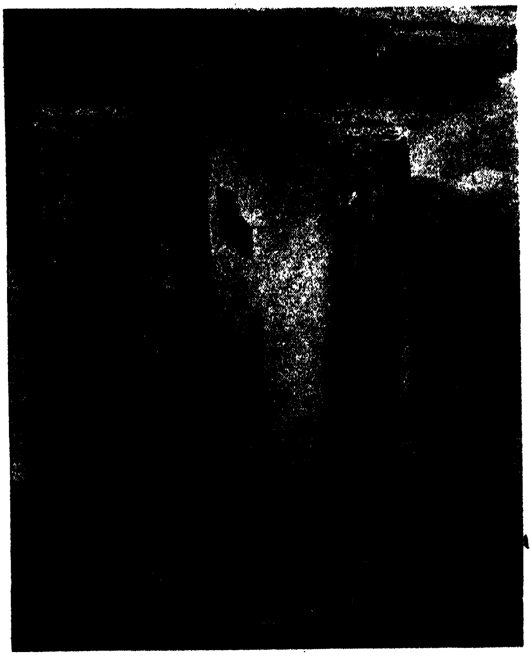
ছবি আঁক্‌তে জানাটি একটা উচ্চ শিক্ষা। সভ্য জগতে এ বিদ্যার যথেষ্ট চর্চ্চা হচ্ছে। [মূর্ত্তি]ও তৈরী করাও একটা বিশেষ প্রশংসার কাজ। কবিতা লিখে যেমন ভাব প্রকাশ করা [যা]য় তেমনি ছবি ও মূর্ত্তির সাহায্যে নানা ভাব ও ভঙ্গী প্রকাশ করা যায়। আধুনিক ভারতের [ছে]লেমেয়েরা এরকম রূপের ডালি রচনা করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করছে। সকল দেশের সঙ্গে [যো]গ রক্ষা করে ভারতের বর্ত্তমান সভ্যতাকে অগ্রসর হতে হবে। মানুষের আনন্দ বাড়াতে [হয়] নানা ভাবে। তাই সুন্দর কবিতা গান ছবি মূর্ত্তি গৃহ রচনা করে সকলের আনন্দ [বা]ড়াতে হয়।

চিত্রের সাহায্যে প্রতিকৃতি রচনা করা আধুনিক যুগে খুব প্রচলিত। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের [ও] প্রিয়জনদের মূর্ত্তি এঁকে গৃহে বা কোন সাধারণ স্থানে রক্ষা করা হয়। দেশপূজ্যগণের

* রমণীর হাতে একটি প্রার্থনা চক্র তাতে ভগবানের নাম লেখা আছে। ওটা ঘোরালেই ভগবানের নাম কীর্ত্তন করা হল। [ভু]টানের লামারা এই ভাবেই পূজা করে।

প্রতিকৃতি অনেক সময় প্রতিগৃহে থাকে। মূল ছবি হতে নকল করে ছাপিয়ে এসব ছবি তৈরী হয়। যে সব ছবিতে রঙ দেওয়া হয় না তাদের বলা হয় Black & White বা সাদা কালো ছবি।

ইংরাজীতে কবিতা, গান, ছবি, মূর্ত্তি ও সৌধরচনাকে Fine Arts বলা হয়। এদেশে এসমস্তকে কলাবিদ্যা বলা হত। ভগবান শুধু সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ মাত্র নন তিনি সুন্দর স্বরূপও। রূপকল্পনা, রূপেব সাধন ভগবানের সাধন ছাড়া আর কি ?



প্রার্থনা

প্রাচীনকালে ঋষিরাই রূপ কল্পনা করতেন এবং দেবদেবীর রূপের কথা বলতেন। বর্ত্তমান যুগে সমাজ ও পরিবারের নানা দিক ছবির ও মূর্ত্তির বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ভারতেও এইভাবে সম্প্রতি কলাবিদ্যার সাধনা হচ্ছে।

——:0:——



লগালেকের পথে—ব্রহ্মদেশ

শ্রীহিমাংশুশেখর গুপ্ত

রেঙ্গুণের ইরাবতী নদীর ধারে স্পার্কস ষ্ট্রীটের একটি চৌতালা বাড়ীর ফ্ল্যাটের বসবার রে বসে আমরা ক'জন গল্প করছি—আমি, মিসেস চৌধুরী, মিসেস চৌধুরীর তিনটি ছোট্ট ময়ে রাণী, তপতী, মঞ্জু ও তাদের এক কাকা হীরেন বাবু।

বাড়ীর নীচেই সদর রাস্তা। সদর রাস্তায় চল্‌তি যান-বাহনের মৃদু শব্দ আসছে কানে। ামাদের মধ্যে এলো মেলে নানা কথা বার্ত্তা হচ্ছে। কথায় কথায় "লগালেকের" কথা শুনলাম। সেস চৌধুরী জানালেন যে, রেঙ্গুণ থেকে মাইল আঠারো দূরে 'লগালেক' নামে নাকি একটি লক্ আছে যা ওঁরা দেখেছেন এবং সেই হ্রদের জলই নাকি সেখান থেকে রেঙ্গুণে পানীয় পে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। বিশেষ ক'রে বর্ষার সময়টাতে লেকের জলই বহৃত হয় অন্য সময় রেঙ্গুণবাসীরা টিওবওয়েলের জলই ব্যবহার করে থাকেন এবং সে জল াওয়ার ব্যবস্থা ও আছে সহরে। আরও শুনলাম দ্রষ্টব্য হিসেবে ও নাকি অনেকেই লগালক আশেপাশের দৃশ্য সৌন্দর্য্য দেখতে যান—বিশেষ ক'রে যারা আগুন্তুক।

লগালেকের পরিচয় শুনে ভাবলাম একবার দেখে আসতে হচ্ছে লগালেক্‌কে। রেঙ্গুণ থকে মাইল আঠারো দূরে হলে গণিতের সহজ নিয়মানুসারে মিঙলাডন থেকে লগালেকের রত্ব দাঁড়ায় তিনভাগের একভাগ মাত্র। কিন্তু লগালেকের কীইবা আছে সৌন্দর্য্য যা আমার াগতে পারে ভাল। পৃথিবীর অনেক সৌন্দর্য্য দ্বারইত এখন পর্য্যন্ত আমার কাছে আছে ন্ধ। আর তা কোনদিন দেখবার সুযোগ সুবিধা পাব কিনা বলতে তো আর পারি না। দখিনি ত অনেক কিছুই। দেখিনি হিমালয়ের বুকে মানস সরোবরের ঢেউ এর খেলা, ভূস্বর্গ াশ্মীরের উলার হ্রদের স্বচ্ছ জলরাশি, নীলগিরির গিরি শ্রেণী, বিদেশের রম্যনিকেতন

জেনীভার লেমানের (হ্রদের) জলের শান্ত-স্নিগ্ধ-শ্যামশ্রী আরও কতকি! রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতার সেই লাইন কয়টি পড়ে মনে।

......'নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি,
বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি',
সমস্ত স্পর্শিতে চাহে।......

স্তব্ধ দুপুরে চারিদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই, শুধু এই ভরাদুপুরে কয়েকটি মাদ্রাজী ছোট ছেলেমেয়েদের কলরব শুনতে পাচ্ছি। ঘরের বারান্দাটার ঠিক নীচেই জঙ্গলীলতা-পাতা, কেরোসিন কাঠের টুক্‌রো প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য বস্তু নিয়ে ওরা খেলায় মত্ত। মাঝে মাঝে তাহাদেরই অবোধ্যভাষার কথা কানে আসছে। পাশের ঘরে দিদি আমার নেহাৎ শান্তশিষ্ট ? ভাগিনেয়টীকে ঘুম পড়ানোয় ব্যস্ত।

নিস্তব্ধ অলসমধ্যাহ্নের কেমনতর জানি একটা মাদকতা আছে।—হঠাৎ চারিদিক যেন ফাঁকা ফাঁকা বলে বোধহয়, নানা চিন্তা স্রোতে খাবি খাচ্ছি। এমনি সময়ে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনের ঘণ্টা উঠলো বেজে। রিসিভার কানে তুলতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর যন্ত্রের ভিতর দিয়ে কানে এলো—'আজ লগালেকে বাইকে আমরা বেড়াতে যাব, তৈরী থাকবেন কিন্তু, তিনটেয় আসবো।'—রেঙ্গুণ থেকে মিঙলাডন ফিরে এসে আমি যখন আমার নবপরিচিত বন্ধুবর মনোজবাবুকে লগালেক দেখ্‌তে যাবার কথা বলেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন—বেশত arrange a day. মনোজবাবুর এই আকস্মিক প্রস্তাবে খুসী না হয়ে পারলাম না।

মুস্কিল বাধল সাইকেল যোগাড় করা নিয়ে; কিন্তু মুস্কিলেরও আসান হ'ল। আমাদের পাশের আবহাওয়া বিভাগের Observer সতীশবাবুকে সাইকেলের কথা বলতেই তিনি সানন্দে তাঁর সাইকেলটি নিয়ে যেতে বল্লেন।

আমাদের দলটী নেহাৎ ছোটখাট হ'লনা। সাইকেলে আঁকা-বাঁকা উচুনীচু পাহাড়ী পিচঢালা রাস্তার উপরদিয়ে চললাম। চল্‌তে চলতে মাইলতিন পরে Wireless office এর সামনে এসে পড়লাম। এই Wireless officeটি আমিও আর একজন ভদ্রলোক বিশেষ অনুমতি নিয়ে দেখেও ছিলাম একদিন ভিতরে গিয়ে। রেঙ্গুণের আবহাওয়ার অবস্থার কথা মিঙলাডন এরোড্রোমে যে সমস্ত এরোপ্লেন চালক অনেক দূর থেকে উড়ে আসতে আসতে জানতে চায় তাদেরকে শূন্যের উপর Wireless office থেকে Codeএ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সে-সংবাদ পাঠানো হয় এবং তারাও সে বুঝে তাদের গতিবিধি ঠিক করে নেয়। Wireless office ও মিঙলাডন এরোড্রাম বেশ দেখবার জিনিষ। Wireless officeএ

ড় বড় সব ডাইনামো যন্ত্র ফিট্ করা আছে, অনেক অপারেটর সেখানে কানে শব্দ গ্রহণ যন্ত্র াগিয়ে বসে আছেন কখন কি সংবাদ আসে এই প্রতীক্ষায়। বিমানচালকদের সংবাদ পাঠানো াড়াও এখান থেকে আরও অনেক—অনেক দূর থেকেও সংবাদের আদান প্রদান করা হয়।

Wireless office এর ঠিক বিপরীত দিকেই একটি বৌদ্ধধর্ম্ম মন্দির বা 'ফায়া'। ায়ার থেকে সিড়ি নেবে গিয়েছে 'ফুদিচণ্ড'এ বা ফুঙ্গীদের (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) থাকবার জায়গায়। ্যাগোডার চারিদিক জঙ্গলাকীর্ণ। আশে পাশের সবকিছুই ছোট ছোট দেখায়। দূরে কটা টিলাতে কতকগুলি গরু চরছিল; প্যাগোডার থেকে সেইগুলিকে কতকগুলি মেষের তই ছোট লাগছিল দেখতে। প্যাগোডার প্রাঙ্গনে দাঁড়ালে লগালেকের নীলজলরেখা স্পষ্ট চাখে পড়ে, প্যাগোডার ছাতারমত আকারের চূড়োয় ঝুলানো ছোট ছোট ঘণ্টাগুলিতে াতাস লেগে টুন্ টুন্ মিষ্টি আওয়াজ দিচ্ছিল।

বর্ম্মীরা বিশ্বাস করে যে প্যাগোডার চূড়োর সোনার বা পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টার ধুর শব্দ সুগতের জয় ঘোষণা করে দুষ্টু অশরীরিদের ভয়চকিত করে তুলবে ও কারও অনিষ্ট রতে বাধা দেবে। এদের আরও ধারণা বৌদ্ধবিহারে বা প্যাগোডায় বৃহৎ ঘণ্টা দান করতে ারলে সবরকমের বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। প্যাগোডার বড় বড় ঘণ্টাগুলি াধারণতঃ আড়াআড়ি ভাবে লাগানো কাঠ কিংবা লোহার দণ্ডের উপরে বসানো থাকে। ণ্টার গায়ে দাতার আকিঞ্চন কামনা বাসনার কথা খোদাই করা থাকে। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত রঙ্গুণের শোয়েডাগন, পেগুর শোয়েমাডো ও মিংগুনে কয়েকটি অতিকায় পুরাণো ঘণ্টা াছে—এগুলিই ব্রহ্মদের বিখ্যাত বৃহৎ ঘণ্টা। ব্রহ্মের সব প্যাগোডাতেই ছোট কিংবা বড় ণ্টা আছে। বড়ঘণ্টায় কোন দোলক নাই যা দিয়ে ঘণ্টা বাজান যায়. ঘণ্টার গায়ে কাঠের াতুড়ি দিয়ে ঘা দিতে হয়। বড় ঘণ্টাগুলি সাধারণতঃ ব্রোঞ্জধাতু কিংবা তামায় তৈরী হয়ে াকে।

প্যাগোডাকে বাঁয়ে রেখে প্রোমরোড ধরে আবার ছুটতে আরম্ভ করলাম। আমাদের ানদিকের রবার গাছের সারি পেছনে ফেলে। আমার উৎসাহটাই বোধহয় সবচাইতে ছিল বশি কারণ আমিই সকলকার আগে আগে যাচ্ছিলাম। হু হু শব্দ করে কয়েকটা স্ত্রী-পুরুষ বাঝাই বর্ম্মাবাস যাতায়াত করছিল। বর্ম্মা বাঁসের চালকগুলি খুব অসতর্কভাবে বাস চালায়।

লগালেকে প্রবেশ করবার গেটের সামনে যখন এলাম তখন আমাদের সঙ্গী দেববাবু ালুকাপূর্ণ পথে মোড়ফেরাতে গিয়ে সাইকেল থেকে একেবারে—পপাত ধরণীতলে, আর সঙ্গে ঙ্গে সাইকেলের দাঁতওয়ালা চাকাটা তার নূতন কাপড়টা দিলে অনেকটা ফ্যাস করে ছিঁড়ে।

বীরের মত ধূলো ঝেড়ে ভদ্রলোক আবার সাইকেলে আরোহণ করলেন আর আমরাও হাঁপছেড়ে বাঁচলাম। এমনি মজা কেউ পড়ে গেলে প্রথমদিকটায় কেন জানি হাসি পায়। আমাদেরও সে নিয়মের হয়নি ব্যতিক্রম!

লগালেক দেখবার জন্য আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম। এই অনুমতি সংগ্রহের কাজের প্রধান নায়ক ছিলেন ওভরসিয়র পালবাবু।

—এই লগা লেক! স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ জল। জলে শীতের রৌদ্রদীপ্ত নীল আকাশের ছায়া পড়েছে। উঁচু তীরের একটা জায়গায় সাইকেল থেকে নেমে আমরা বসলাম। ফুর্‌ফুর্ ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল আর সেই সঙ্গে ভেসে আসছিল আমাদের পেছনের নীচু জায়গাটা থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ অযত্ন-বর্দ্ধিত সাদা-রংএর এক জাতীয় বুনো ফুলের উগ্র গন্ধ। দূরে লগালেকের অপর তীরে একটা প্যাগোডার সোনালী চূড়ো অরুণ কিরণে ঝলমল করে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

লগালেকের পরিধি প্রায় নয় মাইল। এতটা ঘুরতে গেলে রাত হয়ে যাবে কাজেই আমরা লেকের একটা ধারে বসে চারিদিকের শোভা দেখতে লাগলাম।

লেক থেকে লম্বা মোটা পাইপ বের হয়ে এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে সহরের দিকে। আমরা যে ধারটাতে বসেছিলুম সেটার জলের ধারে একটা (Tacht) বা টেক্‌ট্ বাঁধা ছিল। এর আকৃতি অনেকটা বর্ম্মী সাম্পানের মত। নৌকায় চড়ে একটু বেড়িয়ে আসব নাকি? কিন্তু ওমা! এযে জলের ভিতরের খুঁটির মধ্যে আটকানো। আমরা ঠিক করলাম যে একদিন তীরের সামনের বনে আউটিংএ যাব। বুনো মোরগ, নানারকমের পাখী, চাই কি হরিণও ত মিলতে পারে! রয়েল বেঙ্গল টাইগার সে জঙ্গলে নেই সে কথা হলপ করে বলতে পারি—তবে তার জাতভাই নিতান্ত ছোটখাট দু'একজন থাকলেও বা থাকতে পারে।

কতক্ষণ আমরা লেকের তীরে বসে থাকতাম জানিনা, চেয়ে দেখি সূর্য্যিমামা আপনার অরুণরশ্মি চারিদিকে বিলিয়ে দিয়ে হ্রদের জলে অবগাহন করবার জন্য যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আলো ঝলমল ময়ূরকণ্ঠি চেলীর মত ওপারের আকাশের রং ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছিল। এবারে আমাদের টনক নড়ল। ফেরবার উদ্যোগে সবাই উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু ফিরে যাওয়ার তাগিদ যেন কারও বড় একটা ছিল না। এই আলো, এই বুনো ফুলের গন্ধ বয়ে আনা স্নিগ্ধ বাতাস, আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়ের অজানা পাখীর কল-কাকলী, সমুখের স্থির স্বচ্ছ জলরাশি—চারিদিকের এই মায়াপুরিকা কেন জানি আমাদের সকলকারই বড় ভাল লাগছিল।

নির্জ্জন বন-বকুল-মুকুল সুরভিত ছায়া-পথ, সঘন তরুশ্রেণীর সৌন্দর্য্যশ্রী, প্যাগোডার ঘণ্টার টুন্ টুন্ মিষ্টি ঝঙ্কার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনতে শুনতে যখন আমাদের এলাকা মিঙলাডনে

রে এলাম—তখন সন্ধ্যার নির্ম্মল আকাশে দু'একটি তারা নববধূর সরমরাগজড়িত আধ-নিমীলিত উনির মত নীল অবগুণ্ঠণের মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে চাইতে সুরু করেছে আর ইতিমধ্যে নানিবাসের চারিদিকের দীপাবলীও একে একে ফুটে উঠে কি যেন এক স্বপ্নরচনা করতে ারম্ভ করেছে।

রূপকথা

ধায় এসে তরুণ রবি প্রাতে
ছড়ায় প্রথম আবির মাখা আলো,
কাশ ছোঁয়া শুভ্র গিরির মাথে
ময়দানবের পাষাণ-পুরী কালো।

দী সেথায় রাজকুমারী 'ছায়া'—
ঘুমিয়ে আছে সোণার কাঠির ছোঁয়ায়,
লঙ্কে তা'র লুটায় শীর্ণ কায়া—
ময়দানবের মোহন কাঠির মায়ায়!

াটে তা'র জীয়ণ কাঠি আজ ছোঁয়াল কে,
কোন সে রাজার বেপরোয়া ছেলে,—
লো না'ক চোখের পাতা কি সে
রাজকুমারী চোখ দু'টো যেই মেলে?

ানি ক'রে ক্ষণেক গেল কাটি'
রাজকুমার বললো ধরি হাত,—
পন দেখা তুমিই আমার সাথী
খুঁজে পেতে বছর গেল সাত!"

রাজকুমারীর ফুটলো মুখে বাণী,
"ওগো আমার স্বপন-দেখা প্রিয়,—



তুমিই আমার 'আশার মানব' জানি
এলে যখন স্থানটা পায়ে দিও।"

স্বপন দেশের সেই সে রাজার ছেলে
করলে শেষে ময়দানবে নাশ,
রাজকুমারী ফুল্ল মুখে মাল্য দিল গলে
আজও তা'রা করছে সুখে বাস!

—০—

মৌমাছি

মোমবাতি

—শ্রীকারিকর

বহু শতাব্দী আগেকার কথা যখন তেল, গ্যাস বা বিদ্যুত আলোর সৃষ্টি হয়নি, তখন ঘরে ঘরে, সভাসমিতির উৎসবে, রাজারাজড়ার দরদালানে জ্বলতো মোমবাতি। মোমবাতিই ছিল তখনকার দিনে সভ্যজগতের একমাত্র স্নিগ্ধ পরম রমণীয় সুন্দর আলো। আজও এই বিদ্যুৎ-আলোর যুগে অনেক দেশে বিদেশে মোমবাতির আদর আছে তার কারণ যা অন্য আলোতে নেই মোমের আলোর শান্ত শীতল ও স্নিগ্ধ ভাবটুকু। এর অন্য একটা মস্ত উপকারিতা আছে, কখনও চোখ খারাপ হয় না; মোমবাতি যেন উৎসব আনন্দের আলো, আজও ইউরোপ ইংলণ্ড আমেরিকাতে উৎসব মেলার ঋতুতে মোমবাতি রাতের আলো হয়ে জমিয়ে রাখে। কাঁচের ঝাড়ে বিচিত্রভাবে যখন মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়—যখন দালানে হাজার ঝাড়ে সহস্র মোমবাতি একসঙ্গে জ্বলে ওঠে তার অপরূপ আলোতে যে উৎসবের মহলার সৃষ্টি হয়—লক্ষ বিদ্যুৎ বাতিও কি তাদের হার মানাতে পারে? মোমের আলোর কোন এতটুকু উগ্রতা নেই, নরম ও কেমন শান্ত শিষ্ট ও শান্তিময় সে—নয় কি?

কেমন করে এই মোমবাতির প্রচলন হোল ও কেমন করে তাদের তৈরী করা হয় সে এক ভারী মজার ইতিহাস। প্রথম প্রথম গলা চর্ব্বির মধ্যে বাতি ডুবিয়ে তাকে জ্বালান হোত তারপর তিমি মাছের মাথায় এক রকম মোমজাতীয় জিনিষ পাওয়া গেল তাকেও লাগান গেল আলো আদায় করবার কাজে। এই তিমির মোমের রং ধবধবে সাদা হোত। কিন্তু তা হলে হবে কি শীঘ্রই দেখা গেল এ দুরকম মোম জ্বালানই গরীবদের পক্ষে বেশ খরচ; প্রথমটা চট করে গলে যায়, দ্বিতীয় সব সময়ে মেলা শক্ত। কাজেই এরপরে চলল আবিষ্কারের পালা এবং ফলে হোল কি একজন ফরাসী কেমিষ্ট সেভ্রয়ে ১৮২৩ সালে দেখালেন যে চর্ব্বিতে অনেক রকম পদার্থ আছে ও তার মধ্যে কয়েকটি আলো দেবার পক্ষে একেবারেই 'অপদার্থ', তাদের

দ দিয়ে চর্ব্বি জ্বালাতে হবে। দেখা গেল চর্ব্বিতে প্রধানত আছে শক্ত এ্যাসিড ষ্টীয়ারিণ ীয় এ্যাসিড ওলেইন এবং গ্লিসিরিণ। এই-গ্লিসিরিণ অন্য কাজে দরকারী হলেও দেখা গেল লো দেবার পক্ষে একেবারে অকর্ম্মন্য। শক্ত ষ্টীয়ারিণ চার্ব্বিই প্রমাণ হোল সবচেয়ে কাজের নিষ। বছর দশেক গবেষণার পর ষ্টীয়ারিণকে অন্য 'অপদার্থ' থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলা সম্ভব াল, প্রায় বছর কুড়ি এই ষ্টীয়ারিণ ঘরে ঘরে আলো দিল। কিন্তু তারপর আবিষ্কার হোল আর ক নতুন জিনিষ। পেট্রোল তৈরী করার সময় একটা চকচকে সাদা শক্ত পদার্থ পাওয়া গেল— র নাম আমাদের অতি পরিচিত—প্যারাফিন। কিন্তু আমেরিকার পেট্রোল খনিগুলো াবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত এর প্রচলন বেশী হোল না। কিন্তু তারপর এর ব্যবহার খুব ড়ে গেল। বাড়বেই ত, প্যারাফিন তৈরী হওয়া খুব শক্ত নয়। কিন্তু গোল বাধল য়ারিণ বাতি ও প্যারাফিণ বাতির তুলনা করে এবং শীঘ্রই দেখা গেল প্যারাফিন াম আগুনের তাপে বেঁকে যায় কিন্তু ষ্টীয়ারিণ মোমবাতি বরাবর সোজা থাকে ক বৈজ্ঞানিক তখন বুদ্ধি করে এদের মিলিয়ে দিলেন—ফল হোল চমৎকার। যে ঠিকমত গাভাগি করে এদের মেলাতে পারল তাদেরটাই হোতে লাগল বেশী কাজের জিনিষ। এবং রিকরদের বাহাদুরী হোল এই মেশানতেই। কাজেই মোমবাতির এই দুটিই হোল আসল নিষ ও চর্ব্বি থেকে ষ্টীয়ারিন আলাদা করে বা ঘন করে পরিষ্কার করা এবং প্যারাফিনের ঙ্গ মেশানই হোল মোমবাতির কারখানার সবচেয়ে বড় ও প্রধান দুটি কাজ।

ষ্টীয়ারিণ আলাদা করার জন্য প্রথমে চর্ব্বিগুলো বড় বড় পাত্রে গলান ও ফোটান হয় তে তার মধ্যে নানা বিজাতীয় বাজে জিনিষ সরিয়ে ফেলা যেতে পারে। পরে তাদের তামার ত্রে (outoclre) চুণ ও জল মিশিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে বাষ্পের চাপ দেওয়া হয় ফলে হয় ঐ চুণ ও জল চাপের চোটে চর্ব্বি থেকে চার্ব্ব এ্যাসিড ও গ্লিসিরিণ আলাদা করে ফেলে। কাজটা সম্পুর্ণ হলে তামার পাত্রটা থেকে অন্য একটা পাত্রে সব জিনিষটা ঢেলে ফেলা হয় গ্লিসিরিনটা সরিয়ে নেওয়া হয়—এবং চুণটাকেও একটা অন্য এ্যাসিড সালফিউরিক এ্যাসিড য়ে তাকে আলাদা করা হয়।

এরপরে ষ্টীয়ারিণ (ও ওলেইন) নিয়েও তাকে খুব কড়া সালফিউরিক এ্যাসিডে ধুইয়ে ওয়া হয়—তাতে রং পরিষ্কার হয় বাকি বাজে জিনিষ নষ্ট হয় ও ওলেইন কিছু কিছু য়ারিণে পরিণত হয়। কিন্তু এখনও কাজ শেষ হয়নি একে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা াকার তার জন্যে বড় বড় পাত্রে তাদের বাষ্পের দ্বারা গরম করা হয় যতক্ষণ না তা থেকে ষ্পের উৎপত্তি হচ্চে—হলে ঐ বাষ্প সোজা কতকগুলি পাত্রের (condensers) মধ্যে দিয়ে

চালিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়—ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণ পাত্রগুলি থেকে ঐ চর্ব্বি এ্যাসিড জলের মত অন্য বড় পাত্রে তাদের এনে ফেলা হয়। তারপর চ্যাপটা থালার মত টিনের পাত্রে তাদের ঢালা হয় ও শীঘ্রই হাওয়া লেগে তারা শক্ত হয়ে পড়ে।

এখন এই মোমে ষ্টীয়ারিণ ও ওলেইন দুই আছে। কিন্তু পুরোপুরি মোমবাতির কাজে এই ষ্টীয়ারিণটারই মূল্য বেশী আগে বলেছি। এই শক্ত জিনিষটা ক্যানভাসের চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা থলেতে পোরা হয় এবং তাদের ওপর কলের চাপ (Hydraulic Pressure) দেওয়া হয়, চাপের চোটে ওলেইনটা ক্যানভাসের গা ভেদ করে গলে বেরুতে থাকে ষ্টীয়ারিণ তার চেয়ে শক্ত জিনিষ বলে থলের মধ্যে থেকে যায়। এই চাপের পর থলে থেকে বার করে দেখা যায় ষ্টীয়ারিণ বরফের মত সাদা ও সুন্দর হয়ে গিয়েছে। এরপর এ থেকে কেমন করে মোমবাতি তৈরী করা হয় তার কথা বলছি।

কিন্তু তার আগে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্যারাফিনটার সদ্গতি দেখতে হবে। এর হলদে রংটা আলোর পক্ষে ক্ষতিকর আর এথেকেও নরম প্যারাফিনের অংশ ও তেলের ভাগ সরাতে হবে। মাটির নীচে বড় বড় পাত্রে (underground tanks) এদের ঢেলে ফেলে বাষ্প দিয়ে গলিয়ে ফেলা হয়। গলবার পরে পাম্প করে ওপরে অন্য পাত্রে থিতিয়ে দেবার জন্য তোলা হয় পরে জলের ভাগ বার করে অন্য চ্যাপটা পাত্রে এদের ঠাণ্ডা করে আবার সামান্য একটু গরম করা হয় যাতে ঐ প্যারাফিনের নরম অংশ গলে বেরিয়ে যায়। এই কাজটা খুব সাবধানে করতে হয় নইলে আসল প্যারাফিনের অনেক অংশ নষ্ট হতে পারে। কিন্তু আরো একবার একে পরিষ্কার না করা পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিকর সন্তুষ্ট হন না। কাঠ কয়লাকে এবার কাজে লাগান হয়। তোমরা ভাববে তাহলে এবার যা পরিষ্কার হয়ে ছিল তাও গেল বুঝি সব কালো হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় না বালির মত কাঠ কয়লাও গলা জলীয় জিনিষ পরিষ্কার করে। প্যারাফিনকে আবার গলান হল এবং বেশ করে কাঠকয়লা দিয়ে একটা পাত্রে (agitator) নাড়াচাড়া হোল। তারপর কার্ব্বন রইল নীচে পড়ে ও নলের মধ্যে করে বাষ্প দিয়ে প্যারাফিনটা উড়িয়ে অন্যপাত্রে আনা হোল। এবার প্যারাফিন ও ষ্টীয়ারিণ এদের মেলাবার ব্যবস্থা করা হোল অন্য একটি ঘরে (mixing room).

মোম তৈরী করার কথা এতক্ষণ বললাম। এবার বাতির কথা। তারপর মোমবাতি আমরা যেমনটি বাজারে দেখতে পাই, একসঙ্গে কেমনভাবে তৈরী হয় তার কথা। গোড়ায় সাধারণ তুলোর সুতো কয়েকটি আলগা ভাবে জড়িয়ে তাতে বাতি তৈরী করা হোত। কিন্তু দেখা গেল এতে আলো সুবিধের হচ্চেনা আলো নিবে নিবে যাচ্চে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এক

রাসী বৈজ্ঞানিক (ফ্রান্সেই মোমবাতির যা কিছু আবিষ্কার) দেখালেন যে সুতোগুলো না ড়িয়ে বেশ করে পাকালে বাতিটা সামান্য নুয়ে পড়ে তাতে হয় কি সোজাসুজি জ্বললে সুতোর ণষভাগ যেটা পুড়ে পুড়ে মোটা হয়ে যেতো—তা না হয়ে সেটা পুড়ে বেরিয়ে যাবে ও আলো রিষ্কার হবে। কিন্তু আরো একটা কাজ করা দরকার। সুতোর ভেতর যে ছাই ও অন্যান্য ক্ত খনিজ পদার্থ থাকে তাকে বাদ দিতে হবে কারণ সেগুলি জমে বাতিটাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার লতে দেয় না। দেখা গেল বোরাক্স ও অ্যামোনিয়া সালফেট জলে গুলে সেই জলে বাতিটা বিয়ে রাখা যায়—তারপর যদি তাকে শুকিয়ে নেওয়া যায় তাহলে বাতি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে লতে থাকে। এর কারণ কিছুই নয়—বোরাক্স ও এমোনিয়া জলে ডোবানর দরুণ ছাইভাগ লো বোরাক্সে মিশে কাচের বিন্দুতে পরিণত হয়ে বাতি থেকে খসে যায় ও বাতির শেষভাগ রিষ্কার হয়ে যায়। ঠিক সাইজ মত বাতি কাটাও বেশ বাহাদুরীর কাজ। ড় বেশী লম্বা করলে ধোঁয়া হবে ভালো আলো হবে না আবার বেশী ছোট হলে লা মোম সময় মত ভালোভাবে পোড়াতে পারবেনা—ফলে আশে পাশে মোম গলে জমাট াধতে থাকবে।

এবার মোম ও বাতি একসঙ্গে লাগিয়ে ঠিকমত শক্ত করে বাজারের জন্য তৈরী করা। চন্তু বাজারে যেতে এখন বহুৎ দেরী। ষ্টীয়ারিণ ও প্যারাফিণ ঠিকমত মেলাবার পর ঐ লান মোম একটা বরাবর লম্বা পাত্রে ঢালা হয় ; এই পাত্রের ওপর উঁচুতে লোহার ফ্রেমে বাতি াগান থাকে ঐ বাতি শুদ্ধ লোহার ফ্রেম এবার গলান মোমে কয়েক সেকেণ্ড (dipping rocess) ডোবান হয়—পরে গলা মোম শুদ্ধ বাতির সঙ্গে ফ্রেমটি ওপরে তোলা হয় ও একটা াকের ওপর শক্ত করবার জন্য রাখা হয়। এই রকম কয়েকবার ডোবান হয়, তারপর মোম-াতি চাঙড় লোহার ফ্রেম থেকে কেটে নিয়ে কাঠের রডে চালান করা হয়। এর পরেও আবার ' আগের মত ডোবান ও ঠাণ্ডা করা হয় যতক্ষণ মোমটা ঠিকমত না ঘন ও মোটা হয়। রপরে মোমকে শেষ কাজের জন্যে বাষ্পের মধ্যে করে চালিয়ে ছাঁচে ঢালা হয়। মোমকে ই ছাঁচে নিয়ে যাবার ও ঢালার নানা আধুনিক উপায় ও যন্ত্র আজকাল আবিষ্কার হয়েচে। াঁচ থেকে বার করে অথবা কোথাও কোথাও ছাঁচের ভেতরই ঠাণ্ডা জলে মোমকে বেশ করে াওয়ান হয় এতে মোম বেশ শক্ত ও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এরপর কারিকর মোমগুলি াত্যেক ছাঁচ থেকে বার করে ছুরি দিয়ে বাতিগুলো আধ ইঞ্চি আন্দাজ কেটে দেয়। মোম াতির কারখানায় নানা রকম ছাঁদ মজুত থাকে—ছোট, বড়, মাঝারি, সরু, মোটা, লম্বা, বেঁটে ব প্রকাণ্ড ছাঁদ, পূজাপার্ব্বনে বিশেষ ধরণের ছাঁদ নানা অদ্ভুত আকৃতির ছাঁদ সব মজুত থাকে।

এগুলি সাইজ হিসেবে বাজারে একপয়সা, দুপয়সা, এক আনা দু'আনা ইত্যাদি দামে বিক্রী হয়। বড় দিনের সময় ইংলণ্ডে, ইউরোপে পাঁচ ফিটের ওপর লম্বা মোমবাতি তৈরী হয়। অনেক সময় এই বড় মোমবাতিগুলির গায়ে হাতের সুন্দর নানা কাজে চিত্রবিচিত্র করা হয়।

শেয়াল ভাগ্নে

শ্রীসুকুমার দে সরকার

ভর সন্ধ্যেবেলা। বনের পশ্চিমটা টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে। লম্বা ঘাসগুলো বাতাসে দুলছে। তারই একটা ঘন জায়গায় বাঘ ঢুকে গর গর করে বলল—নাঃ ওই পাজীটার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখা হবে না!

বাঘিণী তার সাদা পেটটা সবুজ ঘাসে ঢেলে দিয়ে শুয়েছিল। সে জিগেস করল—কার কথা বলছ গো?

—ওই পাজী শেয়ালটা।

—কেন আবার কি করল?

—আর বাকী কি করবে? মানুষের সমাজে কি মুখ দেখাবার জো রেখেছে?

—তোমার ওই সোনামুখটা বুঝি মানুষে খুব আদর করে দেখে?—বাঘিণী হেসে জিগেস করল।

বাঘ বলল—আহা শোনই না! মানুষের ছানাগুলো শুদ্ধ আজকাল জেনে গেছে শেয়াল কি করে আমাদের ঠকিয়েছে? মানুষগুলোও যেমন!

বাঘ ঘেন্নায় একটা ঘড় ঘড় শব্দ করল।

—তারা আবার বইয়ে সে কথা লেখে। কেন বাপু? লেখ না আমাদের গায়ে কত জোর তা নয় কেবল ওই পাজী শেয়ালটার কত বুদ্ধি, কি করে জানোয়ার ঠকায় খালি সেই সব। নাঃ, ও পাজীটার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নয়!

বাঘ তার প্রকাণ্ড থাবাটা চাটতে লাগল।

তারপরে দিন যায় সুখে দুঃখে। শীত গিয়ে বসন্ত এল, বন ফুলে ফুলে ভরে গেল, বাঁশ ঝাড়ে টিয়া পাখীদের কলরব। বাঘিণীর দুটো ছানা হোল ছোট্ট ছোট্ট নরম তুলতুলে গায়ে হলদে হলদে ছোট ছোট বুটি।

বাঘিণী একদিন বলল—আহা আমার বাচ্ছারা কেমন মিষ্টি! এমন ছানা আর কারো হয় না। বুঝেছ গো বাছাদের অন্নপ্রাশনের দিন জ্ঞাতি গোষ্ঠিদের খাওয়াতে হবে। কি কি হবে বলত? হরিণের মাংস, হাঁসের কচি হাড়, আস্ত খরগোস......

বাঘ জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটতে চাটতে বলে উঠল—আহা হা হা!

বাঘিণী বলেই চলল—সারসের ঠ্যাং, পাঁঠার মুড়ি...



সুন্দরবন থেকে এল ইয়া কেঁদো কেঁদো বাঘ—

—পাঁঠা আবার কোথায় পাওয়া যাবে?—বাঘ বলে উঠল।

—কেন জোগাড় করতে পারবে না? পাঁঠা কিন্তু চাই।

বাঘ বলল—হুঁ! পাঁঠার খবর জানে ওই পাজী শেয়ালটা, কিন্তু ও-পাজীটাকে কিছুতেই বলা হবে না!

বাঘিণী বলল—তা কি হয়? হাজার হোক জ্ঞাতি ত! এমন সুখের দিনে কি ওকে বাদ দেওয়া যায়?

দেখতে দেখতে বাঘের ছানাদের অন্নপ্রাশনের দিন এসে পড়ল। সুন্দর বন থেকে এল ইয়া কেঁদো কেঁদো বাঘ, গুজরাট থেকে বুটিদার চিতা, হিমালয়ের মিশ কালো বাঘ, বন বেরাল টাম আরও কত কি। শেয়ালও এল শেষ কালে।

শেয়াল এসে বলল—কি মামী পাঁঠার জোগাড় হয়েছে ত?

বাঘিণী বলল—না বাবা আর সব হয়েছে ওইটি কিন্তু তোমাকে জোগাড় করে দিতে হবে, তুমি হলে আমাদের আপন জন, আপনার লোক!

গোঁফ চুমরে, লেজ ফুলিয়ে শেয়াল জবাব দিল—তুমি কিছু ভেবো না মামী আমি সব জোগাড় করে দেব, শুধু বাঘা মামাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে।

বাঘিণী একগাল হেসে মূলোর মত দাঁত বার করে বলল,—নিশ্চই, নিশ্চই !

বনের পারে চাষীদের ঘর, তার পাশে ক্ষেত খামার। ঘরের লাগোয়া খোঁয়াড়। খোঁয়াড়ে ছাগলরা ঘুমুচ্ছে। রাত নিশুতি। বাঘকে পথ দেখিয়ে চুপি চুপি শেয়াল সেখানে নিয়ে এল।

—মামা ওই যে খোঁয়াড়, ঝাঁ করে ভেতরে লাফিয়ে পড়। তারপরে একটা করে পাঁঠা মার আর এপারে ফেলে দাও আমি একটু টেনে নিয়ে গিয়ে ওধারে জমিয়ে রাখি। শেষে দুজনে মিলে নিয়ে যাওয়া যাবে।

বাঘেরত আগে থেকেই জিভে জল ঝরছিল সে আর কোন কথা না বলে খোঁয়াড়ের ভেতর লাফিয়ে পড়ল। একটা পাঁঠা মেরে সে এপারে ফেলে দিল —এই নাও ভাগ্নে সরিয়ে রাখো।

শেয়াল মরা ছাগলটাকে টেনে টেনে বনের ভেতর নিয়ে এল। বাঘ ওদিক থেকে শেয়ালকে বলল—ও ভাগ্নে ছাগলগুলো সব জেগে গেছে, বেজায় ছুটো ছুটি করছে একটাকেও ধরতে পারছি না।

শেয়াল ততক্ষণে মরা ছাগলটার লেজের দিক থেকে চিবুতে সুরু করেছে, সে বলল—মামা তোমার এই বীর গলায় একটা হুঙ্কার ছাড়ো না, ভয়েই ছাগলগুলো আধমরা হয়ে যাবে।


লেজের দিক থেকে চিবুতে সুরু করেছে

তাই না শুনে বাঘ মারল এক হুঙ্কার, পৃথিবী কেঁপে উঠল। সেই হুঙ্কারে চাষার দল জেগে উঠল।

—বাঘ—বাঘ—বাঘ পড়েছে !

চাষার দল লাঠি সড়কি নিয়ে ধেয়ে এল। সকলে মিলে প্রাণপণে পিটতে সুরু করল বাঘকে। বাঘ একবার দাঁত বারকরে খিঁচুনী দিতে গিয়েছিল কে যেন একটা জ্বলন্ত মশাল বাঘের মুখে গুঁজে দিল। বাঘ একেবারে চুপ। শেষে আধমরা হয়ে পড়ে রইল বেচারা।

এদিকে ধূর্ত্তশেয়াল মনের সুখে মরা পাঁঠাটাকে পেট ভরে ভোজন করে নিল। ঠাটার লেজের চুলগুলো পড়ে রইল শুধু। আহা কতদিন এমন কচি পাঁঠা খাওয়া হয়নি, ভদিয়ে গোঁফটা চাটতে চাটতে সে ভাবল। ভোর হয় হয়, দূরে খোঁয়াড়ের দিকে চেয়ে সে থল বাঘটা আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। শেয়াল করল কি, অমনি একেবারে হাত পা :ল পড়ে গোঙাতে সুরু করে দিল।

বাঘ ভেবেছিল এসে শেয়ালকে লাগাবে তিন থাপ্পড় যাতে সে নিজের নাম ভুলে গিয়ে ı করে যে সে ইঁদুর, কিন্তু তার অবস্থা দেখে জিগেস করল—কি ভাগ্নে কি হল ?

শেয়াল কাৎরাতে কাৎরাতে জবাব দিল—ওঃ মামা! মেরে পিঠ একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে র নড়তে পারছি না।

—পাঁঠাটা কি হোল ? বাঘ জিগেস করল।

—আর বল কেন ? এই চাষাগুলো নিয়ে গেল।

বাঘ বলল—আর কি হবে ? প্রাণ নিয়ে বেঁচেছি এই ঢের ! চল এখন ঘরে ফেরা যাক্।

একপেট খেয়ে শেয়ালের আর হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না। সে তেমনি কাৎরাতে ংরাতে বলল—না মামা তুমি যাও আমার আর চলবার ক্ষমতা নেই, আমি এইখানেই মরি ম যাও।

—আরে তাও কি হয় ? বাঘ জবাব দিল।

—কি করব এমন মার খেয়েছি যে আমার আর ওঠবার শক্তি নেই।

—এক কাজ কর ভাগ্নে তুমি আমার পিঠে উঠে পড় আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।

বাঘের পিঠে চড়ে বসল ধূর্ত্ত শেয়াল। বাঘ তাকে পিঠে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তে যেতে বলল—অমন মুষড়ে যেও না ভাগ্নে! গিন্নী যা জোগাড় করে রেখেছে সে সব লেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

পথে যেতে যেতে আগে পড়ে শেয়ালের গর্ত্ত। সেই গর্ত্তর কাছাকাছি আসতেই য়াল ঝাঁ করে বাঘের পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে বলল—মামা আজ আমার বড় পেট মড়াচ্ছে, মামীকে বোলো আর একদিন পাঁঠা জোগাড় করতে যাওয়া যাবে, মামীকে নিয়ে। মান্য পাঁঠা জোগাড় করা কি তোমার মত বীরের সাজে ?

এই বলেই শেয়াল টুক করে গর্ত্তে ঢুকে গেল।

——:0:——

বিজ্ঞাপন-পড়ার "হবি"

শ্রীসুকুমার লাহিড়ী

তোমাদের অনেকেরই অনেক রকম খেয়াল বা hobby আছে, চল্‌তি কথায় যা'কে আমরা ব'লে থাকি "বাতিক"। যেমন মনে করো, কেউ নানান্‌দেশের নানারকম ষ্ট্যাম্প বা ডাক্‌টিকিট সংগ্রহ কোরতে ভালবাসো; কেউ নাম-করা লেখক-লেখিকাদের ফটো সংগ্রহ কোরতে ভালবাসো, আবার কেউ ক্যামেরা নিয়ে সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে খুব আনন্দ পাও—এমনি কত কি! কিন্তু কেউ যদি বলে, "আমি বিজ্ঞাপন পড়তে ভালবাসি, আর সে-গুলো আমার খাতায় এঁটে রাখ্‌তে খুব আনন্দ পাই"—তা হ'লে তোমরা তা'র সম্বন্ধে কি ভাবো—বল তো? নিশ্চয়ই এটা তোমাদের কাছে খুব অদ্ভুত ব'লে মনে হয়—নয় কি? কিন্তু তোমরা তা'র সম্বন্ধে যাই মনে করোনা-কেন, এমন খেয়ালী সত্যি সত্যিই আছে এবং তা'রা এ'তে আনন্দও পায় যথেষ্ট, যদিও এ'দের সংখ্যা এমন একটা বেশী নয়। সে যা'হোক্, এই বিজ্ঞাপন পড়ার অভ্যেসটা কিন্তু সত্যি ভালো। আনন্দ ছাড়াও, এ'তে জানবার অনেক জিনিষ আছে যা' আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়। তাই, এ-খেয়াল বা অভ্যেসটাকে হেসে উড়িয়ে দেবার মত অতো তুচ্ছ মনে করা উচিত হ'বে না।

এই তো তোমাদের "রংমশালে" অনেক বিজ্ঞাপনই তো ছাপা হয়। আচ্ছা, সত্যি বলতো, তোমাদের মধ্যে ক'জনে এ'গুলো পড়? "রংমশালে"র মজার মজার গল্প পড়ার উৎসাহেই তোমরা বিভোর, কে আবার এইসব নীরস বিজ্ঞাপন পড়তে যা'বে! কিন্তু সেটা মনে করা তোমাদের কতটা ভুল তা' বুঝতে শিখবে তখন, যখন এই অভ্যেসটি আরম্ভ কোরবে।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাবো, সম্পাদকমশাই কেন যে এই বিজ্ঞাপনগুলো ছাপেন শুধু শুধু! অন্যান্যের সঙ্গে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বিজ্ঞাপন যখন আবার দেখতে পাও তখন হয়তো মনে করো—এ-গুলো আবার কেন? বিস্কুটের বিজ্ঞাপন, বইয়ের বিজ্ঞাপন কিংবা ক্যামেরার বিজ্ঞাপন যে ছাপা হয় তা'র না-হয় একটা মানে আছে, কেননা বিস্কুট খেতে ভাল, পুষ্টিকর সুতরাং এগুলো কিন্‌তে বাবা-মা'কে বল্‌তে পারি, নিজেরাও কিন্‌তে পারি, ক্যামেরা কিংবা ঐ ধরণের জিনিষও না হয় কেনা গেল, কিন্তু ইনসিওরেন্স? বাবা-মাকে

বিজ্ঞাপন-পড়ার হবি
শ্রীসুকুমার লাহিড়ী

আবার এ'সম্বন্ধে কি ব'ল্‌বো ? আর. এখন তো আমাদের রোজগার কোরবার মত বয়সও হয়নি, ভাব্‌বারও সময় নয়, তবে ? এমনটি তোমাদের মনে আসাও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু, হ্যাঁ, অন্যান্য বিজ্ঞাপনের মতো, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সম্বন্ধেও তোমরা তোমাদের মা-বাবা কিংবা অন্য যাঁরা তোমাদের অভিভাবক তাঁদের জিজ্ঞাসা কোরতে পারো। তোমাদের যে-বয়স এটা শেখবারই বয়স তাই এ'বিষয় কিছু যদি এখন থেকেই জানতে চেষ্টা করো তা'তে লাভ ছাড়া তো ক্ষতি নেই। যখন বড়ো হ'বে, তখন এ বিষয়টা তোমাদের কম-বেশী সবায়েরই আবশ্যক হ'বে। আর, তা' ছাড়া, আগের মতো, ইনসিওরেন্স কোম্পানী-গুলো কেবল বড়োদের নিয়েই ব্যস্ত নেই। তোমরা যা'রা ছোট—স্কুল-কলেজে পড়ো, কিংবা তোমাদের চাইতেও যা'রা ছোট—তা'দের জন্যেও এই কোম্পানীগুলো আজকাল এমন সব সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা কোরছে যা' শুন্‌লে তোমরা আজই তোমাদের যারা বড়ো তা'দের কাছে গিয়ে অনেক কথা জান্‌তে চাইবে।

এই সব ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলো তোমাদের জন্যে কি করতে পারে জান ? তোমাদের জন্যে তা'রা এমন সব ব্যবস্থা করতে পারে. যা'তে কোরে তোমরা লেখা পড়া শেখে' নিজেদের মানুষ কোরে তুলতে পারো। সাধারণতঃ এই সব কোম্পানী ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অভিভাবকদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত ক'রে থাকে যা'তে ছেলে-মেয়েদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা'দের লেখা পড়া প্রভৃতির দায়িত্ব ইনসিওরেন্স কোম্পানীই গ্রহণ করে থাকে। তখন অভিভাবককে ছেলে-মেয়েদের জন্যে একটি পয়সাও এদিকে ব্যয় কোরতে হয় না। কথাটা আরো একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।

মনে করো, তোমার বয়স পাঁচ বছর। বিশ বছর পরে তোমার বাবা কাজ থেকে অবসর গ্রহণ কোরবেন। আরো মনে করো, তোমার আরো দু'টী ভাই ও একটি বোন আছে। তাদেরও লেখা-পড়া শেখাতে হ'বে। তোমার বাবার ইচ্ছা যে, তোমার বয়স যখন পঁচিশ বছর হবে, তখন তিনি তোমাকে কৃষিবিদ্যায় বিশেষ জ্ঞান-লাভের জন্যে বিলেত পাঠাতে চান্। এর খরচ ও মনে করো প্রায় ৬০০০৲ টাকা। তোমার বাবার পক্ষে একসঙ্গে এই টাকাটা দেওয়া কি খুব কঠিন হোয়ে পড়ে না ? আর, অবসর গ্রহণ করলেও তো তাঁর এখনকার আয় বন্ধ হোয়ে যা'বে তখন কি করে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবেন ? এই অসুবিধা থেকে সহজেই উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে, যদি তোমার বাবা এ সমস্যায় কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাহায্য নেন্। ইনসিওরেন্স কোম্পানী তখন তোমার বাবাকে বলবে, "হ্যাঁ, আমরা আপনার ছেলেকে বিলেত পাঠিয়ে কৃষিবিদ্যা শেখানোর দায়িত্ব নিতে

প্রস্তুত আছি তবে আপনাকে প্রতি বৎসর ২০০৲ টাকা করে আমাদের দিতে হবে এবং বিশ বৎসর পর্য্যন্ত (অবসর গ্রহন করা না পর্য্যন্ত) এই দু'শো টাকা করে প্রতি বৎসরই আপনাকে দিতে হবে"। কোম্পানী এই সঙ্গে আরো বলবে, "ভগবান না করুন, আপনার অভাব ঘটলে, প্রিমিয়াম আর দিতে হবে না। পঁচিশ বছর পূর্ণ হ'লেই আমরা আপনার ছেলের এই দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন কোরবো"। তোমার বাবা যখন রোজগার করছেন তখন তাঁর পক্ষে প্রতি বৎসর দু'শো টাকা দেওয়া এমন একটা খুব কঠিন নয়। বছরে দু'শো হ'লে, মাসে কত দাঁড়ায় তা' তোমরাই বা'র কোবতে পারবে। তা'হলে দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু ক'রে দিয়ে কত বড় একটা দায়িত্ব ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ঘাড়ে অতি সহজেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারা যায় আর তা'তে ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ ও কত নিশ্চিত থাকে।

আমি ওপরে একটি অতি সোজাসুজি উদাহরণ দিলাম কেবল তোমাদের বোঝানোর জন্যে। সত্যি সত্যি কোম্পানীগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে এমন সব চমৎকার চমৎকার ব্যবস্থা কোরেছে যা' তোমাদের খুব ভাল লাগবে এবং যা' তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আর এ কোম্পানীগুলোও এতো ভালো যে, তোমরা যদি একখানা কার্ড লিখে এদের কাগজ পত্র চেয়ে পাঠাও তা'হলে খুব আনন্দের সঙ্গেই এরা তোমাদের নামে নিজেদের ব্যয়ে নানান্ রকম কাগজ পত্র পাঠাবে। আর, কোন জিনিষ ভালো করে বুঝতে চাইলে ওদের প্রতিনিধি এসে "বিনা ভিজিটে" তোমাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে যাবে।

তোমাদের যদি এ'সম্বন্ধে জানার উৎসাহ থাকে, তা'হলে মাঝে মাঝে আমিও বক্‌তে পারি।

হ্যাঁ, এই সঙ্গে তোমাদের একটি ভারী মজার খবর দেবো। তোমরা নিশ্চয়ই কাগজে প'ড়ে থাকবে যে, হল্যাণ্ডদেশের রাজকুমারী জুলিয়ানার একটি ফুট্‌ফুটে সুন্দর মেয়ে হোয়েছে। তার নাম রাখা হোয়েছে বার্ট্রিক্স। বার্ট্রিক্স এই বছরের ৩১শে জানুয়ারী জন্মেছে। বার্ট্রিক্সের জন্মদিন স্মরণীয় ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে য়্যাল্‌কুয়ারের একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানী, ঐদিন হল্যাণ্ডে যতো শিশু জন্মেছে তাদের, বিনা খরচায় দশ ফ্লোরিণ মূল্যের একটি ক'রে বীমাপত্র দিয়েছে। ২৫ বছর পূর্ণ হ'লে তা'রা ইনসিওরেন্সের টাকা পা'বে। জানা গেছে, হল্যাণ্ডে নাকি প্রত্যেকদিন গড়ে ৫০০ শিশু জন্ম-গ্রহণ করে। কেমন সংবাদটি ? ভারি মজার, নয় ?

ছায়াচিত্রের ফ্রেডি

শ্রীঅধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী

অনেকদিন আগে ভাস্করদেব রংমশালের পাতায় তোমাদের তিনজন ছোট চিত্রাভিনেতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমি তাদেরই মধ্য থেকে ফ্রেডির সম্বন্ধে একটুখানি দিচ্ছি। এগুলো ফ্রেডির নিজের কথা এবং তারই লেখা একখানা চিঠির অনুবাদ। আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে।

ফ্রেডির কথা :

"তোমরা জান আমার একজন বড় লেখক হবার খুব ইচ্ছে, তাই আমি চিত্র সম্বন্ধীয় কাগজে ছোটদের কাছে চিঠি লিখতে খুব ভালবাসি। আমার জন্ম হয়েছে ইংলণ্ডের Wilshire-এ। আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমি আমেরিকায় আসি 'David-Copper-field' ছবিতে অভিনয় করতে। তখন থেকেই আমি এখানে থাকি, আর এ জায়গা আমার কাছে দিন দিন প্রিয় হয়ে উঠছে।

আমার বয়স এখন ১৩ বছর। আমার সপ্তম ছবি 'Captains Courageous' শেষ হয়ে গেছে। এর ঘটনা হচ্ছে একজন বড়লোকের ছেলেকে নিয়ে। সে পড়ে যায় এক সমুদ্রের কিনারায় এবং সেখান থেকে একজন জেলে তাকে উদ্ধার করে। জেলেদের সাথে বাস করতে করতে সে অনেক বিষয় শিখে ফেলে। ভাব একবার, সত্যিকারের জেলেদের সাথে কাজ করতে আমার কিরকম আনন্দ হয়েছিল।

মাছ ধরার দৃশ্যগুলো তুলতে আমরা Catalineতে যাই। সে সময়টা ছিলো খুব আমোদের। আমি নিজেও অনেকগুলো মাছ ধরি। আমরা একটা হোটেলে ছিলাম। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ সময়ই কেটেছিলো নৌকাতে কাজেও মাছ ধরতে।

ছবিতে আমি যে সব পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করি, তাদের অধিকাংশই আমার নিজের। এবং সেগুলো ষ্টুডিও থেকে তৈরী করান। অবশ্য Captains Courageous ছবির কতগুলো পোষাক ছিলো আলাদা। আমাকে অনেক পুরোনো জিনিষ পরতে হয়েছিলো। সাধারণত আমি আমার পোষাক-পরিচ্ছদ নিউইয়র্কের একটা

বিলিতি দোকান থেকে কিনি। Aunt Cissy মনে করেন যে আমিই হচ্ছি বাড়ীতে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে নোংরা ছেলে। আমার কিন্তু মনে হয় ছেলেরা প্রায়ই একরকম।

আমার বর্ত্তমানে একটা নূতন মজার hobby আছে, সেটা হচ্ছে ছবি তোলা, আমার একটা নূতন Leica ক্যামেরা আছে। আর আছে একটা ডার্করুম (Darkroom) আর ছবি তুলবার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম। নীচের তলার একটা ঘরে আমি ডার্করুম করেছি। সত্যি, এ ভারি সুন্দর হবি!

আমি দৈনিক হাত খরচের জন্য (বৃত্তির মত) পাই পাঁচসেণ্ট করে। যখনই পারি আমি এর থেকে কিছু কিছু জমাতে চেষ্টা করি। সম্প্রতি আমি আমার নিজের একটা লেখার জন্য পেয়েছি ৭৫ ডলার। সেই টাকা দিয়ে আমি কি করব তা বলছি।—প্রথমতঃ, Aunt Cissyর জন্য আমি একটা নূতন চেয়ার কিনব—এতে লাগবে প্রায় ৩০ ডলার। স্কুলের কতগুলো জিনিষের জন্য আর প্রায় ৩০ ডলার লাগবে। বাকি ১৫ ডলার আমি রাখব আমার পোষ্ট অফিসের হিসাবে। আমি এই অনুযায়ী কাজ করতে সুরু করে দিয়েছি।

আমি আমার ছোট মোটরে করে West-woodএর পোষ্ট অফিসে গিয়েছিলাম। আমি তাদের বললাম যে আমি একটা হিসাব খুলতে চাই—মানে কিছু টাকা জমা দিতে চাই। তারা আমাকে কতগুলো প্রশ্ন করলে এবং আমার আঙ্গুলের ছাপ নিলে। দু'ডলারের জন্য তারা আমাকে এক ডলারের দু'টো রসিদ দিলে। এসব কাজের সময় আমি Aunt Cissyকে সঙ্গে নেইনি। তাকে খবরটা দিয়ে বেশ একটু তাক লাগিয়ে দিলাম।

দিনের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা আমি স্কুলে থাকি। ছবিতে অভিনয় না কর্ব্বার সময়ও আমি ষ্টুডিওতে যাই। আমি পড়ি ইংরাজি, ল্যাটিন, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, বানান্ আর রসায়ণশাস্ত্র। শীঘ্রই আমি বাণিজ্যসংক্রান্ত আইন আর টাইপরাইটিং নে'ব। আমার ভাল লাগে বিশেষ করে অঙ্ক আর ইতিহাস।

যখন আমাকে স্কুলে যেতে হয়না বা কোন ছবিতে অভিনয় করতে হয়না তখন আমি আমাদের West-woodএর নূতন বাড়ীতে দিন কাটাই। West-wood হচ্ছে একটা ছোট্ট সুন্দর গ্রাম—হলিউড থেকে কয়েক মাইল দূরে। আমি উঠি ভোর ৭টায়। তারপর সকালকার খাওয়াটা সেরে, মোটরে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হই। ঘোড়ায় চড়তে আমি খুব ভালবাসি। সাঁতার কাটতেও আমার বেশ লাগে!

ছায়াচিত্রের ফ্রেডি
শ্রীঅধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী

আমার দুটো পোষা জীব আছে। বছর দুয়েক আগে মিস্ কনণ্ট্যান্স্ কলিয়ার নামে কজন অভিনেত্রী আমাকে একটা স্প্যানিয়েল কুকুর দিয়েছেন। আমি তার নাম রেখেছি Concol. গত সপ্তাহে আমি আরও একটা পেয়েছি। সেটার নাম রেখেছি Captain Manuel Tobias. ওর ডাক নাম হচ্ছে Tobby. Tobbyকে কি করে পলাম শোন :

সেদিন Aunt Cissyকে 'Captain Courageous' ছবির সম্পাদক মি: লরেন্স ফোন্ কর্লেন যে, আমার ছবি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে আস্‌বার আগে কয়েকজন বাছাই করা র্শকের সামনে দেখান হবে, সেখানে তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন * ভাবতে পারো কিরকম র্ত্তি হয়েছিলো আমার! এর আগে আমি কখনও এরকম জায়গায় যাইনি।

দুপুরে তো খাবার আগে মিঃ লরেন্স এসে হাজির হলেন, তিনি বল্লেন যে তাঁর গাড়ীর পছনে বস্‌বার জায়গায় আমার জন্য একটা উপহার রেখেছেন। সেটাই হচ্ছে Tobby.

ছবিতে অভিনয় কর্ব্বার সময় আমি কি করি তা জানতে চাও নাকি?—বেশ। ঠিক কাল নটায় আমি ষ্টুডিওতে যাই। আমাদের সোফার এডোয়ার্ড আমাকে মোটরে করে খানে নিয়ে যায়। সে দৃশ্যের জন্য যে সব পোষাক পরতে হবে, সেগুলো পরবার সময় জ্ঞাকর আমার উপর আবশ্যকীয় কাজগুলো সেরে নেয়। তারপর আমরা 'সেটে' Set) গিয়ে আমাদের 'পার্ট' আবৃত্তি করি। পরিচালক যখন মনে করেন যে মাদের 'পার্ট' ঠিক হচ্ছে, তখন তিনি চিত্রশিল্পী বা ক্যামেরাম্যান্‌কে দৃশ্য তোলা রু করতে বলেন।

প্রত্যেকদিন রাত্রিতে আমি বাড়ীতে আমার 'পার্ট' শিখি। এবিষয়ে Aunt Cissy মাকে সাহায্য করেন। যখন আমি বারে বারে পড়ে সেগুলোকে মুখস্থ করি, তখন তিনি ন্য অংশরূপে অভিনয় করেন। বইতে যেরকম লেখা আছে ঠিক সেই রকম প্রত্যেক থা আমাকে মুখস্থ করতে হয়। এ ছাড়াও ষ্টুডিওতে আরও অনেক কিছুই রবার আছে।"

এই গেলো ফ্রেডির কথা। তোমাদের ভালো লাগলে এবং সম্পাদকমশাই অনুমতি লে আর একদিন ছোট্ট শার্লিকে এনে উপস্থিত করা যাবে, কি বল?

---

* একে Speak Preview বলে



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

বহুক্ষণ—কতক্ষণ তা তার ধারণাই নেই—তখন কেটে গেছে। একটু একটু করে সময়ের যেন জ্ঞান ফিরে এল।

দেহ কিন্তু তখনও প্রায় অসাড়, মাথাটা এত ভারী যে মনে হয় কে যেন মণখানেক পাথর তাতে চাপিয়ে দিয়েচে। মনের আচ্ছন্ন ভাব তখনও কাটেনি। চোখ খুলে চাইতে পারলেও কিছু বোঝবার ক্ষমতা তার নেই। যে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার চারিধার ছেয়ে আছে সেটা বাইরের না তার মনের এইটুকু বুঝতেই তার বেশ সময় গেল।

তারপর ভালো করে একটু জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল আনন্দে বিস্ময়ে—একি এখনও সে বেঁচে আছে! বেঁচে আছে শুধু নয়, সহজে নিশ্বাসও নিতে পারছে!

ব্যাপারটা এতখানি বিস্ময়কর যে খানিকক্ষণ আর কোন চিন্তাই তার মাথায় জায়গা পেলেনা। তারপর এই আনন্দের উত্তেজনাতেই তার সমস্ত দেহে মনে যেন সাড়া ফিরে এল।

বুধগ্রহের হাওয়া তাহলে বিষাক্ত নয়! পৃথিবীর হাওয়ার সঙ্গে হয়ত তার কিছু তফাৎ আছে, তবু তাতে প্রাণ বাঁচে! মিছিমিছিই তারা ভয় পেয়ে এই মুখোসের শাস্তি এতক্ষণ ভোগ করেছে। অবশ্য তারা আগে থাকতে জানবেই বা কি করে! পরীক্ষা না করে দেখে

পৃথিবী ছাড়িয়ে
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

একেবারে সহজ ভাবে বেরিয়ে পড়াও উচিত হত না। বুধগ্রহের বাতাস অন্যরকম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী ছিল। তা যে হয়নি এ তার সৌভাগ্য। যন্ত্রণার চোটে হতাশ ভাবে শেষ মুহূর্ত্তে মুখোসটা না খুলে ফেল্লে সে কিন্তু এ সৌভাগ্য ভোগ করতে পেতনা। চারিধারে অফুরন্ত হাওয়া থাকতেও মুখোসের মধ্যে হাওয়ার অভাবে সে মারা পড়ত।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে গিয়েও সে থেমে যায়। এখনো ভাগ্যের কৃতজ্ঞতা জানাবার সময় বোধ হয় আসেনি। প্রাণে সে আপাততঃ বেঁচে গেছে বটে কিন্তু নিরাপদ সে এখনো মোটেই নয়।

কতক্ষণ যে অজ্ঞান হয়েছিল, বুধগ্রহের কতখানি রাত যে কেটে গেছে কিছুই তার ধারণা নেই। চারিধারে সূচিভেদ্য অন্ধকার, সে অন্ধকার সত্যিই পৃথিবীর অমাবস্যার রাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর। মাঝে মাঝে আকাশের ঘন মেঘের ঢাকনা ভেদ করে বিদ্যুৎ চমকে না উঠলে এই জমাট অন্ধকার বুঝি একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠত।

বিদ্যুতের চকিত আলোয় চারিধার আভাবে মাঝে মাঝে দেখতে পেলেও নিজের অসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থাটাও সে ভাল করে বুঝতে পারলে। ষ্টাইন কোথায় আছে কে জানে, প্রাণে বেঁচে আছে কিনা তাও ঠিক করে বলা যায় না। এই অপরিচিত অদ্ভুত গ্রহে সে একেবারে একা। সামনে সুদীর্ঘ রাত্রি; তারই মধ্যে চারিধারে কি অজানা বিপদ তাকে ঘিরে আছে কে বলতে পারে। এতক্ষণ সে যে নিরাপদ আছে কি করে সেইটেই আশ্চর্য্য!

এখন তার একমাত্র বাঁচবার উপায় কোন রকমে হাউই জাহাজের ভেতরে ঢুকে আশ্রয় নেওয়া। কিন্তু সমস্ত জাহাজ অ্যাল্‌জি লতায় যে ভাবে ঢাকা পড়ে গেছে তাতে শুধু ক্ষণিক বিদ্যুৎ চমককে সম্বল করে ভেতরে ঢোকবার দরজা খুঁজে বার করার ভরসা অত্যন্ত অল্প।

তবু সে চেষ্টা তাকে করতেই হবে। মুখোসওলা পোষাক একেবারে ছেড়ে ফেলার দরুণ শরীর অনেকটা হাল্কা বোধ হলেও দুর্ব্বলতা তার যায় নি। তাই প্রথম উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা গেল টলে, তারপর অ্যাল্‌জি লতায় পিছল হাউই জাহাজের গা বেয়ে হড়কে একেবারে সে নীচে গিয়ে পড়ল। সেখানেও ঘন অ্যাল্‌জি লতা গদির মত বিছানো বলেই এযাত্রা গুরুতর আঘাত থেকে সে গেল বেঁচে।

কিন্তু এখন হাউই জাহাজের দরজাটি ঠিক কোনখানে নির্ণয় করা দরকার। তা না হলে এই অন্ধকারে অকারণ ঘুরে মরাই তার সার হবে।

বিদ্যুতের আলোয় সমস্ত জাহাজের বর্ত্তমান চেহারাটা আর একবার ভালো করে দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার কাণ খাড়া হয়ে উঠল। কাছেই অন্ধকারে কি যেন একটা একঘেয়ে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কোথায় সে আছে ঠিক স্মরণ না থাকলে কাছাকাছি কতকগুলি গরু চরছে বলেই মনে হত। শব্দটা অনেকটা সেই ধরণের, কিন্তু তার সঙ্গে অত্যন্ত ভারী নিশ্বাসের যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, কোন গরুর গলা থেকে তা বেরুন সম্ভব নয়।

সমরের সমস্ত শরীর ধনুকের ছিলের মত টান ধরে উঠল ভয়ে আর উত্তেজনায়। ও শব্দের অর্থ যে কি, কি বিভীষিকা যে ওই শব্দের সঙ্গে জড়ান থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার নেই। শব্দটি যে বুধের কোন প্রাণীর এবিষয়ে শুধু সে নিঃসন্দেহ। সে প্রাণী যেমনই হোক, তার কাছ থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ বুঝে সে একটু একটু করে অন্ধকারেই পিছু হটতে লাগল। একবার বিদ্যুৎ চমকে উঠলে সে অবশ্য প্রাণীটিকে দেখতে পেত, কিন্তু তাও সে এখন চায়না! বিদ্যুতের আলোয় সে প্রাণীটিকে দেখতে পেতে পারে বটে কিন্তু তার নিজের ধরা পড়ার বিপদও তাতে কম নয়। তার চেয়ে অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে না পাওয়াই মঙ্গল।

হাতের অস্ত্রটি বাগিয়ে ধরে সন্তর্পণে একটু একটু করে পেছুতে পেছুতে সমর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, বিদ্যুৎ চমকায়নি, কিন্তু হঠাৎ বুধগ্রহের আকাশ যে ভীষণ তীক্ষ্ণ হুঙ্কার ও আর্ত্তনাদে কেঁপে উঠেছে, পৃথিবীর মানুষের কাণ কোনদিন তা শোনেনি। সেই হুঙ্কার ও আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ। পায়ের নীচের মাটিও তাতে কেঁপে উঠছে,— যেন বিশাল দুটি পাহাড়ই জীবন্ত হয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করছে মনে হয়।

ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে সমরের নড়বার শক্তি পর্য্যন্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে। তার ঠিক পায়ের কাছেই একবার একটি বিশাল কাছির মত জিনিষ যেন আছড়ে পড়ল মনে হ'ল, তবু সমর নিশ্চল নিস্পন্দ। ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে জানোয়ার দুটি ক্রমশঃ তার দিকেই সরে আসছে সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু কি করবে সে? অন্ধকারে আন্দাজে অস্ত্র ছুঁড়েও ত কোন লাভ নেই!

হঠাৎ আকাশ যেন ঠিক সময় বুঝেই তীব্র বিদ্যুতের ছটায় চারিধার আলোকিত করে তুললে। সে আলোর আয়ু আর কতটুকু, কিন্তু সেইটুকুতেই যে দৃশ্য সমরের মনের ওপর গভীরভাবে ছাপা হয়ে গেল তা তার অতি বড় দুঃস্বপ্নেরও অতীত।

দৃশ্যটি দুটি জানোয়ারের লড়াইএর, কিন্তু জানোয়ার দুটির কল্পনাতীত বিশাল আকার ও বিদঘুটে চেহারা না দেখলে সে হিংস্র লড়াইএর বিভীষিকা কল্পনা করা যায় না।

নিজের বিপদ সম্বন্ধে এইবার সজাগ হয়ে সমর সরে যাবার চেষ্টা করছিল এমন সময় আবার একটি জানোয়ারের লেজ তার কাছে সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল। লেজের সে ঘা সরাসরি তার ওপরে পড়লে সমরের অবশ্য আর চিহ্ন পাওয়া যেতনা, তার আঘাতে থেঁৎলে হাড়গোড় তার গুঁড়ো হয়ে যেত! গায়ের ওপর না পড়ে শুধু একটু পাশে ছুঁয়ে যাওয়াতেই সমর একটা ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং তারপর একরকম ভয়ে দিশাহারা হয়েই তার হাতের অস্ত্র সামনের দিকে আন্দাজ করে বার কয়েক ছুড়ে দিলে।

বুধের ওপর সেই অবশ্য প্রথম মানুষের অস্ত্রের আওয়াজ। তার ফল এমন অসাধারণ হবে সমর ভাবতে পারে নি। অস্ত্রের আওয়াজের প্রতিধ্বনি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাবার আগেই, মাটি কাঁপিয়ে বিশাল একটি জানোয়ারের দ্রুত পলায়নের শব্দ পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে শোনা গেল আর একটি জানোয়ারের উন্মত্ত কাৎরানি ও ছটফটানির আওয়াজ। তার পরেই হঠাৎ যেন ভোজবাজিতে সমস্ত অধিত্যকা আলোকিত হয়ে উঠল।

বিদ্যুতের আলো সে নয়,—সমর অবাক হয়ে দেখলে অ্যাল্‌জি লতায় ঢাকা তাদের হাউই জাহাজেরই খানিকটা প্লেট সরে গিয়ে তীব্র সার্চ্চলাইটের ছটা বেরিয়ে এসেছে।

হাউই জাহাজ থেকে সার্চ্চলাইট জ্বাললে কে! ষ্টাইন কি তাহলে নিরাপদে হাউই জাহাজে ফিরতে পেরেছে! এখনো হাউই জাহাজে আশ্রয় পাওয়ার আশা তাহলে তার আছে!

সামনে যে পাহাড়ের মত বিশাল কিম্ভূত কিমাকার জানোয়ারটি পড়ে মরণ যাতনায় ছটফট করছে অন্য সময় হলে তাকে ভালো করে লক্ষ্য করবার লোভ সমর সম্বরণ করতে পারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখন সেদিকে দৃষ্টি পর্য্যন্ত না দিয়ে ব্যাকুল ভাবে সে সার্চ্চলাইটের আলোর পরিধির ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল,—ষ্টাইনের দৃষ্টিতে পড়াই তার এখন একান্ত দরকার।

এবার বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে তাকে হ'ল না। খানিক বাদেই আর একটি আলোর চৌকোণা রেখা ফুটে উঠল অন্ধকারের ভেতর—হাউই জাহাজের দরজা খোলা হয়েছে।

কিন্তু একি! সেই আলোর সামনে দুটি ছায়ামূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে যে! এই বুধগ্রহে সে আর ষ্টাইন ছাড়া আর কোন মানুষই ত থাকতে পারেনা।

কিন্তু এত তার দেখার ভুল নয়! তীব্র আলো পেছনে থাকার দরুণ মূর্ত্তি দুটির চেহারা কালো ছায়ার মত দেখাচ্ছে। কিন্তু সে ছায়ামূর্ত্তি ত মানুষের মত বলেই মনে হয়।

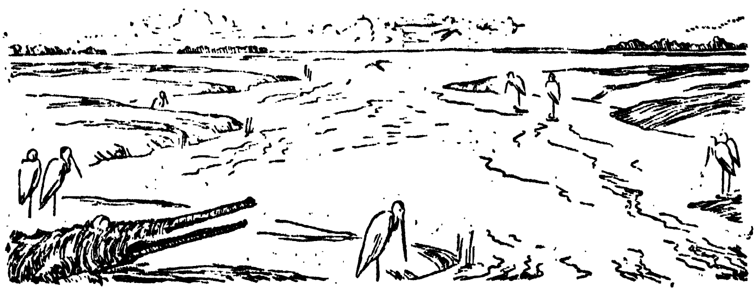
কিম্বা বুধগ্রহেও মানুষের মত আকারের বুদ্ধিমান সভ্য প্রাণী আছে নাকি ? তারাই কি ষ্টাইন ও তার বাইরে যাওয়ার সুযোগে লুকিয়ে এসে হাউই জাহাজ দখল করেছে ! আশ্চর্য্য কিছুই নয়, এই অদ্ভুত আজগুবি গ্রহে সবই সম্ভব। অজ্ঞান হবার আগে হাউই জাহাজের ওপর থেকে দূরে আগুনের আলোয় যা সে দেখেছিল তাও তার মনে পড়ল। আগুন যারা জ্বালতে পারে তারা ত সত্যিই সভ্য প্রাণী। তাদেরই দলের কারুর পক্ষে কৌতূহলী হয়ে হাউই জাহাজে চড়াও হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। তারা শত্রু না মিত্র এখনও বলা শক্ত কিন্তু যে রকম প্রাণীই হোক তাদের বিরুদ্ধে আগে থাকতে প্রস্তুত থাকাই ভাল। সমর হাতের অস্ত্র তাদের দিকে উঁচিয়ে লক্ষ্য স্থির করলে। তারপর কেউ বুঝবেনা জেনেও জোরে চীৎকার করে বল্লে,—দাঁড়াও, আর এক পা নোড়ো না।

মূর্ত্তি দুটি সে ভাষায় কি বুঝল কে জানে, কিন্তু দেখা গেল যে তারা থেমে পড়েছে।

তারপর তাদের একজন চেঁচিয়ে বল্লে—কে সমর ? আমরা অজয় আর ডাঃ ক্রল !

অজয় !—সমর চীৎকার করে উঠল আনন্দে বিস্ময়ে! কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল সে ভাবনা তখন তার মাথাতেই নেই !

ক্রমশঃ



পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

পঁচিশে বৈশাখ !—

সকাল বেলার সূর্য্য তখনও আকাশের পূব্ দিকে দেখা দেয়নি, শান্তিনিকেতনের লাল াকর বিছানো পথে সৌম্যমূর্ত্তি ঋষি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাথায় দুধের মত তাঁর সাদা চুল াতাসের দোলা লেগে মুখের এপাশে ওপাশে পড়ছে। দুচোখের উদাস দৃষ্টি সুদূর মাঠ াড়িয়ে, লাল ঢেউ খেলানো দিক্-সীমানার শেষে ছেড়ে দিয়ে, ঋষি রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে াছেন।

ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠলো। কবির রূপালী চুলে, প্রশস্ত কপালে দীর্ঘ ঋজু দেহে সোনালী াদের পরশ এসে লাগলো, রবি তার বর-পুত্রের সর্ব্বাঙ্গে যেন স্নেহের আশার্ব্বাদ বুলিয়ে লেন। প্রশান্ত সৌম্য কবির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। সে-হাসিতে শিশুর সরলতা, ষির সৌম্যতা একাধারে ফুটে উঠেছে। তখন সে ঋষির পানে তাকালে দূর থেকে শুধু াণাম করতেই ইচ্ছা জাগে।

ওই প্রভাতী রবির মত রবীন্দ্রনাথের মনও চির তরুণ। ছেলেদের তিনি ভালবাসেন, াদের সঙ্গে তিনি তাদের চোখে দুনিয়াকে দেখতে চান, তাদের মনের মত করে তিনি ভাবতে ান, তাদের কথাই সেইজন্য বুঝি কবির কলমের মুখে ভাল করে ফুটে ওঠে। নিজের কথা ভবেই বুঝি কবি "যাদুকর" কবিতায় লিখেছেন—

"দাড়িওলা বুড়ো লোকটা
কিসের নেশায় পাওয়া চোখটা
চারিদিকে তার জুটল অনেক ছেলে
যা-তা মন্ত্র আউড়ে শেষে
একটুখানি মুচ্কে হেসে
ঘাসের পরে চাদর দিল মেলে।"

চারিপাশের সেই সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখের পানে তাকিয়ে যাদুকর রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল —

"বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।"

তারপর কবির মনে অনেক কথাই ভীড় করে এল—

"ছোট কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায়
সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি খেলায়।"

তখনকার রবীন্দ্রনাথের এমন শাদা দাড়ি ছিল না, এমন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দুধের মত চুল বাতাসে এলোমেলো হয়ে পড়তো না, মুখখানি অমন ঋষির মত সৌম্য গম্ভীর হয়ে ওঠেনি। তিনি তখন কবিতাও লিখতেন না। তখন ছোট্ট একটী ফরসা টুলটুলে ছেলে শুধু আপন মনে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতো, কখনও সাথীদের সঙ্গে পুতুল খেলা, ছুটোছুটি করে সময় কাটতো কখনও একা একা।

সকাল বেলায় উঠেই আগে ছোটেন পাখীর খাঁচার কাছে, তারপর—

"কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান
অসুখ করলে হলুদ জলে করিয়ে দিত স্নান।"

সেইখানেই কতটা সময় কেটে যায়, তারপর দেখতে দেখতে খেলাধূলোর ফাঁকে—

"কেমন করে কয়টী প্রহর কোথায় গেল কেটে
সমস্ত দিন ডাকল ঘুঘু দুটী
আশেপাশে এঁটোর লোভে কাক এল সব ছুটি,
গাঁয়ের থেকে কুকুর এল লড়াই গেল বেধে
একটা তাদের পালালো তার পরাভবের খেদে।"

এমনি ভাবেই কখন দিন হয়ে এল শেষ।—

"রৌদ্র পড়ে এল ক্রমে, ছায়া পড়লো বেঁকে
ক্লান্ত গোরু গাড়ি টেনে চলছে হাট থেকে।"

* *

"সন্ধ্যা হয়ে আসে
সোনা মিশোল ধূসর আলো ঘিরল চারিপাশে।"

* *

পঁচিশে বৈশাখ
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

"দিন ফুরাত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথায় মালী"

* *

"কাঁসর ঘণ্টা উঠতো বেজে গলির শিবালয়ে
সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি
দিন ভাঙানো ইলেকট্রিকের হয়নিক উৎপত্তি।"

তারপর কোন এক সময় আরতির ঘণ্টা থেমে যায়, গলির মোড়ে আর মালীর গলা শোনা যায় না, রাত্রির আবছায়া জগৎকে ঘিরে ধরে।—

"সমস্ত নিঃঝুম,
জাগাও নেই কোনোখানে কোথাও নেই ঘুম।"

এমন সময় ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না, ছেলেটী ছাতে এসে দাঁড়ায়। কে কখন আকাশ প্রদীপটি জ্বেলে দিয়ে গেছে! তারার মত মিট্‌মিট্ করে আকাশ প্রদীপটি বাঁশের ডগায় দুলছে। তার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়,—

"মাকি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে
তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শূন্যের পারে।
মেয়ের হাতের একটী আলো জ্বালিয়ে দিল রেখে
সেই আলো মা দেখে নেবে অসীম দূরের থেকে
ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমো খাবার তরে
রাতে রাতে মা-হারা সেই বিছানাটীর পরে।"

এমনি ভাবেই যাদুকরের ছেলেবেলার মিষ্টি দিনগুলি কেটেছিল। তারপর তিনি বিশ্বের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত হলেন। চিরদিন তার আসন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গুণীজনদের মাঝে থেকে যাবে, চিরদিন সুধীজনেরা তাঁর বই পড়ে শ্রদ্ধায় বলবেন—

"তুমি কেমন করে গান করো, হে গুণী,
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।"—

এমন গুণী শ্রেষ্ঠকে যে আজ আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি, এ আজ বাঙালীর সব চেয়ে বড় গৌরব। যাঁকে নিয়ে আমাদের এই গৌরব, পঁচিশে বৈশাখ তাঁর শুভ জন্মতিথি। সেই শুভদিনে আমরা সকলে একত্রে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের মাঝে দীর্ঘায়ু লাভ করে আমাদের দেশকে আরো মহীয়ান করে তোলেন!

———

আদর

শ্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ

সূর্য্য তখন অস্ত গেছে রূপ্‌সী নদীর বাঁকে।
রুনু এসে জড়িয়ে গলা জানায় হেসে মাকে,—
'মা'গো ওমা, আমি এখন বড় হয়েছি
মোটেও কাঁদিনা ;
অ আ ঋ ৯ শেষ করেছি
শেষ করেছি ক খ গ ঘ চেনা।
আর কি জান ?
বলছি শোন :
রাত্তিরে মা ঘুম-পাড়ানি যে গান তুমি গেয়ে,
ঘুম পাড়িয়ে রাখো আমায় চুমায় চুমায় ছেয়ে
সে গান আমি গাইতে পারি—
গাইতে পারি—শক্ত ওতো ভারী !'
ছোট্ট করে চুমার পরশ ছুঁইয়ে রুনুর ঠোঁটে
মা হেসে কন্—'সত্যি খুকু ? বটে ?'
লক্ষ্মী মেয়ে—সোনা মেয়ে ;
ওরে আমার সাত সাগরের আলো করা মাণিক,—'
নিবিড় স্নেহে বুকের মাঝে জড়িয়ে তারে খানিক
কন্ পুনরায়
মধুর ভাষায় :
'রাঙা হাতে কাল্‌কে আমি গড়িয়ে দোবো বালা,
দুলিয়ে দোবো তোমার গলায় মুক্তো গাঁথা মালা।
বাইরেতে ঐ নীল আকাশে ফুটলে তারা ফুল
চয়ন করে সাজিয়ে দোবো তোমার কালো চুল।

আদর

শ্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ

আর যা' কিছু রইলো তোলা আমার মনের তাকে,
ঘরছাড়া সব পায়রাগুলো ফিরলো ঘরে ঝাঁকে।
ঘুম কুমারী এল বেয়ে স্বপন-তরণী
গগনে চাঁদ উঠলো হেসে
ফুট্‌লো তারা নীল আকাশে
জ্যোছ্‌না আলোয় উজল হ'লো মাটির ধরণী।'





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ওঙ্কারধামের যাত্রী

ধান-ক্ষেতের পর ধান ক্ষেত, তারপর আবার ধান-ক্ষেত! সবুজের পর সবুজ আর সবুজ! যতদূর চোখ চ'লে খালি দেখা যায় সমতল ক্ষেত্র! মাঝে মাঝে নারিকেলগাছ, কলাগাছ আর বাঁশবনের ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে সোজা চ'লে গিয়েছে একটি সুদীর্ঘ রাঙা রাস্তা। এত সোজা ও লম্বা রাস্তা সহজে নজরে পড়ে না!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় নদী। কোথাও আছে সাঁকো, কোথাও খেয়া ঘাটে নৌকোয় চ'ড়ে পার হ'তে হয়।

মাঝে মাঝে দেখা দেয় ছোট ছোট গ্রাম। সরাইখানার সামনে রয়েছে খাবার সাজানো। পথের ধারে উবু হয়ে হয়ে ব'সে আনামী স্ত্রীলোকরা চিংড়িমাছ, কমলা-লেবু ও নারিকেল প্রভৃতি বিক্রী করছে। ধূলোর স্তূপে খেলা করছে নগ্ন বা নেংটি-পরা শিশুরা।

সেই সিধে রাঙা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটছে তিনখানা মোটর। একখানা গাড়ীতে আছে জয়ন্ত ও মাণিক, পরের গাড়ীতে অমলবাবু ও সুন্দরবাবু, তার পরের গাড়ীতে দরকারি জিনিষপত্র এবং চাকর-বাকর।

সুন্দরবাবু বলছিলেন, "এ যে দেখছি অন্নপূর্ণার স্বদেশ! পাশাপাশি একটানা এত-বেশী ধানের ক্ষেত কেউ কি কখনো চোখে দেখেছে? হুম্!"

অমলবাবু বললেন, "হ্যাঁ। এ দেশ এম্‌নি উর্ব্বর ব'লেই একদল ভারতবাসী সমুদ্র পার হ'য়ে এখানে এসে নূতন এক রাজ্যস্থাপন ক'রেছিলেন, নূতন এক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন।"

—"হুম্, ও-সব বাজে উপকথা! আমি বিশ্বাস করি না!"

—"না সুন্দরবাবু, সেই লুপ্ত সভ্যতার শেষ-চিহ্ন যখন স্বচক্ষে দেখবেন, তখন আর বিশ্বাসের কথাই তুলতে পারবেন না। আচ্ছা, সেই সভ্যতার কিছু কিছু কথা আগেই আপনাকে শুনিয়ে রাখছি।......এ দেশটা আসলে শ্যামদেশেরই অঙ্গ, খুব অল্পদিনই ফরাসীদের অধিকারে এসেছে। আজ ফরাসীরা এখানে পথঘাট বানিয়েছে, নিবিড় বন কেটে সাফ করেছে বটে, কিন্তু সেদিন পর্য্যন্ত এটা ছিল বাঘ আর হাতীর নিজস্ব মুল্লুক, এখানকার দুর্ভেদ্য অরণ্যের গভীর রহস্যের মধ্যে অতি-সাহসী মানুষও পদার্পণ করতে ভয়ে শিউরে উঠত! সত্তর বছর আগেও পৃথিবী ওঙ্কারধামের নাম শোনেনি।

সতেরো শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ মিশনরীরা শ্যামদেশে এসেছিলেন ধর্ম্মপ্রচার করতে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া ও বিপুল এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। য়ুরোপে ফিরে তাঁরা অনেকের কাছে এই বিস্ময়কর কাহিনী প্রচার করেন। মিশরের পিরামিডের মতন বড় আশ্চর্য্য মন্দির! বাবিলনের মতন বিরাট জনপদ! সবাই গল্প শুনলে বটে, কিন্তু কেউ বিশ্বাস করলে না। পরে সে গল্পও লোকে ভুলে গেল। বড় বড় বটগাছ, বাঁশবন, নারিকেল-গাছ ও নানাজাতীয় লতাগুল্ম এই লুপ্ত হিন্দুসভ্যতার শেষ-চিহ্নগুলিকে এমন ভাবে ঢেকে রইল যে, বাইরের কোন কৌতূহলী চক্ষু আর তাদের কোন খোঁজই পেলে না।

দিনের পর দিন যায়—বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ! ফরাসীরা প্রথমে ব্যবসাসূত্রে ইন্দো-চীনে পদার্পণ করলে। লোকের মুখে জনপ্রবাদ শোনা গেল, অরণ্যের অন্ধকারে যেখানে সূর্য্যালোক সোনা ছড়ায় না সেখানে অজ্ঞাতবাস করছে এক অদৃশ্য রাজ্যের অদ্ভুত রাজধানী, মাইলের পর মাইলব্যাপী নগরের পর নগর। অপূর্ব্ব মন্দির, বিচিত্র প্রাসাদ! কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও সেই-সব প্রবাদ শুনলেন। অনেকেই বললেন, এই প্রবাদ যদি সত্য হয় তাহ'লে বলতে হবে, ওখানে আগে কোন বিপুল সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। মন্দির, প্রাসাদ, নগর নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন এক বিস্ময়কর সভ্যতা পিছনে কোন চিহ্ন না রেখে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। বনবাসে লুকিয়ে থাকতে পারে কেবল অসভ্যতাই।

কিন্তু চীনদেশের পুরাতন ঐতিহাসিক পুঁথি-পত্রেও কাম্বোজের এক আশ্চর্য্য সভ্যতার কাহিনী পাওয়া যায়! Mouhot একজন ফরাসী ভদ্রলোকের নাম। তাঁর কৌতূহল জাগল। পলাতক এই সভ্যতাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে গোয়েন্দার মতন তিনি বাঘ আর হাতীর মুল্লুকে

প্রবেশ করলেন। বাঘেরা জঙ্গলের ছায়ায় ব'সে, হাতীরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে এবং অজগরেরা গাছের ডালে ডালে ঝুলে প'ড়ে সবিস্ময়ে দেখলে, ওঙ্কারধামের অরণ্যে আধুনিক মানুষের মুখ! ওঙ্কারধামের দক্ষিণ প্রবেশ পথের উপরে জেগে ছিল কালজয়ী প্রলয়-দেবতা শিবের চারিটি বিপুল মুখমণ্ডল, তাদের পাষাণ নেত্রের সামনে বহুযুগ পরে আবার ক্ষুদ্র মানুষের আবির্ভাব হ'ল! বোবা পাথরের উপরে বিস্ময়ের শব্দ-রেখা ফুটল না বটে, কিন্তু যে অভাবিত কাহিনী বহন ক'রে Mouhot আবার আধুনিক সভ্য-জগতে ফিরে এলেন, দিকে দিকে তা চমকপ্রদ উত্তেজনার সৃষ্টি করলে!

সেকালের পৃথিবীতে এক জাতি যখন আর এক জাতিকে আক্রমণ করত, পরাজিত জাতিকে তখন প্রায়ই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হ'ত। তারা আবার কোন নূতন দেশে গিয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের তাড়িয়ে বা বশ ক'রে নূতন রাজ্যস্থাপন করত। এইভাবে সেকালকার পৃথিবীতে অনেক নূতন রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে কোন-কোন রাজ্য এখনো টিকে আছে।

সম্ভবত এইভাবেই একদল হিন্দু ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে সাগর পেরিয়ে শ্যামদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কত শতাব্দী আগে, এখনো সেটা স্থির হয় নি। তবে তেরো কি চৌদ্দ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাদের হাতে গড়া নূতন সভ্যতার অস্তিত্ব যে নষ্ট হয় নি, এমন কথা বলা যায়। এবং এই সভ্যতার আশ্রয়ে যে একসময়ে তিন কোটি মানুষ নিরাপদে বাস করত, সেটা অনুমান করবার মত প্রমাণেরও অভাব নেই। ওঙ্কারধাম ছিল তাদের রাজধানী। সে এত বড় নগর এবং তার ধ্বংসাবশেষ এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে, সেখানেও বোধ হয় বাস করত দশলক্ষ হিন্দু! আজ তাদের একজনও নেই, তাদের বংশধরদেরও সন্ধান মেলে না!

কিন্তু তাদের মেঘ ছোঁয়া মন্দির মহাকালকে পরিহাস ক'রে আজও বেঁচে আছে—যেমন বেঁচে আছে মৃত মিশরীদের পিরামিড! ওঙ্কারধামের এই অদ্ভুত মন্দির শিল্পের দিক দিয়ে পিরামিডেরও চেয়ে ঢের বড়, ঢের বিচিত্র, ঢের আশ্চর্য্য! মানুষের হাত পৃথিবীর আর কোথাও এমন মন্দির গড়তে পারেনি। ভাবতে গর্ব্ব হয় যে, এই মন্দির যারা গড়েছে তারা হচ্ছে দিগ্বিজয়ী হিন্দু—আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ!

সুন্দরবাবু, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সেই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখলে আপনাকে স্তম্ভিত হ'তে হবে! মানুষের হাত যে এমন মন্দির গড়তে পারে এ-কথা আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না,—মনে করবেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ছিলেন মর্ত্তে অবতীর্ণ দেবতা!"

সুন্দরবাবু উত্তরে মনের মত কথা খুঁজে না পেয়ে কেবল বললেন, "হুম্!"

প্রথম গাড়ীতে তখন মাণিক বলছিল, "জয়, কলকাতার অলি-গলিতে চ্যান্ আর ইন্ তো এখনো আমাদের খুঁজে মরছে!"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "শত্রুদের যারা নিজেদের চেয়ে বোকা মনে করে, পদে পদে ক মরে তারাই! খুব সম্ভব আমরা তাদের ফাঁকি দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে পারি নি।"

—"কিন্তু জয়, যে-জাহাজে আমরা এসেছি তার মধ্যে যে চ্যান্ আর ইন্ ছিল না, এটা মি হলপ্ করে বলতে পারি। অমলবাবু তাদের চেনেন, জাহাজের আরোহীদের দলে তারা ল না।"

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মত বললে, "হতে পারে। না হ'তেও পারে।"

ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে শোনা গেল একখানা মোটরের ভেঁপুর শব্দ!

জয়ন্ত সচমকে গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে। সোজা রাস্তা অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। জয়ন্তদের তিনখানা গাড়ী ঠিক পরে পরেই ছুটছে। কিন্তু রো খানিকটা পিছনে দেখা দিয়েছে আরো দুখানা নূতন মোটর-গাড়ী! রাস্তার উপরে লার মেঘ সৃষ্টি ক'রে গাড়ীদুখানা ছুটে আসছে যেন বিদ্যুৎবেগে!

মাণিক সবিস্ময়ে বললে, "এত বেগে ওরা কারা গাড়ী চালায়! ক্রমাগত হর্ণের পর হর্ণ য় ওরা আমাদের পথ ছেড়ে স'রে যেতে বলছে! ওদের এত তাড়াতাড়িই বা কিসের?"

পিছনের গাড়ী থেকে ব্যস্ত স্বরে চেঁচিয়ে সুন্দরবাবু ব'লে উঠলেন, "পথ ছাড়ো, পথ ড়ো! নইলে এখনি 'অ্যাক্সিডেন্ট্' হবে!"

জয়ন্ত নিজেদের 'ড্রাইভার'কে বললে, "গাড়ী নিয়ে একপাশে স'রে যাও। গাড়ী কবারে থামিয়ে ফ্যালো।"

'ড্রাইভার' তার কথামত কাজ করলে। তাদের অন্য গাড়ীদুখানাও পথের একপাশে য়ে থেমে দাঁড়াল।

গাড়ীর দরজা খুলে জয়ন্ত পথের উপরে নেমে পড়ল। তারপর নিজের কোমরবন্ধে লগ্ন রিভলভারের উপরে হাত রেখে পিছনদিকে দৃষ্টিপাত করলে। তার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত, খ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব!

ধূলোর মেঘে-ঢাকা দুখানা গাড়ী তার অজ্ঞাত আরোহীদের নিয়ে প্রচণ্ড বেগে খুব ছে এসে পড়েছে!

ক্রমশঃ



উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী

চিত্রিত

'দেখলাম, ধূ ধূ কালো আকাশ, তার নীচের দিগন্তে ছড়ানো রাশি রাশি জল। কালো জলে তুফান ঢেউ আর গভীর অতল থেকে উঠে আসা সোঁ সোঁ ধ্বনি। উন্মাদ কালো ঢেউয়ের বুকে, অন্ধকারে চাঁদের মত, সবুজ দ্বীপ। সবুজ দ্বীপের সবুজ বাগানে একটি লতা—কী অপরূপ শোভা সে লতার! রূপোলী ডাঁটে সোনালী ফুল। লতার চুড়োয়, রূপসীর মাথায় মুকুটের মত, একটি বড় লাল ফুল।

'মহর্ষির কথা শুনতে পেলাম: এই সেই অমরলতা—যাকে নিয়ে ধ্যান আমার। তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে আমার তপস্যা নয়—এ লতার ফুল পাঁচশো বছর আয়ু দেবে মানুষকে। মানুষের আয়ু কম। জীবনের পুরোপুরি জ্ঞান হবার আগে একদিন পরমায়ু ফুরিয়ে যায় তার। তবু তবু তো মানুষের কীর্ত্তি কম নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব সে। ভেবে ভাখো, পাঁচশো বছর পরমায়ু হলে জ্ঞানে বুদ্ধিতে মানুষ হবে দেবতার সমান। পৃথিবীর ধূলোয় একদিন স্বর্গ নেমে আসবে।

'দেখতে দেখতে চোখের সামনের দৃশ্যটা ঘরের আলোয় একসা হয়ে মিলিয়ে গেল। বিস্ময়ে আমার মুখে কথা সরল না। মহর্ষি গম্ভীর হেসে বললেন। আজ সব জানবে সব দেখবে তুমি। অমরলতার রহস্য আর তোমার কাছে আড়াল থাকবেনা।

'আমার চোখের উপর ডান হাতের পাতাটা আস্তে বুলিয়ে নিয়ে মহর্ষি বললেন: পাঁচশো বছরের ইতিহাস ছবির মত ভাখো তুমি। যাদের তুমি দেখবে তাদের মনের গোপন

তুমি জানবে। পাঁচশো বছর তুমি যেন তাদের সাথে ছিলে, তুমি যেন তাদের মনে া হয়ে ছিলে। নাজিরা, তুমি ঘুমোও, ঘুমোও, ভুলে যাও তুমি নাজিরা।

'চক্ষের নিমেষে আমার চারিদিক যেন রঙীণ কুয়াসায় আবছা হয়ে গেল। তারপর াকাশের একদিক হতে আর একদিকে টাঙানো একটা কালোপর্দ্দা উঠে গেল।

'দেখলাম, কতযুগ আগের এক সমুদ্র তীরে এসেছি আমি। সেখানে কোনো এক ঋষি ন ধ্যানে। স্বপ্ন যেমন চুপি চুপি আসে তেমনি নিঃসাড়ে ঋষির মনে চলে এলাম আমি। ম, ঋষি বসেছেন আশ্চর্য্য ধ্যানে। মানুষকে পাঁচশো বছর পরমায়ু দেবার ধ্যান।

'কতদিন! কতরাত্রি! কতযুগ! তারপর একদিন ধ্যানে ঋষি দেখলেন, কালো সবুজ দ্বীপে রূপসী লতা।

ঋষি চোখ মেললেনা। একহাত তুলে ঋষি ডাকলেন : শাঙ্খল! তখন চারিদিক যেন এক দানবের দীর্ঘ শ্বাসে ভরে গেল, যেন কোনো উন্মাদ ঝড় হঠাৎ ক্লান্ত হয়ে হাঁফাতে ত এলো। ধীরে ধীরে চারিদিক ফোঁস ফোঁস শব্দে ভরে দিয়ে সমুদ্রের গুহা থেকে বার লো অতিকায় অজগর। বয়সে বুড়িয়ে গেছে, খোলস ফ্যাকাশে মেরে গেছে—জীর্ণ জরাজর্জ্জর সাপ। তার ছোট দুটি চোখে যেন আর আলো নেই, অন্ধের চোখের মত অসাড়।

ঋষির পায়ের কাছে এসে সাপটা মাথা খুঁড়তে থাকল। ঋষি বললেন, 'কালো সমুদ্র। দ্বীপ। রূপসী লতা।'

'অজগরের চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। একটা ঝড়ের মত সমুদ্রে সে লাফিয়ে পড়ল, মত ছুটে চলল সে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে।

'একদিন, দুদিন——অনেক দিন। তারপর একদিন আকাশ হল গভীর নীল, রোদ ীন আগুন, এলো যেন আবীর মাখা ফাল্গুনের দিন। সেদিন, নীল সমুদ্র ভরে গেছে । আকুল বাতাসে চারিদিক উজ্জ্বল। সাদা ফেণার ফাকে ফাকে নীল জল উঁকি দিচ্ছে মাকাশ থেকে সোণালী আলো চুঁয়ে পড়ছে। অনেকদূরে ঢেউয়ের ধারে ধারে নীল ার একটা বাঁকা দেয়ালের মত দেখা যাচ্ছে দিগন্ত।

'ঋষি সেদিন কান পেতে শুনছেন। সব আওয়াজের মাঝে কী একটা আওয়াজ ন। হঠাৎ ঋষি উঠে দাঁড়ালেন, বাঁশীর মত কী একটা আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে । দেখলেন, অনেকদূরে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর একটা ফণা দুলচে।

'ঢেউয়ের ফেণায় সোনালী শরীরটা ডুবিয়ে, ঢেউয়ের ফেণার উপর মুকুটের মত ফণাটা তুলে ছুটে এলো। মহর্ষি দেখলেন, কোথায় সেই অতিকায় বুড়ো অজগর! এ যেন তরুণ এক অজগর, দুটি চোখ তার বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল। ফ্যাকাশে চামড়ায় রঙীন আভা ফুটেচে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তার শরীরটা থর থর কাঁপচে—সে আর ক্লান্ত নয়, সে উদ্দাম, চঞ্চল। সে যেন তখনই মায়ের কোল ছেড়ে সাগর গুহা থেকে উঠে এসেচে।

'ঋষি ডাকলেন: 'শাঙ্খল'। 'ঝড়ের মত গর্জ্জন করে সাপটা সমুদ্র থেকে উঠে এলো। তার দুটি দাঁতে ধরা একটা লাল ফুল। ঋষি সেই লাল ফুল হাতে তুলে নিলেন। সেই সময়, সমুদ্রের একটা ঢেউ ছল্‌কে উঠে নীল একটা আরসির মত চমকে উঠলো—তাতে ঋষি নিজেকে দেখতে পেলেন। দেখলেন, কোথায় তিনি বৃদ্ধ ঋষি! ফুল ছুঁতে না ছুঁতে বৃদ্ধ ঋষি হয়েছেন নবীন কিশোর।

'আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মহর্ষি, এই কি তুমি?'

'মহর্ষি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'চুপ! কথা কোয়ো না। একে একে দেখে যাও ইতিহাসের ছবি।'

'তারপর, একটা কালো যবনিকা নেমে এসে উঠে গেল। দেখলাম, কোন্ এক পাহাড়চুড়োয় এসেছি আমি। পাহাড়চুড়োয় বিশাল গুহা। রাত যেন দুপহর। গুহায় মশাল জ্বলছে। অন্ধকার যেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুহার একটা দেয়ালে মায়ামুকুর, ত্রিভুবনের সকল ঘটনা ধরা দেয় সেখানে। সেই মায়ামুকুরের সামনে ব'সে আছে যাদুকর কুণ্ডল।

'যাদুকর কুণ্ডলের শরীরে সাড়া নেই। সে যেন পাথরের একটা মূর্ত্তি। হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে পাথরমূর্ত্তি উঠল কেঁপে। যাদুকর পিঙ্গলের দুটি চোখে নিষ্ঠুর হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। তার মুখ পিশাচের মত ভয়ঙ্কর, সয়তানের মত কুটিল হল। দেয়াল থেকে একটা ছোরা খসিয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে কুণ্ডল উঠে দাঁড়ালো।

'কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটা সে পেড়ে আনলে। কৌটা খুলে এক টুকরো কাঁচ সে আস্তে তুলে নিলে। হাতের মুঠোয় কাঁচের টুকরো শক্ত করে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে সোঁসা যেন ঝড় উঠল।

চক্ষের পলকে তিনশো মাইল পার হয়ে যাদুকর চলে এলো লঙ্কার রাজধানীর প্রান্তে। যতদূরে চোখ যায়, থই থই বালু। কিছুটা তফাতে সমুদ্র। সেখান থেকে বাতাসে উড়ে এসে মাঠ বালুময় হয়ে গেছে। সেই ধূ ধূ বালু পার হয়ে তখন আসচেন ঋষি। তাঁর আঙরাখার ভাঁজে লুকনো আছে 'অমরলতার লাল ফুল'!

অমরলতা
শ্রীসতীকান্ত গুহ

'অন্ধকার রাতে তারার আলো। চারিদিক খাঁ খাঁ নির্জ্জন। আবছা অন্ধকারে একটা ছায়ার মত যাদুকর ঋষির সামনে এসে দাঁড়ালো। ঋষি অজান্তে বুকের উপর হাত রাখলেন। যাদুকর বুঝলে, সেখানে লুকনো আছে অমরলতার ফুল।

'ঋষির গলা কেঁপে গেল, শুধোলেন—'কে তুমি?'

'আমি' বলে হেসে যাদুকর খাপ থেকে ছোরাটা খসিয়ে এনে ঋষির বুকে বসিয়ে দিলে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঋষি বালুতে লুটিয়ে পড়লেন!

'ঋষির আঙরাখার ভাঁজ থেকে ফুলটা তুলে নিতে যাদুকর কুণ্ডল ফিরে পেলো তার যৌবন। হাঃ হাঃ করে হেসে সে হাততালি দিলে। তখন হাত থেকে ছটকে কাঁচের টুকরোটা কোথায় পড়ল, বালুতে ঢুকে কোথায় লুকলো——একদিন, দুদিন, তিনদিন খুঁজে হায়রাণ হল কুণ্ডল। জ্যান্ত একটা প্রাণীর মত কাঁচের টুকরোটা যেন পিশাচকে এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালো। তারপর একদিন দাঁতে দাঁত ঘষে, লালফুলটা আঙরাখার ভাঁজে লুকিয়ে নিয়ে, তিন সপ্তাহ পথ হেঁটে কুণ্ডল পাহাড় চুড়োয় ফিরে এলো।

'পাহাড় চুড়োয় এসে কুণ্ডল কী একটা কথা ভাবলে। তারপর সে আপন মনে বললে "আগে চলতাম আকাশে, এখন চলবো মাটিতে। আগে চলতাম উড়ে, এখন চলব খুঁড়িয়ে। যাক্। বয়েই গেছে। পেয়েছি অমরলতার লালফুল! হাঃ হাঃ হাঃ"—কুণ্ডল হেসে উঠল। তার হাসিতে পাহাড়চুড়ো কেঁপে উঠল।

'তখন হাওয়ার চেয়ে নিঃসাড়ে চলে এলাম আমি যাদুকর কুণ্ডলের মনে। জানলাম তার কুৎসিত মনের রহস্য।

'অমরলতার লাল ফুল। ঝরেনা, শুকোয়না। মৃত্যু নেই এর। এর স্পর্শে মানুষ ফিরে পায় যৌবন। পাঁচশো বছর পরমায়ু পায় সে। যাদুকর কুণ্ডল ফন্দি আটলে, এই লাল ফুলের মালিক সে। মানুষের যৌবন তার হাতের মুঠোয়। যৌবন ফিরে পেতে চায় না, এমন বুড়ো কে আছে? যৌবন ধরে রাখতে চায় না, এমন বোকা আছে কে? পৃথিবীর মানুষকে এই যৌবন বেচে পয়সা লুটবে সে। অফুরন্ত সম্পদ হবে তার। কুবের লজ্জা পাবে তার কাছে।

'একদিন, লাল ফুল কোর্ত্তার গোপন ভাঁজে লুকিয়ে নিয়ে বাঁকা হাসি হেসে কুণ্ডল গুহা ছেড়ে এসে বাইরে দাঁড়াল। তিন সপ্তাহ পথ হেঁটে লঙ্কার রাজধানীতে সে পৌঁছল। সভা-কবি মেঘবর্ণের প্রাসাদে এসে সে দ্বারপালকে ডেকে বললে, সভাকবির সঙ্গে আমার জরুরী দরকার। আমি এক্ষুনি দেখা করতে চাই।'

(ক্রমশঃ)

—:০—

চলন্তিকা

কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে হিমালয়ে দুটি যমজ পর্ব্বত শৃঙ্গ (The Twins) আছে। এদের উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ ফিট। এত উচ্চ যমজ পর্ব্বত পৃথিবীতে আর নেই। এই যমজ শৃঙ্গের পূর্ব্ব শৃঙ্গটি জয় করবার অদম্য উৎসাহ দেখা দিয়েছে হিমালয়ান ক্লাবে। সম্প্রতি একটি ছোট দল গঠিত হয়েছে, উদ্দেশ্য এই যমজের পূর্ব্ব শৃঙ্গটি ছুঁয়ে আসা। হিমালয়ান্ ক্লাবের মিঃ মারক্লু এই দলের অধিনায়ক। নাওটক্ থেকে এঁদের অভিযান সুরু হবে ৯ই মে। দলের সকলের আশা ১৯শে মে যমজ শৃঙ্গের ওপর পৌঁছতে পারবেন। সর্দ্দার, কুলি ইত্যাদি নিয়ে এই দলটিতে মাত্র জন দশেক লোক হবে। হিমালয়ের যমজ সন্তানের একটির মুখ দর্শন করার সৌভাগ্যে যেন এ দলটি বঞ্চিত না হয়!

কলকাতায় হকি লীগ নানা আশা নিরাশায় সমাপ্ত হল। কাষ্টামস দল এবারও তাঁদের পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রাখলেন। কাষ্টামস দল যেন বেশ কায়েমী ভাবে চ্যাম্পিয়ণ হয়ে বসেছেন। এই নিয়ে তাদের লীগ জয় বার পনের হল। দলটির এ-বড় কম কীর্ত্তি নয়। কাষ্টামস এর মস্ত প্রতিদ্বন্দী হচ্চে রেঞ্জার্স দল। শেষ খেলাটিতে এরা কেউ কাউকে হারাতে পারল না। কিন্তু কাষ্টামস্ এর মোট ৩৩ পয়েন্ট হল আর রেঞ্জারস এর মাত্র ৩১। দু পয়েন্ট নেহাৎ কম নয়, বিশেষ করে যেখানে প্রতিযোগিতা বেশ জোরাল। কাষ্টামস সকলকে কলা দেখিয়ে আবার চ্যাম্পিয়ন হল। এবারকার লীগে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় কাষ্টাম্স্ বা রেঞ্জারস কেউই একটা খেলাতেও হারেনি। এতে বোঝা যায় এ দুটি দলই হকিতে বেশ পাকা। এদের নিকট প্রতিদ্বন্দী হচ্ছে মোহনবাগান। মোহনবাগানও বেশ প্রশংসাজনক খেলা খেলেচে। মাত্র দুটি খেলাতে এরা হেরেচে এবং টেবিলে রেঞ্জারস এর পরেই স্থান পেয়েচে। আশা করা যায় মোহনবাগান চেষ্টা করলে পরের বছর লীগে আরো ভাল করতে পারবে। ১৯৩৫ সালে এরা হকি লীগ পেয়েছে। হকি লীগ শেষ হল; এবার সুরু হবে বাইটন কাপ। এবার আর

অপ্রতিদ্বন্দী ঝান্সি বীরদের দেখা যাবে না। তবে বম্বে কাষ্টামস যোগ দিয়েচে। আমাদের মনে হয় বম্বের বা কলকাতার কাষ্টামস দল এদের একজন বাইটন কাপটি এবার নেবে।

বাইটন কাপ শেষ হলেই আবার সুরু হবে কলকাতা বহুপরিচিত চির আদরের লীগ ফুটবল খেলাগুলি। বাংলাদেশে অন্য খেলাতে বোধহয় এত উৎসাহ ও হৈ চৈ নেই। এখন থেকেই এক আলোচনা সুরু হয়েচে লীগে কে কিরকম খেলবে কার কি চান্স্? মে মাস পড়তে না পড়তে ময়দানে দর্শক ও খেলোয়াড়দের মেলা বসে যাবে। হৈ-চৈ হুড়োহুড়ি, আর টিকিট পাওয়া যাবে না। এবার মহামেডান্ স্পোর্টিং নিজেদের মাঠ ও গ্যালারী করেচে। মনে হচ্চে ভাল খেলাগুলি এবার একটু ছড়িয়ে দেওয়া হবে। আগে তো ক্যালকাটা মাঠ ছাড়া ভাল খেলাগুলি অন্যত্র দেওয়া হত না। এতে অনেক অসুবিধে হয়। তবে এবার আবার ড্যালহাউসীর মাঠে প্রথম ডিভিসনের লীগ ম্যাচ নাকি খেলা হবে না। এবার শোনা যাচ্চে মহামেডান স্পোর্টিং বেশ জোরাল দল হবে। ইষ্টবেঙ্গল থেকে মজিদ, আকতার্ ও কালিঘাট থেকে বসির মহামেডানয়ে যোগ দিচ্চে। ইষ্টবেঙ্গল টীমেও বেশ কিছু অদল বদল হয়েছে। মোহন বাগানের সুদক্ষ গোলকীপার কে দত্ত ইষ্টবেঙ্গলে যোগ-দান করেচেন। মোহন বাগানের এতে বেশ একটু ক্ষতি হল। ইষ্টবেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইন এবারও বেশ জোরাল রইল। মুর্গেস, লক্ষ্মীনারায়ণ ও বি সেন এঁরা তো আছেনই। মোহন বাগানেও কয়েকটি ভাল খেলোয়াড় যোগ দিয়েছেন! ভবানীপুরের লেপ্ট আউট ফয়জ খান্, ওয়ারীর জে সি দত্ত ও চট্টগ্রাম থেকে এক নতুন খেলোয়াড় কালু সিং এঁরা মোহন বাগানে খেলবেন। গোলে কে দত্তর বদলে খেলবেন কালিঘাটের পূর্ব্ব গোলকীপার এস ব্যানার্জ্জী। এরিয়ান্স্, ভবানীপুর ও কালিঘাট টীমেরও কিছু কিছু বদল সদল হয়েচে। বিদেশী টীম ক্যামেরোনীয়ানস্ ও কে ও এস্ বি এদের মধ্যে কে ও এস্ বি ভাল টীম মনে হয়। তবে কিছুই বলা যায় না। যাহোক এটা মনে হয় যে, কোন ইণ্ডিয়ান টীম এবারও লীগ জয়ী হবে। মহামেডান্স্, মোহন বাগান, ইষ্টবেঙ্গল, কালিঘাট এরা সকলেই ঘোর প্রতিদ্বন্দী। লীগ সুরু হবার আগে এবার বোধহয় আমরা একটি বর্ম্মী টীমের খেলা দেখতে পাবো। এদলটি রেঙ্গুনে করিনথিয়ানদের হারিয়েছিল।

এবার নাকি Talking car এর আবির্ভাব হবে। সম্প্রতি একজন ইঞ্জিনীয়ার এক Talking car এর প্রচলন করেছেন। এই গাড়ীর মালিক ইঞ্জিনীয়ারএর নাম মিঃ হ্যারি কন্। গাড়ীর ভেতর ড্যাস্বোর্ডের ওপর আয়নার কাছে তিনি বসিয়েছেন একটি

মাইক্রোফোন্ আর ড্যাস্‌বোর্ডের নীচে লাগিয়েছেন এ্যাম্‌প্লিফায়ার আর সামনে রেডিএ-টরের সামনে রেখেছেন একটি লাউড স্পীকার। এখন রাস্তা দিয়ে চললেই দরকার মত গাড়ীটি কথা কইবে। ধরো রাস্তা দিয়ে কেউ গাড়ীর সামনে পার হতে যাচ্চে তখন মটর গাড়ীটি গুরু গম্ভীর গলায় বলে উঠবে—"ও-মশাই, সাবধানে রাস্তা পার হবেন, সামনে গাড়ী!" গাড়ীর পেছনে আবার লেখাঃ 'Thank you' অর্থাৎ আপনি যে কথাটি মান্য করেচেন তার জন্য ধন্যবাদ! হঠাৎ বিকট হর্ণ বাজিয়ে লোক চমকানোর চেয়ে এটা বেশ সুন্দর নয় কি? আবার হয়ত সামনা সামনি কোন গাড়ী চলেছে তো চলেছেই তখন পেছনের গাড়ীটি বলে উঠবে—"ও মশাই, * * * নম্বর—আমাকে যেতে দাও না?" তারপর ধন্যবাদ! কিন্তু এতো না হয় ভাল কথায় হল। এখন যদি সব Talking carsই রাস্তায় চলতে সুরু করবে কোন সামান্য কারণে কেউ যদি মন্দ কথা বলে তাহলে তো তর্কাতর্কি চেঁচামেচি! এখন একটা মজা করার উপায় হচ্চে—লাউড স্পীকার সামনে থাকার দরুন কোন্ গাড়ী কি বলছে ধরা যায়—এখন ঠিক হয়েচে—গাড়ীর হেড লাইটের সঙ্গে লাউড স্পীকার লাগিয়ে দিলে টপ করে বোঝা যাবে না ঠিক কে কোন্ গাড়ী কোত্থেকে কথা বললে! কিন্তু সত্যিকারের কথা কে কইবে বুঝতে পারলে তো?



ংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন—

পৃথিবী তার কক্ষ পথে এক পাক ঘুরে এসে আবার নতুন করে যাত্রা সুরু করলে। ামাদেরও নতুন বছর আরম্ভ হল। পৃথিবীর চলাটা অবশ্য এক হিসাবে এক ঘেয়ে চলা, কেই পথে বার বার সে ঘুরে ঘুরে যায়,—বলা চলে। কিন্তু আমাদের চলাটা ঠিক তা নয়। ামাদের নতুন বছর ঠিক আগের বছরের পায়ের চিহ্ন ধরে চলবে না। সেজন্যে হয়ত খানিকটা ঃখ করবার আছে—যে সব আনন্দ আর বছরে পেয়েছি, যে সব মধুর দিন আমাদের কেটেছে সগুলি আর ফিরে পাওয়া যাবেনা এই দুঃখ। সেগুলি আমাদের স্মৃতিতে শুধু জমা হয়ে াইল। কিন্তু আর বছরের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে দুঃখু করবার যতটা আছে, তার চেয়ে নেক বেশী আশা করবার ও উৎসাহিত হবার আছে সামনের দিকে চেয়ে। পৃথিবীর নতুন ছর ঋতুগুলির সেই পুরাণো ধাপে ধাপে পা নিয়েই ঘুরে চলবে কিন্তু আমাদের সামনে কেবারে অজানা নতুন পথ। সে পথ অনেক জায়গায় আমাদের নিজেদেরই কেটে নিতে হবে।

নতুন বছরের গোড়ায় আমরা সেই আশাতেই বুক বাঁধি, সঙ্কল্প করি নানাদিক দিয়ে তুন বছরকে সার্থক করবার। সব আশা হয়ত পূর্ণ হয়না শেষ পর্য্যন্ত, সব সঙ্কল্পে মান রাখা আর হয়ে ওঠেনা। তবু তাতে দমে থাকার কিছু নেই। সুদূর দিগন্তের দিকে লক্ষ্য রেখে সেখানে না পৌঁছোলেও, আমরা যতটুকু এগুতে পারব তাও বড় কমনয়।

নতুন বছর তোমাদের সকল দিক দিয়ে সার্থক হোক, যা কিছু ভালো, যা কিছু বড়, তার দিকে দৃষ্টিরেখে উদার বিস্তৃত জীবনের ক্ষেত্রে তোমরা এগিয়ে যেতে পার এই প্রার্থনাই করি।

—তোমাদের সম্পাদক মশাই—



পরিচালিকা—দিদিভাই!

রংমশাল দলের ভাইবোন—

নতুন বছর এলো! চৈত্র মাস যাই যাই করে চলে গেল, এবার এলো বৈশাখ, নতুন বছরের পদচিহ্ন এঁকে! বৈশাখ বাঙ্গলা বছরের প্রথম মাস, এমাসটা হলো সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের, এমাস হলো শুভস্পর্শে ভরা! শুভ কার্য্যারম্ভের মাস হলো বৈশাখ, আমার ছোট ছোট বোনেরা হয় তো ব্রত করতে বসে গেছ—কি বল?

যে বছরকে পিছনে ফেলে এলাম অনেক আনন্দ আর অনেক ব্যথা তার মাঝে লুকিয়ে রইল· যে এলো—তাকে আনন্দে তোমরা বরণ করে নাও, উৎসাহ আর প্রেরণা লাভ করো, নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারা তোমাদের অন্তরকে স্পর্শ করুক—দৃষ্টি হোক তোমাদের উদার আর অবাধ! যা তোমরা ছোঁবে তাই যেন সোনা হয়ে ওঠে—এ শুভকামনা, আশীর্ব্বাদ আর ভালবাসা তোমাদের জানিয়ে 'চিঠির বাক্স' খুলছি।

হ্যাঁ, 'রংমশাল দল'টা এত ভারী হতে সুরু হয়েছে—যে, দেখে আনন্দ হচ্ছে আর ভয়ও লাগছে—সবাইকে সামলাতে পারবো তো? এবার তোমাদের এত চিঠি এসেছে যে চিঠি প্রকাশ করে উত্তর দেওয়া সম্ভব হলোনা—নূতন বছরে কারো মনে দুঃখ দিতে নেই—তাই চেষ্টা করছি যাতে সকলকেই উত্তর দিতে পারি।

শিপ্রা সরকার (কলিকাতা)

বোনটী, তোমার চিঠি অনেকদিন পেয়েছি। তুমি, কেন আরও আগে চিঠি দাওনি? দিদিভাইকে বুঝি পর ভাবতে আছে না লজ্জা করতে আছে? তোমার ছবি খবরের কাগজের

ছবি কাটা নেসলস চকোলেটের ছবি জমান। বেশ, লেখনী বন্ধু করে দেবো। তোমার বয়স ৬ বৎসর ৮ মাস হলে কি হয়, হাতের লেখা ভালো। তুমি বুঝি মনে করেছ তোমার জন্ম ৩০শে মে ১৯৩১ বলে তুমি তোমার দিদিভাই'এর চেয়ে বয়সে বড়? তোমার ডাক নাম কাজল—সেটাই আমার ভাল লেগেছে খুব। বাড়ীতে পড়ো—কবে স্কুলে ভর্ত্তি হবে? গ্রাহক নম্বর দিও।

পরিতোষ ঘোষাল (ঘাটাল) গ্রাহক নং ৭১৬

তোমার চিঠি পড়ে খুব দুঃখ হলো ভাই তিন বছর বয়সে মাকে হারিয়েছ শুনে। লক্ষ্মী ভাই, তোমার রংমশালদলের এত ভাইবোনের মাঝে নিজের সব দুঃখ ভুলে যাবে না? মা, বাবা, ভাইবোন কিছুই তো চিরকাল থাকে না ভাই। তোমার 'লেখনীবন্ধু' শীঘ্র করে দেবো তোমাদের 'দল' হয়েছে দেখেছ তো? তোমার বয়স ১৬ বছর—ডিটেকটিভ, বৈজ্ঞানিক ও এ্যাডভেঞ্চারের বই ও জীবনী পড়তে ভাল লাগে? কোন স্কুলে কোন ক্লাসে পড়ো? তোমার হারাণ দিদিকে 'দিদিভাই'এর ভিতর খুঁজে পেয়েছ জেনে খুব খুসী হলাম ভাই।

মণিবালা মজুমদার (ভবানীপুর) গ্রাহক ৫৭৭

সত্যি, তোমার চিঠি পড়ে আমি হাসিনি—কেন হাসবো বল তো? তুমি আমায় রোজ মনে মনে দেখতে পাও দিছু? কেন জানো? খুব ভালবাস বলে। তোমার বয়স তেরো থার্ড-ক্লাসে পড়ো, লেখবার ঝোঁক আছে, দু'একটা লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে, এবং বই পড়তে ভাল লাগে এত সব হলে কি হবে—তাতে তুমি মোটেই ভারিক্কী হওনি—ছোট্ট বোন মালা'ই আছ। রংমশাল দলে এলেই লেখনীবন্ধু হবে ভাই।

ছবি বিশ্বাস (কলিকাতা) গ্রাহক নং ৫৫২

তোমার লজ্জা ভয় ভেঙ্গে গেছে দেখে খুব খুসী হলাম বোন--সত্যিইতো দিদির কাছে আবার লজ্জা ভয় কিসের? তুমি না বল্লেও আমি জানি তুমি সব কাজ খুব ভাল করে করতে পারো। তুমি লিখেছ তোমার হবি গান গাওয়া, সুন্দর জায়গায় বেড়ান, অভিনব সংবাদের 'কাটিংস' সংগ্রহ করা, সবরকমের ভালো ছবি দেখতে ও দেশ বিদেশের কথা জানতে ও গল্প পড়তে, যে কোনও নতুন গান ও সুর আয়ত্ত করবার আগ্রহ ইত্যাদি আর রংমশালের মত বই পড়তে ভাল লাগে এসব শুনে আমার খুব ভাল লাগলো। বেলতলা গার্লস স্কুলে ক্লাশ IXএ পড়ো, বয়স ১৪ বছর এও শুনলাম—কিন্তু তোমার যে বিজয়াদশমীর দিন জন্মদিন এটী জানিয়ে ভালো করেছ, ওদিন নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করছ দিদিভাইকে?

মাণিক বসু (নিউ দিল্লী) গ্রাহক নং ৬৯৭

ভাই, তোমার নিমন্ত্রণ তোমার ওখানে যাবার আমি সাদরে গ্রহণ করেছি—কবে যাবো তাতো বলতে পারি না ভাই, হ্যাঁ গেলে তো তোমাদের বাড়ীতে নিশ্চয় উঠবো। তোমার বন্ধু দরকার বলে যা হবি জানিয়েছ তা লিখছি—তুমি ক্লাশ IXএ পড়ো, বিদেশী টিকিট ও নেস্‌ল্‌স এর ছবি জমাও ফটো তোলো—এই সব যে করে তাকে বন্ধু করবে—? কেমন এই তো ? ভুল হয়নি ?

শম্ভু ভাই !

তুমি না লিখেছ পুরোনাম না লিখেছ ঠিকানা বা গ্রাহক নং—সুতরাং কি করে জবাব দিই বল তো ? এবার সব লিখো।

অজিত কুমার রায় (ঢাকা)

অজু ভাই ! গ্রাহক নম্বর দাওনি কেন ? না, রাগ কেন করবো বলতো ? তোমার হবি নানা দেশের টিকিট চকোলেটের ছবি জমান—আচ্ছা আমি সবাইকে বলে দেবো।

মোহিতেন্দু ভদ্র (লামাবাজার, সিলেট) গ্রাহক নং ৯৯৬

তোমার ধারণা ভুল ভাই মোহিত, তুমি সকলের পিছনে এসেছ বলে পিছনে থাকবে তার কোন অর্থ নেই। তোমাদের এ, 'রংমশাল দল' এর সব ভাই বোন তোমাদের দিদি ভাই এর চোখে একই, সবাইকে সমান ভাবে দেখি। আমি তোমার সেই দিদিরাই—যাঁরা একই দিনে প্রায় একই সময় কলেরা হয়ে স্বর্গে গেছেন। আর মনে দুঃখ নেই তো ? শুধু দিদি নয় তোমার কত ভাই বোন হলো বল দেখি ? পরীক্ষা কেমন হোল ? তুমি এবার VIII এ প্রমোশন পাবে, রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুলে পড়, ১৪ বছর বয়স—ভ্রমণ করতে আর ভ্রমণ কাহিনী পড়তে তোমার ভাল লাগে এসব জানলাম—আচ্ছা দেখি তোমার কথা মত তোমারই মত একটী লেখনী বন্ধু করে দিতে পারি কিনা ভাই।

বিশ্বনাথ লাহিড়ী (গাইবান্ধা) গ্রাহক নং ১০৩৩

কিন্তু ভাই, তোমরা 'নির্ম্মাল্য' বলে যে মাসিক পত্রিকা বের করেছ শুনে সুখী হলাম, আরও সুখী হলাম তোমার সাহিত্যানুরাগ দেখে, কিন্তু আমার কাছে লেখা চেয়েছ ? তোমার দিদি ভাই তো লিখতে জানে না ভাই, একমাত্র তোমাদের চিঠি লেখা ছাড়া, সুতরাং এখানেই

সেই তাকে শুধু মনে মনেই আশীর্ব্বাদ করছি। বরং দেখতে দাও যদি একটু পড়ে দেখতে পারি। তুমি গাইবান্ধা হাইস্কুলে VII এ পড়ো, ডাক টিকিট জমাতে, বাগান করতে, গল্প লিখতে ভালবাসো সব জানিয়েছ, কিন্তু বয়স বা জন্ম তারিখ তো জানাও নি। সমস্ত জানিও, লেখনী বন্ধু করে দেবো।

পরিমল সরকার (Haroa) গ্রাহক ১০৪০

তোমার যে বড়দা ছাড়া দিদি নেই বা দাদা নেই সবাই তোমার ছোট---এ দুঃখের কথা জেনে আমি ভারী খুসী হয়েছি কিন্তু ভাই, কেন জানো? তোমার কত ভাইবোন দাদা দিদি হয়ে গেল তোমার দুঃখ আর রইল না—ঠিক কিনা? কলমের নিব, নানান দেশের পয়সা সংগ্রহ করতে, কবিতা ও ছোট গল্প লিখতে ও ফটো তুলতে ভালবাস —জেনে সুখী হলাম। বিকাশেন্দু সরকার ও দীলিপ সিংহ'র ঠিকানা চেয়েছ—ঠিক সময়ে দেবো। গল্প কি করে ভাল লেখা যায় জানতে চেয়েছ কিন্তু আমি তো নিজে জানিনা লিখতে, ঠিক বলতে পারিনা; তবে মনে হয় খুব বেশী লেখো তাহলে পরে বেশ ভাল লেখা হাত দিয়ে বেরোবে। কিন্তু নিজের লেখা পড়া করে অবসর সময়ে এগুলো করবে। ক্লাস IX এ পড়ো বয়স ১৫ কিন্তু জন্ম তারিখ দাও নি তো ভাই? হ্যাঁ, রংমশাল দলে এলেই লেখনীবন্ধু পাবে—জানা কথা।

সুরমা ও সমরেশ (কলিকাতা) গ্রাহক ৯২১

ভাই বোন দুটী, তোমাদের চিঠি পড়ে খুব ভাল লেগেছে। স্থানাভাবের জন্য সব উত্তর দিতে পারা যায় না তোমরা অভিমান করোনা। আমি মোটেই মনে করিনি সুরমা যে আমার খোজ তোমরা নাও না বরং বেশী খোঁজ নাও। আমি কি করতে ভালবাসি? আচ্ছা কি মনে হয় বলতো? তোমাদের যা মনে হবে আমি তাই-ই করতে ভালবাসি—কিছু করতে ভালবাসি কিনা জানিনা কিন্তু তোমাদের সবাইকে খু-উ-ব ভালবাসি। মাকে নমস্কার জানিয়ে বলো তাঁর আদেশ রাখতে চেষ্টা করবো কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হবো জানিনা ভাই।

নিখিল চন্দ্র দত্ত (কলিকাতা) গ্রাহক ৬৯০

তোমার চিঠি যা তোমার অনুযোগ অভিযোগ বয়ে এনেছে—তা আজ সম্পাদক মশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তিনি যা বলবেন পরে তোমায় জানাবো। 'রংমশালদল'এ এসে

পড়লেই লেখনীবন্ধু হবে। তোমার যে বন্ধু হবে তাকে জানিয়ে দেবো তোমার বয়স পনেরোর কম, ক্লাস Xএ পড়ো, খবরের কাগজের কাটিংস রাখো ষ্টাম্প জমাও ইত্যাদি। তোমার চিঠি পড়ে আমি মোটেই বিরক্ত হইনি ভাই।

নলিন কুমার সেন (কলিকাতা)

রতন! তুমি শিং ভেঙ্গে বাছুর দলে ঢুকেছ বলে লিখেছ কিন্তু তা নয়, তোমার সতেরো বছর বয়স আর থার্ডইয়ারে পড়ছ তাতে কি হয়েছে—তুমি যার সঙ্গে আলাপ করতে চাও সেই শুভেন্দুও তোমার মত প্রায়। বয়স নিয়ে সব সময় তুলনা করতে গেলে চলে না ভাই মনটাই আগে দেখতে হয়—তোমরা কি বলছ, এ আসরে আমাদের ঠাকুরমা আছেন (অজয়ের ঠাকুরমা) একজন তিনি এই দলকে কত ভালবাসেন। গ্রাহক সম্বন্ধে যা লিখেছ তার উত্তর—এক বাড়ীর দু'জন গ্রাহক হয়না সত্যি কিন্তু দুজনের নামে বইটী নিলে গ্রাহক নম্বর দু'জনেরই চলবে দুজনেই চিঠি পত্র লিখবে কিন্তু যদি রংমশালদলের ব্যাজ নাও তখন দুটো নিতে হবে কেননা একটা তো দু'জন ব্যবহার করতে পারবে না। রংমশাল দলে এসে গেলেই সবাইকে (যে যার ঠিকানা চায়) ঠিকানা দেওয়া হবে, তুমিও শুভেন্দুর ঠিকানা পাবে। সুজাতার সম্বন্ধে এখন কিছু বলতে পারিনা, পরে জানাবো। তবে মনে হয় যা নিয়ম হয়েছে তার ব্যতিক্রম সম্পাদক মশাই বা পরিচালক মশাই হতে দেবেন না। তোমার হবি বিজ্ঞান আর কবিতার বই পড়া, হবি জেনে সুখী হলাম।

নন্দিনী (ছাপরা)

তুমি আমায় চেনো? কেমন করে বলতো? গ্রাহক গ্রাহিকা না হলে চিঠির উত্তর দেওয়া নিয়ম নয় জানো তো বোন? চটপট রংমশালদলে এসে পড়ে তোমার হবি, স্কুলে পড়ো কিনা, জন্ম তারিখ প্রভৃতি জানিয়ে লেখনীবন্ধু নিয়ে নিও। তোমার ভাইএর নামের সঙ্গে তোমার নাম যোগ করে নিও যেমন ঠিক নলিন ভাইকে লিখেছি—জানো।

উমারাণী রায় (কলিকাতা) গ্রাহিকা ৮৮১

বোনটী, তোমার চিঠিটা পড়ে ভারী আনন্দ হলো—কেমন সুন্দর লেখা ও ছোট্ট চিঠি। দিদিভাই তোমাদের মাপ করবে কি পাগল? এতো তোমাদের জোরের জায়গা, সব জোর করে নেবে। তোমার বয়স ১৫ বছর, হবি নেকলেস চকোলেটের ছবি জমানও পাখী পোষা

এবং রংমশালকে ভালবাসা—এইতো ? আচ্ছা যে তোমার 'লেখনীবন্ধু' হবে—দেখো নিজেই আসবে, না আসে তখন করে দেবো দিচু, কেমন ?

রমা সেন গুপ্তা (লাহোর) গ্রাহিকা ৩৬৬

তোমার মিষ্টি চিঠি পেয়েছি নিমন্ত্রণ ও সাদরে গ্রহণ করলাম। সত্যি রমা তুমি যা লোভ দেখিয়েছ—আমি গেলে তুমি নিজে আমায় সব দেখাবে, শালেমার, সাহাদ্রা, আনারকলির কবর আরো সুন্দর সুন্দর জিনিস এ শুনে আমার ইচ্ছা হচ্ছে এখুনি যাই কিন্তু তা কি করে হয় বলো ? তোমার হবি বাস্কেট বল, কেরাম আর ব্যাডমিণ্টন খেলা— ? আচ্ছা বলে দিচ্ছি সবাইকে—তোমরা সবাই লেখনী বন্ধু পাবে, নিজের ইচ্ছা মত বেছেও নিতে পারো বোনটী, বুঝেছ ?

উর্ম্মিলা সেন (মজঃফরপুর)

ভোলামন বোনটী, ভুলে গেছ গ্রাহক নম্বর দিতে—এবার দিও। সুজাতার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছ করিয়ে দেবো। আমি কিন্তু খুব রাগ করেছি দিদি এতদিন চিঠি দাওনি বলে—আমার রাগ কি করে তুমি ভাঙ্গাবে ? রংমশাল তোমাদের কতপ্রিয় আমি জানি। তোমার হবি পশুপাখীর বাচ্চা ভালবাস। পায়রা, টিয়া, কুকুর, ছাগল সব আছে—সেজন্য তোমায় সবাই ছেলে মানুষ বলে ঠাট্টা করে ? সত্যি ভারী অন্যায়—তোমার বয়স ষোলো, তুমি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ো-আর সবাই কিনা ছেলে মানুষ বলে ? আচ্ছা আমি তোমার ভাইবোনদের বলছি ১৬টা উল্টে ধরতে !

সাধনা সরকার (গৌহাটী) গ্রাহক ৭৬৫

তোমার ভয় ভাঙ্গার জন্য আমার আমোদ আরও খানিকটা বেড়েছে বোনটি, নানা দেশের টিকিট জমাও, গান গাও আর ক্লাশ VI এ পড়ো বয়স ১৩ বছর—সব শুনেছি কিন্তু গান কবে শুনবো ?

দিলীপ সিংহ (কলিকাতা) গ্রাহক ৪৩১

তোমার জন্য রংমশালের ব্যাজ নিশ্চয় থাকবে, কুপন ও টাকা পাঠিয়ে নিয়ে যেও। হ্যাঁ, তোমার হাতের লেখাটী আরও ভাল করা চাই বুঝেছ ভাই ? তুমি যা আমায় পুরস্কার দেবার লোভ দেখিয়েছ তা দেখে প্রীত হলাম। গিরিডিতে কেন আমার কোথাও বাড়ী নেই সুতরাং

তুমি যাকে মনে করছ আমি সে নয়। তোমাদের বাড়ী গিরিডিতে জেনে খুসী হলাম। জগদীশ দাশ ভাই এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। লেখার সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছ সম্পাদক মশাইকে জিজ্ঞাসা করে বলবো।

সতী মৈত্র (রাজসাহী) গ্রাহক ৬৩৬

খুকুমণি! নামটা বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছে—দু'ভাগ করে নেবো, কেমন? তুমি আমায় স্বপ্ন দেখেছ? আমি একথা শুনে হাসিনি খুব আনন্দ হয়েছে। ভাগ্যিস লেখনি যে আমার চেহারা খুব কালো, মোটা আর নাক নেই। তোমার বয়স পনের বছর, ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ো, ছবি গান, ফুল, খেলা ধূলা করা য়্যাডভেঞ্চার ও মজার গল্প পড়া আর দেশ বিদেশের খবর সাময়িকি খেলাধূলার খবর ইত্যাদি জানা,—চমৎকার সত্যি, আচ্ছা লেখনী বন্ধু পাবে সময় মত।

তোমরা হয়তো খুব রাগ অভিমান করবে ভাইবোনরা, কিন্তু স্থানাভাবের জন্য এখন আর উত্তর দেওয়া হলো না. যাদের চিঠি বাকি রইল আগামীবার তাদের সর্ব্ব প্রথমে উত্তর যাবে। যাদের বাকী রইল তাদের নাম অরুণ বন্দোপাধ্যায়, তরুণ শঙ্কর ভাদুড়ী, রবীন্দ্র মোহন মৈত্র, বাসুদেব বসু, শিবরাম বন্দোপাধ্যায়, সাধনা সেন গুপ্তা, অচিন্ত্য কুমার রক্ষিত, বাবু, আরতি, তরুণ ঘোষ, সুশীল দাস, বিমল মণ্ডল, তুষার কান্তি দত্ত, অমলেন্দু সেন, অরুণ (মাণিক), হৃষীকেশ দে, রতন কুমার রায়, তৈয়েবর রহমান, শ্যামল ভট্টাচার্য্য, কমলা দাস, জগদীশ দাশ, লক্ষ্মী ঘোষ, অজিত মুখোপাধ্যায়, অনন্ত কুমার সিংহ, ভানু, কামাক্ষা চন্দ্র বল, গৌরাঙ্গ চৌধুরী, ক্ষিতীন্দ্র নাথ রায়, শচীন্দ্র নাথ রায়, শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, শিব প্রসাদ সেন, বিনয় চন্দ্র, কল্পনা, অঞ্জলি আচার্য্য, প্রতিভা রায়, নিশানাথ দাশগুপ্ত। তোমরা সকলেই আমার স্নেহাদর ও ভালবাসা আশীষ নিও। ইতি—

প্রীতিপ্রয়াসী—

তোমাদের—

দিদিভাই



ামার স্নেহের ছোট্ট বোনেরা !

—শ্রীইন্দিরা দেবী

আজকে আর বিশেষ কিছু নিয়ে আলোচনা করবো না, সাধারণ ভাবে কয়েকটি দরকারী থা বল্‌বো। তোমাদের দিকে চেয়ে আমি এত দিন ধরে যে কথা গুলো বলেছি আশাকরি ামাদের কাছে তার সার্থকতা বিফলে যায়নি। রংমশাল যে রঙে তোমাদের কচি কচি মুখ-লির ভবিষ্যৎ জীবনের পথটুকু রাঙ্গাতে চায়, সে জীবনের আনন্দের ও সাফল্যের বানী শোনাতে য়—সে রঙ ও সে বানী উত্তর জীবনের অনেক কাজে আসবে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক আছে একথা তোমরা জানো। সেজন্য খো আকাশে যখন ঘনঘোর মেঘ করে বর্ষার ধারা নামে, মনের ভিতর সেই দলার রিম ঝিম শব্দের এমন একটা মাদকতা আছে যা আমাদের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে দাস করে তোলে, শীতের রুক্ষমূর্ত্তি যখন শ্যামল বনানীর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি নিরাভরণা করে তোলে াছে গাছে ফুল আর পাতা ঝরিয়ে, তখন আমাদের মনের আনন্দের তার সুভাবে বাজে না। র বসন্তের আগমনে যখন সারা বিশ্ব প্রকৃতি শ্যাম শুচিতায় ভরে উঠে—রুক্ষ মূর্ত্তিতে আসে য্য সৌন্দর্য্য, পাখীর কল কাকলিতে ভাসে আনন্দ গান তখন সে বন্য সৌন্দর্য্য ও আনন্দগান ামাদের মনকেও রূপে রসে গন্ধে বর্ণে ভরিয়ে তোলে—নয় কি? কিন্তু সব চেয়ে মুস্কিল চ্ছে তোমাদের যারা স্কুলে পড়ো আর যারা থাকো নগরে বাস্তবতার ভিতর! কেননা াকৃতির এ আনন্দ প্রকাশের ভিতর নিজেদের বিলিয়ে দেবার মত সুযোগ তোমাদের আসে া, আর এলেও সে সুযোগ গ্রহণ করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না! অনেক সময় মনের চ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা বাধ্য হয়ে অনেক কাজ করো কিন্তু এই কাজ করার ভিতর প্রাণ থাকে

না এবং প্রাণ না থাকার দরুন কাজ সুষ্ঠু হয়ে ওঠে না ! প্রকৃতির বিরুদ্ধে মনকে কোন কাজ জোর করে করিয়ে নিতে নেই। ধরো খুব বৃষ্টি হচ্ছে ঝম ঝম করে—এ অবস্থায় নিত্য পাঠ্য পুস্তকের ভিতর মনকে ডুবিয়ে রাখতে ইচ্ছা হয় না, বইখানা ফেলে 'রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে বসতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে মন যখন কোন কাজে বা লেখাপড়ায় বসতে চাইবে না তখন গল্পের বই নিয়ে বসো, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বসো কিম্বা ভিজে ঘাসের উপর খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে মনকে একটু শান্ত করে নিয়ে আবার যে কোন কাজে বা পড়ায় মন সংযোগ করতে পারো। লেখা পড়ায় বা কাজ কর্ম্মের ভিতর এ স্বাধীনতাটুকু তোমরা আনতে পারো কিন্তু একটু বিবেচনা বা সাবধান হয়ে কাজ করো যাতে এ স্বাধীনতাটুকু ক্ষুণ্ণ না হয়।

তোমরা জানো প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে সবাইকে ভাল রাখবার চেষ্টা। এ ভাল রাখাটুকু শুধু মানুষের উপর নয় কীট পতঙ্গাদির উপরও আছে। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধ আব-হাওয়ার ভিতর বাস করবার ফলে আমাদের শারিরীক ক্ষতি ঘটে।

'শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়'—একথাটা আমরা জানি বলেই নির্ব্বিবাদে অনেক সময় শরীরের উপর নানা অত্যাচার ও অযত্ন করে থাকি—সাময়িক ভাবে এ অত্যাচার বা অযত্ন করার ক্ষতি যে কতখানি তা বুঝতে পারি না কিন্তু সেজন্য ভবিষ্যৎ জীবনে বহুকষ্ট সহ্য করতে হয়। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনে কত বড় কত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নিজের জীবনকে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে ভরিয়ে তুলতে হবে, দেহকে করতে হবে বলিষ্ঠ মনকে রাখতে হবে উদার—যাতে সমগ্র সংসার সুখের হয়ে ওঠে তোমাদের শুভস্পর্শে।

প্রকৃতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যদি পশু পক্ষীদের জীবন ধারণের দিকে চেয়ে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে, ভালভাবে বেঁচে থাকবার চেষ্টা প্রকৃতি তাদের ভিতর জাগিয়ে দিয়েছে, তাই দেখো তারা ভালো জায়গায় থাকতে ভালবাসে, ভাল ভাবে বাসা বাঁধবার চেষ্টা করে ঋতুর পরিবর্ত্তন অনুযায়ী নিজেদের খাপ খাইয়ে চলে আমাদের বেলাও ঐ নিয়ম খাটে। সেজন্য তোমরা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় অনেক সময় আমরা মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ি—কারণ আর কিছুই নয়—প্রকৃতির ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি না বলেই এই বিভ্রাট!—এত সর্দ্দি কাশী এত জ্বর প্রভৃতি।

প্রকৃতির নিয়মটুকু মেনে চললে শারীরিক সুস্থতা অটুট থাকে। মেয়েদের শরীরকে সুস্থ সবলও সুন্দর রাখতে গেলে ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে কিনা এবং সে কি ভাবে, সে কথা তোমাদের পরের বারে বলবো।

ভাবীগৃহিণীর বৈঠক
শ্রীইন্দিরা দেবী

আমার দুটী বোন সুজাতাসিংহ ও রহিমা খাতুনের দুখানি চিঠি পেয়েছি। রহিমা! তুমি যে রুমালের ধার সেলাই কত রকম ভাবে সেলাই করা যেতে পারে জানতে চেয়েছ এ আমি তোমাদের জানাবো শীঘ্র। তোমরাও নূতন সেলাই সম্বন্ধে কিছু জানাতে চাও তো লিখে পাঠিও। আমি খুব খুসী হয়েছি তোমাদের মতামত পেয়ে। গত মাসে 'ভাবীগৃহিনী'র বৈঠক কেন যায়নি এনিয়ে অনেকে জিজ্ঞাসা করেছ—তার উত্তর স্থান ছিলনা তাছাড়া আমাদের পাশের বাড়ী অর্থাৎ তোমাদের দিদিভাই এত বেশী স্থান নিয়ে নেন যে মাঝে মাঝে ভাবী-গৃহিনীর বৈঠক থাকে না। রহিমা! তুমি একটু ভুল করেছ বোন, শেষে লিখেছ তোমার ছবি, বয়েস লেখা পড়ার কথা, কিন্তু ওগুলো আমাকে না জানিয়ে পাশের বাড়ী চিঠি লিখো কারণ এটাতে তো ওসব প্রয়োজন নেই কেবল তোমরা কি শিখতে চাও জানিও সম্ভব হলে নিশ্চয় শেখাবো।

সুজাতাসিংহ! তুমি আল্পনা ও ব্রতকথার বিষয় জানাতে বলেছ, আমি চেষ্টা করবো তোমাদের কথা রাখতে, তোমরাও নানারকম জিনিস লিখে পাঠাতে পারো—উচিৎ বিবেচনা করলে বা মনোনীত হলে প্রকাশ করবো।

আমার সব বোনেরা! নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ নিও।





শবরীর প্রতীক্ষা

(পৌষ মাসের গল্প প্রতিযোগিতায় বড়দের মধ্যে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

পম্পা সরোবরের তীরে ঋষি মতঙ্গের আশ্রম। তাপস হ'তে আরম্ভ করে হরিণ শিশু পর্য্যন্ত সবাই যেন আজ বিষণ্ন। তপোবনের মধ্যে শোকের একটা থম্‌থমে ভাব ছড়িয়ে রয়েছে—মহর্ষি মতঙ্গ আজ দেহরক্ষা করছেন। তিনি যে শুধু এই আশ্রমের গুরু ছিলেন তা নয়, তিনি সবাইকে স্নেহ করতেন অপত্য নির্ব্বিশেষে; তাই সকলেই আজ শোকার্ত্ত। সমাধিলাভ করবার আগে তিনি তাঁর অনার্য্য শিষ্যা শবরীর ওপর আশ্রমের ভার দিয়ে বলে গিয়েছেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আসবেন এই আশ্রমে, তাঁকে যেন উপযুক্ত সমাদর করা হয়।

শবরীর চিন্তার আর অবধি নেই। মহর্ষি তার মত অযোগ্যার হাতে এই গুরুভার অর্পণ করে গেছেন, তার সাধ্য কতটুকু। শৈশবে মা বাপকে হারিয়ে গৃহহীন, আত্মীয় স্বজনহীন হয়ে মহর্ষি মাতঙ্গের আশ্রয়ে এসে পড়ে। তখন হ'তে তিনি এই অনার্য্য সন্তানকে নিজের মেয়ের মত প্রতিপালন করেছেন। মহর্ষি ছিলেন শবরীর পিতা, মাতা, আত্মীয়, গুরু একাধারে সব। তাঁকে হারিয়ে শবরীর নিজেকে আবার নিঃসহায় বলে মনে হ'চ্ছে।

শবরী গুরুর শেষ নির্দ্দেশ কিছুতেই ভুলতে পারেনি। রামচন্দ্র আসবেন এই আশ্রমে একথা সর্ব্বদা তার মনের মধ্যে গাঁথা ছিল। কোথায় তিনি আছেন, কবে তিনি আসবেন, এসব কিছুই সে জান্‌তনা। কিন্তু গুরুর কথা সে বেদবাক্যের মত জান্‌ত। তাই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি যেখানেই থাকুন. শবরীর আশ্রমে আসবেনই। সে গভীর আগ্রহে সেই

শুভক্ষণের আশায় দিন গুনতে লাগল। যদি তিনি অতর্কিতে এসে অভ্যর্থনা না পেয়ে অনাদরে আশ্রম ছেড়ে চলে যান তবে শবরীর আর লজ্জার শেষ থাকবেনা। মতঙ্গ বিশেষ করে এই কাজের ভারটিই তার ওপর দিয়ে গিয়েছেন। তাই সর্ব্বদা সে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকে। তাঁর অভ্যর্থনার উপযুক্ত আয়োজন করতে সে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। প্রত্যহ নিজের হাতে ফুল তুলে সে অর্ঘ্য রচনা করে, আহারের জন্য সুমিষ্ট ফল সংগ্রহ করে, শয়নের জন্য ফুল ও লতা দিয়ে কোমল শয্যা প্রস্তুত রাখে। কিন্তু কোথায় রামচন্দ্র? দিনের পর দিন যায় রাত্রির পর রাত্রি যায়, রামচন্দ্রের দেখা নেই। আশ্রমের সন্ধান না পেয়ে যদি তিনি ফিরে যান এই ভয়ে সে কখনও আশ্রম ছেড়ে বনের পথে গিয়ে অপেক্ষা করে, আঁকা বাঁকা বন পথে যতদূর দৃষ্টি যায় সে তাকিয়ে থাকে আগ্রহ ভরা চোখে; গাছের ফাঁকে সূর্য্য অস্ত যায়, তার চোখের ওপর নেমে আসে সন্ধ্যার কালো ছায়া। নিরাশ মনে সে ফিরে আসে আশ্রমে। এই রকম মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়, 'কৈশোর যৌবন পার হয়ে শবরীর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। তার দেহ হয়ে আসে জীর্ণ, দৃষ্টি হয়ে আসে ক্ষীণ—চলা ফেরা করবার শক্তি ও তার লোপ পায়। কিন্তু তার প্রতীক্ষা শেষ হয় না। কুটীরের প্রান্তে বসে সে জপ করে রামচন্দ্রের নাম, আর ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে পথের পানে তাকিয়ে থাকে—কখন তিনি আস্‌বেন।

জরায় তার দেহ পঙ্গু, আসন্ন মৃত্যুর ছাপ তার সর্ব্বাঙ্গে কিন্তু প্রভুর অভ্যর্থনার আয়োজন তার সম্পুর্ণ, পাদ্য অর্ঘ্য তার পাশে সুসজ্জিত, ফল মূলের থালা এবং নারিকেল পাত্রে স্বচ্ছ পানীয় জল হাতের কাছে রাখা। প্রভু এলে তাঁর যত্ন ও আদরের ত্রুটী না হয় সর্ব্বদাই তার এই চিন্তা। রাখাল বালকেরা যখন ভোর বেলা গরুর পাল নিয়ে মাঠে যায় শবরী তাদের ডেকে বলে, "ওরে তোরা তাঁর দেখা পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে আমাকে জানাস।" দিনের শেষে তারা ফিরে এলে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করে "ওরে তোরা কি তাঁর সন্ধান পেলি?" তারা উত্তর দেয়, "না মা। আমরা কত দূরে গিয়েছিলাম পথে যার দেখা পাই তাকেই জিজ্ঞাসা করি রামচন্দ্র কোথায়। কিন্তু কই, কেউ ত তাঁর খোঁজ নিতে পারে না। সবাই বলে, জানি না।"

শবরীর মুখ ম্লান হয়ে আসে। দুঃখ ও অভিমানে তার হৃদয় ভরে আসে—তবে কি তিনি আসবেন না? অস্পৃশ্যা অনার্য্য রমনী বলে ঘৃণা করে তিনি কি তাকে দর্শন দেবেন না? না, না, তিনি 'ভগবান', সর্ব্ব জীবে তাঁর সমান দয়া। তাকে তিনি নিরাশ কিছুতেই করবেন না। নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে শবরী আশার প্রদীপ আবার দেখতে

পায়। অনিশ্চিত আশাটুকুকে আঁকড়ে ধরে সে তার প্রতীক্ষা নতুন করে আরম্ভ করে।

কিন্তু সে বুঝতে পারে তার মরণ আসন্ন—তার জন্য তার চিন্তার অবধি নেই। মৃত্যুকে সে ভয় পায়না কিন্তু রামচন্দ্রের দর্শন পাবার আগেই যদি মৃত্যু আসে। প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে, "ভগবান, আর কটা দিন বাঁচিয়ে রাখো, আমার মৃত্যু হ'লে প্রভু আশ্রমে এসে অনাদরে ফিরে যাবেন। হে অন্তর্য্যামী, শুধু সেই দিনটী পর্য্যন্ত আমায় বাঁচতে দাও।"

অন্তর্য্যামী বুঝি তার করুণ প্রার্থনা শুনতে পান। আশ্রমের এক বালক ছুটে এসে বলে, "মা মা, রামচন্দ্র বুঝি এসেছেন! বনের পথে দেখ্‌লাম দিব্যকান্তি দুই মহাপুরুষ—পরণে তাঁদের বল্কল, মাথায় জটা, হাতে প্রকাণ্ড ধনু আর মুখে পরম প্রশান্তির ভাব। আশ্রমের দিকে তাঁদের আস্‌তে দেখে তোমায় জানাবার জন্য ছুটে এসেছি।"

তার কথা শেষ না হ'তেই শবরী, নিজের অসহায় পঙ্গু অবস্থা ভুলে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে উঠে দাঁড়াল—"কই, কোথায় চির আরাধ্য দেবতা আমার, চল, তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি।" বলতে বলতে পাগলিনীর মত সে পা বাড়াল। আশ্রম বালক তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে বল্‌ল, "তুমি উঠোনা মা, উঠলে পড়ে যাবে। তিনি নিজেই আসছেন তোমার কাছে।" শবরী বলে উঠ্‌লো, "ওরে না, তোরা বুঝিস্‌ না। পথ ভুল করে যদি তিনি অন্যদিকে চলে যান্‌, তবে আর তাঁর দেখা পাবনা।"

—"তোমার কাছেই আমি আসছিলাম শবরী, পথ তো আমার ভুল হ'তে পারে না। এই তো আমি এসেছি।" বল্‌তে বল্‌তে ধীর পদে রামচন্দ্র তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন।

—"প্রভু কি সত্যই এসেছ?" শবরী তাঁর পদপ্রান্তে উপুড় হয়ে পড়ে।"

—"তোমার আহ্বান কি আমি উপেক্ষা করতে পারি শবরী? তুমি যে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।"

শবরীর চোখের জলে প্রভুর পা ভিজে যায়। পাদ্যঅর্ঘ্য প্রভৃতি অভ্যর্থনার সব আয়োজন দূরে পড়ে থাকে—শবরী তার নীরব অশ্রুদিয়ে প্রভুর অভ্যর্থনা করতে থাকে।

আজ তার প্রতীক্ষা শেষ হ'ল।

শ্রীপবিত্র গুপ্ত (বয়স ১৪)
গ্রাহক নং ৯১১

— দিন শেষে —

সন্ধ্যা আকাশ আবীর রঙে
রাঙা হ'লো,
ওগো দুখী, সারাদিনের
গ্লানি ভোলো।
ভোলো সকল দুখের কথা
ভোলো তোমার প্রাণের ব্যথা
শূন্য হৃদয় সোনার রঙে
রাঙিয়ে তোলো ॥
দিন শেষের বাঁশরীতে বাজে করুণ তান
সারাদিনের মাতামাতি হ'লো অবসান
ওগো পথিক, মলিন বেশে
দাঁড়াও এবার করুণ হেসে
আপন মনেই একতারাটী
বাজিয়ে চলো ॥

কুমারী শিবানী সরকার (গ্রাহিকা নং ৪০৮)

——:0——

— জোনাকী —

দ্বিগ্বিদিকে ছড়িয়ে আছে চন্দ্রদেবের আলো—
'জোনাকী ভায়া,' তোমার আলো, আজকে কেন জ্বালো?
আলো তোমার বৃথাই যা'বে—
ছোট্ট মনে কষ্ট পা'বে,
তোমার আলো লাগবে কালো, এমন পূর্ণিমাতে
দেখতে তোমায়, লাগে ভালো, অন্ধকারের রাতে।
ঝিক্ মিকিয়ে ওঠ তুমি—
দূর হ'তে ভাই দেখি আমি,
লুকোচুরি খেল' তুমি আঁধার-রাতের সাথে ;
তোমার খেলা, দেখে' দেখে,' আমারো মন্ মাতে।
রাগ কো'রোনা, ও লক্ষ্মী-সোনা—
আজকে তুমি আর জ্বো'লোনা,
কৃষ্ণ পক্ষে, তোমার সাথে, কো'রবো আমি খেলা—
আজকে তুমি, আমার কথায়, কো'রো নাকো হেলা!

—সতী মৈত্র (গ্রাহিকা নং ৬৩৬)

——:o:——

আমরা সকলের জন্য

'রংমশাল দল'

দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মানুষের স্বভাব—মানুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই একলা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে ফেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলী হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্য ভাবতে শিখি, একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তৃত হয়।

এতখানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে কাছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করছি—**রংমশাল দল।**

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জন্যে যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা সবাই এক দলের। দলের বীজ সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল **আনন্দ** আর **আলো।** রংমশাল দলেরও আদর্শ পরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ের দরকার হয় সেই জন্যে রংমশাল দলের ব্যাজ হয়েছে **'মশাল'**। সুন্দর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাজটি তৈরী হয়েছে তোমাদের জন্য; ব্রুচের মত ব্যবহার করবে তোমাদের পোষাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

এবার রংমশাল দলের জন্য আমরা একটি মজার ধাঁধা দিলাম। ধাঁধাটি ৬৬৩ পৃষ্ঠায় পাবে।

সকলে আমাদের জন্য



রংমশাল দলের "ব্যাজ"

নিয়মাবলী

(১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জন্যে কোন আলাদা চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাজ পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে। নিয়মিত পাঠক পাঠিকা যাঁরা এজেন্ট মারফৎ কেনেন—এজেন্টের নাম দিয়ে তাঁরা এ দলে ভর্ত্তি হতে পারেন।

(২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।

(৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।

(৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ভাবে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।

(৫) সমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার। সেজন্য কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।

(৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, "দিদিভাই" C/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।

(৭) সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অন্য কোন ব্যাপার—"দিদিভাই"এর ইচ্ছাধীন।

(৮) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।

(৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর সবার উপর সমান দৃষ্টি থাকবে।

(১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

রংমশাল দল
কুপন

নাম...শ্রীঅনন্তকুমার সিংহ.......... গ্রাঃ নং...৮১৩......

জন্ম তারিখ...১|৫|৩০(৭)...স্কুল বা কলেজ, শ্রেণী...........

পিতা বা অভিভাবকের নাম (তাঁর স্বাক্ষর).................

ঠিকানা...১৫|১এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট

...শ্যামবাজার। কলিকাতা.........

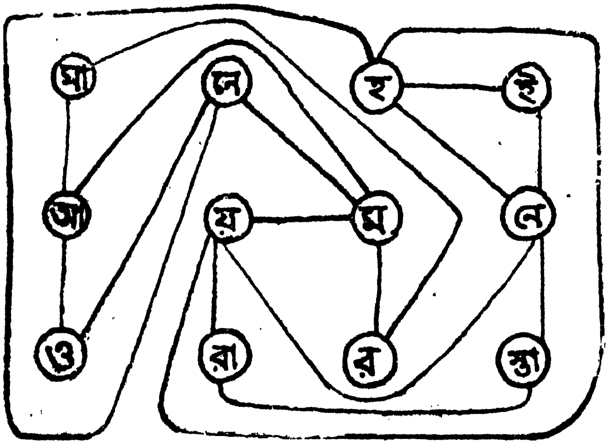
লেখনী বন্ধু চাই কিনা...yes...........

হবি (Hobby)...Stamp, Coin, picture collection. Photography. Games etc.

— রংমশাল দল —

(ধাঁধা)

পাশের নক্সাটাতে বাংলা অক্ষর দেওয়া বৃত্তগুলি এক একটি সহর আর লাইনগুলি হচ্ছে রাস্তা। ধরো রংমশাল দলের তুটি বন্ধু 'ও' সহর থেকে সাইকেল টুরে বেরুবে মতলব করেছে। এখন তাদের ইচ্ছে একবারেই সব সহরগুলি দেখে আসা, অর্থাৎ— কোন সহরে বা রাস্তায় তারা তুবার করে যেতে রাজী নয়। 'ও' সহরটি থেকে বেরিয়ে তারা সবশেষ 'ই' সহরে পৌছতে চায়। একবন্ধু বললে—নিশ্চয় সে রকম রাস্তা আছে খুঁজে বার করতে হবে। অপর বন্ধু বললে—ও আমার মনে হয় রাস্তা নেই তুজনেই একরকম ঠিক কথাই বলচে। রাস্তাও পাওয়া গেল যাতে এক সহরে বা একই রাস্তায় তুবার যেতে হয় না। তোমরা খুঁজে বার করতে পারো রাস্তাটি ? আর তুজনে একরকম ঠিক কথাই বলেচে তার অর্থ কী ?



নূতন ধাঁধা

১। বুনুদের বসবার ঘরে দেখা গেল এই কয়জন লোক বসে গল্প করছেন ;

ঠাকুর্দ্দা-১ ; ঠাকুমা-১ ; বাবা-২ ; মা-২ ; ছেলেমেয়ে-৪ ;
নাতিনাতনি-৩ ; ভাই-১ ; বোন-২ ; ছেলে-২ ; মেয়ে-২ ;
শ্বশুর-১ ; শ্বাশুড়ী-১ ; বৌ-১ ;

বলত সবশুদ্ধ ক'জন লোক ঘরে বসে আছেন ? বলবে ২৩ জন তো ? না, বুনুকে জিগেস করো, ও বলবে, ওমা আমরা তো মোটে ৭ জন ঘরে ছিলাম ! বল দেখি কেমন করে তা হয় ?

২। খোকনদের ছোট্ট দোতলা বাড়ী। একতলা থেকে দোতলা ওঠবার সিঁড়িতে সবশুদ্ধ মাত্র ৮টি ধাপ আছে। খোকন দিনে বোধহয় পঞ্চাশবার ওঠানামা করে—একদিন তার মাথায় তুষ্টু ফন্দি জাগল। সে তার বাবা ও সেজকাকাকে জিগেস করলে,—আচ্ছা বলত, নীচে থেকে ওপরে তুবার ওঠানামা করতে হবে, ওপরে তুবার পৌছান চাই আর নীচে থেকে আরম্ভ করতে হবে, নীচে আর একবার নামতে হবে। এখন কেমন করে সবচেয়ে কম কটা ধাপ ব্যবহার করে তুমি একবার নীচে নেমে ওপরে পৌছতে পারো ? মনে রাখবে কোন ধাপ ডিঙিয়ে বা টপকে গেলে চলবে না আর সিঁড়ির প্রতি ধাপ একই সংখ্যক বার ব্যবহার করতে হবে।

নূতন পুরস্কার প্রতিযোগিতা

নীচে যে ছবিটি দেখছ, এর মধ্যে 'ব' দিয়ে আরম্ভ যত গুলি জিনিষ আছে (যেমন,—বালক, বালিকা, বল, ইত্যাদি), সবগুলির একটা ফর্দ্দ তৈয়ারী করতে হবে। সব চেয়ে বেশী নাম যে বের করতে পারবে সে প্রতিযোগিতায় প্রথম হবে।

কয়েকটি কথা মনে রাখ্‌তে হবে :

(১) আন্দাজে এমন কথা যদি বসাও, যা' এই ছবির জিনিযের নাম নয়, তার জন্য একটি নম্বর কাটা যাবে—সেটিকে তো বাদ দেওয়াই হবে।

(২) যে সব জিনিষের ইংরাজী নামেরই চল হয়েছে (যেমন, "ব্যাট্"), তার ইংরাজী নাম বাংলা অক্ষরে লিখতে পার ; কিন্তু, যে কথার বাংলা সহজ এবং চলিত প্রতিশব্দ আছে, তা'র ইংরাজী নাম দিলে চল্‌বে না (যেমন,—"বোট" কথাটি দিতে পারবে না)।



(৩) এই ছবির সব জিনিষেরই যে "ব" দিয়ে নাম আছে, তা' বল্‌ছি না ; এমন জিনিষও থাকৃতে পারে, যা'র 'ব' দিয়ে নাম নাই।

(৪) নাম গুলি শুদ্ধ বা চলিত কথা হ'তে পারে।

(৫) একই রকমের ৪।৫টি জিনিষের বিভিন্ন নাম থাক্‌তে পারে ;—যেমন, ৪।৫ রকমের পাখী থাকতে পারে ; তা'দের একটির নাম 'বিহঙ্গ' অন্যগুলির বিশেষ বিশেষ পাখীর নাম হ'তে পারে।

(৬) একই জিনিষের কয়েকটি বিভিন্ন নাম থাক্‌লে, তা'র একটি নামই দিতে হবে।

(৭) ছবিতে যা' দেখান হয় নি এমন কিছু লিখবে না ; যেমন, গুণ বা মুখেরও মনের ভাব ;—যথা. বীর, বাক্যালাপ, বর্ণন, বিরস, বিরাগ, বিশ্রী, ইত্যাদি। অথবা বিশেষ ভাবে দেখান ছাড়া অন্য বিষয়ে'র কাজ কর্ম্মের কথাও লিখবে না ;—যেমন, বসবাস, বিহার, বিস্তৃত বিস্তীর্ণ, বাহার, বর্ণ, ইত্যাদি।

ফাল্গুন মাসের পুরস্কার প্রতিযোগিতার ফলাফল

"জোড়া জীব"

১। গরুই (গরু+রুই)
২। ঘোটকচ্ছপ (ঘোটক+কচ্ছপ)
৩। হরিণকুল (হরিণ+নকুল)
৪। চামচিকাকাতুয়া (চামচিকা+কাকাতুয়া)
৫। বরাহনুমান (বরাহ+হনুমান)
৬। আরশুলামা (আরশুলা+লামা)
৭। ছাগণ্ডার (ছাগ+গণ্ডার)
৮। উল্লুকবুতর (উল্লুক+কবুতর)

যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের নাম—

প্রথম — শ্রীপ্রদীপ কুমার সেন (কলিকাতা)।

দ্বিতীয় —
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার গাঙ্গুলী (কলিকাতা)।
কুমারী স্মৃতি রায় (শিলচর)।
শ্রীঅরুণ কিরণ শীল (বরিশাল)।

যাদের দুটি ভুল হয়েছে তাদের নাম :—

শিবপ্রসাদ সেন, (নিউদিল্লী); অলক ও চিত্রা বোষ, (বালীগঞ্জ); দেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল বর্ম্মণ, (শালখিয়া); উমারাণী দেবী, (ভবানীপুর); শ্যামল, অমল, চুনী, ফটিক ও শচীন, (রংপুর); মাণিক বসু, (দিল্লী); অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, (কলিকাতা); অরুণ কুমার রায়, (ভবানীপুর)।

চৈত্র মাসের ধাঁধার উত্তর

১। টাকা বা পয়সা কামাচ্ছে।
২। রান্না চড়াচ্ছে।
৩। ফুল ফুটছে।
৪। বাণ ডাকছে।
৫। দর চড়ছে।
৬। টাকা জমছে।

উত্তরদাতাদের নাম

চৈত্র মাসের ধাঁধার কেহই নির্ভুল উত্তর দিতে পারে নাই।

১টী ভুল উত্তরদাতার নাম :—

অরুণ কুমার রায়, (ভবানীপুর)।

২টী ভুল উত্তরদাতাদের নাম :—

লীলা, মায়া, রেণু, মুকুল, অরুণ ও মীরা, (নিউদিল্লী); উৎপল গুপ্ত, (বালীগঞ্জ); শৈলেন, সত্যেন ও রেণু নাথ, (নিউদিল্লী); সুধা, খোকন, সোনাই, গোপাল ও বিন্তু, (কালীঘাট); রাণী, বকুল, বাদল ও পিউনী, (নিউদিল্লী); পবিত্র ও প্রসূন গুপ্ত, (পাটনা)।

২টীর বেশী ভুল হয়েছে যাদের :—

অচিন্ত্য কুমার ও শ্যামলী রক্ষিত, (কলিকাতা); কমলকৃষ্ণ পাল, (রসুলপুর); বনবিহারী, বাবু, মাণিক ও পুতুল, (আহামদাবাদ); শচীন্দ্রনাথ রায় (হাওড়া); কামাক্ষা চন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ); ইন্দু, প্রকাশ, চুনী ও প্রতাপ রায়, (ধানবাদ); সাধনা, অর্চ্চনা, গোপাল ও রাখাল, (গৌহাটী); খগেন, দীনেন ও বিজয়, (নলহাটী); সুশান্ত কুমার ঘোষ, (খিদিরপুর); রেবা মুখার্জ্জি, (বালীগঞ্জ); নিখিলেন্দ্র দাস, (করিমগঞ্জ)।

ষান্মাসিক সূচীপত্র

কার্ত্তিক .... চৈত্র ১৩৪১ ।

দূরের আলো

প্রতিযোগিতা

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

রংমশাল দল

রংমশাল বৈঠক

সন্ধানী



শ্রীরবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি-উৎসব

[আলোকচিত্রশিল্পী— শ্রী কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়]

রংমশাল
দ্বিতীয় বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ
১৩৪৫

ঘুম্‌ঘুমাঘুম্, জাগর দেশের কথা

শ্রীসতীকান্ত গুহ

শোনো শোনো খুড়ো, বুড়ো থুত্থুরো এসেছিল গাঁয়ে কোনো,
বলেছিল হেসে, ঘুম্‌ঘুমাঘুম্ দেশের কাহিনী শোনো'।
ঘুম্‌ঘুমাঘুম্ দেশের কাহিনী ? ঘুমে আসে চোখ ঢুলে,'
কথা শুনে যাও, ঘুম্‌ঘুমাঘুম্, হাওয়া এসে কয় ফুলে।

বাঁশরী চড়েছে সোনার ঘোড়ায় চলেছে সোনার নায়
জলে আর থলে বাঁশরী কিশোরী কোথা চলে' যায় যায়।
বাঁশরী কে জানো ? ঘুম্‌ঘুমাঘুম্ দেশের রাজার মেয়ে।
পথ চলে তবু আধেক স্বপন যেন আছে চোখ ছেয়ে,
ঘুমে ঢুলে যায় সোনার ঘোড়াটি, সোনালী নায়ের নেয়ে
'ঘুম্‌ঘুমাঘুম্, আয় ঘুম্ ঘুম্' হাওয়া যায় গান গেয়ে।
ঘুমে ঢুলে যায় দখিণ পবন, ঘুমে ভরে' যায় হাসি,
হঠাৎ ঘুমের গান গেয়ে ওঠে কোন্ রাখালের বাঁশী।

তবু পথ চলে, কেন পথ চলে ? শোনো শোনো খুড়ো শোনো,
জাগর দেশের ঘুম ভাঙা পুরে ছিলেন কিশোর কোনো।

ঘুম্‌ঘুমাঘুম্‌ জাগর দেশের কথা
শ্রীসতীকান্ত গুহ

ঘুম্‌তী নদীর ঘুম ভেঙে যায় জাগর দেশের ধারে,
ঘুম ভোলা আলো সোনা গেঁথে দেয় ঘুম্‌তি নদীর পাড়ে।
জাগর দেশের রাজার কুমার কিশোর বুঝিবা নাম,
ঘুম নেই চোখে বিদ্যুৎ আঁকা দুটি চোখ অভিরাম।
খনে খনে খনে, শুধু জাগরণে, জ্বলে' জ্বলে' ওঠে হাসি,
হঠাৎ জাগার গান গেয়ে ওঠে কোন্‌ রাখালের বাঁশী।

শোনো শোনো খুড়ো, বুড়ো থুথুরো বলছিল কানে কানে
'ঘুমের দেশের মেয়েটি চলেছে জাগর দেশের পানে।'
কত ভোর এলো সোনালী পাখায়, কাজল পরানো রাত,
মেঘে মেঘে মেঘে ঝিলিক রোদের জড়ালো রূপোর পাত।
হলুদবনের টিয়ে উড়ে গেল আকাশে পাখাটি তুলে
জোছ্‌না যামিনী নাম লিখে গেল ফুটে ওঠা ফুলে ফুলে।
চলেছে বাঁশরী, সোনার ঘোড়াটি চেপেছে সোনার নায়,
জাগর দেশের রাজার কুমার জেগে জেগে পথ চায়।

হায়রে কে জানে মাঝখানে ছিল ধূ ধূ ধূ তেপান্তর,
হঠাৎ আকাশে কাল বোশেখের নামল ভীষণ ঝড়।
ঝড়ে উড়ে গেল সোনার ঘোড়াটি ডুবল সোনার তরী,
ঘুম্‌তি নদীর ঘুম ভেঙে গেল থই থই জলে ভরি'।
জাগর দেশটি ডুবলো যেমন, ফুটল চাঁদের হাসি,
থেমে গেল ঝড়। হঠাৎ আবার বাজে রাখালের বাঁশী।
বাঁশরী, কিশোর কোথায় মিলালো ? শোনো শোনো খুড়ো শোনো,
বলছিল বুড়ো সে কাহিনী আছে আরেক দিনের কোনো।

কোথায় বাঁশরী ? কোথায় কিশোর ? ঘুমে আসে চোখ ঢুলে,
তাদের কাহিনী লিখে দিয়ে যাবো আরেক দিনের ফুলে।
সে ফুল ফুটবে, শোনো খুড়ো শোনো, আরেক ফাগুন মাসে,
এখন হাওয়ায় শুধু বোশেখের ধুলোটুকু ভেসে আসে।

——:o:——



শ্রীরণেশচন্দ্র ঘোষ

মনে করো ছোট্ট একটা বেজী।

রোঁয়াওয়ালা বুরুশের মত লেজটা ফুলিয়ে লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতর দিয়ে যখন সে শিকারকে তাড়া করে তখন মুখ দিয়ে তার ভারী মজার আওয়াজ বেরোয় "রিক্, টিক্ টিক্কি টিক্কি টক্"—

তাই আমাদের বেজীর নাম হ'লো রিক্কিটিক্কি। সেদিন বাথ্‌রুমে রিক্কিটিক্কি যে রকম লড়াই করে ছিলো একেবারে একলা সে রকমটি তোমরা কখনো দ্যাখোনি। টুনটুনি আর ছুঁচো ভায়া যে একটু আধটু সাহায্য করেনি তা নয়, তবে যুদ্ধের গৌরবটা রিক্কিটিক্কিরই পাওনা আর কারো নয়।

সে ভারী মজার গল্প। গোড়া থেকেই বলি শোনো:

মাঠের ছোট্ট একটি গর্ত্তে রিক্কিটিক্কি মা বাবার সঙ্গে একটু একটু করে বড়ো হচ্ছিলো, এমনি সময় একদিন—সেটা কী দিন মনে নেই—আচম্‌কা দেখা দিলো ছোটখাট একটা বন্যা—কয়েক দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর। কাজেই রিক্কিটিক্কিদের গর্ত্ত গেলো ভেসে, আর জলের স্রোত ওকে আছ্‌ড়াতে আছ্‌ড়াতে নিয়ে ফেল্‌লো অনেকটা দূরে একটা ড্রেনের ভেতর। ডুব্‌তে ডুব্‌তে বেজী দেখ্‌তে পেলো ছোট্ট একটা ঘাসের আঁটি জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ও ঘাসের আঁটিটা কামড়ে রইলো প্রাণপণে তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেল্‌লো।

জ্ঞান ফিরে এলে রিক্কিটিক্কি দেখ্‌তে পেলো কী করে মস্ত বড়ো একটা বাগানে সে এসে পড়েছে। মাথার উপরে আগুণের মত গরম সূর্য্য।

ওর পাশে ঝুঁকে রয়েছে ছোট্ট একটা ছেলে। ছেলেটা বল্‌ছে, "বেজীটা মরে গেছে। পুড়িয়ে ফেলি মা?"

মা বল্‌লেন, "না, এখনো মরেনি বোধ হয়। নিয়ে চলো তোমার বাবার কাছে।"

ওরা রিক্কিটিক্কিকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলো। বেশী বয়সের এক ভদ্র লোক এসে রিক্কিটিক্কিকে তুলে নিলেন দু' আঙ্গুল দিয়ে, তারপর বললেন, "বেজীটা এখনো মরেনি, একটু যত্ন করলে বেঁচে উঠ্‌বে।"



ছেলেটা বলছে, "বেজীটা মরে গেছে, পুড়িয়ে ফেলি মা?"

রিক্কিটিক্কিকে খানিকটা তুলো দিয়ে ঢেকে দেয়া হ'লো। গরম পেয়ে ও চোখ খুলে তাকালো তারপর হেঁচে ফেল্‌লে। বয়স্ক লোকটি (উনি বড়ো গোছের কী একটা চাকুরি করেন, বাংলোতে নতুন এসেছেন) বল্‌লেন, "বেজীটাকে ভয় পাইয়ে দিয়োনা, দেখা যাক্ ও কী করে।"

কিন্তু উনি জানেন না—বেজীদের ভয় পাওয়ানো হচ্ছে দুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কাজ। ওদের নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা অবধি কৌতূহলে ভর্ত্তি। বেজীদের স্বভাবই হ'লো নতুন কিছু হলেই ছুটে গিয়ে দেখা। রিক্কিটিক্কিও, কাজেই ওর যদি একটু কৌতূহল হয়ে থাকে তবে আমরা কিছু মনে করতে পারিনে।

তুলো গুলোর দিকে তাকিয়ে রিক্কিটিক্কি ঠিক্ করে ফেললো যে ওটা খেতে তেমন সুবিধে হবে না। কাজেই টেবিলের চার পাশে একবার ঘুরে এসে গায়ের লোমগুলো ঠিক্ করে নিলো মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে। তারপর একলাফে খোকার কাঁধে উঠে বস্‌লো।

বাবা বল্‌লেন; "কিছু ভয় নেই খোকা। এমনি করেই ওরা ভাব করে, বুঝলে?"

খোকা বল্‌লো; "বড্ড সুড়সুড়ি লাগ্‌ছে বাবা"। রিক্কিটিক্কি খোকার সার্টের কলারের ভেতরটা একবার দেখে নিয়ে, কানের পেছনে কী শুঁকলো তারপর মাটিতে নেমে পড়ে' নাক ঘস্‌তে লাগলো!

মা বললেন, "ওমা, বেজীটা কি রকম পোষ মেনে গেছে দ্যাখো"। বাবা বল্‌লেন, "বেজী গুলো ঐ রকমই। খাঁচায় পূরে না রাখলে সারাদিন এমনি ঘোরাঘুরি করবে। হ্যাঁ, একে কিছু খেতে দিলে হয়।"

তাই করা হ'লো। বেজীটাকে এক টুক্‌রো রুটি দেয়া হলো। রিক্কিটিক্কির ভারী পছন্দ হলো খাবারটা। রুটিটা খেয়ে ও চলে গেলো বারান্দায়—রোদ পোহাতে। গায়ের লোমগুলো শুকিয়ে নিতে হবে তো।......তারপর রিক্কিটিক্কির শরীরটা একটু ভালো বোধ হ'লো। চারদিক তাকিয়ে ও ভাবলো, 'ওমা, বাড়িটাতে কত সব দেখবার জিনিষ আছে। সব না দেখে আর যাচ্ছিনে।"

ঘুরে ঘুরে রিক্কিটিক্কি সারাদিন কাটিয়ে দিলো। আর একটু হলে তো ডুবেই গিয়েছিলো স্নানের টবে, তারপর লেখ্‌বার টেবিলে উঠে কালীর দোয়াতে নাক দিলো ডুবিয়ে। তারপর কী রকম করে মানুষরা লেখে দেখবার জন্য বাবার কোলে লাফিয়ে উঠ্‌তেই চুরুটের আগুনে নাক পুড়ে গেলো।......এমনি ধারা আরো কত কী!

সন্ধ্যের পর ও খোকার ঘরে চলে গেলো। ওখানে দেখ্‌তে পেলো কী করে কেরাসিনের আলো জ্বালানো হয়। তারপর খোকা যখন ঘুমিয়ে পড়লো তখন উঠে বস্‌লো খাটের উপর। রিক্কিটিক্কি ভারী চঞ্চল।

রাত একটু বেশী হ'লে খোকার মা আর বাবা এলেন ঘরে। রিক্কিটিক্কি তখনো বালিশের উপর জেগে রয়েছে।

মা বললেন, "বেজীটা আবার ওখানে কেন? খোকাকে কামড়ে না দ্যায়।"

বাবা বললেন, "একটা ব্লড্‌হাউণ্ডও বেজীটার মত অত ভালো পাহারা দিতে পারবে না, তা জানো? ধরো যদি সাপ—"মা কথাটা শেষ করতেই দিলেন না। তাড়া দিয়ে বললেন, "ওমা যত সব অলক্ষুণে কথা—"

ভোরে খোকার কাঁধে চড়ে রিক্কিটিক্কি বেরিয়ে এলো বারান্দায়। ওকে কলা আর একটু ডিমের টুক্‌রো দেয়া হ'লো। বেজীটা একবার এর একবার ওর কোলে চড়ে বেড়াতে লাগলো। গর্তে থাকবার সময় রিক্কিটিক্কির মা বলে দিয়েছিলো মানুষদের বাড়ীতে থাক্‌তে হ'লে কি কি করতে হয়। ওর মা আবার ছিলো পুলিশ সায়েবের বাড়িতে।

খাওয়া হলে রিক্কিটিক্কি চলে গেলো বাগানে। ওখানে কী আছে দেখবার জন্য। বাগানটা মস্ত বড়ো। সমস্তটা এখনো পরিষ্কার করা হয়নি। বাগানময় বড়ো বড়ো ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, মরশুমী বিলিতি ফুলের ঝাড় আর লম্বা লম্বা ঘাসের ঝোপ। বাঁশ ঝাড়ও রয়েছে একটা। রিক্কিটিক্কি ঠোঁটটা একবার চেটে নিলো। তাইত, শিকারের বেশ সুবিধে হবে। শিকারের কথা ভাবতেই ওর লেজ ফুলে উঠলো। ও বাগানে ঘুর্ ঘুর্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—এমনি সময় ঝোপওয়ালা একটা লম্বা কাঁটা গাছের ভেতর থেকে ভারী করুণস্বর শুন্‌তে পাওয়া গেলো।

টুনটুনি আর তার বৌ কথা বলছিলো। ওরা তুটো বড়ো বড়ো পাতার ধারগুলো সেলাই করে নিয়ে চমৎকার একটা বাসা তৈরী করেছে। গর্ত্তটা নরম তুলো আর খড় দিয়ে ভর্ত্তি! ওরা তু'জনেই বাসার উপরে বসে রয়েছে—বাসাটা তুল্‌ছে একটু একটু। ওরা কাঁদছে রিক্কিটিক্কি শুন্‌তে পেলো।

"কি গো, কী হয়েছে? রিক্কিটিক্কি জিজ্ঞাসা করলো। টুনটুনি বললো, "আর বলো না ভাই, আমাদের ভারী কষ্ট। কাল আমার একটা বাচ্চা বাসার থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া মাত্র কোত্থেকে পাজী সাপটা খেয়ে ফেললো—" টুনটুনির চোখ ছল্ ছল্ করে উঠলো।

"তাইত" রিক্কিটিক্কি বললো, "বড়ো তুঃখের কথা—হ্যাঁ সাপটা কে? আমি আবার নতুন এসেছি।"

টুনটুনি আর তার বৌ উত্তর না দিয়ে ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে বসে রইলো, ওদের গাছের নীচে একটা ঝোপ থেকে চাপা হিস্-স্ শব্দ শুনতে পাওয়া গেলো। শব্দটা শুনলে বুকের ভেতরটা অবধি ভয়ে হিম হয়ে ওঠে। রিক্কিটিক্কিতো চম্‌কে প্রায় তু'হাত পেছিয়ে গেলো। আর ঘাসের ভেতর থেকে সাপের মাথাটা উঠতে লাগলো—এক ইঞ্চি, এক ইঞ্চি করে। মস্ত বড়ো একটা কালো গোখ্‌রো সাপ প্রায় হাত পাঁচেক লম্বা। সাপটা আস্তে আস্তে তুলতে লাগলো একবার এদিক আর একবার ওদিক—বাতাসে নরম ফুলের গাছগুলো যেমনি করে দোলে। আর বিষমাখানো চোখে তাকিয়ে রইলো বেজীর দিকে। সাপের চোখের ভাব কখনো বদলায় না—ওরা যাই ভাবুক না কেন। তারপর বললো—"সাপটা কে জানতে চাইছিলে, না? আমিই সেই, বুঝলে? কেমন ভয়টা পাচ্ছ এখন?

সাপটা ফণা আরো ছড়িয়ে দিলো। তার পেছনে দেখা গেলো গোল চক্রের দাগ। প্রথমটা রিক্কিটিক্কি একটু ভড়কে গেলো। এর আগে যদিও ও জ্যান্ত গোখ্‌রো সাপ কখনো দেখেনি তবুও প্রথম ধাক্কাটা বেশ সামলে নিলো। ছেলেবেলায় রিক্কিটিক্কির মা যখন ওকে মরা

সাপের টুকরো খেতে দিত তখন থেকেই রিক্কিটিক্কি জানে যে বেজীদের কাজ হলো সাপের সঙ্গে লড়াই করা। কথাটা সাপও জানত, কাজেই ভেতরে ভেতরে তার যে একটু ভয় হচ্ছিলো না তা নয়।

'যাকগে', রিক্কিটিক্কি বললো, "ছোট ছোট পাখির ছানা বাসার থেকে পড়ে গেলে তোমার কী সেটা খাওয়া উচিত হচ্ছে? তুমিই বলো।"

সাপটা নিজের মনে কী ভাবছিলো আর রিক্কিটিক্কির পেছনে ঘাসের নড়াচড়া একমনে দেখছিলো। সাপটা বুঝতে পেরেছিলো যে বাগানে বেজী থাকার মানেই ওদের সর্ব্বনাশ। রিক্কিটিক্কিকে একটু অন্যমনস্ক করবার মৎলবে সাপটা মাথা একটু নামিয়ে দিলো, তারপর একপাশে কাত হয়ে বললো "বেশ, তোমার সঙ্গে তর্কটাই সেরে ফেলা যাক্! তুমি তো ডিম খাও। আমি যদি পাখির ছানা খাই তাতেই বা দোষ কী?"

টুনটুনিবৌ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, "এইয়ো বেজী, সাবধান। পেছনে—"

টুনটুনিবৌ বলবার আগেই রিক্কিটিক্কি বুঝতে পেরেছিলো। ও প্রাণপণে শূন্যে লাফিয়ে ওঠা মাত্র ওর নীচে সোঁ করে বেরিয়ে এলো সাপ-বৌয়ের মাথাটা। রিক্কিটিক্কি যখন কথা বলছিলো তখন সাপ-বৌ চুপি চুপি এসে ওকে শেষ করে দেবার সুযোগ খুঁজছিলো, বেজী শুনতে পেলো ওর নিস্ফল গর্জ্জন—হিস্-স্-স্।

বেজী পড়লো ঠিক ওর পিঠের উপর। বুড়ো বেজী হলে ওর জানা থাকত যে এক কামড়ে পিট ভেঙে দেবার সবচেয়ে সুযোগ হলো এবার। কিন্তু গোখ্‌রো সাপের বিদ্যুতের মত প্রতিঘাতের কথা ভেবে রিক্কিটিক্কি ভয় পেয়ে গেলো। কামড়ে দিলে ঠিক, তবে ততটা জোরে নয়, তারপর একলাফে চলে এলো নাগালের বাইরে।

"পাজী টুনটুনি বৌ" সাপ-বৌ রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বললো। তারপর যতটা পারা যায় উঁচু হয়ে টুনটুনির বাসার দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু গিয়েই বা কী হবে? টুনটুনির বাসা সাপের নাগালের বাইরে।

লেজের উপর বসে রিক্কিটিক্কি রাগে ফুলছিলো আর চারদিকে তাকাচ্ছিলো সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু সাপ আর তার বৌ ঘাসের ভেতর মিলিয়ে গেছে। ওদের পেছনে যেতে রিক্কিটিক্কির সাহস হ'লো না। দু' দুটো সাপকে একলা বাগানো আর এমন কিছু সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই ও চলে এলো ওখান থেকে, তারপর বাংলোর কাছেই বাঁধানো রাস্তার ধারে বসে ভাবতে লাগলো।

তোমরা অনেকে বোধ হয় শুনেছো যে, সাপ-বেজীতে যখন লড়াই হয় তখন সাপ যদি বেজীকে কামড়ে দেয়, তবে বেজী নাকি ছুটে গিয়ে কী একটা গাছের শেকড় খেয়ে আসে; তাই সাপের কামড়ে ওদের কিছু হয় না। আসল ব্যাপার কিন্তু মোটেই তা নয়। জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় শুধু হাত আর পায়ের ক্ষিপ্রতায়।

রিক্কিটিক্কি জানত যে ও নেহাৎ ছোট্ট বেজী, তাই দু'দুটো সাপের চোখে ধূলো দিয়েছে ভাবতেই ওর ভারী স্ফূর্ত্তি হ'লো। নিজের উপর বিশ্বাস গেলো বেড়ে।

এমনি সময় দেখা গেলো খোকা ছুটে আস্‌চে। পিঠ্ চাপ্‌ড়ে দেবে ভেবে বেজী ঠিক্ হয়ে নিলো। খোকা এসে ওকে কোলে তুলে নেবে এমনি সময় খুব কাছেই ধূলোর ভেতর থেকে লম্বা মত কী একটা নড়ে উঠে বললো :

"সাবধান, আমাকে ঘেঁটোনা বলছি।"

বেজী তাকিয়ে দেখতে পেলো একটা মেটে রঙের করাত সাপ কথাটা বল্‌ছে। করাত সাপ গুলো দেখতে ছোট্ট বটে কিন্তু ওদের কামড় গোখ্‌রো সাপের মতই মারাত্মক। ছোট্ট ব'লে সাপগুলো তত নজরে পড়ে না। তাইতে ক্ষতি করে বেশী।

বেজীর চোখ রাগে লাল হয়ে উঠ্‌লো। ও লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেলো সাপটার দিকে আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজতে লাগলো সুবিধে মত কামড়ে ধরবার জায়গা। এমনি সময় করাত সাপটা ছোবল্ দিলো। বেজী চোখের পলকে এক পাশে সরে গেলো। সাপের ধূলো ভরা মাথাটা পড়লো একেবারে বেজীর কাঁধের কাছ ঘেঁসে। এক লাফে সাপটাকে ডিঙিয়ে রিক্কিটিক্কি চলে গেলো ওপাশে।

খোকা চীৎকার জুড়ে দিলো, "দ্যাখো, দ্যাখো, আমাদের বেজীটা একটা সাপকে তাড়া করেছে।"

বেজী শুনতে পেলো, খোকার মা চেঁচিয়ে উঠলেন! বাবা দৌড়ে এলেন মোটা একটা লাঠি হাতে। তিনি আসবার আগেই রিক্কিটিক্কি লাফিয়ে সাপটার পিঠে পড়লো, তারপর সাম্‌নের দু'পায়ের ভেতর সাপের মাথাটা চেপে ধরে পিঠে কামড়ে দিলো। এই কামড়ে সাপটা কেমন অবশ হয়ে পড়লো।

রিক্কিটিক্কিও কাছেই একটা ঝোপের কাছে গিয়ে ধূলোয় গড়াগড়ি খেতে লাগ্‌লো। এদিকে খোকার বাবা এসে সাপটাকে লাঠি দিয়ে থেঁৎলে দিলেন।

"মানুষ গুলো যেন কী রকম" রিক্কিটিক্কি অবাক্ হয়ে ভাবলো, "সাপটাকে তো আমি মেরেই ফেলেছি, লাঠি দিয়ে থেঁৎলে দেবার আর কী দরকার ছিলো?"

[আগামী মাসে সমাপ্য]

রামায়ণ কথা

(যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত)

শ্রীঅসিত কুমার হালদার

ভারতের সেরা রাজা
রাম রাজা ছিল,
বিমাতা কৈকেয়ী তাঁরে
বনে পাঠাইল।
রামে বনে যেতে শেষে
আদেশ করিয়া,
শোকে পিতা দশরথ
গেলেন মরিয়া।
ভরত ভায়ের হাতে
সঁপি' রাজ কাজ
বনবাসে চলিলেন
রাম মহারাজ।
লক্ষণ সীতাদেবী
সাথী হ'ল তাঁর,
নদ নদী মাঠ ঘাট
কত হ'ল পার।
বনে থাকিবার কালে
ভরত আসিয়া,
রামে ফিরাইতে এল
আপনি যাচিয়া,
হতাশ ভরত তবে
পাদুকাটি ল'য়ে,
হেঁট মাথা করি দেশে
নিয়ে গেল বয়ে,
রাম-পাদুকাটি রাখি
রাজার আসনে,
মন দিল রাজ কাজে
বিরস বদনে।

বনের পথেতে রাম
পেয়ে দরশন,
গুহক করিল কত
অশেষ যতন।
গুহকের সাথে রাম
মিতালি করিয়া,
সবাকার মন তিনি
নিলেন হরিয়া,
তের বৎসর পার
হ'ল যেই দিন,
কোথা হ'তে বাহিরিল
সোনার হরিণ।
সীতা তার ছলনায়
বুঝিতে নারিল,
পালিবারে হরিণটি
ধরিতে চাহিল।
রাম হরিণের পিছু
চলিলেন ছুটি, ;
হেনকালে ভিখারী
রাবণ আসে জুটি,
দয়াময়ী সীতা দেবী
ভিখারী দেখিয়া,
কুটীর বাহিরে কিছু
দিলেন আনিয়া।
অমনি জাপটি' ধরি
রাবণ কপট,
রথে তুলি নিয়ে গেল
তাঁরে চট্‌পট্।

রামায়ণ কথা
শ্রীঅসিত কুমার হালদার

জটায়ু রুধিল পথ
ডানার ঝাপটে,
পথ ছেড়ে দিতে হ'ল
রাবণ দাপটে।
রাম, সীতা হারাইয়া
বালী বধ করি,
হনুমান দল লয়ে
মারিবারে অরি,
চলিলেন ধীরে ধীরে
বুকে বল লয়ে,
লক্ষ্মণ সাথী তাঁর
সব দুঃখ সয়ে।
জলে ঘেরা রাবণের
লংকা সোনার,
হনুমান একলাফে
হইলেন পার।
খোঁজ করি অবশেষে
অশোক বনেতে,
সীতারে দেখিল হনু
একটি কোণেতে।
রাগিয়া আগুণ তবে
লেজে জড়াইয়া,
সোনার রাবণপুরী
দিল পোড়াইয়া।
পুনরায় একলাফে
হইয়া সে পার,
রাম কাছে আনিলেন
সীতা সমাচার।
ইট কাঠ পাথরেতে
বাঁধিল সাগর,
রামচর যত ছিল
সেথায় বানর,
বিভাষণ রাবণের
এক ভাই ছিল,
ঘরের খবর সব
রামে আনি' দিল।
অংগদ বানর ছিল
গালি দিল গিয়া,
বলিল রাবণে সীতা
দাও ফিরাইয়া।
শুনিলনা কথা কারু
গরবী রাবণ,
লড়াই রামের সাথে
করি' অকারণ,
সবংশেতে মরিল
অবশেষে তাই,
দেখিলেন রাম আর
কাজ সেথা নাই,
বিভীষণে লংকায়
রাজা করি দিয়া,
সেতুটিরে পুনরায়
দিলেন ভাঙিয়া।
বানরের দল আর
সীতা লয়ে শেষে,
রাম লক্ষ্মণ তবে
ফিরিলেন দেশে।
সব রাজা সেরা সেই
হল রাজা রাম,
যুগ যুগ যশ রটে
অমর সে নাম।

——:০:——

গত মহাযুদ্ধ ও ইউরোপের ছেলেমেয়েরা

(প্রবন্ধ)

শ্রীচিত্রভানু

স্মিথ কলেজের প্রায় দুইশত ছাত্রকে একবার বলা হয়েছিল গত মহাযুদ্ধ ((Great-war) সম্বন্ধে তাদের শৈশব স্মৃতির একটা বিবৃতি লিখতে। নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নে উত্তর তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল :

গত মহাযুদ্ধের কারণ তাদের কাছে কি বলে মনে হত—

যুদ্ধের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদের আছে কি না ?—

জার্ম্মানবাসীদের বা জার্ম্মানপণ্যদ্রব্যের উপর তারা মনে মনে কি ধারণা পোষণ করত ?—

মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন কোন্ ঘটনা তাদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে ?—

ভার্সাই চুক্তির ((Versailles Treaty) সময় ছাত্রদের সকলের বয়স দশ থেকে সতেরো বছরের মধ্যে হবে। প্রশ্ন করবার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই সকলকে লেখা দাখিল করতে হয়েছিল। সুতরাং তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবার বা বাইরের বই থেকে যুদ্ধের কারণ ও বিবরণ সংগ্রহ করবার সময় পায় নি। তাই তাদের বিবৃতি যতদূর সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়।

দুইশত কাগজের মধ্যে দুটি বিষয় সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হচ্ছে শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুহূর্ত্তের উচ্ছ্বাসে 'জয় গৌরবের' আনন্দ উপভোগ করবার তীব্র ইচ্ছা। বিবৃতির কয়েকটি অংশ তুলে দিলে তাদের মনের অবস্থাটি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

একজন লিখেছে : "আমি স্বপ্ন দেখতাম লক্ষ লক্ষ বিকটাকার দানবের দল, শক্ত লালচে দাড়ি, লম্বা লম্বা দাঁত, শুঁড়ওয়ালা পাগড়ি মাথায়, মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সব ভেঙে চুরে ধ্বংস করে দিচ্ছে, আর তার চারিদিকে রয়েছে সারি সারি স্তূপীকৃত রক্তাক্ত মৃত দেহ।"

কেউ লিখেছে : "জার্ম্মানদের আমরা এত ভীষণভাবে ঘৃণা করতাম যে আমাদের শিশুমনে তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমার বেশ মনে আছে আমি একটি চীনা পুতুল

ভেঙে টুকরো টুক্‌রো করে' ফেলেছিলাম, কারণ তার পিছনে লেখা ছিল যে সেটি জার্ম্মানীতে তৈরী। পুতুলটি আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় ছিল।"

"যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন আমার বয়স সাত বছর। আর আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার মা বাবা জার্ম্মানদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করতেন। আমি গল্প শুনতাম যে জার্ম্মান কর্ম্মচারীরা ফরাসী দেশের ও বেলজিয়ামের ছোট ছোট শিশুদের হাত কেটে নেয়।" আমেরিকার একজন বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকের নাত্‌নী লিখেছে : "বিদ্বেষ ও ঘৃণার আগুন আমার মনের মধ্যে ভীষণ ভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হত। আমি জার্ম্মানদের ঘৃণা করতাম এবং যে তাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করছি ও তাদের যন্ত্রণা দিচ্ছি, এই ধরণের নানারকম চিন্তা করেও আনন্দ পেতাম। আমাদের যুদ্ধে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি বলে, উইল্‌সন্-এর (Wilson) উপর আমার রাগ হত এবং খুব ছোট বলে, নিজের উপরেও ঘৃণা হত।"

বিবৃতিগুলির ভিতর থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার জন্যে বাবার চাইতে মায়েরাই বেশী দায়ী। "প্রথম থেকেই মা জার্ম্মানদের ভীষণ ঘৃণা করতেন এবং জার্ম্মানীর তৈরী কোন জিনিষ তিনি ঘরে রাখতেন না বা আনতেও দিতেন না। আমার মনে আছে তাঁর এই বাড়াবাড়ির জন্যে বাবা মাঝে মাঝে খুব রাগ করতেন।"

জার্ম্মান শিশুদের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হত, তাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। অনেক অভিজ্ঞ জার্ম্মান শিক্ষক ও ধাত্রীদের কাজ থেকে পদচ্যুত করা হয়েছিল। কয়েকজন ছাত্রকে এই নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। তাদের সেই সব স্মৃতি সত্যিই খুব করুণ। একজন লিখেছে : "আমাদের মত অমায়িক পরিবার আমেরিকাতে খুব কমই ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ছিল জার্ম্মান নাম। আমাকে সব সময়ই জিজ্ঞাসা করা হত তোমার পিতামহ বা প্রপিতামহ কি জার্ম্মানদেশে জন্মেছিলেন ?' সত্য কথা স্বীকার করাতে আমাকে খুব কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। স্কুলের শিক্ষকরা পর্য্যন্ত আমাকে ডেকে নানারকম অপ্রীতিকর কথা বলতেন এবং আমার সহপাঠিরা দল বেঁধে আমার পিছু পিছু বিদ্রূপ করতে করতে যেত। ছ'বছর আমাকে এই রকম লাঞ্ছনা নির্ব্বিবাদে সইতে হয়েছিল।

অনুদারতা ও গোঁড়ামির দৃষ্টান্তও অনেকগুলি পাওয়া গেছে। একজন ছাত্র লিখেছে : "সে বছর আমরা ইউরোপের ভূগোল পড়ছিলাম স্কুলে। আমাদের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে কাইজারের একখানি ছবি ছিল। আমি পেন্সিল দিয়ে ছবিখানাকে নষ্ট করেছিলাম এবং যে সব পাতায় জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বিবরণ লিখিত ছিল, বড় বড় অক্ষরে সেগুলির উপরে 'হেট

ফুল' কথাটি লিখে রেখেছিলাম। স্কুলের গানের বই থেকে জার্ম্মান গানের পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।"

একজন ছাত্র লিখেছে : "যুদ্ধের সমারোহের দিকটাই আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লাগত। নানা রকম রঙ বেরঙের পতাকা, সৈন্যদের শোভাযাত্রা, হল্লা এবং স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে আবেগময়ী বক্তৃতা——এই সব দেখে ও শুনে আমার মনে হত যেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেশে আমরা বাস করি এবং আমরাই হলাম শ্রেষ্ঠ জাত।"

বাবা ও ভাইদের যুদ্ধে যোগ দিতে হবে এ-কথা ভাবতেও তাদের ভীষণ কষ্ট হত। সকলেই চাইত যে শত্রুদের বিনাশ হোক্, তারাই মরুক, কষ্ট পাক্, কিন্তু তাদের নিজেদের দেশবাসী ভাই ও আত্মীয় স্বজনেরা যেন আরামেই থাকে। কাইজার ও জার্ম্মানদের বিরুদ্ধে ছড়া রচনা ক'রে মহানন্দে সকলে গাইত। চলচ্চিত্রই গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছিল শিশু মনের উপর। অনেকগুলি বিবৃতি থেকে তার জ্বলন্ত উদাহরণ মেলে। আমি একটি বিবৃতি তুলে দিচ্ছি :

"যুদ্ধের অমানুষিক বর্ব্বরতা সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা হয় চলচ্চিত্রে Hearts of Gold' নামে একখানি ছবি দেখে। ছবিতে দেখি জার্ম্মানরা ছোট ছোট হৃষ্ট পুষ্ট সব শিশুদের মেরে ফেলছে, গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে, ঘরবাড়ী লুঠ করে নিচ্ছে। মাঠে মাঠে মৃতদেহের ছড়াছড়ি আর রক্তের বন্যা! এই ছবি দেখার পর ভয়ে আমার রাতে ঘুম পর্য্যন্ত হত না কুৎসিত সব স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠতাম।"

প্রবাসী জার্ম্মান শিশুদের উপর কি রকম ব্যবহার করা হত তারও দৃষ্টান্ত অনেকগুলি পাওয়া গেছে। একজন লিখেছে : "আমরা ছোট্ট একটি জার্ম্মান মেয়েকে জোর করে, একজন জার্ম্মান কর্ম্মচারীর ছবির উপর থুতু ফেলতে বাধ্য করেছিলাম। আমাদের আদেশানুসারে সে দশবার আমেরিকার জাতীয় পতাকাকে নমস্কার করেছিল এবং শেষে আমাদের পায়ের কাছে মাটিতে তার মাথা নুইয়ে আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে আমেরিকান-রা জার্ম্মানদের পূজনীয়।"

যুদ্ধের শেষে শান্তি বৎসরের (armistice celebrations) যে সব বিবরণ পাওয়া গেছে তাকে এক কথায় রুগীর বিকার (delirium) বলা চলে। শিশুরা সব পাগলের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে পথে পথে কাইজারের ছবি পুড়িয়ে এবং জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। *

কোন দেশ যখন যুদ্ধে নিযুক্ত হয় তখন সে দেশের শিশুদের মনের অবস্থা কি রকম হয় তা' ওপরের লেখাগুলি থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

* বিদেশী পত্রিকা হইতে অনূদিত

বন্দিনী চাঁদ

(রূপকথা)

শ্রীবসন্ত কুমার আঢ্য

অনেকদিন আগে আমাদের সেই বুড়ী ঠানদির আমলে বিলাতের কারল্যাণ্ড বলে জায়গাটা ছিল বড় বড় গর্ত্তে ভর্ত্তি এক প্রকাণ্ড জলাভূমি। গর্ত্ত গুলো ভর্ত্তি ছিল কাদা গোলা কালো জলে। তার মাঝে মাঝে সবুজ শ্যাওলাভরা সরু সরু নদী গুলো লিকলিকে গিরগিটির মত কিলবিল করতে করতে বয়ে যেতো আর যেখানে হোক পা ফেল্লেই পেঁকো জল ছিটকে উঠতো। ওঃ-অন্ধকার ঘুট্‌ঘুটে রাতে যাবার মত জায়গাই ছিল বটে!

ঠানদির মুখে শুনেছি তাঁর জন্মাবার অনেকদিন আগে একবার চাঁদ ওখানে ধরা পড়েছিল। ঠানদির মুখে গল্পটা যেমন শুনেছি তেমনই তোমাদের বলছি।

শুক্লপক্ষে সুন্দর চাঁদ যখন আকাশ আলোয় উজ্জ্বল করে দিতো, তখন তার আলোয় লোকে এই বিপদভরা জলাভূমি নিরাপদে পার হতে পারতো বলে, চাঁদকে তারা প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করতো। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাতে জলাভূমি পার হওয়া মুস্কিল হয়ে উঠতো। তাছাড়া ভূত, প্রেত, সাপ গিরগিটি আর জলার অন্যসব ভীষণ জানোয়ার যারা আলোকে ভয় করতো, তারা অন্ধকার রাতে শীকারের খোঁজে জলাভূমি ছেয়ে ফেলতো। অনেক অন্ধকার রাতে কত পথিক যে এদের তাড়ায় পথ ভুলে, চোরাবালি কিম্বা জলভরা গর্ত্তে ডুবে মরতো, নয়তো তাদের কামড়ে প্রাণ দিতো, তার কি আর হিসেব আছে? আঁধার রাতে এরাই জলাভূমিতে একছত্র রাজত্ব করতো।

যে চাঁদ লোককে আলো দেখাবার জন্যে সারারাত জেগে আকাশে পাহারা দেয় তার মন যে ভারী নরম আর দয়ায় ভরা, এ বোধ হয় আর তোমাদের বলে বোঝাতে হবে না। তাই লোকের বিপদের কথা শুনে তার মন কেঁদে উঠলো। সে মনে মনে বল্লে "পৃথিবীতে নেমে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি।" এই ঠিক করে, কৃষ্ণপক্ষের এক অন্ধকার রাতে গায়ে কালো চাদরখানা জড়িয়ে নিয়ে, সোনালী চুলগুলো ঘোমটায় ঢেকে, চাঁদ আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এলো। জলাভূমির কিনারায় দাঁড়িয়ে সে একবার এদিক ওদিক দেখে নিলে। সে দেখলে, যতদূর নজর চলে কাদা জলে ভরা গর্ত্তের পর গর্ত্ত চলে গেছে। আগাছায় ভর্ত্তি জলাভূমির মাঝে মাঝে বটের ঝুড়ি নেমে নেমে জায়গাটা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। কোথাও আলোর ছিটে ফোঁটাও নেই। খালি মাঝে মাঝে গর্ত্তের পেঁকো জলে তারার

ছায়া পড়ে একটু আধটু ঝিক্ মিক্ করছে। কিন্তু যেখানে ঘাসের ওপর সে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে কালো চাদরখানার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো মাটিতে পড়েছিল। দেখেই তাড়াতাড়ি সে চাদরখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলে। চারদিক থেকে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস এসে চাঁদের শরীর পিদীমের শিখার কত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। জলাভূমিতে যে সব সাপ খোপ, ভূত প্রেত, ডাইনী, দানা দত্যি ঘুরে বেড়াতো, চাঁদ তাদের ভয় করতো। তবু পৃথিবীর লোকের উপকার করবার জন্যে চাঁদ ঠিক করলে, ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত দেখতেই হবে।

গরমের দিনে বাতাস যেমন পাতার পর পাতা দুলিয়ে দিয়ে বয়ে যায়, তেমনি নিজের পায়ের আলোয় পথ দেখে, পায়ের পর পা ফেলে ফেলে চাঁদ চললো। চলতে চলতে হঠাৎ সে একটা গর্ত্তের কিনারায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো; ভাগ্যি তারার আলো পড়েছিল গর্ত্তের কাদা গোলা জলের বুকে, তাই চাঁদ বেঁচে গেল। কিন্তু ঝোঁক সামলাবার জন্যে তাকে ঝুলে পড়া একটা বটের ঝুড়ি ধরে ফেলতে হোল। কিন্তু ঝুড়িটা ছিল ডাইনীর মন্তর পড়া। তাই ঝুড়ি চেপে ধরতেই, অন্য ঝুড়ি গুলো হাতকড়ার মত তার নরম কব্জিতে চেপে বসে যেতে লাগলো। হাত ছাড়বার জন্যে সে যতদূর পারলে টানাটানি, ধস্তা ধস্তি করতে লাগলো। হাত তো ছাড়াতে পারলেইনা, উল্টে ফল হোল, সেগুলো ইস্পাতের পাতের মত তার কব্জি কেটে চেপে বসে যেতে লাগলো। কেমন করে নিজেকে মুক্ত করবে ভাবতে ভাবতে, সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। এমন সময় দূর থেকে কার গলার শব্দ তার কানে ভেসে এলো। কে যেন হতাশ হয়ে কাঁদছে, তারই করুণ, ক্ষীণ, স্বর তার কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে তার বুকের ভেতরটা পর্য্যন্ত হিম করে দিলে। আস্তে আস্তে সে শব্দ যেন কাছে আসতে লাগলো। সে বেশ বুঝতে পারলে, কে যেন চলতে চলতে থমকে থেমে, হোঁচট খেয়ে, পিছলে পড়তে পড়তে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। শেষ কালে তারার মিটমিটে আলোয় তার নজরে পড়লো, হতাশায় মলিন, ভয়ে বিবর্ণ শুকনো একখানা মুখ আর বড় বড় জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। সে বুঝতে পারলে, পথ হারিয়ে কোন হতভাগা পথিক মরণের মুখে এগিয়ে আসছে। আরো একটু এসে লোকটা বন্দী চাঁদের দেহের আলো খানিকটা দেখতে পেলে। সেটাকে আশার আলো ভেবে, সে থমকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, সেই দিকেই এগোতে লাগলো। চাঁদ বুঝতে পারলে, তার দেহের আলো লোকটাকে মরণের মুখে টেনে আনছে। লোকটার দুঃখে ব্যাকুল হয়ে, নিজের ওপর রেগে, চাঁদ বাঁধন ছেঁড়বার জন্যে খুব ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। যদিও আর কোন ফল ফললো না, তবু টানাটানিতে

তার সোণালী চুলভরা মাথা থেকে ঘোমটা খসে' পড়লো, আর চোখের পলকে চুলের আলোয় চারদিক খিরখুট্টি হয়ে গেল ; সেই আলো গিয়ে পড়লো গর্ত্তের জলে। জায়গাটা দিনের মত সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

তখন পথ-ভোলা পথিকের আনন্দ দেখে কে ? আলো দেখে ভয়ে ভীষণ জানোয়ারগুলো ছুটে গিয়ে সেঁধোল নিজের নিজের গর্ত্তে, এই দেখে তার যা আহ্লাদ হোলো, তা বলবারই নয়। তখন সে নিজের পথ দেখতে পেলে, আর এত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালালো যে, ভাবতেই পারলে না কি করে হটাৎ চারদিক আলো হয়ে গেল। সে জানতেও পারলে না, যে আলোর জন্যে সে প্রাণে বেঁচে গেল তা' চাঁদের সোণালী চুলের আলো, চাঁদ পড়েছে জলা-ভূমিতে বাঁধা আর তার দেহের আধখানা ডুবে গেছে জলার গর্ত্তে। লোকটাকে বেঁচে যেতে দেখে চাঁদের এত আনন্দ হোল যে, সে খানিকক্ষণের জন্যে নিজের বিপদের কথা ভুলে গেল। কিন্তু লোকটাকে পালাতে দেখে তারও খুব ইচ্ছে হোল, সেও ছোটে লোকটার পেছু পেছু। তার জন্যে সে এত টানাটানি সুরু করে দিলে যে, শেষকালে ক্লান্ত হয়ে বট গাছের গোড়ায় এলিয়ে পড়লো, আর তার পা বসে গেল চোরাবালিতে। তার মাথাটা বুকে লুটিয়ে পড়তেই আবার ঘোমটায় তার মুখ ঢেকে গেল।

হঠাৎ যেমন আলো এসেছিল তেমনি হঠাৎ আলো মিলিয়ে যেতেই গর্ত্ত থেকে জানোয়ার আর গাছের কোটর থেকে ভূত প্রেত ডাইনী গুলো হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এলো। তারপর চাঁদকে ঘিরে কেউ মুখ ভেঙ্গাতে লাগলো, কেউ দিলে তাকে আঁচড়ে আর কতকগুলো কিচ্‌মিচ্ করে তাকে খুব ঠাট্টা করতে লাগলো। চাঁদের আলো তাদের মোটেই সইতো না। চাঁদ ছিল তাদের দুষমন ; তাই তাকে হাতে পেয়ে তারা আহ্লাদে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। উজ্জ্বল চাঁদের হাসির ঘায়ে তাদের কত বদমতলব নষ্ট হয়ে গেছে, কতবার তাদের গিয়ে সেঁধোতে হয়েছে গর্ত্তে, কোটরে। বুড়ী একটা ডাইনী চীৎকার করে বল্লে "মর্ পচে এইবার নরকে। তোর জন্যে কত শীকার আমাদের ফস্‌কে গেছে।"

কতকগুলো ভূতপেত্নী কিচ্‌মিচ্ করে বলে উঠলো "পড়্ ওর ওপর ঝাঁপিয়ে। ওর জন্যেই নিজেদের কোটে নিজেরা যা খুশী তাই করতে পাইনি।" তারপর বেজায় বেতালা গোলমাল সুরু হয়ে গেল। অন্ধকারের কাল পেঁচাগুলো আকাশের আলোর রাণীকে ফাটা বাঁশের মত ক্যাঁড়কেঁড়ে গলায় যা খুশী তাই বলতে লাগলো। আহ্লাদে মেতে তারা চাঁদকে ঘিরে নাচতে লাগলো আর হাসতে লাগলো। তাদের 'হা হা! হো হো! হি হি'র চোটে কালো, নিঝুম আকাশের বুক যেন কাঁপতে লাগলো। বুড়ী একটা ডাইনী হাঁকার ছেড়ে বলে উঠলো "মড়া পোড়ানো আগুনে মার বেটিকে পুড়িয়ে।"

"হা হা! হো হো! হি হি!" করে বাকীগুলো সায় দিলে।

সাপ খোপ, গিরগিটির দল বলে উঠলো "ঘাসের আটি মুখে গুঁজে দিয়ে মার ওকে দম বন্ধ করে। বুনে দে ওর চারদিকে বেড়া জালের ফাঁদ।" মাক'সা গুলো অমনি চাঁদের চারদিকে জাল বুনতে স্মুরু করে দিলে।

সবাইকার গলা ছাপিয়ে ক্যাঁকড়া বিছের পালের গোদা বলে উঠলো "মার দুষমণকে ডুবলে।"

অমনি আরগুলো সায় দিলে 'হা হা! হো হো! হি হি!' করে। এসব মতলব যার মনের মত হোলো না, সে নিজের মত জাহির করতে লাগলো। ফলে লেগে গেল কথা কাটা-কাটি আর তা থেকে শেষে ঝগড়া। হতাশ হয়ে চাঁদ গাছের গোড়ায় লুটিয়ে পড়লো। ভোরের আবছা আলোয় যখন পুব আকাশের ঘোর কাটলো, তখনো তাদের ভেতর চলছিল গোলমাল। তারপর যখন সূর্য্যের আলোর প্রথম ফালি আকাশের বুকে তীর হানলে, তখন তারা ভয় পেয়ে গেল। গোটাকতক গিয়ে সেঁধিয়ে পড়লো গর্ত্তে। বাকী যারা রইলো, তারা চাঁদের আলোটা একদম নিভিয়ে দেবার জন্যে, যা হয় একটা করে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। চাঁদকে তখুনি জলায় গোর দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। সবাই এ মতলবে সায় দিলে।

প্যাঁকাটির মত আঙ্গুল দিয়ে চাঁদকে ধরে তারা গর্ত্তে ডুবিয়ে দিতে লাগলো। তাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে, গোটাকতক ছুটে গিয়ে বড় একখানা পাথর নিয়ে এলো। তারপর সেখানা তুলে চাঁদের মাথায় চাপিয়ে দিলে। তখন ডাইনীটা ছুটো আলেয়াকে ডাক দিতেই দূর থেকে তারা নাচ্‌তে নাচ্‌তে ধেয়ে এলো। ডাইনী তাদের চাঁদের পাহারায় খাড়া করে বলে দিলে, তাকে মাথা চাড়া দিতে দেখলেই যেন তারা সাড়া দিয়ে ওঠে। চাঁদকে গোর দিয়ে, আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে দলবল ছুটলো নিজের নিজের গর্ত্তের দিকে। সুয্যিটাকেও যদি তারা অমনি করে গোর দিতে পারতো! কিন্তু সে তো আর হবার নয়। বিশেষ করে সুয্যি যখন চলে আকাশ পথে, তখন তারা তো কোটরের মধ্যে অজ্ঞান।

হতভাগিনী চাঁদ কাদা ঘোলা জলে ভর্ত্তি গর্ত্তে ডুবে গেল, আর তার মাথায় চাপানো রইলো বিশ মণী পাথরের ভার। অন্ধকারের গর্ভে যে সব বদ মতলব জন্মায়, চাঁদ আর তাদের মারতে পারবে না। যেখানে ওরা চাঁদকে গোর দিয়েছিল, সেখানে কোন চিহ্নই রইলো না। কে জানবে ওখানে আছে চাঁদ?

জলাভূমির চারধারে যে সব ভাল লোক থাকতো, শুক্লপক্ষে চাঁদের আশায়, তারা আকাশ পানে তাকাতে লাগলো। চাঁদের আলোয় তারা রাতে পথ খুঁজে পায়, চাঁদের মত বন্ধু আর তাদের কে আছে? এই চাঁদেরই আলোর তাড়ায় বদ জানোয়ারগুলো পালায় গর্ত্তে। কাজেই তারা ব্যাগে পয়সা ফেলে, টুপিতে খড় গুঁজে, হারানো বন্ধুর খোঁজ করতে লাগলো। কিন্তু সন্ধ্যের আকাশে চাঁদকে দেখা গেল না। যাবে কি করে? চাঁদ যে তখন গর্ত্তে ডোবানো। রাতগুলো অন্ধকার ঘুট্ ঘুটে হয়ে রইলো। আর সুবিধে বুঝে, যত ভীষণ জানোয়ারগুলো গর্ত্ত থেকে দলে দলে বেরিয়ে, জলা ছেয়ে ফেল্লে। তখন কোন লোকের জলা পার হওয়া ভীষণ মুস্কিল হয়ে লঠলো। বন্ধু চাঁদও তাদের ওপর বিমুখ হোল দেখে, ভয়ে তারা বোবা হয়ে গেল। জনকতক "গম পেশা কলের জ্ঞানী বুড়ী'র কাছে জানতে গেল, ব্যাপারখানা কি। বুড়ী অনেকক্ষণ নিজের যাদু-আরসীর দিকে চেয়ে থেকে, কতকগুলো শেকড় সেদ্ধ করলে। তারপর শেকড় সেদ্ধ জলের দিকে চেয়ে, নিজের মনে বিড় বিড় করে কি মন্তর আওড়াতে লাগলো। সে সব কথার মানে বোঝে কার সাধ্যি? শেষে বুড়ী বল্লে "ব্যাপারটা খুবই তাজ্জব বটে। কিন্তু চাঁদের যে কি হোল তাতো বলতে পারছি নে। আচ্ছা, পরে দেখছি আবার ভাল করে। এর মধ্যে তোমরা যদি কোন খবর পাও, আমাকে জানাতে দেরী কোর না।" আগেকার চেয়ে অবাক হয়ে তারা চলে গেল। কিন্তু পরেও যখন চাঁদকে পাওয়া গেল না, তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা অনেক কথা বলাবলি করতে লাগলো। চাঁদের কি হোল, এই হোল তাদের একমাত্র কথা। ঘরে, পথের ধারে বেঞ্চে, কারখানায়, সরাইখানায়, সব জায়গায় আর কোন কথাই রইলো না, চাঁদ হারিয়ে গেল, কি চুরি গেল, কি কেউ ভুলিয়ে কোনদিকে নিয়ে গেল, এতে যে লোকে অবাক হয়ে যাবে, তাতে অবাক হবার আর কি আছে?

একদিন হোল কি, জলাভূমির ওপারে একটা সরাইখানায়, একটা লোক বসে পাইপ টান্‌তে টান্‌তে শুনছিল লোকগুলোর জটলা। হঠাৎ সে খাড়া হয়ে বসে, হাঁটু চাপড়ে বলে উঠলো "এইবার বুঝেছি চাঁদ কোথায় আছে।" তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই লোকটাকেই সে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছিল। সে তখন সব কথা খুলে বল্লে। শুনে সবাই তাড়াতাড়ি জ্ঞানী বুড়ীকে গিয়ে সব কথা জানালে। বুড়ী আরসী আর জলের বাটির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে পাকা শোণের মত চুল ভরা মাথাটি নেড়ে বল্লে "বাবা, সবই তো দেখছি অন্ধকার। চাঁদ যখন আকাশে নেই, তখন কি করে বলি তার কি হোল? আর সে গেলই বা কোথায়? তবে যা বলছি তা যদি শোন, তাহলে হয়তো তাকে খুঁজে

পেলেও পেতে পারো। জানোয়ারগুলো গর্ত্ত থেকে বেরোবার আগেই, প্রত্যেকে মুখে একটা করে নুড়ী পাথর নিয়ে, আর ডাইনী তাড়ানো হেজেল ডাল হাতে নিয়ে, নির্ভয়ে চলে যাও জলায়। কিন্তু যদি জানের মায়া থাকে মুখটি খুলো না। যতক্ষণ না একটা কবর দেখতে পাও, যার ওপর একটা ক্রশ চিহ্ন আঁকা আছে আর আছে একটা জ্বলন্ত বাতি, ততক্ষণ সোজা হাঁটবে। যদি বরাত তোমাদের ভাল হয়, তা হলে মনে তো হচ্ছে, সেখানেই পাবে তোমাদের চাঁদকে।"

পরদিন রাতের আঁধার পৃথিবীর বুকে নামতে যেমন সুরু করেছে, অমনি প্রত্যেকে মুখে একটা করে পাথর পূরে, আর হাতে একটা করে হেজেল ডাল নিয়ে, সবাই দল বেঁধে জলার দিকে চল্‌লো। যদিও কেউ কথাটি বলছিল না, তবু সবাই ভয়ে শিউরে শিউরে উঠছিল। পেঁকো জলে ভরা গর্ত্ত, আগাছা, বটের ঝুড়ি ছাড়া কিছুই তাদের নজরে পড়লো না। কাদের ফিস্ ফিস্ শব্দ তাদের কান ঘেঁসে বাতাসের সঙ্গে ভেসে যেতে লাগলো। কাদের স্যাঁত্ সেঁতে হাত তাদের হাতের হেজেল ডালগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে তাদের নজরে পড়লো, দেখতে ঠিক কবরের মত বড় কাল একখানা পাথর; তার ওপর ঝুলে পড়া বটের ঝুড়িগুলো ক্রশের মত দেখাচ্ছিল আর পাথরের ওপর কিসের একটা আলো মিট্ মিটে বাতির মত জ্বলছিল। দেখেই সবাই বুঝলে বুড়ী যা' বলেছিল তাই ঠিক। প্রিয় বন্ধু চাঁদ তাদের খুব কাছেই কোথাও আছে। তারা কাদায় হাঁটু গেড়ে, একবার ভূত প্রেত, ডাইনীর ভয়ে পেছুদিক হেলে, আর একবার চাঁদকে পাবার আশায় পেছুদিকে হেলে, ভগবানকে মনে মনে ডাকতে লাগলো, কারণ মুখ খুলতে বুড়ীর বারণ ছিল, আর মুখ খুল্লে কি বিপদ যে ঘটবে, তা তারা কেউ ভোলেনি। তারপর উঠে, তারা পাথরখানা তোলবার জন্যে ছুঁতেই সেখানা আপনি ঠেলে উঠে পড়লো। ঠান্‌দির মুখে শুনেছি, চকিতের মত তাদের চোখে পড়লো, পৃথিবীর সেরা সুন্দর একখানা মুখ আর মুক্তির আশায় ব্যাকুল দুটি উজ্জ্বল চোখ—কিসের মত? ঠান্‌দি কি বলেছিল ভুলে গেছি—কৃতজ্ঞতায় ভরা জলার গর্ত্তের মত কিম্বা ভালবাসার সায়রের মত টু'চামচ জলের মত দুটি চোখ। তবে পাথরখানা উল্টে দিতেই ঠিক এমনি একটা কিছু ঘটেছিল। চাঁদ খুব তাড়াতাড়ি বলেছিল, "ধন্যবাদ, সাহসী ছেলেরা আমার! তোমাদের উপকার আমি কোনদিন ভুলবো না!" তারপর ঘোলা জলের কবর থেকে একলাফে চাঁদ উঠে গেল আকাশের কোলে! চারিদিক আলোর হেসে উঠলো দেখে তারা থ' হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে জলা দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল। একবার কোটরে কোটরে সড় সড়, হিস্ হিস্ শব্দ উঠলো। তারপর সব চুপ হয়ে গেল। আহ্লাদে আটখানা হয়ে লোকগুলো আকাশ পানে তাকিয়ে দেখলে, চাঁদ আলোর সাগরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে

তাদের পানে হাসি ভরা চোখে চাইছে। তাদের বাড়ী ফেরবার রাস্তা দেখাবার জন্যে, চাঁদ আকাশে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। তারা অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে যে, জলার কোথাও দুষমনগুলোর চিহ্ন মাত্র নেই। হয়েছিল কি জানো? অনেকদিন গোরে থেকে যে তেজ চাঁদের ভেতর জমে উঠেছিল হঠাৎ তার তেজ সইতে না পেরে জলার দুষমনগুলো তখন পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছিল। *

* বেতারের ছোটদের আসরে পঠিত।

বক মহাশয়

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ

বক মহাশয় বসে আছেন চুপটি ক'রে জলের ধারে ;—
যেন কারো 'ভালো-মন্দে' থাকেন নাকো এ-সংসারে!
নিরীহ আর ভদ্র এমন যায়না পাওয়া কোথাও খুঁজে,
ভগবানের নামটি যেন ক'র্‌ছেন জপ চক্ষু বুজে!

কিন্তু যেমন নড়্‌লো জলে মৌরলা কি খল্‌সে, পুঁটি,
অম্‌নি তিনি মার্‌লেন 'ছোঁ' বাড়িয়ে সরু লম্বা টুঁটি!......
লক্ষ্য কভু ব্যর্থ কি হয়?...মাছের বাছা মোক্ষ পায়,
এক নিমিষেই বক মহাশয় পেট-স্বরগে পাঠান তায়।
তারপরেতেই আবার বসেন আগের মতন চুপটি করে,—
যেন কিছুই জানেন নাকো,...কর্‌ছেন জপ ভক্তিভরে!

"মানুষ-বক"ও এই জগতে খুঁজ্‌লে তুমি অনেক পাবে,
বাইরে ভালো, মনে ভাবেন কখন কাহার মুণ্ড খাবে!
তাদের থেকে যতদূরে থাক্‌তে পারো, ততই ভালো ;
নইলে ভীষণ ঠক্‌তে হবে, ঘিরবে তোমায় আঁধার কালো!

'বারটি' দেখে 'ভেতর' কারো যায়না চেনা,—স্মরণ রেখো ;
'বকের ধারা' তোমায় যেন পায়না কভু,—সেইটি দেখো!

——:o:——

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

শ্রীহেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয়

শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী দেবী

আজ যে মহাত্মার বিষয় আলোচনা করিতে প্রয়াসী হয়েছি, তাঁর নাম সকলের পরিচিত। অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয়কে যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে জানিতেন না তাঁহাদের অনেকেরই পিতা এমন কি পিতামহ পর্য্যন্ত তাঁহার ছাত্র। সারা বাঙ্গালা দেশে এমন শিক্ষিত পরিবার বোধ হয় নাই যেখানে তাঁহার ছাত্র বা ছাত্রস্থানীয় কেহ নাই।

অধ্যক্ষ মৈত্রেয় মহাশয় যেমন ধার্ম্মিক ও পূতচরিত্র তেমনি সত্যনিষ্ঠ ও মহাপ্রাণও ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় চাঁদ মোহন মৈত্রেয় মহাশয় ও তাঁহার জননী অতি ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। হেরম্ব চন্দ্র শিশুকাল হইতেই তাঁহাদের ভালবাসিতেন ও আমরণ সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেন।

শিশুকালে তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে মাতার নিকট শয়ন করিতেন; প্রত্যুষে পক্ষীগণ কলবর করিতে থাকিলে মাতা বলিতেন "শোন, পক্ষীগণ বলিতেছে—"জগদীশ্বর জগদীশ্বর!" তিনিও কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতেন এবং নিজেও জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিতেন। মায়ের এই কথা যখন তিনি বর্ণনা করিতেন তখন তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইত।

তাঁহার মাতাপিতা অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন গরীব দুঃখীকে তাঁহারা নানা প্রকারে সর্ব্বদা সাহায্য করিতেন; তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া হেরম্ব চন্দ্রও দীন দরিদ্রকে দয়া করিতে শিখিয়াছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় পাঠে তাঁহার খুব মনোযোগ ছিল। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইংরাজিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনিও এম, এ পরীক্ষায় ইংরাজিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ পদক লাভ করিয়াছিলেন; ইংরাজি সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর উপাধি দিয়াছিলেন; বাঙ্গালা ভাষায়ও তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল, তিনি এমন সুললিত

ভাষায় উপাসনা ও বক্তৃতাদি করিতেন যে তাঁহার কথা শ্রোতার প্রাণ স্পর্শ করিত। তিনি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন ; নিজের ধর্ম্মে তাঁহার নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল সেইজন্যই অপরের ধর্ম্মকে ও তিনি উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনন্ত আকাশ, সুশীতল জল, নির্ম্মল বায়ু ও সুগন্ধি পুষ্প—সকল বস্তুতেই তিনি উপাস্য দেবতার প্রকাশ সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করিতেন।

শিশুদিগের প্রতি তাঁহার অপূর্ব্ব ভালবাসা ছিল। অতবড় পদস্থ ব্যক্তি হইয়াও কিরূপ সহজ ও সরলভাবে তাহাদের সহিত তিনি মিলিত হইতে পারিতেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর ছিল।

তিনি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ক্লাসে যখন পড়াইতেন তখন ছাত্রদিগের কোনওরূপ অমনোযোগ ও অশিষ্টতা দেখিলে বিরক্ত হইতেন ; কিন্তু ক্লাসের বাহিরে আসিয়া তাহাদের অভাব অসুস্থতা ও দৈন্য এই সকল লক্ষ্য করিতেন এবং তাহাদের দুঃখ যথা সম্ভব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

পরশ্রীকাতরতা হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। অনেক সময় বলিতেন "রাজপথ দিয়া যাইবার সময় দুই পার্শ্বে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলে ও বন্ধু বান্ধবের পদ বৃদ্ধির সংবাদ শুনিলে বড়ই আনন্দ হয় ; কেবলি প্রার্থনা করি, সকলের সুখ সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলুক।"

তাঁহার অসুখের মধ্যে কেহ দেখিতে গেলে অথবা সামান্য সেবা করিলে তিনি এমন ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন যে সে ব্যক্তি লজ্জিত না হইয়া পারিত না। বন্ধু বান্ধবের প্রীতি ভালবাসা ও কনিষ্ঠ দিগের শ্রদ্ধা ভক্তির মধ্যে প্রেমের আভাষ দেখিয়া তিনি ভক্তিতে আপ্লুত হইতেন।

মিথ্যা তিনি বলিতে জানিতেন না। সত্যে তিনি হিমালয়ের ন্যায় অটল ছিলেন। প্রার্থনায় তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন ; অন্য উপায় না থাকিলে শুধু প্রার্থনা দ্বারাই অপরের উপকার করা যায় একথা তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন। দেশ ও বিদেশের পরিচিত ও অপরিচিত অসংখ্য নরনারীর জন্য তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনার ফলেই বর্ত্তমান লেখিকা দুইবার মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

আজ তিনি ইহলোকে নাই ; কিন্তু তাঁহার পবিত্র জীবনের আদর্শ তোমাদের নিকট সর্ব্বদা উজ্জ্বল হইয়া থাকুক এই প্রার্থনা করি।



কয়েকটি দিন

লেখক ও আলোকচিত্র শিল্পী—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সকালে একটুখানি যে ঘুমুবো তা'র কি জো আছে ? পাশের বাড়ীর ছেলেটা প্রাণপণে চীৎকার করে চলেছে, "অস্তি নর্ম্মদা তীরে বিশাল শল্মলী······এ্যাঁ এ্যাঁ······মাগো, বড্ড খিদে পেয়েছে······এ্যাঁ এ্যাঁ······অস্তি অস্তি শল্মলী·········"

নাঃ ; পাশ ফিরে শোবার লোভ সামলে উঠে পড়লুম। কি অদ্ভুত হাওয়া আসছে : আজ কত বন কত প্রান্তর পার হয়ে, দক্ষিণ সমুদ্রের টাটকা বাতাস, যেখানে শাদা কেশর তুলিয়ে একটার পর একটা ঢেউ বেলাভূমির ওপর আছড়ে পড়ছে, আর··· ····

আরে, বন্ধু এই সকালেই এখানে এসে হাজির !

ঈষ্টারের কয়েকদিন ছুটী পাওয়া গেছে। এই কটা দিন, বন্ধু বল্‌লেন, শান্তিনিকেতনে যাওয়াই ঠিক করা হয়েছে ; আমাকেও যেতে হবে।

একসঙ্গে বসে চা খেতে খেতে সব ঠিক হয়ে গেলো, আমরা কে-কে যাচ্ছি, কোন্ ট্রেণে যা'বো, কি-কি নেওয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি : পাশের জান্‌লা দিয়ে, হৈ হৈ করে হাওয়া ছুটে আসছে, ইঁটের পাঁজা-বারকরা বাড়ীর ভেতর থেকে ঘাড়-ছাঁটা নারকেল গাছটা খুশীতে বেজায় দুলছে। সমুদ্রের আহ্বানে সেও বুঝি আজ মর্ম্মরে আর গানে মুখর হয়ে উঠেছে !

দেশ-বিদেশে খুব কম ঘুরিনি। তবু আজও ছুটীর দিনে কোথাও যা'বার কথা ভাবলে সত্যিই রোমাঞ্চ হয় ; অদ্ভুত ! সমস্ত মনে যেন ছায়া নামে প্রথম আষাঢ়ের আকাশের আর ঝিলমিল্ করে ওঠে নতুন আলোর, প্রান্তরের আর বনানীর আহ্বান।

সন্ধ্যের দিকে ষ্টেশনে এলুম সেই, ব্যস্ত মানুষের ভীড় : কুলিগুলো ছুটোছুটি করছে, এক বাঙালী ভদ্রলোক ছেলেপিলে স্ত্রী ও মোটমাট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—কা'কে ছেড়ে কাকে

তিনি সামলাবেন। ষ্টেশানে এলেই কি রকম যেন অদ্ভুত লাগে, অদ্ভুত একটা ব্যস্ততায় সমস্ত মন ছেয়ে যায়, আমরা যেন অন্যমত মানুষ হয়ে উঠি!

ট্রেণে উঠে দেখি বুদ্ধদেব বাবু আসেন নি। খবর পাঠিয়েছেন দিন দুই পরে তিনি আসবেন। আমরা ক'জনে কিছু ক্ষুণ্ণ হলুম। ট্রেণ ছেড়ে দিল সেই পরিচিত ছন্দ, সেই পরিচিত দোলা। আজ পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় সমস্ত মাঠ আর আকাশ আর গাছের চুড়োগুলো ছেয়ে গেছে; তারাদের জ্যোঃতি আজ নিষ্প্রভ। মাঝে মাঝে চকিত অল্প জলা জায়গাগুলো হীরে ছড়ানো দেহ নিয়ে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। অল্প অল্প জল টুকরো টুকরো আকাশকে যেন পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে, টুকরো টুকরো আকাশকে তারা বন্দী করেছে! গ্রীষ্মের রাত্রি, পাশের জানলা দিয়ে হু-হু হাওয়া ছুটে আসছে, আর ট্রেণটা জ্যোৎস্নায় চিকচিক লাইনের ওপর দিয়ে চলেছে ছুটে।

রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় বোলপুর ষ্টেশানে আমরা নামলুম। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে ষ্টেশনে সস্ত্রীক এক ভদ্রলোক এসেছেন। শান্তিনিকেতনেরই বাস্ আমাদের জন্যে করছে অপেক্ষা। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল, ভারি অমায়িক সুন্দর লোক তাঁরা। প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় গেষ্ট হাউসে পৌছুলুম। ইলেকট্রিক আলো এখুনি নিভে যাবে। এখানকার এই নিয়ম। ভদ্রলোকরা বিদায় নিলেন রাত্রির জন্যে; দোতলার ছাতে আর বারান্দায় হোল্‌ড্‌ অল্ খুলে, বিছানা বিছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। কাল এখানে নববর্ষের উৎসব, সকালে উঠতে হবে। এখনও এ জায়গাটাকে আমরা দেখিনি, অন্ধকারে আর জ্যোৎস্নায় মাখামাখি, কোনও স্পষ্ট ধারণা হয় না।

খুব সকালে ঘুম ভাঙলো। এখনও অন্ধকার আশ্রমের ছেলেমেয়েরা বৈতালিক গান গেয়ে চলে গেল। ক্রমশঃ আলো ফুটে উঠতে লাগল। এখানকার লাল পথ আর গাছপালা আর কুটীরগুলি হয়ে উঠল স্পষ্ট। এখুনি আমাদের উপাসনা মন্দিরে যেতে হবে; কবি আজ নববর্ষকে কথায় আর ছন্দে আর গানে করবেন অভিনন্দন।······বাসন্তী রঙের উড়ুনি আর শাড়ি আর জামা জড়িয়ে এখানকার ছেলেমেয়েরা একে একে উপাসনা মন্দিরে চলেছে: বাসন্তী রঙ উৎসবের চিহ্ন। ছোট্ট একটুখানি মাঠ পেরিয়ে পরিষ্কার একবারে উপাসনা মন্দিরের মেঝেয় আমরা বসে পড়লুম। খানিক বাদেই কবি মোটর থেকে নামলেন শরতের হালকা মেঘের মত তাঁর হালকা চুল ধবধবে দাড়ি, টকটকে রঙ গরদের ধুতি আর চাদরে অপূর্ব্ব সুন্দর দেখাচ্ছে সবাই আমরা দাঁড়িয়ে উঠলুম।

কতকগুলি গান হল, মেয়েরা গাইলে এস্‌রাজের সঙ্গে ; কবি বেদ আর উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করলেন। পরে তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ কোথায়। পশুকে শিখতে হয় না কিছুই ; তারা জন্মায়, তারা বড় হয় শুধু দেহে। যে হল উই সে চিরকাল উই হয়েই রইল, মাটির দানা জড় করে তৈরা করল তাদের ঘর বাড়ী। উই হয়েই তা'রা জন্মায়, উই হয়েই তারা মরে---এর বেশী নয়। কিন্তু মানুষ জন্মায়, ছোট থেকে হয় বড়, কত কিছু তা'রা শেখে, তারা বদলায়, তারা আশ্চর্য্য। মরে ও তারা মরে না ; মানুষের মৃত্যু নেই! তিনি বললেন এই জীবনের পরের জীবনের সব কথা, যার শেষ নেই, যা চির নবীন যা উজ্জ্বল। মানুষ সেই অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছে। তাঁর অপূর্ব্ব কণ্ঠে তিনি আবৃত্তি করলেন, অন্ধকার থেকে আমায় আলোয় নিয়ে যাও, তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ।

পঁচিশে বৈশাখ কবির জন্মদিন। কিন্তু জন্মদিনের উৎসব এবার থেকে পয়লা বৈশাখে হবে বলেই তিনি স্থির করছেন। পয়লা বৈশাখ কবির জন্মদিন না হলেও শুভ দিন বলে, এবার থেকে ঐ দিনেই কবির জন্মোৎসব হবে।

খানিক বাদেই আমরা কাছের আম্র কুঞ্জে জড় হলুম। মাঝখানে মাটির বেদী, আসন পাতা তার ওপর। পরিষ্কার তক্‌তকে মাটির ওপর সুন্দর আল্‌পনা দেওয়া হয়েছে। কবি এসে বেদীতে বসলেন ; বাসন্তী রঙের উড়ুনি আর শাড়ী আর জামা জড়িয়ে আশ্রমের ছেলেরা আর মেয়েরা আম্র কুঞ্জে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে! এক একটি বেদ মন্ত্র প'ড়ে কবিকে অভিনন্দন করা হল, করা হল তাঁর দীর্ঘ জীবনের কামনা। অনেকে অনেক জিনিষ তাঁকে উপহার দিলেন। তিনি প্রাচীন যুগের ঋষির মত সৌম্য স্মিত মুখে হাত তুলে সবাইকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তারপর ছেলেরা আর মেয়েরা একসঙ্গে গান গাইল ; তা'দের সহজ সুস্থ গলায় সকালের প্রকৃতি উঠল ভরে ; আমগাছগুলোও মুখর হয়ে উঠল।

গেষ্ট হাউসে চা খেয়ে ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে আমরা বেরুলুম। কবি তাঁর ওপরেই আমাদের সামাজিকতার ভার দিয়েছেন। আজ বছরের প্রথম দিনে এখানকার সবাই একটি আমগাছের তলায় জড় হয়ে ফলাহার করে। আমরাও বাদ গেলুম না।

সেখান থেকে চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে সব কিছু দেখতে লাগলুম। ছেলেদের আজ ছুটি ; গাছের তলায় বসে তা'দের ক্লাস করতে হয়। পাকা বাড়ী থাকলেও খড়ের আর মাটির বাড়ীর অভাব নেই। পথ-ঘাট বাঁধানো, মাঝে মাঝে বাড়ী, মাঝে মাঝে মাঠ, মাঝে মাঝে গাছের জটলা।

শান্তিনিকেতন ঠিক গ্রাম নয়, ঠিক সহরও নয়। এই দুয়ের অপূর্ব্ব মিশ্রণ এখানে দেখতে পাই। কাঁচা পথ নয়, ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ী নয়। দিগন্তে বিস্তীর্ণ খোলা উঁচু নীচু মাঠ। মাটির বাড়ীগুলি ভারি সুন্দর ; অথচ তা'দের ভেতর দৈন্য নেই। এখানে গাছের তলায় ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে বসে লেখাপড়া করে। ছেলেরা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে, মেয়েরা আল্‌পনা দেয়। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য এখানে সবাই চায় ; কাজ করার ভেতর যে গৌরব আছে সে শিক্ষাই দেওয়া হয় এখানে। আমরা যে জগতের কারুর চেয়ে ছোট নই, আমাদের বৈশিষ্ট্য নিয়েও যে আমরা সুন্দর, আমাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়েও যে আমরা অন্য সকলের সঙ্গে পা মিশিয়ে হাঁটতে পারি, সে শিক্ষাই দেওয়া হয় এখানে, যা প্রাচীন তাই যে অবহেলার জিনিষ নয়, আর যা নতুন তাই যে ভালো নয়, সে শিক্ষাই এখানে সবাই পায়।

এখানকার কলা-ভবন বেশ সুন্দর। বাইরে জুতো খুলে ঢুকতে হয়। সামনেই প্রকাণ্ড একটা কালো ঘণ্টা। অনেক সুন্দর ছবি আমরা দেখলুম, অজন্তার প্রাচীর চিত্র থেকে আধুনিক ছবি পর্য্যন্ত। দেখলুম বড় বড় কাঁচের আলমারিতে নানা দেশ থেকে পাওয়া কবির বিচিত্র উপহারগুলি। বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসু ছাত্রদের এখানে শিক্ষা দেন ; খোলা জানলার পাশে মাদুরে বসে, কাঠের উঁচু ডেস্কের ওপর ছেলেরা আর মেয়েরা আঁকে, পাশেই থাকে মাটির জল-পাত্র। আঁকতে আঁকতে শ্রান্ত হয়ে চকিতে একবার বাইরে চাইলেই দিগন্ত প্রসারিত মাটির তরঙ্গকে আকাশের মধ্যে অদৃশ্য হতে দেখা যায়।

নতুন একটি বিরাট বাড়ী এখানে সবে হয়েছে, সেটি চীনা ভবন। চীন-দেশের অনেক প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এখানে সযত্নে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে প্রতীচ্য দেশ চীন যে সভ্যতায় আর জ্ঞানে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে বড়, সে সম্মান তাদের দেখানো হয়েছে এখানে। এখানকার লাইব্রেরিটিও নাকি দেখার মত। কিন্তু নববর্ষের জন্যে আজ বন্ধ।

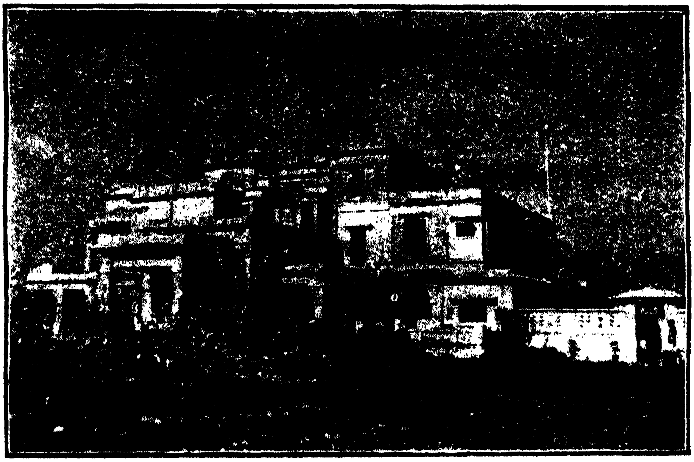
রোদের তেজ তীব্র হয়ে উঠছে। গেষ্ট হাউসে ফিরে স্নান সেরে নিয়ে আমরা সুরুলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম।

লাল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে বাসটা আমাদের নিয়ে যাত্রা করল। শান্তিনিকেতনের ছড়ানো সুন্দর বাড়ীগুলি ছবির মত দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝে সবুজ গাছের জটলা। পথে ক্ষিতীশবাবু দেখালেন কবির সেই গাছের ওপর বিখ্যাত বাড়ী, যেখানে বসে তিনি অনেক সুন্দর কবিতা রচনা করেছেন। সেটি কিন্তু গাছের ওপর নয়, দোতলা ছোট একটি বাড়ী, গা ঘেঁষে তা'র বড় একটা গাছ। প্রথমে নাকি এ বাড়ীর একতলাটা ছিল না ; খুঁটির ওপর ছিল শুধু দোতলার অংশ। তাই গাছের ওপরের বাড়ী বলেইএটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

কয়েকটি দিন

শ্রীকামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সুরুলে আমরা পৌঁছুলুম। ভয়ানক রোদ; ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। আমরা এখানকার কারখানায় গেলুম শুধু। অনেক রকমের সুন্দর জিনিষ এখানে পাওয়া যায়; বেড্-কাভার, শাড়ী, টেবিল ক্লথ থেকে চামড়ার জুতো আর ব্যাগ পর্য্যন্ত। জিনিষগুলো সত্যিই ভারি সুন্দর। দেখলে কেনবার লোভ সামলানো যায় না।



উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন

সেদিন বিকেলেই কবির সঙ্গে দেখা করতে আমরা ক'জনে গেলুম। রাজপ্রাসাদের মত বিরাট তাঁ'র বাড়ী—'উত্তরায়ণ'। গেট থেকে কাঁকর ছড়ানো অনেকখানি পথ। আমরা কিন্তু বড় বাড়ীটায় গেলুম না; কবি বেশীর ভাগ সময় তাঁ'র ছোট মাটির বাড়ী 'শ্যামলীতেই' কাটান, এখন তিনি সেখানেই।—ছোট্ট একটুখানি একতলা বাড়ী এই শ্যামলী, বাড়ীর ঈষৎ উঁচু তক্তকে পরিষ্কার মাটীর প্রাঙ্গণের বাঁ দিকে টগরের একটা গাছ, অজস্র হল্‌দে ফুল ঝরে পড়েছে একধারে। অন্য দিকে আমাদের জন্যে ছোট ছোট মোড়া পাতা।

সে সময়টা সত্যিই অদ্ভুত এক চাপা উত্তেজনায় কি রকম লাগছিল! যেন কোনও রূপকথার রাজার সঙ্গে এসেছি দেখা করতে, বিচিত্র যাদুতে ভরা যা'র বুলি, যার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে অদ্ভুত সুন্দর সব ছবি ফুটে ওঠে আকাশে: সেই কথার জাদুকর, সেই রূপকথার রাজার প্রাঙ্গনে আমরা জড় হয়েছি—আর আকাশে নম্র হয়ে সন্ধ্যা নামছে, টগরের সুগন্ধে বাতাস বুঝি মন্থর, আর শুকনো পৃথিবী থেকে একটা মৃদু গরম বাষ্প উঠছে আকাশে।

পাশের দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে কবি প্রাঙ্গনে এসে বেতের চেয়ারে বসলেন। তাঁর কাশফুলের মত শাদা হাল্‌কা দাড়ি আর চুল মৃদু সুরভিত বাতাসে দুলছে। আমরা সশ্রদ্ধ ভাবে উঠে দাঁড়ালুম, হেসে তিনি বললেন, "আরে বোস বোস তোমরা। তোমাদের কোনও অসুবিধে হয় নি তো? আমি নিজে তোমাদের দেখাশুনো করতে পারছি না।"

একে একে আমাদের সবাইকার সঙ্গে ক্ষিতীশবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা প্রণাম করলুম। স্মিত হেসে কবি বল্‌লেন, "দেখো ক্ষিতীশ, এঁরা সব সাহিত্যিক—ভারি সেন্টিমেণ্ট্যাল লোক; আদর-যত্নের যেন না ত্রুটি হয়।" তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "ঘুম হয়েছিল তো তোমাদের?...তোমরা এসেছো এক খারাপ সময়ে। গরমে হয়তো কষ্ট হবে কিন্তু সে দোষ আমার নয়, আকাশের।"

সমরবাবু বল্‌লেন, "আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি, তবে রাত্রে কোকিলের ডাকে ঘুম হওয়া মুশকিল।"

উত্তরে তিনি বল্‌লেন, "কোকিলের ডাকে কি আর কবিদের ঘুম হয় বাপু? আমাদের এখন মাঝে মাঝে ঘুম হয় না বটে, তা' কোকিলের ডাকে নয়, মশার কামড়ে।"

আমরা সবাই প্রচুর হাস্‌লুম। প্রতি কথাতেই আমাদের তিনি হাসিয়েছিলেন; এই শ্বেত ঢেউএর ফেনার মত হাল্‌কা চুল আর দাড়ির নীচে যে চির নবীন মানুষটি লুকিয়ে আছে প্রতি কথাতেই পেয়েছিলুম তা'র পরিচয়।

আরও খানিক তাঁর সঙ্গে নানা কথা বলার পর বিদায় নিলুম। সেই দীর্ঘ লাল কাঁকর-ছড়ানো পথ দিয়ে ফিরে' চল্‌লুম আমরা; বাঁ-দিকের পাঁশুটে আকাশে সবে মন্থর হয়ে চাঁদ উঠেছে, কয়েকটি পত্রহীন গাছের ডাল ও শুক্‌নো দীর্ঘ ঘাসের ভেতর দিয়ে ঠিক যেন ছবির মত লাগছে দেখ্‌তে।

সেদিন সন্ধ্যাতেই এখানকার নববর্ষের উৎসব হ'ল। খোলা মাঠের মধ্যে, স্বচ্ছ আকাশের তলায় এ' উৎসব। একেবারে নতুন ধরণের। সবাই জড় হয়েছেন, কবি বসেছেন মাঝখানে। আকাশ দিয়ে আলোর বন্যা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই খোলা আকাশের তলায় হ'ল এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ ও গান। কবি নিজে আবৃত্তি কর্‌লেন তাঁর সুন্দর গলায়।

পরের দিন ভোরের গাড়ীতে দলের অন্য সবাই কোল্‌কাতায় ফিরে গেলেন। আমি আর সমরবাবু ঠিক করেছিলুম বিকেলের গাড়ীতে কোল্‌কাতায় ফিরব, কিন্তু সকালেই বুদ্ধদেববাবুর চিঠি পাওয়া গেল। তিনি লিখ্‌ছেন আমরা যেন থাকি, তিনি নিশ্চয়ই সে সন্ধ্যায় আস্‌বেন।

কবিকে এ' খবর জানাতে আবার আমরা গেলুম। সঙ্গে ক্যামেরাটা নিতে ভুল্‌লুম না, আমার ভ্রমণের অকৃত্রিম বন্ধু! দেশ-বিদেশের অনেক অদ্ভুত সুন্দর স্মৃতিতে-ভরা ছবি আমাকে তা' প্রতিবারেই উপহার দিয়েছে। কবির যদি কয়েকটা ছবি তুল্‌তে পারি!

'শ্যামলী'র পেছনে ছোট একটি আমগাছের তলায় বসে' কবি লিখছিলেন; কাঠের সাধারণ একটা বুক-কেস্ ও পাশের মোড়ার ওপরে অনেক বই ছড়ানো রয়েছে। মাটিতে অনেক খোলা খাম রয়েছে পড়ে'। ভয়ে ভয়ে আমি জানালুম আমার ইচ্ছে। তিনি বল্‌লেন, "বেশ বেশ; আমার এখান থেকেই ছবি নিতে পার্‌বে তো, না সরে আস্‌ব?"

তাঁকে না সরিয়েই কয়েকটা ছবি নিলুম। আমাকে তিনি জিগ্‌গেস করলেন উৎসবের, ছবি নিয়েছি কিনা। বল্‌লুম, "হাঁ।"



'শ্যামলী'র পেছনে আমগাছের তলায় ব'সে কবি লিখ্‌ছেন

সন্ধ্যের মুখে ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে এখানকার মেঠো পথ ধরে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলুম। লাল গরুর গাড়ী যাবার পথটা উঁচু-নীচু হয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গিয়েছে। বিকেলের রক্তিম ছায়ায় তা'র ওপর দিয়ে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে কেমন যেন অদ্ভুত লাগ্‌ছিল। কে জানে কবি এই পথকে নিয়েই লিখেছিলেন কিনা, "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে!" সূর্য্য অস্ত গেল, পশ্চিম আকাশে নিষ্প্রভ কয়েকখানা মন্থর মেঘ। সন্ধ্যার ধূসরতায় তাদের রঙ্ যেন গড়িয়ে পড়ে' নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। অন্ধকার আকাশে তারাগুলো এ'বারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; একটা গরুর গাড়ী দূর দিয়ে গ্রামে ফিরে চলেছে, শ্রান্ত গরুর খুরে খুরে রাঙা ধুলো উড়্‌ছে—গোধূলি! সাঁওতাল মেয়ে একটি মাথায় ছোট একটা পুঁট্‌লি নিয়ে বুঝি ফিরে' চলেছে ঘরে, পেছনে তার আঁচল ধরে ছোট্ট একটি ছেলে কখনও ছুট্‌ছে কখনও বা কিছু আস্তে হাঁট্‌চে!

বুদ্ধদেববাবু সে রাত্রেই এলেন। তাঁর থাকার আলাদা বন্দোবস্ত, কারণ তিনি এসেছেন সস্ত্রীক ও সকন্যা। সে রাতটা গেষ্ট-হাউসে কাটিয়ে পরের দিন সকালেই চলে' গেলেন তাঁরা কবির শ্যামলীর পাশের ছোট একতলা বাড়ী পুণশ্চতে।

আরও দিন কয়েক আমরা ছিলুম। কবির সঙ্গে অনেক গল্প, অনেক আলোচনা, অনেক কথা হ'ল। বেশীর ভাগ সময়ই আমরা শ্রোতা হয়ে কাটাতুম। তিনি কথা বলে যেতেন। আধুনিক কবিদের ঠাট্টা করে একদিন তিনি বলেছিলেন, "আমিও একদিন আধুনিক হ'ব—তোমাদেরও লজ্জা দিয়ে যাবো।"

প্রতি সন্ধ্যায় বেড়ানোর পর 'পুনশ্চর' প্রাঙ্গনে অনেকক্ষণ বসে থাকতুম আমরা। উন্মুক্ত আকাশ, হিরে ছিটোনো, সামনের সিরিষ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মন্থর গতিতে চাঁদটা মাঝ আকাশের দিকে এগিয়ে আস্তে আস্তে জ্বলন্ত বরফের মত শাদা হয়ে উঠত। হাওয়া বইত শুকনো ঝারাপাতাগুলোকে কাঁপিয়ে। কিছু দূরেই প্রাসাদের মত উত্তরায়ণ, রূপকথার রাজার বাড়ী যেন। অন্ধকারে আবছায়া এক সান্ত্রী বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভারি আনন্দে কাটল ঐ কটি দিন। ফেরার দিন গেলুম আমরা কবির কাছে বিদায় নিতে। হেসে তিনি বললেন, "হে ক্ষণিকের অতিথি, আবার এসো।"

রাত্রি হয়ে গিয়েছে। ট্রেণে করে' উর্দ্ধশ্বাসে আমরা ছুটে চলেছি : এরপর কোলকাতা। ছেলেটা হয়তো কাল সকালেও আবার পড়বে, "অস্তি নর্ম্মদাতীরে……ওমা, মাগো… …।"



আলোছায়া

শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের কোন জিনিষ হারিয়ে গেলে আমরা খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে দি'। রাত্রে বাতি, লণ্ঠন আর টর্চ্চ এই সব নিয়ে হারাণ জিনিষটিকে খুঁজি কারণ রাত্রে বাতি বা টর্চ্চ না থাক্‌লে সেটি দেখ্‌তে পাই না। দিন ও রাত এই নিয়ে আমাদের ২৪টা ঘণ্টা কেটে যায়। সূর্য্যের তেজে জগত আলোকিত হয় আর যতক্ষণ সূর্য্য আকাশে থাকে ততক্ষণ আমরা দিন বলি। সূর্য্য অস্ত গেলে পৃথিবীতে আমাদের রাত হয়। এই সূর্য্য থেকে আমরা পাই আলো। কোন জিনিষ খুব গরম হলে তার তেজ আমরা অনুভব করি। জিনিষটা যদি খুব বেশী গরম হয়ে পড়ে, যেমন কয়লা কিম্বা লোহার ছড় তখন আমরা চোখেও ঐ তেজ অনুভব করি। এই অনুভূতি আমাদের ব'লে দেয় যে ঐ গরম জিনিষটা থেকে আলো আসছে। ইলেক-ট্রিক বাল্‌বে যখন বিদ্যুৎ চলাচল হয় তখন ঐ বাল্‌বের ভেতরকার তার এতো গরম হয়ে যায় যে আমরা ঐ বাল্‌ব থেকে আলো পাই। তোমরা সময় সময় দেখ্‌তে পাবে যে টর্চ্চের ব্যাটারী খারাপ হয়ে যাবার সময় টর্চ্চের বাতি তত গরম হয় না তখন বাতির ভেতরকার বাল্‌বের তার আলো দিতে পারে না শুধু একটু লাল্‌চে আভা দেয়, তারপরই ব্যাটারীর শক্তি এত ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে সে শক্তি বাল্‌বের তারটিকে তাতাতে অর্থাৎ গরম করতে পারেনা—ফলে বাল্‌বটিও আর আলো দিতে পারে না। কামারের কারখানায় দেখতে পাবে যে, কামার যখন লোহার ছড় আগুনে গরম করে তখন ছড়টি প্রথমে লাল্‌চে হয় পরে যখন খুব গরম হয়ে পড়ে তখন সাদাটে হয়ে যায়। ঐ ছড়টিকে কামার যখন পিটুতে আরম্ভ করে, তখন দেখেচ বোধ হয় যে, আগুণের ফুলকি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ ফুলকিগুলো গরম লোহার টুক্‌রো ছাড়া আর কিছুই নয়। ফুলকিগুলো যতক্ষণ গরম থাকে ততক্ষণই জ্বলতে থাকে; ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর তার আলো থাকেনা। তাহ'লে আলোর কারণ হচ্ছে তাপ, কেমন ত? তোমরা বল্‌বে তবে জোনাকি যখন অন্ধকার রাতে জ্বলে তখন কি জোনাকিগুলো পুড়তে থাকে

নাকি? না, জোনাকির আলো তাপ থেকে নয়। জোনাকির আলোর কারণ অন্যরূপ। ইউরিনিয়াম ব'লে এক রকম ধাতু আছে। এই ইউরেনিয়াম থেকেও আমরা আলো পাই। কোন কোন ঘড়িতে এই ধাতু থাকে আর ঐ ঘড়িতে আমরা অন্ধকারেও ক'টা বেজেছে বেশ দেখতে পাই। আর একটা ধাতুবিশিষ্ট জিনিষ আছে এর নাম বেরিয়াম সাল্‌ফাইড। এই বেরিয়াম সাল-ফাইড একটি কাচের নলে রৌদ্রে রেখে অন্ধকার ঘরে আন্‌লে নলটি থেকে আলো দেখ্‌তে পাবে। কুইনিন সালফেটও এইরূপ ব্যবহারে বেগুনে আলো দেয়। এই প্রকার বিনা তাপে যে আলো পাই তার নাম দেওয়া হয়েচে প্রস্ফুরণ বা Phosphoresence. মনে রাখ্‌বে যে তাপই হচ্ছে আলোর কারণ, অবশ্য সকল ক্ষেত্রে নয়; এই যেমন জোনাকির আলো, বেরিয়ামের আলো, গন্ধকঘটিত ষ্ট্রন্‌সিয়াম ধাতুর আলো, রঞ্জন রশ্মি প্রভৃতি। রেডিও অ্যাক্‌টিউ বস্তু থেকেও আলো পাওয়া যায় এই জন্য সব ক্ষেত্রে তাপই আলোর কারণ নয়।

কিন্তু আলো কী? তোমরা পুকুরে ঢিল্ ফেলে তার ফল পরীক্ষা করেছ কী? পুকুরে ঢিল্ ফেল্‌লে দেখ্‌তে পাবে কেমন সুন্দর ঢেউ সৃষ্টি হয়। এই ঢেউগুলি ছোট থেকে বড় হয় আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বড় বড় ঢেউ ঘাটের কিনারায় ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে যায়। আলোও একরকম ঢেউ। কোন জিনিষ খুব গরম হয়ে পড়লে যেমন লোহার ছড় কিম্বা ইলেক্‌টিক্ বাতি ঐ গরম জিনিষটির থেকে একরকম ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়। এই ঢেউগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোর ঢেউ যখন কোন জিনিষের ওপর পড়ে তখন তা'র খানিক্‌টা ঐ জিনিষের মধ্যে চলে যায় আর বাকিটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। যে ঢেউগুলি ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে বা প্রতিফলিত ঢেউগুলি আমাদের চোখের অক্ষিপটে যখন আঘাত করে তখন আমাদের একরকম অনুভূতি হয় যার ফলে আমরা যে জিনিষ থেকে ঢেউগুলি প্রতিফলিত হচ্ছে সেটি দেখ্‌তে পাই। তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারলেনা, বল্‌বে অক্ষিপট আবার কোন জন্তুর নাম? অক্ষিপট জন্তুর নাম নয় ওটা একরকম স্নায়ুর পর্দ্দার নাম। আমাদের চোখের ঠিক্ পেছন-দিকে অনেকগুলি স্নায়ুর একরকম পর্দ্দা আছে, এই পর্দ্দার নাম হচ্ছে অক্ষিপট বা Retina.

তাহ'লে তাপ থেকে আমরা পাই আলো। আর আলো একরকম ঢেউ আর এই ঢেউ যখন কোন জিনিষে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে তখন ঐ জিনিষটি [illegible] যায়। ঢেউ-এর এই ফিরে আসাকে আমরা বলি প্রতিফলন।

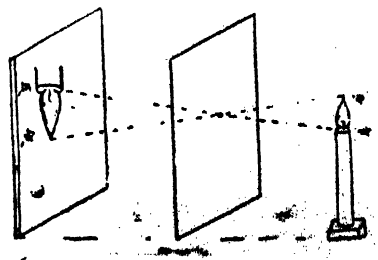
সন্ধানী

শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে, সূর্য্যের তাপ পায় ৬০০০° সেন্টিগ্রেড্। গ্যাস বাতি যখন জ্বলে তখন তার তাপ প্রায় ১৫০০° সেন্টিগ্রেড্ ইলেকট্রিক বাতির তাপও ঐ প্রকার। যদি ১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জল ফুটতে আরম্ভ করে তাহ'লে ভাব সূর্য্যের তাপ কত বেশী।

দুধ থেকে আমরা যেমন ছানা, ননী, মাখন, ঘি প্রভৃতি তৈয়ারী করি তেমনি তাপ, আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ, ও শক্তির (Energy) রূপান্তর মাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঐসকল শক্তি আমরা অনুভব করি।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে সূর্য্যের কিরণ কিভাবে আসে তা দেখেচ কি? দেখে থাকবে নিশ্চয়ই যে রৌদ্রের আলো সোজা পথে ঘরের মধ্যে ঢুকে মেজেতে পড়ে। ঐ আলোর পথে যদি ধূলোর গুঁড়ো কিম্বা খড়ির গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে আলোর রাস্তাটি কেমন স্পষ্ট হয়। এ'র থেকে প্রমাণ হয় যে আলোর রশ্মি বা আলোর ঢেউ সোজা পথেই চলে। একটা মোমবাতি, একটুকরো কার্ডবোর্ড, একটা চতুষ্কোণ কাঠের ফ্রেম ও ঐ ফ্রেম উপযোগী পাতলা কাগজ নিয়ে তোমরা পরীক্ষায় লাগ না কেন? কাঠের ফ্রেমে পাতলা কাগজটি খুব ভাল করে আটা দিয়ে লাগাতে হবে। এ'টা তোমার পর্দ্দা বা screen. এখন একটা সরু পিন্ দিয়ে কার্ড বোর্ডের ঠিক মাঝখানে একটা ছিদ্র করো। এ'রপর কার্ডবোর্ড বাতি ও পর্দ্দা এগুলিকে ১নং ছবি অনুযায়ী একটা টেবলের ওপর সাজাবে। বাতি জ্বেলে ঘরের অন্যান্য দরজা জানালা বন্ধ করে দিও যেন বাইরের আলো ঘরের মধ্যে না আসে। আমার ছবি অনুযায়ী তোমার ঐ তিনটি জিনিষ পরপর সাজালে দেখবে যে তোমার



পর্দ্দার ওপর তোমার বাতির একটা সুন্দর ছবি পড়েছে। তোমার কার্ডবোর্ডের ছিদ্র ও মোমবাতির শিখা সমান এক সোজাপথে না হলে পর্দ্দার গায়ে শিখার ছবি (ক'খ') পা'বে না। শিখার ক বিন্দু থেকে আলোর ঢেউ কার্ডবোর্ডের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পর্দ্দার ক' বিন্দুতে পড়ে আবার শিখার খ বিন্দুথেকে আলোর ঢেউ ঐ ছিদ্র দিয়ে পর্দ্দার খ' বিন্দুতে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে ক'খ' ছবি আমরা পাই। এরই থেকে প্রমাণ হয় না কি যে আলোর ঢেউ সোজা পথে চলে? এই নিয়মের ওপর ফটো ক্যামেরা তৈরী। তোমার ছিদ্রযুক্ত কার্ড বোর্ডটি লেন্সের কাজ করচে আর ফ্রেমে আঁটা কাগজটি পর্দ্দার কাজ করছে নাকি? এই প্রথায় পিন্‌হোল ক্যামেরা (Pinhole Camera)

সন্ধানী

শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

আলোর পথে যদি কোন বই কিম্বা ছড়ি কিম্বা নিজের হাত কিম্বা পেন্সিল প্রভৃতি ধরা হয় তাহ'লে ঐ জিনিষটির পিছনে তার কালো ছবি পড়ে এ'কে আমরা বলি 'ছায়া'। আলোর পথে সব জিনিষেরই ছায়া পড়ে না। কাচের মধ্যে দিয়ে আলো বেশ যাওয়া আসা করতে পারে। কিন্তু ঐ কাচে একদিকে পারা ব্যবহার করলে কিন্তু আলোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। আবার ঐ কাচ যদি বালি দিয়ে ঘষে নেওয়া হয় তাহ'লে আলোর পথ একেবারে বন্ধ হয় না—খানিকটা আলো যাওয়া আসা করতে পারে। মোটা কাগজ চোখের সাম্‌নে ধরো, দেখ্‌বে আলোর পথ বন্ধ কিন্তু ঐ মোটা কাগজে এক ফোঁটা তেল ফেললেই দেখবে যে, ঐ তেলমাখান কাগজের মধ্যে অল্প অল্প আলো যাওয়া আসা করতে পারে।



অস্বচ্ছ বা অনচ্ছ (opaque) বস্তু মাত্রেই আলোর পথে বাধা দিয়ে আলোর ঠিক বিপরীত দিকে মানে বস্তুটির পিছনে বা পাশে ছায়ার সৃষ্টি করে। ২নং ছবি দেখ। দেখবে একটি ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাঁ পা থেকে আরম্ভ করে দেওয়াল পর্য্যন্ত একটা কালো ছায়া পড়েছে। তোমরা যদি রৌদ্রে এইভাবে দাঁড়াও, তাহ'লে তোমরাও ছায়া সৃষ্টি করতে পারবে। এই ছবিটি পিন হোল ক্যামেরায় ঠিক বেলা বারোটায় নেওয়া হয়েছে। সকালে ও বিকালে আমাদের যে ছায়া পড়ে অন্যান্য সময়ের চেয়ে তারা ঢের বড় তার কারণ হচ্ছে ঐ দুই সময় সূর্য্যের কিরণ তির্য্যকভাবে পৃথিবীর ওপর পড়ে আর দুপুর বেলা সূর্য্য ঠিক মাথার ওপর আসে, তখন যে ছায়া সৃষ্টি হয় সেগুলি সকাল ও বিকালের ছায়ার তুলনায় ছোট। এই ছবিতে ছেলেটির ডানদিকে সূর্য্য ছিল কাজেই বাঁ দিকে ছায়া পড়েছে। ছায়ার বিষয় পরে আমরা আরো আলোচনা করবো।

ভারতীয় যাদুবিদ্যা

'ম্যাজিক' বা 'যাত্নবিদ্যা' দেখে নাই এমন লোক বোধহয় খুব কমই আছে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত জীবনে একবার না একবার যাত্নকরের অত্যাশ্চর্য্য খেলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ। যাত্নকরগণ তাঁহাদের অদ্ভুত ক্ষমতাবলে এমন সব কাজ করিয়া থাকেন—তাহা দেখিয়া বৃদ্ধ বিশেষজ্ঞগণও অবাক হইয়া যান। আর আমাদের এই ভারতবর্ষ 'যাত্নকরের দেশ' বলিয়াই খ্যাত। বহু সহস্র বৎসর হইল আমাদের দেশে যাত্নবিদ্যা প্রচলিত হইয়াছে। আজকালকার দিনেও 'ভারতীয় যাত্নবিদ্যা'র সুনাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র। পৃথিবীর অপর কোন দেশের কোন জাতিই ভারতীয় যাত্নকরদের খেলা নকল করিতে পারিল না। আর ইউরোপের বড় বড় যাত্নকরের খেলাগুলি ভারতবর্ষের সাধারণ যাত্নকরেরাও নকল করিয়া ফেলিতেছেন। এই জন্যই ভারতীয় যাত্নবিদ্যার এত সুনাম। শুধু তাহাই নহে আমেরিকা ও ইউরোপের যাত্নকরগণ হস্তকৌশল, ঔষধ পত্রাদি ও যান্ত্রিক কৌশল প্রভৃতির চালাকীদ্বারা নিজেদের খেলা দেখিয়ে থাকেন, আর ভারতীয় যাত্নকরগণ তাঁহাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, বিশ্বাস, সম্মোহন প্রভৃতি বিদ্যা ও গুণের সাহায্যে নিজেদের খেলা সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। ভারতের পথের বেদিয়ারা কোনরূপ সাজসরঞ্জাম না লইয়া খোলা রাস্তায় বসিয়া যেরূপ অদ্ভুত খেলা দেখাইতে সক্ষম হয় পৃথিবীতে অপর কোনদেশের যাত্নকরই সেরূপ করিতে সক্ষম হইবে না। ঐগুলিই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাত্নবিদ্যা বা "প্রকৃত ভারতীয় যাত্নবিদ্যা" এবং সাধারণের নিকট 'ভানুমতীর খেলা' নামে পরিচিত।



যাত্নসম্রাট মিঃ সরকারের ম্যাজিকে ত্নধশুদ্ধ গেলাস শূন্যে উঠ্‌ছে

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশ যাদুবিদ্যায় অনেক উন্নত হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ-সভায় ইহা প্রদর্শিত হইত বলিয়া এই বিদ্যার নাম 'ইন্দ্রজাল বিদ্যা'। তারপর ভোজরাজা নামক একজন রাজাও এই খেলা আয়ত্ত্ব করিয়াছিলেন—সেইজন্য ইহার অপর নাম ভোজ-বিদ্যা, ভোজবাজী বা 'ভোজ রাজাকা খেল'। পূর্ব্বকালে ভানুমতী নামে একজন মহিলা ঐন্দ্রজালিক এই যাদুবিদ্যায় অপূর্ব্ব দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই ইহা 'ভানুমতীর খেলা' নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন ইহা দেবসেনানী কার্ত্তিকের আবিস্কৃত চৌর্য্যবিদ্যার অন্তর্গত কিন্তু বিদ্যাটী চুরিবিদ্যা ই লেও তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর বিভাগের ন্যায় কঠোর সাধনা সাপেক্ষ।

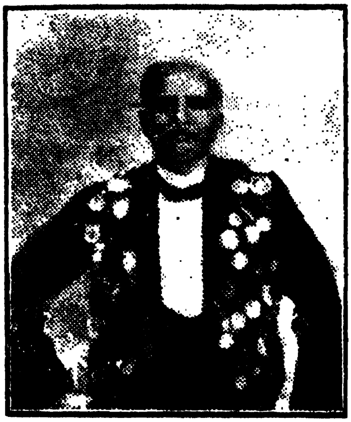


হ্যারী হুডিনি

আমেরিকার একজন যাদুকর এই প্রকৃত ভারতীয় যাদুবিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষতা অর্জ্জন করেন। তিনিই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর —তাহার নাম "হ্যারী হুডিনি"। হুডিনির নাম হয়ত তোমরা শুনিয়াছ। তিনি ছিলেন "হাতকড়ির রাজা" পৃথিবীর যে কোনদেশের হাতকড়ি দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেও তিনি তাহা খুলিয়া ফেলিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহাকে বাক্সে তালা বন্ধ করিয়া ছয়ফুট মাটীর নীচে কবর দিয়া রাখিলেও সেখান হইতে বাহির হইতেন। রঙ্গমঞ্চে একটা প্রকাণ্ড হাতীকে অদৃশ্য করিতেন ও দেওয়ালের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতেন। হুডিনি আজ ৭।৮ বৎসর হ'ল মারা গিয়াছেন।

সুখের বিষয় এই যে আমরা বাঙ্গালীদের মধ্যেও কয়েকজন অদ্ভুত যাদুকর পাইয়াছি। প্রফেসার বিমল গুপ্তকে অনেকে হয়ত শুধু হাস্যরসিক বলিয়াই জানিতেন কিন্তু তিনি একজন ওস্তাদ যাদুকর ছিলেন। তাঁহার 'থট্ রিডিং' বা চিন্তা পাঠ' খেলাটী খুবই বিস্ময়কর ছিল। বৎসর দুই হয় তিনি নীলগিরি রাজবাটীতে খেলা দেখাইতে যাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। অপর একজন বাঙ্গালী যাদুকর প্রফেসার গণপতি চক্রবর্ত্তী। ভূতুড়ে গণপতিকে কে না চেনে! হাত-পা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ করিয়া একটী সিলমোহর করা থলেতে বদ্ধ করিয়া সকলের

পরীক্ষিত একটী বাক্সে আবদ্ধ করিয়া দিলেও গণপতি তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। গণপতির রঙ্গমঞ্চে বহু নরকঙ্কাল নৃত্য করিতে করিতে আসিত ও যাইত। নৃত্যপরায়ণ নরকঙ্কাল গণপতি বাবুর মুখ হইতে জ্বলন্ত সিগারেট কাড়িয়া লইয়া ধূমপান করিত। ইহা কিরূপ বিস্ময়কর বুঝিতেই পার। সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান ভারতীয় যাদুবিদ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকরের বিবরণ দিয়াই প্রবন্ধের শেষ করিব। ইনি 'যাদুসম্রাট' নামে খ্যাত এবং ইহার অদ্ভুত যাদুবিদ্যার কথা প্রায়ই সমস্ত সংবাদপত্রে দেখা যায়। যাদুসম্রাট পি, সি, সরকারকে কে না চেনে? অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার নাম বাংলার ঘরে ঘরে সুপরিচিত হইয়াছে।



গণপতি



যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

এবার জাপানে তাঁহার বিদ্যা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ফলে জাপান গভর্ণমেণ্ট তাঁহার যাদুবিদ্যাভিনয় বন্ধ করিয়া দেন—"পাছে সে দেশের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যায়—এই ভয়ে।" জাপানের যাদুকর সম্মিলনী শ্রীযুত সরকারকে প্রাচ্যের সববশ্রেষ্ঠ যাদুকর স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের 'সম্মানিত সদস্য' নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। পি, সি, সরকারের খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রাচীন ভারতের লুপ্তখেলাগুলি উদ্ধার করিয়া বিলাতী প্রণালীতে প্রদর্শন করেন। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তিনি 'এক্স'রে চক্ষুযুক্ত লোক (The man with X' Ray Eyes) নামে পরিচিত। চক্ষুর উপর হাঁসপাতাল হইতে পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া তিনি গাড়ী ঘোড়া পূর্ণ রাজপথে বহুমাইল সাইকেলে যাতায়াত করিয়াছেন।

তাঁহার হাতকড়ির একটী খেলায় লণ্ডনের যাদুকর সম্মিলনী মুগ্ধ হইয়াছে। চীন দেশে অবস্থানকালে গভর্ণমেণ্টের দুইজোড়া কঠিন হাতকড়িদ্বারা চীনের একটী বিশেষ দ্রুতগামী রেল-লাইনের সহিত গাড়ী অতিক্রম করার মাত্র ৩৮ সেকেণ্ড আগে তাঁহাকে আবদ্ধকরা হয়। শোঁ—শোঁ—শব্দে রেলগাড়ী আসিয়া অতিক্রম করিয়া গেল—এই অল্প সময়ের মধ্যে দর্শকরা লাইন হইতে বহু কষ্টে একটু দূরে মাত্র দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাদুসম্রাট সরকার এই চক্ষুর পলক ফেলিবার সময়টুকুর মধ্যে হাতকড়িসমূহ খুলিয়া রেল-লাইনের ওপারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার এই জাতীয় খেলা আরও বহু আছে। মিঃ সরকারের খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে উহা প্রকৃষ্ট ভারতীয় খেলা এবং আধুনিক (ইউরোপীয়) প্রণালীতে প্রদর্শিত।

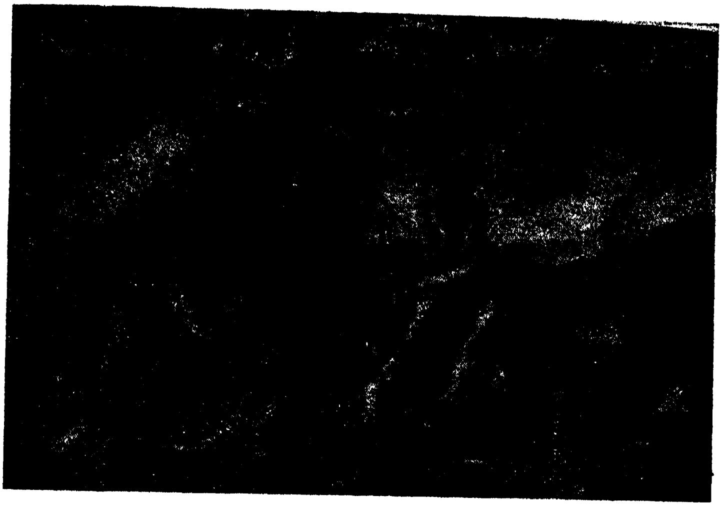
মনেকর, রেলগাড়ী শোঁ—শোঁ শব্দে আসিতেছে এবং চক্ষুর পলকে অতিক্রম করিয়া যাইবে, তখন হাতকড়ি খুলিবার উপায়টী যদি যাদুসম্রাট' ভুলিয়া যাইতেন তবে তাঁহার কি অবস্থা হইত? কিন্তু ঐরূপ দুর্ঘটনা তাঁহার হইবার নহে—নিজের উপর এত দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি এতই প্রখর!

ভারতীয় যাদুবিদ্যার এইগুলিই প্রকৃত বিস্ময়।

বিশ্ববিখ্যাত বাঙ্গালী যাদুকর

শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকার

এবার থেকে রংমশালে তোমাদের জন্য মজার মজার ম্যাজিক সম্বন্ধে নিয়মিত লিখবেন। তাঁর লেখা থেকে তোমরা নিজেরা ম্যাজিক শিখতে পারবে।



উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চিত্রিত

'তোমার এই আষাঢ়ে গল্পও এক্ষুণি শেষ হওয়া দরকার', চড়াগলায় সুনন্দ ব'লে উঠল। বৈঠকি ঘরে বোম্বেটেরা চঞ্চল হয়ে পড়ল। সত্যিই কি এই মেয়েটি মন গড়া এক আজব ইতিহাস ব'লে তাদের চোখে ধূলো দিতে চাইছে? শুধু ক্ষিতিভূষণের শরীরে কোনো সাড়া নেই। রঙ্গিলার কাহিনী তাকে যেন ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।'

কালীভূষণ ঠোঁট কাম্‌ড়ে এক মুহূর্ত্ত কী ভাব্‌লে। একখানা হাত তুলে সে গম্ভীর স্বরে বললে, 'চুপ করো, তোমরা।' রঙ্গিলার দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বললে, 'বলো। তোমার কাহিনী এখনও শেষ হয় নি।'

রঙ্গিলা মাথাটি নুইয়ে ডান হাতে শক্ত করে কপাল চেপে ধরলে। সে যেন হঠাৎ তার কাহিনী ভুলে গেছে। হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে গেছে।

ক্ষিতিভূষণ বলে উঠল, 'মেঘবর্ণের বাসায় কুণ্ডল এসে পৌঁছেচে। তার হাতে অমরলতার লাল ফুল। তারপর কী হল, বলো।'

রঙ্গিলা মাথা তুলে বললে, 'তারপর আমার চোখের সামনের দৃশ্যটা বদলে গিয়ে সেখানে আর একটা দৃশ্য ভেসে উঠল। দেখলাম, সবুজ রেশমে মোড়া বৈঠকঘর মেঘবর্ণের। মেঘের নরম পুরু সবুজ গালচে আর দেয়াল আগা গোড়া ঢেকে দেওয়া মিহি রেশম চাদরে। উনপঞ্চাশ বাতির একটা বেলোয়ারী ঝাড়ে সাত রঙের সাতটি করে আলো।

লঙ্কার সভাকবি মেঘবর্ণ। বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল তাঁর বর্ণ বিদ্যুতের ঝিলিক তাঁর চোখে। মখমলে সাচ্চা জরির কাজ করা কামিজ তাঁর গায়ে। বাঁহাতে ধরা একটি লাল গোলাপ, ডান হাতে হাতির দাঁতের নক্সাকাটা কলম। গন্ধকাগজে এক এক ছত্র কী লিখ্‌চেন আর দুটি চোখ তাঁর অসীম আকাশের দুটি তারার মত ঝিক্‌ মিক্‌ করছে।

কিঙ্কর এসে বললে, 'প্রভু! যাদুকর কুণ্ডল এসেছেন। হুকুম করুন।'

মেঘবর্ণ গম্ভীর স্বরে বললেন, 'যাদুকরকে আসতে দাও এখানে।'

যাদুকর কুণ্ডল ঘরে ঢুকে মাথা নুইয়ে বললে, 'সভাকবি মেঘবর্ণ, নমস্কার। আপনার সঙ্গে জরুরী প্রয়োজন আমার!'

যাদুকর কুণ্ডল ঘরে ঢোকার আগেই কী একটা কথা ভেবে মেঘবর্ণের মুখ কখনো গম্ভীর হচ্ছিল, কখনো কঠিন একটা হাসিতে ছেয়ে গিয়ে ঝড়ের রাতের আকাশের মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু যাদুকর কুণ্ডলের কথা ফুরোতেই মেঘবর্ণ হাঃ হাঃ করে অট্ট হাসি করে উঠলেন।

মনের রাগ মনে চেপে কুণ্ডল বললে, 'সভাকবির এই বিকট হাসিটার অর্থ কী? সভাকবি কি আমাকে ভয় পাইয়ে বিদেয় করে দিতে চান!'

মেঘবর্ণ প্রায় আসন ছেড়ে উঠে বললেন, 'আঃ যাদুকর! সে কী কথা? হাসিটা মুদ্রাদোষ আমার। বোসো বোসো। সুস্থ হয়ে কাজের কথা পাড়ো।'

কুণ্ডল বললে, 'সভাকবি! মস্কারা করে আমায় চটাবেন না। আজ আমি আপনার এখান থেকে চটে মটে বিদেয় হলে, আপনার ক্ষতি হতে পারে।'

সভাকবি মেঘবর্ণ বিস্ময়ের ভাণ করে বললেন, 'হেঁয়ালি ছাড়ো কুণ্ডল। মান অপমানের কথা ভুলে, কাজের কথা বলো।'

'সভাকবি। তাহলে কথাটা বলি। একদিন আপনার একখানা কাব্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। দেখলাম একজায়গায় আপনি বলেছেন, 'হায়, আমি যদি বছরের পর বছর এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারতাম, জরা যদি আমায় স্পর্শ না করত; অনন্ত যৌবন যদি হত আমার!'

'বটে! যাদুকর কুণ্ডলের কারবার দেখচি শুধু ভূতদানো নিয়ে নয়। কাব্যও চলে তার!'

'সে যাহোক। সভাকবি এখন জেনে নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে বছরের পর বছর অটুট যৌবন নিয়ে বেঁচে থাকা আর মিছে কবির কল্পনা নয়।'

'বলো কি!'

'সভাকবি। কুণ্ডল বাজে কথা কয়না।'

'তবে দাও আমাকে এক হাজার বছর পরমায়ু। কিন্তু দেখো। বুড়িয়ে যেন না যাই। জিলিপির মত বাঁকা শরীর নিয়ে এক মূহুর্ত্ত বেঁচে থাকতে চাই না।'

সভাকবি মেঘবর্ণের কথায় ঠাট্টা যেন লেগেই আছে। যাদুকর কুণ্ডল একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'সভাকবি। ঠাট্টা রাখুন। এক হাজার বছর পরমায়ু না হোক, পাঁচশো বছর পরমায়ু তো দিতে পারি আপনাকে।'

'পারো? পারো তুমি আমাকে পাঁচশো বছর পরমায়ু দিতে!'

'নিশ্চয়ই। শুধু যে পারি তা নয়। এখনই পারি, এক মুহূর্ত্তে পারি। কিন্তু তার জন্য সভাকবি আমাকে নিশ্চয়ই মোটা রকমের একটা পুরস্কার দিতে রাজী। এক কোটি মোহর পেলে আমি খুসি হব।'

'পাগল! লঙ্কেশ্বরের কোষাখানায় এক কোটী মোহর হবে কিনা সন্দেহ। অত ক্ষেপো না যাদুকর। একলাখে রাজী হয়ে পড়ো।'

যাদুকর কুণ্ডল মাথা নেড়ে বললে, 'উহুঁ। এক কোটি মোহরের কমে রাজী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মেঘবর্ণ! ভেবে দেখুন। টাকা বাঁচাতে গিয়ে পাঁচশো বছর পরমায়ু না হারান।'

মেঘবর্ণ গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেলেন। গন্ধ কাগজের উপর হাতির দাঁতের কলমটি স্থির হয়ে থাকল আর তাঁর বিরাট সুন্দর শরীর আকাশে থমকে যাওয়া সোনালী রোদ ঢালা একখানা সাদা মেঘের মত শোভা পেতে থাকল।

যাদুকর কুণ্ডলের মন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বুঝতে পারছি তার কুটিল চোখ কেন চক্‌চক্ করছে! সে ভাবচে, পৃথিবীর সেরা ধনী কবি মেঘবর্ণ। পুরুষানুক্রমে যে টাকা তাঁর হাতে এসেচে, তার আর লেখা জোখা নেই। মেঘবর্ণের গুপ্তকোঠার নাম শুনলে রাজা বাদসাদের জিভে জল আসে। মেঘবর্ণ কি এক কোটি মোহরের মায়ায় পাঁচশো বছর পরমায়ু ছেড়ে দেবে?

হঠাৎ মেঘবর্ণ মুখ তুলে বললেন, 'কুণ্ডল, তুমি বলছিলে, এখনই এই মূহুর্ত্তে তুমি আমাকে পাঁচশো বছর আয়ু দিতে পারো?

কুণ্ডল হেসে বললে, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ।'

'ওকি! ওখানে দাঁড়িয়ে কে?' কবাটের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মেঘবর্ণ চেঁচিয়ে উঠলেন।

কুণ্ডল পিছনে ফিরে কবাটের দিকে তাকিয়ে দেখতে গেল। কবাটে কেউ নেই। কিন্তু মেঘবর্ণ ততক্ষণে পিছন থেকে কুণ্ডলের গলা দুহাতে টিপে ধরেছেন।

ভয়ে বিস্ময়ে একখানা হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ছট্‌ফট্ করতে করতে কুণ্ডল বললে, 'সভাকবি! তামাসা রাখুন! আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।'

মেঘবর্ণের কথায় তখন আর ঠাট্টার লেশ নেই। গম্ভীরস্বরে তিনি বললেন, 'কুণ্ডল, তোমার কাছে আছে অমরলতার লালফুল। সেটি পেলেই তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।'

কুণ্ডল হাঁফাতে হাঁফাতে বল্‌লে, 'কী অসম্ভব কথা! অমরলতার লালফুল কি সত্যি-কারের জিনিষ? অমরলতার লালফুল আমি পাবো কোত্থেকে?'

মেঘবর্ণ গম্ভীর গলায় বললেন, 'এক নিমেষে পাঁচশো বছর আয়ু দেয় যে, অমরলতার লালফুল থাকে তার কোর্ত্তার ভাঁজে। কুণ্ডল, তুমি যদি হাত পা একটু কম ছোঁড়ো, আমি ধীরে সুস্থে তোমার কোর্ত্তার লুকনো ভাঁজ থেকে লালফুল বার ক'রে আনতে পারি।'

একহাতে কুণ্ডলের গলাটা ধ'রে রেখে মেঘবর্ণ আর একটা হাত কুণ্ডলের কোর্ত্তার ভিতর চালিয়ে দিতে গেলেন! মরিয়া হয়ে কুণ্ডল মেঘবর্ণের হাতটা দুহাতে শক্ত করে ধ'রে তাতে দুপাটি দাঁত বসিয়ে দিলে। মেঘবর্ণ আঃ ব'লে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলের গলা থেকে তাঁর আর একটা হাত আল্‌গা হয়ে গেল। কুণ্ডল ঝট্ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে মেঘবর্ণের দিকে ফিরে 'রুখে' দাঁড়ালো। খাপ থেকে ছোরাটা খসাতে গিয়ে সে থেমে গেল।

মেঘবর্ণ ততক্ষণে তাঁর ছড়ি-তলোয়ারটা খাপ থেকে টেনে এনে কুণ্ডলের বুকে ঠেকিয়ে-ছেন। নিঃশ্বাসে তার বুক যে একটু ফুলে উঠছিল মনে হচ্ছিল তাতেই তলোয়ারটা বুঝি তার বুকে বিঁধে যাবে।

মেঘবর্ণ বললেন, 'কুণ্ডল! অমরলতার লালফুল আছে তোমার কাছে। বলো, হ্যাঁ কি না।'

কুণ্ডল কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'মেঘবর্ণ শিশু নন, গাঁজাখুরী গল্পে বিশ্বাস রাখা তাঁর উচিত হয় না।'

'মেঘবর্ণ কুণ্ডলের কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'লালফুল দাও, কুণ্ডল।'

কুণ্ডলের দুটি চোখে যেন অন্ধকার নেমে এলো। একটা কুটিল হাসি একখণ্ড উড়ন্ত কালো মেঘের মত ওষ্ঠে ফুটে' উঠে কোথায় মিলিয়ে গেল। তবু একটু হাসতে চেষ্টা করে সে বললে, 'সভাকবির সন্দেহ সত্য হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে লালফুল আছে আমার কাছে। কিন্তু তবু সেটা তো আমার জিনিষ।

সভাকবি দাম না দিয়ে সেটা নিতে চান, এ যুক্তি ভালো নয়।'

মেঘবর্ণ এবার হেসে উঠে বললেন, 'রোসো কুণ্ডল, যে দামে এই লালফুল কিনেছ তুমি, সেই দাম দিয়ে তুমি আমায় লাল ফুল কিনতে বলো ?'

মেঘবর্ণের কথায় কুণ্ডল শিউরে উঠল। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে সে বললে, 'অর্থাৎ'—

'অর্থাৎ, তুমি কি চাও আমি তোমাকে খুন করি ?'

কুণ্ডলের সারা শরীর দিয়ে কালো ঘাম ছুটল। বুকে ঠেকানো মেঘবর্ণের ছড়ি-তলোয়ারটা একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে সে বললে, 'মেঘবর্ণ, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝ্‌চিনা।'

'কুণ্ডল, তোমার যেমন আছে মায়ামুকুর, আমার তেমনি আছে আরশী-আঙটি।'

মেঘবর্ণ বাঁ হাতের অনামিকার আঙ্‌টিটা তুলে ধরলেন। কুণ্ডলের মুখ শুকিয়ে গেল। কুণ্ডল দু-এক পা পিছন হঠ্‌তে গেল। মেঘবর্ণ কঠোরকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'উহুঁ, কুণ্ডল। অত অস্থির ভালো নয়। আমার সবটা কথা না শুনে তোমার ছুটি নেই।

'এই আঙটির নীল পাথরে পৃথিবীর সব ঘটনার ছায়া এসে পড়ে। এই নীল পাথরের পানে তাকিয়ে দেখছি, তোমার কোর্ত্তার ভাঁজে অমরলতার লাল ফুল।'

কুণ্ডল অধীর হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মেঘবর্ণ ছড়ি-তলোয়ার দিয়ে কুণ্ডলের জামাটা বিঁধে দিয়ে বললেন, 'যাদুকর এদিকে তাকাও। নীলপাথরের আর একটা ব্যাপার দেখছি। এই লাল ফুল তুমি এক ঋষির কাছ থেকে কিনেছ। সে তিন সপ্তাহ আগের কথা। ঋষি লালফুল হাতে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে আসছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা।'

কুণ্ডল ঢোঁক গিল্‌লে।

'ঋষি ফুলটি তোমাকে বেচতে চাননি। কিন্তু তুমি এমন দাম দিলে যে ঋষি ফুলটা তোমায় না দিয়ে পারলেন না।'

যাদুকরের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। শিকারী কুকুরের মত আস্তে আস্তে হাঁ মেলে গিয়ে দুপাটি দাঁত বার হয়ে পড়ল।

'তোমার ডানহাতখানা আমার চোখে ধুলো দিয়ে খাপ থেকে যে ভোঁতা ছোরাখানা খুলে আনতে চাইছে, যে ভোঁতা ছোরাখানা হঠাৎ ছুঁড়ে আমার কপাল বিঁধে দিয়ে তুমি পালাবে ভাবচো, সেই ছোরাখানা তুমি অসহায় ঋষির বুকে বিঁধে দিলে। তুমি বড় নিষ্ঠুর,

কুণ্ডল। একটা ধারালো ছোরা দিয়ে ঋষিকে হত্যা করলে তিনি কম কষ্ট পেতেন। দাম দিতে হলেই কি আর মেজাজ খারাপ করা উচিত? আমি কিন্তু তোমাকে চমৎকার দাম দেবো। একটু কষ্ট পাবেনা তুমি। আমার এই ছড়ি-তলোয়ারটা তোমার ফুস্‌ফুস্ ফুটো করে দেবে, তুমি টেরও পাবেনা। হঠাৎ কখন যে তুমি মরে যাবে, তাও বুঝবেনা। আর তখন, আস্তে আস্তে তোমার কোর্ত্তার ভাঁজ থেকে লালফুলটা বার ক'রে আমি চন্দনকাঠের কৌটোয় পুরে মহারাজকে উপহার দেবো। কিন্তু, তোমাকে খালি হাতে মরতে দেব, ভেবোনা। এই যে আমার হাতে লাল গোলাপটা দেখছিলে, সিরাজ থেকে তা এই মাত্র আমার হাতে এসেছে। তিনমাস হয়ে গেছে, অথচ ছ্যাখো ফুলটা এখনো দিব্যি টাট্‌কা আছে। তুমি মরার পর সেই ফুলটা তোমার হাতে গুঁজে দেব। লোকে তারিফ ক'রে বলবে, বাঃ। যাদুকর কুণ্ডল লোক বটে! মরার সময় গোলাপ ফুলটি নিতে ভোলেনি। রাজা বাদ্‌সারাও কি আর গোলাপ ফুল হাতে মরতে পান! ওষুধের গেলাস থাকে তাঁদের হাতে। কি বলো কুণ্ডল!'

থুঃ করে ফেণার মত খানিকটা থুতু গালচের উপর ফেলে কুণ্ডল বললে, 'ছোঃ, ফুল হাতে মরে কোন্ কাপুরুষ। মেঘবর্ণ, আমায় ইঁদুরের মত মেরোনা।

" আমার ছোরা তোমার ললাটে বিঁধবার আগে তোমার ছড়ি-তলোয়ার আমার বুক বিঁধে দেবে, জানি। কিন্তু তবু ছোরা হাতে আমায় মরতে দাও।' এই বলে চক্ষের পলকে কুণ্ডল খাপ থেকে ছোরা খসিয়ে নিয়ে ডানহাতে মুঠ করে ধরলে।

মেঘবর্ণ বললেন, 'রোষো কুণ্ডল, এখনই মরা নয়। আমার ছড়ি-তলোয়ার ঠিক এমনি তোমার বুকে ছুঁয়ে থাকবে, দেখ্‌ব কতক্ষণ তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারো।

এমনি আর কতক্ষণ কুণ্ডল! শেষে দেখবে লজ্জায়, রোষে, দুঃখে তুমি চারিদিক অন্ধকার দেখবে, মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে। তখন ধীরে সুস্থে তোমার কোর্ত্তার ভাঁজ থেকে লাল ফুলটা আনা যাবে।'

কুণ্ডল ক্ষেপে গেল। থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, 'মেঘবর্ণ, তুমি কম সয়তান নও। তোমার আরশী-আঙটির নীলপাথরে সবই দেখো তুমি। অথচ আমাকে ফাঁদে ফেলতে তুমি কসুর করোনি। গোড়া থেকে শেষ তুমি চমৎকার অভিনয় করেছ। তুমি কবি নও, ভণ্ড, জোচ্চোর, ঠক্ তুমি।'

'তুমি থাকতে এ সম্মান আমাকে পেতে হচ্ছে।' মেঘবর্ণ হেসে দিলেন। হঠাৎ নীল পাথরটার দিকে তাকিয়ে মেঘবর্ণের মুখে বিস্ময় ঘনিয়ে এলো। মেঘবর্ণ সেই নীল পাথরটা কুণ্ডলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

আরশী-আঙটির নীলপাথরে কুণ্ডল যা দেখলে তা তার বিশ্বাস হলনা। সে দেখলে স্বপ্নের অতীত ঘটনা। দেখলে, লঙ্কার রাজধানীর প্রান্তে ধূ ধূ বালুর মাঝে মরার মত যে ঋষি পড়েছিলেন, তিনি যেন চোখ মেলে চাইছেন। সমুদ্রের হাওয়ায় তাঁর ক্ষত যেন শুকিয়েছে ।

তখন একটা কথা কুণ্ডলের মনে হল। কুণ্ডল ঋষির বুকে ছোরা বিঁধে দিতে ঋষি বালুতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তারপর কুণ্ডল আর ঋষির পানে ফিরে তাকায় নি।

ঋষি বালুতে লুটিয়ে পড়তে বুক থেকে ছোরাখানা টেনে বার করে ফেলেছিলেন। কুণ্ডল যদি দেখত তো ছোরাখানা আবার বিঁধে রেখে আসত। বুকে ছোরা বেঁধা থাকলে ক্ষত শুকোতে পেতনা, ঋষির আর চোখ মেলে চাইতে হতনা।

কিন্তু, ওকি ? কুণ্ডল সেই নীলপাথরে দেখলে ঋষি হাতে এক টুকরো কাঁচ নিয়ে তন্ময় হয়ে দেখচেন। এযে তার মায়া কাঁচ, যে কাঁচ হাতে থাকলে এক লহমায় সহস্র যোজন পথ পেরিয়ে আসা যায়। তার হাত থেকে ছিট্‌কে গিয়ে শেষে মায়াকাঁচ পড়েছে গিয়ে ঋষিরই হাতের মুঠোয় ?

অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট ! কুণ্ডল মাথা হেঁট করলে। আরশী-আঙটির নীলপাথরটা আর চোখে সইচে না।

মেঘবর্ণ ছড়ি-তলোয়ারটা দিয়ে কুণ্ডলের বুকে আঁচড়ে দিয়ে বললেন, কুণ্ডল, নীল-পাথরের আসল দৃশ্যটা এখন ফুটচে, দ্যাখো।'

কুণ্ডল মাথা তুললে, মাথা তুলে সে তাকালে নীলপাথরটার দিকে।

ঋষি যেন সেই মায়া-কাঁচের রহস্য বুঝেছেন। ঋষি মায়া-কাঁচটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরচেন। তবে, তবে ঋষি কি বলচেন ; মায়া-কাঁচ, আমায় নিয়ে যাও অমরলতার লালফুলের কাছে !' আতঙ্কে কুণ্ডল চীৎকার করে উঠল। সেই মুহূর্তে একটা সোঁ—সোঁ ঝড়ের শব্দ উঠেই থেমে গেল।

ঋষি এসে দাঁড়ালেন মেঘবর্ণের বৈঠকঘরে।

কুণ্ডল অসাড় একটা স্তূপের মত মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। মেঘবর্ণ তার বুকে হাত দিয়ে দেখলেন তার হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে।

আমার চোখের সামনে অতীতের এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখছি। তখন মহর্ষি পিঙ্গলের কথা শুনলাম ঃ

হায় কুণ্ডল! অমরলতার লালফুল দেয় পাঁচশো বছর পরমায়ু। সহজমৃত্যুকে সে ঠেকিয়ে রাখে পাঁচশো বছর। কিন্তু যে মৃত্যু সহজ নয়, যে মৃত্যু লেগে থাকে ছোরা-তলোয়ারের আগায়, যে মৃত্যু লুকিয়ে থাকে বিষে, যে মৃত্যু অথই জলের তলায় ওৎ পেতে থাকে, যে মৃত্যু বিভীষিকা আর ভয়ের হঠাৎ ধাক্কায় দুর্ব্বল হৃৎপিণ্ড দেয় থামিয়ে সে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারেনা অমরলতা। ঋষিকে চোখের সামনে দেখে' কুণ্ডল যেন বিভীষিকা দেখলে। ভয়ে উত্তেজনায় তার হৃৎপিণ্ড গেল থেমে। লাল ফুলের পাঁচশো বছর পরমায়ু পাওয়া তার মিছে হল।

মহর্ষির কথা ফুরলো! ফিস্‌ফিস্ ক'রে তিনি বললেন, 'ঘুমোও রঙিলা, ঘুমোও। এখনো জাগা নয়। ফিরে যাও তুমি মেঘবর্ণের বৈঠক ঘরে!'

দেখ্‌লাম, মেঘবর্ণ কুণ্ডলের কোর্ত্তার ভাঁজ থেকে লাল ফুলটা বার ক'রে নিতে যাচ্ছেন! কি ভেবে মেঘবর্ণ থেমে গেলেন। মাথা হেঁট ক'রে তিনি কি ভাবতে থাকলেন।

ঋষি হেসে বললেন, 'মেঘবর্ণ, কোর্ত্তার ভাঁজে আছে লাল ফুল।

মেঘবর্ণ বললেন, 'জানি।'

'লালফুল স্পর্শ করলেই পাঁচশো বছর আয়ু হবে তোমার।'

'জানি।'

'মেঘবর্ণ কী ভাবচো তুমি?'

'ভাবচি, এই লালফুল ঋষি নিজহাতে তুলে নিন। পাঁচশো বছর পরমায়ুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিশাপ। সেই অভিশাপ চাইনা আমি।

হত্যা ও মৃত্যুকে ডেকে এনেচে লালফুল। ঋষির রক্ত ঝরেছে এর শাপে, কুণ্ডলের আয়ু ফুরিয়েছে এর ইঙ্গিতে।

এ লাল ফুলে শান্তি নেই। মানুষ এখনো একে পেতে পারে না। এখনো তপস্যার প্রয়োজন আছে। সার্থক তপস্যার শেষে লালফুল আসবে শান্তির বাণী নিয়ে। এখন একে পেতে গেলে এ দেবে অভিশাপ।'

ঋষির ললাটে চিন্তার কুটিল রেখা ফুটে উঠল। ঋষির মন আমি যেন চোখে দেখলাম। ঋষি ভাবচেন, তাহলে, তাহলে তপস্যায় কি তাঁর ত্রুটি থেকে গেছে? তিনি কি

শুধু মানুষকে পরমায়ু দেবেন, এই আশঙ্কা ক'রে তপস্যায় বসেছিলেন ? না. তাঁর মনে হীন কামনা ছিল লুকিয়ে ? পৃথিবীকে এই লালফুল উপহার দিয়ে ঋষি কি হতে চাননি মহর্ষি ? খ্যাতির লোভ ছিলনা কি তার ?

ঋষি বললেন, 'তাই হোক্। ফিরে যাক্ লাল ফুল সবুজ দ্বীপে।'

সিরাজের গোলাপটা একটু যেন শুকিয়ে আস্‌চে।

মেঘবর্ণ সেই শুকিয়ে আসা ফুলটা তুলে নিলেন। তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। তারপর তিনি যেন ভাবনায় তলিয়ে গেলেন।

আর ঋষি অমরলতার লালফুল নিয়ে একদিন সমুদ্রতীরে এসে ডাকলেন, 'শাঙ্খল।'

অমরলতার লালফুল নিয়ে মানুষের অজানা সবুজদ্বীপে চলে গেল শাঙ্খল।

ছবির মত দেখলাম আমি। তারপর মহর্ষির কথা কানে ভেসে এলো, 'নাজিরা' ঘুম তোমার ভেঙে যাক, ফিরে এসো তুমি, ফিরে এসো।'

ক্রমশঃ।

শিউলির বিয়ে

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বিয়ের ফুলটি ফোটার আগেই গায়ে হলুদ যার,
সবাই তারে ফেলবে চিনে'—শিউলি যে নাম তার।
ডালটি কিছু উঁচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে—
স্বভাবটি তাঁর রুক্ষ যেমন, গরীব সবার চেয়ে !
বেল-মালতী, জুঁই চামেলী এরা সমান ঘর,
কাজেই এদের যেমনটি চাও, জুটবে তেমন বর।
শিউলি থাকে একটি টেরে গন্ধ টুকুন ঢেকে,
শ্বেত-করবী দেখত তারে পাতার আড়াল থেকে।
প্রজাপতি—ঘটক তিনি—করেন যাওয়া আসা,
বলেন বিয়ের বয়স হল, রূপে গুণে খাসা,
পালটি ঘরের একটি যে বর—পাড়ায় থাকে সে,
বল যদি, দিন করি এই মাসের একুশে।

বাপ তো তোমার রাজীই আছে—সেয়ানা তুমি, তাই
গায়ে হলুদ দেওয়ার পরেও মত্‌টি নেওয়া চাই !
শিউলি বলে তাই যদি হয়, ঘটক, তুমি যাও,
আমি যে আজ স্বয়ম্বরা—পাড়ায় বলে দাও।"
শুনে সবাই ছি-ছি করে—'এমন দেখিনি !
কুলীন ব'লে লজ্জা সরম একটু রাখেনি !
সন্ধ্যেবেলায় ফ্‌ুল বাবুরা বললে মীটিঙ্‌ করে—
শিউলিরা সব হলেন তবে আজ থেকে একঘরে'।
হয়েছে যার গায়ে-হলুদ—বর যদি না জোটে,
জব্দ হবেন বাপ-বেটিতে, থাকবে না জাত মোটে !
শিউলি বলে, "ভয় কি বাবা ! ভাবনা কিসের শুনি ?
ভোর না হতেই বিদেয় হব,—না হয়ত ত' এখ্‌খুনি !

দখিণ-হাওয়া বল্‌লে তারে, "উড়িয়ে নে যাই চল্‌—
গোলাপী রং পরীর দেশে ঢালবি পরিমল,
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বেলে
গাঁথবে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে !
শুক তারাটি ঘুমায় যখন রাত্রিজাগার পর,
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুলবি মনোহর !
আলগা তোমার বোঁটার বাঁধন খুলব নাকি, সই ?"
শিউলি বলে, "কেমন করে' আকাশ কুসুম হই !"

জ্যোৎস্না এল, জরীর চাদর ধুলোয় লুটিয়ে,
বকুল-চাঁপা-হাস্নুহানার গন্ধ ছুটিয়ে ;
সাদা মেঘের টোপর মাথায়, জর্দ্দা চেলীর পাড়ে
চওড়া কালো ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে !
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো,
বললে, "তোমার নেই পাউডার ?—দেখায় সে কি ভালো ?

শিউলির বিয়ে
শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রূপের স্বপন দেখ্‌বে যদি বন্ধ কর আঁখি,—
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি।
নিশুত্‌ রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের,
রুক্ষ-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের।
আকাশ থেকে আসবে নেবে পরী-কুটুম্বিনী,
বনে বসেই পারবে হ'তে স্বপন-বিহঙ্গিনী।"—
একটি কথা কয়না দেখে জ্যোৎস্না গেল ফিরে,
শিউলি ভাবে—'চাইনে স্বপন ভুলতে ধরণীরে'।

আঁধার যখন আব্‌ছা হ'ল পূব-আকাশের পানে,
পাখীর ন'বৎ উঠ্‌ল বেজে ধূমেরি মাঝখানে,—
শিউলি বনে শিউরে ওঠে, বুকের তলায় তার
কিসের যেন সুখটি জাগে—গায় কি চমৎকার!
গাইছে "ওগো ফ্‌লের মেয়ে, জানি তোমার পণ,
—কোন্‌ জনারে সকল শোভা কর্‌বে সমর্পণ।
ধূলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসনখানি?
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি?
মাড়িয়ে চলে সবাই, তবু মাথায় করে শেষে—
দেব্‌তাকে দেয় শীষটি যে তার, পুণ্য আসিস্‌ যে সে!
মেঘের মতন শূন্য-পথের নয় সে উদাসী,
চপল হাওয়ার ইয়ার সে নয়, গন্ধ বিলাসী।
রূপটি যে তার প্রাণের আরাম, দূর্ব্বাদল শ্যাম—
জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম!"

শিউলি বলে, "থাম্‌ না তোরা, দুটি পায়ে পড়ি।
এখ্‌খুনি সব উঠবে জেগে বল্‌বে—গলায় দড়ি!—
সইতে আমি পারব না সে, তবু দোয়েল ভাই,
কুলীন হয়েও কেমন ক'রে এমন ঘরে যাই!

বুঝছি প্রাণে—মন টেনেছে ধূলোমাটির পানে,
দখিণ-হাওয়া আকাশ পেলেও থাক্‌ব না এইখানে।
ঝিঁঝিঁর ডাকে শুনেছিলাম করুণ কাঁদন তার—
সারাদিনের অনেক ব্যথার একটি সে ঝঙ্কার!
তাইত আমি মনেই-মনেই হলাম স্বয়ম্বর,
এক নিমিষেই আপন হল ছিল যে-জন পর!
তবু আমার এম্‌নি কপাল?—দেখতে না পাই তাকে,
জোছ্‌না আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে!...
বল্‌না তোরা ভোর হল কি? মিহিন্‌ কুয়াসায়
ছাদ্‌না তলা দেয় কি ঢেকে ওড়নাখানির প্রায়?
সেই লগনে তোরা সবাই তুলিস্‌ কলস্বর,—
ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝরুক তাহার প'র।"

*   *   *   *

সকাল বেলায় ঘুমটি ভেঙ্গে সবাই দেখে আসি—
সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি!

---

*কবির অনুমতিতে "বিস্মরণী" কবিতা-পুস্তক হইতে গৃহীত।





শ্রীকান্তর কুল্পি খাওয়া

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মেজদা'র টাইফয়েড থেকে উঠে মালাই বরফ খাবার ইচ্ছে হয়েচে। ইচ্ছে হলেই যদি সব জিনিষ পাওয়া যেত ত ভারত এতদিন স্বাধীন হয়ে যেত। সেই জন্য মেজদার আর বরফ খাওয়া হয় না। ডাক্তারেরা বলেচে এখন বরফ খেলে নিমোনিয়া হতে পারে। নিমোনিয়ার ইংরিজি বানান যে টাইফয়েডের থেকে শক্ত তা মেজদার জানা ছিল সেই জন্যে নিমোনিয়া যে টাইফয়েডের থেকে শক্ত অসুখ এ বিষয়ে মেজদা নিঃসন্দেহ তাই সমস্ত দিনটা নিমোনিয়ার ভয়ে চুপ করে থাকত কিন্তু সন্ধ্যেবেলা বরফওয়ালার ডাক শুনলেই নিমোনিয়ার ভয় কোথায় উড়ে যেত।

একদিন হঠাৎ সুযোগ মিলে গেল। পিসিমা গেছেন পাড়া বেড়াতে। বড়দা কোথায় জানি আড্ডা মারতে গেছেন। বাড়িতে আছে শুধু কতকগুলো ছেলে পিলে। অমনি মেজদার কুল্পি বরফের ক্ষিদে পেয়ে গেছে। মেজদার মনে হল বরফ না খেলে এক্ষুণি সব নাড়ি ভূড়ি হজম হয়ে যাবে। কি করি কি করি বলে মাথা চুলকতে গিয়ে হাতটা ঠুকে গেল একটা কৌটয়, আওয়াজ হল ঠং।

মেজদা তাড়াতাড়ি কৌটটা সাপটে ধরলেন, কৌটটা বেশ ভারি। অনেক কষ্টে সেটাকে বুকের ওপর তুললেন। মেজদার অসুখ হতে পিসিমা প্রত্যেক দিন ঠাকুরের নাম করে একটা করে আধুলি এই কৌটর ভেতর রাখতেন। অসুখ সেরে গেলে এই পয়সার হরিরলুট দোওয়া হবে ঠিক করা হয়েছিল কৌটটায় one way passage ছিল। পয়সা ঢোকে কিন্তু বেরোয় না। মেজদার অসুখ যদি সারে তা হলে কামার দিয়ে খোলার ব্যবস্থা করা হবে ঠিক করা হয়েছিল। মেজদার কিন্তু খোলার কায়দা জানা ছিল। তাড়াতাড়ি বিস্কুটের বাক্স কাটা টিনটা বিছানা থেকে কুড়িয়ে নিলেন। ব্যস্ তারপর ঘুটুং করে একটা আধুলি বের করে নিলেন। তাড়াতাড়ি কৌটটা যথা স্থানে রেখে মেজদা বুকের ওপর থেকে আধুলিটা কুড়িয়ে নিলেন। চেয়ে দেখেন 'ও হরি আধুলি নয় পয়সা'। পিসিমা আধুলিতে ভেজাল দিয়ে ছিলেন; ভেবেছিলেন হয়ত অতগুলো আধুলির মধ্যে দু'চারটে চকচকে পয়সাও আধুলি হয়ে যেতে পারে; as for

example ভাল ছেলে বদ ছেলেদের পাল্লায় পড়লে বিগড়ে যায়। মেজদা পিসিমার এসব private খবর জানতেন না। আর একটা পয়সা বার করবার জন্যে তাবার সব সাজ সরঞ্জাম বার করলেন; এবারেও হল ঘুটুং। এবার মেজদার good luck, একটা আধুলি বেরুলো। উদার-হৃদয় মেজদা আগেকার পয়সাটা বাক্সের মধ্যেই চালান দিলেন। একমিনিটের মধ্যেই এক আধুলিটা ছাড়া আর সব জিনিসই যথাস্থানে চলে গেল আর ছুরিটা মেজদার হাত থেকে লাফিয়ে একটা সেলফের ওপর চড়ে বসলেন। খানিকক্ষণ বর্ত্তমান ব্যাপারটাকে ভেবে নিয়ে মন স্থির করে ডাকলেন—'শ্রীকান্ত!'

শ্রীকান্ত পাশের ভাড়ার ঘরে কি একটা দরকারী কাজ সারছিল। ডাক শুনেই সাড়া দিল······কেন? আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়ার ঘর থেকে কি একটা পড়ার আওয়াজ এলো। শ্রীকান্ত তাড়াতাড়ি অবস্থাটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে বলে উঠলো—"না, না! মেজদা, আমি আপনাকে ও কথা বলিনি·········· আজ্ঞে কি বলচেন?···········কেন বলছিলুম এই বেড়ালটাকে দেখচেন না কি হুটোপাটি করচে।"

মেজদা শ্রীকান্তর থেকে মাত্র বছর পাঁচ ছয়ের বড়। তা হলে কি হয় শ্রীকান্ত মেজদাকে আপনি বল্‌তে বাধ্য হয়, আর আজ্ঞে না বললে গরম কালে মেজদা যখন দুপুর বেলা ঘুমুতেন তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে হত। শ্রীকান্তদের বাড়িতে ইলেকট্রিক ফ্যান ছিল না আর থাকলেও বোধ হয় মেজদার ঘরে থাকত না। মেজদার এম, এতে Economics পড়বার ইচ্ছে আছে। তিনি এসব বাজে খরচ দেখতে পারেন না, যদিও মেজদা এম, এর দোর অবধি পৌছবেন কিনা এবিষয়ে শ্রীকান্তর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্রীকান্ত চুপি চুপি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মেজদা সুস্থ শরীরে থাকলে আজ সমস্ত রাত্রি শ্রীকান্তকে মেজদার পা টিপে দিতে হত। মেজদার দুর্ব্বল শরীর এই শ্রীকান্তর যা ভরসা। মেজদা একবার শ্রীকান্তর আপাদ মস্তক দেখে নিলেন তারপর কাছে আসবার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। শ্রীকান্ত বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালো। মেজদার শান্ত গম্ভীর ভাব যে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ তা শ্রীকান্ত বেশ ভাল রকমই জানতো। কাছে আসতেই মেজদা শ্রীকান্তকে ধমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—'ও ঘরে কি করছিলি।'

শ্রীকান্ত মুখ কাঁচু মাচু করে বলল—"আজ্ঞে ঐ ও ঘরে একটা বেড়াল ঢুকেছিল তাই তাড়াচ্ছিলুম।

মেজদা ধমকে উঠে বললেন—"ফের মিথ্যে কথা; বেড়াল ঢুকল কি করে? দরজায় ত চাবি লাগান ছিল।" যদিও চাবি লাগান কথাটা মেজদার অনুমান মাত্র।

শ্রীকান্ত একটু ভয় পেয়ে বল্ল—"দরজা দিয়ে নয় ঐ জানলা············।"

মেজদা হো হো করে হেসে উঠে বললেন "তবে জানলা দিয়ে ঢুকেচে কি বল? কিন্তু জানলায় ত জাল দেওয়া।"

শ্রীকান্ত তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলল—"এই একটু নুন নিতে ঢুকেছিলুম আর সেই ফুরসুতে বেড়ালটা ঢুকে পড়েছিল।"

শ্রীকান্তর কুল্পি খাওয়া
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মেজদা মনে মনে বললেন 'পথে এসো বাছাধন' তারপর শ্রীকান্তকে বললেন—"নূন? নূন ত রান্না ঘরে থাকে।"

শ্রীকান্ত ঘেবড়ে গিয়ে বলল—"নাঃ না! তা বলচিনা। ঐ যে ঝিটা যে বলল একটু নূন আর একটু তেঁতুল দাও বাসন মাজবো।"

মেজদা আর একবার হো হো করে হাসলেন। হেসে বললেন—"হু, নূন আর তেঁতুল দিয়ে বুঝি বাসন মাজে।"

শ্রীকান্ত 'ঐ ঝিটা তো তাই বললে' 'ঐ ঝিটা তো তাই বললে' বলে এক রকম নিজের দোষ স্বীকার করে নিল।

মেজদা ডাকলেন—"এদিকে আয়।"

শ্রীকান্ত আস্তে আস্তে মেজদার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

মেজদা বললেন—"হাত দেখি।"

এবার হাতে যে কি পড়বে তা শ্রীকান্ত বেশ বুঝতে পেরেছিল। চোখ বুজিয়ে সহ্য করবার জন্যে ready হতে লাগল। কিন্তু হাতে পড়ল এক অপূর্ব্ব জিনিষ। শ্রীকান্ত চেয়ে দেখলো একটা আধুলি। ফ্যাল ফ্যাল করে শ্রীকান্ত মেজদার মুখের দিকে চাইল।

মেজদা শ্রীকান্তর অবস্থা দেখে একটু মুচকে হেসে বললেন-"যা আজ তোকে ক্ষমা করলুম। এখন একটা বরফওয়ালা ডাক দিকিনি। এই নে আধুলি আমার জন্যে একটা ছোট্টো দেকে কিনে আনবি; আর বাকি পয়সা দিয়ে তুই নিজে খাবি।"

শ্রীকান্ত মেজদার এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে মেজদার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কাজ হাসিল করবার জন্যে দৌড়ল। শ্রীকান্তর Good luck, দরজার সামনেই এক বরফওলার সঙ্গে দেখা, মেজদার আন্তরিকতায় আজ শ্রীকান্তর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। বরফওয়ালাকে বলল-"ওহে একটা বেশ বড় দেকে মালাই দাওতো হে"। একটা কাচের প্লেটে বরফ নিয়ে মেজদার কাছে হাজির।

বরফ খাওয়া সমাপ্ত করে মেজদা শ্রীকান্তকে বললেন—"জানিস্, শ্রীকান্ত এ বরফটা মোটে ভাল না; খেয়ে সুখ হল না। আর একটা খুব ছোট্টো দেখে নিয়ে আয়।" ব'লে তিনি হাত দিয়ে কুলপির মাপটা দেখিয়ে দিলেন। শ্রীকান্ত গেল আর মেজদার মাপ অনুযায়ী আর একটা নিয়ে এল। মেজদা এক গালে একটা খেয়ে ফেল্লেন তারপরে বললেন—"এটা কি নিয়ে এলি শ্রীকান্ত। যা আর আর একটা ছোট্ট দেকে নিয়ে আয়।" তারপর খানিকটা থেমে বললেন "তা বলে এইটের মতন যেন নিয়ে আসিস্ নি। ঐ আগের টার মতন নিয়ে আসবি।"

শ্রীকান্ত আবার গেল, নিয়েও এলো। মেজদা সেটাও খেলেন তারপর মুখটা কি রকম করে বললেন—"শ্রীকান্ত, শরীরটা কেমন কেমন করচে। এই তোর জন্যেই তো এমন হল। তুই কেন বরফ কিনতে গেলি বল দিকিনি।" একটু খানি হাফিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—"আমি বললুম বলেই কি নিয়ে

আসতে হয়। আমার বলার সঙ্গে কি আসে যায় আমার কি আর মাথার ঠিক আছে। রোগের ঝোঁকে কি বলেচি আর উনি তাই করেচেন।" এই বলে তিনি কাজের কথা পাড়লেন—বললেন "যা করেচ কিন্তু এ কথা যদি মাকে বলেচ ত বুঝবে মজা।"

শ্রীকান্ত ঘাড় নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলো যে সে কিছুতেই বলবেনা, বলতে পারে না। তারপর মেজদা শ্রীকান্তকে বরফ খাবার ছুটি দিলেন। শ্রীকান্ত দৌড়ুল বরফ খেতে। বরফওয়ালার কাছে গেছে না পৌছান অমনি খিড়কি দোরে পিসিমার গলার আওয়াজ শ্রীকান্ত শুনতে পেল। খিড়কি দোরের কাছে একটা মাছের কাঁটা পড়ে আছে তাই তিনি কিছুতেই ঢুকতে পাচ্ছেন না; আর সেই জন্যে তিনি ঝিকে ডাকচেন; আর ঝি এই রাত দুপুরে চান করবার ভয়ে সহজে সাড়া দিতে চাইচেনা।

শ্রীকান্ত বরফওয়ালাকে তাড়াতাড়ি বলল—"এই নাও আট আ. . পয়সা, বাকি পয়সা যা বেঁচে আছে তাই দিয়ে কতকগুলো বরফ দাও।" বলে একটা কলাই করা বড় রেকাব তার হাতে দিল।

বরফওয়ালা জানত ছোট ছেলেরা সিদ্ধি বরফ খাবার ইচ্ছে হলে এই রকম করেই বলে। তারা সিদ্ধি কথাটা লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারে না। বরফওয়ালা শ্রীকান্ত মুখের দিকে চেয়ে একটু মুচকে হেসে ৪টে কুলপি ওর থালার ওপর দিয়ে আধুলিটা বাজিয়ে নিয়ে চলে গেল। শ্রীকান্তের বরফের রূপ দেখবার সময় ছিলনা। এক লাফে পাশের অন্ধকার গলিতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বরফগুলো খেয়ে থালাটা হাতে করে বাড়ি ঢুকলো। তাড়াতাড়ি কলতলায় গিয়ে থালাটা ধুয়ে সেটাকে ঠিক জায়গায় রেখে পিসিমার অলক্ষ্যে চুপি চুপি পড়বার ঘরে ঢুকল।

এখানে মেজদার অসুখ করেচে। পড়বার ঘরে এখন ওদেরই রাজত্ব। যতীন পড়বার ঘরেই শুয়ে ঘুমুচ্চে। ছোড়দা না জানি কোথায় গেছে। এতক্ষণ ত এখানে ছিল। শ্রীকান্ত খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়া আরম্ভ করল।

আধঘণ্টা পড়ে ছোড়দা ফিরল। ছোড়দা শ্রীকান্তকে পড়তে দেখে একেবারে অবাক। এ ক'দিন মেজদার অনুপস্থিতিতে তাদের পড়া শিকেয় উঠেছিল। সন্ধ্যেবেলা লুডো খেলা আর মেজদার নিন্দে হত। আর মাঝে মাঝে মেজদার সেই আদালতের খাতাটার পাতা ছিঁড়ে নৌকা, জাহাজ এই সব তৈরী হত। ছোড়দা এসে ডাকল "এই শ্রীকান্ত।"

শ্রীকান্ত তখন পড়চে—"আকবর, নামে এক রাজা ছিল তার বাবার নাম হনুমান ঠাকুর দাদার নাম বাঁদর।"

ছোড়দা আবার ডাকল—"এই শ্রীকান্ত, কি পড়ছিস্।"

শ্রীকান্ত বইটা ছোড়দার নাকে ছুঁড়ে মেরে মেজদার আদালতের খাতাটা টেনে গম্ভীর ভাবে পড়তে আরম্ভ করল—

Little drops of water,
Little grains of sand
Make the.........

আর পড়তে হলনা, ছোড়দা রাগে শ্রীকান্তর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সে কি হুটোপাটি। দুজনে কালির দোয়াত উলটে হাতে মুখে কালি মেখে বই ছিড়ে একেবারে লঙ্কা কাণ্ড।

হৈ হট্টোগোল শুনে পিসিমা এসে হাজির। বড়দাও এমন সময় বাড়ী ঢুকলেন। অনেক কষ্টে দুজনকে ছাড়ান হল। ছোড়দা রাগে দুঃখে ব্যথায় কেঁদে ফেলল। শ্রীকান্ত ছোড়দার ঐ কালী মাখা মুখ দেখে হেসেই অস্থির। বড়দা যত বলেন 'এই শ্রীকান্ত, কি হচ্চে' শ্রীকান্তের হাসিও তত বাড়তে থাকে॥

বড়দা শেষে শ্রীকান্তকে ছেড়ে ছোড়দাকে জিজ্ঞেস করলেন 'কি হয়েছিল রে?'

কি যে হয়েছিল তা ছোড়দাও ভাল জানে না। যতটুকুও বা জানত তাও ভুলে গেছে। ছোড়দা বলল 'ঐ শ্রীকান্তকেই জিজ্ঞেস কর না।' শ্রীকান্তকে জিজ্ঞেস করবে কি? শ্রীকান্ত তখন আওড়াচ্ছে

Little drops of water
Little grains of sand
Make the..............

বড়দা আবার দিলেন ধমক আর শ্রীকান্তর সে কি কান্না; হাউ হাউ করে কান্না। যতীনের ঘুম এতক্ষণও ভাঙ্গে নি এইটেই আশ্চর্য্য। কান্না শুনে ভাঙ্গল। ভাবল বুঝি পড়ার জন্যে বড়দা সকলকে ঠেঙ্গাচ্চেন। উঠেই সে দৌড়। কিন্তু বেচারার দুর্ভাগ্য, চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল। ছোড়দা আর শ্রীকান্তর মুখ হয়েছিল কালো আর যতীনের মুখ হল লাল।

মেজদা নীচের গোলমাল শুনে অনে'ক্ষণ ব্যাপারটা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন কিন্তু শেষকালে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে একলাই দেওয়াল ধরে ধরে নীচে নেবে এসেছিলেন।

পিসিমা যতীনের হাত ধরে নিয়ে চলে গেলেন আর ডাক্তার ডাকতে হুকুম দিয়ে গেলেন। হুকুমটা যে কাকে দিলেন, আর কে যে তা তামিল করবে সেটা ভাল বোঝা গেল না। হয় ত মেজদাকেই।

মেজদা শ্রীকান্তকে দেখেই তার ব্যাপারটা এক নিমিষে বুঝে নিলেন। পাছে তাকে দেখে ফেলে কোন বেফাঁস কথা শ্রীকান্তর মুখ দিয়ে বেড়িয়ে যায় তাই ভয়ে ভয়ে ওপরে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

শ্রীকান্ত মেজদাকে দেখেই আবার কান্না থেমে গেল। আবার হাসি আরম্ভ হল। ব্যাপারটা সুবিধে নয় বুঝে মেজদা একটু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সিঁড়িতেই মাথা ঘুরে শুয়ে পড়লেন।

ব্যাপারটা ক্রমশই ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচ্চে। এমন সময় ভজহরি ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে এসে হাজির। মেজদার condition সবচেয়ে serious. সেই জন্যে আগে ডাক্তার বাবু তার কাছে গেলেন। সিঁড়ির কাছটা ভয়ানক অন্ধকার। পড়বার ঘরে সেইজন্য আলোটা নিয়ে যাওয়া হল।

শ্রীকান্ত সেই অন্ধকারেই পড়ে রইল। খানিক পরে আবার আরম্ভ করল—আকবর নামে এক রাজা ছিল তার বাবার নাম হনুমান ঠাকুরদাদার—

এমন সময় ডাক্তারবাবু বড়দাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কথাগুলো বলার ধরণ শুনে বললেন—"জানেন এ নেশা করেচে"। বড়দা শ্রীকান্তর অধঃপাতের পরিমাণ শুনে অবাক হয়ে গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে

তার হাত দুটো ঘুসি পাকিয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি তা'কে থামিয়ে বললেন—"এখন ও রকম মেজাজ দেখানো উচিত নয়; ও হয়ত জেনে খায় নি।"

এখন ডাক্তারবাবু শ্রীকান্তর হাত দুটো ধরে ঝাকানি দিয়ে বললেন—"কি খেয়েচ ?"

শ্রীকান্ত তখন বলচে—Little drops of water

বড়দা তেড়ে মারতে এলেন। ডাক্তারবাবু তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"কোত্থেকে পেলে ?"

শ্রীকান্ত। Little grains of sand.

এইটে শুনে বড়দার মেজাজ ঠাণ্ডা হল। ডাক্তারবাবু একটুখানি প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। এমন সময় ছোড়দা এসে বললেন—"জানলে বড়দা শ্রীকান্ত সিদ্ধি বরফ খেয়েচে।" খুনোখুনি ব্যাপার দেখে মেজদা ভয়ে সমস্ত ব্যাপারটা পিসিমার কাছে খুলে বলেচেন।

ডাক্তারবাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন—"হুঁ এটা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলুম। এখন রাত্তিরে একে একটা ঘরে চাবি বন্ধ করে রেখে দিন। আচ্ছা আমি তা হলে এখন আসি।"

"আচ্ছা আসুন, নমস্কার।" বলে বড়দা একটা হাত কপালে ঠেকালেন কিম্বা কপালের কাছাকাছি নিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবুর কথামতই শ্রীকান্তর ব্যবস্থা হল। পড়বার অর্থাৎ বাইরের ঘরে শ্রীকান্তকে চাবি বন্ধ রেখে সকলে চলে গেল। চাবিটা বড়দার কাছেই রইল। তারপর ঘণ্টা খানেক ধরে সকলে মিলে আলোচনা করে মেজদাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হল। ব্যাপার সুবিধে নয় দেখে মেজদার ভয়ানক গা কেমন করতে লাগল আর আলোর জন্যে ভয়ানক মাথা ধরতে লাগল। সুতরাং সকলে মেজদার ঘর ছেড়ে আলো নিয়ে খাবার ঘরে চলে গেলেন।

পিসিমা শরীর খারাপ বলে কিছুই খাবেন না বললেন। আসল কথা ঐ টুকু ছেলে শ্রীকান্ত কিছু না খেয়ে থাকবে আর তিনি খাবেন এটা তার ইচ্ছে হল না। বড়দা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কতকগুলো ফল মূল বৌদি কে দিয়ে পিসিমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পিসিমা বৌদিকে তা একটা কোণে রেখে দিয়ে যেতে বল্লেন।

সে দিন সকলের শুতে রাত্রি বারটা বাজল। তার নীচের ঘরে দুম দাম-এর চোটে রাত্রি দুটোর আগে কারুর ঘুম এলনা।

সকাল হতে শ্রীকান্তর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভাবল—"আমি পড়বার ঘরে ঘুমোলুম কি করে।" পড়ার ঘরের অবস্থা দেখেই ওর চক্ষুস্থির। বাড়ির ভেতর যেতে গিয়ে দেখল দরজায় তালা লাগান। আর দরজার সামনে কতকগুলো কাটা কাটা কলা শসা সব পড়ে আছে; মনে হচ্ছে কে যেন দরজার ফাঁক দিয়ে একটা একটা করে দিয়েচে। শ্রীকান্তর ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। কালিমাখা হাতের অবস্থা দেখে ওর আর খেতে ইচ্ছে হল না। এখন হাত ধোয় কি করে। বাইরে যাবার দরজার কাছে গিয়ে দাড়াল।

শ্রীকান্তর কুল্পি পাওয়া
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

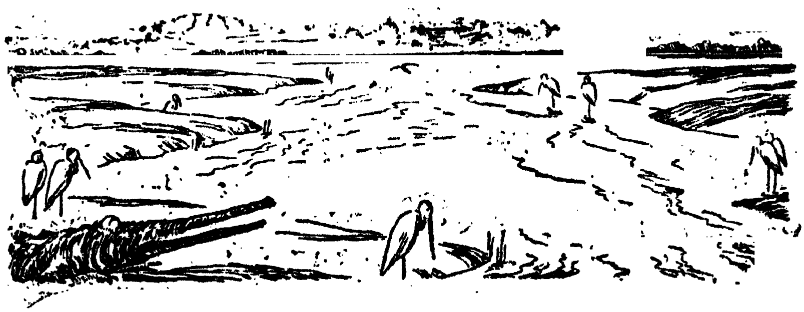
খুটুং করে ছিট্‌কিনিটা খুলে ফেলল। আরে এ দরজাটা তো খোলা। বুদ্ধিমান বড়দা বাইরে যাবার দরজাটা ভেতর দিক দিয়েই বন্ধ করে ছিলেন। রোজ চোরের ভয়ে এই রকম করেই দরজা বন্ধ করা হত। চোর মশাই যে বাইরে থাকেন আর শ্রীকান্ত যে ভেতরে ছিল এটা তার খেয়াল ছিলনা।

শ্রীকান্ত তাড়াতাড়ি বাইরে দিয়ে গিয়ে খিড়কি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো। কলতলায় গিয়ে কাপড় কাচা সাবানই মুখে হাতে পায়ে মেখে ভদ্রলোক হয়ে ঘরে ফিরে এল। কালকের রাত্রি জাগরণের জন্যে এখনও কেউ বাড়িতে ওঠে নি। শুধু ঝিটা বাসন মাজছিল। শ্রীকান্ত পড়বার ঘরে ঢুকে কালকেকার রাত্তিরের ব্যাপারটা ভাববার জন্যে বৃথা চেষ্টা করল। কিছুই মনে এলো না। বরফ খাবার পরে পড়তে বসেছিল এই অবধি মনে আছে। তারপর কি হল, কি করে যে রাত্রি কাটল কিছুই মনে পড়ে না। ভয়ানক ক্ষিদে পাচ্ছিল। ভাবনা টাবনা এখন স্থগিত রেখে শ্রীকান্ত সেই ফলগুলো একের পর এক খেতে লাগল। তারপর হাত মুখ মুছে বইগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। হঠাৎ ইতিহাস বইটায় হাত পড়ে গেল। ইশ, বইটা কি রকম ছিঁড়ে গেছে। কাল অবধি একদম নতুন ছিল।

দরজা খোলার আওয়াজ শুনে শ্রীকান্ত যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে পড়া আরম্ভ করল।

দরজা খুলতেই বড়দা শুনলেন শ্রীকান্ত পড়চে—"আকবর নামে ভারতবর্ষে এক সম্রাট ছিলেন। তার পিতার নাম হুমায়ুন পিতামহের নাম বাবর। পুত্রের নাম জাহাঙ্গীর, পৌত্রের............।"

হনুমানকে হুমায়ুন, আর বাঁদরকে আবার বাবর হতে দেখে বড়দা নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির আর সকলকে ডাকবার জন্যে তাড়াতাড়ি ওপরে চলে গেলেন।





সপ্তম পরিচ্ছেদ

মহাকালের অভিশাপ

জয়ন্তের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে মাণিক বললে, "জয়, তুমি কি মনে কর, ও গাড়ী দুখা'নার মধ্যে আমাদের শত্রু আছে ?"

জয়ন্ত বললে, "শত্রু-মিত্র জানিনা, আমি কেবল সতর্ক হয়ে থাকতে চাই।"

জয়ন্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ভেঁা ভেঁা ভেঁা ভেঁা ক'রে ক্রমাগত 'হর্ণ' বাজাতে বাজাতে প্রথম মোটরখানা তীব্র-গতিতে সাঁৎ ক'রে তাদের চোখের সুমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় গাড়ীখানা! গাড়ী তো নয়, যেন দু-দুটো অগ্নিহীন উল্কা, সে প্রচণ্ড গতির ঝড়ের ভিতর থেকে চেনা বা অচেনা কোন মানুষের মুখই আবিষ্কার করা গেল না!

সুন্দরবাবু বললেন, "মেল-ট্রেণের স্পীড্ও এদের কাছে বোধহয় হার মানে! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এরা কেন যাচ্ছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে ?"

পথের ধুলোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "যেখানেই যাক্, ওরা আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না। আমরা ওদের নাগাল ধরবই!"

সুন্দরবাবু বললেন, "নাগাল ধরবে মানে ? ওদের নাগাল ধরতে গেলে আমাদেরও তো ওদের চেয়ে বেশী জোরে গাড়ী ছোটাতে হয়! হুম্, আমি তাতে মোটেই রাজি নই! গাড়ী যদি একবার হোঁচট্ খায়, তা'হলে ওঙ্কারধাম দেখবার আগেই গোলোকধামে গিয়ে হাজির হ'তে হবে!"

জয়ন্ত রূপোর নস্যদানী থেকে একটিপ্ নস্য নিয়ে বললে, "সুন্দরবাবু, ছেলেবেলায় কচ্ছপ আর খরগোসের গল্প পড়েন নি ? কচ্ছপ দৌড়ে খরগোসকে শেষে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা গাড়ীর স্পীড্ না বাড়িয়েও ওদের নাগাল ধরব। পথের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধূলোর ওপরে ওদের গাড়ীর চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না ?"

সুন্দরবাবু বললেন, "ও হো হো হো, বুঝেছি ! ঐ দাগ ধ'রে আমরা ওদের পিছু নিতে পারব, তুমি এই বলতে চাও তো ?"

অমলবাবু বললেন, "কিন্তু ওদের পিছু নেবার দরকারই বা কি ?"

জয়ন্ত বললে, "দরকার একটু আছে বৈকি ! এমন মারাত্মক স্পীড্ নিয়ে যারা আমাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের নিয়ে মাথা না ঘামালে চলবে কেন ?"

অমলবাবু ভীত কণ্ঠে বললেন, আপনি কি বলতে চান, ঐ গাড়ী তু'খানার মধ্যে চ্যান্ আর ইন্ আছে ?"

—"চ্যান্‌কেও চিনি না, ইন্‌কেও চিনি না, এখন উঠুন্ গাড়ীতে !"—এই ব'লে জয়ন্ত নিজের গাড়ীর ভিতরে গিয়ে ব'সে পড়ল। আর সকলেও তখন তার অনুসরণ করলে, গাড়ী তিনখানা আবার অগ্রসর হ'তে লাগল।

জয়ন্ত প্রথম গাড়ীর ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসল, পূর্ব্ববর্ত্তী গাড়ীগুলোর চক্রে চিহ্নিত পথের উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্যে।

মাণিক সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, "আচ্ছা জয়, যারা গেল তারা যদি চ্যানের দল হয় তবে তারা আমাদের আক্রমণ না ক'রে এগিয়ে গেল কেন ? আর, শত্রুরা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে এলই বা কি ক'রে ? আমাদের জাহাজে তারা তো ছিল না ;"

জয়ন্ত বললে, "চ্যান্ আর ইন্ হয়তো এখনো এখানে এসে পৌঁছতে পারে নি, কিন্তু মাণিক, তুমি ভুলে যেওনা যে, এটা হ'চ্ছে বিশ শতাব্দী ! চ্যানের টেলিগ্রাম হয়তো আমাদের আগেই কালাপানি পার হয়েছে।"

—"জয়, তুমি কি বলতে চাও, চ্যানের কোন টেলিগ্রাম পেয়ে তার দলের লোকরা আমাদের পিছু নিয়েছে ?"

—"হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে ! হয়তো ওরা হুকুম পেয়েছে আমাদের উপরে পাহারা দেবার জন্যে ! ওঙ্কারধামে যাবার প্রধান রাস্তা হচ্ছে এইটিই। হয়তো ওরা এগিয়ে গেল আমাদের পথ আগ্‌লে থাকবার জন্যে।"

গাড়ী ছুটছে! দু'ধারে সেই সবুজ ক্ষেত, আর মাঝখানে সেই সোজা রাঙা রাস্তা।......

মাণিক বললে, "দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।"

ড্রাইভার বললে, "হ্যাঁ, ওর নাম সিয়েম্ রিপ্। আর মাইল খানেক পরেই আমরা ডাকবাংলোয় গিয়ে পৌঁছব।"

সিয়েম্ রিপ্ গ্রাম থেকে উত্তর-দিকে মোড় ফিরতেই চোখের সাম্নে জেগে উঠল, বিরাট ওঙ্কারধামের বিপুল দেবালয়! চারিধারের নিবিড় জঙ্গল ও সুদীর্ঘ বনস্পতিরা ওঙ্কারধামের পঞ্চ-চূড়ার অনেক নীচে প'ড়ে রয়েছে। দূর থেকে ওঙ্কারধামকে দেখে মনে হ'ল, বিরাটতায় সে মিশরের পিরামিডের চেয়ে এবং সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন রূপে সাজাহান বাদসার তাজমহলের চেয়ে খাটো নয়! এই অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ তাকে দেখলে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। এ যেন আলাদীনের প্রদীপবাহী দৈত্যের হাতে গড়া কোন অসম্ভব মায়ামন্দির যে-কোন মুহূর্ত্তে দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শূন্যে মিলিয়ে যেতে পারে!

* * * *

ওঙ্কারধামের ছায়ায় এসে দেখা গেল, তাদের অগ্রবর্ত্তী সেই গাড়ীদু'খানার চাকার দাগ বাংলো ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবু সর্ব্বপ্রথমেই ডাক-বাংলোয় ঢুকে একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হুম্, এইবারে আহার আর বিশ্রাম!"

জয়ন্ত বললে, "আপাততঃ আমাকে ও-দুটি সুখ থেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। আগে বাংলোর চারিদিকটা তদারক না ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।"

মাণিক বললে, "কিন্তু এখানে তদারক করবার কিছু আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। চারিদিক শান্তিময়, শত্রুদের কোন চিহ্নই নেই!"

হ্যাঁ, ঝড়ের আগে প্রকৃতি খুব শান্ত থাকে বটে"—মৃদুস্বরে এই কথা ব'লেই জয়ন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলবাবু বললেন, "এই ওঙ্কারধাম আমার পুরাণো বন্ধুর মত। মাণিক, আগে আমি মন্দিরের সঙ্গে আলাপ ক'রে আসতে চাই'।'

মাণিক বললে, "এই অদ্ভুত মন্দির আমারও কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।"

অগ্রসর হ'তে হ'তে অমলবাবু অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে যেন সুদূর অতীতের দিকে তাকিয়েই যে-কাহিনী বর্ণন করলেন তা হচ্ছে এই ঃ

অস্তলোক থেকে পূর্ব্ব-আকাশের গায়ে ছবির মতন আঁকা নীলপাহাড়ের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর পর যাত্রী—যেন তাদের আর শেষ নেই !

চলেছেন রাজা আর রাজপুত্ররা সাজানো হস্তীদলের পৃষ্ঠে ! চলেছেন রাজপুরোহিতগণ সোনার রথে চ'ড়ে ! চলেছেন বীরবৃন্দ ও সৈনিকগণ তেজীয়ান অশ্বদের উপরে ব'সে ! চলেছে সভাসদ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কর্ম্মচারী, সওদাগর ও ধনীদীন প্রজার দল যথাযোগ্য যান-বাহনে বা পদব্রজে ! চলেছে রুগ্ন ও ভিখারীর দল অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের উপর দিয়ে বা সন্ন্যাসীর গায়ে-মাখানো শুক্‌নো ভস্মের মত সাদা ধূলোয় ভরা উঁচু-নীচু পথ মাড়িয়ে ;—তাদের কোন সম্পদ নেই, তবু তারাও পিছনে প'ড়ে থাকতে রাজি নয়, কারণ তাদের মনে মনে জ্বলছে উজ্জ্বল আশার অম্লান বাতি ! হাজারের পর হাজার, লক্ষের পর লক্ষ লক্ষ লোক চলেছে, এগিয়ে চলেছে ! কত লোকের দেহ পড়েছে এলিয়ে, পায়ে পড়েছে ফোস্কা, তবু তারা এগিয়ে চলেছে ! পথের মাঝে জাগছে পাগ্‌লীনদীর ক্রুদ্ধ ঢেউ, দুরারোহ শৈলের দর্পিত শিখর, দুর্গম বনের জ্বালাময় কণ্টক-প্রাচীর, তবু তারা সব পেরিয়ে চলেছে এগিয়ে—মুখে মুখে জাগিয়ে তুলে কবি-ঋষিদের রচিত পবিত্র মন্ত্রসঙ্গীত ! কত শত শত মানুষের অক্ষম ভগ্ন দেহ জনহীন অনন্ত পথের উপর লুটিয়ে পড়ল, তবু তাদের আত্মা এগিয়ে চলল সেই বিপুল বাহিনীর পিছনে পিছনে !.........কিছুদিন পরে দিনের রোদে আর রাতের জোছনায় দেখা গেল, সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ নির্দ্দয় পথ জুড়ে প'ড়ে রয়েছে মাংসহীন নরকঙ্কালের পর নরকঙ্কাল,—জীবনের যাত্রাপথে যে-সব অভাগা এগিয়ে যেতে পারলে না তাদেরই শেষ-চিহ্ন !

যারা এগিয়ে গেল আর যারা এগিয়ে যেতে পারলে না, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভারত-সন্তান ! হিমালয়ের আশ্রয় ছেড়ে, গঙ্গার স্নিগ্ধ স্পর্শ ভুলে, সাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশের নিবিড় অরণ্য ভেদ ক'রে রাজা-প্রজা, পুরুষ-নারী মা-ছেলে, বর-বউ, কুমার-কুমারী এইখানে এসে অবশেষে কাম্যলোকের সন্ধান পেলে—আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির উপর দিয়ে পদ-চারণ করছি ! সে হচ্ছে শত শত যুগ আগেকার কথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে তখনো কোন বিধর্ম্মী প্রবেশ করতে সাহসী হয় নি। খুব সম্ভব তারা যে দেশ থেকে এসেছিল আজ আমরা তাকে মাদ্রাজ ব'লে জানি। ওঙ্কারধামের পাথরে পাথরে তারা যে সংস্কৃত ভাষার লিপি ক্ষুদে গেছে, তাই দেখেই এই সত্য জানা যায়। ওঙ্কারধামের অসংখ্য মূর্ত্তিও তাদের মৌন ভাষায়

আর এক নিশ্চিন্ত সত্য প্রকাশ করবে : যাদের শিল্পনিপুণ হাত তাদের গড়েছে তারা প্রথমে ছিল হিন্দু, তারপরে বৌদ্ধ !

এইখানে গহনবন কেটে তারা বিপুল সভ্যতা ও বিরাট নগর আর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের হাতের অমর চিহ্ন আজও প্রায় অটুট হয়েই আছে। ভারতের গান্ধার, সারনাথ বা কণারকের মত এখানে আমরা কোন প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব না, ওঙ্কারধামের শত শত শিলাচিত্র, হাজার হাজার দেবতাদানব মানব ও পশুর মূর্ত্তি আজও সম্পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে। এখানকার প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি দেখলে সন্দেহ হবে, বয়সে তারা মোটেই পুরাতন নয়, সেকালে তারা যেমন শক্ত আর নিরেট ছিল আজও সেই রকমই আছে ! বৃষ্টির জল আজও ছাদ ফুটো করতে পারে নি !

.........মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগেই যেন জীবন্তদের কলকোলাহলে ছিল চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে—দেবদাসীরা পায়ে নূপুর খুলে যেন এই সবে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে গেছে, পুরোহিত মন্ত্র প'ড়ে পূজো সেরে এই সবে যেন চোখের অন্তরালবর্ত্তী হয়েছেন, ধূপ-ধুনো অগুরুর গন্ধ যেন আর একটু আগে এখানে এলেই পাওয়া যেত !

ঐতিহাসিকরা বলেন, এক সময়ে ওঙ্কারধামের মতন বড় সহর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যেত না। নবম শতাব্দীর প্রথমে ভারত-শিল্পী যখন এই সহরকে সম্পূর্ণ ক'রে, তুলেছিলেন, তখন য়ুরোপের যে কোন নগর এর কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হ'ত ! এথেন্স-রোম, কার্থেজ ও বাবিলন প্রভৃতি বিখ্যাত ও অমর নগর তাদের উন্নতির দিনেও যে ওঙ্কার ধামের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, এমন মনে করবার মত প্রমাণ নেই !

কিন্তু গভীর জঙ্গল আর হিংস্র পশুদের কবলে এত যত্নে গড়া মন্দির আর রাজধানীকে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় গেল সেই ভারতীয় রাজা, যোদ্ধা, সওদাগর আর শিল্পীর দল ? কোথায় গেল এই সাগরপারে প্রবাসী ভারতীয় সভ্যতা ? আজকের বোবা ওঙ্কারধাম সে প্রশ্নের কোন উত্তর দেয় না। কেবল মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগে যারা এখান থেকে চ'লে গিয়েছে যে-কোন মুহূর্ত্তেই তারা আবার ফিরে এসে মন্দির আর নগর পুনরধিকার করতে পারে।

অবাক হয়ে অতীত-ভারতের এই ইতিহাস শুনতে শুনতে মাণিক পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সূর্য্য তখন সুদূর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে—পশ্চিম-আকাশের মায়াপুরীর রঙিন কিরণমালা তখনো দুলছে হাল্‌কা মেঘে মেঘে। ওঙ্কারধামের পদ্ম-ফোটা খালের ঝিল্‌মিলে জলে, বট আর নারিকেল-কুঞ্জের ভিড়ে ক্রমেই বেশী ক'রে জ'মে উঠছে আসন্ন সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া !

বিভিন্ন দল বেঁধে ছোট ছোট মেঘের মত ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে এবং তাদের কলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাণে আসছে দূরের মন্দির-গর্ভ ভেদ ক'রে আধুনিক বৌদ্ধ পুরোহিতদের গম্ভীর মন্ত্র-ছন্দ! শুনলে আত্মা শিউরে ওঠে,—এ কি বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠরব, না বহুযুগের ওপারে ব'সে ওঙ্কারধামের গৌরবের দিনে একদিন যারা এখানে উদাত্ত স্বরে স্তবপাঠ করত, তারই সুদীর্ঘ প্রতিধ্বনি আজও বেজে বেজে উঠছে মন্দিরের শিলায় শিলায়, অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ?

মাণিক হঠাৎ মুখ তুলে সবিস্ময়ে দেখলে, তার সুমুখেই জেগে উঠেছে আশ্চর্য্য ও বিচিত্র এক নগর-তোরণ! দেখেই সে চিনতে পারলে, কারণ এই বিখ্যাত তোরণের বহু চিত্র সে ইংরেজী কেতাবে এর আগেই দেখেছে! কিন্তু এর আসল ভাবের কোন আভাস ছবিতে কেউ ফোটাতে পারে নি।

খুব উঁচু সেই নগর-তোরণ, তার দ্বারপথ দিয়ে অনায়াসে বড় বড় হাতী আনাগোনা করতে পারে এবং তার উপরে জেগে রয়েছে চারিদিকে চারিটি বিরাট শিবের মুখ! এমন বৃহৎ শিবের মুখ মাণিক জীবনে কোনদিন দেখে নি!

ওঙ্কারধামের একজন হিন্দু রাজা একখানি শিলালিপিতে এই নগরকে "প্রবলপরাক্রান্ত ও ভয়াবহ" ব'লে বর্ণনা ক'রে গেছেন। এখানকার হিন্দুরা জীবনধারণ করত তরবারির সাহায্যেই। তাদের স্থাপত্যেও প্রকাশ পেয়েছে সেই প্রচণ্ড ভাবই! কারণ বাহির থেকে ভিতরে ঢুকতে গেলেই শিবের যে প্রকাণ্ড মুখখানি দেখা যায়, তা ভয়ানক বটে,—সে যেন আগন্তুককে বলতে চায়, সাবধান! পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের মুখদুখানি যেন অনন্তের ধ্যানে আত্মহারা। এবং তোরণের ভিতরদিক থেকে যে-মুখখানি নগরের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ভিতর থেকে যেন আশীর্ব্বাদ ও বরাভয়ের ভাব আবিষ্কার করা যায়!

প্রলয়-কর্ত্তা শিবকে নগররক্ষীরূপে নির্ব্বাচন ক'রে ওঙ্কারধামবাসী ভারতীয়রা উচিত-কার্য্যই করেছে। কারণ, বারে বারে তারা যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করত পৃথিবীর বুক ভেসে যেত তখন শোণিত-প্রবাহে! প্রলয়দেবতার প্রীতির জন্যে লক্ষ লক্ষ শত্রুর প্রাণবলি দিয়ে অবশেষে তারা নিজেরাও পাষাণ দেবতার পায়ে, আত্মদান ক'রে চির বিদায় নিয়ে গিয়েছে। তাদের স্মৃতির শ্মশানে শেষ-পর্য্যন্ত আজ জেগে আছেন কালজয়ী এবং চির-একাকী প্রলয়-দেবতাই!

অমলবাবু তোরণের উপরদিকে শিবের ভয়াল মুখের পানে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, "হে মহাদেব, তুমি কেবল লয়কর্ত্তা নও, সৃষ্টি করাও তোমার কাজ! অবোধ

প্রাণী আমরা, লোভে অন্ধ হয়ে তোমার আশ্রয়ে ছুটে এসেছি ব'লে আমাদের অপরাধ নিওনা। প্রভু, আমাদের তুমি রক্ষা কোরো!"

মাণিক্ হেসে বললে, "এই পাথরে গড়া জড় দেবতার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহ'লে ওঙ্কারধাম আজ শ্মশান হয়ে যেত না!"

অমলবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "মাণিকবাবু, তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অমন কথা বলবেন না, এখনি সর্ব্বনাশ হবে!"

মাণিক বললে, "সর্ব্বনাশ যদি হয়, তাহ'লে ঐ পাথরের দেবতার জন্যে নিশ্চয়ই হবে না, আমাদের নিজেদের বুদ্ধির ভুলেই হবে!"

মাণিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন সন্ধ্যার কালি-মাখা স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে আচম্বিতে জেগে উঠল একটা বন্দুকের শব্দ ও তীব্র আর্ত্তনাদ! তারপরেই আবার বন্দুকের শব্দ!

অমলবাবু ও মাণিকের সচকিত দৃষ্টি পরস্পরের মুখের দিকে ফিরল!

মাণিক ত্রস্ত স্বরে বললে, "শব্দগুলো এল বাংলোর দিক থেকে!" ব'লেই সে বেগে ডাক-বাংলোর দিকে ছুটে চলল—তার পিছনে অমলবাবু!

বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকেই দেখা গেল, সুন্দরবাবু খুব ব্যস্তভাবে একটা বন্দুক নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন!

মাণিক তাড়াতাড়ি সুধোলে, "এখানে বন্দুক ছুঁড়লে কে? আর্ত্তনাদ করলে কে?"

সুন্দরবাবু বললেন; "আমিও তোমাদের ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই?"

—"জয়ন্ত কোথায়?"

—"সে তো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছিল!"

মাণিক চীৎকার ক'রে ডাকলে, "জয়ন্ত! জয়ন্ত!"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মাণিক বললে, "সুন্দরবাবু, আপনি ঐদিকে গিয়ে খুঁজুন! অমলবাবু, আপনি ঐদিকে যান! আমি এইদিকটা খুঁজে দেখি!"

তিনজনে তিনদিকে ছুটল। সন্ধ্যা তখনো মানুষের চোখ অন্ধ করবার মত অন্ধকার বৃষ্টি করেনি—শেষ পাখীর দল তখনো বাসায় ফিরছে! কিন্তু মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতের কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছেনা, নীরবতার মাঝখানে ছন্দ সৃষ্টি করছে কেবল তরুপল্লবের দীর্ঘশ্বাস!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

হঠাৎ সুন্দরবাবুর ভীত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মাণিক! অমলবাবু! এইদিকে, এইদিকে!"

মাণিক সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গিয়ে দেখলে, একটা গাছের তলায় সুন্দরবাবু হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটা সোলার টুপী!

"কি সুন্দরবাবু, ডাকলেন কেন?"

"হুম্, এ কী কাণ্ড! জয়ন্তের টুপী এখানে প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?"

ততক্ষণে অমলবাবুও আর একদিক দিয়ে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ একজায়গায় থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "একি, এখানে এত রক্ত কেন?"

মাণিক উদ্‌ভ্রান্তের মত আবার সেইদিকে দৌড়ে গেল! আড়ষ্ট চোখে চেয়ে দেখলে, সেখানকার মাটি রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে!

সে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "এ কার রক্ত?"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু জয়ন্ত কোথায়?"

অমলবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'সে প'ড়ে বললেন, "মহাকালের অভিশাপ! মাণিক, তোমার নাস্তিকতার ফল দেখ!"

ক্রমশঃ



ছুটির ঘণ্টা

রোয়িং প্রতিযোগিতা ঃ

প্রায় একশত বছর আগে ইংলণ্ডের দুই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের রোয়িং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। আজ এই প্রতিযোগিতা ইংলণ্ডে একটি বৃহৎ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। রোয়িং এ "ব্লু" পাওয়া সেখানকার ছাত্রদের সবচেয়ে বড় গৌরব। ভাল ছেলের চেয়ে নামজাদা উন্নত স্পোর্টস্ম্যানদের সম্মান আরো বেশী! প্রতি বছরই বিপুল জনতার উৎসাহের মাঝে দুই 'ভার্সিটির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবার অক্সফোর্ড ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ২০ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে দুই লেংথ্ এ কেম্ব্রিজকে পরাজিত করেন! গত বছরও অক্সফোর্ড বিজয়ী হয়েছিলেন! কিন্তু তার আগে ক্রমাগত ৭ বছর চ্যাম্পিয়ান হয়ে কেম্ব্রিজ রোয়িং প্রতিযোগিতায় রেকর্ড ক'রে ছিলেন।

কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের ন্যায় কলিকাতা লেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোয়িং ক্লাব ও রেঙ্গুন 'ভার্সিটির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল। রোয়িং এ রেঙ্গুন বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রেঙ্গুনের নামজাদা প্রতিযোগীরা কলিকাতা 'ভার্সিটিকে পরাজিত করেছেন! কলিকাতা 'ভার্সিটি টীম আবার সেই পরাজয়ের শোধ নিয়েছেন কিন্তু ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি! বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রীতিমত শিক্ষা না পেলে 'ভার্সিটির ষ্টাণ্ডার্ড কখনও উন্নত হবে না! তা ছাড়া স্থানীয় কলেজের ছাত্রদের উৎসাহ ও উদ্যম রোয়িং এর প্রতি ততখানি নেই! আশা করা যায়, অতি অল্পদিনে 'ভার্সিটির রোয়িং বিভাগ আরো উন্নতি লাভ করবে এবং একদিন সন্তরণ ও ফুটবল খেলার ন্যায় রোয়িংএ বাংলার ছেলেদের নাম ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে!

এদেশে রোয়িংএ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টুর্ণামেণ্ট হল ওয়েলিংডন টুর্ণামেণ্ট। স্থানীয় ইউরোপিয়ান ক্লাব রেঙ্গুন 'ভার্সিটির কাছে হার স্বীকার করেন! ফাইন্যালে দুই ভারতীয় দল লেক ক্লাব ও রেঙ্গুন এক নতুন রেকর্ড করলেন! প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও রেঙ্গুন সুদক্ষ লেকক্লাবের দাঁড়বাহীদের কাছে পরাজিত হন!

বাইটন হকি টুর্ণামেণ্টঃ—

এদেশে হকির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টুর্ণামেণ্ট বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা। ভারতের বহু প্রদেশের নামজাদা দলগুলি প্রতি বছরই যোগদান করে থাকেন। ধ্যানচাঁদ রূপসিংহ ঝান্সি হিরোজ হয়ে এবার খেলতে না আসায় অনেকেই নিরুৎসাহ হন কিন্তু উচ্চাঙ্গের খেলার পরিচয় দিয়ে আলিগড় 'ভার্সিটি, বোম্বাই কাষ্টমস্ ও লুসিটেনিয়া ক্রীড়ামাঠে চাঞ্চল্য আনেন। প্রতিযোগিতার প্রথম মুখে স্থানীয় দলগুলি বাজে খেলে ভগ্নমনে বিদায় নেয়। কিন্তু বাইরের দলগুলিও



বিজয়ী কাষ্টমস্ দল (হকি)

তেমন সুন্দর খেলে ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দেয়নি! বাইটন টুর্ণামেণ্ট প্রমাণ করল, বাইরের দলের খেলার সেই চাকচিক্য ও ক্রীড়া চাতুর্য্য আর নেই! বেশীরভাগেই খেলোয়াড় 'গ্যালারি গেম্' খেলে হাততালি পাবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি! এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টীমগুলি খুব উৎকৃষ্ট না খেললেও ভারতীয় দলকে হারিয়েছেন। টুর্ণামেণ্টে একমাত্র বোম্বাই কাষ্টমস্ ও লুসিটেনিয়া বাংলার দুই দুর্দ্দান্ত টীম বি, এন, আর ও কাষ্টমস্এর কাছে সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী

হয়ে ছিলেন! ফাইন্যালে কাষ্টমস্ বি, এন. আর কে পরাজিত করেন। এই নিয়ে কাষ্টমস্ তিনবার বি, এন, আর, কে সাক্ষাৎ করে এবং তিনবারই বি, এন, আর সুন্দর খেলে এবং প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ান কাষ্টমসকে হারাতে সক্ষম হয় নি। ফাইন্যাল খেলার মাত্র তিন মিনিট আগে চতুর সিম্যান একটি গোল দেওয়ায় বি, এন, আর-এর সব আশা ভেঙ্গে যায়। শুধু বাইটন বিজয়ী নয় কাষ্টমস্ আবার লীগ বিজয়ী হয়ে এক রেকর্ড করেছেন। প্রায় ১০ বার বাইটন ও লীগ বিজয়ী এবং কম করে ১৫ বার বাইটনে ফাইন্যালে উঠে কাষ্টমস্ ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ হকি টীম হিসেবে সম্মান পাচ্ছেন!



ফাইন্যাল খেলার প্রারম্ভে কাষ্টমস্ ও বি, এন, আর টিমের কাপ্তেনদ্বয় করমর্দ্দন করিতেছেন

২রা মে হতে কলিকাতা ফুট বল লীগ আরম্ভ হয়েছে! ফুটবল সবচেয়ে বাংলার জনপ্রিয় খেলা। দশ বার বছর আগেও বাঙ্গালীর বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মুগ্ধকর খেলা অন্যান্য প্রদেশের ঈর্ষার জিনিষ ছিল! রোভার্স ডুরাণ্ড ও অন্যান্য বহু প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডানস্ ও এরিয়ান্সর কীর্ত্তি কলাপ কম নয়। একমাত্র ডুরাণ্ড ছাড়া এমন কোন টুর্ণামেণ্ট নেই যে বাংলার দল জয়ী হয় নি। দূর জাভা ও সাউথ আমেরিকায় বাংলা

খেলোয়াড়রা বহু প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু কিছুদিন হয় কলিকাতায় বাংলার ফুট-বলের ষ্টাণ্ডার্ড নিম্ন স্থানে এসে পৌঁছতে হঠাৎ বাইরের খেলোয়াড়রা কলকাতা মাঠ জুড়ে বসলেন! তার ফলে স্থানীয় টীমের জুনিয়ার খেলোয়াড়দের—প্রতিভা থাকলেও কর্ত্তৃপক্ষদের নজরে এলো না! তারপর ফুটবলে প্রফেশনাল হিড়িক আসতে একমাত্র মোহনবাগান টীম ছাড়া নামজাদা টীমগুলিতে তরুণ উন্নত বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা আর স্থান পেল না। এবার প্রায় তিনশত খেলোয়াড় তাঁদের ক্লাব পরিবর্ত্তন করে নতুন ক্লাবে যোগদান করেছেন! বেশীর ভাগ খেলোয়াড় নামে এমেচার হলেও প্রফেশনাল—এ সত্য আই, এফ, এ জানেন। নানা রকম



কলিকাতা লীগের প্রথম খেলা কাষ্টমস্ বনাম কালিঘাট ম্যাচে গোলকিপার জাড্ডিন একটি বল ধরছেন। (খেলাটি ড্র হয়)

প্রলোভন, ফন্দি ফিকির করে খেলোয়াড় আনিয়ে টীমগুলিকে দলের কর্ত্তৃপক্ষরা পুষ্ট করেছেন সন্দেহ নাই কিন্তু এত উত্তেজনা উৎসাহের মাঝেও বিজয় ভাদুড়ী, অভিলাষ, ভানু, রাজেন সেন ও পরবর্ত্তী সময়ে গোষ্ট পাল, রবি গাঙ্গুলি, মনা দত্ত, পি, দাস, পি, সিংহ, মনি দাস, এস বোসের মতন একটিও শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মাঠে আর দেখা যায় না! মোহনবাগান এবার সবচেয়ে পুষ্ট টীম হিসেবে গণ্য হবে! যদিও সুদক্ষ গোলকিপার কে, দত্ত ও ব্যাক ডি, ঘোষকে হারিয়েছেন কিন্তু এরিয়ান্সের এন, ঘোষ, এস, দে, কালিঘাটের গোল

কিপার এস, ব্যানার্জ্জি ও ভবানীপুরের ফায়েজ খাঁ কে পেয়েছেন। তা ছাড়া গত বছরের পুরোণো খেলোয়াড় যেমন এস, দত্ত, বিমল, ও প্রেমলাল ত আছেই। মহামেডানসও এবার উৎকৃষ্ট টীম নিয়ে মাঠে নামবেন। গত বছরের সব খেলোয়াড় যেমন, আব্বাস্, নূরমহম্মদ সেলিম, রহিম খেলছেন। ভবানীপুর টীম গেল বছরের চেয়ে ঢের উন্নত হয়েছে। টীমে মানা গুঁই, ডি, লা টেষ্ট, কে, প্রসাদ বিনয় সেন তারপর ছোনে মজুমদার লাগে চাঞ্চল্য আনবেই। দুখীবাবুর এরিয়ান্স টীম আবার নতুন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামবে কিন্তু প্রবল প্রতিযোগিতার মাঝে কতদিন টিকে থাকবে বলা শক্ত। কালিঘাট এবার ও বাইরের ধার করা খেলোয়াড় গিয়ে মাঠে নামছে! ইষ্ট-বেঙ্গলের দলে কে, দত্ত, জি, বোষ তা ছাড়া পুরোণো লক্ষ্মী নারায়ণ, মূরগেস ত আছেনই। কে, প্রসাদ কে হারিয়ে ফরোয়ার্ড লাইন একটু দুর্ব্বল হবে তবে বাইরের খেলোয়াড় আসতে কতক্ষণ! মিলিটারী টীম গুলি গত বছরের চেয়ে ভাল করবে। নতুন অনেক খেলোয়াড় এবার টীমে স্থান পেয়েছে! ক্যালকাটা এবার সম্পুর্ণ নতুন টীম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ডালহৌসির ব্রাউটন খেললে ও ক্যালক্যাটা ফুটবলের সেই অসামান্য সম্মান ফিরে পাওয়া শক্ত। বাকি কাষ্টমস ও পুলিশ মাঝে মাঝে খেলায় ভাগ্যবিপর্য্যয় আনবেই। লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ্ নিয়ে এবারও মহামেডানের আপ্রাণ চেষ্টাকে বাধা দিতে পারেন খুব অল্প দলই আছে! তবে খেলার মাঠে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হতে কতক্ষণ!





টিকিট ঘর

জাপান সম্প্রতি একটি ঘোষণা করেছে ; সে বলেছে যে এতোদিন তার যে সমস্ত ডাকটিকিট বেরিয়েছে শিল্পের দিক থেকে সেগুলো তার মত শক্তিশালী জাতের উপযুক্ত হয়নি। তাই এবার থেকে এমন সমস্ত টিকিট বার করা হবে যেন তারা মহাশক্তিমান জাপানের মর্য্যাদার হানি না করে। এই উদ্দেশ্যে যে নতুন এক সেট টিকিট বেরোবে তাদের মধ্যে তৃতীয়খানি আশা করি এতদিনে বেরিয়ে থাকবে। এই টিকিটখানিতে যে ছবি থাকবে, ইতিহাসের দিক থেকে তার কিছু দাম আছে সত্যি। এর ছবিখানি হচ্ছে একটি পুরোনো জাপানী সওদাগরী জাহাজের, যে ধরণের জাহাজ বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্যে ভার পেয়েছিলো। ষ্ট্যাম্পটি তাদের আশা অনুযায়ী দাঁড়াবে কিনা এখন ঠিক বলতে পারা যায়না। কারণ, ইউরোপের মতে জাপানের টিকিট তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আমার বোধ হয়, এই নতুন সেটের টিকিটগুলো ছাড়া জাপানের আগেকার ডাকটিকিট তোমাদের বিশেষ প্রিয় নয়।

এবারে, আয়ার (আয়ারল্যাণ্ড)এর কথা। এখানকার নতুন শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের স্মরণার্থে দুখানি ডাকটিকিট ছাপা হবে স্থির হয়েছে। দুটি টিকিটই আকারে একটু লম্বা ধরণের হবে ? আর তাদের ছবিখানি হবে একটি রূপক। ছবিখানি এইরকমের হবে : একটি মেয়ে বসে একখানি খোলা বই নিয়ে পড়চে, সেই বইয়ের পাতায় আছে নতুন শাসনব্যবস্থার গোড়ার কথাগুলো। তার ডান হাতে রয়েছে 'হার্প' (ও দেশী বাজনা)— আইরীশ সভ্যতার প্রতীক্ হিসেবে। ছবিখানির ভেতর আরো একটি জিনিষ আছে যা লক্ষ্য এড়ায়না। সেটি হচ্ছে, যার ওপর খোলা বইখানি রয়েছে সেখানে—আল্‌ষ্টার, মান্‌ষ্টার, লিন্‌ষ্টার আর কনট্ এই চারটি আইরীশ প্রদেশের অস্ত্র চিহ্ন আঁকা। এই শেষোক্ত অংশটি দেওয়া হয়েছে উত্তর আয়ারেকে (আলষ্টার) ডাবলিনের অনুশাসনে আসবার জন্যে। এই ছবিটি দেখে আলষ্টার হয়ত রেগে উঠবে। ১৯২২ সালে 'ফ্রী ষ্টেট একখানি মানচিত্রের ছবি

ডাকটিকিটে বার করায় আল্‌ষ্টার ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। সেই ছবিটিতে ছিলো গোটা আয়ারল্যাণ্ডের মানচিত্র; তাতে ছটা কাউন্টি আর ফ্রীষ্টেটের মাঝখানে কোন রেখা টানা ছিলনা।

নতুন ভারতীয় ষ্ট্যাম্প বৃটেনের বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বেশীর ভাগ সমালোচকই স্বীকার করেছেন যে মাঝারি দামের ডাকটিকিটের ছবিগুলো ভাবের দিক থেকে নতুন না হলেও উপযুক্ত আর দেখবার মতনও জিনিষ হয়েছে। ছবিগুলোর বিষয় এমনভাবে নির্ব্বাচিত হয়েছে যাতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কারও ঘা না লাগে। ছবিগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে, ভারতবর্ষে ডাক বিলি করবার নানা রকমের ব্যবস্থা, তার ইতিহাস নিয়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সমস্ত করোনেশন ষ্ট্যাম্প বেরিয়েছিলো, গত ১২ই আগষ্ট তারিখে ওখানকার সব পোষ্ট অফিস থেকে তাদের বিক্রী বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

গত বছর ডাকটিকিট ব্যবসার দিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ফলপ্রসূ হয়েছে—লণ্ডনের ডাকটিকিট ব্যবসায়ীরা সকলেই একথা স্বীকার করছে। তারা আরও বল্‌ছে যে এর প্রধান কারণ হলো করোনেশন ষ্ট্যাম্প। এইসব করোনেশনের সময়কার প্রকাশিত ডাকটিকিট হাজার হাজার লোকের মনে। টিকিট-জমানোর নেশা ঢুকিয়েছে আর এটা যাদের পুরোণো 'হবি' তাদের তো কথাই নেই। এই সব টিকিটের বহুল প্রচার হওয়াতে ডাকটিকিট জমানোর শিক্ষাপ্রদ দিকটা যে বেড়ে গেছে একথা আজ অনেক দেশই স্বীকার করছে।'

'ফিলেটলি' যে বাস্তবিকই দিনের পর দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠ্‌ছে এ-কথা এখন সবাইকে মানতেই হবে।





শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কোন দিন যারা কেউ কাউকে আর ফিরে দেখতে পাওয়ার আশা করেনি, পরস্পরের বেঁচে থাকা সম্বন্ধেও যারা হতাশ হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর বাইরে আর এক গ্রহে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনাচক্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের মিলন হওয়া যে কিরকম তীব্র আনন্দের ব্যাপার তা ভাষায় বলে বোঝান অসম্ভব। সমর ও অজয় পরস্পরকে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরলে; অমন যে ভারিক্কী গুরু গম্ভীর ডাঃ ক্রল তিনি পর্য্যন্ত নিজের সমস্ত গাম্ভীর্য্য ভুলে সমরের হাত ধরে এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে তার প্রায় নড়া ছিঁড়ে যাবার উপক্রম!

কিন্তু এ আনন্দের উচ্ছ্বাস যত তীব্রই হোক বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। সামনে তাদের অনেক কাজ; অনেক কিছু জরুরী কথা তাদের আলোচনা করবার ও জানবার রয়েছে। আনন্দের উচ্ছ্বাসে মেতে থাকবার তাদের সময় কই!

সমরই প্রথম উচ্ছ্বাস কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলে—"কিন্তু তোমরা এখানে এলে কোথা থেকে! ষ্টাইন কোথায়?"

অজয় হেসে বল্লে,—"সে প্রশ্নটা ত আমাদেরই করবার কথা। যাই হোক ওই একটা নয় আরো অনেক কিছু প্রশ্ন করবার আছে আমাদের পরস্পরের! হাউই জাহাজে ধীরে সুস্থে বসে সব বলা যাবে! আপাততঃ যে জানোয়ারটির জন্যে আমাদের হঠাৎ এভাবে মিলন হয়ে গেল সেটিকে একটু পরীক্ষা করে আসা যাক!"

'সে ত কাল সকালেই হতে পারে!'—সমর বল্লে।

ডাঃ ক্রুল হাসলেন—"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এটা পৃথিবী নয়; এখানে একবার সকাল হতে পৃথিবীর গোটা হপ্তা কেটে যাবে। ততক্ষণে এই জানোয়ারটিকে ভালো করে পরীক্ষা করবার সুবিধে হয়ত আর থাকবে না। বুধ গ্রহের অনেক রহস্য হয় ত এই জানোয়ারটির দ্বারা মীমাংসা হতে পারে।"

এরপর সমর আর আপত্তি করলে না। তারা সকলে মিলে এবার বিশাল অতিকায় জানোয়ারটি যেখানে পড়েছিল সেদিকে এগিয়ে এল। তীব্র সার্চ্চলাইটের আলোয় জায়গাটা আলোকিত হয়ে আছে—জানোয়ারটিকে ভালো করে দেখবার কোন অসুবিধা নেই। জানোয়ারটিকে কাছে থেকে ভালো করে পরীক্ষা করে তার বিশাল আকার ও বিদ্‌ঘুটে চেহারায় সমর ও অজয় আশ্চর্য্য হল মাত্র। তাদের কাছে জানোয়ারটা অনেকটা গণ্ডারের বেয়াড়া সংস্করণ বলেই মনে হল। কিন্তু ডাঃ ক্রুল রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন দেখা গেল।

জানোয়ারটি দেখা শেষ করে হাউই জাহাজে ফিরে বিশ্রাম করতে বসা পর্য্যন্ত তাঁর মুখে আর অন্য কথা নেই। সমর ততক্ষণে কিছু খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে অজয়দের সব কথা জানবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু ডাঃ ক্রুল তখন ও তাঁর 'থিওরি' নিয়ে মত্ত। উত্তেজিত ভাবে তিনি তখন বোঝাচ্ছেন—"এবার বুঝতে পারছেন আমরা কোথায় এসেছি! দশ কোটি বছর আগেকার পৃথিবীর সেই—সুদূর অতীত যুগে আমরা পেছিয়ে চলে গেছি ভাবতে পারেন! এখনকার বুধগ্রহ আর সেলোজেহক যুগের সেই সরীসৃপের একাধিপত্যের সময়কার পৃথিবী প্রায় এক। বুধ গ্রহের ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ, এখানকার গাছ পালা দেখে আমার গোড়াতেই এই সন্দেহ হয়েছিল। এই মাত্র যে জানোয়ারটি দেখে এলাম তাতে একেবারে অকাট্য প্রমাণ পেয়ে গেলাম। জানোয়ারটিকে নিশ্চয় গণ্ডারের মত বলে আপনাদের মনে হয়েছে, কিন্তু গণ্ডারের সঙ্গে কোন সুদূর সম্পর্ক ওর নেই। গণ্ডার হ'ল স্তন্যপায়ী জীব, আর এ হ'ল সরীসৃপ—ডিমের খোলস ভেঙে সাপ গিরগিটি কুমীরের মত এদের জন্ম হয়। পৃথিবীতে ব্রোন্টোসরাস বলে ঠিক এই রকম চেহারার এক রকম জানোয়ার সে যুগে ছিল। তারা

নিরীহ নিরামিষাশী, সেকালের জঙ্গলে চরে খেত। তাদের দুষমন ছিল হিংস্র অন্যান্য সব ডাইনসর।' তখন পৃথিবীতে যা ঘটত আজ বুধগ্রহে তাই আবার নতুন করে ঘটতে আমরা দেখলাম। পৃথিবীর টিরানোসোরাম জাতীয় কোন হিংস্র প্রাণী এ বেচারীকে আক্রমণ করে সেরে ফেলেছিল। সমরের বৈদ্যুতিক পিস্তলের আওয়াজে ভয় পেয়ে খাওয়া না শেষ করেই তা'কে পালাতে হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবী আর বুধগ্রহ প্রায় এক ধারাতেই চলেছে, একটি এগিয়ে আর একটি পিছিয়ে। পৃথিবীর সঙ্গে বুধের তফাৎ কিছু আছে, সে কিন্তু খুঁটি নাটিতে, মোটের ওপর মিলই বেশী। এখানে মেসোজোইক যুগের সেই সরীসৃপ। সেই মেঘে ঢাকা ভাপ্‌সা আবহাওয়া সেই অতিকায় শ্যাওলা জাতের গাছ………"

সমর বাধা দিয়ে বল্লে—"শ্যাওলা জাতের গাছ আবার কোথায়! এখানে ত অ্যাল্‌জি জাতের অদ্ভুত লতা!

ডাঃ ক্রুল হেসে বল্লেন—আপনি শুধু এই উঁচু টিলাটাই দেখেছেন, এখানে শ্যাওলা জাতের গাছ এখনো উঠতে পারেনি, কিন্তু নীচের সমতল জলা জায়গায় শ্যাওলা জাতের বিশাল গাছেরই প্রাধান্য। পৃথিবীর সঙ্গে এইখানে অবশ্য বুধের তফাৎ। সরীসৃপদের দোর্দ্দন্ত প্রতাপের দিনে পৃথিবীতে শ্যাওলা জাতের গাছ প্রায় হটে গেছল, ফার্ণ আর ঝাউ জাতীয় গাছই তখন চলতি ফুল ফোটান গাছ ও দেখা দিয়েছে কিন্তু এখানে কি কারণে বলা যায় না উদ্ভিদ জগৎ একটু পিছিয়ে আছে! এমন ও হতে পারে, এগিয়ে গিয়ে ও কোন প্রাকৃতিক কারণে আবার তাকে পিছোতে হয়েছে।"

সমর আবার বাধা দিয়ে বল্লে—আপনি তাহলে এই বলতে চান যে বুধগ্রহের এখন পৃথিবীর তুলনায় শৈশব চলছে। এখানকার প্রাণী জগৎ আপনারমতে সরীসৃপের চেয়ে উঁচু ধাপে উঠেনি।"

ডাঃ ক্রুল গম্ভীর ভাবে বল্লেন—ওটা অসম্ভব বলেই আমি মনে করি।"

সমর একটু উত্তেজনার সঙ্গে বল্লে—কিন্তু কোন সরীসৃপ কি আগুন জ্বালবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। আর যদি তা পারে তাহলে আপনি কি তাকে বুদ্ধিমান উঁচু শ্রেণী জীব বলে ধরবেন না!"

ডাঃ ক্রুল ও অজয় দুজনেই একসঙ্গে সবিস্ময়ে সমরের দিকে তাকাল। ডাঃ ক্রুলই জিজ্ঞাসা করলেন—"আগুন জ্বালতে পারে! এখানকার কোন্ প্রাণীকে আগুন জ্বালতে আবার দেখলেন!"

"কোন্ প্রাণী জ্বেলেছে আমি জানি না কিন্তু আগুন আমি দেখেছি। সে আগুন আলেয়ার মত আপনা থেকেও জ্বলেনি।"—বলে সমর হাউই জাহাজের ওপর থেকে যা দেখেছিল তা বর্ণনা করলে। অজয় ও ডাঃ ক্রুল এতক্ষণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিলেন। সমরের কথা শেষ হতেই দুজনে হেসে ফেল্লেন।

অজয় পরিহাসের স্বরে বল্লে—"তুমি বুদ্ধিমান সভ্য প্রাণীই দেখেছ তাহলে !"

ঠাট্টার সুরে সমর একটু খুন্ন হয়ে জোরের সঙ্গে বল্লে,—"নিশ্চয়ই দেখেছি। আগুন কি যে সে প্রাণী জ্বালতে পারে !"

অজয় হেসে বল্লে—"আমরাও ত তাই বলছি।তুমি যে বুদ্ধিমান সভ্য প্রাণী দেখেছ সে বুধ গ্রহের নয়, পৃথিবীর। অর্থাৎ তুমি যে আলো দেখেছ সে আমাদের জ্বালা আগুনের আলো।"

"তোমাদের ! তোমরা কি করছিলে ওখানে !"

"আমরা ওইখানেই নেমেছিলাম এবং হাউই জাহাজ খুঁজতে বেরুবার সময় জায়গাটা দূর থেকে চেনবার সুবিধের জন্যে আগুন জ্বেলে রেখে এসেছিলাম।"

সমর এবার তাদের হাসিতে যোগ দিয়ে বল্লে,—"আসল রহস্যটা পরিষ্কার করে দিলেই ত সব গোল চুকে যায়। তোমরা হাউই জাহাজ থেকে কোথায় গেলে, এই অসীম শূন্য কেমন করে পার হয়ে এই গ্রহেই আমাদের সঙ্গে এসে পৌঁছোলে সেই কথাই ত জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। প্রথম যখন বেতারে তোমাদের সাড়া পেলাম তখন ত তোমরা হাউই জাহাজের বাইরে অকুল শূন্যে ভাসছ। আমার ধারণা হয়েছিল যে লাইফ্-বোটের মত কোন ক্ষুদে হাউই-বোটে তোমাদের জোর করে চাপিয়ে ষ্টাইন ছেড়ে দিয়েছিল।"

অজয় বল্লে,—"তোমার ধারণা ভুল নয়। ষ্টাইনের কৌশলে প্রথমে ডাঃ ক্রুলকে পেছন থেকে আক্রমণ করে কাবু করে। তার পর আমার ঘুমন্ত অবস্থাতেই আমাদের কামরা থেকে আমায় কোন উপায়ে অজ্ঞান করে ডাঃ ক্রুলের সঙ্গে জাহাজের হাউই-বোটে তুলে দিয়ে সে বোটটি ছেড়ে দেয় অকুল শূন্যে। তোমায় সে সাহায্যের একজন লোক দরকার বলেই রেহাই দিয়েছিল। আমাদের ইচ্ছে করলে সে অনায়াসে প্রাণে মারতে পারত, দয়া করে যে মারেনি তা নয়; মারেনি শুধু তার নিষ্ঠুরতা চরিতার্থ করবার জন্যে। হাউই-বোটটি অকুল শূন্যে কোন কাজেরই নয়। বুধে নামবার পর সামান্য এক দু'হাজার মাইল যাতায়াতের জন্য ওটিকে জাহাজে নেওয়া হয়েছিল। সেই কথা জেনেই তিল তিল করে অকুল শূন্যে

ভাসতে ভাসতে আমরা মরব এইটুকু মনে মনে উপভোগ করবার জন্যেই সে ও কাজ করেছিল।”

অজয় থামতেই সমর অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—“কিন্তু তবু তোমরা রক্ষা পেলে কি করে! যা দেখছি তাতে তোমরা ত প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বুধ গ্রহে এসে পৌছেছ, এমন কি আমাদের কাছাকাছিই এসে নেমেছ। এ কি করে সম্ভব হল! আমাদের সঙ্গে এই অসীম দূরত্ব এই হাউইবোটে কি করে তোমরা পার হলে?

অজয় হেসে বল্লে,—“পার হলাম তোমাদের হাউই জাহাজের অনুগ্রহে আর সৃষ্টির অমোঘ আইনে।

সমর বিরক্ত হয়ে বল্লে,—‘এ সময়ে হেঁয়ালী ভাল লাগছে না, সোজা করে বল যা বলবে।’

‘সোজা করেই বলেছি। তোমাদের হাউই জাহাজ আমাদের নিয়ে এসেছে। এমন করে যে, নিয়ে আসবে তা আমরা ভাবতেই পারনি।’ তার মানে,—যে শূন্যে আমরা চলেছিলাম সেখানে কোন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ ছিল না তোমার বোধ হয় মনে আছে। কিন্তু সত্যিই সেটা মাধ্যাকর্ষণহীন জায়গা নয়। পদার্থ বিদ্যায় বলে জানত যে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে টানে। ওপর থেকে একটা ইট মাটিতে ফেল্লে, পৃথিবী যেমন ইটকে টানে ইটও তেমনি পৃথিবীকে টানে। শুধু পৃথিবীর টান অনেক বেশী বলে ইটের টানের কোন পরিচয় কেউ পায় না।

মাধ্যাকর্ষণ-হীন মহাশূন্যে সেই নিয়মেই তোমাদের বিশাল হাউই জাহাজ আমাদের ছোট লাইট বোটকে টেনেছে। সেখানে অন্য কোন আকর্ষণ না থাকায় তোমাদের জাহাজের টানটাই বড় হয়ে উঠেছে। তোমাদের হাউই বোটের টানটুকু যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে তার সঙ্গে হাউই বোটের সামান্য শক্তি প্রয়োজন মত ব্যবহার করে আমরা অনায়াসে তোমাদের পিছুলেগে থাকতে পেরেছি। অবশ্য গোড়াতেই ডাঃ ক্রুলের পর্য্যন্ত এ সম্ভাবনার কথাটা মনে হয়নি। আমরা তখন মরণ নিশ্চিত জেনে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। তারই মধ্যে এক সময়ে হাউই জাহাজটি লক্ষ্য করতে গিয়ে আমি দেখি যে আমাদের ছাড়িয়ে যতদূর তার চলে যাওয়া উচিত ছিল তা সে যায় নি। কেমন করে এ অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হ’ল ডাঃ ক্রুলের সঙ্গে তাই আলোচনা করতে করতে হঠাৎ উনি আসল রহস্যটা ধরে ফেল্লেন। তারপর সামান্য একটু হাওয়ার অভাব ছাড়া আর বিশেষ কোন দুর্ভাবনার কারণ আমাদের ঘটেনি। এমন কি পথে আসতে আসতেই কি ভাবে হাউই জাহাজ আমরা দখল করব তাও আমরা

ভেবে চিন্তে রেখেছিলাম। বুধ গ্রহের হাওয়া বিষাক্ত হলে অবশ্য এখানে পৌঁছেও আমরা রক্ষা পেতাম না। কারণ হাউই বোটে হাওয়ার মুখোস নেই! কিন্তু সেখানে দৈব আমাদের সহায় হয়েছে।

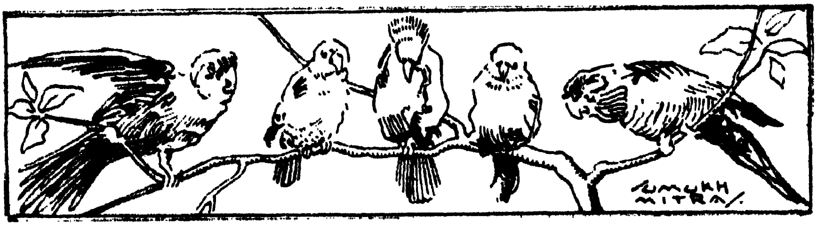
সমর এতক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে অজয়ের কথা শুনছিল; এইবার সবিস্ময়ে বল্লে,—'হাউই জাহাজ কোথায় নেমেছে তোমরা তা হলে লক্ষ্য করে রেখেছিলে!'

ডাঃ ক্রুল হেসে বল্লেন,—"নিশ্চয়ই, নইলে এই বিশাল গ্রহে কোথায় খুঁজে বেড়াতুম।"

"কিন্তু ষ্টাইন যদি জাহাজে থাকত?"

অজয় কি বলতে গিয়ে চমকে থেমে গেল। সমস্ত হাউই জাহাজটা হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে কেঁপে উঠেছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কাঁপুনি ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি হয়ে উঠল। কোন বিশাল দানবীয় শক্তি যেন এই বিরাট জাহাজকে খেলাঘরের খেলনার মত অনায়াসে নাড়াচ্ছে। কামরার জিনিষ পত্র সমেত সবাই যে যার আসন থেকে ছিটকে পড়ল। ডাঃ ক্রুল সবার প্রথম উঠে কণ্ট্রোল রুমের দিকে ছুটতে ছুটতে বল্লেন—ভূমিকম্প, ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প—এখুনি জাহাজ শূন্যে ওঠাতে না পারলে চুরমার হয়ে যাবে সব!

ক্রমশঃ



রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন,

সেদিন রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকার নাম লেখা খাতাটা খুলে আমার টেবিলের ওপর পড়েছিল, অন্যমনস্কভাবে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ কি ভালো যে লাগল কি বলব। সামান্য একটা নীরস কালীর আঁচড় কাটা খাতা আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল। কাগজের পাতা নয় সে যেন বাংলা দেশ এবং বাংলা দেশ ছাড়িয়ে বিশাল ভারতবর্ষ আমার সামনে মেলা। শুকনো নামের অক্ষর আর গ্রাহক নম্বর নয়, সত্যি করে তোমাদেরই আমি দেখলাম; যেন পরিচয় হল তোমাদের সঙ্গে, এই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, বাংলা দেশ ছাড়িয়ে দিল্লী, লাহোর, বোম্বে, কত সহরে সহরে, সুদূর সাগর পার হয়ে রেঙ্গুন মান্দালে, বাটাভিয়ায়। কোথায় না তোমরা আছ! মানচিত্রতে যেখানে খুশী আঙ্গুল দিলে বোধহয় তোমাদের একজনকে ছোঁয়া যায়; মৈমনসিং জলপাইগুড়ি সিমলা মূলতান ইন্দোর শ্রীরঙ্গপট্টম...এগুলো আর আমার কাছে জায়গার নাম মাত্র নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু; এসব নামের সঙ্গে এখন তোমরা জড়িয়ে আছ। দেখলাম হয়ত লয়ালপুর কি লোহজঙ্গ, ডুবরাজপুর কি ডিব্রুগড় অমনি মনে পড়ে গেল সেখানে ত অমলা কি অসিত, কমল কি করুণার বাড়ি!

সত্যি কি মজার কথা বলত! এত দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে থেকেও রংমশালের ভেতর দিয়ে আমাদের সকলের মধ্যে যোগাযোগ আছে ভাবতে ভালো লাগে না কি! সাক্ষাৎ দেখাশুনা আমাদের হয়ত সকলের হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু তাতে কি আসে যায়, রংমশালের মধ্যে আমাদের মেলা বসে মনে মনে। রংপুরের রানু আর ঝাঁঝার ঝরণা সবাই এর সেখানে মেলা মেশা। এই মিলনের ভিৎ মজবুত করবার জন্যেই, সকলের মধ্যে অস্পষ্ট যে মিল আছে তাকে স্পষ্ট রূপ দেবার জন্যেই আমাদের 'রংমশাল দল।'

মজার কথা বল্লাম এবার সামান্য একটু মুস্কিলের কথাও বলি। সে মুস্কিল তোমাদের সম্পাদক মশাই-এর। এখানে রোদে পোড়া রুক্ষ আকাশ এই সবে কালো মেঘে কোমল মধুর হয়ে এসেছে। ঝিমোন আলোয় স্নিগ্ধ সুদূর মাঠের ওপার থেকে বৃষ্টি আসছে বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে আনন্দের হুঙ্কার ছেড়ে, স্কুলের ম্যাচ জেতা ছেলের দলের মত; কিন্তু এসব কথা লিখতে গিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল তোমাদের সবাইকার কি এ কথা ভাল লাগবে! তোমাদের কেউ হয়ত আজ এমন দেশে যেখানে আকাশ এমন রোদে পুড়ে খাক্ হয় নি। প্রথম বৃষ্টি এমন আশীর্ব্বাদের মত যেখানে মনে হয় না।

কিন্তু তবু ভাল লাগবে নাই বা কেন! যেখানেই যাও তোমরা আসলে বাংলা দেশের। এদেশের প্রথম মেঘের মোহ দূরদূরান্তরেও তোমাদের মনে কি না লেগে পারে!

তোমাদের—

সম্পাদক মশাই।



পরিচালিকা—দিদিভাই

আমার আদরের ও স্নেহের ভাই বোনেরা—

যে রকম দেখছি তাতে তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবো না, চিঠির স্রোতে আমায় ভাসিয়ে দেবার জোগাড় করেছ—এ স্রোতের মাঝে তোমাদের তরুণ মনের অরুণ ছোঁয়া রয়েছে, আর রয়েছে নিত্য উচ্ছ্বসিত সুন্দর প্রাণের আনন্দ কলধ্বনি—আমি আনন্দ পাচ্ছি সে কলধ্বনি শুনে। সবায়ের চিঠির উত্তর আমি সব সময় দিতে পারিনা—রাগ করোনা। এবার ভাবছি তোমাদের সম্পাদক ও পরিচালকমশাইকে ব'লে রংমশালের অন্যান্য বিভাগগুলো তুলে তোমাদের সকলের উত্তরের ব্যবস্থা করতে হবে—না হলে তো আমার উপায় নেই! এত রাগ আর অভিমান আমার উপর জমা হয়ে আছে, তোমাদের অভিমান বাঙ্গলার আকাশকেও হার মানায়। 'রংমশাল দল' ক্রমশঃ ভারী হচ্ছে—এদল তোমাদের সমবেত চেষ্টায় যে শক্তিশালী হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস আমার আছে। আশাকরি, রংমশালের আলোতে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতে পারবে।

তোমাদের গ্রাহক নম্বর অনেকে জানাওনি—এবার থেকে প্রত্যেক চিঠিতে গ্রাহকনম্বর ও ঠিকানা লিখবে—নাহ'লে ভয়ানক অসুবিধা হয়।

এবার চিঠির ঝাঁপি খুলছি॥

আমার আদরের ও স্নেহের ভাই বোনেরা—

কুমারী সাধনা সেনগুপ্তা (আমেদাবাদ) গ্রাহিকা ১০১৮

পুতুল! তোমার চিঠিটা অনেকদিন পেলেও উত্তরটা বড় দেরীতে যাচ্ছে তার জন্য দুঃখ করোনা কারণ তো তোমরা জান। তুমি লিখেছ—আমার চেয়ে হাজার মাইল দূরে থাক—কিন্তু তোমাদের রংমশাল এরকম অনেক হাজার মাইল দূর থেকে তোমাদের টেনে দিদিভাই-এর কাছে এনে দেবে। তোমার

পনেরো বছর বয়স—ম্যাট্রিক পড়ছ, হবি হচ্ছে কবিতা লেখা, ছবি আঁকা—গান শেখা ও এস্রাজ বাজান—এগুলো জেনে নিলাম যখন তখন লেখনী বন্ধু পেয়ে যাচ্ছ শীঘ্রই জেনো।

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর) গ্রাঃ ৭৩৪

অনেকদিন থেকে যদি আলাপ করতে ইচ্ছা ছিল তবে এতদিন চিঠি লেখনি কেন ভাই? আমি খুব রাগ করেছি কিন্তু। হ্যাঁ, মাকে বলো সত্যিই তিনি একটী মেয়ে পেয়েছেন—আর তুমি পেয়েছ দিদি। তোমার হবি, বয়স, জন্মতারিখ প্রভৃতি লিখো, না হলে কেমন করে 'বন্ধু' নেবে? তুমি বেশতো চিঠি লিখতে পারো।

কামাখ্যাচন্দ্র বল (ডালটনগঞ্জ) গ্রাঃ ৮০৩

মাখন! তোমাদের চিঠি আমি অনেকদিন আগে পেয়েছি তা তোমরা জান। 'তুমি' বল্লে আমি মোটেই রাগ করিনা বরং খুসী হই। তোমার ১৬ বছর বয়স, ম্যাট্রিক পড়ো আর ডিটেকটিভ ও য়্যাড্‌ভেঞ্চার বই পড়তে ভালবাসো। বেশতো লেখনী বন্ধু হবে।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা) গ্রাঃ ৬৭০

দিদিভাই-এর কথায় রাগ না করে—ঠিক মত বুঝতে পেরেছ এজন্য আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। লেখনী বন্ধু এইবার সবাইকে দিতে আরম্ভ করছি যাতে শীঘ্রই তোমাদের চিঠিতে থাকবে তোমরা বন্ধু পেয়ে গেছ।

ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায় (কুড়িগ্রাম) গ্রাঃ ৭৬৩

তোমার চিঠিটা ভারী চমৎকার, উপদেশ বলে নিইনি ভাই—যা বলেছ তাই যেন হয়—আমার পরম স্নেহের ভাইবোনগুলিকে যেন আনন্দ দিতে পারি। তোমার হবি ফ্রি ক্যাটলগ বই ও নমুনা আনান আর য়্যাড্‌ভেঞ্চার ও ডিটেকটিভ বই পড়া? জেনে যখন নিলাম তখন বন্ধুও পাচ্ছ।

কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর) গ্রাঃ ৮৩৩

খুকু ও বাণী! তোমাদের চিঠি ভাই অনেকদিন পড়ে আছে—কি করি বল দিদু? তোমরা অভিমান করোনা। তোমার নালিশ অনেকদিন হয়ে গেছে সেজন্য সেটা আর খাটবে না, তাছাড়া ভাইবোনের মতামত বিভিন্ন হয়েছে—তার আর নালিশ কি হবে ভাই? তোমাদের হবি যে দেখছি অনেক, দেখ দেখি ঠিক হচ্ছে কিনা—মাসিক পত্রিকা, হাসির বই পড়া, ব্যাডমিণ্টন খেলা, নতুন রেকর্ড কেনা, ভুতের গল্প পড়া, পশু পক্ষী পোষা, গল্প লেখা? কল্পনার বয়স ষোলো আর অঞ্জলির চোদ্দ, দুজনে ক্লাস VII এ পড়ো; এইতো?

প্রতিভা রায় (জামসেদপুর) গ্রাঃ ৮৬১

তোমার বড্ড দুঃখ—তুমিই বড় বলে? দিদি বলে কাকেও ডাকতে পাওনা—দেখ এসব দুঃখ আর রইল না তো? তুমি ডিটেক্‌টিভ য়্যাড্‌ভেঞ্চার, জীবনী ও পৌরাণিক বই পড়তে ভালবাস কিন্তু রংমশালের মত কোনও বই ভাল লাগে না—একথা শুনে খুব ভাল লাগলো। শীঘ্র—লেখনী বন্ধু দেব।

বকুলসেন (দিনাজপুর) গ্রাহক ৯৮৯

তোমরা প্রথম চিঠি এত দেরী করে দিয়েছ যার জন্য আমি ভয়ানক রাগ করছি—এরকম করলে মনে হবে তোমরা তোমাদের দিদিভাইকে ভালবাস না। আমার কথা প্রায়ই ভাবো আর আমায় আবিষ্কার করতে পেরেছ? সত্যি? বেশ খুব ভাল। রংমশালের জন্য তোমার কত ভাইবোন হলো আর তো দিদির অভাব থাকলো না—দুঃখ করোনা। সবাই লিখছে 'লেখনী বন্ধু' চাই আর তুমি লিখেছ চাইনা—এ একটা বেশ নতুনত্ব ভাই। তুমি গার্লস স্কুলে VIIএ পড়ো, বয়স তেরো? ওরে বাবা মস্ত বড় লোক, বয়সের গাছ পাথর নেই দেখছি

তৈয়েবর রহমান (বাগের হাট) গ্রাঃ ৯৯৭

তোমাদের অভাব দূর হয়েছে জেনে সুখী হলাম। তুমি ক্লাস IXএ পড়ো বয়স পনেরো বছর, বাগান করা ছবি সংগ্রহ করা, ভাল ভাল বই পড়া গল্প লিখতে ভালোবাসো—সমস্ত শুনেছি তুমি কার সঙ্গে আলাপ করবে জানিও, করে দেবো ভাই।

বিনয়চন্দ্র (কটক) গ্রাঃ ১০৩৮

তুমি জানতে চেয়েছ—রংমশাল বৈঠক গ্রাহকগ্রাহিকাদের জন্য কিনা। হ্যাঁ তাই ভাই। তোমার বয়স ১২ বছর ক্যাডবেরিজ চকোলেটএর ছবি জমান ও বিখ্যাত মনিষীদের ছবি সংগ্রহ করা জেনে সুখী হলাম ভাই। বন্ধু চাই কিনা তাতো জানাওনি?

অনিলভূষণ দত্ত (বাজিতপুর) গ্রাঃ ১০০৮

ভানুভাই! তোমার ধারণা বদলেছে জেনে সুখী হলাম। তোমরা সবাই বয়স, ছবি ও জন্মতারিখ দিও, নাহলে বড় অসুবিধা হয় ভাই।

নিশানাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০০৯

তোমার বক্তব্য রংমশাল রোগা হয়ে যাচ্ছে সত্যি নাকি ভাই? তোমার ছবি ষ্ট্যাম্প জমান—একটা এলবামও আছে—কিন্তু সবচেয়ে খুসী হয়েছি তোমার কাছে নয় হাজার ষ্ট্যাম্প জমা আছে জেনে। বন্ধু পাবে কিন্তু তার আগে জন্ম তারিখ ও পড়ো কিনা ইত্যাদি সব জানিও। তোমার অন্য ভাইবোনদের অত ষ্ট্যাম্প আছে কিনা জানতে চেয়েছ কিন্তু আমি তো জানিনা তারাই জানাবে।

তুষারকান্তি দত্ত (ভবানীপুর) গ্রাঃ ১০২০

তোমার তো আগের চিঠি পাইনি ভাই। তোমার সমস্ত খবর জানিয়ে বন্ধু করে নিও—কেমন ভাই?

অমলেন্দু সেন (শিলচর) গ্রাঃ ৬০৩

তোমাদের দিদিভাইকে মিষ্টি করেছ তোমরা। তুমি এবার ম্যাট্রিক দিলে, কি রকম হলো জানিও। তোমার ১৬ বছর বয়স, বিদেশী ষ্ট্যাম্প জমা ও চকোলেটের ছবি জমাও ক্রিকেট, টেনিস খেলতে ভালবাস, ফটোগ্রাফী এবং গান শেখবার খুব ইচ্ছা—বেশ তো বন্ধু পাবে ঠিক। না, লেখায় ভুল কিছু নেই, হাতের লেখাটীও বেশ।

অরুণকুমার মুখার্জ্জী (ভবানীপুর) গ্রাঃ ৮৬৯

মাণিক, তোমায় তো উত্তর দেবার কিছু নেই ভাই, তোমার বন্ধু করে দিচ্ছি শীগ্‌গীর।

বাবু (ভাটপাড়া) গ্রাঃ ৩৫৩

তোমার আসল নাম লেখনি? এটী কি তোমার ডাক নাম? জন্ম তারিখ ১১ই বৈশাখ ১৩৩১ ক্লাস IXএ পড়ো, একজন স্কাউট তুমি, ভারতের মহাত্মা লোকদের ছবি জমান ও ছবি আঁকা সমস্ত জানলাম—বাকী শুধু বন্ধু।

কমলাদাস গ্রাঃ (সিলেট) ৫৪

তুমি কি বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে চাও বোনটী? তোমার চিঠির প্রথমেই লেখণী বন্ধুর কথা লেখা আছে সেইজন্য সে বিষয় সচেতন রইলাম। Stamp জমাতে ভালবাসো কিন্তু বেশী জমাতে পারনি? তার জন্য কি হয়েছে—বেশী জমে যাবে চেষ্টা করলেই। তোমার বয়স বা জন্ম তারিখ দাওনি তো?

শ্যামল ভট্টাচার্য্য (কুড়িগ্রাম) গ্রাঃ ৭৯৫

তোমার চিঠি সরস্বতী পুজোর আগে এসেছে—কত তাড়াতাড়ি উত্তর দিচ্ছি বলতো? কিন্তু এজন্য কি তোমরা তোমাদের 'দিদিভাই' কে দোষ দেবে? তোমার বয়স ১৪ বছর, ক্লাস IX এ পড়ো, আবিষ্কারের কাহিনী, য়্যাডভেঞ্চারের গল্প, ডিটেকটিভ্ বই পড়তে ভাল লাগে? আচ্ছা লেখনী বন্ধু করে দেবো ভাই।

জগদীশ দাশ (তেলিনীপাড়া)

অনেকদিন হয়ে গেছে বলে রাগ করছ? রাগ করোনা ভাই, তোমরা সব সময় গ্রাহক নম্বর দিয়ে চিঠি লিখবে। তুমি কার সঙ্গে আলাপ করতে চাও জানিও করে দেবো। তুমি জানতে চেয়েছ—সব ভাই বোনদের একই থালায় একই মিষ্টি পরিবেশন করতে পারবো কিনা—কেন পারবো না, তোমরা সাহায্য করলে?

লক্ষ্মী ঘোষ (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৭০

তোমার চিঠিটা আমি ভাল করে পড়তে পারিনি—হাতের লেখা সব সময় ভাল করবার চেষ্টা করবে। কবিতা পেয়েছি—জায়গা করার ভার তো আমার নয় ভাই, যোগ্যস্থানে পাঠিয়ে দেবো।

রতনকুমার রায়, (মুঙ্গের)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন ভাই, তোমার বয়স ষোলো বছর, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন খেলতে ভালবাস—আর ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে মারামারি করতে ভালবাস। শেষেরটী ভাল কিন্তু জোরে মেরো না ভাই। বন্ধু কাকে নেবে?

অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাঃ ৮২৩

তুমি স্কটিশ চার্চ্চ স্কুলের ক্লাশ—VII এতে পড়ো, ষ্ট্যাম্প জমাও, চকোলেটের ছবি জমাও কিন্তু বয়স জানাওনি তো? হ্যাঁ, লেখাটা ভাল করতে চেষ্টা করবে জানো?

তরুণশঙ্কর ভাদুড়ী (হাওড়া) গ্রাঃ ৯৮০

তোমার চিঠিটা চমৎকার ছোট্ট অথচ সবই লেখা আছে—ভালো লাগল সেজন্য। ছোটর ভিতর সব কথা লিখতে পারা একটা মস্ত বড় ক্ষমতা ভাই, তোমাদের এই রংমশালের বৈঠকের কয়েকটী ভাইবোনের আছে—এরকম দেখলে খুব আমোদ হয়। তোমার বয়স পনেরো বছর টিকিট জমাও, বড় বড় লোকের ছবি জমাও—এই তো?

সুনীল দাস গ্রাঃ ৭৮৪

তুমি দিলীপকে যে চিঠি দিয়েছ—সেতো সম্ভব হলোনা—আমি তোমায় তাকেই লেখনী বন্ধু করে দেবো। তোমরা প্রত্যেক চিঠিতে ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর দিয়ে চিঠি দেবে। লেখনী বন্ধু কি জিনিস জানোনা? আচ্ছা করে দিলেই জানতে পারবে ভাই। 'পরিচয়এর কথা জিজ্ঞাসা করেছ—সে তো পূর্ব্বেই বলেছি।

শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (ভবানীপুর) গ্রাঃ নং ৮৭৬

এস! তোমার লেখনী বন্ধু শীঘ্র যাচ্ছে। রংমশাল দলে যোগ দিতে চাও সে তো খুব ভাল কথা—নিয়ম তো প্রকাশ করাই আছে, যোগ দিয়ে ফেলো ভাই।

হৃষীকেশ দে (সিলেট) গ্রাঃ নং ৭৫৩

তোমার দু'টী চিঠি ও নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি। যেতে পারিনি বলে দুঃখিত হয়োনা ভাই, অতদূর যাওয়া তো সম্ভব নয়। 'গ্রহের ফের' সম্বন্ধে যা বলেছ তার উত্তর তোমার ধারণা ঠিকই হয়েছে। পরীক্ষা কিরকম হলো জানিও। তোমার বয়স জানাও নি, লেখনী বন্ধু পেতে হলে ওসব যে প্রয়োজন ভাই।

বাসুদেব বসু (ঢাকা) গ্রাঃ নং ৫৯৯

তোমার ছোট্ট সুন্দর চিঠিটুকু পেয়েছি। তোমার বাগান করা, দেশ ভ্রমণ করা, ক্রিকেট, হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেলা হবি তা দেখলাম, বয়স ১৪ বছর ক্লাশ X এর ছাত্র তা জেনেছি। কাঁচা আমের গন্ধ এখন আর নেই নিশ্চয়।

অনন্ত কুমার সিংহ (শ্যামবাজার) গ্রাঃ নং ৮১৩

তোমার চিঠি পেয়ে বেশ ভাল লাগলো। ১৩৩০ সালের ১লা ভাদ্র তোমার জন্ম। তোমার হবি Stamp coin চকোলেট সিগারেটের কুপন দেশলাইএর লেবেল, সুন্দর ছবি জমান। তোমার কাছে ৫০-৬০ বছরের পুরাণো ডাকটিকিট আছে—সেখবর তোমার ভাইবোনদের জানালুম। বছর খানেক থেকে হৃদ-রোগে ভুগছ, এখন ভাল আছ তো? শরীর যাতে ভাল থাকে তার চেষ্টা করবে, ভাল না হলে কোনও কাজই করা যায় না। বন্ধু পাবে শীগ্‌গীর।

সুজাতা রক্ষিত (গেথিয়া) ৮৩৯

তোমার চিঠি পেয়েছি। রংমশালের কথা পরিচালক মহাশয়কে বলেছি ভাই, সাধ্য মত ব্যবস্থা করা হবে।

উমারাণী রায় (ভবানীপুর (গ্রাঃ নং ৮৮১)

তোমার লেখনী বন্ধু গেছে দিদু ভাই দেখো, ধাঁধার উত্তর ঠিক হয়েছে তোমার।

দিলীপ সিংহ (কলিকাতা) গ্রাঃ ৪৩১

তোমার ব্যাজ আশাকরি পেয়েছ? তোমার জন্মদিন, আগে তো আমায় জানাওনি ভাই? কোন অরুণের সঙ্গে ভাব করতে চেয়েছ—অনেক অরুণ আছে কিনা।

শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা) গ্রাঃ ৯৪১

ছেলেমেয়েদের সহজ সরল মেলামেশা আমরা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি। কিন্তু আমাদের অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বর্ত্তমান আবহাওয়াকে পছন্দ করেন না। তাঁদের মতকে আমরা সমর্থন না করলেও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ অনেক অভিভাবক অভিভাবিকা আছেন যাদের ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় আপত্তি আছে। আমরা এমন কোনও নিয়ম প্রবত্তন করতে চাই না যাতে কোনও গ্রাহক বা গ্রাহিকার "রংমশাল দল" এ যোগদান করায় বাধা সৃষ্টি হতে পারে। ছেলেমেয়েদের পরস্পর মেলামেশা ছাড়াও আনন্দের উপাদান অনেক আছে। 'রংমশাল দল' এ যোগদান করলে তার পরিচয় পাবে। অরুণের খবর কি? খুব রাগ করেছে বুঝি? তাকে বলো তার ভাইবোনদের কথা।

তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও শুভকামনা নিও, যাদের চিঠি বাকী রইল তাদের নাম—

শচীন্দ্র নাথ রায়, বিমল মণ্ডল, অচিন্ত্য কুমার রক্ষিত, রথীন্দ্র মৈত্র, শিব প্রসাদ সেন, শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, পরিমল সরকার, শিবাণী সরকার, শোভা সেন, গীতা চ্যাটার্জ্জি, সুব্রত দাশ গুপ্ত, শান্তি লতা বসু মল্লিক, ইলা ব্যানার্জ্জি, আনোয়ারা বেগম, সুরমা ও সমর, লতিকা সেন, নীলিমা চক্রবর্ত্তী, কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রদ্যোত মুখোপাধ্যায় সাধনা ও গোপাল, জীমূতবাহন রায়, রাজিয়া, দেবলা ঘোষ, মোহন গুপ্ত, সচ্চিদানন্দ সেনগুপ্ত, রাম মোহন ভট্টাচার্য্য, মায়া সেন, গীতা রায়, পবিত্র গুপ্ত, সুনীল কুমার সেন গুপ্ত, রেণুকা ঘোষ, অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনী, রেণু চৌধুরী, লীলা বিশ্বাস, হৃষীকেশ দে, সুনীল কুমার সিদ্ধান্ত, বাণী ঘোষ, রবীন্দ্র নাথ মিত্র, অলোক ঘোষ, সুমেন্দ্র নাথ মৈত্র, রেবা মুখার্জ্জী, হরিদাস সরকার, হীরেন রায়, পান্নালাল চৌধুরী। ইতি—

শুভার্থিনী—

তোমাদের—

দিদিভাই



স্বপ্নের দেশে

(চৈত্র মাসের প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত)

(১)

দুপুর বেলা ঘাসের ওপর
পড়ল টেবী শুয়ে,
চুপে চুপে নিদ্রাদেবী
দিলেন তারে ছুঁয়ে।
নিদ্রাদেবীর স্পর্শ পেয়ে
ঘুমটি এলো ধেয়ে ;
দুদিক দিয়ে টেবীর চোখে
আঁধার গেল ছেয়ে ॥

(২)

আঁধার মাঝে হঠাৎ আলো,
টেবী ভাবে, একি !
বুঝতে নারি কিছুই আমি
চোখটি খুলে দেখি।
চোখ খুলে যা দেখল টেবী,
অবাক কাণ্ড সে যে।
কোথায় সে যে পৌঁছে গেছে,
নতুন দেশ এযে !

(৩)

সরস রসাল হাড়গুলি তার
নাচছে আশে পাশে ;
ইঁদুরগুলি নৃত্য করে
বেড়াল পালায় ত্রাসে !
টেবীর জিভে জমছে জল
হাড়গুলিকে দেখে ;
ভাবছে টেবী, খুব তো কাছে
দেখি না খালি চেখে।

(৪)

বলগুলি সব সড়াৎ সড়াৎ
ছুটো ছুটি করে।
চাপা পড়ে ইঁদুর ভায়া
চেঁচায় খালি ডরে।
বেড়ালগুলি ছায়ার মত
দৌড়ে কেবল যায় ;
চক্ষু তাদের জ্বলছে এখন
অন্ধকারের গায়।

(৫)

টেবী কুকুর আজকে ঘুমে
গেছে স্বপ্নের দেশ ;
মনের মত খাবার দেখে
হাস্যের নাই শেষ।
মনে মনে ভাবছে তাই
জুটল আজি খাওয়া
কিন্তু যখন উঠবে জেগে
দেখবে সে সব হাওয়া !
তারপরেতে কাণ্ডখানা
উহু থাক্ ভাই।
মানে মানে এস মোরা
সরে পড়ি তাই ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য

স্বপ্নের দেশে

(চৈত্র মাসের প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার প্রাপ্ত)

ভোরের স্বপন মিথ্যে যে নয় সকল লোকে জানে ;
আমি কিন্তু ভেবে পাই না, কি বা ইহার মানে ?
দেখুন সেদিন গাছতলাতে ঘুমিয়ে আছে ভুলো ;
চারধারে তার বসে আছে জ্যান্ত হাড়গুলো।
খাওয়ার শেষে ভুলো যে সব দিয়েছিল ফেলে ;
প্রাণ পেয়ে সব খাড়া হয় রক্ত চক্ষু মেলে।
তারা কেউ বা হাসে কেউবা কাঁদে কেউবা ধরে গান ;
আছে তাদের নাক চোখ মুখ নাইকো শুধু কান।
বেড়াল গুলো যেমন আসে এসেছিলো আজ ;
উল্টো ব্যাপার দেখে তাদের মাথায় পড়ল বাজ !
পালায় যে যার প্রাণটী লয়ে ল্যাজটী তুলে পিঠে ;
জ্যান্ত হাড্ডি খেতে মোটেই লাগবে নাকো মিঠে।
কোথা ছিল একরত্তি ঐ নেংটী ইঁদুরগুলো ;
চুপি চুপি আসে যেথায় ঘুমিয়ে ছিল ভুলো।
কানের কাছে ফিস্ ফিসিয়ে বললে কিযে কথা ;
হেসেই লুটোপুটি যত ঘাস আর গাছের পাতা।
ঘুমের রাজ্য জাগল ; সবাই খিলখিলিয়ে হাসে ;
উড়ছে বল আর চলছে ব্যাট কাঁচা সবুজ ঘাসে।
ভুলেই গেছি কি দেখেছি রাতে ঘুমের ঘোরে ;
ধাঁধার জবাব ভাবছি মনে যাচ্ছি পড়ার ঘরে ;
এমন সময় রংমশালটা পড়ল এসে হাতে ;
অবাক কাণ্ড আমার স্বপন, তারি প্রথম পাতে॥

কুমারী সাধনা সেনগুপ্ত
(গ্রাহক নং ১০১৮) আমেদাবাদ

চলন্তিকা

এবারে একটি বিশেষ দুঃখের খবর দেবার আছে।

ভারতবর্ষের একজন অসাধারণ বিশ্ববিশ্রুত কবি স্যর মহম্মদ ইকবাল গত ২১শে এপ্রিল ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ইকবালের কবি খ্যাতি শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না; ভারতের বাইরে পাশ্চাত্য দেশেও তাঁর কবিতার যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল। হয়ত তাঁর কবিতার সঙ্গে তোমাদের তেমন পরিচয় নেই। কারণ উর্দ্দু ভাষায় তিনি কবিতা লিখেছেন এবং এপর্য্যন্ত বাংলায় তাঁর কবিতার অনুবাদ যথেষ্ট প্রকাশিত হয়েছে বলে জানিনা। তবে তাঁর "সারে জহান সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা" নামক জাতীয় সঙ্গীতটি সমস্ত ভারতবর্ষের প্রিয়। আগামী মাসে আমরা স্যার মহম্মদ ইকবালের পরিচয় ভাল করে দেবার চেষ্টা করব।

ইউরোপের মানচিত্র ক্রমশঃ ক্রমশঃ কেন বেশ আশ্চর্য্য আকস্মিকভাবেই বদলে যাচ্ছে; স্বাধীন অষ্ট্রীয়া আর রাজনৈতিক ভাবে ভিন্ন প্রদেশ রইল না—এখন অষ্ট্রীয়া হয়ে গেল জার্ম্মাণীর অন্তর্গত। নাৎসী জার্ম্মাণী হয়ে বসল অষ্ট্রীয়ার ভাগ্যবিধাতা। এইরূপে জার্ম্মাণীর প্রভাবে মধ্য ইউরোপের সীমান্তগুলি পুনর্গঠিত ও পূর্ণধ্বংস হচ্ছে। মধ্য ইউরোপের তথা সমগ্র ইউরোপের ভূগোল বা ভূপরিচয় নতুন করে আবার তোমাদের পড়তে হবে। এমনি কিন্তু আর এক ধরণের পরিবর্ত্তন হয়েছে আয়ারল্যাণ্ডে বা আইরিশ ফ্রী ষ্টেটে। আজ আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন। তার নিজের ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তার নুতন নামকরণ হয়েছে—"আয়ার্" (Eire), আয়ারল্যাণ্ড আর কেউ বলবে না। পরীক্ষার সময়ে তোমরা লিখলেও নম্বর কাটা যাবে। "আয়ার"এর প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন—ডাঃ ডগ্‌লাস্ হাইড্। ইনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও কবি। এঁর বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। এঁর চেহারা অনেকটা প্রেসিডেন্ট মাসারিকের মত।

আমরা প্রায়ই হিমালয় অভিযানের কথা লিখি। লিখি এইজন্য যে এতবড় দুর্জ্জয় অভিযান পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। ভারতের এই নগাধিরাজ পৃথিবীর সমস্ত পর্ব্বতমালার অপরাজেয় সম্রাট। এঁকে জয় করায় মানুষের অসম সাহসিকতার চেষ্টার অভাব নেই,

হিমালয় জয় করা পৃথিবী জয় করার সমান। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন মানুষ কৃতকার্য্য হয়নি। তাই পৃথিবীর যত কিছু দুঃসাহসিক এ্যাড্ভেঞ্চার ও অভিযান আছে, হিমালয় গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট জয় করার অভিযান তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দুঃসাহসিক ও শ্রেষ্ঠ সে বিষয় সন্দেহ নেই। এবার এক ব্রিটিশ অভিযান এই সঙ্কল্পে সিদ্ধান্ত করে তাঁদের বৈজ্ঞানিক বাহিনী নিয়ে রঙ্বাকে তাঁদের তাঁবু লাগাতে পেরেছেন। এখান থেকে তাঁদের গন্তব্য পথ মাত্র বারো মাইল। এই অভিযানের দলপতি হয়েছেন মিঃ টিলম্যান। আর এই দলে আছেন অভিজ্ঞ নির্ভীক বৈজ্ঞানিকের দল। তাঁদের মধ্যে ওডেল, স্মাইথ, সিপটন, অলিভার, লয়েড ও ওয়ারেন উল্লেখযোগ্য। এঁদের এ্যাড্ভেঞ্চারের কথা আমরা আগেও শুনেছি। আমরা আশা করি টিলম্যানদলের চেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

এমনি একচোট ঝড়, বেশ এক পশলা বিষ্টি বেশ লাগে। এই গরমের দিনে একটু ছোট ঝড় ও বিষ্টির পর সমস্ত আকাশ মাটি কি সুন্দর ও অপরূপ হয়ে ওঠে। বোশেখ মাসের বিকেল বেলা এক পশলা জলের পর কলকাতার মত জায়গাই কি মনোরম হয়ে ওঠে। সিঁদূরে আকাশের তলা দিয়ে ভিজে মাটির মিষ্টি গন্ধে ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে দল বেঁধে বেড়াতে কি ভাল লাগে। কিন্তু কাল বৈশাখীর আর একটি রুদ্ররূপ আছে—সেটি ভয়ঙ্কর। এই কয়েকদিন আগে কাল বৈশাখী একটি ভয়ঙ্কর খেলা খেলে গেল। ঝড়ের সে মাতলামিতে বাংলাদেশের অনেক লোকজন পশুপাখী মারা গিয়েছে। ঢাকাতে ঝড়ের প্রকোপে মালগাড়ী উল্টে গিয়েছিল শোনা গিয়েছে। রাজগঞ্জপুরে অনেক বাড়ী ঘরদোর পড়ে গিয়েছে। কলকাতাতেও সেদিন অনেক ক্ষতি হয়েছে। এরকম আরো দুচারটে নাকি হবে গুজব। কিন্তু এথেকে রক্ষা পাবার উপায় কিছুই নেই।

টেলিভিসন সম্বন্ধে আজকাল অনেক নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে সে কথা হয়ত তোমরা কিছু কিছু শুনেছ। ভারতবর্ষে শীঘ্রই আমরা টেলিভিসন ছবি সিনেমার পর্দ্দায় দেখতে পাবো। পৃথিবীর মধ্যে ফরাসী দেশেই নাকি সব চেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ট্রান্স্মিটিং ষ্টেশন তৈরী হয়েছে। প্যারিসের বিখ্যাত ইফেল টাওয়ারএ একটি নতুন অভিনব ট্রান্স্মিটার বসান হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে নাকি এটি সব চেয়ে বৃহৎ ও শক্তিশালী হবে। ফরাসী দেশের পোষ্ট, টেলিগ্রাফ টেলিফোন বিভাগ আশ্বাস দিয়েছেন যে টেলিভিসন প্রোগ্রাম হবে অতি সুন্দর এবং নতুন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দূরদূরান্তর পৃথিবীর নানা দেশে এ প্রোগ্রাম দেখান হবে। আমাদের দেশে টেলিভিসন নিয়ে এখনও কোন এক্সপেরিমেণ্ট হয়নি, তবে কল্পনা করা হচ্ছে ভারতবর্ষেও শীঘ্র এর সূচনা হবে।

তোমরা সকলে ফাঁকা জায়গায় খুব জোরে আওয়াজ করলে তার কেমন প্রতিধ্বনি হয়। এই প্রতিধ্বনি সম্বন্ধে কয়েকটি মজার খবর আমরা সংগ্রহ করেছি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন বলেছেন যে একবার একজায়গায় একটা পিস্তলের আওয়াজের পঞ্চাশবার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল হঠাৎ মনে হয়েছিল যেন অনেক শত্রু একসঙ্গে আক্রমণ করছে। লর্ড বেকন একটি মজার প্রতিধ্বনির কথা বলেছেন। প্যারিসে এক গির্জ্জার মধ্যে সামান্য কথা বললেই তার সুন্দর স্পষ্ট প্রতিধ্বনি হয় কিন্তু মজার কথা এই যে, 'S' দিয়ে কোন শব্দ উচ্চারণ করলে 'S' কথাটি বাদ দিয়ে তার প্রতিধ্বনি হয়। যেমন Satan' শব্দটি বললে তার প্রতিধ্বনি আসবে—Vatan! এতে বোঝা যাচ্ছে গির্জ্জার ভেতরকার দেয়ালের গঠন-প্রণালী 'S' কথাটি গ্রহণ করতে পারেনা—কাজেই তার প্রতিধ্বনি হয়নি! এবিষয়ে কোন মজার বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিস্কার করা যেতে পারে। কাসেলে এক স্কোয়ারের মধ্যে কোন কথা বললে বা আওয়াজ করলে তার প্রতিধ্বনি হয় দু'বার। কিন্তু যখন ফরাসীরা তাতে নেপোলিয়নের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলে তখন আর কোন প্রতিধ্বনি হল না। পরে আবার যখন ঐ মূর্ত্তিটি সরিয়ে তার বদলে একটি ল্যাম্পপোষ্ট সেখানে লাগান হল তখন সে প্রতিধ্বনিগুলি আবার শোনা গেল!



"স্নানের পরে"—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, (পাটনা)

আমরা সকলের জন্য

রংমশাল দল

দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মানুষের স্বভাব—মানুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই একলা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে ফেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলী হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্য ভাবতে শিখি, একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তৃত হয়।

এতখানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে আছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করছি—**রংমশাল দল।**

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জন্যে যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা সবাই এক দলের। দলের বীজ সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল **আনন্দ** আর **আলো।** রংমশাল দলের আদর্শ পরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ের দরকার হয়। সেই জন্যে রংমশাল দলের ব্যাজ হয়েছে '**মশাল**'। সুন্দর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাজটি তৈরী হয়েছে তোমাদের জন্য; ব্রুচের মত ব্যবহার করবে তোমাদের পোষাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

সকলে আমাদের জন্য

নিয়মাবলী



রংমশাল দলের "ব্যাজ"

(১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জন্যে কোন আলাদা চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাজ পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে। নিয়মিত পাঠক পাঠিকা যাঁরা এজেন্ট মারফৎ কেনেন—এজেন্টের নাম দিয়ে তাঁরা এ দলে ভর্ত্তি হতে পারেন।

(২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।

(৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।

(৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ভাবে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।

(৫) সমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার। সেজন্য কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।

(৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, "দিদিভাই" C/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।

(৭) সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অন্য কোন ব্যাপার—"দিদিভাই"এর ইচ্ছাধীন।

(৮) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।

(৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর সবার উপর সমান দৃষ্টি থাকবে।

(১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

রংমশাল দল
কুপন

নাম.. ....গ্রাঃ নং..................

জন্ম তারিখ..................স্কুল বা কলেজ, শ্রেণী..............................

পিতা বা অভিভাবকের নাম (তাঁর স্বাক্ষর)..................................

ঠিকানা..

....

লেখনী বন্ধু চাই কিনা..

হবি (Hobby)..

চৈত্রমাসের 'স্বপ্নের দেশে' প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম হয়েছেন—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য (রেঙ্গুন)

দ্বিতীয় হইয়াছেন—কুমারী সাধনা সেনগুপ্ত (আমেদাবাদ)

বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল আমরা পরের সংখ্যায় প্রকাশ করব।

নুতন আলোক-চিত্র প্রতিযোগিতা

গরমের ছুটিতে ছবি তোলবার অবসর অনেক। এবারকার ছবির বিষয় হবে "হাসির ছবি"। ছবি যা তুলবে তা খুব হাসির বস্তু হওয়া চাই। কেউ মজা করে হাসছে ছোটদের হাসি, বিশেষ করে কোন একটা ঘটনা শুদ্ধ, তা তোমরা বেশ মজা করে তুলতে পারো। কিন্তু ছবি খুব পরিস্কার হওয়া চাই। ব্রোমাইড প্রিণ্ট দেবে। প্রিণ্টের পেছনে তোমাদের নাম, বয়স ও গ্রাহক নম্বর দেবে। যারা এজেণ্টের কাছ থেকে কেনো—এজেণ্টের নাম দিবে। পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে জ্যৈষ্ঠ। এই প্রতিযোগিতায় দুটি পুরস্কার থাকবে।

নুতন ধাঁধা

শব্দ বদল ঃ

এই ধাঁধাতে একটি কথাকে বদ্‌লিয়ে অন্য একটি কথা বানাতে হয়। প্রথম কথাটির একটি অক্ষর বা চিহ্ন একবারে বদ্‌লাতে হবে এবং প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে এমন একটি কথা হবে যার মানে হয়। এইভাবে বদ্‌লিয়ে, যত কয় বারে সম্ভব, দ্বিতীয় কথাটি বানাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ ; 'সের'কে 'মণ' করতে হ'লে 'সের—সর—মর—মণ এইভাবে করা যায়। এই ধরণের কয়েকটি ধাঁধা নীচে দেওয়া হ'লো। তোমরা এগুলোর উত্তর বের করতে চেষ্টা কর।

(১) 'চিল' কে 'কাক' কর

(২) 'দধি'কে 'ছানা' কর

(৩) 'লুচি'কে 'মাংস' কর

(৪) 'তালা' কে 'চাবি' কর

(৫) 'চিড়ে'কে 'মুড়ি' কর

(৬) 'জুতা' কে 'মোজা' কর

(৭) 'কাঠ'কে 'লোহা' কর

(৮) 'কাজ'কে 'খেলা' কর

(৯) 'গাড়ী'কে 'ঘোড়া' কর

(১০) 'হাতী'কে 'ঘোড়া' কর

(১১) 'মোটা'কে 'সরু' কর

(১২) 'লেখা'কে 'ছবি' কর

(১৩) 'সভা'কে 'হাট' কর

গত মাসের "রংমশাল দলের" ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

(রংমশাল দল ধাঁধার উত্তর)

প্রথম 'ও' সহর হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে আ, মা, র, ম, নে, হ, য়, রা, স্তা, নে, ই, নামাঙ্কিত সহরগুলি যাইতে পারা যায়। ইহাতে কোনও সহরে বা রাস্তায় দুইবার যাইতে হইবে না এবং সবশেষে 'ই' সহরে পৌছান যাইবে।

আর সহরের নামের অক্ষরগুলি সাজাইলে, দ্বিতীয় বন্ধু যাহা বলিয়াছিল, তাহাই দাঁড়াইতেছে।

"ও আমার মনে হয় রাস্তা নেই" সুতরাং দুজনে একরকম ঠিক কথাই বলিয়াছে।

উত্তর দাতাদের নাম :—

শিব প্রসাদ সেন, (নিউ দিল্লী) ; সমরেন্দ্র চৌধুরী, (গৌরারং) ; তরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (মুঙ্গের) কুমারী নীলিমা বসু, (কলিকাতা) ; ইরা রায়, (কলিকাতা) ; বাবু, (ভাটপারা) ; পরিমল সরকার, (হারোয়া) ; কুমারী এষা ব্যানার্জ্জি, (বারাকপুর) ; হরি প্রসাদ চৌধুরী, (চুঁচুড়া) ; রেবা মুখার্জ্জী, (কলিকাতা) ; নীলিমা চক্রবর্ত্তী (শিমলা) ; রথীশ চন্দ্র ঘোষ, (রাজসাহী) ; যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভবানীপুর) ; শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য, (কুড়িগ্রাম) ; কুমারী শান্তি বোস, (বেহালা) ; নির্ম্মলেন্দু সরকার, বাবা, মা, অমল, অরুণ, পারুল, বাচ্চু, আচ্চু, চাঁচ্চু, প্রবাল ও খোকা, (ভাগলপুর) ; ধীরেন্দ্র কুমার সরকার, (ঢাকা) ; গৌর বোস, (কলিকাতা) ; মুকুল, (টাঙ্গাইল)।

গত মাসের নূতন ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

(নূতন ধাঁধার উত্তর)

১।	বুলু নিজে এবং তাহার দুই ভাই বোন	= ৩ জন
	বুলুদের বাবা ও মা	= ২ "
	" ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা	= ২ "
		মোট——৭ জন

২। নীচে হতে প্রথম ধাপ উঠিয়া আবার নীচে নামিবে, তারপর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ধাপ উঠিবে ও দ্বিতীয় ধাপে নামিবে, ফের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধাপ উঠিবে ও চতুর্থ ধাপে নামিয়া পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ধাপে উঠিবে এবং ষষ্ঠ ধাপে নামিবে ও সপ্তম ও অষ্টম ধাপে উঠিবে। এইরূপে তিন ধাপ করিয়া উঠিয়া এক ধাপ করিয়া নামিলে। মোট সবচেয়ে কম ১৯টী ধাপ ব্যবহার করিয়া আবশ্যক মত উঠা নামা করা যাইতে পারে।

গত মাসের নুতন ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম ঃ—

একটি ভুল হইয়াছে যাহাদের ঃ—

পূর্ণেন্দু ও মনুজেন্দু দত্ত মজুমদার, (বাজিতপুর) ; কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য, (নাগপুর) ; মিস ঘোষ, (পাটনা) ; শিব প্রসাদ সেন, (নিউ দিল্লী) ; বিনয় ভূষণ চন্দ্র, (কটক) ; তরুণ কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর) ; সুজাতা রক্ষিত, (নাইনীতাল) ; রাণী ব্যানার্জ্জী, (ঢাকা) ; অমর নাথ ব্যানার্জ্জী, (ভবানীপুর) ; কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জী, (শ্যামবাজার) ; বিভারাণী চক্রবর্ত্তী, (বালীগঞ্জ) . বাবু (ভাটপাড়া) ; কুমারী এষা ব্যানার্জ্জী, (বারাকপুর) ; হরি প্রসাদ চৌধুরী, (চুঁচুড়া) ; দেবেন্দ্র নাথ মণ্ডল বর্দ্ধমান, (সালকিয়া) ; সুনীল চন্দ্র ঘোষ, (দিল্লী) ; পবিত্র ও প্রসূন গুপ্ত, (পাটনা) ; রেবা মুখার্জ্জী, (কলিকাতা) ; নীলিমা, নমিতা, নির্ম্মল ও অমল, (শিমলা) ; রথীশ চন্দ্র ঘোষ, (রাজসাহী) ; যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভবানীপুর) ; সুশান্ত, অরুণ ও অকিঞ্চন, (খিদিরপুর) ; শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য, (কুড়িগ্রাম) ; অসীম কুমার সরকার, (পুরুলিয়া) ; সাবি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সতী, রেণু, রথী ও করুণা মৈত্র, (রাজসাহী) ; কুমারী অমলা, বিমলা ও কমলা দেবী, (ডোমজুর) ; চিত্রা, শুঁটকি, গনৌরী, বেঁটেজি, সুনীল, রাধানাথ ও ভাদু, (বাঁকিপুর) ; নদা, মেথু, কলু, দেবী ও গৌতম, (করিমগঞ্জ) ; কামাক্ষা চন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ) ; কুমারী শান্তি বোস, (বেহালা) ; গীতি, সতী, কল্পনা গোপালেন্দ্র ও রথীন্দ্র মোহন মৈত্রেয়, (রাজসাহী) ; নির্ম্মলেন্দু সরকার, (ভাগলপুর) ; সুরমা ও সমরেশ বোস, (কলিকাতা) ; প্রশান্ত কুমার সিংহ, ও গোবিন্দ লাল সিংহ, (কলিকাত) ; সৌমেন্দ্র মোহন বসু, (কলিকাতা) ।

ফাল্গুন মাসের "জোড়া জীব" পুরস্কার

প্রতিযোগিতায় যারা দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীকনকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য [পাটনা] একজন ; ভুল বশতঃ গত মাসে তাহার নামটি বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। এজন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

বিজ্ঞপ্তি

রংমশাল দলকে নিয়ে সবাই একসঙ্গে আমরা মেলবার একটা সুন্দর আয়োজন করছি। রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকা, তাঁদের অবিভাবক অবিভাবিকা, রংমশালের আত্মীয় বন্ধু লেখক লেখিকা সকলেই এতে যোগদান করবার জন্য আমন্ত্রিত হবেন। এই সম্পর্কে আমরা অভিনয়েরও আয়োজন করছি। আর সেইদিন, তোমাদের মধ্যে যাঁরা রংমশাল প্রতিযোগিতার পুরস্কার পেয়েছো, তাদের পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হবে। যাঁরা আসতে পারবে না, তাদের পুরস্কারগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমরা স্থান ও তারিখ শীঘ্রই জানাবো।



শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোমল অঙ্গের সুকোমল প্রসাধন

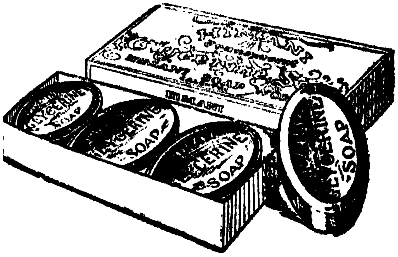
—হিমানী স্নো—

গুণে—গন্ধে—উপকারিতায় যাহার
তুলনা নাই
সৌন্দর্য্যরক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গরাগ



নিত্য স্নানে

হিমানী গ্লিসারিন

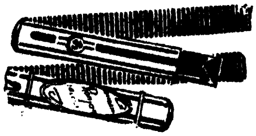


গ্লিসারিন সাবানের চরমোৎকর্ষ প্রথম শ্রেণীর
উপকরণ ও হিমানীর বৈশিষ্ট্য
সমন্বিত অতুলনীয় সাবান।

—ইহাছাড়া—
চন্দন—খস্‌খস্‌,—নিরুপমা—জেসমিন
ফলশর—হিমানী
প্রভৃতি

—রঞ্জনী—

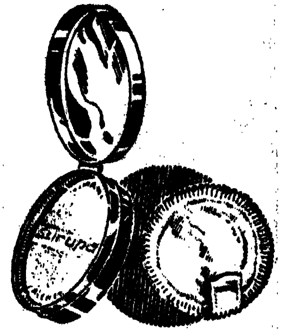
(আধুনিক লিপষ্টিক)
নধর অধর অনুরঞ্জিত
করিতে অপরিহার্য্য
বিবিধ বর্ণের পাওয়া যায়



আধুনিক প্রসাধন

সুরূপা

(গালের রুজ)
গণ্ডদেশে প্রস্ফুটিত
গোলাপের লালিমা
বিকশিত করে
দর্পণ ও প্যাডসমেত
সুরম্য আধারে
রক্ষিত।



এতদ্ব্যতীত—লালিকা (নখের পলিশ) হিমানী ট্যাল্ক পাউডার, পমেড, সাপানী (শাম্পু), হেয়ার ক্রীম, ব্রিলিয়ান্টিন প্রভৃতি প্রসাধনের সব কিছু

প্রস্তুতকারক
হিমানী ওয়ার্কস্‌
বেলগাছিয়া, কলিকাতা

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

—পরিবেশক—
শর্ম্মা ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
১৫৭ বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

রংমশাল

দ্বিতীয় বর্ষ
নবম সংখ্যা

আষাঢ়
১৩৪৫

শিশুসাহিত্য

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিশুজগৎ খুঁজে বেড়াই আর ভাবি আমার সঙ্গে সঙ্গে শিশুজগৎটাও বুড়িয়ে গেল নাকি! দেখি ঠাকুরমা বসে' বসে' ঝিমোচ্ছে সন্ধ্যেকালে, শিশুরদল গল্প শুনতে আসেনা; ঘরের কোণে বসে' শৈশববিজ্ঞানের বই পড়ছে, কাছে এগোয়না ঠাকুরদাদার রামায়ণকথা শুনতে। সে আমলে ছেলেবুড়ো আমরা সবাই শিশু ছিলেম, কথক ছিল গল্পকথা কইবার! এখন কথা শোনেনা কেউ, লেখাগল্প পড়তে চায়।

গল্প কানে শোনার জন্যে, ছবি চোখে দেখার জন্যে, এই জানতেম। এখন দেখি সে চাল উল্টে গেছে। গল্প পড়ে' চলেছে ছেলেরা, ছবি-পরিচয় চোখে না নিয়ে খবরের কাগজের চিত্রপরিচয় পড়ে' দেখছে ছেলেবুড়োতে! নবযুগের এ নববিধান—তড়িঘড়ি শিশুসাহিত্য গড়ে' তোলো, শিশু আছে কি নেই খোঁজ নেবার চেষ্টা কে করে! নিয়ে বসো ভিন্‌দেশের গাদাগাদা ছেলেভুলোনো রঙ্গীন বই, করে' ফেল তর্‌জমা, ব্যস্‌ হয়ে গেল কাজ শেষ! শিল্পের বেলাতেও তাই, হঠাৎ গজাবার চেষ্টা, চটজলদী বাঁধাকপির

মত নবযুগের শিল্প, বার হোক দেদার শিশুসমালোচনা ও পুস্তক তর্জমা, কাগজের তাসের ঘর খাড়া করবারও উৎসাহ বা সময় নেই।

তাড়ার চোটে শিল্প হবে শিশুসাহিত্য হবে, এরকম ভাবা সহজ হয়ে গেছে নবযুগে। এ অদ্ভুত উপায় কে বাৎলালে আমাদের সহজে শিশুসাহিত্য এবং মাষ্টারপিস্ বিনাসাধনায় গড়ে' তোলবার তা কে জানে।

গোড়া থেকে শিশুদের সম্পর্ক যদি না রাখি তো আফিসঘরে বসে' শিশুগল্প লেখা দুষ্কর। গল্পের ভাষা স্বতন্ত্র, পড়ার ভাষা স্বতন্ত্র। গল্পের ছলে বলতে হয় শিশুকে গল্প। রামায়ণের হনুমানকে শিশুরা যে আজও ভালোবাসে, ভীমকে যে একটুও ভয় করেনা, তার পিছনে আছে সেকালের দুই শিশুসাহিত্যসম্রাটের অপূর্ব্ব চরিত্রগঠনের ক্ষমতা এটা মনে থাকে যেন। তাঁরা তর্জমা করে যাননি মহাভারত রামায়ণ, ছেলে বুড়োবুড়ি সবাই যখন আমরা শিশুমন নিয়ে বর্ত্তমান ছিলেম তখনকার কবি তাঁরা কথার মধ্যে দিয়ে ছবিকে ভাষার মধ্যে দিয়ে ভাবকে ফুটিয়ে গেছেন সহজে। আর আজকাল গল্পের ভাব বুঝতে ভাষা বুঝতে গালে হাত দিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ রেখে মাথা ঘামাতে মাথা ধরাতে হয় রাতদুপুরের বাতি জ্বালিয়ে। মুখে মুখে সুকুমারবাবুর আবোলতাবোল ভীষ্মলোচনের কবিতা পড়ে' শোনাই, দেখি শিশুরা দিব্যি শুনে' চলেছে। যত্নে লেখা যত্নে ছাপানো বই পড়তে দিই, দেখি শিশু দুপাত উল্টে' হাই তুলছে। কোনখানে ঠেকে তাদের মন চড়ায় বাধা নৌকোর মতন—নিরস ভাষার বালুচরে, এবং চলতি ভাষার ন্যেকামোতে ন্যেতাজোবড়া হয়ে বোকা বনে' গিয়ে ছেলেরা শৈশব অতিক্রম করে' হঠাৎ হয় ঘোরতর যুবা, নয় ভীষণতরো বুড়ো রকমের মানুষ। চাঁদামামা সূর্য্যিমামা তালপাতার সেফাইদের কথা শুনলে চমকে' উঠে বলে—ওসব পুরণো হয়ে গেছে, এখন চলবেনা। শিশুদের জন্যে চন্দ্রসূর্য্যের বৈজ্ঞানিক পুস্তক লেখো, চলবে বাজারে, তালপাতার সেফাইয়ের দিকবিজয় অচল হবে শিশুদের কাছে।

শিশুসাহিত্য

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

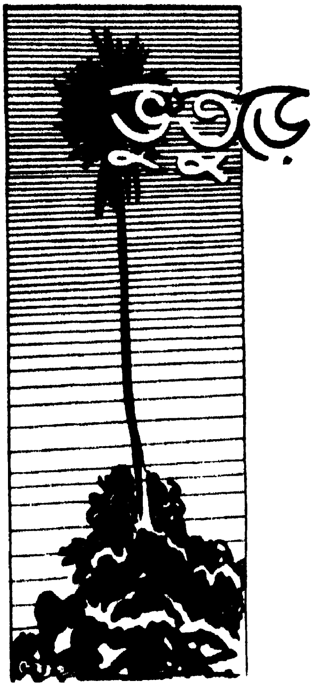
গুরুগম্ভীর লেখার মধ্যে দিয়ে শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েরা গম্ভীর হয়ে উঠলে যখন বড় হবে তখন আর গভীর নিঃশ্বাস ফেলে' বাল্যকালের দিকে তারা ফিরে চাইতেও চাইবেনা—দৃষ্টি থাকবে তাদের শিশুসাহিত্যসম্রাট হবার দিকে, শিশুসাহিত্যের দিকে নয়।

শিশুসাহিত্যপতি, শৈশবরাষ্ট্রপতি, শিশুশিল্পাচার্য্য খেতাব নেওয়া সহজ, কিন্তু কোনো কেতাবে লেখেনা যে এই হলেই হয়ে গেল কাজ!

ইয়োরোপে হাজার হাজার লোক শিশুসাহিত্য গড়ছে কাব্য লিখছে ছবি লিখছে, কারো পেছনে তারা মউরতক্ত কিম্বা নামের তখমা জুড়ে দেয়না। নবযুগের তাড়ায় এই নববিধান কোথা থেকে অকস্মাৎ আমাদের ঘাড়ে চাপলো ভেবে পাইনা। বুড়ো হয়েছি তাই ভাবি বুড়ো হয়েই দিন কাটাই আরাম-কেদারায়। যা নাই, হবার নয়, তার স্বপন আর দেখি কেন? ঘরে যেতে হবে, রাত হল, নমস্কার। *

* রংমশাল প্রীতি-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ





শ্রীসুকুমার দে সরকার

এতটুকুত এক ভুতের ছানা, তার আবার রোয়াব দেখ না—হৈ হৈ করে কাঁদতে লেগেছে! ওই দূরে ঝাঁকড়া মাথা একঠেঙে তালগাছটার মাথায় চড়ে চীৎকারের বহর কি—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া......!

ওই জন্যেই বলে যে মাথায় চড়তে দিতে নেই। তা এক-ঠেঙে তালগাছটাও যেমন! খোকন কাঁদে ওঁয়া ওঁয়া—বুড়ো তাল ঝোড়ো গলায় হেসে ওঠে—হি-হি-...রাত বিরেতে এত হাসি কেন রে বাপু? আর দিনরাত এক ঠ্যাঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবারই বা দরকার কি? নিজেও ঘুমোবে না পরকেও ঘুমুতে দেবে না। কেনরে বাপু, চেয়ে দেখলেই ত হয় পায়ের নীচে ঐ পুকুরের জলে তোরই ত ছায়া-গাছটা কুঁকড়ি শুঁকড়ি মেরে শুয়ে পড়েছে। তবে এও বলতে হবে যে শোয়ার কি আর জায়গা ছিল না? জলের ওপর শোয়ারই বা কি দরকার? আর অমন শিরশির করে কাঁপবারই বা কি দরকার?

নাঃ, ভুতের ছানাটা আজ ঘুমুতে দিলে না।

ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া......

মাও কি নেই ছাই? চটে মটে হাঁকলুম—কৌন্ হ্যায়?

দেউড়ি থেকে জবাব এল—হুজোর!

সে আবার কি রে বাবা? আমি আবার হুজুর হলাম কবে?

মামার বাড়ী এসে এ আবার কি বিপদ? গরমের ছুটিটা ভাবলাম মামার বাড়ী কাটিয়ে যাই। গ্রামকে গ্রামও বেড়ান হবে আর বুড়ি দিদিমার সঙ্গে কত দিন যে দেখা হয়নি। ছেলেবেলায় দিদিমার কোলে শুয়ে বর্ষার কত রাতে গল্প শুনেছি—হলুদ দীঘির পাড়ের ওই একঠেঙে একানড়ে তালগাছটায় ভুতের ছানারা থাকে। থাকেত থাকে এমন জ্বালাতন ত কৈ কোনদিন হইনি। কি জানি তখন দাদামশাই বেঁচে ছিলেন, লোক লস্কর জন দরোয়ানে মামার বাড়ী কি জমজমই করত। ভুতের ছানারা বোধ হয় ভয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদেনি কোন-দিন। তারপরে সময়-বুড়োর রথের চাকাটা চলে গেল মামার বাড়ীর ওপর দিয়ে। কোথায়

গেল সব লোকজন কোথায় বা লস্কর দরোয়ানদের তেলচুক্‌চুক্ লাঠিগুলো। দাদামশায়ের গড়গড়াটা দেখেছি পোড়ো বাড়িটার ওপরের ঘরে মাকড়সার জালে বন্দী হয়ে পড়ে আছে। বুড়ি দিদিমা শুধু আজও ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকেন। কত বলেছি, কিন্তু স্বামী পুত্তুরের ভিটেয় আলো জ্বলবে না বুড়ির সহ্য হয় না।

আশ্চর্য্য লাগে! ওই দিদিমাকে ছেলেবেলাতে দেখেছি তখনও কি রূপ কি মিষ্টি চেহারা! মনে আছে দাদা'মশায় একদিন গড়গড়া টানছিলেন, আমি নানারকম প্রশ্নবাণে দাদামশাইকে অস্থির করে তুলেছিলাম।

—গড়গড়ার নলটা অমন কেন, দাদু? ওটা কি সাপ? তবে অমন কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে কেন, বলনা?

দাদামশাই বলেছিলেন—ওটা আমার রাজকন্যেকে পাহারা দেয় যে—

—তোমার রাজকন্যে! সে কোথায়?

দাদামশাই দিদিমার দিকে চেয়ে হেসেছিলেন।

—তোরও একটা রাজকন্যে নিয়ে আসব রে টাট্টু বড় হ'?

—কেন?

—কেন? বিয়ে করবিনে? সোনার মত রাজকন্যে আমি আনব বলেছিলুম—

না সে রাজকন্যে নয়।

—তবে কোন্ রাজকন্যে?

আমি দিদিমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

দাদামশায়ের সে কি'হাসি—তবে রে শালা, আমার রাজকন্যে চুরী?

রাত্তিরে দিদিমার বুকের কাছে শুয়ে শুয়ে শুনেছি—জানিস্ টাট্টু, তোর দাদামশায়ের রাজকন্যেও একবার প্রায় চুরী হতে বসেছিল......দিদিমার গলার স্বর ঘন হয়ে আসে স্মৃতিতে ....সেই আগলডাঙ্গার মাঠে পালকী করে চলেছি বাপের বাড়ী। উড়ে বেয়ারারা দুলতে দুলতে চলেছে—ধপড় ধাঁই, ধপড় ধাঁই...সঙ্গে নেহাল সিং দরোয়ান...

কিন্তু সে কথা থাক, ঘুম আসছে এখন।

—হুজৌর!

নাঃ, জ্বালালে। ভুতের ছানারা যদি থামল তো হুজৌর থামে না। হাঁকলাম—কৌন্ হ্যায়?

—নেহাল সিং—হুজৌর

ভুতুড়ে
শ্রীসুকুমার দে সরকার

নাঃ, মামার বাড়িটা একেবারে ভুতের আড্ডা হয়ে উঠেছে।

—কেয়া মাংতা ?

—চলিয়ে হুজুর, ডাকু।

—ডাকু ?

ওরে বাবা ! লাফিয়ে উঠলাম।

—চলিয়ে হুজোর জল্‌দি।

লাফিয়ে উঠে ছুটলাম নেহাল সিংয়ের সঙ্গে। বাইরে চাঁদের আলোয় ঝিলিক ফুটছে। হলুদ দীঘির পাড়ে ভুতুড়ে একানড়ে তালগাছটা হাসছে—হিহি-হিহি। হাসছে কি কাঁপছে বলা যায় না। আগলডাঙ্গার মাঠ সামনে ধূ-ধূ-ধূ। পালকী চলেছে ধপড় ধাঁই, ধপড় ধাঁই...হঠাৎ সামনে কারা যেন রে রে রে রে...করে উঠল। অন্তহীন দিগন্ত মাঠে কোন জলচর পাখীর তীক্ষ্ণ করুণ আওয়াজ। নেহাল সিং লাঠি বাগিয়ে দাঁড়াল। তারপরে খট-খট খটা-খট..

ভুতুড়ে ডাকাতগুলো এক এক করে পড়তে লাগল।

নেহাল সিংয়ের মাথা বেয়ে রক্ত ঝরছে। উড়ে বেহারাগুলো পালকী ফেলে অবধড় অবধড় বলতে বলতে হাওয়া। পালকীর ভেতর ফুটফুটে জোচ্ছনা।—ওমা একি ? আমার দিদিমা যে, আমারই দিদিমা...

চেঁচিয়ে ডাকলাম—নেহাল সিং নেহাল সিং ?

কোথায় নেহাল সিং ? কোথায় বা কে ?

স্বপন পুরীর ভুতটা খিলখিল করে হেসে ওঠে। ভুত খোকনদের মা তখন মিষ্টি গলায় নাকী সুরে গান গাইছে—

আঁধার রাঁতে জোঁনাক জ্বলে
খোঁকন সোঁনা ঘুঁমোয় বঁলে
আঁমাবস্যের চাঁদামামা টিঁপ দিঁয়ে যাঁয়
আঁমার খোঁকন কাঁলো মাঁণিক
হাঁর মেঁনেছে চাঁদের ফিঁনিক
আঁয় গোঁ-আঁয় ঘুঁমের দেঁশে কেঁ যাঁবিরে আঁয়
বঁনের ভেঁতর সোঁনার টিঁয়ে
আঁয় রেঁ আঁয় টোঁপর নিঁয়ে
খোঁকন সোঁনা বঁর সেঁজেছে ঘুঁমের দেঁশে যাঁয়।

ভুতুড়ে
শ্রীসুকুমার দে সরকার

ভুতমায়ের সেই নাকী সুরের গান, আগলডাঙ্গার মাঠে কোন অদ্ভুত রাতচরা পাখীর কান্না, হলুদদীঘির পাড়ের একানড়ে তাল-গাছটার হড়বড়ে হাসি। নাঃ, পাগল করে তুল্ল। ওটা আবার কি? জানলা দিয়ে সাদা গোল একটা মড়ার মাথা কেন মরা হাসি হাসে? নাঃ, ওটাত চাঁদই দেখছি। চাঁদটা আবার মরে গেল কখন? দলে দলে মেঘ পেঁজা তুলোর মত হুহু করে ভেসে চলেছে মরা চাঁদকে ঢেকে ফেলতে। বিরাট পোড়ো মামার বাড়িটা অতীত দিনের কথা ভেবে থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সেই ঠাণ্ডা দীর্ঘশ্বাসে একানড়ে একঠেঙ্গে তাল-গাছটা নড়েচড়ে হি-হি করে কেঁপে উঠছে। নাঃ, ঘুমের আর আশা নেই! ভোর হোল নাকি? তাইত শুকতারাটা দেখি এক চোখ টিপে আর এক চোখে আমার দিকে চেয়ে দুষ্টুমী হাসি হাসছে জানলার মাথায়।



ওটা আবার কি?

আবার ভুতের খোকনের কান্না—ওঁয়া ওঁয়া-ওঁয়া...আর থাকতে পারলাম না। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়লাম তালগাছটার মাথা লক্ষ্য করে। অদ্ভুত কাণ্ড! ভুতের ছানাগুলো দিব্যি পাখা মেলে বক হয়ে উড়ে গেল। একানড়ে তালগাছটা এবার পষ্ট আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে হেসে উঠল—হি-হি-হি-হি...

বয়সের প্রতিযোগিতা

জন্তুদের আয়ু

শ্রীইন্দিরা দেবী

জু'তে বেড়াতে যাবে ? এমন চমৎকার দিনটা নষ্ট না করে মনে মনে আমার সঙ্গে সোজা একবারে জু'তে হাজির হও খুব মজার অথচ দরকারী কতকগুলো জিনিস তোমাদের বলবো। কত জীব জন্তু তোমরা দেখো—হাতি, বাঘ, কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতি, কোনটা দেখলে ভয় লাগে আর কোনওটা বিস্ময় বোধ হয়, কিন্তু এরা কে কতদিন বাঁচে বলতে পারো ?

ঠিক করে বলতে পারা সত্যি শক্ত, এসম্বন্ধে কোন রেকর্ড রাখা হয় না। ধরো এই কোলকাতা সহরে আমাদের কথা—জন্ম ও মৃত্যুটা করপোরেশন রেজেষ্ট্রি অফিসে রেকর্ডের খাতায় তোলা, তোমার জন্ম তারিখ সালটা আছে তুমি খুসী মতো দেখে আসতে পারো কিন্তু বেচারা এইসব জন্তুগুলো ! তবে বাড়ীর পোষমানা জন্তু আর জু'তে রাখা জন্তু তাদের মোটামুটী বয়সের হিসাব রাখা হয়। কিন্তু বনে জঙ্গলে এ সব জীব জন্তুদের আয়ু আরও অনেক বেশী।

কে কতদিন বেঁচে থাকতে পারে—এ নিয়ে এদের ভিতর প্রতিযোগিতা হলে কে জয়লাভ করতো জানো ? আচ্ছা, সেই গল্পটা তোমাদের মনে পড়ে ? সেই যে দৌড় প্রতিযোগিতা হলো কচ্ছপ আর খরগোসের ভেতর ! কে জিতেছিল ? হ্যাঁ—হ্যাঁ কচ্ছপই। জীবনের এ দৌড় প্রতিযোগিতায় কচ্ছপই জয়লাভ করবে কারণ এরা সাধারণতঃ ৩০০ থেকে ৪০০ বছর অধিক বেঁচে থাকতে পারে। লণ্ডন জু'তে ১৯০৬ সালে একটা কচ্ছপ মারা যায়—যার বয়স ৩৫০ বছর হয়েছিল। এ বিষয় কুমীরও কচ্ছপের সঙ্গে পাল্লা দেয়—কুমীর তিনশ বছর অবধি বেঁচে থাকতে পারে।

হাতী ? কেমন ভয় করে আর হাসি পায় এমনি চেহারা আর চলন ! এদের শরীর বৃদ্ধিতে যেমন সময় লাগে তেমনি শারীরিক অবস্থা হ্রাস পেতে সময় লাগে, এরা ১০০ বছর অবধি বেঁচে থাকতে পারে। ঈগল পাখীরাও বয়সে হাতীর সঙ্গে পাল্লা দেয়। অনেকে বলেন, এরা দুশ বছর অবধি বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু তিমি বাবাজীর কাছে সব বাবাজীদের মুখ চুণ; তিমির তুলনায় এরা সব নাবালোক ! ৫০০ বছর এরা হেসে খেলেই বেঁচে থাকে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ভিতর যে সব তিমি ধরা পড়ে এদের নাকি অনেকেই হাজার বছরের 'খোকা' ! বেঁচে থাকা নিয়ে প্রতিযোগিতার কথা বল্লাম বটে কিন্তু তিমি, কুমীর আর কচ্ছপ বয়সের দিক দিয়ে এরা যেন সব সৃষ্টি ছাড়া। তা'হলে বেঁচে থাকা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অলিম্পিকের নিয়মানুসারে এরা কি disqualified হবে ?



দেশলাইয়ের বাক্স

শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি. এ.

এক সৈনিক ফাঁকা রাস্তাটা দিয়ে একা এগিয়ে চল্‌ছিল সহরের দিকে। পিঠে তা'র ছোট একটা বোঁচকা আর কোমরে ঝোলানো তরোয়াল। সে গিয়েছিল যুদ্ধ কর্‌তে, এখন ফির্‌ছে সে নিজের বাড়ী।

পথে তা'র সঙ্গে দেখা এক কুৎসিৎ ডাইনির ; তলাকার ঠোঁটটা তা'র থুৎনি পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে।

"শুভ সন্ধ্যা ওহে সৈনিক!" সেই ডাইনি বলে চল্‌ল, "কি সুন্দর তোমার তরোয়ালটা আর তোমার যুদ্ধে যাবার বোঁচকাটা! যত টাকা চাও, নিশ্চয়ই তুমি তত টাকা পাবে।"

সৈনিক বলল, "ধন্যবাদ বুড়ী ডাইনি। কিন্তু তারপর?"

"তারপর?.........না না, সে আর এমন বেশী কথা কি? তুমি টাকা চাও তো, টাকা? শোন আমার কথা মন দিয়ে। ওই বড় গাছটা তুমি দেখতে পাচ্ছো তো?" ডাইনি আঙ্গুল দিয়ে পথের পাশের একটা বড় গাছ দেখাল। "ওটার ভেতরটা কিন্তু এক্কেবারে ফাঁকা! গাছ বেয়ে ওপরে উঠলেই তুমি একটা বিরাট গর্ত্ত দেখতে পা'বে, আর সেখান দিয়ে নাম্‌তে আরম্ভ করলেই তুমি চলে আস্‌বে এক্কেবারে গাছের ভেতরে। তোমার কোমরে একটা দড়ি বাঁধা থাকবে, যা'তে ভেতর থেকে চীৎকার করে বললেই তোমাকে আমি টেনে তুল্‌তে পারি।"

"কিন্তু গাছের ভেতরে গিয়ে হবে কি শুনি?" সৈনিক প্রশ্ন কর্‌ল।

"কেন, টাকা পাবে—টাকা!" এক মুখ হেসে' ডাইনিটা বলে' চল্‌ল, "গাছের তলায় পৌঁছে তুমি একটা চওড়া পথ দেখতে পাবে ; হাজার হাজার মোম বাতি জ্বলছে সেখানে... ঝক্ ঝক্ করছে সমস্ত জায়গাটা, যেন উজ্জ্বল একটা দিন! এগিয়ে গেলেই তোমার সামনে

পড়বে তিনটে দরজা; প্রত্যেকটাকেই তুমি খুসী মত খুলতে পার্বে, কারণ দরজার সঙ্গেই লাগানো আছে তা'দের চাবি। প্রথম ঘরটার মাঝখানে আছে একটা বিরাট সিন্ধুক, আর তা'র ওপরে বসে' আছে একটা কুকুর······চায়ের পেয়ালার মত বড় বড় তা'র চোখ। কিন্তু তা'তে ঘাবড়াবার বিশেষ কিছু নেই। আমি আমার নীল চেক্-কাটা উড়ুনিটা তোমায় দেবো। সেটাকে তুমি মেঝেতে বিছিয়ে ফেলবে; এগিয়ে গিয়ে ধরবে কুকুরটাকে আর রাখবে তুমি সেটাকে এই উড়ুনিটার ওপর। তারপর সিন্দুকটা খুলে যত খুসী পয়সা নাও না কেন, কেউই তোমায় বারণ করবে না। এ সিন্দুকের মুদ্রাগুলো সমস্তই তাঁবার। কিন্তু যদি তুমি রূপোর টাকা চাও, তা হ'লে শুধু তোমাকে যেতে হবে একবার পাশের ঘরে। সেখানে সিন্ধুকের ওপর যে কুকুরটা বসে আছে চোখ দু'টো তা'র জাঁতার মত বড় কিন্তু তা' বলে' ভয়ের কিছু নেই, সেটাকে তুমি উড়ুনিটার ওপর বসিয়ে নিতে পারো যত খুসী রূপোর টাকা ········কিন্তু তুমি যদি সোনার মোহর চাও,········" চোখ দু'টো বড় বড় করে ডাইনিটা বলে চল্ল, "যদি তুমি সোনার মোহর চাও, তাও তুমি যত ইচ্ছে পেতে পারো; শুধু তোমাকে যেতে হবে তৃতীয় ঘরটায়। কিন্তু যে কুকুরটা সে ঘরের সিন্ধুকটার ওপর বসে আছে চোখ দু'টো তার বটগাছের মত বড় বড়! কিন্তু সেটাকেও এই উড়ুনিটার ওপর রেখে সিন্ধুক খুলে যত খুসী সোনার মোহর নিতে পারো।

"কথাগুলো তো নেহাৎ মন্দ লাগছে না।" সৈনিক বলে উঠল; "কিন্তু এর বদলে তোমাকে কি দিতে হবে?"

"না না; আমার একটা কানা কড়িরও দরকার নেই। শুধু,······" গলাটাকে ছোট করে এনে সে বলে চল্ল, "শুধু সেখান থেকে একটা সামান্য দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে আসতে হবে। আমার ঠাকু'মা ওর ভেতরে দেশলায়ের বাক্সটা ফেলে এসেছিল।"

আর কোন কথা না বলে সৈনিক তরতর করে গাছের ওপর উঠে গেল, ঝুলে পড়ল সেখানকার গহ্বর দিয়ে আর যখন সে এসে পৌঁছুলো নীচে সত্যি সে দেখল সেখানে রয়েছে একটা চওড়া পথ আর জ্বলছে হাজার হাজার বাতি যেন একটা ঝকঝকে দিন!

চট্‌পট্ সে খুলে ফেলল প্রথম দরজাটা আর দেখল সেখানে বসে রয়েছে একটা কুকুর চায়ের পেয়ালার মত বড় বড় তার চোখ দু'টো।

ডাইনির ওড়্‌নাটার ওপর কুকুরটাকে বসিয়ে সৈনিক বল্ল, "সত্যিই, তুমি তো খুব সুন্দর ছোক্‌রা হে!" তারপর পকেট ভরে সে নিল তাঁবার পয়সা। দ্বিতীয় ঘরটার দরজা খুলে সে চম্‌কে উঠল········বাপরে! জাঁতার মত বড় বড় দু'টো চোখ মেলে সেখানে বসে

রয়েছে বিরাট একটা কুকুর। কিন্তু সেটাকে ওড়নাটার ওপর বসাতে সত্যিই কিছু সে বলল না। সৈনিক খুল্‌ল সিন্ধুকটা আর ঝক্‌ঝকে রূপোর টাকাগুলো দেখে তাড়াতাড়ি তাঁবার পয়সাগুলো ফেলে দিয়ে সে তা'র পকেটগুলো ঠেসে ভরে নিল রূপোর টাকাতে।

তারপর গেল সে তৃতীয় ঘরটায়। কিন্তু···ওরে বাপ রে; কি ভীষণ! সে ঘরের যে কুকুরটা রয়েছে চোখ দু'টো তা'র সত্যিই বিরাট বটগাছের মত! কিন্তু আশ্চর্য্য, ওড়নাটার ওপর বসাতে কুকুরটা কিছু বল্‌ল না! ব্যগ্র হয়ে খুলল সে এ' ঘরের সিন্ধুকটা আর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল! চোখের সামনে তার ঝলসে উঠল সোনার মোহরগুলো।



সেই মুহূর্ত্তেই সৈনিকের তলোয়ারটা······

এবার সে তার পকেট আর পোঁট্‌লা আর জুতো আর টুপিতে ভর্‌ল সোনার মোহর। তারপর খুঁজে বার কর্‌ল সেই দেশলাইয়ের বাক্সটা তারপর দড়িতে টান দিয়ে বল্‌ল, "ওহে বুড়ী ডাইনি, এবারে টেনে তোলো।

"এই দেশলাইয়ের বাক্সটা দিয়ে তুমি কর্‌বে কি শুনি?" বাইরে এসে সৈনিক জিগ্‌গেস কর্‌ল তাকে।

"তোমার তা'তে দরকার কি বাপু," বিরক্ত হয়ে ডাইনি বলে চলল, "তুমি তো যথেষ্ট টাকা পেয়েছো। এখন বাপু আমাকে ঐ দেশলাইয়ের বাক্সটা ফিরিয়ে দিয়ে যেখানে যাচ্ছিলে যাও!"

"যত সব বাজে বুজ্‌রুকি," কর্কশ গলায় সৈনিক বলে উঠল।" এই মুহূর্তেই যদি না বল এটা নিয়ে কি করবে, আমার তরোয়ালটা বার করে তোমার গলাটা উড়িয়ে দেবো, বলে দিচ্ছি।"

"না, কক্ষনই না।" ডাইনি চীৎকার করে উঠল আর সেই মুহূর্তেই সৈনিকের তরোয়ালটা শূন্যে ঝলসে উঠল একবার, আর ডাইনির কাটা মাথাটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে। সেই নীল চেক্‌-কাটা ওড়নাটা দিয়ে সে ভালো করে সমস্ত মোহরগুলো বাঁধল, দেশলাইয়ের বাক্সটা রাখল তা'র পকেটে, তারপর মনের আনন্দে শিষ দিতে দিতে সোজা গিয়ে পৌঁছুলো প্রথম সহরটায়।

সে সব চেয়ে ভালো সরাই খানায় উঠল, ভাড়া দিল সব চেয়ে ভালো ঘরটা আর সব চেয়ে তা'র যা' প্রিয় খাবার তারই জন্যে দিল আদেশ। এখানকার লোকের মুখে সে শুন্‌ল তাদের রাজার কথা আর শুন্‌ল সুন্দরী রাজকুমারীর গল্প।

সৈনিক জিগ্‌গেস কর্‌ল, "রাজকুমারীকে কি করে দেখা যায় বল্‌তে পারো?"

"তা'র সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব" তারা জানাল "সে থাকে একটা বিরাট তাঁবার দুর্গে। রাজা ছাড়া কেউই সেখানে যেতে পারে না কারণ তা'র হাতে লেখা আছে সে নাকি একজন সাধারণ সৈনিককেই বিয়ে করবে।"

রাজকুমারীকে নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে সৈনিক ফিরে এলো তা'র সরাইখানায়; আর কিছুদিন তা'র সেখানে কাটল খুব স্ফুর্ত্তি করে।······কিন্তু কিছু দিনের ভেতরেই ফুরিয়ে গেল তা'র সমস্ত সোণার মোহর।·········সরাইখানার সবচেয়ে ভালো ঘরটা ছেড়ে দিয়ে সে বাধ্য হ'ল সহরের দরিদ্র পল্লীতে পায়রার খুপরির মত একটা ঘর ভাড়া কর্‌তে।

সেদিন সন্ধ্যায় তার কাছে মোমবাতি কেনার মতও সামান্য পয়সা ছিল না। হঠাৎ তা'র মনে হল সেই দেশলাইয়ের বাক্সটার কথা। দেশলাইয়ের গায়ে একটা কাঠি ঘস্‌তেই তা'র ঘরের দরজাটা খুলে গেল আর সেই চায়ের পেয়ালার মত বড় চোখ ওলা কুকুরটা তা'র সামনে এসে মাথা নুইয়ে বল্‌ল, "আমার ওপর কি আজ্ঞা, প্রভু?"

"এটা তো খুব দরকারী দেশলাইয়ের বাক্স" সৈনিক মনে মনে ভাবল; তারপর সে কুকুরটাকে বলল, "আমার জন্যে নিয়ে এসো তো কিছু টাকা পয়সা।" কুকুরটা ছুটে বেরিয়ে

গেল আর তার পরের মুহূর্ত্তেই, কি আশ্চর্য্য, সে নিয়ে এলো মস্ত একটা থলি তাঁবার পয়সায় ভরা।

সৈনিক এবারে বুঝতে পার্‌ল সত্যিই কি অদ্ভুত ক্ষমতা এই দেশলাইয়ের বাক্সটার। যদি সে একবার কাঠি ঘসে তাহ'লে সেই কুকুরটা আসবে যেটা বসে ছিল তাঁবার পয়সায় ভরা সিন্ধুকের ওপর, দু'বার ঘস্‌লে আসবে যেটা পাহারা দিচ্ছিল রূপোর সিন্ধুকটা, আর তিনবার ঘসলে আস্‌বে সেই ভীষণ কুকুরটা চোখ দু'টো যা'র বট গাছের মত বড়!

সৈনিক আবার ফিরে এলো সরাইখানার সেই সবচেয়ে ভালো ঘরটায়, কিন্‌ল আরও অনেক দামী দামী কাপড় জামা, আর তার পুরোনো ধনী বন্ধুরা আবার তাকে চিনতে পার্‌ল খুব সহজে!

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সৈনিক ভাবতে লাগল, "কেউ নাকি রাজকুমারীকে দেখতে পাবে না! সবাই বলে সে না কি খুব সুন্দর; কিন্তু সারা জীবন সে যদি উঁচু পাঁচিলে ঘেরা তাঁবার দুর্গেই কাটায় তা হলে তার সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কি? আমি কি তাকে একবার দেখতে পাই না?" আর সেই মুহূর্ত্তেই সে তার দেশলাইয়ের বাক্সতে ঘস্‌ল একটা কাঠি আর চায়ের পেয়ালার মত ড্যাব্‌ডেবে বড় চোখওলা কুকুরটা দরজা ঠেলে মাথা নীচু করে দাঁড়ালো তার সামনে, আদেশের প্রতীক্ষায়।

"আমি একবার রাজকুমারীকে দেখতে চাই!" সৈনিক বল্‌ল।

আর কুকুরটা ছুটে বেরিয়ে গেল সেই মুহূর্ত্তে আর অন্য কিছু ভাবার আগেই সৈনিক দেখল ঘুমন্ত রাজকুমারীকে পিঠে নিয়ে কুকুরটা হাজির হয়েছে।.........কি সুন্দর দেখতে সেই রাজকুমারীকে, সত্যিই কি সুন্দর! আর সৈনিক কিছু না ভেবেই চুমো খেলো তার হাল্‌কা ঠোঁটের ওপর। আর তারপরেই কুকুরটা ছুটে চলে গেল রাজকুমারীকে রেখে আসার জন্যে।

পরের দিন সকালে রাজা ও রাণীর সঙ্গে চায়ের টেবলএ বসে রাজকুমারী বল্‌ল, সে দেখেছে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন.........যেন একটা কুকুরের পিঠে চড়ে সে গিয়েছিল রাতে এক সৈনিকের ঘরে আর সে সৈনিক না কি চুমো খেয়েছিল তা'র হালকা ঠোঁট দু'টোর ওপর!

রাণী বললেন, "সত্যিই, এ তো বড় মজার গল্প।" কিন্তু তবুও সে রাত্রে রাজকুমারী যখন শুতে গেল, তখন তিনি একটা থলিতে শরষে পুরে ছোট একটু গর্ত্ত করে বেঁধে, দিলেন রাজকুমারীর জামার সঙ্গে। আর সে রাত্রেও কুকুরটা যখন নিয়ে গেল তা'কে সৈনিকের

কাছে, তখন কেল্লা থেকে সৈনিকের বাড়ী পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল শরষেগুলো, অন্ধকারে কুকুরটা দেখতে পেল না সেগুলোকে। পরের দিন সকালে রাজার লোক এসে সৈনিককে নিয়ে গেল বন্দী করে।



তার পকেট থেকে দেশলাইয়ের......

তারপর সহরের বাইরে সৈনিককে নিয়ে যাওয়া হল। মস্ত উঁচু এক জায়গায় ফাঁসির সরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত, আর সেটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজার সৈন্যদল আর হাজার হাজার লোক। আর রাজা আর রাণী বসে রয়েছেন সুন্দর দু'টো সিংহাসনের ওপর।

ফাঁসী দেবার আগে জিগ্‌গেস করা হয় অপরাধীর শেষ ইচ্ছা কি, আর সে ইচ্ছা যদি ক্ষতিকর না হয় তা হলে তাকে তার শেষ ইচ্ছে মত কাজ করতে দেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে আমাদের সৈনিক চাইল একটা চুরুট খেতে। রাজা অমত করলেন না। সৈনিক তার পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা বার করে কাঠিগুলো ঘস্‌ল......... একবার ....দুবার.........তিনবার। আর সেই মূহূর্ত্তেই হাজির হ'ল সেই সব-কটা কুকুরই, চায়ের পেয়ালার আর জাঁতার চাকার মত, আর বটগাছের মত যাঁদের চোখগুলো! "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও তোমরা" চীৎকার করে উঠল সৈনিক, আর তা'র কথা শুনে কুকুরগুলো লাফিয়ে পড়ল রাজ কর্ম্মচারীদের ওপর, হাতে কিংবা পায়ে ধরে দূর করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল তাদের। সবচেয়ে বড় কুকুরটা রাজা আর রাণীকে এতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল যে দেখাই গেল না কোথায় তাঁরা পড়লেন!

এই সমস্ত দেখে সমস্ত প্রজা আর সৈনিকরা ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে গেল আর তারা চীৎকার করতে লাগল, "থামাও, থামাও তোমার কুকুরগুলোকে। তুমিই হবে আমাদের রাজা, আর বিয়ে করবে আমাদের সুন্দরী রাজকুমারীকে!

তারপর আমাদের সৈনিক গিয়ে বসল রাজার গাড়ীতে আর কুকুরগুলো চীৎকার করে উঠল "হার্‌র্‌—রা—রা; ছেলেরা শিষ দিয়ে উঠল মুখের ভেতর আঙ্গুল পুরে; আর অন্য সৈন্যরা হাত তুলে কর্‌ল অভিবাদন। রাজকুমারী বেরিয়ে এলো তাঁবার দুর্গ থেকে, আর সত্যিই তা'র খুব ভালো লাগল রাণী হতে। বিয়ের ভোজ চল্‌ল আটদিন ধরে, কুকুরগুলোও বস্‌ল টেবল এর ধারে.........আর সে দেশের সেই প্রচলিত কথা সত্যি হল শেষকালে যে একজন সাধারণ সৈনিকই বিয়ে করবে দেশের রাজকুমারীকে !

= স্বপ্ন =

শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত

স্বপ্ন দেখে ছোট্টখোকন, স্বপ্ন রচে দূরদেশের—
স্বপ্নে সাজে রাজার কুমার, স্বপ্ন দেখে রাজ্যজয়ের।
অনেক দূরের অনেক দেশের, স্বপ্ন তাহার মনে ভাসে—
ছোট্টখোকন সেই স্বপনে ঘুমের ঘোরে আপনি হাসে।
তেপান্তরের মাঠের শেষে—
সকল মানুষ সকল দেশে,
হার মানল ছোট্টখোকার কাছে।
খোকার প্রাণ সেই স্বপনে নাচে।

ছোট্টখোকা স্বপ্ন দেখে,
চলেছে সে সবার আগে
বড় ঘোড়ায় বর্শা নিয়ে তার।
অনেক দেশের অনেক মানুষ চল্‌ছে পিছু তার
সেই আনন্দে ছোট্টখোকার মন,
একটুখানি হ'ল যে উন্মন!

তারপরেতে স্বপ্ন দেখে খোকা—
রাজ্যজয়ের বিনিময়ে,
রক্তধারা রক্তনদী হ'য়ে'
রক্ত-স্রোত ভীষণ ধারায় ছোটে।
ঘুমের ঘোরেই খোকা উঠল কেঁদে
গেল তাহার সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে।

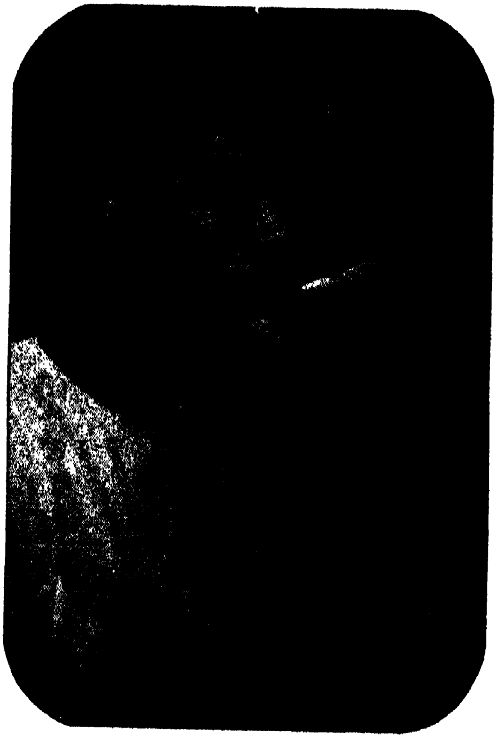
বসে' আছে মায়ের কোলে,
খোকা দেখে তাহার স্বপ্ন শেষে।
'কেন তুমি কাঁদ খোকা'—
মা যে তারে বল্‌ছে হেসে হেসে।
মায়ের হাসি কান্না থামায় খোকার,
'রাজ্যজয়ের নেই প্রয়োজন আমার'—
খোকা তখন বলে।
একটুখানি থেমে আবার বলে—
'তুমি আমার ভাল সবার চেয়ে,
কি হ'বে মা, অমন রাজ্য জয়ে?'



আমার ম্যাজিক

যাতুকর—পি. সি. সরকার

অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি যখন চীন ও জাপানে ম্যাজিক দেখাইতে গিয়াছিলাম—তখন একটী অতিশয় সাধারণ খেলা সে দেশে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই খেলাটীর কৌশল তাহারা কিছুতেই বুঝিতে পারে নাই বলিয়া বারবার আমাকে জিজ্ঞাসা করিত—কিরূপে ইহা আমি করিতে সক্ষম হইলাম। খেলাটী আর কিছুই নহে "তালাবদ্ধ বাক্স হইতে বাহির হওয়া।" চীন ও জাপানে আমি বলিয়াছিলাম যে "আমি যে কোন বাক্স হইতে বাহির হইতে পারি। আমাকে আটকাইয়া রাখিবার উপযুক্ত বাক্স পৃথিবীতে এখনও তৈয়ার হয় নাই।" এই চ্যালেঞ্জের ফলে অনেকে অনেক প্রকার বাক্সই আনিয়া ছিলেন এবং আমি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে সমস্তগুলি হইতেই নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া আসি। এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া সিঙ্গাপুরের (Sunday Tribune) একটী সংবাদপত্র আমাকে 'ভারতীয় হুডিনী' নাম দেয় (Houdini of India). এস্থলে বলা আবশ্যক যে বাক্স হইতে বাহির হওয়া ও যে কোন দেশের হাতকড়ি খোলার খেলাগুলিতে 'হুডিনি'ই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার ঐগুলিই বিশিষ্ট খেলা ছিল—আমরা তাঁহার আবিষ্কৃত উপায়কেই কিছু উন্নত করিয়া বর্ত্তমানে বাহাদুরী লইয়া থাকি। 'হুডিনি' বলিতেন যে তিনি সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিতে পারেন এবং তাহারই সাহায্যে তিনি যে কোন বদ্ধস্থান হইতে বাহির হইতে সক্ষম হন। আমি বাক্স হইতে বাহির হওয়া ও হাতকড়ি খোলা প্রভৃতি খেলায় সেই হুডিনির কৌশলই অবলম্বন করি। তবে একটী বিশিষ্ট দিনের কথা লিখিতেছি—সেইদিন কিন্তু অপর একটী সাধারণ কৌশল সাহায্যে



লেখকের জিহ্বা কাটিয়া জোড়া দেওয়ার প্রসিদ্ধ খেলায় ডাক্তার একজন দর্শকের জিহ্বা স্বহস্তে কাটিতেছেন

নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম। একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "মিষ্টার সরকার, আপনি 'চ্যালেঞ্জ' করিয়াছেন যে আপনি যে কোন তালাবদ্ধ বাক্স হইতে বাহির হইবেন—সেইজন্য আমি



'যাদুসম্রাট' পি, সি, সরকার প্রদর্শিত হাতকড়ি অগ্রাহ্য করার খেলা।

আসিয়াছি সেই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিতে।" তিনি তাঁহার নিজের লোকের দোকান হইতে একটী প্রকাণ্ড 'ষ্টীলট্রাঙ্ক' আনিয়া হাজির করিলেন। আমাকে তাঁহারা বিশেষভাবে পরীক্ষা

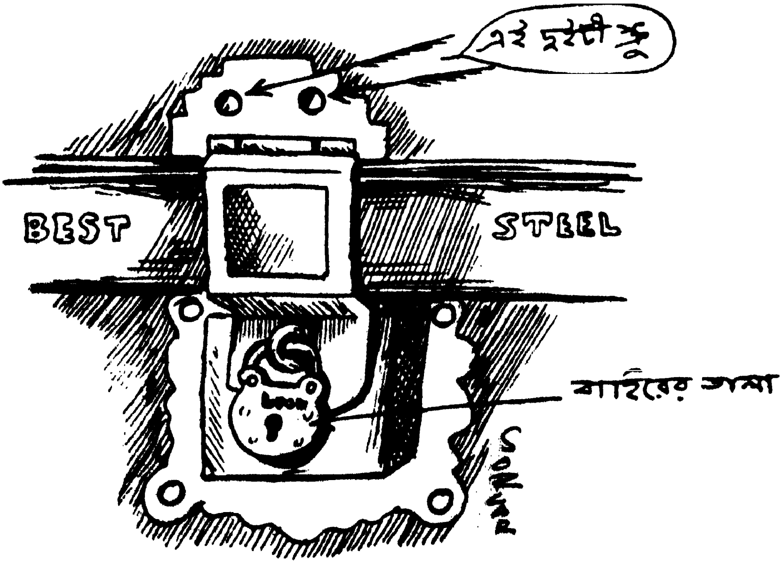
করিয়া সেই 'ষ্টীলট্রাঙ্কে' বন্ধ করিয়া দিবেন ও বাহিরে নিজেদের ইচ্ছামত খুব শক্ত তালাবদ্ধ করিয়া চাবি নিজেদের নিকটেই রাখিবেন। আমি ভদ্রলোকের কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম কারণ তাঁহারা নূতন 'ষ্টীলট্রাঙ্ক' হইতে বাহির হওয়া কঠিন মনে করিতেছেন কিন্তু আমি দেখিলাম উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ঐটী হইতে বাহির হইতে অলৌকিক কোন



যাদুসম্রাটের হাত হইতে ইচ্ছাধীন তাস শূন্যে উঠিতেছে

ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি, সূক্ষ্মদেহ ধারণ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কথার পর কাজ আরম্ভ হইল। সেই রাত্রিতেই বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য দর্শকের সম্মুখে আমাকে হাফপ্যান্ট ও হাফসার্ট

বিশেষ পরীক্ষা করিয়া পরাইয়া— আমার জুতাটীর ভিতরও কোন কিছু লুক্কায়িত নাই দেখিয়া লইয়া সেই আনকোরা নূতন 'ষ্টীলট্রাঙ্কে' বন্ধ করিলেন। ডালা বন্ধ করিবার পর উহাতে দুইটী ছোট ছোট অথচ খুব কঠিন তালা বন্ধ করিলেন। তালাবদ্ধ বাক্সটীকে আমাদের কাল মশারীর ভিতর ঢুকাইয়া তাঁহারা বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছেন—ঠিক সেই সময়ে আন্দাজ এক মিনিট দেড় মিনিটকাল সময়ের মধ্যে আমি ঐ মশারীর ভিতর হইতে অক্ষত-দেহে বাহির হইয়া আসিলাম। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিরাট করতালি পড়িতেছিল—সকলে আমাকে রক্ত-মাংসদেহ বিশিষ্ট (অশরীরী নহে) দেখিয়া ও আমার সঙ্গে কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমার সহকারী পরে বাক্স খুলিয়া দেখাইলেন উক্ত ট্রাঙ্কের ভিতর কিছুই নাই ও তালাগুলি

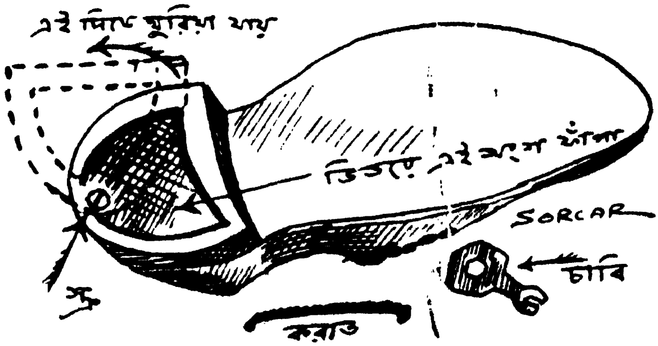


ট্রাঙ্কের তালার কৌশল। উপরের ঐ স্ক্রু দুইটীকে ভিতর হইতে খুলিতে হয়

তখনও ঠিকমত বন্ধই ছিল। এই খেলা আবার করিলাম, ক্রমে সর্ব্বত্রই একটী করিয়া নূতন ট্রাঙ্ক আর এই খেলা চলিতে লাগিল। কিরূপে এই খেলা সম্ভব হইল সকলে আলোচনা করিতেছেন। কেহ বলেন মিষ্টার সরকার ভিতরে প্রবেশই করেন নাই—তাঁহার 'মায়া দেহ' প্রবেশ করে। আবার কেহ বলেন 'ঘড়ির সময় পরিবর্ত্তন করার মত' তিনি আমাদের সকলকে যাদুবিদ্যা প্রভাবে ভুল দেখাইতেছেন। আবার কেহ বলেন কোন ভৌতিক উপায়ে তিনি তাঁহার তালা খুলিয়া ফেলেন। ঐ সব আলাপ আলোচনায় আমি কিন্তু কেবলই হাসিতাম। কাহাকেও কোন কিছু বলি নাই। ব্রহ্মদেশ, সানরাজ্য, মালয়, শ্যাম, চীন, জাপান সর্ব্বত্র

যেখানে যাইতাম সেখানেই প্রশ্ন শুনিতাম—"কিরূপে ঐটী করিলেন?" সেদিন (১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৮) কলিকাতা আসিয়াও নিখিল ভারত বেতার (All-India Radio) কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হই—কিরূপে ঐ বাক্স হইতে বাহির হইয়াছিলাম। রেডিও ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে ঐ দিন সন্ধ্যায় আমি সর্ব্বপ্রথম আমার 'ষ্টীল ট্রাঙ্ক' হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার কৌশল সংক্ষেপে বর্ণনা করি। ইতিপূর্ব্বে উহা জনসাধারণের নিকট একটী সমস্যা হইয়াই ছিল।

এইবার আসল কৌশলটী প্রকাশ করিতেছি। ষ্টীল ট্রাঙ্কের বাহির হইতে খোলা অসম্ভব কিন্তু ভিতরে থাকিলে উহা খোলা মোটেই অসুবিধার নয়। তালা যত কঠিনই হউক না কেন কিছুই আসে যায় না, কারণ তালার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। বাক্সের ভিতরে স্ক্রুর যে 'নাটগুলি আছে ভিতর হইতে উহার উপরের দুইটী খুলিলেই অনায়াসে বাহির হওয়া যায়। (নিজেদের বাড়ীর একটা ট্রাঙ্কের দিকে লক্ষ্য কর সহজেই বুঝিতে পারিবে।) নূতন ট্রাঙ্ক হইলে উহার স্ক্রুগুলিও নূতন থাকে কাজেই সামান্য রুমাল দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া ঘুরাইলেই আপনাআপনি খুলিয়া আসিবে। পুরাতন ট্রাঙ্ক হইলেই খোলা অসুবিধা কিন্তু মজা এই সকলেই নূতন বাক্স দিতে চাহে। তাহাদের ধারণা নূতন বাক্স বেশী শক্ত কাজেই আমাদের বাহির হওয়াও কষ্টকর। আসলে কিন্তু আমাদের তাহাতে সুবিধাই হইতেছিল। আমি শেষে এমন একটী চালাকী করিতাম যাহাতে পুরাতন বাক্স হইলেও অসুবিধা হইত না। স্ক্রুর 'নাট' খোলার জন্য ছোট একটী যন্ত্র আমি নিজের সঙ্গে লইতাম। পকেটে করিয়া লইলে সকলে বাহির করিয়া দেখিবে সেইজন্য একজোড়া কায়দার জুতা তৈয়ার করিয়া লই। জুতাটীর গোড়ালী (হিল) ফাঁপা এবং একদিকে ঘুরান যায়। ঐ ফাঁপা হিলের মধ্যে আমি আমার ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্র ও একটী ক্ষুদ্র লোহাকাটা করাত লইয়া যাইতাম এবং যখন যেটীর প্রয়োজন হইত ব্যবহার করিতাম। এই উপায়ে বাহির হইতে দু'চার মিনিট সময় বেশী লাগিত। আমার জামা কাপড় এমন কি জুতার মধ্য পরীক্ষা করিয়া কেহ কোন যন্ত্রের খোঁজ পাইতেন না। বলা বাহুল্য যে জুতার ভিতর দেখিয়াই সকলে নিশ্চিন্ত থাকিতেন, গোড়ালীর প্রতি কাহারও ভ্রমেও কোন সন্দেহ হইত না। স্ক্রু দুইটী খোলা হইলে 'নাট'



জুতার ফাঁপা হিলের নির্ম্মাণ কৌশল এবং নাট খুলিবার যন্ত্রপাতি

দুইটি পকেটে রাখিয়া আসিতে হয়। তারপর বাক্স হইতে বাহির হইয়া স্ক্রু দুইটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঐ ছিদ্রপথে আস্তে বসাইয়া দিতে হয়। তারপর সহকারী বাক্স খুলিয়া দেখাইবার সময় উপরের অংশটিকে চাপিয়া ধরিয়া বাক্স খুলিয়া দেখাইবেন যে উহা খালি ভিতরে কিছুই নাই। দর্শকগণ তখন যাদুকরকে দেখিতেই ব্যস্ত, বাক্স দেখিবার আগ্রহ কাহারও নাই। এই খেলা দেখাইবার কালে মেঝেটি (floor) খুবই পরিস্কার হওয়া চাই নতুবা অন্ধকারের মধ্যে স্ক্রু দুইটি পরে খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। একবার আমি স্ক্রু খুঁজিতে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলাম বলিয়া পরবর্ত্তী সময় হইতে দুইটি করিয়া 'স্ক্রু' সঙ্গে লইয়াই যাইতাম অবশ্য উহা অলক্ষিতে ফাঁপা জুতার গোড়ালিতেই থাকিত। *

* রংমশাল পাঠকবর্গের মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু তব্য থাকিলে লেখকের নিকট (রংমশালের ঠিকানায়) পত্র ব্যবহার করিতে পারেন।

বিশ্ববিখ্যাত যাদুসম্রাট—পি. সি. সরকার আগামী সংখ্যা রংমশালে কয়েকটি তাসের খেলার মজার কৌশল সম্বন্ধে লিখিবেন। তাহা পড়িয়া তোমরাও সেই খেলাগুলি দেখাইতে পারিবে।



শ্রীরণেশচন্দ্র ঘোষ

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর]

মা এসে ওকে কোলে তুলে নিলেন, তারপর আদর করে বল্লেন যে খোকাকে নাকি ওই বাঁচিয়েছে। বাবাও বললেন, "সত্যি, বেজীটা ছিলো বলেই তো খোকা বেঁচে গেলো।" খোকা শুধু বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে রইলো। রিক্কিটিক্কির বেশ মজা লাগছিলো ওদের এরকম ব্যস্ততায়।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার সময় রিক্কিটিক্কির বারবার মনে পড়ছিলো সাপ আর তার বৌয়ের কথা। খাওয়া হ'য়ে গেলে খোকা ওকে নিয়ে গেলো ওর বিছানায়। তারপর রিক্কিটিক্কির অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর পাশে জোর করে শুইয়ে রাখ্‌লো। শুয়ে থাকৃতে ওর ভারী বিশ্রী লাগছিলো তবুও ও এতটুকু আঁচড়ালো না। ওকে রীতিমত সভ্য বল্‌তে হ'বে। খোকা ঘুমিয়ে পড়া মাত্র ও চলে গেলো বাড়িটার চারপাশে একবার ঘুরে আস্‌তে। অন্ধকারে তো ছুঁচোর সঙ্গে ধাক্কাই লেগে গেলো। "আমাকে মেরো না," ছুঁচো প্রায় কেঁদে ফেল্‌লো, "রিক্কিটিক্কি আমাকে মেরো না।"

রিক্কিটিক্কি বল্‌লো, "তোমার মত একটা অপদার্থকে মেরে আমার কী হবে? আমি সাপ মারি, জানো?"

বিজ্ঞের মত ছুঁচো বললো, "ছ্যাখো, যারা সাপ মারে তারা আবার সাপের হাতেই মারা পড়ে।...তাছাড়া অন্ধকারে যদি সাপটা আমাকে কামড়ে ছ্যায়, তুমি বলে ভুল ক'রে?" ছুঁচোর কান্না পেলো।

রিক্কিটিক্কি অভয় দিয়ে বললো, "কী করেই বা কামড়াবে? সাপটা থাকে বাগানে—আর বাগানে তো তুমি কখনো যাওনা।"

"ইঁদুরটা আমাকে বলছিলো—" ছুঁচো মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেলো?

"কী বলছিলো?"

"চুপ্" ছুঁচো ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌লে, "তোমার উচিৎ ছিলো ইঁদুরের কাছে যাওয়া।"

বিরক্ত হয়ে রিক্কিটিক্কি বল্‌লো, "তা যখন যাইনি তখন তোমাকেই বল্‌তে হবে সব কথা, বুঝলে? বলো শীগ্‌গির নইলে দিলুম কামড়ে।"

ছুঁচো কেঁদে ফেল্‌লো। তারপর হঠাৎ কান্না থামিয়ে বললো "রিক্কিটিক্কি শুন্‌তে পাচ্ছ না? ভয়ে ছুঁচোর গলা বুজে এলো। রিক্কিটিক্কি কান পেতে রইলো। নিশুতি রাত। মনে হ'লো কোথায় যেন একটা অস্ফুট খশ্‌খশ্ শব্দ শুন্‌তে পাওয়া গেলো। মেঝেয় সাপের গায়ের খশ্‌খশ্ শব্দ—রিক্কিটিক্কি খুব ভালো করেই জানে। শব্দটা ভারী পাৎলা। বাথ্‌রুমের নর্দ্দমা দিয়ে সাপটা ভেতরে ঢুক্‌ছে না তো?

বেজী নিঃশব্দে বাথ্‌রুমে ঢুক্‌লো। সাদা মসৃণ দেয়ালের নীচে একখানা ইঁট সরিয়ে জল বেরুবার পথ করে দেয়া হয়েছে। গর্ত্তটার কাছে এগিয়ে যেতেই ও শুন্‌তে পেলো বাইরে সাপ আর তার বৌ ফিস্ ফিস্ করে কী বল্‌ছে?

"ছ্যাখো, বাড়ীতে যখন লোকজন থাকবে না" সাপ-বৌয়ের গলা শুন্‌তে পাওয়া গেলো তখন বেজীটাও সরে পড়বে দেখে নিও। তারপর বাগানটা আবার হবে আমাদেরই।...এই গর্ত্তটা দিয়ে ঢুকে পড়ো।...ভালো কথা, আগে কামড়াবে সেই বড় লোকটাকে—যে করাত সাপটাকে মেরেছিলো...বুঝলে? তারপর আমরা দুজনে বেজীটাকে দেখে নেবো।

"শুধু শুধু লোকটাকে কামড়ে কী হবে?" সাপটা জিজ্ঞেস করলো।

"বা-রে" সাপ-বৌ উত্তর দিলো, "বাংলোতে যখন লোকজন কিছু ছিলো না, তখন দেখ্‌তে পেয়েছিলে ঐ পাজী বেজীটাকে? যতদিন বাংলোটা থাক্‌বে খালি ততদিন আমি আর তুমিই এ বাগানের হর্ত্তাকর্ত্তা, তা জানো?...তারপর আমার ডিমগুলো আবার কাল পরশুর ভেতরেই ফুটবে। তখন বাচ্চাদের জন্য জায়গা চাই না?"

সাপটা বললো, "তাইত, সে কথা তো ভেবে দেখিনি। কিন্তু আমি বল্‌ছি কী বেজীটার পেছনে আর লেগে কী হবে? বাড়ীতে লোকজন না থাক্‌লে ও তো নিজেই চলে যাবে... কী বলো? -- আচ্ছা তুমি যাও আমি ঢুকে পড়ি।"

কথাগুলো শুনতে পেয়ে বেজী রাগে কাঁপছিলো।...ওদিকে গর্ত্ত দিয়ে সাপের মাথাটা আস্তে আস্তে ঢুক্‌তে লাগলো তারপর বেরুলো ওর পাঁচহাত লম্বা ঠাণ্ডা শরীরটা। অতবড়ো গোখ্‌রো সাপটাকে আঁধার রাতে দেখে বেজী রীতিমতো ঘাব্‌ড়ে গেলো।

সাপটা মাথা তুলে অন্ধকারের ভেতর তাকালো। ওর চোখদুটো চক্‌চক্ করছে। আস্তে আস্তে সাপটা দুল্‌তে লাগলো তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শব্দ ক'রে জল খেলো জলের টব থেকে। ওমা, সাপটা নিজের মনেই কী বল্‌ছে। খানিকটা শুনতে পাওয়া গেলো,—

"—মোটা লোকটার আবার একটা লাঠি আছে—" এর পরের কথাটা বোঝা গেলোনা "—এখানে ঠাণ্ডায় বসে থাকা যাক্। বাথ্‌রুমে এলে তো আর হাতে লাঠি থাক্‌বে না, তখন ছোবল দেওয়া যাবে।"

জলের টবটার কাছে ছিলো একটা মাঝারি গোছের কল্‌সী। কলসীর নীচটা জড়িয়ে সাপটা পড়ে রইলো কুণ্ডলী পাকিয়ে। রিক্কিটিক্কি এতক্ষণ মড়ার মত পড়ে ছিলো। এইবার এগিয়ে এলো হাল্কা পায়ে নিঃশব্দে, সাপটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত সাপটার দিকে তাকিয়ে রিক্কিটিক্কি ভাব্‌তে লাগলো কোন্ জায়গা কামড়ে ধরা সবচেয়ে সুবিধেজনক।

এক কামড়ে পিঠ ভেঙ্গে দিতে না পারলে পিঠে কাম্‌ড়ে কোনো লাভ নেই। ওরকম মোটা পিঠটা ভেঙ্গে দিতে পারবে—তাও এক কামড়ে—এ ভরসা ওর হ'লো না। লেজে কামড়ালে তো সাপটাকে শুধু ক্ষেপিয়ে তোলা হ'বে। এখন বাকী রইলো শুধু মাথা। "মাথাটা কামড়ে ধরাই ভালো," রিক্কিটিক্কি ভাবলো, "হ্যাঁ--একবার কামড়ে ধরলে আর ছাড়চিনে।"

রিক্কিটিক্কি ঠিক্ হয়ে নিলো তারপর লাফালো। সাপের মাথাটা আবার সমস্ত শরীর থেকে একটু আল্‌গা হ'য়ে পড়েছিলো। প্রাণপণে দাঁত বসিয়ে দিতেই সাপটার ঘুম গেলো ভেঙে।...তারপর কুকুর যেম্‌নি করে ইঁদুরকে ঝাকুনি দেয় তেম্‌নি করে সাপটা ঝাকুনি দিতে লাগলো—ক্ষ্যাপার মত এদিকে সেদিকে ছুটোছুটি ক'রে। রিক্কিটিক্কি কামড়ে পড়ে রইলো—মৃত্যুপণ করে। ওর শরীরটা শপাং শপাং ক'রে চাবুকের মত মেঝেয় আছড়ে পড়তে লাগলো। সাবানের কেস, ব্রাশ, ঘটি আরো কী সব জিনিষ শব্দ করে উল্‌টে পড়ে গেলো। নিশুতিরাতে

সেই শব্দই অনেক বড়ো হয়ে শোনালো। বেজী ওর কামড় আরো শক্ত করতে লাগ্‌লো। মরেই যদি যায় তবে সবাই যেন দেখ্‌তে পায় ও মরেছে বীরের মত লড়াই ক'রে।

বেজীর মাথাটা কী রকম ঘুরতে লাগলো। মনে হ'লো সমস্ত শরীরটা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ভেঙে পড়ছে। এমনি সময় ওর পেছনে বাজের মত প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হ'লো। আগুনের মত গরম বাতাসের একটা ঝাপটায় বেজী জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। লাল আগুনের হল্‌কায় ওর লোম গেলো ঝল্‌সে!...গোলমালে জেগে উঠে বড় লোকটি তার বন্দুকের দুটো নলই একসঙ্গে ছেড়ে দিয়েছেন সাপের ফণার ঠিক পেছনে।

রিক্কিটিক্কি খানিক পড়ে রইলো চোখ বুজে, অসাড় হয়ে। বেঁচে নেই বলেই মনে হ'লো। ওকে তুলে নিয়ে তিনি বললেন, "ওগো, এবারও সেই বেজীটা খুব বাঁচিয়েছে আমাদের।"

খোকার মা ঘরে ঢুক্‌লেন। ভয়ে তাঁর মুখ ছাইএর মত শাদা হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোখে উনি সাপটার ছিন্নভিন্ন অংশের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ততক্ষণে রিক্কিটিক্কির জ্ঞান ফিরে এলো। কোনোরকমে ও চলে গেলো খোকার বিছানার কাছে। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। রাতে ভালো ঘুম হ'লো না। বারেবারে ঝাঁকুনি দিয়ে দেখ্‌ছিলো গায়ের হাড়গোড় ভেঙে গেছে নাকি।

রাত পোহালে শরীরটা একটু খারাপ বোধ হচ্ছিলো কিন্তু কালকের কথা ভাবতেই ভারী মজা লাগলো। কিন্তু সাপ-বৌ রয়েছে এখনো। তারপর—হ্যাঁ—ভালো কথা সাপ-বৌ যে ডিমগুলোর কথা বলছিলো সেগুলো কবে ফুট্‌বে কে জানে? টুনটুনির কাছে একবার যাওয়া উচিত।

না খেয়ে দেয়েই রিক্কিটিক্কি দৌড়ে গেলো বাগানে। সেখানে তখন টুনটুনি চীৎকার করে গান গাইছে। সাপের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছে বাগানময়। ঝাড়ুদার সাপের শরীরটা ফেলে দিয়েছে ময়লার গাদার উপর।

'এইয়ো' রিক্কিটিক্কি রেগেমেগে বললো, "এখন কি গান গাইবার সময়?"

টুনটুনি গেয়ে চললো, "সাপ মরে গেছে—কী মজা—মরে গেছে। বীর রিক্কিটিক্কি সাপের মাথা কামড়ে ধরেছিলো—কিছুতেই ছাড়েনি। মস্ত বড় লোকটি নিয়ে এলো আগুন-লাঠি আর সাপটা পড়ে গেলো দু'টুকরো হয়ে। সাপটা আর আমার বাচ্চাদের খেতে পারবে না—কী মজা।"

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিক্কিটিক্কি বললো, "সাপ-বৌ কোথায় জানো?"

উত্তর না দিয়ে টুনটুনি গেয়ে চললো, "সাপ-বৌ বাথরুমের গর্ত্তের কাছে গিয়ে সাপকে কত ডাক্‌লো। সাপ বেরিয়ে এলো বটে কিন্তু একটা লাঠির ডগায়। ঝাড়ুদার একটা লাঠির ডগায় করে ওকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ময়লার গাদার উপরে। এসো আমরা সবাই মিলে গাই বীর রিক্কিটিক্কির জয়গাথা।"

টুনটুনি গলা ফুলিয়ে গান গাইতে লাগ্‌লো।

"রিক্কিটিক্কি বললো, "দ্যাখো টুনটুনি, আমি যদি একবার তোমার বাসায় উঠতে পারি তবে দেবো তোমার ছানাগুলোকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে ?....গান থামাবে কিনা শুন্‌তে চাই।"

"কী বলছো ?" ভয়ে ভয়ে গান থামিয়ে টুনটুনি বললো।

"সাপ-বৌ কোথায় জানো ?"

"আস্তাবলের কাছে যে ময়লার গাদা আছে তারি ধারে বসে কাঁদছে মরা সাপের জন্য। সত্যি, রিক্কিটিক্কি তোমার কী সাহস।" "বাজে কথা বোলো না। সাপ-বৌ কোথায় ডিম লুকিয়ে রেখেছে জানো ?"

"ঐ তো দেয়ালের কাছে গোলাপ-ঝাড়ের আড়ালে, যেখানে সারাদিন রোদ পড়ে। হপ্তাতিনেক আগে ও ডিমগুলো লুকিয়ে রেখেছিলো ওখানে।"

"আমাকে বলোনি কেন এতদিন ? যাকগে, দেয়ালের কাছে সেই মস্ত বড়ো গোলাপ-ঝাড়টার কাছে বললে না ?"

"সে কী হে, ডিমগুলো খেয়ে ফেল্‌ছো না তো ?"

"খাবোনা বটে কিন্তু যাহোক একটা কিছু করব। দ্যাখো টুনটুনি, তোমার যদি একটুও বুদ্ধি থাকে তাহলে তুমি আস্তাবলের কাছে উড়ে যাও। তারপর এমন ভাব দেখাও যেন তোমার ডানা গেছে ভেঙে তুমি উড়তে পারছো না। তারপর সাপ-বৌকে ভুলিয়ে নিয়ে এসো তোমার বাসার কাছে, বুঝলে ? এদিকে আমি গিয়ে ডিমগুলোর যাহোক্ একটা গতি করে ফেলি।"

কিন্তু টুনটুনির ভারী কষ্ট লাগলো ডিমগুলো নষ্ট করবার কথা শুনে। ওর নিজের বাচ্চারাও ডিমফুটে বেরোয় কিনা তাই। কিন্তু টুনটুনি-বৌ ভারী চালাক। গোখ্‌রোর ডিম মানে যে ছোট ছোট আরো গোখ্‌রো সাপ সেটা ওর জানা আছে। টুনটুনি চড়ুইকে বাচ্চাদের পাহারায় রেখে টুনটুনি-বৌ উড়ে চলে গেলো। আর টুনটুনি গান গাইতে লাগলো আগের মত। টুনটুনিটা বড়ো বোকা।

রিক্কিটিক্কি
শ্রীরণেশচন্দ্র ঘোষ

ময়লার গাদার কাছে সাপ-বৌ বসে ছিলো। টুনটুনি-বৌ ঝট্‌পট্‌ করতে করতে গিয়ে পড়লো ওর সামনে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললো, "ওমা, আমার ডানা গেছে ভেঙে। আমি আর উড়তে পারছি না। ও বাড়ীর ছেলেটা ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে।"...টুনটুনি-বৌ অসহায়ভাবে ডানা ঝট্‌পট্‌ করতে লাগলো!

সাপ-বৌ মাথা তুলে তাকিয়ে হিস্‌হিস্‌ করে বললো, "তুমি—হ্যাঁ—তুমিই তো রিক্কিটিক্কিকে সাবধান করে দিয়েছিলে—যখন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে শেষ করে দিচ্ছিলুম। ...ডানা ভেঙে এবার পড়েছো আমার মুখেই বেশ"...সাপ-বৌ ধূলোর উপর দিয়ে সর্‌সর্‌ করে টুনটুনি-বৌয়ের দিকে এগিয়ে গেলো।

"মাগো, ডানাটা একেবারে ভেঙে গেছে।" টুনটুনি-বৌ কেঁদে ফেললো। সাপ-বৌ বললো, "মরবার আগে শুনে যদি কিছু সান্ত্বনা পাও তবে শোনো। তোমাকে শেষ করে আমি বোঝাপড়া করবো ও বাড়ীর ছেলেটার সঙ্গে, বুঝলে? এখন তোমরা দেখ্‌ছো সাপটা ম'রে কাঠ হয়ে ময়লার গাদার উপরে পড়ে রয়েছে, নয়?" সাপ-বৌয়ের চোখ চক্‌চক্‌ করে উঠ্‌লো, "কিন্তু আমিও বলে রাখছি, আজ রাতেই ও-বাড়ীর ছেলেটাও এমনি ধারা ম'রে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে, দেখে নিয়ো।...দৌড়ে পালালে কী হবে? ধরে ফেললুম বলে। তাকাও দেখি একবার আমার দিকে।"

টুনটুনি-বৌ মোটেই অত বোকা নয়। ও জানে—পাখীরা সাপেদের চোখের দিকে তাকালে এত ভয় পায় যে আর নড়াচড়া পর্য্যন্ত করতে পারে না। টুনটুনি-বৌ মিহিগলায় কাঁদতে কাঁদতে ঝট্‌পট্‌ করে কেবলই সরে সরে যেতে লাগলো। সাপ-বৌও আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিলো ওর গতি।

রিক্কিটিক্কি শুনতে পেলো ওরা আস্তাবলের রাস্তা দিয়ে চলে গেলো। সেও ছুটে চল্‌লো দেয়ালের কাছে সেই গোলাপ ঝাড়ের কাছে। মস্তবড়ো ঝাড়। চারপাশ আগাছায় ভর্ত্তি। একটু খুঁজতেই শুক্‌নো ঘাসের গরম বিছানায় সাদা সাদা গোটা পঁচিশেক ডিম পাওয়া গেলো। বেশ বুদ্ধি করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাৎ নজরে পড়ে না।

সাদা খোলার ভেতর দিয়ে আশ্চর্য্যভাবে দেখা যাচ্ছিলো ভেতরে ছোট্ট ছোট্ট গোখ্‌রো সাপের বাচ্চা কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে। দু'একদিনের ভেতরেই ফুটবে। আর ডিম ফুটে বেরিয়েই মারবে মানুষ মারবে বেজী—রিক্কিটিক্কি একধার থেকে ডিমগুলো ভেঙে ফেলে ভেতরের বাচ্চাগুলোকে থেঁৎলে দিতে লাগ্‌লো? মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে দেখ্‌ছিলো কিছু বাদ যাচ্ছে নাকি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর মাত্র তিনটে ডিম রইলো। এমন সময় শুন্‌তে পাওয়া গেলো টুনটুনি-বৌ চীৎকার করে বলছে, "রিক্কিটিক্কি, সাপ-বৌ বারান্দায় উঠ্‌ছে—শীগ্‌গির এসো—ওর মৎলব ভালো নয়।"

চোখের নিমেষে রিক্কিটিক্কি ছু'টো ডিম গুঁড়ো করে দিলো তারপর বাকী ডিমটা মুখে করেই প্রাণপণে দৌড়ে বারান্দার দিকে চলে গেলো।

বাইরে বারান্দায় মা, বাবা আর খোকন চায়ের টেবিলে বসে আছে। একটু এগিয়ে রিক্কিটিক্কি দেখ্‌তে পেলো ওরা ভয়ে পাণ্ডাশ হয়ে গেছে—বসে আছে পাথরে গড়া মূর্ত্তির মত। কেউ এতটুকু নড়ছে না।

ওমা, খোকার চেয়ারের পায়া জড়িয়ে ধ'রে সাপ-বৌ হিস্‌হিস্ করে ছুল্‌ছে। সামনেই রয়েছে খোকার খালি পা। ইচ্ছে করলেই ছোবল দেয়া যায়।

বড়ো বড়ো চোখ করে খোকা তাকিয়ে আছে বাবার দিকে, বাবা কোনরকমে ফিস্ ফিস্ করে বল্লেন, "খোকা নড়োনা একটুও।"

রিক্কিটিক্কি ছুটে এলো।

"ছাখো সাপ-বৌ" রাগে লাল হয়ে রিক্কিটিক্কি বললো।

সাপ-বৌ জবাব দিলো না তাকিয়েই, "এইযে তুমিও এসেছো? রোসো, তোমার সঙ্গেও বোঝাপড়া করব।

ছাখো ওরা কী রকম ভয়—ভালো কথা, তুমি একপা এগোলেই খোকাকে কামড়ে দেব। কাজেই সাবধানে থেকো।"

"তোমার ডিম দেখেছো? এই ছাখো। বাকীগুলোর কী করেছি দেখে এসো।"

এবার ফিরে তাকাতেই সাপ-বৌ দেখ্‌তে পেলো একটা ডিম পড়ে আছে বারান্দায়, দেখেই চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, "এই, আমার ডিম ফিরিয়ে দাও বল্‌ছি।" ডিমটা ছু'পায়ে আঁকড়ে ধ'রে বেজী বললো "কী দাম দেব ডিমটার? মনে রেখো পঁচিশটা ডিমের মধ্যে এই একটাই রয়েছে। বাকীগুলো বোধহয় এতক্ষণ পিপঁড়েরা খাচ্ছে।"

"সাপ-বৌ চোখের পলকে ফিরে দাঁড়ালো।" সব ভুলে গেলো একটা ডিমের জন্য। রিক্কিটিক্কি দেখ্‌তে পেলো খোকার বাবা মস্ত বড়ো একটা হাত বের করে খোকাকে তুলে নিলেন, চায়ের টেবিলের উপর দিয়ে—সাপের নাগালের বাইরে।

রিক্কিটিক্কির ভারী ফুর্ত্তি হ'লো, বললো "ব্যস্ খোকাকে বাবা তুলে নিয়েছেন।...কাল বাথ্‌রুমে সাপকে কে কামড়ে ধরেছিলো জানো? আমি—আমি—বুঝলে? আমি।" বেজী

লাফাতে আরম্ভ করে দিলো, "আগুন-লাঠিতে ওকে দু'টুক্‌রো করে উড়িয়ে দেবার অনেক আগেই ও শেষ হ'য়েছিলো।...রিক্, টিক্, টিক্কি, টিক্কি, টক্। চলে এসো সাপ-বৌ, বেশীক্ষণ বেঁচে থাক্‌তে হবেনা তোমায়।"

সাপ-বৌ দেখ্‌লো অবস্থা বড়ো সঙীন্। ছোট ছেলেটাকে কামড়ে দেবার সুযোগ গেলো ফস্‌কে। এদিকে ডিমটাও আবার রয়েছে রিক্কিটিক্কির থাবার ভেতরে। কাজেই ফণা নামিয়ে সাপ-বৌ বললো "ডিমটা দিয়ে দাও রিক্কিটিক্কি, আমি চলে যাচ্ছি।"

"যাবে আর কোথায়? তুমিও পড়ে থাক্‌বে সাপের পাশে ময়লার গাদার উপরে বুঝ্‌লে? ছাখো, খোকার বাপও গেছেন তার সেই শব্দওয়ালা লাঠি নিয়ে আস্‌তে—"

মরীয়া হ'য়ে সাপ-বৌ ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরদিকে; রিক্কিটিক্কি লাফিয়ে পেছনে সরে গেলো। সাপ-বৌ ছোবল দিলো বারবার—রিক্কিটিক্কির গায়ে লাগলো না একটাও। শপাৎ শপাৎ করে ওর মাথাটা শুধু পড়তে লাগ্‌লো মেঝের উপর।...রিক্কিটিক্কি চেষ্টা করছিলো সাপ-বৌয়ের পেছনে যেতে। সেটা টের পেয়ে সাপ-বৌ ঘুরে ঘুরে যেতে লাগলো মুখোমুখী থাকবার জন্য। উত্তেজনায় বেজী ভুলে গেছে ডিমটার কথা। বারান্দার উপরে ওটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। রিক্কিটিক্কির অজান্তে সাপ-বৌ আস্তে ওদিকে এগিয়ে গেলো। তারপর রিক্কি-টিক্কির এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে ডিমটা মুখে করেই বিদ্যুৎগতিতে চলে গেলো বারান্দার সিঁড়ির দিকে। রিক্কিটিক্কিও ছুটলো পেছনে পেছনে। কিন্তু গোখ্‌রো সাপ যখন প্রাণের দায়ে ছুটতে থাকে তখন সে এত তাড়াতাড়ি চলে যে না দেখ্‌লে তোমরা কল্পনা করতে পারবে না।

রিক্কিটিক্কি জানত একবার যদি সাপ-বৌ কোন রকমে পালাতে পারে তবে এমনি ধারা আরো কত বিপদ যে দেখা দেবে তার ঠিক নেই।

সাপ-বৌ ছুটলো সোজা সেই কাঁটাঝোপের নীচের লম্বা লম্বা ঘাসবনের দিকে। ছুটতে ছুটতে রিক্কিটিক্কি শুন্‌তে পেলো চড়ুইটা এখনো গান গাইছে বোকার মত।..কিন্তু টুনটুনি-বৌ ভারী চালাক্। সাপ-বৌকে আস্‌তে দেখেই উড়ে ওর মাথার খুব কাছে ডানা ঝট্‌পট করতে লাগলো। টুনটুনিও যদি তাই করতো তবে দু'জনে মিলে হয়তো ওকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারতো—কিন্তু সাপ-বৌ শুধু ফণাটা নামিয়ে ছুটতে লাগলো। তবুও সেই এক মুহূর্ত্তের বাধাতেই রিক্কিটিক্কি সাপ-বৌকে ধরে ফেল্‌লো।

সাপ-বৌয়ের বাসা হ'লো একটা বড়গোছের ইঁদুরের গর্ত্তে। গর্ত্তে ঢুকে পড়বার সময় বেজীর সাদা সাদা ছোট্ট দাঁতগুলো সাপ-বৌয়ের লেজে আটকে গেলো। সাপ-বৌয়ের সঙ্গে

সঙ্গে রিক্কিটিক্কিও ভেতরে ঢুকে গেলো। বেজীরা সাধারণতঃ সাপেদের গর্ত্তে ঢোকে না—বিশেষ ক'রে গোখ্‌রো সাপের—কিন্তু রিক্কিটিক্কি ঢুকে গেলো একটুও চিন্তা না করে।

গর্ত্তের ভেতরে ঘন অন্ধকার কোথায় যে তার শেষ তাও জানা নেই। রিক্কিটিক্কি চোখ বুজে কামড়ে পড়ে রইলো আর মাঝে মাঝে পেছনের তু'পা দিয়ে গর্ত্তের ভিজা মাটি আঁকড়ে ধরতে লাগলো ব্রেকের কাজ করবার জন্য।

তারপর গর্ত্তের মুখের ঘাসগুলো কিছুক্ষণ নড়ে চড়ে স্থির হয়ে গেলো। টুনটুনি বললো, "সব শেষ হয়ে গেলো। এখন আমরা গাইবো ওর মৃত্যু সঙ্গীত। বীর রিক্কিটিক্কি মরে গেলো। গর্ত্তের মধ্যে পেয়ে সাপ-বৌ ওকে নিশ্চয়ই মেরে ফেল্‌বে।" টুনটুনি গাইল ভারী করুণ একটা গান। ও নিজেই সেটা তৈরী করে নিলো এক মিনিটের মধ্যে। যখন টুনটুনি সবচেয়ে করুণ জায়গাটা গাইছিলো ঠিক্ তখন ঘাসগুলো আবার নড়তে লাগ্‌লো আর রিক্কিটিক্কি গাময় ধূলো কাদা মেখে গর্ত্তের বাইরে বেরুতে লাগলো—ওর লম্বা লম্বা গোঁফ চাটতে চাটতে টুনটুনি থেমে গেলো একটা অস্ফুট শব্দ করে। রিক্কিটিক্কি লোঁম থেকে খানিকটা ধূলো ঝেড়ে ফেলে হেঁচে ফেললো। তারপর বললো "একেবারে শেষ করে দিয়েছি। সাপ-বৌ আর গর্ত্তের বাইরে বেরুবে না।"

ঘাসের গোড়ায় যে লাল লাল পিঁপড়েগুলো থাকে ওরা শুন্‌তে পেলো একথা। তারপর একজন করে সার বেঁধে নীচে নেমে গেলো রিক্কিটিক্কির কথা পরখ করবার জন্য।

রিক্কিটিক্কি নরম ঘাসের উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লো। ঘুম আর ঘুম?...সে ঘুম ভাঙলো একেবারে বিকেল? ঘুম থেকে উঠে ও বললো এখন বাড়ী যাই। "টুনটুনি, তুমি তুমি কারঠোক্‌রাকে বলে দিয়ো—ও যেন সবাইকে বলে দেয় যে সাপ-বৌ আর বেঁচে নেই? বুঝলে?"

"কাঠঠোক্‌রাকে চেনো? ঐ তো যে পাখিটা ঠিক্ কাঠকাটার মত শব্দ করে। কেন করে জানোনা বুঝি? বলছি শোনো, এমনি করে ওরা নাকি বাগানে বাগানে সব খবর বলে বেড়ায়। যারা শুনতে জানে তারাই বোঝে?"

রিক্কিটিক্কি যেতে যেতে শুন্‌তে পেলো কাঠঠোক্‌রা বলছে—"ঠক্-ঠক্-ঠক্ সাপ গেছে মরে ঠক্-ঠক্ ঠক্ সাপ-বৌও আর বেঁচে নেই, ঠক্-ঠক্"—

বাগানের সব পাখীরা গান গেয়ে উঠলো। ব্যাঙ্‌গুলো যোগ দিলো সেই সঙ্গে। কেননা সাপ আর তার বৌ ব্যাঙ খেতো ধ'রে ধ'রে আর তার সঙ্গে ছোট ছোট পক্ষীও।

রিক্কিটিক্কি বাংলোতে ফিরে গেলো।

ওর সেদিনকার আদর তোমরাই কল্পনা করে নিও। কী বলো? আমরা শুন্‌তে পেয়েছি, রিক্কিটিক্কি নাকি এখনও সেই বাগানেই আছে ছোট্টখাট্ট একটি রাজার মত। আর একটিও গোখ্‌রো সাপ নাকি যত বড় সাহসীই হোক্‌না কেন—বাগানে মাথা গলাতে অবধি সাহস পায় না।*

* Kiplingএর "The Jungle Book" থেকে নেওয়া।

উড়ো জাহাজ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমি যখন বড় হবো উড়ো জাহাজ চালাবো,
আকাশ বেয়ে হাওয়ায় ভেসে দূর বিদেশে পালাবো।
খুব উঁচু যে দেবদারু গাছ, সেও রবে ঢের নীচুতে,
বাজ পাখীতেও পাত্তা আমার পাবেই নাকো কিছুতে।
হিমালয়ের মস্ত চূড়া, তারো অনেক উপরে
চলবে আমার উড়ো জাহাজ—সকাল বিকেল দুপরে।
কোথায় বাড়ী তোমার আমার, ক্ষেত-খামার আর পৃথিবী?
থাকবে পড়ে মাটির বুকে—তখন তোরা কি দিবি?

আটলান্টিক অকূল সাগর পার হতে কেউ পারে না,
আমার জাহাজ পার হয়ে যায়, একটুকু ধার ধারে না!
দূরবীণেতে দেখবো আমি ছোট্ট হয়ে দুনিয়া,
সাগর কোলে ভাঁটার মতো দুলছে কি গান শুনিয়া।
গাছপালারা পিঁপড়ে যেন লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে,
শুঁয়োর মতো ডাল পালা সব আকাশ পানে বাড়িয়ে।
গাড়ী ঘোড়া ঘরবাড়ী আর কারখানা কি বাগিচা,
সমতলের বক্ষে যেন আবছা আলোর গালিচা!

নীরুমামার উঠানে আর নিতাই ঘোষের পুকুরে,
বলাইপুরে আড়ংঘাটে বলাগড় কি সুপুরে,
হাজার হাজার ছেলে মেয়ে থাকবে শুধু তাকিয়ে,
যাচ্ছি আমি জাহাজ চড়ে দিব্যি তাদের গাঁ দিয়ে।
আমার যদু কান মলে দেয়, ক্লাসের পড়া পারি নি,
চুলের মুঠি ধরে সেদিন মারলে আমায় তারিণী,
সেদিন তারা থাকবে কোথায়, লজ্জা তারা পাবে না ?
চলছে আমার উড়ো জাহাজ, দেখতে তারা যাবে না ?

চলবে আমার উড়ো জাহাজ সারা আকাশ কাঁপিয়ে
চলবে জাহাজ কলের পাখা হালকা হাওয়ায় ফাঁপিয়ে।
তুলোর মতো উড়ন্ত মেঘ থাকবে পাশে ছড়িয়ে,
আলগে ছোঁয়ায় বৃষ্টি ধারা পড়বে গায়ে গড়িয়ে।
চাতক পাখী পাখনা মেলে ঘুরবে চাকার কাছেতে,
ঝিকমিকিয়ে খেলবে আলো মাটির তলার গাছেতে।
সার্সি থেকে দেখবো আমি বিশাল মরু সাহারা,
উটের পিছে বোঝাই দিয়ে পার হয়ে যায় কাহারা !

রাত্রি বেলা কিন্তু আমি থাকবে নাকো আকাশে,
অন্ধকারে চলবেনা চোখ কুজ্ঝটিকা মাখা সে।
তুহিন মেরু চাঁদের আলোয় পড়বে যখন ঘুমিয়ে,
নামবো আমি কোথায় তখন বুঝবে না তা তুমি হে।
সাতসাগরের মাঝখানেতে প্রবাল দ্বীপের আড়ালে,
যেখানেতে মুক্তো মেলে হাত দু'খানি বাড়ালে,
সেখানেতে ঘুমিয়ে নোব—রাত্রিটুকু ফুরায়ে,
চলবে আবার জাহাজ আমার লাল পতাকা উড়ায়ে।

——:০:——

স্বপ্নাশী

সোডাওয়াটারের গল্প

শ্রীশামুক

গরমদিন। অনেকটা হেঁটে কি খেলে এসে বেশ ক্লান্ত, তেষ্টা পেয়েছে খুবই। রাস্তার উপর সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা 'আমেরিকান সোডা ফাউন্‌টেন্'—তোমায় ডাক দিল। কি চাই? লেমনেড, সরবৎ, সোডা? সরবৎ? না, না। লেমনেডেও তৃষ্ণা মেটে কই? তারচেয়ে শুধু একটা সোডাই ভাল, বসে বসে আস্তে আস্তে খাওয়া যাবে, ক্লান্তি দূর হবে একেবারে। হাত পা ছড়িয়ে বসতেই সামনে এসে হাজির—একটি চুমুক—আঃ! পৃথিবী কি সুন্দর! কিন্তু খাচ্ছ কি তুমি? ভেবে দেখেছ কখন?

পয়সা খরচ করে যা খেতে সুরু করলে আরামের সঙ্গে, ভেবে দেখেছ কি যে ঐ একই জিনিষটি তুমি বার ক'রে দেবার জন্য, ওর কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তোমার চেষ্টার ও পরিশ্রমের অন্ত নেই? এক এক চুমুকে যাকে তুমি শরীরের ভিতর নিচ্ছ আনন্দের সঙ্গে, তাকেই প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে বার করে দিচ্ছ প্রতি নিমিষে!

সোডাওয়াটারে সোডার নামগন্ধও নেই অথচ আজ কতদিন ধরে আমরা বলে আসছি—সোডাওয়াটার, সোডাওয়াটার! এর চেয়ে মজার কথা দুনিয়ায় কমই আছে—নয় কি?

দু'এক বছর আগেকার কথা নয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রীষ্টলী প্রথম তৈরী করেন এই অভিনব বস্তুটি, আমেরিকায়। কি করে তাঁর মাথায় এ মতলব এল জান? পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রস্রবণ ও উষ্ণ-কুণ্ড দেখে। কিন্তু সাধারণ লোকে এর নাম জানলো অনেক পরে—এক কুড়ি বছর বাদে। পল্ নামে একটি লোক রোজগারের আশায় জিনিভাতে তখন বেশী করে তৈরী আরম্ভ করেছে। আমেরিকাও চুপ করে বসে ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত জিতলেন স্পেক্‌ম্যান। নানারকম মিষ্টি ফলের রস আর ফুলের সুন্দর গন্ধ মিশিয়ে সোডাওয়াটারকে তিনি এমন সব নতুন নতুন রূপ দিতে লাগলেন যে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে সত্যই মানুষের প্রিয় বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। তারপর আজকাল যে এর কত আদর তা তোমরা জানো।

একটা গ্যাস আর জল এই দিয়ে সোডাওয়াটার তৈরী। আগেকার দিনে গুঁড়ো সোডাতে এ্যাসিড দিয়ে এই গ্যাস তৈরী হত। পরে দেখা গেল লাইমষ্টোন বা চূণাপাথরে ঐ এ্যাসিড দিলে তেমনি ভাল গ্যাস পাওয়া যায় অথচ ভারী সস্তা। তখন আর কি, হাজার হাজার টন লাইমষ্টোন ভাঙ্গ আর গ্যাস তৈরী কর। শেষে এমন হ'ল যে চূণাপাথরের পাহাড়গুলি মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে পৃথিবীর বুকের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় বুঝি। এখন তাই পাহাড়দের রেহাই দিয়ে পৃথিবীর স্বাভাবিক উৎসগুলি থেকে ও কয়লা পুড়িয়ে এই গ্যাস সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কিসে সোডাওয়াটার তৈরী তুমি নিজেই জানতে পারো যদি একটু দেখ নিজের সামনের গ্লাসটির দিকে। দেখবে গ্লাসের তরল বস্তুটি দুটো আলদা জিনিযে ভাগ হয়ে হয়ে যাচ্ছে। একটি হ'ল জল আর বাকীটি গ্যাস—যা এক একটা বুদ্বুদ তৈরী ক'রে ভেঙ্গে পড়ছে। একটি যে শুধু জলই তা তুমি নিজেই বুঝতে পার। বাকী জিনিষটি একটা ভারী গ্যাস গ্লাসের উপরের খালি জায়গাতে জমা হচ্ছে। একটা দেশলাই চেয়ে নিয়ে জ্বালো, হাওয়াতে বেশ জ্বলবে কিন্তু গ্লাসের খালি জায়গাটিতে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেখ—ক্রমশঃ নিবু নিবু হয়ে একেবারে নিবে যাবে।

আরেক কাজ করতে পারো—তবে বাড়ীতে বসে করতে হবে। একটু চূণের জল নাও—পানে খাবার চুণ নিলেই চলবে। চূণের জলের উপরের ভাগটা নিও—বেশ পরিষ্কার যেন সাদা জল। আর একটা খড়ের নল নাও। যা দিয়ে সাবানের ফেণার ফানুস তৈরী করা যায়। এবারে গ্লাসে চূণের জলের মধ্যে খড়ের নল ডুবিয়ে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেল দেখবে একটু বাদেই চূণের জল ঘোলাটে হয়ে সাদা দুধের মত হয়ে গেল। এবার আধ গ্লাস সোডাওয়াটার নিয়ে টেবিলে রাখো আর একটা খুব ছোট পাতলা কাঁচের বাটিতে ঐ আগেকার পরিষ্কার চূণের জল নিয়ে সোডাওয়াটারের উপর ভাসিয়ে দাও। একটু পরে চূণের জল সাদা হয়ে যাবে।

বড় আশ্চর্য্য লাগছে, না? আমরা যে গ্যাসকে সব সময়ে শরীর থেকে বার ক'রে দিচ্ছি—সেই গ্যাসকেই আবার জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাচ্ছি শরীর তাজা করবার জন্য। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয়েছে যে এ হাওয়া নয়—চূণের জল হাওয়ার সঙ্গে মিশে সাদা হয়ে যায় না।

সত্যিই এ একেবারে আলাদা গ্যাস—এর নাম 'কারবণ-ডাইঅক্সাইড্'। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে হাওয়া থেকে অক্সিজেন নিই আর প্রশ্বাসের সঙ্গে কারবণ-ডাই-অক্সাইড্ বার করে

দিই। গাছপালাদের ব্যবহার আমাদের ঠিক উল্‌টো। ওরা আমাদের দরকারী অক্সিজেনটি বার-করে দেয় আর তার বদলে নেয় আমরা যেটা চাইনা সেই কারবণ-ডাইঅক্সাইড্‌। এ নিয়ম না হলে হাওয়ায় যত অক্সিজেন সব ফুরিয়ে যেত বুঝি? আমরা বাঁচতাম কি করে? আর এই জন্যই বুঝি মানুষ বাগানওয়ালা বাড়ীঘর এত পছন্দ করে?

তুমি যতক্ষণ বসে বসে ভাবছো—ওদিকে তোমার সোডাওয়াটার থেকে গ্যাসটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। আর তুমি ও ত তাই! চেয়ারে বসে বসে কেবল উপে যাচ্ছ! গ্লাসের উপরে একটা হাই দাওনা, দেখবে গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল আর গ্যাসের বুদ্বুদ সৃষ্টি হল—ঠিক ভিতরকার সোডার বুদ্বুদগুলির মতনই। তুমি ও তাহ'লে হাওয়াতে মিলিয়ে যাচ্ছ প্রতি নিমেষে—জল আর গ্যাস সৃষ্টি করতে করতে। তুমি কি ভাবে কতখানি গ্যাস তৈরী করছো মেপে বলে দেওয়া যায়। হিসাব করে দেখা গেছে মানুষ যখন চুপচাপ বসে থাকে তখন মাত্র এক আউন্স কারবণ ডাইঅক্সাইড তৈরী হয় এক ঘণ্টায়; আর যখন খেলাধূলা দৌড়াদৌড়ি বা কোন পরিশ্রমের কাজ করে তখন পাঁচ আউন্স পর্য্যন্ত গ্যাস এই রকম আউন্সের পর আউন্স গ্যাস তৈরী করতে করতে একদিন শরীরের কলকব্জা সব বন্ধ হয়ে যাবে, আর গ্যাস তৈরী হবেনা—আমরা তখন মাথা নেড়ে বলবো, আহা, বেচারী মরে গেল গো! এখন যদি কেউ বলে যে মানুষ সারা জীবন কারবণ-ডাইঅক্সাইড তৈরী করবার জন্য বেঁচে থাকে—একেবারে হেসে দেওয়া চলবে না।

এখন এই গ্যাস এত আসে কোথা থেকে? আমরা যত জিনিষ খাই তাতে কারবণ, হাইড্রোজেন আছেই। এরপর হাওয়া থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নিলাম। এরা সব মিলে মিশে—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে তৈরী করলো জল আর কারবণ ও অক্সিজেনে বানালো কারবণ-ডাইঅক্সাইড। সেজন্য প্রশ্বাসের সঙ্গে এ ছু'টো জিনিষ ছাড়া আর কি বার হবে?

দেখা যাচ্ছে সোডাওয়াটারটি বড় সহজ জিনিষ নয়—অথচ দেখলে মনে হয় ওর মধ্যে কোন গোলমালই নেই। এদিকে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। তুমি চেয়ারে বসে ভাবছো আর জলও গ্যাস হয়ে উড়ে যাচ্ছে মিনিটে মিনিটে, আর ওদিকে সোডাবাহাদুরেরও হচ্ছে ঠিক একই পরিণতি। বেচারী কুম্ভকর্ণ লম্বা একটানা ঘুম দিয়ে দিয়েও এর হাত থেকে নিস্তার পায় নি।

বোতলের ভিতরও গ্যাস বেশ নির্ব্বিবাদে ছিল জলের সঙ্গে মিশে আর গ্লাসে ঢালার সঙ্গে সঙ্গে তার এ পালাবার চেষ্টা কেন? এর উত্তর হচ্ছে যে ঐ জলে যতটা গ্যাস থাকা

উচিং তার চেয়ে বেশী ছিল। আমরা জানি যে একটা তরল জিনিষকে যত ঠাণ্ডা করা যাবে সে তত বেশী গ্যাস ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু তাকে যদি ক্রমশঃ গরম করতে থাকে-ত' তার এই ধরে রাখার ক্ষমতা নিয়মমত কমতে থাকবে আর গ্যাস বেরুতে থাকবে। তোমার গ্লাসের জলে প্রায় ছু'গ্লাস কারবণ-ডাইঅক্সাইড ছিল। এখন চারিপাশের আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতই তোমার সোডা গরম হয়ে উঠছে ততই তা থেকে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে। বরফ দিয়ে ঘেমে শুধু যে ঠাণ্ডা হয় তা নয়, বরফ এই গ্যাসকে খুব ধীরে ধীরে বেরুতে দেয়, তার জন্য আমরা অনেকক্ষণ উপভোগ করতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, চাপ দিয়ে বেশী গ্যাস ধরানো যায় যে কোন তরল জিনিষের মধ্যে। সাধারণ বাতাসের চাপে যদি এক গ্লাস জলে এক গ্লাস গ্যাস মিশানো যায় ত' এই চাপকে চারগুণ বেশী করতে পারলে চার গ্লাস গ্যাস মিশানো চলবে। সোডাওয়াটার তৈরী করার সময় এইরকম বেশী চাপ দিয়ে জলের সঙ্গে বেশী গ্যাস মিশানো হয়। আমরা পয়সা দিয়ে কিনলাম বটে একটি সোডার বোতল কিন্তু আসলে তাতে গ্যাস আছে ঢের বেশী, হয়তো এই জন্যই আমরা বেশী আগ্রহ করে কিনি আর তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করি—কত বেশী ফাউ যে? ফাউ কে না ভালবাসে।

ছিপি খোলার সঙ্গে সঙ্গে চাপ গেল কমে আর ভুড়ভুড়ির ভিতর দিয়ে উপরের বন্দী গ্যাসটুকু বেরুতে লাগলো। গ্লাসে ঢালার পর তলার দিকে জলের সঙ্গে যারা বন্দী আছে তাদের পক্ষে বেরুনো অত সহজ নয়। গ্লাসের চারপাশে আর তলায় ছোট ছোট বিন্দুর সৃষ্টি হ'ল। কাঁচের দেয়াল আঁকড়ে ধরে গা বেয়ে বিন্দুরা উঠবার চেষ্টা করছে। ওরা স্কুলে নিশ্চয়ই 'একতা'র প্রবন্ধ লিখেছিল তোমারই মতন। তা না হ'লে হঠাৎ গুটি গুটি একজন আরেকজনের গায়ের উপর পড়ে মিশে গিয়ে দল বাঁধতে শিখলো কি করে? দেখছো ত' পাঁচ-ছ'টি খুদে খুদে বিন্দু এতক্ষণে দলবেঁধে কেমন বড়সড় হয়ে উঠলো? ওদের মধ্যে এক-গুঁয়ে অমিশুকও আছে কেউ কেউ। দেখনা, ছু'চারটি বিন্দুকে তাদের আশেপাশের বিন্দুরা যেন ছুহাত বাড়িয়ে ডাকলো একসঙ্গে মিশে যাবার জন্য, কিন্তু ওরা একটু একটু সরে গেল। কিন্তু সে কতক্ষণ! একটা দলবদ্ধ বড় বিন্দু যেন জোর করে ওদের দলে টেনে নিল। এবারে বড় বড় বিন্দুদের ক্ষমতা বেশী। তারা উপরে উঠতে লাগলো পরে ক্রমশঃ আরো বড় হতে লাগলো একটু একটু করে।

বড় হচ্ছে কেন যত উপরে উঠছে? ক্রমশঃ জলের চাপ কমে যাচ্ছে যে। চৌবাচ্ছার তলায় হাত রেখে আস্তে আস্তে উপরে উঠাও না দেখবে জল কি ভয়ানক চাপ দেয়। যত উপরে হাত এসে পড়বে তার উপর জলের চাপও তেমনি কমতে থাকবে। এবারে বড়

বিন্দুরা উপরে এসে পৌঁচেছে—এখন একএকটা বুদ্বুদ বলতে পারো—তারপরে ফেটে গেল যে! ফাটলো কেন?

একটা বেলুন নিয়ে যদি ফুঁ দাও, বড় থেকে ক্রমশঃ বড় হতে থাকবে—আরো বড় যাঃ ফটাস্! তুমি ফুঁ দিয়ে দিয়ে ভিতরের হাওয়া ক্রমশঃ বাড়াতে থাকলে আর তার চাপও বাড়তে লাগলো। শেষে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছালো যে ভিতরের হাওয়ার চাপ বাইরের হাওয়ার চাপের চেয়ে বেশী হয়ে গেল—আর সেই মুহূর্তেই ফেটে গেল। সোডাওয়াটারের বুদ্বুদদেরও ঐ দশা। জলের ছোট বিন্দুর মধ্যে গ্যাস ছিল। অনেকগুলি বিন্দু দল বাঁধতে গ্যাসের পরিমাণও চাপ দুই বেড়ে গেল। সে চাপ দিয়ে উপরে উঠাতে লাগলো আর উপরে উঠতে উঠতে যেই জলের চাপ কমতে থাকলো অমনি বুদ্বুদের ভিতরের গ্যাসের চাপ, বুদ্বুদকে বড় থেকে আরো বড় করলো। শেষে উপরে উঠে এসে ফেটে গেল।

একটা ফাটা কি এবড়োথেবড়ো কাঁচের গ্লাসে যদি সোডা ঢাল ত' দেখবে যে খুব তাড়াতাড়ি গ্যাস উঠে আসছে: আর ঐ ফাটা জায়গাটিতে লাইন-বন্দী বিন্দু তৈরী হচ্ছে। কোনরকম অসমতল স্থান পেলেই গ্যাসের চলাফেরা করার বেশী সুবিধা। খুব মসৃণ বা তেলা গ্লাস যদি একটা লও ত' দেখবে কত আস্তে ও কত দেরী করে করে গ্যাস উপরে উঠবে। একটা চামচ নিয়ে যদি জলকে একটু নাড়া দাও ত' হুস্ হুস্ করে বেশী গ্যাস একসঙ্গে উঠবে কারণ জলের চাপটুকুকে তুমি নষ্ট করে দিলে নাড়া দিয়ে। যদি অনেকক্ষণ গ্যাসকে ধরে রাখার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে বরফ ত' দেবেই একটু চিনির সিরাপও মিশিয়ে দাও। দেখবে বুদ্বুদগুলো ফেণার আকারে গ্লাসের জলের উপর বিজবিজ্ করবে—লেম্‌নেড হয়ে গেল আর কি!

কিন্তু তেষ্টার সময় সোডা খেতে বসে কত আর ভাবা যায়? কপালে ত' বিন্দু বিন্দু ঘামও ফুটে উঠেছে! আর একি সহজ ভাবনা? সোডার মতন মানুষ জীবজন্তু সকলেই জল আর কারবণ-ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হচ্ছে। জেগে থাকলে ত' হচ্ছেই, ঘুমাতে ঘুমাতেও হচ্ছে—খেতে খেতে, খেলতে খেলতে, ভাবতে ভাবতে—না, কোন নিস্তার নেই, বিশ্রাম নেই এতটুকু! সব দিনরাত জল আর গ্যাস হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছি—সবাই! কিন্তু ভেবে হবে কি? ভাবতে ভাবতেও ত' উপে গেলে এতক্ষণে বেশ খানিকটা? ওদিকে সোডাটা জুড়িয়ে জল হয় যে—!



অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাথরের সিনেমা *

আরো অনেক ডাকাডাকির পরেও জয়ন্তের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ততক্ষণে গোলমাল শুনে অমলবাবুর দ্বারবান হাতী সিং ও দলের অন্যান্য চাকর-বাকররাও এসে পড়েছে। সন্ধ্যার আবির্ভাবেও অন্ধকার সেখানে গাঢ় হ'তে পারলে না, কারণ কয়েকটা পেট্রলের লণ্ঠনের প্রখর আলোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু বনজঙ্গল ঠেঙিয়েও শত্রু বা মিত্র জনপ্রাণীরও সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না।

সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "হায় হায়, মগের মুল্লুকে এসে জয়ন্ত শেষটা প্রাণ হারালো!"

মাণিক মাথা নেড়ে বললে, "আমার বন্ধু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। জয়ন্ত হয়তো এখনি ফিরে আসবে!"

অমলবাবু বললেন, "আমার তা মনে হয় না। দু-দু'বার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কেন? ওখানে রক্তে মাটি ভিজে কেন?"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম! আর ওখানে জয়ন্তের টুপীটা গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন?"

মাণিক বললে, "দেখা যাক্, জয়ন্তের পদ্ধতিতেই কোন রহস্য আবিষ্কার করা যায় কিনা!"

যেখানে টুপীটা প'ড়েছিল সেইখানে গিয়ে সে আগে টুপীটা তুলে নিলে।

* ওঙ্কারধাম সম্বন্ধে এ উপন্যাসে আগে বা পরে যা বলা হয়েছে ও বলা হবে, তা লেখকের কপোলকল্পিত নয়। অধিকাংশই প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য। ইতি লেখক।

পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই সভয়ে দেখলে, টুপীর ত্বদিকে ত্বটো ফুটো—বন্দুকের গুলি একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এবং টুপীর ভিতরেও রক্তের দাগ!......সেখানকার মাটির উপরেও রক্তের দাগ দেখা গেল!

মাণিক নিরাশ কণ্ঠে বললে, "আর কিছু পরীক্ষা করা মিছে! জয়ন্তের মাথায় লেগেছে শত্রুর গুলি।"

অমলবাবু বললেন, "তাহ'লে গুলি খেয়ে জয়ন্তবাবু কি পালিয়ে গিয়েছেন?"

—"জয়ন্তের মতন সাহসী লোক খুব কম দেখা যায়। সে পালাবে ব'লে মনে হয় না।"

অমলবাবু বললেন, "দশজন সশস্ত্র লোক একজনকে যখন হঠাৎ আক্রমণ করে, তখন যে পালাতে রাজি হয় না তাকে সাহসী না ব'লে নির্ব্বোধ আর গোঁয়ার বলাই উচিত। জয়ন্তবাবু নিশ্চয়ই এ-শ্রেণীর লোক নন।"

—"সে কথা সত্যি। কিন্তু তাহ'লেও এতক্ষণে সে ফিরে আসত।"

—"এখানে জয়ন্তবাবুও নেই, শত্রুরাও নেই। যদি তারা তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে থাকে?"

—"অসম্ভব নয়। কিন্তু জয়ন্তকে ধ'রেও শত্রুরা বিশেষ সুবিধা ক'রে উঠতে পারবে না। কারণ সেই সোনার চাক্তিখানা তার কাছে আছে বটে, কিন্তু চাবিকাঠি আছে আমার কাছে। জয়ন্তের পরামর্শেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। একজন ধরা পড়লে একসঙ্গে ত্বটো জিনিষ চুরি যাবে না।"

সুন্দরবাবু বললেন, "এখানে রয়েছে জয়ন্তের রক্তমাখা টুপী, মাটির উপরেও রক্তের দাগ! কিন্তু ওখানে অত-দূরেও মাটির উপরে রক্তের ঢেউ বইছে! আমার কি ভয় হচ্ছে জানো মাণিক?"

—"কি ভয় হচ্ছে?"

—"আমরা ত্ববার বন্দুকের আওয়াজ শুনেছি। ধর, জয়ন্ত জানতে পারবার আগেই শত্রুর প্রথম গুলিতে আহত হয়ে এইখানে প'ড়ে যায় আর তার টুপীটা যায় মাথা থেকে খুলে। কিন্তু আহত হয়েও সে তাড়াতাড়ি আবার উঠে ঐদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাই এখানে রক্তের দাগ এত কম! সে যখন ঐখানে গিয়ে পৌঁছেচে তখন শত্রুদের দ্বিতীয় গুলি আবার তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, আর তার রক্তের ধারায় মাটি যায় ভিজে। তারপর হয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়—ভগবান না করুন—মারা পড়েছে! কারুর দেহ থেকে অত-বেশী রক্ত বেরুলে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, দীর্ঘকাল পুলিসে কাজ ক'রে এ-অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে! মাণিক, খুব-সম্ভব আমাদের বন্ধু আর বেঁচে নেই!"—গভীর ত্বঃখে সুন্দরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তাঁর চোখত্বটি ছল্-ছল করতে লাগল!

অমলবাবু আকুল কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু জয়ন্তবাবুর দেহ কোথায় গেল?"

সুন্দরবাবু বললেন, "নিজেদের বিরুদ্ধে প্রমাণ লুকোবার জন্যে শত্রুরা জয়ন্তের দেহ সরিয়ে ফেলেছে।"

ওঙ্কারধামের মন্দির-চূড়াকে তখন রহস্যময় আকাশের বিরাট পটে কালি-দিয়ে আঁকা ছবির মতন দেখাচ্ছিল এবং জঙ্গলের বোবা অন্ধকারের মুখে ভাষা দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে নৈশ জীবদের নানা-রকম কলরব, গাছে গাছে পাতায় পাতায় বাতাসের নিঃশ্বাস-উচ্ছ্বাস।

মাণিক খানিকক্ষণ স্তব্ধ মূর্ত্তির মত ব'সে থেকে হঠাৎ পাগলের মত চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ চাই!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্! আমারও ঐ কথা! এখন আর পদ্মরাগ-বুদ্ধের খোঁজ নয়, আগে খুঁজে বার করতে হবে জয়ন্তের হত্যাকারীদের!"

অমলবাবু বললেন, "কিন্তু কোথায় তারা?"

মাণিক বললে, "অমলবাবু, যে ভাঙামন্দিরের ভিতর থেকে আপনি বুদ্ধমূর্ত্তিটা এনেছিলেন, সেখানে যাবার পথ আপনার মনে আছে তো?"

—"নিশ্চয়ই আছে!"

"—তাহ'লে তল্পিতল্পা গুছিয়ে নিয়ে এখনি চলুন সেইদিকে!"

—"তবে কি এখন হত্যাকারীদের সন্ধান করা হ'বে না?"

—"অমলবাবু, হত্যাকারীরা যদিও চাবিটা পায় নি, কিন্তু চাক্তির নক্সা তো পেয়েছে! তারা এখন সেই মন্দিরের দিকেই যাবে। ঐদিকে গেলেই তাদের খোঁজ পাব।"

—"কিন্তু আমরা যখন সেখানে গিয়েছিলুম তখন চ্যান্ আর ইন্‌কে তো সঙ্গে নিয়ে যাইনি, মন্দিরে যাবার পথ হয়তো তারা জানে না।"

—"এটা আপনার ভুল বিশ্বাস। পদ্মরাগ-বুদ্ধের কথা আর মন্দিরের পথ হয়তো তারা আপনার আগে থাকতেই জানত—জান্‌ত না কেবল পদ্মরাগ-বুদ্ধের ঠিকানা। চাক্তির নক্সা পেয়ে তারা এখন সদল-বলে সেইদিকেই ছুটে চলেছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "মাণিকের কথাই যুক্তিসঙ্গত ব'লে মনে হচ্ছে। চল, চল,—আর দেরি করা নয়, যত দেরি করব শত্রুরা ততই এগিয়ে যাবে! আগে প্রতিহিংসা, তারপর শোক-দুঃখের কথা! তাড়াতাড়ি পেটে ছাইভস্ম কিছু পুরে আমাদের এখনি যাত্রা করতে হবে!"

সবাই যখন শত্রুদের সন্ধানে যাত্রা সুরু করলে, আকাশে তখন অপরিপূর্ণ চন্দ্র জেগে চারিদিকে যেন ছায়ামাখা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে! ডাকবাংলোর ছাদে একটা প্যাঁচা ব'সেছিল, হঠাৎ এতগুলো লোক দেখে ভয়ে চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে চেঁচিয়ে শূন্যে ঝটপট্ ডানা বাজিয়ে উড়ে পালাল।

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্—পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই প্যাঁচার ডাক! দুর্গা, দুর্গা!"

মাণিক দুঃখিত স্বরে বললে, "জয়ন্তকে যখন হারিয়েছি, তুচ্ছ প্যাঁচার ডাকে আমাদের আর কি অনিষ্ট হবে সুন্দরবাবু?"

পদ্মরাগ বুদ্ধ
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

—"যা বলেছ মাণিক! জয়ন্ত যে আমাদের কতখানি ছিল এখন সেটা বুঝতে পারছি! আজ আমরা তাকে হারিয়ে চলেছি যেন নাবিকহীন জাহাজের মত! কপালে এও ছিল—হুম্।"

এবারে আর ঝাপ্‌সা আকাশপটে নয়, চাঁদের ছটা পিছনে রেখে ওঙ্কারধামের পঞ্চচূড়া অন্ধকারে-গড়া পঞ্চ-স্তম্ভের মত মহাশূন্যের বুক বিদীর্ণ করছে! এখন তাকে কী অবাস্তবই দেখাচ্ছে! অতীতের একটা বিলুপ্ত জাতির সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সমাধি-মন্দির এই ওঙ্কারধাম, তার বিপুল ছায়ার তলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে আজও বিদ্যমান রয়েছে—তারই উপর দিয়ে লণ্ঠনের আলোতে চলন্ত ও সুদীর্ঘ কৃষ্ণচ্ছায়ার সৃষ্টি ক'রে হেঁটে যাচ্ছে আজ বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি প্রাণী! একদিন এইখান দিয়ে হেঁটে বা রথে বা গজপৃষ্ঠে বা অশ্বারোহণে বীরদর্পে ধনুক-বর্ষা-তরবারি হাতে ক'রে দলে দলে হাজারে হাজারে এগিয়ে গিয়েছিল যে স্বাধীন ভারতের ছেলেরা, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের স্বগোত্র এই লোকগুলিকে কত অসহায়, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ ব'লেই মনে হয়!

দূর-গ্রামে কাদের সব দামামা বাজছে এবং তাদের প্রতিধ্বনি ফিরে আসছে ওঙ্কারধামের গগনস্পর্শ শিখরে প্রতিহত হয়ে।

সকলে তখন একটি পাথরে গড়া প্রকাণ্ড চত্বরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।

অমলবাবু যেন আপন-মনেই বললেন, "রাজা ইন্দ্রবর্ম্মণের পুত্র যশোবর্ম্মণ ছিলেন একজন মহামানুষ! তাঁর দেহ ছিল দানবের মতন প্রকাণ্ড, জনতার অনেক উচ্চে জেগে থাকত তাঁর গর্ব্বিত মাথা! আর তাঁর বলবীর্য্যও ছিল অসাধারণ! তিনি নাকি নিরস্ত্র হয়েও খালি হাতে হস্তী ও ব্যাঘ্র সংহার ক'রেছিলেন!

তাঁর কীর্ত্তিও তেমনি অতুলনীয়! সিংহাসনে আরোহণ ক'রে মাত্র এগারো বৎসরের ভিতরেই তিনি এখানকার বিরাট নগর গ'ড়ে সম্পূর্ণ ক'রে ফেলেছিলেন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়!

আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এইখানেই মহারাজ যশোবর্ম্মণ যে বীরত্ব আর অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাও অমানুষিক বললেও চলে।

ওঙ্কারধামের বয়স তখন পুরো একবৎসরও হয় নি। ভারত রাহু সম্বৃদ্ধি নামে এক রাজা বিদ্রোহী হয়ে হঠাৎ একরাত্রে সসৈন্যে প্রাসাদ আক্রমণ করলেন।

প্রাসাদের বাহিরে যে-সব প্রহরী ছিল তারা সকলেই মারা পড়ল। বিদ্রোহীরা সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে ঢুকতে লাগল পঙ্গপালের মত দলে দলে। ভিতরের প্রহরীরা প্রাণভয়ে কে কোথায় স'রে পড়ল তার কোন সন্ধানই মিলল না।

বিদ্রোহীদের জয়ধ্বনিতে মহারাজ যশোবর্ম্মণের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উলঙ্গ তরবারি নিয়ে প্রাসাদে ঢোকবার সংকীর্ণ এক পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পাশে রইল দুইজন মাত্র সাহসী যোদ্ধা।

বিদ্রোহীরা দলে খুব পুরু ছিল বটে, কিন্তু একসঙ্গে দুই-তিনজনের বেশী লোকের পক্ষে সেই সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল না। মহারাজ যশোবর্ম্মণ বিপুলবপু নিয়ে সেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার জন্যে উন্মত্তের মত অসিচালনা করতে লাগলেন—বিদ্রোহীরা এগিয়ে আসছে আর গোড়াকাটা কলাগাছের মত মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ছে!

যশোবর্ম্মণের দুই সঙ্গী রাজার জন্যে প্রাণ দিলে, কিন্তু মহারাজের সতর্ক তরবারি এড়িয়ে তবু কেউ ভিতরে ঢুকতে পারলে না।

বিদ্রোহীদের নেতা ভারত তখন মহাবিক্রমে যশোবর্ম্মণকে আক্রমণ করলেন—দুই বীরের মুক্ত তরবারি বারবার পরস্পরের আলিঙ্গনে ধরা পড়তে লাগল।

যুদ্ধ যখন শেষ হ'ল তখন দেখা গেল, বিদ্রোহী ভারতের মৃতদেহের উপরে সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে, শূন্যে রক্তাক্ত তরবারিতে বিদ্যুৎ খেলিয়ে মহারাজ যশোবর্ম্মণ সিংহনাদ করছেন! বাকি বিদ্রোহীরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল!"

হাতী সিং ও আর-চারজন অনুচর প্রত্যেকেই এক-একটা পেট্রলের লণ্ঠন নিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছে, এবং সেই প্রচণ্ড আলোকের তীব্রতায় ভয় পেয়ে দূরে স'রে স'রে যাচ্ছে ছায়াময় অন্ধকার।

সেই আলোতে কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, বিরাট সব দানবের প্রস্তর-মূর্ত্তি বহুমুণ্ড সর্পদের ধ'রে পাশাপাশি ব'সে আছে! উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রত্যেক দানবের উচ্চতা আট ফিটের কম হবে না। কোন কোন দানব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে প্রকাণ্ড শিলাসর্পের গুরুভার আর বইতে না পেরে যেন শ্রান্ত হয়েই নীচের খালের ভিতরে গড়িয়ে প'ড়ে গেছে!

অমলবাবু বললেন, "আগে এম্নি পাঁচশো চল্লিশটি দানব এখানকার পাঁচটি সিংহদ্বারের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকত। এখানে কোথাও ক্ষুদ্রতা কি অপ্রাচুর্য্য নেই! যা দেখবে সবই বিরাট! ওঙ্কার-ধামের প্রধান মন্দির-চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ ফুট—অর্থাৎ কলকাতার গড়ের মাঠের মনুমেন্টের চেয়ে তা দু-গুণ বেশী উঁচু! আর তার অন্য চারটি শিখরও বড় কম যায় না, কারণ তাদের প্রত্যেকের উচ্চতা হচ্ছে দেড়শো ফুট ক'রে! আর চারিদিক ঘিরে ঐ যে খাল চ'লে গেছে, তাও চওড়ায় দুশো ত্রিশ ফুট!"

সর্পমূর্ত্তি চোখে পড়ে চতুর্দ্দিকেই। এর দুই কারণ থাকতে পারে। প্রথম, সাপ হচ্ছে শিবের প্রিয় জীব এবং ওঙ্কারধাম হচ্ছে আসলে শিবেরই লীলানিকেতন। দ্বিতীয়, ওঙ্কারধামের প্রথম রাজা কম্বু বিবাহ ক'রেছিলেন নাগরাজের কন্যাকেই। এবং এ স্থানটা হচ্ছে নাগরাজ্যেরই অংশবিশেষ।

যেখানেই ভারত-শিল্পীর বাটালি প'ড়েছে সেখানেই জন্মলাভ ক'রেছে অসংখ্য হাতীর মূর্ত্তি। এখানেও তাই। সর্ব্বত্রই এত হাতী যে দেখলে অবাক হ'তে হয় এবং অধিকাংশ মূর্ত্তিই জীবন্ত হাতীর মতই মস্তবড়! এমন বৃহৎ সব মূর্ত্তি এত অজস্র পরিমাণে গড়তে যে কত যুগের দরকার হ'য়েছিল তা' ভাবলেও অবাক্ হ'তে হয়! কিন্তু ভারতের শিল্পী হয়তো পরিশ্রম ও কালের হিসাব রাখতে জানতনা—তাদের ধৈর্য্যের পরমায়ু ছিল অক্ষয়! যেন তারা জন্মজন্মান্তর ধ'রে মূর্ত্তি বা মন্দির গড়তেও নারাজ ছিল না!

এবং কঠিন পাথর ছিল তাদের হাতে যেন নরম ভিজে বেলে-মাটির মত! তাদের হাতের মায়া-ছোঁয়া পেলে পাথর যেন বেঁকে-নুয়ে-দুমড়ে অতি-সহজেই শিল্পীর ইচ্ছামত যে-কোন আকার ধারণ করতে বাধ্য হ'ত! এ-বিষয়ে ভারত-শিল্পের কাছে পৃথিবীর আর সব দেশের শিল্পই ম্লান হ'য়ে যাবে!

দেয়ালের গায়ে গায়ে পাথরে ক্ষোদা ছবিই বা কত! সেই ছবির পর ছবির সারি মাপ্‌লে নিশ্চয়ই এক মাইলের কম হ'বে না! কোথাও মস্ত হস্তীরা ধেয়ে চ'লেছে, কোথাও দেবতা, দানব, মানবের জনতা, কোথাও রামায়ণের দৃশ্যের পর দৃশ্য, কোথাও গভীর অরণ্যে বন্য জন্তুরা বিচরণ ক'রছে, কোথাও সাগরে সামুদ্রিক জীবরা সাঁতার কাটছে, কোথাও রন্ধনশালায় রান্না হচ্ছে, বাজারে নানা জিনিষের বিকিকিনি চল্‌ছে, বাজীকররা হরেক-রকম খেল্‌ দেখাচ্ছে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘোড়ায় চড়ে পোলোর মতন কি-এক খেলায় নিযুক্ত হ'য়ে আছেন! রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, দেবদাসী, রাজকুমারী, সুয়োরাণী-দুয়োরাণী, সখীর দল, বাঁদী ও তীর্থযাত্রী—কিছুরই অভাব নেই! দ্বন্দ্বযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, রাজসভা, কুচ্‌কাওয়াজ, শোভাযাত্রা, উৎসব, পূজা, নাচ, ঘর-সংসার,—শিল্পীর বাটালি কোন-কিছুরই প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেনি! মহাকালের অদৃশ্য হস্ত কত শতাব্দীর রহস্যময় যবনিকা হঠাৎ এখানে সরিয়ে দিয়েছে, তাই হাজার বছর পরেও এখানে এসে বিংশ শতাব্দী বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে সেকালের সমস্ত সুখ-দুঃখ-মাখা বিচিত্র জীবনযাত্রার চিত্র! প্রথম দর্শনে সন্দেহ হয়, এই মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেও এরা সবাই জীবন্ত গতির লীলায় চঞ্চল হ'য়ে অতীত নাট্যলীলার পুনরভিনয় করছিল, বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র মানুষদের পদশব্দ পেয়ে এখন স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে আচম্বিতে!

আসলে কিন্তু সমস্তই অতীত! যোদ্ধাদের ধনুকগুলো নুয়ে আছে, কিন্তু তীর আর ছুটবে না! মায়ের কোলে শুয়ে পাথুরে শিশুরা স্তন্যপান করছে, কিন্তু তারা আর বালক বা যুবক হ'তে পারবে না! শিলাহস্তীর দল তাদের যে-সব পা শূন্যে তুলেছে, সেগুলো আর কখনো মাটিতে পড়্‌বে না! সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে, সেই বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে তাদের আর-কোনদিন দেখা হবে না, রাজসভার জনতার মধ্যে সিংহাসনের উপরে ছত্রের তলায় মহারাজ ব'সেছেন বিচারে, কিন্তু তাঁর মুখ আর কথা কইবে না! এরা এখন সবাই আড়ষ্ট, সবাই চির-বোবা! আরো কত যুগ আস্‌বে, আবার চ'লে যাবে, কিন্তু সেই মৃত জাতির, লুপ্ত সভ্যতার এই কালজয়ী স্মৃতি তখনো এম্‌নি স্তম্ভিত ও আড়ষ্ট হ'য়েই এখানে বিরাজ করবে!

সুন্দরবাবু সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌লেন, "হুম্‌! এ যে পাথরের সিনেমা! কত গল্পের ছবিই এখানে রয়েছে!"

অমলবাবু বললেন,—"সত্যিই তাই! সেকালের অধিকাংশ লোকই তো পড়্‌তে জান্‌ত না, প্রাচীন শিল্পীরা তাই মন্দিরের গায়ে সমস্ত বিখ্যাত কাব্যের আর ইতিহাসের ছবি ক্ষুদে রাখ্‌তেন। নিরক্ষর লোকরাও সেগুলো দেখে শিক্ষালাভ করত।"

পদ্মরাগ বুদ্ধ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মাণিকও এই শিলাময় নূতন জগতে এসে বিস্মিত হ'য়েছিল, কারণ ভারত-শিল্পীর এই নূতন স্বদেশে এসে বিস্মিত না হয়ে থাক্তে পারে কে? কিন্তু সে-বিস্ময় তাকে বেশীক্ষণ অভিভূত ক'রে রাখ্তে পারেনি। তার মাথায় ঘুর্‌ছে কেবল জয়ন্তের কথা এবং তার মন ক্রমাগত হা-হা করে উঠ্‌ছে!

অমলবাবুর কোন উক্তিই ভালো ক'রে তার কাণে ঢুকছিল না, শূন্য-দৃষ্টিতে চারিদিকের শিল্পকাজের দিকে তাকাতে তাকাতে সে হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল,—লণ্ঠনের আলোক-রেখাগুলো যে তার পিছনে অনেক দূরে প'ড়ে রইল, সে-খেয়ালও তার রইল না!

এক-জায়গায় মোড় ফিরে সে যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কেবল চাঁদের আধ-ফোটা আলোতে চারিদিক থম্‌থম্ কর্‌ছে! অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মস্ত মস্ত পাথরের হাতীর পর হাতী সা'র গেঁথে কোথায় কতদূরে নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই!

হঠাৎ তার হুঁস্ হ'ল, এর পরে কোন্‌দিকে যেতে হবে তা সে জানে না এবং ভুল পথে গেলে সঙ্গীদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। মাণিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে প'ড়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা-ছড়ানো আকাশ তখন যেন তন্দ্রাময়। খানিক তফাতে অরণ্যের কালিমাময় বুকের তলা থেকে ভেসে আসছে যেন রাত্রি-দানবীর ফিস্-ফিস্ কাণাকাণি! জীবন্ত জগতের আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না!

চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতা আচম্বিতে আর যেন চুপ ক'রে থাকতে না পেরে পাগল হয়ে গর্জ্জন ক'রে উঠল—গুড়ুম্, গুড়ুম্, গুড়ুম্!

চম্‌কে উঠে মাণিক ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুতের মত!

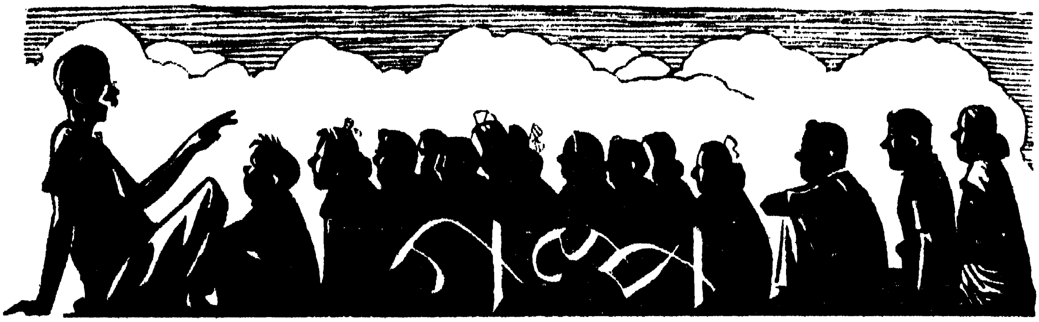
পিছনে অনেক লোকের গোল্‌মাল! আবার দু-বার বন্দুকের শব্দ, তারপরেই দূর থেকে সুন্দরবাবুর চীৎকার শোনা গেল—"মাণিক! মাণিক!"

মাণিক ফিরে দৌড়োবার উপক্রম করছে, হঠাৎ বৃহৎ একটা গুরুভার তার পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কোন-কিছু বোঝবার আগেই বিষম এক ধাক্কায় সে একেবারে মাটির উপরে উপুড় হয়ে মুখ থুব্‌ড়ে প'ড়ে গেল!

তারপরেই কে তার পিঠের উপরে চেপে বসল এবং দুখানা বড় বড় চ্যাটালো হাতে প্রাণপণে তার গলা চেপে ধরল!

সেই অজ্ঞাত শত্রুকে পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে মাণিক তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না! দশটা লোহার মতন কঠিন আঙুলের চাপে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।

ক্রমশঃ।



পাঞ্জাবী উপকথা

(ভবন পিটারার গল্প)

শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার সাত রাণি কিন্তু কারও একটি সন্তান নেই। রাজা কত যাগযজ্ঞ করলেন, কত সন্ন্যাসির কাছ থেকে কত ওষুধ নিয়ে খাওয়ালেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। তখন তিনি মনের দুঃখে ঠিক করলেন যে, তিনি আর সংসারে থাকবেন না, বনে চলে যাবেন। শুনে সাত রাণিরই খুব ভাবনা হলো, রাজাকে কত বোঝালেন, কত কান্নাকাটি করলেন, কিছুতেই রাজার মত বদলাতে পারলেন না। তখন তারা পরামর্শ করে রাজার কাছ থেকে ছ' মাসের সময় চাইলেন, যাতে তারা ছ' মাসের জন্য স্বামীর সেবা করতে পান রাজা তাতে সম্মত হলেন।

এই ছ' মাস রাণিরা মনপ্রাণ দিয়ে রাজার সেবা করতে লাগলেন আর প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে চুপি চুপি পরামর্শ করতে লাগলেন যাতে রাজা বনে না যান। মন্ত্রী বড় বড় জ্যোতিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের টাকা দিয়ে এবং বুঝিয়ে রাজার সামনে যা বলতে হবে সব শিখিয়ে দিলেন। ছ' মাস পূর্ণ হতে মাত্র কয়েকদিন আছে এমন সময় বড় রাণি রাজাকে জানালেন যে ছোট রাণির সন্তান হবে। শুনে রাজার আনন্দ আর ধরে না, তখনই সহরে আনন্দোৎসবের ধুম পড়ে গেল। রাজা বনে যাবেন না শুনে প্রজাদের আনন্দ আর ধরে না। রাজা দান ধ্যান করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে দশ মাস হয়ে গেল, এগার মাসও প্রায় পূর্ণ হয়ে আসে কিন্তু কোন খবর রাজার কাছে আসেনা। এদিকে রাণিরা বড় ভাবনায় পড়লেন। তখন রাজা যাতে বনে না যান

তাই মিথ্যেটা করে রাজাকে বলে রেখেছিলেন। এখন সদ্যোজাত কোন শিশু পাননা যাকে এনে রাজাকে দেখান যায়। প্রধান মন্ত্রীর দিনরাত বিরাম নাই, খুঁজছেন। একদিন একটি শিশু পাওয়া গেল তাকে ঘরে এনে চারিদিকে প্রচার করে দেওয়া হোল যে রাণির একটি ছেলে হয়েছে। শুনে রাজার কি আনন্দ, বড় বড় পণ্ডিতদের ডাকলেন ছেলের ভাগ্য গণনার জন্য। মন্ত্রী তাদের আগেই শিখিয়ে রেখেছিলেন, তারা অনেক পুঁথি দেখে শুনে বললেন যে খুব ভাগ্যবান ছেলে হয়েছে কিন্তু একটা বড় ফাঁড়া আছে, বার বছর আপনি সন্তানের মুখ দেখবেন না। বার বছর পরে তার বিবাহ দিয়ে ছেলে বৌয়ের একসঙ্গে মুখ দেখতে পারবেন। শুনে রাজার মন একটু খারাপ হলেও ছেলে হয়েছে এবং বার বছর পরে যে তাকে দেখতে পাবেন এই আশাই তাহাকে শান্তি ও আনন্দ দিল।

রাজার ছেলে দেখা বারণ কাজেই রাণিরা তাঁহাকে পাশের ঘর থেকে শিশুর কান্না শুনিয়ে দিলেন, কান্না শুনেই রাজা খুসি। কয়েকদিন রাজাকে এমনি কান্না শুনিয়ে যার শিশু তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। তারপর মাঝে মাঝে একটি করে ছোট শিশু এনে রাজাকে তার কান্না শুনিয়ে দেওয়া হ'ত। এইরূপ একবছর কেটে গেল, তখন ছেলে হাঁটতে শিখেছে এই বলে রাণিরা এক বিড়ালের পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তাকে ঘরের ভিতর ছুটাছুটি করিয়ে রাজাকে পাশের ঘর থেকে শোনাত। রাজা ভাবতেন যে ছেলে মল পরে খেলা করছে। এই রকম রাণিরা নানা উপায় করে রাজাকে প্রায় পাশের ঘর থেকে শুনিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে ছেলে ক্রমশঃ বড় হচ্ছে।

তারপর, এগার বছর পূর্ণ হতেই রাজা চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন ছেলের জন্য কনে দেখতে। এক রাজার খুব সুন্দর সুলক্ষণা কন্যা দেখে বিয়ে ঠিক করলেন। দেখতে দেখতে যাত্রার দিন এসে পড়ল। সহরে আনন্দ উৎসবের ধুম পড়ে গেল। রাজার আনন্দ দেখে কে? আর কয়দিন পরে পুত্রের মুখ দেখতে পাবেন। এদিকে রাণিরা ভয়ে অস্থির, এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছেন এখন কি উপায় হবে। ভেবেচিন্তে তাঁরা ঠিক করলেন যে বিয়ে না হলে রাজা মুখ দেখবেন না, টেরও পাবেন না, মরতে ত হবেই—যে কটা দিন বাঁচতে পারা যায় তাই করি। এই না ভেবে তাঁরা এক সুন্দর ক্ষীরের পুতুল করলেন ও তাকে গহনা কাপড় পরিয়ে পালকিতে তুলে দিলেন।

রাজা যাত্রা করলেন। অনেক দূরের পথ, সন্ধ্যার সময় এক নদীর ধারে তাঁরা আস্তানা করলেন। সকলে যে যার খাওয়া দাওয়া করতে ব্যস্ত; অন্ধকার হয়েছে, পালকি একটা

গাছের তলায় রেখে চাকররাও সকলে নিজের নিজের কাজ করছে। এমন সময় এক সাপ ক্ষীরের গন্ধ পেয়ে পালকির ভিতরে গিয়ে পুতুলটি খেয়ে ফেল্‌লে। সব খাবার পর তার কিন্তু মনে বড় কষ্ট হল, ভাবলে আহা! রাজার ছেলে বিয়ে করতে যাচ্ছিল, আমি খেয়ে ফেললাম— রাজা যখন দেখবেন তাঁর ছেলে নেই তাঁর বড় কষ্ট হবে। তার বড় অনুতাপ হতে লাগল। তখন তার মনে হল একটা কাজ করি, আমিই কেন রাজার ছেলে হয়ে বিয়ে করতে যাই না? কিছুদিনের জন্য মানুষ হয়ে দেখি কেমন লাগে—তারপর আবার ফিরে এলেই হবে। এই না ভেবে সে নদীর ভিতর গেল। সে ছিল সাপদের রাজা। ঐ নদীর ভিতরে তার মহল ছিল মা ছিল আর তার সাত রাণি ছিল। সে মার কাছে গিয়ে বললে যে সে বার বছরের জন্য বিদেশ যাবে এবং সব ঘটনা মাকে বল্‌ল। সে বার বছরের জন্য মানুষ হয়ে পৃথিবীতে থাকবে তারপর আবার ফিরে আসবে। মা অনুমতি দিলেন, তখন সে রাজ্যের সব ব্যবস্থা করে রাণিদের কাছে বার বছরের জন্য বিদায় নিয়ে এসে পালকির ভিতর গিয়ে বার বছরের ছেলে হয়ে গহনা কাপড় সব পরে বসে রইল।

দুদিন পরে কনে'দের দেশে গিয়ে সকলে পৌঁছলেন। ওদেশের রাজা সকলকে অভ্যর্থনা করলেন। এদিকে মন্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেছে, যে পালকি খুললেই ত সব জানতে পারা যাবে আর সেই সঙ্গে তাহার প্রাণও যাবে। মৃত্যুর জন্য সে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে এমন সময় দেখে যে জীবন্ত বার বছরের সুন্দর একটি ছেলে পালকি থেকে বেরুল তখন তার আনন্দ দেখে কে। রাজার ছেলের রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। রাজা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখে অপার আনন্দ পেলেন।

বিয়ে দিয়ে রাজা দেশে ফিরলেন। ছেলে বৌ নিয়ে সিংহদরজায় পৌঁছলেন এদিকে সাত রাণিরা ভাবছে যে রাজা এসেই তাদের তো মেরে ফেলবেন তাই এক ছোট্ট কুঠারির ভিতর লুকিয়ে আছে। পালকি দরজায় এলো কেহ বরণ করবার নেই; ঝি চাকর ছুটাছুটি করছে রাণিদের পায় না শেষে এক ঝি তাদের ছোট ঘরে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বরণ করবার জন্য বল্‌ল রাণিরা কিছু বুঝতে পারে না শেষে যখন বুঝলে যে রাজা তাঁদের মারবার জন্য খুঁজছেন না, ছেলে মেয়ে বরণ করবার জন্য, তখন তারা বড় আশ্চর্য্য হ'লো, এবং মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে মনে করে আহ্লাদে তাড়াতাড়ি জোগাড় করে বরণ করতে গিয়ে সুন্দর ছেলে ও সুন্দর বৌ দেখে বড় আনন্দিত হলো।

রাজা ও রাণিরা ছেলে বৌ নিয়ে কিছু দিন ঘর করে ছেলেকে রাজত্ব দিয়ে বনে গেলেন।

এদিকে সাপের রাজা মানবী স্ত্রী পেয়ে নিজের দেশের কথা রাণিদের কথা সব ভুলে গেলেন। বার বছর পর যে তিনি ফিরে যাবেন, মাকে বলে এসেছেন সে কথা আর মনে আসত না। পরম সুখে রাজত্ব করছেন। ওদিকে সাত সাপিনী রাণিরা বার বছর পূর্ণ হয়ে গেল, তের বছরও পূর্ণ হয় হয় অথচ রাজা আসেন না দেখে সাশুড়ির কাছে গিয়ে বল্‌ল যে তা'রা পৃথিবীতে যাবে তাদের স্বামীকে খুঁজতে। তিনিও ছেলের জন্য বড় চিন্তিত ছিলেন, অনুমতি দিলেন। তখন সাত সাপিনী নদী থেকে বেরিয়ে মানুষের রূপ ধরে রাজাকে দেশে দেশে খুঁজতে লাগ্‌ল। অনেক কষ্টে যে দেশে রাজা ছিলেন সে দেশে এসে দেখে যে রাজা মানবী স্ত্রী নিয়ে খুব মনের সুখে আছেন। ওরা বুঝলো যে তার কাছে গিয়ে কোন লাভ নাই, উনি তাদের দেখলে বিরক্ত হবেন তাই তারা অন্য উপায় চিন্তা করতে লাগ্‌ল।


বৌ দেখে বড় আনন্দিত হোল

একদিন রাজা শিকারে গেছেন এমন সময় এক সাপিনী চুড়িওয়ালি সেজে রাণির মহলের নীচে চুড়ি বিক্রি করতে গেল। রাণি সুন্দর চুড়ি দেখে তাকে ডেকে পাঠালেন।

চুড়ি পরাতে পরাতে সে রাণির সঙ্গে নানা রকম আলাপ করতে লাগ্‌ল। সাপিনী বল্‌লে তোমার স্বামী তোমায় একটুও ভালবাসেন না। যদি তোমার সঙ্গে এক থালায় ভাত খান তখন বুঝবে যে সত্যি তিনি তোমায় ভালবাসেন।

সাপিনী ভাবলে যে রাজা মানুষ হ'লে কি হয় মুখের বিষ ত যায় নাই একপাতে খেলেই বিষ খেয়ে রাণি মারা যাবে। না মর্‌লে যে রাজা ফিরবেন না তাহা সে বুঝেছিল।

সন্ধ্যার সময় রাজা এসে দেখেন যে রাণি মুখ ভার করে বসে আছেন কথা বলেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করে রাজা মান ভাঙালেন তখন রাণি কথা কইলেন, বল্‌লেন যে এক পাতে খেলে কথা বলবেন, নইলে নয়। রাজা অনেক বোঝালেন জিজ্ঞাসা করলেন কে

তোমায় বলেছে যে একপাতে না খেলে ভালবাসে না। তখন রাণি চুড়িওয়ালির কথা বল্‌লেন, শুনে রাজা বুঝলেন যে ব্যাপার কি। তিনি দেশে ফিরে যান নাই সাপিনীরা যে তাঁকে খুঁজতে আসবে তাহা তিনি আগেই বুঝেছিলেন। বড় চিন্তিত হলেন কারণ তাঁ'র সাত সাপিনীরা যে অত্যন্ত খল স্বভাব এবং রাণিকে মারবার চেষ্টা করবে তাহা চিন্তা করে মনে মনে বড় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। প্রকাশ্যে রাণিকে বল্‌লেন এই কথা,বেশতো আজই তোমার সঙ্গে এক পাতে খাব। শুনে রাণি বড় খুসি।

খেতে বসে রাজা সাবধানে এক পাশ থেকে একটু আধটু খেলেন খুব সাবধানে যাতে ওঁ'র মুখেরটা অন্য ভাতের সঙ্গে না মিশে যায়।

রাজা মহলের সকলকে কড়া হুকুম দিলেন কারুকেও যাতে মহলে না ঢুকতে দেওয়া হয়।

কয়েকদিন পর আবার রাজা শিকারে গেলেন। এক সাপিনী দইওয়ালী সেজে দই বিক্রি করতে লাগ্‌ল। রাণি ডেকে পাঠালেন আবার, সে রাণিকে নানা রকম কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করল যে রাজার জাত কি জান! রাণি বল্‌লে রাজার আবার জাত কি—ক্ষত্রিয় জাত। সে বল্‌লে না—রাজা তোমায় একটুও ভালবাসেন না তাই জাত লুকিয়ে আছেন—তুমি রাজা এলে জাত জিজ্ঞাসা কর।

আবার রাণি রাগ করে শুয়ে রইলেন রাজা এসে অনেক সাধনার পরে শুনলেন যে তাঁর জাত কি বল্‌তে হবে। শুনে প্রথমে রাজা চমকে উঠলেন তারপর বল্‌লেন "তুমি কি আমার জাত জাননা, রাজার ছেলের যা জাত হয়ে থাকে তাই আমার জাত একথা আর কখনও জিজ্ঞাসা কর'না তাহলে অনেক দুঃখ পাবে।"

রাণি কিছুতেই বোঝেন না বলেন "জাত বল নইলে আমি খাব না—" রাজা অনেক বোঝালেন যে এই কথা শুনতে চেও না তাহলে তুমিও কষ্ট পাবে আমিও কষ্ট পাব। কিন্তু রাণির এক কথা। তখন রাজা বল্‌লেন যে আচ্ছা আজ ওঠ, পরশু সকালে জাত বল্‌ব।

[আগামী মাসে সমাপ্য]

ছুটির ঘণ্টা

নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা

প্যালেনষ্টাইনে রাজনৈতিক গণ্ডগোল অবসান না হওয়ায় এসিয়াটিক অলিম্পিক স্পোর্টস্ বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং অলিম্পিক কমিটীর পরিচালিত নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতি-যোগিতা কলিকাতায় কর্ণওয়ালিস পুকুরে অনুষ্ঠিত হলেও ততখানি উৎসাহ ছিল না। জলের



দুর্গাদাস ও অর্জ্জুন সিং

সঙ্গে বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের এক গভীর সম্বন্ধ আছে। সন্তরণে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের কীর্ত্তিকলাপ দেশবিখ্যাত! পাঞ্জাব, বোম্বাই, ইউ, পি প্রভৃতি প্রদেশের নামজাদা সাঁতারুরা

প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু সব বিভাগেই বাংলার সাঁতারুদের কাছে অতি শোচনীয় ভাবে হার স্বীকার করে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। অলিম্পিক স্পোর্টসে যেমন পাঞ্জাব ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন সাঁতারে তেমনি বাংলার প্রতিযোগীরা আশ্চর্য্যকর ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয় দিয়ে এক রেকর্ড করলেন! এবার প্রতিযোগিতায় ৪৩০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সন্তরণে দুর্গাদাস মাত্র ৫ মিঃ ৩৮৪/৫ সেঃএ জয়ী হয়ে এক নূতন রেকর্ড করলেন! ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক প্রতিযোগিতায় প্রফুল্ল মল্লিক ৩ মিঃ ৯ সেঃএ জয়ী হয়ে আরেকটি রেকর্ড করলেন। ওয়াটার পোলো খেলায় বাংলা দল অতি সহজে রেষ্ট দলকে ৩-২ গোলে হারান।

নিম্নে কয়েকটি ফলাফল :—

১০০মিটার ফ্রি ষ্টাইল :—(১) দিলীপ মিত্র। সময়—১ মিঃ ৬১/২ সেঃ

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল (মহিলা) (১) কুমারী লীলা চ্যাটার্জ্জী।

সময়—১ মিঃ ৩২ সেঃ।

রাজপুতনা দল :—

অষ্ট্রেলিয়া আশ্চর্য্যকর ক্রীড়া নৈপুণ্যের জোরে ইংলণ্ডে ভীষণ চাঞ্চল্য আনলেও রাজপুতনা দল সুন্দর খেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদিও রাজপুতনা দল ইংলণ্ডের কোন নামজাদা দলকে সাক্ষাৎ করেনি কিন্তু ক্রীড়া মাঠে বিপক্ষ দলকে হারিয়ে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন! কে, বসুর দু'দুটো সেঞ্চুরী রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওভাল গ্রাউণ্ডে দুর্ব্বল গ্রাসহপারকে রাজপুতনা ১০ উইকেটে হারিয়ে দেন। বোলার গোলাপ দাস এক ওভারে ৪টি উইকেট নিয়ে সকলকে বিস্মিত করেন। অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে রাজপুতনা দলের ২২৬ রাণ সন্তোষজনক। অক্সফোর্ড ৬ উইকেটে ৩৬৪ রাণের পর ডিক্লেয়ার করেন। খেলাটি ড্র হয়। Julian cahn's এরটীমের বিরুদ্ধে রাজপুতনা একেবারে দাঁড়াতে পারেনি। ওয়ালসের মারাত্মক বোলিংএর কাছে একমাত্র কে বসু দ্বিতীয় ইনিংসে ১০১ রাণ করে শোচনীয় পরাজয়ের হাত হতে রাজপুতনাকে রক্ষা করেছিলেন। রাজপুতনা খেলায় ১০ উইকেটে পরাজিত হন। রাজপুতনা দলে একমাত্র কে, বসু ছাড়া অন্য কোন ব্যাটসম্যানের ক্রীড়া ফল তেমন সন্তোষজনক নয়। শুধু ভাল ব্যাটসম্যানের অভাবে রাজপুতনার রাণ সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য হচ্ছেনা।

অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল :—

ইংলণ্ডে আসবার পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের তালিকা দেখে ইংলণ্ডের কাগজের মারফতে এমন সব মন্তব্য প্রকাশ হয়েছিল যে একমাত্র ব্র্যাডম্যান এবং ওরিলী ছাড়া ইংলণ্ডের সমকক্ষ খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়াদলে কেউ নেই। অনেকে এঁদের কৃতকার্য্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল ইংলণ্ডের মাটীতে নামজাদা দলগুলিকে যাতুকরের মত অতি শোচনীয় ভাবে হারিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছেন! একা ব্র্যাডম্যানের ওপর অষ্ট্রেলিয়া টীম নির্ভর করে নেই! ফিঙ্গলটন, ব্যাড্কক, হ্যাসেট, ব্রাউন, ম্যাককাব প্রত্যেকেই শতাধিক রাণ করে ইংলণ্ডের বোলারদের অপদস্থ করে-ছেন। তারপর ওরিলী, ওয়েট, ম্যাককরমিক, চিপারফিণ্ডের ন্যায় তুর্দ্দান্ত বোলারদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন ব্যাটস্‌ম্যান খেলতে পারেনি! হ্যাসেট ইংলণ্ডে প্রথম খেলতে এসেই তিনটি গেমে তু'শতাধিক রাণ করে এক রেকর্ড করেছেন! প্রথম ম্যাচ উরসেষ্টারকে এক ইনিংসে হারিয়ে ইংলণ্ডের তুই ভার্সিটিকে সাক্ষাৎ করেছিলেন! অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া রাণ করলেন ৭ উইকেটে ৬৭৯। ফিঙ্গলটন, ম্যাককাব ও হ্যাসেট এক ইনিংসে শতাধিক রাণ করে অক্সফোর্ডকে দাঁড়াতে দেয়নি। অক্সফোর্ড অতি কষ্টে ১১৭ ও ৭৫ রাণ করেন। এক ইনিংস ও ৪৮৭ রাণে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া কৃতিত্ব দেখালেন।

তারপর লিষ্টার ভয়ে ভয়ে খেলতে নাবলেন। রাণ করলেন ১ম ইনিংসে ২১২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৫। তার উত্তর অষ্ট্রেলিয়া দিলেন ৪ উইকেটে কম করে ৪১০ রাণ তুলে। এবার সেঞ্চুরী করলেন ব্যাড্কক ১৯৮ ও হ্যাসেট। কেম্ব্রিজের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়—নইলে ওরিলী ও ওয়েটের বলে ১২০ রাণে সব আউট হয়ে গেলেন। অষ্ট্রেলিয়া রাণ করলেন ৫ উইকেটে ৭০৮। ফিঙ্গলটন ১১১, ব্রাডম্যান ১৩৭, ব্যাড্কক ১৮৬ ও হ্যাসেট ২২০ রাণ নটআউট। এক ইনিংসে চারটি সেঞ্চুরী রাণ ইংলণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে মাত্র ৭ বার হয়েছে। খেলায় অষ্ট্রেলিয়া অতি সহজে এক ইনিংস ও ৪২৫ রাণে জয়ী হলেন। এবার আর অক্সফোর্ডের আপশোষ করবার কিছুই রইল না। তারপর এলেন এম, সি, সি, দল খেলতে। এম, সি, সি দলে ইংলণ্ডের ষ্টেট খেলোয়াড় রবিন্‌স, স্মিথ, ফার্ন্স, ওয়াট প্রভৃতি খেলেছিলেন কিন্তু এঁদের সকল আক্রমণকে ব্যর্থ করে একা ব্র্যাডম্যান আশ্চর্য্যকর ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিলেন ২৭৮ রাণ করে। ১ম ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার ৫০২ রাণের পর এম, সি, সি অতি কষ্টে ২১৪ তুলেন। "ফলো অন্" করতে হল এবং এম, সি সি পরাজিত হলেন। তারপর নর্দ্দান্স টীমের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ৪০৬ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবার ব্রাউন নিখুঁত খেলে

১৯৪ রাণ করেন। কিন্তু প্যাট্রিজের বলে মাত্র ছ রাণের মাথায় ব্র্যাডম্যান হঠাৎ আউট হয়ে যান। নর্দ্দাম্সকে এক ইনিংস ও ৭৭ রাণে হারিয়ে "সারে" দলকে সাক্ষাৎ করেন। এবার ব্র্যাডম্যান ১৪৩ রাণ করেন। ১ম ইনিংসে রাণ তুলেন ৫২৮। কিন্তু খেলোয়াড়দের অসুস্থতার জন্যে "সারে" দলকে ফলো অন না করায় পরাজয়ের হাত হতে 'সারে' বেঁচে যায়। হ্যাম্প-সায়ারকে পরাজয়ের হাত হতে বাঁচালেন কিন্তু জল-দেবতা! হ্যাম্পসায়ার অতি কষ্টে রাণ তুলেছিলেন ১৫৭। ওরিলী ৬ উইকেট ৬৫ রাণ নেন। অষ্ট্রেলিয়া এঁদের সব আক্রমণ ব্যর্থ করে এক উইকেটে রাণ করলেন ৩২০। ব্র্যাডম্যান ১৪৫ নট আউট আর ফিঙ্গলটন ১২৩ নট-



মহামেডান স্পোর্টিং

আউট। মে মাসের মধ্যে মাত্র ৭ ইনিংস খেলে এক সহস্র রাণ করে ক্রিকেটে ব্রাডম্যান নতুন রেকর্ড করলেন। ১৯৩০ সালে ব্রাডম্যান ১১টি ইনিংসে সহস্র রাণ পূর্ণ করেছিলেন। সর্ব্ব-প্রথম ১৮৯৫ সালে ১০ ইনিংসে সহস্র রাণ করে বিখ্যাত জি, গ্রেস এক রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু এত অল্প ইনিংসে নামজাদা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলে সহস্র রাণ করতে একমাত্র ব্যাডম্যানই সক্ষম হলেন। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র মিডিলসেক্স সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী দিয়েছিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম অতি অল্প রাণে অষ্ট্রেলিয়া সব আউট হয়ে যান। ব্রাডম্যান, ৫, ফিঙ্গলটন, ২ ব্যাড্কক ১০ খেলার ছিল বিশেষত্ব। ১৩২ রাণে অষ্ট্রেলিয়াকে ১ম ইনিংসে

নাবিয়ে মিডলসেক্সর উল্লাস বেশীক্ষণ স্থায়ী ছিলনা, বিষ্টি হতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলাটি অমিমাংসিত ভাবে শেষ হলো।

প্রতি মাসে শতাধিক রাণ তুলে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের তবু চাঞ্চল্য আনেন নি, নামজাদা খেলোয়াড়দের অপদস্থ এবং টেষ্ট কমিটির কর্ত্তৃপক্ষদের ভাবিয়ে তুলেছেন। দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রেলিয়াকে "টেষ্ট" ম্যাচে হারাতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বোলারদের হিমসিম খেয়ে যেতে হবে এ কে না জানে। হ্যামণ্ড ইংলণ্ডের ক্যাপ্তেন হয়েছেন। —বি, সি



পি. দাস (ব্যাক) বর্ম্মা টীমের আক্রমণ ব্যর্থ করিতেছেন

ফুটবল ঃ—

লীগ খেলায় এখনও প্রথম অর্দ্ধাংশ শেষ হয় নাই। Md. Sportingএর আর আগেকার 'ফরম্' নেই, কাজেই তাঁরা আর সুদক্ষতার পরিচয় দিতে পারছেন্ না। মুরগেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণএর আগমনে 'ইষ্টবেঙ্গল'খুবই ভাল খেলছেন্। সেদিন যে Md. Sportingএর সঙ্গে এঁদের খেলা হয়েছিল তাতে 'ইষ্টবেঙ্গল' যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেখিয়ে দুই গোলে জয়ী হ'ন। মোহনবাগান এখনও একবারও পরাজিত হ'ন নাই। কিন্তু কিছুই বলা যায় না। অনেকেই আশা করছেন যে মোহনবাগান হয়ত লীগ বিজয়ী হ'তে পারেন। কিন্তু এখনও

সঠিক কিছুই বলা যায় না। এইত গেল এখানকার স্থানীয় টিম্‌এর কথা। এরপরে তোমাদের একটা খুব মজার খবর দে'ব। তোমরা বোধ হয় শুনে থাক্‌বে যে আই, এফ, এর উদ্যোগে এবছর ব্রহ্মদেশ থেকে খেলওয়াড়রা কলিকাতায় এসেছিলেন। ব্রহ্মদেশের ফুটবল খেলার অনেক গল্প তোমরা নিশ্চই শুনে থাকবে। আমাদের দেশ থেকে অনেক ভাল ভাল টীম ওদেশে গিয়ে পরাজিত হ'য়েছে। এ ছাড়া বিলেতের Corinthians দল ব্রহ্মদেশে গিয়ে এদের কাছে হার মেনেছিলেন। কলিকাতায় তাঁরা এবার যখন সদলবলে উপস্থিত হলেন তখন আমাদের আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল পাছে বাঙ্গালী নিজের মাঠে আবার হেরে যায়। সে ভয় কিন্তু শিগ্রই কেটে গেল। প্রথম খেলায় আই. এফ্‌, এ ব্রহ্মদেশকে এক গোলে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় খেলায় মোহনবাগান—সি, এফ্‌, সি মিলিত দল (৩-২) গোলে হেরে যান। সে দিন বৃষ্টিতে মাঠ একবারে পুকুর হয়েছিল। শেষ খেলায় ভারতীয় দল ড্র করে (২-২)। তিন দিনই খুব জোর খেলা হ'য়েছিল। ব্রহ্মদেশীয়রা জলভরা মাঠে যে রকম খেলা দেখিয়াছেন তেমন সুন্দর খেলা কয়েক বৎসর কলিকাতায় দেখা যায় নাই। এঁদের ফরওয়ার্ডে ছিলেন প্রসিদ্ধ খেলোওয়াড় বা বা—যাঁর সঙ্গে চৈনিক খেলোওয়াড় লী ওয়াই টংএর তুলনা করা হয়েছে। আমাদের তরফে বিমল মুখার্জ্জী ও নুর মহম্মদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মদেশীয়দের খেলা খুব বিজ্ঞান সম্মত; এঁরা করিন্থিয়ানদের মত গায়ের জোর খাটান না। খেলার কায়দায় এঁরা ওস্তাদ। তবে বেঁটে বলে এঁরা মাথা দিয়ে বল নিতে পারেন না—আর এঁদের 'স্পিড' ও কম, আমাদের তরফে পি, দাসগুপ্ত, রাখাল মজুমদার, বেণীপ্রসাদ, রহিম, টেলার এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালের অলিম্পিক্‌ প্রতিযোগিতায় যদি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একটা মিলিত দল পাঠায় তাহ'লে আমরা আশা করতে পারি যে খুব খারাপ হ'বে না। তোমাদের কি মনে হয়?

শ্রীসুশীল কুমার বসু

প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা

(৯ই জুন পর্য্যন্ত)

		জ	ড্র	প	পক্ষে	বিঃ	পয়েন্ট
মহমেডান স্পোর্টিং	১২	৬	৩	৩	২০	১৩	১৫
পুলিস	১০	৫	২	৩	১৮	১৩	১২
ইষ্টবেঙ্গল	১১	৪	৪	৩	১১	৯	১২
কাষ্টমস	১২	৩	৬	৩	১২	১২	১২
মোহনবাগান	১০	২	৭	১	৯	৭	১১
কালীঘাট	১১	৩	৫	৩	৯	৮	১১

	খে	জ	ড্র	প	পক্ষে	বিঃ	পয়েন্ট
ক্যামেরোনিয়ান্স	১২	৩	৫	৪	১০	১০	১১
ই বি আর	১১	৪	৩	৪	৯	·১১	১১
কে ও এস বি	৯	৪	২	৩	১১	৯	১০
এরিয়ান্স	১১	৩	৩	৫	৯	১৭	৯
ক্যালকাটা	১১	৩	৩	৫	৬	১২	৯
	১২	৩	৩	৬	১৪	১৭	৯

——:০:



শ্রীসতীকান্ত গুহ

লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চিত্রিত

ফিরে এলাম আমি, ফিরে এলাম পাঁচশো বছর আগের স্বপ্ন থেকে। চোখ মেলতে মহর্ষি হেসে বললেন, 'এসো রঙ্গিলা, এসো তুমি, অমরলতার দাসী।'

মহর্ষির পিছু পিছু সেই সকাল-রোদের সোণামাখা পাথরকোটা ছেড়ে বাইরে এলাম। অনেকদূরের নীল-আকাশ একখানা নীলপাথরের মত যেন আর খানিকদূরের নীল-সাগর সেই পাথরের গা বেয়ে একটা নীলঅরণ্যের নীলঅজগরের মত এঁকে বেঁকে ফোঁস ফোঁস করতে করতে চলেছে।

সেদিক পানে তাকিয়ে মহর্ষি বললেন, 'পাঁচশো বছর কেটে গেছে রঙ্গিলা, কিন্তু অমরলতার তপস্যা তো ফুরোয়নি। ঐ যে সমুদ্র দেখচ, ঐ যে-সমুদ্রকে দেখে' মনে হচ্ছে বুঝি স্বপ্ন, বুঝি রহস্য, ঐ সমুদ্রের দূরে দূরে কতদূরে এখনো চলেছে অভিযান। জাহাজে পাল তুলে চলেছে সন্ধানীরা, সবুজদ্বীপের রূপসীলতাটিকে খুঁজে খুঁজে।'

মহর্ষি একটা দিকে পাহাড়-গায়ের সরু একটা পথ ধরে' চলে' চলে' একটা মস্ত ফাটলের সামনে এসে আমায় ইসারা করলেন। সেই ফাঁটল দিয়ে মহর্ষির একটি হাত ধরে' চলে' এলাম আমি কোন্ ভৌতিক রাজ্যে! মাটির নীচেয় কোথা থেকে আসে রোদের আলো, বাতাসের নিঃশ্বাস? কোথা থেকে ভেসে আসে ময়নাপাখীর 'ময়না-কই' গান? কিন্তু না, এতো পাতাল নয়, পাহাড়ঘেরা এক ঢালুদেশের ঢেউখেলানো ছবির বুকে চলে এসেচি আমরা। পাহাড়

পেরিয়ে আসচে বাতাস, পাহাড়ের চুড়োয় নেচে নেচে পিছ্‌লে এসে পড়ছে রাশি রাশি আলো, অফুরন্ত আকাশের অফুরন্ত আলো।

আমি বললাম, 'মহর্ষি, এই কি অমরলতার দেশ, সন্ধানীদের দেশ? মহর্ষি এখানে তুমিই কি বসে' তপস্যা করচ? এখান থেকেই কি জাহাজে পাল তুলে' সন্ধানীরা বেরিয়ে পড়ে?'

মহর্ষি গম্ভীর গলায় বললেন, হ্যাঁ। তারপর একদিন 'পাঁচশোবছর আগের তপস্যা পেলেন ঋষি পিঙ্গল। স্বপ্নে দেখলেন, সবুজদ্বীপের সবুজলতা। ভুল করে' মানুষ তখনই মহর্ষি খেতাব দিলে তাঁকে। কিন্তু হায়, সবুজদ্বীপের সবুজলতা আড়ালেই থেকে গেল। সন্ধানীরা কয়েকটা যুগ পৃথিবী তোলপাড় করে' ফিরলেন, হায়রাণ হলেন, মহর্ষি পিঙ্গল বুড়ো হলেন। একদিন তিনি ভাবলেন, হায়! অমরলতার তপস্যা মিছেই হল।'

হাসি-কান্নায় মিশিয়ে আমি বললাম, 'তখন বুঝি মহর্ষি একদিন স্বপ্নে নিশানা পেলেন। দশবছরের ভিখিরী মেয়ের কপালে অমরলতার চিহ্ন আঁকা দেখলেন। তাই তাকে সাতসমুদ্র তের নদীর পার থেকে মরুভূমির ওপার থেকে তার আপন দেশ থেকে নিয়ে এলেন?'

মহর্ষির দুটি চক্ষু জ্বলে' উঠলো। বললেন, 'রঙ্গিলা, সেই স্বপ্ন মিছে হবার নয়। একদিন জাহাজে চেপে নীলসমুদ্রের আলোয় অন্ধকারে ঝড়ে তুফানে যেতে হবে তোমাকে। একদিন অমরলতার সবুজফুল তুলে নিয়ে আসবে তুমি। অমরলতা তুলে এনে পুঁতে দেবে মানুষের বাগানে। কিন্তু, কিন্তু সে দিন তো এখনো আসেনি। এখনো, এখনো তার আসার সময় হয়নি।'

আমি বললাম, 'কে আসেনি? কার আসার সময় হয়নি মহর্ষি? স্বপ্নে তুমি কি শুধু আমাকেই দেখোনি?'

মহর্ষি বললেন, 'স্বপ্নে দেখেচি দু'জনকে—একজন তুমি, আর একজন, সে যেন ছায়ার মত। তার হাতে যেন খোলা তলোয়ার। সাতসমুদ্রে ছায়া ফেলে সে যেন আছে দাঁড়িয়ে, মানুষ নয় যেন, যেন দৈত্য। কিন্তু, কিন্তু তার তলোয়ারে অমরলতার পথ যেন কাটা হয়ে' যাবে। সেই পথ ধরে' তুমি একদিন সবুজদ্বীপে গিয়ে তুলবে আশ্চর্য্য ফুল।'

হঠাৎ রূপকথার রাজ্যে যেন চলে' গেলাম আমি। ভাবলাম, কে জানে! হয়তো পাতালপুরীর দৈত্যের নাম ধরে' একদিন আমি তার শিয়রের ধারে গিয়ে ডাকবো। ঘুম ভেঙে আমার পিছু পিছু এসে অমরলতার বাগানটি দেখিয়ে দেবে সে।

মহর্ষি যেন স্বপ্ন দেখে' দেখে বললেন, 'কিন্তু তাকে আসতে হবে। না এসে পারেনা সে। একদিন তার জাহাজ এসে হানা দেবে আরব সাগরে। সেদিন তুমি তাকে ডেকে বলবে, এসো। সেদিন তোমার সঙ্গে তোমার নিশানা নিয়ে সবুজদ্বীপের পথটি ধরবে সে। রঙ্গিলা, ভেবোনা এ শুধুই স্বপ্ন, মিছে কথা। অক্ষরে অক্ষরে স্বপ্ন ফলবে। কিন্তু এসো, তার আগে এসো তুমি, পরিচয় হোক তোমার অমরলতার দেশের সঙ্গে।'

আলগোছে আমার চিবুকটি একহাতে তুলে' ধরে' মহর্ষি খানিকটা হেসে দিলেন। সাদা-চুড়ো একটা দালানের দিকে এগিয়ে তিনি ডাকলেন, 'সুকণ্ঠ, দেখে' যাও কী এনেছি।'

—ক্রমশঃ

যাঁরা আমাদের স্মরণীয়

কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল

ভারতবর্ষে সার্ব্বজনীন কবিখ্যাতি পেয়েছেন যে কয়জন, কবি ইকবাল সে মুষ্টিমেয় গুণীদের মধ্যে একজন। ইকবালের উর্দ্দু ও পার্শী কবিতার প্রতিভা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাহিরের জগতেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর কবিতাগুলি ইউরোপের নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। মুসোলিনী তাঁর কবিতা প'ড়ে ইতালীয় ভাষায় তা' অনুবাদ ক'রতে বলেন।

তাঁর কবিতা যেমন উঁচুদরের, তার মধ্যে যেমন তাঁর ধ্যানী দার্শনিক মনের মস্ত পরিচয় আছে, তেমনি তাঁর কয়েকটি কবিতা ছত্রে ছত্রে তাঁর অন্তরের গভীর দেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার বাণী নিয়ে ফুটে উঠেছে।

তিনি যেমন কবি ছিলেন তেমনি বড় দার্শনিকও ছিলেন। ইসলাম জগতে এবং প্রাচ্যে তিনি জীবনে যে সহজ সত্যটি চিনেছিলেন সেটাও এক পরম আশার বাণী তিনি তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে পৃথিবীকে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন ভাবজগতের সত্যিকারের ঋষি।

তাঁর কয়েকটি উর্দ্দু জাতীয় সঙ্গীত শুধু পাঞ্জাবের নয় সমগ্র হিন্দুস্থানের হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। 'তাঁর হিন্দুস্থান হামারা'—কবিতাটি উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র তাঁর গভীর

দেশপ্রীতির কথা বলেছেন—'গানে ভারতবর্ষের মত সুন্দর দেশ আর পৃথিবীতে নেই'—এই ভাবটি তাঁর গানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইকবালের কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্চে তাঁর সার্ব্বজনীন আবেদন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কবি ইকবালের মৃত্যুতে আন্তরিক শোকপ্রকাশ করে বলেছেন—তাঁর মৃত্যুতে আমাদের সাহিত্যে যে মস্ত একটা শূন্য সৃষ্টি হ'ল—একটা মর্ম্মান্তিক ক্ষতের মত তা' বহুদিন আমাদের বেদনা দেবে। তিনি বলেছেন যে, ভারত, যার স্থান বিশ্বের সাহিত্য দরবারে নিতান্তই অল্প, ইকবালের কবিতার সার্ব্বজনীন আবেদন সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

ইকবালের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীরী পণ্ডিত ছিলেন। এই প্রাচীন পণ্ডিতদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমানে "সপ্রু" উপাধিতে পরিচিত। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইকবালের পূর্ব্বপুরুষেরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

যৌবনে কবি ইকবাল ইংলণ্ড এবং জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। কেম্ব্রিজ এবং মিউনিক এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি পি এইচ্ ডি উপাধি লাভ করেন। ইসলাম এবং পারশী দর্শনসম্বন্ধে তিনি গবেষণামূলক বই লিখে জগতের সম্মান লাভ করেন। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবিও ছিলেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ৬১ বছর হয়েছিল। দুটি ছেলে এবং ৬ বছরের একটি মেয়ে তিনি রেখে গেছেন। লাহোরে এক প্রাচীন মসজিদে ওঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা উর্দ্দু সাহিত্যে ও কাব্যে সুপণ্ডিত তাঁরা বলেছেন যে কবি ইকবাল তাঁর কবিতায় এক নূতন উদ্দীপনা ও শক্তি সঞ্চার করে ভারতের দুর্ব্বল সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। উর্দ্দু সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু ইকবালকে পৃথিবীর এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে স্বীকার করেছেন।

ইকবালের কবিতা ইন্দ্রজালের মত দেশবাসীর অন্তরস্পর্শ করেছে। কবি ইকবালের মৃত্যুতে সমস্ত ভারতের তথা পৃথিবীর সাহিত্যে ও দর্শনে যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে হুগলী জেলা বোর্ডের এক সভায় স্থির হয়েছে যে স্থানীয় বোর্ডের যে রাস্তাটি শরৎবাবুর জন্মস্থান দেবানন্দপুর গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়েছে সে রাস্তার নাম শরৎচন্দ্র চাটার্জ্জি রোড রাখা হবে। এ ছাড়া তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে শরৎবাবুর পৈতৃক বাড়ীতে একটি মর্ম্মর স্মৃতি ফলক স্থাপন করা হবে স্থির হয়েছে। তাতে লেখা থাকবে ঃ

বাঙ্‌লার অপরাজেয় কথা শিল্পী
জনপ্রিয় সাহিত্যিক
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডি, লিট্
এই পল্লীভবনে জন্মগ্রহণ ও
বাল্য জীবন যাপন করেন

জন্ম—৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩ সাল ;
মৃত্যু—২রা মাঘ, ১৩৪৪ সাল।

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের
সৌজন্যে
উত্তরপাড়া

হুগলী জেলা বোর্ড।

আমরা আশা করি কলিকাতা কর্পোরেশন শরৎবাবুর নামে স্থানীয় কোন রাস্তা বা কোন পার্ক করে হুগলীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন।

ভিটার দুর্ঘটনা ভুলতে না ভুলতে আর এক ভয়াবহ রেলদুর্ঘটনার খবর এল। গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রে মধুপুরের কাছে দ্রুতগামী পাঞ্জাব মেল লাইন থেকে উল্টে নীচে গিয়ে পড়ে। ফলে ৭টা বগী গাড়ীর মধ্যে ৫টা এঞ্জিনের সঙ্গে উল্টে নীচে পড়ে। এঞ্জিন ড্রাইভারকে মৃত অবস্থায় নীচে কয়লার গাদা থেকে পাওয়া যায়। একজন বাঙ্গালী ডাক সরবরাহকারীকেও (সুধীরকুমার ব্যানার্জ্জী) মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আপাততঃ আমরা আর কারুর মৃত্যু সংবাদ জানিনা। অথচ আশ্চর্য্য—এঞ্জিনের দুজন ফায়ারম্যান নিরাপদে বেঁচে গিয়েছে—এদের একজনের ভিটা দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা ছিল। আপাততঃ খবর এই যে দুজন মৃত ও প্রায় ৩৪ জন আহত। ট্রেনযাত্রী একদল ইংরেজ সৈন্য আহতদের খুব সাহায্য করেচেন। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার যে মধুপুর ও জসিডির মাঝামাঝিই কেন এ দুর্ঘটনাগুলি পরপর ঘটছে! তোমরা অনেকেই দেখেছ মধুপুর ও জসিডির রেলরাস্তা। আমরা জানি রাস্তাটা অত্যন্ত পাহাড়ে—এঁকাবেঁকা এবং গাড়ীগুলি আস্তেই চলে—বোধহয় অনেক মোড় আছে ও রাস্তা খারাপ বলে। কিন্তু এ রাস্তা যদি রেলের উপযোগী না হয় এখনই খবরদারী করা উচিত। এরকম রেলদুর্ঘটনা বার বার ঘটতে থাকলে রেলে নিরাপদে ভ্রমণ করাই তো দুষ্কর হবে। এবারকার দুর্ঘটনার আসল কারণ কী এখনও জানা যায়নি। গুজব যে লাইনের একটা "ফিস প্লেট" নাকি কে সরিয়ে ফেলেচে! কিন্তু কে এ কাজ করলে এবং কেন? যাইহোক রেলকোম্পানীর কর্ত্তব্য জনসাধারণকে ও যাত্রীদের সমস্ত খবরাখবর জানান এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে এখনই অনুসন্ধান করা। এতে একটা অত্যন্ত ভয়ের সৃষ্টি হয়—আমরা প্রার্থনা করি এরূপ মারাত্মক দুর্ঘটনা যেন আর না ঘটে। আহত ও মৃত ব্যক্তিদের বন্ধু পরিবারবর্গদের আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি। এবং যে ইংরেজ সৈনিকরা সে দুর্যোগে সাহায্য দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নিউ ইয়র্কএ সেদিন একটা ভারী মজার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। নিউ ইয়র্কএর একজায়গায় এক সার্কাস হচ্ছিল। সার্কাস যখন বেশ জমে উঠেছে তখন সার্কাসের এক বাঘিনী হঠাৎ ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে রিঙএর বাইরে বেরিয়ে পড়ে। চারিদিকে হুলস্থুল কাণ্ড, সার্কাসের ঘোড়াগুলো চীৎকার করতে লাগল, উটগুলো একপাশে জমা হতে থাকল। পুরুষদর্শকেরা চীৎকার করতে লাগল, মেয়েরা ভয়ে চোখে হাত দিলে। আর বাঘিনীটা গ্যালারীর তলায় তলায় ঘুরতে লাগল। লোকেরা দেখতে পায় না—সার্কাসের লোকেরাও গ্যালারীর তলা থেকে তাকে বাগে আনতে পারছে না। মহা গণ্ডগোল—হঠাৎ বাঘিনীকে যেখানে রিঙএর মধ্যে পুরোদমে সার্কাস চলছিল সেখানে লাফিয়ে পড়তে দেখা গেল, কিন্তু আবার ভয় পেয়ে সেখান থেকে এক

লাফে ড্রেসিং-রুমে ঢুকে পড়ল। এখন ড্রেসিং-রুমে তখন কয়েকজন ক্লাউন—"Snow white"এর "Seven Dwarfs" সাজছিল। তাদের মধ্যে যে 'Sleepy' সেজেছিল সে সত্যিই একজন বামন, তার নাম ফ্রাঙ্ক হারাম্‌পো—মাত্র সে তিন ফিট লম্বা! এখন ফ্রাঙ্ক করলে কি একটা ছড়ি নিয়ে বাঘিনীর নাকে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিলে। বাঘিনীটাতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে একটা কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন একজন ট্রেনার এসে পড়ে বাঘিনীটাকে বেঁধে ফেললে। সেদিন সার্কাসে 'Sleepy' না থাকলে বাঘিনীটা অনেককেই ঘুম পাড়িয়ে দিত।

শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনের সুমুখে গঙ্গায় সেদিন বেজায় রকম হুলস্থুল। গঙ্গার বুকে জেলেরা একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গর ধরেছে! কলকাতার গঙ্গায় হাঙ্গরের বড় একটা দেখা মেলে না। কিন্তু কলকাতা থেকে সমুদ্র বেশী দূরে নয়। তাই মাঝে মাঝে দু'একটা হাঙ্গর গঙ্গায় ভেসে এসে যে বিপদ বাঁধায় না তা নয়। এই হাঙ্গরটিকে জেলেরা যদি না দেখতে ও ধরতে পারত তাহলে নিশ্চয় গঙ্গা স্নানের সময় দু'দশটি লোকের প্রাণ যেতো হাঙ্গরটার পেটে। আপাততঃ কলকাতার যাদুঘরে আমাদের হাঙ্গর বাবাজীর সাজ সজ্জা হচ্চে। শীঘ্রই তোমরা তার প্রকাণ্ড কঙ্কালটা যাদুঘরের mammal gallery তে দেখতে পাবে।

বিশ্বাস ক'রতে কেমন যেন খটকা লাগে কিন্তু সত্যি সত্যিই একজন অন্ধ জগৎ 'দেখে' এসেছেন। ইনি শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায়। দু'বছর আগে বিশ্ব বিদ্যালয়ের "Ghose Travelling" বৃত্তি নিয়ে ইনি অন্ধদের শিক্ষা প্রণালী জানবার জন্য বিদেশ যাত্রা করেন। তারপর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণ, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ ক'রে ফিরে এসেছেন। পৃথিবীর মধ্যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটী মাত্র শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে মূক, বধির, অন্ধ, আতুরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক তৈরি করা হয়। সেখানে সুবোধবাবু এম, এ, উপাধি লাভ করেন। আমাদের দেশে অন্ধ বধিরের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নাই, পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু সরকারী সাহায্য নিয়ে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে—যেমন 'Sunshine Homes'—যেখানে কেবল মাত্র অন্ধদের জন্যই সুন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তার ফলে, ওদেশে এমন অনেক অন্ধ লোক দেখা যায় যাঁরা সব বিষয়েই স্বাভাবিক লোকের মত কর্ম্মপটু। নিউইয়র্কে এক অন্ধ মহিলা সাংবাদিকের কাজে বেশ নাম করেছেন। একটা কুকুর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়—এই ধরণের কুকুরকেও অন্ধদের সাহায্যের জন্য বিশেষ

এক প্রণালীর শিক্ষাদেওয়ার ব্যবস্থা ওদেশে আছে। অন্ধের অন্ধ হওয়াটাই তার বড় অনুশোচনা নয়, এদেশে অন্ধকে বেশীর ভাগ সময়ই চুপচাপ নিশ্চেষ্ট আলস্যে বসে থাকতে হয় এটাই তার আপসোষ। ওদেশে অন্ধেরা নানা কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ভারতবর্ষের অন্ধদের সংখ্যা ৬ লাখ। তাদের জন্য স্কুল আছে ১৫টা আর জাপানে মাত্র ৭৬ হাজার অন্ধের জন্য স্কুল আছে ৯০টা।

ডেভিস কাপ ঃ—

বিখ্যাত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় বহু বছর পর ভারতীয় পূর্ণ টেনিস টীম যোগ দিয়েছিলেন নিজেদের ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয় দিতে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় খেলবার আগে ভারতীয় দল ইউরোপে নানা টুর্ণামেণ্টে খেলেন এবং বিশিষ্ট খেলোয়ড়দের হারিয়ে ভারতের সম্মান রাখেন। সোহানী, গাউস মহম্মদ, রণবীর সিংহ ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও কোন টুর্ণামেন্টের ফাইন্যালে চ্যাম্পিয়ান হন নি। এবার এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল বেলজিয়ামের সঙ্গে খেলেন। সোহানী সুন্দর খেলে ও প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের ১ নং খেলোয়ড় Lacroix এর কাছে ৬-৪-৬-৩-৪-৬-৬-৩ গেমে পরাজিত হন। গাউস মহম্মদ আপ্রাণ চেষ্টার পর দুর্দ্দান্ত Naeyert কে ৫-৭-২-৬-৬-৩-৬-৯-৭ গেমে হারাণ। দুটি খেলাতেই খুব প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ডবলস্ খেলায় সোহানী ও গাউস মহম্মদ পর পর দু'টী গেম অতি সহজে জয়ী হয়েও শেষ পর্য্যন্ত হার স্বীকার করেন। নিজেদের সমস্ত দুর্ব্বলতা ধরা দিতে সুযোগ বুঝে Lacroix ও ডি বরমন ৪-৬-৩-৬-৬-৩-৭-৫, ৬-৪ গেমে জয়ী হয়ে ভারতীয় দলের সব আশা ভেঙ্গে দেন। ইউরোপে একমাত্র ফ্রান্স, জার্ম্মাণি ও ব্রিটেন ছাড়া অন্য কোন দেশের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভারতীয় উচ্চাঙ্গের খেলার চেয়ে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু খেলার মাঠে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা নিজেদের যোগত্যার প্রমাণ দিতে সক্ষম হন নি।

বাংলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি সস্তায় দেখে আসবার জন্য ই, বি রেলওয়ে কোম্পানী এবার বেশ সুবিধে করে দিয়েছেন। আমরা বাংলার প্রাচীন নগরীগুলির কথা অনেকেই জানি না। অথচ একদিন বাংলা ইতিহাসে ভারতের গৌরব ছিল। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, গৌড়, পাণ্ডুয়া, ঢাকা, মুর্সিদাবাদ এই সমস্ত প্রাচীন দেশগুলি না দেখলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাংলার তরুণ ছাত্রছাত্রী যাঁরা এই প্রাচীন জায়গাগুলি আজও দেখেননি তাঁরা রেলওয়ের এই সুযোগে সদলবলে দেখে একসঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করতে পারেন।

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন শ্রীমান সুবল সখা মণ্ডল। বয়স প্রায় ১৫। ডায়মণ্ড হারবার হাই স্কুলের ইনি একজন সুযোগ্য ছাত্র। মোট ৭০০ নম্বরের মধ্যে শ্রীমান সুবল ৬৩৭ নম্বর পেয়েছেন। তার মানে গড় পড়তা ১০০র মধ্যে ইনি পেয়েছেন ৯১। কয়েকটি বিষয়ে অঙ্ক, সংস্কৃত ইত্যাদিতে প্রায় ফুল্ মার্ক পেয়েছেন। ইহা অল্প প্রতিভার পরিচয় নয়। শ্রীমান সুবলের কৃতিত্বে আমরা তাঁকে অভিনন্দন করছি।

আমরা শুনে খুসী হলাম সুপরিচিত শিল্পী শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী ৮৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ "বাসন্তী বিদ্যাবীথি" ভবনে 'শিল্প সদন' নামে একটি চিত্রাঙ্কণ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। স্কুল কলেজের পাঠ বজায় রেখেও ছাত্রছাত্রিগণ যাতে শিল্প বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেন সেজন্য সকালে ছেলেদের ক্লাশ এবং বিকালে মেয়েদের ক্লাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রগণ যাতে এখানে শিক্ষা লাভ করে উপার্জ্জনশীল হতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা হবে। শিল্পীগণের সুবিধার জন্য প্রতিমাসে শিল্পীও শিল্প সমালোচকদের আহ্বান করে আলোক চিত্র সহযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হবে। কৃতবিদ্য ছাত্র ছাত্রিগণকে পৃথক ব্যবস্থায় প্রতি বৎসর একবার করে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কণের জন্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হবে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে এবং যদি কোনো মহিলা বাড়ীতে শিখতে চান, শিল্প সদন থেকে তারও ব্যবস্থা করা হবে।





শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অজয় বা সমর পৃথিবীতেও খুব ভীষণ ভূমিকম্পের মধ্যে কোনদিন পড়েনি। কিন্তু প্রত্যক্ষ না দেখলেও পৃথিবীর বড় বড় ভূমিকম্পের বিবরণ তারা পড়েছে। ভূমিকম্পে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে ঘটে, এক মুহূর্ত্তে কি কল্পনাতীত সর্ব্বনাশ যে হয়ে যায়, তা তারা জানে! প্রলয়ের দেবতার অমন রুদ্ররূপ আর কিছুতেই ফোটেনা। বন্যা, ঝড়, মহামারী তার কাছে কিছুই নয়, চোখের পলক না ফেলতে ফেলতে গোটা একটা দেশ তাতে শ্মশান হয়ে যায়। বিস্তীর্ণ জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় পৃথিবীর গর্ভে।

কিন্তু পৃথিবীর ভীষণতম ভূমিকম্প থেকেও বুধগ্রহের এ অসম্ভব ব্যাপার কল্পনা করা যায় না। ভূমিকম্প বল্লে এ আলোড়নের ভুল বর্ণনা দেওয়া হয়। কারণ কম্পন সেত নয়— তার চেয়ে অনেক বেশী অনেক ভয়ঙ্কর কিছু। কঠিন মাটি যেন পলকের মধ্যে প্রলয়ঙ্কর সাইক্লোনের সমুদ্র হয়ে উঠল তাদের চোখের ওপরে। আকাশছোঁয়া মাটির ঢেউ উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল, লকলকে আগুনের শিখার সঙ্গে। বিরাট একটা বোমার মত সমস্ত বুধগ্রহটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

ডাঃ ক্রুল কন্ট্রোল রুমে পৌঁছিতে আর একটু দেরী করলে এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ অবশ্য তাদের মিলত না। এমনিতেই বিদ্যুৎবেগে হাউই জাহাজ আকাশে উঠান সত্ত্বেও তারা একেবারে অক্ষত থাকতে পারেনি। যে পাহাড়ের ওপর তাদের হাউই জাহাজ নেমেছিল সেইটি তারা মাটি না ছাড়াতে ছাড়াতেই আগ্নেয়গিরির মত হঠাৎ ফেটে গিয়ে আগুন লাভা ও পাথর ওপড়াতে সুরু করে ; এবং প্রকাণ্ড কামানের গোলার মত একটি পাথরের চাঁই তাদের হাউই জাহাজে ছিটকে এসে লাগে। ইস্পাতের চেয়েও শক্ত মিশ্র ধাতুতে তৈরী হলেও সে আঘাতে হাউই জাহাজের একটি হাউই-নলের মুখ একেবারে ভেঙে অচল হয়ে যায়। আর দু-চারটি ওরকম পাথরের চাঁই লাগলে তাদের হাউই জাহাজের পরমায়ু ওইখানেই শেষ হয়ে যেত। সৌভাগ্যক্রমে সে রকম কোন পাথর আর ছিটকে তাদের গায়ে না লাগলেও, হাউই জাহাজ নিয়ে তাদের খানিকক্ষণ নানাভাবে নাকাল হতে হয়েছে। বুধগ্রহের বিরাট আলোড়ন ও জায়গায় জায়গায় মাটি ফেটে বিশাল আগ্নেয়গিরি জেগে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার আকাশে প্রচণ্ড ঝড় সুরু হয়েছে। তাদের হাউই জাহাজকে পর্য্যন্ত সে ঝড় নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। পৃথিবীর হাওয়ার পরিমণ্ডল বুধগ্রহের তুলনায় নগণ্য ; পাঁচ ছয় মাইল ওপরে উঠলেই পৃথিবীতে ঝড়ের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু বুধগ্রহের আকাশে ঝড়ের প্রতাপ উর্দ্ধে ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তার ঝড় সুতরাং এমনিতেই পৃথিবীর তুলনায় অনেক প্রচণ্ড। তার ওপর এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের পর সেখানকার আকাশে যে ঝড় সুরু হল তার পার্থিব কোন তুলনা দেওয়া যায় না। হাউই জাহাজের অসীম শক্তিও তার বিরুদ্ধে কিছু নয়। ঝড়ে উড়ে যাওয়া শুকনো পাতার মত কতবার যে তাদের হাউই জাহাজ পাক খেয়ে আছড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল তা বলা যায় না। শুধু ডাঃ ক্রুলের অদ্ভুত চালনার কৌশলেই সে যাত্রায় যে তারা রক্ষা পেল এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

মাইল চল্লিশ ওপরে উঠে যখন হাউই জাহাজ কতকটা নিরাপদ হ'ল তখন দেখা গেল আসবাব পত্র থেকে তাদের হাত পা পর্য্যন্ত কিছুই আর সম্পুর্ণ অটুট নেই। কন্টোল রুমেই যন্ত্রপাতির গায়ে ধাক্কা খেয়ে ডাঃ ক্রুলের কপাল কেটে রক্ত বেরুচ্চে, অজয়ের একটা কব্জি মুচড়ে গেছে ও সমর খোঁড়াচ্চে পায়ে চোট খেয়ে।

কিন্তু নীচে তখন যে ব্যাপার ঘটছে তার আকর্ষণের কাছে এসমস্ত আঘাত তাদের কাছে তুচ্ছ।

সমর ও অজয় কোনরকমে ধাক্কা খেতে খেতে তখন কণ্ট্রোলরুমেই এসে দাঁড়িয়েছে। সমর নীচেকার জানলার ঢাকনি খুলে তলার দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করে বল্লে,—"এ আবার কি ব্যাপার ডাঃ ক্রুল ! পলকে এমন প্রলয় হবে তা ভাবতে পারিনি ।

কপালের আঘাতের উপর রুমাল দিয়ে একটা ফেট্টি বেঁধে ডাঃ ক্রুল বল্লেন,—ভাবা কিন্তু উচিত ছিল !

অজয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—বা ! ভূমিকম্পের কথা ভাববো কোথা থেকে !

"ভাববো বুধগ্রহের বয়স থেকে ! আমাদের বোঝা উচিত ছিল, বুধগ্রহর এখন বয়স কাঁচা, এই বয়সে সব গ্রহেরই বড়বেশী এই রোগ দেখা যায়। গ্রহের ভেতরকার উত্তাপ ফুটে বা'র হওয়া আর জলস্থল সমেত ওপরের খোসা কুঁকড়ে যাওয়ার ফলেই এরকম ঘটে। আমাদের পৃথিবীতেও এককালে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। পৃথিবীর চেহারা কতবার তাতে বদলে গেছে তার লেখাজোখা নেই ।

সমর নীচে দিক থেকে মুখ না তুলতেই বল্লে—"কিন্তু সে কি এই রকম ভূমিকম্প। নীচের দিকে চেয়ে দেখেছেন কি ব্যাপার হচ্চে এখানে ? সমস্ত বুধগ্রহময়কে যেন বড় বড় তুবড়ি সাজিয়ে আগুন দিয়েছে, রাত একেবারে দিন হয়ে গেছে তাদের আলোয়। পলকের মধ্যে এতগুলো আগ্নেয়গিরির জন্ম—এ ত চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিনা।

ডাঃ ক্রুল হেসে বল্লেন,—"আমাদের বিশ্বাসের ক্ষমতা আর কতটুকু।"

সত্যি নীচেকার দৃশ্য তখন বিশ্বাসের অতীত। খানিক আগে যে গ্রহ কালীর মত কালো অন্ধকারে ঢাকা ছিল সেখানে এখন যেন দেওয়ালির রোসনাই লেগেছে। এ যেন দৈত্যদের বাজি পোড়ানর উৎসব। দিকে দিকে আকাশছোঁয়া লকলকে আগুনের শিখা, চারিধারে অতিকায় তুবড়ির মত আগ্নেয়গিরির উচ্ছ্বাস। তাদের হাউই জাহাজ তখন রীতিমত বেগে বুধের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে, কিন্তু তবু যতদূর এগিয়ে যাওয়া যায় এদৃশ্যের শেষ যেন নেই।

সমর আবার জিজ্ঞেস করলে—"সমস্ত বুধগ্রহেরই এই অবস্থা নাকি।"

ডাঃ ক্রুল গম্ভীর মুখে বল্লেন, "আশ্চর্য্য কিছু নয় !

"কিন্তু তাহলে আমরা যাচ্চি কোথায়।"

"যদি বুধের উল্টোপিঠে কোথাও নিরাপদ জায়গা পাওয়া যায়। যাচ্ছি সেই খোঁজে !

অজয় উদ্‌গ্রীব ভাবে জিজ্ঞেস করলে,—"নিরাপদ জায়গা কোথাও নেই।" এমনও হতে পারে নাকি !

"তা হ'তে পারে বই কি !"

"কিন্তু কতক্ষণ আর থাকবে !"

"তারও কোন ঠিক নেই—সামান্য দু'একমাস থেকে হাজার বছরও এমন চলতে পারে !"

"হাজার বছর ! বলেন কি ? আমাদের নামবারতো কোন আশাই তাহলে নেই, বুধের প্রাণীজগতেরও কেউ তো তাহলে টিকবেনা।"

"সবাই না হলেও, টিকবে সম্ভবতঃ কেউ কেউ। কিন্তু রাজত্ব বদলে যাবে। আজ 'ডাইনসর ধরণের যে সব জানোয়ার শ্যাওলা ও অ্যালজি জাতের যে সব গাছের প্রতাপ আমরা দেখলাম, তারা হয়তো সবংশে মুছে যাবে। তার জায়গায় কোথাও কোন অজানা কোণে, আজকের দিনে যারা নগণ্য হয়ে আছে তারাই ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে হয়ত ভবিষ্যতে একদিন প্রধান হয়ে উঠবে। পৃথিবীতেও এই ব্যাপার হয়েছে। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে সরীসৃপ জাতের যে প্রাণীরা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিল একদিন তারা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তার জায়গায় এল স্তন্যপায়ী প্রাণীরা, স্তন্যপায়ীদের ভেতর আবার মানুষ সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল !"

"কিন্তু সে তো আর এরকম ভূমিকম্পের ফলে হয়নি !"

"কিসে যে হয়েছে বৈজ্ঞানিকেরাও ঠিক করে বলতে পারেন না। তবে পৃথিবীতেও এধরণের ওলটপালট সুদূর অতীতে হয়েছে এটা ঠিক। আপনাদের ভারতবর্ষের গৌরব যে হিমালয়—সেও এইরকম একটা ব্যাপারের ফল। আজ যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পাহাড় সেখানে একদিন সমুদ্রের জল থই থই ক'রত, কতবড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে তা সম্ভব ভেবে দেখুন দিকি !"

অজয় একটু অধৈর্য্য হয়ে বল্লে,—"কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভাবনার কথা কোথাও না নামতে পারলে আমরা কি করব !"

—ক্রমশঃ

রংমশাল দল
প্রীতি উৎসব

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ আশুতোষ কলেজ হলে রংমশাল প্রীতি উৎসবে তোমরা যোগ দিয়ে আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছো। তোমরা অনেকেই সে দিন উপস্থিত ছিলে, তোমাদের অভিভাবকরা ও বন্ধুরাও কষ্ট করে অনেকক্ষণ ছিলেন এতে আমরা খুব খুসী হয়েছি। তাঁদের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ো। উৎসব সভায় তোমাদের সঙ্গে আরও ছিলেন রংমশালের প্রিয় লেখক লেখিকারা—তোমাদের প্রিয় অনেক নামজাদা সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীরা। আর তাঁদের মধ্যে সবার অগ্রণী ছিলেন তোমাদের বৃদ্ধ দাদামশাই শ্রীঅবনী দাদা। তাঁর মত একজন গুণী রসিক লোককে সেদিন আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেয়ে ছিলাম। আর তাঁরা সকলেই তোমাদের মাঝে থেকে খুব খুসী হয়েছিলেন। শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ অসুস্থ ছিলেন তবু তিনি তোমাদের মাঝে কিছুক্ষণ থাকবার জন্য নিজের অসুস্থতা ভুলে গিয়ে সেদিন খুসী মনে হাজির ছিলেন। আমাদের খুব ইচ্ছে রইল একদিন শ্রীঅবনীন্দ্রনাথকে কেবল তোমাদের মাঝে আরো কাছে এনে হাজির করব তাঁর মুখ থেকে তাঁর গল্পগুলি যাতে তোমরা শুনতে পাও। তাঁর হাতে লেখা মজার গল্পগুলি তোমরা তো পড়ে মুগ্ধ হয়েছ কিন্তু যেদিন তোমরা তার মুখের গল্প শুনতে পাবে সেদিন আরো মুগ্ধ হবে। এ মাসে রংমশালের গোড়াতে তাঁর সেদিনকার অভিভাষণটি ছাপালাম। তোমাদের মধ্যে যারা দূর প্রবাসে থাকো যারা আসতে পারনি তাদের সকলের জন্য আমরা দুঃখিত রইলাম কিন্তু তোমাদের সকলকে একসঙ্গে পাওয়া তো সম্ভব নয়। সেদিন রংমশাল প্রীতি সম্মিলনী কি রকম হয়েছিল সকলের জন্য এবার তা সংক্ষেপে বলি।

উৎসব সভায় সব প্রথম বন্দেমাতরম গানটি গাওয়া হয়েছিল। গানের পর তোমাদের সম্পাদক মশাই রংমশাল দলটি সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা সভাকে বলেন। তিনি বলেন, রংমশাল দল কোন সামরিক বা সম্প্রদয়ক দল নয়, এর উদ্দেশ্য এ নিজেই সৃষ্টি করে নেবে, আনন্দ ও আলোর মধ্যে মিলে এর উদ্দেশ্য আপনি বিস্তারিত হবে। এর পর তোমাদের দিদিভাই এর অভিভাষণ এর সার অংশ আমরা তাঁর নিজের ভাষায় এখানে তুলে দিলাম।

"পত্রিকার ভিতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের 'দল' বাঁধবার চেষ্টা বাংলা দেশের ভিতর এই প্রথম বলেই আমাদের মনে হয়। সুজলা বাংলার শ্যামল কোল ছেড়ে যাঁরা প্রবাসী হয়ে পড়ে আছেন যাঁরা কাজ ও কর্ত্তব্যের খাতিরে বাংলা দেশের সুদূর অঞ্চলে ও বাংলার বাইরে ছড়িয়ে আছেন সেই দূরবাসী ও প্রবাসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাংলা দেশের কৃষ্টি ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখবার চেষ্টা পেয়েছি আমরা এর ভিতর দিয়ে। লেখনী বন্ধু দ্বারা দূরত্বের বন্ধনটাকে আমরা কাটাবার চেষ্টা পেয়েছি—ভাবের ও ভাষার আদন প্রদান ঘটিয়ে আমরা অন্তরের পরিসর আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক করার চেষ্টা পেয়েছি—এই চেষ্টাই, এই আন্তরিকতাই আমাদের দল বাঁধাবার অনুপ্রেরণা দিয়েছে।—রংমশাল দলের উদ্দেশ্য—আনন্দ ও আলো! এই আনন্দ আর আলো আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের মাঝে, শোনাতে চাই তাদের সৌভ্রাত্রের ও মৈত্রীর বাণী। রংমশালের এই আনন্দ আর আলো বাংলা দেশের ঘরে ঘরে জ্বলুক। রংমশালের আলোয় বাংলার ছেলেমেয়েদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক স্বাস্থ্য সজীবতার গানে, শক্তির প্রাচুর্য্যে, প্রতিভার দীপ্তিতে।"

অভ্যাগতদের মধ্যে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত রংমশালের আদর্শের প্রশংসা করে কয়েকটি সুন্দর কথা বলেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় দলকে শুভকামনা জানান। শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় রংমশালের উপন্যাস ও গল্পগুলির প্রশংসা করেন ও রংমশালের চিঠির বাক্সের চিঠিপত্র তাঁর কত ভাল লাগে সে কথা জানান। তিনি বলেন, পুরীতে থাকতে রংমশালের 'চিঠির বাক্সের' এক চিঠির মধ্যে তাঁর এক চেনা মেয়ের বহুদিন পরে সন্ধান পান। তার অনেকদিন তিনি খবর পান নি। তার চিঠিটি দেখে তাঁর ভারী আনন্দ হয়েছিল বলেন। শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি সুন্দর কথা বলেন। সবার প্রীতি ভাষণ এর পর রংমশালের মাসিক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পদক ও পুস্তক পুরস্কারগুলি দেওয়া হয়। যারা প্রবাসী গ্রাহক গ্রাহিকা তাদের পুরস্কারগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুরস্কারগুলি তোমাদের খুব ভাল লেগেছে তোমরা খুব আনন্দ পেয়েছিলে। যারা প্রবাসে বিদেশে আছ তারাও নিশ্চয় তেমনি আনন্দ পাবে।

পুরস্কার বিতরণের পর সভাপতি শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর একটি সুন্দর সুদীর্ঘ অভিভাষণ দেন। অভিভাষণের সার অংশ আমাদের অনুরোধে তিনি নিজের হাতে সেটি তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন।

অভিভাষণের পর শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের "ডাক ঘর" এর অভিনয় সুরু হয়। এ অভিনয়টি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেছিলেন শ্রীধীরেন্দ্র ঘোষ। সঙ্গীতের ভার নিয়েছিলেন শ্রীবাণী কান্ত গুহ। অভিনয় সকলের খুব ভাল লেগেছিল। তোমরা অনেকে সে কথা জানিয়েছো। কুমারী গীতা দে সরকার, কুমারী পাপড়ী সেনগুপ্তা, কুমারী গীতা মজুমদার, শ্রীধীরেন ঘোষ শ্রীচণ্ডী চরণ ঘোষ, শ্রীমিহির দে, শ্রীসত্য রায়, শ্রীঅজিত দে, শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘোষ, শ্রীঅশোক দত্ত, শ্রীঅমল দত্ত, শ্রীগোবিন্দ দাস গুপ্ত ও শ্রীপ্রদীপ কুমার সেন এঁরা অভিনয় করেছিলেন। শ্রীগৌরী দাস গুপ্ত, কুমারী বীণা দত্ত, কুমারী পাপড়ী সেনগুপ্তা, ও কুমারী মঞ্জুলিকা দত্ত।— এঁরা একা গান করেছেন। ছেলেদের দলে গান করেছেন কুমারী নমিতা, বাণী, স্নেহ ও আরতি। অমলের ভূমিকায় কুমারী গীতা ও সুধার ভূমিকায় কুমারী পাপড়ী অতি সুন্দর অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। এঁদের অভিনয় দেখে যেমন তোমরা তেমনি সভাশুদ্ধ সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। ডাকঘরের ছোট্ট রুগ্ন ছেলে অমল আর মালিনী মেয়ে ছোট্ট সুচতুরা সুধা—এদের এত ভাল অভিনয় এর আগে আর কেউ নাকি দেখেনি একথা সেদিন আমরা শুনে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

ডাকঘরের পর শ্রীঅখিল নিয়োগীর 'বাসন্তিকা' অভিনয় হয়েছিল। বাসন্তিকা নাটকটি তোমরা সকলেই রংমশালে পড়েছ। বাসন্তিকার সুষ্ঠু পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তোমাদের 'দিদিভাই' নিজে। শ্রীননী দাসগুপ্ত এর প্রযোজনার ভার নিয়েছিলেন আর সঙ্গীতের ভার নিয়েছিলেন শ্রীবিমান ঘোষ। বাসন্তিকার অভিনয়ও সকলকে মুগ্ধ করেছিল। লিলি চক্রবর্ত্তী, পারুল দেবী, লীনা ঘোষ, অমিতা সাহা, নমিতা সাহা, গীতা বসু, সেবা ঘোষ, ডোরা গাঙ্গুলী ও নীলিমা গাঙ্গুলী—এঁরা অভিনয় করেছিলেন। বালিকার দলে ছিলেন—কুমারী মমতা, পূর্ণিমা, অজন্তা, ফ্লোরা, পূর্ণিমা রায়, কেয়া, বুনু, বুলু ও প্রতিমা। খর্ব্বনাশার অভিনয়ে শ্রীমতী পারুল দেবী সকলকে খুব হাসিয়েছিলেন। কুমারী নমিতা সাহা মলয়ানিলের ভূমিকায় নাচে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। নাচে গানে বাসন্তিকা সভার আসর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জমিয়ে রেখেছিল।

এরপর সভা ভঙ্গ হবার আগে কুমারী গীতা দে সরকার, কুমারী পাপড়ি সেনগুপ্তা ও শ্রীমতী পারুল দেবীকে অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। সভাস্থ সকলেই এতে আনন্দ জানিয়েছিলেন।

এরপর আমাদের ধন্যবাদ জানাবার পালা। রংমশাল উৎসবে যোগ দান করে তোমরা সকলে তোমাদের অভিভাবকগণ আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানবে। আর যাঁরা সেদিন উপস্থিত থেকে সভার বিশেষ মর্য্যাদা বাড়িয়েছিলেন তাঁদেরও আবার ধন্যবাদ আমরা জানাচ্ছি। ডাকঘর ও বাসন্তিকার অভিনয়, পরিচালনা ও প্রযোজনার যাঁরা ভার নিয়েছিলেন তাঁরাও তো আমাদের আপনার লোকই তাঁদেরও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা শুধু সেদিন নয় বহুদিন আগে থেকে তাঁরা আনন্দে পরিশ্রম করেছিলেন।

এছাড়া সেদিনকার সভার সমূহ সুব্যবস্থার জন্য ফিলিফস্ এণ্ড রায়, আশুতোষ কলেজ ফিজিক্স বিভাগ, অর্গান কোম্পানী ও মিত্র মুখার্জ্জি (মেডেল ও রংমশাল ব্যাজের জন্য) আমাদের ধন্যবাদার্হ। আর প্রফুল্ল পিকচারসের সৌজন্যে অরকেষ্ট্রা ও যন্ত্র সঙ্গীতের ভার নিয়ে শ্রীরবি রায় এণ্ড পার্টি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

তোমাদের সকলকে নিয়ে সেদিন আমরা যে উৎসব আয়োজনে মিলেছিলাম আর যাঁরা সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের মধ্যে আমরা যে আন্তরিক আনন্দ পেয়েছিলাম এ সমস্তই তোমাদের আজকের রংমশালে মধুর ভাবে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল।

আসচে মাসে গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হবে। জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নামও এবার স্থানাভাবে দিতে পারা গেল না বলে আমরা দুঃখিত। আসচে মাসে সেগুলি নিয়মিত ছাপা হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের আলোকচিত্র প্রতি-যোগিতার শেষ তারিখ ২০শে আষাঢ় পর্য্যন্ত রাখা হ'ল।

আমরা সকলের জন্য

'রংমশাল দল'

দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মানুষের স্বভাব—মানুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই একলা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে ফেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলী হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্য ভাবতে শিখি, একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তৃত হয়।

এতখানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে আছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করছি—**রংমশাল দল**।

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জন্যে যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা সবাই এক দলের। দলের বীজ সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল **আনন্দ** আর **আলো**। রংমশাল দলের আদর্শ পরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ের দরকার হয়। সেই জন্যে রংমশাল দলের ব্যাজ হয়েছে '**মশাল**'। সুন্দর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাজটি তৈরী হয়েছে তোমাদের জন্য; ব্রুচের মত ব্যবহার করবে তোমাদের পোষাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

নিয়মাবলী



রংমশাল দলের "ব্যাজ"

(১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জন্যে কোন আলাদা চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাজ পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে। নিয়মিত পাঠক পাঠিকা যাঁরা এজেণ্ট মারফৎ কেনেন—এজেণ্টের নাম দিয়ে তাঁরা এ দলে ভর্ত্তি হতে পারেন।

(২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।

(৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।

(৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ভাবে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।

(৫) সমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার। সেজন্য কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।

(৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, "দিদিভাই" C/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।

(৭) সব বিষয়ে দিদিভাইএর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অন্য কোন ব্যাপার—"দিদিভাই"এর ইচ্ছাধীন।

(৮) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।

(৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর সবার উপর সমান দৃষ্টি থাকবে।

(১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জন্য বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

রংমশাল দল
কুপন

নাম...গ্রাঃ নং....................

জন্ম তারিখ.....................স্কুল বা কলেজ, শ্রেণী..

পিতা বা অভিভাবকের নাম (তাঁর স্বাক্ষর)..

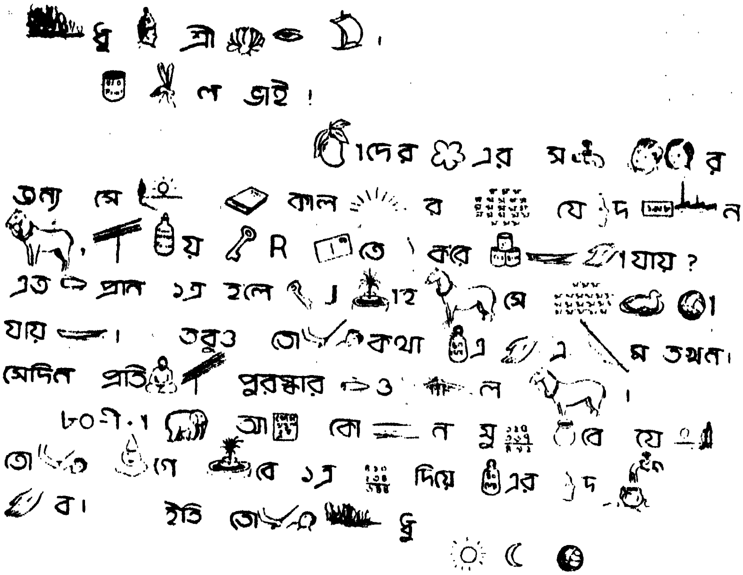
ঠিকানা..

....

লেখনী বন্ধু চাই কিনা..

হবি (Hobby)..

উৎসাহীর চিঠি



ওপরের ওটা কি বলত ? না না ওটা একটা চিঠি ! রংমশাল দলের এক উৎসাহী অন্য এক উৎসাহীকে ঐ চিঠিটি লিখেছে। বুঝতেই পারছ চিঠি যে লিখেছে, তা'র ছবি আঁকার অভ্যাস খুব বেশী আছে, তাই সে চিঠিখানি ছবি দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছে, অর্থাৎ, কথার বা কথার অংশের বদলে ছবি এঁকে রেখেছে। হয়তো লিখতে হবে 'বল্কল,' সে ছবি আঁক্‌বে একটা বলের (খেলার বল) আর একটা কলের (জলের কলের)। হয়তো, লিখতে হবে 'বন্ধু' সে আঁকবে একটা বনের ছবি, আর তা'র ডান পাশে লিখবে 'ধু' ;—এই ভাবে সে ছবির চিঠি লিখো এই চিঠিতেও সে ঐ রকম করেছে।

কিন্তু, যে বেচারা চিঠি পেয়েছে, তা'র তো মহা মুস্কিল ! বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে সে চিঠিখানা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। সেটা এখানে ছাপা হ'লো। তোমরা প'ড়ে এর মানে বের করতে চেষ্টা কর।

(তোমাদের সুবিধার জন্য চিঠির দু'চারটি কথা ব'লে দিলাম :—আনন্দ, আশা, সঙ্গে, ছেলেমেয়ের)।

তোমাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে জানাও যে রংমশাল পাওনা। তাদের আবার আমাদের রংমশাল পাঠাতে হয়। এতে তোমরা জেনো আমাদের দোষ কিছু নেই। বরং এতে আমাদের ক্ষতিই হয়। আমরা সকলকেই ঠিক সময় তোমাদের ঠিকানা মত রংমশাল পাঠাই। পোষ্ট অফিসে কোন কোন রংমশাল মারা যাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। তোমরা তোমাদের পোষ্ট অফিসে [illegible]ন করো। এ বিষয়ে আমরাও জেনারেল পোষ্ট অফিসে লিখেছি।



পরিচালিকা—**দিদিভাই**

স্নেহের রংমশাল দল'এর ছোট ভাই বোনেরা !

'রংমশাল দলের' প্রীতি উৎসবে তোমরা অনেকে এসেছিলে আবার অনেকে আসতে পারোনি। যারা দূরে থেকে আসতে পারোনি তাদের অন্তরের আন্তরিকতা প্রীতি উৎসবকে শুভস্পর্শ দিয়েছে। আমরা আশা করছি পরের বছর তোমাদের সব ভাইবোনদের এক জায়গায় দেখতে পাবো।

আষাঢ় এসে পড়লো, আকাশে তার ঘন সমারোহ চলেছে। প্রখর তাপে মাটির বুক খাঁ, খাঁ করে তরু তার শাখা প্রশাখা আকাশের দিকে বিস্তার করে বলে ওগো আমরা তৃষ্ণার্ত্ত জল দাও একটু! শ্রীভগবানের আশীষের মত আকাশ থেকে জল ঝরে পড়ে তৃষ্ণার্ত্ত পৃথিবীর বুকে, তরু শাখায় শাখায়, বনে বনে !

ঘরের সার্সিতে বাজছে জল তরঙ্গ, স্তূপীকৃত চিঠির ভিতর ডুবে আছি আর কান পেতে শুনছি বৃষ্টির ছন্দের টুং টাং শব্দ—মনে হচ্ছে এ শব্দ যেন তোমাদের আনন্দ উচ্ছসিত হাসির শব্দ। আকাশের জল ভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে তোমাদের অভিমান ভরা মুখের কথা মনে পড়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিতে সুরু করছি—

আরতি (বালিগঞ্জ)

তোমার চিঠিতে যা প্রশ্ন করেছ তার উত্তর বহু পূর্ব্বেই আমি তোমার অন্য ভাইবোনদের দিয়ে দিয়েছি স্থতরাং আর কিছু বলবার নেই। তোমার কবিতার সম্বন্ধে যা হয় তার উত্তর যথা সময়ে পাবে। তোমাদের উপর আমি রাগ করতে কি পারি ভাই—? তবে নিয়মবিরুদ্ধ কাজও তো করতে পারি না সেইজন্য মুস্কিল হয়।

শচীন্দ্র নাথ রায় (হাওড়া) গ্রাহক নং ৯৭৫।

তোমার চিঠির উত্তর অনেকদিন পরে যাচ্ছে দুঃখ করো না ভাই, তোমার লেখনী বন্ধু আশা করি পেয়েছ। তোমার লেখার বিষয় যথা সময়ে জানতে পারবে ভাই।

বিমল মণ্ডল (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮১৯।

তোমার দিদির অভাব তো আর রইল না ভাই! তোমার বন্ধু চাই কিনা সে কথা কিছু তো জানাওনি।

অচিন্ত্য কুমার রক্ষিত (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮৪৪।

তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের এক জন সৈনিক—একথা শুনে খুসী হয়েছি। তুমি I. Sc. পড়ছ, তোমার বয়স ১৯ বলে রংমশাল দলে ভর্ত্তি হতে পাবে না লিখেছ। কিন্তু তাতো নয় ভাই—আগেই তো বলেছি বয়সটা সব নয় আগে মন! তোমার ভাইদের ভিতর কাকে তুমি লেখন বন্ধু পেতে চাও?

রথীন্দ্র মোহন মৈত্র (রাজসাহী) গ্রাঃ ৯৯০।

খোকা ভাই! তোমার লেখনী বন্ধু চলে গেছে, তাকে পেয়েছ তো? দিদি পেয়ে তোমার আনন্দ হচ্ছে জেনে খুসী হলাম।

শিব প্রসাদ সেন (নিউদিল্লী) ৫৮৯।

তোমার তিনখানা চিঠিই পেয়েছি। তুমি Samdhar Lake থেকে যে চিঠি দিয়েছ তার খানিকটা আমি তোমার ভাইবোনকে পড়তে দিচ্ছি "আমরা ১৮ই এপ্রিল এখানে এসেছি। আমরা এখানে তিন মাস থাকবো। রাজপুতনায় মরুভূমির এক প্রান্তেই সহরটা। এখানে মাত্র ২।৩ ঘর বাঙালী আছেন। সকাল বিকেল ছাড়া আর কখনও বাইরে বেরনো যায় না। দুপুরের রোদে বালি আগুনের মত হয়ে যায়, আর রাত্রি বেলা সাপের ভয়। এখানে ভয়ানক সাপ। রাত্রে বালি ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, সেই সময় সাপগুলো বালির ওপর ঘুরে বেড়ায় এখানকার সাপের ভীষণ বিষ। এখানে অনেক ময়ুর আছে—এই হচ্ছে এ সহরের সৌন্দর্য্য এখানে ব্যাং ও ইঁদুর অনেক সেইজন্য সাপও অনেক—আবার সাপ অনেক সেই জন্য ময়ুর বেশী। বর্ষার সময় ময়ুরেরা পেখম তুলে নাচে। এটা একটা লবণের পাহাড়। মরুভূমিতে যেমন চারিদিকে বালির পাহাড় এখানে সেই রকম চারিদিকে লবণের পাহাড়। আমরা প্রায়ই ও হ্রদে বেড়াতে যাই, যদি কেউ লবণের ইতিহাস জানতে চান আনন্দের সঙ্গে জানাতে পারি।"

শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী (বিক্রমপুর বা কালি গাঁ) ৩৫৭।

তোমার চিঠি অনেকদিন পড়ে আছে বলে রাগ করনি তো ভাই? তুমি যে চিঠি পাঠাবে বলেছ পাঠিও দেখে তবে উত্তর দেবো। হ্যাঁ লেখনীবন্ধু তুমি বেছে নেবে, না আমি করে দেবো?

বানী ঘোষ (পাটনা) গ্রাঃ ১০১২।

তোমার চিঠিটি আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমার যা যা ছবি লিখেছ তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল কোনটা জানো? ঐ জিনিস পত্র গুছিয়ে রাখার অভ্যাসটা। ভাবীগৃহিনীর বৈঠক এর পারিচালিকা কে

তোমার কথা বলেছি শীঘ্র ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। মা, বাবা কেউ চিরকাল থাকেন না তো ভাই সুতরাং দুঃখ করোনা বোনটী বুঝেছ? তোমার বয়স এর কথা যা লিখেছ তার উত্তর আমি তো আগে দিয়েছি ভাই। তোমার বন্ধু পেয়েছ তো? দেখ বন্ধু পেয়ে তোমরা দিদিভাইকে ভুলে যাবে না তো?

রেণুকা ঘোষ (দাঁতন)

তোমার দুটো চিঠিই পেয়েছি। গ্রাহিকা নম্বর দাও নি কেন? হাতের লেখার কথা বলেছ—রোজ চারপাতা করে হাতের লেখা করো তাহলেই খুব চমৎকার লেখা হবে। তোমার বয়স ১২ বছর তা তা আমি চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছি। সুজাতা রক্ষিত কে বলবো—তুমি ও তোমার অন্য ভাইবোন T B. সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। আমার ছবির কথা পূর্ব্বেই তো বলেছি ভাই।

প্রদ্যোত মুখোপাধ্যায় (বালীগঞ্জ) গ্রাঃ ১১০০।

তুমি রংমশাল দলের জন্য যে মতামত পাঠিয়েছ সেগুলি আমার ভাল লেগেছে। আমরা পরে বিবেচনা করে জানাবো তোমাকে।

জীমূত বাহন রায় (কলিকাতা)

তোমার বাড়ী যাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি ভাই। আশাকরি লেখনী বন্ধু পেয়েছ!

রাজিয়া (ময়মনসিং) গ্রাঃ ৮৬০।

তুমি যাদের ঠিকানা চেয়েছিলে পেয়েছ তো? যখন চিঠি লিখবে পুরো নাম ঠিকানা গ্রাহক নম্বর না দিলে বড্ড অসুবিধা হয়। হ্যাঁ। দুই বন্ধুর এক গ্রাঃ নম্বর চলবে কিন্তু যখন ব্যাজ নেবে তখন দুজনের আলাদা নিতে হবে। রংমশাল সম্বন্ধে যা জানিয়েছ আমি পরিচালক মশাইকে জানাবো। তোমার হাতের লেখাটী সত্যি খুব চমৎকার ভাই। রংমশাল দলের ভর্ত্তি হলে ঐ কুপনটী বই থেকে কেটে নিয়ে ভর্ত্তি করে পাঠাবে।

মায়া সেন (কলিকাতা)

না বোনটী, আমাদের রাজ্যে ওরকম কড়া আইন নেই সুতরাং ১৮ বছর হলেও তুমি অনায়াসে আসতে পারো। গ্রাহক নম্বরটা দুই ভাইবোনের নামে করিয়ে নিলেই হবে। তোমার পাঠান বিলিতি বান্ধবীদের ঠিকানা আমি আমার অনেক বোনকে দিয়েছি। তোমার ছোট ভাইকে তার নালিশ অবশ্য জানাতে বলবে। তোমার দিদির অভাব পূর্ণ হয়েছে তো?

মোহন গুপ্ত (হাওড়া) গ্রাঃ ৮৪০।

তোমার জিজ্ঞাসা বিষয় আমি আগেরবার শুভেন্দুর চিঠির ভিতর জানিয়েছি—আশাকরি তা পড়েছ, সেইজন্য আর কিছু বলবার দরকার নেই।

সুব্রত দাসগুপ্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮৮৮।

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ রাগ করেছি কিনা, না এখন আর রাগ নেই—চিঠি লিখেছ বলে। তোমার লেখনীবন্ধু পেয়েছ তো? দেখো দিদিভাইকে ভুলে যেওনা যেন।

শান্তিলতা বসু মল্লিক (হাওড়া) গ্রাঃ ৭৩৫ ।

তুমি নিশ্চয় খুব রাগ করেছ দিদু নয় ? কিন্তু কি করব বলো—কিছুতেই স্থান পাইনা সবার চিঠির উত্তর দেবার। তোমায় খুব আদর করে ডেকে নিয়েছি ভাই। রাঁধতে পারো লিখেছ—কিন্তু তার প্রমাণ কবে পাবো বলতো? তোমার জন্মতারিখ ১৩২৯ সালের ১০ই পৌষ—তাই বুঝি বসে বসে ভাবছ—আমার চেয়ে বড় তুমি? লেখনীবন্ধুতো গেছে—পেয়েছ ?

সুরমা সমর (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯২১ ।

তোমরা আমায় বেমালুম দোষী করে ফেলেছ, পাগল, তোমাদের আমি ভুলতে পারি? স্কুলে পড়না বলে লেখনীবন্ধু পাবেনা একথা কে বলেছে, লেখনীবন্ধু তো অনেকদিন তোমার বাড়ী গেছে। লেটারবক্সটা খোলনি বুঝি অনেকদিন? হাঁ আমার নমস্কার মাকে জানিও।

শোভা সেন (ভাগলপুর)

গ্রাঃ নম্বর দাওনি যে? কে বলে তোমার নাম খারাপ—ভারী মিষ্টি নাম, তোমারি উপযুক্ত। আচ্ছা শোভা তুমি যে দিদি পেলে তার জন্য আমায় পুরস্কার দেবে না? বন্ধু পেয়েছ বলে বুঝি চুপকরে আছ?

শিবাণী সরকার (কলিকাতা) গ্রাঃ ৪০৮।

তোমার দ্বিতীয় চিঠি পাওয়ামাত্র লেখনীবন্ধু পাঠিয়েছি—নিশ্চয় আর কোন অনুযোগ, অভিযোগ দুর্য্যোগ বাধিয়ে তুলবে না—কারণ তাতে সুযোগ হবে কি ভাই? পরীক্ষা কেমন হলো? ফটো তুলে পাঠাবে জেনে খুব খুসী হয়েছি।

হীরেন রায় (রাঁচী) গ্রাঃ ৯৮৮।

তোমার বন্ধু শীঘ্র যাচ্ছে ভাই। তোমার মা নেই শুনে বড় দুঃখ হলো—এই তোমার কত ভাই বোন করে দিলাম—এতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না? তোমার ১২ বছর বয়স ক্লাস VIIএ পড়ো তা, আজি জেনেছি।

রেবা মুখার্জ্জী (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০৭৬।

তোমার চিঠি ঠিক সময়ে পেলেও উত্তর দেরীতে যাচ্ছে বলে রাগ করোনা ভাই। তোমার চিঠি ও হাতের লেখা খুব ভালো। লেখনী বন্ধু পেয়েছ তো?

রবীন্দ্র নাথ মিত্র (দার্জ্জিলিং) গ্রাঃ ১০৭৭।

তুমি কার সঙ্গে ভাব করতে চাও জানিও করে দেবো। আসরে যোগ দিতে তুমি নিশ্চয় পারো আমিতো বলেছি—ভয় করবার কিছু নেই। আর দিদিভাই তো সকলেরই—সুতরাং তোমার অবশ্যই জোর আছে।

অলক ঘোষ (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৭৬।

তোমার একটি চিঠি মাত্র আমি পেয়েছি ভাই। তুমি অনুযোগ করেছ—কিন্তু চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে না পারলেও ভ্রান্তি স্বীকার করে নিতাম। তোমাদের ব্যাজ এতদিনে পেয়েছ তো?

চিঠির বাক্স

দিদিভাই

আষাঢ়, ১৩৫৫

আনোয়ারা বেগম (বারাকপুর) গ্রাঃ ১১০৯।

আন্নু! তোমার সুন্দর চিঠিটা পেয়েছি। তোমার বয়স পনেরো বছর--এবং এরই মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে বলে ভাবছ আশ্চর্য্য হবো, কিন্তু তা আমি মোটেই হইনি। চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরী হলেও লেখনীবন্ধু তো আগেই পেয়েছ ভাই।

সুমেন্দ্র নাথ মৈত্র (হুগলী) গ্রাঃ ১০৫৬।

বুকু! গ্রীষ্মের ছুটীতে ভয়ানক হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছ নিশ্চয়? সেইজন্য এতদিন লেখনীবন্ধু করে দিইনি। স্কুল খুললেই লেখনীবন্ধু যাবে। তোমার বয়স ১১ বছর আর দেশ বিদেশের খবর জানতে চাও তা আমি জেনেছি ভাই!

লীলা বিশ্বাস, সুনীল সিদ্ধান্ত, পবিত্রগুপ্ত, সুনীলকুমার সেনগুপ্ত, অবনীকুমার বসু,, কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাধনা ও গোপাল, দেবলা ঘোষ, সচ্চিদানন্দ সেনগুপ্ত, রামমোহন ভট্টাচার্য্য, ইলা ব্যানার্জ্জী, বিনয়চন্দ্র পান্নালাল চৌধুরী, হরিদাস সরকার, লতিকা সেন, নীলিমা চক্রবর্ত্তী; তোমাদের চিঠি আমি পেয়েছি, তোমরা যারা লেখনীবন্ধু চাও তাদের পাঠাচ্ছি এবং পাঠিয়েছি। আরও যদি কিছু জানবার বা জানাবার থাকে, ভাই, তাহলে চিঠি লিখো আমায়।

হৃষীকেশ তোমার পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার খবর পেয়ে সুখী হলাম। 'মিষ্টান্ন মিতরে জনা' হবে নিশ্চয় ভাই?

সুজাতা রক্ষিত! বোনটী, তোমার চিঠি পেয়েছি---যা বলেছ তার ব্যবস্থা করে দেবো তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নিজে বুঝি জানাতে নাই কেমন আছ? চিঠে লিখো শীঘ্র, কেমন?

শৈলেন্দ্রকুমার নাথ, মণিমালা মজুমদার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল সরকার, জগদীশ দাস, তুষারকান্তি দত্ত' অঞ্জলি আচার্য্য, শ্যামলকুমার ভট্টাচার্য্য, অঞ্জলি সেনগুপ্তা, মোহিতভদ্র, দুর্গাচরণবসু অজয়কুমার ঘোষ, তোমাদের চিঠির উত্তর পরের বার যাবে। ব্যাজএর জন্য যারা লিখেছ তারা যদি এতদিনেও ব্যাজ না পেয়ে থাকো—আমি খবর নিয়ে যাতে ২।১ দিনের ভিতর পাও তার ব্যবস্থা করছি। পরিমল সরকার ভাইএর সব চিঠি পেয়েছি। তোমরা সকলে আমার স্নেহাদর, প্রীতি ভালবাসা নিও।

ইতি— তোমাদের—

দিদিভাই

ভাবীগৃহিণীর বৈঠক

শ্রীইন্দিরা দেবী

আদরের ছোট্ট বোনেরা !

গতবারে তোমাদের কাছে কি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তা বোধ হয় মনে আছে তোমাদের? সাধারণ সুস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তোমাদের একান্ত দরকার—এ নিয়ে আলোচনা করতে করতে প্রশ্ন উঠেছিল--মেয়েদের ব্যায়াম করা উচিত কিনা?

সাধারণ চোখে প্রশ্নটা নেহাৎ বাজে ঠেকতে পারে কিন্তু এদিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দেবার সময় এসে পড়েছে বলে মনে হয় আমার। সংসারে মেয়েদের খুটি নাটি কাজ করতে হয়, এদিক দিয়ে খানিকটা শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হয়—কাজেই অনেকে বলেন মেয়েদের ব্যায়ামে প্রয়োজন নেই। এখানে আরো একটা কথা ভাবা দরকার, সাধারণতঃ ব্যায়াম ব্যাপারে পুরুষেরা যে প্রণালী অনুসরণ করে থাকেন সে প্রণালী মেয়েদের পক্ষে কি হিতকর? মেয়েদের যে নিজের শরীর সুস্থ সবল রাখবার জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে—একথা আজ কাল কেউই অস্বীকার করেন না। দেহকে সুগঠিত রাখবার জন্য মেয়েদের ব্যায়াম করা দরকার কিন্তু সে ব্যায়াম পুরুষ প্রণালী অনুকরণে নয়। অথচ একথা আমরা কেউই স্মরণে রাখি না—তার ফলে মেয়েদের শারীরিক গঠন আহত হয়ে পড়ে। তোমাদের ভিতর অনেকেই নিজের দেহের দিকে তাকাও না, যত্ন নাও না, যেমনটি যত্ন নাও ক্লাস প্রমোশনের পর নতুন চকচকে বইগুলোর উপর! যেন ধুলো না লাগে, ময়লা না হয়, মলাট দাও—আরও কত কি কর! কিন্তু নিজের শরীরের বেলা দূর থাক গে ছাই! স্নান করবার সময় কই? স্কুলের বাস এসে দাঁড়িয়ে আছে—কাজেই নাকে মুখে কোনও রকমে গুঁজে তো বাসে ওঠা যাক!

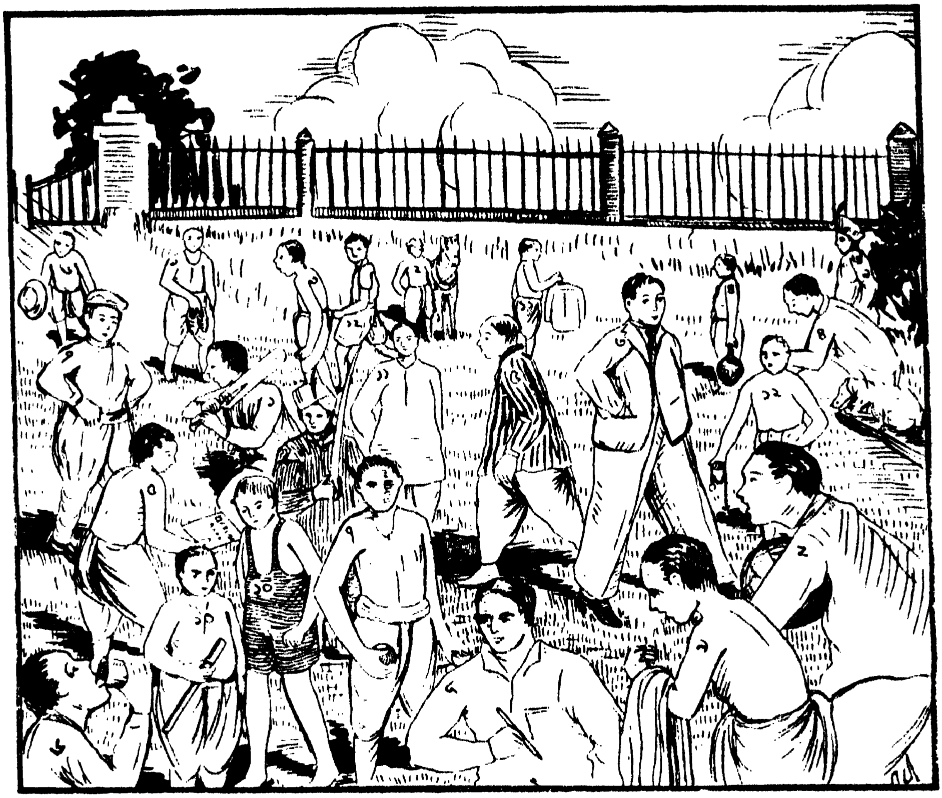
আমাদের প্রত্যেক ব্যাপারটার পিছনে কেমন একটা নির্ব্বিকার ভাব আছে—'যা হচ্ছে হোক' এই মনের ভাব আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ভাব যেন তোমাদের অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারে। আহার ও স্নানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া মানে 'টয়লেট' করা নয়—একথা মনে রেখো।

তোমরা তো জানো শরীর যন্ত্রের মত! যে সব উপাদানে আমাদের শরীর গঠিত কারুর কোনও একটার অভাব হ'লেই আমাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত আমাদের অবস্থা—জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্ব্বদিক দিয়ে চলছে দুরারোগ্য ব্যাধির বীজাণুদের ষড়যন্ত্র আর গোপন অভিযান—এদের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, সুস্থ থাকতে হয়। এ অবস্থায় আমরা যদি আমাদের দিকে না তাকাই তাহলে আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? নতুন চকচকে বইগুলো যত্নের অভাবে পোকায় কেটে কুৎসিত ও বিকৃত করে দেয়—আমাদেরও এ অবস্থায় আসতে দেরী হয় না—তার ফলে আমরা ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে পড়ি, সংসারে অশান্তি আসে। যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেলে যেমন প্রয়োজন হয় মিস্ত্রির—তেমনি এ দেহ আমাদের বিকল হয়ে পড়লে প্রয়োজন হয় ডাক্তারের। তখন গরজ পড়ে, খাওয়া দাওয়ার ইত্যাদির ওপর আমরা একটু চোখ রেখে থাকি—কিন্তু সপ্তাহ না পেরুতেই আবার যে কে সেই না রাম না গঙ্গা। ডাক্তাররা মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন না—শরীরকে সুস্থ রাখবার সুশক্তি আমাদের ভিতর ঘুমিয়ে থাকে—ডাক্তারের কাজ সেই লুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা।

তোমরা সকলে আমার স্নেহ ভালবাসা নিও।

নূতন ধাঁধা

কা'র চাকর ?



ওপরের এই ছবিটিতে ১২টি ছেলে তাদের চাকরের সঙ্গে পার্কে খেলা করতে এসেছে, দেখান হয়েছে। ছেলেগুলিকে দেখে এবং চাকরদের দেখে বল্‌তে পার কি, কোন্ ছেলের কোন্ চাকর ? প্রত্যেক ছেলের একটি নম্বর আছে, চাকরদের ও একটি ক'রে নম্বর আছে। কত নম্বরের ছেলের কত নম্বরের চাকর বলে দাও ; কি কারণে এটা ঠিক কর্‌লে তা'ও বল্‌তে হবে।

নতুন প্রতিযোগিতা

এবারকার নতুন প্রতিযোগিতা তোমাদের দেওয়া হল—প্রথম-কাহিনী রচনার প্রতিযোগিতা। তোমরা হয়ত অনেকেই এই গরমের ছুটীতে কোথাও বেড়িয়ে এসেছ বা আগের কোন ছুটীতে কোথায় গিয়েছিলে—দূরে হোক কাছে হোক তার প্রথম কাহিনী এবার তোমাদের লেখবার প্রতিযোগিতা হবে। মনে রাখতে হবে ভ্রমণ-কাহিনী বেশী বড় হলে চলবে না। বেশ ঝর ঝরে গল্পর মতন করে লিখতে হবে আর ছোট্ট করে—রংমশালের ২।৩ পাতার বেশী যেন না হয়। সঙ্গে যদি ছবি দিতে পার ভালই তবে যে ছবি থাকবেই তার কোন মানে নেই। এতে ছুটো পুরস্কার থাকবে একটি ছোটদের (১২ বছরের নীচে) আর একটি বড়দের জন্য। লেখার সঙ্গে নিজের নাম—বয়স গ্রাহক নং (বা এজেন্টের নাম) ও অভিভাবকের স্বাক্ষর দিয়ে পাঠাবে। পাঠাবার শেষ দিন ২৮শে আষাঢ় মনে রাখবে।



বঙ্কিমচন্দ্র

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী মহাশয়ের সৌজন্যে]

রংমশাল

দ্বিতীয় বর্ষ
দশম সংখ্যা

শ্রাবণ
১৩৪৫

মায়ের ঘরের একটি ছবি

শ্রীসতীকান্ত গুহ

১

মায়ের ঘরে একটি ছবি, নিঝুম বেলাতে
হঠাৎ হাসে হঠাৎ কাঁদে আলোয় ছায়াতে
এই ছবিটা কে ?
বলবে আমাকে ?
খুকু তুমি চুপটি করে কানে কানে শোনো,
সেই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

২

মাথায় টুপি টুকটুকে লাল, চোখ জোড়াটি বাঁকা,
গোঁফ জোড়াটি সাদা মেঘের রঙ্‌টি দিয়ে আঁকা।
নাকটি যেন কাকাতুয়ার, ঠোঁটটি কমলরাঙা,
লম্বা মুখে তোবড়ানো গাল, চিবুক আধো-ভাঙা।
কাঁধে লাঠির আগায় বাঁধা একটা পুটুলি,
ফকির যেন দাড়িটি তার বেজায় মামুলি।

একটি হাতে আজব বাঁশী ধরচে মুখেতে,
হঠাৎ যেন উঠবে বাঁশী পঞ্চমে মেতে।
এই ছবিটা কে ?
বলবে আমাকে ?
খুকু তুমি চুপটি করে কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

৩

মায়ের ঘরে দুপুর বেলা আধেক অন্ধকার,
খানিক দূরে বাগানেতে পায়ের সাড়া কার ?
হঠাৎ হাওয়া শিরশিরিয়ে সুরটি তুলে যায়,
কাঠবেড়ালী উঠতে গাছে মুখটি তুলে চায়।
এদিকেতে ঘরের মাঝে আঁধার-মাখা আলো,
দেয়ালেতে কাদের ছায়া একটু যেন কালো।
তাদেরসাড়া পেয়ে হঠাৎ টিকটিকিটা ঠিক,
ঘড়ির কাঁটার মতন বলে টিকটিকাটিক টিক।
তখন হঠাৎ হাওয়া এসে কাঁপবে জানালায়,
নীলরেশমের পর্দ্দাখানা আধেক উড়ে যায়,
হঠাৎ যেন ছবির চোখে ক্ষণেক জাগা হাসি,
বাজে যেন মুখে ধরা তুলির আঁকা বাঁশী।
এই ছবিটা কে ?
বলবে আমাকে ?
খুকু তুমি চুপটি করে' কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

৪

মায়ের ঘরে বিকেল বেলা রাতটি চলে' আসে,
যখন বেলাশেষের আলো বাইরে নাচে ঘাসে।
দিনফুরানোর গানটি যখন রঙিন হয়ে যায়,
বিকেল বেলা সিঁদূরমাখা আলোর ঝরোণায়।

মায়ের ঘরের একটি ছবি

শ্রীসতীকান্ত গুহ

তখন আসে মায়ের ঘরে চাঁদ-লুকনো রাত,
ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে কারা বুকটি করে ছাৎ।
কারা যেন চুপি চুপি বলে "আসি আসি,
ছবি তুমি চুপটি কেন? বাজাও তোমার বাঁশী।"
তখন কোথায় হাওয়া এসে ছবির গায়ে লাগে,
চোখটি মেলে' ঘুম ভেঙে সে তখন যেন জাগে।
হঠাৎ ক্ষ্যাপা ছবির চোখে উছলে ওঠে হাসি,
বেজে ওঠে মুখে-ধরা তুলির আঁকা বাঁশী।
এই ছবিটা কে?
বলবে আমাকে?
খুকু তুমি চুপটি করে' কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো

মায়ের ঘরে রাতদুপুরে ঝিমিয়ে পড়ে আলো,
জানলা দিয়ে লুটোয় এসে দূর আকাশের আলো।
তখন কারা গুণগুণিয়ে বলে "আসি আসি,
আসি আসি আসি ছবি আমরা আসি আসি।"
কে আসেরে এমন করে আঁধার মাখা রাতে?
ঘুমোয় যারা দিনের আলোয় আকাশ সীমানাতে
অন্ধকারে ঘুমটি ভেঙে তখন দলে দলে
জলে স্থলে হাওয়ায় তারা মিছিল বেঁধে চলে,
তাদের গানে রাতদুপুরেও দিনটি যেন জাগে,
বুকেতে তার কোন্ ক্ষ্যাপাদের সুরের ছোঁয়া লাগে
তখন যেন ছবির চোখে চম্‌কে ওঠে হাসি
বেজে ওঠে মুখে-ধরা তুলির আঁকা বাঁশী।
এই ছবিটা কে?
বলবে আমাকে?

খুকু তুমি চুপটি করে' কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

৬

শেষপ্রহরে ঘণ্টা বাজে ঢং ঢঙা ঢং ঢং,
নীল আকাশে হিলিমিলি মেঘ-সায়রের রঙ।
তখন যেন মায়ের ঘরে কাদের খেলাঘর,
রাতের ছায়া ছোঁয়ায় আলো সেই সে খেলার পর।
অচিন দেশে আড়াল হয়ে লুকিয়ে যারা থাকে,
সেই খেলাটি হাতছানিতে সবায় যেন ডাকে।
সেই খেলাতে আকাশ থেকে লুকিয়ে আসে কারা,
সেই খেলাটি খেলতে আসে নেই-কখনো যারা।
নেই কো এখন ছিল কভু, তারাও আসে আসে
মৃত্যু নদীর ঢেউটি ঠেলে, স্বপন চোখে হাসে।
তখন ক্ষ্যাপা ছবির চোখে ফিনিক জ্বলে হাসি
বেজে ওঠে গোপন সুরে তুলির আঁকা বাঁশী।
এই ছবিটা কে?
বলবে আমাকে?
খুকু তুমি চুপটি করে কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

৭

হটাৎ বাজে পূব আকাশে ভোরেরি রোস্‌নাই,
রাতের তারা চমকে গিয়ে বলে যে 'যাই যাই।'
তখন মায়ের খেলাঘরে বাজে ছুটির বাঁশী,
খেলার পরে খেলা ফুরোয় ঝরা পাতার রাশি।
আঁধার রাতের পথিক সবে ঘরের পানে চায়,
হেসে বলে, 'ছবি যদি সঙ্গে যাবে আয়।'
কেমন করে যাবে ছবি, বন্দী রঙেতে,
বলে আমায় 'হায় বোলোনা সঙ্গেতে যেতে।

কেমন করে আসবো আমি, রঙের খাঁচাতে
তার চেয়ে নয় ঘুমিয়ে পড়ি ভোরের বেলাতে।
সকাল বেলা ছবির চোখে মিলিয়ে আসে হাসি,
চুপটি করে থাকে তখন তুলির আঁকা বাঁশী।
এই ছবিটা কে ?
বলবে আমাকে ?
খুকু তুমি চুপটি করে' কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

৮

আড়ালেতে লুকিয়ে থাকে এমনি করে তারা,
দিনের আলোয় ছায়া হয়ে মিলিয়ে রয় যারা।
চোখে যারা দেয়না ধরা, বাঁধবে মনে বাসা,
অন্ধকারে স্বপন-পথে তাদের যাওয়া আসা।
তারা আসে আঁধার রাতে তারার আলোতে,
তাদের আলো জেগে ওঠে রাতের কালোতে।
তাদের খেলা ঝুলন দোলা স্বপন লগনে,
ঘুমিয়ে পড়ে' জাগা তাদের আজব ধরণে।
দিনের আলোয় বোবা যারা, মুখের কথা ক'য়ে,
খেলে তারা গোপন-খেলা পুতুল ছবি লয়ে।
তাদের হাতে আছে যেন সব জাগানোর বাঁশী,
ফুটে ওঠে ছবির মুখে ভেল্কি-করা হাসি।
সেই ছবিটার সঙ্গে আছে এদের চেনাশোনা,
খুকু আমার এ-সব কথা স্বপ্নে জেগে শোনা।

নোবেল প্রাইজ
ও
আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল

শ্রীঅনিলকুমার দাসগুপ্ত

তোমরা অনেকেই জান যে বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক রমণ পেয়েছেন এবং সেজন্য তাঁদের প্রতিভা আজ বিশ্বের সম্পত্তি। এই পুরস্কার সম্বন্ধে কিছু জানলেও যে মহাত্মা এত বড় একটা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে বোধহয় কিছু কিছু জান। এই পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল।

আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের রাজধানী ষ্টক্‌হোল্‌ম্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইম্যানুয়েল ছিলেন একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও আবিস্কারক। পিতার প্রকৃতি তিনি পেয়েছিলেন তাই তিনি ও তাঁর ভাই বিস্ফোরক জিনিষ নিয়ে কাজ করতে খুব ভালবাসতেন—ক্রমে তিনি বিস্ফোরক "ডিনামাইট্" আবিস্কার করেন।

আলফ্রেড কোনদিন কোন বিদ্যালয়ে যাননি, তাঁর শিক্ষা হয় ঘরে বসেই। তিনি পরে ব্যবহারিক রসায়ণ শাস্ত্রে (applied chemistry) বিশেষভাবে রত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উপ্‌শালা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি. এইচ. ডি উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নোবেলের পিতা ইম্যানুয়েল তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে চ'লে গেলেন রুশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গ সহরে। এই সময় তাঁর উন্নত ধরণের আবিস্কারে মুগ্ধ হ'য়ে রুশ্ সরকার পরীক্ষা চালাবার জন্য তাঁকে রসায়ণাগার স্থাপনের উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন।

ইম্যানুয়েল তাঁর ছেলেদের নিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্যের উন্নতির ও নাইট্রো গ্লিসারিন্ নামে একটি পদার্থের নির্ম্মাণ কৌশল আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষা চালাতে লাগলেন; কিন্তু নাইট্রো-গ্লিসারিন আবিষ্কারের সৌভাগ্য তাঁর হ'ল না—এর যা' কিছু বাহাদুরি সবই পেয়ে গেল একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক। এই নাইট্রো-গ্লিসারিন্ (যার নাম হ'ল ব্লাষ্টিং অয়েল) সামান্য মাত্র ধাক্কাতেই বিস্ফোরিত হয়। একবার একটা জাহাজ এই ব্লাষ্টিং অয়েল নিয়ে যাবার সময় বিস্ফোরণের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আর তার ফলে সমস্ত সভ্য জগতে একটা আলোড়ন

উপস্থিত হয়। এমনি সময়ে আলফ্রেড নোবেল এই অসুবিধার প্রতিকারে মনোনিবেশ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ব্লাষ্টিং অয়েলকে কোন কঠিন বস্তুতে পরিণত করতে পারলেই কাজ হ'বে। তাই তিনি নানা পরীক্ষার পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ডিনামাইট্ আবিষ্কার করলেন; কিন্তু এই আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে রইল একটা বিষাদের স্মৃতি। এই সময়েই ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে তিনি তাঁর প্রিয় ভাই অস্কারকে ইহ জীবনের মত হারালেন।

এ'দিকে নোবেল কিন্তু ডিনামাইট্ আবিষ্কার করেও সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তিনি এমন একটা জিনিষের সন্ধান করতে লাগলেন যার সঙ্গে নাইট্রো-গ্লিসারিন মিশিয়ে দিলে মাড়ের (paste) মত একটা জিনিষ হয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের দেখা যায় অনেক সময় তাঁরা ভাগ্যক্রমে কোন কোন জিনিষের আবিষ্কার করেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিরূপণ, আরকিমিডিসের হিয়ারো রাজার স্বর্ণ-মুকুটের খাদের পরিমাণ নির্ণয়, রঞ্জনের রঞ্জনরশ্মি (X-ray) ও জগদীশচন্দ্রের জড়ের প্রাণ আবিষ্কারের মূলে আছে বিশেষ বিশেষ ঘটনা। নোবেলের বেলাও ঠিক তেমনি ঘটনাই ঘটলো। একদিন নিয়মিত পরীক্ষা চালাবার সময় হঠাৎ তাঁর হাত কেটে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে কয়েক ফোঁটা কলোডিয়ন লাগিয়ে দেন। তখনি তাঁর মনে হ'ল নাইট্রো-গ্লিসারিণের সঙ্গে কিছু কলোডিয়ন মিশিয়ে দেখাই যাক না কি হয়। এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাজে পরিণত ক'রে তিনি আশাতীত ফল লাভ করলেন। এই জিনিষকেই তিনি রূপান্তরিত করে এক রকম জিনিষ তৈরী করলেন ত'ার নাম হ'ল ব্লাষ্টিং জিলেটিন্। তাকে আবার রূপান্তরিত ক'রে তৈরী করলেন—'বেলিমাইট্'—এক রকম নির্ধূম গুঁড়ো (smokeless powder)।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে 'নোবেল এণ্ড কোং' নামে একটি কোম্পানি খোলা হয়। তারপরে নানা স্থানে আরও কতগুলো কোম্পানি খুলে নোবেল অপর্য্যাপ্ত নাইট্রো-গ্লিসারিন তৈরী করতে লাগলেন। ক্রমে তিনি বাঁকুর (রুশ দেশে) তৈল খনির উন্নতি বিধানের জন্য বড় ভাইদের সঙ্গে মিলে একটি কোম্পানি স্থাপন করলেন। এমনি ক'রে আলফ্রেড নোবেল প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন; কিন্তু তার অধিকাংশই তিনি জনকল্যাণে ব্যয় করেন।

অস্কারের মৃত্যুর অনতি বিলম্বেই নোবেলের পিতা ইম্যানুয়েলের মৃত্যু হয়,—অবশ্য আলফ্রেডের মা অনেক বয়স পর্য্যন্ত বেঁচেছিলেন। আলফ্রেড কিন্তু পরীক্ষা-কাজের ফাঁকে-ফাঁকে যখনই সময় পেতেন তখনই মায়ের সেবায় রত থেকে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।

আলফ্রেড অনেক কারখানার মালিক ছিলেন বটে কিন্তু সাধারণ মালিকদের মত তিনি তাঁর মজুরদের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তা'দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।

আজীবন অবিবাহিত আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল নানা জন-হিতকর কার্য্যে রত থেকে ৬৩ বৎসর বয়সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর স্যান্ রেমো নামক স্থানে মৃত্যু মুখে পতিত হন।

মৃত্যুর সময় তিনি যে উইল্ করে যান, সেই উইলের ফলেই হ'ল নোবেল পুরস্কারের প্রবর্ত্তন। তাতে লেখা ছিল—আমি যে ৯০,০০,০০০ লক্ষ ডলার (১) রেখে গেলুম, তার সুদ থেকে প্রত্যেক বছর পাঁচটা ক'রে পুরস্কার দেওয়া হবে। রসায়ণ, পদার্থ ও ডাক্তারী বিদ্যা, সাহিত্য ও শান্তির জন্য যে' যে' লোকের দান সর্ব্বোচ্চ বিবেচিত হবে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় ৪০,০০০ হাজার ডলার পুরস্কার পাবেন।

এই নোবেল পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয় ১৯০১ খৃষ্টাব্দ থেকে। সর্ব্বপ্রথম যে পাঁচজন পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁদের নামগুলি তোমাদের জানিয়েই আজকের প্রবন্ধ শেষ করব। সাহিত্যের জন্য প্রথম পুরস্কার পান সালি প্রুধোম (ফরাসী) রাসায়ণের জন্য—জেকোবাস্ হেন্‌রিকাস্, পদার্থ বিদ্যার জন্য—উইল্‌হেল্‌ম্ কোনরাড্ রঞ্জন (জার্ম্মাণী), চিকিৎসার জন্য—এমিল ফন্ বোরিং (জার্ম্মাণী), এবং শান্তির জন্য পুরস্কার পান হেন্‌রি ডুনাণ্ট (জেনিভা) ও ফ্রেড্‌রিক্ পাসি (ফরাসী)।

(১) এক রকম মুদ্রা, ইহার দাম প্রায় ৩৵০, আনা

সময় নাই

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

কথায় বলে, "সময়ই টাকা" (Time is money). সময় বাঁচাতে পারলেই টাকা বাঁচান যায়। সে কেমন কথা? সময় না হয় বাঁচালাম, সঙ্গে সঙ্গে টাকাও বাঁচবে কেমন করে? অর্থাৎ, কম সময়ে কাজ করতে পারলে কাজের মজুরী কম পড়বে; অথবা, সময় যা' বাঁচবে তার সাহায্যে আরও টাকা রোজগার করা যাবে। কাজেই, যা'র টাকার দরকার, তাকে যথাসম্ভব কম সময়ে সব কাজ শেষ করতে হবে;—মোট কথাটা এই।

এ যুগের যত সভ্য মানুষ, সকলেরই দেখি টাকার দরকার; কাজেই সব কাজে সময় বাঁচানও দরকার। ফলে, কলিযুগের সব কাজেই তাড়াহুড়ো, সব কাজেই সময় বাঁচাবার নেশা হয়ে পড়েছে। কি রকম, একবার ভেবে দেখি!

সেকালে মানুষ হেঁটে	১০০	মাইল	যেতো	গড়ে	৩৩ ঘণ্টায়
গরুর গাড়ী চ'ড়ে	"	"	"	"	·৫
ঘোড়ার গাড়ী চ'ড়ে	"	"	"	"	১৫
রেলগাড়ী চ'ড়ে	"	"	"	"	৫
আধুনিক মেল ট্রেন চ'ড়ে	"	"	যায়	"	৩
দ্রুতগামী মোটরে চ'ড়ে	"	"	"	"	২
এরোপ্লেন চ'ড়ে	"	"	"	"	১

৩৩ ঘণ্টা থেকে ১ ঘণ্টায় নেমেছে; আধুনিক দ্রুতগামী এরোপ্লেনে ১০০ মাইল ২০।২৫ মিনিটেও যাওয়া সম্ভব। তা' ছাড়া এরোপ্লেন রাস্তার ধার ধারে না; গন্তব্যের দিকে সোজা নাক বরাবর উড়ে গেলেই হ'লো। ভবিষ্যতে নাকি ঘণ্টায় ৪।৫ শত মাইল বেগেও উড়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে! তখন ১২।১৩ মিনিটে ১০০ মাইল যাওয়া চল্‌বে।

স্থলপথে নানারকমের বাধা; তাই অত বেগে চলা যায় না। কিন্তু, রাস্তার উন্নতি ক'রে, মোটরের উন্নতি ক'রে, টায়ার ফাটার আশঙ্কা কমিয়ে, ভাল ব্রেকের (Brakes) ব্যবস্থা ক'রে,

মোটরের বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও বেশী যাওয়া যায়। রেলেরও বেগ বাড়িয়ে, বাতাসের বাধা কাটাবার ব্যবস্থা ক'রে ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশী যাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।



আধুনিক অতি দ্রুতগামী এঞ্জিন ও ট্রেন বাতাসের বাধা কাটিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ১২৫ মাইল বেগে চল্‌তে পারে

জলপথে, জাহাজেরও বেগ অনেক বাড়ান হয়েছে। বাতাসের এবং জলের বাধা কমিয়ে, এঞ্জিনের শক্তি বাড়িয়ে, এখন বড় বড় জাহাজও ঘণ্টায় ৩০।৪০ মাইল বেগে চলেছে। এই বিষয় নিয়ে এখনও নানা পরীক্ষা চলেছে। ভবিষ্যতের জাহাজের চেহারা বদ্‌লিয়ে অনেকটা চম্‌চমের আকারের হবে বলে মনে করা যাচ্ছে। ছোট ছোট জাহাজ জলের উপর দিয়ে চল্‌বার সময় শুধু জল ঘেঁষে যাবে—তার অধিকাংশ অংশ শূন্যেই থাক্‌বে। তা'র বেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কাজেই, সাগরপাড়ি অল্প সময়েই দেওয়া যাবে।

স্থলপথে চলার উন্নতির সঙ্গে রাস্তাঘাটেরও উন্নতি হচ্ছে। মোটরের গাড়ির বেগ খুব বেশী হওয়া চাই; কাজেই, তার জন্য আলাদা রাস্তাও চাই। মোটর-লরি বা মালবাহী মোটরে আজকাল বহু জিনিষ সরবরাহ করা হয়; তার জন্যও বেশ ভাল রাস্তা চাই। এই সব কারণে, রাস্তা তৈয়ারীরও বেজায় ধূম পড়েছে। এ ব্যাপারেও তর সয় না। বিরাট মাটিখোঁড়া কল, রাস্তা সমান-করা কল, দুরমুষের কল, এ সব লাগিয়ে শত শত মুটে মজুরের কাজ দু'একটি কলেই করছে, এবং চোখের সাম্‌নে "দ্যাখ্‌-দ্যাখ্‌" কর্‌তে কর্‌তে সুন্দর রাস্তা তৈয়ারী হয়ে যাচ্ছে।

তা'তেও কুলায় না। জঙ্গলের মধ্যে, রাস্তাহীন দুর্গম জায়গায় যাওয়া অনেক সময় দরকার হয়। যুদ্ধের সময়ও দরকার হয়। সেখানে মোটরে যাওয়াও চাই। কাজেই, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে "Catter pillar Tractor" (শুঁয়োপোকা মাল-মোটর) বানান হয়েছে। তার অনেকগুলি চাকা, এবং রবরের একটি "বেল্ট"এর মত জিনিষ দিয়ে সেগুলি ঢাকা। ঢালু, উঁচু নীচু, উবড়ো-খাবড়া জায়গা দিয়ে এই মোটর বেশ অনায়াসে যেতে পারে,—রাস্তার ধার সে ধারে না। এর সাহায্যে দুর্গম জায়গা থেকে মাল ব'য়ে নিয়ে আসা, জঙ্গলের রাস্তাহীন জায়গায় যাওয়া প্রভৃতি বেশ সহজ হয়;—অনেক সময় বাঁচে তার ফলে।


"শুঁয়োপোকা" মাল-মোটর—ইহার রাস্তা না থাকলেও পরোয়া নাই

মালবাহী বড় বড় মোটরের আজকাল এক নূতন ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। এর উপর ঘর বানিয়ে, দিব্যি দোকান সাজিয়ে গ্রামে গ্রামে চলন্ত দোকান নিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীর অনেক সুবিধা করে দিচ্ছে,—বিস্তর সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে। টাকা কিন্তু দোকানদার হাতে হাতে পেয়ে যাচ্ছে। হয়তো গ্রামবাসীও সময় বাঁচিয়ে কিছু বেশী টাকা রোজগারের সুবিধা করতে পারছে।

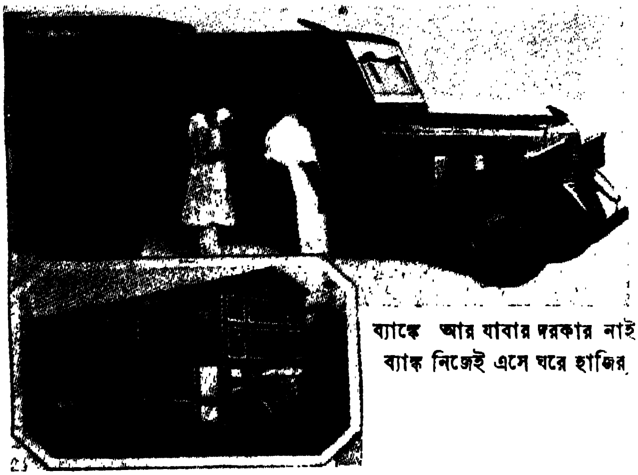
যেখানে যাও, সময় বাঁচাবার ব্যবস্থা। দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না;—আজকালের ব্যবস্থায় চলন্ত থাকের উপর জিনিষ সাজিয়ে সমস্ত দোকানটি তোমার চোখের সাম্নে ঘুরিয়ে আনা হবে। যেখানে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে যাও আর ইচ্ছামত জিনিষ বেছে নাও। হোটেলে গিয়ে, কলে পয়সা ফেলে দাও, অম্নি দেখবে একটা বড় ফুটোর ভিতর থেকে গরম 'খানা' বেরিয়ে এল। 'খানা' খেয়ে, প্লেট ইত্যাদি ফেলে দিলেই হ'লো (কারণ, প্লেট কাগজের, চামচ কার্ডবোর্ডের, জলের গ্লাসও মোটা কাগজের)। কলে পয়সা ফেলে এখন অনেক জিনিষই কেনা যায়;—ফল, তরকারী, চকোলেট, মিঠাই, ডাকটিকিট, সিগারেট, পত্রিকা, বই: আরো

কত কি। সবই কিন্তু সময় বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। কলে ওজন হয়ে, ওজনের ছাপা টিকিট পাওয়া যায়, তা' তো জানই ; কল থেকে আবার রেজ্‌কিও ভাঙ্গান যায়। কত সুবিধা বল তো ?—আসল কথা কত সময় বাঁচান যায় বল তো।



খেলনা মেরামতের চলন্ত দোকান হয়েছে। টেলিফোন করলেই এসে খেলনা মেরামত করে দিয়ে যাবে

ব্যবসায়ে সময় বাঁচানটাই সব চেয়ে বেশী দরকার। সেই ক্ষেত্রে রেষারেষিও সব চেয়ে বেশী। সেদিন ইংলণ্ডের একজন ব্যবসাদার মোটর-হর্ণ কিন্‌তে গিয়ে, কাগজে পড়্‌লেন আমেরিকার একটা কোম্পানী নাকি চমৎকার এক রকমের হর্ণ এই সদ্য বের ক'রেছেন। তার আওয়াজ তাঁর জানা ছিল না ; অথচ, আওয়াজ শুনে কিন্‌তে গেলে দেরি হবে ;—তার আগে যদি কেউ সে হর্ণ এনে ফেলে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়েছে। অম্‌নি তিনি টেলিফোনের আপিসে গিয়ে আমেরিকার সেই কোম্পানীকে টেলিফোন করে বল্‌লেন, "আপনাদের যে নূতন হর্ণ বেরিয়েছে, তার আওয়াজ একবার শুন্‌তে চাই।" কোম্পানীও সেখানে টেলিফোনের কাছে একটি হর্ণ এনে "ভপ্‌" ক'রে বাজিয়ে দিলেন। সাহেব হর্ণের শব্দ শুনে তখনই এক হাজার হর্ণের অর্ডার দিয়ে দিলেন। প্রায় ৪।৫ সপ্তাহ সময় বেঁচে গেল।



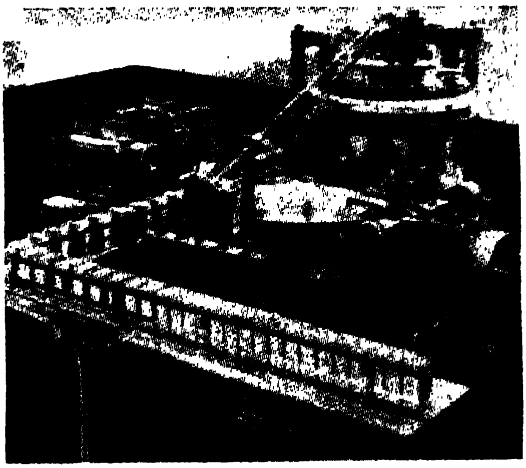
ব্যাঙ্কে আর যাবার দরকার নাই ব্যাঙ্ক নিজেই এসে ঘরে হাজির

বাড়ীও মোটরে চ'ড়ে চলে আজকাল। এটিতে শোবার ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর, বারান্দা আছে ; বৈদ্যুতিক আলো আছে ; রেফ্রিজারেটার আছে

কারখানায় গেলে দেখবে, চারিদিকেই সময় বাঁচাবার ব্যবস্থা। সব কাজেই কলের সাহায্যে চট্ পট্ হ'য়ে যাচ্ছে ; প্রকাণ্ড ঘরে সারি সারি কল, হয়তো ৫।৭টি লোকের সাহায্যে চল্‌ছে। জিনিষপত্র গুছান, বয়ে নিয়ে যাওয়া, এ সবও কলেই হচ্ছে ; মোড়ক মোড়াই, লেবেল লাগান, বোনা, মাপা, মিশান—এ সবও কলের সাহায্যে হচ্ছে। যাকে বলে "Untouched

by hand"—"হস্তের দ্বারা স্পর্শিত নহে"। সময় যে কত বাঁচ্ছে তার কোনও হিসাবই নাই ;—অবশ্যি, কারখানার মালিক জানেন।

সময় বাঁচানর কথা লিখ্তে বস্লে প্রকাণ্ড বই হয়ে যাবে,—তবুও সে কথা শেষ হবে না। যেদিকে তাকাই সময় বাঁচাবার ব্যবস্থা। খেতে বসেও নিস্তার নেই ;—সময় বাঁচাবার চেষ্টা সেখানেও। কিন্তু, তার ফল কি ভাল হচ্ছে ? স্বাস্থ্যের পক্ষে তাড়াতাড়ি খাওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর ;—এবং তার ফলও আমরা চোখের উপর দেখ্তে পাচ্ছি ;—অম্ল, অজীর্ণ, আরো কত রোগ। তাড়াতাড়ি চলার ফলে কত যে দুর্ঘটনা ঘট্ছে তার খবর নিতে গেলে চম্কিয়ে উঠ্তে হয়। এক মোটরের দুর্ঘটনায় প্রতিদিন যে কত লোক মারা যাচ্ছে আর জখম হচ্ছে তার কথা ভাবলেও ভয় হয়। কারখানায় দ্রুতবেগে কল চলার ফলেও কত দুর্ঘটনা ঘট্ছে!



এই কলের সাহায্যে যে-কোনও গুঁড়ো জিনিষ ওজন হয়ে, ঠোঙ্গায় ভর্ত্তি হয়ে, প্যাক্ হয়ে কল থেকে বেরিয়ে আসবে ;—একেবারে "হস্তের দ্বারা স্পর্শিত নহে

সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, অন্ধ লোভী মানুষ স্বার্থের বশ হয়ে পরস্পরে ঝগড়া করে যে ভীষণ ব্যাপার "যুদ্ধ" নামে সৃষ্টি করেছে, সেই যুদ্ধের ব্যাপারেও "সময় বাঁচাও" রব। বড় বড় কামান বানিয়ে প্রকাণ্ড গোলা মেরে দাও সব মুহূর্ত্তকে উড়িয়ে! দ্রুতগামী এরোপ্লেন থেকে ভীষণ বোমা ছেড়ে দাও সহর, গ্রাম সব উড়িয়ে! বিষাক্ত গ্যাস্ ছেড়ে দাও গ্রামকে-গ্রাম, সহরকে-সহর উজাড় ক'রে! একেবারে নিঃশেষে বিনাশ কর ;—ছেলেপিলে, মেয়েরা কেউ যেন বাদ না যায় !—এই হ'লো এ যুগের "মানুষ"এর কাণ্ড! এনাকি "সভ্যতা"র যুগের ব্যাপার!



চলন্ত দোকানটি খরিদ্দারের সাম্নে দিয়ে ঘুরে চলেছে—তাকের উপর সাজান সব জিনিষই ধীরে ধীরে সকলের সাম্নে দিয়ে যাবে

যেদিন মানুষ সরলভাবে বল্বে, "আগে মানুষ বাঁচাও, মনুষ্যত্ব বাঁচাও—তারপর সময় বাঁচাও," সেদিন পৃথিবীর বাস্তবিক সুদিন আস্বে।

সোজা হিসেব

শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

হাত-পা গুলো সরু সরু, মাথাটি বেশ বড়,—
বঙ্কুবাবু হিসেবে খুব দড় !
কাউকে কিছু দিতে হ'লে বঙ্কুবাবু পড়েন গোলে,
নেবার বেলায় কিন্তু হিসেব হয়না নড়চড় !
বঙ্কুবাবু হিসেবে খুব দড় !

সেদিন, শনিবারে তাঁহার বাজার সেরে যেতে,
ইচ্ছে হ'ল কমলালেবু খেতে !
ধীরে ধীরে অবশেষে হাজির তিনি হলেন এসে,
কমলালেবু বিকোয় যেথা, ফলের দোকানেতে।
ইচ্ছে হঠাৎ কমলালেবু খেতে !

শুধান্ তিনি, "মিঞাসাহেব, সস্তা লেবু আছে ?"
চিন্তা, বেশী খরচ না-হয় পাছে !
দাড়ির মাঝে হস্ত দিয়ে সব ক'পাটি দাঁত দেখিয়ে,
ব'ল্লে মিঞা, "বিস্সি কি দাম লিবো আপ্না কাছে।"
খরচা যেন না হয় বেশী পাছে !

যা' হোক্, বিশেষ তুষ্ট হ'য়ে, নিজের মনোমত,
বঙ্কুবাবু বাছেন গোটাকত !
মিঞা পরম আপ্যায়নে বলে, "বাবু, আজ্কে জোনে,
সোস্তা কোরে দিছি বোহুৎ, লিন্না খোসী যোতো !"
বঙ্কুবাবু নিলেন গোটাকত।

ছোট ছোট লেবুগুলো, রং ধরেনি তা'তে,
চারটে তা'রি তুলে নিয়ে হাতে,
বলেন, "মিঞা এইতো হ'ল, চারটে লেবুর দাম কি বলো!"
মিঞা বলে, তিন পোয়সা—হামারা এক বাৎ এ !"
বঙ্কুবাবু চারটে তোলেন হাতে।

চোস্ত হিসেব
শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

মিঞার কথা শুনে তিনি, তিনটে ফেরৎ রেখে,
একটি শুধু নিলেন ভালো দেখে।
মিঞা বলে, "কি বাবুসা'ব একঠো খালি লিয়ে কি লাভ!
কোমতি দোরে যাস্তি কোরে লিন্ না কেনো চেখে!"
বঙ্কুবাবু একটি নিলেন দেখে।

"একটা নিলেই হ'য়ে যাবে," দু'তিনবার কেশে,
বঙ্কুবাবু ব'লে দিলেন শেষে,
"বেশী নিয়ে কি আর হ'বে নিলেই হ'বে লাগবে যবে!"
"বোহুৎ আচ্ছা বাবুসাহাব্," ব'ললে মিঞা হেসে।
বঙ্কুবাবু আবার ওঠেন কেশে।

বগল চাপা ছাতাটিকে খুলে মাথায় ধ'রে,
সেই লেবুটি দিব্বি হাতে ক'রে,
মিঞার দিকে বারেক চেয়ে, নাকবরাবর রাস্তা বেয়ে,
বঙ্কুবাবু গুটিগুটি পড়েন সোজা স'রে—
লেবুটিকে হস্তগত ক'রে!

প্রথমতঃ মিঞাসাহেব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে,
খানিক সময় হাঁ ক'রে রয় চেয়ে!
তা'রপরেতেই চেঁচায় জোরে, "আরে লিম্বু-পোয়সা!" করে
বঙ্কুবাবু দাঁড়ান রুখে, শুনতে সে'সব পেয়ে!
অবাক্ মিঞা হাঁ ক'রে রয় চেয়ে!

ভীষণ চ'টে বঙ্কুবাবু জবাব দিলেন কী সে!
হিসেব শুনে মিঞা হারায় দিশে!
"তিন পয়সায় চারটে হ'লে দু'পয়সাতে তিনটে চলে,
দু'টো তবে একপয়সা, একটার দাম কিসে?"
"আল্লা" ব'লে মিঞা হারায় দিশে!!



আজব দেশ

শ্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ

রবিবার। রংমশালের লেখনী বন্ধুদের স্কুলের ছুটী; ভারী মজা। একে ছুটী—তায় আবার বিকেলের দিক্‌টায় কাল মেঘে আকাশ ছাওয়া; টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টিও সুরু হয়েছে। লেখনী বন্ধুরা কেউ আজ তাই মাঠে বেড়াতে যায়নি। সকলে যুক্তি করে দিদিভাইকে ঘিরে গোল হয়ে বসে আবদার জানিয়ে বল্লো:

"দিদিভাই আজ একটা গল্প বল্‌তে হবে,—খুব ভাল গল্প।"

লেখনী বন্ধুরা তাদের দিদিভাইকে সত্যিই বড় ভালবাসে; দিদিভাই-ও ভালবাসেন তাঁর লেখনী বন্ধুদের। তাই তাদের আবদার ফেল্‌তে না পেরে ঘাড় নেড়ে 'আচ্ছা' বলে দিদিভাই হেসে জিজ্ঞেস কল্লেন:

"ভূতের গল্প?"

"না, না দিদিভাই ভূতের গল্প বল্‌বেন না, আমার বড্ড ভয় করে।" লেখনী বন্ধুদের মধ্যে একজন ভয়েতে দিদিভায়ের কাছে সরে এসে বল্লো।

ঠিক হলো দিদিভাই আজব দেশের গল্প বল্‌বেন। সকলে আসর জম্‌কে ঠিক হয়ে বস্‌লো; চুপচুপ্ এইবার গল্প সুরু হবে। সকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠ্‌লো, সকলে হাসি হাসি মুখ নিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো গল্পবলা দিদিভায়ের মুখের দিকে।

গল্প আরম্ভ হলো:

"সাতসমুদ্দর তের নদীর পারে—দূরে--অনেক দূরে আজব রাজার আজব দেশ,—মস্ত বড় আজব দেশ।..."

সকলে "হু" বলে সায় দিলো। তারপর,...

আজব দেশ

শ্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ

"সাগরের মত তারও সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায়না। এই আজব দেশ ভারী সুন্দর,—যেমন সুন্দর চাঁদের হাসি, গোধূলির আবীর মাখা আকাশ,—যেমন সুন্দর শরতের শিশির ভেজা শিউলী, রামধনুকের রঙ,—আর যেমন সুন্দর সাগর বুকে ঢেউয়ের দোলা, হাওয়ার কোলে সুরের কাঁপন। সেখানে আছে সোনার পাহাড়...সোনার পাহাড়ের গায় রূপোলী তুষার ; ক্ষীরের সমুদ্র···ক্ষীরের সমুদ্রে ছোট বড় মাঝারি কত রঙ্‌বেরঙের মাছ······"

লেখনী বন্ধুদের মধ্যে একজন দিদিভায়ের থুঁতনিতে হাত দিয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগ্রহ-ভরে বল্লো :

"আমাদের বাড়ীতে মার ঘরে যে দেরাজ আছেনা—তার উপরে কাঁচের যে মস্ত বড় জার আছেনা... তাতে অনেক মাছ আছে, মাছ সব সময় খেলা করে বেড়ায়।"

দিদিভাই তার কথায় সায় দিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন—

"ঐ মাছেরাও খেলা করে···ছুটোছুটী খেলা। তারপর ; সেই আজব দেশে আছে সোনার গাছে সোনার পাতা···সোনার ফল ; হীরের ফুল গাছে হীরের কুঁড়ি···হীরের ফুল···হীরের ফুলে মণির আলো ; চুম্‌কির প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় তারই ডালে ডালে···পাতায় পাতায় : সেখানে আছে পারিজাতের ভ্রমর... ফিরোজারঙের পাখী,...পাখীর ডানায় ডানায় রাঙা রবির রাঙা আলো ; তাছাড়া·· সেখানে নাকি আছে প্রবালের মাটী,···সেই মাটীর বুকে সবুজ ঘাসের হাসি······

আহ্লাদে আটখানা হয়ে লেখনী বন্ধুরা হাততালি দিয়ে উঠলো ; বেনু জিজ্ঞাসু নেত্রে দিদিভায়ের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লো :

"হ্যাঁ দিদিভাই, সত্যি ?"

"হ্যাঁ সত্যি।" দিদিভাই উত্তর দিলেন।

গল্প ছেড়ে দিদিভাইকে অন্য কথা বল্‌তে দেখে রেণী লিলি একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে ; তারা মুখ কাঁচু-মাচু করে বল্লো :

"আর কি আছে বলুন না, দিদিভাই।"

দিদিভাই বল্‌তে আরম্ভ কল্লেন :

"মুক্তো ছড়ান বড় বড় রাস্তা...রাস্তার দু'ধারে সারি সারি সাজানো চুনি পান্নার অট্টালিকা ; ইন্দ্রনীল মণির একুশচূড়া আজব রাজার প্রাসাদ,···সেই প্রাসাদের দেওয়ালে দেওয়ালে জহরৎ বসান,...শঙ্খমালায় সাজানো তার দরজা···জান্‌লা। হাতীশালে আছে হাজার হাজার হাতী,···ঘোড়াশালে পক্ষীরাজ ঘোড়া,... আরো কত কি।......

আজব দেশের ছেলেরা সমুদ্রফেনার মত ধব্‌ধবে শাদা ; মেয়েরা গোলাপের পাপ্‌ড়ির মত লাল ; সকলেই ভারী হাসকুটে, তারা তোমাদের মত ভারী লক্ষ্মী ; সকলেই তোমাদের মত সকলের খেলার সাথী।

আর কি জানো ? তাদের সকলের তুলতুলে নরম ঠোঁটে লেগে আছে···ঝরে পড়ছে পদ্মমধুর মিষ্টি হাসি,... চোখের তারায় তারায় দুষ্টু ছেলের মত হেসে গড়িয়ে পড়ছে...লুটোপুটী খাচ্ছে রূপোলী চাঁদের চক্‌চকে... ঝক্‌ঝকে স্নিগ্ধ কিরণ ; তা'ছাড়া তারা হাস্‌লে মুক্তো ঝরে...কাঁদলে ঝরঝর করে মাণিক পড়ে।..."

মীনা জিজ্ঞাসা কল্লো :

"আমাদের মত তাদের গল্প বলা দিদিভাই আছে ?"

"হ্যাঁ আছে।"

"ঠিক আমাদের মত ?"

"হ্যাঁ।"

"ইস্‌···সে দিদিভাই হয়তো ভারী রাগী।" মীনা বিজ্ঞের মত মুখের ভাব করে বল্লো। দিদিভাই মৃদু হেসে বল্লেন :

"না মীনা...তাদের দিদিভাইও তাদের খুব ভালবাসেন···কারণ তারা খুব লক্ষ্মী কিনা।" তারপর···

"সেখানকার ছেলেরা মাথায় পরে ময়ুরের পালক...গলায় মৃণাল মালা ; আর মেয়েরা ? মেয়েরা ভারী সৌখীন কিনা...তাই তারা মাথায় পরে পোকরাজের সীঁথি,—সিঁথীর উপর মৌরী ফুলের মুকুট,...কানে হীরের ঝুম্‌কো···গলায় গজমতি হার...মতির হারে চুনির লকেট ; আঙুরের থোকার মত সোণার চুলে সাজিয়ে রাখে তারার ফুল,...কপালে পরে চাঁদের টিপ্‌···গায়ে জরির ব্লাউজ...জরির ফ্রক,···জাফ্‌রাণ রঙের কাপড়,···তাতে আছে রূপোলী জরির কল্‌কা,···পায়ে লাল জুতো,···লাল জুতোয় জরির আঁচড়।···

এমন সুন্দর আজব দেশের গল্প শুনেছে পরীর দেশের পরীরা তাদের পরী ঠাকুরমার কাছে,···আর শুনেছে রাজকন্যের সম্বন্ধে কত না কথা. শুনেছে রাজকন্যের নাম রূপকুমারী ; তার নাকি আছে বাঁশীর মত টিকোলো নাক,...ডাগর ডাগর কালো হরিণ চোখ,···চোখের কোলে মেঘের কাজল,···কপাল জোড়া টানাটানা ভুরু,···দুধে আলতা গায়ের রঙ,...পায়ের নোখে চাঁদের আলো। এইসব শুনে পরীদের হলো ভারী মন খারাপ ; একদিন হলো কি লাল...নীল···হল্‌দে...গোলাপী···বেগুনে পরীরা সভা করে বসলো তাদের ফুল বাড়ীতে ; ঠিক্ হলো তারা দল বেঁধে দেখতে যাবে আজব দেশ···দেখবে আজব দেশের রাজকন্যেকে···ভাব কর্ব্বে ঐ রাজকন্যের সঙ্গে।...

ফুট্‌ফুটে জোছনা রাত্তির ; লাল···নীল...হল্‌দে···গোলাপী...বেগুনে পরীরদল নানারঙের পাখা মেলে উড়ে চল্লো আজব দেশ দেখতে...দেখতে আজব দেশের রাজকন্যেকে ; প্রথমে উড়তে সুরু কল্লো বড় পরীর দল···তারপর মাঝারি···তারপর...তারপর সব চেয়ে শেষে উড়তে সুরু কল্লো ছোট পরীর দল।···"

পরীদের উড়তে শুনে লেখনী বন্ধুরা বিস্ময়ে...কৌতুকে হাতে তালি দিয়ে উঠ্‌লো এবং তাদের কলকণ্ঠ-স্বর বৈঠক ঝাঁকিয়ে তুল্লো। চুপ্‌···চুপ্‌,···সকলে চুপ কল্লো ; রেনী জিজ্ঞাসা কল্লো :

"পরীরা এখনও উড়ছে...এখনও···এখনও ?"

"হাঁ এখনও উড়ছে···" দিদিভাই রেণীর কথার উত্তর দিয়ে বল্লেন···

আজব দেশ

শ্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ

আজবদেশ অনেক দূর কিনা…তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা; পরীরা উড়ছে পাখায় পাখায় শন্…শন্ শব্দ করে…বাতাসের জোয়ার ঠেলে…ছায়া পথের সীমা ছাড়িয়ে…ধবল কালো মেঘের পাহাড় ভেদ করে…উড়ে আসছে সুখী চাঁদের মুখে চুমোর ছোঁয়া দিয়ে…হঠাৎ তাদের নজরে পড়লো…তাদের থেকে একশো হাত নীচে ঝলমলে একটা আলোর দেশ.. পরীরা জানে না যে ঐ আলোর দেশই গল্প শোনা আজব দেশ; শুধু তারা অনুমান করে নিলো; হল্দে পরীরা গোলাপী পরীরদলকে জিজ্ঞাসা কল্লো:

"ঐ কি আজব দেশ?"

"মনে হচ্ছে তাই,…দেখাই যাক্না।" গোলাপী পরীরা বল্লো। দেখতে দেখতে নিমেষের মধ্যে তারা পৌঁছে গেল আজব দেশে।

রূপকুমারীর শয়নকক্ষের সংলগ্ন ফুলের বাগান; পরীরা এসে নেমেছে ঐ বাগানে…রূপকুমারীর শয়নকক্ষের খোলা জান্লায় দেখলো কে একজন পরমা সুন্দরী মেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে সোনার পালঙ্কে রূপোলী জরির বালিশ মাথায় দিয়ে; শিয়রে…পাশতলায় ঘর আলো করে জ্বলছে রংমশাল।…ঘুমন্ত মেয়েকে দেখে তাদের রাজকন্যে রূপকুমারী বলেই মনে হ'তে লাগ্লো; কিন্তু কেউ নিশ্চয় করে মনে কর্ত্তে পাচ্ছে না: যদি না হয়।…



কে একজন পরমা সুন্দরী মেয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে সোনার পালঙ্কে…

নিশুতি রাত, হ্যাঁ অই রূপকুমারী,… না…কখ্খনো না—" এই নিয়ে পরীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি…জল্পনা-কল্পনা চল্ছিলো ভীষণভাবে; ক্রমে কথা কাটাকাটি ছেড়ে যেন মনে হলো তাদের মধ্যে বেশ একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠ্ছে; ঠিক তাই; চাপা কণ্ঠস্বর হলো উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ; তাদের এই উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ শুনে রাজকন্যের ঘুম ভেঙে গেলো; রাজকন্যে ধড়ফড়িয়ে উঠে দেখে কারা যেন তার ঘরের জান্লায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে; ঈষৎ ভয় হলেও রাজকন্যে জিজ্ঞাসা কল্লো:

"কে?"

পরীরা কেন…কি জানি, রাজকন্যের প্রশ্নের উত্তর দিলোনা; তারা যে যার মুখ চাওয়া চাই কর্ত্তে লাগলো; তাদের নিরুত্তর দেখে রাজকন্যে ভুরু কুঁচ্কে আবার জিজ্ঞাসা কল্লো:

"তোম্রা কারা, কি চাই…?"

বেগুনে পরী হেসে হেসে জবাব দিলো:

"আমরা পরীর দল···নাম-না-জানা···অচীন-দেশে বাড়ী।" এই কথা বলে তারা রাজকন্যেকে জিজ্ঞাসা কল্লো :

তুমি কে ভাই···কি নাম তোমার ?"

"রূপকুমারী...আজব দেশের আজব রাজার মেয়ে।" রাজকন্যে পালঙ্ক ছেড়ে শিয়রের রংমশালদীপ হাতে করে পরীদের দেখবার জন্যে এগিয়ে গেল খোলা জান্‌লার কাছে ; পরীদের মুখের সাম্‌নে রংমশালদীপ তুলে ধরে হাসিমাখা মুখে সকলকে বেশ করে দেখে নিলো, শেষে নরম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লো :

"তোমরা এই নিঃঝুম্ রাতে···নিজদেশ ছেড়ে...আজব দেশে কেন এসেছো ভাই ?"

লাল পরীদের মধ্যে যে সব চেয়ে ছোট্ট...সবচেয়ে হাসকুটে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে আদ্ আদ্ কণ্ঠে উত্তর দিলো :

"এতেচি 'আজব দেশ দেক্তে···এতেচি রাজকন্যের সংগে যে খেলতে।"

রূপকুমারীর ভারী আনন্দ হলো ; সে হেসে বল্লো :

"বেশ তো—"

পরীদের সঙ্গে রূপকুমারীর ভাব জমে উঠলো : কিন্তু শয়নকক্ষের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ; দাসদাসীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে ;···কে তাকে দরজা খুলে দেয়। রাজকন্যেকে নিরুপায় দেখে নীল পরীরা কি জানি কি মন্তর আওড়ে গেল ; দেখতে দেখতে···রূপকুমারী আর মানুষ রইলো না···ছায়া পাখী হয়ে ফুড়ুত করে জান্‌লা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ; বেরিয়ে এসে হয়ে গেল যে কে সেই মানুষ রূপকুমারী। নীল পরীদের মন্তরের এই অসম্ভব শক্তি দেখে রূপকুমারী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে রইলো ; নীল পরীরা হেসে উঠে বল্লো :

"মন্তরে ভাই সব অসম্ভব সম্ভব হয়।...

রূপকুমারী জিজ্ঞাসা কল্লো :

"এ মন্তর তোমাদের কে শেখালে ভাই ?"

"চাঁদি বুড়ী—" নীল পরীরা জবাব দিলো।

"আমায় শিখিয়ে দেবে ?"

হ্যাঁ,···আমরা লাল, নীল, বেগুনে, হল্‌দে গোলাপী পরীরা যে যা মন্তর জান সব শিখিয়ে দোবো।" নীল পরীরা ঘাড় নেড়ে এই কথা বল্লো ; সকলেই তারা মন্তর জানে শুনে রূপকুমারী লাল...নীল···হল্‌দে·· বেগুনে···গোলাপী পরীদের এক এক করে বলতে অনুরোধ জানালো। লাল পরীর দল হেসে বল্লো :

"সাগর শুকানো মন্তর।"...

নীল পরীরা বল্লো :

"ছায়া পাখী হওয়ার মন্তর।"

রূপকুমারী হল্‌দে পরীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে জিজ্ঞাসা কল্লো :

"তোমরা ভাই ?"

হল্‌দে পরীরা জানালো :

"ঐশ্বর্য্য বাড়ান মন্তর।"

"তারপর...তোমরা বেগুনে পরীরা ?" রূপকুমারী জিজ্ঞাসা কল্লো।

"মানুষ মারা মন্তর।" বেগুনে পরীরা ইতঃস্তত করে বল্লো।

বেগুনে পরীদের মুখে এই অলুক্ষুণে কথা শুনে রূপকুমারী আতঙ্কে শিউরে বল্লো :

"কি সর্ব্বনাশ !...কি নিষ্ঠুর মন্তর বাবা। আমি ভাই এ মন্তর শিখবো না।"

গোলাপী পরীরা রূপকুমারীকে ভয়ার্ত্ত দেখে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কল্লো :

"আমরা যদি বলি... যে আমরা মরা মানুষকে বাঁচান মন্তর জানি...তাহলেও কি ঐ মন্তর শিখবে না রূপকুমারী ?"

গোলাপী পরীদের মন্তরে যে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে শুনে রূপকুমারীর চোখ মুখ দিয়ে এক ঝলক হাসি গড়িয়ে পড়ে ঢেউ খেলে গেলো : রূপকুমারী ঘাড় নেড়ে জানালো :

"তা'হলে নিশ্চয়ই ঐ মন্তর শিখ্‌বো ; বেশ হবে,...আমার এক হাতে থাকবে মরণ...অপর হাতে থাকবে জীয়ন মন্তর।"

এক এক করে সকল দলের পরীরা রাজী হলো রূপকুমারীকে তাদের মন্তর শিখিয়ে দিতে ; রূপকুমারীও মনে মনে বেশ গর্ব্ব অনুভব করে ভাব্‌লো...যে সে যদি এই সব মন্তর শিখে নেয় তাহলে তার দেশের গর্ব্বের আর একটা বিষয় বস্তু হলো ; বেশী করে দেশের গুণ পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে...যেমন করে বাতাস ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর চারিধারে ; কত দেশ বিদেশ থেকে রাজরাজড়ারা...রাজপুত্তুররা... আম্‌লা...গোমস্তা...কাতারে কাতারে লোক ভিড় ঠেলে আসবে তাকে দেখতে,...আসবে তার জন্যে উপহার নিয়ে।

...পরীর দল রূপকুমারীকে মন্তর শিখিয়ে দিতে রাজী হলো বটে...তবে এক সর্ত্তে ; সর্ত্ত হলো যে সে কখ্যনো তাদের ভুলতে পার্ব্বেনা ; রূপকুমারী তিন সত্যি কেটে জানালো যে সে জীবনে পরীদের ভুলবে না...এমন কি তাদের সঙ্গে চন্দ্রমামাকে সাক্ষী করে 'বেল কুঁড়ি' পাতিয়ে ফেল্লে। আর পরীরদলেরা রাজকুমারীর সঙ্গে পাতাল 'সই ;' সাক্ষী হলো সপ্তর্ষিমণ্ডল। তারপর...তারপর পরীর দলেরা একে একে রূপকুমারীর কানে কানে কি জানি ফিস্ ফিস করে বল্লো ; আর রূপকুমারীও কানপেতে শুনে ঐ মন্তরগুলো মনের মধ্যে গেঁথে নিলো এমন ভাবে যাতে না সে কোনদিনও ভুলে যায়।

সই পাতান শেষ হলো,...শেষ হলো রূপকুমারীর মন্তর শেখা ; তারপর রূপকুমারী বেলকুঁড়িদের হাত ধরাধরি করে চল্লো ঘুরে ঘুরে পরীদের আজব দেশ দেখাতে।...হাল্‌কা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে সারারাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরীরা রূপকুমারীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো গল্পে শোনা আজব দেশ...সেই সে সোনার পাহাড়...সোনার পাহাড়ের গায় রূপোলী তুষার, ক্ষীরের সমুদ্র. সোনার গাছে সোনার পাতা...সোনার

ফল হীরার ফুলে মণির আলো, ফিরোজা রঙের পাখী,···সেই পাখীর পাখায় পাখায় রাঙা রবির আলো, পারিজাতের ভ্রমর···সব···সব।···গল্পের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো আজব দেশের প্রতিটি জিনিষ।··· তার ফলে লাল পরীর দল আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে ভাব্‌লো···কি অপূর্ব্ব ; নীল পরীর দল অবাক মেনে দৃষ্টি ফেরাতে পাচ্ছে না···এতই লেগেছে তাদের চমৎকার ; হল্‌দে···বেগুনে পরীর দলের তো কথাই নেই···তারা প্রশংসার পর প্রশংসা করে ছেয়ে ফেলতে চাইলো আজব দেশ ; আর বাকী রইলো কেবল গোলাপী পরীদের কথা ; তারা রূপকুমারীকে আনন্দবিস্ফারিত দৃষ্টিতে বার বার নিরীক্ষণ করে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বল্লো :

"আজব দেশের রাজকন্যে···তুমি সই ভারী সুখী···যেমন সুখী ভোরের আলো···যেমন সুখী মলয় বাতাস···যেমন সুখী ছোট্ট চড়াই পাখী।"···

পৃথিবীর মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য এই আজব দেশ, পরীরা এক বাকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে স্বীকার না করে পাল্লো না।···"

দিদিভায়ের কোলে ইতিমধ্যে মাথা রেখে রেবার বেশ এক ঘুম দেওয়া হয়ে গেছে ; রেবা স্বভাবতই তাড়াতাড়ি কথা বলে ; সে চোখ মুছতে মুছতে দিদিভাইকে জিজ্ঞাসা কল্লো :

"হ্যাঁ দিদিভাই···বেবিলনের হ্যাংগিং গার্ডেন···টেমস নদী···যেখানে

"উপরে জাহাজ চলে
নীচে চলে নর···"

মিশরের পিরামিডের চেয়েও···খুব খুব আশ্চর্য্য ?"

"হ্যাঁ রেবা···খুব আশ্চর্য্য··· ।" দিদিভাই উত্তরে বল্লেন, তাঁর কথা শেষ হতে না হতে রেবা আবার জিজ্ঞাসা কল্লো :

বইতে পিরামিডের কথা, টেমসনদীর কথা আছে কিন্তু আজব দেশের কথা নেই কেন, দিদিভাই ?"

"সব কি বইতে লেখা যায় ?"

দিদিভাই বল্লেন। রেবা সরল বিশ্বাসে মেনে নিলো দিদিভাইয়ের কথা। দিদিভাই তারপর বলতে লাগ্‌লেন :

···পরীদের দেশে ক্ষীরের সমুদ্র ; তারা মাথায়...মাথার খোঁপায় খোঁপায় ফুল গুঁজে ক্ষীরের সমুদ্রের তীরে আশ্চর্য্য হয়ে···ক্ষীর সমুদ্রের ছোট...বড় ঢেউগুলো নেচে নেচে খেলায় মেতেছে···এ ওকে ধরবে বলে···তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে রূপকুমারীকে ঐ কথাই বল্‌ছিলো ; প্রাণভরে সমুদ্র দেখেও তাদের আশ মিট্‌লো না ; ভারী ইচ্ছে হলো তাদের ক্ষীর-জলে সাঁতার কাট্‌তে···ঢেউগুলোর তালে তাল মিলিয়ে খেলা কর্ত্তে ;··· রূপকুমারী তাদের ইচ্ছেয় বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহ দিলো ; পড়ে গেলো হাসির হুড়োহুড়ি ; রূপকুমারী যত হাসে···পরীরা হাসতে লাগ লো তার দশগুণ ; খল্ খল্···হাসির শব্দে সমুদ্র তীর মুখর হয়ে উঠলো ; ঢেউগুলো খেলা থামিয়ে দেখতে লাগ্‌লো কি ব্যাপার···রঙবেরঙের মাছেরা গা ভাসান দিয়ে উঠ্‌লো হাসির শব্দে।···

এই ভাবে হাসতে হাসতে পরীর দল···প্রথমে বড় পরীরা পরে মাঝারি···পরীরা···তারপর···তারপর ছোট পরীর দল একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রের বুকে। আরম্ভ হলো সাঁতার সাঁতার খেলা... হোল্‌ডুবের পালা; পরীরদল এবং রূপকুমারী আনন্দে মস্‌গুল হয়ে ক্ষীরের জলে সাঁতার কাটছে···আর কাটছে; হুস্ নেই···খোঁপার ফুল ভেসে গেল,...বিনুনী করা চুল এলোমেলো হয়ে ভাসতে লাগ্‌লো; মাছের দল আর চুপ করে থাক্‌তে পাল্লেনা···; রুই···কাৎলা···গল্‌দাচিংড়ী...পুটী যে যেখানে ছিলো ছুটে এসে তাদের সঙ্গে খেল্‌তে আরম্ভ করে দিলো।···


আরম্ভ হলো সাঁতার সাতার খেলা···

ক্রমেই রাত গড়িয়ে চল্লো;···চাঁদের আলোও ম্লান হয়ে আসতে সুরু করে···ম্লানও হলো···আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কাক ডেকে উঠ্‌লো···'কা-কা-কা'···চড়াই করে উঠ্‌লো ···'কিচিরমিচির কিচ্।' পূবে ফরসা দিয়েছে; পরীরা আর কি মানুষের দেশে থাকতে পারে; অনেক আগে তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়া উচিৎ ছিল; কিন্তু রূপকুমারীকে নিয়ে তারা এতই খেলায় বিভোর হয়েছিল যে তাদের চোখের উপর দিয়ে চার প্রহর রাত কেমন করে কেটে গেল যে তার টেরই পায়নি।···

অনিচ্ছা সত্ত্বে···পরীদের রূপকুমারী তাদের খেলার সাথীকে ছেড়ে···আজব দেশ না তো স্বপনঘেরা দেশছেড়ে...মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হচ্ছে। হাজার কাজ থাক্‌লেও···ঝড়···বৃষ্টি প্রলয় হলেও তারা রোজই রাত্রে রূপকুমারীর কাছে আসবে···আসবে...আসবে বলে···সারি দিয়ে ডানা ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে শূন্যে উঠে চোখের পলক না ফেলতে ফেলতে কোথায় মিলিয়ে গেল···রূপকুমারী তা ঠিকই কর্ত্তে পাল্লো না; ফিরে এলো বিষন্ন মনে তার শয়ন কক্ষে···মন্তর পড়ে ছায়া পাখী হয়ে।"

দিদিভাই লেখনী বন্ধুদের দিকে চেয়ে বল্লেন:

"তোমরা যদি একবার আজব দেশ দেখো···তা'হলে···তোমরাও পরীদের মত ছেড়ে চলে আসতে মনে কষ্ট পাবে···কষ্ট পাব আমিও···সত্যি।"

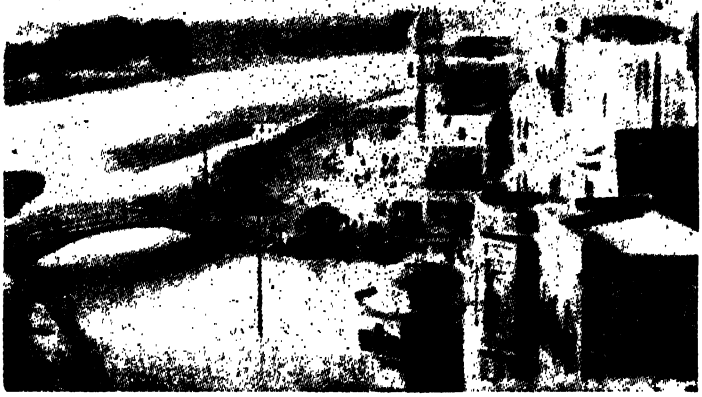
রূপকথার মত রূপকথার দিদিভাই...খোকাখুকুদের স্বপ্নের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।



হৃষিকেশ ও লছমন্ ঝোলায় একদিন

শ্রীমতী ইন্দিরা চৌধুরী

গত নভেম্বর মাসের ৬ই আমাদের হৃষিকেশ ও লছমন ঝোলায় যাত্রার দিন স্থির হইল। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি আমরা হরিদ্বারে প্রায় মাসাবধি বাস করিতেছি। এই সময়ে এখানে একপ্রকার ঠাণ্ডা বাতাস সন্ধ্যা হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত বহিতে থাকে, শীতে একটু কষ্ট হইলেও শরীরের পক্ষে কিন্তু উহা বড়ই উপকারী।



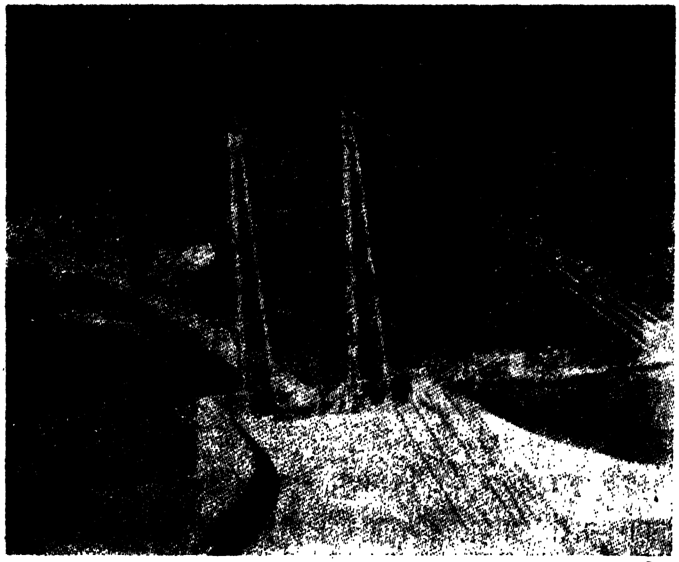
ব্রহ্মকুণ্ড

অতি প্রত্যুষেই শীত বস্ত্র পরিধান করিয়া আমরা হৃষিকেশ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের যে টানেল আছে সেই টানেলের প্রবেশ দ্বারে ক্ষণকালের জন্য গাড়ী দাঁড়ায়, আমরা সকলে তথায় যাইয়া গাড়ী ধরিলাম। বাবা পূর্ব্বেই জানিয়া আসিয়াছিলেন হরিদ্বার ষ্টেসনে গাড়ী ধরিতে হইলে অনেকটা পথ হাঁটিতে হয় এবং overbridge অতিক্রম করিয়া অপর পারে গাড়ী ধরিতে হয়। আমরা ট্রেণে উঠিতে না উঠিতে ট্রেণখানি ছাড়িয়া

দিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ অন্ধকারময় টানেলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপ পর পর দুইটি টানেল অতিক্রম করিয়া ভীম-গোডা ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। তখন পাহাড়ের ফাঁক দিয়া ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হইতেছে। বহু দূরে পর্ব্বতগাত্রে মনে হইল যেন কতকগুলি শ্বেতবর্ণ গাভী তাহাদিগের সন্তানসন্ততিসহ স্থির হইয়া প্রাতঃকালীন্ রৌদ্র-কিরণ উপভোগ করিতেছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহার নাম নরেন্দ্রনগর। ওগুলি টিহিরী রাজপ্রাসাদ—ভীমগোডা হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অন্যদিকে দেখি পর্ব্বত হইতে বেগবতী গঙ্গা নিম্নাভিমুখে কলকল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। সম্মুখস্থ পর্ব্বতমালা যেন সমুদ্রের প্রকাণ্ড ঢেউএর মতই অনন্তের কোলে মিলাইয়া গিয়াছে। দূরে অভ্রভেদী তুষার শিখরগুলি যেন মণিমুক্তাখচিত শুভ্র-মুকুট পরিধান করিয়া প্রভাত সূর্য্যকে অভিবাদন করিতেছে। প্রকৃতির এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-রাজ্যে এমনই মগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম যে কখন হৃষিকেশ ষ্টেসনে ট্রেণখানি আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা বুঝিতেই পারি নাই। ষ্টেসনে নামিয়া দেখি মাত্র একখানি টাঙ্গা দাঁড়াইয়া আছে। টাঙ্গার নিকট পৌঁছিবার পুর্ব্বেই কোন এক সৌভাগ্যবান তাহাতে আরোহণ করায় আমাদের পদব্রজেই হৃষিকেশ সহর অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আমরা উক্ত নগরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

হৃষিকেশ সহরটি ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে অতি সুন্দর ও সেখানে সর্ব্বপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বাবা আমাদের লইয়া কালী কম্বলীওয়ালার আশ্রমে উঠিলেন। এই আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাদের বড় একখানি ঘর ও একটি রান্নাঘর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখানে বিশ্রাম করিবার পর লছমন ঝোলায় যাইবার জন্য সকলে প্রস্তুত হইলাম। এখান হইতে লছমন ঝোলা তিন মাইল মাত্র; প্রায় সকলেই পদব্রজে সেখানে যাইয়া থাকেন কিন্তু নানান অসুবিধার জন্য আমাদের মটর বাসে যাওয়াই স্থির হইল। বাস্‌ভাড়া লোক প্রতি নয় আনা মাত্র। বাসখানি যাত্রা সুরু করিল—এমনই আঁকা-বাঁকা ও উচুনীচু পথ যে বাসের ঝাঁকুনিতে আমরা পরস্পরের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। কিছু পরে একটি নদী পাইলাম। সেতুটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ড্রাইভার নদীগর্ভের বড় বড় পাথরের উপর দিয়াই বাসখানি চালাইতে লাগিল। যাহা হউক, আমরা তালগোল পুঁটুলী পাকাইয়া কোন প্রকারে টিহিরী রাজের টোল অফিসের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানকার টোল অফিসার ড্রাইভারের নিকট নিজ প্রাপ্যগণ্ডা বুঝিয়া লইয়া বাসখানি ছাড়িয়া দিল। এবার গাড়ীখানি পর্ব্বতগাত্র সংলগ্ন সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। আমাদের বামদিকে বনরাজি

সমাকীর্ণ ধুম্র পাহাড়, রাস্তার কোল ধরিয়া সোজা উপরিভাগে উঠিয়া গিয়াছে। আবার অপর পার্শ্বে বহু নিম্নে স্রোতস্বতী গঙ্গা প্রচণ্ড বেগে বহিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে পথটি এমনই বাঁকা যে ভ্রম হয় সম্মুখে বুঝি আর পথ নাই। প্রতিক্ষণেই মনে হইতে লাগিল, বাস্‌খানি বুঝিবা বহু নিম্নে গঙ্গাগর্ভে গড়াইয়া পড়িবে। বাস্‌চালক যাহাতে অন্যমনস্ক না হইয়া পড়ে তজ্জন্য বাবা তাহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতেছিলেন। বাস্ হইতে অবতরণ



"লছমন্-ঝোলা (নূতন) সেতু"

করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে ধ্রুবকুণ্ডে আমরা আসিয়া পৌঁছিলাম। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। গঙ্গার উভয়কূলেই বহু মন্দির ও হর্ম্ম্যরাজি অবস্থিত। বহুস্থানে আবার পুরাতন মন্দির ও সৌধসমূহের ভগ্নাবশেষ গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত।

আমরা ধ্রুবকুণ্ডে অবগাহন করিয়া নিকটস্থ মন্দির-প্রাঙ্গনে উপবেশন করিলাম। মানুষের সহিত প্রকৃতির যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার পরিসমাপ্তি বুঝি বা এখানেই। এখানকার আকাশে বাতাসে এবং প্রতি ধূলিকণায় আনন্দময় অসীমতা বিরাজ করিতেছে। এখানে আসিলে মানুষ যেন সকল দুর্ব্বলতা হইতে মুক্তি পায়।

অনতিদূরে লৌহরজ্জু নির্ম্মিত অতি সুন্দর একটি দোদুল্যমান সেতু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাই লছমন্ ঝোলার বিখ্যাত সেতু। আমরা আর সময় নষ্ট না করিয়া

সেই সেতুর উপর দিয়া গঙ্গার অপর তীরে পৌছিলাম। সেতুর বামদিক ধরিয়া যে রাস্তাটি বদরিনারায়ণ অভিমুখে গিয়াছে আমরা সকলে সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইবার পর দেখিলাম ছোট-ছোট নির্ঝরিণীগুলি গঙ্গার সহিত সবেগে মিলিত হইতেছে। গঙ্গাগর্ভে মাঝে মাঝে বৃহতকায় উপলখণ্ড সেই একটানা প্রবাহের বৃথা বাধা সৃষ্টি করিতেছে। সেই প্রস্তর স্তূপগুলিতে সফেন জলরাশি আঘাত পাইয়া ভীমবেগে উছলিয়া চতুর্দ্দিকে তুষার কণার ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য... মনে হইল দিক্‌দিগন্ত ভূষণ-সিঞ্চনে মুখরিত করিয়া ও সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষিয়া বিরহ-বিধূরা গঙ্গা ছুটিয়া চলিয়াছেন—সাগর-সঙ্গমে মিলনের আকাঙ্ক্ষায়। আর অধিক দূর অগ্রসর হইলে স্বর্গাশ্রমের দেবালয় ও তপোবন দেখিবার সময় হইবে না ভাবিয়া বদরিনারায়ণ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পর্ব্বতগাত্রে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিলাম গভীর জঙ্গল, নিকটে একটি কাষ্ঠফলকে লেখা আছে Reserved forest সকলেই জানিলাম পর্ব্বতগাত্রস্থ বনভূমি বন্যজীব জন্তুর আবাস স্থল। যাহা হউক, আমরা স্বর্গাশ্রমের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথিমধ্যে দেবালয় ও ধর্ম্মশালা দেখিতে দেখিতে আমরা তপোবনে আসিয়া পৌছিলাম।



রামেশ্বর দেবের মন্দির

তপোবনের রাস্তাটি বৃক্ষাচ্ছাদিত, তাহার উভয় পার্শ্বেই সন্ন্যাসীদিগের জন্য ছোট-ছোট কুটির। কুটির সংলগ্ন আঙ্গিনাগুলি নানা প্রকার পুষ্প বৃক্ষে সুশোভিত, তপোবনটি বুঝি স্বর্গের ন্যায়ই সুন্দর। কৌতূহলবশতঃ দুই একটি কুটিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তপস্বীগণ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহাদিগকে আর বিরক্ত না করিয়া নিঃশব্দে কুটিরদ্বারে যৎকিঞ্চিত প্রণামী রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা মহাত্মা কালিকম্বলীওলার আশ্রমে আসিয়া পৌছিলাম। বহুক্ষণ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় একটু বিশ্রামের জন্য তাঁহার গদিগৃহে উপস্থিত হইলাম। সেখানকার মহন্ত মহারাজ স্বর্গাশ্রম সম্বন্ধে যে পৌরাণিক তথ্য বর্ণনা করিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

মহাত্মা কালি কম্বলীওলা (স্বামী আত্মাপ্রকাশ) এই স্বর্গাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তপস্যার জন্য বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে মণিকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন গঙ্গার সমীপবর্ত্তী বহুস্থানে সন্ন্যাসীগণ তপস্যায় মগ্ন। অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন এই স্থানটি স্কন্দপুরাণ বর্ণিত কেদারখণ্ড। তিনি তত্রস্থ সাধুদিগের অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত দেশ-বিদেশের উদারপ্রাণ ধনী শেঠদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া উক্ত স্থানটি সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে সন্ন্যাসীদিগের বাসোপযোগী তপোবন সংলগ্ন কুটিরগুলি তিনি নির্ম্মাণ করাইলেন। সাধুদিগের



নীলধারা

দেহধারণের নিমিত্ত হৃষিকেশ ধর্ম্মশালায় সদাব্রতের ব্যবস্থা করিলেন, এবং রুগ্ন সাধুদিগের জন্য ঔষধ পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করিলেন। শীতকালে সন্ন্যাসীদিগের জন্য কম্বলাদি ও হোমাগ্নি রাখিবার জন্য গাড়ওয়াল Governmentএর নিকট হইতে একশত একর বনভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। প্রবাদ আছে, বদরিকাশ্রম দর্শন অভিলাষী ব্যাকুলপ্রাণ বহু সাধু সন্যাসী রজ্জু নির্ম্মিত সেতু অতিক্রম করিবার সময় পড়িয়া গিয়া চিরতরে গঙ্গাগর্ভে সমাধিস্থ হইতেন। উক্ত তেজস্বী মহাত্মা সাধুদিগকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে বোম্বাইনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তত্রস্থ অধিবাসীদিগের নিকট পুনরায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, অধুনাতন এই লৌহনির্ম্মিত সেতুটি নির্ম্মাণ করাইলেন।

একটি ছিন্ন কৌপীনধারী দরিদ্র সন্যাসীর এতবড় মহান্ প্রতিষ্ঠান দেখিয়া, এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ শুনিয়া আমরা সকলে বিস্ময়াভূত হইলাম; এবং তাঁহার

রামেশ্বর দেবের মন্দির দর্শন করিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। কিয়ৎদূর পদব্রজে যাইবার পর আমরা হনুমান কুণ্ডের নিকট একটি মনোরম উদ্যান সংলগ্ন মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দির দর্শন করিয়া, হনুমান কুণ্ডে যে খেয়াঘাট অবস্থিত, তথায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

তখন দিনমণি ধীরে ধীরে পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। দূরে পর্ব্বতগাত্রস্থ পায়ে হাঁটা পথ ধরিয়া এতদ্দেশীয় পাহাড়বাসী পৃষ্ঠদেশে গুরুভার লইয়া আপন্ আপন বাসভূমি অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। মাঝে মাঝে নির্ম্মল নীল আকাশ বাহিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পর্ব্বত শিখরস্থ বনরাজির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতেছে। গঙ্গাগর্ভস্থ অসংখ্যমীন স্থির হইয়া উপকূল সমীপে বিশ্রাম করিতেছে। কি সুন্দর, কি অপূর্ব্ব, কি মহান এই দৃশ্য...এখানে দ্বেষ নাই ; হিংসা নাই ; কুটিলতা নাই, শুধুই আনন্দ। আমি সেই বিরাট আনন্দময়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া অপর পারে যাত্রার নিমিত্ত নৌকায় উঠিয়া বসিলাম ; এবং মনে মনে সেই অন্ত-র্য্যামীর উদ্দেশ্যে কায়মনবাক্যে প্রার্থনা জানাইলাম হে দয়াল আনন্দময়, এমনি করিয়া আমাদের জীবনযাত্রার শেষ দিনে তোমার বিরাট আনন্দের মাঝখানে আমাদের চিরতরে ডুবাইয়া দিও।





শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ডাঃ ক্রুল একটু ম্লান হেসে বল্লেন,

—"কি আর করব। আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে!"

"কিন্তু আপনার এত কষ্টের আয়োজন, আমাদের এত হায়রানি, সবই তাহলে ব্যর্থ!"

ডাঃ ক্রুল শান্তভাবে বল্লেন, "একেবারে ব্যর্থই বা ভাবছ কেন? আমরা যেটুকু করলাম তাও কি কম! বুধগ্রহে মানুষের প্রথম পায়ের চিহ্ন আমরা রেখে গেলাম, এখানকার মাটি জল বাতাসের কথা, প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধে কত কিছু জেনে গেলাম, এতবড় একটা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা দেখে গেলাম—এ সবের কোন কি দাম নেই! যদি কোনরকমে এইসব খবর নিয়েও আমরা পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরতে পারি তাহলেও বুধগ্রহের প্রথম দুঃসাহসিক যাত্রী বলে ইতিহাসে আমরা অমর হয়ে থাকব।

শূন্যপথের প্রথম অভিযানে আমরা যতটা সাফল্য লাভ করলাম সমুদ্রপথের অভিযানে সেকালের কত দুঃসাহসী বীরের ভাগ্যে তার তিলমাত্রও মেলেনি...

সমর এতক্ষণ নীচের জানলার দিকে চোখ রেখেই ডাঃ ক্রুলের কথা শুনছিল; মাঝখানেই হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—"একি! দূরে অন্ধকার যে ফিকে হয়ে আসছে! ইতি-মধ্যে সকাল এসে গেল কি করে?"

ডাঃ ক্রুল হেসে বল্লেন—"সকাল নয় এটা সন্ধ্যা এবং আমরা তার কাছে এসে গেছি, আমাদের হাউই জাহাজ কি বেগে কতদূর এসেছে তা খেয়াল আছে! বুধগ্রহের অস্ত যাওয়া সূর্য্যকে তাড়া করে আমরা তাকে ধরে ফেলেছি; আমরা এখন বুধের অন্তপিঠের কাছ কাছে এবং খানিক বাদে সাধারণ নিয়মে উল্টে আমারা সন্ধ্যে থেকে সকালের দিকে এগিয়ে যাব।"

ব্যাপারটা এত অদ্ভূত যে বুঝতে অজয় ও সমরের বেশ একটু সময় গেল, তারপর এই বিপদের মাঝেও ছেলেমানুষের মত উৎসাহিত হয়ে উঠে অজয় বল্লে,—"তার মানে বুধগ্রহ যতখানি বেগে ঘুরে যাচ্ছে, আমাদের হাউই জাহাজের বেগ তার চেয়ে বেশী?"

ডাঃ ক্রুল হেসে বল্লেন,—'নিশ্চয়ই! এখন দিনের আলোয় নিরাপদে নামবার কোন জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক্। এখানে ঝড়ের বেগ যেন খানিকটা কম মনে হচ্ছে, মেঘও ততটা ঘন নয়, আমি হাউই জাহাজ একটু নীচে নামাচ্ছি। আপনারা ভাল করে নীচে নজর রাখুন।

হাউই জাহাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের বদলে ক্রমশঃই বেশ স্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছিল। মেঘ ও যে কারণেই হোক এদিকে অনেকটা ফিকে।

অজয় উদ্‌গ্রীবভাবে নীচের দিকে দূরবীণ ধরে বসে রইল। হাউই জাহাজ ক্রমশঃ নীচে নামছে সাহস করে।

আশার কথা, এই যে এখন পর্য্যন্ত কোন আগ্নেয়গিরির পরিচয় পাওয়া যায়নি। হয়ত বুধের এদিকটা নিরাপদ হতেও পারে। আর একটু নামলেই মেঘের আবরণ আরো পাতলা হয়ে নীচের দৃশ্য ভালো করে দেখা যাবে! দেখাও গেল খানিক বাদে। তখন কিন্তু অজয়ের মুখে কথা নেই!

ডাঃ ক্রুল উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি দেখছেন!"

হতাশ হয়ে অজয় বল্লে,—শুধু সমুদ্র যতদূর দেখা যায়...

বলতে বলতে হঠাৎ অজয় যেন চমকে উঠে থেমে গেল।

ডাঃ ক্রুল একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "থামলেন কেন। কোথাও কোন দ্বীপ দেখতে পাচ্ছেন নাকি!"

অজয় উত্তেজিত হয়ে বল্লে,—না দ্বীপ নেই, কিন্তু আপনি এদিকে আসুন, ডাঃ ক্রল, নিজে একবার দেখুন!"

কি হয়েছে কি বলুন না!

যা হয়েছে তা বিশ্বাস করা যায় না, আমাদের হাউই বোটটা এখানে কি করে এল বলতে পারেন!

"হাউই বোট!" সমর ও ডাঃ ক্রল দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন।

হ্যাঁ হাউই বোট! অজয় জোরের সঙ্গে বল্লে,—"আমাদের মাইল দুয়েক নীচে দিয়ে সেটা সমুদ্রের দিকে নামছে।

"কিন্তু হাউই বোট চালাবে কে?" সমর নিজের মনেই বল্লে,—"ষ্টাইন! সত্যি ষ্টাইনের কথা আমরা ভুলেই গেছলাম যে!"

"না আমি ভুলিনি, কিন্তু ভেবেছিলাম জঙ্গলে পথ হারাবার পর প্রাণে বেঁচে থাকলেও ভূমিকম্পে সে রক্ষা নিশ্চয় পায়নি। সে যে সময় মত হাউই-বোট খুঁজে পেয়ে রক্ষা পাবে এটা আশা করতে পারিনি।"—ডাঃ ক্রলের গলার স্বরে বেশ একটু উত্তেজনার আভাষ পাওয়া গেল।

"রক্ষা পাবে বলে এখনও আশা করবেন না!" অজয় একটু কঠিন স্বরেই বল্লে,—"হাউইবোটটা যেভাবে সমুদ্রের দিকে নামছে সেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়,—কোনরকমে জখম হয়ে বিকল হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে! "সমুদ্রেই যাবে ডুবে।"

"এটা ভাগ্যের প্রতিশোধ বলতে হবে তাহলে! যে হাউই-বোটে তোমাদের বন্দী করে মারতে চেয়েছিল তাইতেই তার মৃত্যু!"—সমর একটু নিষ্ঠুর ভাবেই বল্লে, ষ্টাইন তাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছে, যে হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে তা সে ভোলেনি।

কিন্তু ডাঃ ক্রল হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত হয়ে দূরবীণ দিয়ে নিজেই একবার ব্যাপারটা দেখে উত্তেজিতভাবে বল্লেন,—"না, না ওভাবে ওকে মরতে দেওয়া যেতে পারে না!"

অজয় তাঁকে বাধা দিয়ে একটু ব্যঙ্গ করেই বল্লে,—"হঠাৎ যীশুখৃষ্ট হয়ে পড়লেন যে! কি ভাবে আপনাদের নিষ্ঠুরভাবে মারবার ফন্দী করেছিল ভুলে গেলেন নাকি!"

"না, না তা ভুলিনি, কিন্তু!"—ডাঃ ক্রল বেশ অস্থির হয়ে উঠেছেন দেখা গেল।

সময় বল্লে,—"কিন্তু ষ্টাইনকে রক্ষা করবার কোন উপায় আছে কি?

হাউই জাহাজের ব্রেক খারাপ হয়েছে তা বোধহয় জানেন? বেশী নীচে নামলেই বিপদ। সেবারে তবু ডাঙ্গায় জঙ্গলের ওপরে পড়ে কোনরকমে বাঁচা গেছল, এবারে একেবারে সমুদ্রের জলে ডুবতে হবে। আমাদের জীবনের কি কোনই দাম নেই। ষ্টাইনের মত খুনের জীবনের দামই বেশী হল!

ডাঃ ক্রুল এবার কাতর হয়ে বল্লেন,—খুনে হতে পারে, নিষ্ঠুর হতে পারে, আমাদের শত্রু হতে পারে কিন্তু তবু সে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক! যত বিবাদই থাক তবু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

ডাঃ ক্রুল তখন জাহাজ নীচে নামাবার হাতল সম্পূর্ণ টেনে দিয়েছেন।

অজয় ও সমর বল্লে,—"পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক! ষ্টাইন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হল কবে! এ নামও ত কখন শুনি নি!'

"না, কোনো আশ্চর্য্য নয়, কারণ ষ্টাইন ওর আসল নাম নয়!" ডাঃ ক্রুলের গলার স্বর বেশ কম্পিত মনে হল।

"কি তাহলে ওর নাম?"—একসঙ্গে সবিস্ময়ে অজয় ও সমরের মুখ দিয়ে বার হল।

ডাঃ ক্রুল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অস্ফুট স্বরে বল্লেন—"উনিই আসল ডাঃ ক্রুল,—আমি জাল।"

ক্রমশঃ।

ছাগল ছানা

নন্দগোপাল সেন গুপ্ত

দুষ্টু ছাগল ছানা, ছোট্ট ছাগল ছানা,
এক্ষুনি উঠানেতে এসো না—
আমার হয় নি লেখা, হয়নি বানান শেখা,
এর মাঝে অত গায়ে ঘেঁষো না!
তুমি কথা শোনো নাক, ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকো,
এলো মেলো কত কথা বলো যে—
আমি আছি নানা কাজে, তুমি কিছু বোঝো না যে,
টেনে টেনে মাঠে নিয়ে চলো যে।

ছাগল ছানা
শ্রীনন্দগোপাল সেন গুপ্ত

গাছপালা আছে ঢের, তাই নিয়ে দুপুরের
খাওয়াটা কি শেষ করা চলে না ?
আরো ত ছাগল আছে, যাওনা তাদের কাছে,
তারা কেউ হেসে কথা বলে না ?
মা গিয়েছে নদী পার, এত কি ভাবনা তার ?
সন্ধ্যাতে সে কি ফিরে আসে না ?
চুক চুক দুদু দিয়ে, কোলের কাছেতে নিয়ে,
সারা রাত সে কি ভালো বাসে না ?

তুমি বড় দুষ্টুটি, খুদে খুদে চোখ দুটি,
লাফ দিয়ে কোলে ওঠো কেন গো ?
কচি কচি শিং দিয়ে, পায়ে পায়ে খোঁচা দিয়ে,
অভিমানে ফুলে ওঠো যেন গো !
হবে নাক কিছু আজ, লেখা-পড়া কোন কাজ—
তুমি এসে অসময়ে ধরেছো ;
সারাটা দুপুর বেলা, শুধু হবে মিছে খেলা—
বোধোদয়.. তুমি একি পড়েছো ?

মন বুঝি ভালো নাই, এত রাগারাগি তাই—
বেশ চলো একটুকু খেলিগে ;
বই-খাতা থাক পড়ে, গোহালের পাছ দোরে,
পাতা দিয়ে ঘর গড়ে ফেলিগে !
শুধু শুধু যেন তুমি, করো না'ক দুষ্টুমি,
চুপ করে কোলে বসে থেকো ত !
ছাগল হলে কি হবে, দু'একটি কথা কবে,
মা মা বলে কানে কানে ডেকো ত !



নবম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের আয়োজন

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল মাণিক তা জানেনা, কিন্তু চোখ মেলে দেখলে সুন্দরবাবু ও অমলবাবু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে তার দেহের দুইপাশে ব'সে আছেন এবং হাতী সিং ব'সে আছে তার মাথাটা নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে!

প্রথমটা কিছুই মনে পড়ল না। কিন্তু সে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই অমলবাবু ব'লে উঠলেন, "না, না, আপনি আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকুন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, বিপদে পড়লুম আমরা, লড়াই করলুম আমরা, শত্রুদের তাড়ালুম আমরা। কিন্তু তুমি খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন বাপু?"

তখন মাণিকের সব স্মরণ হ'ল এবং তার কণ্ঠদেশ যে বেদনায় টন্‌টন্ করছে এটাও অনুভব করতে পারলে। সে বললে, "সুন্দরবাবু, পিছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে কে আমার গলা টিপে ধ'রেছিল! আপনারা কি এখানে এসে কারুকে দেখতে পাননি?"

—"হুম্, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। স্বপ্ন দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এখানে এসে আমরা একটা টিকটিকির ল্যাজ্ পর্য্যন্ত দেখতে পাই নি। পেয়েছি কি অমলবাবু?"

—"না।"

মাণিক বললে, "আমার গলায় ভয়ানক ব্যথা! সুন্দরবাবু, এটাও কি স্বপ্ন-দেখার ফল?"

—"কৈ দেখি! তাই তো-হে মাণিক, তোমার গলার ওপরে যে অনেকগুলো আঙুলের লাল লাল দাগ রয়েছে! কে তোমার গলা টিপে ধরেছিল? কেন ধ'রেছিল? সে ব্যাটা গেল কোথায়?"

অমলবাবু বললেন, "ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে আক্রমণ করারও মানে হয় না, আমাদেরও আক্রমণ করার মানে হয় না!"

—"আপনাদের কে আক্রমণ করেছিল?"

—"অনেকগুলো লোক। আক্রমণ ক'রেছিল বললে ঠিক হয় না, কারণ তারা আমাদের কাছে আসে নি। তুমি তো এগিয়ে এলে, আমি সুন্দরবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে আসছিলুম! হঠাৎ দূরে বনের ভিতর থেকে চার-পাঁচজন লোক বেরিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমরা বন্দুক ছুঁড়তেই তারা আবার অদৃশ্য হ'ল! মিনিট-খানেক পরে পথের আর একদিকে আবার চার-পাঁচজন লোকের আবির্ভাব—আবার আমাদের বন্দুক ছোঁড়া—আবার তাদেরও অন্তর্ধান!"

সুন্দরবাবু বললেন, "আমার মনে হ'ল, তারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় না—কেবল আমাদের ভয় দেখাতে চায়!"

মাণিক ধড়্‌মড়িয়ে উঠে ব'সে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে ভিতরদিকে হাত চালিয়ে দিয়ে কি যেন অনুভব করলে, তারপর আশ্বস্ত ভাবে বললে, "নাঃ, ঠিক আছে!"

সুন্দরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে সুধোলেন, "কি ঠিক আছে, মাণিক?"

"সেই চাবিটা। আমার জামার ভিতর-দিককার পকেটে সেই চাবিটা রেখে পকেটের মুখটা শেলাই করে দিয়েছি। শত্রুরা কোনগতিকে সন্দেহ করেছে চাবিটা আমার কাছেই আছে। এটা হাতাবার জন্যেই তারা আমাকে একলা পেয়ে মারবার, আর আপনাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা ক'রেছিল।"

অমলবাবু বললেন, "তার মানে?"

—"মানে খুব সহজ। আমি বোকার মত এগিয়ে আপনাদের চোখের আড়ালে এসে প'ড়েছিলুম। তখন একজন কি দুজন শত্রু অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। সেই সময়টায় আপনাদের অন্যমনস্ক রাখার জন্যে বাকি শত্রুরা আপনাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলছিল!"

সুন্দরবাবু বললেন, "মাণিক, তোমার কথাই ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে! কিন্তু তোমাকে গলা টিপে অজ্ঞান ক'রে ফেলেও তারা ঐ চাবিটা নিয়ে গেল না কেন?"

—"এর একমাত্র কারণ হ'তে পারে, হয়তো চাবিটা খুঁজতে তাদের দেরি হয়েছিল। আপনারা এসে পড়াতে তারা পালিয়ে যায়।"

—"খুব সম্ভব তাই।"

এমন সময়ে হাতী সিং জমির উপর থেকে কি-একটা ছোট চক্‌চকে জিনিষ তুলে নিয়ে মাণিককে বললে, "বাবুজী, আপনি উঠে বস্‌তেই এটা আপনার বুক থেকে মাটির ওপরে প'ড়ে গেল!"

সেই জিনিষটার দিকে তাকিয়েই সকলের দৃষ্টি যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন হয়ে গেল! সেটা আর কিছু নয়, সেই নক্সা-আঁকা সোনার চাক্তি!

কি অদ্ভুত রহস্য! চাক্তি ছিল আগে হতভাগ্য জয়ন্তের কাছে, তারপর তাকে হত্যা ক'রে শত্রুরা নিশ্চয়ই এই চাক্তিখানাকে হস্তগত ক'রেছিল, কিন্তু যে অমূল্যনিধির জন্যে এত খোঁজাখুঁজি, এত হানাহানি, এমন অরক্ষিত অবস্থায় সেই জিনিষটাই মাণিকের বুকের উপরে অযাচিত ভাবে এসে পড়ল কেমন ক'রে?"

তাড়াতাড়ি চাক্তিখানা নিয়ে লণ্ঠনের আলোতে ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে মাণিক হতবুদ্ধির মত বললে, "এ যে সেই চাক্তি, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই! কিন্তু—কিন্তু, নাঃ, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি!"

খানিকক্ষণ সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ! তারপর অমলবাবু ধীরে ধীরে বললেন, "হয়তো মাণিককে যে আক্রমণ করেছিল, ধস্তাধস্তির সময়ে চাক্তিখানা তার অজান্তেই প'ড়ে গিয়েছে!"

মাণিক বললে, "আপাতত তাই মনে করা ছাড়া উপায় নেই! কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য?"

আচম্বিতে সুন্দরবাবু কি দেখে বেজায় চম্‌কে উঠলেন! তাড়াতাড়ি একটা লণ্ঠন তুলে ধ'রে জমির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিপুল বিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "হুম্! এ আবার কি?"

মাণিক অবাক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পাশের জমির উপরে অনেকখানি রক্ত প'ড়ে রয়েছে,—খালি রক্ত নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে একখানা বড় ছোরা বা ছোট তরবারির মত অস্ত্র এবং মানুষের হাতের একটা সদ্য-কাটা আঙুল!

অমলবাবু এ-রকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি শিউরে উঠে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেললেন!

সুন্দরবাবু মাণিকের দুই হাতের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "মাণিক, তোমার হাতের একটা আঙুলও তো হারিয়ে যায় নি দেখছি! তবে এ বেওয়ারিস আঙুলের অর্থ কি ?"

মাণিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ ধ'রে আঙুলটা দেখে বললে, "আঙুলটা কি-রকম লম্বা আর মোটা দেখছেন তো ? এ আঙুল যারই হোক্, তাকে খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ ব'লেই মনে হয়!"

অমলবাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, "শত্রুদের দলে চ্যান্ আছে কিনা জানিনা, কিন্তু খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ লোক বললে চ্যান্‌কেই আমার মনে পড়ে!"

সুন্দরবাবু বললেন, "ধ'রে নেওয়া যাক্. চ্যান্ সকলের চোখে ধূলো দিয়ে কোন রকমে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে এসেছে! ধ'রে নেওয়া যাক্, চ্যান্‌ই গলা টিপে মাণিককে অকালে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল! কিন্তু চ্যানের আঙুল-বলি দিলে কে ? মাণিক, অজ্ঞান হবার আগে তুমি কি লড়াই ক'রেছিলে ?"

মাণিক বললে, "লড়াই করব কি, কে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাও দেখতে পাই নি! আর দেখছেন না, ছোরাখানাও রক্তমাখা! নিশ্চয়ই ঐ ছোরাতেই আঙুলটার উচ্ছেদ হয়েছে! ও-রকম দু-ধারে ধার-দেওয়া ছোরা কখনো আমার কাছে ছিল না! ও ছোরা কার ? ওর মালিক ওখানা ফেলে রেখে গিয়েছে কেন ? আমাকে বাঁচাবার জন্যেই সে যদি আমার শত্রুকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ ক'রে থাকে, তবে সেও পালিয়ে গেল কেন ? তাকে তো আমরা বন্ধু ব'লে পরম সমাদর করতুম! আর সেই অজানা মুল্লুকে বন্ধুই বা পাব কোত্থেকে, বন্ধু তো আকাশ থেকে খ'সে পড়ে না!"

অমলবাবু বললেন, "এক হ'তে পারে, পদ্মরাগবুদ্ধের লোভে ঐ সোনার চাক্তিখানার জন্যে শত্রুরা নিজেদেরই মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ক'রেছিল!"

সুন্দরবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "ও সব বাজে কথা! শত্রুরা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করতে পারে, কিন্তু মাণিককে বাঁচাবার জন্যে তাদের কারুরই মাথাব্যথা হ'তে পারে না! হুম্, এ-সব হ'চ্ছে ডাহা ভুতুড়ে কাণ্ড! এ-জায়গাটা হচ্ছে হাজার বছরের পুরাণো একটা মরা জাতের গোরস্থানের মত! এখানকার আনাচে-কানাচে ভুতের আড্ডা আছে!"

মাণিক বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে, "এ যদি ভুতুড়ে কাণ্ড হয় আমি তা'হলে বলব, জয়ন্তের প্রেতাত্মাই আমাকে আজ বাঁচিয়েছে, আর নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে!"

সুন্দরবাবু তখনি টপ্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমি অবশ্য জয়ন্তকে অত্যন্ত ভালোবাসি, কিন্তু তার প্রেতাত্মাকে ভালোবাস্‌বার ইচ্ছে আমার নেই। আমার বাবা-মা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেতাত্মা এলেও আমি আর দেখা করব না। ওঠ মাণিক, উঠুন অমলবাবু!"

মাণিক গাত্রোত্থান ক'রে বললে, "হ্যাঁ, এখানে আর দেরি ক'রে লাভ নেই। এই গভীর রহস্যের কিনারা না ক'রেই আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হবে।"

সুন্দরবাবু বললেন, "খালি ভূত নয়, এখানে চারিদিকে শত্রুরাও লুকিয়ে আছে। তারা আমাদের সমস্ত গতিবিধিই লক্ষ্য করছে! তারা যে সাহস ক'রে আমাদের আক্রমণ করতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে আমরা সবাই সতর্ক আর আমাদের হাতে আছে চার-চারটে বন্দুক! ...আরে গেল, এই হাতী সিং! তোমার নাম গাধা সিং হওয়া উচিত! তোমার বন্দুকের মুখনল আমার ভুঁড়ির দিকে নামিয়ে রেখেছ কেন? যদি ফস্ ক'রে আওয়াজ হয়ে যায়? অমন ক'রে বন্দুক ধরতে নেই, ওটা কাঁধে তোলো!"

আলোয়-ছায়ায়, মাঠে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে আবার সবাই এগিয়ে চলল। রাত পোয়ালো, উষার সিঁথায় দিবস-বধূ সিঁদূর-লেখা লিখ্‌লে, মাঠ-বাটের উপর দিয়ে তপ্ত তুপুরে-হাওয়া তেষ্টায় হা-হা ক'রে গহনবনের ঠাণ্ডা বুকের ভিতরে গিয়ে নিসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সন্ধ্যার মেঘ-মন্দিরে সূর্য্যচিতার রক্ত-শিখা জ্ব'লে উঠল, রাত্রি আবার তার অন্ধ-কুঠরীর দরজা খুলে ছায়া-অনুচরদের পৃথিবী-ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলে! মাঝে মাঝে দেখা দেয় মাটির উপরে চির-চলন্ত বৃহৎ জলসর্পের মত নদী। তখন ওঠে নদী পার হবার সমস্যা! মাঝে মাঝে বিপুল অরণ্য বাহুবিস্তার ক'রে পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়ায়। তখন কুঠার নিয়ে বনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মাঝে মাঝে গিবন-বানরের দল গাছের নীচের ডাল থেকে মগ্-ডালে লাফ মেরে কিচিরমিচির ভাষায় কি ব'লে ওঠে এবং কৌতূহলী চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে এই নির্জ্জন বনরাজ্যে প্রথম মানুষদের দেখে, আর বোধকরি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে,—'এরা আবার কোন্ দেশী বানর? এদের ল্যাজ নেই, গায়ে লোম নেই, এরা গায়ে জড়িয়ে থাকে কি কতকগুলো সাদা সাদা জিনিষ, তু-পা দিয়ে হাঁটে, এরা আবার কোন্‌দেশী বানর?' মাঝে মাঝে বাঁশবন তুলে-তুলে ওঠে, মড়্-মড় ক'রে শব্দ হয়, বোঝা যায় হাতীর দল ওখানে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করছে! মাঝে মাঝে ধারাবাহিক ঝোপঝাপের উপর দিয়ে তীব্র একটা গতির রেখা সশব্দে চ'লে যায়—একটা চাপা গর্জ্জনও শোনা যায়, বনের মধ্যে অশান্তিকর অনাহুত অতিথি দেখে বাঘ বা অন্য হিংস্র জন্তু দূরে স'রে গেল! মাঝে মাঝে মানুষের ঘৃণ্য

পায়ের শব্দে লম্বা ঘাসের ভিতরে গোখ্‌রো-সাপের ঘুম ভেঙে যায়, ফোঁশ্‌ ক'রে ফণা তোলে, তীক্ষ্ণ চক্ষে জ্বলন্ত হিংসার স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে পড়ে এবং পরমুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়।...এবং সর্ব্বক্ষণ সারা বনে জেগে থাকে যাদের দেখা যায়না, বোঝা যায়না, তাদের অশ্রান্ত অস্তিত্বের ধ্বনি! কে যেন নিরালায় কাণাকাণি করছে; কে যেন আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে কথা বলছে; কে যেন শুক্‌নো পাতা মাড়িয়ে অতি-সন্তর্পণে পিছনে পিছনে আসছে আবার থেমে পড়ছে, আসছে আবার থেমে পড়ছে!

গভীর দূর-বিস্তৃত নানাশব্দময় প্রত্যেক অরণ্যই মানুষের পক্ষে ভয়াবহ! কোন অরণ্যই আধুনিক নগরবাসী মানুষকে সাদর সম্ভাষণ জানায় না। বনবাসী কোন জীবই মানুষকে বন্ধু ব'লে মনে করে না। কল্পনায় নির্জ্জনতাকে মিষ্টি লাগে, কিন্তু অরণ্যের এই সশব্দ নির্জ্জনতা মনকে দেয় দমিয়ে। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনায় মানুষ চম্‌কে ওঠে! বোধ হয়, প্রত্যেক শব্দই আসছে লুকানো মৃত্যুর কণ্ঠ থেকে! সমস্ত অরণ্যকেই বিরাট একটা প্রেতাত্মা ব'লে সন্দেহ হয়! সূর্য্যালোক তাকে কতকটা বন্ধুর ছদ্মবেশ পরাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু, রাত্রির ঘোর অন্ধকারে মানুষের মন সেখানে ভয়ে কুঁক্‌ড়ে পড়ে...এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে?—অরণ্যের মত ভয়ঙ্কর তখন আর কিছুই নেই! কারণ কেবল কাণে তখন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায় না, চোখও তখন সভয়ে দেখে কাছে, দূরে, শত শত বিভীষিকার আনাগোনা! বিজন অরণ্যে চন্দ্রালোকের চেয়ে অন্ধকার সহনীয়!

আর-একটা দুঃস্বপ্নময় রাত্রির পরে এল স্নিগ্ধ শান্তপ্রভাত।

অমলবাবু বললেন, "আমরা খুব তাড়াতাড়ি চলছি। আজ সন্ধ্যার আগেই হয়তো ভাঙা মন্দিরের কাছে পৌঁছতে পারব।"

সুন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু শত্রুদের আর কোন সাড়াশব্দ নেই।"

মাণিক বললে, "কিন্তু তারা যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে, এটা সর্ব্বদাই মনে রাখবেন। আমরা সশস্ত্র আর সাবধান ব'লেই তারা এখনো সামনে আস্‌ছে না।...কাল রাত্রেই আমি তাঁবুর বাইরে পায়ের শব্দ শুনেছি! কে যেন পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছিল। বাইরে বেরিয়ে তাকে ধরতে পারলুম না বটে, কিন্তু বেশ দেখলুম, একটা ছায়া ছুটে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল!"

সুন্দরবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য্য, তুমি আমাদের ডাকলে না কেন? এক বেটার আঙুল কাটা গেছে, এ বেটাকে ধরতে পারলে আমি এর নাকটা কচ্‌ ক'রে কেটে নিতুম!"

মাণিক বললে, "তার নাক নিয়ে আপনি কি করতেন, সুন্দরবাবু? যদিও আপনার নাকটি খ্যাঁদা, তবু তার নাক টিকলো হ'লেও আপনার অভাব তো দূর হ'ত না!"

সুন্দরবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "এরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করিনা! আমার নাক খ্যাঁদা? কে বললে তোমাকে? আমার নাক খ্যাঁদা নয়!"

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা মাইল-খানেক চওড়া মাঠের উপর এসে পড়ল। কেবল মাঠ নয়, মাঠের একপাশ দিয়ে ঝির্-ঝির ক'রে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট্ট নদী এবং তার তীরে তীরে চ'রে বেড়াচ্ছে একঝাঁক পাখী!

সুন্দরবাবু খুসি-গলায় ব'লে উঠলেন, "বন-মুর্গী! এস মাণিক, দেখা যাক্ ভগবান আজ আমাদের বন-মুর্গীর মাংস খাওয়াতে পারেন কিনা!"

মাণিক মাথা নেড়ে বললে, "না সুন্দরবাবু! জয়ন্ত মুর্গীর মাংস খেতে ভালোবাস্ত! সে যখন নেই, আমার মুখে ও-মাংস আজ আর রুচ্বে না!"

এদিকে মানুষের সাড়া পেয়ে মুর্গীগুলো তখনি উড়ে পালালো! সুন্দরবাবু হতাশ ভাবে সেই উড়ন্ত, জ্যান্তো খাবার-গুলোর দিকে তাকিয়ে ফোঁশ্ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন।

মাণিক বললে, "দেখুন সুন্দরবাবু, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!"

—"হুম্। সুবুদ্ধি, না কুবুদ্ধি?"

—"আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধি। ইচ্ছা করলে এখনি আমরা দেখতে পারি, শত্রুরা আমাদের পিছু-পিছু আসছে কিনা? সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাও দিতে পারি!"

—"কি ক'রে শুনি?"

—"এই মাঠটা দেখছেন তো? এর মধ্যে গাছপালা কিছুই নেই। এপারে গভীর বন, ওপারেও গভীর বন। আমরা এখনি ওপারের বনে গিয়ে ঢুকব। তারপর আর না এগিয়ে ঝোঁপের আড়ালে বন্দুক বাগিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকব।"

সুন্দরবাবু বললেন, "খাসা মৎলোব এঁটেছ ভায়া! শত্রুরা যদি আমাদের পিছনে লেগে থাকে, তাহ'লে তাদেরও এই মাঠ পার হ'তে হবে। এখানে লুকোবার জায়গা নেই, তারা এলেই আমরা দেখতে পাব! তারপরেই আমাদের বন্দুকগুলো গুড়ুম্ গুড়ুম রবে গর্জ্জন ক'রে উঠবে,—কেমন, তাই নয় কি?"

—"ঠিক তাই। কিন্তু আমরা তাদের পা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়ব। নইলে নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে!"

—"ও-সব শত্রুকে হত্যা করলেও পাপ নেই। ওরা তো আমাদের খুন করতেই চায়, আমরাও আত্মরক্ষা করব না কেন? চল, এখন তোমার কথা-মতই কাজ করা যাক্!"

সকলে ওপারের বন লক্ষ্য ক'রে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল। মাঠ শেষ হয়ে গেল।

মাণিক বললে "এখানে বেশীর ভাগই বাঁশবন। গোটাকয়েক বটগাছও আছে। এদিকে বেতবন, নীচে সব জায়গা জুড়ে রয়েছে আগাছার জঙ্গল। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আসুন, গা-ঢাকা দেওয়া যাক্! একটু পরেই হয়তো চ্যান্ আর ইনের খবর পাওয়া যাবে!"

সকলে একে একে ঝোঁপের ভিতরে অদৃশ্য হ'ল।

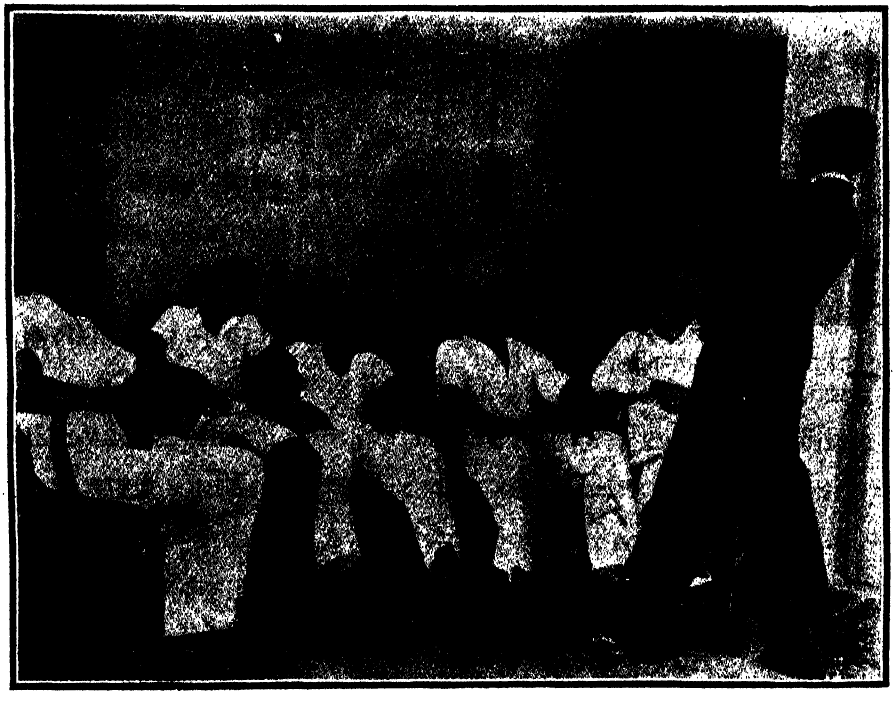
সবুজে মাঠ ধূ-ধূ করছে। ওদিক্কার বন-রেখার উপর থেকে এই অভিনব নাট্য-লীলার দর্শক-রূপে সূর্য্যদেব রাঙামুখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর সোনা-হাসি ওপাশের নদীর লহরে লহরে নেচে নেচে খেলতে লাগল। গানের পাখীরাও নীরব হয়ে ছিল না।

ক্রমশঃ

তাসের ম্যাজিক

যাদুকর—পি, সি, সরকার

অল্প কয়েক মাস পূর্ব্বে নিখিল ভারত রেডিও (All-India Radio) র কলিকাতা শাখা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি বেতারে কয়েকটী তাসের খেলা শিখাইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে বহুবার রেডিও শ্রোতাগণ ও কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও কোন সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। বহু কাজের তাড়াহুড়ার মধ্যে 'রংমশাল' পাঠকবর্গের জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম।



মিঃ সরকার একযোগে বহুলোককে সম্মোহিত করিতেছেন

তাসের খেলা দুই প্রকারে সম্ভব হয়; প্রথমতঃ কোনরূপ হিসাব, অঙ্ক প্রভৃতির সাহায্যে, দ্বিতীয়তঃ তাস কাটিয়া তাহাতে নানারূপ কায়দা করিয়া সম্পাদন করা। ইংরাজীতে ইহাকে যথাক্রমে card tricks without apparatus ও card tricks with apparatus বলে। আমরা যাদু রঙ্গমঞ্চে উভয় প্রকার কৌশলই অবলম্বন করিয়া থাকি।

প্রথমতঃ without apparatus শ্রেণীর একটী তাসের খেলা এখানে বর্ণনা করিব। খেলাটীর নাম "spelling Bee." বিলাতে ছাত্রমহলে এই ধরণের খেলার বড়ই আদর কারণ ইহা দেখাইতে বিশেষ কোনরূপ অসুবিধা নাই—এক অর্থাৎ ইংরাজীতে ONE হইতে বার twelve পর্য্যন্ত যে গুণিতে পারে এবং প্রত্যেকটি যথাযথ ইংরাজীতে বানান spelling করিতে পারে সেই এই খেলাটী দেখাইতে পারিবে। লণ্ডন যাতুকর সম্মিলনীর ম্যাগাজিনে প্রায়ই এই ধরণের খেলা সম্বন্ধে এক একটী প্রবন্ধ থাকেই। কার্টার দি গ্রেট ও হাওয়ার্ড হ্রাসটন প্রণীত তাসের খেলার পুস্তকাদিতেও এই জাতীয় খেলা সম্বন্ধে বহু পৃষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। আমি নিজেও প্রথম প্রথম এই খেলা খুবই দেখাইতাম।



ইতালীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাতুকর 'ম্যাক্সম্যালিনী'—ইনি তাসের খেলায় অত্যন্ত দক্ষ।

SPELLING BEE.

এক প্যাকেট তাস হইতে সবগুলি অর্থাৎ তের খানি রুহিতন বাছিয়া লউন। সেগুলিকে Q 4 A 8 J 2 7 5 10 K 3 6 9 এই ফর্ম্মুলা অনুযায়ী সাজাইয়া ফেলুন। বলাবাহুল্য Q অর্থ Queen, 4 অর্থাৎ four, A অর্থ Ace (টেক্কা) 8 = eight J = Jack (গোলাম), 2= two, 7 = Seven, 5 = five, 10= ten K = king (সাহেব), 3 = three, 6 = six ও 9 = Nine. এস্থলে আরও মনে রাখিতে হইবে Jack=eleven, Queen=twelve এবং king=thirteen যাক সে যাহাই হউক এই বার সকলের নীচে Q টীকে উপুড় করিয়া রাখুন, তাহার পিঠের উপর 4 টীতে উপুড় করিয়া রাখুন এইরূপে যথাক্রমে Q, 4, A, 8, J, 2, 7, 5, 10, K, 3, 6, 9, সবগুলি তাস সাজাইয়া ফেলুন। এখন হাতে এক প্যাকেট তাস হইল যাহার সর্ব্বনিম্ন তাসটী রুহিতনের বিবি এবং সর্ব্বোপরি তাসটী হইল রুহিতনের নয়।

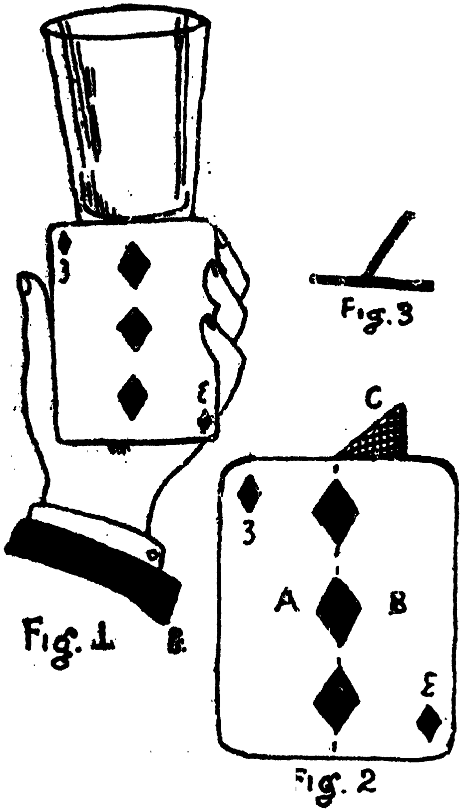
এইবার দর্শকদিগকে বলুন যে আপনি নীচ হইতে ইংরাজীতে O-N-E, T-W-O ইত্যাদি spelling করিবেন এবং প্রত্যেকটী অক্ষরের জন্য একটী করিয়া তাস তুলিবেন ইহা যেই বানান করা শেষ হইবে তখনই সেই সংখ্যার তাসটী হাতে আসিবে। এই বলিয়া খেলা দেখান আরম্ভ করা যাইতে পারে। উপুড় করা তেরটী তাসের প্যাকেটটী বাম হস্তে

ধরিয়া spelling করুন O-N-E, = one সঙ্গে সঙ্গে 'O' বলিয়া নীচের তাসটী না দেখিয়া তুলুন ও সকলের উপরে রাখুন, N বলিয়া তখনকার সকলের নীচের তাসটী তুলুন ও সকলের উপরে রাখুন। 'O' গেল 'N' গেল এই 'E' বলিয়া সকলের নীচের তাসটী তুলুন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখান O-N-E = one অর্থাৎ হাতের তাসটীও one. (টেক্কা)। ঐ তাসটীকে আর পুনর্ব্বার প্যাকেটের মধ্যে না রাখিয়া মাটীতে বা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া এইবার two গুণিবার জন্য প্রস্তুত হউন। হ্যা, 'T' বলিয়া সর্ব্বনিম্নের তাসটী উপরে তুলুন, 'W' বলিয়া তখনকার সকলের নীচের তাসটি সকলের উপরে রাখুন, 'O' বলিয়া সকলের নীচের তাসটী বাহির করিয়া ফেলুন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলুন T-W-O = two অর্থাৎ হাতেরটীও two (রুহিতনের দুই)। সকলকে দুই দেখাইয়া তাসটী পূর্ব্ববৎ হয় মাটীতে অথবা টেবিলে ফেলিয়া দিন। এরপর তিন বাহির করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। spelling করুন T-H-R-E-E, = three. 'T' বলিয়া সকলের নীচের তাসটী উপরে রাখুন, 'H' বলিয়া তখনকার সকলের নীচের তাসটী সকলের উপরে রাখুন, 'R' বলিয়া সকলের নীচের তাসটী উপরে রাখুন, 'E' বলিয়া সকলের নীচের তাসটী সকলের উপরে রাখুন, এইবার 'E' বলিয়া তাসটী বাহির করুন এবং T-H-R-E-E = three বলিয়া রুহিতনের তিন তাসটী সকলকে দেখান। এই তাসটীও পূর্ব্ববৎ ফেলিয়া দিন। তারপর F-O-U-R = four spelling করিতে প্রস্তুত হউন। 'F' বলিয়া তুলুন উপরে রাখুন, 'O' বলিয়া তুলুন রাখুন, 'U' বলিয়া তুলুন রাখুন, 'R' বলিয়া সকলকে দেখান যে ঐটীই F-O-U-R = four অর্থাৎ রুহিতনের চার। এইভাবে F-I-V-E S-I-X, S-E-V-E-N, E-I-G-H-T, N-I-N-E, T-E-N, সবগুলি চলিবে। কেবল এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেকটী সংখ্যা পর পর (serially) spelling করিয়া যাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রথম one, তারপর two, তারপর three, তারপর four, five, six seven, eight, nine, ten, eleven, twelve এই ভাবে। আরও মনে রাখিতে হইবে যে একটী অক্ষর spelling করা হইলেই সেটীকে উপরে তুলিতে হইবে তবে word এর শেষ অক্ষরের বেলায় উপরে উপরে না রাখিয়া সকলকে তাসটী দেখাইতে হইবে। এই তাসটী দেখান



চীনের যাদুকর 'লংটাকসাম' ও মিষ্টার ডার্ণ তাসের খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

হইবার পর যেন প্যাকেটে আর না রাখা হয় অর্থাৎ বাকী তাসগুলির সঙ্গে না মিশে তবেই গণ্ডগোল বাধিবে ও খেলা নষ্ট হইবে। তাসটী দেখাইয়াই মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া অথবা টেবিলে ফেলিয়া রাখাই যুক্তিযুক্ত। এইভাবে Ten, eleven ও twelve পর্য্যন্ত spelling করা চলিবে। E-L-E-V-E-N spelling করিয়া গোলামটী দেখাইতে হইবে এবং T-W-E-L-V-E বলিয়া বিবিটী দেখাইতে হইবে। তের নম্বরের তাসটী আর spelling চলিবে না কারণ তখন একটী মাত্র তাস হাতে থাকিবে। লোকে বলিলে এটী unlucky thriteen বলিয়া ফেলিয়া দিতে হয়—যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে unlucky কেন মশাই তখন বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাসের অন্যান্য সাহেবগুলির দুইটী করিয়া চক্ষু আঁকা আছে কিন্তু ঐ রুহিতনের সাহেবের আছে মাত্র একটী চক্ষু। দর্শকগণ ইহা দেখিয়া হাস্য করিতে থাকিবেন। আমি ঐ ফর্ম্মুলা অনুযায়ী তাসগুলি পূর্ব্বথেকেই প্যাকেটে গুছাইয়া রাখিতাম এবং খেলা দেখাইবার সময় বাহির করিয়া লইতাম। নতুবা দর্শকদের সম্মুখে গুছাইলে সকলে বুঝিয়া ফেলে যে কোন ফর্ম্মুলা অনুযায়ী সাজান হইতেছে।



ব্যালান্সিং কার্ড (Balancing card)

'ব্যালান্সিং কার্ড'

(Balancing a glass on a card)

সাধারণ দর্শকের নিকট একটী তাসের উপর একটী জল পূর্ণ বড় কাচের গ্লাস দাঁড় করাইয়া রাখা (Fig. 1) অসম্ভব বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু ইহার কৌশল অতিশয়

ঐ 'ব্যালান্সিং কার্ডটী (চিত্রে রুহিতনের তিন) দুইটী বিভিন্ন তাস আঠা দ্বারা জোড়া লাগাইয়া বিশেষভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে। উহার একটী প্রকৃত রুহিতনের তিন, অপরটী একটী অন্য তাসের মধ্যস্থল (Fig 2 এর বিন্দু বিন্দু চিহ্নিত অংশ) ভাঁজ করা। এই ভাঁজ করা দ্বিতীয় তাসটীর অর্দ্ধেকাংশ আঠা দ্বারা সম্মুখের রুহিতনের তিনের সঙ্গে সমান করিয়া মিলাইয়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অপর অর্দ্ধেকাংশ (চিত্রে C অংশ) বাক্সের ডালার ন্যায় আলগা রহিয়াছে। চিত্রের বিন্দু বিন্দু চিহ্নিত রেখাটি কব্জার কাজ করিতেছে। পেছনের C অংশটি এমন ভাবে সম্মুখের তাসের সঙ্গে ধরা যায়, যাহাতে দর্শকদের মনে হয় যে ঐটী একটী তাস মাত্র, আবার উহাকে হাতের আঙ্গুল দ্বারা সকলের অগোচরে লম্বভাবেও দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়। লম্বভাবে ঐটী দাঁড়াইলে fig-এর ন্যায় আকৃতি ধারণ করে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এক প্যাকেট তাস হইতে ঐ পূর্ব্ব প্রস্তুত তাসটী বাছিয়া লইয়া দর্শকদিগকে দেখাইতে হইবে যে ঐটী একটী মাত্র তাস। বলা বাহুল্য, দেখাইবার কালে C অংশটী 'রুহিতনের' তিন এর A অংশটীর সহিত মিলাইয়া ধরিতে হইবে; তারপর চালাকী করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির সাহায্যে ডালাটীর ন্যায় C অংশটী খুলিয়া দিলেই উপরে যে ইংরাজী অক্ষর T র ন্যায় একটী স্থান প্রস্তুত হইবে, উহার উপরে একটী জলপূর্ণ কাঁচের গ্লাস অনায়াসে রাখা যাইতে পারিবে। এখন তাসটিকে হাতে ধরিয়াও জলের গ্লাস রাখা যাইতে পারে—আবার ঐটী একটী টেবিলের উপর দাঁড় করাইয়া তাহার উপর জলের গ্লাসটী দাঁড় করাইয়া রাখা চলে। এইটীই খুব আশ্চর্য্যজনক মনে হয়।

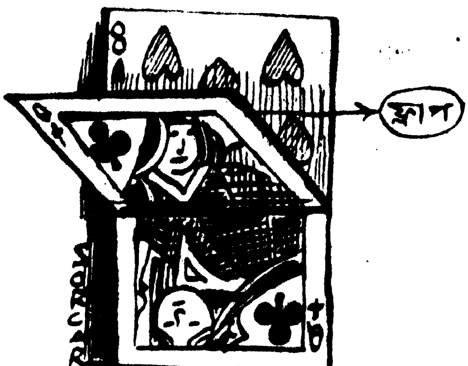


Fig. 4.
তাসের রং পরিবর্ত্তন

কিছুকাল জলের গ্লাসটি ঐভাবে দাঁড় করাইয়া রাখার পর গ্লাসটি তুলিয়া ফেলিয়া, তাসটির C অংশটী পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ করিয়া ধরিয়া এ পিঠ, ওপিট সকলকে দেখাইয়া বলা যাইতে পারে যে তাসটীর মধ্যে কোনরূপ কায়দা হয় নাই!. (অবশ্য ম্যাজিকের 'লজিক' অনুযায়ী)।

'ম্যাজিক' অর্থই চালাকী বা বুদ্ধির খেলা, যে যত চালাকী করিতে পারিবে যে তত বড় যাদুকর। বহুদিন করিতে করিতে চালাকী করিবার বুদ্ধি আপনা আপনিই হয়।

তাসের রং পরিবর্ত্তন
(Colour changing card)

তাসের খেলা ছাড়া আজকাল ম্যাজিকই হয় না। ছোট বড় সব ম্যাজিসিয়ানই তাসের অন্ততঃ দুই চারটা খেলা দেখাবেনই। এইবার তাসের যে খেলাটী বর্ণনা করিতেছি এইটী অতিশয় সুন্দর। ক্রিয়া প্রদর্শক ইচ্ছা করিলে একটী তাসের উপর হাত বুলাইবামাত্র অপর তাসে পরিণত করিতে পারেন। ইহারও কৌশল অতিশয় সহজ। চিত্রে [পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখ] কিরূপে যাদুকর চিরতনের বিবিকে হরতনের আটে পরিণত করিতে পারেন তাহাই দেখান হইয়াছে। আবার ঐ হরতনের আটকে হাত বুলাইবামাত্র চিরাতনের বিবি করা যাইবে। এই খেলাটীর জন্য যে তাসটী ব্যবহৃত হইবে—ঐটী বিশেষভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই। প্রথমতঃ দুইটি বিভিন্ন তাস লইতে হইবে, যেমন চিরতনের বিবি এবং হরতনের আট। এইবার তাস দুইটীর মধ্যস্থলে ভাঁজ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং এটির অর্দ্ধেক ও ঐটির অর্দ্ধেক এইভাবে পিঠাপিঠে জোড়া দিতে হইবে। এইবার Trick card প্রস্তুত হইল (Fig, 4 দেখুন)। উহাতে এখন দেখা যাইবে যে মধ্যের যে ডবল তাসের একটি 'প্লাপ' তৈয়ার হইল উহা উপর দিকে তুলিয়া দিলেই চিরতনের বিবি হইল এবং ঐটীকে পুনরায় নীচের দিকে নামাইয়া দিলেই হরতনের আট হইল।

দর্শকগণের হাতে এই তাসটী না দিয়া দূর হইতে দেখাইতে হইবে। তাহা হইলে ভিতরের সামান্য ভাঁজ দর্শকদের নজরে পড়িবে না। সম্মুখে হাত বুলাইবার সময় কৌশলে প্লাপটীকে উঠা নামা করাণ যায় এবং প্রত্যেকবার উঠা ও নামার সঙ্গে সঙ্গে তাসের রং ও পরিবর্ত্তিত হইবে। দেখাইবার সময় তাসটীকে একটু একটু নাড়া চাড়া করিয়া দেখাইলে ভাল হয়।

[ক্রমশঃ]

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে রংমশালের ঠিকানায় লেখকের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করা চলিবে।

পাঞ্জাবী উপকথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

পরদিন রাজা মন্ত্রীকে রাজকাজ সব বুঝিয়ে দিলেন আর বললেন যে তাঁকে কিছু-দিনের জন্য কোথাও যেতে হবে।

সারাদিন বিষণ্ণ মনে সব কাজের সুব্যবস্থা করলেন।

রাণীর আর রাত্তিরে ঘুম হলনা, ভোর না হতেই বল্‌লেন "বল তোমার জাত কি?" রাজা বল্‌লেন "এখানে নয় নদীর ধারে চল"। এই বলে রাজা রাণীকে নিয়ে নদীর ধারে গেলেন। সেখানে আবার রাজা অনেক করে বললেন যে "রাণি, দেখ এখনও সময় আছে, বলত এখনও ফিরে গিয়ে দুজনে সুখে থাকি; আমার জাত জেনে তোমার কপালে দুঃখ ছাড়া আর কিছু নাই।" কিন্তু রাণী অটল। তখন রাজা নদীতে নামলেন, হাঁটু জলে গিয়ে বল্‌লেন "রাণী এখনও সময় আছে বলত ফিরে আসি, তুমি জান না যে তুমি কি দুঃখ বরণ করতে যাচ্ছ" কোমর জলে গিয়ে আবার বল্‌লেন "এখনও বল ফিরে আসি কেঁদে কেঁদে মরে গেলেও কিন্তু আসবনা"। রাণীর কিন্তু এক কথা, আমি তোমার জাত জানতে চাই। তারপর রাজা বুক জলে দাড়ি পর্য্যন্ত জলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"রাণী, এখনও সময় আছে বল ফিরে আসি"। রাণী মাথা নাড়লেন। তখন রাজা এক ডুব দিয়ে একটু দূরে গিয়ে সাপের ফণা তুলে রাণীকে ডেকে বল্‌লেন "দেখ রাণী আমার জাত এই"



এখনো বল ফিরে আসছি

বলে জলে ডুব দিয়ে তাহার মা ও সাপিনী রাণিদের কাছে চলে গেলেন।

এদিকে রাণী কাঁদতে লাগলেন কাপড় ছিঁড়ে চুল ছিঁড়ে বারবার রাজাকে ডাকতে লাগ্‌লেন। তখন তাঁর কান্না আর কে শোনে! রাজা তাঁর মহলে সেই নদীর নীচে চলে

গেছেন। রাজার মা রাজাকে দেখে বড় খুসি হ'লেন বল্‌লেন যে "বাছা, এতদিন মানুষদের সঙ্গে থেকে তোর গায়েও মানুষের গন্ধ হয়ে গেছে, আমি চাকরাণী পাঠিয়ে ঝরণার জল আনাই তুই সেই জলে স্নান কর।" এই বলে তিনি চাকরাণীদের ডেকে বল্‌লেন যে—"ঝরণার জল একশ' কলসী নিয়ে এসো, ছেলে স্নান করবে।"

একশ ঝি নদী থেকে বেরিয়ে ঝরণার জল আনতে গেল। রাণী সেইখানে মাটিতে পড়ে কাঁদছিলেন। একটি সুন্দরী মেয়েকে এই ভাবে কাঁদতে দেখে একজন জিজ্ঞেস করলে যে কেন সে কাঁদচে। রাণী তারা কে জানতে চাওয়াতে একজন বল্‌ল যে, তারা সাপের রাজার ঝি, রাজা মানুষ হয়ে অনেকদিন ছিলেন, এখন দেশে এসে-ছেন, তাঁর গায়ে মানুষের গন্ধ তাই রাণীমা ঝরণায় জল আনতে বলেছেন স্নানের জন্য। শুনে রাণী তাদের বল্‌লেন তাঁকেও সেখানে নিয়ে যেতে। তাতে তারা কেউ রাজি হলো না। বেচারী অনেক খোসামোদ অনেক মিনতি করলেন নিজের সমস্ত গহনা দিতে চাইলেন কিন্তু কেউই তাহার কথা শুনল না। জল নিয়ে ফিরবার পথে রাণী আবার তাদের বলাতে একজনের দয়া হলো, সে বল্‌লে অনুমতি ছাড়া নিয়ে যেতে পারব না, তবে তুমি যদি কিছু বল তা রাজাকে বলব।" তখন রাণী আঙ্গুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে দিলেন।

রাজা চৌকির উপর বসে, দাসীরা একে একে জলের কলসি তাঁর মাথায় উপুড় করছে জল ফেলবার সময় রাজার মাথায় না দিয়ে কোলে জল ফেলল আংটি কোলে পড়তেই রাজা চিনতে পেরে সেটা লুকিয়ে নিলেন ও একটু পরে নদীর উপরে এলে রাণী বল্লেন তাঁর দেশে নিয়ে যেতে নইলে তিনি না খেয়ে সেখানেই মরবেন রাজা মুস্কিলে পড়লেন আর নিয়ে যাওয়াও বিপদজনক। কি করেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, "মা! মানুষের দেশের খাবার খেয়ে এখন সাপের দেশের খাওয়া আমি খেতে পারব না, তুমি যদি অনুমতি দাও তবে সেখান থেকে লোক নিয়ে আসি, সে আমায় ওদের মত রেঁধে দেবে।" ছেলে সুখী হবে মার ত আপত্তি নেই, তক্ষুণি অনুমতি দিলেন আর রাজা ও রাণীকে এনে তাঁর মার মহলে রেখে দিলেন কারণ এক সেখানেই সাত সাপিনির কাছ থেকে বাঁচবার নিরাপদ জায়গা।

সাপিনিরাও তাকে দেখেই চিন্‌ল কিন্তু রাজাও তার মার ভয়ে কিছু বলতে সাহস করল না। এইভাবে কিছু দিন যায় এক দিন রাজা বাড়ি নেই, তাঁর মাও কোথায় গেছেন সাপিনিরা সুবিধা পেয়ে রাণীকে এক ঝাঁঝরী দিয়ে বলল, যাও ত এতে জল নিয়ে এস না পারলে কামড়ে দেব, বেচারা ভয়ে ভয়ে ঝাঁঝরি নিয়ে বল্লে আর কাঁদতে লাগলেন রাজার কথা না

পাঞ্জাবী উপকথা
শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

শুনে কি বোকাম করেছেন বুঝতে পারলেন। এমন সময়, রাজা এসে সব জিজ্ঞাসা করে বললেন যে দেখ এক কাজ কর, আজি কল দিয়ে ঝাঁঝরি ফুটে বন্ধ করে দেই তুমি জল নিয়ে পাশের ঘরে রেখ। রাণী ও সেই মত পাশের ঘরে রেখে সাপিনিদের বললেন "নাও, জল এনেছি।" ওরা এসে দেখে সত্যই জল ঝাঁঝরি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

এই ভাবে সুযোগ পেলেই সাপিনিরা রাণীকে অদ্ভুত হুকুম দিত আর রাজা তাকে সাহায্য করে বাঁচিয়ে দিতেন। সাপিনিরা পরামর্শ করল যে এভাবে আর কত দিন যাবে একে না মারলে আমাদের সুখ নেই।

একবার রাজাকে দূর দেশে যেতে হবে; মাকে বলে গেলেন রাণীকে যত্ন করতে কিন্তু তিনি একা আর সাপিনি সাত, শিগিগরই ওরা সুযোগ পেল। রাণীকে একদিন একা পেয়ে বল্লে যে তাদের চিঠি রাজার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে বাপের বাড়ির পথ ঘাট বলে দিল আর চিঠি দিয়ে বল্লে যে", ভবন পিটারা" (ভুবন প্যাঁটরা) নিয়ে এস। সে বেচারা 'না' বলতে পারে না। চিঠি নিয়ে বল্ল বহু দূরের পথ। কয়েকদিন হাঁটার পর দুপুরে এক কুয়োর পাড়ে শুয়ে আছে এমন সময় রাজা তাকে দেখতে পেলেন চিঠি পড়ে দেখেন তাতে লেখা—পত্র বাহক সতীন তাকে মেরে ফেলতে! রাজা সেই চিঠি ছিঁড়ে আর একখান লিখে দিলেন—যে পত্র বাহককে সুখ আদর যত্ন করতে ও ভবন পিটারী দিয়ে দিতে।

রাণি গিয়ে সাপেদের দেশে পৌঁছতেই সব বড় বড় সাপ ফনা তুলে এল ও বেচারা ভয়েতে তাড়াতাড়ি চিঠি বার করে ফেলে দিল।

চিঠি পড়ে তার আদর দেখে কে, আদর যত্ন করে তাকে রাখা হলো। সেও এতদিনপর একটু যত্ন পেয়ে বেঁচে গেল। কয়েকদিন পর সাপিনির মা তাকে "ভবন পিটারা" দিয়ে বল্লেন, "যাও মেয়েদের দিও।" রাণি ভবন পিটারা নিয়ে আসছেন কিছু দূর গিয়ে ভাবলেন দেখি ত ভির্তরে কি আছে! প্যাঁটরার ঢাকনি খুলে দেখেন তার ভিতর আর একটা প্যাঁটরা এদিকে ঢাকনি খুলতেই সেই মাঠের মধ্যে মস্ত সহর হয়ে গেল। দ্বিতীয় ঢাকনি খুলতেই লোক লস্কর দোকান পাট কেনা বেচা। তার ভিতর আর একটা ছোট্ট ঝাটা সেটা খুলতেই মস্ত মহল কী চাকর দরওয়ান আর "রাণী" হয়ে বসলেন। দিব্বি সুখে রাজত্ব করছেন এদিকে রাজা ভাবছেন ব্যাপার কি, সে গেল কোথায়?

কিছুদিন পর রাজা খুঁজতে বেরলেন। মাঠের মধ্যে দেখেন মস্ত সহর লোক জন, তিনি আশ্চর্য্য হলেন এখানে ত কোন সহর আগে কখনও দেখেন নাই অনুমানে বুঝলেন রাণি "ভুবন পিটারা" খুলেছেন। সহরে ঢুকে রাণির সঙ্গে দেখা করে বাড়ি যেতে অনুরোধ

করলেন, কিন্তু রাণি সাপিনিদের কাছে আর যেতে রাজি নন। রাজা তখন বোঝালেন "যদি সাপিনিরা লোক পাঠায় বা রাজার বাড়ি থেকে লোক আসে তখনই সব জানতে পারবে আর সাপের প্যাঁটরা কেড়ে তোমাকে মেরে ফেলবে। বাড়ি চল,—উপায় করে তাদের মারব।"

রাণী কি করেন রাজার কথা মত স্বীকার করলেন। ছোট প্যাটরা বন্ধ করতেই মহল অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় বন্ধ করতেই লোকজন আর বড় প্যাঁটরা বন্ধ করতেই বাড়ি ঘর দোর কিছুই থাকল না। মাঠের মধ্যে রাজা ও রাণি প্যাঁটরা নিয়ে দাঁড়িয়ে! রাজা আগে চলে গেলেন। রাণী দুঃখিত মনে প্যাটরা মাথায় সাপিনিদের কাছে উপস্থিত। বেচারারা নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল তাকে দেখে কি করে সে বেঁচে এল বুঝতে পারলেনা।

রাজা একদিন তাঁর মাকে বললেন বড় "ভাল্লা খেতে ইচ্ছে করছে।" শুনে মা বললেন "আমরা ত কেউ সে জিনিষ করতে জানিনা বাবা"। রাজা বল্‌লেন "সেই মানবী ঝি সে করতে জানে? তাকে বল করতে"। রাণিমা তাকে ডেকে পাঠালেন কি কি জিনিষ চাই তা সব যোগাড় করে দিলেন। রাণি এক অন্ধকার ঘরে রাঁধতে গেলেন ও কয়েকটা 'দইভল্লা' ভেজে তৈয়ার করে রাজাকে ডেকে খাওয়ালেন। রাজা খেয়ে পাশে অন্ধকার কাঠের ঘরে লুকিয়ে রইলেন। তারপর রাজার মা এসে খেয়ে গেলেন। তখন বড় সাপিনী রাণিকে ডাকা হলো রাণি কড়ায় অনেক তেল দিয়ে বসে আছেন। বড় রাণি অন্ধকার কুঠরির দিকে পিছন করে খেতে বসেছেন। পিছন থেকে রাজা তার লেজ ধরে গরম তেলের কড়ায় ফেলে দিলেন। সে তখনই মরে গেল। এরূপ সাত সাপিনীকে মেরে ফেলে, রাজা তাঁর মার কাছে আবার কিছুদিনের জন্য বিদায় নিয়ে রাণির সঙ্গে ফিরে এসে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

* "ভাল্লা—দই কড়াই ডালের, বড়া, ভেজে টক দইয়ে ভিজিয়ে তৈরী হয়। পাঞ্জাবে "ভাল্লা" একটি উপাদেয় খাদ্য।



উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চিত্রিত

সাদাচুড়ো দালানের কবাট খুলে' গেল। ফুটফুটে একটি ছেলে বার হয়ে এলো, যেন আকাশে চাঁদ ফুটলো। তার চাঁদপানা মুখ দেখে' আমার মন মায়ায় ভরে' গেল।

মহর্ষি বললেন, "অমরলতার পাহাড়ীরাজ্যের কবি এ। সুকণ্ঠ এর নাম। আমি যখন ধ্যানে বসি, সন্ধানীরা যখন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলেন, তখন আমাদের কিশোর কবিটি একলাটি বসে' অগণ্তি কবিতা লেখেন। লিখে' লিখে' অমরলতার নামে উৎসর্গ করে' দেন।"

মহর্ষি শুধোলেন, "সুকণ্ঠ, মনে পড়ে সেই যে অমরলতার পূজোর রাতে কবিতা লিখেছিলে—

'কোথায় আছো অমরলতার দাসী!
সাগরপারে ফুল ফুটেচে রঙীণ রাশি রাশি।'

সুকণ্ঠের মুখ উজ্বল হয়ে উঠল। কোন্ আলোকরাতের অপরূপ স্বপ্ন নেমে এলো তার চোখে। তার দুটি চোখ বুজে' এলো। সে বললে, 'মনে পড়ে, মনে পড়ে মহর্ষি।' এই বলে' সে তার কেঁপে কেঁপে যাওয়া সুরেলা গলায় আওড়ালে,

'হায়রে হায় হায়,
কোন্ মায়াবী রঙীণ লতায় ফুল ফুটিয়ে' যায়!
কোথায় আছো রাজার মেয়ে, অমরলতার দাসী?
আসবে কবে, গাঁথবে মালাগাছি?
হায়রে হায় হায়,
নীলসায়রে তুফান উঠে' পথ মিলিয়ে যায়।
সাগর পারে ঢেউ জমেছে আকুল রাশি রাশি।'

সেই পাহাড়ীরাজ্যের সোণালী সকাল, কিশোর কবির সেই চাঁদপানা মুখ, আর চাঁদপানা মুখের দোলনছন্দের সেই মধুর কবিতা আমার মনে হাহাকার করে' ফিরতে থাকল। নিজেকে ডেকে আপনমনে শুধোলেম, 'হায়রে হায়, কোথায় আছো অমরলতার দাসী!'

কবিতা পড়া শেষ হল। সুকণ্ঠ তখন একবার আমার পানে, আর একবার মহর্ষির পানে তাকাল। মহর্ষি হেসে আমার হাত ধরে' এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'অমরলতার রাজকনে দাসী। রাজকনে পথের ধূলোয় ঘুমিয়ে ছিলেন। পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাকে আকাশ-শেষ দেশের তেপান্তর থেকে নিয়ে আসা হয়েচে।'

সুকণ্ঠ যেন জেগে উঠল। মধুর ভঙ্গিতে শরীর হেলিয়ে পায়ের ছুটি আঙুলের উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়াল। সে যেন অমরলতার দাসীর খবরটা নিয়ে এখুনি আকাশের কোনো আশ্চর্য্য দেশে উড়ে যাবে। তাকে দেখে' মনে হল সে যেন তখন হাওয়া হ'য়ে সকালের আলোয় মিশে' গিয়ে কোনো একদিকে চক্ষের পলকে ভেসে চলে' যাবে।

তারপর, তারপর সুকণ্ঠ ছুটে চলে গেল। হাসিখুসি মুখে সবুজঘাসের উপর দিয়ে ছুটন্ত মেঘের পলাতক ছায়ার মত সে চলে গেল। খানিকবাদে হাঁপাতে হাঁপাতে সে ফিরে এলো। তার হাতে একটি চিত্রবিচিত্র লালফুল।

আমার হাতে ফুলটি দিতে গিয়ে সে জিগেস করলে, 'তোমার নামটি কি বলোতো?'

আমি বললাম, 'আমার নাম—আমার নাম নাজিরা।'

সে বললে, 'উঁহু, নাজিরা নয়, নাজিরা নয়। তোমাকে দিলেম রঙিন ফুল। তোমার নাম হোলো রঙিলা।'

এই বলে' সুকণ্ঠ মহর্ষির পানে তাকাল। মহর্ষি হেসে বল্‌লেন, 'তাই হোক। আজ হতে নাজিরার নাম হোক রঙিলা।'

স্বপ্নের রাজপুত্তুরের মত সুন্দর সুকণ্ঠ, আকাশের আলোর মত হাসিখুসি সুকণ্ঠ, নিরালা রাতের ঘুমের মত মধুর সুকণ্ঠ—সেই কিশোর সুকণ্ঠের সঙ্গে অমরলতার ঢেউখেলানো পাহাড়ী-রাজ্যে কেটে যায় দিন। পূব হতে পশ্চিমে নীলআকাশে আলো জ্বেলে ছায়া ঢেলে ছুটে যায় চঞ্চল দিন, আমরা তখন গাছের ছায়ায় কবিতা লিখি, মালা গাঁথি। সন্ধ্যায় অন্ধকার সমুদ্র হতে চুম্‌কি গাঁথা নীলাম্বরী পরে' উঠে আসেন নিশারাণী, একখানা চাঁদ তার কপালে টিপ হ'য়ে জ্বলে, আমরা দুটি তখন সাদাচুড়ো দালানের একটি ঘরে প্রদীপ জ্বেলে অমরলতার পুঁথি পড়ি।

এমনি ক'রে দিন যায়, রাত আসে, তারপর অন্ধকার ফিকে হয়ে' আলোর ছোঁয়ায় রাত মুছে যায়। সময়-পুরুষ আঁধারে আলোয় পথ হাঁটেন, পথ আর ফুরোয়না। আর পাহাড়ীরাজ্যে ব'সে আমি খেলার সঙ্গীটির কাছ থেকে অমরলতার সব খবর পাই।

সেই যে এক ঋষি সমুদ্রপারে ধ্যানে বসেছিলেন, শাঙ্খল সাপ তাঁকে একদিন অমরলতার ফুল তুলে' এনে দিয়েছিল। মেঘবর্ণের কোঠা থেকে বেরিয়ে এসে ঋষি একদিন আবার সমুদ্র-পারে এসে ডাকলেন 'শাঙ্খল।' অমরলতার ফুল নিয়ে শাঙ্খল সাপ রেখে এলো কোন্‌ রহস্য দ্বীপে!

সেই ঋষি একদিন দেহত্যাগ করলেন। তারপর কতদিন, কতরাত কাটলো, কতযুগের কত আঁধার কত আলোয় আকাশ ম্লান হল, হেসে দিলে। কত ঋষি এলেন, কত কঠোর তপস্যা শেষে তাঁরা স্বর্গে গেলেন। কিন্তু অমরলতার তপস্যায় কেউ বসলেন না। সে সাহস কারো হোলনা। পৃথিবীতে হাহাকার উঠলো, অমরলতা যাঁরা খুঁজে ফিরছিলেন সেই সন্ধানী-দের মুখ কালো হল, হায়। তবে কি অমরলতা মানুষের হোলোনা! পাঁচশোবছর পরমায়ু, সে কি আকাশকুসুম হয়ে রইল।

তখন একদিন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল। সন্ধানীরা একরাত্রে সকলে মিলে এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখলেন। তাঁরা স্বপ্নে দেখলেন মহাসমুদ্রের শেষ দিগন্ত হতে একখানা নৌকো বেয়ে একটি অদ্ভুত মানুষ আসচেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ ঋষি তিনি, মহর্ষি পিঙ্গল। অমরলতার তপস্যায় বসে মানুষকে লতার খোঁজ দেবেন তিনি।

পাঁচশো সন্ধানী সমুদ্রের পারে এসে দাঁড়ালেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাঁরা সমুদ্রপারে ঠায় অপেক্ষায় রইলেন। দুপুররোদে তাঁদের শরীর ঝলসে গেল, তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই। রাতে চোখে ঘুম নেই, পাঁচশো মশাল জেলে পাঁচশোজন সমুদ্রের শেষ ঢেউটির পানে তাকিয়ে রইলেন। শেষে, একরাত্রে হাওয়া পড়ে' এলো, সমুদ্র যেন ঘুমে ঢলে' পড়লন একখানা চাঁদ শান্ত সমুদ্রের উপর কী একটা কথা বলতে রাতের আকাশে ফুটে উঠলো। তখন একখানা হাতীর দাঁতের ছোট্ট নৌকো মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এসে পারে লাগলো, মহর্ষি পিঙ্গল এলেন।

পাঁচশো মশালের আলোয় পথ দেখে' মহর্ষি পিঙ্গল এলেন পাহাড়ীরাজ্যে। সেখানে দেখতে দেখতে একটু একটু ক'রে গড়ে' উঠলো অমরলতার অপরূপ রাজ্য। মহর্ষি বসলে ধ্যানে, পাঁচশো সন্ধানী দলভারী হয়ে পাঁচলাখে হল পাঁচটি দল। একটি দল হলেন সেবক, তাঁরা বারোমাস থাকেন অমরলতার রাজ্যে। বাকী চারলাখে হল দুটি দল। ছমাস ছমাস ক'রে একটিদল বেরিয়ে পড়েন পৃথিবীতে, পাহাড়ে অরণ্যে সমুদ্রে খুঁজে ফেরেন অমরলতা। একদল যখন এমনি ক'রে হায়রাণ হ'য়ে পড়েন, অন্যদল তখন পাহাড়ীরাজ্যের ঠাণ্ডা বাতাসে একটু জিরিয়ে নেন।

এদিকে তপস্যা চলে মহর্ষির। অমরলতাকে দেখতে পান তিনি, দেখতে পান রূপসী-লতা, সোণালী ফুল। দেখতে পান সবুজদ্বীপ যেখানে একলা আকাশের তলায় একলা ফুটে আছে লতা। কিন্তু নিশানা পাননা সবুজ দ্বীপের! কোন্ সমুদ্রের শেষে কোন্ আকাশের তলায় সবুজ দ্বীপ, ঠাহর হয়না ঋষির। একদিন ধ্যানে ঋষি দেখলেন, একটি বালিকা আর একটি পুরুষ। খোলা তলোয়ার হাতে দৈত্যের মত বিরাট পুরুষ চলেছে, তার পিছু পিছু চলেছে বালিকা। তারপর, সেই বালিকা যেন ফুল তুললে। তখন সবুজ দ্বীপের আকাশ যেন সুনীল হ'ল, সমুদ্র শান্ত হল, আর দেশবিদেশ হতে পাল তুলে জাহাজ বেয়ে যেন সন্ধানীরা এলো।

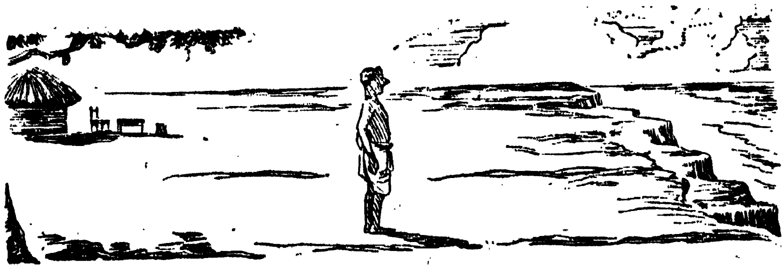
অমরলতার গল্প বলতে বলতে সুকণ্ঠ হেসে বললে, 'এই বালিকা কে জানো? তুমি। তুমিই মহর্ষিকে ধ্যানে দেখা দিয়েছিলে। তাই মহর্ষি তোমাকে তাঁর কাছটিতে নিয়ে এসে-

ছেন। কিন্তু খোলা তলোয়ার হাতে সবুজদ্বীপের পথ দেখিয়ে যে নিয়ে যাবে তোমায়, সে কে জানো?'

সুকণ্ঠ খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললে, 'অনেকে বলে, সে হয়তো বজ্রনাথ। দৈত্যের মত বিশাল তিনি। তাঁকে দেখলে লোকে ভয় পায়। চমৎকার চেহারা তাঁর, কিন্তু বড় কঠোর। যেন আগুন জ্বলচে। মহর্ষির প্রধান শিষ্য তিনি।'

আমার পানে একটুক্ষণ স্থিরচোখে তাকিয়ে থেকে সুকণ্ঠ বললে, 'কিন্তু মহর্ষি বলেন, ধ্যানে দেখা বিরাট পুরুষকে তিনি চেনেন না। কিন্তু তা কি করে হয়? বজ্রনাথকে তো ঋষি চেনেন! তবে কি এই পুরুষ বজ্রনাথ নয়! ঋষির পুঁথি লেখে সুমন্ত্র। সে কি বলে জানো? সে বলে এ বজ্রনাথ নয়। সন্ধানীদলের লোক এ নয়। অদ্ভুত মানুষ এ। একে এখনো জানবার উপায় নেই। যেদিন তলোয়ার হাতে এ এসে হাজির হবে, সেদিন মহর্ষিও অবাক হ'য়ে যাবেন।'

ক্রমশঃ



ছুটির ঘণ্টা

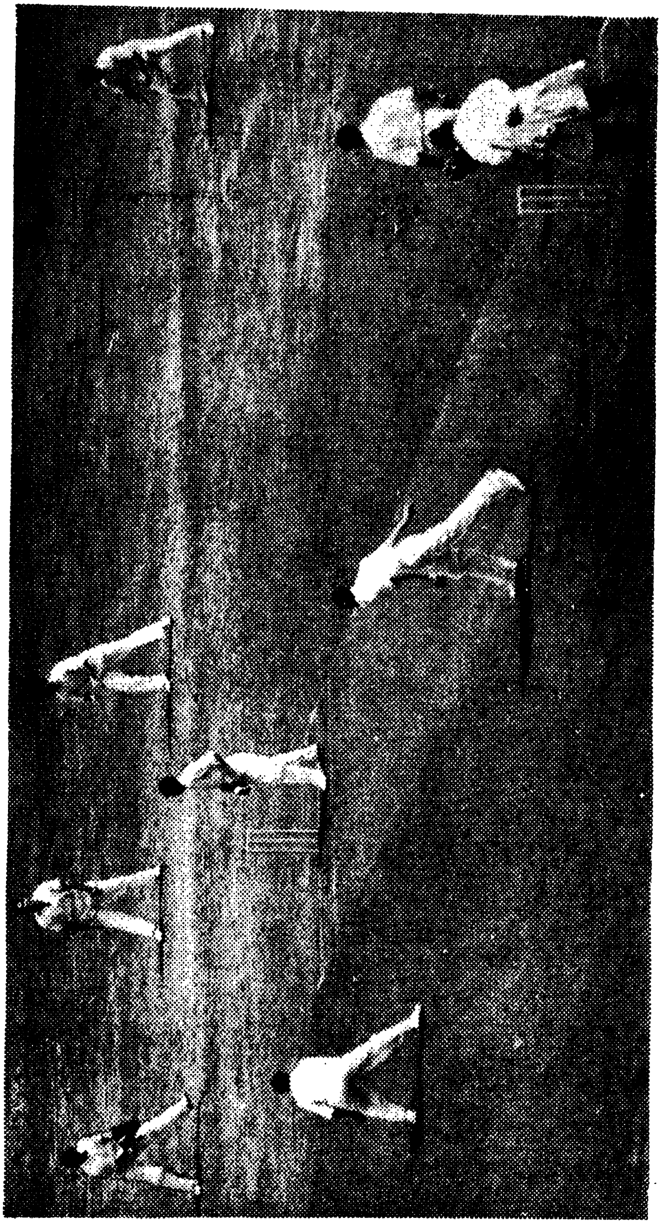
টেষ্ট ম্যাচঃ

এবার ইংলণ্ডের মাটীতে অষ্ট্রেলিয়া নামজাদা টীমদের অতি সহজে হারিয়ে ক্রীড়া মহলে চাঞ্চল্য এনেছিল। অনেকে ভেবেছিল ইংলণ্ড টেষ্ট ম্যাচে দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদম দাঁড়াতে পারবেনা। কিন্তু বিপুল জনতার সামনে প্রথম টেষ্টম্যাচে নটিংহ্যাম গ্রাউণ্ডে ইংলণ্ডের তরুণ খেলোয়াড়দের আশ্চর্য্য ক্রীড়া-দক্ষতা সকলকে মোহিত কর'ল। ওরিলী, ওয়ার্ড, ম্যাকরমিক প্রভৃতি বিখ্যাত বোলাররা তেমন সুবিধে করতে না পারায় খেলতে নেবেই ইংলণ্ড রাণের পর রাণ তুলতে থাকে। হটন ১০০, বার্ণেট ১২৬, পেণ্টার ২১৬, নট আউট ও কম্পটন ১০২—একই ইনিংসে চারটি সেঞ্চুরী টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের এক রেকর্ড। ৮ উইকেটে ইংলণ্ড ৬৫৮ রাণে ডিক্লেয়ার্ড করে। এর প্রত্যুত্তরে অষ্ট্রেলিয়া রাণ করে ৪১২। ব্রাডম্যান, ব্রাউন, ফিঙ্গলটন আউট হয়ে যেতে পতনোন্মুখ অষ্ট্রেলিয়াকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত হতে ম্যাককেব বাঁচাল ২৩৫ মিনিটে ২৩২ রাণ করে। ইংলণ্ডের বহু প্রতিদ্বন্দ্বী টীমকে এবার অষ্ট্রেলিয়া "ফলো অন্" করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস—টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়াকে বাধ্য হয়ে "ফলো অন" করতে হয়। কিন্তু ব্রাউন ও ব্রাডম্যান মনে গভীর সাহস নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের আক্রমণকে ব্যর্থ করল অতি সহজে। ব্রাউন ১৩৩ ও ব্রাডম্যান ১৪৪ নট আউট—অষ্ট্রেলিয়ার ক্রীড়ানৈপুণ্যের ফলে ইংলণ্ডের জয়ের আশা ভেঙ্গে চুরমার হল। ৬ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া ৪২৭ রাণ করে। খেলাটি চারদিন হওয়ায় সময়ের অভাবে ড্র হয়।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয় বিখ্যাত লর্ডস্ গ্রাউণ্ডে। এবারও ইংলণ্ড টস্ জিতে ভাল মাঠে প্রথম খেলতে নাবল। ম্যাকরমিকের বলে ইংলণ্ডের নামজাদা প্রথম তিনটি ব্যাটস্ম্যান হাটন, বার্ণেট ও এডরিচ অতি অল্পরানে আউট হয়ে যায়। ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন হ্যামণ্ড ও পেণ্টার প্রতি বলটি দেখে খেলে অতি দক্ষতার সহিত রাণ করল ২৪০ ও ৯৯। দু'দুটো সেঞ্চুরী রাণ করে হ্যামণ্ড শুধু সম্মান পাননি প্রায় পরাজয়ের হাত হতে ইংলণ্ডকে বাঁচিয়ে টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সর্ব্বোচ্চ রাণ করে ক্রিকেটে এক নূতন রেকর্ড করলেন।

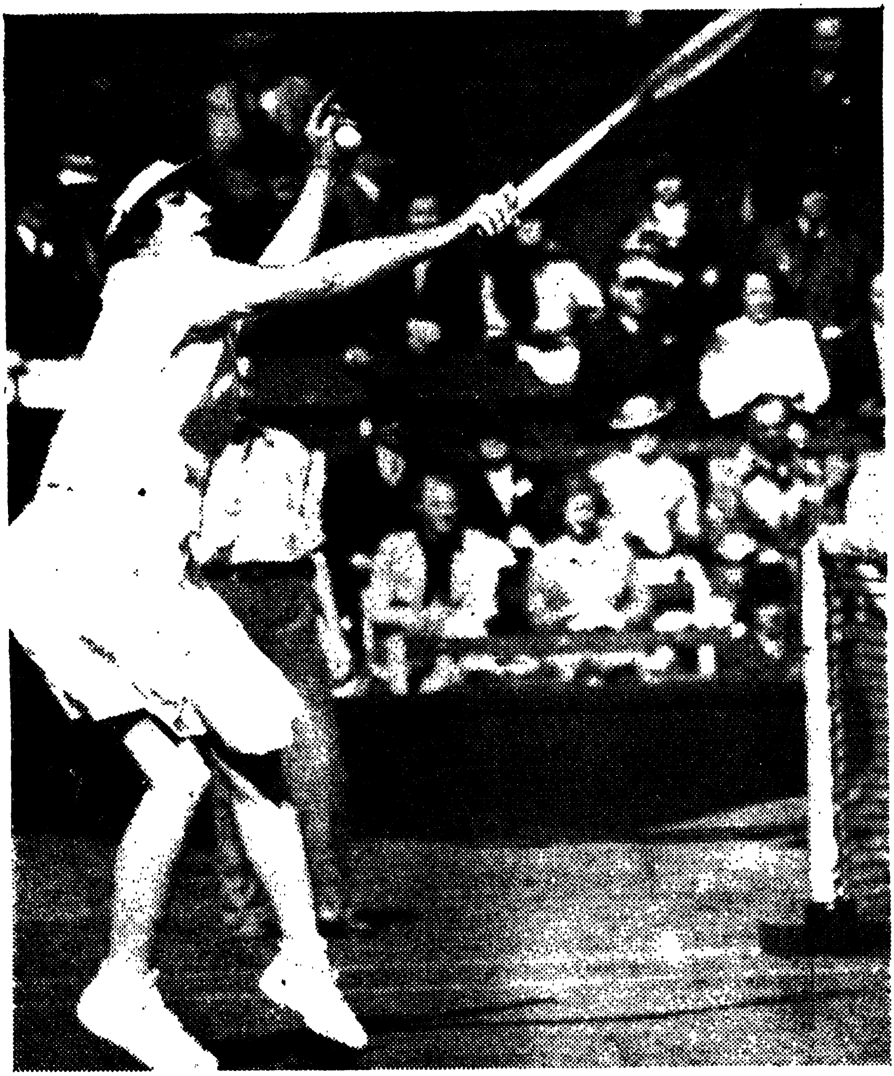
ব্রাউন ইংলণ্ডকে অপদস্থ করে রাণ করে ২০৬। একমাত্র ব্রাউনের ক্রীড়াফলে অষ্ট্রেলিয়ার মোট রাণ হয় ৪২২। দ্বিতীয় ইনিংস বেশ প্রতিযোগিতামূলক হয়।

অতি অল্প রাণে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা আউট হয়ে যেতে পেণ্টার ৪৩ ও কম্পটন ৭৬রাণ করে ইংলণ্ডকে বাঁচাল। এবার হ্যামণ্ড রাণ করে মাত্র দুই। ৮ উইকেটে ২৪২ রাণে ইংলণ্ড ডিক্লেয়ার্ড করতে খারাপ



ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচ

মাঠে অষ্ট্রেলিয়, সময়ের অভাবে জয়ী হতে পারল না। এবারও ব্রাডম্যান ১০২ আরেকটি সেঞ্চুরী করে সকলকে বিস্মিত করে। এই নিয়ে ব্রাডম্যান ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ২৫টি টেষ্ট ম্যাচে ৪০ ইনিংস খেলে ১৪টি



মিসেস মোদী সার্ভ করছেন

সেঞ্চুরী রাণ করল। তারপর বিখ্যাত হব্‌সের রেকর্ডকে ব্রাডম্যানই ম্লান করে দেয়। ৪১ টেষ্টে ৭১ ইনিংস খেলে হবস্‌ রাণ করেছিল ৩৬৩৬। ব্রাডম্যান অতি অল্প টেষ্ট ম্যাচ খেলে হবসের চেয়ে উচ্চতর রাণ করে ক্রিকেটে আর একটি নূতন রেকর্ড করল্‌! খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ২০৪ রাণে সময়ের

অভাবে এবারও ড্র হয়। দুই টেষ্ট ম্যাচে নামজাদা ব্যাটসম্যানরা নিজেদের ক্রীড়া গৌরবের পরিচয় দিলেও শুধু যাদুকর বোলারের অভাবে কোন দলই জয়লাভ করতে পারল না।

ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট মুষ্টি-যুদ্ধঃ—

অনেকখানি সাহস নিয়ে ম্যাক্স্মেলিং জার্ম্মান মুষ্টিযোদ্ধা অপ্রতিদ্বন্দ্বী জোলুইএর সঙ্গে নিউইয়র্কে ইয়াঙ্কি ষ্টেডিয়ামে সাক্ষাৎ করেছিল। প্রায় আশি হাজার দর্শকের সামনে বর্ত্তমান সময়ের দুই শ্রেষ্ঠ মুষ্টিবীর লড়তে নাবল। নিগ্রোবীর জো লুই ১৫ রাউণ্ড যুদ্ধে প্রথম রাউণ্ডেই সকলকে বিস্মিত করে দেয়। মাত্র দুই মিনিট ৪ সেকেণ্ড লড়াইয়ের পর হঠাৎ জোলুইএর প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে জার্ম্মাণ বীর স্মেলিং ধরাশায়ী হল। স্মেলিংএর আর লড়বার শক্তি ও সামর্থ্য না থাকায় জোলুই অতি সহজে আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান পেল। এই যুদ্ধে টিকিট বিক্রি হয়েছিল প্রায় ১৪০,০০০, পাউণ্ড। জোলুই চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় সেদিন সারা আমেরিকায় নিগ্রোরা আমোদ ও আনন্দে কাটিয়েছিল।

ওয়েম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ—

টেনিসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টুর্ণামেণ্ট হলো বিলেতে ওয়েম্বলডন্ টেনিস টুর্ণামেণ্ট। দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ এমেচার টেনিস খেলোয়াড়রা প্রতি বছরই যোগদান করে থাকেন। এবং প্রতি বছরই জগতের চারটি শ্রেষ্ঠদল ব্রিটেন, জার্ম্মানি ও আমেরিকার ভিতর চ্যাম্পিয়ানসিপ নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা হয়। আগেকার চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড়রা যেমন ভাইনস্, কোসে, টিলডেন প্রভৃতি প্রফেসনাল খেলোয়াড় হয়ে যেতে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্ন না হলেও তেমন উৎসাহ ও প্রতিযোগীমূলক হয়না। আমেরিকার তরুণ খেলোয়াড়দের সঙ্গে অন্যান্য দেশের নামজাদা প্রবীণ খেলোয়াড়রা কোন মতেই পেরে উঠছেনা। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় আমেরিকার ব্যাজ এবার অতি সহজে ফাইন্যালে উঠে ব্রিটেনের প্রধান খেলোয়াড় অষ্টিনকে সাক্ষাৎ করে। খেলায় অষ্টিন নিজের কৃতিত্ব দেখতে পারেনি। অষ্টিনকে একদম দাড়াতে না দিয়ে ব্যাজ অতি সহজে ৬-১,৬-০,৬-৩ গেমে জয়লাভ করে। মিকস্ ডবলাস্ ফাইন্যালে ব্যাজ ও মিস মাবেল, হেন্কেল ও মিস ফেবিয়ানকে হারান। তারপর পুরুষ ডবলস ফাইন্যালে প্রবল প্রতিযোগিতায় ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয় দিয়ে ব্যাজ ও মেকো (আমেরিকা) ৬-৪,৩-৬,৬-৩, ৮-৬ গোলে হেন্কেল ও মেটেস্কা (জার্ম্মাণ) কে পরাজিত করেন। তিনটি বিভাগেই চ্যাম্পিয়ান হয়ে ব্যাজ শুধু রেকর্ড নয় জগতের একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে সম্মান পেলেন। মহিলা সিঙ্গল্স্ ফাইন্যালে দুই বিখ্যাত আমেরিকা খেলোয়াড় সাক্ষাৎ করেছিলেন। মিসেস মোদী অতি সহজে ৬-৪,৬-০ গেমে মিস্ জেকবসকে হারিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। এই নিয়ে মিসেস মোদী ৮বার ওয়েম্বলডন্ মহিলা চ্যাম্পিয়ান হলেন। জগতে টেনিস খেলায় আজ পর্য্যন্ত কোন মহিলা খেলোয়াড় এত বড় সম্মান পাননি। এবারকার ওয়েম্বলডন্ টুর্ণামেণ্টে সবচেয়ে বিশেষত্ব হলো—ভারতীয় টীমের যোগদান করা। ভাল খেলেও তাঁরা উত্তম খেলোয়াড়দের কাছে হার স্বীকার করেন। আর সকল দেশকে অপদস্থ করে আমেরিকা সমস্ত ফাইন্যালে জয়ী হয়ে টেনিসে এক বিজয় কীর্ত্তি রাখল।

ইণ্টার ন্যাশন্যাল চ্যারিটি ম্যাচঃ—



ভারতীয়-ইউরোপীয়—ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফুটবল দল

কলিকাতার লীগে ভারতীয় দল বনাম ইউরোপীয়ান দলের চ্যারিটি ম্যাচটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার ইন্টার ন্যাশন্যাল ম্যাচ সবদিক দিয়েই রেকর্ড করেছে। অতি অল্প সংখ্যক দর্শকের সামনে দুই নিকৃষ্ট দল বাজে খেলে সকলকে নিরুৎসাহ করেছে। এই খেলায় টিকিট বিক্রি হয়েছিল মাত্র চার হাজার আটাস টাকা। আগে এই ম্যাচ দেখবার জন্যে মাঠে ভীড় কম হত না। কিন্তু লীগের মুখে দুই তিনটে চ্যারিটি ম্যাচের পর আবার চ্যারিটি ম্যাচে সেই পুরোন খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে কারো উৎসাহ থাকে না। খেলায় ভিজে মাঠে হেণ্ডারসন একটি গোল দেয়। বহু সুযোগ পেয়েও ভারতীয় দল সেই গোল শোধ করতে পারেনি। ১৯৩৬ সালে এই ম্যাচে ৩-৩ অল ড্র হয় এবং ১৯৩৭ সালে ভারতীয় দল ২-০ গোলে জয়ী হয়েছিল।

লীগ ঃ—

লীগের দ্বিতীয় হাফের সঙ্গে খেলার উৎসাহ ও তীব্র প্রতিযোগীতা বেড়ে গেছে। মহমেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও কাষ্টমস—এই তিন টীমের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলেছে লীগ চ্যাম্পীয়ানের জন্যে। মহমেডান তিন পয়েন্টে সকলকে পেছিয়ে বাধা পেল মোহনবাগানের কাছে। মোহনবাগান ভাল খেলে গোল দিতে না পারায় খেলাটি ড্র হয়। মাননীয় বাঙ্গলার অস্থায়ী গভর্ণর এই খেলাটি দেখতে এসেছিল। খেলার

শেষে রেফারি বেচারা এস, ঘোষ অনেক কষ্টে সার্জ্জেন্টের সাহায্যে জনতার আক্রমণ হতে কোন মতে প্রাণে বেঁচে বাড়ী পালায়। কিন্তু আশ্চর্য্য সেই রেফারির আশ্চর্য্যকর অন্যায় রেফারিংয়ের জন্যে সুন্দর খেলে ই, বি, আর দুটি 'আফসাইড' গোল খেয়ে পরাজিত হয়। লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার আশায় মহমেডান রহমৎকে আনিয়েছে বাঙ্গালোর হতে। অন্যদিকে জল বৃষ্টির মধ্যে এরিয়ান্সের কাছে এক পয়েন্ট ও মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র করায় আরেকটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করায় ইষ্টবেঙ্গল চাম্পিয়ান হবার সব আশা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশকে আশ্চর্য্য ভাবে খেলার শেষ মুখে এক গোলে হারিয়ে ইষ্টবেঙ্গল মাত্র দুই পয়েন্টে পেছিয়ে আছে। অন্য গেমগুলি পরাজিত না হলে শেষ খেলা মহমেডানের সঙ্গে চ্যারিটি ম্যাচে এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ানের সব নির্ভর করছে। ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণ ভাগের দুটি শ্রেষ্ঠ ব্যাক, হাফে বি, সেন ও নন্দী এবং ফরওয়ার্ডে মুর্গেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণের ক্রীড়া নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। কাষ্টমস লীগে এত উচ্চ স্থানে বহুদিন হয় উঠেনি। বৃষ্টি পড়লে হয় ত কাষ্টমসের ভাগ্য ফিরে যাবে। করুণা ভট্টাচার্য্য ও সিম্যান কাষ্টমসের দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের ওপর টীমের লীগ চ্যাম্পিয়ান সব নির্ভর করছে। পুলিস লীগে আরও রেকর্ড করেছে দুইবার মহমেডনেকে অতি সহজে হারিয়ে। দ্বিতীয় হাফে ৫-১ গোলে হারিয়ে পুলিসের কৃতিত্ব বেড়ে গেল। মোহনবাগান জুনিয়ার খেলোয়াড় নিয়ে লীগে মন্দ করেনি। সুদক্ষ খেলোয়াড়ের অভাবে ভারতের প্রিমিয়ার টীমের দুর্দ্দশা শোচনীয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। একমাত্র গোলকিপার ভট্টাচার্য্য, কে বানার্জ্জি, যোগী দত্ত, বেণী প্রসাদ এবং ফরোয়ার্ডে এন ঘোষ ও এন, চৌধুরীর ক্রীড়াদক্ষতা প্রসংশনীয়। ই, বি, আর ক্যামেরোনিয়ান্সকে কম করে ১০-০ গোলে হারিয়ে বিস্মিত করেছে কিন্তু ক্যালকাটার কাছে ড্র করে ই, বি, আর-এর কৃতিত্ব রইল না। সামাদকে এবার মাঠ থেকে বিদায় নেওয়া উচিত। একমাত্র ব্যাকে কার্ভে টীমকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরিয়ান্স লীগে মন্দ করেনি। কে, প্রসাদ, তালপাত্র, এস দে'র প্রশংসনীয় খেলা উল্লেখযোগ্য। কালিঘাট ক্রমশঃ লীগে নিম্ন স্থানে পৌঁছেচে। জন, জোসেফ প্রভৃতি সব খেলোয়াড় নিয়মিতভাবে খেলতে না পারায় প্রায় গেমেই তেমন সুবিধা করতে পারেনি। এদের নন্দী উৎকৃষ্ট খেলে বাহবা পেয়েছে। দুই মিলিটারী টীমের সবচেয়ে দুর্দ্দশা। ক্যামেরোনিয়ান্স ও কে, ও, এস, বি লীগের প্রথম মুখে মন্দ খেলছিল না। কিন্তু হটাৎ ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে, প্রায় গেমেই হার স্বীকার করে মিলিটারী দলের কীর্ত্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। বহুবার শীল্ড ও লীগ বিজয়ী দুর্দ্দান্ত প্রিমিয়ার ইউরোপীয়ান ক্লাব ক্যালকাটার আশ্চর্য্যকর অধঃপতন এবারকার লীগের বিশেষত্ব। ক্যালকাটা ও ডালহৌসি নিকৃষ্ট খেলার পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে লীগের ফুটবল ষ্টাণ্ডার্ড নিম্নস্থানে এসে পৌছয়। ভাল ইউরোপিয়ান খেলোয়াড় কলিকাতায় না থাকায় ডালহৌসি বি ডিভিসনে নেবে গেছে এবং ক্যালকাটাও সেই পথে চলেছে। লীগের সবচেয়ে নীচে ভবানীপুর অথচ এই

ভবানীপুর গতবছর লীগের রাণার্স আপ্ ছিল। বাইরের খেলোয়াড় নিয়ে ভবানীপুরের নিকৃষ্ট খেলা হয়ত ভবিষ্যতে অন্য টীমদের শিক্ষা দেবে। মহমেডান ও ইষ্টবেঙ্গলের মধ্যে কে লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে এবং ক্যালকাটা ও ভবানীপুরের মধ্যে কে বি ডিভিসনে নাববে বলা শক্ত। *

লীগের ফলাফল (৫ই জুলাই পর্য্যন্ত)

	খেলা	জয়	ড্র	পরাজয়	গোল	বিঃ	পয়েণ্ট
মহমেডান ··· ···	১০	১২	৪	৪	৩৬	১৯	২৮
ইষ্টবেঙ্গল ···	১৯	৮	৮	৩	২৩	১৩	২৪
কাষ্টমস ···	১৯	৮	৮	৩	২৩	১৪	২৪
পুলিশ ···	২০	১০	৩	৭	৩২	২১	২৩
মোহনবাগান ···	১৯	৫	১০	৪	১৬	১৩	২০
ই, বি, আর ···	১৯	৬	৭	৬	২৫	২২	১৯
এরিয়ান্স ···	১৯	৭	৫	৭	২০	২৮	১৯
কালিঘাট ···	১৯	৪	১০	৫	১৮	২৪	১৮
ভবানীপুর ···	১৯	৬	৩	১০	২২	৩৭	১৫
ক্যালকাটা ···	১৯	৪	৭	৮	৯	১৭	১৫
ক্যামেরনিয়ান্স ···	২১	৪	৬	১১	১৮	৩২	১৪
কে ও,এস, বি ···	১৯	৫	৩	১১	২৫	২৮	১৩

* এ লেখাটা আমরা ৫ই জুলাই পেয়েছিলাম। মহামেডানস লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কাষ্টমসকে Replayতে ১—০ গোলে হারিয়ে। কলিকাতা দল লীগ টেবিলে নীচে নেমে তাঁদের হয়ত পরের বছর ২য় ডিভিসনে খেলতে হবে। কিন্তু এই দলের আভিজাত্যের দরুণ তাঁদের নীচে এবার নামান হবে কি না সে বিষয় আলোচনা সাপেক্ষ। সম্পাদক।

রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাই বোন,

তোমাদের সব সময়ে আনন্দের কথাই বলতে ইচ্ছে করে, তোমাদের মুখে হাসি দেখতেই ভাল লাগে। ইচ্ছে করে কবির কথায় তোমাদের বলি—'ঈশ্বর আছেন স্বর্গে, পৃথিবীর খবর সব ভালো," কিন্তু তা সব সময়ে পারা যায় কই!

পৃথিবীর খবর সত্যি যে আর খুব ভালো নয়। মিথ্যে করে সুখবর বানিয়ে বলতে তাই আজকে বাধছে। মনে হচ্ছে সুখবর যদি না থাকে ত মিথ্যে খবরে তোমাদের ঠকানও উচিত নয়।

সেদিন বিলাতী একটি কাগজে ছোট্ট একটি বছর তিনেকের মেয়ের ছবি দেখলাম। মুখে তার বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচবার মুখোস পরান। সে মুখোসে তাকে কি কুৎসিত যে দেখাচ্ছে কি বলব। ফুলের মত যে সুন্দর আর পবিত্র তার অমন দুর্দ্দশা দেখলে যেন কান্না পায়।

সে ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল এ ত শিশুর মুখোস নয়, এ যে পিশাচের মুখ;—যে পিশাচ আজ দেশে দেশে মানুষের ওপর ভর করে তাকে সর্ব্বনাশের রসাতলের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চীনে, স্পেনে যারা অসহায় নিরীহ, নিরপরাধ ছেলে মেয়েদের ওপর বোমা ফেলছে, তাদের এই পিশাচই পেয়ে বসেছে, মা বাপ ভাই বোনের দুঃখ তারা বোঝে না, শিশুর আর্ত্তনাদ তাদের কাণে যায় না, মানুষের যা কিছু ভালো কোমল সুন্দর মহৎ, সব তারা ভুলে গেছে।

চীনে ও স্পেনে আজ যে বীভৎস ব্যাপার ঘটছে, কাল তা ঘটাবার আয়োজন সমস্ত পৃথিবীতেই চলছে। সভ্যতা নিয়ে যারা গর্ব্ব করে সেই সব দেশেই মানুষের বীভৎস রূপ সবচেয়ে স্পষ্ট,—মানুষের লাঞ্ছনারও সেখানে তুলনা নেই। আকাশে মাথা তুলে, সোজা হয়ে

দাঁড়ান যার গর্ব্ব সেই মানুষ মানুষের ভয়ে মাটির তলায় ইঁদুরের মত সুড়ঙ্গ কাটছে, মানুষের কাছে মানুষের আর মুখোসে না ঢেকে মুখ দেখাবার উপায় নেই।

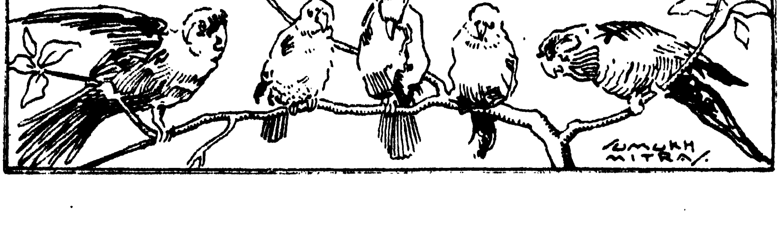
আমাদের দেশে তোমাদের সুন্দর মুখ অমন কুৎসিত মুখোসে ঢাকবার এখনো অবশ্য দরকার পড়েনি। কিন্তু তাই বলেই কি এ বিষয়ে উদাসীন থাকা যায়! বোমা যেখানে পড়ছে, বাতাস যেখানে গ্যাসে বিষিয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে দূরে আছি বলে' আমাদের ভাববার কি কিছু নেই? দেশ আলাদা হতে পারে কিন্তু চীনে ও স্পেনে আজ যে সব অবোধ অসহায় শিশুর দুঃখে দুর্দ্দশায় পাথর গলে যায় তারা তোমাদেরই সমবয়সী।

তোমাদের কাছে সেই জন্যই আজ এ অপ্রিয় কথাটা না তুলে পারলাম না। আজ যারা এই সব পৈশাচিক কাণ্ড করছে তারাও একদিন তোমাদের মত ছোট ছিল, তাদের মনও ছিল ফুলের মত সুন্দর। ছেলেবেলার মনের সে পবিত্র সৌরভ তারা হারিয়ে না ফেললে পিশাচ তাদের মধ্যে প্রবেশ করার ছিদ্র বোধ হয় পেত না।

তোমরাও একদিন বড় হবে। যতটুকুই হোক এ পৃথিবীকে গড়বার ভার তোমাদের ওপরও পড়বে। সেদিন যেন তোমাদের কাছে নিজেদের ছেলেবেলা একেবারে ঝাপসা না হয়ে যায়। সুন্দরকে ভালবাসবার, মহৎকে সম্মান করবার, সত্যকে স্বীকার করবার, অপরের দুঃখ বোঝবার যে শক্তি ছেলেবেলার তাজা মনের অমূল্য সম্পদ, বয়সের সঙ্গে তা একেবারে ক্ষয় করে না ফেল্লে পৃথিবীকে এমন কুৎসিৎ করে তুলতে মানুষ পারত না। মানুষকে মূষিকের মত সুড়ঙ্গ কাটতে তাহলে হ'তনা, শিশুর মুখ ঢাকতে হ'ত না কুৎসিত মুখোসে।

তোমাদের—

সম্পাদক মশাই



ভূমিকা

আজ এক শতাব্দী পূর্ব্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। কোন মহাপুরুষের শতবার্ষিকী এক সভায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বক্তৃতাকালে বলেছিলেন—'He has made a century and is not yet out' এ কথাটি বঙ্কিমবাবুর ওপরও প্রযোজ্য। বাস্তবিক, সাহিত্যে উপন্যাসে, গল্পে, গানে বঙ্কিমচন্দ্র যা দিয়ে গিয়েছেন তা চিরদিন অমর ও অতুলনীয় হয়ে থাকবে! তিনি শুধু দেশানুরাগী ছিলেন না, মানব চরিত্রে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। শুধু দেশপ্রীতির বাণী নিয়েই তাঁর 'বন্দেমাতরম্' গানটি ফুটে ওঠেনি দেশমাতৃকার আন্তরিক পরিচয় তিনি গানটিতে দিয়েছেন। আর তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধে তাঁর যাদুহাতের স্পর্শে মানুষের চরিত্র অপূর্ব্ব মহিমময় হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন সত্যিকারের সাহিত্যগুরু—বাংলার নব্যযুগের সাহিত্যধারা তার যা সুন্দরতম প্রকাশ তা প্রথম তিনিই দেখিয়েছেন। তাঁর লেখা "কপালকুণ্ডলা", "আনন্দমঠ", "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতি প্রত্যেকটি নিজের অপরূপ বিশেষত্বে চিরদিন ফুটে থাকবে। তাঁর গান দাক্ষিণাত্য থেকে হিমাচল পর্য্যন্ত গীত হ'তে থাকবে বহুকাল, বহুকাল ভারতবাসীকে তাঁর গান নূতন উদ্দীপনা ও আনন্দে জাগিয়ে রাখবে। তোমরা বড় হয়ে তাঁর লেখাগুলি পড়ে মুগ্ধ হবে, বুঝতে পারবে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্র বিশ্লেষণের কথা। ভেবো না শুধু তাঁর লেখাগুলিতে সমাজ ও ধর্ম্মবিষয়ক বড় বড় গভীর তত্ত্বকথা, মানব মনের অপূর্ব্ব প্রকাশ, গভীর দেশপ্রীতির কথাই আছে—তা নয়, তাঁর লেখা অনাবিল হাস্যরস ও কৌতুকেও সুন্দরতর হয়েছে। তাঁর লেখাগুলি, তাঁর বাণী যতদিন ভারত বেঁচে থাকবে ততদিন সেগুলিও শিক্ষা আনন্দে ভারতবাসীর মন তাজা রাখবে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে অনুসরণ করে তাঁর কথা একটু বদলে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মউৎসব উপলক্ষ্যে আমরা বলি :—Bankim Chandra would make many more centuries and shall never be out.

রংমশালের কোন গত সংখ্যায় হিমালয় অভিযানে টিলম্যান দলকে আমরা তাঁদের যাত্রা জয়যুক্ত হোক বলে শুভকামনা জানিয়েছিলাম। একথাও আমরা বলেছিলাম অপরাজেয় নগাধিরাজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতশৃঙ্গকে জয় করার মত দুঃসাহস ও য়্যাডভেঞ্চার নেই। এবারেও এক দৃঢ়সঙ্কল্প পাকা দলকে হার মানতে হয়েছে। অবশ্য তাঁদের চেষ্টা ও সাহসের অভাব ছিল না, মানুষের অগম্য স্থানেও বিপদসঙ্কুল জায়গাতেও তাঁরা পৌছতে পেরেছিলেন। কিন্তু হিমালয়ের কোলে ঝড় জলের চলাফেরা রহস্যময়! কে জানে সে সব বিজ্ঞানের বোধগম্যর বাইরে কি না! যাই হোক মানুষের দলকে হার মানলেও তাতে লজ্জার কিছু নেই। প্রকৃতি রহস্যময়ী, প্রকৃতির ভয়ঙ্করের তুলনায় মানুষ কতটুকু! তাঁদের যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হয়েচে তা অমূল্য। আশা করি পুস্তক ও চিত্রযোগে তাঁদের এ অদ্ভুত অসমসাহসিক অভিযানের কথা আমরা জানতে পারব ও আমরাও যুগপৎ আনন্দ বিস্ময় ও অভিজ্ঞতা লাভ করব! তবুও প্রকৃতি যতই দুর্দ্দান্ত ও অপরাজয় হোক আমরা আশা করতে ছাড়ব না যে ভবিষ্যতে কোন মানুষের দল নিশ্চয় একদিন হিমাচলশৃঙ্গে আরোহণ করে দেখাতে পারবে প্রকৃতি তার আপন রহস্য পরিশ্রমী ও অনুসন্ধানীদের কাছ থেকে বেশীদিন লুকিয়ে রাখতে পারেন না। নাঙ্গা পর্ব্বতে যে জার্ম্মাণ অভিযানটি এবার গিয়েছে তারা এখনও আশা ছাড়েনি। নাঙ্গা পর্ব্বতকে তারা জয় করবেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কলিকাতায় লীগ ফুটবল এবার বেশ উত্তেজনা ও অনিশ্চিতের মধ্যে শেষ হল। শেষ পর্য্যন্ত কে যে লীগ বিজয়ী হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা ছিলনা। লীগের যবনিকার কয়েক দিন আগে পর্য্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল, কাষ্টমস ও মহামেডান্‌স এ তিন দলের যে কোন দল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতবে তা বলা শক্ত ছিল। চ্যারিটি ম্যাচে ইষ্টবেঙ্গল ২—০ গোলে মহামেডানসএর কাছে হেরে গিয়ে তার লীগ পাবার সব আশা ত্যাগ করল। তখন কাষ্টমস ও মহামেডান্‌স এ দু-দল ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। বিশেষ করে যখন শেষ ম্যাচে কাষ্টমস ১—০ গোলে মহামেডান্‌কে হারিয়ে দিলে তখন তো কলকাতা ফুটবল ব্যাপারে তুমুল কাণ্ড! অনেকে ভাবল কাষ্টমস তো বড় কম নয়—সে হকিতে তো চ্যাম্পিয়ন বটেই—এবার ফুটবলেও সে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু Replayতে মহামেডানস কাষ্টমস্‌কে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী চ্যাম্পিয়নশিপ সগৌরবে বজায় রাখল। এই নিয়ে তাদের

পাঁচবার লীগ জয় হল। বোধ হয় পৃথিবীতে এতবার কেউ কোন লীগ জয় হতে পারেনি। পাঁচবছর আগে মহামেডানস্ প্রথম ডিভিসনে প্রমোশন পেয়ে উঠেছে—আর সে বছর থেকে তাঁরা পাঁচবারই লীগ জয় হয়েছে। এবড় কম কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা নয়। বাংলায় তথা ভারতবর্ষের মহামেডানস যে একটা শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল তাতে সন্দেহ নেই। আমরা তাদের গৌরবে সকলেই গৌরবান্বিত। কিন্তু আজ আর একটা কথাও বলতে হচ্চে এবং সকলেই সেটা দেখেছেন। এবার কলকাতার মাঠগুলিতে বাস্তবিক ভাল খেলা আমরা দেখতে পাইনি। কি জানি কি হয়েছিল এবারকার ফুটবল দলগুলির মধ্যে। কোথাও খারাপ রেফারিংএর দরুণ খেলা খারাপ হয়েছে, কোথাও খেলোয়াড়রা মেজাজ খারাপ করার দরুণ খেলা নষ্ট হয়েছে। আমরা আশা করি শীল্ড প্রতিযোগিতায় কয়েকটি ভাল খেলা আমরা নিশ্চয় দেখতে পাব।

রংমশালের কোন গত সংখ্যায় আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তর মেরু অভিযানের কথা তোমাদের বলেছিলাম। উত্তর মেরু বাস উপযোগী করবার সঙ্কল্পে ও নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার মানসে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ এই অভিযানটীর পত্তন করেছিলেন। তাঁরা নানা মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করে নিজেদের দেশের ও বৈজ্ঞানিক জগতে অভূতপূর্ব্ব উপকার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কারের ফলে উত্তর মেরু সমুদ্রের বরফের গতিবিধি তাঁরা স্থির করেছেন—তাঁরা দেখিয়েছেন, যে বায়ুমণ্ডল অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয় সে বায়ুমণ্ডল বরফের গতিবিধি নির্দ্ধারণ করে। এতদ্দ্বারা ভবিষ্যতে জাহাজের নাবিকগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরে আর্টিক সাগরে তাঁদের জাহাজ চালাতে সক্ষম হবেন! এছাড়া মেরুদেশের আকাশের বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তাঁরা বলেছেন যে নিকট ভবিষ্যতে তাঁরা মেরু পার হয়ে উড়োজাহাজে নিয়মিত ভাবে আমেরিকা যাওয়া আসা করতে পারবেন!

রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকদের অভিযানের এই ফলাফল জগতকে স্তম্ভিত করেছে। উত্তর মেরু সমুদ্রে এবার জাহাজ চলবে, রাশিয়া থেকে উত্তর মেরুর আকাশে নিয়মিত যাত্রীদের নিয়ে এরোপ্লেন আমেরিকা চলাফেরা করবে!

কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম—নয় কি! ভবিষ্যতে তাঁদের ক্রমশঃ গবেষণার ফলে আমরা জানতে পারব অতীতকালে এই বিরাট উত্তর মেরু কি ছিল? অর্থাৎ পূর্ব্বে উত্তর মেরু কি

কোন বিশাল মরুভূমি না উর্ব্বরা শ্যামল ক্ষেত্র ছিল? না সমস্তটাই বিরাট সমুদ্র বা পার্ব্বত্য প্রদেশ ছিল?

বেহার, বাংলা ও আসাম বন্যার জন্য সুবিখ্যাত। এই বন্যা যে কিরূপ ভয়াবহ ও ক্ষতিকর কলকাতায় বসে আমরা কল্পনা করতে পারব না। কলকাতায় একটু জল হলে হাঁটু জলেই আমরা বন্যার আভাস পাই এবং তাতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত ও ভয়গ্রস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু বেহারে, পূর্ব্ব বঙ্গে ও আসামের বন্যা যে কী জিনিষ তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। গঙ্গা, মেঘনা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদ নদী প্রতি বছর তাদের তীরবর্ত্তী দেশ-সমুহে বিরাট ক্ষতি করে বড় বড় পুল, রাস্তা, রেলপথ ধ্বংস করেই তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, শতসহস্র মানুযের জীবন নাশে তারা বিপর্য্যয় হয়ে ওঠে। বন্যার সময় তো এই কাণ্ড। তারপর বন্যার পর দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি এসে যা কিছু বাকি থাকে তার পরিসমাপ্তি ঘটায়। ডিব্রুগড় থেকে খবর এসেছে ১৯৩১ সালের বন্যার পর সেখানে এত জল কখনও আর হয়নি। বাড়ী ঘর রাস্তা ঘাট সমস্ত বন্যার জলে নিমগ্ন! শুধু ডিব্রুগড় নয়, আরো নানা দেশ থেকে এই খবর আসছে। এই বন্যা বেহার, বাঙ্গলা, আসাম এর পক্ষে যে কি ক্ষতিকর তা বলবার নয়। সকলেরই তা জানা আছে। কিন্তু কি করা হচ্ছে এ সম্পর্কে, কি করা যেতে পারে। আমেরিকা, ইউরোপ বা অন্য দেশ হলে হয়ত কিছু করা সম্ভব হত! আমাদের দেশে বন্যার দয়াধীন থেকে দেশগুলিকে নিরাপদ করার জন্য কে মাথা ঘামাবে? বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, ধনীরা, মন্ত্রিগণ এবিষয় কি কিছুই সাহায্য করতে পারেন না? বন্যার পর যখন মানুষ, ধন, শস্য সব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যে টুকু বাকি থাকে তার জন্য সহরের রাস্তায় গান গেয়ে যে সামান্য অর্থ আমরা রোজগার করি তাতে কতটুকু হয়?



পরিচালিকা—**দিদিভাই**

আমার স্নেহের রংমশাল দল'এর ভাই বোনরা !

প্রকৃতির বুক থেকে একটা পাতা খসে পড়ে গেল, দুরন্ত বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল নিরুদ্দেশের যাত্রা পথে। আষাঢ় গেল, এলো শ্রাবণ মাস। শ্রাবণ প্রকৃতির হাসি কান্নায় ভরা, আলো ঝলমল মিষ্টি রোদ আর বর্ষণ মুখর কালো মেঘের সমারোহ নিয়ে সে আসে। অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর যখন মিষ্টি রোদ এসে পৃথিবীর বুকে ঝিলিমিলি খেলে যায় তখন মনে করিয়ে দেয় আগতদিনের আনন্দ উজ্জ্বল রৌদ্র ঝলসিত নীল আকাশের কথা—সাদা মেঘের ভেলা চলবে আকাশের বুকে। যে আসবে শ্রাবণ হলো তার অগ্রদূত !

তোমাদের পত্রের প্রতিছত্রে এঁকেছো শ্রাবণের নিখুঁত রূপ, অভিমান আর আনন্দ—মেঘ আর রৌদ্র নয় কি ? এবার এসো, মেঘ আর রৌদ্রের খেলা সুরু হোক্—

অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর) গ্রাঃ ৮৩৩

তোমার পর পর তিনটী চিঠি পেয়েছি। তোমরা যারা ব্যাজের জন্য টাকা পাঠিয়েছ আমরা পেয়েছি—তোমরা নিশ্চিন্ত থাক শীঘ্র তোমাদের ব্যাজ যাবে। ব্যাপারটা হয়েছে কি, যেরকম ব্যাজ করতে দেওয়া হয়েছিল সে রকম না করে ওঁরা যা করে এনেছিলেন তা বেশী দিন স্থায়ী হবে না—ভাই সেগুলি ফেরৎ গেছে নূতন গুলি শীঘ্র এসে পড়বে এবং আমরা আশা করি এই মাসের মধ্যে তোমাদের দিতে পারবো। কল্পনার কি খবর ? কার কার সঙ্গে আলাপ হলো ?

পরিমল চন্দ্র সরকার (Haroa) গ্রাঃ ১০৪০

তুমি ভাই রাগ করেছ—সত্যি তোমার অনেকগুলো চিঠি পেয়েছি কিন্তু উত্তর দিতে কেন পারিনি তাতো জানো এবং বোঝ—তোমাদের দিদিভাই-এর অবস্থা বুঝে রাগ অভিমান না কমালে কি করি বলত

লক্ষ্মী ভাই? 'ব্যাজ' সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলেছি, নিশ্চিন্ত থাক। কার ঠিকানা চেয়েছিলে বলতো? ভাল করে লিখে পাঠিও নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবো। রাগ করোনা আর, কেমন ভাই?

অজয় কুমার ঘোষ (এলাহাবাদ) গ্রাঃ ৪৫৭

তোমার পরীক্ষার সুখবর শুনে খুব খুসী হয়েছি—কিন্তু এর পরের ব্যাপারটার কি হবে? ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করো এবং তিনি আর চিঠি লেখেন না কেন—ভুলে গেলেন আমাদের? জিজ্ঞাসা করো। যার ঠিকানা চেয়েছ শীঘ্র পাঠিয়ে দেবো। প্রীতি উৎসবে আসতে পারোনি বলে দুঃখ করেছ—আগামী বারে এসো।

রেখা বসু (কিশোরগঞ্জ) গ্রাঃ ৪০৩

তোমায় খুব আদর করে ডেকে নিচ্ছি দিদু, শিপ্রা আর সুজাতার ঠিকানা পাবে, এত ভাইবোন তো পেয়েছ তুমি—নাইবা থাকলো আর ভাই—দেখছ বোনটী কেউ আমায় পুরস্কার দেয় না।

সুজাতা রক্ষিত (নাইনিতাল) গ্রাঃ ৮৩০

কে বলেছে তোমায় আমরা ত্যাগ করেছি? তোমার ভাই বোনেরা সমস্বরে চেঁচাচ্ছে সুজাতাদির খবরের জন্য—তাছাড়া সবাই T.B. সম্বন্ধে জানতে চাইছে। কল্পনা অঞ্জলি'রা স্যানিটোরিয়ামের কিরূপ বন্দোবস্ত জানতে চায়—তুমি সব জানিও ভাই। অত দুঃখ করে কেন চিঠি লিখেছ বলতো? আমি কি তোমায় ভুলতে পারি। তোমার বই ভি, পি, তে গেছে পেয়েছ তো? ব্যাজও পাবে—যথারীতি ব্যবস্থা আমি করবো বোন, কিছু ভেবোনা, তোমায় সবাই খু-উ-ব ভালবাসে।

অঞ্জলি সেনগুপ্তা (ভোজেশ্বর)

গ্রাহিকা নম্বর নেই কেন? সেলাইএর প্যাটার্ণ শীঘ্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে 'ভাবীগৃহিণীর বৈঠকে'র পরিচালিকাকে বলবো।

জগদীশ দাস (তেলেনী পাড়া) গ্রাঃ ১১১৭

তোমার পরীক্ষার খবর পেয়ে খুসী হলাম কিন্তু শেষেয় ব্যাপারটা? তোমার লেখা মনোনীত হয়েছে যথাসময়ে যাবে। হাতের লেখা তোমার ভালই। লেখনীবন্ধু যাদের চেয়েছ—দেবো।

সুগত দাসগুপ্ত (বালিগঞ্জ) গ্রাঃ ৮৮৮

গতবার তোমার নাম পড়তে ভুল করেছি বলে লিখেছ—এবার সংশোধন করে নিলাম। দুটো নামই খুব ভাল। তোমার বন্ধু যাবে।

নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য গ্রাঃ ১০৩৪

ঠিকানা নেই, দেশের নাম নেই কি ব্যাপার? আর শুধু শুধু নিমন্ত্রণ কেন? ভয় লাগছে যে ভাই যা দিনকাল পড়েছে। তোমার লেখা পাঠিও, মনোনীত হলেই দেওয়া হবে।

মাধুরী সেন (ঢাকা) গ্রাঃ ৮৯৭

তোমায় কি শ্রীমাধুরী বলে ডাকবো ভাই? চমৎকার চিঠি তোমার বোধ হয় নামটীর জন্য। তোমার জন্মদিন শেষ হলে তবে চিঠি পেয়েছি—তবুও আশীষ জানিয়েছি। তোমরা যারা প্রীতি সম্মিলনীতে আসতে পারনি বলে দুঃখ করেছ—তাতে আমরাও দুঃখিত হয়েছি—পরের বছর এসো ভাই। 'হাইড্রোপ্যাথী সম্বন্ধে' ভাবীগৃহিণীর বৈঠকে জানাতে বলেছি। ফটোর কথা পূর্ব্বেই বলেছি।

শিবানী সরকার (কলিকাতা) গ্রাঃ ৪০৮

তোমার পরীক্ষার সুসংবাদে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি—বিরক্ত হয়নি মোটে। নিশ্চয় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি।

মুকুল সেন (বেহালা) গ্রাঃ ৯৬২

তুমি এত বড় অপবাদ কেন আমায় দিয়েছ? অনেক ভাই বোন পেয়ে আমি অহঙ্কারী হয়েছি? তাহলে সে দোষ তো তোমাদের ভাই। সিলেটে কোন লেখনি বন্ধু চাও? গল্প মনোনীত হলে নিশ্চয় যাবে। কার সঙ্গে লেখনী বন্ধু করবে নাম জানিও।

সুজাতা গুপ্ত (দানাপুর)

গ্রাহিকা নম্বর নেই কেন বোনটী? তোমার চিঠিটী কবিতায় খুব চমৎকার হয়েছে—কিন্তু নিজের কথা কি করে ছাপাই বল? কিন্তু পড়ে খুব ভাল লাগলো ভাই।

ছবি বিশ্বাস (কলিকাতা) গ্রাঃ ৫৫২

প্রীতি সম্মীলনীতে আমায় দেখতে পাওনি সেজন্য তোমার দুঃখ হয়েছে ভাই—আমায় দেখলেই তো বোঝা যায় 'দিদিভাই' বলে। তোমাদের সুবিধার জন্য সেদিন কপালে মস্ত বড় করে 'দিদিভাই' বলে লিখে রেখেছিলুম তবুও দেখতে পেলেনা—এজন্য আমারই দুঃখ হওয়া উচিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের রংমশাল পাওনি বলে দিয়েছি—এ সম্বন্ধে সোজা পরিচালক মহাশয়ের নামে চিঠি লিখলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। কার সঙ্গে ভাব করবে জানালে ঠিকানা দেব।

সুজাতা ঘোষ (শান্তিনিকেতন গ্রাঃ ৮১৮)

তুমি সুজাতা রক্ষিতের সঙ্গে আলাপ করতে চাও আমি ঠিকানা পাঠাব। একলা বোন ছিলে, কত বোন হলো—দেখছ তো বোনটী। তুমি তো বেশ চমৎকার আঁকতে পারো—লক্ষ্মী বোন কিনা।

কামাখ্যা চন্দ্র বল (ডালটনগঞ্জ) গ্রাঃ ৮০৩

তোমরা অনেকে সুজাতা রক্ষিতের কাছে T.B. সম্বন্ধে জানতে চাও তা আমি তাকে বলে দিয়েছি। কে বলেছে তোমাদের আবদার রাখতে হাঁপিয়ে উঠেছি—? এত অল্পে হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন? শিবপ্রসাদ সেনকে বলে দিচ্ছি সে যেন লবণের বিষয় কিছু জানায় তোমাদের অনুরোধে।

অরুণ তপন ঘোষ (কলিকাতা গ্রাঃ ৭৬৭)

তুমি লিখেছ 'চিঠির বাক্স' একটা ন্যাকামীর প্রতিবিম্ব—কিন্তু তোমাদের অন্য ভাই বোনদের মত অন্য রকম। এ বিভাগ তাদের খুব প্রিয়। তোমাদের জ্ঞান যাতে হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখা হচ্ছে—শুধু জ্ঞান নয় আনন্দও চাইতো, তাই তোমাদের জন্য নানারকমের বন্দোবস্ত করা হয়—চিঠির বাক্সতে যোগ করা না করা নিজের ইচ্ছা—জোর করে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই আর তার কোন অর্থ হয়না—যারা ভালবাসে তারা যোগ দেয়।

সুবোধ গুপ্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ২০০১

তোমার হিমালয়ের অভিযানের ব্যাপারটা সবাইকে বলবো নাকি ভাই? কিন্তু ওপরে উঠেই আমায় দেখতে পেতে তারই বা কি মানে আছে? অন্য কথার উত্তর আগেই দিয়েছি ভাই।

বেলা দাসগুপ্তা (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৫২

বিবি! তোমায় পেয়ে খুব ভাল লাগলো। তুমি নেপাল সম্বন্ধে কি জানাবে লিখো ভাই।

দুর্গাচরণ বসু (সালিখা) গ্রাঃ ১১১৬

তোমার হবি'টা বেশ—ভাই বোনদের বলবো নাকি? তোমাদের সকলকার জন্যই তো এই স্থান তবে ওকথা কেন ভাই?

রবীন্দ্র নাথ মিত্র (দার্জ্জিলিং গ্রাঃ ১০৭৭)

রবি! বড় হলেও তোমার চিঠিখানা সব পড়েছি। তোমার সেই সীতা দিদিভাইএর কথা সার্থক করে তুলো। হ্যাঁ সত্যিই আমি—'A voice without a form' স্বামী বিবেকানন্দের কথাটা চমৎকার খাটে। রংমশাল দল সম্বন্ধে তোমার মতামত আগ্রহে শুনবো।

দিলীপ বন্দোপাধ্যায় (বালিগঞ্জ)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন? বেশতো চটপট করে 'রংমশাল দল'এ এসে পড়ো। রংমশালের সমস্ত নিয়ম তো ঐতেই লেখা আছে—দেখো।

লতিকা সেন (কালীঘাট) গ্রাঃ ৪২৮

প্রীতি উৎসবে এসেছিলে জেনে সুখী হলাম। তোমরা যে সব অনুযোগও অনুরোধ করেছ তা আমরা যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করবো। রংমশালকে তোমরা ভালবাস জানি ভাই। ধাঁধাঁর উত্তর আলাদা কাগজে দিলে সুবিধা হয়।

তরুণ শঙ্কর ভাদুড়ী (হাওড়া)

তোমারও ঐ ভুল, গ্রাহক নম্বর নেই। যথাসময়ে তোমরা সংবাদ পাবে—প্রত্যেককে আলাদা খবর দেওয়া সম্ভব হয়না ভাই আমাদের পক্ষে, তাই যখন সংবাদ দেওয়া হবে একত্রে রংমশালের পাতায়।

শান্তিকুণ্ড (Katihar)

আর দেরী কেন ভাই? তাড়াতাড়ি রংমশাল দলে এসে পড় এবং যাদের বন্ধু পেতে চেয়েছ বন্ধু করে নাও। আমার কি খবর তোমরা জানতে চাও বলতো? শান্তিনিকেতনের ছাত্রী তুমি জেনে সুখী হলাম।

সুনীতলাল মুখার্জ্জি (শিবপুর) গ্রাঃ ১০৯৮

তুমি বলেছ তোমার ডাক নাম 'বেজী' একথা যেন তোমার ভাইবোনকে না বলি—আচ্ছা তোমার সে কথা আমি রাখবো—কেমন? লেখনীবন্ধু সম্বন্ধে তোমাদের সকলকে একটা কথা বলি শোনো—তোমরা যারা লেখনীবন্ধু চাও তারা যদি জানাও কার সঙ্গে আলাপ করতে তোমাদের ইচ্ছা হয়—তাহলে আমার বড় সুবিধা হয়, কারণ আমি আন্দাজে দিলুম—হয়তো মনোমত হলোনা তাছাড়া বয়সের তারতম্য হলো—এমনি কত কি। তাই সবচেয়ে সুবিধা যদি তোমরা নিজেরা জানাও কার সঙ্গে ভাব করতে তোমাদের ইচ্ছা, তাহলে ভাল হয়।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী, অমলেন্দু সেন, রাজিয়া বোন! তোমরা এবং আরও অনেকে জানিয়েছ তোমাদের ভালভাবে পরীক্ষোত্তীর্ণ সংবাদ। আমি খুব সুখী হয়েছি এবং তোমাদে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি জীবনের সব পরীক্ষায় যেন তোমরা সফল হও। তোমরা অনেকে গল্প ও নানাবিধ রচনা পাঠিয়েছ প্রত্যেককে পৃথক ভাবে জানান সম্ভব নয়—তাই বলছি তোমাদের রচনা মনোনীত হলে যথাসময়ে রংমশালের পাতায় সেগুলি দেখতে পাবে।

তুষারকান্তি দত্ত, শ্যামল ভট্টাচার্য্য, অরুণ বন্দোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র কুমার নাথ (সিমলা হিল্‌স) মোহিত ভদ্র, মণিমালা মজুমদার, নিখিলেন্দ্র দাস, তরুণ ঘোষ, সুরথ বসু, পিণ্টুরাণী বসু, অজয় কুমার মিত্র, রফির (পুরোনাম লিখবে) মুকুল সেন, অজিত কুমার দাস (টুকু) বিষ্ণু (পাটনা) দিলীপ কুমার সান্ন্যাল, বেলারাণী ব্যানার্জ্জি, প্রবোধরঞ্জন দে, রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, কুমারী শিপ্রা সরকার (কাজল) মনীন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার রায়—

তোমাদের সকলের চিঠি আমি পেয়েছি—উত্তর দেবার মত বিশেষ কিছু লেখনি তো ভাই তাই জানাচ্ছি তোমাদের চিঠি পেয়েছি আমি—আর তোমরা যারা যে যে অনুরোধ জানিয়েছ তা যাতে সম্পন্ন হয় তার চেষ্টা করবো। তোমরা যারা আজ নতুন এলে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আর জানাচ্ছি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ, স্নেহ ও ভালবাসা তোমাদের সকলকে।

তোমাদের—

দিদিভাই



আলোর কণা

(গল্প)

সুষমা দত্ত (গ্রাঃ নং ৯৪৩)

গ্রামের শেষ প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে এক দুঃখীনি অনাথা থাকেন। তাঁর একটীমাত্র আটবছরের ছোট ছেলে মাণিককে নিয়ে। দুঃখিনী মায়ের বাস্তবিকই সাতরাজার ধন মাণিক ছিল সে।

শুধু মাও ছেলে, সংসারে আর কেউ ছিলনা তাদের। মা পরিশ্রম করেন সারাদিন। গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ীতে ধান ভেনে, চাল ঝেড়ে, বড়ির ডাল বেটে এই সবরকম কাজগুলি সেরে, মাণিকের জন্য মুড়ি, মুড়কি বা বাতাসা কিনে নিয়ে তিনি যখন কুটীরের পথে ফেরেন তখন পা যেন আর চলেনা। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসে তখন, সূর্য্য ডুবে যায় পরপারে। দূরে দূরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে ওঠে, শঙ্খধ্বনি ক্ষীনভাবে কানে আসে। কুটীরে প্রদীপ জ্বেলে মা ছেলেকে বুকে টেনে নেন। তাতেই তার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

যেদিন ছেলেকে পেটভরে খেতে দিতে পারেন না সেদিন তাঁর দুচোক ভরে জল এসে পড়ে। ছেলে মার মুখ পানে তাকিয়ে বলে: "হাঁ মা, তুমি কাঁদছ?"

"না বাবা কাঁদিনি, একটা কথা মনে হয়ে গেল তাই—"

মাণিক জানে তার মায়ের ব্যথা কোনখানে। তবু মাকে অন্যমনস্ক করবার জন্যেই বলে,—

"কি কথা মা, তোমার সেই আগেকার কথা? বলনা মা, সে সব কথা শুনতে বড় ভাল লাগে। বাবা যখন ছিলেন—হ্যাঁমা, বাবা এখন কোথায়—আকাশে? স্বর্গ তো আকাশেই না?"

"হ্যাঁ মাণিক!"

"কিন্তু আমি তো দেখতে পাইনা, শুধু মেঘ আর তারা—"

"পৃথিবীর লোকে স্বর্গ যে দেখতে পায়না ধন!"

এইরকম প্রশ্নোত্তরের মধ্যে মাণিক মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে কখন। সুখে দুঃখে তাদের দিন কাটে। কিন্তু হঠাৎ মা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সংসারের একমাত্র আশ্রয় স্থল মা, তাঁর অসুখে মাণিক দুচোখে অন্ধকার দেখে। সে গ্রামের ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে মিনতি করে মার ঔষধ এনে দেয়, তাতে জ্বরটা কমে যায় কিন্তু ছাড়েনা। গ্রামের লোকেরা দয়া করে রুগ্না মাতার পথ্য ও বালকের ক্ষুধার অন্ন জোগায়, কিন্তু মাণিকের স্বস্তি নেই মা যে দিন দিন বিছানায় মিশে যাচ্ছেন।—

একদিন মাণিক মায়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন করে সারবে মা?

মা আদর করে বল্লেন,—"একবারটী উঠে গিয়ে রোদে বসতে পারতুম যদি—কিন্তু সে ক্ষমতা তো নেই আর!"

"আমি যদি তোমাকে বাইরে নিয়ে যাই, যদি—"

"পাগল! এতটুকুন ছেলে তুই"—

বেচারা মাণিক কেবল ভাবে, কেমন করে মাকে সূর্য্যের আলো দেবে। কিন্তু কোন উপায় দেখতে পায়না সে।

ঘরের কোনে কুলুঙ্গীতে একটা বোতল পড়েছিল ধুলো মেখে, মনে মনে কি ফন্দি এঁটে মাণিক বোতলটা পরিষ্কার করে। ঠিক দুপুর বেলা, মা তখন ঘুমিয়েছেন, মাণিক বোতলটা নিয়ে চুপিচুপি কুটির থেকে বেরিয়ে যায় পুব্‌দিকের খোলা মাঠে। সূর্য্য মাথার ওপর, প্রখর রোদ। মাণিক বোতলটা উঁচু করে ধরতেই স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ ঝকঝকিয়ে ওঠে।

"এইত রোদ ধরেচি!" মাণিক খুসী হয়ে, তৎক্ষণাৎ বোতলটার ছিপি এঁটে এক ছুটে নিয়ে আসে মার কাছে, মা জিজ্ঞাসা করেন, "কিরে মাণিক, কোথায় গেছ্লি?"

"ওমা ওই দেখ তোমার জন্য আলো এনেছি, এইবার তুমি ভাল হয়ে উঠবে। এই দেখনা এই বোতলের ভিতর—"

মাণিক কাপড়ে লুকোন বোতলটা মার মুখের সামনে তুলে ছিপি খুলে দেয়—কিন্তু একি? আলো কই? মাণিক কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে,—

"ওমা এত করে আলো ধরলুম, সব বেরিয়ে গেল। কেমন করে তুমি সারবে?"

মা ছেলের অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে চুমো খেয়ে হাসতে হাসতে বলেন,—

"না ধন, সব আলো যায়নি, এই যে একটুখানি আলোর কণা তোর মুখে লেগে আছে এতেই আমি সেরে উঠব।"

ভগবানের মায়া—সেদিন থেকে মার অসুখ বাস্তবিকই সারতে আরম্ভ হল।

"বর্ষায়"

বাদল দিনে,—ছাতের টিনে—বৃষ্টি মাদল বাজছে।
চৌদিকে তাই,—দেখছি যে ভাই—সৃষ্টি নূতন সাজছে।
আকাশ ভরি—মেঘের তরী-পরীর দেশে ঐ যে যায়
এমন ক্ষণে,—ঘরের কোণে মন মাতেনা হায় রে হায়,
ডোবার বনে, একটী কোণে ডাহুক চেঁচায় প্রাণ খুলি
ঘরের পাশে শঙ্কা ত্রাসে ভিঝছে বসে বুল বুলি
খালের জলে, ব্যাঙের দলে, গান সে উঠে চুল বুলি
নলের জলে দাওয়ার তলে বইছে নালা কুল কুলি।

শ্রীঅজিত কুমার ভট্টাচার্য্য গ্রাঃ নং ৪১২

ঝরণা

দ্যুতিময় সূর্য্যের বিভ্রম আলোকে,
শোভাময়ী মনোহরা অপরূপ পুলকে ;
নর্ত্তনে চঞ্চলা, উচ্ছলা ছন্দা
প্রভাতের ক্ষণাবধি সুখদায়ী সন্ধ্যা।

তুষার শুভ্র সম চন্দ্রের জ্যোছনায়,
সুন্দর, মোহময়, শিহরিত তব কায়,
তরুশাখে ফুলদল উন্মনা, হর্ষে,—
সদাগতি সমীরের সোহাগের পর্শে।

আকাশের তারাদের ক্ষীণ জ্যোতি আলোকে,
নৃত্যের তালে তালে এলে নেমে ভূলোকে।
শুভ্র ও জলকণা ঝরণা গো মেদুরা,
দিবসেতে দীপ্তা গো রাতে তুমি মধুরা।

চির গতি শীলা তুমি চঞ্চলা ঝরণা,
মুখরিত গীতি গানে তুমি চির মগনা।
কল্ কল্ ছন্দে ও প্রাণ ভরা হাস্যে,—
ব্যথা শোক পরাজিত, তব মধুলাস্যে।

সঞ্চয়ি উচ্চাশা আপনার মর্ম্মে,
চির পরিতৃপ্তা গো আপনার কর্ম্মে।
বিকাশ সহায় তব সুন্দর এ ভুবন
রবি, শশী, তারা, আলো, অরণ্য এ গহন।

চির গৌরব ময়ী স্নিগ্ধ গো ঝরণা,
তব সম অন্তর আমাদের করণা।
তেজ ভরা, নন্দিত, কর্ম্মেতে তূর্ণ,—
স্নিগ্ধ, তৃপ্ত, নব, উচ্চাশা পূর্ণ।

শ্রীষষ্ঠীপ্রদ সেনগুপ্ত গ্রাঃ নং ৯৭৯

বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতার উত্তর

"ব" দিয়ে কথার ফর্দ্দ তৈয়ারী

১। বাসা (পাখীর) ২। বায়ুবস্ত্র (বা বায়ুপথ) ৩। বাঁশ ৪। বাতি ৫। বধূ ৬। বেতার ৭। বাড়ী ৮। বারান্দা ৯। বরগা ১০। বোর্ড (সাইন) ১১। বিজ্ঞাপন ১২। বর্হিদ্বার ১৩। বালতি ১৪। বেসাত ১৫। বেসাতী ১৬। বাজরা ১৭। ব্যাং ১৮। বেজী ১৯। বেদী ২০। বৃশ্চিক ২১। বল্মীকস্তূপ ২২। বিষধর ২৩। বাগান ২৪। বিবর। ২৫। বেড়া ২৬। বৃত্ত ২৭। বহ্নি ২৮। বাষ্প ২৯। বৃদ্ধা ৩০। ব্যজনী ৩১। বৃদ্ধ ৩২। বালিকা ৩৩। বেণী ৩৪। বো ৩৫। বালা ৩৬। বোতাম ৩৭। বেল্ট ৩৮। বগলস্ ৩৯। বুট ৪০। ব্যাট ৪১। বল ৪২। বালক ৪৩। বাইসিকল্ ৪৪। বেলুন ৪৫। বেত ৪৬। বাজনা ৪৭। বাহক ৪৮। বিদেশী ৪৯। বাঙ্গালী ৫০। বাবু ৫১। বাবরী ৫২। বিনামা ৫৩। বামন ৫৪। বামুন ৫৫। ব্রহ্মসূত্র ৫৬। বাসন ৫৭। বারকোষ ৫৮। বেলনা ৫৯। বেলনা চাকী ৬০। বেগুন ৬১। বঁটি ৬২। বাটি ৬৩। বাটালি ৬৪। বাঁশী ৬৫। বন্দুক ৬৬। বর্শা ৬৭। বাণ ৬৮। বাণাসন ৬৯। ব্যাধ ৭০। বলদ ৭১। বাহন ৭২। বস্তা ৭৩। বাধন ৭৪। বোঝা ৭৫। বোচকা ৭৬। ব্যাগ ৭৭। বোতল ৭৮। বেঞ্চি ৭৯। বই ৮০। বিতর্দ্দিকা ৮১। বিছানা ৮২। বালিশ ৮৩। বাক্স ৮৪। বিড়াল ৮৫। বানর ৮৬। বায়স ৮৭। বারণ ৮৮। বটবৃক্ষ ৮৯। বৃক্ষ ৯০। বেল ৯১। বন ৯২। বৈজয়ন্তা ৯৩। বুরুজ ৯৪। বাতায়ন ৯৫। বাজার ৯৬। বিপণী ৯৭। বাদুড় ৯৮। বলাকা ৯৯। বারিদ ১০০। বর্ষা ১০১। বিজলী ১০২। বিমান ১০৩। বিমানপোত ১০৪। বিহঙ্গম ১০৫। বালার্ক ১০৬। বিভা ১০৭। বহা বা বহিত্র ১০৮। বারি ১০৯। বিম্ব ১১০। বীচি ১১১। বাচ ১১২। বৈঠা ১১৩। বাদাম বা বাতবস্ত্র ১১৪। বেলাভূমি ১১৫। বাঁধ ১১৬। বর্ত্ম বা বীথি ১১৭। বাঁক।

বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল

"ব" দিয়ে ফর্দ্দ তৈয়ারী

প্রথম—প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী, (কলিকাতা), গ্রাঃ নং ৪৯৪ (১১৭টি শব্দ)

দ্বিতীয়—প্রদীপকুমার সেন, (কলিকাতা), গ্রাঃ নং, ৩০১

তৃতীয়—কুমারী ইন্দিরা ঘোষ, (ঢাকা), গ্রাঃ নঃ ১০০৪

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতিযোগিতা

(আলোক চিত্র)

এই প্রতিযোগিতায় উপযুক্ত ছবি আমরা একটিও পাইনি। প্রথম পুরস্কার যোগ্য ছবি এবার না পেয়ে আমরা দুঃখিত। প্রতিযোগিদের মধ্যে মাণিক বসুর (গ্রাঃ নং ৬৯৭) ছবি (Fresh Fruit) আমাদের বিবেচনায় মন্দ হয়নি। তাকেই আমরা প্রথম পুরস্কার দিলাম। নীচে ফলাফল দেওয়া গেল ঃ—

১ম—মানিক বসু, শিমলা (গ্রাঃ নং ৬৯৭)

(১) প্রথম ছবির বিষয়—Fresh Fruit.

(২) দ্বিতীয় ছবির বিষয়—"তোমরা হাঁসছ !

Consolation Prize :—নিরদকুমার সিংহ রায় (গ্রাঃ নং ৪২২)

ছবির বিষয়—"আমি একজন ভাবুক।"



Fresh Fruit



আমি একজন ভাবুক



তোমরা হাঁসছ ?

ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

জ্যৈষ্ঠমাসের ধাঁধার উত্তর

(শব্দ-বদল)

১। চিল-কিল-কল-কাল-কাক ॥ ২। দধি-দহি-দহ-দাহ-দান-দানা-ছানা ॥ ৩। লুচি-মুচি-মুণি-মণ-মন-মান-মাস-মাংস ॥ ৪। তালা-তাল-খাল-খাব-খাবি-চাবি ॥ ৫। চিড়ে-চড়ে-চরে-করে-করি-কড়ি-কুড়ি-মুড়ি ॥ ৬। জুতা-সুতা-সুরা-সরা-মরা-মজা-মোজা ॥ ৭। কাঠ-কাট-লাট-লোট-লোটা-লোহা ॥ ৮। কাজ-কাল-মাল-মল-মলা-নেলা-মেলা ॥ ৯। গাড়ী-বাড়ী-বালী-বাল-পাল-পাড়-পাড়া-পোড়া-ঘোড়া ॥ ১০। হাতী-হাত-হাড়-ছাড়-ছাড়া-তাড়া-তোড়া-জোড়া-ঘোড়া ॥ ১১। মোটা-মোজা-মজা-মাজা-মারা-মরা-মরা-সর-সরু ॥ ১২। লেখা-লেখ-লেহ-লহ-রহ-রব-রবি-ছবি ॥ ১৩। সভা-সরা-সারা-সার-হার-হাট ॥

জ্যৈষ্ঠমাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

যারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছে :—

অমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (ডালটনগঞ্জ) ; বুল সেন, (ভবানীপুর) ; পবিত্র ও প্রসূন গুপ্ত, (দিনাজপুর) ; অচিন্ত্যকুমার ও শ্যামলী রক্ষিত, (কলিকাতা) ; জগদীশ, সত্যসাধন, পুনু ও বাসু (তেলিনীপাড়া)।

যাদের একটিমাত্র ভুল হইয়াছে :—

কনকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, (পাটনা) ; উৎপল গুপ্ত, (বালীগঞ্জ) ; জহরলাল মুখোপাধ্যায়, (মালদহ) ; কুমারী নীলিমা ও নমিতা এবং নির্ম্মলেন্দু ও অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, (সিমলা শৈল) ; তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা) ; রামপ্রসাদ সিং (বেহালা) ; রাজিয়া, রসীদ, আনোয়ারা জাহানারা, রোকেয়া, রাফিক, দেবব্রত ও কল্যানী, (ময়মনসিং) কামাক্ষাচন্দ্র বল, (ডালটন্‌গঞ্জ)।

আষাঢ় মাসের ধাঁধার উত্তর

(কার চাকর ?)

১নং	ছেলে—ব্যাট হাতে		...	৭নং চাকর		ক্রিকেট বল হাতে
২নং	„	ফুটবল নিয়ে	...	১০নং	„	পাম্প হাতে
৩নং	„	সুইচ ও টাই পরে	...	৬নং	„	হ্যাট হাতে
৪নং	„	কাছে কুকুর	..	১২নং	„	চেন হাতে
৫নং	„	খালি পায়ে	...	১নং	„	জুতা হাতে
৬নং	„	গ্লাসে জল খাচ্ছে	...	৪নং	„	কুঁজো হাতে
৭নং	„	ঘোড়ায় চড়ার পোযাকে	..	২নং	„	ঘোড়া সঙ্গে
৮নং	„	পেন্সিল হাতে	...	৫নং	„	খাতা হাতে
৯নং	„	রাজপুত্র	...	৮নং	„	তলোয়ার হাতে
১০নং	„	সাঁতারের পোষাকে	...	৯০	„	কাপড়চোপড় হাতে
১১নং	„	সাধারণ পোষাকে	...	৩নং	„	বিশেষ কিছু নাই হাতে
১২নং	„	গেঞ্জি গায়ে	...	১১নং	„	কোট হাতে

যাদের উত্তর নির্ভুল :—

অমিয়া ও আরতি দত্ত, (কলিকাতা) ; সুবোধ, বুড়ো, লতু, ফিন্‌কী ও বুদ্ধান, (কলিকাতা) ; গীতশ্রী ও ঊষা বন্দ্যোপাধ্যায়, (মুঙ্গের) ; হারাধন বসু, শান্তিলতা বসু, পূর্ণিমা, বেলারাণী, কমলা, সুবোধ ও নরেশ, (যশোহর), পরেশচন্দ্র মাইতি, (ভবানীপুর) ; নরেন্দ্র সিংহ বাচ্ছাওত, (আজিমগঞ্জ), সনৎকুমার গাঙ্গুলী, (কালীঘাট), শতদল দাস, (শ্রীহট্ট) ; উৎপল গুপ্ত, (বালীগঞ্জ) : প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; (কানপুর) ; সরোজকুমার নায়ক, (এগরা) ; কামাক্ষা চন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ) ; শিবপ্রবাদ সেন, (নিউ দিল্লী) ।

যাদের দুটি ভুল :—

মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর) ; অরুণকুমার রায়, (ভবানীপুর) ; সুনীল ও সুশীল সেন, (পাবনা) প্রভাতরঞ্জন রায়, (মজিদপুর) সরযুবালা দেবী ও বেলারাণী ব্যানার্জ্জি, (কলিকাতা) ; নিখিলেন্দ্র দাস, (করিমগঞ্জ) ; লিলি, কানু, তৃপ্তি ও শচীন্দ্রনাথ রায় (হাওড়া) ; বিভূতি ভূষণ মল্লিক, (নিউ দিল্লী) ; সমরেন্দ্রকুমার চৌধুরী, (গৌরারং) ।

আষাঢ় মাসে প্রকাশিত উৎসাহীর চিঠির মানে

বন্ধুবর শ্রীকমললোচন পাল।

রংমশাল ভাই !

আমাদের দলের সকল ছেলেমেয়ের জন্য সেদিন বৈকাল ছটার সময় যে আনন্দ সম্মিলন হয়, তার বিষয় কি আর চিঠিতে ভাল করে বর্ণনা করা যায় ?

এতগুলি প্রাণ একত্র হলে কি যে উৎসাহ হয় সে সময়, তা বলা যায় না।

তবুও তোমার কথা মনে করেছিলাম তখন। সেদিন প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলিও দেওয়া হয়।

আশাকরি আবার কোনদিন সুযোগ ঘটবে যেদিন তোমার সঙ্গে উৎসবে একত্র যোগ দিয়ে মনের আনন্দ পূর্ণ করব। ইতি—

তোমার বন্ধু

অরুণচন্দ্র বল।

আমাদের গ্রাহকদের মধ্যে কেহই উৎসাহীর চিঠির নির্ভুল মানে করিতে পারে নাই।

যাদের উত্তর আংশিক ভাবে নির্ভুল হয়েছে তাদের নাম :—

অমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (ডালটনগঞ্জ) ; বুল সেন, (ভবানীপুর) ; কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য, (নাগপুর) ; অরুণ শীল, (বরিশাল) ; মৃদুলা, রঞ্জিত ও রমলা দত্ত, (কলিকাতা) ; কণকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, (পাটনা) ; অরুণকুমার রায়, (ভবানীপুর) ; কামাক্ষাচন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ) ; সরোজকুমার নায়ক, (এগরা) ; রহিমা খাতুন, (ঢাকা) ; সরযূবালা ও বেলারাণী দেবী, (কলিকাতা) ; তরুণ ঘোষ, (বালীগঞ্জ) ; মীরেন, বাতাসা, টম্বল, কানু, মণি, সদা, খোকা ও পুলক, (তেওতা) ; সুবোধ, বুড়ো, লতু, ফিন্‌কী ও বুদ্ধান, (কলিকাতা) ; অমিয়া ও আরতি দত্ত ; (কলিকাতা) ; জগদিন্দ্রনাথ রায় (ভবানীপুর) ; কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জি (শ্যামবাজার) ; শ্রীমতী নীলিমা, ললিতা ও শ্রীমান নির্ম্মল ও অমল, (সিমলা) ; জগদীশ, সত্যসাধন, পুনু ও বাসু (তেলিনীপাড়া) ; রাজিয়া, রসিদ, জাহানারা, আনোয়ারা, রোকেয়া, রফিক, কল্যাণী, দেবব্রত (ময়মনসিং) ; অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর)।

নূতন ধাঁধা

নীচের প্রত্যেকটি পদের '———' চিহ্নিত জায়গাগুলি ভারতবর্ষের কোনও জায়গার (সহর, নদী, পাহাড় প্রভৃতি) নাম দিয়ে পূরণ করতে হবে।

যেখানে '—— ——' চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দুটি কথা বা কথার অংশ মিলে একটি নাম হবে।

(১) ———র ———র ওঠায় আজ ——, —— —— নাইলে চল্‌বে না।

(২) গোলা থেকে ——ণ —— —— দিলে কেউ টেরও পাবে না।

(৩) জামাটা কি —— টে রংএর!

(৪) পূর্ব্ববঙ্গে —— —— হ'লে চাষীদের হাহাকার।

(৫) —— ——; মাছি বস্‌বে।

(৬) সহরটি খুব ———।

(৭) ———ম ক'রে —— —— টান কি পরীক্ষার্থীর উচিত?

(৮) —— ——উ —— ——ম চাল প্রভৃতি সব বাজারেই পাবেন।

(৯) অতীতের কত ম—— ——পেয়ে গেছে!

(১০) তিনি তো প্র—— ——ক সবই; সব—— ——ম দিয়ে নেবেনই তো।

উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫ শে শ্রাবণ।

নূতন প্রতিযোগিতা

বাড়ী-করা

একটী একতলা বাড়ীর নক্সা (Plan) আঁকতে হবে। বাড়ী কেমন হবে তোমাদের রুচির ওপর নির্ভর করচে। তোমাদের মনের মত করে আঁকলেই হবে। সহরে বাড়ী হতে হবে তার কোন মানে নেই, গ্রাম্য কুটীরের নক্সাও দিতে পার। যার যা ভাল লাগবে আঁকতে পারবে। মনে রাখবে বাড়ীর ছবি তোমাদের আঁকতে হবে না—বাড়ীর নক্সা এঁকে তার নানা অংশগুলি যা তোমাদের মনে হবে দেওয়া দরকার সেগুলি দেবে। নক্সাটি পরিষ্কার হওয়া চাই। সাদা ড্রইং কাগজে কালো কালিতে আঁকবে। ১ম ও ২য় পুরস্কার থাকবে। পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে শ্রাবণ মনে রেখো।



ঝড়ের আগে

চিত্রশিল্পী
শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যা

রংমশাল
দ্বিতীয় বর্ষ
১১শ সংখ্যা
ভাদ্র
১৩৪৫

র রংমশাল

(নাটিকা)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

—প্রথম দৃশ্য—

[মেঘলা আকাশ,—দুপুর-বেলাতেও চারিদিক ছায়ামায়াময়। গাঁয়ের প্রান্তে পাঠশালার একচালা। পাঠশালার পরেই ধূ-ধূ করছে তেপান্তর মাঠ। মাঠের একধার দিয়ে বন-শ্যামলতায় বোনা জরির পাড়ের মত বয়ে যাচ্ছে সুন্দুরী নদী]।

ছেলের দল পাত্‌তাড়ি বগলে ক'রে গান গাইতে গাইতে আসছে—

গান

পাঁচ দুকুনে দশটি গণ্ডা,
সেই হিসেবে দাওনা মণ্ডা!
দু'য়ে পক্ষ, তিনে নেত্র,
ভুললে পরে পড়বে বেত্র,—
গুরুমশাই বেজায় যণ্ডা!

অমল — ওরে, সূয্যি-ঠাকুর আজ সকাল থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কমল — তাই মেঘে মেঘে বুঝি তাঁর নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে?

বিমল — ধেৎ, নাক কি কখনো অত জোরে ডাকতে পারে রে বোকা ?

নির্ম্মল — সূয্যিঠাকুরের নাসিকা কি বড় যে-সে নাসিকা রে ? বাবার মুখে শুনেছি সূয্যি নাকি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড় ! সূয্যিমামার নাক, বাজের মতন ডাক !

অমল — তোদের নাক-টাকের কথা এখন থো কর্‌ শুনছিস্‌ না, আকাশ যেন আজ আয় আয় ব'লে ডাক দিচ্ছে ? আজ কি আর শুক্‌নো পড়ায় মন বস্‌বে ?

কমল — ঝিল-বিল যেন আজ শালুক-ফুলের তালুক হয়ে উঠেছে !

বিমল — ঠাণ্ডা বাতাস মেখেছে কেয়াফুলের আতর !

নির্ম্মল — ময়ূর ডাকছে কেমন বন-কাঁপানো তালে তালে !

সকলে — ওরে, চল্‌ চল্‌, আজ আর পাঠশালায় ঢোকা নয়, আজ আমরা বন-বাদাড়ে যেখানে খুসি যাব, মাঠে-বাটে ছুটোছুটি-খেলা করব, নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাইব !

গান

তেপান্তরের মন্তরে সব মন মেতেছে ভাই !
কে জানে তাই আমরা সবাই কী পেতে যে চাই !
মন মেতেছে ভাই !
ময়ূর নাচে প্যাখম তুলে,
ফড়িং নাচে ঘাসের ফুলে,
মেঘরা সেধে বলছে—চল, স্বপন-দেশে যাই,—
মন মেতেছে ভাই !
আকাশ ডাকে, বাতাস ডাকে, নদীর হাসি-ঢেউরা ডাকে,
ডাকছে ভ্রমর-মৌমাছিরা সবুজ-পাতার ফাঁকে ফাঁকে !
পুঁথির পড়ায় ছুটি নিয়ে
চল্‌রে ছুটি মাঠ পেরিয়ে,
দিঘির জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পদ্মমুড়ি খাই !
মন মেতেছে ভাই !

অমল — হুঁঃ, কিন্তু আমাদের মাথার ওপরে কে আছেন জানিস্‌ ?

কমল — হ্যাঁ, গুরুমশাই—

বিমল — আর তাঁর মস্ত বেত—

নির্ম্মল — কান্মুটি, গাঁট্টা !

অমল — (শিউরে উঠে) বাপ্‌রে, দরকার নেই আর মেঘের ডাকে সাড়া দিয়ে! চল্ গুটি-গুটি পাঠশালায় ঢুকি, গুরুমশাই এখনি এসে পড়বেন!

কমল — এসে পড়বেন কি, ঐ দ্যাখ্ এসে পড়েছেন!

(সকলে সভয়ে গাঁয়ের পথের দিকে ফিরে তাকাল)

বিমল — কিন্তু উনি কি গুরুমশাই ?

নির্ম্মল — ওঁর মাথায় টিকি তুলছে না, হাতে বেত লক্-লক্ করছে না, কোমরে ভুঁড়ি হাঁস্-ফাঁসিয়ে উঠছে না—উনি কি গুরুমশাই ?

কমল — (দু' পা এগিয়ে গিয়ে) ওঁর গলায় দুলছে ফুলের মালা, হাতে রয়েছে শ্বেতপদ্ম আর বাঁশী, মুখে শুনি গানের তান আর দুটি পায়ে নাচের ছাঁদ! উনি তো গুরুমশাই নন! ওঁকে দেখে তো পেটের পিলে চম্‌কে উঠছে না!

সকলে — তবে উনি কে, তবে উনি কে ?

(নাচের ভঙ্গিতে গাইতে গাইতে কবির প্রবেশ)

গান

গানের মানুষ গান গেয়ে যাই—তাইরে না রে, তাইরে না রে!
কেউ শোনে আর কেউ শোনেনা গাই তবু গান দ্বারে দ্বারে—
তাইরে না রে তাইরে না রে!
ঝর্ণা যখন একলা ঝরে,
নিজের মনে গান সে ধরে,
বিজন বনের দোয়েল-শ্যামা গান যে শোনায় বারে বারে—
তাইরে না রে তাইরে না রে!
প্রজাপতি যে-স্বর বোনে নীরব তানে, (তাইরে নানা!)
সেই রাগিণী শুন্‌ছি আমি প্রাণের কাণে, (তাইরে নানা!)
শুন্‌ছি যত গাইছি তত
ফুটিয়ে মুকুল শত শত,
গানের ভেলা ভাসিয়ে চলি কান্না-হাসির পারাবারে—
তাইরে না রে, তাইরে না রে, তাইরে না রে, তাইরে না রে!

কমল — আপনি কে ?

কবি — 'আপনি' বললে তো সাড়া দেব না ভাই, আমাকে তুমি ব'লে ডাকো।

কমল — তুমি কে ভাই ?

কবি — গুরুমশাই !

অমল — তোমার মুখে নেই ধমক, তোমার হাতে নেই বেত, তুমি কি-রকম গুরুমশাই ?

কবি — ধমকের বদলে আমার মুখে আছে হাসি, আর বেতের বদলে আমার হাতে আছে বাঁশী। আমি নতুন গুরুমশাই।

বিমল — যখন হিতোপদেশ মুখস্থ হবে না, তখন তো তুমি আমাদের ধমক দেবে ?

কবি — না, তখন আমি হাসব।

নির্ম্মল — যখন আঁক কষ্‌তে পারব না, তখন তো তুমি আমাদের বেত মারবে ?

কবি — না, তখন আমি বাঁশী বাজাব।

সকলে — আর পাঠশালায় না গিয়ে আমরা যখন পথে পথে টো-টো ক'রে খেলে বেড়াব ?

কবি — (হেসে) তখন আমি তোমাদের খুব—খুব—খুব ভালোবাসব !

সকলে — (হাততালি দিয়ে নেচে উঠে) ওহো, কী মজা রে কী মজা !

গান

সকলে—

আমাদের এই মজার গুরু !
হিতোপদেশ ভুল্‌লে শিকেয় শাসায়নাকো কুঁচ্‌কে ভুরু !
আঁকের খাতা রাখলে মুড়ে
মারবেনাকো ঘুঁসি ছুঁড়ে,
বেতের ঠেলা নেইকো যখন হোক্‌গে সখের খেলা সুরু !

কমল — কিন্তু ভাই, তোমাকে তো আমরা গুরুমশাই ব'লে ডাকতে পারব না ! ও-নামে ভয় হয়।

কবি — আমাকে তো কেউ গুরুমশাই ব'লে ডাকেনা ভাই !

অমল — তবে কি ব'লে ডাকে ?

কবি — কবিঠাকুর।

সকলে — (সুরে) কবিঠাকুর—কবিঠাকুর ? বেশ নাম !
ও-নামে নেই গুরুগিরির হাঙ্গাম !

কবি — আচ্ছা ভাই, এখন বল দেখি, তোমরা কি খেলা খেল্‌তে চাও ?

সকলে— আজ আমরা বন-বাদাড়ে যেখানে খুসি যাব, মাঠে-বাটে ছুটোছুটি-খেলা করব, নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাইব !

কবি —(মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে) বেশ, বেশ, তাই ভালো। তোমাদের পুরাণো গুরুমশাই আজ বাদ্‌লা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, চল, সেই ফাঁকে আমরা চুপিচুপি খানিক বেড়িয়ে আসি। কিন্তু কোন্‌দিকে যাই বল দেখি ?

সকলে— তুমিই বল কবিঠাকুর !

কবি — ঐ যেখানে সবুজ বনের ঠাণ্ডা ছায়ায় সুন্দুরী-নদীর জলবীণায় সুরের লহর তুলছে, যেখানে কেয়া-কদমের শুভ্র হাসির আসর বসেছে, সেখানে রোজ কারা আনাগোনা করে তোমরা কেউ তার খবর রাখো কি ?

সকলে— (সাগ্রহে) কারা আনাগোনা করে, কারা আনাগোনা করে ?

কবি — যাদের তোমরা চিনেও চেনোনা দেখেও দেখনা, তারা।

সকলে— তারা কি বাঘ-ভাল্লুক ?

কবি — না।

সকলে— তারা কি ভুত-পেত্নী ?

কবি — না।

সকলে— তবে ?

কবি — আমার সঙ্গে দেখবে এস।

— দ্বিতীয় দৃশ্য* —

[সুন্দুরী-নদীর ধারে বনভূমি,—চারিদিকে ছোট-বড় ফুলগাছের ভিড়। সামনে খানিকটা খোলা জমি। সবুজ ঘাসের বিছানায় অজস্র ফুল ছড়ানো।

আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা ও চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুতের ছটা আরো বেড়ে উঠেছে]।

* দ্বিতীয় দৃশ্যে কবির প্রথম গানটি ছাড়া আর সব গানের সঙ্গেই নাচ থাকবে। ইতি—লেখক।

(গাইতে গাইতে কবির প্রবেশ। পিছনে পিছনে আর সকলের আগমন)

কবির গান

বৃষ্টি আসে, বৃষ্টি আসে!
কোন্ সে সজল কাজললতার কাজল ঝরে নীলাকাশে!
দেখে ধরায় কালোয়-কালো,
লুকোতে চায় লাজুক আলো,
ফুলের ফ্লুট্ বাজছে তবু লতাপাতায় শ্যামলা ঘাসে।
ছায়াপরীর ঘুম ভাঙিয়ে বনে বনে,—বৃষ্টি আসে!
মায়াপুরী জাগিয়ে দিয়ে মনে মনে—বৃষ্টি আসে!
কদম-কেয়ার কেয়ারীতে
কাঁপন্ নাচে দেয়ার গীতে,
ঝিল্মিলিয়ে বিজলীকে মেঘমহলে কে আজ হাসে!

ছেলেরা— (সকলে সকৌতুকে) ওরে, ওরে, বৃষ্টি এল রে বৃষ্টি এল! আজ বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা সবাই ঘর-পালানো খেলা খেল্‌ব।

কবি — শোনো ছোট্ট বন্ধুরা! চল, আমরা ঐ ঝুপ্সী বটগাছের তলায় গিয়ে লুকিয়ে ব'সে থাকি গে।

কমল — (সভয়ে) ওখানে যে দিনের-বেলাতেই রাতের বাসা!

অমল — ওখানে যে অন্ধকারে চোখ চলবে না!

কবি — (সহাস্যে) ওরে ভাই, আজ যে আমদের সবাইকে বাইরের চোখ বন্ধ ক'রে ফেলতে হবে!

বিমল — তাহ'লে দেখব কেমন ক'রে?

কবি — ওরে ভাই, আজ যে আমাদের সবাইকে মনের চোখ খুলে রাখতে হবে!

সকলে— (সবিস্ময়ে) মনের চোখ!

কবি — হ্যাঁ রে ভাই, হ্যাঁ। মন যাদের জ্যান্তো আর রঙিন, নয়ন মুদে তারা যা দেখতে পায়, বাইরের চোখে বড় বড় দূরবীণ লাগিয়েও তা দেখা যায় না! মনের চোখে অন্ধকারও হয়ে ওঠে 'সার্চ্-লাইটে'র মত!

কমল — (সন্দিগ্ধ স্বরে) তুমি কি সত্যি বলছ কবিঠাকুর?

কবি — কবির কাছে কিছুই মিথ্যে নয় ভাই! চল তবে, অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'সে থাকবে চল, এখুনি সেখানে রংমহলের রংমশাল জ্ব'লে উঠবে!

[কবির পিছনে পিছনে এগিয়ে সবাই ধীরে ধীরে ঝুপসী বটগাছের অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল। খানিকক্ষণ জনপ্রাণীকে দেখা গেল না। আলো আরো ঝিমিয়ে পড়ল—ঝরতে লাগল বাদল-ঝরণা। অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল কবির বাঁশীর মেঘমল্লার সুর।

খোলা জমির উপরে নৃত্যচপল পায়ে ছুটে এল শরীরিণী বর্ষারাণী, পরণে মেঘডুম্বুর সাড়ী, কাজলবরণ এলোচুলে জ্বল্‌ছে বিদ্যুৎ-চমক।]

বর্ষার গান

রুনুঝুনু রুনুঝুনু—ভুবনের খেলাঘরে,
রিমিঝিমি রিমিঝিমি—আলো-ছায়া খেলা করে।
নূপুরের রুমুঝুমু,
নীলঘাসে খায় চুমু,
ছুটোছুটি ক'রে মেঘ চপলার মালা পরে!
ছুঁয়ে আঁখিহাসিধারা
চাতকেরা গানে সারা,
ঝুরু-ঝুরু ভিজে বায়ে যূথী-চাঁপা-বেলা ঝরে।

[বর্ষার গান থামল, কিন্তু নাচ থামল না। একদল মেঘের প্রবেশ। বর্ষার চারিদিকে মণ্ডলাকারে ঘুরে ঢিমে তালে নাচতে নাচতে মেঘেরা গান ধরলে। গান থামলে তাদেরও নাচ থামল না। তারপর যে-তালে মেঘেরা নাচছে তার দ্বিগুণ দ্রুত—অর্থাৎ দুন—তালে বিজলীবালা ঢুকে মেঘদেরও বেড়ে নাচ-গান ধরলে এবং তার গান যেই শেষ হ'ল অমনি বাজ গান গাইতে গাইতে ঢুকে বিজলীরই তালে তার পিছনে অনুসরণ করতে লাগল। তারপর ঝড়ের প্রবেশ, সে মণ্ডলে যোগ না দিয়েই গান ও এলোমেলো নাচ আরম্ভ করলে।]

গান

মেঘদল — তোম্‌-তানানানা, বোম্‌-বোম্‌-বোম্‌, ববম্‌-ববম্‌-বোম্‌!
ধুমধাড়াক্কা, পাইবে অক্কা ব্যোম্‌-রবি-তারা-সোম্‌!

বিজলীবালার প্রবেশ — আমি আজুলী বিজুলীবালা,
আঁচলে আলোর ডালা,
পলকে পুলকে আঁকি আর ঢাকি মায়াছবি অনুপম!

মেঘদল — তোম্‌-তানানানা—প্রভৃতি

বজ্র — আমি মহা বাজ, ডাহা জাঁহাবাজ—চপলার দ্বারবান্,
চিকুর-চমকে আমার ধমকে পেটে পিলে আন্‌চান্ !

ঝড় — আমি শঙ্কর-কিঙ্কর,
ধিঙ্গী, ভয়ঙ্কর !
ভোঁ-ভোঁ ছুটে ধরা ভেঙে-ভুঙে শিঙা বাজাই ভভম্ভম্ !

মেঘদল — তোম্-তানানানা—প্রভৃতি

[সকলের প্রস্থান। কেউ কোথাও নেই—কেবল কবির বাঁশীর রাগিণী শোনা যাচ্ছে। তারপর শোনা গেল বাঁশীর সুরের তালে তালে নেপথ্যে নূপুরের ধ্বনি এবং তারপর ফুলকুমারীদের (যূথী, বেলা ও জর্দ্দাগোলাপ) প্রবেশ]

গান

ফুলকুমারীরা — মৌমাছি গো, ঘুমাও নাকি ? প্রজাপতি, ওগো অলি !
মিষ্টি তোদের গানের কথাই করছি যে ভাই বলাবলি !
আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা,
আয়না মোরা করব খেলা,
বসিয়ে নতুন রঙের মেলা ভরিয়ে তুলি কাননতলি।

গাইতে গাইতে ভ্রমর, প্রজাপতি
ও মৌমাছির প্রবেশ— ফুলকুমারী, ফুলকুমারী !
আজ নেমেছে বাদ্‌লা ভারি,
পাখ্‌না পাছে যায় ভিজে ভাই, ছেড়েছি তাই কুঞ্জগলি !

(একদিকে দুঃখিতভাবে ভ্রমর প্রভৃতি এবং অন্যদিকে ফুলকুমারীদের প্রস্থান)

[অল্পক্ষণ কোথাও কেউ নেই—বাজছে কেবল কবির বাঁশীতে হাসিমাখা খেলার সুর।]

(ব্যাং, গঙ্গাফড়িং ও শামুকের প্রবেশ)

গান

কোরাস — গ্যাঙর-গ্যাঙর, তিড়িং-মিড়িং ! আজ্‌কে যাব ক্যাল্‌কাটা !
মার্কেটেতে কিনব মোরা তোপ্‌সে-ইলিশ আর বাটা !

ফড়িং — ব্যাং-ভায়া গো ! শামুক-খুড়ো ! জোরসে লাগাও লম্ফ,
পাঞ্জাব-মেল ধরতে গেলে হবে যে বিলম্ব !

শামুক — কেমন ক'রে হাঁটব জোরে, ফুটছে গায়ে চোরকাঁটা !

কোরাস — গ্যাঙর-গ্যাঙর—প্রভৃতি

ব্যাং — ফড়িংভায়া, বড্ড ক্ষিধে ! কোথায় মশা-মক্ষী !
শূন্য-পেটে মূর্চ্ছো গেলে সাম্‌লাবে কে ঝক্কী ?

শামুক — দৌড়ে গেছে দম বেরিয়ে, তেষ্টাতে বাপ্, প্রাণ টা-টা !

কোরাস — গ্যাঙর-গ্যাঙর—প্রভৃতি

(প্রত্যেকে তাদের স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে প্রস্থান করল)

[আবার খানিকক্ষণ কারুকে দেখা গেলনা, খালি শোনা গেল কবির বাঁশীর আলাপ।]

(নেপথ্যে বাঁ-দিক থেকে গানের সুরে শোনা গেল :)

"সাত-ভাই চম্পা, জাগো, জাগো, জাগো রে !"

(নেপথ্যে ডানদিক থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে শোনা গেল :)

"কেন বোন পারুল, ডাকো, ডাকো, ডাকো রে ?"

(একদিক থেকে পারুল ও আর একদিক থেকে সাত-ভাই-চম্পার প্রবেশ)

গান

পারুল—

এসেছে, রূপকথার এক রাজকুমার,
চাঁদিমা নিছ্‌নি যে চায় তার চুমার !
যেতে চায় আমায় নিয়ে,
বলে যে, করবে বিয়ে !
শুনে তাই ভয় হয়েছে ভাই আমার !

সাত-ভাই-চম্পারা—ওরে বোন পারুলবালা ! রূপে তোর কানন আলা,
কুমারে ভয় কোরোনা, ধরি আয়, বিয়ের পালা !

রূপকথার রাজকুমারের প্রবেশ ও গান—

শোনো গো ফুলের মেয়ে !
এসেছি মুখটি চেয়ে,
হাতে মোর হাতটি রাখো আজ তোমার

(পারুলের লজ্জিত হাতদুখানি নিজের হাতে নিয়ে রূপকথার রাজকুমার মাঝখানে দাঁড়াল এবং তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে সাত-ভাই-চম্পাদের নাচ-গান)

গান

বাদল-মাদল বাজিয়ে চল,
বনের ময়ূর নাচিয়ে চল!
কাজ্‌লা-বেলায়
মেঘ্‌লা খেলায়
ফুলের সভা সাজিয়ে চল!

(সকলের প্রস্থান)

[বিজন বনে কবির বাঁশী এবার ধরলে করুণ কান্নার সুর। অন্ধকার আরো গাঢ় হ'য়ে উঠল]

(অতি-অলস নাচের ভঙ্গিতে ঝরাফুলের প্রবেশ)

গান

ঝরাফুল— ওগো, আমি ঝরাফুল ঝ'রে ঝ'রে পড়ি একলা ঘাসের কোলে,
দেখ, এখনো রয়েছে আতর আমার, রাঙিমা যায়নি জ্ব'লে!
তবু চায়না আমায় কেহ,
মোর ভেঙেছে তরুর গেহ,
তাই বাদলের বায় ক'রে হায়-হায় কেঁদে দূরে যায় চ'লে।
ভিজে মেঘের অশ্রুনীরে,
ঝরে পরাগকেশর ধীরে,
আর জাগিবনা আমি নবপ্রভাতের বিহগ-বীণার বোলে।

(তৃণশয্যার উপরে দুই চোখ মুদে এলিয়ে শুয়ে পড়ল)

[চারিদিক নিবিড় তিমিরের ভিতরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল—তখনো জেগে রইল কেবল কবির বাঁশীর কান্না]

—তৃতীয় দৃশ্য—

পাঠশালার অভ্যন্তর-ভাগ। একদিকে উচ্চাসনে গুরুমশাইয়ের স্থির মূর্ত্তি।

(বাইরের দরজা দিয়ে কবির প্রবেশ)

কবি — (বাইরের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে)—ওহে বন্ধুরা, তোমরা ভিতরে আসছ না কেন? ভয় নেই, পাঠশালায় আসোনি ব'লে আজ গুরুমশাই তোমাদের কিছু বলবেন না!

কমল — (দরজার ভিতরে মাথা গলিয়ে ভয়ে ভয়ে)—সত্যি বলছ কবিঠাকুর? গুরুমশাই আমাদের কিছু বলবেন না? আমাদের বেত মারবেন না?

কবি — (হেসে)—না, গুরুমশাই আজ কথাও কইবেন না, বেতও তুলবেন না।

(সকলে একে একে সঙ্কুচিত ভাবে ভিতরে এসে দাঁড়াল)

কমল — (চুপি চুপি কবিকে)—গুরুমশাই অমন চুপ ক'রে আছেন কেন? উনি কি ব'সে-ব'সেই ঘুমিয়ে পড়েছেন?

কবি — কাছে গিয়েই দেখে এস না!

(ছেলেরা সন্তর্পণে গুরুমশাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে কমল সাহস ক'রে গুরুমশাইয়ের গায়ে হাত দিলে)

কমল — (সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে) কবিঠাকুর! এ যে পাথরের গা!

(আর সকলেও তাড়াতাড়ি গুরুমশাইয়ের দেহ স্পর্শ করলে)

সকলে—কবিঠাকুর, এ তো মানুষ নয়, এ যে পাথরের মূর্ত্তি!

কবি — (সহাস্যে)—হ্যাঁ ভাই, তোমাদের গুরুমশাই আজ পাথরের মূর্ত্তি হয়েই গিয়েছেন!

সকলে— কি সর্ব্বনাশ! কেন কবিঠাকুর, কেন?

কবি — তোমাদের গুরুমশাই বাইরেই কেবল চলাফেরা করতেন বৈ তো নয়, আসলে ওঁর মনের ভিতরটা ছিল শুক্‌নো পাথরের মূর্ত্তির মতই। পৃথিবীতে এমন চলন্ত পাথরের মূর্ত্তিই আছে বেশী। তোমাদের মনের চোখ আজ খুলে গেছে ব'লেই গুরুমশাইয়ের আসল চেহারাখানা দেখতে পেলে! কিন্তু তোমাদের মানসচক্ষু অবার যদি অন্ধ হয়, গুরুমশাইও আবার জেগে উঠে বেত তুলে হুঙ্কার দিতে থাকবেন!

সকলে (সমস্বরে) না, না, আর আমরা মনের চোখ বন্ধ করব না !

কবি—তাহ'লে তোমাদের চোখের সামনে রংমহলের রংমশালের আলোও আর কোনদিন নিব্‌বে না ! দেহের চোখে দেখা যায় কেবল শুক্‌নো পুঁথিপত্র আর পাথুরে-প্রাণ মানুষদের, কিন্তু মনের চোখে সরস আর সজীব হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীর সমস্তই ! ঐ দেখ, বনভূমির সবাই আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসছে, ওরা আর কখনো তোমাদের ছেড়ে চ'লে যাবে না !

(নানা দ্বার দিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ । কবিকে মাঝখানে রেখে সকলে একসঙ্গে গান ধরলে)

গান

গাইবে যখন কোকিল-পাখী,
চর্ম্মচোখের চশ্‌মা ফেলে খুল্‌বে তখন মানস-আঁখি ।
দেখ্‌বে কোকিল—সুরে-সুরে
খেল্‌ছে কারা ভুবনপুরে,
স্বপ্ন হবে সত্য তখন, সত্য হবে মস্ত ফাঁকি !
দেখ্‌বে ধরায় মিথ্যে যারা
মনের মাঝে জ্যান্তো তারা,
কল্পলোকের গল্পে আছে এই জীবনের রঙিন রাখী !

—যবনিকা—



খুকু পুতুল কিনবে নাকি ?

শ্রীখোকা গুহ

খুকু তুমি খেলবে বলে তাইতো আমি আসি,
আসি আমি রঙীণ পুতুল নিয়ে রাশি রাশি।
আসি আমি আসি খুকু আসি দুপুর বেলা,
আকাশেতে হাল্কা মেঘে যখন ঘুড়ি খেলা।
গলির বাঁকে হঠাৎ ডাকি
'খুকু পুতুল কিনবে নাকি ?'
'কিনবে কে আর ? কিনবো আমি,' বলেই হাসিখুসি
জান্‌লা খুলে তাকাও তুমি, সঙ্গে মেনিপুষি।

রঙীণ পুতুল নয়রে শুধু রঙের খেলেনা,
এদের সাথে স্বপ্নে জানা স্বপ্নেতে চেনা।
লুকিয়ে ছিল মাটির বুকে কেমন করে মিশে,
হঠাৎ তাদের ঘুম ভেঙে যায় রঙটি ছুঁয়ে কিসে!
তাদের নিয়ে এসে ডাকি
'খুকু পুতুল কিনবে নাকি ?'
'কিনতে পারি। কেমন পুতুল ?' বলেই হাসিখুসি
একটি কাহন দাও ফেলে যে সঙ্গে মেনিপুষি।

মাটির বুকে আছে স্বপন আছে বুকের ভাষা,
আর আছে যে রূপতরাসের দেশের যত আশা।
ফুলের আশা লুকিয়ে সেতো মাটির তলে থাকে
হঠাৎ আলোয় ফুটি উঠি গোপন সুরে ডাকে।
সেই মাটিকে নিয়ে ডাকি
'খুকু পুতুল কিনবে নাকি ?'
'কেমন পুতুল ? মাটির পুতুল ?' বলেই হাসিখুসি
'দাও' বলে দাও হাত বাড়িয়ে, সঙ্গে মেনিপুষি।

খুকু পুতুল কিনবে নাকি?

শ্রীখোকা গুহ

আমার আছে সাত স্বপনের মন্ত্রপড়া রঙ্
সেই রঙেতে জাগার প্রহর-ঘণ্টা বাজে ঢং।
সেই রঙেতে জাগে মাটি, সেই রঙেতে রেঙে
অচিন দেশের মানুষ সবে তাকায় স্বপন ভেঙে।
মাটি-মানুষ নিয়ে ডাকি
'খুকু পুতুল কিনবে নাকি?'
'কেমন পুতুল? মাটির পুতুল?' বলেই হাসিখুসি
একটি হাতে নাও তুলে যে সঙ্গে মেনিপুষি।

হায়রে যে রঙ স্বপ্নে থেকে গোপন কথা কয়
সে রঙ এসে তুলির রঙে মুরটি হয়ে রয়।
যার চোখে নেই রঙের স্বপন তুলিটি তার ফাঁকা,
খানিক মিছে রঙ ফলিয়ে মাটির পরে আঁকা।
আমি পুতুল নিয়ে ডাকি
'খুকু পুতুল কিনবে নাকি?'
'কিনবো না গো, সে কোন্ কথা?' বলেই হাসিখুসি
একটু হাসো কেমনতর, সঙ্গে মেনিপুষি।

তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়ো তখন এরা জাগে
স্বপ্নে এসে কাণে কাণে 'খুকু' বলে ডাকে।
দিনের বেলা রয় ঘুমিয়ে, তারার দেশে বাড়ী
চাঁদের আলোয় হয়তো চাপে, মেঘের জুড়িগাড়ী।
তবু তাদের নিয়ে ডাকি
'খুকু পুতুল কিনবে নাকি?'
'এদের কাছে স্বপন দেশের খবর আছে বুঝি—?'
বলেই তুমি হেসে ফ্যালো, সঙ্গে মেনিপুষি।

——:o:——

মেঘের ছবি

লেখক ও আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ফোটোগ্রাফির আসল কথা এই নয় যে যত ভালো ক্যামেরা হ'বে ছবি উঠ্‌বে তত ভালো ! যেমন দামী বেহালা বা পিয়ানো কিন্‌লেই সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে ওস্তাদ হওয়া যায় না, ফোটোগ্রাফির বেলাতেও তাই। তবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম সুরের উঠানামা ইত্যাদির জন্য যেরকম নিখুঁত যন্ত্রের প্রয়োজন ফোটোগ্রাফির নিখুঁত কারুকার্য্যের জন্যে সেই রকম দরকার শক্তিশালী লেন্স, দ্রুতগতি শাটার (Shutter) ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বেশী যে জিনিষের প্রয়োজন তা' কোন দোকানে কিন্‌তে পাওয়া যায় না, সেটি হচ্ছে শিল্পী মন ও আলো-ছায়া সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন যাঁদের আমার চেয়ে অনেক বেশী দামী ক্যামেরা আছে। কিন্তু তাঁদের অনেকেই আমাকে অনুযোগ করে' বলেন আমার তোলা ছবির মত তাঁদের ছবি হয় না। অনেকে আমার কাছে আসেনও ফোটোগ্রাফী সম্বন্ধে শেখ্‌বার জন্য ; তাঁরা হয়তো ভাবেন এমন কতকগুলো কায়দা আমার জানা আছে যেগুলো তাঁদের শিখিয়ে দিলেই তাঁরাও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছবি তুল্‌তে পারবেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বড় বড় কথা বল্‌তে হয়, অনেক কূট প্রশ্নের দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌তে হয় ; অথচ কোন যে বিশেষ উপকার হয় তা মনে হয় না। কারণ আলো ও ছায়ার পরিপূর্ণ জ্ঞান কেউ কাউকে দিতে পারে না।

ছবি তোলার প্রাথমিক যে কয়েকটি নিয়মকানুন তা' আয়ত্ত করা খুব কিছু শক্ত নয়। কি রকম আলোয় কি রকম exposure দিতে হবে, lensএর aperture কতটা ছোট-বড় হবে ইত্যাদি কয়েকদিন ছবি তুল্‌লেই বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও খুব ভালো ছবি যখন বেরোয় না অনেকেই তখন ছবি তোলার ওপর একান্ত বিরক্ত হয়ে ক্যামেরাটা তুলে রেখে দেন—আল্‌মারি বা বাক্সের সবার নীচে পড়ে' থেকে তার ওপর অবহেলার ঝুল ওঠে জমে।

তবে এ কথাও ঠিক ছবি তোলার আগেই সবাইকার ভেতর পরিপূর্ণ শিল্পী মন ও আলো-ছায়ার জ্ঞান থাকেনা। ছবি তুল্‌তে-তুল্‌তে সেই সুপ্ত প্রতিভা অঙ্কুরিত হ'য়ে ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। তা' ছাড়া অন্যের তোলা ভালো ছবিগুলি বিশ্লেষণ ক'রে

দেখ্‌লেও অনেক উপকার পাওয়া যায়। আর সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হয় কিসের জন্যে ভালো ছবিগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, নিজের ছবিতে কিসের অভাব রয়েছে।

আমার মনে হয় মেঘের ছবি তোলায় যতটা আনন্দ পাওয়া যায় অন্য কোন বিষয়ের ছবি-তোলায় ততটা আনন্দ থাকে না। বছরের বেশীর ভাগ দিনেই আকাশে মেঘ পাওয়া যায়; অন্য দৃশ্যের সঙ্গে ঠিক ক'রে মানিয়ে আংশিক বা পূর্ণভাবে মেঘে-ঢাকা আকাশকে ক্যামেরার মধ্যে বন্দী করতে পারলে ছবিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মনস্তত্ত্ব এই আকাশ আর মেঘের মধ্যে পড়ে' যায় ধরা। আর অনেক বছর পরে পুরোণো এ্যালবামের পাতাগুলো ওল্টাতে ও পাল্টাতে সেই হারিয়ে যাওয়া সুন্দর মুহূর্ত্তগুলো যেন আবার স্পন্দিত হয়ে ওঠে।



ঝড়ের পরে

আকাশ ও মেঘের ছবি তোলা আগে খুবই অসুবিধের ছিল। ফলে তখন যাঁরা ছবি তুল্‌তেন সযত্নে তাঁরা আকাশকে বাদ দিতে চেষ্টা করতেন, নইলে ছবির ওপরের দিকটা এমন প্রাণহীন রক্তশূন্য শাদা হয়ে ফুটে উঠ্‌তো যাতে ছবির সমস্ত সৌন্দর্য্যেরই ঘট্‌ত অপমৃত্যু। কিন্তু ক্রমশঃ ক্যামেরা লেন্স, শাটার, ফিল্‌টার, ফিল্ম ইত্যাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে সে অসুবিধের মূলচ্ছেদ ঘটছে। এখন আর ছবির সেই রক্তশূন্য ফ্যাকাশে শাদা জায়গাটাকে তুলির সাহায্যে মেঘ এঁকে দিতে হয় না; exposure দেবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বর্ণ আর মেঘ ফিল্মের ওপর নিখুঁত ভাবে আঁকা হ'য়ে যায়। তাই আজকাল প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির সৌন্দর্য্য কেন্দ্র হচ্ছে মেঘ ও আকাশ এমন কি মেঘ না থাকলেও শুধু আকাশেরই এমন সুন্দর বর্ণ ধরা যায় যা'র তলায় চাপা পড়ে' যায় সেই ফ্যাকাশে শাদা রঙ্‌।

অনেকেই ছবি তোলার সময় ক্যামেরা ও ফিল্মের দিকে যতটা নজর দেন, ফিল্‌টারের দিকে ততটা মনযোগ দেন না। অথচ আকাশ ও মেঘের ছবি তুল্‌তে গেলে এই ফিল্‌টার

জিনিষটার প্রয়োজন হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের মত। আমাদের দেশে যারা ছবি তোলেন ফিল্‌টার সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁদের নেই বল্‌লেই চলে—এক টুক্‌রো হল্‌দে কি নীল কি লাল কাঁচ নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাতে মোটেই প্রস্তুত ন'ন। অথচ ফিল্‌টার জিনিষটার যে কি অবিশ্বাস রকম শক্তি আছে তা' যদি তাঁরা জান্‌তেন! আমার তো মনে হয় যে কোনও ছবি তোলার সময় ফিল্‌টার ব্যবহার করা উচিৎ—অবশ্য কি রঙের ফিল্‌টার ব্যবহার কর্‌তে হ'বে তা' বিষয়বস্তুর ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কারণ, যদিও আজকাল ফিল্ম ও প্লেটের অনেক উন্নতি হয়েছে তবুও সব কটা রঙের ছায়া প্লেটের বা ফিল্মের ওপর পাওয়া যায়না—যদি না ফিল্‌টার ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক্ একটি ছোট মেয়ের ছবি তুল্‌তে হবে: তা'র জামার রঙ্ লাল, মোজার রঙ নীল, জুতোর রঙ্ সবুজ, চুলের রঙ্ সোণালী আর দেহের রঙ্ দুধের মত শাদা। এখন যদি ফিল্‌টার না দিয়ে ছবি তোলা যায় তা' হ'লে দেখা যা'বে ছবিতে শুধু উঠেছে একটি মেয়ের চেহারা এবং ঐ সবকটা রঙের জন্যে সাদ ও কালো মাত্র এই দুটো রঙ্‌কেই দেখা যাবে—লাল সবুজ নীল ইত্যাদি সব রঙ্‌গুলোর ফল হবে একই রকম। কিন্তু যদি ছবি তোলার সময় একটা ফিকে হল্‌দে রঙের ফিল্‌টার ব্যবহার করা যায় তা হলে যে ছবি উঠবে, আগের ছবির সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। মেয়েটির চুলের থেকে জুতো মোজা ইত্যাদি সব জিনিসের বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ফল বা effect স্পষ্ট দেখা যাবে—ফিলটার লাগানোর জন্যে অবশ্য ফটোতে লাল নীল সবুজ ইত্যাদি রঙগুলো দেখা যাবে না—দেখা যাবে সেই সাদা ও কালো রঙ, তবুও আগের ছবির শাদা ও কালো রঙের চেয়ে এর সাদা ও কালো রঙের আকার অনেক তফাৎ। যেখানে ছিল লাল রঙ্ সে জায়গাটা ছবিতে উঠবে ঘোর কালো, যেটা ছিল সবুজ সেটা হবে একটু ফিকে কালো, নীল রঙ্ হবে আরও ফিকে কালো ইত্যাদি। আগের ও পরের ছবির দুখানা প্রিন্ট পাশাপাশি রাখলে সহজেই বোঝা যাবে কতটা আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়েছে মাত্র এক টুকরো হল্‌দে কাঁচ ব্যবহার করার জন্য।



বসন্তের প্রতীক্ষায়

মেঘের ছবি

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মেঘের ছবি তোলার কথাই এবার বলি।

মেঘ নানা ধরণের আছে, কোনটা পাখীর পালকের মত হাল্‌কা আর শাদা কোনটা বা রাত্রির ছায়ার মত গম্ভীর ও কালো। শরৎকালে এক রকম মেঘ দেখা যায়, কালবৈশাখি ঝড়ের আগে দেখা যায় মেঘের রঙ্‌ আর এক রকম, আষাঢ়ের আকাশে বৃষ্টি পড়ার আগে ও পরে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন রঙের মেঘ। কোন মেঘ দেখলে হঠাৎ খুশীতে ভরে যায় সমস্ত মন। কোন মেঘ আবার স্কুলের হেড পণ্ডিতের মত মুখটা করে থাকে অযথা গম্ভীর ও ভারি।



মেঘ ও রৌদ্র

এখন এই সমস্ত বিভিন্ন ধরণের মেঘের ছবি তুলতে গেলে বিভিন্ন ধরণের ফিলটার ব্যবহার করা প্রয়োজন। এবং মেঘের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বা মানুষের জীব-জন্তুর ছবি তোলার সময়েও আলাদা আলাদা রঙের ফিলটার লেন্সের সমানে লাগান উচিত।

মেঘের ছবি তুলতে গেলে প্রথমতঃ ব্যবহার করা উচিত প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম বা প্লেট: কোডাকের প্যানাটমিক্‌ বা আগ্‌ফার সুপ্যারপ্যান ফিল্মই ভালো—এই ফিল্মের আর একটা মস্ত গুণ—এথেকে ছবির অনেক বড় এনলারজমেণ্ট করা যায়। আগেই বলেছি ফিলটার ব্যবহার করলে বিভিন্ন জিনিষের রঙ বিভিন্ন ধরণের সাদা ও কালো হয়। তাই মেঘের ছবি তোলার সময় ফিল্‌টার দিয়ে ছবি তুললে আকাশের রঙ্‌ হয় এক রকম এবং মেঘের রঙ হয় আর এক রকম। তাতে মেঘের ছবি বেশী সুন্দর ও স্পষ্ট হয়ে খোলে।

উদাহরণস্বরূপ এখানে কতকগুলি ছবি দিলুম। প্রত্যেকটি ছবির বিশেষত্ব কোথায় এবং কি ভাবে তোলা হ'য়েছে তা' নীচে লিখ্‌চি:

(১) ঝড়ের আগে (প্রচ্ছদপট)—এ' ছবিটা দেখ্‌লেই মনে হয় না কি যে ক্ষিপ্ত দৈত্যের মত মেঘটা তেড়ে আসছে? এখানে মেঘের কারিকুরি বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, শুধু কালো মেঘের শেষে দেখা যাচ্ছে রূপোলি আলোর পাড়। একটা বিরাট ঝড়ের প্রতীক্ষায় নিষ্কম্প গাছ গুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চার্‌দিকে একটা থম্‌থমে ভাব। মেঘটার রং আসলে

এতোটা কালো ছিল না, কিন্তু ঝড়ের আব্‌হাওয়াকে খুব স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যে এখানে সমস্ত মেঘটাকেই ইচ্ছে করে অমাবস্যার আকাশের মত কালো ক'রে ফেলা হ'য়েছে। ঘোর হল্‌দে ফিল্‌টার (deep yellow filter) এখানে ব্যবহার ক'রেছিলুম এবং বিকেল তিনটের সময় exposure দিয়েছিলুম এফ আট্‌ এ $\frac{1}{100}$ সেকেণ্ড (F 8, $\frac{1}{100}$th part of a second). খুব কম exposure দেওয়ায় মেঘের রঙ্‌টা কালো হ'বার সহায়তা ক'রেছে।

(২) ঝড়ের পরে—(ছবি ৯৪৮ পৃঃ) ঝড় যে শেষ হয়েছে এ ছবিটা দেখ্‌লে সে কথা আর স্পষ্ট করে 'বলে' দিতে হয়না। মেঘগুলো ছেঁড়াখোঁড়া আগের ছবির মত তা'দের মধ্যে সেই জমাট্‌-বাঁধা থম্‌থমে ভাবখানা নেই। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার দরুণ মেঘের সেই ভারি কালো রঙও হয়েছে অদৃশ্য। নিষ্পত্র রিক্ত গাছগুলোও যেন বলে দিচ্ছে এক্‌টা সাঙ্ঘাতিক ঝড় এসে' তা'দের ঝুঁটি নাড়িয়ে সমস্ত পাতার সজ্জা নির্ম্মমভাবে দিয়েছে ঝরিয়ে। তা' ছাড়া এ' ছবিখানা দেখলেই মনে হয় এখুনিই মেঘে-মাজা নীল আকাশখানা হেসে' উঠ্‌বে। এই ধরণের হাল্‌কা ও সাদা রঙের মেঘের ছবি তুল্‌তে গেলে' ফিকে লাল রঙের ফিল্‌টার (light red filter) ব্যবহার করতে হয়। তাতে উঁকি ঝুঁকি মারা নীল আকাশখানার রঙ্‌ কালো হয়ে যায় এবং ফলে সাদা মেঘ আরও চমৎকার খোলে। এখানে গাছপালা মাটি ইত্যাদি সব কিছুকে ইচ্ছে করে' কালো বা silhouette করে' দিয়েছি ; ছবির সৌন্দর্য্য ও ভাব ফোটাবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছে। বিকেল চারটেয় এ' ছবি তোলা হয়েছিল ; exposure দিয়েছিলুম এফ্‌ ৫·৬তে $\frac{1}{100}$ সেকেণ্ড (f 5·6, $\frac{1}{100}$ th part of a second) (গোড়ার ছবি দেখ)।



বাড়ীর পথে

(৩) বসন্তের প্রতীক্ষায় (পৃঃ ৯৪৯)—সাধারণ এত মেঘ্‌লা দিনে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এ ছবিটা তুলে'ছিলুম। এই রকম পাতা মরা শীর্ণ ডালপালা মেলা গাছের পেছনে মেঘ জম্‌লে ছবি খুব ভালো হয়। দৃশ্যটা খুবই সাধারণ, অথচ কি রকম চমৎকার হ'য়ে উঠেছে দ্যাখো !

ফিকে হল্‌দে ফিল্‌টার ও এফ্‌ ১১র $\frac{১}{৮০}$ সেকেণ্ড (f 11, $\frac{1}{80}$th part of a second) exposure এ’ ছবিটা তুলে’ছিলুম।

(৪) মেঘ ও রৌদ্র (পৃঃ ৯৫০)—সূর্য্যের আলোয় ঝল্‌সানো কোনও কোন জ্বলন্ত দিনের দুপুরেহঠাৎ দেখা যায় ক’য়েক টুক্‌রো হাল্‌কা শাদা মেঘ ক’য়েক মুহূর্ত্তের জন্য সূর্য্যটাকে ঢেকে’ ফেল্‌লো এবং উজ্জ্বল হীরের মত সেই মেঘের চারদিক্‌ থেকে তীরের মত তীক্ষ্ণ রোদ ঠিক্‌রে পড়্‌তে লাগ্‌লো—এই ছবিটা সেই রকমই এক দিনে তোলা। এই ঠিক্‌রে পড়া সূর্য্যরশ্মি-গুলোকে ধরবার জন্যে গভীর লাল ফিল্‌টার (deep red filter) ব্যবহার কর্‌তে হয় এবং exposure সম্বন্ধেও হতে হয় খুব সতর্ক। কারণ exposure সামান্য বেশী-কম হলেই ওই ধরণের রশ্মিগুলো পাওয়া যা’বে না। দুপুর দু’টোর সময় এফ্‌ ৮এ $\frac{১}{৮০}$ সেকেণ্ড (f 8, $\frac{1}{80}$th part of a second) তোলা হ’য়েছিল।

(৫) বাড়ীর পথে (পৃঃ ৯৫১)—এই ধরণের ছবি তোলা খুব শক্ত। কারণ মেঘের ছবি তোলার সময় দিতে হয় খুব কম exposure, কারণ মেঘের মধ্যে সূর্য্যের আলো থাকে খুব বেশী। এবং মানুষ, জীবজন্তু বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলার সময় exposure দিতে হয় কিছু বেশী। ফলে একসঙ্গে মেঘ ও মানুষ জীব-জন্তুর ছবি তুল্‌তে গেলে কি exposure দেবো এই নিয়ে মহা অসুবিধেয় পড়্‌তে হয়। এ’ ক্ষেত্রে ফিল্‌টার বাছাই ও exposureএর ওপর নিখুঁত দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ ভুল রঙের ফিল্‌টার বাছলে ও exposure বেশী কম হলে হয় মেঘটা আস্‌বে খুব ভালো কিন্তু অন্য সব জিনিষ কালো (silhoutted) হয়ে যা’বে কিংবা অন্য সব জিনিষ আস্‌বে পরিষ্কার কিন্তু মেঘের বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য হ’বে নষ্ট, এবং বেশী ভুল হ’লে হয়তো কোন রকম মেঘের চেহারাই দেখ্‌তে পাওয়া যা’বে না। অনেক সময়ে এ’ ধরণের ছবি তুল্‌তে গেলে একাধিক ফিল্‌টার ব্যবহার কর্‌তে হয়েছে। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় এ’ ছবি তোলা হ’য়েছিল; ফিকে হল্‌দে ও সবুজ ফিল্‌টার (light yellow and light green filter) ব্যবহার করেছিলুম exposure—এফ্‌ $\frac{১}{২৮}$ সেকেণ্ড (f 5·6 $\frac{1}{28}$ th part of second).

এখানে যতগুলি ছবি ছাপানো হ’ল সবগুলি তুল্‌তেই হয় কোডাক্‌ প্যানাটমিক্‌ বা আগফা আইসোপ্যান্‌ রোল ফিল্ম ব্যবহার করেছি।

এই প্রবন্ধে শুধু মেঘের ছবি তোলাই আলোচনা কর্‌লুম। ভবিষ্যতে অন্য নানা বিষয়ের ছবি তোলা সম্বন্ধে লেখ্‌বার ইচ্ছে রইলো। এই সমস্ত ছবি দেখে’ ও এ প্রবন্ধ পড়ে’ তোমাদের ভেতর উৎসাহী একজন ছেলে-মেয়েও যদি কিছু কিছু ভালো ছবি তুল্‌তে পারো তা’ হলে আমার এ প্রবন্ধ সার্থক হয়েছে বলে’ মনে’ কর্‌বো।



দশম পরিচ্ছেদ

[হানা দেবালয়ের জীবন্ত পাথর]

মাণিকের অনুমানও ব্যর্থ হয় নি, তার ফন্দিও ব্যর্থ হ'ল না!

মিনিট-পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ওধারের বনের ভিতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। দূর হ'তে তাদের দেখাচ্ছে খুব ছোট ছোট!

সুন্দরবাবু দূরবীণটা তাড়াতাড়ি চোখে লাগিয়ে সোৎসাহে বললেন, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ! হুম্, ব্যাটাদের দলে দশজন লোক আছে। ওরা হন্-হন্ ক'রে এইদিকেই আসছে। হুঁ-হুঁ বাবা, ঘুঘুই দেখেছ ফাঁদ তো দেখনি! চ'লে আয়—চ'লে আয়, চৈ চৈ চৈ!……ওরে বাপ্‌রে! ওটা আবার কে রে! কী লম্বা! কী জোয়ান্! যেন ঘটোৎকচের বাচ্ছা! ওর পাশে পাশে আসছে এক বেটা গুড়্‌গুড়ে বেঁটেরাম সর্দ্দার, পায়ে হেঁটে চলছে, না ফুটবলের মত মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে?"

—"কই, দেখি দেখি" ব'লে সাগ্রহে অমলবাবু দূরবীণটা সুন্দরবাবুর হাত থেকে প্রায় একরকম কেড়েই নিলেন এবং নিজের চোখে লাগিয়েই ব'লে উঠলেন, "ঐ তো চ্যান্! ঐ তো ইন্! সাত ঘাটের জল ঘেঁটে এতদিন পরে স্বচক্ষে আবার প্রভুদের দেখা পেলুম! ওরে ও পাপিষ্ঠ, ওরে অ পিশাচ! সুরেনবাবু আর জয়ন্তবাবু তোদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! তোরা গোপীনাথকে খুন করেছিস্, আমাকেও বধ করতে এসেছিলি!……অ্যাঃ! চ্যানের বাঁ-হাতে যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তাহ'লে পশুরাতে মাণিকবাবুকেও ওরা মারতে এসেছিল! হাতী সিং, বন্দুক ছোঁড়ো—বন্দুক ছোঁড়ো! হতভাগাদের পাগ্‌লা কুকুরের মত মেরে ফেল!"

প্রভুর হুকুম পালন করবার জন্যে হাতী সিং তখনি বন্দুক তুললে, কিন্তু মাণিক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, "বন্দুক নামাও হাতী সিং, আমি যখন বলব তখন ছুঁড়বে! অমলবাবু, আপনি বড়ই উত্তেজিত হয়েছেন, শান্ত হোন্! ওদের আরো কাছে আসতে দিন্!"

অমলবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "উত্তেজিত হব না—বলেন কি? যমদূতদের দেখলে কি শান্ত হয়ে থাকা যায়?"

সুন্দরবাবু প্রমাদ গুণে বললেন, "অমলবাবুই সব পণ্ড করবেন দেখছি! অত চ্যাঁচালে ওরা কি আর কাছে আসবে?"

তখন অমলবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, "মাপ্ করুন, আর আমি কথা কইব না!"

ততক্ষণে মাঠের লোকগুলো অনেকটা এগিয়ে এসেছে, তাদের চেহারাও মোটামুটি দেখা যাচ্ছিল। তারা সবাই হয় বর্ম্মী, নয় শ্যামদেশের লোক এবং তাদের ভিতরে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চ্যানের অসম্ভব দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ! এবং তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় যে, কাটা-আঙুলের যন্ত্রণায় তার অবস্থা বিলক্ষণ কাহিল!

মাণিক বললে, "আসুন, এইবারে বন্দুক নিয়ে আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি। পায়ের দিকে গুলি ক'রে ওদের অকর্ম্মণ্য করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, নরহত্যায় দরকার নেই—কি বলেন সুন্দরবাবু?"

—"বেশ, তাই সই।"

এইবারে শত্রুরা বন্দুকের নাগালের ভিতরে এসে পড়ল।

সুন্দরবাবু বললেন, "ওরা যে কেন এতক্ষণ দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করে নি, এইবারে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে! ওদের কাছে আছে মোটে একটা বন্দুক!"

মাণিক বললে, "এইবারে আমাদের চারটে বন্দুক গর্জ্জন করতে পারে,—ওদের আর এগুতে দেওয়া উচিত নয়!"

সুন্দরবাবু বললেন, "ওয়ান্, টু, থ্রি!"

একসঙ্গে চারটে বন্দুক অগ্নি-উদ্গার করলে—সঙ্গে সঙ্গে মাঠের উপরে সর্ব্বপ্রথমে ধরাশায়ী হ'ল ইনের বাঁটকুল দেহ! বাকি সকলে মহা ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে যেদিক থেকে আসছিল আবার সেইদিকে দৌড়তে আরম্ভ করলে!

এদিক থেকে দ্বিতীয় বার গুলিবৃষ্টি করা হ'ল। এবারে লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পাগলের মত মাঠের নানাদিক ছুটতে লাগল, আর একজন আহত হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়েও আবার কোনরকমে উঠে ভোঁ-দৌড় মারলে! কিন্তু দৌড়তে পারছিল না কেবল ইন্, সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আর ভয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে কোনরকমে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যাচ্ছিল! তার দুর্দ্দশা দেখে চ্যান্ আবার ফিরে এল এবং একহাতে ইনের দেহকে সে ঠিক শিশুর দেহের মতই নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে আবার দৌড়তে আরম্ভ করলে!

অমলবাবু চ্যানকে টিপ্ করে বন্দুক ছুঁড়লেন, কিন্তু গুলি তার গায়ে লাগল না।

আরো দু'একবার গুলিবৃষ্টির পর মাণিক বললে, "যথেষ্ট হয়েছে, আর টোটা নষ্ট ক'রে লাভ নেই! ওরা নানাদিকে দৌড় মেরেছে. আবার বন-বাদড় ভেঙে একসঙ্গে মিলতে ওদের অনেকক্ষণ লাগবে। তার পরেও আজ আর ওরা আমাদের পিছু নিতে সাহস করবে ব'লে মনে হয় না।"

সুন্দরবাবু মাণিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, "হ্যাঁ, ব্যাটারা যত-বড় গুলিখোরই হোক্, আবার গুলি খাবার জন্যে ওরা আর শীঘ্র ব্যস্ত হবে ব'লে মনে হচ্ছে না!··· ··জয়, মাণিকের বুদ্ধির জয়!"

পথ চলতে চলতে মাণিক জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা অমলবাবু, এই পদ্মরাগ-বুদ্ধের কোন ইতিহাস জানেন?"

অমলবাবু বললেন, "ঠিক পদ্মরাগ-বুদ্ধের ইতিহাস জানিনা বটে, তবে ওঙ্কারধামের ইতিহাসে এরই মত এক মরকত-বুদ্ধের কথা শোনা যায়। ওঙ্কারধাম সাম্রাজ্যের রাজধানী যশোধরপুরে এই মরকত-বুদ্ধে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। *

মরকত-বুদ্ধ নিয়ে তর্ক চলছে। কেউ বলেন, এখন এই মূর্ত্তি জাপানে আছে; কেউ বলেন, ফর্মোজা দ্বীপে আছে; কেউ বলেন, জাভায় আছে। ওঙ্কারধামের পতন হয়, শ্যামদেশের দ্বারা। ওদেশের লোক বলে, তাদের রাজধানী ব্যাঙ্কক্ সহরের মন্দিরে যে সবুজাভ পাথরে গড়া বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, সেইটিই হ'চ্ছ প্রবাদ-প্রসিদ্ধ মরকত-বুদ্ধ। কেবল মরকত-বুদ্ধ নয়, ওঙ্কারধামে নাকি একটি স্বর্ণময় বিরাট শিবলিঙ্গ ছিল। ওঙ্কারধামের বাসিন্দারা থেইস্ নামে একটি জাতিকে অত্যন্ত ঘৃণা করত। এই থেইস্রা বাস করত বর্ত্তমান শ্যামদেশে। এখনো যারা ওখানে বাস করে তারা ঐ থেইস্দেরই বংশধর।......বারংবার পরাজয়ের পর থেইস্রা অবশেষে বিশেষ আয়োজন ক'রে ওঙ্কারধামকে হঠাৎ আক্রমণ করে। একটা বড় যুদ্ধে তারা জয়ী হয়। জনৈক ভগ্নদূত সেই খবর নিয়ে ফিরে এল। ওঙ্কারধামের সেনাপতি বললেন, "তোমার খবর মিথ্যা হ'লে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। আর তোমার খবর সত্য হ'লেও তোমার প্রাণদণ্ড হবে। কারণ সবাই যখন বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তখন তুমি কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছ!" ভগ্নদূতের প্রাণদণ্ড হ'ল, কিন্তু ওঙ্কারধাম রক্ষা পেলে না। পুরোহিতরা নগর-রক্ষা অসম্ভব দেখে মরকত-বুদ্ধ, স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ, অন্য অন্য মূল্যবান বিগ্রহ আর রাশি রাশি হীরে-মণি-মুক্তা তখনি সরিয়ে ফেলে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন। অনেকেরই দৃঢ়বিশ্বাস, বিজয়ী থেইস্রা সে-সব গুপ্তধন খুঁজে পায় নি। ওঙ্কারধামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও কত লোক সেই গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়! কিন্তু আজও কেউ তার ঠিকানা আবিষ্কার করতে পারে নি! আমাদের এই পদ্মরাগ-বুদ্ধ সেই গুপ্তধনেরই অংশবিশেষ কিনা, কে তা বলতে পারে?"

* "And in Yacodharpura, which is the Great Capital of the Khmer people and the finest city in all of Asia, there is a statue of the Lord Buddha sitting upon the coiled cobra which is the emblem of that race. And this statue was fashioned out of emeralds so cunningly matched and cemented together that the whole work sums as one solid emerald and shines with a green light so intense that none but the faithful may look upon it."

পদ্মরাগ বুদ্ধ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বৈকাল অতীত হয়ে গেছে, সূর্য্যালোক তখন অরণ্যের মাথার উপরে গিয়ে উঠেছে। দিনের আলোয় চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু এমন নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ যে, রাত্রির স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনা করা চলে!

আরো মাইল-খানেক পথ পেরিয়ে অমলবাবু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "ঐ সেই সপ্ত-তালগাছ!"

সুন্দরবাবু বললেন, "সপ্ত-তালগাছ আবার কি?"

—"ঐ হচ্ছে আমাদের পথের শেষ-নিশানা। পাশাপাশি ঐ যে সাতটা তালগাছ দেখছেন, ওর পরেই সেই ভাঙা-মন্দিরের প্রকাণ্ড বাঁধানো চত্বর—অর্থাৎ আমাদের পথের শেষ!"

কিন্তু পথের শেষে এসে মাণিকের মনে জয়ন্তের শোক আরো বেশী ক'রে জেগে উঠল। জয়ন্তের জন্যেই এদেশে আসা, পদ্মরাগ-বুদ্ধের জন্যে তারই আগ্রহ ছিল অফুরন্ত। জয়ন্ত নেই তবু যে সে এখানে এসেছে, এ কেবল বন্ধুর ব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্যে! সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে, 'যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে অমলবাবুর হাতে পদ্মরাগ-বুদ্ধকে সমর্পণ ক'রে সে সর্ব্বাগ্রে চ্যান্ আর ইনকে গ্রেপ্তার করবে। যতদিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবে না, ততদিন সে স্বদেশে ফেরবার কথা মনেও আনবে না?'

তারা সপ্ত-তালের তলায় এসে দাঁড়াল। তারপর একটা বাঁশবনের প্রাচীর পার হয়েই সকলে সবিস্ময়ে দেখলে, তাদের চোখের সামনেই রয়েছে, চারিদিকে প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত একটা মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে পাথরে-বাঁধানো একটি প্রকাণ্ড চত্বর। এবং চত্বরের মাঝখানে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর এক কোণ দিয়ে যে-রাস্তাটি পশ্চিম মুখে চ'লে গিয়েছে, তারই প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মস্ত একটি পাথরের মন্দিরের কতক অংশ। মন্দিরের বাকি অংশ গাছপালার ভিতরে ঢাকা পড়েছে।

সকলে যখন পুকুর-পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল, সুন্দরবাবু বললেন, "এইবারে পদ্মরাগ-বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে হবে। হুম্, বার কর তো মাণিক, তোমার সেই সোনার চাক্তিখানা!"

মাণিক পকেট থেকে চাক্তি বার ক'রে সুন্দরবাবুর হাতে দিয়ে বললে, "আপনিই তা'হলে নক্সার পাঠোদ্ধার ক'রে আমাদের বাহবা লাভ করুন!"

সুন্দরবাবু অবহেলা-ভরে বললেন, "পুলিসে চাকরি নিয়ে ঢের ঢের হেঁয়ালী জলের মত প'ড়ে ফেলেছি, এ তো সামান্য নক্সা মাত্র!……

হুম্! নক্সায় এই তো রয়েছে পুকুরটা, চারদিকে এই তো চারটে ঘাটের সিঁড়ি! কিন্তু নক্সায় পুকুরের পশ্চিম কোণে এই যে তিন-কোণা চিহ্নিত জায়গাটা রয়েছে, আসল পুকুরের পশ্চিম কোণে তেমন ধারা কিছুই তো দেখছি না!" *

মাণিক হাসতে হাসতে বললে, "ওকি সুন্দরবাবু, এরি-মধ্যে মাথা চুল্‌কোচ্ছেন কেন?"

—"মাথা চুল্‌কোচ্ছি কি সাধে? এ নক্সাখানা কেউ ঠাট্টা ক'রে আঁকেনি তো?"

* "রংমশালে"র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত মন্দিরের নক্সা দেখুন।

—"বোধহয় না। আচ্ছা, দিনের আলো থাকতে থাকতে আগে মন্দিরের ভেতরে চলুন। সেখানে গেলে হয়তো কোন হদিস্ পাওয়া যাবে!"

—"ঠিক বলেছ। তাই চল।"

দিনের আলো তখন নিবু-নিবু হবার সময় এসেছে। পাখীরা বিদায়ী গান গাইতে গাইতে বাসার দিকে ফিরতে সুরু করেছে। সূর্য্যের কিরণ আর দেখা যাচ্ছে না—যদিও অন্ধকারের ঘুম এখনো ভাঙে নি।

মাঝখানে প্রকাণ্ড এক মন্দির, তার উপর দিকটা ভেঙে পড়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, সম্পূর্ণ অবস্থায় এ-মন্দিরটা অন্ততঃ একশো ফুটের কম উঁচু ছিল না। মন্দিরের আগাগোড়া কারুকার্য্যে আর ছোট-বড় মূর্ত্তিতে ভরা। কিন্তু তার অধিকাংশই ভেঙে বা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে মহাকালের নির্দ্দয়তায়। বড় মন্দিরের চারপাশে যে চারটি ছোট মন্দির ছিল, এখন তাদের সামান্য চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানে যেদিকেই তাকানো যায়, কেবলই ধ্বংসের লীলা স্তম্ভিত হয়ে আছে মৃত্যু-স্তব্ধতার কোলে। মন নেতিয়ে পড়ে, প্রাণ হা-হা করে, চোখে বিষণ্ণতা জাগে।

সকলে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করল। মন্দিরের ভিতরে তখন আলো-আঁধারের খেলা আরম্ভ হয়েছে—সহজে দূরের জিনিস স্পষ্ট চোখে পড়ে না।

চূড়া ভেঙে পড়েছে ব'লে উপর-পানে তাকিয়ে দেখা গেল, পশ্চিমের আরক্ত রাগে রঞ্জিত নীলাকাশকে।

মন্দির-গর্ভ খুব প্রশস্ত, তার মধ্যে বড় বড় অনেকগুলো হল-ঘরের ঠাঁই হ'তে পারে। ভিতরের চারকোণে চারিটি মানুষের চেয়েও ডবল বড় 'অবলোকিতেশ্বর' বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। একটি মূর্ত্তি কতকটা অটুট আছে, বাকি মূর্ত্তি তিনটির কারুর দেহের উপরিভাগ নেই, কারুর পদযুগল নেই, কারুর মুণ্ড নেই। দেওয়ালেও ক্ষোদিত ভাস্কর্য্য কাজ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে ভালো ক'রে দেখা যায় না।

মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের সামনে প্রকাণ্ড একটি মূর্ত্তিশূন্য বেদী রয়েছে—কালো পাথরে গড়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে অমলবাবু বললেন, "ওরই ওপরে আমরা সেই ছোট্ট বুদ্ধমূর্ত্তিটি পেয়েছিলুম।"

মানিক একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "অতটুকু একটি মূর্ত্তির জন্যে এত-বড় একটা মন্দিরের এত-বড় কালো পাথরের বেদী গড়া হয়েছিল! সে মূর্ত্তি কখনো এমন মন্দিরের প্রধান দেবতা হ'তে পারে না!"

অমলবাবু বললেন, "আমারও সেই সন্দেহ হয়। বিশেষ, মন্দিরের অপ্রধান মূর্ত্তিগুলিই যখন এমন প্রকাণ্ড!" আমার বিশ্বাস, বেদীর উপর থেকে প্রধান মূর্ত্তিটিকে হয়তো কোন কারণে সরিয়ে ফেলা

হয়েছিল। পরে পূজার বেদীতে দেবতার অভাব কতকটা দূর করবার জন্যে কোন ভক্ত এই মূর্ত্তিটিকে স্থাপন করেছিল!"

—"খুব সম্ভব, তাই!"

সুন্দরবাবু এতক্ষণ নির্ব্বাক ও হতভম্বের মত নক্সার সঙ্গে বেদীটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

অমলবাবু তাঁর অবস্থা দেখে হেসে ফেলে বললেন, "কি সুন্দরবাবু, নক্সা দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না তো? আমিও পারি-নি!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, এ হচ্ছে একখানা বাজে নক্সা! কোন ধাপ্পাবাজের আঁকা! আমরা সবাই হচ্ছি মহা হাঁদা-গঙ্গারাম, এক-টুকরো হিজিবিজি দেখে যমালয়ের রাস্তায় ছুটে এসেছি! পদ্মরাগ-বুদ্ধ! সোণার পাথর-বাটি! যা নয় তাই!"

মাণিক চাক্তিখানা সুন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

মন্দিরগর্ভে অন্ধকার তখন আলোকের শেষ আভাটুকুও নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। সেই মহা-নির্জ্জনতার স্বদেশে, সেই মান্ধাতার আমলের মন্দিরের প্রাচীন স্তব্ধতা যেন ঘনায়মান ও হিংস্র অন্ধকারের মূর্ত্তি ধ'রে সকলের প্রাণ-মনের উপরে চেপে বসতে চাইছিল! উপর দিকে হঠাৎ ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ শব্দ হ'ল—নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার মাঝখানে সেই শব্দগুলোকে শোনালো যেন বন্দুকের আওয়াজের মত! চমকে এবং দোদুল ভুঁড়ি নাচিয়ে লাফিয়ে উঠে সুন্দরবাবু সভয়ে ঊর্দ্ধমুখে দেখলেন, ভাঙা মন্দিরের ফাঁকে তখনো-উজ্জ্বল আকাশপটে কালো কালো চলন্ত দাগ কেটে কি-কতকগুলো উড়ে গেল!

অমলবাবু বললেন, "বাদুড়!"

সুন্দরবাবু বললেন, "না, অন্ধকারের কালো বাচ্ছা!

মাণিক নিজের মনেই বললে, "নক্সায় বেদীর গায়ে সিঁড়ি আঁকা রয়েছে। কিন্তু এখানে কোথায় সিঁড়ি?"

সুন্দরবাবু বললেন, "প্রতিধ্বনিও বলবে—কোথায় সিঁড়ি? ও সিঁড়ি-ফিড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না, আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হ'ল, জয়ন্ত-বেচারা বেঘোরে প্রাণ দিলে, এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাই চল মাণিক!"

—"পালাবো, কেন?"

—"এ জায়গাটা ভালো নয়! আমার বুক ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে! হুম, আমার বুক অকারণে ছাঁৎ-ছাঁৎ করেনা, এটা নিশ্চয়ই হানা মন্দির!"

মাণিক হেসে উঠল—তার হাস্যধ্বনি মন্দিরের অন্ধকার-ভরা কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে, শোনালো ঠিক অন্ধকারের হাসির মত !

সুন্দরবাবু অস্বস্তিপূর্ণকণ্ঠে বললেন, "তুমি হেসো না মাণিক। এমন অস্বাভাবিক স্তব্ধতা তুমি কখনো অনুভব করেছ ? একমাইল দূরে একটা আল্‌পিন পড়লেও যেন শোনা যায় ! এ স্তব্ধতা যেন নিরেট্, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় ! এ স্তব্ধতা যেন ওজনে ভারি—বুকে জাঁতাকলের মত চেপে বসে ! এ যেন স্তব্ধতার মহাসাগর,—আমাদের কথাগুলো যেন মুখ থেকে বেরিয়েই এই স্তব্ধতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে !"

মাণিক কোন কথায় কাণ না পেতে মন্দিরের বেদীর উপরে হাত বুলোতে লাগল। তারপর ফিরে বললে, "অমলবাবু, এ বেদীর গায়ে কখনো যে কোন সিঁড়ি ছিল, তার চিহ্নটুকুও দেখ্‌ছি না ! অথচ নক্সায় সিঁড়ি আঁকা রয়েছে ! এর মানে কি ?"

—"আমার বোধ হয় এ নক্সাখানা অন্য কোন জায়গাকার !"

—"অসম্ভব ! নক্সার সঙ্গে এখানকার বাকি সমস্তই হুবহু মিলে যাচ্ছে ! এই সিঁড়ির হয়তো কোন গুপ্ত অর্থ আছে।"

—"থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কেউ তা জানি না। সুতরাং আমাদের পক্ষে ও-গুপ্তঅর্থ থাকা-না-থাকা দুই-ই সমান।"

হঠাৎ সুন্দরবাবু আঁৎকে ব'লে উঠলেন, "মাণিক, মাণিক ! কে যেন এখানে চাপা হাসি হাস্‌ছে !"

মাণিক বললে, "কৈ ?"

—"হাসি আবার থেমে গেল !"

—"ও আপনার মনের ভুল। আমি কোন হাসি শুনি নি।"

—"অমলবাবু, আপনিও শোনেন নি ?"

—"না। কে আবার হাসবে. এখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।"

—"হুম্, শুনিনি বললেই হ'ল ? আমি স্পষ্ট শুনেছি ! কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি চেপে রাখবার চেষ্টা ক'রেও পারলে না !"

—"তাহ'লে আপনার পিছনে ঐ যে বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে জাগ্রত বলে মানতে হয় ! আপনার ভয় দেখে উনিই হেসে ফেলেছেন !"

সুন্দরবাবু তাড়াতাড়ি দু পা পিছিয়ে এসে ফিরে তাকালেন।

পদ্মরাগ বুদ্ধ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া মেঘে প্রকাণ্ড "অবলোকিতেশ্বর" দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রস্তর-চক্ষুর প্রশান্ত ন সুন্দরবাবুর মুখের পানেই তাকিয়ে আছে এবং তাঁর ওষ্ঠাধর স্নিগ্ধহাস্যে বিকসিত !

সুন্দরবাবু বিস্ফারিত আড়ষ্ট চোখে দেখলেন, আচম্বিতে বুদ্ধমূর্ত্তি জ্যান্তো হয়ে টলমলিয়ে ন'ড়ে উঠল !



অবলোকিতেশ্বর দাঁড়িয়ে···

—"হুম, বাপ্ !" ব'লে সুন্দরবাবু সুদীর্ঘ এক লাফ মেরে একেবারে মাণিকের ঘাড়ের উপরে এসে পড়লেন !

অমলবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "বুদ্ধদেব ন'ড়ে উঠেছেন মাণিক ! আমি স্বচক্ষে দেখেছি !„

মানিক বিস্মিতভাবে তাকিয়ে দেখলে. মূর্ত্তি যেমন স্থির ছিল তেমনই রয়েছে ! সে ভৎ'সনার স্বরে বললে, "আপনারা দুজনেই পাগল হ'লেন নাকি ?"

সুন্দরবাবু ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "পাগল এখনো হইনি মাণিক, কিন্তু পাগল হ'তে আর বেশী বিলম্বও নেই ! পাথরের মূর্ত্তি হাসে, পাথরের মূর্ত্তি নড়ে, —এমন ব্যাপার কেউ কখনো দেখেছে ?

মাণিক এগিয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির গায়ে হাত রেখে বললে, "এই দেখুন, আমি মূর্ত্তির গায়ে হাত দিয়েছি ! একেবারে জড় পাথর, এর মধ্যে কোন প্রাণ নেই !"

হঠাৎ সেই প্রস্তরমূর্ত্তি একখানা জীবন্ত ও বলিষ্ঠ বাহু বাড়িয়ে সবলে মাণিকের হাত চেপে ধরল !

আকস্মিক আতঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে মাণিক প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "সুন্দরবাবু ! অমলবাবু !"

ক্রমশঃ

আমার ম্যাজিক

যাদুকর—পি, সি, সরকার

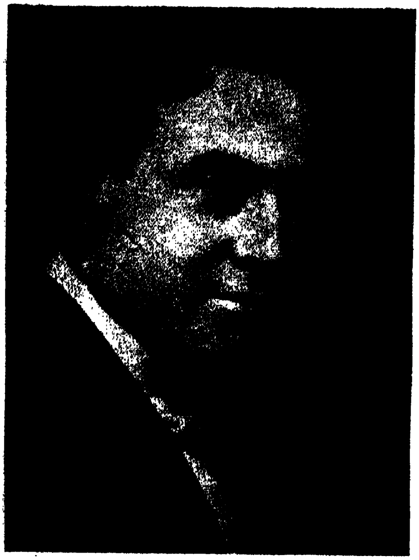
কিছুদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদ স্বদেশী লীগ কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পণ্ডিত জওরলাল নেহেরুর পত্নী স্বর্গগতা কমলা নেহেরুর স্মৃতিতে পরিকল্পিত নূতন হাঁসপাতালের অর্থ-ভাণ্ডারে সাহায্যার্থে আমি দুইদিন যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তখন আমি একটী খেলা দেখাইয়াছিলাম যাহার কথা প্রায়ই লোককে জিজ্ঞাসা করিতে শুনিতাম। খেলাটীর নাম দিয়াছিলাম "জাপানী সিল্ক কেন এত সস্তা?" খেলাটী এলাহাবাদ বাদেও বহুস্থানে অনেক বার দেখাইয়াছি। সর্ব্বত্রই লোকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিত "ঐটী কিরূপে হইল?" বর্ত্তমানে খেলাটীকে আমি বিভিন্ন উপায়ে প্রদর্শন করিতেছি বলিয়া পূর্ব্বকার প্রণালী এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইব। এই খেলাটির সঙ্গে একটী সরস বক্তৃতা দিতে হয়—ঐ বক্তৃতাটীই এই খেলার প্রাণ। ইংরাজীতে এই বাক্যবিন্যাস করাকে 'Patter' বলে। এই Patter সাহায্যে লোককে অন্যমনস্ক রাখিয়া যাদুকরদিগের নিজেদের আপন কাজ সারিতে হয়। আমি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়া থাকি—



যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার চক্ষুবন্ধাবস্থায় পত্রিকা পড়িতেছেন

"মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, আমি গত বৎসর মে মাসে যাদুবিদ্যা প্রদর্শনার্থে জাপান গিয়াছিলাম ইহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু আমার মনে হয় সত্য কথা বলিতে গেলে আমি জাপানে ম্যাজিক দেখাইতেও যাই নাই বা শিখিতেও

যাই নাই। আমি জাপানে গিয়াছিলাম একটী প্রশ্নের সমাধান করার উদ্দেশ্যে—"জাপানী সিল্ক কেন এত সস্তা?" আজকাল প্রাচ্যজগতে নব্যজাপান একটা বিরাট প্রহেলিকার মত হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র ইউরোপ আজ জাপানের নবজাগরণে ভীত। সংগ্রাম জগতেই শুধ্ নহে, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও জাপান আজ সমস্ত পৃথিবীকে হার মানাইয়াছে। অতি-উচ্চ হারের শুল্ক দেওয়া সত্ত্বেও দেখুন জাপানী সিল্ক আজকাল কত সস্তা। বিলাতী জিনিষ যেগুলি এক টাকা দুইটাকা গজদরে বিক্রয় হয়, জাপানী সিল্ক সেইগুলি অতি উচ্চ হারের 'শুল্ক' দেওয়া সত্ত্বেও বাজারে চারি আনা বা ছয় আনা দামে বিক্রয় হইতেছে। ইহা কি ভাবিবার বিষয় নয়?



যাদুকর নেলসন ডাউনস Nelson Downs
(টাকার খেলায় ইনি ওস্তাদ)

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি জাপানের কোবে, ওশাকা, ইওকোহামা টোকিও প্রভৃতি সমস্ত বড় বড় বন্দরগুলি ঘুরিয়া ছোট বড় সকলের সঙ্গে মিশিয়া এতদিন উহাদের গুপ্ত তথ্য আবিষ্কার করিয়াছি। আমি এখন আপনাদিগকে সর্ব্বসমক্ষে জাপানী সিল্কের রুমাল প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দেখাইব।

এই দেখুন একটী সাধারণ এক টুকরা "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ছিন্ন অংশ। রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছি বলিয়া ইহার মূল্য কিছুই নাই—কেমন? এইটীকে আমি এ দিয়াশলাইর আগুনে পুড়াইয়া দিলাম। দেখুন কিরূপে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—এখন এই 'ছাই' এর মূল্য কি? কিছুই নহে। কিন্তু এই ছাইগুলি এই ভাবে আস্তে আস্তে ঘষিলেই চমৎকার সিল্ক প্রস্তুত হয়, এই দেখুন—এই যে সিল্কের রুমাল প্রস্তুত হইল। এই রুমালের দাম এখন কত? কিছুই নহে কারণ পোড়া ছাই হইতে ঐটী প্রস্তুত হইয়াছে। জাপানে সমস্ত ব্যবসায়ীরা এইভাবে পুরাতন সংবাদপত্র দিয়া বা বাজে কাগজ পুড়িয়া তাহার ছাই হইতে রুমাল প্রস্তুত করে। এই রুমাল গুলির মজা এই যে হাতে ঘষিলে ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দেখুন ইহা ক্রমশঃ বেশী হইতেছে, এই একটী হইল, এই আরেকটী, এই আরও একটী

ঐই যে দেখুন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এইবার ভাল করিয়া গুনিয়া দেখি কতগুলি রুমাল প্রস্তুত হইল এক দুই তিন ·····চার ·····পাঁচ ····· ছয় ····· সাত ····· আট ·····নয় দশ এগার ·····বার। একি এক ডজন! আচ্ছা আবার এগুলি হাতে লইয়া ঘষিয়া দেখি — বেশ বাড়িতেছে— ও একি দুই তিন ডজন সিল্কের রুমাল প্রস্তুত হইল! দেখুন কত বিভিন্ন প্রকার রং এবং ডিজাইন। এইগুলি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পছন্দ না করিবে কেন?

আচ্ছা এইবার আমরা জানিতে পারিলাম জাপানে রুমাল প্রস্তুত করিবার বা সিল্ক প্রস্তুত করিবার খরচ কিছুই হয়না। সামান্য কাগজ পুড়াইয়া তাহার ছাই হইতেই গাড়ী গাড়ী ভর্ত্তি সিল্ক প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু এইবার চিন্তা হইল পাঠাইবার খরচ লইয়া। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নানারূপ বাধা আছে, জাহাজে মাল 'বুক' করিবার খরচ অর্থাৎ জাহাজ ভাড়া আছে, উচ্চহারের শুল্ক দিবার আছে—এতগুলি দিয়া মাত্র চার ছয় আনা দামে কেমন করিয়া বিক্রয় হয় এ প্রশ্ন বাস্তবিকই খুবই চিন্তনীয়। তাহলে দেখুন কাগজ পোড়াইয়া রুমাল তৈয়ার করিতে আমরাও জানি কিন্তু পাঠাইবার খরচ কম করিবার উপায় কি? ইহার সমাধানও বিশেষ কষ্টকর নহে। জাপানীরা রুমাল গুলি এই ভাবে ছোট করিয়া গুছাইয়া আস্তে আস্তে উপর দিকে ছুড়িয়া মারে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রম্ করিয়া শব্দ করিয়া কবুতরের আকার ধারণ করে। ঐ দেখুন আমার হাতেরগুলি কবুতর হইয়া উপরে উড়িয়া গেল—ঐ দেখুন উড়ন্ত ঐ দুইটী বাদেও আমার হাতে আরও একটী আছে।"



খুদাবক্স জলন্ত আগুনের উপর হাঁটিতেছেন

দর্শকগণ এই বক্তৃতাটী অতিশয় আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলা হইতে থাকে বলিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের চক্ষুতে দেখে। প্রথমে আমার কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া তাহারা বিশ্বাস করেন যে আমি যেন সত্যি তাহাদের অর্থনৈতিক কোন প্রশ্নেরই

সমাধান করিব কিন্তু যখন বুঝে যে ঐটী একটী খেলা মাত্র তখন এক বিরাট হাস্যধ্বনি উঠে। এইভাবে লোক ঠকানই হইল উচ্চ শ্রেণীর যাদুবিদ্যার মুলমন্ত্র। যে যত বেশী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া ঘুরাইয়া অন্য গল্পের মধ্য দিয়া দর্শকদিগকে বোকা সাজাইতে পারিবেন সে ততবড় যাদুকর। এইজন্য প্রত্যেক খেলার জন্য এক একটি সুন্দর গল্প প্রস্তুত করিতে হয়। যাহারা আমাকে রঙ্গমঞ্চে খেলা দেখাইতে দেখিয়াছেন তাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমার প্রত্যেকটী খেলার সঙ্গে একটী একটী মজাদার গল্প থাকে।



জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর টেন কাটসু (Ten Katsu)

আমার প্রোগ্রামেও খেলার নাম থাকে ঐরূপ যথা 'জাপানী সিল্ক কেন সস্তা?' 'ভূতেরা কি খায়?' 'হেডমাষ্টারকে ফাঁকি' 'শ্বশুর বাড়ীর পার্শ্বেল' ইত্যাদি—।

এইবার উল্লিখিত খেলাটীর কৌশল বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমতঃ হাতের উপরের দিকে কাঁধের নীচে একটী 'ব্যাণ্ড' বাঁধিতে হয়—উহাতে একটী ছোট রবারের দড়ি (cord elastic)এর এক দিক শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে—রবারের দড়িটীর অপর দিকে একটা 'ক্লিপ' (clip) আছে। এখন দড়ীটি টানিয়া হাতের তালু পর্য্যন্ত নিয়া উহাতে ছোট রুমালের একটী বাণ্ডিল ক্লিপের সঙ্গে আটকাইয়া দিলে —আল্গা দিবা মাত্র আস্তিনের ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে কেহই দেখিতে পাইবে না। ইংরাজীতে এই প্রকার দড়ির নাম 'Pull' (elastic or mechanical pull) এইগুলির সাহায্যে রুমাল, ডিম, বল প্রভৃতি অতি সহজে লুকান যায়। বাকী অংশ অত্যন্ত সহজ, যাদুকর একটী ছোট সিল্কের রুমাল দিয়াশলাইর বাক্সে ভরিয়া রাখেন, আগুন দ্বারা কাগজ পোড়াইবার সময় তিনি ঐটী অক্লেশে লইয়া থাকেন এবং বাকী দুই তিন ডজন রুমাল খুব ছোট ছোট বাণ্ডিল করিয়া আস্তিনের ভিতর কোটের পকেটে, বেল্টের নীচে লুকাইয়া রাখিতে হয়। গুণিয়া দেখাইবার সময় ঐগুলি দেখাইতে হয়। দুইটী বা তিনটী কবুতর ওয়াচ কোটের নীচে লুকাইয়া রাখিতে হয়। কবুতরকে একটু আফিং

খাওয়াইয়া রাখিলে উহারা চুপ চাপ বসিয়া থাকে, কোনরূপ নড়াচড়া করে না। হাতের রুমালগুলি অদৃশ্য করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কবুতর বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। রুমাল ও কবুতর যে কোট পেণ্টালুন পরিয়াই দেখাইতে হইবে এমন নহে। লুকাইবার কায়দা প্রদর্শকদের



আমেরিকাতে জনতা সম্মোহনের একটী দৃশ্য

ইচ্ছাধীন করাই ভাল। প্রকৃত গুণ আয়ত্ব থাকিলে শাড়ী পড়িয়াও ম্যাজিক দেখান যাইতে পারে। জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর টেনকাট্‌সু—একজন মহিলা এবং তিনি এই 'রুমাল ও কবুতরের' খেলা দেখাইয়া থাকেন।

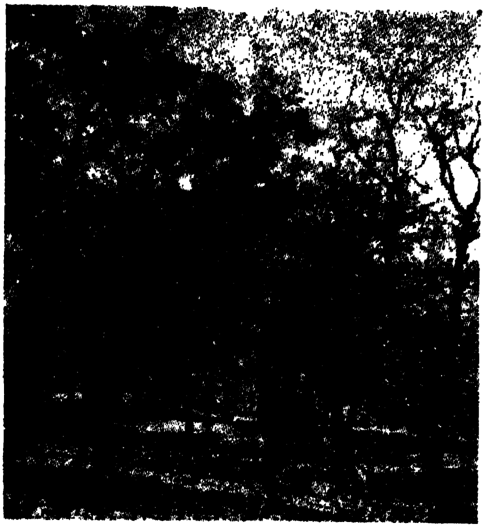
(ক্রমশঃ)

পাহাড়তলি

শ্রীপুষ্প দেবী

মোহন শোভন দৃশ্যে ভরা পাহাড়তলী গ্রাম
মুগ্ধ আজি করল আমার মন !
কোথাও সবুজ কোথাও বা লাল কোথাও ঘনশ্যাম
রঙের খেলা খেল্‌ছে অনুক্ষণ।

কোন্ সে নিপুণ চিত্রকরের দক্ষ তুলিকাতে
ছবির মত উঠলি রে তুই ফুটে' !
মুগ্ধ হৃদয় অতুল তোর রূপের গরিমাতে
চিত্রকরের চরণ তলে লুটে।



পাহাড়গুলির ওপর থেকে ছোট্ট সহরখানি
দেখ্‌তে কি যে নয়ন অভিরাম :
কোনোখানে মাঠের পরে মাঠ রয়েছে পড়ে',
কোথাও ছোট ছায়ায় ঢাকা গ্রাম।

কোথাও ছোট পাহাড় ঘিরে ফুলের লতায় ভরা
নানা রঙের ফুলের মেলা যত,
কোথাও শ্যামল মাঠের কোলে সুরকি ফেলা পথ
সবুজ শাড়ীর রাঙা পাড়ের মত।

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছগুলি
ফুলে ফুলে পথ ফেলেছে ছেয়ে,
সাথে লয়ে সাদা কালো নানা গরুর দল
রাখাল ছেলে চলেছে পথ বেয়ে।

সাম্‌নে অসীম নীল সমুদ্র ঢেউয়ের তালে তালে
মিশে গেছে নীল আকাশের তলে,
রাতের বেলা সারা সহর আলোর মালা পরে'
অন্ধকারে তারার মত জ্বলে !

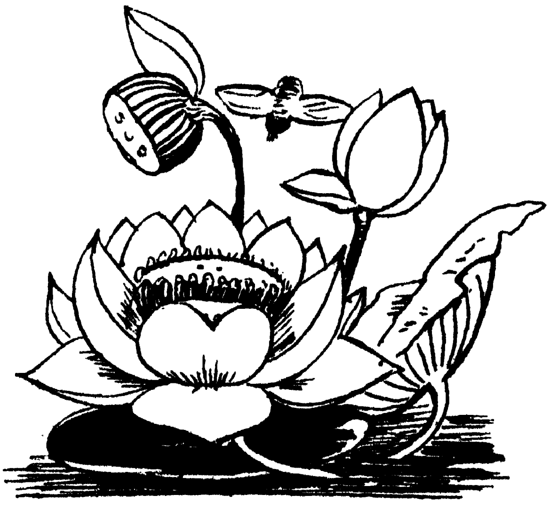
পাহাড়তলি

শ্রীপুষ্প দেবী

কোনখানে সারি সারি পাহাড় আছে বসে'
ধ্যানে অটল যোগী-ঋষির মত,
কোথাও আবার ঝর্ণাধারা চপল শিশুর প্রায়
আপন মনে ছুট্‌ছে অবিরত।

যেদিকে চাই সে দিকেতেই মনটি হরণ করে
মুগ্ধ হয়ে চেয়েই শুধু থাকি,
যতই দেখি সাধ মেটেনা রই যে কেবল বসে'
দূরের পানে মেলে' অবাক আঁখি।

নিত্য নূতন রূপে তুমি চিত্ত বিনোদ করে'
দিচ্ছ দেখা নিত্য সকাল সাঁঝে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায় হৃদয় আমার ভরা
তোমার ছবি আঁকা মনের মাঝে।





সম্বর হ্রদে

থ

-

(আষাঢ় মাসের প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত ভ্রমণ-কাহিনী রচনা)

নূতন বছর সুরু হয়েছে। পরীক্ষা শেষ। ক্লাসে নূতন নিয়ম—খেলা ও গল্প। এবার বছরটা সুরু হল ভালই। মনে মনে কত কিছুর কল্পনা করি। 'রংমশালের' দূরবাসী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করি, ঘুরে আসি বর্ম্মা, পঞ্জাব, মাদ্রাজ আবার সেই পুরাণো ঘরের কোণে। গ্রীষ্মকাল তখন রাজপুতানার মরুভূমির ডাক হাওয়ার পিঠে পশ্চিমের সহরে সহরে যাত্রা করেছে। তপ্ত হাওয়ায় এল মরুভূমির আমন্ত্রণ।

দুদিন পরেই বাবা বল্‌লেন—রাজপুতানা যাব, সব ঠিক! আমরা ত অবাক! ক্লাস সবেমাত্র সুরু হয়েছে, গ্রীষ্মের ছুটির ১ মাস দেরী। তার আগেই আমরা যাব। আনন্দে নেচে উঠলাম।

বন্ধুরা বল্লে—রাজপুতানা যাবি এই গরমে! কি আর গরম, রাজপুতানা কেন, সাহারা যেতেও ভয় করি না। বৈশাখের প্রথমভাগে আমরা দিল্লী থেকে রওনা হলাম সম্বর হ্রদে। ভয় ভাবনা পড়ে রইল, এখন শুধু আনন্দ আর উৎসাহ। মরুভূমির বুকে হ্রদ কল্পনা করতেও বিস্ময় লাগে।

দিল্লী থেকে B.B.C.I. Mail এক রাত্রেই পৌঁছে দিল মরুভূমির সীমায়। অন্ধকার রাত্রে কত ষ্টেশন পার হয়ে এলাম—ভোরে দেখি এক নূতন দেশ। জয়পুর রাজ্য পিছনে রেখে আমরা চলেছি মাড়ওয়াড়ের দিকে। যেখানে যোধপুর রাজ্য সুরু হয়েছে সেখানেই জয়-

পুরের এক প্রান্তে প্রসিদ্ধ সম্বর হ্রদ, দিল্লী থেকে ২০০ মাইল। ভোরে জয়পুর পার হতেই দেখা দিল আজমীর-মাড়ওয়ারের পাহাড়। ক্রমে স্পষ্ট দেখতে পেলাম আরাবল্লী পর্ব্বতমালা।' চারিদিকে তার শাখাপ্রশাখা সারা রাজপুতানা ঘিরে। পাহাড়গুলি সব রুক্ষ তৃণলতাহীন। গাছ-পালা বিশেষ নেই, না আছে ঘাস—মাঠ করছে ধূ ধূ ধূ। দূরে দুএকটা টিলা মাঠের মাঝে মাঝে; আর সব বালি, কোথাও পাথর। মাঠের সীমায় খেজুর গাছগুলি দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

রাজপুতানার শুক্‌নো মাঠ দেখলাম, দেখলাম তার কঠিন পাহাড়। এবার দলে দলে বেরোচ্ছে ময়ূর, রোদের আলো সাত রঙে ছড়িয়ে পড়ছে পালকে। মাঠের ধারে খরগোসের পাল, হরিণের দল চরছে, গাড়ীর শব্দে কখনও মুখ তুলে তাকায়, কখনও ছুটে পালায়। রাজপুতানার প্রান্তরে শ্যামল শোভা না থাক্‌লেও, অসংখ্য পশুপাখীতে তার সৌন্দর্য্য। এই সুন্দর পশুপাখীগুলি কেন সুন্দর বন পাহাড় ছেড়ে এল এই মরুভূমির দেশে।

গাড়ীর ভিতরে নানা রঙের মেলা, লাল নীল পাগড়ী, মেয়েদের নানা বর্ণের ঘাগরী। নানা রকমের ভাষা, নানাদেশের লোক, বিচিত্র তাদের পোষাক। রাজপুত চলেছে ধুতির সঙ্গে তলোয়ার বেঁধে, যেন মস্ত বীর, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী—'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরহাত বীচি।' তার আড়ালে রোগা পট্‌কা তালপাতার সেপাই যিনি, তিনিই রাজপুত। জিজ্ঞেস করলাম---'তলোয়ার খেল্‌তে জান।' অবাক হয়ে শুনি---'না এটা এমনি রাখতে হয়।' আর গাড়ীতে চলেছে মাড়ওয়ারীর দল, সারা বাংলা মুলুক ঘুরে এসেছে তারা। কথায় কথায় একজন বল্‌লে---'সোনার বাংলা। এমোন দেশ কোথায় পাবে! এমোন চিতোল মাছ! এমোন পানি কোথায়! কোথায় চলেছ বাবু রাজপুতানার মরুভূমিতে।' মনে হল কত দূরে সুজলা বাংলা দেশ, আমরা কোথায়। মরুভূমির উষ্ণশ্বাস বইছে, আগুনের হল্‌কা ছুটছে। কোথায় বাংলা---কোথায় রাজপুতানা! আমরা ভোর ৯টায় সম্বরে এলাম।

ষ্টেশনের ধারে স্তূপীকৃত লবণের পাহাড় গাড়ী থেকে দেখা যাচ্ছে। রোদ স্তূপের উপর ঠিক্‌রে পড়্‌ছে আলো হয়ে, যেন হীরের খনি। সহর দূরে রেখে আমরা লবণ বিভাগের এলাকায় প্রবেশ করলাম। পথের দুধারে নিমগাছের ঘন ছায়া, তার ফাঁকে ফাঁকে রোদ রাস্তার বালির উপর পড়ে চিক্‌মিক্‌ করছে। সারি সারি উট চলেছে, কখন দেখা যায় বিচিত্র চূড়া দেওয়া রথের মত গরুর গাড়ী আর রয়েছে এক্কা। পথের পাশে গাছের আড়ালে ময়ূর পেখম ধরেছে। প্রথম দেখায় সহরটী বেশ সুন্দরই লাগছে!

সম্বর হ্রদে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

সম্বর সহর বৃটিশ, জয়পুর ও যোধপুর এই তিনটি রাজ্যের অধীন। লবণবিভাগ বৃটিশের হাতে। সবচেয়ে বেশী নুন যায় এখান থেকে। এবং সেজন্যই সহরটার এত খ্যাতি। সহরটাও নাকি খুব পুরোণো, গুপ্তযুগের হিন্দু সভ্যতার অনেক চিহ্ন হ্রদের তলায় পাওয়া গিয়েছে। সম্বর ছিল চৌহানদের প্রথম রাজধানী। কিন্তু বর্ত্তমানে সহরটা বড় নোংরা ও ঘিঞ্জি। প্রায় ১০ হাজার লোকের বাস এখানে।

আমরা লবণের হ্রদ দেখার জন্য উৎসুক ছিলাম।

কিন্তু কয়েকদিন কেটে গেল হ্রদ দেখার সুবিধা হয় না। দিনের বেলা আঁধি বা ধূলার ঝড় বইছে সোঁ সোঁ সোঁ, রাত্রে সব নিস্তব্ধ। ভোর না হতেই সূর্য্যের প্রখর তেজ, দুপুরে বালির প্রচণ্ড তাপ, আর বালির আগুন ঠাণ্ডা হতে না হতেই রাত্রি। কোথায় যাব রাত্রে সাপের রাজত্বে। মন বড় খারাপ।

সৃষ্টি ছাড়া গরমের পর একদিন সন্ধ্যার আকাশে একটুকরো মেঘ দেখা দিল। বাতাস থেমে গেল, চারিদিকে একটা থমথমে ভাব ময়ূরগুলি পেখম ধরে নাচতে সুরু করেছে---বর্ষার আগমনী বেজে উঠল দেয়ার ডাকে। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি এল বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত। গাছপালা, মাঠ, পাহাড় সমস্ত বালির রাজ্যে অনন্ত ক্ষুধা—দু'চার ফোটায় কি হয়, শুষে নিল এক মুহূর্ত্তে! বৃষ্টির জল কোথায় মিলাল। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা বোধ করলাম। ভোরে উঠে দেখি আবহাওয়া অন্য রকম। গাছ পালায় নবীনতা, মাঠে ঘাটে সজীবতা, নূতন প্রাণ এসেছে মরু রাজ্যে। পাখীর গান, ময়ূরের নাচ, ভেকের ডাক—সর্ব্বত্র এক আনন্দ উৎসব। বৃষ্টির পর মনে হলো এ একেবারে নূতন দেশ।

আর সময় নষ্ট করা যায় না।

আমরা পরদিনই সরকারী লবণ বিভাগের ট্রলিতে চড়ে চললাম হ্রদের উদ্দেশ্যে। সহর থেকে তিন মাইল দূরে যেখানে হ্রদ সুরু হয়েছে, সেখানে 'ঝাপোগ' নামে একটা ঘাঁটি। ১২ মাইল লম্বা এই হ্রদ 'গুচাতে' তার শেষ। হ্রদের ধার দিয়ে ট্রলির লাইন গিয়েছে। হ্রদটা প্রায় ৬০ মাইল জুড়ে। এই সুযোগে এ অঞ্চলের বিখ্যাত দিঘী 'রতনতলাও' দেখে আসব ঠিক রইল।

অন্ধকার তখনও দূর হয়নি। আবছা আলোতে ঢালু পথে তীরবেগে চলেছে আমাদের ট্রলী দুখানা, বাতাসে জেগে উঠছে সোঁ সোঁ শব্দ। সব যেন অপূর্ব্ব রহস্যময়। আশে

পাশে জলের ভিতর থেকে চীৎকার করে উঠছে চখাচখী, বক ডানা মেলে পালিয়ে গেল। দিকসীমানায় আলোর রেখা ফুটে উঠছে। ঐ ঐ সম্বর হ্রদ! আকাশ নুয়ে হ্রদের জলে নেমেছে, আর কিছু দেখা যায় না, শুধু আলো। অরুণ কিরণ ছড়িয়ে পড়ল হ্রদের জলে। জলের উপর ঢেউগুলি দুলে দুলে আলোর রেখা ছড়িয়ে দিচ্ছিল বহুদূর। অন্ধকারের বক্ষ ভেদ করে আমরা সেই আলোর নৃত্য দেখতে লাগলাম। জল ক্রমে শুভ্র স্বচ্ছ হয়ে উঠছে তার উপর সোনালী রোদের আভা, অপূর্ব্ব সেই দৃশ্য। ধীরে ধীরে সূর্য্য হ্রদের কোল ছেড়ে দিল, হ্রদের বিস্তার বেড়ে গেল—যেন কুলহীন একটা বিশাল সমুদ্র। বাতাসে ঢেউগুলি তীরে তীরে ঠেকছে, দেখতে ঠিক রূপোর মত ঝক্‌মক্। অসংখ্য জলচর পাখীর কোলাহলে দশদিক মুখরিত। অন্য কোন কিছু খেয়াল ছিলনা। ট্রলী থামতেই চম্‌কে চেয়ে দেখি "ঝাপোগ" এসে গেছি।

এবার পায়ে চলা সুরু। 'রতনতালাও' শুনেছি শিকারীদের নন্দন-কানন। অসংখ্য পাখী, অফুরন্ত মাছ! দূরে ঘন ছায়া বটের তলায় "রতনতলাও" আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে চল্‌ল। কিন্তু পথের আর যেন শেষ নেই। আমাদের সঙ্গের লোকেরা বল্লে—"ঐযে বটগাছ, তারই তলে দিঘী।" আমি এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখি সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোথায় দিঘী! কোথায় "রতনতলাও" স্বচ্ছ শীতল জল! মুখে কারও কোন কথা নেই। কে সব জল শুষে নিয়েছে। আমাদের সামনে খটখটে ডাঙ্গা, পাঁক নেই, কাদা নেই। আর ঠাট্টা ভাল লাগেনা, বল কোথায় দিঘী, জল কোথায় লুকালো। তারা মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। পরে খানিক দূর নিয়ে গেল একটা বড় কুয়োতে। আমাদের পথপ্রদর্শক বল্লে,—"এখনও বর্ষা হয়নি, দিঘী আছে জল নেই। দিঘীর জল এখন এই কুণ্ডে রয়েছে, বৃষ্টিতে এ সব জায়গা ভেসে যাবে, জল করবে থৈ থৈ। মাছগুলি সব কুয়োতে, পাখীরা এখনও শীতের দেশ থেকে আসেনি। আসবেন একবার শীতের দিনে কি সুন্দর দৃশ্য দেখতে!" এত আড়ম্বর এত আয়োজন সব বৃথা। আমরা ক্লান্ত হয়ে বটগাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় মিষ্টি হাওয়ায় ঘাসের বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। এত সুখ কখনও পাইনি। মরুভূমিতে শ্যামল শোভা এমনি দূর্ল্লভ ও মনোরম।

কি ভাবে যে ফিরে এলাম ভাবতে পারি না। কারও মুখে কথা নেই। মরুভূমির দেশে এই দিঘীই অমূল্য সম্পদ। শেষে আমরা হ্রদের ধারে এসে মিললাম। এবার ফেরার পালা। হ্রদ এখন আরও বিশাল মনে হল। জলস্থল আকাশ সব মিলে একাকার। ধূলার মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন! হ্রদের জল বাষ্প হয়ে উঠছে ধোঁয়ার মত বাতাসে কাঁপছে ধূসর

ছায়া। সেই অপরূপ দৃশ্য আমরা বহুক্ষণ দেখ্‌লাম। যেতে যেতে দেখলাম হ্রদের ধারে লবণ তুলে স্তূপ করা হচ্ছে। লবণের স্বচ্ছ দানাগুলি আলোতে রূপোর মত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। এখন বর্ষার আগেই সমস্ত লবণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। গরমের সময় কাজ চলে, আর বর্ষায় হ্রদ পড়ে থাকে তখন পাখীদের তীর্থ হয়ে দাঁড়ায়। মাঠঘাট সব জলময় হয়ে হ্রদের পরিধি শতগুণে বেড়ে যায়। কত দেশ থেকে আসবে "সারস," "রাজহাঁস" আরও কত সুন্দর জলচর পাখী, শীত কাটিয়ে ফিরে যাবে নানা দেশে। আমরা কল্পনার দৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগলাম হ্রদের জল হাঁসে হাঁসে সাদা হয়ে রয়েছে, শুনতে পেলাম তাদের কল কোলাহল। সম্বর হ্রদ সেই শীতের অপেক্ষা করছে। আমরা গ্রীষ্মের শোভা দেখেই ফিরে এলাম।



বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ !

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

আমাদের বকু, সশরীরে, ঈশ্বর লাভের পর, ভারী এক সমস্যায় পড়ে' গেল। আর কিছু না—নিজের নামকরণের সমস্যায় !

এ-জন্মে ঈশ্বরলাভ হলে এইখানেই ফ্যাসাদ্! অকস্মাৎ নাম থেকে নামান্তরে যাবার হাঙ্গামা। এজন্মে না পেলে এসব মুস্কিল নেই, নাম বদলাতে হয় না, যথাসময়ে কলেবর বদ্‌লে ফেল্লেই চলে যায়। কিন্তু দেহরক্ষা না করে' ঈশ্বর-লাভ ভারী গোলমেলে ব্যাপার।

বকুর বরাতে এই গোলোযোগ ছিল—সশরীরে স্বর্গীয় হবার সঙ্কট। মরে যাবার পর যারা স্বর্গীয় হয়, বা, স্বভাবতঃই, ঈশ্বর পায়—তারা বিনা সাধ্য-সাধনাতেই পেয়ে যায়, এইজন্য তা'দের নামের আগে একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ ক'রে' দিলেই চলে। যেমন ৺চিত্তরঞ্জন, ৺আশুমুখুজ্যে—ইত্যাদি ! লেখবার সময়, নামের আগে, অনুস্বর ও বিসর্গের পরবর্ত্তী চিহ্নটি দেয়া দস্তুর—ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তিমে, বিসর্গের শেষে স্বর্গের চূড়ান্ত ব্যঞ্জনা যেটি সংক্ষেপে। তবে উচ্চারণের সময়ে তোমার যা-খুসি পড়তে পারো : স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন, ঈশ্বর চিত্তরঞ্জন কিম্বা চন্দ্রবিন্দু চিত্তরঞ্জন ! চিত্তরঞ্জন আপত্তি করতে আসবেন না।

বকুর বেলা আমাদের সে সুবিধে নেই। চন্দ্রবিন্দুযোগে বকুর নিজেরও আপত্তি হতে পারে, তার মা-বাবার তো বটেই এবং পাড়াপড়শীরাই কি ছেড়ে কথা কইবে ? শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নে না-ডেকে হঠাৎ নামডাকে ঈশ্বরত্ব জাহির—এতখানি ফাঁক্‌তাল বরদাস্ত করতে তারা প্রস্তুত হবে না। সবাই কি হাসিমুখে, যুগপৎ, নিজের ক্ষতি ও পরের লাভ স্বীকার করতে পারে ? উঁহু।

ঈশ্বর ? সে তো মুঠোর মধ্যে !—এরকম সন্দেহ, ঘুণাক্ষরেও যার মনে জেগেছে, সে-ই পিতৃদত্ত নাম পাল্‌টে ফেলে নতুন নামে উত্তীর্ণ হয়। ব্যাঙাচি বড় হলেই তার ল্যাজ খসে যায়, ওরফে, ব্যাঙাচির ল্যাজ্ খসে গেলেই সে বড় হয়। অতএব পৈতৃক নাম খসে গেলেই বুঝ্‌তে হবে লোকটার হস্তগত যদি কিছু হয়ে থাকে, সেই কিছু—আর কিছুনা, স্বয়ং ঈশ্বর।

আমাদের বকুও ঈশ্বরকে বাগিয়ে ফেলেছে। তারপরেই এই নামকরণের নিদারুণ সমস্যা।

আনন্দ-যোগ করে' একটা উপায় অবিশ্যি ছিল, কিন্তু কেউ কি তার কিছু বাকী রেখেছে আর ? বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে' আড়ম্বরানন্দ, বিড়ম্বনানন্দ পর্য্যন্ত, যাকিছু ভালো, মন্দ, এবং ভালোমন্দের অতীত আনন্দদায়ক নাম ছিল সবই বকুর বেদখলে। এই কারণে, বকু ভারী নিরানন্দ কদিন থেকে। দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর হাতানো যত সোজা, ঐশ্বরিক নাম হাত্‌ড়ানো তত সহজ নয়।

অনেক নামাবলী টানা-ছেঁড়ার পর, একটা আইডিয়া ধাক্কা মারে আমার মাথায়: "আচ্ছা, ব্যাকরণ মতে একটা রাখ্‌লে হয় না ?"

"ব্যাকরণের নাম—কিরকম শুনি আবার ?" বকু একটু আশ্চর্য্যই হয় ! কিন্তু নিমজ্জমান লোকের কুটোটিকেও বাদ দিলে চলেনা এবং কুটোটি এগিয়ে দিয়ে পরের উপকার করতে, ঈশ্বর যে পায়নি সেও, কদাচই পরান্মুখ হয়।

আমি অগ্রসর হই উৎসাহে: "এই যেমন----এই ধরনা কেন, বকু ছিল ঈশ্বর—"

সে বাধা দ্যায়, "বারে ! আমি আবার ঈশ্বর ছিলাম কবে ?"

"ছিলে কি না ছিলে তুমিই জানো ! আমার জানা থাকার কথা না ! ব্যাকরণের ব্যবস্থাটাই বল্‌ছি আমি কেবল। বেশ, তাহলে ধরো এই ভাবে—বকু হোলো ঈশ্বর ? এ-তো হয় ?"

"বাঃ ! আমি হবো কেন ? আমি তো কেবল ঈশ্বর পেলাম !" বকু বলে।

"বেশ, তাই সই। তবে এইরকম হবে—বকু পেল ঈশ্বর ইতি বক্কেশ্বর ! কেমন হোলো ?"

ততটা মনঃপূত হয়না বকুর; কিন্তু অনেক টানা-হ্যাঁচড়ার পর, কষ্টেসৃষ্টে এই একটা বেরিয়েছে, এটাও খোয়ালে, অগত্যা, বিনামা হয়েই থাকতে হবে বকুকে, কিম্বা নেহাৎ কোনো বদ্‌নামই না সহ্য করতে হয় শেষটা, একথা স্পষ্টাস্পষ্টই আমি জানিয়ে দিই ওকে।

"ব্যাকরণের সূত্রটা কি শোনা যাক্ ! শুনি ?" সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে।

"একেবারে যাকে বলে দীর্ঘসূত্র।" আমি ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাই। "সন্ধিও বল্‌তে পারো। সমাস হলে হবে দ্বন্দ্ব সমাস—বকুশ্চ ঈশ্বরশ্চ—"

আর বলতে হয় না; নামের মহিমায় বকু বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিগলিত বকু প্রগল্‌ভ হয়ে উঠে: "বাঃ বেশ নাম ! নামের মত নাম ! বক্কেশ্বর ! বকু ছিল—নাঃ, ছিল কি ? ছিল কেন ? এতো অতীতের কথা নয়—বকু হোলো—হ্যাঁ—হওয়া আর পাওয়া একই ! হলেই পায়, পেলেই হয়—বকু হলো ঈশ্বর ! আবার ব্যাকরণসিদ্ধও বটে ! ক'টা সিদ্ধ পুরুষের আছে এমন নাম ? বকুশ্চ ঈশ্বরশ্চ—যেন দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা ! খাসা !"

সেই থেকে, দ্বন্দ্ব-সমাসে ঈশ্বরের সঙ্গে ওর সন্ধি স্থাপিত হয়েছে এবং মার্ব্বেলের ট্যাবলেট্ পড়েছে বাড়ীর সদরে: স্বামী বক্কেশ্বর পরমহংস।

ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে জড়িত হবার ঢের--ঢের আগে থেকেই বেচারা বকু আমাদের ঈশ্বরে জর্জ্জরিত। ছোট বেলা থেকেই ওর ঈশ্বর উপার্জ্জনের দুরভিসন্ধি। সদ্যপ্রকাশিত ওর নিজের কথামৃতে রয়েছে: বরাবরই আমার ঝোঁক্ ছিল এই পরম বর্ব্বরের দিকে। বাড়ীই বলো আর দাড়িই বলো, জুড়ি গাড়ীই বলো আর জারিজুরিই বলো—এসবই পেতে হবে বর্ব্বর হয়ে। বর্ব্বরতা ব্যতিরেকে এসব লভ্য হবার নয়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। বল আর বর্ব্বরতা এক; দ্যাখো ভূতপূর্ব্ব ইংরেজ আর বর্ত্তমান জাপানকে, দ্যাখো অভূতপূর্ব্ব হিট্‌লার, মুষলিনী ও চেঙ্গীজ খাঁকে। এই সব বর্ব্বর শক্তির মূলে আছেন সেই

সর্ব্বশক্তিমান মহাবর্ব্বর—হিট্লারের হিট্-এর যোগান্ এই কেন্দ্র থেকেই, মুষলিনীর মুষল ইনিই। প্রচুর অর্থ বা প্রচুর অনর্থ—যাই করতে চাওনা কেন, খোদ্ ভগবানের কাছ থেকেই তার ফন্দী ফিকির জেনে নিতে হবে। এই রহস্যই হচ্ছে উত্তম রহস্য—উপনিষদের রহস্যমুত্তমম্। তাঁর কাছ থেকে জান্তে হবে সুকৌশলে, কায়দা করে', সহজে জানান্ দেবার পাত্র নন্ তিনি—যোগবলেই তাঁকে টের পাবে। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। এবং তাঁর ফলেই হবে বলযোগ। অচিরাৎ এবং নির্ঘাৎ।"

এই কথামৃত পড়ার পর থেকেই আমার ধারণা বলবৎ হয়েছে যে, বৈধ বা অবৈধ, যেকোনো উপায়ে হোক, ঈশ্বরকে আত্মসাৎ না ক'রে ও ছাড়বেনা। আর তার পরেই ওর কেল্লা ফতে—বাড়ীই কি আর দাড়িই কি, জুড়িই কি আর ভুঁড়িই কি—কে পায় ওকে!

হাঁ, যা বল্‌ছিলুম—ছোট বেলা থেকেই ওর ভাগবৎ দৌর্ব্বল্যের কথা। সেই কালেই একদিন ওর বাড়ী গিয়ে যে-দুর্ঘটনা দেখেছিলাম তা'তেই আমার আন্দাজ হয়ে গেছল যে ঈশ্বর না পেয়ে ওর পরিত্রাণ নেই।

বকু তখন ইস্কুলে ছাত্র, সেকেণ্ড ক্লাসে এবং হাফ্‌প্যাণ্টে। যদি পড়ার কথাই ধরো, বইয়ের চেয়ে প্যাণ্টেই ছিল ওর বেশি মনোযোগ—প্যাণ্ট্ই ছিল ওর একমাত্র পাঠ্য। এবং অদ্বিতীয়। প্রায় সময়েই, বইয়ের পড়া নয়, প্যাণ্ট্-পরা নিয়েই ওকে বিব্রত দেখেছি।

এমনি একদিন গেছি ওদের বাড়ী, ক্লাস-পরীক্ষার ফলাফলের বৃত্তান্ত নিয়ে, গিয়ে দেখি বকু এবং বকুর বাবা মুখোমুখি বসে' আর বকু দিচ্ছে বাবাকে ধর্ম্মোপদেশ। কথাগুলো ঠিক ধর্‌তে পারলাম না, তবে এটুকু বুঝ্‌লাম যে বড় বড় বাণী গড়্ গড়্ করে বকে যাচ্ছে বকু—বোধ হয় মুখস্ত কোনো বই থেকে—আর হাঁ করে' শুন্‌ছেন ওর বাবা।

বকু সহসা থেমে যায়: "কিরে—খবর কি?"

"পরীক্ষার রেজাণ্ট্ বেরিয়েছে—"আমি ইতস্ততঃ করি, "বল্‌ব—বল্‌বো কি?"

"বল্‌না কি হয়েছে!"

"ফেল্ গেছিস্ তুই! বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, পালি—সব সাব্‌জেক্টেই।" বলেই ফেলি আমি।

সাম্‌লাতে একটু সময় লাগে বকুর, ওর বাবার হাঁ—টা কেবল আরো একটু বড়ো হয়। বকু বলে—"যাক্, সংস্কৃতে যে পাশ করেছি এই রক্ষে! ওতেও তো ফেল্ যেতে পারতুম্! তবু ভালো।"

"সংস্কৃত তো ছিলনা তোর, তুই পালি নিয়েছিলি যে!"

আমার বলার সঙ্গে সঙ্গে বকু কেমন যেন হয়ে গেল হঠাৎ! "ও—তাই নাকি!" এই বাঙ্‌নিষ্পত্তি করেই তার চোখ দুটো ঠেকে উঠ্‌ল কপালে, নাক গেল বেঁকে, মুখ গেল সাদা ফ্যাকাসে মেরে'।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে ওকে ধর্‌তে গেলাম। ওর বাবা আমাকে ইঙ্গিতে নিরস্ত কর্‌লেন—তারপর আস্তে আস্তে ওর চোখ বুজে এল, ঘাড় হোলো সোজা, সারা দেহ কাঠ হয়ে, অনেকটা, ধ্যানী বুদ্ধের মতো হয়ে গেল বকু।

বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

আমি যেন সার্কাস্ দেখ্‌ছি তখন, কিন্তু ঠিক উপভোগ করতে পার্‌ছিনা, এমন সময়ে ওর বাবা বল্লেন—"ভয় পেয়োনা, ভয়ের কিছু নেই। ওর সমাধি হয়েছে কেবল!"

"সমাধি? সমাধি কি? মরে' গেলেই তো সমাধি হয়!" আমি এবার সত্যিই ভয় পাই, "যাকে বলে কবর দেয়া। তাহলে বকু কি আর বাঁচ্‌বে না?" আমার কণ্ঠস্বর কাঁদো-কাঁদো।

"মর্‌বে কেন! বেঁচে আছে, জলজ্যান্তই বেঁচে আছে!"

"ও, বুঝেছি!" আমি মাথা নাড়ি—"জীবন্ত সমাধি! এরকম হয় বটে! অনেক সময়ে সমুদ্রে জাহাজ ডুবে গেলে এরকম হয়ে যায় হঠাৎ!"

বকুর বাবা ঘাড় নাড়েন।—"উঁহু, সে-সমাধিও নয়। তাতে তো লোক মারা যায়, প্রায় সব লোকই মারা যায়। জলে ডুবেই মারা যায়। কিন্তু এ সমাধিতে মর্‌বার কিছু নেই, খাবি খায় না পর্য্যন্ত!"

তারপর একটু থেমে উনি অনুযোগ করেন:—"এ রকম ওর হয় মাঝে মাঝে। প্রায়ই হয়।"

"তবে বুঝি কোনো শক্ত ব্যায়রাম?" সভয়ে জিগ্যেস্ করি।

"ব্যায়রাম! হ্যাঁ, ব্যায়রামই বটে!" অমায়িক মৃদু হাস্য ওর বাবার। "কেবল ঈশ্বরজানিত মহাপুরুষদেরই হয় এই ব্যায়রাম!"

"আমি এর ওষুধ জানি।" বলি ওর বাবাকে। "আমার পিস্তুত ভায়েরও এই রকম হোতো। ঠিক হুবহু। তারপর পাঁচু ঠাকুরের মাদুলি পরে ভালো হয়ে গেল। ওকে যদি আপনি মাদুলী আনিয়ে দ্যান্ ও-ও সেরে যাবে।"

"পাগল! এ-পেচোয় পাওয়া নয়,—যে সারবে। এ হচ্ছে ভগবানের পাওয়া—এ সারে না।" তাঁর কণ্ঠস্বর আশাপ্রদ কি হতাশা-ব্যঞ্জক ঠিক ধর্‌তে পারি না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি যোগ করেন: "আর ভগবানের হাতে কি কারু নিস্তার আছে?"

এই অভিযোগের আমি আর কী জবাব দেব তবু ওঁকে আশ্বাস দিতে চেষ্টা করি: "যদি বলেন, এখনকার মতো বকুকে আমি ভালো করে দিতে পারি?"

তিনি শুধু সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকান, কিছু বলেন না।

"আপনাদের বাড়ী কেউ নস্যি নেয়? একটিপ্ ওর নাকে দিলেই—এক্ষুণিই—'

"খোকা, তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ! সমাধির ব্যাপার বোঝা তোমার সাধ্য না! এযে পরমহংস দেবের হোতো! সমাধি সারাণো নস্যির কর্ম্ম নয়—তা পরিমলই দাও কি কড়াই দাও!"

"নস্যির কর্ম্ম নয়,—তাহলে তো—তাহলে তো ভারি মুস্কিল!" বেচারার দৈহিক বিপর্য্যয় দেখে দুঃখ হয় আমার। অজ্ঞান মানুষকে জ্ঞানস্থ করার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার বশেই যারা ডুবন্ত অবস্থায় জল খেয়ে, বা আত্মহত্যার আকাঙ্খায় আত্মহারা হয়ে' আফিং গিলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তাদের অভিরুচির তোয়াক্কা বা অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই তাদের ঠ্যাং ধরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আমরা ঘুরিয়ে থাকি,

দুমদাম্ দুদ্দাড় তাদের পিঠে কিল্‌চড়্ সাঁটিয়ে যাই—তাদের দেহে লাগবে বা মনে ব্যথা পাবে বিন্দুমাত্রও একথা ভাবিনা, তাদের আবার সজ্ঞানতায় ফিরিয়ে আনাতেই তখন আমাদের আনন্দ !

"—তাহলে তো সত্যিই মুস্কিল !" একটু ইতস্ততঃ করে' বলেই ফেলি কথাটা : "অবশ্যি আরো একটা উপায় আছে সমাধি সারাবার। যদি বলেন—যদি বলেন আপ্‌নি—তবে য্যাক চড়ে—"

এই পর্য্যন্ত যেই না এগিয়েছি, ওর বাবা অম্‌নি, হাতের কাছে ছিল এক ভাঙা ছাতা, তাই নিয়ে এমন এক তাড়া কর্‌লেন আমায়, যে তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সটান্ ছাতে উঠে পাশের বাড়ীতে টপ্‌কে পড়ি'—বেচারা বকুকে সমাধির গর্ত্তে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়।

পরের দিন ইস্কুলে এসে বকুর কি না বকুনি আমায় !

"আমার সমাধির তুই কী জানিস্ হতভাগা ? বোকা গাধা কোথাকার ! জানিস্ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যের হোতো সমাধি ? শ্রীবকুরও তাই হয় ! তুই আর কি জান্‌বি মুখ্যু ? চড়্ দিয়ে উনি সমাধি সারাচ্ছেন ! আহাম্মোক ! সমাধি হলে কানের কাছে রাম নাম কৃষ্ণ নাম করতে হয় তাহলেই জ্ঞান ফিরে আসে সবাই জানে এ কথা, আর উনি কিনা—"

বকুর আফ্‌সোস্ আর ফোঁসফোঁস সমান তালে চলে। বাধা দিয়ে বল্‌তে যাই—"রাম নামের মহিমা আমারও জানা আছে ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কিন্তু মারের চোটেও ভূত পালায় নাকি ? তোকে পেঁচো ভূতে পেয়েছিল আমি তো তাই—"

সেই মুহূর্ত্তে মাষ্টার মশাই আসেন ক্লাসে---বিতণ্ডাটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই, বকুর কি বরাত জানি না, সেই পুরাতন দুর্লক্ষণের পুনরাবৃত্তি। মাষ্টার মশাই পড়া নিয়ে কী প্রশ্ন করেছেন, বকু পারেনি, অম্‌নি হুকুম হয়ে গেছে বেঞ্চির উপরে নীলডাউনের। আর নীল্‌ডাউন্ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বকুর সমাধি !

ব্যাপার দেখে ভড়কে গিয়ে মাষ্টার ম[illegible] ছুটে বেরিয়েছেন, ক্লাসশুদ্ধ সবাই গেছে চক্ চকিয়ে, কী করতে হবে ভেবে পাচ্ছেনা[illegible]

আমি ওর কানের কাছাকাছি গিয়ে, রাম, [illegible]য়ে লাগাবো ঠিক করতে না পেরে হঠাৎ বলেই ফেলি—"চাটাও কসে এক চড়্ !"

যেই না এই বলা, অম্‌নি ব[illegible] সমাধি ফেলে এক সে[illegible]াও আপ্ অন্‌দি বেঞ্চ্ !

তার পর---তার পরদিনই বকু [illegible]লে ইস্তফা দিল।

এসব তো বেশ কিছু দিন আগে[illegible]কথা। ইতিমধ্যে বকু [illegible] বেড়ে এবং বুদ্ধিতে পাকা হয়ে' যে-ঈশ্বরকে নিয়ে বাল্যকালে তার নিতান্তই খুচ্‌রো কারবার ছি[illegible]কেই এখন বড়ো রকমের আম্‌দানী-রপ্তানির ব্যাপার করে' ফলাও রকমে ফাঁদতে চায়। সেই জ[illegible]ওকে জাঁকালো রকমের নাম নিতে হচ্ছে : শ্রীমৎ বক্কেশ্বর পরমহংস। যে কোন ব্যবসাতেই নামটা[illegible] আসল, সেইটাই গুড্ উইল্ কিনা।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

বকু থেকে বক্কেশ্বর হবার পর, অনেকদিন আর যাওয়া হয়নি ওর কাছে। ভাব্‌লাম যাই একবার। ঈশ্বরই লাভ করেছে বেচারা, কিন্তু ঈশ্বরকে ভাঙিয়ে আরো কতদূর লাভ—কী সুরাহা করতে পারল দেখে আসা যাক্। পুরো টাকাটা পেয়ে কোনোই সুখ নেই, যদি না ষোলো আনায় ও চৌষট্টি পয়সায়---এবং কত আধ্‌লায় কে জানে---তার বহুল ও বহুবিস্তৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। যে-টাকাকে আনায় আনা যায় না, তা নিতান্তই অচল টাকা। তাকে পাওয়াও যা, না পাওয়াও তাই---একেবারেই বদ্‌লাভ বল্‌তে গেলে।

বকুই আমাকে বলেছিল এ কথা। "যে-ঈশ্বর ব্যাঙ্কে বাড়েন্ না তিনি একেবারেই ফক্কেশ্বর! বক্কেশ্বরের তাঁকে দরকার নেই আদৌ! অকেজো জিনিসের ঝামেলা কে সইবে বাপু!"

গিয়ে দেখি বেশ ভীড় ওর বৈঠকে। ঘর জুড়ে সতরঞ্চি পাতা, ভক্ত-শিষ্য পরিবেষ্টিত বকু মাঝখানে সমাসীন্। নির্লিপ্ত, প্রশান্ত ওর মুখচ্ছবি—কেমন যেন ভিজে বেড়ালের মত হাব-ভাব।

আমিও গিয়ে বসি একপাশে, ও দেখ্‌তে পায় না, কিম্বা দেখেও দেখেনা, কে জানে!

ভক্তদের একজন তখন প্রশ্ন করেছে: "প্রভু, ব্রহ্ম কী? ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধই বা কী?"

প্রথমে বকুর মৃদু হাস্য---তারপরে বকুর সুমধুর কণ্ঠ। "ব্রহ্ম! ব্রহ্মকে বোঝা ব্রহ্মারও অসাধ্য! আর ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক বলছ? সে সম্বন্ধ ডিমের সম্বন্ধ! এই জন্যেই জগতকে ব্রহ্মাণ্ড বলে থাকে। আমাদের জন্যে ব্রহ্মের কোনই হাপিত্যেশ্ নেই, আমরা বাঁচি কি মরি, খাবি খাই কি খাবার খাই তা নিয়ে ব্রহ্মের মোটেই মাথা ব্যথা নেই! মাথাই নেইত মাথাব্যথা! ব্রহ্ম---সে এক চীজ্! এই প্রত্যয় যার হয়েছে তাঁকেই বলা হয় ব্রহ্মালু! ব্রহ্মের আলু-প্রত্যয় যাকে বলে। খুব কম লোকেরই এই প্রত্যয় আসে জীবনে। যাঁদের হয় তাঁদেরই বলে' থাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ! অর্থাৎ কিনা—"

ভিড়ের আড়াল থেকে আমি ফোড়ন্ কাটি: "আলুসেদ্ধ মহাপুরুষ!"

ক্ষণেকের জন্য বকুর খইফোটা ব[illegible]য়, ভক্তরাও চঞ্চল হ[illegible]ঠে।

কিন্তু ভক্তির স্রোত কতক্ষণই ব[illegible]র প্রশ্ন হয়---"দেখুন, আপনি ভগব[illegible]কে মাতৃভাবে সাধনা করতে বলেছেন। কি[illegible]ই পাই কিন্তু ভগবানের কাছে চে[illegible] পাই না কেন বলুন্ তো!"

ভারী মুস্কিলের কথাই! এ[illegible]বকু কা জবাব দেয়, জান্‌বার জন্য আমিও ব্যগ্র হই।

বকুর আবার মৃদু হাস্য---তবে এ[illegible]ধি সিকি ইঞ্চি [illegible]ও!

"আমরা কি আর ভগবানের ক[illegible]গুলা? সত্যি [illegible]ই কি তাঁকে মা বলে' ভাব্‌তে পারি? আমাদের প্রার্থনা তো রাম [illegible]মধুর কাছে, তাদের [illegible] চেয়ে চিন্তে আমাদের পাওনা গণ্ডা না পেলে তখন ভগবানকেই গাল পা[illegible]

"কিন্তু রাম শ্যাম যদু মধুর মধ্যে[illegible]সেই ভগবান---সেই [illegible]া নেই কি? তবে তাদের আচরণ ঠিক মাতৃবৎ হয় না কেন?"

"তার কারণ, সেই-মা যখন সীমার মধ্যে আসেন তখন যে মাসীমা হয়ে পড়েন্! মার চেয়ে মাসীর দরদ্ কি বেশি হয় কখনো? মাসীর যদি বা কদাচ দেবার ইচ্ছাই হয় সে নিতান্তই যৎকিঞ্চিৎ, কখনো বা হয়ই না, কখনো যদি বা হোলো দিলেন আবার ঠিক উল্টোটাই! তাই তো এত হাহুতাশ দুনিয়ায়।

বকু তাক্ লাগিয়ে ছায় আমার! এই সব মুরুব্বির মত আর মোরব্বার মতো বোল্‌চাল্---যেমন মিষ্টি তেমনি গুরুপাক্ এত তত্ত্ব ও পেল কোথায়! তবে কি সত্যিই ও ভগবান্ পেয়েছে নাকি? সন্দিগ্ধ হতে হয়। এযে পরমহংস দেবের মতই প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাণ-জল করা কথা সব! আমার নাস্তিক হৃদয়েও ভক্তির ছায়াপাত হতে থাকে।

এমন সময়ে জনৈক ভক্ত এক ছড়া পাকা মর্ত্তমান নিয়ে এসে হাজির! বকুর শ্রীচরণে নিবেদন করে' ছায় প্রণত হয়ে।

বকু হাত তুলে আশীর্ব্বাদ জানায়---"জয়োস্তু!"

তারপর একটা কলা ছাড়িয়ে মুখের কাছে তোলে---নিজের মুখের কাছে। কাকে যেন অনুনয় করে ---"মা খাও।"

আমি চারি দিকে তাকাই, বকুর মাকে দেখ্‌তে পাইনে কোথাও! তিনি হয়তো তখন তেতলায় বসে, তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে, পানদোক্তাই চিবুচ্ছেন! সেখান থেকে কি শুনতে পাবেন বকুর ডাক? তাছাড়া তিনি আস্‌তে চাইবেন কি এই দঙ্গলে?

বকুর পুনরায় কাতর অনুরোধ---"খাও না মা!"

বোধ হয় দরজার আড়ালেই অপেক্ষা কর্‌ছেন উনি! এতক্ষণ নেপথ্যেই ছিলেন তাহলে!

আমি মার আগমনের অপেক্ষা করি, বকু কিন্তু করে না, কলাটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে, সুচারু রূপে চিবিয়ে, গিলে ফেলে একদম্।

দ্বিতীয় কলাটিও ঐ ভাবে মুখের কাছাকাছি আসে। আবার বকুর সকাতর আহ্বান্---"মা মাগো! আরেকটা কলা খাও!"

আমি অবাক্ হই এবার! কাছের একটি ভক্তকে জিগেস্ করি---"মহাপ্রভুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এমন কর্‌ছেন কেন?"

শুনে' তিনি তো চোখ পাকান্, পাশের আরেকজন ঘুষি পাকায়। অবশেষে, পেছনের একটি সদাশয় ভদ্র লোক আমাকে সব বুঝিয়ে ছায়। তখন আমি জানতে পারি যে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের চির-দিনের আদা ও কাঁচ কলার সম্পর্ক ভুলে গিয়ে, আত্মীয়বোধে তাঁর সঙ্গে বাৎচিৎ করা ভগবৎ সাধনারই একটা প্রত্যঙ্গ। তারপর আর বুঝ্‌তে দেরি হয় না আমার! অর্থাৎ, ভগবানকে মা-টা বলে' একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে, ভুলিয়ে ভালিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে নেবার ফন্দী আর কি! ভগবানের সঙ্গে এরকম চালাকি আমার ভালো লাগে না কিন্তু!

তৃতীয় কলার প্রাদুর্ভাবেই আমি প্রতিবাদ করি: "উঁহু, মা বেচারীকে অত কলা খাওয়ানো কি ঠিক হবে? সর্দ্দি হতে পারে মার। তার চেয়ে বরং বাবাজীদের বিতরণ করলে হয় না?"

বকুর কদলী-সেবন বাধা পায় না। চিবতে চিবতেই সে বলে: "হ্যাঃ, মার আবার সর্দ্দি হয় না কি! তিনি হলেন সর্ব্বশক্তিময়ী! সর্দ্দি হলেই হোলো! আর যদি হয়ই, মা কি আমার আদা-চা খেতে জানেন না!"

সাধ্য সাধনায় লোকে ঢোঁক গিলে ফেলে; কলা তো কি ছার! সমস্ত ছড়াটাই বকুর মার, বিকল্পে, বকুর অন্তরালে, দেখ্‌তে না দেখ্‌তে, অন্তর্হিত হয়।

তারপর একে একে 'মা আঁচাও', 'মা মুখ মোছো'—ইত্যাদি হয়ে যাবার পর, একটি পান মুখে দিয়ে বকুর দ্বিতীয় কিস্তি কথামত সুরু হয়। মাঝে একবার সমাধির ধাক্কাও সাম্‌লাতে হয় বকুকে।

অবশেষে অনেক বেলায়, ভক্তদের সবার অন্তর্ধানের পর, থাকি কেবল বকু আর আমি।

"এই যে শিব্রাম্ যে! অনেকদিন পরে কি মনে করে'?" ভারিক্কী চালে বলে বকু।

"এলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাব বলে! মডার্ণ-টাইম্‌স্ হচ্ছে মেট্রয়। চার্লি চ্যাপ্‌লিনের। চলো দেখে আসা যাক্ আর হেসে আসা যাক্!"

"আমার কত কাজ, কি করে' যাই বলো!" বকুর মুখ ভার।

"আচ্ছা, মাকে একবার জিগ্যেস্ করেই নাওনা কেন! তিনি তো এখনো দেখেননি ছবিটা! কিম্বা যদি দেখেও থাকেন তো দেখেছেন সেই ফিল্‌ম তোলার সময়ে হলিউডে। তারপর সটান্ চলে এসেছে কলকাতায় আজই প্রথম শো!"

"আঃ, কি বক্‌ছ! মার সময় কই এখন!"

"তবে মাকে নাই নিয়ে গেলে, তোমাকে নিয়ে গেলেই হবে। মার কি মাসীমার যারই হোক্, অনুমতিটা কেবল নিয়ে নাও!"

"ভাই শিব্রাম!" বকুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে: "ঈশ্বর ছাড়া কি আর কোন কাম্য আছে আমার জীবনে? আর কোনো চিন্তা? আর কিছু দ্রষ্টব্য? না। এখন ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য।"

"তা বেশ তো! লক্ষ্য তাই থাক্ না, কিন্তু, সিনেমাটা উপলক্ষ্য হতে দোষ কি? চার্লি চ্যাপ্‌লিন্---"

"তা হয় না শিব্রাম;" বকু বাধা দিয়ে বলে'—"তুমি নিতান্ত মূঢ়মতি! এই গূঢ় অতি ব্যাপার কী বুঝবে! লক্ষ্য মাত্রই ভেদ করবার জিনিস্, তাতো মানো? কথায় বলে লক্ষ্যভেদ! ঈশ্বর যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তাহলে ঈশ্বরকেও ভেদ করতে হবে! ঈশ্বরকে ফাঁক না করা পর্য্যন্ত আমার শান্তি নেই!"

আমার কি রকম একটা ধারণা ছিল যে ঈশ্বর লক্ষ্য হতে পারেন কিন্তু ভেদ্য নন্, কিম্বা ভেদ্য হতে পারেন কিন্তু লক্ষ্য নন্ অথবা ও দুয়ের কিছুই নন্—তিনি সমস্ত ভেদাভেদের একেবারে অতীত। সেই কথাটাই পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করতে যাচ্ছি কিন্তু পাড়্‌তে না পাড়তেই সে আমাকে বাগ্‌ড়া দ্যায়: "বাঃ, ভেদ করা যায়না কে বল্‌ল! ঈশ্বরকে ভেদ করেই তো আমরা এলাম! এল এই বিশ্ব সংসার! নইলে এলাম কোত্থেকে!

ঈশ্বরকে ছিন্নভিন্ন করেই তো আমরা এসেছি----যা একবার ভেদ হয়েছে তা আবার ভেদ হবে। তবে, হ্যাঁ দুর্ভেদ্য বটে!"

এই বলে সে অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদের উদাহরণ ঠেলে নিয়ে আসে আমার সামনে, আমার কিন্তু ধনঞ্জয়ের, দৃষ্টান্তে প্রহারের অভিসন্ধিই জাগ্‌তে থাকে কেবল!

নিজেকে সামলে নিই কোনোরকমে---নাঃ, এতখানি ন্যাকামি বর্‌দাস্ত করা সম্ভব নয়' আমার পক্ষে। আমার পিত্ত প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে, একটা নিষ্কাম রাগ, নিস্বার্থভাবে ধরে' পিটুবার অহেতুক ইচ্ছা আমার পেটের মধ্যে ধূমায়িত হয়। নাঃ, বকু যদি এতটা বাড় বাড়ে তাহলে বকুকেই আমার জীবনের লক্ষ্য করে' বস্‌ব কোন্‌দিন। একেবারে ভেদ করে ফেল্‌ব ওকে---জরাসন্ধের মতো সরাসরি। জরাসন্ধকে কে ফাঁক্ করেছিল? অর্জ্জুন, না, ধনঞ্জয়---কে? সে যেই করুক, গ্যাড্‌ভাইস্ বা এক্‌জাম্পলের তোয়াক্কা নেই আমার, ওকে আমি হুবহু দেখে নেব, তা যাই থাক্ কপালে, মানে, বকুর কপালে! আর বল্‌তে কি বকুকে আমার দুর্ভেদ্য বলে' মনে হয় না আদপেই!

চটে মটেই চলে আসি---সেদিনকার মতো ওকে মার্জ্জনা করে'। আসবার সময় সে রহস্যময় হাসি হেসে বলে: "জান্‌তে পাবে, ক্রমশঃই জান্‌তে পাবে। অচিরেই প্রকাশ হবে। ভগবান যখন ফাটেন বোমার মতই ফাটেন! যেম্‌নি অবাক্-করা তাঁর কাণ্ড---তেম্‌নি কান-ফাটানো তাঁর আওয়াজ! না দেখার, না শোনার যো কি! কতজনকে যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যান্ তার পাত্তাই পাওয়া যায় না! ভগবানের সামনে যে পড়েছে তার কি আর রক্ষে আছে? উধাও হতেই হবে তাকে? আজ না হয় কাল!"

দিনকতক পরে, যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি সংগ্রহ করে' আবার যাই বকুর কাছে। দৃঢ়সংকল্প করেই যাই, এবার আর বলা নেই কওয়া নেই, সোজা গিয়েই ওকে চাঁটাতে সুরু করে' দেব, তা যাই থাক্ বরাতে—ভক্তবৃন্দই এসে বাধা দিক্ কি মাসীমাই মাঝখানে পড়ুন্। কারু কথা শুনছি না!

কিন্তু যেতেই, দোরগোড়াতেই প্রথম ধাক্কা! দেখি বকুর সাইন্‌বোর্ড বদ্‌লেছে: "শ্রীমৎ বক্কেশ্বর পরমহংসের" বদলে স্রেফ্ "স্বামী বক্কানন্দ"! আমার মনে আঘাত লাগে, ভালো হোক্ মন্দ হোক্, বকু আমার বন্ধুই—বিনা হাফ্‌প্যান্ট এবং হাফ্‌প্যান্টের সময় থেকেই। ধনরত্ন কিছুই দিতে পারিনি ওকে, কেবল নামমাত্র দান করেছিলাম, তাও অভিমানবশে ও প্রত্যাখ্যান করল!

অভিমানবশে কি ক্রোধভরে, কে জানে! আমি ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে অনুযোগের সুর তুল্‌তেই ও বলে: "আর ভাই, বোলোনা! পাড়ার চ্যাঙ্‌ড়াদের জ্বালায় পাল্‌টাতে হোলো! 'পরমহংসের' জায়গায় কেবল 'পরমবক' বসিয়ে দিয়ে যায়। চক্ দিয়ে, কালি দিয়ে, উডপেন্‌সিল্ দিয়ে, যা কিছু দিয়ে। কাঁহাতক্ আর সব সময়ে কেবল ধোয়া মোছাই করি! আর যদি দিনরাত কেবল নাম নাম করেই পাগল হব ভগবানকে তবে ডাকব কখন! কাল আবার আলকাৎরা দিয়ে লিখে গেছে---সে লেখা কি ছাই সহজে ওঠে! ভারী খিট্‌কাল্ গেছে কাল'। তারপরই ভাব্‌লাম, ধুত্তোর! নাম নিয়ে কি ধুয়ে খাবো! বদ্‌লে ফেল্‌লুম নাম! তা এমন মন্দই বা কী হয়েছে!"

"শ্রীমৎ বক্কেশ্বর পরম্বক !" আমি বলি : "তাই বা এমন কী খারাপ ছিল !"

"বারে ! বক যে একটা গালাগাল !" বকু বলে---"হংসমধ্যে বকো যথা, বইয়ে পড়োনি ?"

"ধার্ম্মিক মানুষদেরই বকের সঙ্গে তুলনা করে। বক কি যা তা ?" বকের পক্ষ সমর্থন করি আমি---"হাঁসের চেয়েও বক ভালো---প্যাঁচার চেয়েও।"

"তোমার কাছে ভালো হতে পারে," বকু এবার চটে, "আমার কাছে নয় ! তোমার ইচ্ছা হয় বকের মাদুলি বানিয়ে গলায় ঝোলাও গে, আমি কিন্তু বক দেখ্‌লেই মুছে ফেল্‌ব, মেরেই বস্‌ব একেবারে, যদি হাতের নাগালে পাই !" বকু গজ্‌রাতে থাকে।

"তা যাক্‌গে।" আমি ওকে ঠাণ্ডা করি, "ব্যাকরণ-থেকে বের করা ছিল নামটা, তাই বল্‌ছিলাম —"

"বাঃ এতেও তো ব্যাকরণ বজায় আছে। বিলক্ষণ ! বকু ছিল আনন্দ কিম্বা বকু পেল আনন্দ অথবা বকুর হোলো আনন্দ ইতি বক্কানন্দ ! এমন মন্দ কি !"

"কিন্তু ঐ যে নামের গোড়ায় স্বামী বসিয়েছ ! স্বামী কেন আবার ?"

"বাঃ, তাও জানো না ! স্বামী বসাতে হয় যে ! বিয়ে না কর্‌লেও বসানো যায়।" আমার বোকামিতে বকুর বিস্ময় ধরে না ! "আমি তো বিয়েও কর্‌তে যাচ্ছি !"

আমি আকাশ থেকে পড়ি—"বলো কি !"

"অবাক হচ্ছ যে ! কেন ! বিয়ে কি কর্‌তে নেই ?" বকু বলে : "দুদিন বাদে বক্কানন্দও লোপ পাবে আমার। থাক্‌বে কেবল স্বামী।"

"য়্যাঁ ?"

"তোমাকে লক্ষ্য ভেদের কথা বলেছিলাম্ না ? সে লক্ষ্যভেদ হয়ে গেছে আমার !"

"য়্যাঁ, বলো কি ? ঈশ্বরকে ফাঁক্ করেছ তাহলে ?"

"একেবারে চৌচির ! এই ছাখো।" ব্যাঙ্কের একটা পাশ বই বের করে' আমাকে ছাখায় : তাতে বকুর নামে লক্ষ টাকা জমা ! পুনরায় আমার পিলে চম্‌কায় !

"য়্যাঁ ? এতটাকা বাগালে কোত্থেকে ?"

"ভক্তদের কাছ থেকে ধার নেয়া সব।"

"ভক্তদের ফাঁকি দেবে ? বেচারাদের !"

"ভক্তিতে মানুষকে কাণা করে, গুরুর কাজ হচ্ছে চক্ষুদান করা। সেই গুরুতর কাজটাই করেছি শুধু আমি।"

প্রথমে আমার মুখে কথাই সরে না, বহু চেষ্টায় নিজেকে জড়ো করে' আনি, তারপর ওকে জড়িয়ে খুব কসে' ওর পিঠ্ চাপ্ড়ে দিই : "ভ্যালা মোর বক্কেশ্বর—গদাম্---গদাম্---গুম্ !"

শেষের কথাগুলো বলে আমার দক্ষিণ হস্ত—ওর প্রশস্ত পিঠে। অব্যয় শব্দ সব হাতের অপব্যয় থেকেই আসে তো !

আমার তারিফের তাল সাম্লাতে ওর সময় লাগে। এটা অনুরাগের বহর কি, অনেকদিনের রাগের ঝাল্—ও ঠিক বুঝতে পারে না। আমিও না।

পুনরাবৃত্তির সূত্রপাতেই ও পিছিয়ে যায়: "আমি চল্লুম ব্যাঙ্কে। য্যাদ্দিন্ শুধু সমাধিই করেছি, এবার সমাধা করি !"

আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকি। লক্ষ টাকা ভেদ করা কি চারটিখানি ! দুর্ভেদ্য রহস্যের মতই বকুকে বোধ হয় আমার !

ব্যাঙাচির ল্যাজ খসে' গেলেই সে ব্যাং হয়—আরো বড়ো হলে' যখন ঠ্যাং খসে যায় তখন থাকে শুধু ব্যা।---বকু আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে।





(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

ডাঃ ক্রুল বলে' এতদিন যাঁকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছে তার এই স্বীকারোক্তির পর সমর ও অজয়ের বিমূঢ় অবস্থাটা খানিকটা বোধ হয় অনুমান করা যেতে পারে। অসংখ্য প্রশ্ন তাদের মনে জেগে উঠল। কিন্তু তখন তার সমাধানের অবসর নেই।

হাউই জাহাজ সবেগে নীচে নামছে। তবু মনে হল ষ্টাইন বা আসল ডাঃ ক্রুলের হাউই বোটকে রক্ষা করবার আশা অত্যন্তই অল্প। সমর ও অজয় ও বুঝেই উঠতে পারছিল না হাউই জাহাজ কোন রকমে হাউই বোটের নাগাল ধরতে পারলেও কি করে তা থেকে আসল ডাঃ ক্রুলকে উদ্ধার করা যাবে।

কৌতূহল না চাপতে পেরে সমর সে কথাই জিজ্ঞেস করলে।—"হাউই জাহাজ ত নীচে নামাচ্ছেন সব বিপদ তুচ্ছ করে। কিন্তু হাউই বোট বাঁচাবেন কি করে?"

ডাঃ ক্রুল বা হের ভোগেল তখন দূরবীণে চোখ লাগিয়ে এক মনে নীচের হাউই বোটের ওপর লক্ষ্য রাখছেন। চোখ না তুলেই তিনি বল্লেন—সমুদ্রে ডোববার আগে হাউই বোটের নাগাল যদি পাই তাহলে সেটা শক্ত হবে না।"

ব্যাপারটা পরিষ্কার না হলেও সমর ও অজয় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে না। যত বড় বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন সাক্ষাৎ শয়তানরূপী ডাঃ ক্রুলের উদ্ধারের ব্যাপারে সত্যিই তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। হাউই জাহাজের বিপদের কথা ভেবেই তারা তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কি কারণে কে জানে। হাউই জাহাজের এবারে কোন বিপদ হল না। ব্রেকের কাজেও এবার কোন গলদ দেখা গেল না। শেষ পর্য্যন্ত হাউই বোট সত্যিই রক্ষা পেল।

পৃথিবী ছাড়িয়ে
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

হাউই বোটটি এমন সহজে রক্ষা করা যাবে সমর বা অজয় ভাবতে পারেনি। বোটটি প্রায় সমুদ্রে পড়ে পড়ে এমন সময় তাদের হাউই জাহাজ তার নাগাল ধরে ফেলল। সে মুহূর্ত্তেই হের ভোগেল একটি কল টিপতেই দেখা গেল জাহাজের নোঙ্গরের মত দুটি শেকলে বাঁধা হুক হাউই জাহাজের তলা থেকে ঝুলে পড়েছে।

হাউই বোটটি দেখতে অনেকটা বিশাল পটলের মত। তার ওপরের দিকে কটি আংটা যে লাগান আছে, সমর এমন কি অজয় পর্য্যন্ত তা আগে লক্ষ্য করে নি। পরে তারা অবশ্য জেনেছিল হাউই জাহাজ থেকে হাউই বোট নামাবার ও তোলবার জন্যেই আংটাগুলি আছে। ছাড়বার সময় ওই আংটাতে শেকল দেওয়া হুক লাগিয়ে হাউই বোট নামিয়ে দেওয়া হয় আবার শূন্য পথেই ওই আংটায় হুক লাগিয়ে সেটিকে হাউই জাহাজে তুলে নেওয়া যায়।

কল বিগড়ে যাওয়ার ফলে বেয়াড়া ভাবে ঘুরপাক খাবার দরুণ হাউই-বোটের আংটায় জাহাজের হুক লাগাতে হের ভোগেলকে অবশ্য বেশ একটু বেগ পেতে হল। তবু শেষ পর্য্যন্ত সুকৌশলে তিনি তা লাগিয়ে ফেলেছেন দেখা গেল। তারপর হাউই বোট জাহাজে উঠিয়ে ফেলতে কোন হাঙ্গামই হল না।

কিন্তু কত বড় হাঙ্গাম যে তখনও বাকী তা তারা জানে না।

হাউই জাহাজ তখন বুধের সমুদ্রের একেবারে ওপরে এসে পড়েছিল। সমস্ত বুধগ্রহময় বিপুল একটা প্রলয়লীলা যে চলেছে তার পরিচয় এখানেও পাওয়া যায়। ঝড় নেই বৃষ্টি নেই তবু সমুদ্রের সে কি ভয়ঙ্কর রূপ! সমুদ্রের তলা থেকে বিরাট সব পাহাড় যেন ঠেলে উঠতে চাইছে। ব্রেকে সামান্য একটু গলদ দেখা দিলেই সে যাত্রা তাদের আর রক্ষা পেতে হত না। বুধের সেই উত্তাল তরঙ্গময় অজানা সমুদ্রেই তাদের ইতিহাস শেষ হত। কিন্তু ব্রেক এবারে আর বিফল হল না। হের ভোগেল একটা হাতল টেনে দিতেই হাউই জাহাজ আবার ওপর দিকে নির্বিঘ্নে ঠেলে উঠল।

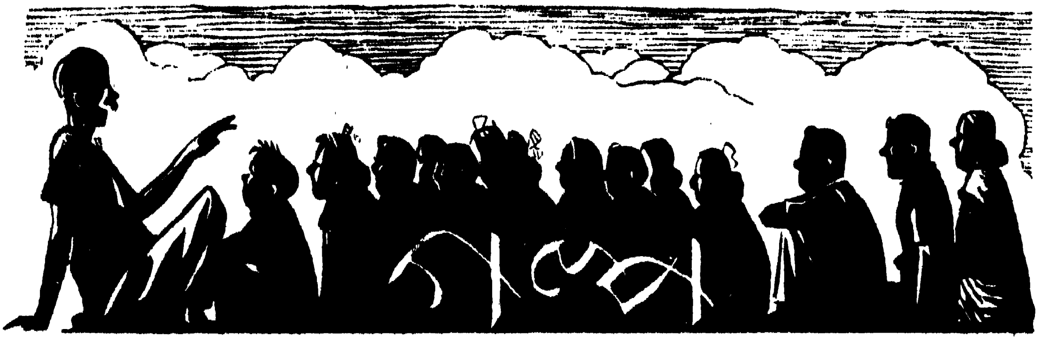
ভোগেল এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন,—"হাউই জাহাজ সম্বন্ধে এখন আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত। এবার ডাঃ ক্রুলের খবর নিতে যেতে পারি।"

অজয় একটু অপ্রসন্ন ভাবে বল্লে,—"তাঁকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন সেই যথেষ্ট এখনি আর খবর না নিলে কি চলত না। আমাদের একবার যে সর্ব্বনাশ তিনি করেছেন তাতে এবার হাউই বোট তাঁর বন্দী থাকাই সবার পক্ষে মঙ্গলের কথা বলে ত আমার মনে হয়।

হের ভোগেল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়ে বল্লেন,—"আমার ও মত তাই, কিন্তু তিনি কোন রকম আহত হয়েছেন কিনা সেটা একবার দেখা উচিত মনে করছি।

সমরের সঙ্গে হের ভোগেলকে অনিচ্ছার সঙ্গে অনুসরণ করে অজয় বল্লে,----"আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। কিন্তু আবার কোন শয়তানী করবার সুযোগ যেন সে না পায় এইটুকু সাবধান থাকবেন।"

ভোগেল একটু হেসে বল্লেন----"সে কথা আমায় বলতে হবে না। আহত হোক বা না হোক যে অবস্থাতেই থাকে ডাঃ ক্রুল এখন থেকে আমাদের বন্দী। ক্রমশঃ



বীরবলী

শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

একদিন বাদশাহ আকবর ও বীরবল এক বেগুনের খেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। কচি কচি সুন্দর নীল বেগুন গুলি দেখে রাজা বললেন, "বীরবল, দেখ দেখ কি সুন্দর বেগুন! বীরবল তখনই শত মুখে বেগুনের গুণ বর্ণনা করতে সুরু করলেন ও বললেন, জাঁহাপনা, বেগুনের খেতই সব লাগান উচিৎ, পৃথিবীর কোন তরকারি এর কাছে লাগে না।"

কিছুদিন পর আবার আকবর ও বীরবল দুজনে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন। বেগুনের সময় উৎরে গেছে, পোকা ধরেছে, চারাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে তার পূর্ব্বের সে সৌন্দর্য্য আর নেই।

আকবর শাহ বলে উঠলেন, "কি বিশ্রী দেখতে!"

বীরবল তখনই বেগুনের দোষ বর্ণনা করতে লাগলেন, ও শেষে বললেন, "জাঁহাপনা, বেগুন কখনও খেতে নেই।"

আকবর শাহ সব শুনে বললেন, "বীরবল, বল কি? এই সেদিন বেগুনের প্রশংসা তোমার মুখে ধরে না, আর আজ এতনিন্দা করছ যে?"

বীরবল কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বাদশাহকে লম্বা কুর্নিশ করে গম্ভীর স্বরে বললেন, "জাঁহাপনা, আমি ত আর বেগুনের চাকর নই, আমি আপনার চাকর।"

আশ্চর্য্য অসুখ

রজত সেন

ছেলেবেলায় চীৎকার ক'রে ক'রে পড়েছি—'টেম্‌স্ নদীর সুরঙ্গ, কিবা মনোহর, উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর,' পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছি। অদ্ভুত লাগ্‌ত! তখন চাটগাঁ থাক্‌তাম, বয়েস পাঁচ কি ছয়। মাঠের একধারে পর্দ্দা খাটিয়ে প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হ'ল। অনেক দূরে একটা উঁচু ঢিবির ওপর বসে সন্ধ্যার পর আমরা কয়েকজন সেদিন সেই প্রথম দেখ্‌লাম পর্দ্দার গায়ে লোক ঘোড়ায় চড়ছে, পাহাড়ে উঠ্‌ছে, নদীতে সাঁতার কাট্‌ছে, আরও কত রকমের দৃশ্য! কি ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে সে-রাত্রিটা কেটেছিল! এখন, এতদিন পরে সে-কথা ভাবতে কি ভালো যে লাগ্‌ছে কি বল্‌বো!

পৃথিবীর যত বয়েস বাড়ছে, পৃথিবীতে অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য ঘটনার সংখ্যা যেন তত বেড়ে চলেছে। কত অদ্ভুত কিম্ভূতকিমাকার রোগ যে মানুষের আজকাল হচ্ছে তা তোমরা জানো? ডাক্তার হয়েও আর সুখ নেই, হাতে এমন রুগী এলো যে রোগের কথা সে কোন ডাক্তারী বইতে কোন দিন পড়েনি।

লণ্ডনের কোন থিয়েটারে এক ভদ্রলোক একবার পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে ঠোঁটে রাখ্‌লেন, তারপর দেশ্‌লাই জ্বেলে যেই সিগারেট ধরাতে যাবেন অমনি হুস্ ক'রে প্রকাণ্ড এক শব্দ হ'ল, তাঁর মুখ থেকে সিগারেটটা ছিট্‌কে গিয়ে পড়লো প্রায় কুড়ি হাত দূরে আর একজন দর্শকের পায়ের কাছে। দেশলাইএর কাটিটা গেল সঙ্গে সঙ্গে নিবে। King's College হাসপাতালের ডাক্তার ভদ্রলোককে খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন ব্যাপার কি! জানা গেল তাঁর পেটের মধ্যে খাবার হজম না হ'য়ে চার পাঁচ দিন পরে সেই খাদ্যদ্রব্য থেকে একরকম গ্যাস সৃষ্টি হয়; মুখের কাছে হঠাৎ আগুনের স্পর্শে প্রায় বারুদের মত এই গ্যাস জ্বলে ওঠে! ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য্য নয় কি?

আশ্চর্য্য অসুখ
রজত সেন

পোর্টল্যাণ্ডে সেদিন একটা লোক মোটরে যাবার সময় আর একটা গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে। চোট লেগে লোকটার ভ্রূ আর চোখের মাঝামাঝি জায়গায় ছিদ্র হ'য়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই ছিদ্র দিয়ে শরীরে হাওয়া ঢুক্‌তে আরম্ভ করে, লোকটাও ফুল্‌তে থাকে। ক্রমশঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে লোকটা তার শরীরের দ্বিগুণ হয়ে যায়। অবশেষে লোকটার পেটে ছিদ্র করে সমস্ত হাওয়া বার ক'রে দিয়ে তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করতে তবে লোকটা ভালো হ'য়।

আর এক রকম রোগের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, যে রোগ শরীরের স্বাভাবিক বর্ণ একেবারে আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে দেয়। প্রথমে হয়ত পা ছুটোই নীল হ'য়ে গেল। গায়ের চামড়া অনবরত হল্‌দে, কালো, লাল প্রভৃতি রংএ পরিবর্ত্তিত হ'তে লাগ্‌লো। এই সমস্ত রোগের কারণ এখনও বৈজ্ঞানিক জগতে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

Hartford-এ একজন রোগী পাওয়া গেল যার কান ছুটো অবিশ্রাম নড়ছে, মিনিটে ১০০ থেকে ১৩২ বার কান নড়তে থাকে। দূরের লোক সে কান নড়ার শব্দ শুন্‌তে পেতো। periscope-এর মত যন্ত্র দ্বারা ওর গলা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল শিরার কোন গোলমালের দরুণ এই সাজ্ঘাতিক রোগের উৎপত্তি।

California-তে একজন চিত্রকরের হঠাৎ মাথাটা বড় হ'য়ে গেল দেখ্‌তে দেখ্‌তে, শরীরটাও এলো কুঁজো হ'য়ে; পা ছুটা কেমন যেন দুমড়ে ছোট হ'য়ে গেল। ভদ্রলোককে দেখ্‌লে হঠাৎ মনে হয় প্যাণ্ট্‌-কোট-পরা একটা বনমানুষ।

আর একটা আশ্চর্য্য ঘটনা। Patricia Maguire নামে একটি মেয়ে প্রায় ছু'বছর ধরে ঘুমোচ্ছে। বেশ স্বাভাবিক ঘুম। কত রকম যে চেষ্টা করা হয়েছে ওর ঘুম ভাঙাবার তার আর ইয়ত্তা নেই, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ, সে ঘুমোচ্ছে। ডাক্তারেরা আশা করছে এবারে ওর ঘুম ভাঙ্গবে।

একবার একজন মহিলা হঠাৎ হাই তুলতে আরম্ভ করেন। প্রথমে আস্তে আস্তে কয়েকবার, তারপর মিনিটে দশ বারো বার ক'রে তাঁর হাই উঠ্‌তে লাগ্‌লো। কিছুতেই হাই ওঠা থামে না। ডাক্তার ডাকা হ'ল, নানা ওষুধ দেয়া হ'ল, কিন্তু হাই তোলা থামতেই চায় না। শেষকালে ক্লান্ত হয়ে মহিলা ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন জেগে উঠ্‌লেন। তখন তাঁর ব্যারাম সেরে গেছে!

আর এক মুস্কিলে ব্যারাম আছে—এর নাম হিক্কে। মাঝে মাঝে আমাদের কয়েক মিনিটের জন্যে হিক্কে উঠ্‌তে থাক্‌লে আমরা কি মুস্কিলেই পড়ে যাই; কখনও জল খাচ্ছি কখনও বা নিশ্বাস বন্ধ ক'রে কিংবা নানা রকম কসরৎ করে তবে হিক্কে বন্ধ করতে পারি। California-র এক ভদ্রলোককে একবার ধ'রলো এই হিক্কে। কিছুতেই কমেনা, বড় বড় ডাক্তার দেখালেন, নানা ওষুধ পত্র খেলেন, কোথায় কি? কয়েক দিন অসহ্য কষ্টে কাটাবার পর ভদ্রলোক ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন, এমন ভাবে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। রিভলবারটা বার করে তিনি কপাল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপ্‌লেন, সঙ্গে সঙ্গেই হিক্কা উঠ্‌লো, তিনি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলেন, জীবনটা বেঁচে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হিক্কেও সেরে গেল!

আর একটা ব্যাপার বলে এ কাহিনী শেষ করা যাবে। এক ভদ্রলোক কোন রেস্তরাঁয় বসে বন্ধুর সঙ্গে চা পানের পর একটা সিগারেট ধরিয়ে গল্প করছিলেন। হঠাৎ মানুষের চামড়া পোড়ার গন্ধ নাকে লাগ্‌তে দুই বন্ধুই আশ্চর্য্য হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্‌লেন। হঠাৎ হাতের দিকে নজর পড়াতে ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, যে দুটো আঙ্গুলে তিনি সিগারেটটা ধরেছিলেন সিগারেটটা ক্রমশঃ ছোট হ'য়ে গিয়ে তাঁর সে দুটো আঙ্গুল পুড়তে আরম্ভ করছে, ভদ্রলোক ভয়ানক বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। তাঁর নিজের দুটো আঙ্গুল বেমালুম পুড়ে যাচ্ছে আর তিনি গন্ধ না পাওয়া পর্য্যন্ত বিন্দু বিসর্গ টের পাননি! সোজা চায়ের দোকান থেকে তিনি এলেন ডাক্তারের বাড়ী। ডাক্তার সাহেব ত ব্যাপার শুনে হকচকিয়ে গেলেন। এ আবার কি ব্যারাম রে বাবা। চল্‌লো গবেষণা অনেক দিন। ডাক্তার একদিন ভদ্রলোককে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ Xray দ্বারা পরীক্ষা করলেন। রহস্যের সমাধান হ'ল। ভদ্রলোকের হয়েছিল কি তাঁর মেরুদণ্ডের মধ্যে এক জায়গায় গর্ত্ত হয়ে যে শিরাগুলো মাথার মধ্যে স্পর্শ-বোধ বয়ে নিয়ে যায় সে শিরাগুলো নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, সে জন্যেই তিনি কিছু অনুভব করতে পারতেন না। গর্ত্তের চারপাশ দিয়ে অবশ্য যে শিরাগুলো গেছে তারা অক্ষতই আছে, সে জন্যে অন্যান্য শারীরিক অনুভূতি পূর্ব্বের মতনই।

যদিও বিজ্ঞান Xray এবং আরও অভাবনীয় যন্ত্রপাতি ক্রমশঃ আবিস্কার করছে, এমন অনেক রোগ আজকাল হচ্ছে বিজ্ঞানের সাহায্যে যাদের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

সাধ্যমত কাজ

শ্রীরাণী রায়

১

বর্ষাকালে ছোট্ট মেঘ এক
হারিয়ে নিজের দল,
বললে, "ও ভাই, আমার যে এই
কয়েক ফোঁটা জল,
পারবে কি তা' নদীর বুকে ঢেউ ছোটাতে,
কিংবা, চাঁপা, টগর বেলা ফুল ফোটাতে ?
তবুও আমার সাধ্যমত কাজ
করবো তাতে পা'ব নাকো লাজ।"

২

বাগানের এক ফুলগাছেতে
ছোট্ট একটি ফুল
বল্‌লে ফুটে, "এই বাগানে
রোজ আসে বুলবুল,
ফুলের বাসে মাতাল হ'য়ে শোনায় মধুর গান,
একা আমার গন্ধেতে কি মাতবে তাহার প্রাণ ?
তবুও আমার সাধ্য মত কাজ
করবো তা'তে পা'ব নাকো লাজ।"

৩

মৌমাছি এক গুন্‌গুনিয়ে
ছুট্‌ছিল ফুল পানে,
হঠাৎ থেমে, কাছে এসে,
বল্‌লে কানে কানে,
"সারাটাদিন ছুটে ছুটে করছি মধু জড়,
কিন্তু একা চাকখানিকে করতে নারি বড়।
তবুও আমার সাধ্যমত কাজ
করবো, তা'তে পাব নাকো লাজ।"

৪

রাতের বেলা আঁধার যখন
মিশ্‌মিশিয়ে কালো,
একটি তারা বল্‌লে আমায়,
"মিট্‌মিটে মোর আলো।
এই পৃথিবীর জমাট্‌ অন্ধকার
দূর ক'রে দেই সাধ্য নেই তা'র।
তবুও আমার সাধ্যমত কাজ
করবো তা'তে পাব নাকো লাজ।"

ছুটির ঘণ্টা

টেষ্ট ম্যাচ ঃ—

ম্যাঞ্চেষ্টারে চার দিন ধরে বিষ্টি হওয়ার ফলে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা একেবারেই হয় নি। ১৮৯০ সালে ঠিক এমন দুর্য্যোগ হয়েছিল ম্যাঞ্চেষ্টারে এবং সেবারও কোন খেলা হয় নি। ১১শে জুলাই চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হল লিড্‌স্ গ্রাউণ্ডে। এবারও হ্যামণ্ড টস্ জিতল। প্রায় ৪০,০০০ হাজার দর্শকের সামনে ইংলণ্ডের নামজাদা খেলোয়াড়রা অষ্ট্রেলিয়ার দুর্দ্দণ্ড আক্রমণকে ব্যর্থ করতে না পেরে চাঞ্চল্য আনল। ১ম ইনিংসে ইংলণ্ডের রাণ হল ২২৩। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম মুখে তেমন সুবিধে করতে পারে নি। এবারও ব্র্যাডম্যান ইংলণ্ডের সব আক্রমণকে তুচ্ছ করে আশ্চর্য্য ক্রীড়া দক্ষতায় একা রাণ করলেন ১০৩। প্রথম ইনিংসে মোট রাণ হল ২৪২। দ্বিতীয় ইনিংসে সত্যিকার উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এবারও অষ্ট্রেলিয়ার যাদুকর বোলারদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সুদক্ষ খেলোয়াড়রা জমাতে পারলেন না। দ্বিতীয় ইনিংসে মোট রাণ হল ১২৩। মাত্র ১০৫ রাণ হলে অষ্ট্রেলিয়ার তখন জয় হয়। সময় ও তখন অনেক। কিন্তু ব্রাউন ফিঙ্গলটন, ব্যাডম্যান মাত্র ১৬ রাণে আউট হয়ে যেতে উত্তেজনা বেড়ে গেল। ইংলণ্ড ভাবল হয়ত ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্না হলেন। ইংলণ্ডের বোলিংকে জব্দ করে হ্যাসেট খেলার গতি ফিরিয়ে দিল। টীমের সর্ব্বোচ্চ রাণ করল ৩৩। ৫ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে পরাজিত করল! চার দিনের খেলা তিন দিনেই শেষ হল। চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের পরাজয়ের মূল কারণ বোলারের অভাব। এবারও ব্যাডম্যান একটি সেঞ্চুরী করেছিলেন। প্রথম দুটি টেষ্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় এবং তৃতীয় টেষ্ট না হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ান হবার আশা বেড়ে গেল। পঞ্চম টেষ্টে দুর্দ্দান্ত অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করতে ইংলণ্ডের শক্তির অভাব না হলে ও যাদুকরের মত খেলে ক্রিকেটে এঁরাই যে রেকর্ড করবেন সে আর আশ্চর্য্য কি!



লোকাল এবং ভিজিটার দলের সম্মিলিত খেলোয়াড়গণ

টেনিস ঃ—

লণ্ডনে কুইন্স ক্লাবে ভারতীয় ডেভিস কাপ টীম ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের একটি একজিবিসন ম্যাচে সাক্ষাৎ করেছিলেন। খেলায় ইংলণ্ডের ক্রীড়া গৌরব অক্ষুণ্ণ রইল। এই খেলার মধ্যে ভারতীয় দল অতি কষ্টে ছুটি গেমে জয়ী হয়। এই খেলাই প্রমাণ করে ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নিম্নস্থানে পড়ে আছে। মেহ্‌টা একমাত্র সিঙ্গলস ও ডবল্‌স্ ম্যাচে জয়ী হন। সিঙ্গলস ম্যাচে পিটারকে ৩-৬, ৩-৬, ৮-৬ গেমে মেহ্‌টা হারিয়ে দেন। অন্যদিকে অষ্টিন ৬-২, ৭-৫ গেমে রণবীর সিংহকে পরাজিত করেন। ডবল্‌স্ ম্যাচে মেহ্‌টা ও সোয়ানী ৬-১, ৬-৩ গেমে স্যাপ ও রিচিকে হারান।

চ্যারিটি ম্যাচ ঃ—

শিল্ডের মাঝে প্রথম চ্যারিটি ম্যাচ হয়—লোকাল বনাম ভিজিটার্স। আগে এই খেলাটি দেখবার জন্যে লোকের ভীড় কম হত না। নামজাদা ভারতীয় খেলোয়াড়রাও তখন লোকাল টিমে স্থান পেতেন না, কারণ ইউরোপিয়ান খেলোয়াড় ও তখন কেউ কম ছিলেন না। এবার ভিজিটার্স দলে কোয়েটার মোসলেম দলের তিনজন খেলোয়ার ছিলেন। খেলাটি কিন্তু তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নি। বিষ্টি ও কাদায় মাঠে অতি অল্প সংখ্যক দর্শকের সামনে লোকাল টীম ২-১ গোলে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে হারায়।

আই-এফ-এ শীল্ড ঃ—

বিখ্যাত আই, এফ, এ শীল্ড টুর্ণামেণ্টে এবারও দেশ বিদেশের মিলিটারী ও সিভিল টীম যোগদান করে ছিল। কম করে ৪৫টি ক্লাব টুর্ণামেণ্টে খেলেছেন কিন্তু কেউ তেমন ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। ফুটবলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নীচে এসে পৌঁচেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল দুর্দ্দান্ত পুরোন মিলিটারী টীমদের অতি নিকৃষ্ট খেলায়। তারপর খেলায় বাংলার মফঃস্বলের ক্লাবগুলি উলপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা ইউনিয়ান স্পোর্টিং, ফরিদপুর, বরিশাল টুর্ণামেণ্টের প্রথম মুখে পরাজিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

মোহনবাগান প্রথম রাউণ্ডে পুরোণো শত্রু হাওড়ার কাছে ১-০ গোলে হেরে শীল্ডে প্রথম চাঞ্চল্য আনে। শুধু ফরোয়ার্ডের খেলার দোষে জেতা গেম ইচ্ছে করে হারে। ২য় ডিভিসনের "জর্জ্জ টেলিগ্রাফ" সত্যি চাঞ্চল্য এনেছিল পর পর কালীঘাট ও রয়েল ফুসিলিয়ারকে পরাজিত করে। কাষ্টম্‌সের হাতে তৃতীয় রাউণ্ডে জর্জ্জ টেলিগ্রাফের হারতে হয়। ইষ্টবেঙ্গলের সব আশা ভেঙ্গে দেয় হাওড়া। খেলা শেষ হবার দু'মিনিট আগে পেনাল্টি



শীল্ড ফাইনালে মহমেডানের কাপ্তেন ইষ্টইয়র্কের কাপ্তেনের করমর্দ্দন, মাঝখানে রেফারি গিলসন

সটে ইষ্টবেঙ্গল গোল দিতে পারে নি। গত বছর শীল্ডবিজয়ী ফিল্ড বিগ্রেডকে হারিয়ে আরগাইল্‌স্ হাইল্যাণ্ডার নাম কেনে। সেই আরগাইল্‌স্‌কে অতি সহজে হারিয়ে ই, বি, আর একেবারে সেমিফাইনালে উঠে সকলকে বিস্মিত করে দিল। লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান ডালহৌসীকে ৫-০ গোল, ও মুঙ্গেরকে ৭-০, ক্যামেরিয়ান্সকে ২-১ গোল দিয়ে অতি সহজে সেমিফাইন্যালে পৌঁছল। শীল্ডের সত্যিকার উৎসাহ ও উত্তেজনা বেড়ে যায় সেমিফাইন্যাল গেম হতে। ই, বি, আর বিজয়ী ইষ্টইয়র্ককে সাক্ষাৎ করল—অন্য দিকে মহমেডান পুরোণ শত্রু কাষ্টম্‌সের বিরুদ্ধে খেলতে নাবল। খেলার প্রথম হাফে ২-০

গোলে হেরে যেতে কাষ্টম্‌স্ যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। দ্বিতীয় হাফে রিবেলো আহত হয়ে মাঠ থেকে বিদায় নিতে এবং রবিন নেল খারাপ খেলাতে মহমেডান ৪-০ গোলে জয়ী হন। অন্যদিকে ই, বি, আর শুকনো মাঠে ইষ্টইয়র্ককে প্রায় হারিয়ে ছিল! একা নন্দী ইষ্টইয়র্ককে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। দুর্দান্ত গোলকিপার পটার ইষ্টইয়র্ককে বাঁচাল। তারপর সামাদ গ্যালারি গেম খেলতে প্রথম দিন জেতা গেম ইচ্ছে করে' নষ্ট করে। দ্বিতীয় দিন ভিজে মাঠে ইষ্টইয়র্ক ১-০ গোলে ই, বি, আরকে হারিয়ে প্রতিশোধ নেয়। ইষ্টইয়র্ক আবার মহমেডানকে সাক্ষাৎ করল। ১৯৩৫ সালে ইষ্টইয়র্ক সেমিফাইন্যালে মহমেডানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে এবং সেই বছর ইষ্টইয়র্কই শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল। তার পরের বছর মহমেডান তিন দিন ক্যালকাটার সঙ্গে ড্র-এর পর সর্ব্বপ্রথম শীল্ড বিজয়ী হয়।

ফাইন্যাল খেলা ঃ—

বিপুল দর্শকের সামনে ফাইন্যাল গেম আরম্ভ হয়। ভীষণ উত্তেজনার মাঝে মহমেডান একটি পেনালটি পেল হকিন্স হ্যাণ্ডবল করতে। রসিদ খাঁ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পটারের গায়ে মারল। ব্রামওয়েল প্রথম গোল করে' মহমেডানকে আরো উত্তেজিত করে' দেয়। গোলটি শোধ করে আব্বাস। অনেকের মতে সেটা অফ্-সাইড গোল। রহিম ও নূরমহম্মদ [জুনিয়ার) পর পর দু' দুটো গোল দিলেও রেফারি গিলসন একটি হ্যাণ্ডবল এবং অন্যটি অফসাইড বলে গোল দেয় নি। খেলার শেষের দিকে ইষ্টইয়র্ক একটি পেনালটি পেতে ওসমান আশ্চর্য্যভাবে উইলিয়ামসনের বলটি রক্ষা করেন। সেদিন ভাল খেলেও মহমেডান জয়ী হতে পারল না। দ্বিতীয় দিনে রহমৎ গোল দিয়ে ইষ্টইয়র্কের সব আশা প্রায় ভেঙ্গে দিয়েছিল, খেলা ভাঙ্গবার মাত্র দু' মিনিট বাকি। হঠাৎ ওসমান বল পেয়ে গ্যালারি গেম খেলে বাহবা পাবার মুখে ছুটে এসে ব্রামওয়েল ওসমানকে চার্জ্জ করে' চোখের নিমিষে গোল দিয়ে সকলকে বিস্মিত করেন। তৃতীয় দিনের খেলায় কিন্তু মহমেডান দাঁড়াতে পারলে না। জয়ী হবার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ইষ্টইয়র্ক অতি সুন্দর খেলে' মহমেডানের সব গর্ব্ব ভেঙ্গে দিল। এবারও জুম্মাখাঁ অন্যায়ভাবে ব্রামওয়েলকে ফাউল করতে পেনালটিতে প্রথম গোল দেয়। দ্বিতীয় হাফে ব্রামওয়েল আবার একটি গোল দিয়ে মহমেডানের সব উৎসাহ ও চীৎকারকে দমিয়ে দিল। রহিম, রহমৎ, সাবু খারাপ খেলতে মহমেডানের আক্রমণ সব ব্যর্থ হচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত ইষ্টইয়র্ক ২-০ গোলে মহমেডানকে হারিয়ে আবার শীল্ড বিজয়ী হন। ১৯১১ সালে মোহনবাগান এই ইষ্ট-ইয়র্ককেই হারিয়ে সর্ব্বপ্রথম শীল্ডবিজয়ী হয়েছিল।

ছেলের গান

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

বাঙ্‌লা দেশের ছেলে
মোরা বাঙ্‌লা দেশের ছেলে
এই বাঙ্‌লা মায়ের শ্যামল কোলেই
বেড়াই হেসে খেলে
মোরা বাঙ্‌লা দেশের ছেলে।

ওরে কেউবা মাঠে লাঙ্গল চষি—
সব্‌জী নিয়ে হাটে বসি—
খাল বিলেতে মাছ ধরি কেউ—
মাছ ধরা জাল ফেলে
মোরা বাঙ্‌লা দেশের ছেলে।

এই বাঙ্‌লা মায়ের শ্যামল কোলে
সোনার ফসল ফলে
আর চাষীরা সব হাসিমুখেই
লাঙ্গল কাঁধে চলে—
পল্লীবধূ কল্‌সী কাঁখে—
লাজুক চোখে চাইতে থাকে
পরাণ-মাঝির পান্‌সী ভাসে—
কাজ্‌লা নদীর জলে
মোরা বাঙ্‌লা দেশের ছেলে
মোরা বাঙ্‌লা মায়ের ছেলে॥



রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাই বোন—

কাল পর্য্যন্ত ঘন মেঘে আকাশের মুখ অত্যন্ত ভার হয়েছিল আজ হঠাৎ এখানে কি মন্ত্রে তার অভিমান যেন কেটে গেছে। ঘন মেঘের ভার কোথায় উড়ে গিয়ে সকালের রোদে উজ্জ্বল এমন আশ্চর্য্য নীল আকাশ বেরিয়ে এসেছে যে তার দিকে চাইতে বুক কেঁপে ওঠে আনন্দে। আকাশের সে রূপের আভা পৃথিবীতেও লেগেছে, মাটির ভেতর থেকে খুশী যেন উথলে উঠছে কাঁচা সবুজ রঙে।

আকাশ পৃথিবীর এ চেহারা বেশীক্ষণ থাকবে না আমি জানি। এখনও ঠিক সময় হয়নি। দিগন্তের আড়ালে এখনি হয় ত ঘন মেঘ জমা হচ্ছে ক্ষণিক খুশীর এ উৎসব ভেঙে শেষ করে দিতে। তবু আভাষ ত আমরা পেয়েছি, শুনতে পেয়েছি আগমনীর সুর।

এ যে কিসের আভাষ তা তোমাদের নিশ্চয় বলতে হবে না। ছুটি-ভরা শরৎ যেন তার আনন্দ উৎসবের একটুখানি নমুনা আগে থাকতে পাঠিয়ে দিয়েছে। আসর জাঁকিয়ে এসে বসবার আগে এ যেন তার বিজ্ঞাপনের এক-সকাল-ভরা সোনালী রোদের হ্যাণ্ডবিল!

সে হ্যাণ্ডবিল দেখেই তোমরাও নিশ্চয় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছ দিন গুণছ তার আশায়। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ত ভাল নয়। একদিন রোদে পোড়া আকাশে যে মেঘের মিষ্টি ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে গেছল আজ তাইতেই অরুচি ধরে গেছে। বৃষ্টি আর বৃষ্টি, ভাপসা গুমোট আর ঝাপসা আলো আর ভাল লাগে না। কবে আবার আকাশ পৃথিবী হেসে উঠবে এই একঘেয়ে ধোয়া মোছার পাট শেষ হয়ে? কবে বাজবে ছুটির ঘণ্টা দিক দিগন্ত ভরে? পৃথিবীর দূর দূরান্তরের মত সময়ের দূর দূরান্তর তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাবার যদি কোন উড়ো জাহাজ থাকত!

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি তাহলে মোটেই ভাল হত না। ঠিক সময়টির এক মিনিট আগে আসে না বলেই ছুটির এত দাম, দীর্ঘ বর্ষা পার হয়ে পৌছোতে হয় বলেই শরৎ এত মধুর, কোন মতে জোর করে আগে ডেকে আন্‌লে তা নেহাৎ সস্তা হয়ে যেত। আসল কথা কোন কিছুর জন্যেই অধীর ভাবে ব্যাকুল না হতে পারলে গভীর ভাবে তা ভালো লাগে না। আনন্দের দর আকুলতা দিয়েই ঠিক হয়। ঠিক বোঝাতে পারলুম কি?

যাই হোক আসল ছুটির চেয়ে ছুটির কল্পনা কম মধুর নয় তা নিশ্চয় বুঝেছ!

—তোমাদের সম্পাদক মশাই।

উদীপিকা

গত মাসে আমাদের দেশে যে কয়েকজন মহাপুরুষকে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী সভা-সমিতিতে আমরা স্মরণ করেছিলাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লোকমান্য গঙ্গাধর তিলক, দেশপ্রিয় শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও স্যর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমরা প্রথম-ভাগ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনেছি। তিনি কেবল বিদ্যার মহাসাগরই ছিলেন না, দেশের নানা সামাজিক পরিবর্ত্তনে তিনি প্রথম আলোক দান করেছিলেন। বিদ্যাসাগর যেমন পূর্ব্ব ভারতের ব্রাহ্মণকুলের দীপক ছিলেন তেমনি পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মণ বংশের আর এক মহাপুরুষ—লোকমান্য তিলক সমস্ত ভারতের আকাশ উজ্জ্বল করেছিলেন। তিনি শুধু জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন না, অকুতোভয়ে দেশের সেবা ক'রে তিনি আমাদের কাছে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। শ্রীযতিন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বাংলার স্বনামধন্য নেতা ছিলেন, তাঁর স্বদেশপ্রীতি তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃত্ব বাংলা তথা ভারত চিরদিন মনে রাখবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হয়ে সমগ্র ভারতের তিনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়েছিলেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী বাংলার দুর্দ্দিনে নিজের আশ্চর্য্য বক্তৃতায় ও প্রেরণায় সে সময় বাঙ্গালীকে যা দিয়েছিলেন, বাংলা কোনদিন তা ভুলবে না। তাঁর বক্তৃতা যাঁরা শুনেছেন, তাঁকে যাঁরা দেখেছেন ও তাঁর পরিচয় সৌভাগ্য হয়েছিল, আজও তাঁর সে প্রচণ্ড গগনভেদী কণ্ঠস্বর, তাঁর আশ্চর্য্য ব্যক্তিত্ব, পৌরষত্ব ও প্রতিভা তাঁদের স্মরণীয় হয়ে আছে। এই কয়েকটি মহাপুরুষের বাণী শুধু আজ নয়, ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁদের আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁদের সকলকে স্মরণ করে আমরাও বরণীয় হই।

* * * *

বন্যা প্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষ তার শস্য সন্তানে আজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ। শুধু বাংলা নয় সেখানে ক্ষতি সর্ব্বাপেক্ষা বেশীই, বোম্বাই, আসাম, বেহার, পশ্চিম দেশগুলিও বন্যার জলে প্লাবিত ও আর্ত্ত হয়ে ক্রন্দন করছে। আজ বিরাট জলপ্লাবনে এই প্রাকৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে আমরা কতটুকু তাই মনে হয়! সহুরেবাসীরা হয়ত এই প্লাবনের ভীতিপ্রদ মারী উল্লাসের তাণ্ডব নৃত্য স্বচক্ষে দেখেননি। শত শত গ্রামবাসীরা এই জলপ্লাবনে তাদের স্ত্রীপুত্র সন্তান-সন্ততি শস্য সব হারিয়ে আজ কেবল ভগবানের করুণা কৃপা করছে। কিন্তু মানুষে কি কিছুই এর প্রতিকার করতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীই এবার যেন কার অভিশাপে আজ এ প্রাকৃতিক বিপ্লবে মরতে বসেছে! আমেরিকা, জাপান, ইউরোপ প্রভৃতি দেশগুলিও বন্যার ক্রূর তাণ্ডব নৃত্যে নিপীড়িত হচ্ছে। বিজ্ঞান কি বন্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে একান্তই অপারগ?

* * * *

অষ্ট্রেলিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের নিমন্ত্রণ পেয়ে এই সর্ব্বপ্রথম আই, এফ, এ দল অষ্ট্রেলিয়াতে খেলতে গিয়েছেন। তাঁরা খেলা সুরু করেছেন কিনা তার খবর এখনও আমরা জানি না। কয়েক বৎসর আগেও আই,

এফ, এ দল আফ্রিকায় সুন্দর ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। আমরা আশা করি এবারকার এই বিশেষ নির্ব্বাচিত ভারতীয় দলটি অষ্ট্রেলিয়াতে ভাল খেলে সুনাম অর্জ্জন করে দেশের সম্মান রাখবেন। ২০শে আগষ্ট থেকে পাঁচটী টেষ্টম্যাচ সুরু হবে। দুটি হবে সিড্‌নীতে, আর বাকি খেলাগুলি হবে ব্রিসবেণ, নিউকাসেল ও মেলবোর্ণে। নিম্নে আমরা নির্ব্বাচিত আই, এফ, এ খেলোয়াড়দের তালিকা দিলাম :—

গোল—কে, দত্ত; রোজারিও।

ব্যাক—পি, দাসগুপ্ত; ম্যাকগুয়ার; জুম্মা খাঁ।

হাফব্যাক—বি মুখার্জ্জী: বি, সেন; এ নন্দী; রেবেলো; প্রেমলাল।

ফরওয়ার্ড—নূর মহম্মদ (জুঃ); রহিম; লাম্পডেন; কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপ্টেন); এস চৌধুরী; জোসেফ; কে প্রসাদ।

*　　*　　*　　*

তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে বহু প্রাচীন কালের এক ভীতিপ্রদ নিষ্ঠুর প্রথা আজও বর্ম্মা-আসামে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রথাটি হচ্ছে—নরমুণ্ড শিকার (Head Hunting)। সম্প্রতি সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার একটি দল আসাম-বর্ম্মার সীমান্তে গিয়ে এই নরমুণ্ড শিকার স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানে এই দলটি নাগা পাহাড়ে আসাম-বর্ম্মার সীমান্তে পরিভ্রমণ করছিলেন। এই নাগা পাহাড় বিখ্যাত জঙ্গলী জায়গা এবং এর অনেক অংশের আজ পর্য্যন্ত কোন ম্যাপই তৈরী হয়নি। নাগারা আজও তাদের অপ্রতীদ্বন্দ্বী রাজত্বে তাদের প্রাচীন প্রথা অনাহত রেখে সভ্যতার আড়ালে নির্ব্বিঘ্নে বাস করছে। একটা ছোট পাহাড়ের ওপর অলক্ষ্যে থেকে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার দলটি নীচে নামফুক উপত্যকায় (Namphuk valley) একটি নরমুণ্ড-শিকার অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। শোনা যায় নাগারা সবশুদ্ধ ৩৭টি নরমুণ্ড শিকার করেছিল !

*　　*　　*　　*

আর একটি আশ্চর্য্য সংবাদ—গত ৩১এ জুলাই সিন্ধু দেশ থেকে আমরা পেয়েছি। সাক্কারে (লাহোরের নিকটবর্ত্তী) মাঙ্গলী নামে একটি চাকরাণী কয়েকদিন পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখল যে আকাশ থেকে মৎস্য-বৃষ্টি হচ্ছে! পরে যখন একদিন মাঙ্গলী সে প্রাচীন সহরে তার ঘরের দাওয়ায় বসে বৃষ্টিপাত উপভোগ করছিল হঠাৎ সে দেখতে পায় ঝুরঝুর করে জলবৃষ্টির সঙ্গে মাছ-বৃষ্টি হচ্ছে! কিন্তু শুধু মাঙ্গলী নয়, একটা বেশ লোকের ভীড় এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল। গোটা কুড়ি মাছ নাকি সংগ্রহ করাও হয়েছে। সহরে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দুটো মাছ নাকি রাখা আছে। তোমরা লাহোর বা ঐ অঞ্চলে যারা থাকো মাছগুলি দেখে আসতে পারো। মাঙ্গলী ঝি নাকি ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেছিল যে সে প্রার্থনা করে যে, তাঁর স্বপ্ন যেন সত্য হয়। স্বপ্ন সত্য হওয়া তো একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার—তার ওপর এই মাছ-বৃষ্টির স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়া বাস্তবিক কি অদ্ভুত! মাছ-বৃষ্টি হওয়ার কোন প্রাকৃতিক কারণ আছে কি না তা আমরা ভবিষ্যতে তোমাদের বলবার চেষ্টা করব।



শ্রীইন্দিরা দেবী

আমার স্নেহের ছোট বোনেরা !

তোমাদের কাছে থেকে আমি অনেক চিঠি পেয়েছি। তার মধ্যে নীলিমা চক্রবর্ত্তী, গীতা চ্যাটার্জ্জি আনোয়ারা বেগম—এই তিনজনের কথার চিঠির উত্তর দিচ্ছি। গীতা, তুমি রান্না এবং সেলাই সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ আর চামড়ার ব্যাগ, আনোয়ারা আর নীলিমা ও সেলাই, আবার ও বাড়ী থেকে খবর এসেছে তোমাদের দিদিভাই জানিয়েছেন—তোমাদের কে একটি বোন হাইড্রোপ্যাথী সম্বন্ধে জানাতে—সবগুলো একত্রে জানান সম্ভব নয় তাই আমি এ কয়টি জিনিস একটী একটী করে আগামী বার থেকে তোমাদের জানাবো।

এ জগতের প্রতি জীব নিরন্তর বেচে থাকবার চেষ্টা করে. এজন্য তকে সংগ্রাম করতে হয়—একে আমরা 'Struggle for existence' বলি! এই বেঁচে থাকবার ভিতর অদম্য চেষ্টার অনুপ্রেরণা দেয় আমাদের জীবনীশক্তি কাজেই এ জীবনীশক্তিটুকুর গতিকে অব্যহত রাখা আমাদের উচিত, জীবনীশক্তিকে অটুট রাখবার চেষ্টা এ জগতে সব প্রাণী ক'রে থাকে—প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম আইন কানুনগুলো নিজেদের জীবনে সম্পূর্ণ খাটিয়ে নেয় অথচ মানুষই হলো একমাত্র যেন সৃষ্টি ছাড়া প্রাণী—প্রকৃতির নিয়মগুলোর ওপর যেমন দার্শনিক ঔদাস্য প্রদান ক'রে থাকে—ফলে হয় কি—জীবনীশক্তিটুকু অপহরণ করার যে নিরন্তর গোপন ষড়যন্ত্র চলছে মানুষ ইচ্ছা করেই সে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে থাকে—ফল যা হয় বুঝতেই পাচ্ছ—জীবনী শক্তি কমে আসে—আমাদের বাঁচা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না।

গতবারে যা বলেছিলাম আশাকরি তা তোমাদের মনে আছে—শরীরকে সুস্থ ও কর্ম্মঠ রাখবার জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন কিন্তু মেয়েরা কি ব্যায়াম করবে এ বিষয়ে যে মতভেদ আছে সে কথা তোমাদের আগেই জানিয়েছি—এখন কথা হচ্ছে আমরা কি করবো? মেয়েরা গৃহকাজে নিযুক্ত থাকে বলে তাদের ব্যায়াম বা অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন নেই একথা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নয়। দেহকে কমনীয় ও সুগঠিত করার জন্য মেয়েদেরও ব্যায়াম বা অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন আছে—সাঁতারটী সব চেয়ে ভাল কিন্তু এতে যোগ দেওয়া সব সময় সম্ভবপর হয় না। আমরা যাই করিনা কেন পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়ামে আমাদের শরীরে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়—খুব বেশী দিনের কথা নয়—মেয়েদের ব্যায়াম বা খেলা ধুলায় যোগ দেওয়া ছিল সব রীতির বাহিরে—আস্তে আস্তে এ জড় নিয়মটুকুর রূপ বদলাচ্ছে—তোমরা জানো অনেক বাঙ্গালী মেয়ে খেলাধুলায়, দৌড়ে, সাঁতারে কেমন নাম করেছে। স্কিপিং মেয়েদের খুব উপযোগী; লাঠি খেলা অল্প বিস্তর জানা ভাল।



পরিচালিকা—দিদিভাই

আমার স্নেহের রংমশাল দল'এর ভাই বোনেরা !

এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে নদী, সে নদীর পারে প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। নদী আর গাছ, কত অন্তরঙ্গতা দু'জনায়। নেচে নেচে চলে নদী, গাছের বুকে লাগে কাঁপন—ঝির ঝির ক'রে সে কাঁপে আর কাঁপে এক একটা করে পাতা খসিয়ে দেয়—মুহূর্ত্তে সে পাতা যায় অদৃশ্য হয়ে। পড়ছে নদীর জলে কেউ জানে না, কত যুগ ধরে তাও কেউ জানে না। গাছ পাতা ঝরিয়ে দেয় নদীর বুকে, নদী আগ্রহে তাকে স্থান দেয় আপন বুকে। এমনি করেই দিন যায়·········

আজও গাছের একটা পাতা খসে পড়লো—এলো ভাদ্র মাস। ভরা ভাদর, নদীর জলে এসেছে জোয়ার, সমুদ্রের আহ্বান সে কি পেয়েছে? আকাশও কি তার সাড়া পেয়েছে—এত আনন্দ উজ্জ্বল তার মুখ—এত নীল! অরণ্যে জেগেছে মর্ম্মর ধ্বনি। সমস্ত মলিনতা দূর করে এলো ভাদ্র! নিয়ে এলো তোমাদের জন্য স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্যের ও আনন্দের মূক বাণী। ভরা ভাদরের দিকে তাকিয়ে একথাই আমার বার বার মনে পড়ে—আচ্ছা এখন এসো তোমাদের চিঠির বাক্স খুলি—

শৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (ঢাকা) গ্রাঃ ৩৫৭

তোমার সুন্দর চিঠিটা পেয়েছি। হাতের লেখাটা চমৎকার তোমার। লেখনী বন্ধু নিজে বেছে না নিলে দিদিভাইকে বিপদে ফেলা হয় যে ভাই!

কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় (জামালপুর) গ্রাঃ ৬৭৮

তুমি ভাই রাগ করে যে চিঠি দিয়েছ তা পেয়েছি। ব্যাজ পাঠাতে আমাদের কেন দেরী হচ্ছিল তাতো পূর্ব্বে তোমাদের জানিয়েছি। একলা তোমার তো দেরী হয়নি ভাই, তোমার সব ভাই বোনদেরই এই অবস্থা। রাগটা কিন্তু বৃথায় গেলো—কারণ এ চিঠি পড়বার আগে ব্যাজটা পরে বসে থাকবে। দার্জ্জিলিংএর রবীনের ঠিকানা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কমলা দাস (শিলং) গ্রাঃ ৫৪১

তোমরা সিলেট থেকে শিলংএ গেছো এবং ও জায়গাটা তোমাদের খুব ভাল লাগছে—চারিদিকের দৃশ্যগুলিও চমৎকার জেনে—তোমার মত আমারও খুব ভাল লাগলো ভাই। তোমার বাড়ী যাওয়ার নিমন্ত্রণ আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। হ্যাঁ, কুপনটা ভর্ত্তি করে পাঠিও আর ব্যাজের টাকা তোমার যে রকম ভাবে সুবিধা হয় পাঠাতে পারো। আমিও আশাকরি আগামী বৎসর প্রীতি উৎসবে তোমাদের সব কচি মুখগুলি আমরা দেখতে পাবো।

রাজিয়া খাতুন (ময়মনসিংহ) গ্রাঃ ৮৬০

মান্নু! তোমার চিঠিটা আসতে ভাই বড্ড দেরী হয়ে গেছে তাই ধাঁধাঁর উত্তর দাতাদের নামের লিষ্টএ তোমার নাম যায়নি। তুমি লিখেছ "মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়ে দেশ বিদেশের ছেলেমেয়েদের যোগসূত্র স্থাপন করা অনেকদিন থেকে প্রচলিত। তবে বাংলা মাসিকের মধ্যে রংমশালেই বোধহয় প্রথম এই দল বাঁধার চেষ্টা এবং সেজন্য তোমার উদ্যমকে প্রশংসা করি। একটা পুরাণো বিলিতি মাসিকে দেখে ছিলুম ১৯১৬ সালের……তাতেও এই দল বাঁধার চেষ্টা চলেছে দেখলাম পৃথিবীর প্রায় সব দেশের ছেলে মেয়েদের নিয়ে—কে যে কবে এই সুন্দর পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেছেন জানতে ইচ্ছা হয়।…আমাদের বাংলা পত্রিকা রংমশালে ওদের মত ব্যাজের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে দেখে আনন্দ হলো।" রাজিয়া, আমাদের সাফল্যের গৌরব অনুভবের কথা আমরা ভাবিনি—তোমাদের ছোট ছোট সুন্দর মুখগুলি আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—এই আমাদের তৃপ্তি ও পরম লাভ। হ্যাঁ, কুপনটা পাঠাও আর ব্যাজের টাকাও ঐ সঙ্গে। টিকিট ঘরের চিঠি তুমি পরিচালক মশাইকে দিতে পারো। হ্যাঁ, প্রীতি উৎসবে তুমি থাকলে আমায় সাহায্য করতে লিখেছ, সত্যি আমি ভারী খুসী হতাম—আশাকরি আসছে বছর তোমার মধুর সাহচর্য্য থেকে বঞ্চিত হবো না।

পরিমল সরকার (Haroa)

কাম্নু! প্রথমেই ভুল, গ্রাহক নম্বর কি আমার মনে থাকে? প্রতি চিঠিতে তোমরা দেবে—বুঝেছ? তোমার লেখনী বন্ধু যাদের চেয়েছিলে—পাঠিয়েছি। রাগ অভিমান একটু না কমালে 'দিদিভাই'এর প্রাণ যে যায়।

সুরমা ও সমর (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯২১

ভাইটী আর বোনটী, তোমরা দেখি ভারী দুষ্টু হয়ে উঠলে! নিজেরা খবর দেবে না, মামার বাড়ীর আদর ভোগ করবে আর উল্টো চাপ আমায়? বেশ তো মজা! আচ্ছা দাঁড়াও মা'কে বলে দুষ্টুমী ভাঙ্গচি। কে তোমার লেখনী বন্ধু আমার নাম তো মনে নেই ভাই, কেন সে বুঝি চিঠি লিখছে না? বেশ তো তুমিই লেখোনা আগে?

অঞ্জলি সেনগুপ্তা (ভোজেশ্বর) গ্রাঃ ৫৯২

তোমার ব্যাজ সম্বন্ধে আগে আমি জানিয়েছি। যে ব্যাজ তৈরী করান হয়েছিল ভাল হয়নি এবং শীঘ্র নষ্ট হয়ে যেতো বলে—ভাল করে ব্যাজ করাতে দেরী হয়ে গেলো, তোমরা অনেকে অনুযোগ করেছ—কেউ আবার রাগ করেছ ভাই—কিন্তু এবার আর তা থাকবে না। সেলাইএর প্যাটার্ণ পাঠাতে 'ভাবী গৃহিণীর বৈঠকে'র পরিচালিকাকে বলায়—তিনি বল্লেন পাঠিয়েছেন, আশাকরি পেয়েছ। আর লেখনী বন্ধু কাকে চাই জানালে ঠিকানা পাঠাবো ভাই।

সুজাতা রক্ষিত (নাইনিতাল)

তোমার ২ পাতা চিঠি পেয়েছি ভাই। টি, বি সম্বন্ধে লিখো, যখন পাঠাবে সমস্তটা পাঠিও না হলে আমাদের অসুবিধা হবে। আমি এবং আমার সব ভাইবোনেরা প্রার্থনা করি তুমি সুস্থ হয়ে শীঘ্র ফিরে এসো।

অজয়কুমার ঘোষ (এলাহাবাদ) গ্রাঃ ৪৫৭

তোমার চিঠি অনেকদিন পরে পেয়ে খুব ভালো লাগলো ভাই, আমি ভাবছিলাম আমার ভাই বোনেরা সব বন্ধু পেয়ে বুঝি দিদিভাইকে ভুলে যায়। তোমার 'ধন্যবাদ' তুমি ফেরৎ নাও ভাই, আমি ওর মোটেই পক্ষপাতী নই, দিদিভাইকে মনে রেখো সেই আমার যথেষ্ট পুরষ্কার। তোমাদের সুন্দর সুন্দর ছোট মুখগুলি আনন্দে ভরে ওঠে আমি কল্পনায় দেখতে পাই—সেও আমার মস্ত পুরষ্কার। এসেছিলে যদি দেখা করলে না কেন ভাই? ফোটো ওঠে না বলে—সত্যি একটা চেহারা নিশ্চয় আছে। সব সময় ছোট চিঠি দিয়ে একবার বড় দিলে—রাগ করবো কেন ভাই? ঠাকুরমা'রকি খবর?

বীণা ও রমা দত্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ৩৮৫

আমাকে যে 'আপনি' বলতে নেই তা বুঝি জানো না বোনেরা? দিদিভাইকে কি 'আপনি' বলে? অনেকদিন পরে হলেও আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাদের 'দল'এ ডেকে নিচ্ছি ভাই। রমা তোমার মোটে তের বছর বয়স আর বীণার বারো—তা না হয় জানলুম, কিন্তু ভাই নাম বলো আমি লেখনী বন্ধু পাঠাবো, কেমন?

রথীশচন্দ্র ঘোষ (রাজসাহী) গ্রাঃ ৩৩৬

তুমি এতদিন বাদে এলেই বা—সবাই একসঙ্গে আসতে হবে---তার কি মানে? দেরীতে এলেও তোমরা সবাই আমার সমান ভাই। তোমার বয়স তেরো, রাজসাহী স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়---সবই ভাল কিন্তু একটা কথায় বড় মুস্কিল বাধিয়েছ---সেটা দিদিভায়ের নাম জিজ্ঞাসা করে। দিদিভাই-এর নাম 'দিদিভাই'।

বেলা দাশগুপ্তা (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৫২

বিবি! তোমার এ চিঠিতে জবাব যা দেব---পূর্ব্বেই তা জানিয়েছি। নেপাল সম্বন্ধে ছোট করে লিখে পাঠিও। তোমার কোনও দোষ তো পেলাম না তা ক্ষমা করবো কি ভাই?

শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী (শ্রীরামপুর) গ্রাঃ ১০৯।

তুমি রংমশালের ছাপা সম্বন্ধে যা লিখেছ সে কথা আমি পরিচালক মহাশয়কে বলবো---এবং তাঁরা যা বলেন পরে জানাবো। লেখনী বন্ধু নিশ্চয় পাবে ভাই, নাম জানিও পাঠিয়ে দেবো।

জেবউন্নিসা (বগুড়া)

তোমার চমৎকার মিষ্টি চিঠি পেয়েছি বোনটী, তুমি তো আমাদের নিয়ম জানো ভাই---গ্রাহক বা গ্রাহিকা না হলে চিঠির উত্তর দেওয়া হয় না, তোমার দিদি ডাক আমি অগ্রাহ্য করতে পারিনি তাই লিখছি---কিন্তু দিদু জানোতো সব ? বোশেখের ঢের দেরী এখন ভাই---তার আগে যদি সম্ভব হয় বা ভাল বোঝ---তা হলে আমি যাতে চিঠির উত্তর দিতে পারি আমার সে উপায় করো। তোমার হাতের লেখা খুব চৎকার—মোটেই বিশ্রী নয়। বোন হয়ে যদি পড়—তা হলে সত্যিই তো সব দেখবো—যা দেখাবে বলেছ। মিষ্টি আমি মোটেই নই বোন—তোমরা ভালবাস বলে তাই ভাল লাগে। তোমার ছবি'র ভিতর রংমশালকে ভালবাস এ ছবিটা জেনে খুব খুসী হয়েছি !

শিবানী সরকার (কলিকাতা) গ্রাঃ ৪০৮

এটা তোমায় আমার নিজে থেকে লেখা চিঠি—তুমি মায়া সেনএর ঠিকানা চেয়েছিলে---কিন্তু তার ঠিকানা আমার কাছে নেই, সে নিজে গ্রাহিকা নয় বোধ হয়---সে যদি আলাপ করতে চায়---যেন আমায় চিঠি লেখে। আশাকরি তোমার খবর ভালো।

আনোয়ারা বেগম (বারাকপুর) গ্রাঃ ১১০৯

আন্নু বোনটী ! তোমার দু'খানা চিঠিই আমি পেয়েছি। প্রথম চিঠিটায় তুমি লিখেছ---"কিন্তু দুঃখের বিষয় আমায় যে লেখনী বন্ধু (উমারাণী রায়) দিয়েছিলে সে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় না---তাই সে আমার চিঠির উত্তর দিলে না......সে বন্ধুটী আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় না বোধহয় আমি মুসলমান বলে। তাই তোমায় লিখছি আমায় রাজিয়া বোনটীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও, আর অন্যান্য হিন্দু মেয়েদের যাদের জাতি ভেদ নাই ও আমার সঙ্গে আলাপ করতে রাজী আছে তাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিও। উমারাণীর চিঠি না পেয়ে আমি খুব দুঃখিত।......তুমিও যদি শীঘ্র উত্তর না দাও বুঝবো তোমারও ঐ বোনটীর মত জাতি ভেদ আছে এবং মুসলমানদের দিদিভাই তুমি হও না।" আন্নু ! তোমার চিঠি পড়ে ও অভিযোগ শুনে দুঃখিত হলাম। উমারাণী বোনটী তোমায় চিঠি দেয়নি বলে তুমি যে ধারণা করে নিয়েছ সেটা তার এবং আমার উপর অবিচার করা হচ্ছে। তুমি জানো আমাদের 'দল'এর উদ্দেশ্য কি ? ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের কথা এখানে উঠে না, তোমরা ভাইবোনের দল, এর জাতি, ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের ছায়া তোমাদের ওপর পড়বে না---আর আমি হলাম তোমাদের সকলেরই দিদিভাই---এই তো আমাদের সব চেয়ে বড় পরিচয় নয় কি ? অভিমান করে অবুঝ হয়ো না ভাই, অন্যান্য লেখনী বন্ধুদের নাম শীঘ্র পাঠাচ্ছি।

রতন (কলিকাতা) গ্রাঃ ৬৯৬

তোমার চিঠি পেয়েছি। ভাই বোনে লেখনী বন্ধু হওয়া নিয়ে আমাদের মতামত আগেই জেনেছ--- (জ্যৈষ্ঠ মাসে) কাজেই এখানে তার আর পুনরুল্লেখ করলাম না, তবে পরে ও সম্বন্ধে পরিচালক মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করবো। হ্যাঁ, তোমার ধারণাই ঠিক, অলক ঘোষের ঠিকানা পাঠাচ্ছি শীঘ্র। শুভেন্দু তোমায় কোনও উত্তর দেয়নি জেনে দুঃখিত। অলক ঘোষ লেখনী বন্ধু হবে, এবার কোনও ক্ষোভ থাকবে না।

উমারাণী রায় (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮৮১

উমা বোন! আন্নকে চিঠি দাও নি কেন ভাই? দেখতো আন্ন কি রকম দুঃখ আর অভিমান করে চিঠি লিখেছে। কি খবর তোমার? আমাকেও বহুদিন চিঠি দাও নি কেন বলতো? সবাইকে ভুলে গেলে?

শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (পাটনা) গ্রাঃ ৯৪১

তোমারই বা কী খবর? একেবারে চুপচাপ, রতন তো তোমায় চিঠি লিখে উত্তর না পেয়ে ক্ষেপতে সুরু করেছে, তাড়াতাড়ি উত্তর দাও অভিমান করো না। অরুণ ভাই-এর কি খবর? দল বেঁধে অভিমান নাকি?

মায়া সেন (কলিকাতা)

যে দু'টী আমেরিকান মেয়ের ঠিকানা দিয়েছিলে---সেটী আমি হারিয়েছি! যদি সুবিধা হয়, ঠিকানা দু'টী আবার পাঠিও। আশা করি খবর ভালো।

রাগ অভিমান আর বেশী করে কেউ করোনা ভাই, লক্ষ্মী হয়ে থাক সব, কেমন?

সবাই আমার আশীষ, স্নেহ ও ভালবাসা গ্রহণ করো।

ইতি—

শুভার্থিনী—

দিদিভাই

ভ্রম সংশোধন

এ মাসের প্রকাশিত "সম্বর-হ্রদে" ভ্রমণ কাহিনীটির লেখকের নাম ভ্রম-ক্রমে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন ছাপা হইয়াছিল। লেখকের নাম শ্রীশিবপ্রসাদ সেন।



'দূরের ডাক'

সুধাতোষ বসু

(আষাঢ় মাসের প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কারপ্রাপ্ত ভ্রমণ কাহিনী রচনা)

জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি। কলকাতার অসহ্য গরমে দীর্ঘ দিনগুলি ক্রমশঃ বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। এমনি সময় চিঠি এল ভাগ্নের কাছ থেকে :

খোকামামা, চলে এস ভাই। গরম কমে এসেছে। সকালবেলা সোনের বালির উপর ছোটাছুটী, দুপুরে গল্প, সন্ধ্যায় এ্যানিকাটের ঠাণ্ডা হাওয়া,—এরা কি তোমার মন টানতে পারবে না?

উৎসাহে সেই দিনই অরুণকে চিঠি লিখে দিয়ে তার পরের দিন ধরলাম বম্বে মেল। ষ্টেশনের আলোকমালা পিছনে ফেলে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে ট্রেণ ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সে দিন কি তিথি ছিল জানি না, কিন্তু বাহিরে ছিল ঘোর অন্ধকার। জানালায় মুখ রেখে বসেছিলাম। মাঝে মাঝে কোন গ্রামের ছোট আলো চোখে পড়ে। তারই স্তিমিত আলোয় দেখতে পাওয়া যায় অস্পষ্ট ছোট ছোট কুটীর, আর চারপাশের বড় বড় ঝাপসা গাছ। ট্রেণ ছুটে চলে,—পেছনে পড়ে থাকে এমনি কত ছোট গ্রাম, কত মাঠ, কত অজানা নদী-প্রান্তর। ট্রেণ নিমিষে পার হয়ে যায়। গাড়ীর ঝকমক আওয়াজ, মাঝে মাঝে বাঁশীর তীক্ষ্ণ শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল ভোর হয়ে এসেছে। বাইরে থেকে হাঁক শুনলাম—Sone-East-Bank। আমার নামবার সময় হয়ে এসেছে; বিছানাটা গুটিয়ে ঠিক করে রাখলাম। গাড়ীর গতি একটু কমাতে বাইরে চেয়ে দেখি সোন ব্রিজ এসে

পড়েছে। সোন এখানে অনেকখানি চওড়া। বাইরের অন্ধকার তখন ফিকে হ'য়ে এসেছে। দেখলাম সোন শুকিয়ে গেছে একেবারে, শুধু মাঝে মাছে জলের দু'একটী শীর্ণ ধারা চক চক করছে,—যেন শুধু তার নদী নামটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই।

ডিহরী-অন-সোন। গাড়ী থামিতেই সুটকেশ আর বিছানাটা নিয়ে নেবে পড়লাম। প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে ছিল অরুণ, হাসিমুখে এগিয়ে এল। ষ্টেশনের উপরেই বাড়ী। একটু পরেই যখন সেখানে পৌছলাম, পূর্ব্বদিকে লালের আভাস জেগেছে মাত্র।

*　　*　　*　　*

এর পরের যে দিনগুলো তার ভিতর বৈচিত্র্য নেই কিছু। ভোরে উঠতাম। সোন ওখান থেকে অনেক দূরে, ঘুমচোখে পথ পার হ'য়ে যেতাম। সোনের বালুর উপর দুজনের সে ছুটোছুটীর কথা কোনদিন ভুলব না বোধ হয়। কলকাতার সাজানো পার্কের চেয়ে সেই ধূ-ধূ বালির সোণার চর যেন অনেক সুন্দর মনে হত। ফিরতে ফিরতে রোজ হয়ে যেত দিন। পথে তখন লোক চলাচল সুরু হ'য়েছে, দু'একটা ছোট ছোট দোকান সবে খুলছে। মিলের শ্রমিকরা দল বেঁধে চলেছে কাজে, আর এক দল আসছে ফিরে।

সন্ধ্যায় যেতাম এ্যানিকাটে। একপাশে বড় বড় গাছের সারি আর একপাশে নদী,—মাঝখানে আমরা বসে থাকতাম। মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়া আমাদের সব ভুলিয়ে দিত, জোৎস্না-রাতে মাঠের পথে বাড়ী ফিরতাম। দু'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, আর তার বুকের উপর দিয়ে জনহীন পায়ে চলা পথ। পথের সে চাঁদের আলো ফেলে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করত না।

বৈচিত্র্য এখানে খুব ছিল না সত্য। কিন্তু এমনি করেই কেটে গেল অনেকদিন, বিরক্তি আসেনি একদিনও।

একদিন বিকালবেলা এমনি এ্যানিকাটে বসেছিলাম। অরুণ বল্লেঃ খোকামামা চল, মন্দিরে বেড়িয়ে আসি।

বল্লাম, মন্দির! মন্দির কোথায়?

ঐযে, একটু এগিয়ে, চল না?

বল্লাম, চল।

লালখোয়ার রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই মন্দির, ছোট্ট মন্দির—শিবের। চারদিকে পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। পাঁচীল অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। মন্দিরে যখন ঢুকলাম তখন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ, কেমন একটা শান্ত, সমাহিত ভাব। মাঝ-

খানে এক অশথ, বয়স হ'য়েছে তার, চারিদিকে অজস্র ডালপালা মেলে সমস্ত চত্বরটাকে ঢেকে আছে। মোটা গুঁড়ি,—গায়ে মাখান রয়েচে সিঁদুর। গাছের তলা দিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। মন্দিরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন অনেকদিনের অনেক পুরান কাহিনী মাখান রয়েছে। ভারী ভাল লাগল জায়গাটী, মন্দির আর ঠাকুর। আলোর প্রাচুর্য্য নেই, উপচারের বাহুল্য নেই, নেই অগণিত ভক্তজনের সমারোহ—তবু ভাল লাগল এই ভাঙ্গা ছোট মন্দির।

বুড়ো অশথ গাছের ঘন ডালপালার মধ্য দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেছে শিরশির করে। চাঁদ কখন উঠেছে, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূল সে আলোকে ঝকমক করছে। সঙ্গে একজন ওদেশী লোক ছিল, বল্লে, ও ত্রিশূলটা সোনার। একবার একটা চোর উঠেছিল ওটা চুরী করতে, কিন্তু 'শিবাজী' তাকে ঐ ত্রিশূলে গেঁথে মেরে ফেলেছেন।

হয়তো সত্যি নয়। হয়তো ত্রিশূলটা সোনার নয়, হয়তো কোন চোর কোন দিন উঠে নি ওটা আনতে, কিন্তু তবু অবিশ্বাস করতে পারি না। স্থানটার এমনি গাম্ভীর্য্য, এমনি মাধুর্য্য, যে নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথাটাও মেনে নিতে হয়। প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। ত্রিশূলটা তেমনি চকচক করছে, গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া বইচে সনসন ক'রে, মন্দিরের ভিতর থেকে কে গম্ভীর কণ্ঠে পাঠ করচেন স্তোত্র।

সেদিন ভোর থেকেই অঝর-ঝরে বৃষ্টি সুরু হ'য়েছিল। আগেও ক'দিন বৃষ্টি হ'য়েছিল। বেলা তখন চারটে, এমনি সময় মেঘ কেটে গিয়ে বৃষ্টি থেমে গেল। গাঢ় নীল আকাশের বুকে হালকা তুলোর মত শাদা মেঘ এক অপরূপ শোভা জাগিয়ে তুলন। ক'দিন ধ'রে সাসারমে tombএ যাবার কথা হচ্ছিল। আকাশ পরিষ্কার হ'তেই ঠিক করা হ'ল আজই tombএ যাওয়া হ'ক। Grand Trunk Road ধ'রে আমাদের গাড়ী ছুটে চলল বেগে। দু'পাশে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নতুন ঘাসে সবুজ হ'য়ে গেছে। পথের ধারে সদ্যস্নাত গাছের সারির উপর মিঠে রোদ প'ড়ে একটা স্নিগ্ধ শোভা জেগেছে। ওপাশে রেললাইনের মাথার উপর আকাশে সাতরঙা রামধনু, আর এপাশে ধূসর কুয়াশার মধ্যে দূরের আবছা পাহাড়।

সাসারাম দূরে নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌছে গেলাম। Tombএর কথা বলতে ভুলে গেছি ; ভারতসম্রাট সেরশা'র নাম শুনেছ ? এই সৌধ তিনি তৈরী করিয়ে যান, তাঁর নিজের কবরের জন্য। গাড়ী থেকে নেমেই প্রথমে চোখে পড়ে প্রকাণ্ড এক দীঘি। সেই দীঘির মাঝে রয়েছে সেরশা'র সমাধি-মন্দির। তীরের উপর একটী ছোট ঘর রয়েছে। প্রথমেই রয়েছে সেরশা'র সমাধি। আশেপাশে আরও অনেকগুলি কবর রয়েছে—সেরশা'র

আত্মীয়-জনের। বড় বড় পাথরের তৈরী, কোথাও আড়ম্বরের বাহুল্য নেই, বিচিত্র কারু-কার্য্যের কলকৌশল নেই, অথচ কি সুন্দরই না দেখায় এই স্মৃতি-সৌধ!

সমস্ত সহর ঘুরে যখন বাড়ী পৌছলাম তখন আটটা বেজে গেছে।

* * * *

ছুটী ফুরিয়ে এসেছিল। কাজেই একদিন যাত্রা করতে হ'ল। আবার সোনের উপর দিয়ে গাড়ী ছুটল। কিন্তু তিনসপ্তাহ আগে যে সোন দেখেছিলাম শুক্‌নো বালির চর, আজ সেই সোনের জল দু'কূল কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে প্রবল উচ্ছ্বাসে। আবার এল সেই সব ছোটবড় ষ্টেশন, ছোট ছোট গ্রাম, নদী, খাল, সেই পাহাড়, টানেল। কিন্তু কুড়ি দিনে অনেক পরিবর্ত্তন এসে গেছে। যাবার দিন যে মাঠ দেখেছিলাম শুক্‌নো, আজ সে সব ভরে গেছে সবুজ শোভায়।

বিহারের রুক্ষ সৌন্দর্য্য কখন পার হ'য়ে গিয়ে এসে পড়লাম বাংলার শ্যামল সৌন্দর্য্যের ভিতর। বাঁশের ঝাড়, তালের সারি, গরুর পাল, রাঙামাটীর মেঠো পথ, সবুজ ধানের ক্ষেত, ছোট পুকুর, গোবর নিকানো ছোট ছোট মাটীর কুটীর,—চোখের সুমুখ দিয়ে পলকে পার হয়ে যায়।

হাওড়ায় পৌঁছে গেলাম। বিচিত্র কোলাহলের ভিতর দিয়ে প্লাটফর্ম্মের বাহিরে এলাম। ফেরিওয়ালার বিচিত্র চীৎকার, বাসের ঘর্ঘর, মানুষের অবিশ্রান্ত কোলাহল, কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল।

কিন্তু সবকে ছাপিয়ে মনে ভেসে উঠছিল একটী শান্ত, সরল পল্লীছবি,—সূর্য্য পশ্চিমে নেবে গেছে, পশারীরা ঝুড়ি মাথায় ফিরে আসছে গ্রাম্য পথ দিয়ে, মিলের শ্রমিকরা ফিরছে দলে দলে, কৃষক তখনও ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত, বেহারী মেয়েরা কাঁচা ইটের বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে পাঁজা সাজাচ্ছে, তাদের গলায় মোটা হাঁসুলি, হাতের ভারী বালার ঠুনঠুন্ শব্দ—।

'ডিব্রুগড়ের বন্যা'

আমার রংমশালের প্রিয় ভাই বোনেরা—

ডিব্রুগড়ের নাম তোমরা নিশ্চয় ভূগোলে পড়েছ। এটী হল পাহাড়ের বেড়া দিয়ে ঘেরা আসামের প্রান্ত দেশে অবস্থিত একটা ছোট সহর। এর পাস দিয়ে ভীম বেগে ছুটে চলেছে ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়ে নদ বাধা কাকে বলে জানে না, সামনে যা পায় পাসে যা পায়, সব কিছু চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

জুলাইর মাঝামাঝি মেঘের গুরু গুরু রব শুনতে পেলাম—আকাশ দিনের পর দিন মেঘে ঢাকা, মেঘেদের নড়বার চিহ্ন নেই—ঠিক যেন কুটুম্বরা বিয়ে বাড়ীতে ভোজ খেতে এসেছে। তারপরই একটু একটু করে নদীর জল বাড়া সুরু হল। ১৬ই জুলাই (শনিবার) থেকে নদী এত বৃদ্ধি পেল যে সহরের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিক থেকে ভয়ার্ত্ত রব শোনা গেল। রাতটা কোন মতে কাটিয়ে ১৭ই জুলাই (রবিবার) ভোরে উঠে দেখলাম নদীর নিকটবর্ত্তী সমস্ত রাস্তাই প্রায় জলে ডুবে গিয়েছে। যারা নদীর ধারে ছিল তারা আগেই রাতারাতি অন্যত্র চলে গিয়েছে।

একটু পরেই রাস্তায় বড় বড় নৌকা চলা সুরু হল। শীঘ্রই সহরেই প্রায় যান চলাচল বন্ধ হল। বিপন্নের উদ্ধারের জন্য পুলিশের লোক এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকের দল চারিদিকে ছুটাছুটী সুরু করলো। ছেলেদের মধ্যে যারা একটু বড় তারা নৌকা করে খাবার নিয়ে বিপন্নের দ্বারে দ্বারে পৌছে দিল। মানুষের চেয়ে গরু বাছুরের কষ্ট সব চেয়ে বেশী হয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় দেখা গেল কত ছোট ছোট বাছুর মরে পড়ে রয়েছে! আর কত গরু কত মহিষ নদী দিয়ে ভেসে যেতে দেখলাম। ব্রহ্মপুত্রের প্রলয় গর্জ্জনে এই সব মূক প্রাণীর ক্রন্দন রব মিলিত হয়ে যে অশ্রুতপূর্ব্ব করুণ চীৎকার সে সময় উত্থিত হয়েছিল তাতে হৃদয়ের সমস্ত অর্ঘ নিবেদন করে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছিলাম—

হে রুদ্র! তোমার প্রলয় রূপ সংবরণ কর আর যে দেখতে পারি না। ইতি

ধীরেন্দ্র ঘোষ (ডিব্রুগড়) গ্রাঃ ৩৪৮

শ্রীসতীকান্ত গুহ অসুস্থ হওয়ায় এবার অমরলতা প্রকাশিত হইল না।

পরের সংখ্যায় অমরলতা নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।



নূতন ধাঁধা

ল্যাজে 'ল'

বাংলায় অনেক শব্দ আছে যার পিছনে অন্য একটি অক্ষর জুড়ে দিলে তার অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়, যেমন—গজ মানে হাতি কিন্তু ল যোগ করে গজল অর্থ সম্পূর্ণ অন্য। আমরা এইখানে কয়েকটি শব্দের সঙ্কেত দিলাম যার পিছনে 'ল' যোগ দিলে তার অর্থ ভিন্ন হয়ে যাবে। এই ল্যাজে 'ল' বা ল-যুক্ত শব্দের অর্থের সঙ্কেতও এখানে দেওয়া হ'ল, কথাগুলি বার কর দেখি!—

১। হাতি থেকে একটা সুর—গজল।

২। বিয়োগ থেকে বর্ণা—।

৩। সমস্ত থেকে জোরাল—।

৪। মানুষের ক্রিয়াকলাপ থেকে চোখের ভূষণ—।

৫। দুধের অংশ থেকে সহজ—।

৬। বাংলার এক প্রধান শস্য থেকে ধূসর—।

৭। গাছের এক অংশ থেকে ত্রিভূবনের এক—।

৮। বানর থেকে মুনি—।

৯। অল্প থেকে এক বিশিষ্ট ফুল—।

১০। কাপড় থেকে শ্বেত—।

১১। বিরাট সময় থেকে জোড়া—।

১২। খারাপ থেকে পরিবর্তন—।

(উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৮শে ভাদ্র)

নূতন প্রতিযোগিতা

জীবনকাহিনী প্রতিযোগিতা

বাংলার যে কোন মনীষির জীবন চরিত (মহিলা বা পুরুষ : স্বর্গগত বা জীবিত) তোমাদের লিখতে হবে এই নতুন প্রতিযোগিতার জন্য। কেন তিনি বড় ও তাঁর জীবনী পড়ে কি শিক্ষা পাই? রংমশালের চার পাতার বেশী হবে না। ৩০শে ভাদ্র শেষ তারিখ। দুটি পুরস্কার থাকবে। পিতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর, বয়স ও গ্রাঃ নং দেবে।

আষাঢ় মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল

(ভ্রমণ কাহিনী রচনা)

১ম। শ্রীশিবপ্রসাদ সেন, (নিউ দিল্লী) গ্রাহক নং ৫৮১

—সম্বর হ্রদে।

২য়। শ্রীসুধাতোষ বসু, (কলিকাতা) গ্রাহক নং ৮৫২

—দূরের ডাক।

নিম্নের রচনাগুলিও সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য হয়েছে :—

কাঙ্‌ড়া উপত্যকায় সাতদিন (শ্রীপারুল সেনগুপ্তা, লাহোর) গ্রাঃ নং......

নেপালের পথে (শ্রীরথীন্দ্র সেন, দিনাজপুর) গ্রাঃ নং ৯৮৯

'Sagaing'এর পথে (শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, রেঙ্গুন) এজেন্ট মারফৎ

ছুটির ক'দিন (শ্রীপবিত্র গুপ্ত, পাটনা) গ্রাঃ নং ৯১১

দিল্লী-আগ্রা ভ্রমণ—চিঠিচ্ছলে ; (শ্রীমণিমালা মজুমদার, কলিকাতা) গ্রাহক নং ৫৭৬

এ মাসে রংমশালে আমরা "সম্বর হ্রদে" ও "দূরের ডাক" ভ্রমণ-কাহিনী দুটি ছাপালাম। আশ্বিনের রংমশালে "কাঙ্‌ড়া উপত্যকায় সাতদিন" ভ্রমণ-কাহিনীটি ছাপা হবে। পরে উল্লিখিত কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনী ছাপাবার আমাদের ইচ্ছা রইল।

বিশেষ বিবৃতি

গ্রাহক গ্রাহিকাদের প্রতি :

রংমশালের শারদীয়া সংখ্যা (আশ্বিন) তোমাদের মনের মত করে ১লা আশ্বিন তোমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। যারা গ্রাহক নয়, এই বেলা গ্রাহক হয়ে পড়, শেষে হয়ত শারদীয়া সংখ্যা সব বিক্রী হয়ে যাবে, পাবে না। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। ১৲ টাকা বেশী পাঠালে "রংমশাল দলের সভ্য হওয়া যায়। তৃতীয় বর্ষের রংমশালের প্রথম সংখ্যা (কার্ত্তিক) অভিনব সাজসজ্জায়, নূতন চিত্রে গল্পে রচনায় কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। তোমরা যারা পুরাণ গ্রাহক আছ আশ্বিন মাসেই তৃতীয় বছরের রংমশালের জন্য মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠিয়ে দিয়ো। নূতন গ্রাহক গ্রাহিকাদেরও আমরা সাদরে নিমন্ত্রণ করছি। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠান সুবিধা।

বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি :

আমরা বিশেষভাবে রংমশালের শারদীয়া সংখ্যার আয়োজন করছি। এখনই বিশেষ জায়গা নির্ব্বাচন করে পরিচালককে পত্র লিখুন। ২৫ শে ভাদ্রের মধ্যে কপি পৌঁছান চাই। সংবাদ দিলে আমাদের প্রতিনিধি দেখা করবেন।

শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

১। কাশি, গয়া ও কালনা।
২। সিকিম, ধানবাদ।
৩। কটক।
৪। পাটনা।
৫। ঢাকা, খুলনা।
৬। বর্দ্ধমান।
৭। আরা, কালকা।
৮। সিমলা, আম্‌বালা (আম্বালা)।
৯। হিমালয়।
১০। ভূপাল, মালদা।

কেহই নির্ভুল উত্তর দিতে পারে নাই।

যাদের একটি ভুল হয়েছে :—

কামাক্ষা চন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ) ; নীলিমা, নমিতা, নির্ম্মল, অমল, রবি ও সুচিত্রা, (সিমলা শৈল) ; সুজাতা সেন (কলিকাতা) ; নির্ম্মল, অরুণ, কিরণ (ভবানীপুর) ; তপু, অরু, নিরু, খোকা (কলিকাতা) ; অজয়, বিজয়, সুজা (লাহোর) ; অনিমা, পূর্ণিমা (দার্জ্জিলিং) ; অপূর্ব্বচন্দ্র রক্ষিত (কলিকাতা) : অজয় চট্টোপাধ্যায় ও নীলিমা বসু (কলিকাতা) ; খোকন, জয়শ্রী, মঞ্জুশ্রী (কলিকাতা) ; বিজয়প্রকাশ (ভবানীপুর) ; তপন, সলীল (দিল্লী) ; নিপেন, ধীরেন বসু (কলিকাতা)।

গতমাসের প্রতিযোগিতা--

তোমাদের সুবিধার জন্য শ্রাবণের বাড়ী-করা প্রতিযোগিতার তারিখ আমরা ২৫শে ভাদ্র পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিলাম।



শিল্পী—শ্রীগোপেশ চক্রবর্ত্তী

সাদা মেঘে লুটিয়ে আঁচল কে এল

রংমশাল

দ্বিতীয় বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা

আশ্বিন
১৩৪৫

পাড়ুয়াল

গত কাল পাঁচটায়
তেলে ভেজে মাছটায়
বাবু রেখেছিল পাতে
ছিল সাথে ছেঁচকি।
নেয়ে এসে দেখে চেয়ে
বিড়ালে গিয়েছে খেয়ে
চেঁচেঁ করে ওঠে শেষ
ভাত ওরে ছেঁচকি।
মহারাগে তিনু রায়
যেতে চায় ভাটপাড়ায়,
পাঁজিতে রয়েছে লেখা
দিন আছে কল্য।
রান্না চড়াতে গেলে
পাছে ট্রেন নাহি মেলে
ভোরে উঠে তাই সাথ
হাওড়ায় চলল ॥

৩।৭।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাদশাহী গল্প

ঠাকুরদাদা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ

"তারপর ?

—"কিসের পর বাদোশাবাবু ?"

—"সেই যে তুমি ভুৎখানা থেকে ফিরে এসে দেখলে, কামিজও নেই, কলমও নেই, পকেটও নেই, জেগে দেখলে ঠাকুর হয়ে গেছ—তারপর ?"

—"তারপর ভাই, জেগে জেগে দেখি উল্টো। শ্রী—ছিলেম 'শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' হয়ে-গেছি 'ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ'—নামটা কুরকুর করে খাচ্ছে কলাই ভাজি নেংটি ইঁদুর তিনটা ধারালো দাঁত।"

—"তোমার কি হল তাই বলনা !"

—"হবে আর কি ! তিন-তিনটি 'মিকি মাউস্‌' হয়ে নামটা কলাই খেয়ে আমার পায়ে গোঁফ মুছতে আমি পা তুলতে যাবো—পা ওঠেনা ; হাত ছুঁড়তে যাই—হাত নড়েনা, শরীর যেন পাষাণ ; সুড়সুড়ি লাগছে—রোমাঞ্চ হচ্ছেনা, মন অস্থির, গা শির শির, চক্ষুস্থির, আকাট বসে আছি রাত আর কাটেনা। ভাবছি ঠাকুর হয়ে তো বিপদে ঠেকলেম—সকালে চা টোষ্ট খাওয়া হবেনা তো আর ঠাকুর ঘরের বাল্যভোগ পুজুরিতে বাদোশাবাবুতে খাবে, যা কিছু বাকী থাকবে ছোলা-কলা-কলাই-মটর তা কতক খাবে টিয়াপাখি কতক খাবে চড়াই কতক খাবে ইঁদুর ; আমি চাইতেও পারবোনা, কেড়ে খেতেও পারবোনা। বেলাতে ভোগ চড়বে, খিচুড়ি ভোগের গন্ধ নাকে পাবো, পিত্তি জ্বলবে, খেতে পাবো না। ঘণ্টা বাজবে ভোগের—ভিখিরি বুড়ি লাঠি হাতে গুড়ি গুড়ি এসে পাতা পেড়ে বসবে—ব্রাহ্মণেরা বসে যাবে কুশাসনে, সপাসপ্‌ খাবে খিচুড়ি, সবাই দক্ষিণে পাবে দু-দুআনা। আমাকে তালাবন্ধ ঠাকুর ঘরে শয়নে থাকতে হবে কয়েদীর মত, আর শুনতে হবে কোশাকুশি বাসনমাজার শব্দ। বৈকালে বৈকালিকি ফুলবাতাসা বাদোশা বেলের সরবতের সঙ্গে হজম করবে। আমি বসে ভাববো, এই বুঝি আনে রাধু চিজ্‌ টোষ্ট, অম্‌লেট চা—কে কোথা !

হবে সন্ধ্যাপূজা সমাপন,
গোধূলিতে গোষ্ঠে যাবে কৃষ্ণের গোধন,
ঠাকুরের ঘরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে দেবে দাস গোবর্দ্ধন।

বাদশা ছাড়বেন গ্রামোফোন,
রাধু কাট্‌লেট্ ভাজছে যখন,
খট্ করে পড়বে ঠাকুর ঘরের তালা,
এসে পড়বে পেলেট্ ধোয়ার পালা,
হবে খানার টেবিলে ডিনারের আয়োজন,
আমার কি হবে তখন ?"

বাদোশাবাবু বলে উঠলেন—"তুমি—'খাবো, খাবো, পুডিং খাবো' বলে চ্যাঁচাবে, আমি গিয়ে তালা খুলে দেবো !"

—"পারবেনা বাদোশাবাবু। ঠাকুর ঘরে ভুত ঢুকেছে বলে তুমি লেপ মুড়ি দেবে; দাসী চাকরবাকর উচ্ছেলালকে ডাকতে ছুটবে, সে লণ্ঠন হাতে লাঠি ঠক্‌ঠকাতে এদিকওদিক ঘুরে—'কোই নেহি হ্যায়'—বলে দেউড়িতে গিয়ে খাটিয়া নেবে সে রাতের মত; সাত ডাকে আর সাড়াও দেবে না।

—"তখন কি করবে তুমি ?

—"করব কি সেই তো কথা বাদশা বাবু !"

—"ভেবে দেখনা কি করবে !"

—"রোসো ভাবি, আমিও ভাবি তুমিও ভাবো !"

—"কেন হনুমানকে স্মরণ করবে !"

—"সে তো আসবে না, আমার নাম যদি রাম হ'ত তবে আসতো !"

—"কলা দেখালেই আসবে !"

—"মুষ্টিবদ্ধ হাত, কলা দেখাই কেমন করে ? আঙ্গুল নড়বে না যে !"

—"কেন নৈবিদ্যির কলা ? না, না সেতো পাবেনা; আমি যে খেয়ে ফেলেছি তখন।"

—"তবে কি হবে—বাদশা বাবু ?"

—"ও ঠাকুর নাই হলে, আরো তো অনেক রকম ঠাকুর আছে !"

—"বলে যাও আরো কি ঠাকুর হতে পারা যায় !"

—"কেন গোঁসাই ঠাকুর তো বেশ ! চেলীর জোড় পরে, জরীর ছাতি মাথায় চামর বাতাস খেতে খেতে নগরকীর্ত্তনে বেরোবে শিঙে ফুঁকে—আমরা দেখবো বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে !"

—"আরে খড়ম পায়ে দুহাত তুলে নাচতে রাস্তায় পপাত হবো দশা পেয়ে তখন তুমি গিয়ে ভারি দেহটা কি ধরে তুলবে ?"

—"হাঁ তুলবো !"

—"বাঃ তুমি মুর্গি খাও, আমি পরম বৈষ্ণব গুরু গোঁসাই—পবিত্র দেহ যাকে তাকে ছুঁতে দেবনা। পরম ভাগবৎ শিষ্য না জোটালে গোঁসাই ঠাকুর হয়ে লাভ নেই। শুধু দশা পাও আর কাদা মাখো।"

—"তা হলে ও চলবে না। আচ্ছা রাঁধুনী ঠাকুর হলে কেমন ?

—"ছেঁক্ ছেঁক্ ছেঁক্ রাঁধুনী ঠাকুর
আনোনা ছোকা ধোঁকা কচুর
ডাল কি ডালনা বোঝা যাবেনা-লঙ্কার ঝালে ভরপুর
ভাতে ঝুল, চুল আর কয়লাচুর
রোচে যদিবা মুখে বাদশা বাবুর
রুচ্‌বে না বেড়াল ছানার রাধুর
রোজ ফুটো হাঁড়ির জরিমানা দিতে, মাইনে নিতে গিয়ে দেখবো হয়ে গেছি ফতুর।

—"কেন আমাদের সব আলুমিনামের হাঁড়ি।"

—"আরে হাঁড়ি হলে কি হয়, শুখা বেহারা যে—

আনবে সাতকেলে শুকনো মাছ তরকারি
তখন যে ওপড়াবে রাঁধুনি ঠাকুরের পাকাদাড়ি
তার চেয়ে ভালো আমার ঠাকুরবাড়ী
ওকাজ নারি, বাদশাবাবু রাঁধুনি ঠাকুর হতে নারি
আর কি হওয়া যায় ভাবনা ভাবো তারি।

—"রোসো ভাবি—ঘুম পাচ্ছে ভারি—ঠাকুর—দাদাঠাকুর—ঠাকুর দাদা !"

"বস্ হয়েছে, চুকে গেছে বাধা—ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরদাদা !"

"কার ঠাকুরদাদা ?"

"কেন তোমার, তোমার শুধু-দাদার—এরপর কথা নেই আর। আনো নুন মাখিয়ে পুড়িয়ে আদা !

—"কে পোড়াবে ?

—"কেন তুমি !

—"হাত পুড়বে না ?

—"তবে রাঁধুনী ঠাকুর পোড়াবে।"

—"তুমি খাবে? এই নাও, মুখ খোলো দেখি। মুখ যে খোলেনা, রোসো মন্তর পড়ি—শুন্—

মন্তর মন্তর দাঁতি ছাড়া মন্তর চোল ধরা মন্তর
আদায় নুনের ছিটে, চুণে গুড়ে, চিট্ চিটে—খুলে যায় খিল দন্তর
কার আজ্ঞে? লোহদন্ত মুনির আজ্ঞে; অনুজ্ঞে কার? করাতি দাতার;
প্রতিজ্ঞে কার? হাতে যার জাঁতি যন্তর।"

—"যাঃ ফুঃ।"

—"দাঁতি ছেড়েছে, বাদোশাবাবু, বাতাসা খাবু!"

—বাতাসা নেই, আদাপোড়া!"

—"নড়লো না চোয়াল জোড়া!"

—"চক্‌লেট চকচকে রাংতা মোড়া?"

—"এই খুল্লো কুমীড়ে হাঁ, চোখ খুলছেনা—ফেল দেখি চক্‌লেট দু'জোড়া! হাঁ আঁ, আরে ছ্যাঃ এযে খালি কাগজ!

"মুখ খুলে গেছে এখন গল্প বেরোক ফসাফস্।"

শোন শোন গল্প বলি ঠাকুরদাদার
গ্রাণ্ডফাদারেরও গ্রাণ্ডফাদার পেকে হয়নি ঝুনো
তত পুরনো একটা গলি, তারই মোড়ে আর এক গলি
আর এক মোড় আর এক গলি
ছিষ্টি করেছে অলি গলি গোলক-ধাঁধার
তার মধ্যে দিয়ে ঠাকুরদাদা চল্লেন ঠানদিদি আনতে বাদশাদাদার
বাজিয়ে গড়ের বাদ্যি, জ্বালিয়ে ফাসকেলাস্ খাস্‌গেলাস দেদার।
সঙ্গে চল্লো বরযাত্রি ভোলানাথ পুরুৎ
ছিরাম ঘটক মুখে চুরুট—নেড়ে টিকি।
তখন খাননা তামাকটি ঠাকুর দাদা
ঠোঁটের পরে সরু টানটি গোঁফের রেখার
টাক ঢাকা কোঁকড়া চুলে টেরির বাহার
চাপ্‌কান্ কিংখাবের
পায়ে মখমলের জুতো পঞ্জাবের
মাথায় কার্ত্তিকের পাগড়ি, কপালে চন্দন, গলায় মুক্তাহার
ফেটিং গাড়ি চারঘোড়ার—
খেপে বুঝি এই ভয় হচ্ছে ঠাকুরদাদার।
সে ভারি মজার ভিড় বরযাত্রার
সঙ্গে তখন রাধু নেই—আছেন কুণ্ডু রামলাল গলায় সোনার হার।

পুরুৎ বলেছিল খালিপেটে যেতে
রামলাল লুকিয়ে দিয়েছিল খেতে—
লুচি ষোলোখান, রামপাখির কাট্‌লেট খানচার।

—"ঠাকুরদাদা লুচি খেয়ে গেলে কয় গণ্ডা?"

—"আরে ভাই চার গণ্ডা!"

—"কতদূর যেতে হল তোমার?"

—"বেশী দূর নয় এই গলির মোড়েই শিব মন্দির
তারপরেই এক গলির মোড়ে দোকান দোয়ারি ময়রার
তার পরেই থালা ঘটি বাটি বেচে হরিচরণ কর্ম্মকার
তারপরেই শ্বশুর মন্দির।

"যেতে কতক্ষণ লাগলো?"

—"তা অনেক্ষণ, অনেক লোক লস্কর, পথে কন্ধকাটা, গন্নাকাটা পায়ে পায়ে সবাই আগ বাড়ালো, সঙ্গে ছিল কাবুলিওয়ালা পাহাড়াওয়ালা—পৌঁছতে বেশ একটু খিদে চাগ্‌লো!"

—"তারপর?

—"তারপর ভাই রঙ্গ বাধলো—

নাপিত বল্লে—'চোগা-চাপ্‌কান পেন্টুলান ছাড়াও রামলাল!
খুলে নিয়ে গয়নাগাটি, জুতোপাটি সাজ গোজ চমৎকার
দিলে পরিয়ে একখানা চাদর, দশহাত ধুতি—পাড়টা তার লাল।
ফতুর বেশে ঠাকুরদাদাকে শেষে
টেনে নিয়ে গেল—কে জানে কে সে?
ভোলানাথ বল্লেন—'হাঁটুর কাপড় তুলে উবু হয়ে বসো হেসে একগাল'।
ভোলানাথ তো ভোলানাথ,
ভুলে গেছে আমার হাঁটুতে বাত
উবু হয়ে বসতে ছাড় ছাড় ধাত্‌
পিঁড়া পরে কাৎ হয়ে পপাৎ
শব্দ দিলে মটাৎ—পিঁড়ির কাঠ।
'দেহটা ভারি' বলে ভোলানাথ
মন্তর পড়িয়ে চল্লেন—খুলে পুঁথির পাত্‌।

—"কি মন্তর ?"

"অড়র্ বড়র্—অসিত দেবল ! কাশ্যপ শাণ্ডিল্য"—

"তুমি মন্তর বল্লে ?"

—"সনস্কৃত বুঝলে তো বলব ! আমি কেবল দে দে বলে হাত পাতলেম।"

—"কি করলে পুরুৎ ?"

"সে এক কাণ্ড অদ্ভুত ; আমার বাঁ হাতে একটা সোণার আংটি পরিয়ে ডান হাতে গোটাকতক পান স্থপুরি দিয়ে আর একটা পিঁড়ের উপরে আর একটা লাল চেলীর পুট্লী থেকে একখানা মোমের মত নরম গয়নাপরা হাত টেনে বার করে আমার হাতে লাল-স্থতো দিয়ে বেঁধে ফেল্লে।"

—"তারপর ?"

—"তারপর বল্লে 'উঠে পড়, যাও বাটির মধ্যে !' বাটির মধ্যে ঢুকবো কি—আমি উঠলেম, সঙ্গে সঙ্গে সামনের চেলীর পোঁটলাটিও উঠলো—ত্বখানা রাঙা টুকটুকে আলতায় জোবড়ানো পা ঝমর ঝমর শব্দ করছে।"

—"তারপর ?"

—"বাটির মধ্যে ঢুকি কেমন করে ভেবে খিদে বেড়ে গেল। যা কপালে আছে বলে চল্লেম চক্ষু বুজে !"

—"তারপর কি হল ?"

—"হবে আবার কি ! কলাতলায় ঠাকুরদাদায় ঠানদিদিতে শুভদিষ্টি—লাল কাপড় ঢাকা দিয়ে !"

—"সে আবার কি ? শুভদিষ্টি ?"

—"আরে সে যার হয়েছে সেই জানে। তোমার যখন হবে তুমিও জানবে। সে কথা বলতে বারণ আছে।

—"চুপি-চুপি বলনা কানে কানে—আমি কাউকে বলব না। লাল কাপড় ঢাকা দিয়ে বাটির মধ্যে কি ?"

—"বলবার জো নেই। সে যে কী তা আমিই জানি তোমার ঠানদিদিও জানেন—কিন্তু বলবেনা !"

—"বলবেনা কেন ?

—মন্তর ফাঁশ হয়েছে কি ঠাকুরদাদাতে ঠানদিদিতে চটাচটি হয়ে যাবে—শুধিয়ে দেখো !"

—"বলবে না ?"

—"কিছুতে না !"

—"শুভ-দিষ্টির ইন্‌জিরি কি ?"

—"Holy Look."

—"এখনি দেখছি ডিকসেনারি !"

—"যাও, খুঁজে বার করতে করতে দেখবে তার আগেই হয়ে গেছে তোমার শুভদিষ্টি !"

—"তারপর কি ?"

—"তারপর ভাই পেটে ধরেছে খিদের জ্বাল।
সামনে ভাত বেড়ে দিয়েছে একথাল।
খিদে বলে আর কোথা যান
গরাস তুলে মেলাতে মুখখান
চেপে ধরলে। একহাত শালা
বলে 'খড়কি আগায় লও ঘ্রাণ'
পিছন থেকে কে মলে দিলে কান
ফিরে দেখলাম তোমার ঠানদিদির ঠানদিদি
নিয়ে পালালেন ভাতের থাল।
আমার কানে ধরিয়ে জ্বালা
তার উপরে হাসি টিটকিরিতে কাণ ঝালাফালা।

—"তার পরে ?"

—"তারপরে এলো গরম গরম লুচির পালা।"

—"তার পরে ?"

—"তারপরে সবাই বলে 'আরো খান তুচ্চার লুচি খাও'।
আমি মুখে বলিনে মনে মনে বলি 'যতপারো কানমলা দাও'
সবাই বলে 'আর দুটো সন্দেশ খাও'
আমি মুখে বলিনে মনে মনে বলি বলি 'আর চলবেনা একটাও'
হয়ে গেল সব গলাধঃকরণ
বাদশা বাবু ঘুম পেলো যে করিগা শয়ন
আর কথা নয় লাঠি গাছ দাও।"

—"কাল চাই ভালো গল্প !"

—"বেশ এখন নিন্ গিয়ে তল্প, খেয়ে ডাল ভাত বিশ্রী"—

শারদীয়া

শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ খাঁন্, বি. এ.

আজ শরতের প্রথম প্রাতে ফুটল আলোর আল্পনা
সোনার মায়ায় সাজিয়ে দিল আপন হাতে কল্পনা।
নীল আকাশে পাত্‌লা মেঘে ঘুম ভেঙে সব উঠ্‌ল জেগে
কচি বুকে ফুটল তাদের আকাশ পাড়ির জল্পনা!

কমলকলি উঠ্‌ল নেচে বাজিয়ে জলের মন্দিরা
চোখ মুছে সব উঠ্‌ল জেগে ঘুমভাঙা রূপ-নন্দীরা!
শেফালিরা উল্লাসেতে লুটিয়ে প'ল সবুজ ক্ষেতে
ফুল-বাগিচায় ব্যস্ত হ'ল রূপ-দেউলের বন্দীরা!

অপ্‌রাজিতা চাইল হেসে পটল-চেরা চোখ তুলি
খুসীর ভারে গাইল গজল শালিক ফিঙে বুল্‌বুলি!
কাশ কুসুমের উত্তরী হায় পথের ধারে ওই দেখা যায়
করবী আজ কইল কথা হটাৎ হেসে ঠোঁট খুলি!

দখিন হাওয়া গাইল সুরে আগমনীর বন্দনা
সঙ্গে তাহার সুর ধরেছে দোয়েল শ্যামা চন্দনা!
তন্বী শ্যামা আত্রেয়ী হায় সেও আজি কণ্ঠ মিলায়
হটাৎ জেগে উঠ্‌ল কি সব স্বপ্নলোকের নন্দনা!

খুসীর খবর ছড়িয়ে গেছে নিখিল জগৎ সব খানে
কচিধানের সুবাস আজি প্রাণ টানে গো—মন টানে!
জলভরা ওই বিলের কোলে চখাচখির-চিত্ত দোলে
না-ঘুমানো নিশিথিনী একলা সারা সন্ধানে!

শারদীয়া

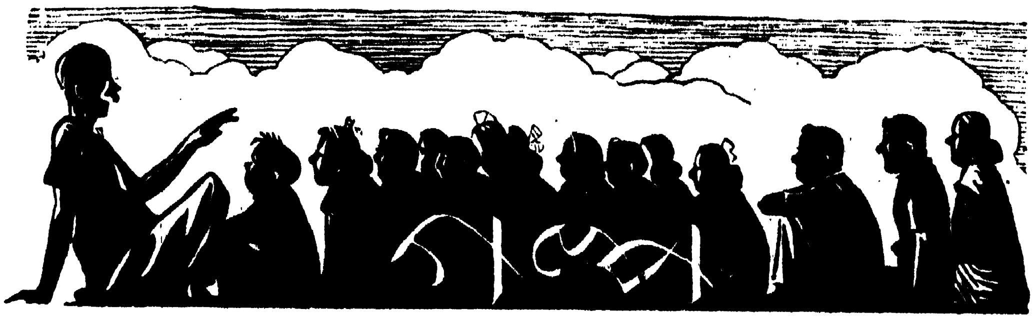
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ খাঁন্

নওরোজেরি খুশ্-খবরে পরাণ জেগে উঠ্‌ল গো
বালু বেলার বক্ষে কি আজ শ্যামলিমা ফুটল গো !
ছিন্ন বীণার বেসুর তারে জাগ্‌ল খুসী ভারে ভারে
ঘুমিয়ে-পড়া খুসীর প্লাবন কোথা হ'তে জুট্‌ল গো !

উঠো ! উঠো ! পড়ল সাড়া নিদ্রা-অলস ঘুম্‌বনে
ক্লান্তি ব্যথা পালিয়ে গেছে সোনার কাঠির চুম্বনে !
কাঁচাসোনার রোদ্দুরে হায় শিহর আনে লতায় পাতায়
নও-জোয়ানের সুপ্তি ভাঙার কচি-পাতার গুঞ্জনে !

জাগ্ লো তোরা চোখ মুছে সব—পালিয়ে গেছে শর্ব্বরী
খুসীর সুরে ক্ষুব্ধ এখন নিদ্-মহালার ঘুম্-পরী !
রোদ্দুরে আর শ্যামলতায় কুসুম, বিহগ, কচিপাতায়
শারদীয়ার পরম-প্রাতে জাগল শ্যামা-সুন্দরী !





রামধনুর রাজ্যে টপ্‌সী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট্ট একটি মেয়ে ; মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল, দুষ্টু দুষ্টু চোখ, আর ফোলা ফোলা গাল। কালীর দোয়াত উল্টে, কাঁচি দিয়ে মার শাড়ীর পাড় কেটে, দিদির পুতুলের চোখ খাম্‌চে, দাদার পেন্সিল ভেঙ্গে—তার কর্ম্মচক্র সারাদিন ঘুর্‌ছে। তাকে যদি বকা হয় "এই খুকী ! কি কর্‌ছিস্‌, কালী ফেল্লি কি করে," সে অমনি অত্যন্ত নিরীহ বেচারীর মত মুখ করে বলবে, "কি জানি কেম্‌নি করে দোয়াতটা উল্‌টিয়ে গেল।" তার বাবা তাই তাকে "টপ্‌সী" বলে ডাকতেন। তোমরা কি টপ্‌সীর গল্প জান ? টম কাকার কুটীর পড়েছ কি ? আমরা ঐ বইটা খুব পড়তাম। ওটা আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার সম্বন্ধে লেখা একটা গল্প। টপ্‌সী ক্রীতদাসদের মেয়ে ছিল। যাহোক, এই মেয়েটীরও নাম হল টপ্‌সী—সে টপ্‌সীর মত মজার মজার কথা বলতে বলে। গল্পতে টপ্‌সীকে নিদারুণ মিথ্যাবাদী দেখান হয়েছে—সেটা তার দোষ নয়, কারণ তার মত অবস্থায় ওরকম করার দিকেই মনের গতি হয়। এই ছোট্ট মেয়েটীরও মিথ্যাবাদী নাম হ'য়ে গেল একদিন। কি করে যে হ'ল তারই গল্প আজ বলব। তোমাদের অবনী দাদু হয়তো বলবেন—তোমরা কিচ্ছু বোঝনি, ও তো মিথ্যাবাদী নয়, ও হ'ল শিশু-সাহিত্যের শিশু-সাম্রাজ্ঞী।

ওদের বাড়ীর ছাতে খেলতে আসতো এক দঙ্গল মেয়ে, বড়, ছোট, মাঝারি নানা সাইজের ; কেউ ফ্রক পরে, কেউ শাড়ী পরে, কেউ রঙীন, কেউ ডুরে কেউ আবার মহাধার্ম্মিক ত্যাগী সেজে সাদা কাপড় পরে,—এই সব নানারকম মেয়েদের মধ্যে ওর দিন বেশ কাটে। ও উল নিয়ে Cats' Cradle খেলে, দড়ি ঘুরিয়ে Skip করে, ঘুটিং খেলে, আবার ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ায় আর মার্ব্বেল খেলে। আজকাল মার্ব্বেল খেলা প্রায় দেখিই না। "টোয়েন্টি"

রামধনুর রাজ্যে টপ্‌সী
শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়



দেখতে পেল রামধনু রঙের রাজ্য

আর "নাথিং, নট কিচ্ছু" শুনতেই পাইনা। তখন কিন্তু ছেলেরা এ খেলা খুব খেলত আর জুতোর গোড়ালি দিয়ে রাস্তায়, ঘাটে যেখানে সেখানে গাব্বু খুঁড়ে রাখতো। কর্পোরেশন তো তখন পাথর দিয়ে ফুটপাত বাঁধিয়ে দুষ্টুবুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। দেখ না, অমন খেলাটাই মাটী করে দিয়েছে।

একদিন এমনি এক আষাঢ়ের সন্ধ্যায় টপ্‌সী ছাদ থেকে দেখতে পেল যে মেঘের ফাঁকে এক রামধনু রঙের রাজ্য দেখা যাচ্ছে! সে রাজ্যে যাবার রাস্তাটা যেন লাল আলো দিয়ে তৈরী। তার তো ভারী ভাল লাগলো সেই রাজ্যটা—ইচ্ছা হতে লাগল ঐ আলোর পথ বেয়ে সেখানে এক ছুটে যায়; কিন্তু আলোর পথ তার নাগালের বাইরে; বেচারা যেতে পারে না! সে ছুটে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখল তার দা-বু জানালার কাছে বসে ছবি আঁকছেন। সে তাঁর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে বলল, "দা-বু আমায় একটা মস্ত মই যোগাড় করে দিন না আমি ঐ মেঘের দেশে যাবো।" দাবু-দা তার বল্লেন, "মই দিয়ে যাবি কি করে? অত বড় মই তো দিদি আমাদের দেশে মেলে না!

"কেন? মই-এর উপর মই, তার উপর মই এমনি হাজারটা—লক্ষটা মই লাগালেও যাওয়া যাবে না?

"না রে! তারপর মই লাগাবে কি করে? কিসের গায়ে ঠেকাবে?" "কেন, মেঘের গায়ে। ঠিক পারা যাবে। মই দিয়েই দেখুন না!" তবুও তার দা-বু মাথা নেড়ে বল্লেন, "অত মই আমি আনতে পারব না দিদি।" রাত্রে বারেবারে টপ্‌সী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, মেঘের ফাঁক দিয়ে সেই রাজ্যটা দেখা যায় কি না! নাঃ এখন কেবল মেঘের ফাঁক দিয়ে তারাগুলো দুষ্টু মেয়ের মত উঁকি দেয় আর মিটিমিটি হাসে। তাদেরি লক্ষ্য করে সে বলতে লাগল, "তোমরা একজন নেমে এস না বাপু, আমায় ওখানে নিয়ে যাও।" সে শুনেছে দিদিমার কাছে যে তারারা সব দক্ষ রাজার মেয়ে, সব বুড়ো চাঁদমামার বৌ। দীঘল কালো তাদের চুল, টানা টানা চেরা পটলের মত তাদের চোখ, ফুরফুরে হাওয়ার মত পাৎলা, রূপালী জ্যোৎস্নায় বোনা শাড়ী পরণে, হীরার কণার মত তারার ধূলি গহনা গায়ে—তারা রোজ রাত্রে চাঁদকে ঘিরে সভা করে আর সুধা পান করে। মজা করে তো ঐ সব করা হচ্ছে, এদিকে একটু নেমে এসে টপ্‌সীকে নিয়ে যাবার নাম নেই। না নিয়ে গেল তো টপ্‌সীর বয়েই গেল; সে মলে যখন 'তারা' হয়ে যাবে, যেমন নাকি মনোদিদির দিদি হয়েছেন, তখন সে দক্ষরাজার মেয়েদের সঙ্গে কথাই বলবে না, ভীষণ রকম আড়ি দেবে। দক্ষরাজার মেয়েরাই বা কারা আর মরা মানুষ 'তারা' হয়েছে যারা তারাই বা কারা! আহা! তারা তো আর পৃথিবীতে নেমে আস্‌তে পারে না—তা হলে মনোদি'র দিদিকে ডাকলে নিশ্চয়ই আসতেন। আসতেন না আবার—হ্যাঁ। টপ্‌সী মনে মনেই পটলির সঙ্গে যেন ঝগড়া করতে লাগল। এমন সময় টপ্‌সী হঠাৎ দেখলো হীরার কণ্ঠি গলায়, গজমতির মালা বুকে, মাথায় হীরার তারা, জ্যোৎস্না-বোনা শাড়ী পরে দীঘল কালো মেঘের বেণী এলিয়ে তার সামনে নেমে এসেছে সুন্দরী এক মেয়ে।

টপ্‌সী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি' ? সে মিটিমিটি হেসে বল্‌ল, "এই গজমোতির মালা দেখেও চিন্‌লে না ? টপ্‌সী বল্‌ল "পেরেছি, তুমি চাঁদের রাণী" সে বল্‌ল "হ্যাঁ, আমরা তো ছাব্বিশ জন, আমি কে ?" ও বল্‌ল "না, ঠিক জানি না।" মেয়েটী বল্‌ল "ওমা! আমি স্বাতী! তাও জানো না।" টপ্‌সী বল্‌ল "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, দা-বু একদিন যে গল্প করেছিলেন স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়্‌লে হাতীর মাথায় মুক্তা জন্মায়। গজ মানে যে হাতী তা ভুলেই গিয়েছিলাম।" স্বাতী বল্‌ল "তুমি বুঝি গজ মানে দুই হাতে যে গজ হয় তাই ভাবছিলে ? সেলাই-এর ক্লাসে সেই যে তোমার সোণাদি কাপড় মাপ্‌লেন।" "তুমি কি করে জান্‌লে ?" "ও আমরা সব জানি। তুমি যে রামধনুর রাজ্যে যেতে চাও আর তুমি যে আমাদের উপর রাগ করছিলে তাও জানি। এখন যাবে নাকি আমার সঙ্গে" "হ্যাঁ যাবো, কিন্তু—"



কে তুমি—"

"ফেলে টেলে দেবো কি না তোমায় আকাশ থেকে তাই বল্‌ছ ? না, আমরা ছোট্ট মেয়েদের ফেলে টেলে দি না। তুমি আসতে চাও তো আসতে পার !"

টপ্‌সী স্বাতীর সঙ্গে আকাশে উড়ে চল্‌ল রামধনুর রাজ্যে। রাস্তা সেখানকার রামধনু দিয়ে তৈরী, মুক্তোর মন্দির আর সোনার বাড়ী। সেখানে শণের মত সাদা ফুরফুরে চুল্‌ওয়ালা এক বুড়ী কাপড় বুনছে হাওয়ার মত ফুরফুরে, কুয়াসার মত পাৎলা, রূপালী রংএর শাড়ী—চাঁদের বৌয়েরা যে কাপড় পরে। টপ্‌সী বল্‌লে "এ কে ?" স্বাতী হেসে বল্ল "চাঁদের বুড়ী— আমাদের ধাই শ্বাশুড়ী।" ধাই শ্বাশুড়ী আবার কি কথা টপ্‌সী ভাব্‌ল। স্বাতী বলে উঠ্‌ল, "তোমার মনের কথা বুঝেছি—দিদিশ্বাশুড়ী মামী শ্বাশুড়ী পিসী শ্বাশুড়ী হতে পারে ধাই-শ্বাশুড়ীই বা হবে না কেন ? ও যে তোমাদের চাঁদের ধাইমা।" টপ্‌সী খুব পণ্ডিতের মত মাথা নেড়ে বল্‌ল "ওঃ হ্যাঁ সত্যিই তো ! তা হবে না কেন ?"

তারপর টপ্‌সী লাল আলোর রাস্তার দুধারে রামধনুর রঙীন মেঘের বাড়ীগুলো ঘুরে ঘুরে দেখ্‌ল কত গম্বুজ, মিনার, কত ডোম, দেওয়া সে কি অপূর্ব্ব প্রাসাদ সব আর বাগানে কি অদ্ভুত লতা, ফুল ! একটা বাড়ীতে মস্ত বড় অলিন্দে হীরা-খচিত সাদা সোণার আসনে বসে

সোণার চিরুণী দিয়ে মেঘের মত কালো চুল আঁচড়াচ্ছেন এক রাণী, কি তাঁর পোষাক, গল্পের অমলার পোষাক তার কাছে কি লাগে। সে স্বাতীকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল "ঐ রাণীই কি রোহিণী?" স্বাতী হেসে বল্‌ল "নাঃ, ওতো ক্যাসিয়োপিয়া; খালি চুল আঁচড়াচ্ছে, আর ওদিকে ওর মেয়েটাকে তো বলি দেবার জন্য বেঁধে রাখা হয়েছে।" টপ্‌সী বল্‌ল "ওঃ, কি দুষ্ট মা! ও কি সৎমা?" "না, ও সৎও নয়, অসৎও নয়, ভারী স্বার্থপর, খালি নিজের চুলের কথাই ভাবে।"

পশ্চিমদিকের একেবারে শেষ প্রাসাদটীর কাছে গিয়ে টপ্‌সী দেখ্‌ল একটা চমৎকার লাল রংএর কি একটা জিনিস সজারুর মত তালগোল পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে—প্রাসাদের জালিকাটা দেয়ালের মধ্য দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা ডিমের মত। সে বল্‌ল "ওটা আবার কি?" স্বাতী বল্‌ল "ওটা বল্‌তে নেই: অভদ্রতা হয়। সূর্য্যদেবের সারথি উনি; অরুণ নাম শোন নি?" "হ্যাঁ, শুনেছি বৈকি! সেই যে অদিতি তাড়াতাড়ি ডিম ভেঙে ফেলেছিল—না, না ভুল হয়ে গেছে—ফেলেছিলেন; সেই গল্পটা তো?" "গল্প আবার কি বোকা মেয়ে? তবে আমিও কি গল্প না কি?" স্বাতী ভয়ানক রেগে বলে উঠ্‌ল, "তবে আর রামধনুর রাজ্যে তোমার থেকে কাজ নেই।" টপ্‌সী তার হাত ধরে বল্‌তে গেল "না, ভাই রাগ কোরো না"—এমন সময় দেখ্‌ল কোমরে তলোয়ার মস্ত এক কালো পুরুষ তার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে একটা ঘোড়া ছুটিয়ে, আবার দাড়ি-ওলা সাতটা বুড়ো হঠাৎ মিলে একটা ভাল্লুক হয়ে তাকে তাড়াল—ওতো ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুট্‌তে গিয়ে পা হড়্‌কে যে পড়ল, তো পড়তেই লাগ্‌ল। এমন সময় দেখ্‌ল যে ছোট্ট একটি ছেলে স্থির নয়নে ওরদিকে তাকিয়ে আছে, চোখে তার করুণার দীপ্তি, সে বল্‌ল, "ভয় কি? হরিকে ডাক তিনিই তোমায় পতন হতে রক্ষা কর্‌বেন। তুমি তাঁরই কোলে পড়্‌বে, কিচ্ছু ভয় নেই, হাড়গোড় কিছু ভাঙ্গবে না।" টপ্‌সী দোমনা হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বল্‌ল, "আমায় চিন্‌ছ না? আমি ধ্রুব।" টপ্‌সী বল্‌ল "হ্যাঁ, ভাই, চিনেছি। সেই যে তুমি 'তোরা যা যা আমি ঘরে যাব না' বলে গান করতে করতে চলে গেলে, সেই যে তুমি হরিকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আকাশে উঠে গেলে।" এই বলে টপ্‌সী 'হরি তোমায় ডাকি' বলে গান করতে গিয়ে দেখ্‌ল যে আঁধার অরণ্যে "ধাই হে" বলা তার চল্‌বে না আর। 'আকাশ থেকে ধপাস্ করে পড়ি' বল্‌লে শোনায়ও না ভাল, সুরটাও একটু বদল হয় বলে, চোখ বুজে 'খালি হরি, হরি, আমায় কোলে কর' বল্‌তে লাগ্‌ল। ওর মনে হ'ল যে ধপ্‌ করে ও কার জানি নরম কোলে পড়েছে। চোখ চেয়ে দেখ্‌ল ওর নরম বিছানায় ও শুয়ে আছে।

রামধনুর রাজ্যে টপ্‌সী
শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

পরদিন বিকালবেলা ছাদে ও মহোৎসাহে এই ব্যাপারটা বর্ণনা করছিল। খোঁপা বাঁধা বড় গোছের একটি মেয়ে এসে বল্লেন "কি বল্‌ছিস টপ্‌সী।" টপ্‌সী আবার সব কথা বল্‌ল। বড় মেয়েটী বল্লেন "আচ্ছা, আমায় একবার নিয়ে যাস্‌ তো।" ও উৎসাহ করে বল্‌ল 'আপনি যাবেন মিনু দি? আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাবো।"

সেই রাত্রে টপ্‌সী দেখ্‌ল ধ্রুব এসেছে তার কাছে। সে ধ্রুবকে বল্‌ল "ভাই মিনুদি'কে নিয়ে চল্‌তে হবে তোমাদের দেশে। যাবে, ভাই?" ধ্রুব বল্‌লো "চলো"। টপ্‌সী বাতাসে ভেসে ভেসে মিনুদি'দের বাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে মিনুদি'কে ডাক্‌ল, পায়ে চিমটি কাট্‌ল কিন্তু মিনুদির ঘুম ভাঙল না। ধ্রুবও একটু পরে মিলিয়ে গেল। মিনুদি'র জন্য বেচারী টপ্‌সীরও রামধনুর রাজ্যে যাওয়া হ'লনা।

পরদিন মিনুদি'কে সেই কথা বলতে গেলে তিনি চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে বল্লেন "যাঃ আর মিথ্যে কথা বল্‌তে হবে না। কাল বলে আমি সারারাত জেগে রইলাম। আমি আগেই জানতাম মিথ্যে কথা বল্‌চিস্‌ তুই। খালি সেটা প্রমাণ করবার জন্য বলেছিলাম আমায় নিয়ে যেতে। জানতামই নিয়ে যেতে পার্‌বি না। বাবা, কি মিথ্যেবাদী তুই! সাধে কি জ্যেঠামশায় তোর নাম টপ্‌সী রেখেছেন?"

বেচারা টপ্‌সী দুঃখে এতটুকু হয়ে গেল। তাকে ঘিরে আর সকলে "মিথ্যেবাদী! মিথ্যেবাদী!" বলে চেঁচাতে লাগ্‌ল। কেউ কেউ আবার ডান হাতের তর্জ্জনীর উপর মধ্যমা আঙুলটাকে ক্রশ করে রেখে বল্‌তে লাগ্‌ল "টপ্‌সী তোকে ছোঁব না। টিকটিকিটা বলরাম।"

টপ্‌সী হয়তো কেঁদে ফেল্‌তো। কিন্তু কি জানি এখন কাঁদল না। তার মনে ধ্রুবর মুখটা জলজ্বল করতে লাগল। সে তো সত্যিই তাদের দেখেছে। সে ম্লানমুখে ফিরে এল বটে, কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা আনন্দের অনুভূতি জেগে রইল।

প্রবন্ধ
রাশিয়ার ছেলেমেয়ে

শ্রীবিনয় ঘোষ

কোন দেশের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সে দেশের শিক্ষার প্রসার ও প্রভাবের উপর। আধুনিক রাশিয়ার কথা ভাবলে আমাদের মনে হয় যেন তার এই অকল্পিত উন্নতি কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যে সম্ভব হ'য়েছে। কিন্তু রাশিয়ার উন্নতির মূলে কোন ভৌতিক খেলা নাই, আছে সে-দেশের বৃদ্ধ, যুবক ও শিশুদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও মনের দৃঢ়তা। নিজের হাতে তারা নিজেদের দেশকে সোণার দেশ করে' গড়ে' তুলেছে। উন্নতির কাজে যোগ দেবার প্রারম্ভেই তারা বুঝেছিল যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর দানব যে দেশের বুকের উপর হাটু গেড়ে বসে' রক্ত শুষ্‌ছে, সে হ'চ্ছে নিরক্ষরতা। তাই তারা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এই দানবের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করলে। এই দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ে আর সেই কাহিনীর প্রধান নায়কনায়িকা রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে মন বিস্ময়ে ভরে' ওঠে! রাশিয়ার কোন শিশুর মুখের দিকে চাইলেই দেখতে পাবে কতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেই মুখ, আশায় ও অনুপ্রেরণায় কতো উজ্জ্বল! কি ভাবে দেশের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এই সব ছোট শিশুরা অক্লান্ত অভিযান করেছে এবং কি ভাবেই বা তারা নিজেরা শিক্ষা পেয়ে দেশের ভাবী সৈনিক হিসেবে গড়ে' উঠ্‌ছে, সেই সম্বন্ধেই তোমাদের কয়েকটি কথা বলব।

মাত্র পঁচিশ বছর আগেও রাশিয়াতে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা আটাত্তর জন। এই বৃহৎ অশিক্ষিতের সংখ্যা বাইশ বছরের মধ্যে মাত্র আটের কোঠায় এসে পৌঁছায়। বাইশ বছর আগে ছিল বাইশজন শিক্ষিত আর বাইশ বছর পরে দেখতে পাই শতকরা বিরোনব্বুই জন শিক্ষিত! এটা একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ব'লেই মনে হবে তোমাদের। আর বাস্তবিকই রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন যে খুব ভালো ছিল তাও নয়। স্কুলের সরঞ্জাম বা শিক্ষকের অভাব ছিল। পাঠ্যপুস্তকেরও রীতিমত বন্দোবস্ত কিছু ছিল না। অথচ এখন সোভিয়েট রাশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি শ্রমিক ও প্রত্যেকটি চাষী লিখতে পড়তে পারে। রাশিয়ার যুবকরা মিলিত হয়ে একটি সঙ্ঘ গঠন করে আর সেই সঙ্ঘটির নাম দেওয়া হয় "নিরক্ষরতা ধ্বংস সঙ্ঘ" (Down With Illiteracy Society)। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে দেশ থেকে নিরক্ষরতা নির্ম্মূল করা। এর প্রধান কাজ হ'চ্ছে অশিক্ষিতদের প্রথমে শুধু পড়তে ও লিখতে



ছেলেমেয়েরা ড্রিল করছে

শেখানো ! পরে তাদের উচ্চশিক্ষারও বন্দোবস্ত করা হয়। প্রত্যেক স্কুলে এই "নিরক্ষরতা ধ্বংস সঙ্ঘের" একটি করে' শিশুদের শাখা-সমিতি আছে—সেগুলিকে বলা হয় "Children's Cell"। এই Cell থেকে উৎসাহী শিশুদের বেছে নিয়ে ছোট ছোট Brigade গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি Brigade-এর উপর নির্দ্দিষ্ট একটি জেলা বা কয়েকটি গ্রামের ভার দেওয়া হয়। সেই জেলায় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে গিয়ে ছেলেরা কাগজ পেন্সিল নিয়ে অশিক্ষিতের সংখ্যা গণনা করে। অলিগলিতে বস্তিতে বস্তিতে পর্য্যন্ত তারা যায়। অনেক সময় গ্রামের বা বস্তির বাসিন্দারা তাদের গায়ে কাদামাটি ছুঁড়ে মেরেছে, জল ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু তারা পিছিয়ে আসে নি। সংখ্যা গণনা শেষ হবার পর, পাঠ্যপুস্তকের অভাবের জন্যে কাগজ কেটে অক্ষর তৈরী করে' বিলোনো হ'তো। আমাদের এদেশে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হ'লে যেমন দল বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে সেবকসঙ্ঘের লোকেরা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে' বেড়ায়, তেমনি রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা এই সব গরীব গ্রাম্য অশিক্ষিতদের বিনা খরচে কাগজ পেন্সিল সরবরাহ করবার জন্যে পথে পথে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করে' বেড়াত। কোলের ছেলে নিয়ে মায়েদের লেখাপড়াতে মন দেওয়ার অসুবিধা হয় বলে' প্রত্যেক স্কুলে একটি করে' শিশুদের গৃহের পৃথক বন্দোবস্ত আছে। সেখানে শিশুদের ভিতর থেকেই দু'জন monitor

ঠিক করা হয় এবং তাদের উপর সব ছোট কোলের ছেলেদের ভার দিয়ে মায়েরা লেখাপড়াতে মন দেয়। শিশুরাই হয় তাদের বৃদ্ধ পিতামাতার শিক্ষক। এ ছাড়াও প্রত্যেক গ্রামে একটি করে' 'পাঠকুটীর' বা 'Reading Hut'এর বন্দোবস্ত আছে। সেইখানে ছেলেরা মিলিত হয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সেইদিনকার খবরের কাগজ থেকে দরকারী সব খবর পড়ে এবং পরস্পর আলোচনা করে। আজ রাশিয়ার বুকের উপর থেকে সব কুসংস্কার আবর্জ্জনা ধুয়ে মুছে' গেছে, তার সমস্ত কৃতিত্ব এই শিশুদেরই প্রাপ্য। শুধু তাই নয়, আজ রাশিয়ার যে লক্ষ লক্ষ লোক লিখতে পড়তে শিখেছে তা' কেবল শিশুদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যেই। এই সব শিশুরা কি ভাবে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হ'য়ে ওঠে তা তোমাদের সকলের জানা উচিত!

রাশিয়ার সাধারণ স্কুলকে 'গৃহ' বলা চলে। এই গৃহগুলি অনাথ, আশ্রয়হীন, অর্দ্ধভুক্ত ছেলেমেয়েদের জন্যে। ধনীর গৃহের মতো এ গৃহ আসবাবপত্তরে ঠাসা নয়, খুব সাদাসিধে। মস্কোর (Moscow) এই এক একটি গৃহে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের একশ'টি করে' ছেলে-মেয়ে থাকে, খায়, ঘুমোয়, লেখাপড়া শেখে, খেলা করে। দিনের বেলা আরও একশ'টি করে' গরীবের ছেলেমেয়েরা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আবার সন্ধ্যা হ'লে তাদের বাপ মা আত্মীয়স্বজনের কাছে ঘরে ফিরে যায়। এই দু'শটি ছেলেমেয়ে বাদ দিয়েও চল্লিশটি পরিবার এখানে বাস করে, যদিও স্কুলের কার্য্যকলাপের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। এই থেকে মস্কোর এই শিক্ষাগৃহগুলির আয়তন সম্বন্ধে তোমাদের খানিকটা ধারণা হবে আশা করি। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতিও ভিন্ন ধরণের, ঠিক আমাদের দেশের মতো নয়!

সকাল সাড়ে সাতটায় স্কুলের কাজ সুরু হয়। বেলা আটটার মধ্যে সব ছেলেদের প্রাতরাশ খাওয়া শেষ হ'য়ে যায়। তারপর বেলা একটা পর্য্যন্ত তারা কেউ ছুতোরের, কেউ কামারের এবং আরও নানারকম বিভাগের কাজ শিখবার জন্যে কারখানায় যায়। বেলা একটা থেকে দু'টো পর্য্যন্ত তাদের দুপুরের খাওয়া ও বিশ্রামের সময়। দু'টো থেকে চারটে পর্য্যন্ত স্কুলের ক্লাস তখন তারা নিজেরা লেখাপড়া শেখে। বিকেল পাঁচটার সময় জলখাবার খাওয়ার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তারা ক্লাবে স্ফূর্ত্তি করে। মাঝখানে সন্ধ্যা সাতটার সময় তারা নৈশভোজন শেষ করে' নেয়। এই ক্লাবগুলি ঠিক আমাদের এখানকার ক্লাবের মতো নয়। বাজে গল্প-গুজবের মজলিস্ এখানে বসে না। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত, এই পাঁচঘণ্টা সময়কে ক্লাব বলা হয়। খেলার ক্লাব আছে, অভিনয়ের ক্লাব আছে, গানের ক্লাব আছে, আবার রাজনৈতিক ক্লাবও আছে। কাছাকাছি যে চিত্রকর থাকেন তিনি হয়তো সেই সময় এসে যারা চিত্রপ্রিয় তাদের ছবি আঁকতে শেখান। একদল হয়তো নিজেদের পত্রিকার



ছেলেরা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনছে

কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কেউ কেউ আবার অর্কেষ্ট্রাতেও যোগ দেয়; দেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হ'য়ে থাকে। এইসব ছেলেদের ভিতর থেকে অনেকে চিত্রকর, গায়ক ও অভিনেতা হিসেবে বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে। কেউ কেউ মিস্ত্রীর কাজকর্ম্মে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যে পরে তারা সেই সব দিকে বিশেষভাবে শিক্ষা পেয়ে দেশের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার হ'য়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে এই সব বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর দশ, কুড়ি, ত্রিশ জন ছাত্রকে প্রত্যেক শিক্ষাগৃহ থেকে এই সব স্কুলে বিশেষ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তোমরা হয়তো ভাবছো তাদের দিয়ে জোর করে' কাজ করিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু তা' নয়। তাদের কখন জোর করে' কোনদিন কিছু করানো হয় না, নিজেদের ইচ্ছামত তারা কাজ করে। একবার একটি অহঙ্কারী ছেলে বলেছিল, "তা' হ'লে তুমি চলে' যেতে পারো। এখানে থাক্‌লে কাজ করতে হবে। তুমি কি আমাদের মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে খেতে চাও?" কিছুদিন পরেই দেখা গেল সেই ছেলেটি মন দিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেছে!

তোমরা হয়তো ভাবছ যদি কোন নূতন ছেলে এসে কাজ করতে না চায় তবে তাকে কি ভাবে কাজ করানো হয়? এসব বিষয় নিয়ে শিক্ষকরা মাথা ঘামান না। ছেলেদের

একটি সঙ্ঘ আছে সেই সঙ্ঘের সভা আহ্বান করে' এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। যদি তারা কোন উপায়েই তাকে আয়ত্তে আনতে না পারে, তা' হ'লে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া, তা' ভিন্ন তাঁরা আর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, সব বিষয়ে ছেলেদের যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয়। জীবনের অন্য অন্য কঠিন বিভাগের শিক্ষক তারা নিজেরাই, শিক্ষকরা দূর থেকে পর্য্যবেক্ষণ করেই খালাস। তোমরা যেমন এখানে কেউ কোন দোষ করলে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে শিক্ষকের কাছে নালিশ করো, ওদেশের ছেলেরা সে-রকম করে না। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করলে—সময়মত আবার নিজেরাই মিটমাট করে' নেয়।

স্কুলের বা শোয়ার ঘর খুব সাধারণ গরীবের ঘরের মতো—কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মনে কোরো না যে কোন চাকরে তাদের এই সব কাজকর্ম্ম করে দেয়। ছেলেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে। শৈশব থেকেই তাদের এমন শিক্ষা যে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন জীবনে কোন দিন অনুভব করে না। বাবুগিরি করবার মতো কারও বেশী পোষাক থাকে না। প্রত্যেকের একটি করে' টুথ্ ব্রাশ, চিরুণী, তু'টি সার্ট, তু'টি প্যাণ্ট আছে। নিজেদের আহার পর্য্যন্ত তারা নিজেরা পাক করে এবং নিজেরাই পালা করে' পরিবেশন করে। কারও অসুখ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে' আবার সে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে যোগ দেয়। এইভাবে ছোটবেলা থেকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম্ম তারা নিজেরাই করে' নেয়, ঘুম থেকে উঠে রাতে বিছানায় শুতে যাবার আগে পর্য্যন্ত তারা কাতরনয়নে পরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে থাকে না। তাদের জীবন এই রকম অপরের ছায়ায় নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে' ওঠে না বলেই তারা ভবিষ্যতে নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে নিজেরা সোজা হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে, আত্মবিশ্বাসী হয়, সত্যিকারের মানুষ হয়, কারণ সব শিক্ষার বড়ো শিক্ষা যে আত্মনির্ভরতা—তা' তারা দোলায় শুয়ে শুয়েই বুঝতে শেখে।

আর একটা জিনিষ তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত, ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ এখানে ভাইবন্ধুর মতো। তোমরা যেমন তোমাদের মাষ্টারমশাইকে দেখে জুজুর মতো ভয় করো, ওখানকার ছেলেরা সেরকম করে না। রাশিয়ার শিক্ষকরা তাঁদের ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে খেলা করেন, গল্প করেন, আবার হাসিঠাট্টাও করেন। ছেলেদের ঘুণাক্ষরে জানতে দেন না যে তাঁরা জুজু-জাতীয় কোন জীব। ভয় দেখিয়ে বা পিঠের উপর বেত ভেঙে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে-শিক্ষার যে কোন সার্থকতা নেই তা' তারা জানেন। সেখানে মনের



স্বাস্থ্যকর গৃহ উদ্যানে রাশিয়ার অগ্রদূত শিশুদল

মুক্ত আবহাওয়ায় শিক্ষার পল্লবিত হ'য়ে ওঠে, তার ডালে ডালে মিষ্ট ফল, রঙবেরঙের ফুল ফোটে।

রাশিয়ার শিশুরা যে শুধু লেখাপড়া বা নিজেদের কাজকর্ম্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে তা' নয়, তারা নিজেদের দেশকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলে থাকে না। জাতির জীবনের গতিবিধির সঙ্গে তাদের জীবন যে জড়িয়ে আছে তা' তারা শৈশব থেকে বুঝতে শেখে। দেশসেবা তাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। তোমাদের যেমন নিজেদের দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান নিজেদের পাড়াটুকুর মধ্যে আবদ্ধ, দেশের মানুষ বলতে তোমরা যেমন প্রতিবেশী ভিন্ন আর কিছু জানো না, দেশের দুর্দ্দশার কথা, দেশের অবনতির কথা, তোমরা যেমন বই-এর পাতায় বা খবরের কাগজ পড়েই হাঁফ ছেড়ে বাঁচো, রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা কিন্তু তা' করে না। দেশের প্রত্যেকটি সমস্যা জানবার জন্যে তাদের যেমন আগ্রহ, তেমনি তার কবল থেকে মুক্তির পন্থাও তারা চিন্তা করে, সকলে মিলিত হয়ে আলোচনা করে। দেশ ও সমাজকে তারা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। অক্লান্তভাবে তার সেবা করে তারা অগাধ তৃপ্তি ও আনন্দ পায়।

রাশিয়ার ছোট ভাইবোনদের কথা কিন্তু পড়েই যেন তেমন ভুলে যেও না। তারাও তোমাদের মতো ছোট ছোট ভাইবোন। কি ভাবে তারা দিন কাটায়, কি ভাবে নিজেরা শিক্ষা পেয়ে মানুষ হয়ে ওঠে, কি আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তারা জীবনের পথে চলে. তাদের নিবিড় দেশপ্রেম, গভীর আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের কথা আশা করি তোমরাও তোমাদের রোজকার কাজের মাঝখানে মনে রাখবে।



রঙ্গিলা বৌ

শ্রীসুকুমার দে সরকার

কালশরীর বিলের জলে একটা রূপোলী ঢেউ শির শির করে এগিয়ে এল। শরবনের শুকনো শরে হাওয়া ঢুকে বাঁশির মত মধুর আওয়াজ স্বচ্ছ আকাশে কেঁপে কেঁপে উঠে যাচ্ছে। কালশরীর বিল, বিস্তৃত, উদাস, মরুভূমির মত দিগন্তে ছড়িয়ে আছে। যতদূর দৃষ্টি চলে জল আর জল। জলার পূব গা ঘেঁসে বন ঘন সবুজ থেকে ঘনতর হতে হতে কালচে সবুজ হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে। উষার ধূসর ছোঁয়াচ লেগেছে বনের মাথায়। নিস্তরঙ্গ জলার রূপোলী ঢেউটা শির শির করে আসতে আসতে শরবনে একটা সাপ হয়ে মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর উঁচুতে যাযাবর বুনো হাঁসের ডাকে পৃথিবী যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে সূর্যোর দিকে মুখ ফেরাল।



হাঁসেরা সব আসছে।

অনেক দল এসে পৌঁছে গেছে, আরও আসছে। দূর দূরান্ত দেশে শীতে জমে গেল হ্রদ জলা বাদা। সেখানে কুয়াশার সঙ্গে নামছে বরফ। হাঁসেরা তাই গরম দেশে এল চলে। গরম দেশে শীতটা কাটিয়ে গ্রীষ্মের আগেই তারা আবার ধরবে আকাশ পথ। এখন শীতের কুয়াশাভরা আকাশ, এখানে বুনো হাঁসের চিকণ ডানায় চিত্রিত হয়ে উঠল।

জলার ধারে শরবন থেকে উঠে জমীটা যেখানে ঢালু হয়ে উঠে গেছে, সেখানে সবুজ ঘাসে ঘন একটা জায়গা দেখে রঙ্গিলা তার বাসা বেঁধেছে। রঙ্গিলার বৌ দিনরাত ডিমের ওপর বসে আছে। কচি কচি সাদা দুধের মত দুটো ডিম।

রঙ্গিলা আকাশের দিকে চেয়ে বলল—দেখেছ এখনও সব এসে পৌছাল না। আর দেরী হলে পথে ঠাণ্ডায় জমেই যে মারা যাবে। আমাদের এদিকে বাচ্ছাদের ফোটবার সময় হোল; রঙ্গিলার বৌ বলল—ভালয় ভালয় হয়ে গেলে বাঁচি!

—কেন, এখানে আর ভয় কি?

—তা কি আর বলা যায়? চোখ জলা পেঁচাগুলোকে কিছু বিশ্বাস নেই। কোথা থেকে যে হতভাগা সাপের পো এসে আমার ডিম বাচ্ছাদের মেরে খাবে কিছু বলা যায় না—

ডানা ফুলিয়ে ঘাড় বেকিয়ে রঙ্গিলা গরব করে বলল—ওঃ আসুক না একবার, ঠুকরে সেরে দেব না!

বৌ বলল—কত মুরোদ জানা আছে।

—"তোমার একটুও বিশ্বাস নেই আমার ওপর"—রঙ্গিলা জবাব দিল।

বাসা থেকে উঠে রঙ্গিন ডানাটা মেলে রঙ্গিলা একবার ঝটপট করে উঠল তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে রূপোলী স্বরে ডেকে উঠল—প্যাক প্যাক পেঁ-য়া-ক!

তারপরে থপ-থপ করে সে নেমে এল জলার ধারে। জলার জলে ঠোঁটটা লাগিয়ে সে যেন একবার জলের স্বাদটা দেখে নিল, তারপরে আলগোছে নরম সাদা বুকটা জলের ওপর ভাসিয়ে দিয়ে পেছনে জলের শিরশিরে রেখা রেখে এগিয়ে গেল। জল এখানে গভীর নয়। নীচে নরম কাদা মাটি, মাঝে মাঝে শালুক ফুটে আছে। টুপ করে গলাটা জলের ভেতর ডুবিয়ে দিল রঙ্গিলা, পেছনে পুচ্ছটা তার উঁচু হয়ে উঠল। এখানকার জলে অনেক শামুক গুগলী পাওয়া যায়। নিশ্চিন্ত মনে রঙ্গিলা তার প্রাতরাশ সেরে নিল।

আকাশে সূর্য্যদেবের সোনার মুকুট ঝলসে উঠেছে। বন থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত সব শব্দ। দূরে দূরে হাঁসেরা ভাসছে জলে। রঙ্গিলা ফিরল ডাঙ্গার দিকে। গিন্নীকে তার খানিকটা ছুটি দিতে হবে। সে সেরে নেবে প্রাতরাশ। ততক্ষণ ডিমের ওপর বসবে সে। রঙ্গিলা ভাসতে ভাসতে শরবনের গা ঘেঁসে ডাঙ্গায় এসে লাগল। একটা মুহূর্ত্ত। শরের গুচ্ছ চামরের মত রঙ্গিলার মাথায় হেলে পড়েছে, শিরশির করে কাঁপছে মৃদু হাওয়ায়। রঙ্গিলা ডাঙ্গায় পা দিতে যাবে, কি যেন কিলবিল করে উঠল পায়ের নীচে। রঙ্গিলা প্যাক্ করে ডেকে সরে যেতে গেল সাপটা তখন জড়িয়ে গেছে তার পায়ে। ঝটপট করে রঙ্গিলা গিয়ে ডাঙ্গায় পড়ল আর তীক্ষ্ণ ভাবে ডেকে উঠল—প্যাক প্যাক।

একটা করুণ চীৎকার, সাপটা ছোবল মেরেছে রঙ্গিলার নরম সাদা বুকে! মৃত্যু-কাতর সে চীৎকার কেঁপে কেঁপে আকাশে উঠে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল।

—পেঁ-যা-ক্!

রঙ্গিলা ঢলে পড়ল শরবনের কোলে। কালো সাপটা কিলবিল করতে করতে নেমে গেল। শরবনের শুকনো শরে বাতাস ঢুকে রঙ্গিলার করুণ চীৎকার যেন উদাস জলার ওপর ছড়িয়ে দিতে লাগল।

বাচ্চারা ফোটবার আগেই বাপকে হারাল তারা।

চিকির কাছে পৃথিবীটা ভারী সুন্দর এখন। হবে নাই বা কেন? স্ফূর্ত্তি মাখা তার শরীর নরম তুলতুলে। সোনালী উজ্জ্বল চোখ, ধারাল নখ আর দাঁত। অনেক বিশ্বাস তার মনে। সে এখন মা ছাড়াই বলে চলা ফেরা করে বেড়াতে পারে। বনের কন্দরে কন্দরে কত নতুন বিস্ময়—চিকি অবাক হয়ে যায়। বুড়ো বেঁজীরা চিকির মাকে বলে—ছেলে এত বড় হোল এখনও সাপ মারতে শেখালে না এ কি?

চিকির মা হাসে, বলে—রক্তের তেজ যাবে কোথায়? ও শেখাতে হয় না, শত্তুরের সামনে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।

চিকি এখন টুকটুক করে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। বনে খাবারেরও ভাবনা নেই নতুন জিনিসেরও অভাব নেই ভারী মজা। সেদিন সকালে চিকি বন থেকে বেরিয়ে এল জলার দিকে। বন এখন কেমন যেন জীবন্ত। দলে দলে হাঁসেরা নেমেছে জলায়। হাঁসেদের সাথে চিকির শত্রুতা নেই—তারা ত আর সাপ নয়। মা বলে দিয়েছে—খবরদার চিকি হতভাগা সাপগুলোকে কখন বিশ্বাস করিস নি! হাঁসেরা শান্ত নিরীহ। তাদের চলা ফেরা জলের ভেতর ডুব দেওয়া চিকির অদ্ভুত লাগে। চিকি এদিক ওদিক চাইতে চমকাতে চমকাতে এগিয়ে চলে।

রঙিলা বৌ

শ্রীসুকুমার দে সরকার

বেলা বয়ে যায়; রঙ্গিলা এখনও ফিরল না। রঙ্গিলার বৌ ডিমেদের ওপর বসে বসে ভাবল---ডিম ফোটবার সময় হোল---তুলতুলে নরম বাচ্ছা হবে, তার এখন কত কাজ। তবু জীবনটা ত রাখতে হবে! তারও ত কিছু খাওয়া দরকার কিন্তু রঙ্গিলার হুঁস নেই। সে বোধহয় এখন পেটুকের মত খেয়েই চলেছে। নাঃ আর পারা যায় না!

রঙ্গিলা বৌ উঠল। দেখা হলে এমন ধমক দেব যে বুঝিয়ে দেব মজা। ডানা ঝাপটে উঠে এল সে। থপথপিয়ে চলল জলার ধারে। হায় রে! সে ত আর জানে না যে রঙ্গিলা আর ইহজগতে নেই। রঙ্গিলা বৌ রাগ করে গলা ফুলিয়ে চলল জলার ধারে। সে জানে না যে ডিমগুলো একা ফেলে যাওয়ায় কি বিপদ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে! প্রকৃত পক্ষে, চিকি যদি সেদিন এদিকে না বেড়াতে আসত তা হলে!—সাপটা গন্ধে গন্ধে টের পেয়ে ডিমগুলোর লোভে এগিয়ে আসছিল। ঘাসের মধ্যে সর সর সর। রঙ্গিলা বৌ একবার চমকে উঠল। সাপটা তখন ঘাসের মধ্যে নিঃশব্দে স্থির হয়ে গেছে তাকে দেখে। মায়ের সামনে থেকে ডিম কেড়ে নিয়ে যেতে, অতি বড় শক্তিশালী প্রাণীও ভয় পায়। কোথাও আর শব্দ না শুনে রঙ্গিলা বৌ আবার নিশ্চিন্ত মনে এগোল জলার দিকে। সাপও এগোল তখন। হাঁসের বাসার কাছে সে প্রায় এসে পড়েছে। কচি ডিমের লোভে জল ঝরছে তার চেরা জিভে আর একটু এগোলেই ব্যাস!

কিন্তু সাপ আর এগোল না। গায়ের রক্ত তার হিম হয়ে গেল। সামনে একজোড়া সোনালী চোখ অদ্ভুত ভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। চির শত্রু বেঁজী সামনে, চুকচুক, চুকচুক করছে তার লাল মুখ। সাপ ফণা ধরে ফোঁস করে গর্জ্জে উঠল।

চিকি এর আগে কখনও সাপ দেখে নি। সাপের সামনে পড়ে সে অবাক হয়ে চেয়ে দেখল—ওঃ এই সাপ?

তার দৃষ্টিতে কোন রাগ নেই। স্থির বিস্মিত তার চোখ। কিন্তু সাপটা যেই ফোঁস করে গর্জ্জে উঠল অমনি জন্ম জন্মের অনুপ্রেরণায় তার রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু চিকিকে স্থির দেখে সাপ ঝাঁ করে এক ছোবল মারল। বিদ্যুতের মত একলাফে চিকি পেছিয়ে এল। ছোবল ফসকে সাপ আবার ফণা ধরে রাগে হিস্ হিস্ করতে লাগল। চিকি তখন যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাপটা দুলছে, সামনে চিকি পাথরের মত স্থির। সাপটা তাক্ করে মারল আবার ছোবল। সে ছোবল যদি গায়ে পড়ত তা হলে পৃথিবীর আলো চিকির ওইখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু চিকি বিদ্যুতের মত সরে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সাপটার মাথার ওপর দিয়ে চিকি মারল এক লাফ। সেই লাফের সঙ্গে তার ধারাল নখের ঘায়ে সাপের মাথাটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল।

—হিস্ হিস্ হিস্ হিস্

সাপ মরিয়া হয়ে আবার ছোবল মারল, আবার চিকির লাফ, আবার সাপের মাথা ক্ষত বিক্ষত। কিছুক্ষণ চলল এমনি। প্রতিটি ছোবলে চিকি সরে গিয়েই লাফ মারে আর তার নখের ঘায়ে সাপ ক্ষত

বিক্ষত হয়ে যায়। একটু একটু করে সাপটা নির্জ্জীব হয়ে আসতে লাগল তারপরে এক সময়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তার ফণা আর উঠল না শূন্যে। চিকির রাগ তখনও থামেনি। সাপটা লুটিয়ে পড়তেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপরে তার ধারাল দাঁতে সাপটা টুকরা টুকরো হয়ে গেল। মুখে রক্ত মেখে চিকি ছুটে চলল বাসায়। চিকির মা গর্ত্তের ধারে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল, তাকে দেখে চমকে বলে উঠল—ওমা এত রক্ত কিসের ?

—সাপ মেরেছি।

—"সাবাস!" বলে উঠল চিকির মা---তারপরে বুড়ো বেঁজীদের ডেকে সে বলল---কেমন বলিনি যে শেখাতে হবে না ? বুড়ো বেঁজীরা ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলল---ঠিক ঠিক !

শরবনের ধারে জলার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে রঙ্গিলা বৌ ক্রুদ্ধ স্বরে ডেকে উঠল—প্যাক প্যাক প্যা-অ্যা-ক !

এই ডাক রঙ্গিলার অনেক চেনা ছিল একদিন। এই ডাককে সে ভয় করত, জানত বৌট চটেছে। কিন্তু আজ কে সাড়া দেবে ? রঙ্গিলা বৌ একটু এগিয়েই দেখতে গেল তাকে। তার বুকা ধ্বক করে উঠল। রঙ্গিলা পড়ে আছে কেন—নড়েও না চড়ে না! ও তবে কি ? রঙ্গিলা বৌ তার কাছে এগিয়েই চীৎকার করে উঠল। তারপরে চীৎকার করতে করতে পাগলের মত রঙ্গিলার চারপাশে ছুটে বেড়াতে লাগল।



পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক

সাপের বিষে রঙ্গিলা নীল হয়ে গেছে। দুঃখের প্রথম ধাক্কাটা কমতেই তার নীল রং নজর পড়ল রঙ্গিলা বৌএর। সাপে কামড়েছে! সে সাপটা কোথায় ? তার বুক ভয়ে আবার ধ্বক করে উঠল। তার ডিমেরা যে খালি পড়ে আছে। দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে রঙ্গিলা বৌ উঠল বাসার দিকে। হায় হায় কি হোল ? কি হোল ?

পথে যেতে রঙ্গিলা দেখল একটা মরা সাপ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বৌ এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল তারপরে তার বাসায় অস্ফুট কি একটা শব্দ শুনে সে আবার পাগলের মত বাসার দিকে এগিয়ে গেল।

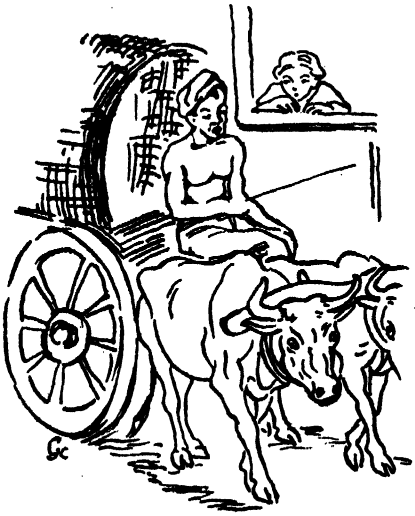
অস্ফুট করুণ মৃদু একটা শব্দ—পিঁক, পিঁক, পিঁক পিঁক !

বাসার সামনে এগিয়ে যেতেই রঙ্গিলা বৌ দেখল ডিম দুটো ফেটে তার মধ্যে থেকে দুটো রোঁয়া-হীন কচি কচি গলা তার দিকে চেয়ে ডাকছে—পিঁক পিঁক পিঁক পিঁক।

ভয়ের ঢেউ তার শরীর থেকে নেমে গেল। কচি বাচ্চাদের সে ডাক রঙ্গিলা বৌয়ের কাণে যেন মধু ঢেলে দিল। সে ছুটে গিয়ে ডানা দুটো খুলে বাচ্চাদের আগলে চাপা দিয়ে বসল।

গরুর গাড়ী

শ্রীসতীকান্ত গুহ



সকালবেলা উড়িয়ে ধূলো কোথায় দিলে পাড়ি
রাঙামাটির পথটি ধরে' ওগো গরুর গাড়ি ?
গরুর গাড়ি ঘুমের গাড়ি ওগো গরুর গাড়ি
আমায় তুমি চিনতে পারো ? পথের ধারে বাড়ি।
পথের ধারে বাসা আমার, ছোট্ট জানালায়
খানিক দূরে রাঙাপথের রথটি দেখা যায়।

খুব সকালে রাতের তারা নিবলো আকাশেতে,
ফুল হয়ে কি ঝরল তারা ভোরাই সুরে মেতে ?
তখন হঠাৎ মিঠে হাওয়ায় ভেসে আসে গান,
শুনি পথের গান ধরেছে কেশব গাড়োয়ান।
পথের ধারে বাসা আমার, ছোট্ট জানালায়
খানিক দূরে রাঙাপথের গানটি শোনা যায়।

গরুর গাড়ি দোলন-গাড়ি ওগো গরুর গাড়ি,
ধানের ক্ষেতে রোদ মেলেচে রঙীন আঁচল তারি।
হালের বলদ তাকিয়ে থাক মনটি বোঝা ভার,
মনটি কি তার যায় চলে ওই রাঙাপথের ধার ?
পথের ধারে বাসা আমার ছোট্ট জানালায়,
খানিক দূরে চষা ক্ষেতের গন্ধ ভেসে যায়।



একটু বেলা উঠল যখন, জাগলো যত পাড়া,
পণ্ডিতেরা পুঁথি পড়েন, তর্ক করেন কারা !
গয়লা পাড়ায় শ্যামোলী দোয় নোলক পরা মেয়ে,
কুমোর ভিটেয় খুটি ধরে কে রয় পথে চেয়ে ?
পথের ধারে বাসা যাদের, তাদের মনে হায়
রাঙা পথের গানটি যেন ডাকটি দিয়ে যায়।



গরুর গাড়ি স্বপনগাড়ি ওগো গরুর গাড়ি,
ঢিমে তালে ছন্দ বাজে চাকায় যে তোমারি।
তুপুর রোদে আগুন রোদে আকাশখানা ঘেরা
তখন বাঁশের বাঁশি বাজায় গাঁয়ের রাখালেরা।
পথের ধারে তাদের বাঁশীর সুরটি এসে হায়,
ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর গানে তোমার ঘুমটি ঢেলে যায়।

বিকেলবেলা গাছের ছায়া ঘুমোয় পথের ধারে
জল আনিতে কে চলেছে চলন দিঘীর পাড়ে?
তোমায় দেখে' দেখে' মনে সাধ জাগে না তার
রাঙা পথে রওণা হবে বাপের বাড়ী তার!
পথের ধারে এসে খোকন ডাক দিয়ে কয় আয়,
সেই কথাটি যায় কি ভেসে তোমার কাছে হায়?

গরুর গাড়ি যাতুগাড়ি ওগো গরুর গাড়ি,
সাঁঝের আলো ছড়িয়ে দিলে আবীর ধূলো তারি।
হাটুরেরা হাটের শেষে চলছে সারে সারে,
দিনের ছবি মিলিয়ে আসে রাতের অন্ধকারে।
ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর গানটি তখন ভেসে সাঁঝের বায়,
রাঙা পথের মনের কথা কাদের বলে যায়!



সাঁঝরাতে যে পূবআকাশে একটি তারা ফোটে
কাঁসরী পাড়ায় ঠন্‌ঠনাঠন্ আওয়াজ তবু ওঠে,
সেই আওয়াজে তোমার চাকার শব্দ এসে মিশে,
ঘুমপাড়ানী গানের সুরে ছড়ায় দিশে দিশে,
হঠাৎ হাওয়া গহণ বনে শব্দ তুলে' হায়,
'ঘুম এলোরে' বলেই চুপে চুপটি করে যায়।

গরুর গাড়ী

শ্রীসতীকান্ত গুহ

গরুর গাড়ি কেমন গাড়ি ওগো গরুর গাড়ি,
কোন্ দেশেতে বিদেশ তোমার, কোথায় তোমার বাড়ি ?
রাঙামাটির পথ কি তোমার ফুরিয়ে কভু যায় ?
রাতের শেষে পৌঁছে কি যাও আপন ঠিকানায় ?
জানো তুমি রাঙাপথের শেষে আছে পথ,
নদীর শেষে আছে জানো নীলটুপি পর্ব্বত ?



আছে আছে পথের শেষে আছে খেলাঘর,
খেলাঘরের শেষে আছে বুঝি স্বপন ঘর,
স্বপন ঘরে জাগর দেশের আলো এসে পড়ে,
সেই আলোতে পথের শেষে পথিক ফেরে ঘরে,
সেই আলোতে কখন্ তুমি আসবে বেলা শেষে,
না জানি কোন্ লুকিয়ে থাকা ভুলিয়ে-দেয়া দেশে !



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আশ্চর্য্যভাবে ডাঃ ক্রুলকে বিকল হাউই বোট সমেত উদ্ধার করবার পর অনেক দিন কেটে গেছে। বুধের আকাশ ছাড়িয়ে শূন্যপথে হাউইজাহাজ পৃথিবীর দিকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। দূরবীণ ছাড়াই এখনো বুধগ্রহকে মেঘের আবরণ সমেত দেখা যায় বটে, কিন্তু ক্রমশঃই তার আকার ছোট হয়ে আসছে দূর আকাশে।

ডাঃ ক্রুলকে অবশ্য সেই দিন থেকেই বন্দী রাখা হয়েছে কিন্তু সে শুধু তাঁর শয়তানীর ভয়ে নয়, তার চেয়েও আরো গুরুতর কারণে।

হাউই বোটটি উদ্ধার করবার পর ডাঃ ক্রুলের খবর নিতে গিয়ে তাঁকে আহত অবস্থায় দেখবার আশঙ্কাই সবাই করেছিল, কিন্তু তার বদলে তাঁকে দেখা গেছে—বদ্ধ উন্মাদ। ডাঃ ক্রুল একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন। হয়ত বুধের গহন অরণ্যে হারিয়ে যাবার পর নিদারুণ ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় অস্থির হ'য়ে, হয়ত সে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে হাউই বোটে আশ্রয় পাবার পরও আকস্মিক কল্পনাতীত ভূমিকম্পে বিহ্বল হয়েই তাঁর এরকম মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। কিম্বা এ উন্মাদ রোগের বীজ হয়ত তাঁর ভেতর আগে থাকতেই ছিল। কারণ যাই হোক, ডাঃ

ক্রুলের সমস্ত আগেকার অপরাধ ক্ষমা করলেও এখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব। বিশেষ সতর্ক পাহারায় তাই তাঁকে একটি কামরায় বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

ডাঃ ক্রুলের ওপর যত আক্রোশই থাক তাঁর এ পরিণামে সবাই বিশেষ দুঃখিত। হের ভোগেলের মনেই অবশ্য আঘাতটা সবচেয়ে বেশী লেগেছে। সারাক্ষণ তিনি মনমরা হয়ে একা একা কাটান। এত বড় একটা কীর্ত্তির গৌরব নিয়ে পৃথিবীতে ফেরার যেন তাঁর কোন উৎসাহই নেই। ডাঃ ক্রুলের এই পরিণামের জন্যে নিজেকেই যেন তিনি অনেকখানি অপরাধী বলে মনে করেন।

সমর ও অজয় এপর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও তাঁর এই মনোভাব দূর করতে পারেনি। ক্রমশঃ তারাও কেমন বিরক্ত ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। শূন্যপথের দিন-রাত্রি-হীন জীবন একেই দারুণ একঘেয়েমীতে দুর্ব্বহ তার ওপর এই ব্যাপার।

একদিন কিন্তু অজয়ের আর সহ্য হলনা। বুধ গ্রহের চেয়ে পৃথিবীর আকারই তখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে শূন্যপথের কালীর মত কালো আকাশে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান পর্য্যন্ত টের পাওয়া গেছে হাউই জাহাজের বিশেষ যন্ত্রে।

সেই বিষয়েরই উল্লেখ করে অজয় হের ভোগেলকে একটু উৎসাহের সঙ্গে বল্লে—"আর কি! পৃথিবী ত প্রায় পৌঁছে গেছি!"

হের ভোগেল কন্‌ট্রোল বোর্ডেই ছিলেন। নিতান্ত উদাসীন ভাবে তিনি উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ।"

হঠাৎ অত্যন্ত চটে উঠে অজয় বল্লে—"শুধু একটু ছোট্ট "হ্যাঁ" কি মশাই! আপনার যেন পৃথিবীতে পৌঁছোন না পৌঁছোন ত কিছু আসে যায়না দেখছি।"

হের ভোগেল তার দিকে ফিরে একটু ম্লানভাবে হাসলেন মাত্র। কোন উত্তর দিলেন না।

অজয় আরো বিরক্ত হয়ে ভোগেলের মনে আঘাত দেবার জন্যেই রূঢ়ভাবে বল্লে—"ডাঃ ক্রুলের জন্য আপনার যদি এতই দরদ তাহলে অত ফন্দি ফিকির কেন করেছিলেন! যখন ডাঃ ক্রুলেরই হাউইজাহাজ চুরি করে তাঁকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন, আমাদের প্যাঁচে ফেলে দলে ঢুকিয়েছিলেন তখন এ দরদ ছিল কোথা!"

হের ভোগেল কোন উত্তর দেবার আগেই অজয়ের বদলে সমর বল্লে—"আসল কথা আপনি যে ডাঃ ক্রুল নন তাই আমি বিশ্বাস করিনা!"

এবার হের ভোগেল হেসে বল্লেন—"কেন বলুনত!"

"আমরা ডা: ক্রুলের ছবি দেখেছি—তার সঙ্গে ষ্টাইনের চেহারার কোন মিল নেই। সে আপনারই মুখ, শুধু তফাৎ নাকের।"

হের ভোগেল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে নিয়ে বল্লেন—"শুনুন তাহলে, আপনাদের সব কথা তাহলে ভেঙে বলি। কেন আমার ছবিই ডাঃ ক্রুলের বলে চলেছে, কেন ডাঃ ক্রুলকে হটিয়ে তাঁর হাউই জাহাজ আমি দখল করবার চেষ্টা করেছি সব তাহলে বুঝতে পারবেন। আপনারা যে ছবি দেখেছেন তা সত্যিই আমার। কিন্তু তবু আমি ডাঃ ক্রুল নই। আমি ডাঃ ক্রুলের সহকারী। তাঁর সঙ্গে গত দশ বৎসর আমি কাজ করেছি। ষ্টাইন বলে যাঁকে জানেন সত্যিই তিনি ডাঃ ক্রুল। তিনি যেমন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক তেমনি দাম্ভিক নিষ্ঠুর স্বার্থপর। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তাঁর মন। বিজ্ঞানের প্রতিভা যে শুধু নিজের ও দেশের স্বার্থের জন্যে নয় সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করা দরকার এ কথা বোঝবার ক্ষমতাই তাঁর নেই। তিনি আশ্চর্য্য সব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, কল্পনাতীত নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন কিন্তু তাঁর কল নিজের জাতি ছাড়া আর কেউ তা পায়নি। পাছে বিদেশী কোন গুপ্তচর তাঁর কাজের সন্ধান পায় বা তাঁর কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা করে এই ভয়ে তিনি শুধু তাঁর পরীক্ষাগারের ঠিকানা নয় নিজের পরিচয় পর্য্যন্ত গোপন করেছেন। গত দশবৎসর ধরে তাঁরই ইচ্ছায় ডাঃ ক্রুল বলে আমি পরিচয় দিয়ে এসেছি। তাঁর নামে সর্ব্বত্র আমার ছবি বার হয়েছে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কয়েকজন ও জার্ম্মাণীর হর্ত্তাকর্ত্তাদের কয়েকজন ছাড়া কেউ এ রহস্য জানেনা। হাউই জাহাজ তাঁর শেষ অসাধারণ উদ্ভাবন। এ কাজে তাঁকে আমি সাহায্য করেছি কিন্তু তাঁর গোপন উদ্দেশ্য জেনে মনে মনে ভীত হয়ে উঠেছি। হাউই জাহাজ দিয়ে নতুন গ্রহ জয় করে তিনি মানুষের গৌরব ও অধিকার বাড়াতে চাননি, একটি জাতকে অন্যায়ভাবে শক্তিমান ও বড় করে তুলে পৃথিবীর অকল্যাণ ডেকে আনতে চেয়েছেন। তিনি অত্যন্ত গোপনে এ হাউই জাহাজ নিয়ে অভিযান করবার মতলব করেছিলেন। তাঁর একমাত্র সহকারী থাকবার কথা আমার। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষের মুখ চেয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। শুধু একটি জাতির জন্যে নয় সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আমি বুধগ্রহ জয় করতে চেয়েছিলাম। সেই জন্যেই তাঁকে বন্দী করে রেখে আমায় অন্য সহকারী খুঁজতে হয়েছে। নতুন গ্রহ জয়ের গৌরব যাতে কোন একটি বিশেষ দেশ না দাবী করতে পারে সেই জন্যেই আপনাদের মত পরাধীন দেশের লোককে আমি বেছে নিয়েছিলাম। আপনাদের প্রথমে আমি যে কথা বলি সে আমার নিজের কথা নয়,—ডাঃ ক্রুলের। ডাঃ ক্রুলকে বন্দী করলেও তাঁর অসম্মান আমি করতাম না। কিন্তু তিনি নিজে থেকে মুক্ত হয়েও যে হাউইজাহাজে লুকিয়ে

থেকে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন তা আমি ভাবিনি। নিষ্ঠুর ভাবে তিনি যে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিলেন তার জন্যে সত্যি এখন আর আমার তাঁর ওপর রাগ নেই। তিনি যেমন লোকই হোন, তাঁর কাছে অনেক বিষয়ে আমি ঋণী। এত বড় একটা প্রতিভাকে এই অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই আমার দুঃখ। তাঁর এ অবস্থার জন্যে আমিও যে খানিকটা দায়ী একথা আমি ভুলতে পারছিনা।"

হের ভোগেল চুপ করলেন। এই রুক্ষ চেহারায় প্রৌঢ় জার্ম্মাণের চোখের পাতা তখন সত্যি সজল হয়ে উঠেছে।

ডাঃ ক্রুলের প্রতি বিশেষ কোন সহানুভূতি না থাকলেও সমর এবং অজয়ও তখন বেশ অভিভূত হয়ে গেছে।

খানিকক্ষণ ধরে তারা বুকের কেমন যেন একটা কষ্ট বোধ করছিল। হঠাৎ সমরের মনে হল এত শুধু হৃদয়ের আবেগের দরুণ কষ্ট নয়। সে অজয়ের মুখের দিকে চাইলে—তারপর সাহস করে ঘরের স্তব্ধতা ভেঙ্গে বল্লে—"কি রকম একটা মনে হচ্ছেনা?

অজয় এবং হের ভোগেল দুজনেই যেন আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠে বল্লেন—হ্যাঁ, কিরকম একটা অদ্ভুত লাগছে!"

বলতে বলতেই—হের ভোগেল উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"বাতাস, বাতাস! এয়ার প্ল্যান্টে কি গণ্ডগোল হয়েছে, বুঝতে পারছেন না অক্সিজেনের অভাব!"

"অক্সিজেনের অভাব! কিন্তু এয়ার প্ল্যান্ট যে ঘণ্টা দশেক আগে আমরা তদারক করে এসেছি। কোন গোল তখন ছিলনা।"

বলে সমর হঠাৎ কি মনে করে টেলিভিসন যন্ত্রের একটি বোতাম শশব্যস্ত হয়ে টিপে দিলে। একটি সঙ্কীর্ণ ঘরের ছবি সেখানে ফুটে উঠতেই দেখা গেল তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

অজয় ও হের ভোগেল ব্যাকুলভাবে বল্লেন—'কি হয়েছে কি!'

সমরের গলা দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেরুল—"আমি জানতাম। এয়ার প্ল্যান্টের গণ্ডগোল বলতেই আমি এই ভয় করেছিলাম।"

"কি জানতে?"—অজয় তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করলে।

"ডাঃ ক্রুল আর আমাদের বন্দী নেই। তাঁর কামরা শূন্য!"

আগামী মাসে সমাপ্য।

বাঘের খেলা

শ্রীধরণী সেন

তার নাম ছিল যুং-সু। অবশ্য এটা তার সার্কাসী ছদ্মনাম।

ওয়াই-সার্কাসে প্রতি রাত্রে হাজার লোকের সামনে যুং-সু দেখাত বাঘের খেলা। গোটা বারো কেঁদো কেঁদো বাঘ নিয়ে নানা খেলা নানা কসরৎ দেখান তার নিত্য নিয়ম ছিল। তোমরা কে না সার্কাসে বাঘের খেলা দেখেছ—চাবুক ও চেয়ার হাতে নিয়ে বাঘেদের দৌড়ঝাঁপ করান, পিপের ওপর তাদের দাঁড়ান, আগুনের আংটার মধ্যে দিয়ে লাফ দেওয়া এসব দেখে তোমাদের কেমন ভয় ও আনন্দ দুই-ই হয়েছে।

ভয় হবার কথাই। বনের বাঘকে ধমকে ছেলেখেলা করান বড় চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু ওস্তাদ যুং-সু যখন বাঘের খেলা দেখাত, ওরে বাপ! বারোটা বাঘের সে ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনে ছোট ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠত। আর তার খেলাও ছিল একটু আলাদা ধরণের।

কিন্তু ওয়াই-সার্কাসের একশ এক রাত্রে যে খেলা দর্শকরা দেখেছিল সে সত্যিই বাঘের খেলা। কিন্তু কি করুণ মর্মস্পর্শী যে সে খেলা হয়েছিল, তা আমুদে দর্শকেরা প্রত্যক্ষ করেও কি কিছুমাত্র অনুভব করেছিল?

ওয়াই-সার্কাসে যুং-সু যেমন দেখাত বাঘের খেলা, তেমনি আর এক ওস্তাদ দেখাত সিংহের খেলা। এই সিংহ খেলোয়াড়ের নাম ছিল ওকামা। লোকটা ছিল যেমন ধূর্ত্ত তেমনি শয়তান। যুং-সুর সঙ্গে ওকামার প্রায় কথা কাটাকাটি হত। অবশ্য সুরু করত ওকামাই: পাকা ওস্তাদ কে আর বাঘ বড় না সিংহ বড়? কিন্তু সে মীমাংসা আজ পর্য্যন্ত হয়নি। তা'না হোক, ওকামা লোকটি সত্যি ছিল একটা শয়তান। রোজ খেলা দেখাবার আগে করত কি, চুপিচুপি সিংহগুলোকে সে আফিম খাইয়ে রাখত। কাজেই খেলার সময় সার্কাসে দর্শকদের সামনে সিংহগুলোকে নিয়ে সে যা খুসী তাই করতে পারত। আর এ কথা কেউ বিন্দুমাত্রও জানত না। যখন ওকামা তার কাঁচা মাথাটা সিংহের মস্ত হাঁ'র মধ্যে চালিয়ে দিত ও আবার আস্ত মাথাটাই বের করে আনত তখন দর্শকদের ঘনঘন হাততালি পড়ত! আর ওকামা এই মিছে গর্ব্বেও বেশ ফুলে উঠত।

কিন্তু ওয়াই-সার্কাসের লোকেরা অন্যান্য খেলোয়াড় ওস্তাদেরা মদগর্ব্বিত ওকামাকে মোটেই পছন্দ করত না। তারা যুং-সুকেই ভালবাসত।

যুং-সু অবশ্য নানা দুঃসাহসিক খেলা দেখাত কিন্তু বাঘের মুখে সে তার মাথাটা গলিয়ে বাজে বাহবা নেবার পক্ষপাতী ছিল না। তার ছোট্ট বয়স থেকে সে বাঘেদের দেখে আসছে। তার বাবা ছিলেন মস্ত শিকারী,

তিনি তাকে কত বাঘের ছানা উপহার দিয়েছেন। পাকা শিকারী হিসেবে সে জানে বাঘের শিরায় শিরায় বনের উষ্ণ রক্ত বইছে, বাঘের মজ্জাগত প্রবৃত্তি ও সংস্কারে ঘা দিতে অন্ততঃ য়ুং-সু কখনও রাজী নয়। না, সে জানে বাঘকে সে ধরণের শিক্ষা দিলেও মানুষের কাঁচা মাথা তার মুখের মধ্যে দেওয়া মানে আঁতে ঘা দিয়ে তাকে রাগান। তাকে তাতে পোষ মানান যায় না। বনের পশুদের নিয়ে এই ছেলেখেলা, এইধরণের অস্বাভাবিকতার ধার দিয়েও সে যেত না।

য়ুং-সুর মনে হত ওকামার সিংহগুলো বনের পশু নয়, যেন পোষমানা কুকুর। তার কেমন সন্দেহ হত। তবু য়ুং-সুকে কেউ কেউ বিদ্রূপ করতেও ছাড়ত না—য়ুং-সু মুখ বুজে থাকত কিছু বলত না। বরঞ্চ তার বাঘেদের নিয়ে শক্ত শক্ত জিমনাষ্টিক খেলা সে দেখাত ও তাতে সে নিজে বেশ খুসী হত। বাঘগুলোর মেজাজও বোধহয় খুসী থাকত।

কিন্তু বেশী দিন এমন গেল না।

একদিন ওয়াই-সার্কাসে বাংলাদেশের 'সুন্দর বন' থেকে এক মস্ত 'রয়েল-বেঙ্গল' মার্কা বাঘের আমদানী হল। কে একজন শিকারী এই বাঘটিকে সার্কাসে ভেট পাঠিয়েছে। য়ুং-সুর ওপর এর ভার পড়ল! চমৎকার প্রকাণ্ড তেজী বাঘ, লিক্‌লিক্ করছে তার গড়ন, কালো আর হলদে ডোরা-কাটা দাগে তার দেহ যেন শিল্পীর আঁকা। রং করা তার মস্ত মাথা, ধুসর বর্ণের জল্‌জ্বলে ছুটো বড় বড় চোখ! এক কথায় তাকে দেখলেই যেমন তখনই আদর করতে ইচ্ছে করে, তেমনি তার নাগালের কাছেও যেতে হৃৎকম্প হয়। য়ুং-সু একে দেখে ভারী খুসী হল। সে তার নাম রাখল—'শের সা'। বাঘটা কেমন যেন আলাদা রকমের; না, সার্কাসের অন্যান্য বাঘেদের মত মোটেই নয়। আভিজাত্যে ও সৌন্দর্য্যে বাঘটা যেন কোন অনাবিস্কৃত দেবতাদের অরণ্য থেকে মর্ত্তের মানুষদের পরীক্ষা করতে নেমে এসেছে!

আস্তে আস্তে য়ুং-সু শেরসার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেললে। দুজনে তাদের ভারী ভাব হয়ে গেল। ক্রমশঃ য়ুং-সু তাকে নানা খেলা নানা আদব কায়দা শিখিয়ে ফেললে। কিন্তু সে কখনও তার হাতে পিস্তল বা চাবুক রাখত না। তারি মিষ্টি কণ্ঠস্বরে ও চোখের ভাষায় য়ুং-সু শেরসাকে বশ করে ফেললে। বেশ একটা সুন্দর বোঝাপড়া তাদের যেন হয়ে গেল। শেরসার অদ্ভুত খেলা দেখে সার্কাসের দর্শকরা ঘনঘন হাততালি দিতে লাগল। এক একটা খেলা দেখান হয় আর তুমুল হাততালির মধ্যে য়ুং-সু ও শের সা পরস্পরের দিকে কৃতজ্ঞতা-চিত্তে দেখে। চোখের ভাবে যেন শের সা বলে: বন্ধু, তুমি আমাকে জিতে নিয়েছ; কিন্তু দেখো বন্ধু, মিছে উত্তেজনার মধ্যে আমার আত্মমর্য্যাদার কথাটা যেন ভুলে যেয়ো না। আপাততঃ এসো, 'হ্যাণ্ড-সেক' করি—আর আবার তুমুল কোলাহলের মধ্যে শের সা ও য়ুং-সু 'হ্যাণ্ড-সেক' করত।

তারপর খেলা শেষ করে শের সা খাঁচায় ফিরে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত। ওয়াই সার্কাসের কোলাহল, হট্টগোল, বিদ্যুতের এই জোরাল আলো, অচেনা লোকজন শেরসার একটুকুও ভাল লাগত না। তার বন্ধু য়ুং-সুর প্রতি মুগ্ধ হয়েই সে যেন যা কিছু করত।

শেরসা ও যুং-স্থর এই খেলা দেখে ওকামার চোখ ঈর্ষায় জ্বলে উঠত। কিন্তু সে বুঝলে এ বাঘটা যে সে বাঘ নয়—যেমন বিনীত তেমনি আবার দুর্দ্দান্ত। মনে মনে ওকামা ফন্দি ভাঁজতে লাগল।

শেরসার খেলা দেখে সার্কাসের অন্য বাঘগুলো আশ্চর্য্য হয়ে যেত। তারা ভাবত কি রকম বাঘরে বাপু! বড় বোকা তো—হাতের কাছে নিরস্ত্র কাঁচা শিকার পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছে! কিন্তু শেরসা তাদের মোটে ভ্রূক্ষেপ করত না। প্রকাণ্ড বীরের মত সে ভাবত: এতটুকু মানুষের কাছে আবার গায়ের জোর দেখাব কী! তাকে ভালবাসাই যায় আর যুং-স্থকে তার ভারী ভাল লেগে গিয়েছে। এক একবার তার নিজেরই ভাবনা হত। যখন যুং-স্থ তাকে পিপের ওপর থেকে জলন্ত আংটার ভেতর দিয়ে তার দিকে লাফাতে বলত, নিমরাজী হয়ে লাফাবার সময় শেরসার মনে হত—যুং-স্থর ঐ ঘাড়ের ওপর গিয়েই সে পড়ল বুঝি!

কিন্তু অমন ভুল সে কোনদিন করেনি। কেবল শান্ত চোখের ভাষায় মৃদু ভৎসনা করে সে যেন যুং-স্থকে বলত—এসব কিন্তু আমার ভাল লাগে না বাপু। এ রকম মারাত্মক খেলায় যুং-স্থকে সে এড়াতে চায়।

রাতের পর রাত ওয়াই-সার্কাসে যুং-স্থ তার শেরসাকে নিয়ে এই রকম আশ্চয্য খেলা দেখাত।

কিন্তু একশ রাতের পরের রাতে শেরসা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

আর সেই রাতে দুষ্ট ওকামা তার শয়তানী ফন্দী আঁটলে। আর যুং-স্থ সেও বুঝি উত্তেজনার বশে শেরসার আজন্মগত সংস্কারে প্রথম ঘা দিলে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওকামা যুং-স্থকে বললে: যতই তুমি শেরকে নিয়ে তোমার ঐ জিমনাষ্টিক কর না কেন হুঁ, মাথা গলাও দিকি ভায়া ওর হাঁ'র মধ্যে তবে বুঝি, হুঁ, তুমি ওস্তাদ বটে। আজ রাতে দেখা যাক্ আমার দুরজা (তার সিংহদলের একটা বড় বুড়ো সিংহ) আর তোমার শেরসার খেলা। দেখা যাক্, কার খেলায় বেশী হাততালি পড়ে।—বলে বক্র হেসে ওকামা সরে পড়ে। যুং-স্থর সামনে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে সে ভয়ও পায়।

ঘৃণায় যুং-স্থর মুখ লাল হয়ে ওঠে কিন্তু সে একটি কথাও বলে না। না, শেরসার প্রতি অন্যায় অস্বাভাবিক ব্যবহার কিছুতেই সে করতে পারে না। কিন্তু এই সয়তান ওকামাটা—!

অথচ হঠাৎ যুং-স্থ শেরসার খাঁচার দিকে চলল। গিয়ে সেখানে শেরসাকে দুচারটে রুটি খাওয়াবার বৃথা চেষ্টা করে জানালে সে তার মাথাটা তার মুখে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু শেরসার চোখ দিয়ে আগুণ বেরুতে লাগল, ভাবে গতিকে শাসিয়ে সে যুং-স্থকে জানিয়ে দিলে সে তার মাথাটা সে ছুঁতে চায় না। না, আলগোছে মুখের ভেতর সে এমন কিছুই রাখতে চায় না যা সে চিবিয়ে ফেলবে না। এরকম খেলা বাঘেদের মধ্যে চলে না।

যুং-স্থ বুঝলে তার অত্যন্ত ভুল হয়েছে। শেরসার প্রতি সে গভীর অবিচার করতে গিয়েছিল। শেরসার পিঠ চাপড়ে জানালে যে, না কিছুতেই সে তার সঙ্গে এই অস্বাভাবিক ব্যবহার আর করবে না। তখন আবার তাদের ভাব হয়ে গেল।

বাঘের লেখা
শ্রীধরণী সেন

সে রাত্রি ওয়াই-সার্কাসের একশএক ও শেষরাত্রি।

সমস্ত গ্যালারী লোকে লোকারণ্য। কোথাও এতটুকু জায়গা নেই, চারিদিকে লোক গিজ্‌গিজ্‌ করছে। নানারকম খেলা হবার পর এবার হবে বাঘ সিংহীর খেলা। ব্যাণ্ড বাজা শেষ হয়েছে। এবার যুদ্ধের বাজনার মত ড্রাম বাজতে সুরু হল। দর্শকেরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ছোট ছেলেমেয়েরা অজানা আশঙ্কায় কেঁদে উঠল।

খেলা সুরু হয়েছে। সার্কাসের মধ্যিখানে পাশাপাশি দুটো প্রকাণ্ড রিং, চারিদিক শক্ত লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। একটাতে ওকামার সিংহের খেলা আর একটাতে যুং-সুর বাঘের খেলা সুরু হল। সে কি খেলা! ঘনঘন তুমুল হাততালির মধ্যে দুজনেই উৎসাহে খেলা দেখাতে লাগল। ড্রামের বাজনা আর পশু মানুষের চীৎকারে সে মধ্যরাত্রেও ওয়াই-সার্কাস ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

কিন্তু শেরসার সঙ্গে খেলার সময় যুং-সু কি তার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাবে! শেরসাও কি তার বন্ধু তার গুরুকে ভুলে নিজের মজ্জাগত জঙ্গলী রক্তে হিংস্র হয়ে উঠবে!

ওকামার রিংএ সিংহগুলো বিরাট গর্জ্জনে তাদের প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ওকামার চাবুকের ইঙ্গিতে নানা খেলা দেখিয়ে বাহবা পেতে লাগল যুং-সুও আজ কেবল চোখের ইসারায় তার রিংএ বাঘেদের শক্ত শক্ত খেলা দেখিয়ে চলল, বাহবা সেও পেতে লাগল কিন্তু তার মনে হতে লাগল ওকামাই যেন বেশী হাততালি পাচ্ছে। যুং-সুর কপালের শিরাগুলো এই প্রথম বুঝি ঈর্ষায় ফুলতে লাগল।

ওয়াই-সার্কাসের একশ এক কালরাত্রি নিঃশব্দে দুপ্রহরে এগিয়ে চলেছে। সার্কাসের তাঁবুর ফাঁকে অন্তরালে রহস্যময় মিশমিশে আকাশ যেন কোন গভীর ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে নিঃশব্দে নীচেকার বাঘে-মানুষের বোঝাপড়ার অপেক্ষা করছে।

ওকামার খাঁচায় দুরজার খেলা আর যুং-সুর খাঁচায় শেরসার খেলা এবার সুরু হয়েছে। শেরসা যুং-সুর চোখের ভাষায় যে খেলা দেখায়, দুরজা সঙ্গে সঙ্গে ওকামার চাবুকের গর্জ্জনে সে খেলা দেখায়। ওকামার চাবুকের শানিত আওয়াজে ওয়াই-সার্কাসের তাঁবু কেটে যেতে থাকে। যুং-সুর কণ্ঠস্বর ও চোখের ভাষায় শেরসা নিঃশব্দে খেলা দেখিয়ে চলে। যুং-সুর হাতে পিস্তল নেই, চাবুকও থাকে না।

লকলকে আগুনের আংটার মধ্য দিয়ে শেরসা সহজে একলাফে পার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুরজাও অন্য রিংএ আর একটা আগুনের আংটা সগর্জ্জনে পার হয়ে গেল। শেরসা ও দুরজা পরস্পর এরকম কয়েকটি খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করল।

আবার ড্রাম বেজে উঠল আর দর্শকেরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখল ওকামা তার কাঁচা মাথাটা অনায়াসে দুরজার বিরাট মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দিলে!

শেরসা হতভাগ্য দুরজার এই নির্জীব খেলা দেখে অবাক হয়। ভাবে বুড়ো সিংহটার কি হয়েছে! কিন্তু ওকামার দিকেই তার হিংস্র দৃষ্টি পড়ে থাকে। ওকামার প্রতি তার ও যুং-সুর মনের ভাব ভিন্ন রক্তেও একই তাল দিতে থাকে।

আবার যখন ওকামা তার কাঁচা মাথাটা আস্তই তুরজার মুখের ভেতর থেকে বার করে নিয়ে এল তখন তুমুল হাততালি আর ঘন ঘন শিষ পড়তে লাগল। ধূর্ত্ত ওকামা দর্শকদের দিকে তিনবার লম্বা কুর্নীশ করে। বক্রদৃষ্টিতে যুং-স্যুর দিকে চাইলে। আর অমনি হাজার লোকের স্ফূর্ত্তির দৃষ্টি গিয়ে বিঁধল যুং-স্যুর ওপর। তামাসা দেখবার জন্য তারা রীতিমত পয়সা খরচ করে এসেছে।

উত্তেজিত হয়ে যুং-স্যু ভাবল যা হবার হোক, শেরকে তার হাঁ'র মধ্যে আমার মাথাটা একবার নিতেই হবে—তা সে তার ভাল লাগুক বা নাই লাগুক। এরকম ক্ষিপ্ত হয়ে যুং-স্যু অন্য বাঘগুলোকে রিং থেকে সরিয়ে দিলে। ভয়ে ভয়ে বাঘগুলো লেজগুটিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। শেরসার এটা ভালই লাগল। অন্য বাঘগুলো সে মোটে পছন্দ করত না। এবার একা একা সে যুং-স্যুর সঙ্গে তার সবচেয়ে ভাল খেলাটা দেখাবে। তারপর সে তার নিজের খাঁচায় ফিরে যাবে আর তার বন্ধু যুং-স্যু তার কাছে গিয়ে আদর করে বলবে—সে কি চমৎকার বাঘ!

স্থির শান্ত হয়ে শেরসা যুং-স্যুর পরিচিত ইঙ্গিতের অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু যুং-স্যু তার শেষ খেলার মধ্যে না গিয়ে হঠাৎ যখন তাকে রিংএর মধ্যস্থলে ইসারায় ডাকলে শেরসা ভারী আশ্চর্য্য হয়ে গেল। চোখের ভাষায় শেরসাকে তার আরো কাছে আসতে ইঙ্গিত করে যুং-স্যু চুপিচুপি বললে: বন্ধু, একবারটি তুমি আমার খাতিরে এটা কর—করবে না?

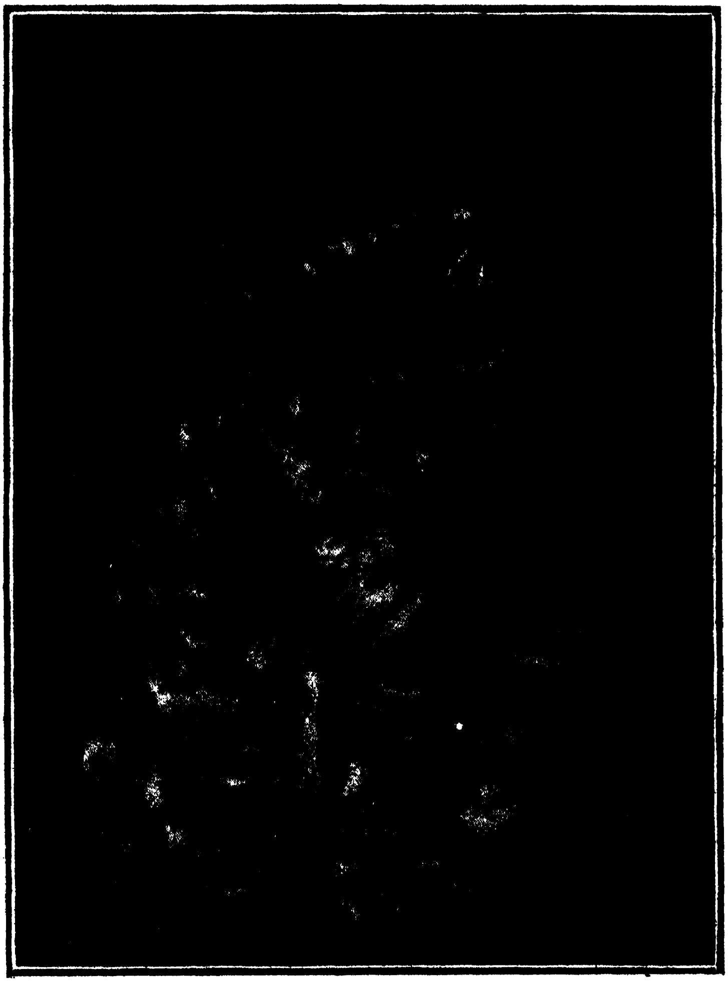
চারিদিকের সে তুমুল কোলাহল সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শেরসা তার জ্বলজ্বলে প্রশান্ত চোখে বললে: বন্ধু, এরকম তো কথা ছিল না। না, এ অনুরোধ, তুমি কোরো না। আমি আজ বড় ক্লান্ত। আমি আজ বড় ক্ষুধিত। শেষ খেলা করে আমি খাঁচায় ফিরে যেতে চাই।

কিন্তু যুং-স্যু শেরসার চোখের ভাষা কি আজ আদবেই বুঝতে পারলে না! হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সে শেরসার বিরাট মুখটা সজোরে খুলে ফেলে নিজের মাথাটা তার হাঁ'র মধ্যে চালিয়ে দিলে। আর—আর শেরসার দাঁতগুলো মুহূর্ত্তে ঝকঝকিয়ে উঠল, তার প্রকাণ্ড মুখখানা নিঃশব্দে, যেন আপন প্রবৃত্তিবশে তার নিজের যেন শত অনিচ্ছাসত্বেও যুং-স্যুর নরম গলার ওপর আস্তে আস্তে বুজে এল।

একমুহূর্ত্ত মাত্র!

যখন শেরসা তার দাঁত আলগা করে ফেললে—ড্রামের বাজনা বলির বাজনার মত হঠাৎ থেমে গিয়েছে, চারিদিক কেমন যেন সব থমথমে নিঝুম হয়ে পড়েছে! কোথাও এতটুকু টুঁ শব্দ নেই। শেরসার সেদিকে কিন্তু কোন ভ্রুক্ষেপ নেই; সে কেবল আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছে—যুং-স্যু কেন অমন চুপ হয়ে পড়ে আছে! চারিদিকের লোকেরা কেবলমাত্র তো নিংশ্বাস বন্ধ করেছে সে এমন কিছুই নয়। কিন্তু যুং-স্যু যে তার থাবার মধ্যে পড়ে আছে তার খেলা এখনও শেষ হয়নি কী? সে তো উঠছে না। শেরসার দিকে সেতো আগেকার পরিচিত সে মিষ্ট চাহনি দিয়ে কিছু তো বলছে না!

যুং-স্যুর স্থির ঘোলাটে চোখের দিকে শেরসা কতক্ষণ নিষ্পলক চেয়ে রইল। চোখের মধ্যে শেরসার সমস্ত ব্যাকুল আত্মাটা যেন থমকে স্থির হয়ে রইল—কখন্ তার প্রিয় বন্ধু তাঁর প্রভু যুং-স্যুর আত্মা উঠে তার সঙ্গে মিলিত হবে!



কি করুণ সে চীৎকার--।

কিন্তু ওয়াই-সার্কাসের সে স্তব্ধ রাতের যেন সহস্র প্রহর কেটে গেল, কিছুই হলনা। তখন শেরসা বুঝতে পারলে—না, আর কিছু হবার নয়।

সার্কাসের সাহেব ম্যানেজার শেরসাকে গুলি করবার আগেই শেরসা বুঝেছিল—তার বন্ধুকে তার দেবতাকে সে মেরে ফেলেছে! গুলিবিদ্ধ হবার মুহূর্ত্ত আগে সহসা সে তার রং করা প্রকাণ্ড মাথাটা একবার উঁচু করে তুলে ভীষণ গগনভেদী এক চীৎকার করে উঠল। সে বিরাট চীৎকার ওয়াই সার্কাসের তাঁবু ভেদ করে দুপ্রহর নিশুতি রাতের স্তব্ধ আকাশে গিয়ে পৌছল! সমস্ত লোকেরা সে চীৎকার শুনে ভয়ে কেঁপে উঠল।

কিন্তু কি করুণ সে চীৎকার—!

সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—!

আমার ম্যাজিক

যাদুকর—পি, সি, সরকার

আজকে আমি রংমশালের পাঠকবর্গকে একটী ছোট তাসের খেলার কৌশল বুঝাইয়া দিব। একটু পরিশ্রম করিয়া ইহা ঠিক করিয়া লইলে তাহারাও সহজে এই ম্যাজিকটী দেখাইতে সক্ষম হইবে। খেলাটীর নাম 'আজ্ঞাবহ তিন'—"The obedient Threes."

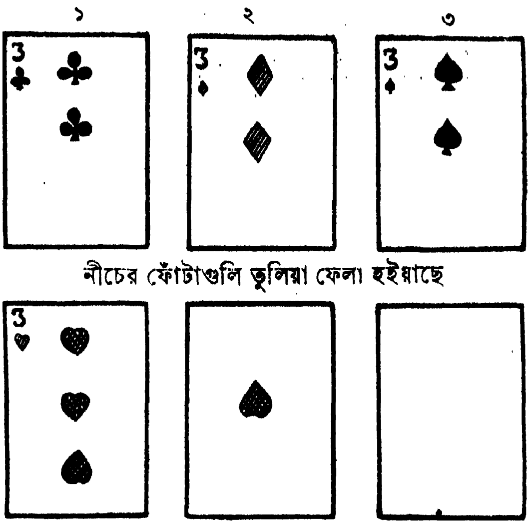


Fig I

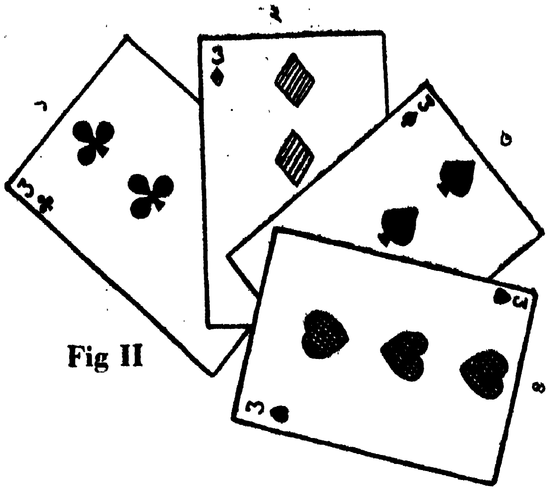


Fig II

The Obedient Threes

'রংমশাল' পত্রিকার পরিচালক মহাশয় একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি যখন বিলাতে ছিলেন, সে দেশের 'ম্যাজিক বাক্স' কিনিয়া কয়েকটি কৌতুকপ্রদ খেলা শিখিয়াছেন। বিলাতের বড় বড় দোকানে অনুরূপ ম্যাজিকের বাক্স যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয় এবং ঐগুলি Conjurer's Cabinet নামে পরিচিত। তিনি বলিয়াছিলেন যে চারিটী সাহেব হাতে লইয়া উহার রং পরিবর্ত্তন করার কৌশল ঐ ম্যাজিকবাক্স হইতে তিনি শিখিয়াছেন। আমি এইবার ঐ খেলায় গুপ্তকৌশল প্রকাশ করিয়া দিতেছি। এক প্যাকেট তাস হইতে চারিটী 'তিন' বাছিয়া লও—যথা, ইস্কাবনের তিন, চিরাতনের তিন, রুহিতনের তিন ও হরতনের তিন। এইবার আরও দুইটী তাস লও—হরতনের এক (টেক্কা) ও সাদা তাস একটী। (সাদা তাস না থাকিলে রুহিতনের টেক্কার মধ্যের ফোঁটা ঘসিয়া তুলিয়া—সাদা করিয়া লইতে হইবে।) এইবার ঐ চারিটি তিন ও একটি টেক্কা ও একটি সাদা এই মোট ছয়টি তাসের সাহায্যে এই খেলাটি হইবে। খেলাটি এই :—

আমার ম্যাজিক

পি, সি, সরকার

যাদুকর সর্ব্বপ্রথম চারিটি তাস দর্শকদিগকে দেখাইয়া বলিবেন যে তাঁহার হাতে মাত্র চারিটি তাস আছে যথা, হরতনের তিন, ইস্কাবনের তিন, রুহিতনের তিন ও চিরাতনের তিন। এই চারিটি তাস হইতে তিনি হরতনের তিন তাসটি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া হরতনের টেক্কাটি তুলিয়া লইবেন। তখন হাতের সমস্তগুলি তাসই টেক্কা হইয়া যাইবে যথা, হরতনের টেক্কা, ইস্কাবনের টেক্কা, রুহিতনের টেক্কা ও চিরাতনের টেক্কা। যাদুকর ইহার পর হরতনের টেক্কাটি রাখিয়া দিয়া সাদা তাস টি লইবেন—তখন চারিটি তাসই দুধের ন্যায় সাদা হইয়া যাইবে। যাদুকর এই খেলা যতবার ইচ্ছা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইতে পারেন।

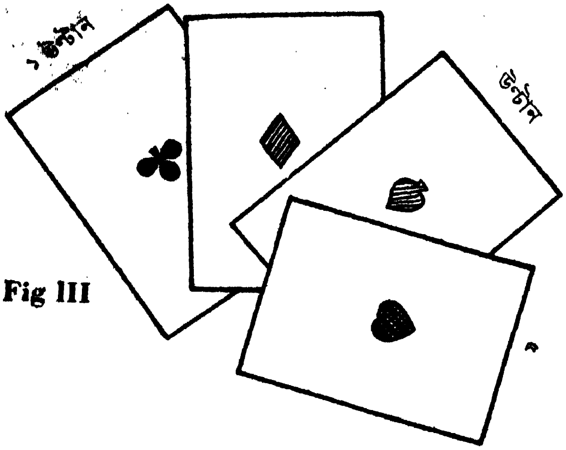


Fig III

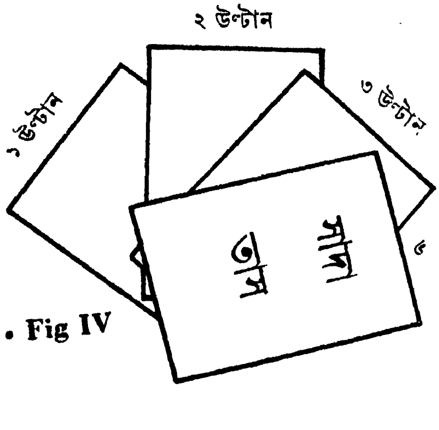


Fig IV

খেলাটির কৌশল অতি সামান্য। চিরাতনের তিন, রুহিতনের তিন ও ইস্কাবনের তিন—এই তিনটি তাস পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। চিত্রের ন্যায় উহার নীচের ফোঁটাটি ও কোনের চিহ্ন (Index mark) ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। মিহি শিরিষ কাগজ (sand paper) বা ব্লেড সাহায্যে উহা অতি সহজেই করা যাইবে। এইবার শুধু তাসগুলিকে কৌশল করিয়া সাজাইয়া দেখাইবার উপর খেলা নির্ভর করে। দ্বিতীয় চিত্রের ন্যায় সাজাইলে উহা চারিটি আসল তিন বলিয়া মনে হইবে। তারপর হরতনের তিন তাসটী ফেলিয়া দিয়া তাস তিনটী উল্টাইয়া ধরিয়া হরতনের টেক্কা যোগ করিয়া দিলেই তৃতীয় চিত্রের ন্যায় দেখাইবে অর্থাৎ চারিটী টেক্কা হইবে! ইহার পর হরতনের টেক্কা ফেলিয়া দিয়া সাদা তাসটী লইয়া ফোঁটা তিনটী একটু চাপিয়া ধরিয়া দেখাইলেই চতুর্থ চিত্রের ন্যায় চারিটী তাসই সাদা দেখাইবে! প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী তাসগুলিকে প্রস্তুত করিয়া চিত্র অনুযায়ী সাজাইয়া দেখিবে ইহা করা অতিশয় সহজ।

প্রদত্ত চিত্র হইতে এই খেলা অতি সহজে বোধগম্য হইবে।



একাদশ পরিচ্ছেদ

নূতন বিপদ

যদিও দূর থেকে অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, তবু সাহসী মাণিককে অমনভাবে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠতে দেখে সুন্দরবাবু তখনি বুঝে নিলেন যে, ভয়ঙ্কর ভূতুড়ে কোন ঘটনা ঘটেছে! মাণিককে সাহায্য করবেন কি, তিনি নিজেই প্রায়-মূর্চ্ছিত হয়ে সেইখানে ব'সে পড়লেন, পালাবার শক্তি পর্য্যন্ত রইল না!

অমলবাবুর অবস্থাও তথৈবচ!

মাণিক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের হাতখানা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না! যে-হাতখানা এমন বজ্র-মুষ্টিতে তার হাত চেপে ধরেছে তা কিন্তু পাথরের নয়, রক্তমাংস গড়া মানুষের হাত!

মাণিক তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ধারালো ছুরিখানা টেনে বার ক'রে ফেললে!

—এবং সঙ্গে সঙ্গে সুপরিচিত স্নিগ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল, "মাণিক, ছুরি দিয়ে কি তুমি আমার হাতখানা কেটে ফেলতে চাও?"

বিষম বিস্ময়ে মাণিক চেঁচিয়ে উঠল, "জয়ন্ত!"

—"হ্যাঁ বন্ধু, আমি সেই পুরাতন জয়ন্তই—আপাতত যমালয়ের ফের্ত্তা মানুষ" বলতে বলতে বুদ্ধমূর্ত্তির পিছন থেকে স্বশরীরে সকলের চোখের সামনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল হাস্যমুখে জয়ন্ত!

অমলবাবু একেবারে থ হয়ে গেলেন এবং এ যে জয়ন্তের প্রেতাত্মা সে-সম্বন্ধে সুন্দরবাবুর কোনই সন্দেহ রইল না। তিনি প্রায়-কাঁদো-কাঁদো মুখে দুইহাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেললেন, কারণ তাঁর পক্ষে এমন স্বচক্ষে প্রেতদর্শন অসম্ভব!

মাণিক বিস্ময়ে, আনন্দে ও উচ্ছ্বাসে প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, "জয়, জয়! তুমি! তুমি বেঁচে আছ!"

—"এক ভালো গণৎকার হাত দেখে ব'লেছিল, আমার পরমায়ু আশী বৎসর। অসময়ে মরিনি ব'লে বিস্মিত হ'চ্ছ কেন ভাই?"

—"কিন্তু তোমার সেই গুলিতে-ছ্যাঁদা টুপী; জমির উপরে দু-জায়গায় রক্তের দাগ, তোমার অন্তর্ধান,—সবের অর্থ কি?"

—"মাণিক, এতদিন আমার সঙ্গে থেকেও তোমার পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে বাড়ল না, এ বড় দুর্ভাগ্যের কথা! জমির উপরে রক্তের দাগ আর ছাঁদা টুপি দেখেই হাল ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। তুমি আমার পায়ের মাপ জানো। যেখানে আমার টুপীটা প'ড়ে ছিল, সেখানে তুমি যদি আমার পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে, তাহ'লে স্পষ্ট দেখতে যে আমি দু-পায়ে হেঁটে পাশের জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছি। আর, যেখানে অনেকটা রক্ত ছিল, সেখানটা খুঁজলে তুমি আমার পায়ের দাগ দেখতেই পেতে না, কারণ সেখানে আমি একবারও যাই নি!"

—"তবে?"

—"আমি যখন বাংলোর দিকে ফিরছিলুম, তখন শত্রুরা অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করে। প্রথমেই বন্দুক ছুঁড়ে আমি তাদের একজনকে মাটিতে পেড়ে ফেলি বটে, কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তাদের বন্দুকের একটা গুলি আমার টুপী ভেদ ক'রে মাথার খানিকটা ছাল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ আত্মরক্ষার জন্যে মাটিতে আছড়ে প'ড়ে চির-পুরাতন কৌশল অবলম্বন—অর্থাৎ মৃত্যুর ভাণ করলুম। তারপর দশ-এগারো জন লোক আমার কাছে ছুটে এল। আমার জামা হাতড়ে সেলাই-করা পকেট কেটে সোণার চাক্তিখানা বার ক'রে নিলে। এমন সময়ে তোমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তারা তাদের মৃত বা আহত সঙ্গীকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমিও উঠে জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হলুম।"

—"কেন?"

—"আমি জানতুম, তোমরা এই মন্দিরের দিকে আসবেই, আর শত্রুরা তোমাদের পিছু নেবে—কারণ চাবি তারা পায় নি। স্থির করলুম, আমিও লুকিয়ে তাদের উপরে পাহারা দেব, যাতে তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে না পারে। তারা জানে আমি বেঁচে নেই! সুতরাং আমি যে তাদের পিছু নিয়েছি, এ-সন্দেহ তারা করবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকলে আমার এ সুবিধা হ'ত না, আমিও জানতে পারতুম না যে, রাত-আঁধারে বন-বাদাড়ে বিপদ আসবে কোন্ দিক থেকে!"

—"এতক্ষণে বুঝলুম, চ্যানের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচিয়েছে!"

—"হ্যাঁ, ওঙ্কারধামে চ্যান্ যখন তোমার গলা টিপে ধ'রে, আমি ছুটে গিয়ে বন্দুকের কুঁদোর বাড়ি তার মাথায় মারি। সে তখন ছোরা বার ক'রে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। আমি যুযুৎসুর এক প্যাঁচ্ কষ্‌তেই সে জমি আশ্রয় করলে—আর পড়বার সময়ে চ্যানের নিজেরই ধারালো ছোরায় তার বাঁ-হাতের

একটা আঙুল গেল উড়ে। সেই সময়েই তার কাছ থেকে সোণার চাক্তিখানা আমি আবার কেড়ে নি। চ্যান্ বেগতিক দেখে চম্পট দেয়। সোণার চাক্তি তোমাদের দরকার হবে বুঝে সেখানা তোমার বুকের উপরে রেখে আমিও অদৃশ্য হই। আমি জানতুম, তোমাদের দলের কেউ না কেউ সেখানা দেখতে পাবেই।"

—"কিন্তু জয়ন্ত, তুমি কি অনাহারে আছ?"

—"মোটেই না। এখানকার নদী জলহীন আর গাছ ফলহীন নয়!······হ্যাঁ, ভালো কথা! এইবার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সেই মাঠে শত্রুদের গতিরোধ করবার বুদ্ধি তোমাদের কার মাথায় প্রথমে আসে?"

—"প্রস্তাব করেছিলুম আমি, সমর্থন করেছিলেন সুন্দরবাবু।"

—"বাহবা, চমৎকার! মাণিক, তুমি যে চাল চেলেছ, তা অতুলনীয়! এই এক চালেই তোমরা নিরাপদ হয়েছ। আমিও তারপরেই তোমাদের চেয়েও দ্রুতপদে এগিয়ে এই মন্দিরে এসে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম।"

সুন্দরবাবু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, "হুম্, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে কেন?"

—"মোটেই ভয় দেখাই নি। আপনার ছেলেমানুষী ভয় দেখে আমি হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না, আর তাই শুনেই আপনি একেবারে ক্ষেপে গেলেন!"

—"খামোকা ক্ষেপি নি। পাথরের বুদ্ধ জ্যান্তো হ'লে কে না—"

—"মূর্ত্তিটাই নড়্‌বোড়ে। কতকালের পুরাণো ভাঙা মূর্ত্তি, হাত দিলেই নড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনিও একবার হাত দিয়ে ঠেলে দেখুন না!"

—"না, আমি হাত দিয়ে ঠেলে দেখতে চাই না, আমি এখান থেকে পালাতে চাই!"

—"সে কি, এখনি পালাবেন কোথায়? এখনো যে পদ্মরাগ-বুদ্ধ লাভ হয় নি!"

—"হেঃ, সে লাভের আশায় গয়া! সে নক্সার কোন মানে হয় না! এখন 'লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং' ক'রেই আমাদের মুখ শুকিয়ে ঘরপানে ফিরতে হবে!"

—"সুন্দরবাবু, নক্সার মানে আমি বুঝেছি ব'লেই কলকাতা থেকে এত দূরে ছুটে এসেছি!"

অমলবাবু সবিস্ময়ে বললেন, "নক্সার মানে বুঝেই আপনি এখানে এসেছেন?"

—"হ্যাঁ অমলবাবু! কলকাতাতেই যখন আমি আপনার মুখে শুনলুম যে, নক্সায় সিঁড়ি আছে অথচ বেদীর গা ব'য়ে কোন সিঁড়ি আপনি দেখেন নি, তখনি তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা ক'রেছিলুম। এখন দেখা যাক্, আমার আন্দাজ ঠিক কিনা!······(উচ্চস্বরে) ওহে হাতী শিং, তোমার লোকজন নিয়ে মন্দিরের ভিতরে এস! বড় অন্ধকার, আগে আলোগুলো জ্বালো!"

হাতী শিং সদলবলে বাহির থেকে ভিতরে এল। চারটে পেট্রলের লণ্ঠন জ্বালা হ'ল। এই প্রাচীন মন্দির হয়তো রাত্রে কখনো এত উজ্জ্বল আলো দেখবার সৌভাগ্যলাভ করে নি!

সুন্দরবাবু হাঁপ ছেড়ে বললেন, "আঃ, আলো দেখে ধড়ে প্রাণ এল! এখন দেখছি বাইরেই অন্ধকার! হুম, আমি আর বাইরে পা বাড়াচ্ছি না!"

জয়ন্ত বললে, "বেদীটা এখানে এসেই আমি দেখে নিয়েছি। মাণিক, তুমি যদি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে পরীক্ষা করতে, তাহ'লে বেদীটা যে ফাঁপা, এটা বুঝতে তোমার কোনই কষ্ট হ'ত না!·· ······ হাতী শিং! তোমার লোকজনদের কুড়ুল নিয়ে এই বেদীটা ভেঙে ফেলতে বল!"

হাতী শিংএর অনুচরেরা তখনি বেদী-ধ্বংসে প্রবৃত্ত হ'ল,—অন্য সকলে বিপুল কৌতূহলে আগ্রহ চক্ষে তাদের কাজ দেখতে লাগল।

জয়ন্ত বললেন, "পাথরের বেদী যখন ফাঁপা, তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে!"

ঠং ঠঙা ঠং, ঠং ঠঙা ঠং—কুড়ুলের পর কুড়ুলের ঘা, অতি নিস্তব্ধ মন্দির ঘন ঘন শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেন গম্-গম্ করে উঠল! শব্দের চোটে সেই নড়্‌বোড়ে বুদ্ধমূর্ত্তি আবার কাঁপতে সুরু করেছে দেখে সুন্দরবাবুর গায়ে কাঁটা দিলে!

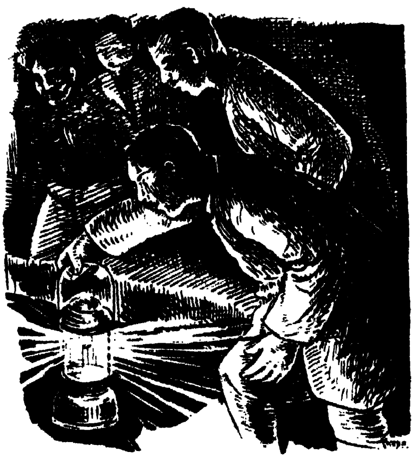
বেদীটা গাঁথা ছিল কয়েকখানা বড় বড় পাথর দিয়ে। এক-একখানা পাথর সরানো হয় আর দেখা যায়, বেদীর ফাঁকা কিন্তু অন্ধকার-ভরা গর্ত্ত ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে!

জয়ন্ত বললে, "ব্যাস্, আর পাথর সরাতে হবেনা! হাতী শিং, একটা লণ্ঠন উঁচু ক'রে তুলে ধর তো!"

হাতী শিং ভাঙা বেদীর গর্ত্তের উপরে একটা হাজার-বাতি লণ্ঠন তুলে ধরলে।

উঁকি মেরে দেখা গেল, গর্ত্তের ভিতর দিয়ে একসার পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে সোজা নেমে গিয়েছে!

জয়ন্ত উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, "এখন বুঝতে পারছ তো মাণিক, যে-রহস্য চোখে দেখা যায় না, সোনার চাক্তির নক্সা তাই এঁকে রেখেছে? আমি গোড়াতেই এটা বুঝতে পেরেছিলুম। নক্সা যদি বাজে হ'ত তাহ'লে অত সাবধানে, অত গোপনে, অত যত্ন ক'রে বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে রক্ষা করা হ'ত না! পদ্মরাগ-বুদ্ধকে যদি প্রণাম করতে চাও, তাহ'লে আমার সঙ্গে এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবে চল!"


হাজার-বাতি লণ্ঠন তুলে ধরলে।

অমলবাবু অভিভূত কণ্ঠে বললেন, "জয়ন্তবাবু, আশ্চর্য্য আপনার বুদ্ধি!

জয়ন্ত বললে, "বুদ্ধি হচ্ছে স্বাভাবিক, তা আশ্চর্য্য নয়। সব মানুষ যে তা ব্যবহার করতে পারেনা, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য্য!"

সুন্দরবাবু খুঁত-খুঁত করতে করতে বললেন, "তাইতো, এ যে আবার নতুন বিপদ দেখছি! ঐ পাতালের ভিতরে ঢুকলে আবার বেরুতে পারব তো? ওখানে কোন ভয়ঙ্কর ওঁৎ পেতে আছে, কে তা জানে?"

মাণিক বললে, "তাহ'লে আমরা নীচে নামি, আপনি এইখানে ব'সে বিশ্রাম করুন।"

সুন্দরবাবু বললেন, "একলা? বাপ্‌রে, তাও কি হয়! 'প'ড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!' আমি তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই থাকব—যা থাকে কপালে! হুম্!"

জয়ন্ত বললে, "আমাদের সঙ্গে আটটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। সবগুলোই জ্বেলে ফেলো! পাতালের অন্ধকারে যত আলো তত ভালো।"

সামনে, মাঝখানে, পিছনে প্রদীপ্ত লণ্ঠন নিয়ে সকলে একে একে সেই নিম্নগামী সোপান শ্রেণী দিয়ে নামতে লাগল। পরে পরে কুড়িটি ধাপ নেমে সিঁড়ি শেষ হ'ল। তারপর দেখা গেল, একটি সমতল পথ সোজা এগিয়ে দূরের অন্ধকারের ভিতর হারিয়ে গিয়েছে; পথটাও পাথরে বাঁধানো এবং নিতান্ত অপ্রশস্ত নয়, তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে!

গুহাপথের সেই যুগে যুগে সঞ্চিত নিবিড় তিমির সহসা আজ আলোকের আঘাতে যেন মৌন চীৎকারে আর্ত্তনাদ ক'রে পায়ে পায়ে দূরে স'রে আর স'রে যেতে লাগল, সভয়ে! সেখানকার বহুকালব্যাপী নিদ্রিত স্তব্ধতাও আজ এতগুলো আধুনিক জুতার খট্‌খট্ শব্দে যেন অত্যন্ত যাতনায় ধড়্‌ফড়্ করতে করতে ম'রে গেল!

সুন্দরবাবু সঙ্কুচিত সন্দেহে গুহাপথের বদ্ধ-হাওয়া সশব্দে শুঁক্‌তে শুঁকতে বললেন, "হুম! আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়ে যে-গন্ধ পাই, এখানে আমি যেন সেইরকম দুর্গন্ধই পাচ্ছি!"

অমলবাবু বললেন, "এ গুহাপথ কতকাল বন্ধ আছে তা কে জানে! হয়তো আপনি বিষাক্ত বাষ্পের গন্ধ পাচ্ছেন!"

—উঁহু, এ বাষ্প-টাষ্প'র গন্ধ নয়!"

মাণিক বললে, "তাহ'লে এটা বোধ হয় ভূতের গায়ের দুর্গন্ধ!"

সুন্দরবাবু চটে গেলেন, "ঠাট্টা করোনা মাণিক, ও-রকম ঠাট্টা পছন্দ করি না! হুম্! এখানে যে ভূত নেই তা কি ক'রে জানলে? ভূতের পক্ষে এটা হচ্ছে অতি-মনোরম স্থান! আলো নেই হাওয়া নেই, শব্দ নেই, এখানে থাকবে না তো ভূত কোথায় থাকবে?"

মাণিক আবার টিপ্পনি কাটলে, "কেন, আপনার মাথার ভিতরে! আপনার মাথাটি হচ্ছে ভূতের স্বদেশ! ওখানে নিত্যনূতন ভূতের জন্ম হয়!"

জয়ন্ত সর্ব্বাগ্রে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে প'ড়ে গম্ভীর স্বরে বললে, "সাবধান! আর কেও এগিও না!"

প্রত্যেকেই সচমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেবল সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলেন এবং একেবারে সকলের পিছনে না গিয়ে আর থামলেন না !

মাণিক বললে, "কি ব্যাপার, জয় ?

"কি-রকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে !"

মাণিক কাণ পেতে শুনতে লাগল। হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে ! কেবল অদ্ভুত নয়, ভয়াবহ !

---"ও কিসের শব্দ, জয় ?"

—"ঠিক বুঝতে পারছি না ! পাথরের উপর দিয়ে কারা যেন অনেকগুলো বস্তা টেনে নিয়ে যাচ্ছে !...... না, যাচ্ছে নয়, টান্‌তে টানতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে !"

সুন্দরবাবু মাথার ঘাম মুছতে মুছতে কাতরভাবে মনে মনে বললেন, "হা ভগবান ! এই ডানপিঠে চোঁড়াগুলোর সঙ্গে এদেশে এসে কি ভুলই করেছি ! আর কি দেশে ফিরতে পারব ? হুম্ !"

(আগামী মাসে সমাপ্য)



LOVE ME AND LOVE MY DOG

(গল্প)

বুদ্ধদেব বসু

আমার জ্যাঠতুতো দাদা হুতুমগঞ্জের ম্যাজিষ্টর। হুতুমগঞ্জ বিখ্যাত জায়গা, সেখানে পথে সাপ, ঘাটে সাপ, বাথরুমে সাপ, খাটের তলায় সাপ, কপাল ভালো হ'লে বালিশের তলায়ও সাপ! শুনতে পাই সেখানে মানুষ আর সাপ পারস্পরিক সখ্যতায় দিব্যি বসবাস করছে; মানুষেরা সাপ মারবার দরকার বোধ করে না, আর সাপেরা যে মাঝে মাঝে দু' একটা মানুষ মেরে ফেলে তার কারণ বোধ হয় শুধু এই যে এতদিন মানুষের পাশাপাশি থেকেও তারা তাদের বন্য হিংস্র প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভুলতে পারছে না।

এ-হেন হুতুমগঞ্জে যাবার জন্যে মাঝে মাঝে মেম-বৌদির নেমন্তন্ন পেতুম। যা ভাবছো তা নয়। আমার দাদা বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করেননি, ফিরে এসে খাস বাঙালি বিয়ে করেছেন। তবে ম্যাজিষ্টর হ'লে একজন ভদ্রলোক সাহেব হ'য়ে যান, এবং তাঁর স্ত্রী হন মেমসাব তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, মেম-বৌদি নিজের হাতেই আমাকে চিঠি লিখতেন। বাংলাতেই লিখতেন। তবে সে-বাংলা মনে মনে ইংরিজিতে তর্জমা ক'রে নিয়ে তবে আমি তার মানে বুঝতুম। এমনকি, চিঠির গোড়াতে 'প্রিয় রণেন'ও মনে-মনে "ডিয়র রণেন' পড়লে তবে সেটা পরিষ্কার বোঝা যেতো। আমি যেন একবার হুতুমগঞ্জে কয়েকটা দিন কাটিয়ে তাঁদের 'সুখী' করি, প্রায় চিঠিতেই এই অনুরোধ থাকতো।

বলা বাহুল্য, তাঁর অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারিনি। যে-সব সাপ দেখতে মানুষের মতো, কলকাতায় তারা সব সময়েই চারদিকে কিলবিল করছে; তবু, যারা সাপও বটে, দেখতেও আবার সাপের মতো, তাদের কথা ভাবতেই আমার গা-টা কেমন শিরশির করে ওঠে। এটা আমার দুর্ব্বলতা বলতে পারো, সাহসের অভাব। এই সামান্য সাহসের অভাবে, কিংবা অসামান্য সাহসের অভাবে হুতুমগঞ্জে যাওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটলো না। অবশ্য ম্যাজিষ্টরের অতিথি ব'লে সাপেরা হয়তো সমীহ ক'রে চলতো; কিন্তু নিজে তো আর আমি ম্যাজিষ্টর নই···বিশ্বাস কী? দাদা-বৌদি অনায়াসে থাকতে পারেন, তাঁদের পাইক আছে, পেয়াদা আছে, মোটর আছে, বন্দুক আছে; কলকাতা থেকে তাঁদের কেক-বিস্কুট যায়, তাঁরা চাপবেন ব'লে রেলগাড়ি ইষ্টিশানে ছত্রিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে—তাঁদের ভাবনা কী! তাছাড়া, বাংলাদেশের কোনো সাপেরও এত বড়ো সাহস নেই যে আস্ত একটা ম্যাজিষ্টরের গায়ে ছোবল তুলবে। তার উপর এ-ও শুনেছি যে হুতুমগঞ্জের সাপেরা নাকি ভারি ভালোমানুষ। সেখানকার একজন উকিল গল্প করলেন যে ম্যাজিষ্টরের কুঠির গেটের দু'দিকে দুটো কেউটে নাকি ব'সে থাকে, সায়েব যখনই বেরোন কি ঢোকেন, ফণা দুলিয়ে-দুলিয়ে সেলাম করে। চাকর, মেথর, কুলি কি ফিরিওলাকেও কিচ্ছু বলে না, কিন্তু সহরের কোনো ভদ্রলোক ঢুকতে গেলেই...উকিলবাবুকে নাকি একবার বিষম তাড়া করেছিলো।

তবে এটা সম্ভবত গল্পই।

যা-ই হোক্, এ গল্প শোনবার পর আমার হতুমগঞ্জে যাবার যেটুকু ইচ্ছা ছিলো, তাও নিবে গেলো। কয়েক মাস পরে খবর পেলুম দাদা আলিপুরে বদলি হয়েছেন; কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁরা যখন বেশ গুছিয়ে বসেছেন, তখন মনে হ'লো এইবার মেম-বৌদির নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যেতে পারে। অতএব এক বিকেলবেলায় কলেজ থেকে ফিরে চা খেয়ে (কম ক'রেই খেলুম) যাত্রা করলুম বালিগঞ্জের দিকে।

বলতে লজ্জা নেই, সাজগোজটা পরিপাটি রকমই করলুম। জুতোটা নিজের হাতেই ঘষতে ঘষতে আয়নার মতো ক'রে তুললুম। আয়নার সামনে স্থির হ'য়ে ব'সে চুলটা অনেকক্ষণ ধ'রে ফেরালুম। তারপর ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে বেরলাম। যা-ই বলো, আমাদের মতো মানুষের ম্যাজিষ্টর-দাদা থাকা যেন অজীর্ণরোগীর ভুরি-ভোজন; ভালো জিনিসগুলো চোখে দেখেই খুসি থাকতে হয়, আর পেটে যেটুকু গেলো তার ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে প্রাণান্ত।

ট্র্যাম থেকে নেমে মাইলখানেক হাঁটা পথ। তাঁদের নিজেদের, এবং বন্ধুবান্ধব সকলেরই গাড়ি আছে; আমাদের মতো ট্র্যামসওয়ার ও পদাতিকেরই হয় মুস্কিল। তার উপর, ওল্ড বালিগঞ্জ রোডটাই এমন যে সেখান দিয়ে হাঁটা যায় না। শাঁ শাঁ ক'রে মোটর ছুটছে, তার উপর আবার বাসগুলোর তুফানের মতো তাড়া। হোঁচট খেয়ে খেয়ে, চমকে থমকে ও থেমে, মোটর-চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যেতে যেতে যখন বালিগঞ্জ পার্কে দাদার বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছলুম, তখন আমি হাঁপাচ্ছি ও ঘামছি। মস্ত কম্পাউণ্ডওলা বাড়ি, গেটে একটা সাজগোজ করা দরোয়ান ব'সে।

—ক্যায়া মাংতা? দস্তুরমতো রূঢ় ভাষায় ব্যাটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—সাব্ হ্যায়?

—কৌন্ সাব?

—গুপ্ত সাব?

—আভি কোর্টসে নেই আয়া। মোলাকাৎ কর্নেকো টাইম মর্ণিং হ্যায়, ন' বাজে।

আমি মহা ফাঁপরে পড়লুম। ব্যাটা দেখি আমাকে বাড়িতেই ঢুকতে দিতে চায় না। এখন আমি কী বলি? মেম-সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে চাই বললে চাইকি পুলিশেই ধরিয়ে দেবে।

শেষটায় সাহস ক'রে ব'লে ফেললুম—গুপ্ত সাব হামারা ভাই হ্যায়। মেমসাব্‌কো বোলো রণেনবাবু আয়া।

—বাবুলোগকো টাইম মর্ণিং। মেম-সাব্‌কো আভি বিউটি-ন্যাপকা টাইম হ্যায়। বিউটি-ন্যাপ আবার কী বস্তু, মনে-মনে আমি ভাবলুম।

কোথা থেকে আমার এত সাহস এলো জানিনে হঠাৎ একটু ধমকের সুরেই ব'লে ফেললুম—যাও না তুম, বোলো মেমসাবকো।

লোকটা খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে কেমন একরকম ক'রে তাকিয়ে রইলো; তারপর আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে বললে—কার্ড হ্যায়?

—নেই হ্যায়।

তখন লোকটা তার পকেট থেকে অতি নোঙরা চিটচিটে একটা নোটবই বার করলে, আর একটা অতি ক্ষুদ্র ভোঁতা পেন্সিল, আমি কোনরকমে নিজের নামটা লিখে দিলুম। অতি কষ্টে ও অত্যন্ত অনিচ্ছায় সেই কাগজের টুকরো হাতে ক'রে প্রকাণ্ড জাঁদরেল পালোয়ান ভৃত্য চ'লে গেলো ভিতরে।

মিনিট দুই পরে ফিরে এসে বললে—আইয়ে। তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে তার কর্ত্রী যে আমা-হেন জীবকে এ-সময়ে অভ্যর্থনা করলেন এতে সে মনে-মনে ঘোরতর রুষ্ট।

তারই নেতৃত্বে প্রকাণ্ড লেন পার হ'য়ে বাড়ীতে গিয়ে—হ্যাঁ, শেষ পর্য্যন্ত উঠলুম বটে, কিন্তু সেটাও সহজ হলো না। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বারান্দা থেকে অন্তত দশটা কুকুর প্রচণ্ডস্বরে গর্জ্জন ক'রে উঠলো, আর আমার দিকে যে জানোয়ারটা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এলো, এখন ঠাণ্ডা মাথায় তাকে কুকুর বলতে পারছি বটে, কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিলো নতুনরকমের কোনো বাঘ-টাগ হবে। সেটা অন্ততঃ দশ বছরের ছেলের সমান উঁচু, গায়ে ডোরা-কাটা, আর গলার আওয়াজ অতি ভয়ঙ্কর।

দরোয়ান খুব অমায়িকভাবে বললে—আইয়ে, কুচ ডর্ নেই। তারপর সে ঐ জন্তুটার গায়ে হাত বুলিয়ে স্নেহ-শীতল স্বরে ডাকলে—ঠার যাও, মুসো, ঠার যাও।

কিন্তু মুসোর ঠার যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেলো না। কেন যে সে আমার গলা কামড়ে ধ'রে আমাকে কয়েকটি মাংসখণ্ডে পরিণত করলে না, কী ক'রে যে আমি আজ পর্য্যন্ত বেঁচে আছি, সেটা আমার কাছে এখনো রহস্য। নিঃসাড়, অবশ হ'য়ে পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় কুকুরের কলরোল ছাপিয়ে একটি অতিশয় মিহি কণ্ঠস্বর আমার কানে পৌঁছলো—Shut up Musso.

সঙ্গে-সঙ্গে বাঘটা চুপ করলো. অন্যগুলোও চুপ করলো: একটু পরে নিজের অজ্ঞাতেই দেখলুম আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আর আমার সামনে এক বিচিত্র ড্রেসিং গাউন জড়ানো মেম-বৌদি।

মেম-বৌদি মধুর ও পরিমিত হেসে বললেন—যাক, তবু তুমি এলে।

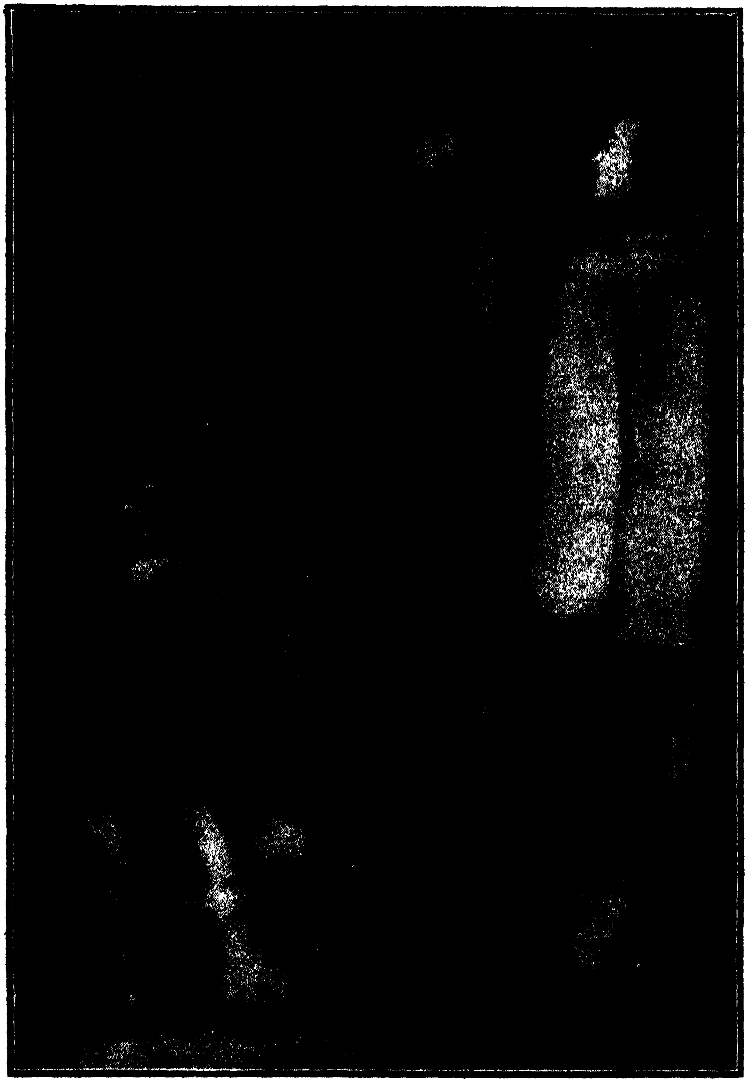
আমার বুকের কাঁপুনি ও মুখের হাঁপানি তখনো কমেনি, তাই কিছু না ব'লে বোকার মতো চুপ ক'রে রইলুম।

—চলো, ভেতরে চলো।

বারান্দাটার দু'দিকে বহু কুকুর শেকল দিয়ে বাঁধা। তাদের দিকে ক্ষণিক একবার দৃষ্টিপাত ক'রে মেম-বৌদির পিছন পিছন মহামূল্য ড্রয়িংরুমে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু তারা আমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখলে না—এমনকি স্বয়ং মুসো এককোনে এমনভাবে শুয়ে রইলো যেন জগতের কোনো-কিছুর প্রতিই তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

পাখার নিচে খানিকক্ষণ বসবার পর আমি বললুম—বাব্বাঃ, কী ভয়ানক কুকুর তোমার!

মেম-বৌদি অত্যন্ত খুসি হ'য়ে বললেন—ওঃ, ভয়ানক তেজীয়ান! খাঁটি গ্রেট ডেন, চারশো টাকা দিয়ে বাচ্চা কিনেছিলুম। ওর জাতের কুকুর ইণ্ডিয়াতে খুব বেশি নেই, এক শিমলাতে মিসেস অগ্নিভির



বিচিত্র ড্রেসিং গাউন জড়ান মেম-বেদিনী

একটা, আর সেদিন কাগজে পড়লুম পুনাহ্-তে একটা জকি নাকি বিলেত থেকে এ-রকম একটা গ্রেট ডেন আনিয়েছে।

—আমাকে বড্ড তাড়া করেছিলো।

—ওঃ, অচেনা লোক দেখলে একেবারে ক্ষেপে যায়। একটু লেলিয়ে দিলে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে ত'বে লেলিয়ে না দিলে কিছু করে না। ওকে ছেলেবেলা থেকে এমন ট্রেনিং দিয়েছি—

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম—ওকে বেঁধে রাখলেই পারো।

—কাকে? মুসোলিনিকে? তার কি উপায় আছে ভাই, চারদিকে যা চোরের উৎপাত। আর সকলকেই তো বেঁধে রাখি; শুধু মুসোলিনি ছাড়া থাকে। বিষম গুণ্ডা কিনা ও। তারপর—তুমি কেমন আছো?

—আমি ভালোই আছি। এইমাত্র যে ফাঁড়া কাটলো তা স্মরণ ক'রে আন্তরিকভাবেই বললাম কথাটা।

—কলেজে পড়ছো তো?

—হ্যাঁ।

—বেশ, বেশ। একবার হুতুমগঞ্জে তো এলে না।

—মেম-বৌদি, ওখানে নাকি বড্ড সাপ?

—ওঃ, সে ভয়েই বুঝি তুমি আসোনি—সাবাস্ বীর!

আমি অত্যন্ত কাপুরুষ ও অপদার্থ বোধ করলুম। মেম-বৌদি আবার বললেন—তা ট্রপিক্স-এ সাপ কোথায় নেই বলতে পারো? তোমরা গরমের দেশের লোক, তোমাদের এত সাপকে ভয় করলে চলে?

মেম-বৌদির কথা শুনে মনে হ'লো তাঁর দেশ ল্যাপল্যাণ্ড কি গ্রীনল্যাণ্ড। তারপর এই ল্যাপল্যাণ্ড-বাসিনী বললেন—হ্যাঁ, হুতুমগঞ্জে সাপের উৎপাত কিছু আছে। ভাবতে পারো, একটা সাপ একবার আমাদের হিটলারকে কামড়াতে এসেছিলো!

—হিটলার কে? আমি চমকে উঠলুম।

—মুসোলিনিকে তো দেখলে, ওরই জুড়ি হচ্ছে হিটলার। জর্মান উল্ফ্-হাউণ্ড। ওঃ, স্প্লেনডিড ডগ্। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললুম কোথায় সে?

—তাকে সেদিন হাসপাতালে পাঠিয়েছি, শরীর ভালো যচ্ছেনা। যা গরম! মুসোকে দেখেই তুমি এত ঘাবড়ে গেছলে, হিট্‌কে দেখ্‌লে না জানি কী করতে!

মেম-বৌদি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

—হিট্ বুঝি আরো ভয়ানক?

—দেখতে অবিশ্যি মুসোর মতো জাঁদরেল নয়—হাউণ্ড জাতের কিনা, রোগা লিকলিকে শরীর। কিন্তু তেজীয়ান জানোয়ার যদি দেখতে চাও—একেবারে এ-ওয়ান! হুতুমগঞ্জে একটা লোক চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে আসছিলো—তাকে ক্যাঁক ক'রে কামড়েই ধরলে পায়ে।

—বলো কী! আমি শিউরে উঠলুম।

মেম-বৌদি হেসে বললেন—হ্যাঁ, বই-খাতা দেখলেই হিট্-এর মাথা খারাপ হয়ে যায়, চোখ গোল হ'য়ে ওঠে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে থাকে। এমনকি, তোমার দাদা যখন বই পড়েন, তখন ও তাঁরও

কাছে ঘেঁষে না, দূরে দাঁড়িয়ে গোঁ-গোঁ করতে থাকে। আমি একদিন একটা বই পড়ছিলুম, সেই রাগে ও আমার সাড়িটাই টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে দিলে। সেই থেকে আমি বই-টই পড়া ছেড়েই দিয়েছি।

আমি বললুম—তারপর সেই লোকটার কী হ'লো?

—কোন লোকটা?

—চাঁদার খাতা নিয়ে যে আসছিলো?

—কী আর হবে! দশটা টাকাই চাঁদা দিতে হ'লো আরকি। বলো কেন, কুকুর পোষবার ঝকমারিও আছে।

—তারপর লোকটার কিছু হয়নি তো? হাইড্রোফোবিয়া কি······

—কই, তা তো কিছু শুনিনি। তা আজকালকার দিনে একেবারে বোকা না হ'লে আর হাইড্রোফোবিয়া হবে কেন? গোটা কয়েক ইঞ্জেকশন নিলেই হয়।

—হুতুমগঞ্জে কি ও-সব ইঞ্জেকশন হয়?

—তা তো জানিনে। কামড়ে ধরলো যখন তখন লোকটার মুখ যদি দেখতে! মেম-বৌদি মৃদু হাসলেন। ওঃ হিট্ ভারি বদমাস। তার উপর এখন এই ভাদ্রমাসে কুকুরদের একটু মাথা খারাপ হয়ই। এত গরম কি এ-সব ভালো-ভালো কুকুর সইতে পারে? মুসো তোমাকে কিছু করেনি তো?

ফ্যাকাশে মুখে যতটা সম্ভব হাসি টেনে এনে আমি বললুম—না শুধু একটু ঘেউ-ঘেউ করেছিল। তা হিট্-এর কি খুব অসুখ? বাঁচবে তো?

বৌদি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন—কী যে বলো! হিট্ সামনের সোমবারই বাড়ি ফিরবে। আর একদিন এসো, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। হিট্ আর মুসো—ওরা বদরাগি বটে, কিন্তু ভাব ক'রে ফেলতে পারলে ভারি ভালো। দু'চারদিন ওদের সঙ্গে একটু খেলা করলে হয়। কী করলে খুব শিগগির ভাব হয় জানো? বই ছিড়তে ওরা দু'জনেই খুব ভালোবাসে। ধরো, বেশ ভালো বাঁধানো খানকয়েক ভালো-ভালো বই এনে দিলে—তখন দেখবে ওদের ফুর্ত্তি। বইগুলোকে টুকরো-টুকরো করেই তোমার হাত চাটতে আসবে। তোমার কাপড়ও হয়তো খানকয়েক ছিড়বে···তা অত ভাবলে কি আর চলে? এসো দেখবে নাকি আমার কেনেল?

—আমি বললুম, এখনই···?

—এসো না। বৌদি ওঠবার ভঙ্গি করলেন।

কিন্তু আমার কপালগুণে তক্ষুনি বাইরে একটা গাড়ী থামলো. আর একটু পরেই স্বয়ং আমার সিবিলিয়ান দাদা ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। তাঁর পরনে ঠিক সেই জিনিষ, আমরা যাকে হাফ-প্যান্ট বলি আর সাহেবরা যাকে বলে—শর্ট্স। গায়ে একটা হাত-কাটা শার্ট, মুখে পাইপ।

Love Me and Love My Dog

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

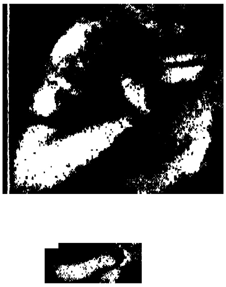
মুখ থেকে পাইপ না-নামিয়েই দাদা বললেন—এই যে রণেন। কেমন আছিস?

আমি বোকার মতো ব'লে ফেললুম—দাদা, তুমি ঐ বেশেই আফিসে গিয়েছিলে নাকি?

দাদা গম্ভীরভাবে বললেন—ট্রপিক্‌স্‌-এ এই তো পরতে হয়। ব'লে অন্তর্হিত হ'লেন ভিতরে খানিক পরে ফিরে এলেন সাদা পাৎলুন, সাদা ক্যানভাসের জুতো প'রে, আর গায়ে একটা সবুজ রঙের চেনটানা গেঞ্জি।

চেন-টানা গেঞ্জিটা দেখে একটা কথা ফস্ করে আমার মুখে উঠে আসছিলো, কিন্তু চেপে গেলুম। কে জানে, ট্রপিক্‌স্‌-এ হয়তো এ-ই পরতে হয়।

তারপর চা-পর্ব্ব। দুঃখের কথা আর বলবো কী—অত সব ভালো-ভালো খাবার, কিছুই তার খেতে পারলুম না। মেম-বৌদির সখ, বিকেলের চায়ের সময় সবগুলো কুকুর ছেড়ে দেয়া হবে। সবসুদ্ধ বারোটা। গুণতে হয় তো আমার ভুল হয়েছিল, কিন্তু বারোটা না হ'য়ে এগারোটা কি বারোটা হ'লে খুব কি কিছু এসে যায়? প্রকাণ্ড মুসো থেকে সুরু ক'রে অতি ক্ষুদে পুতুলের মতো বাচ্চা কুকুর পর্য্যন্ত নানা রঙের ও ছাঁদের, নানা নামের ও ডাকের কুকুরে প্রকাণ্ড ঘরটা ভর্ত্তি। তবু তো, সব চেয়ে বড়ো নাম-ডাক যার সেই হিট্-ই অনুপস্থিত। দাদা বৌদি দু'জনেরই হিট্-এর জন্য বেশ মন-খারাপ দেখা গেলো।



চা-পর্ব্ব

আমার পক্ষে অবশ্য বারোটাই যথেষ্ট। সে যা দৃশ্য দেখলুম জীবনেও ভুলবো না। কেউ বৌদির কোলে উঠে বসছে, কেউ একেবারে টেবিলের উপরেই আসীন; দাদার পায়ের তলায় গোটা দুই, তাঁর চেয়ারের আদ্ধেক দখল ক'রে একজন, একটা ক্ষুদে জাতীয় কুকুর চেয়ার বেয়ে তাঁর মাথার উপরেই চ'ড়ে বসলো দেখলুম। দাদা হয়তো একবার বললেন—Oh naughty Monty! কি মেম-বৌদি মৃদুহাতে একটার কান ম'লে দিয়ে হাসলেন; তাতে অবশ্য আরো বেশী উৎসাহ পেয়ে ওরা কেউ ডিগবাজি খেয়ে চায়ের পেয়ালাটাই উল্টে দিলে। শুধু মুসোলিনিকেই মনে হ'লো গম্ভীর, এ-সব ছেলে-খেলায় তার মন নেই; মুখের রীতিমতো একটা কটমটে ভাব ক'রে সে

চুপ ক'রে এককোনে ব'সে রইলো : মাঝে একবার আড়চোখে আমার দিকে তাকালো সঙ্গে সঙ্গে আমি গলায় কেক ঠেকে বিষম খেয়ে মরি আর কি।

মেম-বৌদি যথেষ্ট ভদ্রতা ক'রে বললেন—কী হ'লো ?

আমি তাড়াতাড়ি ত্থ' ঢোঁক চা খেয়ে বললুম—কিছু না। তোমার কুকুরগুলো বেশ, মেম-বৌদি।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। বুঝতে পারলুম, কেক খেতে গিয়ে বিষম খাওয়া সত্বেও আমার উপর তাঁর শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে। মধুর হেসে বললেন—তুমি খুব কুকুর ভালোবাসো, না ?

চারদিকে তাকিয়ে বললুম—তা-হ্যাঁ-তা-ভালোবাসি বইকি।

মেম-বৌদি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললেন—Dogs are wonderful ! তুমি এয়ারডেল্ ভালোবাসো, না অ্যালসেশিয়ন ?

আমি সেই মুহূর্ত্তে একখানা স্যাণ্ডউইচ তুলে মুখে ভরছিলুম, হঠাৎ আমার হাতে একটা আঁচড় লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে স্যাণ্ডউইচখানা অন্তর্হিত হ'লো !

মেম-বৌদি হাসতে হাসতে বললেন—Poppy ! you naughty boy ! পপিটা বড্ড স্যাণ্ডউইচ খেতে ভালোবাসে ; ছাড়া থাকলেই চুরি করে। পমিরেনিয়ান তোমার ভালো লাগে না ? কী সুন্দর ছোট্ট পুতুলের মতো। না কি তুমি সীলাম পছন্দ করো ?

ততক্ষণে আমার চেয়ারের চারদিকে চার-পাঁচজন জড়ো হয়েছে; কেউ আঁচড়াচ্ছে, কেউ কোলে উঠতে চেষ্টা করছে, কেউ বা ত্থ'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে কুঁই-কুঁই করছে। মেম-বৌদি ব'লে উঠলেন Look, look at Spots ! The clever beggar ! কিছু দাও ওকে রণেন। দেখছো না, তোমার কাছে খেতে চাইছে !

একখানা স্যাণ্ডউইচ দিলুম ওকে; তারপর আর একখানা, তারপর আরো একখানা।

ইতিমধ্যে দেখি, আর একজন আমার কোলে চ'ড়ে বসেছে। আমি কিছু ভীতস্বরেই বললুম—বৌদি, ওকে ডাকো।

—ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই, ও একেবারে ভেড়ার মতো ঠাণ্ডা। একটু আদর করো না ওকে।

অগত্যা কোলে আসীন সারমেয়টার একটুখানি গায়ে হাত বুলোলাম। তারই ফলে কিনা জানিনে, হঠাৎ ও এক প্রচণ্ড লাফ দিয়ে মেঝেতে গিয়ে ছিটকে পড়লো; ওর নখের আঁচড়ে আমার পাঞ্জাবির খানিকটা ছিঁড়ে গেলো।

মেম-বৌদি ব'লে উঠলেন—ইঁদুর ! নিশ্চয়ই ইঁদুর দেখেছে। বাব্বাঃ, ইঁদুর দেখলে জ্যাকির আর রক্ষে নেই। খুন চেপে যায়।...তুমি কিছু খাচ্ছো না যে ?

—ওঃ, ঢের খেয়েছি, কত আর খাবো ?

—স্যাণ্ডউইচ খাও ? না কি হ্যাম সম্বন্ধে কোনো প্রেজুডিস...

—না, না, সে-সব কিছু নয়; এখন আর কিছু খাবো না।

দাদা বললেন—আজ ওয়েদার ভালো আছে; একটু টেনিস খেললে হয়। তুমি খেলো নাকি রণেন?

কলেজে আমি একজন নাম-করা খেলোয়াড়; কিন্তু সে-কথা চেপে গিয়ে বললুম—না, আমি এখন উঠি।

দাদা বললেন—আমাদের ইয়ং মেন মোটে খেলে না। কেবল পড়া আর পড়া! এ জন্যেই তো আমাদের দেশের কিছু হচ্ছে না।

—হিটলারকে লেলিয়ে দাও দাদা, তাহ'লে সব পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে।—ব'লে আমি উঠলুম।

বৌদি বললেন—শিগগির আর একদিন এসো কিন্তু। হিট্-এর সঙ্গে আলাপ করবে। ডার্লিং হিট!

সেই যে দাদার বাড়ি থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোলুম, বলা বাহুল্য সে-রাস্তা আর মাড়াইনি।

খোকনের সাধ

শ্রীবেতাল

একটি যদি ছোট্ট পরী পাই
ছোট্টপরী প্রজাপতির মত
রামধনুকের ওড়না দেওয়া গায়
উড়ে বেড়ায় ফুলের বনে যত।

তবে আমি কারুক্কে কি চাই!
করুক আড়ি সবাই যত পারে।
প্রজাপতি পরীর সাথে সাথে
যাই চলে সেই মায়া-নদীর ধারে।

কি হয় জানো নাইলে মায়া-নদী-ই?
ছোট্ট হয়ে যাবো অনেক আরো,
রঙীন দুটি উঠবে পাখা পিঠে;—
তখন তোমরা আর কি চিনতে পারো!

খোকনের সাধ

শ্রীবেতাল

ওরা সবাই ভাববে মনে মনে,
খোকনটা ত ভারী অহঙ্কারী!
সারা সকাল খেলতে এল নাক
বিকেল-বেলা ওর সাথে আজ আড়ি।

আমি এখন কি আর তাতে ডরাই
আড়ি!—তাতে বয়েই গেছে আমার!
প্রজাপতি-পরী আমার সাথী
রামধনুকের রঙ আমারো জামার।

ওদের কাছেই বেড়াই যদি উড়ে
অবাক হয়ে থাকবে ওরা চেয়ে।
ভাববে, একি মজার প্রজাপতি
এল রঙীন ভোরের মেঘে নেয়ে!

তখন আমার কি মজাটাই হবে
ধরতে যখন করবে ছুটোছুটি;
ফুলের বনে থাকব এমন মিশে
খোঁজ পাবেনা হাজার মাথা কুটি'।

ফুর্‌ফুরিয়ে হঠাৎ যাবো উড়ে
বলবে ওরা,—একি! কেমন ফুল!
বলব তখন হেসে,—ছুয়ো ছুয়ো!
বোকার মতন এমন করে ভুল!

একটি যদি ছোট্ট পরী পাই
ছোট্ট পরী প্রজাপতির মত,
তবে আমি কারুক্কে না চাই
আড়ি সবাই করে, করুক যত।



উপন্যাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ

লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চিত্রিত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একদিন সন্ধ্যাবেলা সুকণ্ঠ এসে বললে, "কপাল ভালো তোমার।"

আমি হেসে বললাম, "কেন বলো তো। আবীরলতার ফুল এনেছো বুঝি?"

"উঁহুঁ" বলে' ঘাড় নাড়তে নাড়তে, চুলের গোছা সরিয়ে, আলগোছে কাণে মুখ রেখে সুকণ্ঠ বললে, "বজ্রনাথ যজ্ঞ করছেন। দেখে এলাম ধূমেধামে তোমার মূর্ত্তি পূজো হচ্ছে।"

আমি খানিক চুপ থেকে ভাবলাম, এ আবার কী রহস্য! মহর্ষির প্রধান শিষ্য বজ্রনাথ। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মানুষ ধন্য হয়ে যায়। সেই বজ্রনাথ কী চান আমার কাছে?

কৌতূহল হল। বললাম, "সুকণ্ঠ, একবার নিয়ে যাবে আমাকে? চুপি চুপি লুকিয়ে দেখে আসবো।"

সুকণ্ঠের মুখে কে যেন কালি মেখে দিলে। তার দুটি চোখে ভয় ফুটে উঠলো। সে বললে, "তা হবার নয় রঙিলা। গোপনে বজ্রনাথ যজ্ঞ করছেন। শুধু সাতটি শিষ্য তাঁর সেখানে আছেন। মহর্ষি পিঙ্গলও বিন্দুবিসর্গ জানেন না। মহর্ষি জানলে রক্ষা নেই। তাঁকে লুকিয়েই বজ্রনাথ যজ্ঞে বসেছেন।"

রহস্য গভীর হয়ে আসে। কিছুই ভেবে পাইনা। বজ্রনাথ পূজো করছেন আমায়, মহর্ষিকে লুকিয়ে—কেন?

সুকণ্ঠ সহসা আমার একটি হাত ধরে' বলে "রঙিলা, দেখো, একথা কাউকে বোলোনা যেন। মহর্ষি যেন টের না পান। বজ্রনাথের কাছে তাহলে লজ্জার চূড়ান্ত হবে আমার।"

সেরাতে সুকণ্ঠ বজ্রনাথের যজ্ঞ পাহারা দিতে চলে' গেছে। একাঘরে আমি অন্ধকারে বসে' আকাশ-পাতাল কত কী ভাবলাম। রাত একপ্রহর, দুপ্রহর হল। তখন পাহাড়ীদেশের রাতপাখীর গান শুনতে শুনতে কখন আমার দু'চোখে ঘুম নামলো, কত রাত হল! হঠাৎ একাঘরে কার পায়ের সাড়া পেলাম,



এ ফল নিয়ে আমি কি করব?

চক্‌মকি ঠোকার আওয়াজ হল, চাপাগলায় রাতের নিঃশ্বাসের মত কার কথা শুনলাম, "রঙিলা! ওঠো, ওঠো।"

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে দেখি, ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বজ্রনাথ। তাঁর পিছনে তাঁর সাতটি শিষ্য। সবার থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে স্বকণ্ঠ। একাঘর আর একা নয়—রাতের রহস্যসভা সেখানে জম্‌জমাট।

সেই আগুনের মত অপরূপ সুন্দর বজ্রনাথকে দেখে' আমার যেন আর বিশ্বাস হলনা। গলা শুকিয়ে গেল আমার। ফিসফাসের মত আমি একটু বলতে পারলাম, "তুমি কে!"

"আমি বজ্রনাথ। রঙিলা, এই নাও যজ্ঞের ফল।"

বজ্রনাথের হাত হতে ঘি-চন্দন মাখানো ফলটি নিয়ে আমি বিহ্বল স্বরে বললাম, "আমি—এফল দিয়ে আমি কী করব?"

বজ্রনাথের গম্ভীর সুন্দর মুখ অপরূপ হাসিতে ভরে গেল। তিনি বললেন. "এই ফল এখন তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি হাঁটু পেতে বসছি, তোমার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, শুধু বলো তুমি—আমি যা চাই পাবো।"

আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম, ভাবলাম পথকুড়োনো মেয়েকে নিয়ে এ কোন্ চূড়ান্ত তামাসা? তবু আমি বললাম, "কী চান বজ্রনাথ!"

বজ্রনাথ হাঁটুপেতে বসে' পড়ে' বললেন, "আমি চাই অমরলতা। রঙিলা, বলো অমরলতা আমার হবে!"

আমি ভাবলাম, এ কী ছেলেমানুষী এ কী পাগলামী! তবু আমি বললাম, "মহর্ষি পিঙ্গলের জয়-হোক—তাঁর আশীর্ব্বাদে অমরলতা হোক্ আপনার।"

মহর্ষি পিঙ্গলের নাম শুনে বজ্রনাথের সুন্দর মুখে ভ্রূকুটি জাগলো, তাঁর দুটি চোখ আগুনের মতন ধ্বক্ করে' জ্বলে' উঠল। ভয়ঙ্কর হেসে বজ্রনাথ বললেন, "মহর্ষি পিঙ্গলের জয় হলে' বজ্রনাথের জয় আর হবার নয়। রঙিলা, অমরলতা তোমার। তুমি যাকে দেবে অমরলতা তার হবে।"

আমি বলতে গেলাম, "সে কী কথা বজ্রনাথ, মহর্ষি পিঙ্গল যে অমরলতার তপস্বী, আমি যে অমরলতার দাসী"—বাধা দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনাথ বলে' উঠলেন, "মিছে কথা। কে বলে তুমি অমরলতার দাসী? রঙিলা, তুমি কি বুঝছোনা তুমি অমরলতার কে? তোমাকে না হলে অমরলতা পাওয়া চলেনা, পাঁচশো বছরের পরমায়ু ফাঁকি হয়ে' যায়—তাই না মহর্ষি একদিন মিশর থেকে তোমাকে নিয়ে এলেন মরুভূমি আর মহাসমুদ্রের শেষে হিন্দুস্থানে। তুমি আজ আমাকে হাঁটুপেতে বসতে দেখে অবাক হচ্ছ। শোনো রঙিলা, একদিন মহর্ষি ঠিক এমনি হাঁটু পেতে বসে বলবেন, 'রঙ্গিলা, অমরলতা দাও আমায়।'"

আমি ভাবলাম, তাই কি? তা হলে আমি কি পথকুড়নো সামান্য মেয়ে নই? আমি কি মানুষ নই? আমি কি মিশরদেশের আপনভোলা কোনো দেবী?—একদিন পিরামিডের ছায়ায় পৃথিবীর পথে নেমে পথ কি ভুলে গেছি আকাশদেশের? এতকথা জেনেই কি মহর্ষি নিয়ে এলেন আমায়? মহর্ষি কি আমায় আসল কথা লুকোচ্ছেন—আমি কি অমরলতার দাসী নই, দেবী! আমার মুখের কথায় অমর-লতার ইতিহাস কি হবে বদল? মহর্ষি পিঙ্গল মুছে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠবেন বজ্রনাথ?

দেখলাম, বজ্রনাথের দুটি চোখের তারা আকাশতারার মত ঝিক্‌মিক্ করছে—তা'থেকে ছায়াপথের আলোর মত একটা রহস্যরশ্মি যেন আমার উপর এসে পড়ছে।

আমি কী ভাবতে গেলাম, একবার মহর্ষিকে নাম ধরে' ডাকতে গেলাম, ভাবনা গুলিয়ে গেল. মুখের কথা মুখে রইল।

বুদ্ধি লোপ পেলো আমার।

মহর্ষি পিঙ্গল শিষ্যদের বর দিয়ে বলতেন, 'তথাস্তু।' মিশরের পথকুড়োনো মেয়ে আমি হঠাৎ বজ্রনাথের উদ্দেশে একটি হাত তুলে বললাম, 'তথাস্তু।'

পরদিন সুকণ্ঠ এলো। চোখ তুলে সে তাকাতে চায়না, মাথা হেঁট করে' থাকে। খানিকবাদে তার লজ্জা ভাঙে। হঠাৎ মাথা তুলে' সে বলে' ওঠে, "কাল বজ্রনাথকে বর দিলে। দেবী, আমাকেও একটি বর দাও।"

একি পরিহাস? না, সত্যিসত্যি! দেখলাম, সুকণ্ঠের চোখেমুখে পরিহাসের লেশ নেই।

আমি বললাম, "বড় হও, বীর হও, আর রঙিলাকে কখনো ভুলে না যাও, এই বর দিলেম।"

"নাঃ, বড় আর বীর হওয়ার বড় ঝকমারী। শেষটুকু শুধু নিলেম রঙিলা দেবী—তোমাকে যেন ভুলে না যাই, যেন তোমাকে আবীরলতার ফুল এনে দিতে পারি, যেন গান শোনাতে পারি।"

আমি বললাম, "সুকণ্ঠ! কী হয়েছে তোমার বলতো! এত কথা কেন!"

হঠাৎ সুকণ্ঠের মুখ কালো হয়ে আসে। একটু কাছে সরে এসে একহাতে আমার আঁচলের খুঁটটা মুঠ করে' ধরে' সে বলে, "জানিনা কেন রঙিলা, কাল রাত থেকে হঠাৎ একটা ভয় এসে ধরেছে আমায়। মহর্ষির চোখে ধূলো দিয়ে বজ্রনাথের দলে ভিড়েছি, বজ্রনাথকে ছাড়বো সে সাহস নেই, বুকে সে জোরও নেই। বজ্রনাথ আমার হৃদয়ে আঁকা হয়ে আছেন। কিন্তু কে যেন আমায় চুপিচুপি বল্‌ছে, "সাবধান। মহর্ষি পিঙ্গলের অভিশাপে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে—বজ্রনাথ শেষ হয়ে যাবেন, সেই সঙ্গে আমরা।"

আমার বুক দুরু দুরু কেঁপে উঠল।

সুকণ্ঠ ফিস্‌ফাস করে' বললে, "আজ রাতে পঞ্চাশ হাজার সন্ধানী নিয়ে বজ্রনাথ যাচ্ছেন।"

অবাক হয়ে আমি বললাম "বজ্রনাথ যাচ্ছেন—কোথায়?"

"মহর্ষি পিঙ্গলের কেল্লায়।" মনে মনে একটা হিসেব ধরে' সুকণ্ঠ বললে, "পাঁচলাখ সন্ধানীর আড়াই-লাখ অমরলতার খোঁজে ফিরছে—এখনো ফেরেনি। বাকী আড়াই লাখের পঞ্চাশ হাজার বজ্রনাথ হাত করেছেন। মহর্ষির দলে যে দুলাখ সন্ধানী আছে তাদের আজ ছুটি। তারা যে যার ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে। যে পাঁচ হাজারের উপর কেল্লা পাহারা দেবার ভার তারা বজ্রনাথের দলের লোক। বজ্রনাথের হুকুম পেলেই তারা পথ ছেড়ে দেবে। মহর্ষি পিঙ্গল আজ নিজেকে বাঁচাতে পারেন কিনা সন্দেহ। মহর্ষির তক্তে হয়তো বসবেন বজ্রনাথ।"

আমি বললাম. "কী সর্ব্বনাশ! মহর্ষিকে খুন করতে যাচ্ছেন বজ্রনাথ!"

সুকণ্ঠ ম্লান হেসে বললে, "বজ্রনাথ তলোয়ার বড় ভালোবাসেন। তিনি বলেন, তলোয়ারের মত বন্ধু মানুষের দুটি নেই। তলোয়ারের কোপে হাজার বছরের ঝগড়া একনিমেষে মিটে যায়।"

আমার মন কেঁদে উঠল। মহর্ষির শান্ত উজ্জ্বল দুটি চোখ, গভীর গম্ভীর কণ্ঠ, তাঁর সাধনা ত্যাগ—সব কিছু একে একে আমার মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, হায়! বজ্রনাথ এ কী করতে যাচ্ছেন!

সুকণ্ঠের একটা হাত শক্ত করে' চেপে ধরে আমি বললাম, "সুকণ্ঠ! চলো, এক্ষুণি বজ্রনাথের সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।"

সুকণ্ঠ থমকে গেল। সে অস্পষ্ট গলায় বললে "কিন্তু এসব কথা তোমাকে বলতে বজ্রনাথ নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন যে!"

আমি বললাম "সুকণ্ঠ! বজ্রনাথ আমায় দেবী বলে জানেন। দেবীর পক্ষে মানুষের মনের খবর জেনে নেওয়া অসম্ভব নয়। ভয় নেই। তোমাকে বাঁচিয়ে আমি চলব।"

একাঘরে জানালার পাশে বসে' আছি আমি। বাইরে অন্ধকার জমে' উঠেছে। পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে নীল আকাশ থেকে গা ঢাকা দিয়ে ছায়ার দল নেমে আসছে। আমি ভাবছি এতক্ষণে বজ্রনাথের পঞ্চাশ হাজার সন্ধানী কেল্লা দখল করেছে না কি তারা এখনো খোলা তলোয়ার হাতে মহর্ষি পিঙ্গলের গুপ্তকোঠার-দিকে আঁধারে গা মিশিয়ে গুঁড়িসুড়ি এগিয়ে চলেছে!

সকালে বজ্রনাথের ঘরে পা দিতে বজ্রনাথ চমকে উঠেছিলেন। অনেকটা সময় চুপ থেকে ধীরে ধীরে বলেছিলেন, "আচ্ছা! তোমার কথাই রাখবো দেবী রঙিলা। মহর্ষি রক্ষা পাবেন। একাঘরে জীবনের শেষদিনতক বন্দী থাকবেন তিনি। তবে কথা দাও, তুমি থাকতে অমরলতার তপস্যা আর কারো হবেনা, হবে শুধু বজ্রনাথের।"

আমি বলেছিলাম, "যদি মহর্ষির হাতে দৈবাৎ আজ বজ্রনাথ হটে যান, তাহলে?"

"তাহলে'ও অমরলতার তপস্যা হবে আমার—কথা দাও!"

আমি বলেছিলাম, "মহর্ষি বেঁচে থাকতে তাঁর হাত থেকে তপস্যা ছিনিয়ে নেওয়া, সে কী করে সম্ভব বজ্রনাথ!"

বজ্রনাথ বলেছিলেন, "দেবী রঙিলা। এখনো অনেক কথা জানা নেই তোমার। শোনো তবে। রঙিলা দেবী, তুমি কি জানোনা অমরলতার ইতিহাসের নতুন পাঠ সুরু হয়েছে। অমরলতা আর মানুষের চোখের আড়ালে নেই! আড়াইলাখ সন্ধানী মিছেই খুঁজে ফিরছে। কিন্তু মহর্ষির ধ্যানে হঠাৎ অমরলতা ধরা দিয়েছে, পাওয়া গেছে তার সবুজদ্বীপের নিশানা। কত নদী কত সমুদ্রের শেষে কত যোজন পথ পেরিয়ে সে দ্বীপ, মহর্ষি জেনেছেন। সুগোপনে মহর্ষি একখানা মানচিত্র এঁকেছেন—সেই মানচিত্র যার হাতে আসবে সে একদিন সবুজদ্বীপে পৌঁছবেই। এখন মহর্ষির তপস্যা শেষ, যারা পাহাড় ডিঙিয়ে সমুদ্র উজিয়ে চলতে জানে, তলোয়ারের কোপ হানতে জানে, এখন তাদের তপস্যা সুরু। ঋষি এখন সরে দাঁড়াবেন, বীর এসে হাত দেবে কাজে।"

আমি বলেছিলাম "মহর্ষির প্রধান শিষ্য বজ্রনাথ। বীর তো তিনি কম নন। মহর্ষির কাছে বীরের যোগ্য কাজটি চেয়ে নিন তিনি। মহর্ষির গায়ে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে লাভ কি? মহর্ষি তাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে অমরলতার নিশানা দিয়ে সেনাপতি করে পাঠাবেন, এ অসম্ভব বিশ্বাস করবে কে? বজ্রনাথ কেন মিছামিছি অধীর হচ্ছেন?"

বজ্রনাথ দুঃখের হাসি হেসে বলেছিলেন, "রঙিলা দেবী! সুখে আছো। কিছুই জানো না তুমি। অমরলতার যে ইতিহাস এখন চলছে তাতে মহর্ষি পিঙ্গলের পর ছিলেম আমি। অমরলতার নিশানা জানবার পর মহর্ষি যে আমাকেই সবুজদ্বীপের মানচিত্র হাতে দিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো দিয়ে অভিযানে পাঠাবেন, সন্দেহ ছিলনা। কত কল্পনাই না ছিল আমার! ভেবেছিলাম অভিযানের কীর্ত্তি দিয়ে নিজেকে অমর করে' যাবো আমি কিন্তু হঠাৎ ইতিহাসের পাঠ গেল বদলে—বজ্রনাথ হটে গেল। সেখানে এলো আর একজন।"

বলতে বলতে বজ্রনাথের মুখ নিদারুণ রোষে কালো হয়ে গিয়েছিল, গলা ধরে' এসেছিল। বজ্রনাথ

একটু থেমে আবার সুরু করেছিলেন, "একদিন মহর্ষি ধ্যানে দেখা পেলেন এক আশ্চর্য্য পুরুষের। বিশাল বিরাট পুরুষ। চোখে তার আগুন জ্বলে, কণ্ঠস্বরে বাজ যেন ধমকে ওঠে। মহর্ষি দেখলেন একখানা মস্ত তলোয়ার হাতে করে' সে ঝড়ের মত জাহাজে চেপে ছুটে চলেছে, অসংখ্য জাহাজে সে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তার তলোয়ারের কোপে কাটামুণ্ডুর পাহাড় জমছে। মহর্ষি ধ্যানে স্থির করলেন, অমরলতার তপস্যা হবে এর। বজ্রনাথ বাদ যাবে।"

বজ্রনাথের গম্ভীর কণ্ঠ আমার কাণে বেজে উঠেছিল, "রঙিলা, মহর্ষির ধ্যানে দেখা পুরুষ সামান্য নয়। কিন্তু বজ্রনাথ, সেও তো তুচ্ছ নয়। ঘৃণা করে' তাকে হটিয়ে দেওয়া—আমি ভাবতে পারিনা রঙিলা। আজ রাতে মানচিত্র হাত ক'রব। জাহাজ তৈরী আছে। মাঝিমাল্লা সব তৈরী। কাল রাত না পোহাতে জাহাজে পাল উঠবে, বজ্রনাথের অভিযান সুরু হবে। মহর্ষির ধ্যান-পুরুষ ধ্যানেই থাকুন। বোম্বেটে কালীভূষণ জাহাজে চেপে স্ফূর্ত্তিতে জাহাজ পোড়ান, মানুষ মারুন, বোম্বেটেগিরিতে হাত পাকান—আমার পথ আটক হবার নয়।"

জানালায় বসে, সকল কথা আমার মনে পড়ে' গেল। সামনে একখানা কালো পাথরের দেয়ালের মত জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকারের গায়ে আমি যেন সব ছবি দেখতে থাকলাম। দেখলাম, বজ্রনাথ যেন জাহাজে চেপেছেন, দেখলাম মাঝসমুদ্রে দুর্দ্দান্ত বোম্বেটে কালীভূষণ যেন বজ্রনাথের পথ আটক করেছে. বজ্রনাথের জাহাজের পাল যেন আগুনে জ্বলে উঠেছে। দেখলাম বোম্বেটে কালীভূষণ যেন হাঁটু পেতে বসেছে মহর্ষি তাকে যেন আশীর্ব্বাদ করছেন। দেখলাম বোম্বেটে কালীভূষণ একখানা গেরুয়া পরে, অমরলতার জয় বলে হাঁক দিয়ে যেন জাহাজে চাপছে। দেখলাম একখানা আগুনভরা কালো মেঘ যেন অমরলতার পাহাড়ী-রাজ্যের উপর নেমে আসছে, যেন অনেকদূরের সবুজদ্বীপের আঁধার সমুদ্রে তুফান উঠেছে, তলোয়ারে তলোয়ার লেগে সবুজদ্বীপে যেন আগুন জ্বলছে, তাতে যেন অমরলতার ফুল শুকিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ অন্ধকার রাত যেন দুঃস্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠল, অনেকদূরে মহর্ষির কেল্লার ছাতে যেন একসঙ্গে অনেকগুলো মশাল জ্বলল। সামনে পথে ঘোড়ার খুর খট্‌খট্‌ বেজে উঠল। একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে কে যেন খানিকটা আলো আর ধুলো ছিটিয়ে ছুটে আসছে। ভয়ে উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। কে আসে? মহর্ষির কেল্লায় কোন্ দুর্ঘটনা ঘটেছে কে জানে?

আমার সাদাচুড়ো দালানকোঠার সামনে আসতেই মশাল নিভে গেল। অন্ধকারে এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দুরদার করে' দৌড়ে এসে কে কপাটে তিনটে বিষম ধাক্কা দিয়ে হাঁকলে "রঙিলা দেবী! দোর খোলো।"

কাঁপতে কাঁপতে আমি গিয়ে কপাট খুলে দিলাম।

সবুজ সাঁজোয়াপরা এক মূর্ত্তি মাথা নুইয়ে বললে, "মহর্ষি পিঙ্গলের জয় হোক। আমি সবুজ সন্ধানী।"

ধরাগলায় আমি বললাম, "কী খবর—এত রাতে"—

উত্তর হল, "বজ্রনাথ ধরা পড়েছেন। মহর্ষি পিঙ্গলের হুকুম, রঙিলা মাকে এখনই কেল্লায় যেতে হবে।"

ক্রমশঃ

মজার স্বপ্ন

শ্রীঅর্জ্জুনা দেবী রায়

তোমরা নিশ্চয় মজার মজার স্বপ্ন দেখ রাত্রে, না? দিনের বেলা অবশ্য স্বপ্ন দেখার কোন মানা নেই কিন্তু দিনের বেলা স্বপ্ন না দেখাই মঙ্গল। সেই গয়লানীর গল্প জানতো? সেই যে মাথায় এক কলসী দুধ নিয়ে গয়লানী চলেছে আর ভাবছে অর্থাৎ দিবা স্বপ্ন দেখছে: দুধ বিক্রী ক'রে সে হাঁস কিনবে, হাঁস ডিম পাড়বে, অনেক ছানা হবে। আর সে বড় লোক হয়ে—ভাল কাপড় জামা পরে উৎসবে যাবে। উৎসবে সুন্দর সুন্দর ছেলেরা এসে তাকে বিয়ে করতে চাইবে—আর সে মাথা নাড়বে। আর যেই না মাথা নাড়া, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল দুধের হাঁড়ি আর তার মধুর স্বপ্নের সব শেষ!

যাই হোক রাত্রে তো না ঘুমিয়ে উপায় নেই—আর ঘুমোলেই দু'একটা স্বপ্ন দেখতেই হয়। কিন্তু যদি সকালে উঠে স্বপ্নগুলি তোমাদের লিখে রাখো তা হলে তা থেকে ভারী মজার মজার বিষয় জানা যায়। স্বপ্ন যে কত অদ্ভুত কত আজগুবী হয় তার কয়েকটি উদাহরণ আজ তোমাদের দেবো। কিন্তু জেনো স্বপ্ন কেবল নিছক আজগুবীই হয় না, কোন কোন স্বপ্নের কেমন একটা মানে থাকে, একটা কারণ থাকে। আমরা যে জিনিষগুলি বাস্তব জীবনে চাই, ভাবি, আশা করি, স্বপ্নে সেগুলি একটা রূপ নিয়ে ধরা দেয়।

স্বপ্নকে অনেকে বলে থাকেন ঘুমের অভিভাবক। কিন্তু শুধু তাই নয় আমাদের রোজকার একঘেয়েমি থেকে স্বপ্ন একটা সুন্দর মধুর এ্যাড্ভেঞ্চার। স্বপ্ন ও রূপকথা বোধহয় একই সূত্রে গাঁথা। মার কোলে শুয়ে রূপকথা শুনতে শুনতে আমরা ঢুলে পড়ে সেই স্বপ্নরাজ্যে চলে যাই। কি অপরূপ সে রাজ্য—সেখান থেকে কি ফিরতে ইচ্ছে করে?

স্বপ্নের ঘটনাগুলি বেশীর ভাগই অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত হয় বলে আরো ভাল লাগে। বাস্তব জীবনে এঘটনা তো সত্যি ঘটবে না। অবশ্য স্বাভাবিক ঘটনাও আমরা প্রায়ই স্বপ্নে দেখে থাকি।

কিন্তু মজার স্বপ্নের কথা আমরা আজ বলছিলাম। কোন কোন স্বপ্ন সত্যি যেমনি অসম্ভব তেমনি এত সুন্দর হয় যে রূপকথাও হার মানে। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে ভারী ভাল লাগে, আর কিছুতেই জাগতে ইচ্ছে করে না—তাই না ?

একটি ছোট আট বছরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছিল !—তার শোবার ঘরে আকাশ থেকে নেমে সূর্য্য ও চন্দ্র বেড়াতে এসেছে আর ঘরে এমন জায়গা নেই যে মেঝের ওপর সে চলতে পারে। কাজেই তাদের দেশে স্বর্গে সে উঠে বেড়াতে গেল। আর গিয়ে দেখলে সেখানে সে কি অগুন্‌তি আলো আর কত নানা রংবেরং !

আর একটি ছোট আট বছরের ছেলে বড় তাজ্জব স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল যে, তাকে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্নান করাবার পর তাকে নিঙড়োন হোল, নিঙড়ে শুকোবার জন্য দড়িতে তাকে ঝোলান হোল। ঝুলতে ঝুলতে এমন সময় এলো বিষ্টি—তখন তার মা তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে ঘরে গেলেন 'ইস্ত্রি' করতে। আর ইস্ত্রির গরম লোহা যেই ছ্যাঁক করে তার গায়ে লেগেছে অমনি তার ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখে বিছানায় সে চুপটি করে শুয়ে আছে।

তারপর এই মজার স্বপ্নগুলি শোন ঃ

এগার বছরের একটি মেয়ে স্বপ্ন দেখল—তাকে কবর দেওয়া হচ্ছে! আর তার স্কুলের বন্ধুরা তার কবরের ওপর কত ফুল দিয়েছে কিন্তু তা তার মোটেই ভাল লাগছে না। যেই সে মুখে বিরক্তির শব্দ করেছে অমনি সে দেখে কোথায় কবর, নরম তুলোর বিছানায় সে শুয়ে আছে।

বার বছরের একটি ছেলে একবার স্বপ্ন দেখেছিল যে একটা মস্ত মাথা-ওয়ালা পোকার সঙ্গে সে খুব তর্ক করে রেগে তার মাথাটা দিলে কেটে। তখন পোকার লেজের দিকটা তাকে তাড়া করে বলতে লাগল ঃ দাও শীঘ্র আমার মাথা ফেরৎ, শীঘ্র দাও বলচি ! আর লেজের ধমক খেয়ে তার ঘুম গেল ভেঙ্গে।

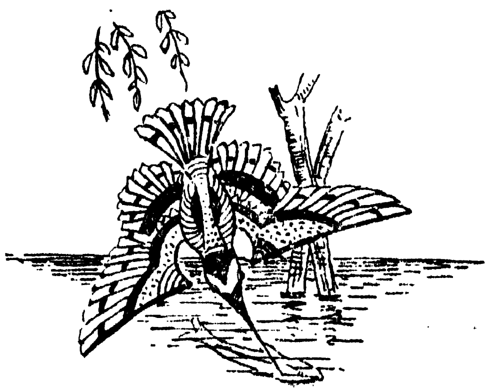
একটি তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে বড় মজার স্বপ্ন দেখেছিল। ইংরাজিতে একটা কথা আছে না—To rain cats and dogs—অর্থাৎ ভয়ানক বিষ্টি হওয়া ? এখন সে মেয়েটি স্বপ্ন দেখলে যে ঝড়জলের মত আকাশ থেকে জ্যান্ত কুকুর বেড়াল ঝপাঝপ্ পড়ছে। এই সেদিন করাচীতে একটি চাকরাণী এইরকম একটা স্বপ্ন দেখেছিল, আকাশ থেকে মাছ-বিষ্টি হচ্ছে ! এখন এর মজার ব্যাপার হচ্ছে, যে, তার কয়েকদিন পরে সত্যিসত্যিই

দেবী রায়

করাচীতে মাছ-বিষ্টি হয়েছিল! অবশ্য মরা মাছ। দুএকটা মাছ নাকি সহরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে রাখা আছে।

একটি বারো বছরের বধির ছেলে খবর পেয়েছিল যে সমুদ্রে এক দুর্ঘটনায় তার বাবার একটি পা নাকি ভেঙ্গে গিয়েছে। প্রায়ই সে তাই রাত্রে "পা" সম্বন্ধে কিছু না কিছু স্বপ্ন একটা দেখত। একরাত্রি যা দেখলে তা সে একেবারে তাজ্জব। সে দেখলে একটা পা তার শোবার ঘরে পড়ে আছে, সে তাড়াতাড়ি সেটা দেখতে গেল কিন্তু ওমা এ যে একেবারে তার নিজের পা'র মত! হঠাৎ সেই পা'টা লাফিয়ে উঠে তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। অনেক ছোটাছুটির পর পা'টা তাকে হঠাৎ ধরে ফেললে!—আর ধরে তাকে এমনি নাড়া দিলে যে—নাড়ার চোটে তার ঘুমই ভেঙ্গে গেল।

এমনি কত মজার স্বপ্ন আমরা দেখি। কিন্তু আমাদের রোজকার জীবনের সঙ্গে প্রত্যেক স্বপ্নটারই কিছু না কিছু ছোট্ট প্রচ্ছন্ন যোগ আছে। তোমরা যদি এমনি বা এর চেয়েও অদ্ভুত আজগুবী স্বপ্ন দেখ, তাহলে নিশ্চয়—রংমশালে জানিয়ো।



কাঙড়া উপত্যকায়

পারুল সেনগুপ্তা

অনেকদিন ধরে আমাদের জল্পনা চল্‌ছিলো—কাঙ্গড়া বেড়াতে যেতে হবে। বেড়াবার হিসাবে এই উপত্যকাটি অন্যান্য দৃশ্যবহুল পর্ব্বতাবলীর সমকক্ষ তো বটেই বরং অনেকাংশে আরও সুন্দর। লাহোর থেকে কাঙ্গড়ার দূরত্ব মাত্র দুইশত মাইল। তাই এবার যখন আমার বাবার এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধু কাঙ্গড়া উপত্যকার পালমপুর থেকে আমাদের সেখানে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন, আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।

সোমবার, ১৩ই জুন রাত্রের ট্রেণে আমরা লাহোর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন সকাল থেকেই বরুণ দেবতা আমাদের উপর প্রসন্ন ছিলেন। উপর্য্যুপরি কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় গ্রীষ্মের দগ্ধতাপ থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছিলাম। আমাদের ট্রেণ ছাড়ার পরই আরও জোরে বৃষ্টি নামল—সঙ্গে সঙ্গে ভয় হলো—বুঝি আমাদের ভ্রমণ মধ্য পথেই শেষ করতে হয়। কেন না—বেশী বৃষ্টি হলে কাঙ্গড়া উপত্যকার রেলপথে প্রায়ই পাহাড় থেকে পাথর ভেঙ্গে পড়ে, গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়। রাত্রি দুইটায় আমরা পাঠানকোট জংশনে গাড়ী বদল করে ছোট গাড়ীতে চড়লাম। পাঠানকোট্ ষ্টেশনটি কাঙ্গড়া পর্ব্বতমালার পাদমূলে অবস্থিত।

আমাদের প্রোগ্রামে ছিল প্রথমে জ্বালামুখী দেখতে যাওয়া। কাঙ্গড়ার মধ্যে জ্বালামুখী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে লোকে এখানে দেবী দর্শন করতে আসেন পীঠস্থান বলে। ভোরে যখন আমরা জ্বালামুখীরোড্ ষ্টেশনে পৌছালাম তখনও বৃষ্টি হচ্ছে এবং সংবাদ নিয়ে জানা গেল সেখান থেকে মন্দির পর্য্যন্ত ১১ মাইল—মোটরের রাস্তার অবস্থা বৃষ্টিতে শোচনীয়। কয়েকদিন পূর্ব্বেই নাকি এখানকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্ পুলিশ ও সিভিল সার্জ্জন্ এই পথে মোটর নিয়ে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন। এই সংবাদে আমরা আর এখানে নামবার সাহস পেলাম না। সোজা পালমপুর গিয়ে নামলাম বেলা ৯।০ টায়। বৃষ্টি তখন ধরেছে, চারিদিকের পাহাড়ে জলে ধোয়া সবুজের মেলা বসেছে। পাইন ও চীর গাছের মাথা থেকে তখনও টপ্‌টপিয়ে জল পড়ছে। উঁচু পাহাড়গুলির মাথা সাদা তুষারে ঢাকা যেন একরাশ তুলো পিঁজে কেউ জড় করে রেখেছে। তারই মাঝে মাঝে যেখানে বরফ গলেছে সেখানে পাহাড় দেখা যাচ্ছে দূর থেকে দেখে মনে হয় একমাথা শুভ্র পক্ককেশের মধ্যে দুচার গাছি কাঁচা চুল।

পালমপুর আর কাঙ্গড়ার মাঝখানের রেলপথের দৃশ্য বড় সুন্দর। স্থানে স্থানে রেলপথের একপার্শ্বে গভীর খাদ ও অন্য দিকে উঁচু পাহাড়। খাদের পাশেই অনেক নীচে পার্ব্বত্য নদী বাণগঙ্গা—বরফগলা জল নিয়ে পাথরগুলির উপর দিয়ে নেচে নেচে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা—মাঝে মাঝে ছোট্ট গ্রাম—

কাঙ্গড়াবাসীদের। গ্রাম থেকে গ্রামান্তর যাবার জন্য পাহাড়ের গায়েই চলা পথ—'পাক ডাণ্ডী'। অনেক জায়গায় তুপাশ থেকে তুটো পাহাড় এসে হঠাৎ থেমে গিয়েছে, মাঝখানে গভীর খাদ, সেখানে রেলের যে সেতু নির্ম্মিত হয়েছে তার কোন থাম নেই একটা ইস্পাতের arch-এর উপর সমস্ত সেতুটি দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এটা নাকি একটা মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কায়দা। এইরূপ একটী সেতু বাণগঙ্গার উপর পালমপুরের নীচেই আছে।

পাঠানকোট থেকে পালমপুরের মাঝে কাঙ্গড়াই সবচেয়ে বড় সহর। এখানে মিশনারীদের হাসপাতাল, স্কুল, একটী পুরাতন কেল্লা ও কাঙ্গড়া মন্দির নামে দেবীর এক বহু পুরাতন মন্দির আছে। এই মন্দির নাকি হিন্দুরাজাদের তৈরী।



পালামপুর ষ্টেশন



যোগীন্দ্রনগর (Power Station

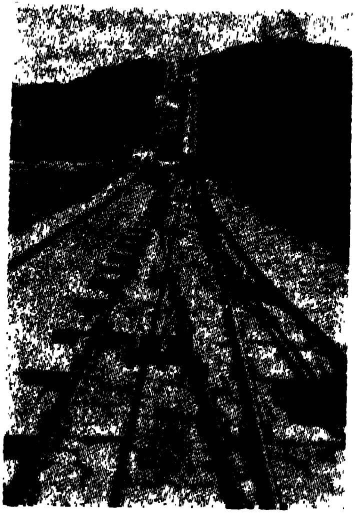
পালামপুরের চারিদিকেই চা বাগান। এখানে যে চা তৈরী হয় তা সবুজ চা ("গ্রীন্ টি")। মাঝে মাঝে চা তৈরীর কল ও আটা তৈরীর কল আছে। একে "পাণ চাকি" বলে। এগুলি জলের ঘুর্ণী দিয়ে চলে।

"গ্রীন টি" এখান থেকে কাশ্মীর অঞ্চলে চালান যায়। পালামপুরে তুইদিন থেকে আমরা প্রাচীন বৈজনাথ মন্দির দেখতে যাই। কথিত আছে যে, মহারাজা রাবণ মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন এইখানে বসে। মহাদেব তাঁকে নাকি এইস্থানেই 'মৃত্যুবাণ' দিয়েছিলেন। বৈজনাথ মন্দিরে আমরা মোটর করে আসি। মোটরের রাস্তা রেললাইনের মতই পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে গেছে। বৈজনাথ থেকে তুতিন মাইল যাবার পর 'মণ্ডি' ষ্টেট আরম্ভ হয়। 'মণ্ডি' ষ্টেটের রাজারা সেন বংশীয়। কথিত আছে এঁরা বল্লালসেনের বংশধর এবং এঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাংলা দেশ থেকেই ওখানে গিয়েছিলেন।

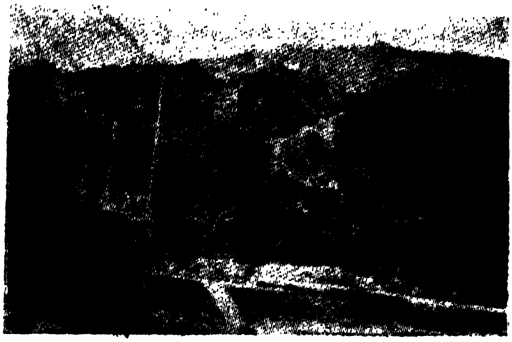
বৈজনাথ থেকে আমরা যাই যোগীন্দ্রনগর, এই রেল লাইনের শেষ ষ্টেশন। যোগীন্দ্রনগর নামকরণ হয়েছে মণ্ডি ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব রাজা যোগীন্দ্র সেনের নাম থেকে। বৈজনাথ থেকে যোগীন্দ্রনগর আরও

খানিকটা উঁচুতে উঠে আবার নামতে হয়। তাই এখান থেকে ট্রেণে তুটো ইঞ্জিন লাগে। পাঞ্জাবের বিখ্যাত হাইড্রো-ইলেক্ট্রীক্ পাওয়ার হাউস্ এই যোগীন্দ্রনগরে অবস্থিত। এতবড় হাইড্রো-ইলেক্ট্রীক Scheme ভারতের আর কোথাও নেই।

যোগীন্দ্রনগরে পৌঁছাবার পর প্রথম দিন সন্ধ্যায় আমরা ওখানকার 'পাওয়ার হাউস্' দেখ্তে যাই। এখান থেকে যে ইলেক্ট্রিসিটি তৈরী হয় সে বিদ্যুৎ তার যোগে সোজা পাঠানকোট গুরুদাসপুর, লাহোর,



ট্রাক্ ও ট্রাকের লাইন (যোগীন্দ্রনগর)



ব্রোট (Head Works)

প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হচ্ছে। সমস্ত পাঞ্জাবের বড় বড় সহরে—একদিকে দিল্লী এবং অন্য দিকে রাওলপিণ্ডি পর্য্যন্ত যাতে এখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় তার ব্যবস্থা চল্‌ছে। এর উদ্দেশ্য পাঞ্জাবের সমস্ত কলকারখানা বিদ্যুতে চল্‌বে এবং তাতে পাঞ্জাব উন্নত ও অর্থশালী হবে।

যোগীন্দ্রনগর থেকে আমরা পাহাড়ের উপর ব্রোট্ দেখতে যাই, যেখান থেকে জল নেওয়া হচ্ছে। সেখানে যেতে হলে Hydroelectric Dept.এর অনুমতি নিতে হয়, কিন্তু নির্ম্মলবাবু (যাঁর বাড়ীতে আমরা উঠেছিলাম) থাকায় আমাদের সে সব হাঙ্গামা হয়নি। সেখানে যেতে হলে ট্রলি ট্রাকে পাহাড়ে উঠতে হয়। ট্রলিখানা একটা মোটা তারের দড়ি দিয়ে বেঁধে ওপর থেকে টেনে নেওয়া বা নামিয়ে দেওয়া হয় এই টেনে নেওয়া বা নামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটা বিদ্যুতের সাহায্যেই হয়। আমরা যথন ট্রাকে উঠলাম তথন সকাল ৮৷৹টা। ট্রাক্‌খানা একখানা তক্তা ছাড়া কিছুই নয়, তার নীচে দু জোড়া চাকা। টাকে একবারে শুয়ে পড়তে হয় কিন্তু পাহাড় জায়গায় জায়গায় এত সোজা উঁচু যে মনে হয় আমরা ট্রাকে শুয়ে নেই বসে আছি। সেইখান দিয়ে যাবার সময় নীচের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে। ট্রাকখানা চলে লাইনের উপর দিয়ে আর দুই লাইনের মাঝখানে Pulleys আছে।

ট্রাক টেনে তোলার দড়ি এই Pulleyর ওপর দিয়ে গেছে। যেখান থেকে এই দড়িটানা হচ্ছে সেখানে খুব বড় একটা রোলারের গায়ে দড়িটা জড়ান আছে, আর সেই দড়ির তুটো মুখে তু'খানা ট্রাক বাঁধা আছে—যখন একটা উঠে তখন অন্যটা নামে।

যোগীন্দ্রনগর থেকে প্রথম ট্রাকে আমরা উঠলাম ৫,৫০০ ফুট। সেখানে আবার ট্রাক বদল করে উঠলাম আরো ২,৪০০ ফুট। এই জায়গা থেকে হেঁটে প্রায় ১½ মাইল পথ চলার পর আমরা যে জায়গায় পৌছালাম, তার নাম Head gear, আর এ জায়গাটা ৮,৩০০ ফুট উঁচু। এখান থেকে আবার আমরা ট্রাকে করে ১০০০ ফুট নামার পর ট্রাকের দড়ি বদল করা হল। এই দড়ি বদল এক বিপজ্জনক ব্যাপার। তখন মনে হচ্ছিল যদি একবার কোনও রকমে দড়ি বদল করার পূর্ব্বেই ট্রাক চলতে আরম্ভ করে তাহলে আর ফিরতে হবে না, ঐখানেই চিরসমাধি। এখান থেকে আরো ১০০০ ফুট নীচে নেমে আমরা উল (uhl) নদীর ধারে এসে পৌছালাম। ওপর থেকে উল নদী দেখে মনে হচ্ছিল একটা রূপার তার পড়ে আছে। নীচে এসে দেখলাম নদী বেশী চওড়া নয় তবে স্রোত এত বেশী যে কুটো পড়লে তু'খানা হয়ে যায়। এ জায়গার দৃশ্য এত সুন্দর যে বর্ণনা করা যায় না। উলের ধারে ধারে প্রায় একমাইল চলার পর আমরা এসে পড়লাম উল নদী ও লম্বাডাগ্ নদীর সঙ্গমস্থলে। এই জায়গাকে Headworks বলে। এইখান থেকে Hydroelectricএর টানেল কেটে জল বার করে নেওয়া হয়েছে। উল নদীর জল বরফের মত ঠাণ্ডা—আর বার মাসই এই রকম স্রোত নদীতে থাকে—তাই জলের অভাব হয় না। এজন্যে এর জল ইলেক্‌ট্রিক 'পাওয়ার' (power) তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হবার উপযোগী বলে এইখানে হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার ষ্টেশন (Hydroelectric power station) তৈরী হয়েছে। অতীব জটিল কলকব্জাও যে প্রকৃতিরই সাহায্যে চালান যেতে পারে হাইড্রোইলেকট্রিক স্কীম্ তারই একটা দৃষ্টান্ত। এইখান থেকেই আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি। যখন আবার যোগীন্দ্রনগর এসে পৌছাই তখন বিকাল ৬টা।

তারপরদিন আমরা যোগীন্দ্রনগর থেকে বিদায় নিয়ে আবার লাহোর রওনা হলাম।

লাঠিয়াল পুলিনবিহারী

শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত

বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে একটা অপবাদ শুনা যাইত,—বাঙ্গালা ভারু, বাঙ্গালী কাপুরুষ, বাঙ্গালীর মধ্যে বীর জন্মগ্রহণ করে নাই। এই কথা শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালীর মনেও ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তাহারা বুঝি সত্যি সত্যি ভীরু ও দুর্ব্বল, কিন্তু বাঙ্গালী চিরকাল সত্যি সত্যিই দুর্ব্বল ছিল না। পরশ্রীকাতর বিদেশী ঐতিহাসিকের লেখনিমুখে ঐসব কথা বাহির হইয়াছে, উহা মিথ্যা। বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। বাঙ্গালী রাজ্য পরিচালনা করিয়াছে, বাঙ্গালী দেশ বিদেশে গিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়ের মত বীর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ছিল বীর, যোদ্ধা, শক্তিমান পুরুষ। এমন কি বাঙ্গালী নারীও লাঠি হাতে বাঘ তাড়াইয়াছে। সুতরাং 'বাঙ্গালী ভারু কাপুরুষ' এমন কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

অবশ্য বাঙ্গালীর বন্দুক কামানের বহর তেমন ছিল না, কিন্তু যাহা ছিল তাহার দ্বারাই বাঙ্গালী দিগ্বিজয় করিয়াছে। বাঙ্গালীর ছিল লাঠি, ঐ লাঠিই ছিল তাহার খাঁটি পরিচয়। সেকালের শিক্ষিত লাঠিয়ালগণের অসীম ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন —

"……লাঠি, তুমি বাঙালীর আব্রু পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে, বদ্‌মাইস্ তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, তুমি তখনকার পিনাল কোড ছিলে।"

সেকালের জমিদারের পাইক, পেয়াদা ও লাঠিয়ালদের সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী আজও লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীতে জীবিত রহিয়াছে। বিক্রমপুরের যুদ্ধের পর আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কেদার রায়ের রাজ্য তাঁহার প্রধান অমাত্য রঘুরামের হাতে দিয়া যান। রঘুরামের প্রধান সর্দ্দার রামমালিকের অদ্ভুত লাঠি খেলার কথা আজও লোকে গাহিয়া থাকে ঃ—

রাম মালিকের লাঠি
রঘুরায়ের মাটী।
উঠলে লাঠির ডাক,
দৌড়ে পালায় বাঘ।
গুলি ফিরে ঝাঁকে
রামের লাঠির পাকে।
মালিক ধরে লাঠি,
যম যেন সে খাঁটি।

এমন কত রামমালিক সেকালের বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিত।

বস্তুত: লাঠি-খেলোয়াড়ের অভাব বাঙ্গলা দেশে কোন কালে হয় নাই। বাঙ্গালীর শক্তিসাধনার ইতিহাস লাঠিয়ালগণের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত।

কিন্তু এই ইতিহাসের ধারা যখন পুষ্টির অভাবে শুষ্কপ্রায় তখন বাঙ্গলায় এক শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হইল। তিনি পুলিন বিহারী দাশ। দেশের শিক্ষিত তরুণদের ভিতর ইনিই নূতন প্রথায় লাঠিখেলা শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। অন্যান্য লাঠিয়ালগণের সঙ্গে তুলনায় এইখানেই পুলিনের পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। বিশেষ করিয়া ছোট ও বড় লাঠির এমন সুন্দর নিয়মে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান ভারতের কোন প্রদেশেই হইয়া উঠে নাই।

১৯০৩ সালের কথা। পুলিনবিহারীর প্রথম লাঠিখেলা শিক্ষার আরম্ভ হয় একজন মুসলমান লাঠিয়ালের নিকট। ইহার কিছুদিন পরে লর্ড কার্জ্জন যখন ঢাকায় আসেন তখন ঢাকার নবাব সাহেব প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল প্রোঃ মার্ত্তাজাকে লাঠিখেলা দেখাইবার জন্য ঢাকা আনেন। মার্ত্তাজা ছিলেন একজন যাদুকর। ঠগীদের সঙ্গে জেলে থাকিবার সময় তিনি তাহাদের কাছে লাঠি খেলা শিখেন। ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পি, কে, রায় মার্ত্তাজাকে একদিন কলেজ প্রাঙ্গনে খেলা দেখাইতে আমন্ত্রন করেন। এই সময় পুলিন তাঁহার নিকট লাঠি খেলা শিক্ষার সুযোগ পাইলেন। ইহার পর মার্ত্তাজা যখন শ্রীরামপুরে থাকিতেন, তখন পুলিন শ্রীরামপুরে যাইয়া মার্ত্তাজার খেলার পদ্ধতি দেখিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া ধীরে ধীরে লাঠি সম্পর্কিত কতকগুলি তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লন। লাঠিখেলা শিক্ষার প্রতি পুলিনের ছিল দুর্ব্বার আগ্রহ ও চেষ্টা, সুতরাং পথের ইঙ্গিত তিনি আপনিই পাইয়াছিলেন। পুলিন এখন হইতে কয়েকজন শিষ্য করিয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু

কিছু শিক্ষাদান আরম্ভ করিলেন। ঐ শিক্ষার সময় তিনি কতকগুলি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি জানিতেন সংযম ভিন্ন উন্নতি অসম্ভব। যা' তা' ভাবে লাঠি পরিচালনা করিলে কোন লাভ হইবে না; ইহাকে একটা সুশৃঙ্খল রূপ দিতে হইবে। তিনি লাঠিখেলা সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

সুসঙ্গের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একখানা সংস্কৃত পুস্তক, বোলপুর শান্তি নিকেতন হইতে কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা পুস্তক এবং Capt. Opert ও ৺রামদাস সেনের ভারতবর্ষীয় অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কিত পুস্তক প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া এবং বড় লাঠি, ছোট লাঠি, গদা, ছুরি, অসি, তীর, ধনুক, পরশু, ভিন্দিপাল, যুযুৎসু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় অস্ত্র ও কৌশল প্রয়োগ ব্যবহার শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজে অভিজ্ঞ হইয়া তিনি শিষ্যদিগকে শিক্ষা দান করিতে থাকেন।

এই সময়ে বীরাষ্টমী পূজা ও ডাঃ পি, কে, রায় মহোদয়ের বিদায় উপলক্ষে পুলিন সর্ব্বপ্রথম সাধারণের সমক্ষে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য লাঠি খেলায় কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসা লাভ করেন। তখন হইতেই পুলিনের নাম ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময়ে তিনি ঢাকা কলেজে লেবরেটরী এসিস্‌টেন্টের কাজ করিতেন।

১৯০৫ সালে কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ পি, মিত্র, বিপিন পাল প্রমুখ নেতাগণের উদ্যোগে বাঙালী যুবকদের মধ্যে শরীর চর্চ্চার আন্দোলন পূর্ণরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। নানাস্থানে ব্যায়াম চর্চ্চার সমিতি গঠিত হয়। ঢাকায়ও পুলিন যুবকদিগকে লাঠি খেলা শিখাইতে আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে স্বামীবাগ আশ্রম-ময়দানে কৃত্রিম যুদ্ধের (mock-fight) অনুষ্ঠান করিতেন। দুই বৎসরের মধ্যেই ব্যায়াম চর্চ্চার ফলে তরুণদের চেহারা বদলাইয়া গেল। যাহারা অলস, দুর্ব্বল, ভীরু বলিয়া লোকের বিদ্রূপ লাভ করিত, শক্তির যাদুস্পর্শে তাহারা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে সুস্থ, সবল ও শক্তিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। লোক দলে দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে লাগিল। লাঠি শিখিয়া আত্মরক্ষা এবং নারী রক্ষায় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে কৃত্রিম লাঠির লড়াই বাঙালী যুবকের প্রাণে শক্তিচর্চ্চার বিপুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আঘাত না খাইলে কেহ আঘাত দিতে পারে না, আবার মারামারি করিতে হইলে দশটা মার পিঠ পাতিয়া সহ্য করিবার ক্ষমতা ও সাহস থাকা চাই—কৃত্রিম লড়াইয়ে এই সমস্ত সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি গুণাবলীর অনুশীলন হয়। দুই দল যখন লাঠি হাতে চীৎকার করিয়া পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিত, এবং লাঠির ঘাত প্রতিঘাতে খেলার মাঠ কম্পিত হইয়া উঠিত তখন সে একটা দেখিবার দৃশ্য ছিল। প্রাচীন ইতিহাসের

ধারাকে, রক্ষা করিয়া এমনি করিয়াই সেদিন জাতি গঠন করিবার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

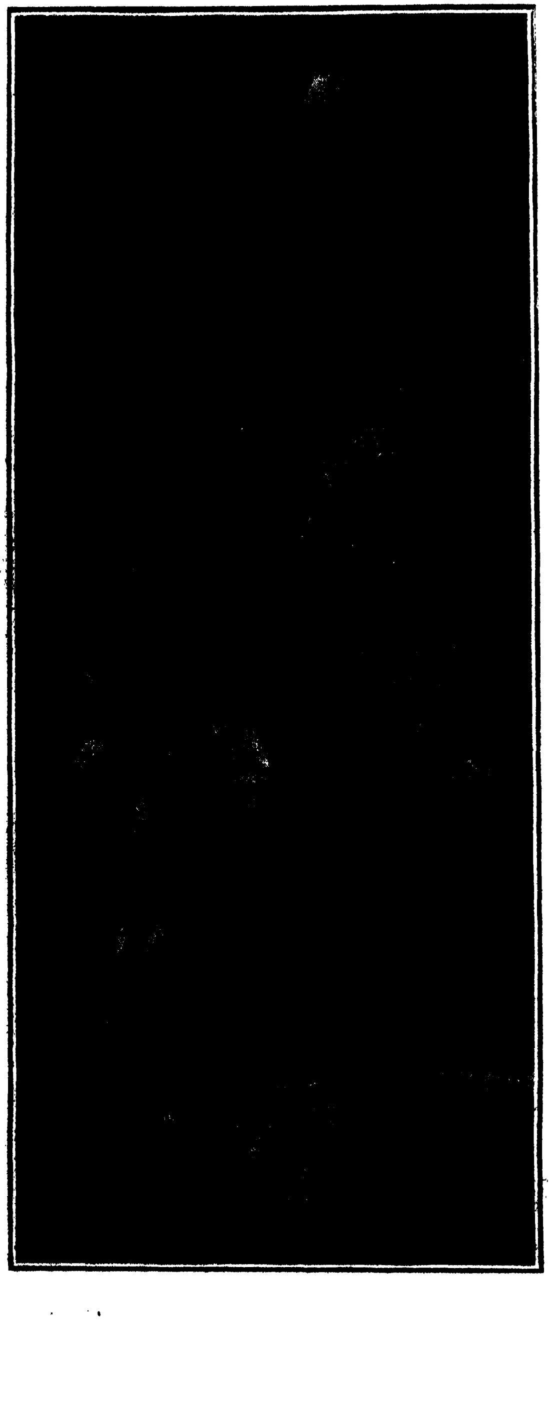
১৯০৬ সালে একবার প্রায় দ্বিসহস্রাধিক দুর্ব্বৃত্ত পুলিনের বাড়ী আক্রমণ করে। তখন পুলিন মাত্র পাঁচ ছয়টি বালকসহ তাহাদিগকে হঠাইয়া দেন এবং আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন লোক গুরুতররূপে আহত হয়। ১৯২৬ সালে কলিকাতায় যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধে তখন পুলিন উহার প্রতিরোধকল্পে অত্যাশ্চর্য্য কাজ করিয়াছিলেন। মন্দির রক্ষার্থ তিনি জীবনের মমতা ভুলিয়া দিবারাত্র প্রহরা দিয়াছেন। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী বিপক্ষদল কর্ত্তৃক বহুবার আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল পুলিনের বীরত্ব ও কর্ম্মকৌশলে তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। মেছুয়াবাজারে পুলিনের বাড়ীর নিকট একবার দুর্ব্বৃত্তের দল আক্রমণ করে কিন্তু পুলিনের সুগঠিত রক্ষিদল কর্ত্তৃক তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হয়।

যিনি দুর্ব্বৃত্ত ভীরু বাঙালীর প্রাণে সাহস ও শক্তি আনিয়া দিয়া তাহাকে জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন সেই বীর বাঙালী আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া বাঙালীকে বীর্য্যের পথে পরিচালিত করুন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।



দাদার ঘুঁড়ি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



দাদা তুমি ওড়াও ঘুঁড়ি ছাতের ওপরে
একটি পাশে চুপ্‌টি করে থাকি :
খোলা আকাশ নীল হয়েছে মেঘের কিনারে,
নিজের মনে সোনার স্বপন আঁকি ।

মজার রঙের হাজার ঘুঁড়ি উড়ছে আকাশে
কেউ বা নীল কেউ বা শাদা লাল,
তোমার ঘুঁড়ি বুক ফুলিয়ে উড়ছে তাদের পাশে
নীল আকাশে উড়িয়েছে তার পাল ।

মেঘের পাহাড় লাল হয়েছে পলাশ ফুলের মত
কত রঙ—গাঢ় ফিকে নীল ;
বকের সারি দিচ্ছে পাড়ি কোন্ সে নদীর চরে
সোনার বালু স্বচ্ছ ঝিলিমিল ।

তোমার ঘুঁড়ি দিগ্‌বিজয়ী ঘোরে খেয়াল মত
আকাশখানি এপার-ওপার চিরে,
সন্ধ্যে হলে রাত্রি যখন ঝোলায় তারার বাতি
তোমার ঘুঁড়ি তখন আসে ফিরে ।

আমি যদি দিগ্‌বিজয়ী তোমার ঘুঁড়ি হতাম
যেতাম উড়ে অনেক দূরে চলে,
সন্ধ্যে হলে অন্ধকারে আকাশ কালো হয়ে
যেখানেতে তারার বাতি জ্বলে ।

পল্‌কা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের তরোয়াল
সাঁতার দিয়ে যেতাম ঘুঁড়ির মত,
অনেক দূরে যেখানেতে স্বপন বুড়ির গ্রাম
ভীড় করেছে ছোট্ট তারা যত ।

দাদা তুমি ওড়াও ঘুঁড়ি ছাতের ওপরে
একটি পাশে চুপ্‌টি করে থাকি :
খোলা আকাশ নীল হয়েছে মেঘের কিনারে,
আমার বুকে ঘুঁড়ির স্বপন আঁকি ।

দূরের আলো

আদ্যিকালের ধাঁধা

শ্রীননীগোপাল দাস

প্রাচীন বাংলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানারকম ধাঁধা ছড়া রূপকথা শোনান হত। আর এ নিয়ে সকলে কত আনন্দ উপভোগ করত। ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাসার মধ্যে আমোদে আনন্দে ছেলেমেয়েদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির শতদলগুলি ফুটে উঠত। এই আমোদের ছলে জগতের অনেক কিছু জানবার বিষয়ও তারা শিখে ফেলত—যা তারা বইপড়ে কোনদিন শিখত কিনা সন্দেহ।

শিশুর জন্মের পর কি করে তাকে মানুষ করে তুলতে হয়, নূতন বিষয় তার মনে অঙ্কুরিত করতে হয় তা প্রাচীন বাঙ্লার মায়েরা জানতেন। সুললিত ছড়া গান গল্প রূপকথা ধাঁধার ভিতর দিয়ে শিশুর চরিত্র তাঁরা গড়ে তুলতেন। কোলের শিশুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে তাঁরাই বলতেন ঃ

আয় চাঁদ আয়।
নীল সাগরের ওপর দিয়ে,
বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে
মণির কপালে মোর টিপ দিয়ে যা।

চাঁদের আলোয় সমস্ত বাড়ীঘর ভরে যেত। মায়ের কোলে শুয়ে শিশু একমনে সেই সুমধুর ছড়াগান শুনত আর একদৃষ্টে বিস্মিত হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে মনে মনে কি ভাবত! এইভাবে চাঁদের সঙ্গে তার ভাব করিয়ে দেওয়া হত।

কিছুদিন পর যখন তার কথা বলার শক্তি আসত তখন আধ আধ ভাষায় ঐ ছড়াগুলি সে আবৃত্তি করত।

তারপর এটা কি ওটা কি জানবার জন্য শিশু সকলকে ব্যস্ত করে তুলত। দিদিমা ঠাকুমা, মা আবার শিশুর চতুপার্শ্বস্থ সাধারণ জিনিষগুলি শেখাবার জন্য তখন বলতেন ঃ

পিঁড়ি দিয়ে করবে কি ?
বউ বসবে !
বউ কোথায় ?
জল আনতে গেছে বৌ।
জল কোথায় ?
তাল খেয়েছে।
তাল কোথায় ?
বনে গেছে।
বন কোথায় ?
পুড়ে গেছে।
ছাই কোথায় ?
ধোপায় নিয়েছে।

এইভাবে জানবার প্রবৃত্তি তার মনে বাড়িয়ে দেওয়া হত। এরপর যখন শিশুর মন আরো নতুন বিষয় জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত তখন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসত রাজপুত্র, ব্যঙ্গমাব্যঙ্গমী আসত, বাণিজ্য নিয়ে আসত সওদাগর। আর শিশুর মন দেশবিদেশে ছুটত, তার অনুসন্ধিৎসু মন তার মধ্যে অপরূপ রূপ নিত।

ধাঁধার মধ্যে দিয়েও শিশুর মন অনুসন্ধিৎসু উৎসুক হয়ে উঠত। ধাঁধার মজার মধ্যে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কত কি সে শিখে ফেলত। তখন মায়ের দল শিশুরদলকে একসঙ্গে বসিয়ে বলতেন—

আছে ফল গাছে নেই
খায় ফল ছোবা নেই
বেনের দোকানে নেই
বাজার মুল্লুকে নেই।

এমন একটা ফলের নাম কর, যার ছোবা নেই , যা গাছে হয় না, যা দোকানে নেই যা বাজারেও পাওয়া যায় না।

শিশুর দল অবাক হয়ে ভাবতে বসল—ওরে সে আবার কি ? বর্ষার সময় শীল পড়ে তোমরা দেখেছ। এর ছোবাও নেই, গাছেও হয় না, বাজারে তো মেলেই না।

আবার ধরো ঃ

একগাছি দড়ি
গুছিয়ে না পারি।

দড়িগাছিকে তুমি যতই গোছাও না কেন এর শেষ পাবে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস করে গুছিয়ে চললেও এর সঙ্গে পেরে উঠবে না।

কাকে এই দড়ি বলা হচ্ছে?

রাস্তাকে।

আচ্ছা বলত তখনকার আর একটী ধাঁধা?

ঘরের মধ্যে ঘর
তার মধ্যে পরমেশ্বর।

রাতে মশার উৎপাতে ঘরে আমরা মশারী খাটিয়ে শুই। মশারী ঘরের মত আর তার মধ্যে ঘুমোচ্ছে ছোট্ট শিশু।

আনারস গাছ তোমরা দেখেছ। তার পাতাগুলি দেখতে ঠিক করাতের মত, নয়? সেই পাতার মাঝে আনারস হয়। আনারসের মাথায় জটার মত পাকিয়ে ছোট ছোট পাতা থাকে তাও তোমরা দেখেছ। দূর থেকে মনে হয় ঝুটকুলী দেয়া যেন একটি পাখী। এখন শোন ঃ

কর্ কর্ করাতের ধার
তার মধ্যে জটাধর,
জটাধরের নামটি কি
সুন্দর মত পাখীটি।

উত্তর দিতে বেশ ভাবতে হয়, না? আচ্ছা বলত?—

রাজাদের পুকুরের এক কোণা
নাড়া দিলে নড়ে সাত কোণা।

মস্ত কড়ায় দুধ জ্বাল দিলে কেমন সর পড়ে দেখেছ। সরের কোন দিক্ একটু নেড়ে দাও, দেখবে সরের চতুর্দ্দিকই চিক্‌চিক্ করে উঠছে।

উত্তরগুলি আমরা বলে দিচ্ছি তাই নইলে এর উত্তর দিতে বেশ ভাবতে হয়।

তারপর এই প্রাচীন-ধাঁধাগুলি শুনে ছোট ছেলেমেয়েদের মহলে কি হুলস্থুল পড়ত যে বলবার নয়। যেমন,—

আন্টিকালের ধাঁধা
শ্রীননীগোপাল দাস

এতো বড় মজারে ভাই
এতো বড় মজা
জানলা দিয়ে ঘর পালাল
গৃহস্থ রইল বাঁধা।

তোমরা ভাবছ, না এ হতেই পারে না। জানলা দিয়ে আবার ঘর পালাবে—এ অসম্ভব! তবে শোন: মাছ ধরবার জাল ফেলা হয়েছে জলে। জলের খানিকটা ঘরের মত জাল ঘিরে ফেললে। জল যেন সেই ঘর, জালের ফোপগুলি জানলা। জাল তোলা হল জলঘর জানলা দিয়ে পালাল, গৃহস্থ মাছ পড়ে রইল।

পূর্ব্বে বলেছিলে তোমরা একেবারে অসম্ভব। এখন দেখছ কত সোজা ও কি মজা।

এবার শেষ করি একটা আজগুবী ধাঁধা বলে—

মেটে হাতল কেঠো গাই
বছর বছর দুয়ে খাই।

ও বাবা! এমন তো কখন শুনিনি!—কাঠের গরু কখনও দুধ দেয় আর তা' আমরা বছর বছর খাই! তাহলে আমরাও নিশ্চয় কাঠের পুতুল। অসম্ভব মিথ্যে কথা! কিন্তু খেজুর গাছটা ভুলে গেলে কেন? খেজুর গাছের রস আমরা খাইনা? এই খেজুর গাছটা "কেঠো গাই" বলে কল্পনা করা হয়েছে।

এমনি করে মজার মজার ধাঁধা ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন বাংলার শিশুরা আমোদে আনন্দে কত জিনিষ শিখত। চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তি তাদের কত সুন্দরভাবে শৈশব থেকেই বেড়ে উঠত। প্রাচীন বাংলার আদর্শ কত সুন্দর ছিল, নয় কি? *

* Radio-তে Children's Corner এ পঠিত।

ছায়াচিত্রে ছোটরা

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একদিন বছর তিনেক বয়েসের ছোট্ট একটি কোঁক্ড়া-চুল লাজুক ছেলে এক গির্জের সাম্নে কয়েকটি ছোট্ট কবিতা আবৃত্তি করে। কে সেদিন ভেবেছিল বল আরো কিছুদিন পরে তার অভিনয় দেখার জন্যে সিনেমার টিকেট কেনার ঘরের সামনে হুড়োহুড়ি পড়ে যা'বে? ছেলেটির নাম ফ্রেডি বার্থলমিউ, তোমাদের ভেতর সবাই এই ছোট্ট অভিনেতার কোনো না কোনো ছবি নিশ্চয়ই দেখেছো।



"ডেভিড্স্ টেক্স্ দি কাউন্ট"এ ফ্রেডি, মিকি ও জ্যাকি গান ধরেছে'



কালানাগের' পিঠে বসে সাবু তাকে আক খাওয়াচ্ছে

তখন মেট্রো-কোম্পানী বিখ্যাত উপন্যাসিক ডিকেন্সের "ডেভিড্-কপারফিল্ড" ছবি তোলার তোড়জোড় করছে। অভিনেতা বাছার ধূম পড়ে গেছে। উপন্যাসের অন্য চরিত্র-গুলির জন্যে খ্যাতনামা অভিনেতাদের পাওয়া গেল, কিন্তু শিশু "ডেভিড্" সাজ্বে কে? অনেক শিশু অভিনেতা এলো, কিন্তু "ডেভিড" অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল। হঠাৎ একদিন এ খবর ফ্রেডির কাণে গেল। ডেভিড-কপারফিল্ড বইটা ফ্রেডির খুব প্রিয়, যখন সে পড়তে শেখেনি তখন থেকেই অন্য লোকের কাছ থেকে এর গল্প বহুবার সে শুনেছে। খুড়ীমার খুব আদুরে ছেলে ছিল ডেভিড, সে বায়না ধরল হলিউডে একবার তাকে নিয়ে যাওয়া হোক্। তারপর থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই আশ্চর্য্য এক্টা গল্পের মত, এবং তোমাদের মধ্যে যারা ডেভিড্-কপারফিল্ড বইটা দেখেছো তাদের কাছে সেই অদ্ভুত অভিনয়ের কথা নিশ্চয়ই

নূতন করে' বল্‌তে হবে না। অনেক বিখ্যাত অভিনেতাই সে বইতে নেমেছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যেও ফ্রেডির স্বাতন্ত্র্য সামান্যও কমে নি।......একজন ক্ষুদে অভিনেতার দেখা পাওয়া গিয়েছে, সভ্য জগতে সাড়া পড়ে গেল।

এর পর ফ্রেডিকে নিয়ে ছবির পর ছবি তোলা হাতে লাগ্‌ল। গ্রেটা গার্বো, ফ্রেডিক্ মার্চ্চ, ভিক্টার ম্যাক্‌ল্যাগল্যান ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত অভিনেতাদের সঙ্গে ফ্রেডি অভিনয় করেছে এবং সব জায়গাতেই দেখিয়েছে সমান অদ্ভুত কৃতিত্ব। লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ফ্রেডির জুড়ি নেই। ষ্টুডিওর চাকর-বাকর থেকে বড় বড় ডিরেক্টর আর অভিনেতাদের সে সমান প্রিয়।

বর্ত্তমানে ফ্রেডির বয়স প্রায় চোদ্দ বছর। কিন্তু শুধু অভিনয়ের ভেতরেই তার সমস্ত সময় কাটে নি। পড়াশুনো তাকে নিয়মিত করতে হয়, তা ছাড়া খেলা-ধুলোতেও তার জুড়ি পাওয়া ভার। ক্রিকেট সে ভালোই খেলে তা ছাড়া ফুটবলেতে গোল-কীপার থেকে ব্যাক্, হাফ্-ব্যাক্‌এতেও সমান দক্ষতার সঙ্গেই পারে খেল্‌তে।

জ্যাকি কুপার, মিকি, রুণি ও ফ্রেডি "ডেভিল টেক্‌স্ দি কাউন্ট" ছবিতে এক সঙ্গে অভিনয় করেছিল। তিন জনেই সমান দুরন্ত; ও ডিরেক্টার ভ্যান ডাইককে তারা জ্বালাতন করে মারত—যেমন ধর ভালো কাপড় জামা পরে ডিরেক্টার সায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটা পুকুর পাড়ে, কথা নেই বার্ত্তা নেই আচম্‌কা কোথা থেকে তিনজনে তারা এসে দিলে তাঁকে জলের মধ্যে ঠেলে ফেলে!

ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে অভিনয় করার যে অদ্ভুত একটা ক্ষমতা আছে মাত্র কয়েক বছর হল ঐ বিষয়ে দর্শক আর ডিরেক্টাররা সচেতন হয়েছেন। তাই শিশু অভিনেতাদের জন্যে চারিদিকে আজকাল সাড়া পড়ে গিয়েছে। ১৯৩৫ সালে রবার্ট ফ্লেহার্টি "এলিফ্যাণ্ট-বয়" ছবির টুমাই-এর ভূমিকায় শিশু অভিনেতার খোঁজে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সেদিন যে মহীশূর রাজ্যের নিঃসম্বল ভীতু চেহারার বারো বছর বয়েসের একটি ছেলে এসে ফ্লেহার্টির সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিল, চিত্র জগতে সে-ও দর্শকদের অন্য শিশু অভিনেতাদের চেয়ে কম আশ্চর্য্য করে নি। আমি সাবুর কথাই বল্‌ছি। "এ্যালিফ্যাণ্ট-বয়" ছবিতে একটি নিরক্ষর ভারতীয় ছেলে যে-অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছে সিনেমার ইতিহাসে সে একটা আশ্চর্য্য পাতা বৈকি! এইবারেই জীবনে সে প্রথম ক্যামেরার সাম্‌নে দাঁড়ায়, কিন্তু তার সহজ স্বাভাবিক অভিনয়, সূর্য্যের আলোর মত স্বচ্ছ হাসি সমস্তই অভাবনীয় সুন্দর। তার চেহারার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে সবাইকে তা আকর্ষণ করবেই। ডিরেক্টার ফ্লেহার্টি নিজেই জানেন না প্রথমে কেন সাবুকে তাঁর পছন্দ হয়!

কাবিনী নদী সেদিন বর্ষার জল মেখে পাগল হয়ে উঠেছে। মিঃ ফ্লেহার্টি বল্‌লেন, যে সেই স্রোতের মধ্যে দিয়ে একটা হাতিকে অন্য পারে নিয়ে যেতে পারবে বিশেষ একটা পুরস্কার তাকে তিনি দেবেন। মাহুতের সর্দ্দার এ কথা শুনে সব চেয়ে জোয়ান হাতিটা নিয়ে সেই দুরন্ত স্রোতে সাঁতার দিয়ে পার হতে রাজী হল। এই সময়েই সাবু তার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাবার প্রথম সুযোগ পেল— সে-ও হাতীর পেটে বাঁধা দড়িটা ধরে স্রোত পার হবে। সেই দুর্জ্জয় স্রোতের ভেতর মানুষ আর হাতি আর শিশু সবই ভাসমান ছিপির মত



"Our Gang"



"বুড়ী গিন্নী"—শার্লি টেম্পল

হাবুডুবু খেতে লাগ্‌ল। হাতিটা শুধু ওপারে গিয়ে পরিশ্রমে যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল, একমাত্র সাবুই শুধু তার হাসি দিয়ে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, "আমাকে নিয়ে চল্‌বে কি ?"

সেই নিঃসম্বল পিতৃমাতৃহীন মাহুতের ছেলে আজ বিলেতে। প্যারীতেও সে গিয়েছিল। সমস্ত সভ্য সমাজ আজ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইংরিজি বল্‌তে সে শিখেছে, সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা সে পেয়েছে। সবচেয়ে সে ভালোবাসে তার ছোট্ট মোটারকারে (এটা সে উপহার পেয়েছে) ডেন্‌হাম ষ্টুডিওর মাঠে খুসীমত ঘুরে বেড়াতে!

এরপর যে ক্ষুদে পাকা-গিন্নীর কথা তোমাদের বল্‌ব তার বয়স কিন্তু মাত্র ন' বছর! আজকালকার যুগে শার্লি তো প্রধান একটি বিস্ময়। শিশু অভিনেতৃ বলে যে আজকাল তার

খ্যাতি তা নয়—তার খ্যাতি অভিনেতৃ বলেই, ছবির রাজ্যে সে এখন 'ষ্টার'। ভাবতে পারো কি এ' কথা?

অভিনয় করে সপ্তাহে শার্লি যে কত পাউণ্ড পায় সে কথা নিজেও সে জানে না! নিজের হাত খরচের জন্যে সামান্য টাকা থেকেই সে তার গরীব বন্ধুদের ভোজ দেয়, উপহার কিনে দেয়।

অভিনয় করা থেকে আরম্ভ করে পিয়ানো বাজানো, নাচ, গান, ফ্রেঞ্চে কথা বলা ইত্যাদি সব কিছুই সমান দক্ষতার সঙ্গে সে সম্পন্ন করে। প্রত্যহ সে খবরের কাগজ পড়ে, রাত্রে ডায়েরি লেখে, নিজেই বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়—হাঁ, নেমন্তন্নর কথা বলায় সেদিনকার কথা মনে পড়ে গেল: সেদিন সে তার বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে অপেক্ষা করছিল, সপ্তাহে মাত্র একটি দিন তারা আসতে পারে—বেস্পতিবার। এলো একদল ছোট্ট দুরন্ত মেয়ে, বড়দিদির মত তাদের সে বসালো, সবাইকার সঙ্গেই 'ঘরসংসারে'র কথাবার্ত্তা হল, তাদের জন্যে খেলনা বার করে দিল—এক কথায় পাকা-গিন্নীর মত তার ভাবখানা!— —সাংসারিক খুঁটিনাটিতে অভিজ্ঞ মাত্র ন' বছরের একটি মেয়ে!

কিছুদিন আগে শার্লি লস্-এঞ্জেলস্‌এ এক হাসপাতালে গিয়েছিল। তার মাকে পেছনে রেখে একাই সে প্রত্যেক রুগ্ন লোকের কাছে গিয়ে তাদের কপালে মুখে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে নিজেই কেঁদে ফেলেছিল! গত বড়দিনের সময় গরীবদের উপহার দেবার জন্যে নিজেই সে বাজার করতে বেরিয়েছিল, প্রত্যেকটি উপহারের প্যাকেট নিজেই সে গুছিয়ে দিয়েছিল।

এখন সে বড় হয়ে উঠছে। তার এখন অনেক কাজ। "শার্লি টেমপল্ পুলিশ" নামে একটা দল হয়েছে (অনেকটা 'রংমশালদলের' মতই আর কি!) তার প্রত্যেকটি সভ্যকে একটা করে ব্যাজ জামা কাপড়ে আটকে রাখতে হয়, ব্যাজ না থাকলেই শার্লি তাকে ফাইন্ করে। এ বিষয়ে প্রচুর তার উৎসাহ। যে যত বিখ্যাত তাকে তত বেশী ফাইন্ দিতে হয়—এই তো সেদিন বিল রবিনসন্‌কে দশ ডলার ফাইন দিতে হয়েছিল! এই ফাইনের সব টাকাই দরিদ্রদের সাহায্যের জন্যে খরচ হয়।

শার্লি খুব কৌতুকপ্রিয় কিন্তু খুব সূক্ষ্ম পরিহাসে খুব দক্ষ সে। সে ঘোড়ায় চড়তে পারে, সে গাড়ী চালাতে পারে। সে নেমন্তন্ন বাড়ীতে বক্তৃতা দিতে পারে, সে পুতুলের রান্না করতে পারে।...সকলের অদ্ভুত বিস্ময় ক্ষুদে মেয়ে এই 'বুড়ী-গিন্নী"—শার্লি টেমপল্!

কাজীর বিচার

(ছোট্ট নাটক)

মন্মথ রায়, এম, এ

[গৌড়ের রাজপথ। এক অন্ধ ভিক্ষুক তাহার ছোট নাতনিটির হাত ধরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। দুজনে একটি ভজন গান গাহিতেছে। গানটি সুমধুর হওয়ায় অনেকেই দাঁড়াইয়া শুনিল—কিন্তু গান শেষ হওয়া মাত্র প্রায় সকলেই সরিয়া পড়িল।]

ভিক্ষুক। ভিক্ষা দাও বাবা! দুটো খেতে দাও!

নাতনি। আমার দাদু আজ দুদিন না খেয়ে আছে!

জনৈক নাগরিক। ওতে কিছু হয় না—আমার ওপর রাগ করে আমার পরিবারও আজ দুদিন না খেয়ে আছে কিন্তু তার গলার ঝাঁঝ কিছুমাত্র কমে নি!

[প্রস্থান]

ভিক্ষুক। আমার এই অভাগী নাতনিটিকে দয়া কর বাবা!

নাতনি। কাকে বলছ! কেউ নেই! সবাই চলে গেছে!

ভিক্ষুক। এঁ্যা! চলে গেছে! তাহলে কি হবে দিদি! আজ তোকে কি খাওয়াবো?

নাতনি। আজ আমার ক্ষিদে পায়নি দাদু! বিকেলে আমি পিঠে খেয়েছি—কেন তুমি ভুলে গেলে নাকি?

ভিক্ষুক। পোড়া পিঠে! পথে ফেলে দিচ্ছিল, ভিক্ষা চাইতে দিল। হ্যাঁরে, পিঠে দুখানা খেতে পেরেছিলি, না একেবারেই পোড়া ছিল?

নাতনি। না দাদু, বেশ পিঠে—চমৎকার পিঠে।...দাদু, আমি তোমার জন্য তার একখানা রেখে দিয়েছি, তোমাকে খেতে হবে—চল ওদিকটায় গিয়ে আমরা বসি—

ভিক্ষুক। ভারী তো দুখানা পিঠে—তারও একখানা আবার আমার জন্য রেখেছিস! আমি রাগ কর্লাম দিদি!

নাতনি। হ্যাঁ, তা বুঝতে পাচ্ছি। গলার ঝাঁঝটা একটুও কমে নি!...নাও—এখন এস...ঐ পাথরটার ওপর বসি—এ—সো—

[তাহাকে টানিয়া পাথরটার কাছে লইয়া গেল—হঠাৎ দেখিল সেখানে একটি পেটিকা পড়িয়া রহিয়াছে।]

নাতনি। দাদু! কে একটা পেটিকা ফেলে গেছে! [তুলিয়া লইল] বেশ ভারী দেখছি! [ঝাঁকি

দিল] একি ! মনে হচ্ছে এতে টাকাকড়ি রয়েছে !

ভিক্ষুক। কি সর্ব্বনাশ !···কার পেটিকা ! কে ফেলে গেল !

নাতনি। [পেটিকাটির মুখ খুলিয়া তাহা হইতে একটী মুদ্রা বাহির করিয়া—চীৎকার করিয়া উঠিল] দাদু ! দাদু ! সব সোণার মোহর ! মোহরে বোঝাই !

ভিক্ষুক। বলিস কি দিদি ! না জানি কার সর্ব্বনাশ হয়েছে ! দেখি—[পেটিকাটি হাতে লইল] এ যদি সব মোহর হয়—এযে এক রাজ্যের ধন ! একটা—একটা মোহর পেলে আমাদের বছরের খোরাক হয় দিদি ! এত মোহর !···চল, আগে কিছু খাবার কিনে তোকে খাওয়াই, তারপর ভেবে দেখব—

নাতনি। কিন্তু দাদু, এতো আমাদের নয় !

ভিক্ষুক। আমাদের ! আমাদের ! আমাদের দুঃখ দেখে ভগবান আমাদের দিয়েছেন !

নাতনি। না দাদু, না। ভগবানকে তো অনেক ডেকেছি ! এত ডেকেছি যে, যদি আমাদের দুঃখে তাঁর দয়া হ'ত, তিনি নিজে এসে আমাদেব বুকে তুলে নিতেন !

ভিক্ষুক। ভগবানের কি আলাদা কোন রূপ আছে দিদি ! তিনি লোকের মাঝেই আছেন, লোকের মাঝেই তাঁর প্রকাশ। এদ্দিন যে আমরা বেঁচে আছি, লোকের দয়াতেই বেঁচে আছি, সে দয়া তাঁরই দয়া। এ দয়াও তাঁরি।

নাতনি। তাই যদি হয় দাদু, এ আমরা কুড়িয়ে পেলাম কেন ? লোকের হাতেই পেতাম ! না দাদু, এ তাঁর ছলনা। এ আমরা নেব না। [পেটিকাটি নিয়ে] যেমন ছিল তেমনি এর মুখ বেঁধে রাখলাম। রাগ আমরাও করতে জানি। কুড়িয়ে কিছু নেব না, দিতে হয় নিজে এসে দিন !

ভিক্ষুক। [হেসে] কি রকম রাগ ! গলার ঝাঝ কিছুমাত্র কমেনি দেখছি !

[অদূরে কোলাহল। ঢেটরা সহ সাধু চক্রধরের প্রবেশ। সঙ্গে বহু লোক।]

ঢেটরা। চক্রধর সাধুর একশ মোহরের একটি পেটিকা হারিয়েছে ! যে পেয়ে ফেরৎ দেবে, পাঁচ মোহর তার পুরস্কার। [তিনবার ঘোষণা করিল।]

নাতনি। [উদ্দীপ্ত কণ্ঠে] দাদু ! দাদু !

জনৈক নাগরিক। [চক্রধর সাধুকে] কি হে চক্রধর ! একশ মোহর হারিয়েছ ! কি করে হারালে ?

চক্রধর। কপাল কপাল ! পোড়াকপাল ! এক খাতকের কাছ থেকে পাওনা আদায় করে ঘরে ফিরছিলাম—দশ পেটিকা মোহর—একটি পেটীকা কোথায় পড়ে গেছে !···আমি ভাই পথে বসেছি ! কি করে দিন চলবে তাই ভাবছি !

অন্য এক নাগরিক। আ-হা-হা ! তাইতো ! হাজার মোহরের শ মোহর হারিয়েছে ! ব্যাচারি এখন খায় কি !

অন্য এক নাগরিক। তাইতো! কি আজব তুনিয়া দেখেছ! [ভিক্ষুককে দেখিয়ে] এই এক বেচারা—নাতনিটির হাত ধরে ভিক্ষে করছে—ভাবছে খাবে কি! আর এই চক্রধর সাধু, কম করে লাখো মোহর সিন্ধুকে, ভাবছে খাবে কি! মাথায় হাত দিয়ে ভগবানও ভাবছেন তাইতো! তুনিয়ায় এত ক্ষুধা! এরা শেষটায় নিজেদের হাত পা নিজেরা চিবিয়ে খাবে নাকি!

চক্রধর। ব্যাপার প্রায় তাই দাঁড়িয়েছে ভাই! একটী নয়—তুটি নয়—একশটি মোহর—নিজের হাত পা নিজেই চিবিয়ে খেতে ইচ্ছা হচ্ছে! [ঢোটরাকে] চল—এগিয়ে চল—

নাতনি। [চক্রধরের প্রতি] দাঁড়ান। আপনার পেটিকা যে পেয়ে ফেরৎ দেবে, পাঁচমোহর তার পুরস্কার?

চক্রধর। হঁ্যা। খোঁজ-খোঁজ—খুব ভালো করে খোঁজ [ঢোটরাকে] চলহে চল—

ঢোটরা। [পুনরায় ঘোষণা] চক্রধর সাধুর একশ মোহরের পেটিকা—যে পেয়ে ফেরৎ দেবে পাঁচ মোহর তার পুরস্কার!

[সদলবলে কাজীর প্রবেশ। সকলে কাজী সাহেবকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল]

কাজী। [চক্রধরকে] কি হে চক্রধর সাধু! পেটিকা পেলে?

চক্রধর। না হুজুর!

কাজী। একশ মোহর হারিয়েছ, মাত্র পাঁচমোহর পুরস্কার দিতে চাইছ! ওতে কি হয়! যে দিনকাল পড়েছে—যে পাবে, সে পাঁচমোহর না নিয়ে আর ঐ শ মোহরই নেবে! একটা তদন্তে বেরিয়েছি [জনতার প্রতি] যাবে না কি হে, চল—

নাতনি। [চক্রধরের সম্মুখে গিয়া] পেটিকা আমি পেয়েছি।

[কাজী চক্রধর প্রভৃতি সকলেই চমকিয়া উঠিলেন]

কাজী। পেয়েছ!

চক্রধর। কই?

নাতনি। এই যে! [সম্মুখে ধরিল]

চক্রধর। আমার! আমার!

[পেটিকাটি একরূপ কাড়িয়াই লইল—এবং মোহরগুলি গুণিতে লাগিল।]

কাজী। [মেয়েটিকে] কোথায় পেলে?

নাতনি। আমার দাতুকে নিয়ে এই পাথরটার ওপর বসতে এসে দেখি—এখানে পড়ে রয়েছে!

কাজী। কি হে বুড়ো! তাইতো?

ভিক্ষুক। হঁ্যা বাবা!

কাজী। তুমি দেখছি অন্ধ! ওতে কি আছে জানতে না বুঝি?

ভিক্ষুক। জানতাম। আমার নাতনি পেটিকার মুখ খুলে দেখেছিল···মোহর রয়েছে।

কাজী। তুমি ভিক্ষা করে খাও ?

ভিক্ষুক। হ্যাঁ হুজুর !

নাতনি। ভিক্ষা করে খাই বলতে পারি না। ভিক্ষা করি, কিন্তু খেতে পাই কই ? আজ দুদিন দাদু কিছুই খাইনি !

চক্রধর। [গণণা শেষ হইয়াছে। পেটিকার মুখ বাঁধিয়া] ঠিক আছে। [কাজীর প্রতি] তাহলে আসি হুজুর আমার পরিবার মোহরের শোকে জলবিন্দু মুখে দেয় নি ! যাই, গিয়ে বলি—

কাজী। কিন্তু এই বালিকার পুরস্কার ?

চক্রধর। [মাথায় যেন বাজ পড়িল !] পুরস্কার !

কাজী। পাঁচমোহর :

চক্রধর। পাঁচ মোহর ! [চোখ কপালে উঠিল !]

কাজী। ঘোষণা করেছ।

চক্রধর। তা বটে ! তা বটে ! কিন্তু সে কি আপনি ভেবেছেন ওবেটি নেয় নি ? না নিয়েই আমায় ফেরৎ দিচ্ছে !

কাজী। কি করে নিল ! একশ মোহর ছিল—একশ মোহরই তো রয়েছে !

চক্রধর। [সপ্রতিভ ভাবে] না—না, আমার ভুল হয়েছিল. পেটিকায় ছিল একশ পাঁচ মোহর !

কাজী। একশ পাঁচ মোহর !

চক্রধর। হ্যাঁ হুজুর।

কাজী ! একশ পাঁচমোহর ! দেখো, ভুল হয়নি তো ?

চক্রধর। না হুজুর ! এ কি ভুল হবার কথা ?

কাজী। এতে রয়েছে একশ মোহর ?

চক্রধর। হ্যাঁ হুজুর।

কাজী। [মেয়েটিকে] তোমরা এ থেকে কি পাঁচমোহর নিয়েছ ?

নাতনি। নিলে তো সবই নিতে পারতাম হুজুর !

কাজী। ঠিক। [চক্রধরকে] একশ পাঁচমোহর ! তাহলে এ পেটিকা তোমার নয়। আমার একটা একশ মোহরের পেটীকা হারিয়েছিল, এ পেটিকা আমার।

চক্রধর। হুজুর !

কাজী। [চক্রধরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।] এ পেটিকা আমার। [চক্রধরের হাত হইতে পেটিকাটি তুলিয়া লইলেন, সে কোন প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না। কাজী মেয়েটির সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন।]

আমার এই শ মোহরের পেটীকা আমি তোমায় দান কর্লাম মা !

ভিক্ষুক। নে দিদি, নে, ভগবান এমনি করেই দান করেন, নে—

[নাতনি সশ্রদ্ধচিত্তে দান গ্রহণ করিল।]

চক্রধর। আমার নিজের হাত পা নিজে চিবিয়ে খেতে ইচ্ছা হচ্ছে ! [সকলে হাসিয়া উঠিল।] এই কি বিচার !

কাজী। হ্যাঁ, বিচার। এরই নাম কাজীর বিচার ! [মেয়েটিকে] ওর একশ পাঁচ মোহরের পেটীকাটি যদি কখনো পাও, ওকে ফেরৎ দেবে।

জীবজন্তুর রোগ চিকিৎসা

সুবিনয় রায় চৌধুরী

"আঘাত পেলে বনের পশু ডাক্‌বে নাকো ডাক্তার
চুপটি ক'রে রইবে শুয়ে, শুনবে নাকো ডাক তার।
সঙ্গে আছে অমোঘ ওষুধ---প্রচুর এবং সস্তায়
বনের ঘাস ও জিভের লালা—কেনই বা সে পস্তায়?"

কথাটা খুবই সত্যি। বনের পশু আঘাত পেলে, আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে বিশ্রাম কর্‌বে; আহত জায়গা জিভ দিয়ে চাট্‌বে আর মাঝে মাঝে ঘাস খাবে;—এই হ'লো তা'র চিকিৎসা। ঐ চিকিৎসায়ই সে সেরে উঠে। ঘাস খাওয়াটা শুধু পেট পরিষ্কার করার জন্য; লালা আর বিশ্রামই হ'লো তার আসল ওষুধ।



হরিণ-শিশু পা উঁচু করে উপকারী পাতা খাচ্ছে



বড় শৃঙ্গী হরিণ জলপদ্মের শিকড়ের খোঁজে
(গোলাপের ওষুধ) জলে নেমেছে

আর, মানুষ আঘাত পেলে?—ডাক্তার ডাকরে, ওষুধ লাগাওরে, পট্টি বাঁধরে,—কত কাণ্ড! তা'ও হয়তো দেখ্‌বে, দু'দিন বাদে পেকে সেপ্‌টিক' হয়েছে!

পশুদের তো আর ডাক্তার নাই;—তাই তারা প্রকৃতির ব্যবস্থায় সকলেই নিজের নিজের ডাক্তার। তাদের জন্য ডাক্তারখানা খোলে নি কেউ; কাজেই প্রকৃতি নিজেই তাদের জন্য ডাক্তারখানা খুলে বসেছেন। কেউ তাদের জন্য 'প্রেসক্রিপ্‌সন' লেখে না বা 'ব্যবস্থাবিধি' দেয় না, তাই তারা প্রকৃতির দেওয়া গাছড়ার ব্যবস্থাই মানে; তার নিজের কাজের মত গাছড়াগুলিকেও চেনে। পথ্য তা'দের ব'লে দিতে হয় না;—সে বিষয়েও তা'দের যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

জীবজন্তুর রোগ চিকিৎসা

সুবিনয় রায় চৌধুরী

আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে ব'লেছে ঃ "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং"—অর্থাৎ, জ্বরের গোড়ায় লঙ্ঘনই (উপবাসই) পথ্য। আমরা এ কথাটা জানি, কিন্তু, সব সময় ভাল ক'রে মানি না। হয়তো, জ্বরের প্রথম কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেই, 'গোড়া' কেটে গেছে মনে ক'রে উপবাস ভঙ্গ করি, আর তার ফল ভুগি। জীবজন্তুরা কিন্তু সকলেই জানে কখন উপবাস করতে হয়। পশুপাখী যখন খেতে চাইবে না, তখনই বুঝবে তাদের শরীর খারাপ হয়েছে। সব জাতের সব বয়সের পশুপাখী এই নিয়মটি জানে।

অসুখ তো হ'লো,—এখন সারাবে কেমন করে? তা'ও তাদের পক্ষে তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। পেটের কোনও গোলমেলে ব্যাপার থেকেই রোগের সূত্রপাত ;—অর্থাৎ খাওয়া ঠিকমত না হওয়ায় শরীরে আবর্জ্জনা জ'মে তা'র বিষাক্ত অংশ রোগের আকারে দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির ব্যবস্থায়, বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। জীবজন্তু বেশ জানে, অমুক গাছড়া বা ঘাস খেলে বমি হ'য়ে পেটের আবর্জ্জনা বেরিয়ে যাবে ; অমুকগাছড়া বা ঘাস জোলাপের কাজ ক'রে পেট পরিষ্কার করবে। সে আর অপেক্ষা না ক'রে মাঠে, জঙ্গলে জলায় ঘুরে, ওষুধটি খেয়ে, তবে নিশ্চিন্ত হবে। তারপর, সময়মত ওষুধের কাজ হ'য়ে গেলে তা'র শরীর আবার সুস্থ হ'য়ে উঠবে। তা'রা বিষাক্ত ওষুধ খায় না, অতিমাত্রায় ওষুধ খায় না, প্রকৃতির কারখানা ছাড়া অন্য কোনও 'কোম্পানীর' কারখানার ওষুধ খায় না।



ভাল্লুক জোলাপের ওষুধের সন্ধানে চলেছে



সিংহেরা শিকারের পেটের মেটুলি ইত্যাদি থেকে 'খাদ্যপ্রাণ' পায়

জীবজন্তুর রোগ চিকিৎসা
স্থবিনয় রায় চৌধুরী

আশ্বিন ১৩৪৫

মানুষ নিজের দোষে নিজের শরীরে কত রোগের সৃষ্টি করছে। অনুপযুক্ত খাদ্য হচ্ছে এই অবস্থার জন্য সব চেয়ে বেশী পরিমাণে দায়ী। চালের উপকারী অংশ ফেলে দিয়ে মাজা চাল খাচ্ছে; আটার ভুষি আর খনিজ জিনিষ (mineral contents) বাদ দিয়ে সাদা ময়দা তৈয়ারী ক'রে খাচ্ছে, ফল তরকারীর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে টাটকা ফল খাওয়াই ছেড়ে দিচ্ছে, তার ফল যে কি হচ্ছে, তা তো চোখের উপরই দেখ্‌তে পাচ্ছি। এখন বড় বড় রাসায়নিক, ডাক্তার, চিকিৎসক নানা পরীক্ষা করে বল্‌ছেন, "ঢেঁকি-ছাঁটা চাল খাও, মোটা আটা খাও, গুড় খাও, খোসা শুদ্ধ তরকারী খাও, টাটকা ফল যথেষ্ট পরিমাণে খাও", ইত্যাদি। 'খাদ্যপ্রাণ' যথেষ্ট পরিমাণে চাই। জীবজন্তুরা কোন্ আদ্যিকাল থেকে প্রকৃতির এনিয়ম পালন ক'রে আস্‌ছে। তা'রা সব খাবারেই 'খাদ্যপ্রাণ' রেখে খেতে জানে। কাজেই, তাদের মধ্যে তত রোগ নাই, যত মানুষের মধ্যে আছে। মানুষ বলেছে, "শরীরংরোগমন্দিরং" —অর্থাৎ, শরীর রোগের মন্দির। কিন্তু এই মন্দির মানুষের নিজের হাতেরই তৈয়ারী। জীবজন্তু যখন জঙ্গলে থাকে, তখন এই 'মন্দির'এর ব্যাপার বড় একটা জানে না! মানুষের কাছে এসে তা'রা এই মন্দিরের কিছু কাজ শেখে;—অর্থাৎ, খাবার গণ্ডগোলে তাদেরও শরীরে অনেক রোগ দেখা যায়।

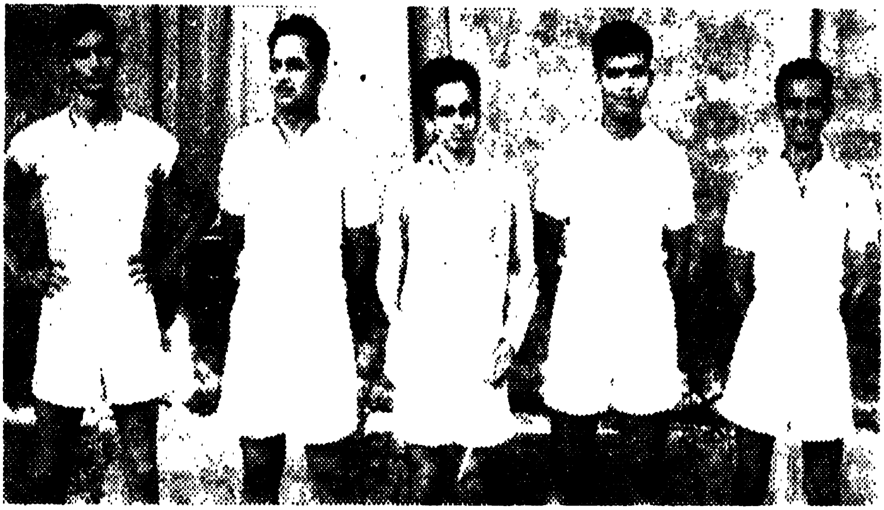
দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে যখন রেলওয়ের লাইন বসান হচ্ছিল, তখন, সেই লাইনের মজুরদের একরকমের রোগ দেখা দিল। সে রোগ অনেকটা একালের 'বেরি-বেরি'র মত। ডাক্তারেরা বহু গবেষণা করেও তার কারণ বের করতে পারেন নি। শেষটায় তাঁরা হতাশ হ'য়ে বল্‌লেন, "এত অস্বাস্থ্যকর জায়গায় রেলপথ বানানই বৃথা—লাইন আর বানিও না!" তখন একজন ডাক্তার বল্‌লেন, "মানুষই কি শুধু এই জায়গায় এসে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে? বনের পশুপক্ষী কেমন সুস্থ দেখতো এই জায়গায়! বানরদের একবার দেখতো! তারা বনের টাটকা ফল, বাদাম ইত্যাদি খেয়ে কেমন মনের আনন্দে, সুস্থ শরীরে, পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ! মানুষকেও টাটকা ফল, তরকারী খেতে দাও;—দেখ তা'র স্বাস্থ্য ঠিক থাকে কিনা!" মজুরেরা টিনে-ভরা মাংস, তরকারী, ফল ইত্যাদি খেতো। তাদের জন্য তাজা ফল, তরকারী, মাংস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হ'লো,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তা'দেরও স্বাস্থ্য ফিরে এল। পশুপাখীদের দেখাদেখি মানুষ এখানে প্রকৃতির নিয়ম পালন করতে শিখ্‌ল।

পশুপাখীরা জানে, "সারা'বার চেয়ে তাড়াবার ব্যবস্থাই ভাল" ("prevention is better than cure") মানুষও এখন এই ব্যবস্থাই মান্‌তে প্রস্তুত।

ছুটির ঘণ্টা

ইংলণ্ডে টেষ্টম্যাচঃ—

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট টেষ্ট মহাসমারোহে সমাপ্ত হোল। হাটনের আশ্চর্য্য ক্রীড়াদক্ষতায় পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড জয়ী হলেও আর এ সালের টেষ্ট ড্র হলেও অষ্ট্রেলিয়াই পাশ্চাত্য ক্রিকেটের সব চেয়ে বড় পুরস্কার "Ash নিয়ে গেলেন তাদের দেশে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার গৌরব এবার বেশ একটু ম্লান হয়েছে। ইংলণ্ডের তরুণ খেলোয়াড় হাটন যাদুকর ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন!



রোয়িং চ্যাম্পিয়ন সেণ্ট জেভিয়ারস কলেজ

পঞ্চম টেষ্টম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। অবশ্য ব্র্যাডম্যান আহত হওয়াতে এই টেষ্টে অনুপস্থিত ছিলেন। এবারের টেষ্টে সবশুদ্ধ খেলা হয় ১৪৪; ইংলণ্ড ৫৫টি ম্যাচে জয়ী হন এবং অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হন ৫৭টি ম্যাচে। বাকি ৩২টি খেলা ড্র হয়।

অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ফুটবল দলঃ—

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় ফুটবল খুব নাম করেছে এটা গৌরবের বিষয়। আমরা বলছি না তারা কেবল জিতছেই, খেলাতে হারজিৎ আছেই। ভারতীয় দল জিতছেও আবার হারছেও কিন্তু তারা বরাবর ভালই খেলছে। প্রসাদ, রহিম, কে-ভট্টাচার্য্য, লামসডেন প্রভৃতি খেলোয়াড়রা অষ্ট্রেলিয়া ফুটবল

ফ্যানদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। ওসাদের নাম দিয়েছে তারা 'মিকি মাউস,' আর সবাই তাকে মিকি বলেই ডাকে। লামসডেনের খেলায় বিস্মিত হয়ে অষ্ট্রেলিয়া তার নাম দিয়েছে "ইণ্ডিয়া ব্লুমার"। নীচে খেলাগুলির ফলাফল সংক্ষেপে আমরা দিলাম:—

আই, এফ, এ (৬) :	দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া (১) :	আই, এফ, এ, (২) :	ভিক্টোরিয়া (৪)
আই, এফ, এ (৪) :	নিউ সাউথ ওয়েলস (৬) :	আই, এফ, এ, (১) :	নর্দ্দার্ণ ডিষ্ট্রিক্টস (২)
আই, এফ, এ (৩) :	অষ্ট্রেলিয়া-১ম টেষ্ট (৫) :	আই, এফ, এ, (৭) :	কুইনসল্যাণ্ড (৬)
আই, এফ, এ (৪) :	অষ্ট্রেলিয়া-২য় টেষ্ট (৪) :	আই, এফ, এ, (৭) :	টুওম্বা (২)
আই, এফ, এ (৫) :	ইপসউইচ (২) :	আই, এফ, এ, (৪) :	অষ্ট্রেলিয়া-৩য় টেষ্ট (১)

এই ১০টি খেলার মধ্যে দেখা যাচ্চে ভারতীয় দল ৫টি জিতেছে. ৫টি হেরেছে ও ১টি ড্র করেছে। পাচটি টেষ্টের তিনটির খেলা হয়েছে, তার মধ্যে ভারতীয় দল ১টি জিতেছে, ১টি হেরেছে ও ১টি ড্র করেছে। বাকি ছুটি টেষ্ট এখনও খেলা হয়নি।

কলিকাতা লেকে রেগাটা:—

ইন্টার কলেজিয়েট রোয়িং লীগে কলিকাতার কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এবার বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড রোয়িং প্রতিযোগিতা জগত বিখ্যাত ও ইংলণ্ডের একটি জাতীয় উৎসব। কলিকাতা রোয়িং এবার ছাত্রমহলে একটা জাতীয় উৎসবের মতই তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। ইন্টার কলেজিয়েট ফাইনালে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেণ্টজেভিয়ারস কলেজে বিপুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সেণ্টজেভিয়ারস কলেজ ৩ মিঃ ২৯½ সেঃএ প্রেসিডেন্সী কলেজকে পরাজিত করে রেকর্ড করেন। এবার সেণ্টজেভিয়ারস কলেজ ৭টি প্রতিযোগিতায় ১৪ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলেন।

এবার লেক ক্লাব পূজা বার্ষিকী রেগাটাতেও তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। Senior sculls Final এ কে, সি, সেন, ২½ লেণ্ডথ্এ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বি দলকে পরাজিত করেন। তাঁর সময় হয়েছিল ৩ মিঃ ৫৬ সেঃ। Junior Sculls Finalএ অরুন বোস হাফ লেণ্ডথ্এ এন, পি, সেনকে পরাজিন করে 'লতিফ কাপ' পেলেন। তাঁর সময় হয়েছিল ৩ মিঃ ৪৯ সেঃ। Senior Pairs প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও, এ, ডি, সেন এবং এস, পি, সারথী—কে, এম, বোস এবং এস, কে, বোসকে হারিয়ে Powvala Cup জয়ী হন।। কিন্তু Coxed Fours প্রতিদ্বন্দ্বিতাই রেগাটা উৎসবে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। সেন-এর দল ও দত্ত'র দলএ তুমুল প্রতিযোগিতা হয়েছিল। কোয়াটার লেণ্ডথ্এ সেনে-এর দল দত্ত'র দলকে পরাজিত করে Poddar Trophy লাভ করেন। তাঁদের সময় হয়েছিল ১০০০ গজে ৩ মিঃ ৩৯ সেঃ।

ভারতবর্ষে বিদেশী খেলোয়াড়দের আগমন বার্ত্তা :—

খেলাধূলা মহলে প্রকাশ, যে, হ্যামণ্ডের নেতৃত্বে ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ড তার ক্রীকেট দল নিয়ে ভারতে খেলতে আসবেন। এই ক্রীকেট দল ছাড়াও আমেরিকা থেকে একটি টেনিস দল আসবেন বলে শোনা যাচ্ছে। সেই দলে নাকি থাকবেন বিখ্যাত খেলোয়াড়রা—ডোনাল্ড বাজ, পেরী, ভাইনস প্রভৃতি। তারপর এই ক্রীকেট ও টেনিস দল ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া থেকে নাকি একটি ফুটবল দলও আসবেন ভারতবর্ষে খেলতে। বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় দল ফুটবল খেলছেন, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে অষ্ট্রেলিয়ান দল ফুটবল খেলবেন, এ অতি সুখের কথা। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে এরূপ আলাপ পরিচয়ে যে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব গড়ে উঠে সেটা আন্তরিক হয়।



রংমশাল দলের বন্ধু-ভাইবোনেরা

শারদীয়ার শুভকামনা জানিয়ে তোমাদের একটা নিমন্ত্রণ একটু আগেভাগে চুপিচুপি জানিয়ে রাখছি। আমরা শীঘ্রই মিলব। সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হবে। কার্ত্তিকের রংমশালে কিছু জানতে পাবে কবে কোথায় কখন—এখন গোপন রইল।

সম্পাদক।



বীণা দেবী

হস্তিনাপুরে রাজপুরী মাঝে
দেবাদিদেবের দেউল বিরাজে
রজত শুভ্র বিরাট কান্তি
নয়ন মুগ্ধকর,
চাহি সে পূণ্য পূত মন্দির
দেবতা চরণে নত হয় শির
মনে লয় বুঝি বাঁধা পড়েছেন
উদাসী মহেশ্বর।

আজি মহেশের পূজা অবসানে
বসি রাজমাতা অজিন আসনে
সম্মুখে শোভে রতন পাত্রে
নানাবিধ আয়োজন,
শতেক পুষ্প বিল্বপত্র
পরশি প্রভুর চরণ পদ্ম
প্রণামের ছলে করিছে নীরবে
আত্ম সমর্পণ।

বদ্ধনেত্রা গান্ধারী সতী
অপরূপ সেই তাপসী মূরতি
অন্তরে জ্বলে পুণ্য পাবক
সত্যের হুতাশন,
সভয়ে দেবতা কাঁপিল গগনে
কি কহিবে মাতা আশীর্ব্বচনে
সত্যব্রতা সে রমণীর বাণী
মিথ্যা কভু না হ'বে,
গর্ব্বে উড়িবে পাপের নিশান
ধূলায় লুটাবে ধর্ম্মের মান
কুরুক্ষেত্রে এই মহারণ
সকলি ব্যর্থ তবে।

মাতার মানসে জাগিছে কেবল
জতুগৃহের সে পাপ অনল
পঞ্চ ভ্রাতার প্রতি পুত্রের
দারুণ অত্যাচার,

মায়ের আশীর্ব্বাদ

বীণা দেবী

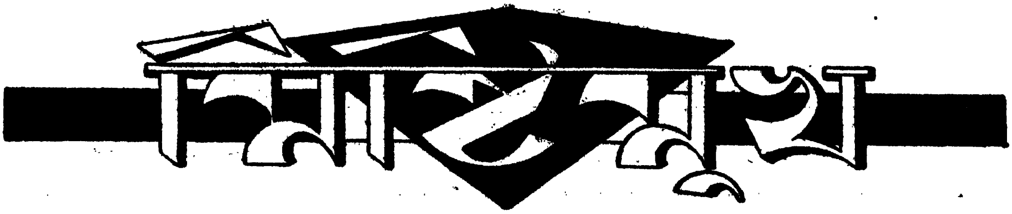
স্নেহ বিগলিত সেই মুখপানে
চাহিয়া ক্ষণেক ফুল্ল পরাণে
কহিলা পুত্র 'দেহ মা আমায়
পূজার শান্তি জল,
'চলেছি যুদ্ধে দেহ গো অভয়
কর আশীর্ব্বাদ লভিবারে জয়
হে পুণ্যবতী, তোমার প্রসাদ
আজিকে শ্রেষ্ঠবল।'

সভয়ে দেবতা কাঁপিল গগনে
কি কহিবে মাতা আশীর্ব্বচনে
সত্যব্রতা সে রমণীর বাণী
মিথ্যা কভু না হ'বে,
গর্ব্বে উড়িবে পাপের নিশান
ধূলায় লুটাবে ধর্ম্মের মান
কুরুক্ষেত্রে এই মহারণ
সকলি ব্যর্থ তবে।

মাতার মানসে জাগিছে কেবল
জতুগৃহের সে পাপ অনল
পঞ্চ ভ্রাতার প্রতি পুত্রের
দারুণ অত্যাচার,
সেই দ্যূতক্রীড়া রাজসভা মাঝে
একবস্ত্রা কুললক্ষ্মী বিরাজে
পুত্রগণের পাপ উল্লাস
কৃষ্ণার হাহাকার।

গগনে গরজে অশনি মন্দ্র
ডুবেছে সূর্য্য ডুবেছে চন্দ্র
থর থর থর কাঁপে ধরিত্রী
সর্ব্বং সহা মাতা,
বদ্ধনেত্রে অনল জ্বলিল
পুত্র স্নেহের মমতা পুড়িল
"যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"
উচ্চারিলেন মাতা।





রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন—

দিন গোণা তা হলে সত্যি শেষ হ'ল। এল ছুটি। অনেক আগে মেঘ স'রে যাওয়া এক সকালের আকাশে বিলি করা হ্যাণ্ডবিলে ত মিথ্যে আশ্বাস ছিল না—সবুজে সাদায়, সোণালী নীলে ঝলমল এ যে সত্যি অবাক করা ছুটি। বারবার সে ঘুরে আসে তবু তার রঙ কোন দিন ফিকে হয় না, টান কোন দিন আলগা হয় না।

ভেবেছিলাম এবার ছুটিতে কোথাও যাবার কথা আর কিছুতেই বলব না—তোমাদের কাছে যদি তা পুরোণ এক ঘেয়ে লাগে! কিন্তু ছুটি মানেই যে ছুটে যাওয়া, ছুটি হলেই মন যে টানে সেই অনেক অনেক দূরে—রেলের লাইন যেখানে পৌঁছোতে ফুরিয়ে যায়, দিগন্ত যার নাগাল পায় না।

কে না চায় সেখানে যেতে! কিন্তু সেই অনেক অনেক দূর কোথায় আছে! হয়ত অনেক অনেক কাছে, একেবারে আমাদের বাড়ির পাশে, আমাদের খেলার মাঠের ধারে, আমাদের খিড়কী পুকুরের পাড়ে, সে কথা কি কোন দিন ভেবে দেখ নি!

নাই বা যাওয়া হল এবার শিলং কি সিমলা, মাদুরা কি মধুপুর, সবাই ত আমরা সকলবার যেতে পারি না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। অনেক অনেক দূর, হয়ত অনেক অনেক কাছে অপেক্ষা করে আছে আমাদের আবিষ্কারের আশায়। শুধু ছুটির চোখে না খুঁজলে তাকে দেখা যায় না।

ছুটি ত আজ আমাদের বুকে, আমাদের চোখে, সেই লুকিয়ে-থাকা অনেক দূরকে কেন আমরা খুঁজে পাব না! হলদে, লাল, নীল ছুটির টিকিট কিনে যারা অনেক দূরে চল্‌ল রেল গাড়ীতে চড়ে তারা সুখী, কিন্তু তাদের ঈর্ষা করব কেন? রেলের ইঞ্জিনও হাঁফিয়ে ওঠে যেতে, এমন দূর হয়ত আমরা পায়ে হেঁটেই চলে যাব;—দেশের গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে সেই যে বাঁজা মাঠ, একটি ন্যাড়া শিমূল যেখানে সারারাত জোনাকী আর সারাদিন প্রজাপতিদের পাহারা দেয়—সেইখানে, কি শহরের পাড়া ছাড়িয়ে সেই অজানা রাস্তায়, যেখানে কোনদিন গেছি কি না গেছি মনে পড়ে না!

অত খানিই বা যেতে হবে কেন। হয়ত আরো কাছে, একেবারে বাড়ির আশে পাশে, ঘরের ভেতরে, বিছানায় শুয়ে পড়া মজার বই-এর পাতায় ঝিম্ ঝিম্ করছে, অনেক-অনেক দূর!

তোমাদের সম্পাদক মশাই!

ভূমিকা

পূজোর সময় প্রথমেই তো ছুটির গল্প। আর পূজোর ছুটিটা কেমন কাটান যায়। যারা যেখানে থাক বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে যায়—নতুন দেশ দৃশ্য দেখতে হাওয়া বদলাতে সাধ যায়। যার যেমন রুচি সে তেমন ভাবতে বসে। কল্পনায় কেউ চলে যায় সমুদ্রের ধার, কেউ পাহাড়ের গায়, কেউ নির্জ্জন নিরালা গ্রামের প্রান্তে। নূতন মানুষ, নূতন বন্ধু নূতন এ্যাডভেঞ্চারে বের হতে ইচ্ছে যায়। আর পূজের ছুটি এ কল্পনাকে সত্য করতে জানে। হেঁটে ভ্রমণ করার মত জিনিষ নেই কিন্তু লম্বা পাড়ি দিতে হলে রেলপথের কথা প্রথম মনে জাগে। প্রতিবার পূজোর মত এবারও রেল কোম্পানিরা—ই. আই, আর. ই, বি, আর প্রভৃতি কনসেসানে সস্তায় ভ্রমণ করার বিশেষ সুবিধে করে দিয়েছেন। উচ্চশ্রেণীর মত এবার তৃতীয় শ্রেণীতেও সুবিধাজনক কনসেসন দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশ দরিদ্র—তৃতীয় শ্রেণীতেও ভ্রমণ করে পূজোর অভিযান পরিপূর্ণ করা যায়।

যে আমেরিকান দলটি কারাকোরাম পর্ব্বত অভিযানে গিয়েছিলেন তাঁরা পৃথিবীর উচ্চতায় দ্বিতীয় পর্ব্বতশৃঙ্গ K_2 প্রায় জয় করে ফেলেছিলেন। K_2 উচ্চতায় ২৮,২৫০ ফিট, তাঁরা ২৬,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উঠতে পেরেছিলেন বলে প্রকাশ। বাকি ২,২৫০ ফিট উঠতে পারলেই তাদের জয়লাভ পরিপূর্ণ হত। যাই হোক তাঁদের কৃতিত্বে আমরা এই আমেরিকান দলটিকে অভিনন্দিত করছি। তাঁদের নিজেদের কথায় '২৬০০০ ফিট অভিযানের' গল্প তোমাদের বলছি :—

July 21.—Skirting under a line of seracs, slowly kicking steps upward, toward the summit cone, which very gradually grew closer to their great delight they found the ascent offered only average difficulty. The 25,370 ft shoulder lay well below them. Still they went on up the rock cone till thickening clouds on K_2 and Broad Peak warned that a storm was imminent. This was no place to be caught in uncertain weather. Regretfully they begun the descent. They had reached a point at about 26,000 ft ! অর্থাৎ—

খাড়াই ত্রিকোণ বরফস্তূপ পদাতিকের মত সার বেঁধে দাঁড়িয়ে—তারই ধারে ধারে পাহাড়ের শেষ চূড়োর দিকে মন্থরগতিতে তাঁরা উঠছেন। কারাকোরমের শেষচূড়ো ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কাছে যেন এগিয়ে আসছে। তাঁরা দেখছেন, আরোহণের পথ আর সুকঠিন নয়, কারাকোরমের শেষচূড়ো যেন পথ ছেড়ে দিয়েছে।

২৫,৩৭০ ফুট উঁচু পাহাড় তাঁদের পায়ের তলায় পড়ে' রইল, তাঁরা এগিয়ে চললেন, পাষাণ পিণ্ডের মত নিরেট বরফস্তূপের গা বেয়ে তাঁরা চললেন—শেষে K_2 আর Broad Peakয়ের ঘনিয়ে আসা মেঘ ঝড়ের ঝাণ্ডা তুলে হাঁকলে—খবর্দ্দার।

ঝড় আসছে, ঝড় এসে পড়েছে, এই বরফচূড়োয় ঝড়ের সঙ্গে তাল ঠুকে টিকে থাকা সোজা কথা নয়।

তাঁদের মন হতাশায় ভরে' যায়, তাঁরা নামতে সুরু করেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে' তাঁরা ভাবেন, হায়, ২৬,০০০ ফুট উঁচুতে তাঁরা উঠেছিলেন!

* * *

আসন্ন যুদ্ধের মেঘে আজ সমস্ত ইউরোপের আকাশ আচ্ছন্ন! অবস্থাটা এমনি যে, যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে পারে। কিন্তু কেন এই যুদ্ধং দেহি ভাব? মধ্য ইউরোপের সমূহ অসন্তোষের কারণ কী? সুইটজারল্যাণ্ডের মত জেকোস্লোভাকিয়াও বিশেষ এক জাতির দেশ নয়—একে আন্তর্জ্জাতিক প্রদেশ বলা চলে। এখানে জার্ম্মাণ, জেক, স্লোভাক, পোলিস, ইহুদি সকলে শত শত বছর ধ'রে একসঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করছিব। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর জেক ও স্লোভাকরা জার্ম্মাণদের ওপর কিছু অত্যাচার করতে থাকে। বর্ত্তমানে জেকোস্লোভাকিয়াতে শতকরা বাইশজন জার্ম্মাণ। জেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তের অর্দ্ধেকের ওপর ঘিরে আছে জার্ম্মাণী। যুদ্ধ বাধলে জার্ম্মাণী পাবে দুইটি সীমান্ত (ফ্রান্স) ও আর একটি পূর্ব্ব সীমান্ত (সোভিয়েট ও জেকোস্লোভাকিয়া)। যুদ্ধ বাধলে জেকোস্লোভাকিয়াকে পশ্চিম প্রান্তে ফ্রান্সের মিতালীতে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে আর দক্ষিণে লড়তে হবে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে treaty of allianceএ সে রক্ষা পেতে পারে আর জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে তার অস্ত্র ফ্রান্স ও সোভিয়েটের বন্ধুত্ব। কিন্তু জার্ম্মাণী জেকেস্লোভাকিয়ার অর্দ্ধেক ঘিরে আছে সে কথা ভুললে চলবে না। এটা জার্ম্মাণীর দিকে মস্ত সুবিধে। এই দুই জাতির বিরোধের পেছনে নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখা যাবে:

(১) ইউরোপে এখন ডিক্‌টেটরদের রাজত্ব, ড্যানুব উপত্যকা দিয়ে সমস্ত মধ্য ইউরোপ তারা জয় করতে চায়।

(২) জেকোস্লোভাকিয়া গণতান্ত্রিক দেশ।

(৩) সুডেটান জার্ম্মাণরা গত যুদ্ধের পর থেকে জেক ও স্লোভাকদের হাতে নির্য্যাতিত হচ্ছে। এই সুবিধে নিয়ে জার্ম্মাণীর নাৎসী দল রীতিমত আন্দোলন সুরু করলে। হিটলার জেকোস্লোভাকিয়ার জার্ম্মানদের পূর্ণ ক্ষমতায় অধিকারী করবার জন্য হুমকি ছাড়লেন।

জার্ম্মাণী এই সর্ত্তগুলি দাবী করেছে:

(১) সমস্ত সুযোগ সুবিধার সমান অধিকার

(২) আইনে সমান দাবী

(৩) স্বায়ত্বশাসন

(৪) গতযুদ্ধের পর সমূহ অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ

(৫) স্বচ্ছন্দে জার্ম্মাণ জাতীয়তা ও জার্ম্মাণ মনোভাব পোষণ

এখন এই দাবীগুলি জেকোস্লোভাকিয়া মেটাতে মোটে রাজী নয়। জার্ম্মাণীও ছাড়তে নারাজ। জেকোস্লোভাকিয়া বলছে তাদের দেশ গণতন্ত্রবাদী, তারা ডিকটেটরদের নিয়মকানুন অস্বীকার করে। তাছাড়া জার্ম্মাণ ছাড়া অন্যান্য জাতীদের প্রতি তাদের একটা কর্ত্তব্য আছে।

জেকোস্লোভাকিয়া ও জার্ম্মাণীর এই বিরোধ, ও আসন্ন যুদ্ধের আশঙ্কার—গোড়ার কথা এই। যুদ্ধ বাধলে ফরাসী দেশ ও সোভিয়েট জেকোস্লোভাকিয়ার পক্ষ নেবে। ফরাসী ও ইংলণ্ডে মিত্রতা থাকার দরুণ ইংলণ্ড জেকোস্লোভাকিয়ার হয়ে যুদ্ধ করবে। অপরপক্ষে জার্ম্মাণীর সঙ্গে যোগ দিতে পারে অষ্ট্রিয়া ও ইতালী। সোভিয়েট শত্রু জাপানও জার্ম্মাণীর দলভুক্ত হতে পারে। তাহলে বুঝতেই পারছ ইউরোপে এখন যুদ্ধ বাধা মানে সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধে নামা!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের পূর্ব্বপ্রকাশিত "পথেবিপথে" উপন্যাসটির শেষাংশ রংমশালে আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে ছাপা হইবে।



কা—দিদিভাই

আমার স্নেহের ও আদরের মিষ্টি ভাই বোনেরা

শরতের বাঁশী বেজেছে বাংলার গৃহে গৃহে, সোনার স্বপ্ন রূপায়িত হয়ে উঠেছে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে। বাংলার বন ঘন সবুজ—তারই সঙ্গে হাতছানি দিয়ে তাকে ঘননীল আকাশ বাতাসে আনন্দের আমেজ। ভাদ্র গেল এল শরৎ! ছুটীর বাঁশী বেজেছে সকালের মনে। এ আনন্দ দিনে তোমাদের আশীষ জানাই—আমার ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা সুন্দর হও। আনন্দের পরশমণি তোমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে ধন্য হোক।

লীলা ও ইলা ব্যানার্জ্জি, গ্রাঃ ৪৮০

তোমাদের চিঠি পেলাম। তোমাদের পূর্ব্ব চিঠির উত্তর দিইনি বলে অনুযোগ করেছ—কিন্তু সত্যি যদি না দিয়ে থাকি তাহলে পাইনি জেনো। বাড়ীতে কে বলেছেন দিদিভাই তোমাদের ভালবাসে না? তাঁদের বলো দিদিভাই বলেছে সেকথা ঠিক নয়—দিদিভাই তোমাদের সকলকেই খু-উ-ব ভালবাসে। চিঠি যখন তোমরা লিখবে—উপরে ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সর্ব্বদা দেবে।

শিবাণী সিংহ (কলিকাতা)

তোমার সুন্দর মিষ্টি চিঠিটুকু পেয়েছি। থাকলেই বা তোমার খোকাখুকু—ভাবলে এখানে ঢুকতে পাবেনা, এমন কোনও কথা নেই ভাই! লাল্টু মুকুলদের নিয়ে গ্রাহক হয়ে পড়ো, দিদি তোমাদের সকলের জন্য বসে আছে। এখানকার খালি যে আইনটুকু আছে সেটা মানতে হবে—তবে সেখানে বয়সের সম্বন্ধে কড়া আইন নেই। সত্যি 'আপনি' আমি ভালবাসিনা—গ্রাহিকা হলেই লেখনী বন্ধু ও অন্যান্য বিষয় জানতে পারবে ভাই।

মায়া সেন (কলিকাতা) গ্রাঃ ৩০৯

তোমার ভাইএর গ্রাঃ নম্বরেই চলবে—এবং তাই করা হলো। ঐ গ্রাহক নম্বর দিয়ে চিঠি লিখো। এক বাড়ীতে দুজন গ্রাহক হওয়া সম্ভব নয় আমরা জানি বলেই ঐ ব্যবস্থা হয়েছে। সুজাতা রক্ষিত ও শর্বাণী সরকারের ঠিকানা পাঠাচ্ছি। বয়সের সম্বন্ধে কোনও কড়া আইন নেই সে কথা আগেই বলেছি ভাই।

পিণ্টুরাণী ও মিণ্টুরাণী বসু (চুঁচড়া) গ্রাঃ ১১১৮

তোমাদের লেখনী বন্ধু পাঠাচ্ছি, সেলাইএর প্যাটার্ণ সম্বন্ধে ওবাড়ীতে (ভাবীগৃহিণীর বৈঠক) খবর দেবো।

তোমাদের বৌদির চিঠি তো পাইনি ভাই।

পরিমল সরকার (Horua) গ্রাঃ ১০৪০

চিঠির উত্তর না পেলে রাগ করবে বলেছ—কিন্তু উত্তর দেবার তো কিছু নেই ভাই। যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠাচ্ছি।

যামিনীভূষণ সেনগুপ্ত (মজঃফরপুর)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন? কবিতা বিচার করবার ভার তো আমার নয় ভাই—তাই যথাস্থানে পাঠিয়েছি—সময়ে সংবাদ পাবে। তোমরা যেকেউ যখন চিঠির সঙ্গে রচনা পাঠাবে তখন আলাদা আলাদা কাগজে লিখো।

কামাখ্যাচন্দ্র বল (ডালটনগঞ্জ) গ্রাঃ ৮০৩

বঙ্কিমচন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তুমি প্রথম হয়েছ জেনে আমি এবং তোমার ভাইবোনরা খুসী হয়েছি খুব। তোমার প্রবন্ধ দেখে সম্পাদক মশাই যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে।

নীলিমা

গ্রাহক নম্বর, ঠিকানা পদবী কিছু নেই কেন? সব দেবে। ঠিকানা পাঠাচ্ছি।

তোমাদের ইন্দিরাদিকে তুলে দেওয়া উচিত হচ্ছেনা বলে অনুযোগ করেছ! শুনেছি স্থানের সঙ্কুলান হয়না বলে প্রত্যেকবার তাঁর বিভাগে লেখা যায়না। আমি তোমার ও অঞ্জলি সেনগুপ্তা প্রভৃতি বোনদের অনুযোগ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাবো।

সুনন্দা দে (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯২৮

তোমাদের প্রবেশের সম্বন্ধে তো আগেই বলেছি ভাই। তোমার জন্মদিনের পর আমি চিঠি পেলে আশীষ জানিয়েছি। ভাবী গৃহিণীর বৈঠকে প্রবেশ করতে পয়সা লাগে কিনা জানতে চেয়েছ? না মোটেই লাগেনা—তোমাদের জানবার জানাবার জন্যই ঐ বিভাগ! তোমাদের চিঠি পেলে বিরক্ত হবো কেন বলতো ভাই?

অরুণকুমার মুখার্জ্জী (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮৬৯

তোমার লেখনী বন্ধু 'বাবু' ও শ্যামল চিঠির উত্তর দেয়নি বলে অনুযোগ করেছ—আমি ওদের বলে দিচ্ছি—এ ভারী অন্যায়। তোমরা নিজেরা বন্ধু বেছে নিয়ে ঠিকানা চাও পাঠিয়ে দিচ্ছি না হলে আমি যাদের দিই তাদের এইরকম গোলমাল হয়—তার চেয়ে নিজেদের নেওয়া ভাল না ? কি বলে ডাকব বলতো ? মনে নেই ভাই জানিও।

সমীর চৌধুরী (বহরমপুর) গ্রাঃ ১১৫৫

বুটু ! তোমার মিষ্টি চিঠি ভারী আমোদ দিয়েছে। তোমার ছোট্ট ভাই দিন্টুকে নিয়েই রংমশাল দলে ঢুকলে আরো খুসী হতাম। মা কি সকলের থাকেন ভাই ? দুঃখ করতে নেই—রোজ সকালে উঠে তার উদ্দেশে প্রণাম জানিও দেখো অনেক ভাল লাগবে। কবিতা পেয়েছি।

সুশীলবর্দ্ধন সেন (পাবনা)

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ এজেন্টের কাছে কিনলে চিঠি লিখতে পারবে কিনা—নিশ্চয় পারবে ভাই।

মণিমালা (কলিকাতা) গ্রাঃ ৫৭৭

তোমাকে ভুলিনি আমি—চিঠিতো তুমিই অনেকদিন লেখনি ভাই। তুমি যে লেখা পাঠিয়েছ মন্দ হয়নি আরো উন্নত করবার চেষ্টা করবে।' এটা যাবে কিনা এখনও জানতে পারিনি।

সুবোধকুমার গুপ্ত (আসানসোল) ১০৭১

তোমার সব অনুরোধ রক্ষা করবার চেষ্টা করবো। কলিকাতা রেডিও ষ্টেশনের ঠিকানাতো রংমশালের পাতায় যাবেনা ভাই—যদি সুবিধা হয় পরে জানাবো। কবিতার সম্বন্ধে যথাসময়ে খবর পাবে। তোমার ঠিকানা চিঠির উপর লিখো।

শিবপ্রসাদ সেন (নিউদিল্লী) গ্রাঃ ৫৮৯

তোমার চিঠি, নক্সা ইত্যাদি পেয়েছি—এবং ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি।

জ্যোতির্ম্ময় দাশ ও জগদীশ দাস (তেলিনীপাড়া) গ্রাঃ ১১১৭

জ্যোতির্ম্ময়, তুমি এতদিন চিঠি লেখোনি বলে আমি রাগ করেছি। জগদীশ, উল্টো চাপ দিলে চলবে না বুঝেছ ? এ ব্যাপারে ছোট বড় নেই।

নিশানাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০০৯

তোমার সমস্ত মন্তব্য শুনেছি ! কবিতার কথা জিজ্ঞাসা করবো কি করে বল ? তিনি দেখে জানাবেন। বন্ধু কাকে নেবে জানিও।

শৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (ঢাকা) গ্রাঃ ৩৫৭

তুমি যা লিখেছ তা আমি নীচে দিলাম। "রংমশালদলের ভাইরা! আমি একজন লেখনীবন্ধু আকাঙ্খী। আমি এবার ম্যাট্রিক দেবো, আসছে কার্ত্তিকমাসে আমি ষোলো বছরে পড়বো।...আমি থাকি ঢাকা জেলায়, আমার লেখনীবন্ধু যে হবে সে দার্জ্জিলিং, রেঙ্গুণ, মুঙ্গের পাটনা, আসাম, দিল্লী বা তারও বেশী দূরের কোন দেশ থেকে। আমার অল্পদূরের ভাইরা, তোমরা রাগ করোনা; আমায় অহঙ্কারী ভেবে নিওনা... আমার ইচ্ছা লেখনী বন্ধু করে পত্র বিনিময়স্থলে বন্ধুর দেশের সকল বিবরণ জেনে নেওয়া ও আমার দেশের বিবরণ তাকে জানিয়ে দেওয়া। এই আদান প্রদানের মধ্যে দিয়েই আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে। দেখা হবেনা কোনদিন। অপেক্ষা যে মোহ গড়ে তুলে তা বড়ই মধুর।—" তোমরা কে শৈলেনের সঙ্গে আলাপ করবে জানিও ঠিকানা দেবো।

আনোয়ারা বেগম (বারাকপুর) গ্রাঃ ১১০৯

তোমার লেখনী বন্ধু লীলা আমায় জানিয়েছে—সে তোমার চিঠি পেয়েছে এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। তবে চোখের খুব অসুখ—একটা চোখ একেবারে বাঁধা আছে—লিখতে বা পড়তে পারা দূরের কথা আলোতে চোখ মোটে খোলা হয়না—তাই সে বলেছে তুমি তার যেন ভুল ধারণা কোরোনা—সে একটু ভাল হয়েই তোমায় চিঠি লিখবে।

জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, তুষারকান্তি দত্ত, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, সুরথ বসু, ভাদুড়ী ভ্রাতৃবৃন্দ; অরুণ বন্দোপাধ্যায়, বিনয়চন্দ্র, পঞ্চানন রুই, পরিমল কুমার চক্রবর্ত্তী, অলক ঘোষ তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি—যারা যা অনুরোধ করেছ রাখতে চেষ্টা করা হবে। যারা আজ নতুন এসেছ তাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছি আর জানাচ্ছি তোমাদের সকলকে আমার আন্তরিক স্নেহ ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র (কলিকাতা) গ্রাঃ ১০৭৭

তুমি দার্জ্জিলিং থেকে কোলকাতা এসেছ সে খবর৭ তোমার দুটী চিঠিই আমি পেয়েছি ভাই।

তোমার কথাগুলো আমার ভালো লেগেছে। চমৎকার উত্তর দিয়েছ 'ছাদে উঠে সিঁড়িকে অপমান করা'। আনন্দকে বিশ্লেষণ করে দেখার শক্তি তোমার আছে। আদর্শবাদের কথাটা খুব মানি। কিন্তু সে আদর্শকে ক'জন অটুট রাখতে পারেন? যাঁরা পারেন তাঁরা মহাপুরুষ! বিবেকানন্দের কথাটা "জীবনে একটা আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শের জন্য প্রাণত্যাগ করো"—তোমাদের সকলের জীবনে সার্থক হ'য়ে উঠুক। তোমাদের রংমশালকে যে ভাবে তুমি রূপ দিতে চাও দেখছি অনেকখানি চিন্তা এর পিছনে আছে তোমাদের আন্তরিক স্নেহভালবাসার স্পর্শে এ আরো সুন্দর হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস তবে সময় লাগবে ভাই। অন্যান্য বিষয়গুলো পরিচালকমশাইএর অবগতির জন্য তোমার চিঠিখানা তাঁর কাছে পাঠালাম। ইতি—

শুভার্থিনী—

তোমাদের

দিদিভাই



সহসা

শ্রীমতী শিবানী সরকার

অন্ধকার তখনও ভালো করে দূর হয়নি। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে মালতী দূরে মিলিয়ে যাওয়া একটি তারার পানে চেয়ে আছে। তারাটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। মালতী এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সকালবেলার উজ্জ্বল রোদ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলেছে। বীরু এসে মালতীর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। "এত বেলা হয়ে গেছে, ছোড়দি, এখনও ঘুমোচ্ছ?" মালতী ধড়মড় করে উঠে বসল। পায়ের কাছে বেড়ালছানাটা মাথা ঘসছে। তার দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করে মালতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই মনিবটীর কাছে সে কোনদিন ভালো ব্যবহার পায়নি।

"ওঃ এত বেলা হয়ে গেছে!" মালতী তাড়াতাড়ি চুল বাঁধতে লাগল।

ভোঁ-ও-ও—ওই যাঃ স্কুলের বাস। খাওয়াটাই ছাই হলনা। মালতী ছুটতে ছুটতে বাসে উঠে বসল। তার মুখ দেখে মেয়েরা সবাই হেসে ফেলল।

সত্যি এমন অপেয়া আজকের দিনটা! স্কুলে গিয়ে বাস থামতেই নামতে গিয়ে মালতী খেল এক আছাড়।

ওঃ বাবা ক্লাশে আবার বসে আছেন সাক্ষাৎ যম—মিসেস মিটার। মালতি নিজের জায়গায় বসতে না বসতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—Atlas Mountain আফ্রিকার কোন দিকে?" শুনে মালতী এতই ভয় পেল, যে, এত ভালো করে শেখা পড়াটার বিন্দুমাত্রও তার মগজে রইল না। তোতলতে তোতলাতে কোনমতে সে উত্তর দিল, "এঁ্যা—এঁ্যা—দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোনে।"

"Nonsense !—মিসেস মিটারের স্বর পর্দ্দায় চড়ল।

অঙ্কের ক্লাশেও মালতী খুব বকুনি খেল মীরাদি ত স্পষ্টই বললেন যে পৃথিবীতে গোবরের পরিমাণ কিছু বেশী হয়ে যাওয়ায় মালার মাথায় গিয়ে কিছু আশ্রয় নিয়েছে!

টিফিনের সময় নমিতা এসে তার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। দুজনে মাঠের দিকে যাবে এমন সময় হঠাৎ মালতী প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, "কি হবে নমিতা? কাল সকাল মিস্ সেনকে টাস্ক দেখাতে গিয়ে আমার Fountain Pen সেখানে ফেলে এসেছি, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।" "তোর মত মেয়ে আর দেখিনি, মালা। চল্ মিস্ সেনের ঘর থেকে Penটা আনি এখন বোধ হয় উনি নেই ঘরে।

মিস্ সেনের ঘরটা প্রকাণ্ড। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চমৎকার চন্দনকাঠের টেবিল। তার ওপর বসানো আছে একটা সুন্দর আয়না, ভারী চমৎকার জিনিসটা। এটা মিস্ সেনের দাদা তাঁকে জন্মদিনে দিয়েছেন। সেই টেবিলটার ওপর, আয়নাটার সামনে পড়ে আছে মালতীর Fountain Pen. মিস্ সেনের ঘরে সর্ব্বদা থাকে একটী ছেলে, নাম তার মন্নুয়া। সে মিস্ সেনের ঘর ঝাড়ে ও তাঁর হুকুম পালন করে। কিন্তু এখন সে ঘরে ছিলনা। নমিতা বলল, "তোর সৌভাগ্য মালা। মন্নুয়াটাও আজ ঘরে নেই।" চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে মালতীর চোখ পড়ল সেই Penটার ওপর। ছুটতে ছুটতে গিয়ে যেই সে টেবিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে Penটা তুলে আনতে গেল অমনি টেবিলটা একদিকে কাৎ হয়ে পড়ে মিস্ সেনের সাধের আয়না সশব্দে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার! মালতীকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নমিতা তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল।

বাড়ী গিয়ে মালতি সেদিন খালি ভাবছে কাল কি হবে! "ঘুড়ি ওড়াবে ছোড়দি?" —"না," মালতী ঝেঁকে উত্তর দিল। বীরু বেচারা মুখ চুন করে চলে গেল। বেড়ালছানাটা মিউ মিউ করে দুবার ডেকে মালতীর পায়ে মাথা ঘষতেই মালতী এমন এক চপেটাঘাত করল যে বেচারী বেড়াল ছুটে পালালো।

পরদিন স্কুলের বাস এসে দাঁড়াতে শঙ্কিত পদে মালতী এসে বাসে উঠল। সারাটী গাড়ী সে একটী কথা কইল না। মনের অবস্থা তার বড় ভয়ঙ্কর। মালতী ভাবতে লাগল, এবার সে ঠিক আত্মহত্যা করবে, —হ্যাঁ নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবে। হঠাৎ তার চিন্তাধারায় বাধা পড়তে সে দেখল বাস স্কুলে এসে থামল। নমিতা তার হাত ধরে টেনে বল্লে, "কি মজা দেখবি চল মালা।" বলে মালতীকে নিয়ে গেল একেবারে মিস্ সেনের ঘরের সামনে। সেখানে ক্রোধারক্ত মুখে দাঁড়িয়েছিলেন মিস্ সেন, তাঁর পাশেই মিসেস্ মিটার ও অন্য টিচাররা। কয়েকজন মেয়েও ভীড় করেছে আর মিস্ সেনের সামনে ভীত মুখে দাঁড়িয়ে আছে মন্নুয়া।

"নিশ্চয় তুমিই ভেঙেছ। তুমি ত থাক এ ঘরে।" মিস্ সেন বললেন।

মন্নুয়া কম্পিত কণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানালো, কিন্তু সে প্রতিবাদ কেউ গ্রাহ্য করল না।

"হয় এখনই আয়নার দাম দিয়ে দে, নয় বেরিয়ে যা; তোকে আর রাখব না।"

বেচারী মন্তুয়া ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে রইল, গরীব মানুষ, দামী আয়নার দাম কোথা থেকে দেবে? আর চলে গেলেই বা কি করবে? যা পেত এখানে কাজ করে তার থেকেই বাড়ীতে তার মা আর ছোট বোন খেতে পেত। এখন তারা কি খাবে?

নমিতা দেখল মালতীর চোখ কেমন ছল ছল করছে। নমিতা কি একটা বলতে গেল এমন সময় মালতী অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল!

সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে মিস্ সেনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "মিছামিছি কেন ওকে শাস্তি দিচ্ছেন মিস্ সেন? আয়নাটা আমিই ভেঙ্গেছি, ও নয়।" "তুমি মালা? কি করে ভাঙ্গলে?" "পরশু টাস্ক দেখাবার সময় আমার Pen ফেলে গিয়েছিলাম এ ঘরে। সেইটা কাল টিফিনের সময় নিতে এসেছিলাম, আমার হাতের ধাক্কা লেগে ওটা পড়ে গেল। আমায় ক্ষমা করুন, মিস্ সেন।" মিস্ সেন কিছু বলবার আগেই মিসেস্ মিটার এগিয়ে এসে বললেন, "I am very pleased with you Mala." তারপর মিস্ সেনের দিকে ফিরে বললেন, "আয়নার দাম আমি দিয়ে দেব, মিস্ সেন।"

* * * *

বাড়ী আসতেই বীরু বল্লে, "আজকে আমরা খেলায় জিতেছি ছোড়দি।" "তাই নাকী? বেশ তো।"—মালতী হাসতে লাগল। বীরু অবাক! তার ছোড়দির আজ এত খুসি মেজাজ? ঘরে বেড়ালছানাটা ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। মালতী একটু হেসে তাকে কোলে তুলে নিল।

গ্রাহকগ্রাহিকাদের ছবিঃ—



ডিব্রুগড়ে বন্যা—রাস্তার এক অংশ
ধীরেন ঘোষ (গ্রাঃ নং ৩৪০), ডিব্রুগড়।



'কি রে দিদি কি'—বলে ঝুঁকে ছোট্ট বোনটি
দেখে দিদি পড়ে কি—কিসে তার মনটি।
প্রদীপকুমার সেন (গ্রাঃ নং ৩০১), কলিকাতা।



চাঁদ ও মেঘ (হাতে আঁকা)
শ্রীরথীশচন্দ্র ঘোষ (গ্রাঃ নং ৩৩৮), রাজসাহী।

অঞ্জলি স্মৃতি

আমরা গভীর দুঃখে জানাইতেছি রংমশালের গ্রাহিকা শ্রীঅঞ্জলি সেনগুপ্তা গত ৭ই ভাদ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় অঞ্জলির বয়স মাত্র ১৪ ছিল। অঞ্জলি রংমশালের গোড়া থেকেই তার গ্রাহিকা ছিলেন এবং রংমশাল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাংলা সাহিত্যে অঞ্জলির প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অঞ্জলির ভ্রাতা শ্রী অপর্ণা প্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ মহাশয় অঞ্জলির স্মৃতি রক্ষার্থে রংমশাল প্রতিযোগিতায় দুইটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। কার্ত্তিকের রংমশালে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। তোমাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরা অঞ্জলির আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি ও অঞ্জলির আত্মীয় স্বজনের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

রংমশাল দল

দিদিভাই'এর খোলা চিঠি

রংমশাল দলের আদরের ভাইবোনেরা আমার!

চিঠির বাক্স ছেড়ে এবার তোমাদের সবাইকে একত্রিত করবার জন্য বাইরের আলোতে এসে দাঁড়িয়েছি,—কি মজা বলতো!

গতবারের রংমশাল দলের প্রীতিসম্মিলনীতে তোমরা অনেকেই আসতে পারোনি। অনেকেই এজন্য আমার ওপর অভিমান করেছিলে, রংমশাল মারফৎ তোমাদের জানান হয়নি বলে তোমরা দুঃখ করেছিলে। এইরকম এক সম্মিলনের জন্য তোমরা প্রায় সবাই আমায় অনুরোধ করে পাঠিয়েছ—পরিচালকমশাই তোমাদের আব্দার মঞ্জুর করেছেন—খুব আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। তোমাদের নিয়ে একটু আনন্দ করতে চাই, মেশাটাই আমাদের আসল। যথাসময়ে অন্যান্য খবর পাবে।

শারদীয়ার প্রীতি ও আশিষ সবাই জেনো। ইতি—

তোমাদের

প্রীতিপ্রয়াসী

দিদিভাই

রংমশালের নতুন বছর এল। নতুন বছরে রংমশালও নতুন হয়ে বার হবে। রঙে রেখায় ছন্দে গল্পে আরও কত কিছুতে রংমশাল নতুন হবে। তোমরা দেখে আশ্চর্য্য হবে। রংমশালের নতুন মলাটের অদ্ভুত ছবির প্রতি দৃষ্টি রেখো।

আর দেরী না করে এখনই রংমশালের গ্রাহক হয়ে পড়। কার্ত্তিক মাস পড়বার আগেই চাঁদা পাঠিয়ে দাও। যারা গ্রাহক আছ তারা শীঘ্র মণি-অর্ডারে চাঁদা পাঠাও—নতুন খাতায় নাম তোলা হবে।

আমাদের লাইব্রেরী

• **দুধ সায়রের পথে** : লিখিত সুকুমার দে সরকার, চিত্রিত গোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স, দাম ৸৵০

সাজ সজ্জা ও অপরূপ ছবিতে এই মনোরম রূপকথাকারে আজব উপন্যাসটি পড়ে আমরা খুসী হয়েছি। মাটির পুতুল পেহ্লাদি ও তার হাঁস সঙ্গী কক্কিকিচক্ দুধ সায়রের পথের অভিযানে কত অদ্ভুত দেশ দেখল, কত রকম মানুষ পশুপাখী পিঁপড়েদের সঙ্গে তাদের আলাপ পরিচয় হল। পূজোর ছুটিতে এই বইটি হাতে নিয়ে তোমরাও কক্কিকিচক্ ও পেহ্লাদীর সঙ্গে দুধ সায়রের পথে বেড়িয়ে আসতে পারো। সে ভারী মজার এ্যাড্‌ভেঞ্চার। আর পথের খরচ মাত্র ৸৵০

দুই খুনী :—সুকুমার দে সরকার, রংমশাল প্রেস। দাম ৸০

সুকুমার বাবুর এ বইটিরও পরিচয় নিস্প্রয়োজন। নানা মাসিকপত্র ও কাগজে বইটির উচ্চ প্রশংসা বেরিয়েছে। পশু পাখীদের নিয়ে গল্প লেখায় সুকুমার বাবুর পাকা হাত। শুধু তা নয়, সুকুমার বাবু পশু পাখীদের ভাষা আয়ত্ত করে ফেলেছেন—তাদের ঘর দোর সংসারের কথা, তাদের সুখ দুঃখ, রোজকার নিত্য জীবনের নানা তথ্য আবিষ্কার করে তোমাদের এ বইটি তিনি উপহার দিয়েছেন। পশু পাখীদের নিয়ে এমন গল্পের বই সুকুমার বাবু ছাড়া বোধ করি আর কেউ লেখেন নি।

সবুজ লেখা :—প্রাচী পাব্‌লিশিং হাউস : দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত। রবিরঞ্জন মিত্রমজুমদার, সাহিত্য আশ্রম, পি ৭৭ লেকরোড, প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন আর্ট পেজি বড় সাইজ, পুরু অ্যান্টিক কাগজে ছাপা. তিনরঙা ও এক রঙা অসংখ্য ছবি। মূল্য দেড় টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

বাংলা দেশের শিশু সাহিত্যে দুটি নাম করতে গেলে অবনীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জনের নাম না করে' উপায় নেই। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' যখন বার হয়, দেশে তখন হুলস্থুল

পড়ে' যায়। শ্রীঅরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কেউ-ই বইখানার প্রশংসা করতে বাদ যান নি। তারপর থেকে সুরু করে' দক্ষিণারঞ্জন অজস্র রঙীন সুমিষ্ট লেখা লিখেছেন, কিন্তু এই সব চমৎকার লেখা একত্র ছাপা হয়ে' কখনোও বার হয় নি। এই সঞ্চয়ন বইখানায় দক্ষিণারঞ্জনের শ্রেষ্ঠ রূপকথা, কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান, হাসির গল্প ইত্যাদি আছে। বইখানার সাজাবার ভার নিয়েছিলেন প্রাচী পাবলিশিং হাউস। এঁরা রঙে রেখায় যে মনোহর রূপ দিয়েছেন বইখানাকে, তা' সত্যিই অভিনব। এ বই ছেলেমেয়েদের আনন্দ, শিক্ষা, উৎসাহ ও আদর্শ যোগাবে।

পরীর গল্প :—সুধাংশু দাসগুপ্ত, ইষ্টার্ণ ল' হাউস। দাম ।৵০

গল্প ঠাকুরদা :—বুদ্ধদেব বসু, ইষ্টার্ণ ল' হাউস। দাম ।৵০

জীবনের সাফল্য :—শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও গৌরাঙ্গ বসু, ইষ্টার্ণ ল' হাউস। দাম ।৵০

আরতি :—সুনির্ম্মল বসু সম্পাদিত, ইষ্টার্ণ ল' হাউস। দাম ১।০

ইষ্টার্ণ ল' হাউস এত সস্তায় বই কেমন করে বার করেন ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। শুনেছি তাঁদের উদ্দেশ্য বাংলার ঘরে ঘরে তাঁদের বই পৌঁছুক। **পরীর গল্প** বইটি সুধাংশু বাবুর লেখা, এতে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী আটটি মনোরম রূপকথা আছে। **গল্প ঠাকুরদা** বইটি লেখা বুদ্ধদেব বাবুর। বুদ্ধদেব বাবুর নামের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। রংমশালে তোমরা তাঁর লেখা পড়েচ। এ বইটিতে ভারী মজার ৬টি ছোট গল্প আছে। হাসির পরিবেশক শ্রীশিবরাম ও তাঁর তরুণ বন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ দুজনা ভাগাভাগি করে **জীবনের সাফল্য** বইটি লিখেছেন। সবশুদ্ধ ১০টি গল্প। কয়েকটি গল্প রংমশালে প্রকাশিত হয়েছিল। **আরতি** তোমাদের পূজার ছুটি কাটাবার মস্ত বই। গল্প কবিতা ও প্রবন্ধে সবশুদ্ধ ৪৯টি। ছবিও অনেক। বইটির আয়তনের তুলনায় দাম সস্তাই বলতে হবে। এঁদের আরো দুটি বই পূজোর বাজারে তোমরা পাবে। একটি সুবিনয় রায় চৌধুরীর প্রণীত ধাঁধার বই—"**বল তো ?**"—দাম ৷৵০ আর একটি গোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত **অঞ্জলি** (গল্পের বই) দাম ।৵০।

আবিসিনিয়া-ফ্রণ্টে :—ধীরেন্দ্রলাল ধর। এম সি সরকার এণ্ড সন্স। দাম ১৲

ধীরেন বাবুর মতে আধুনিক যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে বাংলা সাহিত্য কিশোরদের মৌলিক উপন্যাস এই প্রথম। আবিসিনিয়ার যুদ্ধ ভিত্তি করে এটি একটি কাল্পনিক যুদ্ধ কাহিনী। বইটি বিলম্বে পাওয়ায় কোন সমালোচনা করা সম্ভব হ'ল না।

ভাদ্র মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

ধাঁধার উত্তর

১। গজল	৭। পাতাল
২। বাদল	৮। কপিল
৩। সবল	৯। কমল
৪। কাজল	১০। ধবল
৫। সরল	১১। যুগল
৬। পাটল	১২। বদল

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম ঃ

জগদিন্দ্রনাথ রায়, (ভবানীপুর) ; শতদল দাস, (দাড়িয়াপাড়া) ; প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর) ; অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর) , সুনীল কুমার ঘোষ, (তালতলা); পরেশচন্দ্র মাইতি, (ভবানীপুর) ; জনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (খিদিরপুর) ; মণীন্দ্রনাথ মিত্র, (কোন্নগর) ; কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য, (নাগপুর) ; জ্যোতির্ম্ময় মুখোপাধ্যায়, (আরা); বকুল, সুনীল ও রণীন্দ্র সেন, (দিনাজপুর) । সুভাষ কুমার ও সুবোধ কুমার রায়, (মধুবাণী) ; শীলা ও ইলা ব্যানার্জ্জী, (গোয়াবাগান) ; শৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, (ঢাকা); কুমারী জ্যোতির্ম্ময় মুখার্জ্জী, (বালীগঞ্জ) , অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা) ; অরুণ কুমার মুখার্জ্জী, (ভবানীপুর) ; কলকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, (পাটনা) ; সুনন্দা দে, (কলিকাতা) ; অঞ্জলি, রজত ও খোকা, (নৈহাটী) ; অজিত কুমার লাহিড়ী, (কলিকাতা) ; সমীর চৌধুরী, (বহরমপুর) ; অরুণ কুমার রায়, (ভবানীপুর) ; নীলিমা, নমিতা, নির্ম্মল ও অমল, (সিমলা শৈল) ; সবিতা বসু, (কলিকাতা); মহাবিষ্ণু সেন, (ফরিদপুর) ; প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়, মিঃ উইলোবি, মিঃ সি, এস, ব্যাস ও মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, (শ্যামনগর) ; অসীম কুমার সরকার, (পুরুলিয়া) ; সুনীল কুমার দত্ত (দার্জ্জিলিং) ; মীরেন্দ্র কুমার সরকার, (তেওতা) ; প্রতিভা, ছোটমামা, রেণু, লীলা ও রমেশ, (জামসেদপুর) ; সাবি, দুর্গা, লক্ষ্মী, করুণা, রেণু, রথীন্দ্র ও সতী মৈত্র, (রাজসাহী) ; গোপালেন্দ্র, সাবিত্রী, গীতি, বেবী, সতী ও রথীন্দ্র মৈত্রেয়, (রাজসাহী) ; অদিতি দেবী, অমিতাভ ও মনোজিৎ ঘোষাল, (পুরুলিয়া) ; পরিমল কুমার চক্রবর্ত্তী, (জামালপুর) ; অজিত কুমার বোস, (মজঃফরপুর) ; পঞ্চানন রুই, (উল্টাডাঙ্গা) , কোতা, বৃচি, অঞ্জলি, কমল ও ধীরেন্দ্রলাল ঘোষ, (ডিব্রুগড়) ; কুমারী আভা রায়, (কলিকাতা), কামাক্ষাচন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ) ; বিশু, মধু, ছবি ও ক্ষিতীশচন্দ্র দাস, (বালীগঞ্জ) ; মিস দেবলা ঘোষ, (বাঁকীপুর) ; জ্যোতিপ্রকাশ রায়চৌধুরী, (রামগোপালপুর) ; বাসন্তী সেনগুপ্তা, (কলিকাতা) ; ইন্দিরা ঘোষ, (ঢাকা) ; আশীষনাথ রায়, (পুরন্দরপুর) ; সুবোধ, বুড়ো, বুদ্ধান, লতু ও ফিনমী, (বোলপুর), রেণু, কণা, সুনীল ও অরুণ, (রাজসাহী) ; রমেশ, সোমেশ, ভবেশ, বিশ্বনাথ, মনু, টুনু, ঝুনু ও ভানু, (মধুপুর) ; রঞ্জন সরকার, (বালীগঞ্জ) ; ভবানীপ্রসাদ গুপ্ত, (ডিব্রুগড়) ; হীরা বসু, (লাহোর), সাধনা, অর্চ্চনা, গোপাল ও রাখাল, (গৌহাটী) : রাধারাণী চক্রবর্ত্তী, (জলপাইগুড়ি) ; প্রসুন, অরুণ, শৈলেশ, টিপলু এবং গাবলু, (মীরাট) ;

পবিত্র ও প্রসূন গুপ্ত, (পাটনা) ; সুনীল ও সলীল সেন, (পাবনা) ; হারাধন বসু, (ছাপড়া) ; সুধীন্দ্রনাথ গুহ, (ভবানীপুর) ; লেঙ্গা, হরিপদ, ভাগ্নে ও যুগলকিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভবানীপুর) ; প্রশান্ত, অনন্ত, কানন ও হিটলার (শ্যামবাজার), সুধাতোষ বসু, (কলিকাতা) ; মীরা তরফদার, (ময়মনসিংহ) ; মীরা ঘোষ, (কলিকাতা); কমলা চ্যাটার্জ্জী, (শ্যামবাজার) ; অমিয়, অনল, অজিত, সাবু, খুকু ও মন্টু, (মানভূম) ; অরুণ কিরণ শীল, (বরিশাল) ; সরোজ কুমার নায়ক, (মেদিনীপুর) ; বেণু, পিন্টু, মিন্টু ও বাবলু, (কলিকাতা) ; সুকুমার ও বলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (শিবপুর) ; সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, (ঝামাপুকুর) ; অঞ্জলি গুপ্তা, (কলিকাতা) ; অমিয়, অমল, গোপাল, অজিত, সাবু এবং লুলু, (খুদিয়া)।

যাদের একটি ভুল হয়েছে তাদের নাম স্থানাভাবে ছাপা এবার সম্ভব হল না।

শব্দ চৌকি

নীচের শব্দ-চৌকির সাদা ঘরগুলি এক একটি অক্ষর দিয়ে ভর্ত্তি কর। নম্বরের সঙ্গে কথাগুলির নির্দ্দেশ দেওয়া হল। পাঠাবার শেষ তারিখ ২৮শে আশ্বিন। কেবল নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম কার্ত্তিকে প্রকাশিত হবে।

১ কু	২	৩ র	●	●	●	৪ বি		৫
৬	কৃ		৭	●	৮		●	
৯		●		●	১০ ত			●
য়	●	১১	ল		●	বী	●	১২
১৩	১৪	●	●	●	১৫		●	
●	১৬	১৭	●	১৮ অ		●	১৯	
২০		না	●		●	২১		ম্ন
২২	ক	●	২৩	ন	●	২৪	মা	●
	●		২৫ ল		●	২৬		

নির্দ্দেশ

পাশাপাশি ঃ

১। পরশুরামের প্রসঙ্গে 'এর' কথাই মনে পড়ে। ৪। এ 'মা' করাই উচিৎ। ৬। রংমশালের গ্রাহকরা যা। ৮। অস্থির সমুদ্রে দেখতে পাওয়া যায়। ৯। এর আদর যে পায়নি তাকে দুর্ভাগা

বলতে হবে। ১০। পাখীর ডানা ভেঙে আছে এর ভেতর। ১১। হাত পা মচকালে এতে অনেক উপকার দেখা যায়। ১৩। আমাদের দেশের মেয়েদের এর প্রতি ভক্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ১৫। যুদ্ধের সময় বিশেষভাবে দরকার হয়। ১৬। শুভকার্য্যে এর প্রয়োজন। ১৮। লোকে বলে এর শেষ রাখতে নেই। ১৯। পরিষ্কার। ২০। বিখ্যাত সওদাগরের স্ত্রী। ২২। ধর্ম্মমতের গোঁড়ামিই আজ ভারতবর্ষকে "—" করেছে। ২২। দুষ্টু ছেলের গুরুমশায় পেছন ফিরলে দেখায়। ২৩। এর গহনে প্রবেশ করা বড় দুরূহ। ২৪। তিব্বতী হরিণ। ২৫। সবার প্রিয়। ২৬। বিলাসের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় ওলটপালট।

ওপর নীচেঃ

১। এমন সুন্দর যার অস্ত্র তারই কিনা দেহ নেই। ২। এর ঝুলিটী কোথায় হারিয়ে গেল? ৩। চিরচঞ্চলা ইনি। ৪। ধৃতরাষ্ট্রের পিতা। ৫। এর যদিও কর নেই কিন্তু এর নাম হয়েছে করী এ নামটি কি ঠিক? ৭। ঈশ্বরের দূত। ৮। যা হয়ে গেছে। ১২। বিপদে অনেকেরই বুদ্ধিনাশ হয়। ১৪। বর্ষাকালে এর শোভা মনকে আনন্দ দেয়। ১৫। ইনি বৈকুণ্ঠবাসী। ১৭। মহাভারতের বিখ্যাত নারী। ১৭। এ কেহই সহ্য করেনা। ১৯। এ করে কোন লাভ ত হয়ই না বরঞ্চ এ অন্যের ব্যাথার কারণ হয়। ২০। আগেকার দিনের চোর ডাকাতরা এ গুণ অস্বীকার করত না। ২১। এর স্বপ্ন দরিদ্রের না দেখাই ভালো। ২৩। শিশুরা পেলে খুব খুসি হয়।

পূজার ছুটি প্রতিযোগিতা

পূজার ছুটিতে তোমরা কোথায় কে কি করলে, কোন একদিনের মজার ঘটনা, কোন এক রাতের রহস্য, কোন মজার গল্প, কোন নতুন দেশ বা নূতন বন্ধুর পরিচয়—তার ছোট্ট কাহিনী লিখতে হবে এই প্রতিযোগিতায়।

বুঝতে পেরেছ বোধহয় পুরো পূজার ছুটিটা কি করেছ তার বর্ণনা দিতে হবে না—কোন একটা বিষয় যা তোমাদের ভাল লেগেচে তাই নিয়ে লিখতে হবে।

রংমশালের একপাতার বেশী হবে না। নাম, গ্রাঃ নং, বয়স, অভিভাবকের স্বাক্ষর ইত্যাদি লিখবে। দুটো পুরস্কার থাকবে: একটা **ছোটদের** একটা **বড়দের**।

পাঠাবার শেষ তারিখ: ২০শে কার্ত্তিক।

শ্রাবণ মাসের বায়-করা প্রতিযোগিতার ফলাফল কার্ত্তিকে প্রকাশিত হবে।

এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া

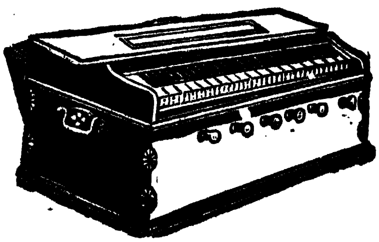
লাইফ এস্যুওরেন্স কোং, লিমিটেড

সম্পত্তি	...	৪,৮৭,২৭,০০০
আয়	...	৮১,৩৪,০০০
চলতি বীমা	...	১২,৮২,৮৮,০০০
নূতন বীমা	...	১,৮৬,৬৯,০০০

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিমিটেড

চীফ এজেন্টস্— বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম।

২৮, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা



অরগ্যাণ কোং

৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

আমাদের নিজ কারখানায় অরগ্যান, হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, সেতার, এস্‌রাজ, বাঁশী, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত ও মেরামত করা হয়।

=সুবর্ণ সুযোগ=

ইনষ্টলমেণ্ট অর্থাৎ মাসিক কিস্তিতে টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

সূচীপত্র


রংমশাল
পরিচালক-অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন এম.এ
সম্পাদক - শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
দ্বিতীয় বর্ষ
নবম সংখ্যা
আষাঢ়
১৩৪৫
মশাল প্রেস লিমিটেড
ফোন - কলিকাতা ৪১৩৭

বার্ষিক সূচীপত্র

কার্ত্তিক ১৩৫৪—আশ্বিন ১৩৫৫



"বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!"

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

পুণ্য তীর্থ হরিদ্বারে

পূর্ণ কুম্ভ মেলা

১০ই মার্চ্চ হইতে—২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত

জীবনের এ মহা সুযোগ হারাইবেন না

পুণ্য স্নানের প্রধান দিন :—

দোল পূর্ণিমা	...	১৫ই মার্চ্চ
চৈত্র অমাবস্যা	...	৩১শে মার্চ্চ
রাম নবমী	...	৮ই এপ্রিল
কুম্ভ	...	১৩ই এপ্রিল

সুদীর্ঘ এগার বৎসর পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতীব পুণ্যদায়ক এই মহাযোগ পুনর্ব্বার অনুষ্ঠিত হইতেছে, হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভ মেলা ১৯৫০ সনের পূর্ব্বে আর হইবে না।

১০ই মার্চ্চ হইতে ১৮ই এপ্রিল অবধি হরিদ্বারের জন্য হ্রাস মূল্যে সকল শ্রেণীর যাতায়াতী টিকিট পাওয়া যাইবে, যাহাতে ২রা মে অবধি প্রত্যাবর্ত্তন করা চলিবে। পথিমধ্যে ইচ্ছামত যে কোন ষ্টেশনে যাত্রা বিরতি করিতে পারা যাইবে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভ্রমণ শেষ করিতে হইবে।

টিকিট ক্রয়ের স্থান হইতে ৩০ মাইল বা তার ভিতর কোন ষ্টেশনেই যাত্রা বিরতি করিতে পারা যাইবে না।

প্রয়োজনমত সকল প্রধান ষ্টেশন হইতেই অতিরিক্ত গাড়ী ছাড়ার ব্যবস্থা হইবে।

রেলে আরামে ভ্রমণ করুন।



কবিরাজ—এন. এন সেন এণ্ড কোং লিং
১৮।১ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীসুকুমার দে সরকারের নূতন বই !

তোমাদের সকলেরই
সুকুমার বাবুর গল্প খুব ভালো লাগে, না ?
তাঁর নূতন গল্পের বই

দুই খুনী

জন্তু-জানোয়ারের পশু-পক্ষীর ঘরের কথা
ঝকঝকে তকতকে বই !
শীঘ্রই প্রকাশিত হবে !
দাম মাত্র—বারো আনা
রংমশাল কার্য্যালয়
১৫৪, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
ফোন সাউথ ১৩৯

এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া

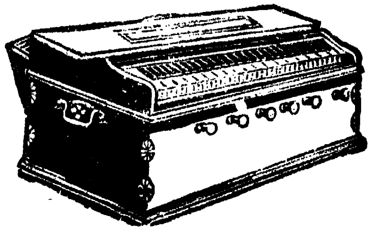
লাইফ এস্যুওরেন্স কোং, লিমিটেড

সম্পত্তি	...	৪,৮৭,১৭,০০০
আয়	...	৮১,৩৪,০০০
চলতি বীমা	...	১১,৮১,৮৮,০০০
নূতন বীমা	...	১,৮৬,৬৯,০০০

ডি, এম, দাস এণ্ড সন্স লিমিটেড

চীফ এজেণ্টস— বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম।

২৮, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা



অরগ্যান কোং

৬।১।১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

আমাদের নিজ কারখানায় অরগ্যান, হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, সেতার, এসরাজ, বাঁশী, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত ও মেরামত করা হয়।

মফঃস্বলের অর্ডার যত্ন ও তৎপরতার সহিত সরবরাহ করা হয়।

উচ্চ কমিশনে সর্ব্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক।

সচিত্র কেটালগের জন্য পত্র লিখুন।